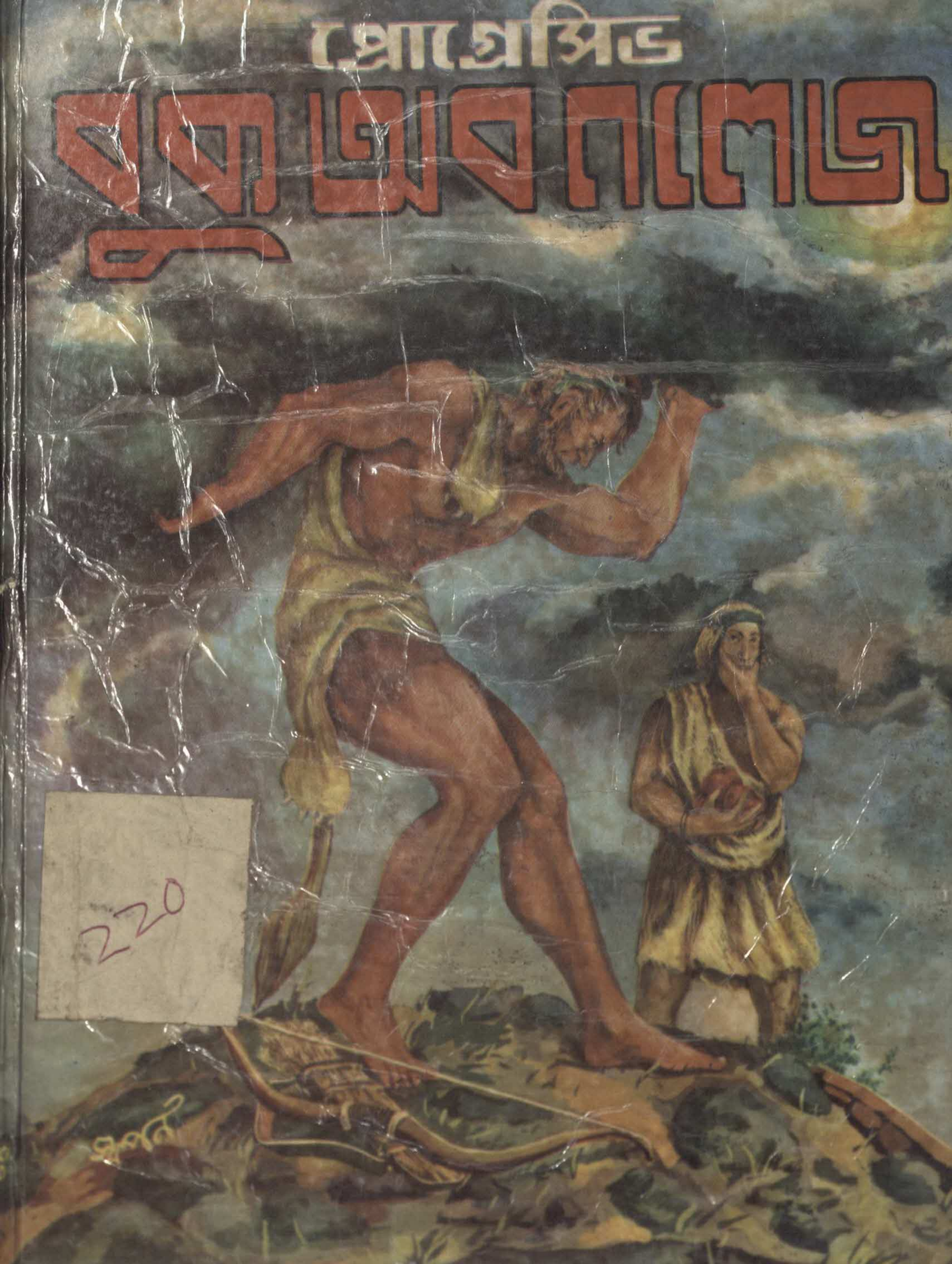
প্রোগ্রেসিভ

বুক অব নলেজ





প্রোগ্রেসিভ

বুক অব নলেজ

সাধারণ সম্পাদকঃ

আচার্য **ননী গোপাল আইচ**

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতিঃ

ডঃ আর. কে. দাশগুপ্ত

ভূতপূর্ব ডিরেক্টর, ন্যাশানাল লাইব্রেরী, কলিকাতা



প্রকাশক :
ছবি ভট্টাচার্য
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৪

মূল্য : একশত পঁচিশ টাকা

মুদ্রক :
শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ধন
নবদুর্গা প্রেস
৭, সৃষ্টিধর দত্ত লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

বই বেঁধেছেন :
হরিপদ দাস
নারায়ণ বাইণ্ডিং ওয়ার্কস
১, রাজেন্দ্র দেব রোড
কলিকাতা—৭০০০০৭

ভূমিকা

অন্ধকার রাত্রে নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকালে অগণিত আলোর ফুটকি চোখে পড়ে। এগুলি ছোট ফুটকির মতো দেখালেও মোটেই ছোট নয়। এগুলি সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার ধরে পরিব্যাপ্ত বিরাট বিরাট জ্যোতিষ্ক। কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত বলে এই সব জ্যোতিষ্ককে ছোট আলোর ফুটকির ন্যায় দেখায়। অনাদি অনন্ত মহাশূন্যে জ্যোতিষ্কের সংখ্যা যে কত, তা বলে শেষ করা যায় না। মহাসাগরের তীরের বালুকণার মতোই এই সব জ্যোতিষ্ক অগণিত। মানুষ তার সীমিত শক্তি নিয়ে তাদের সংখ্যা নিরূপণ করতে পারে নি, কোনদিন যে পারবে তা-ও মনে হয় না। আলোর গতি সেকেণ্ডে ২,৯৯,৭৯২ কিলোমিটার। এই ধরনের বেগসম্পন্ন কোন গাড়ি আবিষ্কৃত হওয়ার কথা কল্পনা করা যায় না। যদি সেই রকম গাড়ি আবিষ্কৃত হত এবং তা মহাকাশের শেষ প্রান্তের সন্ধানে যাত্রা করতে পারত তাহলে মহাশূন্যে এপর্যন্ত আবিষ্কৃত শেষ জ্যোতিষ্কে পৌঁছতে ৫০০ কোটি বছর লেগে যেত। এ থেকেই কিছুটা বুঝতে পারা যায়, মহাশূন্য কী বিরাট, ভূমারূপে বিরাজিত। মহাকাশ যেন ক্রমশঃই সম্প্রসারিত হচ্ছে। এর কোথায় যে আদি, কোথায় যে শেষ তা মানুষ যে কোনদিন নির্ধারণ করতে পারবে তার সম্ভাবনা নেই বললেও চলে।

এই মহাকাশের মতোই বিশ্বের জ্ঞানরাজ্যও অনাদি ও অনন্ত। মানুষের ক্ষমতা সীমিত হলেও সেই জ্ঞানরাজ্যের সকল রহস্য উদ্ঘাটন করতে, সকল তথ্য আহরণ করতে লোকে যুগে যুগে চেষ্টা করে এসেছে। সেই চেষ্টা আজও থেমে নেই।

বিশ্বের কথা, সৌরজগৎ, মহাকাশ, মহাকাশ অভিযান, পৃথিবী, সাগর, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, মানুষ, পর্বত, আবহবিজ্ঞান, যানবাহন, এঞ্জিনীয়ারিং, খেলাধুলা, ধর্ম ও দর্শনশাস্ত্র, ভৌগোলিক নানা কথা, গানবাজনা, পরিযায়ী পাখি, মেরু অভিযান, শারীর বিজ্ঞান, নানা দেশের ঘরবাড়ি ও বেশভূষা, ফটোগ্রাফি, চলচ্চিত্র, রঙ্গালয়, নৃত্যকলা, চারুকলা, সাহিত্য, নানা দেশের শিক্ষাব্যবস্থা, ইতিহাস, নোবেল পুরস্কার, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, কৃষি, সার্কাস, খনি ও খনিজ সম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র, জাতীয় সংগীত প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে সব দেশের সবাই খুবই আগ্রহী।

সকালে প্রতিটি দেশের মানুষ সংবাদপত্র পাঠ করার জন্যে উৎসুক হয়। এই সংবাদপত্রে পৃথিবীর নানা দেশের নানা ঘটনার কথা লেখা থাকে। সেই সব কথা জানার জন্যে লোকে আগ্রহের সঙ্গে সংবাদপত্র পাঠ করে।

স্কুল-কলেজের পাঠ্য পুস্তক ছাড়াও শিক্ষার্থীরা বহু গ্রন্থ পাঠ করে। এর মুখ্য উদ্দেশ্য বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞানার্জন। সংবাদপত্রই হোক, বিভিন্ন গ্রন্থই হোক, সব কিছু পাঠ

করে সব বয়সের লোক নানা ধরনের জ্ঞান লাভ করে তাদের অদম্য জ্ঞানস্পৃহাকে অন্ততঃ কিছুটা পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু জ্ঞান অনন্ত, জ্ঞানের বিষয় সীমাহীন। এই সব বিষয়ের সকল জ্ঞান নিঃশেষে আহরণ করতে গেলে বহু শত বৃহদাকার পুস্তকের প্রয়োজন। তত পুস্তক সংকলন করা যেমন অতি কঠিন ব্যাপার, সেই সব পাঠ করে শেষ করা তার চেয়েও অনেক বেশী কঠিন। এক খণ্ডে সম্পূর্ণ কোন পুস্তকে জ্ঞানরাজ্যের সকল তথ্য পরিবেশন করা সম্ভব নয়। যতটুকু পরিবেশন করা যায়, তাতে মানুষের অনন্ত জ্ঞানস্পৃহাকে চরিতার্থ করা যায় না।

তাই নানা দেশে নানা সময়ে বহু খণ্ডে গ্রন্থ প্রকাশ করে জ্ঞানরাজ্যের তথ্য যথাসাধ্য মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়েছে। এই থেকেই এনসাইক্লোপীডিয়া বা বিশ্বকোষ বা জ্ঞানকোষের উদ্ভব। এনসাইক্লোপীডিয়া (encyclopædia) শব্দের অর্থ চেম্বার্স টোয়েন্টিয়েথ সেনচুরি ডিক্সনারিতে লেখা আছে, a work containing information on every department, or on particular department, of knowledge, generally alphabetically arranged.

যতদূর জানা যায়, ১৫৩৮ খ্রী. স্যার টমাস ইলিয়ট তাঁর অভিধানে প্রথম এনসাইক্লোপীডিয়া শব্দটি ব্যবহার করেন। বর্তমানে পৃথিবীর সকল উন্নত দেশেই বহু এনসাইক্লোপীডিয়া প্রকাশিত হয়েছে ও হচ্ছে। এই সব এনসাইক্লোপীডিয়ার কোন কোনটিতে সব বিষয়ের জ্ঞাতব্য তথ্য দেওয়া হয়েছে। আবার কোন কোনটি মাত্র একটি বিষয় নিয়ে লেখা—Encyclopædia of History, Encyclopædia of Geography, Encyclopædia of Biography ইত্যাদি।

রোমক পণ্ডিত প্লিনি দি এল্ডার-কে (২৩-৭৯ খ্রী.) কেউ কেউ প্রাচীন যুগের প্রাচীনতম বিশ্বকোষকার বলে গণ্য করেন। তিনি জীবনবৃত্তান্ত বিষয়ক যে গ্রন্থ রচনা করেন, সেটি সাঁইত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত ছিল। অবশ্য, বহু পণ্ডিত বলেন, তারও আগে গ্রীক পণ্ডিতেরা বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। বিশিষ্ট রোমক পণ্ডিত বাররো-কেই (১১৬-১২৭ খ্রী. পূ.) আদি যুগের শ্রেষ্ঠ বিশ্বকোষকার বলা হয়ে থাকে।

চীনা পণ্ডিত লি-ফ্যাঙ চীনাভাষায় সংকলিত যে বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক ছিলেন, তার নাম 'তাই-পিঙ ইউ-লাল'। এই সুবৃহৎ গ্রন্থ ৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটিতে পঞ্চান্নটি বিভাগ ও এক হাজার অধ্যায় থাকে। লি-ফ্যাঙ একটি জীবনীমূলক বিশ্বকোষও সংকলন করেন।

প্রসিদ্ধ বৃটিশ মুদ্রাকর উইলিয়াম ক্যাক্সটন (William Caxton, ১৪২২-১৪৯১ খ্রী.) 'মিরর অব দি ওয়ার্লড' নামে একটি বিশ্বকোষ সংকলন করেন। জন হ্যারিস (১৬৬৭-১৭১৯ খ্রী.) যে 'লেক্সিকন টেকনিকাম' নামে ইংরেজী বিশ্বকোষ

সংকলন করেন সেটিকে প্রথম বর্ণানুক্রমিক বিশ্বকোষ বলা হয়। তার পরে বিভিন্ন সময়ে বহু এনসাইক্লোপীডিয়া রচিত হয়েছে।

মিশর, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশেও বিভিন্ন সময়ে বহু বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে। ফ্রান্স, জার্মানি, হাঙ্গেরী, ইতালি, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশেও নানা সময়ে বহু বিশ্বকোষ রচিত হয়েছে।

ফরাসী বিশ্বকোষ 'আঁসীকলোপেদী' অষ্টাদশ শতাব্দীর একখানি অতি প্রসিদ্ধ বিশ্বকোষ। ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এটির সংকলন কার্য শুরু হয়।

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা (Encyclopædia Britannica) ও এনসাইক্লোপীডিয়া আমেরিকানা (Encyclopedia Americana) বর্তমানে ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত সুবিখ্যাত বহু খণ্ডে বিভক্ত বিরাট ইংরেজী বিশ্বকোষ।

ভারতে বাংলা, তামিল, তেলেগু, মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় বহু মূল্যবান্ বিশ্বকোষ তৈরী হয়েছে। খ্রীষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীতে রাজা রাধাকান্ত দেব যে 'শব্দকল্পদ্রুম' প্রকাশ করেন তা মূলতঃ 'শব্দাভিধান'। অবশ্য, বিশ্বকোষের কিছু কিছু বিষয় এতে সন্নিবেশিত।

উইলিয়াম কেরীর পুত্র ফেলিকস কেরী বাংলা ভাষায় 'বিদ্যাহারাবলী' (১৮১৯-১৮২১ খ্রী.) নামে একটি অসম্পূর্ণ বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

কালীকৃষ্ণ দেব বাহাদুর ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে সংক্ষিপ্ত 'সদ্বিদ্যাবলী' নামে একটি বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থ সংকলন করেন।

কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় 'বিদ্যাকল্পদ্রুম' বা 'এনসাইক্লোপীডিয়া বেঙ্গলিনসিজ' নামে যে বিশ্বকোষ রচনা করেন তা ১৩ কাণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৮৪৬-১৮৫১ খ্রী.)।

বর্ণানুক্রমিক বাংলা বিশ্বকোষ রাজকৃষ্ণ রায় ও শরৎচন্দ্র দেব কর্তৃক (১২৮৯-১২৯৯ বঙ্গাব্দ) প্রকাশিত 'ভারতকোষ' (পৃষ্ঠাসংখ্যা ১৬৫০)।

প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু-সম্পাদিত বিশ্বকোষ এ পর্যন্ত সর্ববৃহৎ বর্ণানুক্রমিক বিশ্বকোষ। এটি ২২ খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়। এর সংকলনকার্য শেষ হয় ১৩১৮ বঙ্গাব্দে। এর প্রথম দুই খণ্ড বিখ্যাত সাহিত্যিক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় ও তাঁর গুণী অনুজ ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৭-১৯১৩ খ্রী.) সংকলন করেন।

১২৯১ বঙ্গাব্দে বিশ্বকোষের প্রথম সংস্করণের ১ম সংখ্যা লেখকদ্বয়ের জন্মভূমি রাহুতা গ্রাম থেকে প্রকাশিত হয়। ১২৯৪ বঙ্গাব্দে নগেন্দ্রনাথ এই বিশ্বকোষ সংকলনের ভার গ্রহণ করেন। ১৩১৮ বঙ্গাব্দে বিশ্বকোষ সংকলনের কাজ সম্পূর্ণ হয় (২২ খণ্ড)। এর দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ ১৩৪০ বঙ্গাব্দে শুরু হয়। ৪র্থ খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৩৪৫

বঙ্গাব্দে। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এই সংস্করণে সহযোগিতা করেন। নগেন্দ্রনাথ ও অমূল্যচরণের মৃত্যুতে দ্বিতীয় সংস্করণের কাজ অসমাপ্ত রয়ে গেছে।

অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ 'বঙ্গীয় মহাকোষ' নামে একটি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর মৃত্যুতে গ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড এবং তৃতীয় খণ্ডের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশিত হয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভারতকোষ নামে একটি ৫ খণ্ডে সম্পূর্ণ বিশ্বকোষ প্রকাশ করেছেন। ঢাকা থেকে ৪ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'বাংলা বিশ্বকোষ' প্রকাশিত হয়েছে।

বর্তমান কালে পঁচিশ খণ্ডে সমাপ্য 'আধুনিক বিশ্বকোষ' (ভট্টাচার্য ও আইচ) ভারতের সর্বাপেক্ষা বিরাট ও নির্ভরযোগ্য বিশ্বকোষ। এর চারিটি খণ্ড এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। সংকলকদ্বয় ও প্রকাশকের এই ধরনের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ভারতের এক অমূল্য জাতীয় সম্পদ।

যে-সব বিশ্বকোষের কথা বলা হল সেগুলির অধিকাংশই বর্ণানুক্রমিক। 'প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ' বর্ণানুক্রমিক নয়। এটি বিষয়ানুক্রমিক। মাত্র এক খণ্ডে এটির প্রকাশ।

এই গ্রন্থকে এনসাইক্লোপীডিয়া বা বিশ্বকোষ না বলে বিশ্বজ্ঞানকোষ বলা চলে। বহু বিষয়ে সরল ভাষায় নানা জ্ঞানের বিষয় এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এর পাতায় পাতায় অজস্র ছবি দেওয়া হয়েছে। তার ফলে বহু বিষয় সহজবোধ্য হয়েছে। শুধু তাই নয়, বহু পূর্ণপৃষ্ঠা রঙীন ছবি দিয়ে গ্রন্থটিকে সুসমৃদ্ধ করা হয়েছে। ইংরেজী Book of Knowledge পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। এটি পূর্বে সম্পূর্ণ বিষয়ানুক্রমিক ছিল। বিভিন্ন সময়ে এটি বহু খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বর্তমানে 'The New Book of Knowledge' নামে ২০ খণ্ডে একটি বর্ণানুক্রমিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার ইংরেজী Book of Knowledge-এর নামটি গ্রহণ করে 'প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ' প্রকাশ করা হয়েছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বানান সংস্কার সমিতি থেকে প্রকাশিত পুস্তিকার তৃতীয় সংস্করণে গৃহীত বানান প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজে অবলম্বিত হয়েছে।

এই পুস্তক সংকলনে তিন শতাধিক গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সে-সবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—

আধুনিক রান্না—মঞ্জুলিকা গঙ্গোপাধ্যায়
চলন্তিকা – রাজশেখর বসু
চিরঞ্জীব বনৌষধি—শিবকালী ভট্টাচার্য

জাগে শর্বরী—ননীগোপাল আইচ
দেশের কথা—সখারাম গণেশ দেউস্কর
নবজ্ঞান-ভারতী—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়
পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও মেলা—অশোক মিত্র
বঙ্গীয় মহাকোষ—অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা
বঙ্গের বাহিরে বাঙালী—জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস
বঙ্গের মহিলা কবি—যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত
বাংলা বিশ্বকোষ (ঢাকা)
বাংলা সাহিত্যের পরিচয়—পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য
বাঙ্গালীর ইতিহাস—ডঃ নীহাররঞ্জন রায়
বাণিজ্যিক ও শিল্প আইন—অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য
বিচিত্র বিশ্বরেকর্ড—উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
বিজ্ঞানভারতী—দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
বিশ্বকোষ—নগেন্দ্রনাথ বসু
বিশ্বপরিচয়
বিশ্বরাষ্ট্র পরিচয়—ননীগোপাল আইচ
ভারতকোষ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
ভারতীয় বনৌষধি—ডঃ কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ
মৃত্যুঞ্জয়ী—মহাজাতি সদন
রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ—শিবনাথ শাস্ত্রী
শব্দকল্পদ্রুম—রাধাকান্ত দেব
সংবাদপত্রে সেকালের কথা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
সাহিত্য-সাধক চরিতমালা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ
স্বরকল্লোল—ননীগোপাল আইচ
হিসাবশাস্ত্র—অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য, প্রভৃতি।

A Dictionary of Geography—W. G. Moore
Big Book of Questions and Answers
Collins Concise Cyclopedia
Encyclopædia Britannica

Encyclopedia Americana
Great Centres of Art, Calcutta
Guinness Book of Records
Indian Architecture—Percy Brown
My Favourite Encyclopedia
Pears Cyclopædia
Tell Me Why
The Complete Home Medical Encyclopedia
The Human Body—Golden Press, New York
The Macmillan Colour Library—Animals
The Outline of History—H. G. Wells
The Statesman's Year-book
Webster's Seventh New Collegiate Dictionary
Who's Who of Indian Martyrs—P. N. Chopra
Wonders of the World—Edmund Swinglehurst
1000 Great Lives, etc.

এই বিরাট গ্রন্থ সংকলনে যাঁর অকুণ্ঠ সহায়তার কথা সর্বাগ্রে মনে আসে তিনি প্রথিতযশা **অধ্যক্ষ সুধাংশুশেখর ভট্টাচার্য**। তাঁর অমূল্য সাহায্য এই দুরূহ গ্রন্থ রচনাকে সহজ ও সাবলীল করেছে। আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা মূলতঃ তাঁরই প্রাপ্য।

এই গ্রন্থ সংকলনে যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতা ও মূল্যবান্ পরামর্শ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাঁরা হলেন **শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মল্লিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীসিতাংশু ভট্টাচার্য, শ্রীছবি ভট্টাচার্য, অধ্যাপক উষাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ডঃ বারিদবরণ ঘোষ ও অধ্যাপক সুধীরকুমার সেনগুপ্ত।**

বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বহু ছবি গ্রহণ করা হয়েছে। সেই সব গ্রন্থের প্রকাশকদের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি।

ছবি এঁকেছেন শ্রীসুবোধ গুপ্ত, শ্রীফণী সাহা, শ্রীস্বপন রায়চৌধুরী, শ্রীপ্রহ্লাদ দে।

প্রুফ দেখেছেন শ্রীপাঁচুগোপাল ভট্টাচার্য, শ্রীমতী মল্লিকা মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিরঞ্জন ভট্টাচার্য, শ্রীমতী রীতা দত্ত, শ্রীমতী মিতালী সেনগুপ্ত, শ্রীরবীন ব্যানার্জী, শ্রীহিরণ্ময় মুখোপাধ্যায় ও শ্রীবিশ্বনাথ মজুমদার।

নিবেদন

রবীন্দ্রনাথ আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন : 'দেশে বড়ো বড়ো শিক্ষিত উকিল-জজ-কেরানীর অভাব নাই, কিন্তু জ্ঞানতপস্বী কোথায়।' এখানে জ্ঞানতপস্বী বলিতে নৈমিষারণ্যের মুনি-ঋষিদের কথা বলা হইতেছে না, বৃহৎ পণ্ডিতের কথাও বলা হইতেছে না। যাঁহারা জ্ঞানান্বেষণে আনন্দ পান, জীবনে জ্ঞানের মূল্য উপলব্ধি করিয়া উহার আহরণে তৎপর হন তাঁহারাই যথার্থ জ্ঞানতপস্বী। যে কোন দেশের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূলে এই জ্ঞানের তপস্যা। এই জ্ঞানতপস্যার প্রক্রিয়া প্রকরণ আমরা জ্ঞানী মানুষের নিকট হইতে শিখিয়া লই, সেই শিক্ষা আমরা আবার সাধ্যমত অন্যদের প্রদান করি। এইভাবে সমাজ শিক্ষিত হইয়া ওঠে। আধুনিক যুগের একটি বড় প্রশ্ন হইল এই যে, শিশুদের অর্থাৎ বালক-বালিকাদের মনে এই জ্ঞানার্জনের স্পৃহা জাগ্রত করা যাইতে পারে কি প্রকারে। প্রাচীনকালে কি মধ্যযুগে এ বিষয়ে চিন্তা বড় হয় নাই। আর বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিশুদের কিছু জানা প্রয়োজন পুরাকালের মানুষ তাহা মনে করিতেন না। কিছু নীতিকথা গল্পের আকারে শিশুদের কাছে উপস্থিত করা হইত। কিছু কৌতুকের কথা ছড়ার মধ্য দিয়া শিশুদের আনন্দ দিত। আমাদের বাল্যকালে পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে আমরা উপেন্দ্রকিশোরের ছোটদের রামায়ণ, মহাভারত, দক্ষিণারঞ্জনের ঠাকুরমার ঝুলি আর সুকুমার রায়ের হযবরল পড়িতাম। আর চাণক্য-শ্লোক মুখস্থ করিতাম। যাহাদের অভিভাবকরা সন্তানদের এই বিশ্ব সম্বন্ধে, প্রাকৃতিক জগৎ ও বিজ্ঞানের জগৎ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আহরণ করিতে আদেশ করিতেন তাহাদের ইংরাজিতে লিখিত বুক অব নলেজ লইয়া কিছু কালক্ষেপণ করিতে হইত। তখন আমাদের এইরূপ একটি ধারণা হইয়াছিল যে নলেজ নামক পদার্থটি এক বিদেশী বস্তু এবং উহা বিদেশী ভাষার মধ্য দিয়াই অর্জন করিতে হয়।

বহির্বিশ্বের বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান সংগ্রহ করিয়া তাহা শিশুদের কাছে উপস্থিত করিবার পরিকল্পনা প্রথম পাশ্চাত্যেই হইয়া থাকে। এবং এই ক্ষেত্রে ইউরোপ ও আমেরিকার কৃতিত্ব বিস্ময়কর। তবে একথা স্বীকার করিতে হয় যে আর্থার মী সংকলিত দ্য চিল্‌ড্রেন্‌স্ এনসাইক্লোপিডিয়া শিশুদের পক্ষে উপযোগী হইলেও তাহাদের পিতা-পিতামহদের পক্ষেও বড় কম উপযোগী নয়।

ইউরোপে শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে প্রথম গভীর চিন্তা করেন সপ্তদশ শতাব্দীর চেক দার্শনিক কমেনিয়াস্। ১৬৩৭ সালে প্রকাশিত তাঁহার অর্বিস্ পিকটুস্ যা বিশ্ব-চিত্র প্রথম শিশুপাঠ্য বিশ্বকোষ। ১৬৫৯ সালে দ্য ভিজিবুল্ ওয়ার্ল্ড নামে ইহার এক ইংরাজি সংস্করণ প্রকাশিত হয়। শিক্ষাবিদ্ হিসাবে কমেনিয়াসের মূল কথা এই যে শিশুদের সরল ভাষায় ছবির মধ্য দিয়া বিশ্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটাইয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ শিশু তাহার কল্পনাশক্তির সাহায্যে জ্ঞানকে আত্মসাৎ করিবে।

এই প্রসঙ্গে শিশুদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শিশুরা বই অবশ্যই পড়িবে এবং তাহাদের বুঝিতে হইবে বই-ই জ্ঞানের আধার। কিন্তু কোমলমতি শিশু মুখে শুনিয়া যাহা শিখিবে তাহা তাহার মজ্জাগত হইয়া যাইবে। শিশুর সঙ্গে বসিয়া যদি আকাশের দিকে একত্রে তাকাইয়া তাহাকে বলিতে পারি আকাশ কেন নীল, সূর্য চন্দ্র পৃথিবী হইতে কত দূরে, উহাদের আকার কি, ওজন কত তাহা হইলে এই সকল কথা তাহাদের মনে গাঁথিয়া থাকিবে। এবং ইহার পর তাহারা ক্রমে প্রকৃতি সম্বন্ধে কৌতূহলী হইবে, নানা প্রশ্ন করিবে। যদি বৃষ্টির সময় শিশুদের বুঝাইতে পারি বৃষ্টি কেন হয়, যদি সূর্যোদয় দেখিয়া সূর্যোদয় বুঝাইতে পারি, সূর্যাস্ত দেখিয়া সূর্যাস্ত বুঝাইতে পারি তাহা হইলে আমাদের সন্তানেরা অতি সহজভাবে এবং আনন্দের সহিত এই বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে ক্রমে পরিচিত হইয়া উঠিবে। এবং সেই পরিচয় উহাদের মনে গাঁথিয়া থাকিবে। আমরা যখন কোন প্রসঙ্গ লইয়া উহাদের সঙ্গে কথা বলিব উহারা কৌতূহলী হইয়া নানা প্রশ্ন করিবে। উহাদের মনে হইবে প্রকৃতির কথা উহারা যেন প্রকৃতির কাছেই শুনিতেছে। এইভাবে ইতিহাস পুরাণের কথা, নানা বিদ্যার নানা কথা শিশুরা স্বাভাবিক ভাবে আয়ত্ত করিবে। বিদ্যাকে তখন আর তাহারা কোন দূরের বস্তু বলিয়া মনে করিবে না। উহা তাহাদের অন্তরের বস্তু হইয়া উঠিবে।

তাই বলিতেছিলাম শিশুদের শিখাইতে হইলে অভিভাবকদের শিক্ষিত হইতে হইবে। বিশ্বের বিচিত্র কথা

যে কতগুলি গ্রন্থের অসংখ্য শব্দের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া নাই, উহা যে মুখস্থ করিয়া শিখিতে হয় না তাহা আমরাই শিশুদের বুঝাইয়া দিতে পারি। বুক অব নলেজ শিশুরা যেমন পড়িবে, শিশুদের অভিভাবকেরাও তেমন পড়িতে হইবে আমি এই কথাই বলিতে চাহিতেছি।

একালের এক বিশিষ্ট ইংরাজ কবি দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন – Where is knowledge lost in information, where is wisdom lost in knowledge ? কথাটি আমাদের বুঝিয়া লইতে হইবে। এই পৃথিবীর নানা বিষয় সম্বন্ধে, ইতিহাসের নানা ঘটনা সম্বন্ধে কতগুলি কথা জানিয়া আমার লাভ কি হইল। কোন্ ক্রিকেটার সর্বাপেক্ষা বেশী সেঞ্চুরি করিয়াছেন এই তথ্যটি আমি জানি, তুমি জান না এই আত্মতুষ্টির অর্থ কি? আমার মাথা বিচিত্র বিষয় সম্বন্ধে বিচিত্র সংবাদে ঠাসা। যে কোন সময়ে আমি যে কোন তথ্য নির্ভুলভাবে উপস্থিত করিতে পারি। কিন্তু এই বিদ্যার মূল্য কতখানি। আমার চিন্তা-শক্তি বা কল্পনা-শক্তির কোন পরিচয় ইহাতে না থাকিতে পারে। কোন বিষয়ে কিছু সরল ও সরসভাবে প্রকাশ করিবার শক্তিও আমার না থাকিতে পারে। অর্থাৎ যাহাকে আমরা জেনারাল নলেজ বলি তাহা অর্জন করিলেই আমাদের বিদ্যা-বুদ্ধির পূর্ণ বিকাশ হইল ইহা ধরিয়া লইতে পারি না।

অপরপক্ষে সর্ববিষয়ে অজ্ঞতাকে ধীশক্তির বিকাশের পরিপোষক বলিব কোন্ বিচারে? ইনফরমেশনকে বর্জন করিয়া নলেজ হয় না এবং উইজ্‌ডম্ এই নলেজেরই এক পরিণত রূপ। বলা বাহুল্য এখানে আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথা বলিতেছি না। আমাদের শুধু লক্ষ্য করিতে হইবে যে শিশুরা খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন তথ্যগুলি থরে থরে সাজাইয়া এই বিশ্বচরাচর সম্বন্ধে এক অখণ্ড উপলব্ধিতে উপনীত হইতে পারে। জানিবার আগ্রহ মূলে বুঝিবার আগ্রহ আবার বুঝিবার আগ্রহ মূলে একটা কিছু অনুভব করিবার আগ্রহ। হিমালয় দেখিয়া যে বিস্ময়ের অনুভূতি হয় তাহা হিমালয়ের উচ্চতার হিসাব লইলে নষ্ট হইবে না। বরং সেই অনুভূতি আরও গভীর হইবে। এ আধুনিক সভ্যতার এক বড় দায়িত্ব বিজ্ঞানের জগতের সঙ্গে কাব্যের জগতের এই আত্মিক যোগটি বুঝিয়া লওয়া। শিশু যাহা জানে তাহা অনুভব করে। অভিভাবক হিসাবে আমাদের দেখিতে হইবে বিদ্যার সঙ্গে অনুভূতির এই একাত্মতা যেন অক্ষুণ্ণ থাকে। বুক্ অব নলেজ যেন তাহাদের কাছে বুক অব লাইফ হইয়া ওঠে।

বর্তমান বুক অব নলেজ গ্রন্থখানি বিশেষ আগ্রহ, নিষ্ঠা ও পরিশ্রম সহকারে গড়িয়া তোলা হইয়াছে। বিষয়গুলির নির্বাচনে, আলোচনায় এবং বিন্যাসে একটি বিশিষ্ট রীতি অবলম্বন করা হইয়াছে। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল কথা একখানি গ্রন্থের মধ্যে সাজাইয়া উপস্থিত করার গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পাদকমণ্ডলী যে সজ্ঞান ছিলেন তাহার প্রমাণ এই বুক অব নলেজের প্রত্যেক পৃষ্ঠায়। তবে এই গ্রন্থখানিতে একটি ভুলও কেহ দেখাইতে পারিবেন না এমন অহংকার করি না। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার মত বহুশ্রুত গ্রন্থও যে ভ্রমশূন্য নয় তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তবে সম্পাদকমণ্ডলী এবং লেখকগণ প্রত্যেকটি রচনা যাহাতে নির্ভুল হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিয়াছেন। ইস্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্যই এই গ্রন্থখানি রচিত হইলেও ইহা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও ব্যবহার করিয়া লাভবান হইবেন। যাহা আমরা শিশুদের শিখাইতে চাই তাহার সব কিছু যে আমরা বয়স্করা জানি না ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে পারি আমি এই বইখানি এখন মন দিয়া পড়িব এবং পড়িয়া লাভবান্ হইব।

প্রত্যেকটি প্রবন্ধের ভাষা ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী হইয়াছে বলিয়া মনে করি। বইখানি আগাগোড়া সহজ-পাঠ্য। আশা করি এই গ্রন্থখানি বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদৃত হইবে।

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

'প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ'-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি

শুকতারা

সূচীপত্র






স্বপন

বিষয় পৃষ্ঠা



বিষয়		পৃষ্ঠা



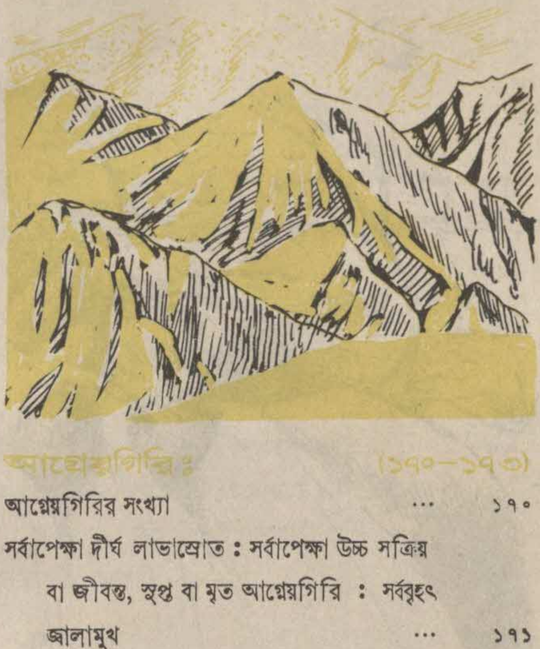
পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ (১১৮-১৪১)





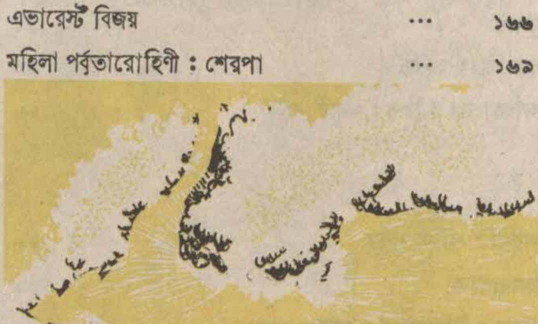


মানুষ ঃ (১৪২—১৫৭)





পর্বত : (১৫৮—১৬৯)



আগ্নেয়গিরি : (১৭০—১৭৩)

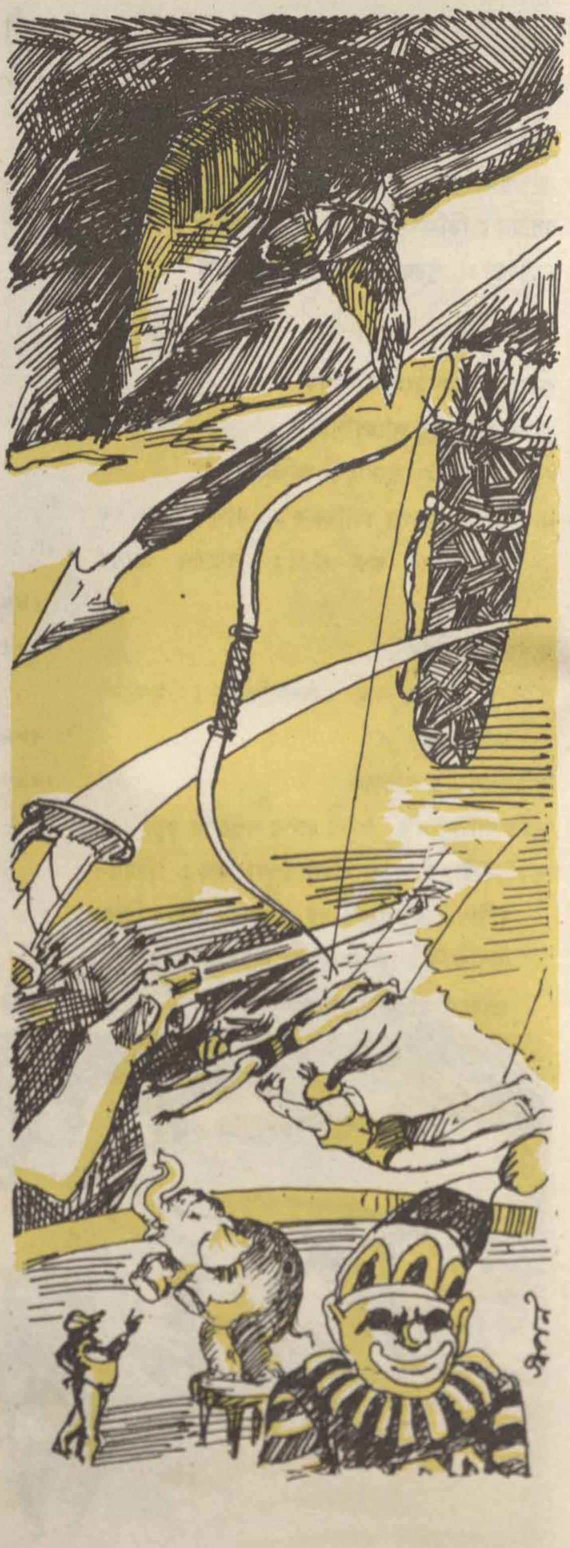












বিষয় পৃষ্ঠা

নানাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থা : (৩১১—৩২০)

খেলাধুলা (৩২১—৩৩৬)



বিষয় পৃষ্ঠা





বিষয় পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা
ধর্মের কথা ঃ		**(৩৬১—৩৭৯)**
সুমেরের দেশের ধর্ম : জরথুস্ট্র	...	৩৬২
গ্রীস ও রোমের ধর্ম	...	৩৬৩
নরগুয়ের পৌরাণিক কাহিনী	...	৩৬৪
বৌদ্ধ ধর্ম	...	৩৬৫
জৈন ধর্ম	...	৩৬৬
ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম	...	৩৬৭
ইসলাম ধর্ম : কনফুসি ধর্ম	...	৩৭০
লাওৎজু : শিখ ধর্ম	...	৩৭১
শিন্টো ধর্ম : ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর	...	৩৭২
নানা দেবদেবী : হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা : দশ অবতার : গীতা : শংকরাচার্য	...	৩৭৩
রামানুজ : কবীর : চৈতন্যদেব	...	৩৭৪
নানা মহাপুরুষ	...	৩৭৫
ব্রাহ্ম ধর্ম	...	৩৭৭
আর্য সমাজ : বিভিন্ন ভজনালয়	...	৩৭৮
সর্বপ্রাণবাদ	...	৩৭৯
দমকলের কথা ঃ		**(৩৮০—৩৮৪)**
শহরে দমকলবাহিনীর কার্যালয় : আগুন ব্যবহারের প্রারম্ভ : ঘরবাড়িতে আগুন লাগা	...	৩৮০
দমকলের সৃষ্টি : টেলিফোনের সাহায্যে আগুন লাগার খবর জানানো : নানা কারণে আগুন লাগা : দ্রুত আগুন নেভানোর জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ	...	৩৮১
সন্ধ্যার পর আগুন জ্বালায় নিষেধ : লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ড	...	৩৮২
পাড়াগাঁয়ে আগুন : উন্নত দমকলবাহিনী : দমকলের সাজসরঞ্জাম	...	৩৮৩
দমকলের লোকেদের নানা কাজ : দমকলবাহিনীর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা	...	৩৮৪
নানা দেশের ঘরবাড়ি ঃ		**(৩৮৫—৩৯৭)**
হিমালয়ের গুহায় সন্ন্যাসী : হ্রদবাসী : গাছের উপরে বাড়ি	...	৩৮৬





ফটোগ্রাফি : (৪১৩—৪২২)

নানা দেশের জাতীয় সংগীত : (৪২৩—৪৩২)

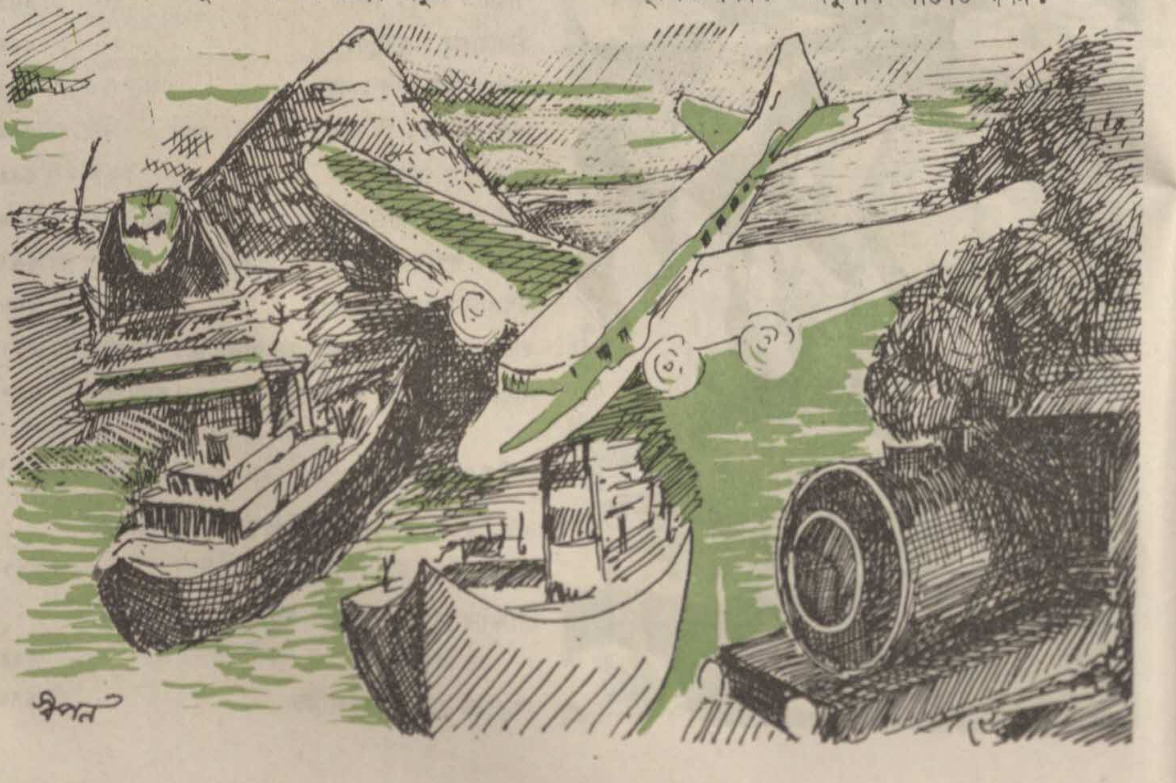


জীবজন্তু পোষা : (৪৩৩—৪৪৭)








দীপন





ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম :

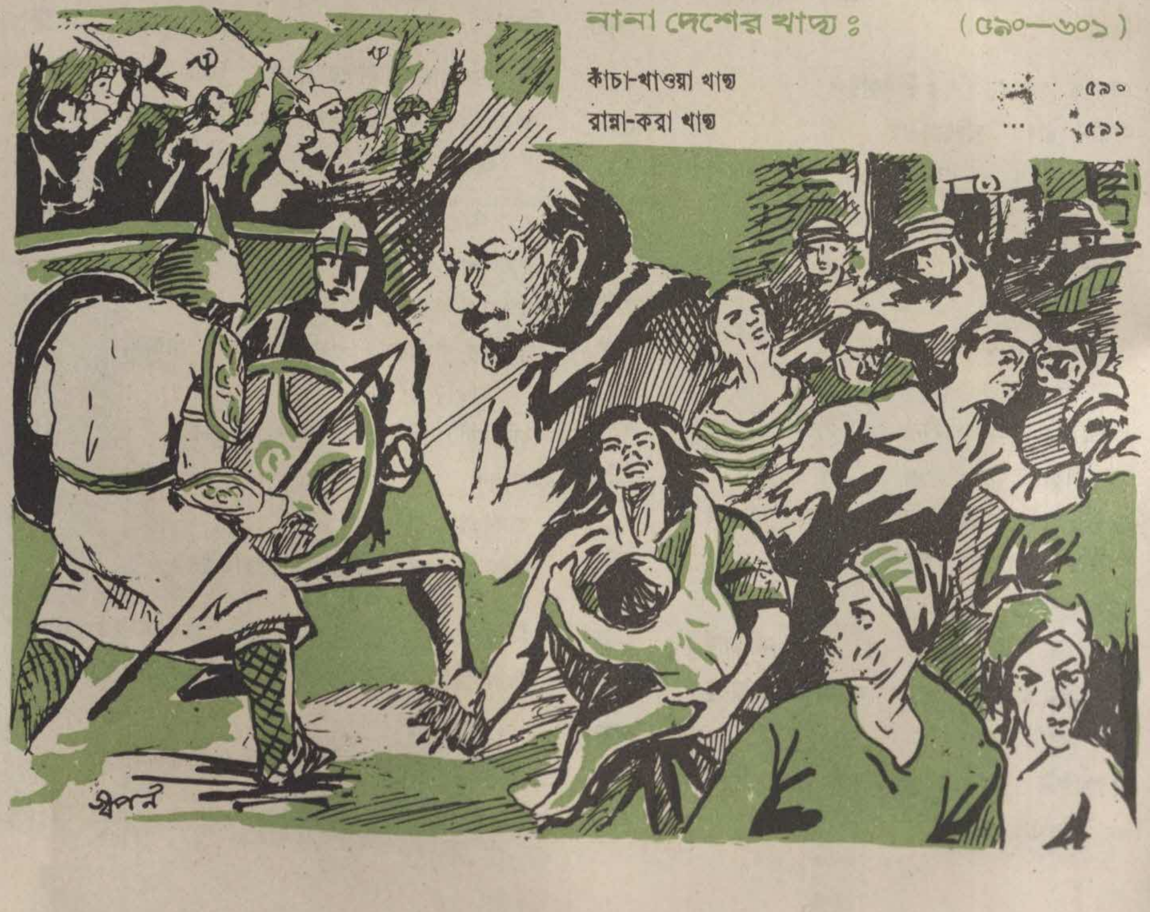
(৫২৩—৫৫১)




দীপনী

ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা : (৫৭৫—৫৮৯)

নানা দেশের খাদ্য : (৫৯০—৬০১)











স্বপন



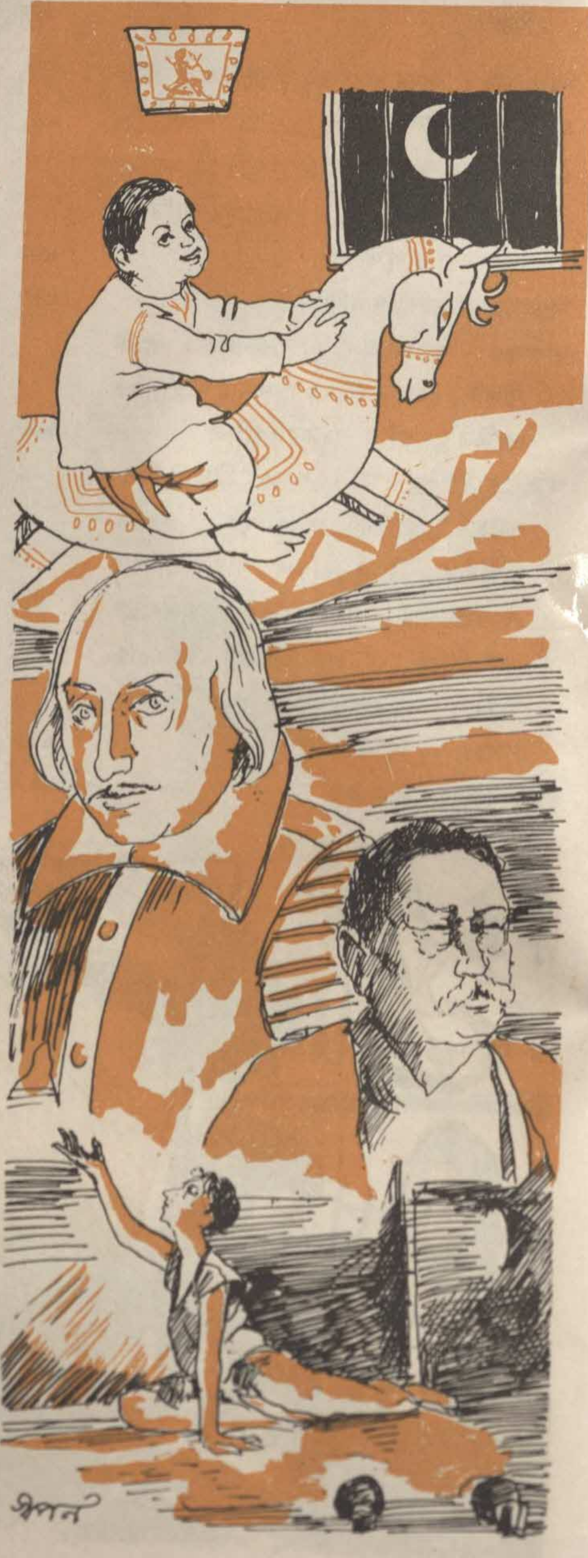
বিষয়		পৃষ্ঠা
সবাক্ ছবি : প্রথম সম্পূর্ণ সবাক্ চলচ্চিত্র : রঙিন ছবি : ছবি তোলার কৌশল	...	৬৩৫
সবচেয়ে বেশী অর্থব্যয়ে নির্মিত ছবি : সবচেয়ে কম খরচে তোলা ছবি : ভারতের খ্যাতিমান অভিনেতা ও অভিনেত্রী	...	৬৩৬
বিদেশের অভিনেতা ও অভিনেত্রী	..	৬৩৭
ভারতের খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক : ওয়াল্ট ডিজনি : ডিজনি ল্যাণ্ড : ডিজনির পরিচালিত চলচ্চিত্র : সুদীর্ঘ সময়ের চলচ্চিত্র	...	৬৩৮
অভিনয়ে বেশী অর্থ-উপার্জন : সর্ববৃহৎ ফিল্ম স্টুডিও : সবচেয়ে পুরাতন সিনেমা-গৃহ : সর্ববৃহৎ সিনেমা : সিনেমা-প্রাঙ্গণে গাড়ি রাখবার প্রশস্ততম স্থান : জনসংখ্যার বিচারে সবচেয়ে বেশী সিনেমা : যে দেশে সবচেয়ে বেশী লোক সিনেমায় যায় : সবচেয়ে বেশীসংখ্যক সিনেমা : সবচেয়ে বড় সিনেমার পর্দা	...	৬৩৯
অস্কার পুরস্কার : নানা কথা	...	৬৪০



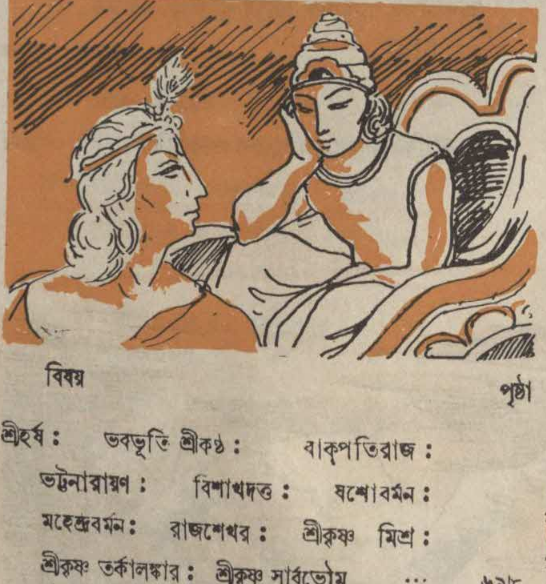


বিষয়		পৃষ্ঠা

ভারতের স্থাপত্য : (৬৪২–৬৫২)




ডাকঘর
C.C.P.
স্বপন

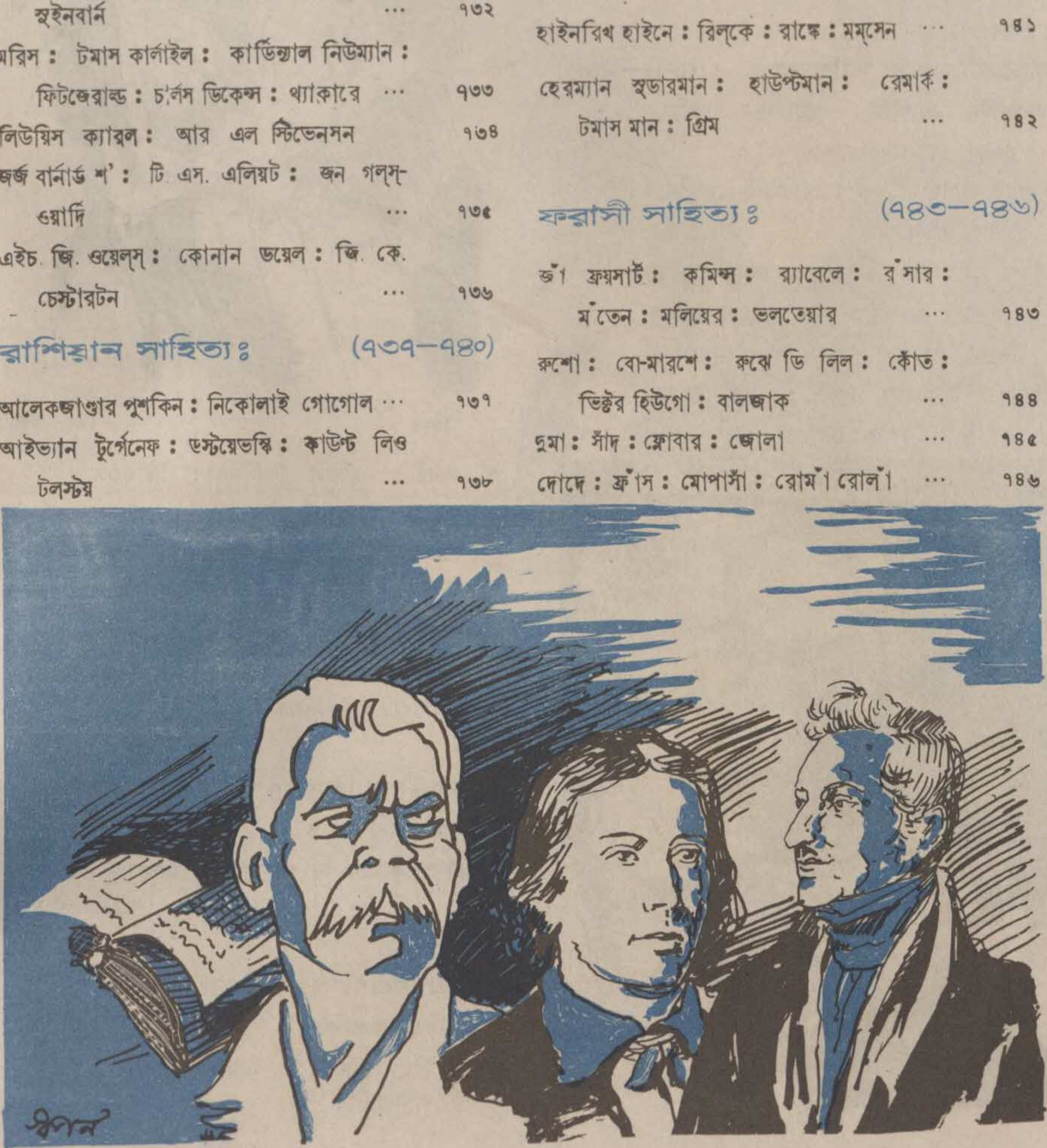







স্বপন

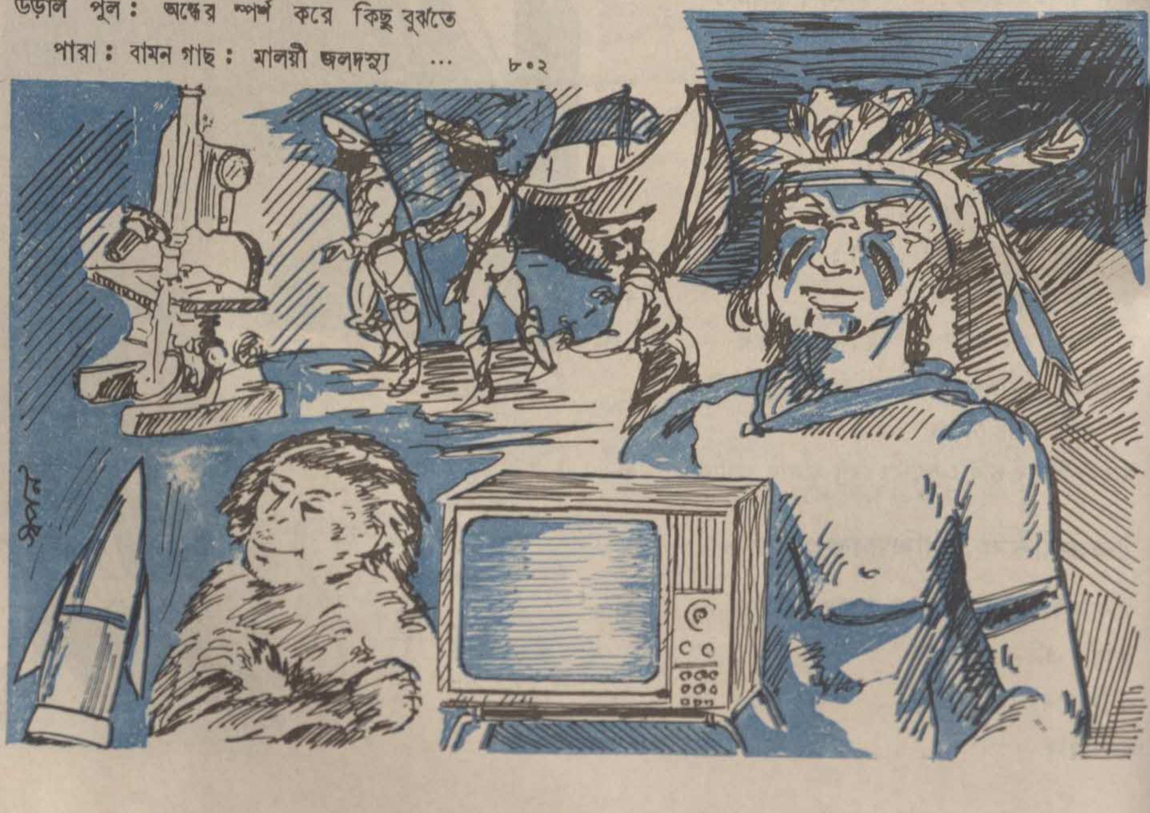



স্বপন










স্বপন



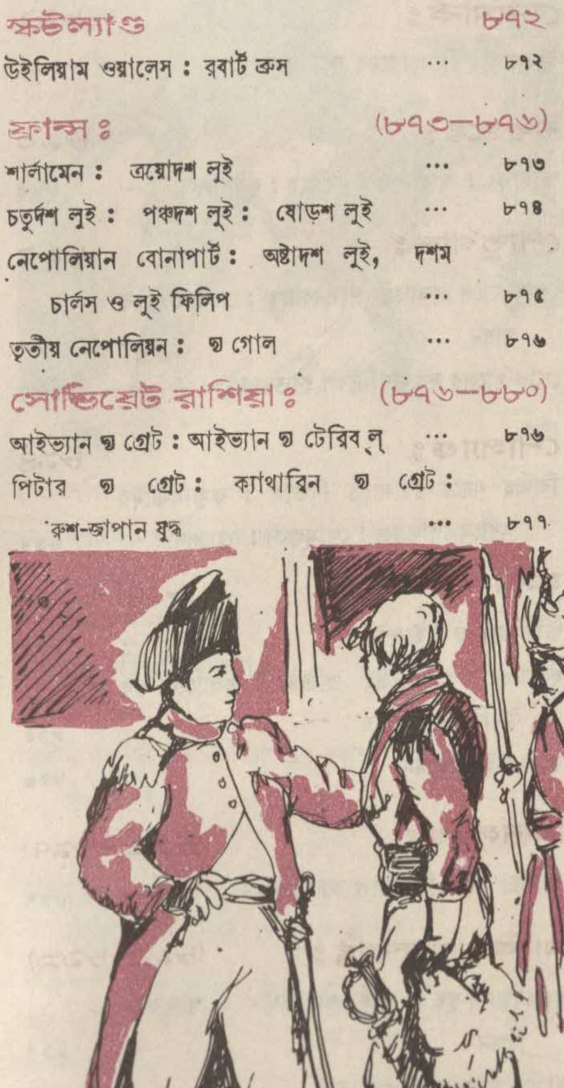






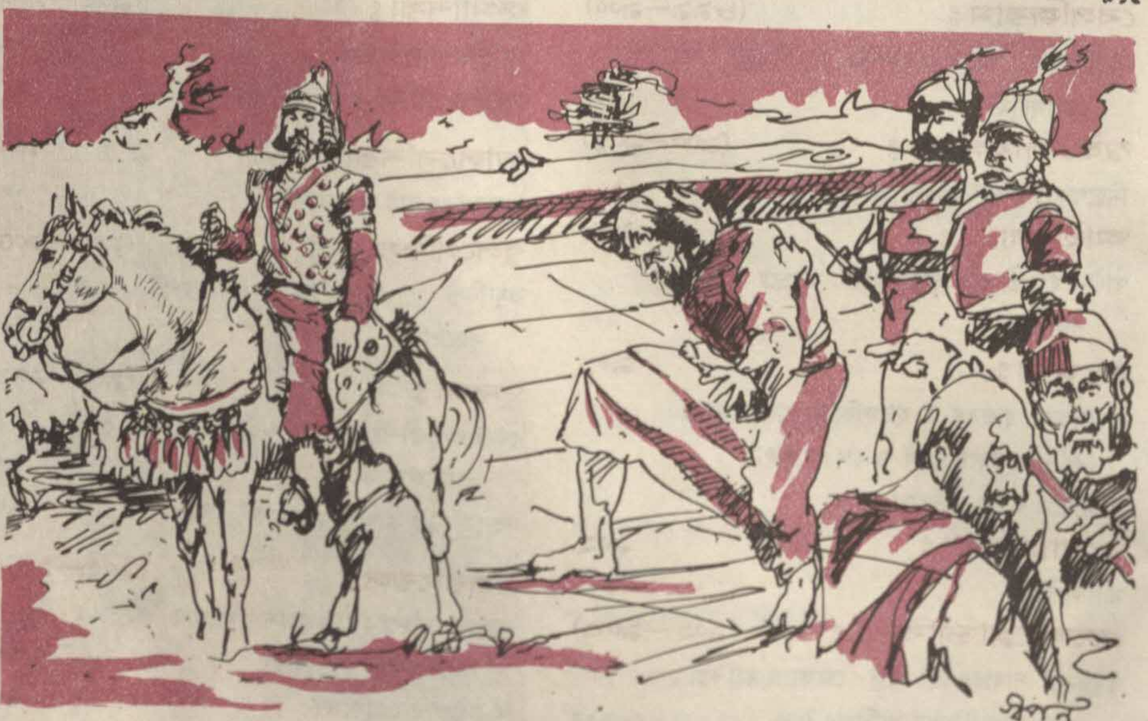

স্বপন






প্রকাশ


স্বপন



স্বপন

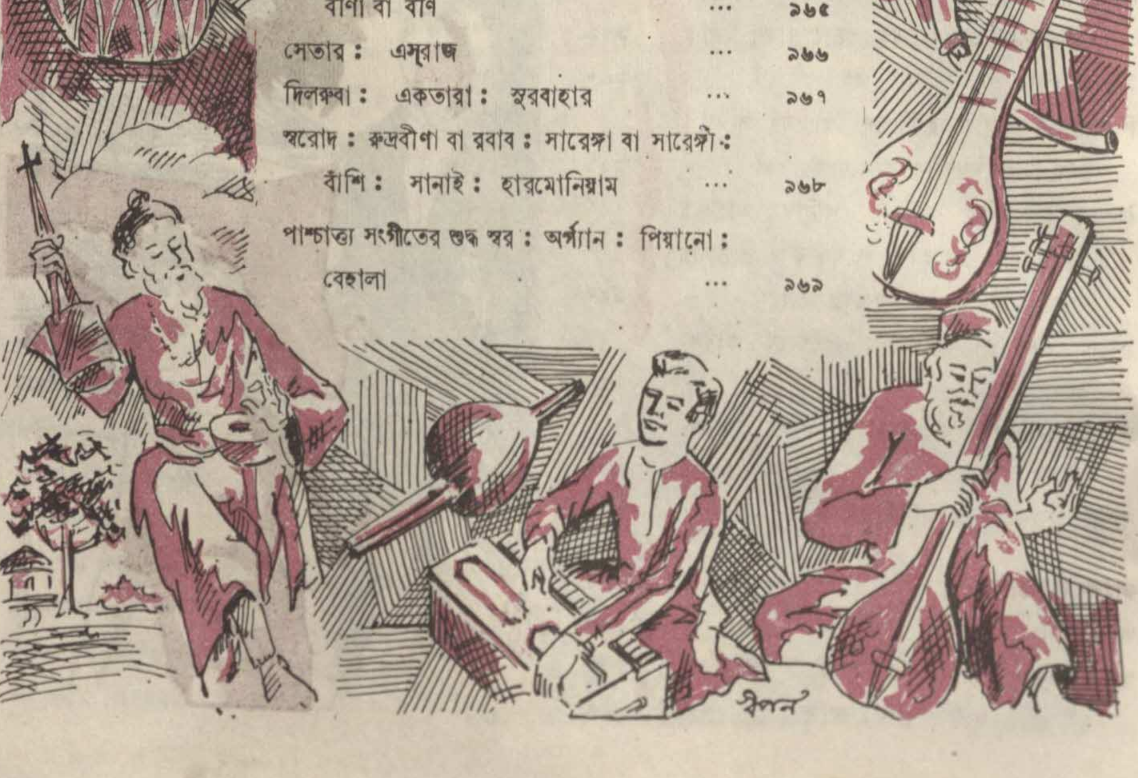

স্বপন


স্বপন











কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ভূমিকায় উল্লিখিত বইগুলি ছাড়াও নিম্নলিখিত বইগুলি থেকে প্রভূত সাহায্য লাভ করা গিয়েছে—

A Dictionary of Science (Penguin)

বাংলা বুক অব নলেজ—দেব সাহিত্য কুটীর

ইতিহাস অভিধানযো—গেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

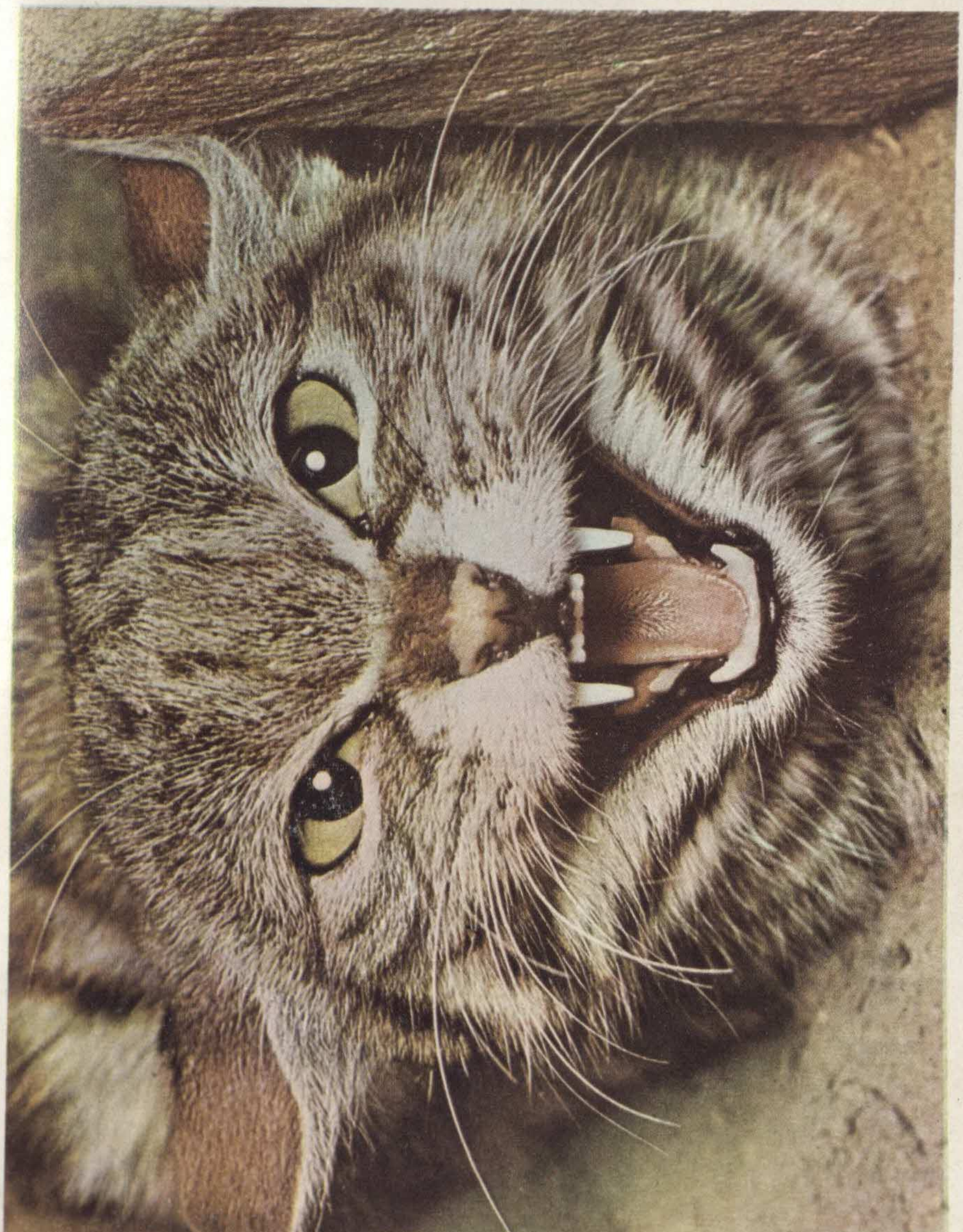
New Encyclopedia of Science 1—16

বিশ্বপরিচয়—দেব সাহিত্য কুটীর

এই বই-এর প্রধান শিল্পী শ্রীস্বপন রায়চৌধুরী এবং তাহার সহকারী শ্রীপ্রহ্লাদ দে ও শ্রীসুবুদ্ধ ঘোষ।

প্রোগ্রেসিভ বুক অব নলেজ

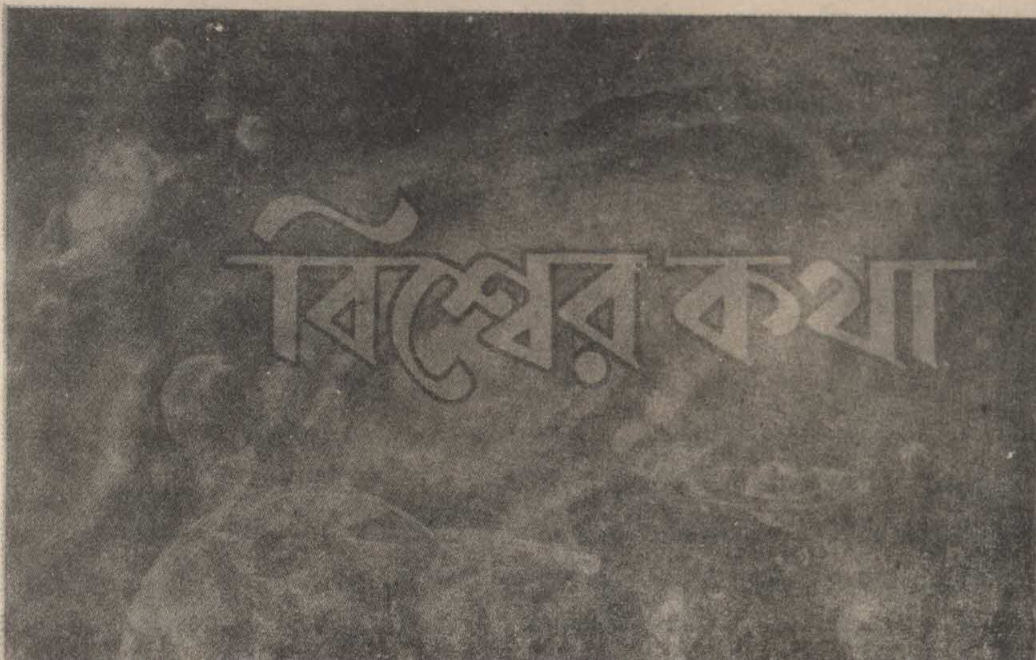
রঙীন ছবিসমূহের সূচী



বনবিড়াল

অনেক বাড়িতে পোষা বিড়াল দেখা যায়। সেই সব বিড়াল সাধারণতঃ নিরীহ, হিংস্র নয়। বনের বিড়ালকে পোষ মানানোর প্রথম কৃতিত্ব মিশরের। এখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোকের বাড়িতে নানারকমের পোষা বিড়াল আছে।

কিন্তু বনবিড়াল (wild cat) যে কী ভয়াবহ হিংস্র প্রাণী, তার সম্মুখীন না হলে বোঝা যায় না। আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া প্রভৃতি মহাদেশে বনবিড়াল দেখা যায়। আফ্রিকার দক্ষিণাংশে এক ধরনের বনবিড়াল দেখতে পাওয়া যায়। তারা আকারে হৃষ্টপুষ্ট গৃহপালিত বিড়ালের মতো। কিন্তু তাদের গায়ে ভীষণ জোর। খুব হিংস্র তারা। তারা পাখি, কাঠবিড়ালী, ছোট ছোট সরীসৃপ প্রভৃতি শিকার করে খায়। এদের চোখ খুব বড়। খুব মৃদু আলোতে দেখতে এদের অসুবিধে হয় না। অনেক দূর থেকে তারা দেখতে পায়। পূর্বপৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হল, তা বাঘের বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ছবিটি আফ্রিকার একটি বনবিড়ালের।



।। বিশ্ব কি ?।।

অন্ধকার রাত্রে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে উপর দিকে তাকালে অগণিত আলোর ফুটকি চোখে পড়ে। এই ফুটকির কোনটি গ্রহ, কোনটি তারা, কোনটি উপগ্রহ। আর চোখে পড়ে আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত একটা মেঘের ফালির মতো ছায়াপথ। এই সব কিছু এক বিরাট শূন্যে অবস্থিত। এই শূন্য স্থানের আদিও নেই, অন্তও নেই।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ধুমকেতু, ছায়াপথ—সব কিছু যে কল্পনাতীত ভাবে বিশাল মহাশূন্যে বিরাজিত, অগণিত জ্যোতিষ্ক-সমন্বিত সেই মহাশূন্যই বিশ্ব বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

এই বিশ্বের সৃষ্টি কবে হয়েছে, কীভাবে হয়েছে এ পর্যন্ত শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীরা তার কোনও হদিশ খুঁজে পান নি। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, প্রায় ১,০০০ কোটি বছর আগে বিশ্বের সৃষ্টি, কেউ কেউ বলেন, ২,৫০০ কোটি বছর। তাঁদের ক্লান্তিহীন প্রচেষ্টায় বিশ্বের নানা তথ্য আমরা জানতে পেরেছি। নিত্য নূতন তথ্যও অবিরত আবিষ্কৃত হচ্ছে। সেই সব তথ্য মানুষকে ভয়ে বিস্ময়ে একান্ত অভিভূত করে।

।। বিশ্বের বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ।।

বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে নানা বিজ্ঞানী নানা কথা বলেছেন। সে-সবের মধ্যে একটা কথাকে অধিকাংশ বিজ্ঞানী মেনে নিয়েছেন। সেই কথা বা মতবাদকে বলে Big-Bang Theory অর্থাৎ মহা-বিস্ফোরণবাদ। বিজ্ঞানীরা বলেন, সহস্র সহস্র কোটি বৎসর আগে বিশাল মহাশূন্যে একটা বহু কোটি কিলোমিটার পরিব্যাপ্ত পিণ্ড ছিল। একদিন মহাকাশে বিস্ফোরণের ফলে সেই পিণ্ড থেকে কোটি কোটি পিণ্ড চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেই সব পিণ্ড থেকেও অসংখ্য পিণ্ডের সৃষ্টি হয়। এই ভাবে মহাশূন্যে নক্ষত্র, নীহারিকা.

ছায়াপথ প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে। এই সব কিছু নিয়েই বিশ্ব বা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। এই বিশ্বের সম্প্রসারণ আজও থেমে নেই। ক্রমশঃ বিশ্ব সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই জন্যই বলা হয় the ever-expanding universe.

॥ আলোকবর্ষ ॥

সমগ্র বিশ্বের সীমাহীন দূরত্বের পরিমাপ করা এক দুরূহ ব্যাপার। সাধারণ মিটার বা কিলোমিটার দিয়ে সেই দূরত্ব মাপা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আলোকবর্ষ (light-year)-এর মাপ দিয়ে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের নানা দূরত্বের পরিমাপ করার চেষ্টা করেন। অবশ্য তার দ্বারাও প্রকৃত সমস্যার সমাধান হয় না।

এক স্থান থেকে আর এক স্থানে যেতে আলোর গতি এক সেকেণ্ডে প্রায় তিন লক্ষ পাঁচ হাজার চল্লিশ কিলোমিটার। সেই হিসাবে আলো এক বছরে ৯৪,৬০,৫২,৮৪,০৫,০০০ কিলোমিটার যায়।

এক বর্ষে বা বছরে আলোক যতখানি পথ অতিক্রম করে তাকে বলে আলোকবর্ষ (এ দূরত্বের মাপ, সময়ের মাপ নয়)।

॥ প্রাচীনকালে মহাকাশ চর্চা ॥

ভারতের বিজ্ঞানী আর্যভট বা আর্যভট্ট (জন্ম ৪৭৬ খ্রীঃ) বলে গেছেন, পৃথিবী পাক খেতে খেতে ডিম্বাকার পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। চাঁদের আলো নেই, সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে চাঁদের আলো সৃষ্টি করে। আর্যভটের প্রায় দু'শ বছর পরে প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ব্রহ্মগুপ্ত পৃথিবীর আয়তন নির্ণয় করেন। তারও প্রায় চারশ বছর পরে বিজ্ঞানী ভাস্করাচার্য (মৃত্যু ১১১৪ খ্রীঃ) গোলাধ্যায়-নামক গ্রন্থে পৃথিবীর গোলত্ব ও মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কথা লিখে গেছেন।

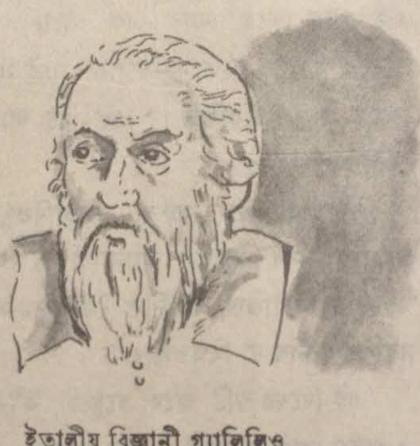
পোলিশ জোতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস (Copernicus, ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ) পাশ্চাত্ত্য জগতে প্রথম প্রকাশ করেন, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে, ঘুরছে। কিন্তু ডেনমার্কের জ্যোতির্বিদ্ টাইকো



পোলিশ জ্যাতির্বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস

ব্রাহী (Tycho Brahe, ১৫৪৬-১৬০১ খ্রীঃ) বলে গেছেন, সূর্যই পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে।

হল্যাণ্ডদেশীয় বিজ্ঞানী লিপারশে (Lippershay) ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে দূরবীন আবিষ্কার করেন। ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও (Galilei Galileo, ১৫৬৪-১৬৪২ খ্রীঃ) তাঁর দূরবীনের সাহায্যে চাঁদের গায়ের গর্ত, সূর্যের কলঙ্ক, শত শত তারা দেখতে পান।



ইতালীয় বিজ্ঞানী গ্যালিলিও

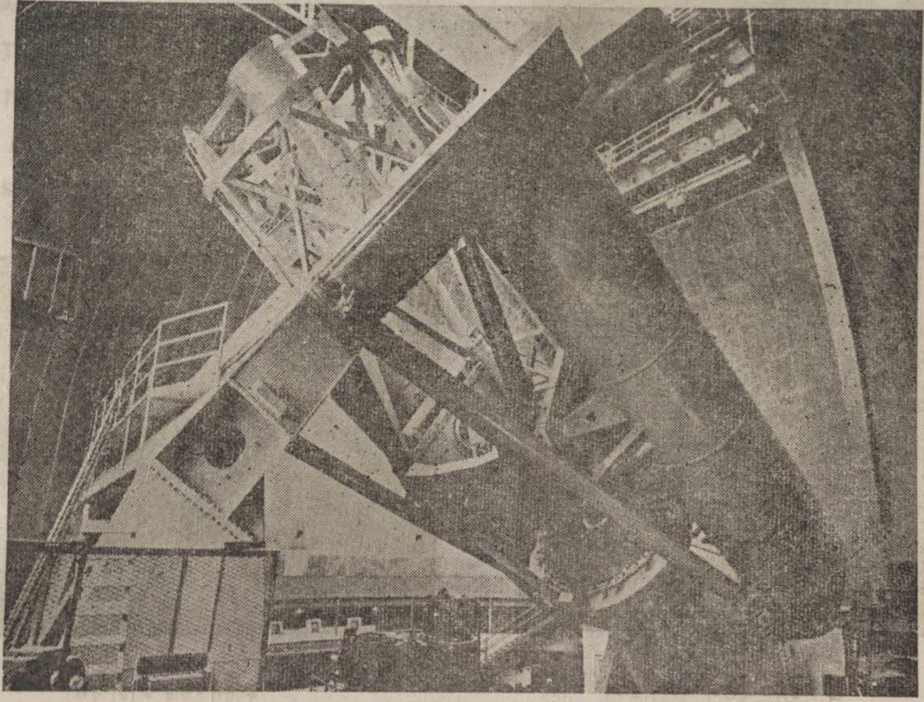
তিনি জানান, কোপার্নিকাসের কথাই সত্য, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। তিনি বললেন, পৃথিবী

সূর্যকে এক বছরে প্রদক্ষিণ করে ও একদিনে নিজের মেরুদণ্ডের উপরে পাক খায়।

॥ মানমন্দির ॥

উঁচু জায়গা থেকে আকাশ দেখার সুবিধা হয়। তাই হাজার হাজার বছর আগে থেকে নানা দেশে উঁচু জায়গায় বাড়ি তৈরী হয়েছিল। সেই সব বাড়িকে বলে মানমন্দির। সব চেয়ে উঁচুতে অবস্থিত মানমন্দির মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কলোরাডোর রকি পর্বতের উপরে অবস্থিত দি ইউনিভার্সিটি অব ডেনভার্স হাই অলটিচিউড অবজারভেটরি—৪,২৯৭ মিটার উচ্চে অবস্থিত। ২,১০০ বছর আগে গ্রীক বিজ্ঞানীরা আলেকজাণ্ড্রিয়ায় মানমন্দির তৈরি করেছিলেন। বাগদাদ, দামাস্কাস, সমরখন্দ প্রভৃতি স্থানে অনেক মানমন্দির তৈরী হয়েছিল। সমরখন্দের মানমন্দির প্রসিদ্ধ মোঙ্গল জ্যোতিষী উলুক বেগ সাড়ে পাঁচশ বছর আগে নির্মাণ করেন। ভারতে অম্বরের রাজা জয়সিংহ দিল্লী, জয়পুর, কাশী ও উজ্জয়িনীতে কয়েকটি মানমন্দির নির্মাণ করেন। দিল্লীর মানমন্দির 'যন্তর মন্তর' নামে প্রসিদ্ধ। সব চেয়ে পুরনো মানমন্দির দক্ষিণ কোরিয়ার Chomsong-dae ৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয় এবং তা আজও বিদ্যমান।

বর্তমানে ইংলণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে বহু উন্নত মানমন্দির স্থাপিত হয়েছে। সেই সব মানমন্দিরে অতি শক্তিশালী দূরবীন আছে। কালিফোর্নিয়ার মাউন্ট পালোমার মানমন্দিরের দূরবীন খুবই শক্তিশালী। এর কাচের ব্যাস ৫০৮ সেন্টিমিটার মোটা ৬৩ সেন্টিমিটার, ওজন২০ টন। তা দিয়ে ২০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের তারা দেখা সম্ভব হয়েছে।



পালোমার মানমন্দিরের দূরবীন

ভারতে একটি সুবৃহৎ দূরবীন তৈরী হচ্ছে। এটি ১৩ মিটার দীর্ঘ, এর ওজন ১৩৫ টন। দূরবীনটির ব্যাস ২৩ মিটার। তৈরী শেষ হলে এটি হবে পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম দূরবীন।

॥ নীহারিকা বা নেবুলা ॥

সারা মহাকাশ জুড়ে নানা আকারের অসংখ্য ঘুর্ণমান গ্যাস ও ধুলার পিণ্ড বিরাজমান। এদের বলে নীহারিকা বা নেবুলা (Nebula)। এই



ব্রাইড্যাল ভেল নীহারিকা

নীহারিকা থেকেই গ্রহনক্ষত্রের সৃষ্টি হয়েছে। কোটি কোটি নীহারিকার মধ্যে মাত্র কয়েকটি খালি চোখে দেখা যায়। কয়েক সহস্র দেখা যায় শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে। অগণিত নীহারিকা মানুষের আবিষ্কৃত দূরবীনের সাহায্যেও দেখা যায় না।

দূরবীন দিয়ে দেখা গেছে, অনেক নীহারিকার মধ্যে তারা আছে।

অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রের মধ্যের নীহারিকা, কালপুরুষ (Orion)-এর কোমরবন্ধনী থেকে লম্বমান তিন তারার তরোয়ালের মাঝখানের তারাটির পিছনের নীহারিকা (যাকে বলা হয় Great Nebula of Orion),ব্রাইড্যাল ভেল নীহারিকা প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ।

অ্যাণ্ড্রোমিডা নক্ষত্রের মধ্য দিয়ে যে নীহারিকা দেখা যায়, তা এমন বিরাট যে তাতে আমাদের সৌরজগতের ন্যায় দু'হাজারেরও বেশী সৌরজগতের থাকার জায়গা হতে পারে। আমাদের পৃথিবী থেকে ৯ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে এটি আছে। এর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো যেতে প্রায় ৫০ হাজার বছর লাগে। একে বলা হয় the Spiral Nebula Andromeda। এই নীহারিকা আমাদের সূর্যের চেয়ে ১৫০ কোটি গুণ



হর্সেস হেড নীহারিকা

বেশী আলো দেয়।

যাকে বলা হয় কালপুরুষের নীহারিকা তা কালপুরুষের কোমরবন্ধ থেকে লম্বমান তরোয়ালের

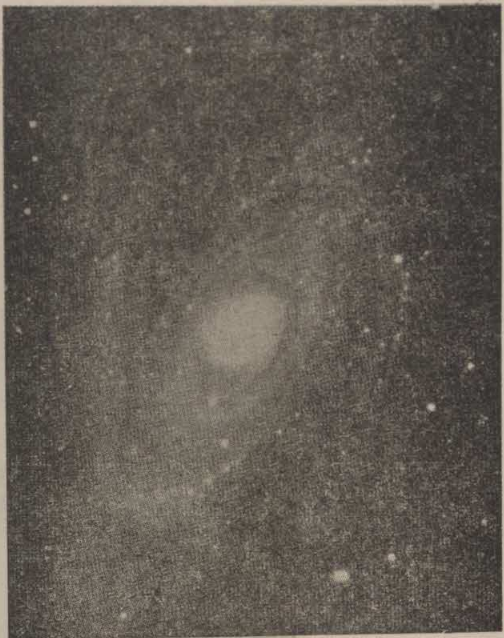
মাঝখানের তারার পিছনে বহু দূরে অবস্থিত। কালপুরুষ নক্ষত্রের সঙ্গে তার কোনও যোগ নেই। তবু তাকে আমরা বলে থাকি কালপুরুষের নীহারিকা। এর চেহারা দেখে নাম দেওয়া হয়েছে হর্সেস হেড নীহারিকা (the Horse's Head Nebula)। পৃথিবী থেকে এই নীহারিকার



কালপুরুষের নীহারিকা

দূরত্ব ১,৫০০ আলোকবর্ষ। এর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত আলো যেতে ৩০ আলোকবর্ষ লাগে। খালি চোখে এই নীহারিকাকে একটুকরো ছোট ধোঁয়ার মতো দেখায়।

ট্রিফিড নীহারিকা (the Trifid Nebula in Sagittarius) ২,৩০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। এই নীহারিকায় অসংখ্য উত্তপ্ত নক্ষত্র



স্পাইর‍্যাল নেবিউলা

দেখা যায়। the Dumbell Nebula, the Ring Nebula, the Bridal vail Nebula, the Crab Nebula, the Tarantula Nebula প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ নীহারিকার সন্ধান পাওয়া গেছে।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে নীহারিকা থেকে নক্ষত্রের সৃষ্টি। সমগ্র বিশ্বে কয়েক কোটি নীহারিকা আছে।

॥ ছায়াপথ ॥

অন্ধকার রাত্রে মেঘহীন আকাশের দিকে তাকালে দেখা যাবে, উত্তর-দক্ষিণে একটা সুদীর্ঘ মেঘ লম্বালম্বিভাবে আকাশ জুড়ে রয়েছে। যাকে মেঘ বলে মনে হয়, তা মেঘ নয়, ঘন-সন্নিবিষ্ট প্রায় দশ হাজার

কোটি জ্যোতিষ্কের সমষ্টি। অবশ্য, ঘন-সন্নিবিষ্ট বলা হলেও জ্যোতিষ্কগুলি পরস্পরের থেকে কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বহু দূরে থাকার ফলে সেইসব জ্যোতিষ্ককে আলোর মেঘ বলে মনে হয়। এর নাম ছায়াপথ বা আকাশগঙ্গা বা স্বর্গঙ্গা বা দুগ্ধ-সরণি (**Milky Way**)। সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত ছায়াপথের সংখ্যা এক হাজার কোটি।



আণ্ড্রোমিডার নীহারিকা

যে ছায়াপথকে খালি চোখে এক ফালি মেঘের মতো দেখায় তারই এক প্রান্তে আমাদের সৌরজগৎ অবস্থিত। ছায়াপথ প্রধানতঃ দুরকমের। এক-রকমের ছায়াপথ কোটি কোটি জ্বলন্ত জ্যোতিষ্কের সমষ্টি, আর একরকম শুধুই জ্বলন্ত গ্যাসের রাশি।

সৃষ্টির আদিতে সব ছায়াপথই ছিল শুধু জ্বলন্ত গ্যাসের রাশি। বহু কোটি বৎসর বাদে সেই সব গ্যাস জমে জ্যোতিষ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

ছায়াপথের আকৃতি নানা ধরনের। কোনটা পেঁচালো স্প্রিং-এর ন্যায় (spiral), যাকে বলা হয় কুণ্ডলিত ছায়াপথ। কোনটি ডিম্বাকৃতি (elliptical)।

ম্যাগেল্যানিক ক্লাউড (Magellanic cloud) ছায়াপথের দূরত্ব পৃথিবী থেকে প্রায় ২ লক্ষ আলোকবর্ষ। অ্যাণ্ড্রোমিডা ২২ লক্ষ, বৃহৎ ঋক্ষ মণ্ডল (Ursa major)-এর ছায়াপথ প্রায় ৮০ লক্ষ, কন্যা রাশি (Virgo)-র ছায়াপথ প্রায় ৩ কোটি ২০ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে বিরাজমান। বুটস (Bootes) নক্ষত্রমণ্ডলীর ছায়াপথ ৫০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত; এর চেয়েও দূরে ছায়াপথ আছে।

॥ তারা, গ্রহ, উপগ্রহ ॥

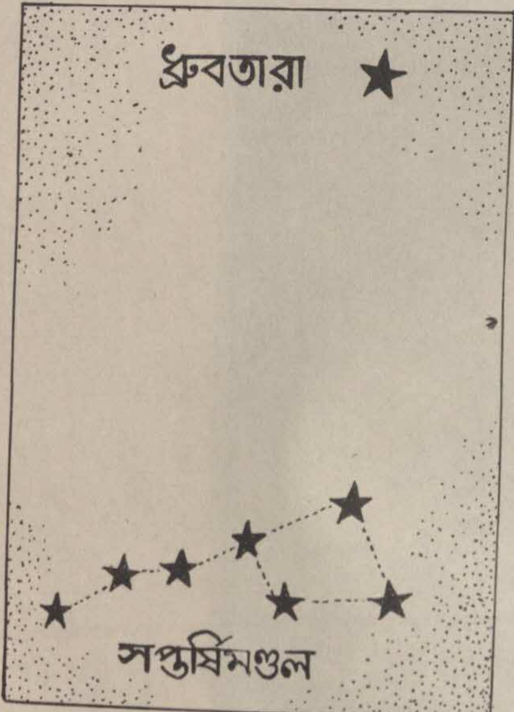
আকাশে যত আলোর ফুটকি আমরা দেখি, তার সবগুলিকে বলি তারা। কিন্তু সবগুলি তারা নয়। যে-সব আলোর ফুটকি ঝিকমিক করে, সেগুলি তারা বা নক্ষত্র, যেগুলির আলো কাঁপে না সেগুলি গ্রহ। তারা বা নক্ষত্রের নিজস্ব আলো আছে, সবগুলিই জ্বলন্ত। গ্রহের নিজস্ব আলোক নেই। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে সেগুলিকে উজ্জ্বল দেখায়। গ্রহের চারদিকে যেগুলি ঘোরে সেগুলি উপগ্রহ। সূর্য একটি তারা, চাঁদ একটি উপগ্রহ। ধ্রুবতারা একটি তারকা বা তারা (star)। শুকতারা বা শুক্র একটি গ্রহ (planet)। আমাদের সূর্য একটি তারা।



ম্যাগেল্যানিক ক্লাউড

॥ তারা ও নক্ষত্র ।

তারা ও নক্ষত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় তারা বা তারকা ও নক্ষত্রের মধ্যে পার্থক্য করা হয়। একা একা যে-সব জ্যোতিষ্ক



ধ্রুবতারা

থাকে, তাকে বলা হয় তারা বা তারকা। দল বেঁধে যেগুলি থাকে, তাকে বলা হয় নক্ষত্র বা তারকাপুঞ্জ বা তারকামণ্ডল (Constellation)। ধ্রুবতারা একটি তারা। কিন্তু কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্র বা তারকাপুঞ্জ।

॥ মহাকাশে তারার সংখ্যা ॥



মহাকাশের তারা বা নক্ষত্রের সংখ্যা নিরূপণ করা অসম্ভব। খালি চোখে এ পর্যন্ত মানুষ ৬,০০০ তারা দেখতে পেয়েছে। কিন্তু দূরবীনের সাহায্যে ১০০ কোটির বেশী তারা বা নক্ষত্র দেখা সম্ভব হয়েছে, সে-সবের আলোকচিত্রও গ্রহণ করা হয়েছে।



কালপুরুষ (Orion)

মহাকাশের তারা বা নক্ষত্রের সংখ্যা তার চেয়ে অনেক অনেক বেশী।

তারার রং ও উত্তাপ

সব তারা বা নক্ষত্রের রং একই ধরনের নয়—নীল, সাদা, হলদে, কমলা ও লাল নানা রঙের। তাপের জন্যে রঙের তফাত হয়।

নীল রঙের তারা স্পাইকা (Spica)-র পৃষ্ঠতাপ ২৫ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, সাদা রঙের লুব্ধক (Sirius)-এর ১১ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, হলদে রঙের সূর্যের ৬ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, কমলা

রঙের আর্কটিউর্যাস (Arcturus)-এর ৪ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, লাল রঙের বেটেলজুজ (Betelgeuse)-এর পৃষ্ঠতাপ ৩ হাজার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

॥ বিশ্বের সবকিছুই ঘুরছে, ছুটছে ।

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ছায়াপথ, নীহারিকা, ধূমকেতু বিশ্বের সব কিছুই অবিরাম ঘুরছে ও ছুটে চলেছে। যেমন পৃথিবী সেকেণ্ডে প্রায় ৩০ কিলোমিটার বেগে ছুটছে, সূর্য ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে প্রতি সেকেণ্ডে ১৯৩ থেকে ২৭৫ কিলোমিটার বেগে ঘুরছে, সেকেণ্ডে প্রায় ১৯ কিলোমিটার বেগে সমগ্র সৌরজগৎ অভিজিৎ (Vega)-এর দিকে ছুটে চলেছে। কেউ কেউ বলেন, সূর্য নিউ হারকিউলিস তারার দিকে ছুটছে। এমন নক্ষত্র বা তারকাপুঞ্জ আছে যা এক সেকেণ্ডে প্রায় ১৬১০ কিলোমিটার বেগে ধাবিত হয়।

॥ সব চেয়ে কাছের তারা ।

আমাদের সূর্যই সব চেয়ে কাছের তারা, মাত্র ১৪,৭০,৯৭,০০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। তার পরে কাছের তারা হল প্রক্সিমা সেন্টরি (Proxima Centauri), ৪.২২ আলোকবর্ষ দূরে এর অবস্থিতি।

॥ ধ্রুবতারা, সপ্তর্ষি ও লঘুসপ্তর্ষি ॥

সাতটি তারা নিয়ে সপ্তর্ষি নক্ষত্র (বশিষ্ঠ, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলহ, পুলস্ত্য ও ক্রতু)। সপ্তর্ষির মাথার ছুটি তারাকে মনে মনে একটা লাইন টেনে তা সামনের দিকে বাড়িয়ে গেলেই সেটা ধ্রুবতারার পাশ দিয়ে যাবে। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ইউরোপীয় নাম Ursa Major ; ইংরেজীতে বলে Great Bear (বড় ভল্লুক)। সপ্তর্ষিমণ্ডলের ন্যায় আর একটি নক্ষত্রমণ্ডল আছে, তার নাম লঘু সপ্তর্ষি বা শিশুমার বা ছোট ভল্লুক। ইউরোপীয় নাম Ursa Minor বা Little Bear বা Little Dipper। এই লঘু সপ্তর্ষির শেষ তারাটি হচ্ছে ধ্রুবতারা।

সপ্তর্ষিমণ্ডলকে একটি জিজ্ঞাসার চিহ্নের ন্যায় দেখায়। চৈত্র-বৈশাখ মাসের সন্ধ্যায় উত্তর আকাশে খুব উপরের দিকে দেখতে পাওয়া যায়। জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়ে বা শ্রাবণে এই সপ্তর্ষিমণ্ডল ক্রমেই পশ্চিমে সরে আসে। ভাদ্র থেকে অগ্রহায়ণ মাস পর্যন্ত তাকে আকাশে দেখা যায় না। পৌষ মাসে তাকে উত্তর-পূর্ব আকাশে দেখা যায়। তারপর ক্রমশঃ সেটি পশ্চিম দিকে সরে যায়।

বশিষ্ঠ ঋষির পত্নীর নাম অরুন্ধতী। সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠ (Mizar)-র পাশে অরুন্ধতী (Alcor)-র অবস্থিতি। অরুন্ধতী একটি অস্পষ্ট তারা।

ধ্রুবতারার ইংরেজী নাম Pole Star বা Polaris বা North Star। অন্যান্য তারা বা নক্ষত্র আকাশে স্থান পরিবর্তন করে। ধ্রুব নক্ষত্র ঠিক একই জায়গায় থাকে, স্থান বদলায় না।

। ক্যাসিওপীয়া, অ্যাণ্ড্রোমিডা, পার্সিউস ও পেগাসাস ॥

সপ্তর্ষিমণ্ডলের বিপরীত পার্শ্বে পাঁচটি উজ্জ্বল তারা W-র আকারে সাজানো দেখা যায়। এর নাম ক্যাসিওপীয়া (Cassiopeia)। শীতকালে আকাশগঙ্গার গায়ে এটি দেখা যায়। এর একটু উত্তরে আকাশগঙ্গার বাইরে পূর্বদিকে কয়েকটি তারা মন্দিরের আকারে সাজানো দেখা যায়। সেই তারা কয়েকটির নাম সিফিউস নক্ষত্র (Cepheus)। সিফিউস নক্ষত্রের পাশে পার্সিউস (Perseus) নক্ষত্র বিরাজিত।

ক্যাসিওপীয়ার এক মাথার তারার নাম বীটা-

ক্যাসিওপীয়া (Beta-Cassiopeia)। এটি ক্যাসিওপীয়া নক্ষত্রমণ্ডলের দ্বিতীয় উজ্জ্বলতম তারা। ধ্রুবতারা থেকে বীটা-ক্যাসিওপীয়ার লাইন ধরে এগিয়ে গেলে পেগাসাস (Pegasus) নক্ষত্রে পৌঁছানো যায়। পেগাসাস নক্ষত্রমণ্ডলের আকার অনেকটা ঘুড়ির মতো। তাতে তারার সংখ্যা ১২। ওই ঘুড়ির আকারের নক্ষত্রমণ্ডলের তিনটি স্পষ্ট তারা ঘুড়ির লেজের আকারে সাজানো। তারা তিনটির মাঝেরটির গায়ে আর একটি তারা রয়েছে। এই লেজের তারাগুলি নিয়েই অ্যাণ্ড্রোমিডা (Andromeda) নক্ষত্রমণ্ডল।

লেজের শেষ ভাগের সঙ্গে আড়াআড়িভাবে সাজানো কয়েকটি তারা পার্সিউস নক্ষত্রের মস্তকদেশ।

॥ কৃত্তিকা ও রোহিণী ॥

কৃত্তিকা (Pleiades) নক্ষত্র সাতটি তারা নিয়ে গঠিত ছিল। তাই হিন্দু পুরাণে বলা হয়েছে 'সাত ভাই'। কিন্তু খালি চোখে মাত্র ৬টি তারা দেখা যায়। বশিষ্ঠ ছাড়া সপ্তর্ষিমণ্ডলের আর ছয় জন ঋষির পত্নী হলেন এঁরা ছয় জন। গ্রীক পুরাণে বলে, এই ছ'জন চন্দ্রদেবী ডায়ানা (Diana)-র ছয় সখী। অবশ্য শক্তিশালী দূরবীন দিয়ে দেখলে ছটি তারার জায়গায় অসংখ্য তারা দেখা যায়।

কৃত্তিকার একটু নীচের দিকে একটি উজ্জ্বল লাল তারা দেখা যায়। এর নাম রোহিণী (Aldebaran)। রোহিণী পাঁচটি তারার সমষ্টি হাইঅ্যাডীজ (Hyades)-এর উজ্জ্বলতম তারা। রোহিণীকে বৃষ নক্ষত্র (Taurus)-এর চক্ষু বলা হয়।

॥ কালপুরুষ, আর্দ্রা ও বাণরাজা ॥

রোহিণীর কাছে ধনুক হাতে শিকারীর আকারের বিরাট কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রমণ্ডল। কালপুরুষকে দেখলে মনে হয় যেন একজন শিকারী হাতে ধনুক, কোমরে তরোয়াল। সঙ্গে ২টি কুকুর। শীতকালে কালপুরুষকে পূর্ব আকাশে দেখা যায়। বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে দেখা যায়, কালপুরুষ পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছে।

কালপুরুষের ডান কাঁধের বৃহৎ উজ্জ্বল তারার নাম আর্দ্রা (Betelgeuse)। বাঁ পায়ের শেষ তারাটি কালপুরুষের তারাগুলির মধ্যে সব চেয়ে উজ্জ্বল—নাম বাণরাজা (Rigel)।

কালপুরুষের কোমরের বন্ধনী থেকে যে তিন-তারার তরোয়াল ঝুলছে, তার মাঝের তারার পিছনে একটি নীহারিকা বিদ্যমান। এটি কালপুরুষের অন্তর্গত না হলেও একে কালপুরুষের নীহারিকা (Great Nebula of Orion) বলা হয়। এর অন্য নাম হর্সহেড নীহারিকা। এই নীহারিকার দূরত্ব পৃথিবী থেকে ১২০০ আলোকবর্ষ।

। লুব্ধক ও সরমা ॥

ওরাইঅন ছিলেন পুরাণোক্ত এক বিরাট শিকারী। তাঁর ছিল দুটি কুকুর। কালপুরুষ (Orion) নক্ষত্রমণ্ডলেরও দুটি কুকুর বলে কল্পিত তারা আছে বড় কুকুরটির নাম Canis Major। এর এদেশীয় নাম লুব্ধক। ইংরেজীতে বলে Dog-star বা Sirius। লুব্ধক মহাকাশে দৃশ্যমান সবচেয়ে উজ্জ্বল তারা। পৃথিবী থেকে লুব্ধকের দূরত্ব ৮·৬ আলোকবর্ষ।

ছোট কুকুরটির নাম Canis Minor। এর অন্য নাম সরমা বা প্রশ্বা (Procyon)। আর্দ্রা, লুব্ধক ও সরমাকে যোগ করে লাইন টানলে একটি ত্রিভুজের সৃষ্টি হয়।

॥ খুব উজ্জ্বল তারকাসমূহ ॥

লুব্ধক (Sirius বা Dog-star), অগস্ত্যালু (Canopus), কিন্নর (Alpha Centauri), সরমা বা প্রশ্বা (Procyon), রোহিণী (Aldebaran), স্বাতী (Arcturus), অভিজিৎ (Vega), শ্রবণা (Altair), জ্যেষ্ঠা (Antares), ব্রহ্মহৃদয় (Capella), আর্দ্রা (Betelgeuse), চিত্রা (Spica), মঘা (Regulus), শূলতারা (Archerner), বাণরাজা (Rigel), পুনর্বসু (Pollax), ফোমালহট (Fomalhaut), বীটা সেন্টরি (Beta Centauri), কৃষ্ণসখা (Deneb) ও আলফা ক্রুসিস (Alpha Crucis)।

॥ রাশিচক্র ও রাশি ॥

সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে, পশ্চিমে অস্ত যায়। মনে হয়, সূর্য চলছে। কিন্তু সূর্যের কোন গতি নেই। সূর্য



রাশিচক্র

আকাশে যে পথ ধরে চলে বলে মনে হয়, তার নাম 'রবিমার্গ।' এই রবিমার্গের দুদিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে বহু নক্ষত্রপুঞ্জ আছে। এই নক্ষত্রপুঞ্জে গঠিত চক্রের নাম রাশিচক্র (Zodiac)। রাশিচক্রকে বারো ভাগে ভাগ করে তার এক এক ভাগের নাম দেওয়া হয়েছে রাশি (sign)। বারোটি রাশির নাম—মেষ (Aries), বৃষ (Taurus), মিথুন (Gemini), কর্কট (Cancer), সিংহ (Leo), কন্যা (Virgo), তুলা (Libra), বৃশ্চিক (Scorpio), ধনু (Sagittarius), মকর (Capricornus), কুম্ভ (Aquarius) এবং মীন (Pisces)।

সূর্য বৈশাখ মাসে মেষ রাশিতে থাকে। জ্যৈষ্ঠে থাকে বৃষ রাশিতে। এইভাবে ক্রমে চৈত্রে মীন রাশিতে এলে এক বছর হয়।

রাশিগুলির এক একটা মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। বারোটি রাশির মধ্যে সাতটির নাম নানারকম প্রাণীর, দুটির নাম কন্যা (মেয়ে) ও মিথুন (স্বামী-স্ত্রী)। বাকী তিনটি তিন রকম জিনিসের—তুলা (দাঁড়িপাল্লা), ধনু (ধনুক), আর কুম্ভ (কলসী)।

॥ রাশিচক্রের নক্ষত্রসমূহ ।

বারোটি রাশিতে মোট সাতাশটি নক্ষত্র আছে। এদের হিন্দুশাস্ত্রে বলা হয় চাঁদের স্ত্রী। নক্ষত্রগুলির নাম – অশ্বিনী, ভরণী, কৃত্তিকা, রোহিণী, মৃগশিরা, আর্দ্রা, পুনর্বসু (Pollus), পুষ্যা, অশ্লেষা, মঘা, পূর্বফল্গুনী, উত্তরফল্গুনী (Denebola), হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্বাষাঢ়া, উত্তরাষাঢ়া, শ্রবণা (Altair), ধনিষ্ঠা, শতভিষা, পূর্বভাদ্রপদা (Markab), উত্তরভাদ্রপদা ও রেবতী।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, চাঁদ এক বছরের মধ্যে এক এক সময়ে অশ্বিনী থেকে রেবতী পর্যন্ত সাতাশ নক্ষত্রের সামনে বা পাশ দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। অবশ্য সামনে বা পাশে বলতে মোটেই কাছে নয়, অনেক অনেক দূরে—কোটি কোটি মাইল তফাতে।



যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, অগণিত অরণ্য, পর্বত, নদী, সমুদ্র, অসংখ্য মানুষ, জীবজন্তু নিয়ে যে পৃথিবী, তা একদিন ছিল না। প্রায় ৫০০ কোটি বছর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি।

পুরাণে, লোককথায়, ধর্মশাস্ত্রে নানা দেশে পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে নানা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু সে-সব কথার মধ্যে কোন বিজ্ঞানসম্মত সারবত্তা নেই।

॥ নীহারিকাবাদ ॥

বিজ্ঞানীরাও নানা সময়ে নানা মতবাদের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর সৃষ্টিরহস্য উদ্ঘাটনের প্রয়াস চালিয়েছেন। কিন্তু কোন মতবাদই সর্ববাদিসম্মত হয় নি। ফরাসী বিজ্ঞানী লাপ্লাস (Pierre Simon Laplace, ১৭৪৯-১৮২৭) বললেন, এক বিরাট ঘূর্ণমান নীহারিকা থেকে সৌরজগৎ ও তার গ্রহ-উপগ্রহের সৃষ্টি। তিনি এমন নীহারিকা দেখালেন যে, তা থেকে স্পষ্ট গ্রহাদির সৃষ্টি হচ্ছে। তাঁর



ঘূর্ণমান নীহারিকা থেকে সৌরজগতের সৃষ্টি
(নীহারিকাবাদ)

মতবাদের নাম নীহারিকাবাদ। কিন্তু অধিকাংশ বিজ্ঞানী এই মতবাদকে সমর্থন করতে পারলেন না।

॥ জোয়ারবাদ ॥

ইংরেজ বিজ্ঞানী জেমস জীনস (Sir James Hopwood Jeans, ১৮৭৭-১৯৪৬) ও হ্যারল্ড জেফ্রিস জানালেন, একটা বিশাল জ্যোতিষ্ক সূর্যের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাবার সময় তার কল্পনাতীত প্রবল আকর্ষণে সূর্যের এক বিরাট অংশ ছিটকে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তা একটা পেটমোটা



বিশাল জ্যোতিষ্কের টানে সূর্যদেহ থেকে সৌরজগতের সৃষ্টি (জোয়ারবাদ)

চুরুটের আকারে মহাশূন্যে চলে যায়। পরে তা থেকে সব গ্রহের সৃষ্টি হয়। এই মতবাদকে বলে জোয়ারবাদ। কিন্তু বিজ্ঞানী-মহল থেকে এর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া গেল না।

॥ যুগ্মতারকাবাদ ॥

পরে বিজ্ঞানী হয়েল (Hoyle) বললেন, সৃষ্টির আদিতে সূর্য ও আর একটা তারকা যুগ্ম অবস্থায় প্রচণ্ড বেগে আবর্তিত হচ্ছিল। কোটি কোটি বৎসর আগে তারকাটিতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে। তারকাটির এক বিরাট অংশ বহু দূরে মহাশূন্যে চলে যায়। বাকী অংশ ও সূর্য থেকে গ্রহগণের সৃষ্টি হয়। আপাততঃ এই যুগ্মতারকাবাদ সকলের দ্বারা সমর্থিত হয়ে চালু রয়েছে।

। সৌরজগৎ ॥

সূর্য ও সূর্যকে কেন্দ্র করে যে-সব গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ বা গ্রহকণিকা (Asteroids বা Planet ids), ধূমকেতু, উল্কারাশি প্রভৃতি ঘুরছে, সৌরজগৎ (solar system) তাদের সমষ্টি।

॥ গ্রহ ও উপগ্রহে প্রভেদ ॥

যে-সব জ্যোতিষ্ক সূর্যের চারদিকে ঘোরে তারা গ্রহ (planet)। গ্রহের চারদিকে যে-সব জ্যোতিষ্ক ঘোরে তারা উপগ্রহ (satellite)।

গ্রহের সংখ্যা নয়টি। সূর্যের কাছ থেকে দূরে, এই ভাবে সাজানো পর পর তাদের নাম—বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth), মঙ্গল (Mars), বৃহস্পতি (Jupiter). শনি Saturn), ইউরেনাস (Uranus), নেপচুন (Neptune) ও প্লুটো (Pluto)। এ ছাড়া মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যেকার জায়গায় বহু সহস্র খুব ছোট ছোট গ্রহ আছে। সেগুলিকে গ্রহাণু বা গ্রহ-কণিকা বলে।

নয়টি প্রধান গ্রহ ছাড়া দশম গ্রহও আবিষ্কৃত হয়েছে। তার নাম রাখা হয়েছে ভালকান (Vulcan)। আবার অনেকে বলতে শুরু করেছেন একাদশ গ্রহও আছে।

॥ সূর্যের বয়স ॥

৫০০ কোটি বৎসর আগে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে।



সৌরজগৎ

তারও আগে সূর্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঠিক কত আগে তা বিজ্ঞানীরা সঠিকভাবে ধারণা করতে পারেন নি।

॥ সূর্যের উত্তাপ ॥

বহু কোটি বৎসর আগে সূর্যের সৃষ্টি হলেও এখনও সেটি একটি জ্বলন্ত গ্যাসের গোলা। সূর্যে লোহা ইত্যাদি ধাতু গ্যাসের আকারে আছে। আর আছে এতে অতি উত্তপ্ত কার্বন (carbon), হিলিয়াম গ্যাস (helium gas), অক্সিজেন গ্যাস (oxygen gas), হাইড্রোজেন গ্যাস (hydrogen gas), ইত্যাদি প্রায় ৬০ রকম উপাদান—সোনা, রুপা, তামা, রেডিয়াম (radium), সোডিয়াম (sodium), ম্যাগনেসিয়াম (magnesium), অ্যালিউমিনিয়াম (aluminium), ইউরেনিয়াম (uranium), সীসা, ক্যালসিয়াম (calcium) প্রভৃতি। সব উপাদানই উত্তপ্ত গ্যাসের আকারে বিদ্যমান।

সূর্য অনবরত জ্বলছে। এই বিরাট অগ্নিময় গ্যাসপিণ্ডের চার ধারে প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত গ্যাসরাশি বহু সহস্র কিলোমিটার দীর্ঘ লেলিহান শিখায় বিস্তৃত হয়ে আছে।

সূর্যের উপরিভাগের তাপ প্রায় ৬,০০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (১০,০০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট)। ভিতরের তাপ প্রায় পৌনে তিন কোটি ডিগ্রী ফারেনহাইট।

॥ সূর্য কত বড় ॥

সূর্য মহাকাশের একটি মাঝারি গোছের তারা। আমাদের পৃথিবীর চেয়ে ১৩ লক্ষ গুণ বড়। সূর্যের ব্যাস পৃথিবীর ব্যাসের প্রায় ১১০০ গুণ অর্থাৎ ১৩,৯২,৫২০ কিলোমিটার। এত বড় সূর্য কিন্তু পৃথিবীর চেয়ে মোটে ৩,৩৩,৪৩২ গুণ ভারী।

॥ সূর্যের আয়ু ॥

প্রাকৃতিক নিয়মে সূর্য একদিন নিভে যাবে। জ্বলন্ত গ্যাসপিণ্ড ঠাণ্ডা হতে হতে কঠিন আকার

ধারণ করবে। সে দিন না থাকবে সূর্যের বর্তমান আলো, না থাকবে তেজ-বিকিরণের ক্ষমতা। অবশ্য



দূরবীনে দেখা সূর্যের চেহারা

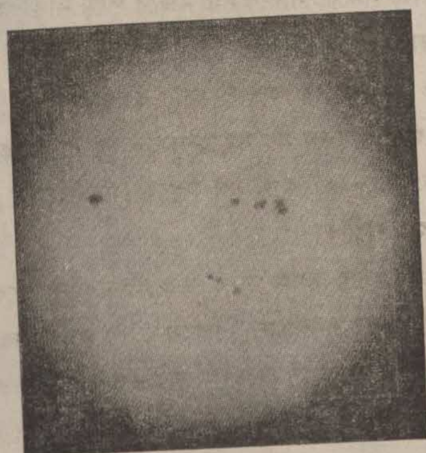
সূর্যের মৃত্যু ঘটবে কয়েক হাজার কোটি বছর পরে। পৃথিবীর কোন মানুষই সূর্যের মৃত্যু দেখতে পাবে না। কারণ সৌরজগতের প্রাণ সূর্যের মৃত্যুর বহু আগেই সকল জীবের মৃত্যু ঘটবে।

॥ সূর্যের দূরত্ব ॥

জানুয়ারি মাসে পৃথিবী সূর্যের কিছুটা কাছে আসে। তখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব হয় ১৪,৭০,৯৭,০০০ কিলোমিটার। জুলাই মাসে সূর্যের দূরত্ব হয় ১৫,২০,৯৯,০০০ কিলোমিটার।

॥ সূর্যের কলঙ্ক ॥

ভয়ংকর উত্তপ্ত গ্যাসের পিণ্ড সূর্যের গায়েও কালো কালো ছাপ দেখা যায়। দূরবীন দিয়ে দেখা তো যায়ই, কখনও কখনও সূর্যাস্তের কিছু আগে শুধু চোখে দেখা যায়। সূর্যাস্তের কিছু আগে সূর্যের তেজ কমে যায়। তখন খালি চোখে তার দিকে



সূর্যের কলঙ্ক

তাকানো যায়। অন্য সময় তাকাতে গেলে মানুষ

অন্ধ হয়ে যেতে পারে। এই কালো দাগগুলিকে বলে সৌর-কলঙ্ক (sun-spots)।



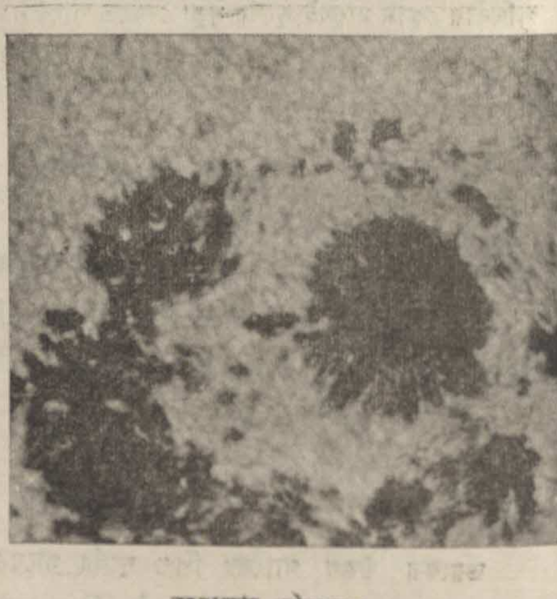
২টি সৌর-কলঙ্ক



বিরাট সৌর-কলঙ্ক

সব সময়ে সৌর-কলঙ্ক নজরে পড়ে না। আবার যে দাগ দেখা যাচ্ছিল, কিছু পরে তাও মিলিয়ে যায়। প্রতি ১১ বৎসর অন্তর সৌর-কলঙ্ক বাড়ে। সৌর-কলঙ্কের আয়তন সব সময়ে সমান হয় না। কখনও কখনও ১,৮০০ কোটি বর্গ কিলোমিটারব্যাপী সৌর-কলঙ্কের সৃষ্টি হয়।

এই সৌর-কলঙ্ক থেকে এক ধরনের তেজ বেরিয়ে পৃথিবীর বেতার-তরঙ্গের বিপর্যয় ঘটায়, কখনও কখনও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের গোলযোগ সৃষ্টি করে। সৌর-কলঙ্কের প্রভাবে গাছপালার ক্ষতি হয়। সেই জন্য দেখা গেছে ১১ বৎসর বাদে বাদে পৃথিবীর নানা স্থানে শস্যোৎপাদন কম হওয়ায় প্রচণ্ড খাদ্যাভাব দেখা দেয়।



বৃহদাকার সৌরকলঙ্ক

॥ সূর্যের আলোকচিত্র ॥

বিভিন্ন উপায়ে সূর্যের আলোকচিত্র গ্রহণ করা

হয়। এখানে দুটি আলোকচিত্র দেওয়া হল। একটি ক্যালসিয়াম আলোয় তোলা, অপরটি



ক্যালসিয়াম আলোয় তোলা সূর্যের আলোকচিত্র

হাইড্রোজেন আলোয় তোলা।

॥ সূর্যের আবর্তন ॥

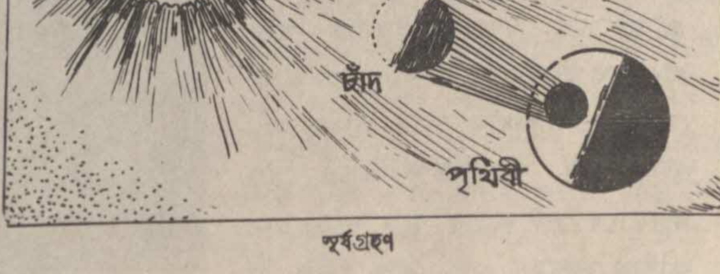
পৃথিবীর মতো সূর্যও তার কল্পিত মেরুদণ্ডের উপরে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে সাড়ে পঁচিশ দিনে একবার ঘুরে থাকে।

॥ সূর্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন ॥

২২শে ডিসেম্বর থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত সূর্যের ভ্রমণপথকে ক্রমশঃ উত্তর দিকে সরতে দেখা যায়। সূর্যের এই উত্তরাভিমুখী আপাতগতিকে বলে সূর্যের উত্তরায়ণ। ২১শে জুন থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সূর্যকে ক্রমশঃ দক্ষিণ দিকে সরতে দেখা যায়। সূর্যের এই দক্ষিণমুখী আপাতগতিকে বলা হয় সূর্যের দক্ষিণায়ন।

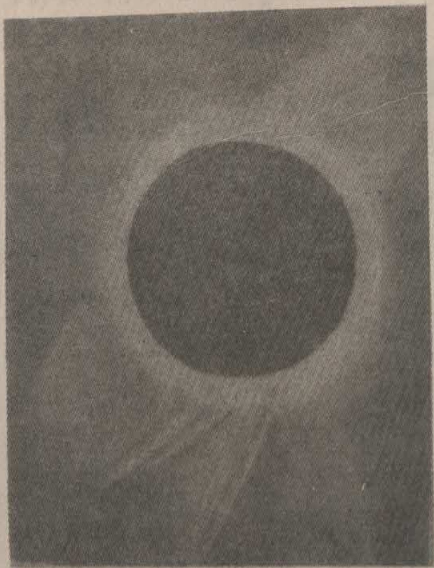
॥ সূর্যগ্রহণ ॥

চন্দ্র পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে থাকে। চন্দ্র যখন ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবী ও সূর্যের মাঝখানে এসে পড়ে সূর্যকে আড়াল করে তখন সূর্যকে আংশিক বা সম্পূর্ণ না দেখতে পাওয়াকে আমরা বলি আংশিক সূর্যগ্রহণ বা খণ্ডগ্রাস (partial eclipse) ও পূর্ণ সূর্যগ্রহণ বা পূর্ণগ্রাস (total eclipse)। কখনও কখনও চাঁদ সূর্যের ঠিক মাঝখানটাকে আড়াল করে। তখন আলোক-মণ্ডলের একফালি আলো একটা



সূর্যগ্রহণ

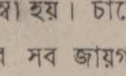
বালার ন্যায় হয়। এরকম হলে তাকে বলা হয় বলয়-



সূর্যের আলোকমণ্ডল

গ্রাস (annular eclipse)। অমাবস্যা ছাড়া সূর্যগ্রহণ হয় না। সূর্যগ্রহণ হতে গেলে চাঁদের ছায়া পৃথিবীতে পড়া আবশ্যক। এই ছায়া ৩,৭৩,৫২০ কিলোমিটার থেকে ৩,৭৯,৯৬০ কিলোমিটার লম্বা হয়। চাঁদের ছায়া একই সময়ে পৃথিবীর সব জায়গায় পড়ে না। তাই সব দেশে একই সময়ে সূর্যগ্রহণ দেখা যায় না। পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ ৭ মিনিট ৩১ সেকেণ্ডের বেশী স্থায়ী হয় না।

॥ সূর্যের টান ॥



সূর্যের টান বা মহাকর্ষের জোরেই প্রতিটি গ্রহ, ধূমকেতু ইত্যাদি সূর্যের চারদিকে ঘুরছে, সূর্যকে বা সৌরজগৎকে ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে পারছে না। প্রতিটি গ্রহ বা ধূমকেতু প্রচণ্ড বেগে মহাকাশে ছুটে চলেছে বলে সূর্যের টান কাটিয়ে চলেছে। এই বেগে ছোটা না থাকলে সব গ্রহ ধূমকেতুই সূর্যের টানে সূর্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ত।

॥ সূর্যের আলোর রং ॥



সূর্যের আলোর রং সাদা। কিন্তু বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এই সাদা রঙের আলো সাতটা রং-এর আলো দিয়ে গড়া। সেগুলি হচ্ছে—বেগুনি (violet), ঘননীল (indigo), নীল (blue), সবুজ (green), হলদে (yellow), কমলা (orange) ও লাল (red)। ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলা হয় VIBGY-OR এবং বাংলায় বলা হয় বেঘনীসহকলা। ত্রিপার্শ্ব বা prism দিয়ে সূর্যের সাতটা রং আলাদাভাবে দেখা যায়। রামধনুর সাতটা রং সূর্যের সাদা আলোরই বিশ্লিষ্ট রূপ। এ ছাড়া লাল আলোর আগে অবলোহিত রশ্মি (infra-red) এবং বেগুনির



হাইড্রোজেন আলোয় তোলা সূর্যের ছবি

পরের আলোকে অতি-বেগুনি (ultra-violet) রশ্মি বলে। অবশ্য এই দুটি রশ্মিকে দেখা যায় না।

॥ বুধ ॥

সূর্যের সর্বাপেক্ষা কাছের গ্রহ বুধ (Mercury)। বুধ সূর্য থেকে ৫,৭৯,০৯,২০০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। প্রায় ৮৮ দিনে এই গ্রহ সূর্যপ্রদক্ষিন করে। বুধের গতি ঘণ্টায় ১,৭২,২৪৮ কিলোমিটার।

বুধে হাওয়া নেই। কোন প্রাণীর অস্তিত্ব নেই। বুধের একদিকে চিরকালই দিন ও প্রচণ্ড গরম, অন্য দিকে চির-অন্ধকার রাত ও প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বুধের ব্যাস মাত্র ৪,৮৩০ কিলোমিটার। একুশটা বুধ পৃথিবীর সমান। মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত রকেটের সাহায্যে বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়েছে, বুধের ১টি উপগ্রহ আছে।

॥ শুক্র ॥

শুক্র (Venus) সূর্যের দ্বিতীয় গ্রহ। সূর্য থেকে তার দূরত্ব ১০,৮১,৯২,০০০ কিলোমিটার। সেকেণ্ডে তার গতি প্রায় ৩৬ কিলোমিটার। ২২৪$\frac{৩}{৪}$ দিনে এই গ্রহ সূর্য-প্রদক্ষিণ করে। শুক্র পৃথিবীর সবচেয়ে কাছের গ্রহ। পৃথিবী থেকে দূরত্ব ৪ কোটি ১৮ লক্ষ কিলোমিটার। শুক্রে সামান্যই অক্সিজেন আছে। খুব বেশী আছে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ও কিছু জলীয় বাষ্প। প্রাণের কোন সন্ধান বিজ্ঞানীরা আজও পান নি।

এই গ্রহ ৩২.২০ কিলোমিটার পুরু ঘন সাদা ধোঁয়ার আবরণে ঢাকা। সূর্যের আলো তাতে পড়ে চকচক করে। সন্ধ্যায় যখন তাকে দেখা যায়, তখন তাকে বলা হয় সাঁঝতারা বা সন্ধ্যাতারা। সকালে দেখা গেলে বলা হয়, শুকতারা বা প্রভাততারা।.

দূরবীনের সাহায্যে ধোঁয়ার আবরণে ঢাকা শুক্র-পৃষ্ঠের কোন তথ্য আমরা জানতে পারি নি। মার্কিন মহাকাশযান-মেরিনার-১০ (Mariner-X) শুক্রের ৩৪,৭৭৬ কিলোমিটার দূর দিয়ে চলে যায়। রুশীয় রকেট ভেনেরা-৭ (Venera-7) চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করে। তাদের সাহায্যে শুক্রের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য জানতে পারা গেছে। এ ছাড়া আরও মার্কিন ও রুশ রকেট শুক্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য ও ফটোগ্রাফ পাঠিয়েছে। শুক্রের দিন-রাতের উত্তাপ প্রায় সমান।

॥ পৃথিবী ॥

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ ('পৃথিবী' অধ্যায় দ্রঃ)।

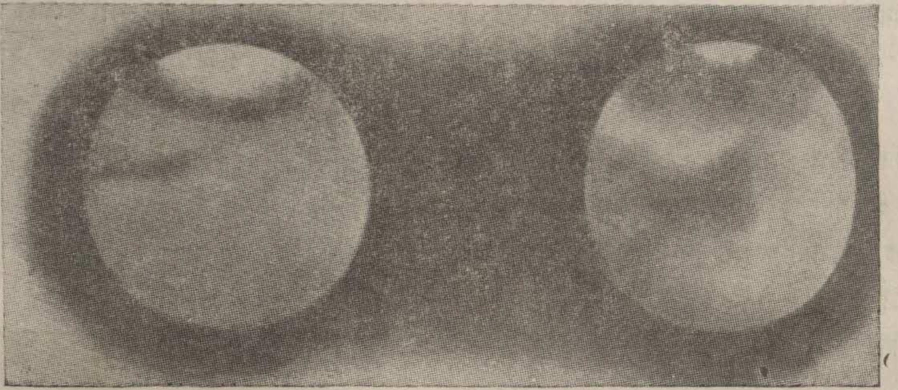


লে ভেরিয়ার (২৪ পৃঃ)

॥ মঙ্গল ॥

পৃথিবীর চেয়ে ছোট গ্রহ মঙ্গল। এর ব্যাস ৬,৭৮৬ কিলোমিটার। সেকেণ্ডে ২৪ কিলোমিটার বেগে ছুটে আমাদের ৬৮৭ দিনে একবার সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসে। সূর্য থেকে মঙ্গল (Mars) গ্রহের দূরত্ব প্রায় ২২ কোটি ৭৮ লক্ষ কিলোমিটার। মঙ্গল থেকে পৃথিবীর সব চেয়ে কাছের দূরত্ব ৫ কোটি ৬৩ লক্ষ কিলোমিটার। ৭৮০ দিন অন্তর অন্তর এই গ্রহ পৃথিবীর খুব কাছে আসে। মঙ্গল তার মেরুদণ্ডের উপর সাড়ে চব্বিশ ঘণ্টার কিছু বেশী সময়ে একবার পাক খায়।

মঙ্গলে পাতলা হাওয়া আছে, শীত গ্রীষ্ম আছে। মঙ্গলকে খুব লাল দেখায় তার কারণ, ওখানে প্রচুর বালি আছে। এই গ্রহের দুই মাথা বরফের আবরণে ঢাকা। শীতকালে এই আবরণ অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, গ্রীষ্মকালে বরফ গলতে আরম্ভ করলে সেই আবরণের বিস্তৃতি অনেক ছোট হয়।



বরফে ঢাকা মঙ্গলের দুই মেরুপ্রদেশ

মঙ্গলের হাওয়ায় অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কম। ইতালীয় বিজ্ঞানী স্কিয়াপ্যারেলি (Schiaparelli, ১৮৩৫-১৯১০), ও মার্কিন বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লোয়েল (Percival Lowell, ১৮৫৫-১৯১৬) মঙ্গলগ্রহের গায়ের দাগগুলিকে মানুষের কাটা খাল বলে মনে করেন। বিজ্ঞানীরা বলেন, তাঁদের ধারণা ভুল।

মার্কিন ও রুশ রকেটের সাহায্যে জানা গেছে, এতদিন ধরে যে ভাবা হয়েছিল মঙ্গলে পৃথিবীর চেয়ে উন্নততর মানুষ বা জীব আছে, তা অমূলক। মঙ্গলে যদি জীব থাকে তা অতি সূক্ষ্ম। গাছপালা নেই। ভাইরাস থাকতে পারে। সব তথ্য জানবার জন্য মার্কিন ও রুশ বিজ্ঞানীরা প্রভূত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।

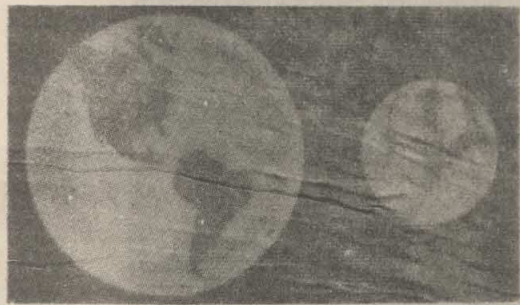


মঙ্গলের উপগ্রহ ফোবোস (Phobos)

এ পর্যন্ত জানা গেছে, মঙ্গলের মাত্র ২টি উপগ্রহ আছে। একটি ফোবোস (Phobo,) অপরটি ডীমোস (Deimos)।

বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গলকে

বলা হয় ভিতরকার গ্রহ (inner planets), গ্রহাণুপুঞ্জের ওপারের বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোকে বলা হয় বাইরের গ্রহ (outer planets)।



পৃথিবী ও মঙ্গলের তুলনামূলক ছবি

॥ গ্রহাণুপুঞ্জ ॥



জার্মান বিজ্ঞানী বোড (Johann Elert Bode, ১৭৪৭-১৮২৬) সূর্য থেকে গ্রহদের দূরত্ব কতটা তা বলতে গিয়ে জানালেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে দূরত্ব অস্বাভাবিক। নিশ্চয়ই এখানে কোন গ্রহ আছে।

শেষ পর্যন্ত ইতালীয় জ্যোতির্বিদ্ পিয়াৎসি (Giuseppe Piazzi, ১৭৪৬-১৮২৬) ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে সিরিজ (Ceres) নামে একটি ছোট গ্রহ আবিষ্কার করলেন। ক্রমে ক্রমে ৪৫ হাজার গ্রহাণু বা গ্রহকণিকা আবিষ্কৃত হয়।

সিরিজের ব্যাস ১,০২৫ কিলোমিটার, প্যালাস (Pallas)-এর ৪৮৯ কিলোমিটার, জুনো (Juno)-র ১৯৩ কিলোমিটার, ভেস্টা (Vesta)-র ৬০৩ কিলোমিটার, অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রহাণুর নাম—অ্যাষ্ট্রিয়া (Astraea), অ্যাডনিস (Adonis), হার্মিস (Hermes), হিডালগো (Hidalgo), এরস (Eros), অ্যাপলো (Apollo), অ্যাকিলিস (Achilles), হেক্টর (Hector), নেস্টর (Nestor), প্রায়াম (Priam), অ্যাগামেমনন (Agamemnon), ইউলিসিস (Ulysses), অ্যাজাক্স (Ajax), আইকেরাস (Icarus) প্রভৃতি। আইকেরাস (ব্যাস ·৮০ কিলোমিটার) ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুন পৃথিবীর কয়েক মাইলের মধ্যে এসে গিয়েছিল। অধিকাংশ গ্রহাণুর নামকরণ ও বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সুদূর অতীতে কোন গ্রহ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গ্রহাণুপুঞ্জের সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। গ্রহাণুদের আকৃতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে গোলাকার নয়, ভাঙ্গাচোরা নানা রকমের।

॥ বৃহস্পতি ॥



গ্রহকণিকাদের পরে সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ বৃহস্পতি (Jupiter)। এর ব্যাস ১,৪২,৯৩৫ কিলোমিটার ; পৃথিবীর ব্যাসের ১১ গুণ।



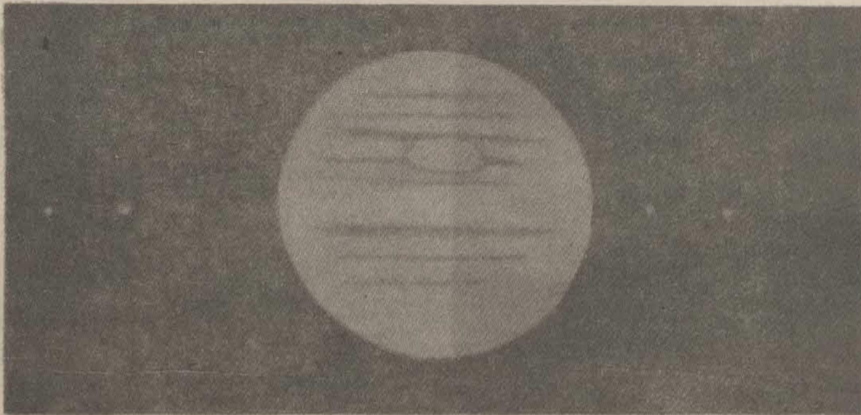
বৃহস্পতি গ্রহ

বৃহস্পতি সূর্য থেকে ৭৭ কোটি ৯২ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থেকে সেকেণ্ডে ১২·৮৮ কিলোমিটার বেগে সূর্য-প্রদক্ষিণ করছে। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তার লাগে প্রায় বারো বৎসর (১১ বছর ৩১৪ দিন)।

সূর্য এক রাশিতে এক মাস থাকে। বৃহস্পতি থাকে প্রায় ১২ বছর।

নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর একবার পাক খেতে বৃহস্পতির লাগে ৯ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।

বৃহস্পতি গ্রহে অক্সিজেন বা নাইট্রোজেন নেই, আর দেখতে পাওয়া যায় এক জায়গায় একটা বড় লাল দাগ (great red spot)। এই দাগটি প্রায়ই স্থান পরিবর্তন করে। এই দাগের আয়তন



বৃহস্পতি ও তার চারটি উপগ্রহ

আছে বিষাক্ত কয়েক রকম গ্যাস (মিথেন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি)। সম্ভবতঃ কয়েক হাজার কিলোমিটার ১২,৮৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া ও ৪৮,৩০০ কিলোমিটার পর্যন্ত লম্বা। এই দাগ সম্বন্ধে গবেষণা



শনিগ্রহ

পুরু বরফের আবরণে ঢাকা বৃহস্পতির পৃষ্ঠদেশ। সেখানকার উত্তাপ -১২০° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

লাল, হলদে, খয়েরী, হলদে-খয়েরী প্রভৃতি নানারকমের রঙীন দাগ বৃহস্পতিতে দেখা যায়। করতে গিয়ে কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এই দাগের উৎপত্তির হেতু। এই ঘূর্ণিঝড় কখনও থেমে থাকে না। বহু শত বৎসর ধরে বিরামবিহীনভাবে এই ঝড় চলেছে।

বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা ১৬। কিন্তু মার্কিন ও রুশ রকেটের সাহায্যে জানা গেছে এই সংখ্যা ষোলর অনেক বেশী।

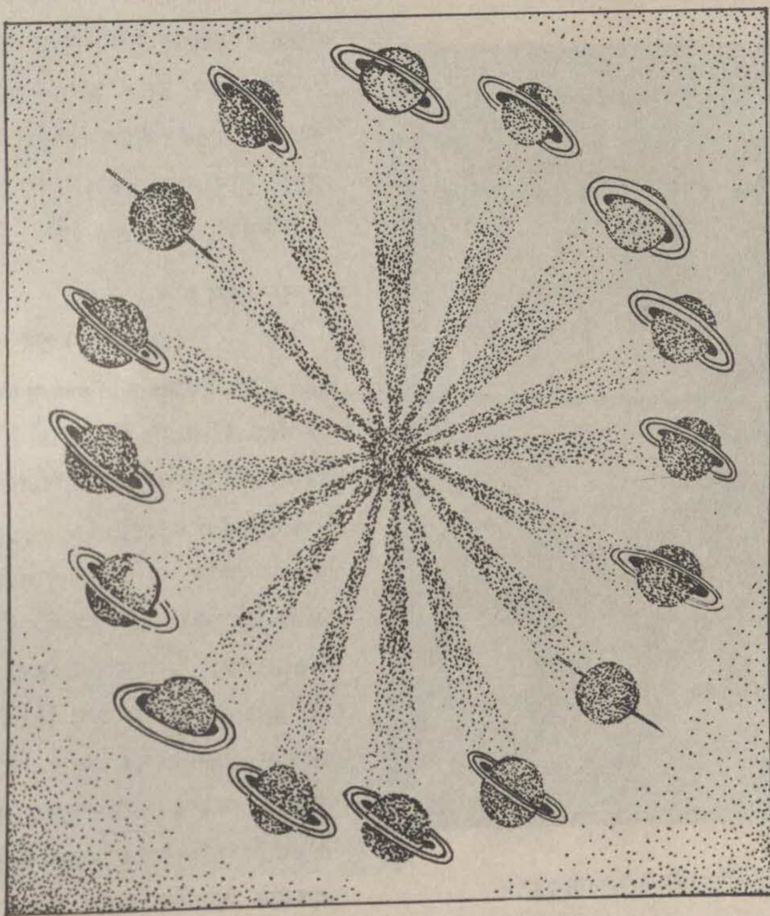


॥ শনি ॥

বৃহস্পতির পরের গ্রহ শনি (Saturn), সূর্য থেকে ষষ্ঠ গ্রহ। শনির গতি খুব ধীর। প্রতি সেকেণ্ডে মাত্র ৯·৬৬ কিলোমিটার চলে। হিন্দু শাস্ত্রে তাই শনির এক নাম শনৈশ্চর (শনৈঃ মানে ধীরে)।

শনি সূর্য থেকে প্রায় ১৪২ কোটি ৬৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে তার লাগে ২৯ বৎসর ১৭০ দিন।

শনির ব্যাস ১,২০,৭৫০ কিলোমিটার। শনির মাঝখানটাকে ঘিরে তিনটি চাকা (rings of Saturn) পর পর ঘুরছে। এই চাকা কয়টিকে বলা হয় শনির বলয়। শনির বলয়গুলিকে ধরলে শনির মাঝখানটার ব্যাস হবে ২,৭৫,৩১০ কিলোমিটার।

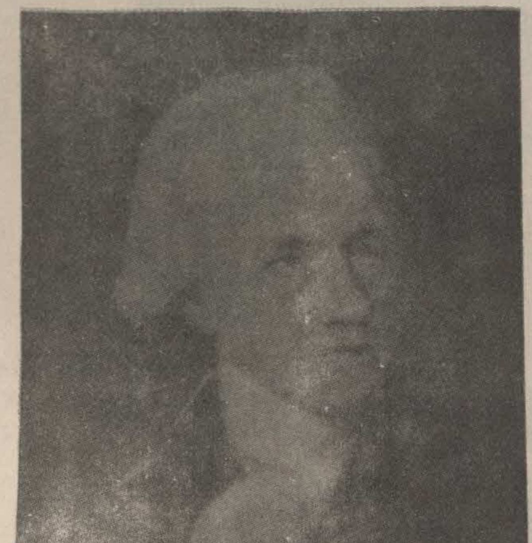


সূর্যের চারিদিকে ঘূর্ণমান শনিগ্রহ

মার্কিন বা রুশ রকেটের সাহায্যে জানা গেছে, শনির বলয়ের সংখ্যা বহু।

শনির বলয় অখণ্ড কিছু নয়, বহু সহস্র উপগ্রহের ঝাঁক প্রচণ্ড বেগে ঘুরছে। বহু দূর থেকে মনে হচ্ছে, সেগুলি বলয়। সুদূর অতীতে শনির কোন উপগ্রহ ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেই টুকরোগুলিই ঝাঁক বেঁধে শনির চারদিকে ঘুরছে।

শনির উপগ্রহ ১৬টি বলে জানা ছিল। এখন জানতে পারা গেছে, উপগ্রহগুলি সংখ্যায় ১৬-এর বেশী।



জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম হার্শেল

॥ ইউরেনাস ॥

হার্শেল (William Herschel, ১৭৩৮-১৮২২) ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে যে গ্রহ আবিষ্কার করেন, তার নাম দেওয়া হয় ইউরেনাস (Uranus)। এই গ্রহ আবিষ্কারে হার্শেলের বোন ক্যারোলাইন হার্শেলকে প্রভূত সাহায্য করেন। এই গ্রহ সূর্য থেকে ২৮৭ কোটি ৬ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থেকে ৮৪ বৎসর ২০ দিনে সূর্য প্রদক্ষিণ করছে। এই গ্রহের আর এক নাম হার্শেল।

ইউরেনাসের ব্যাস প্রায় ৫১ হাজার ৫২০ কিলোমিটার। সেকেণ্ডে তার গতি ৬.৮৪ কিলোমিটার। প্রায় পৌনে ১১ ঘণ্টায় ইউরেনাস নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর ঘুরে থাকে।

ইউরেনাস প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। সেখানকার হাওয়াও বিষাক্ত মিথেন গ্যাসে পূর্ণ। কাজেই সেখানে প্রাণের আশা করা বৃথা।

ইউরেনাসের উপগ্রহ ৫টি।

॥ নেপচুন ॥



নেপচুন (Neptune) সূর্য থেকে আরম্ভ করে অষ্টম গ্রহ। ইংরেজ গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ্ আডামস (John Couch Adams, ১৮১৯-১৮৯২) ও ফরাসী জ্যোতির্বিদ লে ভেরিয়ার (Urbain Jean Joseph Le verrier, ১৮১১-১৮৭৭) একযোগে নেপচুন গ্রহের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর জার্মান জ্যোতির্বিদ Galle গ্রহটি আবিষ্কার করেন।

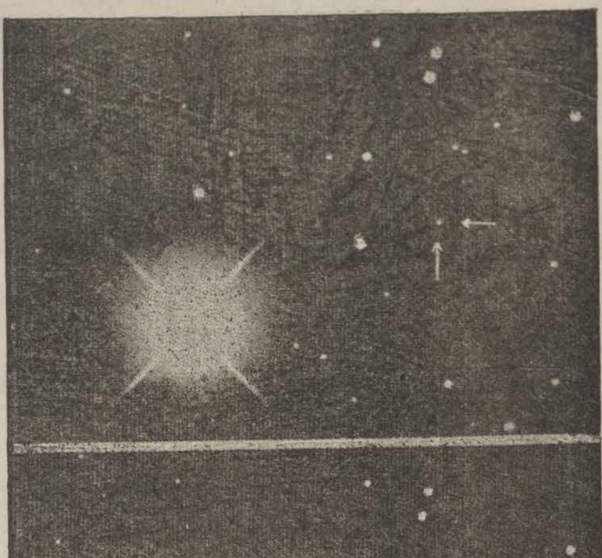
৪৪৯ কোটি ৭৫ লক্ষ কিলোমিটার দূরে থেকে নেপচুন ১৬৪ বৎসর ২৮১ দিনে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করছে। নেপচুনের গতি সেকেণ্ডে প্রায় ৫.৬৩ কিলোমিটার। নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্তন করতে তার লাগে ১৫$\frac{4}{5}$ ঘণ্টা।

নেপচুনের ২টি উপগ্রহ।

॥ প্লুটো ॥

প্লুটো (Pluto) সূর্য থেকে আরম্ভ করে নবম

গ্রহ। বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লোয়েল (Percival Lowell) জানালেন, নেপচুনের পরে আর একটি গ্রহ আছে। তিনি ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মারা গেলেন। তার ১৪ বৎসর বাদে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি আরিজোনার ফ্ল্যাগস্টাফের লোয়েল অবজারভেটরি থেকে C. W. Tombaugh এই গ্রহটির অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন। নাম দেওয়া হল প্লুটো (Pluto)। নেপচুনের ভাই পাতালের রাজা প্লুটোর নামে



৬ দুটি তীর দিয়ে মহাকাশে প্লুটোর অবস্থান দেখানো হচ্ছে

গ্রহটির নামকরণ করা হল প্লুটো (Pluto)। পার্সিভ্যাল লোয়েলের নামের প্রথম অক্ষর P. L. কাজেই গ্রহটির নামকরণ সকলেরই মনঃপূত হল।

প্লুটো ৫৯১ কোটি ৩৫ লক্ষ ১৪ হাজার কিলোমিটার দূরে থেকে প্রায় ২৪৮·৫৪ বৎসরে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। প্লুটোর গতি সেকেণ্ডে মাত্র ৪৮২৮০২ কিলোমিটার।

প্লুটোর ব্যাস ৩,০০০ কিলোমিটার। প্লুটোর মাত্র ১টি উপগ্রহ।

প্লুটো গ্রহের শৈত্য অত্যধিক। এর তাপমাত্রা -২২০° সেন্টিগ্রেড।

॥ সূর্যের দশম গ্রহ ।

লরেন্স লিভারমোর গবেষণাগার থেকে জানানো হয়, শনিগ্রহের চেয়ে তিন গুণ বড়, পৃথিবী থেকে প্রায় ৯ শত ৬৬ কোটি কিলোমিটার দূরে সূর্যের আর একটি গ্রহ আছে। যোসেফ ব্রাডি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। ৬ শত বৎসরে এই গ্রহ একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে।

সূর্যের এই দশম গ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে Vulcan। নির্ভরযোগ্য অন্যান্য তথ্য প্রকাশিত হয় নি।

। উপগ্রহ ॥

যে-সব জ্যোতিষ্ক গ্রহের চারদিকে ঘোরে তাদের বলা হয় উপগ্রহ (satellite)। এ পর্যন্ত পৃথিবীর টি (চন্দ্র), মঙ্গল গ্রহের ২টি, বৃহস্পতির ষোলটি, শনির ষোলটি, ইউরেনাসের ৫টি, নেপচুনের ২টি ও প্লুটোর ১টি উপগ্রহ আছে বলে জানা গেছে।

বুধ গ্রহের সম্ভবতঃ ১টি উপগ্রহ আছে, অবশ্য তার কোন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায় নি। শুক্র

ও প্লুটোর কোন উপগ্রহ আছে কিনা জানা যায় নি।

অবশ্য মার্কিন ও রুশ রকেটের সাহায্যে জানা গেছে, বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতির উপগ্রহের সংখ্যা আমাদের জানা উপগ্রহের সংখ্যার চেয়ে বেশী।

মঙ্গলের ২টি উপগ্রহের একটির নাম ফোবোস (Phobos)। ফোবোস মঙ্গল থেকে ৯,৩৭৮ কিলোমিটার দূরে থেকে প্রতি ৭ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে একবার মঙ্গলকে প্রদক্ষিণ করছে। তার ব্যাস মাত্র ১৬ কিলোমিটার। অন্য উপগ্রহটির নাম ডীমোস (Deimos)। মঙ্গল থেকে ২,২৫৪ কিলোমিটার দূরে থেকে ৩০ ঘণ্টায় মঙ্গলকে একবার প্রদক্ষিণ করে থাকে।

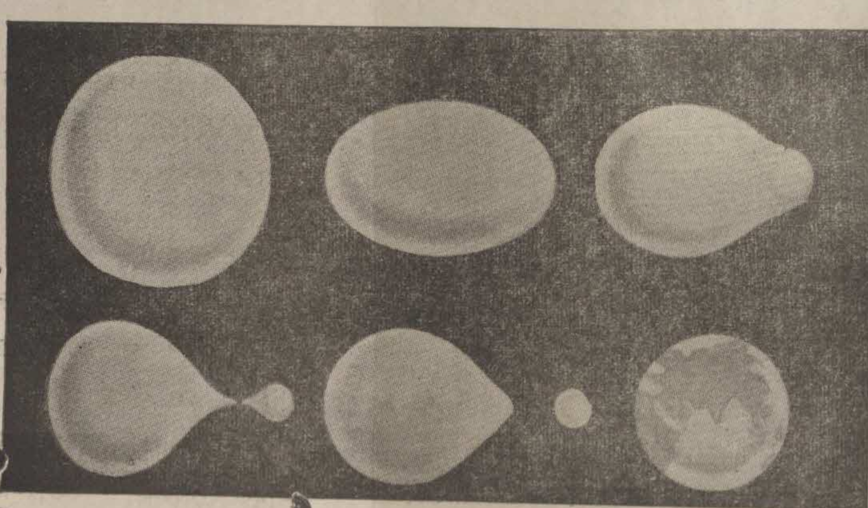
বৃহস্পতির ষোলটি উপগ্রহের মধ্যে গ্যানিমীড (Ganymede), ক্যালিস্টো (Callisto), ইউরোপা (Europa) ও আইয়ো (Io)—এই চারিটি বিজ্ঞানী গ্যালিলিও দূরবীন দিয়ে আবিষ্কার করেন। সব চেয়ে ছোট উপগ্রহ Leda (Jupiter XIII)। ব্যাস মাত্র ১৫ কিলোমিটার।

শনির ষোলটি উপগ্রহের মধ্যে সব চেয়ে বড়টির নাম টাইট্যান। সৌরজগতের সব চেয়ে বড় উপগ্রহ টাইট্যান। ব্যাস ৫৪০০ কিলোমিটার।

ইউরেনাসের ৫টি উপগ্রহ—মিরাণ্ডা (Miranda) এরিয়েল (Ariel), আমব্রিয়েল (Umbriel), টাইট্যানিয়া (Titania) ও ওবেরন (Oberon)। নেপচুনের দুটি উপগ্রহ। বড়টির নাম ট্রাইটন (Triton)। উইলিয়াম লাসেল উপগ্রহটি আবিষ্কার করেন। অন্যটির নাম নীরীড (Nereid)।

॥ চাঁদ ॥

পৃথিবীর একটি মাত্র উপগ্রহ—চাঁদ। পৃথিবী থেকেই তার সৃষ্টি। পৃথিবীর থেকে অনেক ছোট বলে চাঁদ অনেক আগেই কঠিন হয়ে গেছে। মাধ্যাকর্ষণ



পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি

কম বলে বাতাসকে ধরে রাখা যায় নি, মহাশূন্যে উধাও হয়ে গেছে। জল নেই। শুকনো জলহীন খাদ বা সাগর, পৃথিবীর চেয়েও বড় বড় পর্বত,

আরগুলি আকারে খুব ছোট। গ্যানিমীড সব গ্রহের উপগ্রহের মধ্যে বেশী ভারী, পৃথিবীর চাঁদের চেয়ে ২'০২ গুণ বেশী ভারী। সৌরজগতের

অপর্যাপ্ত ধুলো নিয়ে চাঁদ।



দূরবীন দিয়ে দেখা ষষ্ঠীর চাঁদ

চাঁদে কোন গাছপালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ, জীবাণু, ভাইরাস নেই, মানুষ তো নেইই।

চাঁদের ব্যাস ৩,৪৭৫ কিলোমিটার। ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার দূরে থেকে সেকেণ্ডে ১৬০৯৩৪ কিলোমিটার বেগে ছুটে প্রায় ২৭ দিন ৭ ঘণ্টা ৪৩ মিনিটে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে। পৃথিবীর তুলনায় চন্দ্র আকারে ৫০ ভাগের ১ ভাগ।

চাঁদ চিরকাল এক পিঠ পৃথিবীর দিকে রেখে ঘুরছে। অন্য পিঠ ঘন অন্ধকারে ঢাকা,



দূরবীন দিয়ে দেখা নবমীর চাঁদ



দূরবীন দিয়ে দেখা পূর্ণচন্দ্র

চন্দ্র থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে ১.২ সেকেণ্ড লাগে।

চাঁদের ২টি পক্ষ—কৃষ্ণপক্ষ ও শুক্লপক্ষ। পূর্ণিমার পরের দিন থেকে পনের দিন চাঁদের আকার ছোট হতে হতে অমাবস্যার অন্ধকারে বিলীন হয়ে থাকে। এই পনের দিনকে বলে কৃষ্ণপক্ষ। অমাবস্যার পর থেকে চাঁদ আবার একটু একটু করে বাড়তে শুরু করে। পনের দিনের মাথায় চাঁদ পুরাপুরি গোল হয়। সেই চাঁদকে বলে পূর্ণিমার চাঁদ। পূর্ণিমা থেকে পূর্ণিমা, অমাবস্যা থেকে অমাবস্যা হতে ২৯½ দিন লাগে।

চাঁদের যে পিঠকে আমরা দেখি, তাতে কিছু কিছু দাগ দেখা যায়। এই দাগ দেখে কেউ বলে,



চাঁদের যে পৃষ্ঠ দেখা যায় না সেই পৃষ্ঠের একটি বিরাট খাদ

প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সেখানে। এতদিন চাঁদের অপর পিঠ আমরা দেখি নি। মার্কিন ও রুশ রকেটের সাহায্যে চাঁদের অপর পিঠের ছবি তোলা গেছে। সে দিক্‌ও এদিকের মতো শুকনো সাগর, খাদ ও উঁচু উঁচু পাহাড়ে পূর্ণ। চাঁদের ৫৯ শতাংশ স্থান পৃথিবী থেকে দেখা যায়।

চাঁদের আলো স্নিগ্ধ। এ তার নিজের আলো নয়। সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে আলো বিকিরণ করে। ৪,৬৫,০০০ পূর্ণিমার চাঁদের আলো সূর্যের আলোর সমান হতে পারে।



রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ

চাঁদের বুড়ী-মা চরকা কাটছে, কেউ বলে ওটা একটা খরগোশ। আসলে চাঁদের বড় বড় ও গভীর খাদের বা সমুদ্রের মধ্যে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে না পালা, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গ কিছুই নেই। চাঁদ এক নিষ্প্রাণ জড় পদার্থ।

দিনের বেলায় চাঁদের সর্বোচ্চ উত্তাপ ১১৭·২°



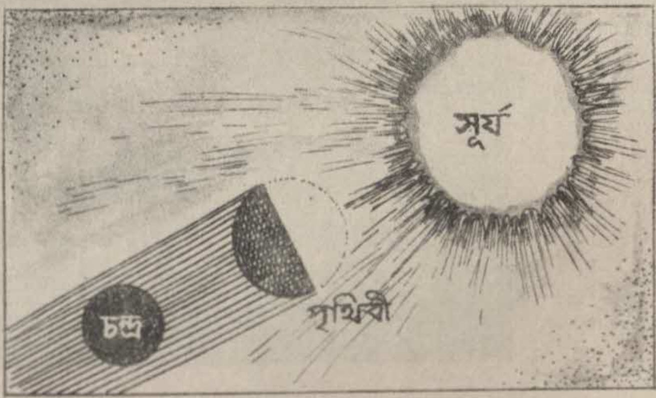
৫০ হাজার টন ওজনের উল্কাপিণ্ড পতনের ফলে সৃষ্ট আরিজোনার ১ কিলোমিটারব্যাপী খাদ

পারায় সেই-সব স্থান আলোকিত হয় না। তাই-ই দূর থেকে দাগের মতো দেখায়। এই দাগকে বলে চাঁদের কলঙ্ক।

সেন্টিগ্রেড, রাত্রের তাপ সর্বনিম্ন—১৬২·৭° সেন্টিগ্রেড।

চাঁদে ১৫ দিন ধরে এক নাগাড়ে দিন চলে তার মধ্যে রাত হয় না।

পৃথিবীতে বসেই মানুষ চাঁদের প্রতিটি জলহীন সাগর ও সব পাহাড়ের নামকরণ করেছে। তাদের আয়তনও নিরূপিত করেছে। সব চেয়ে উঁচু পাহাড়ের উচ্চতা ৭,৮৩০ মিটার। চাঁদে আগ্নেয়গিরির অনেক গহ্বর আছে। সব চেয়ে বড় গহ্বর নিউটন ক্রেটার। আয়তন ৭,০০০ থেকে ৮,৮৫০ হাজার মিটারের মধ্যে।

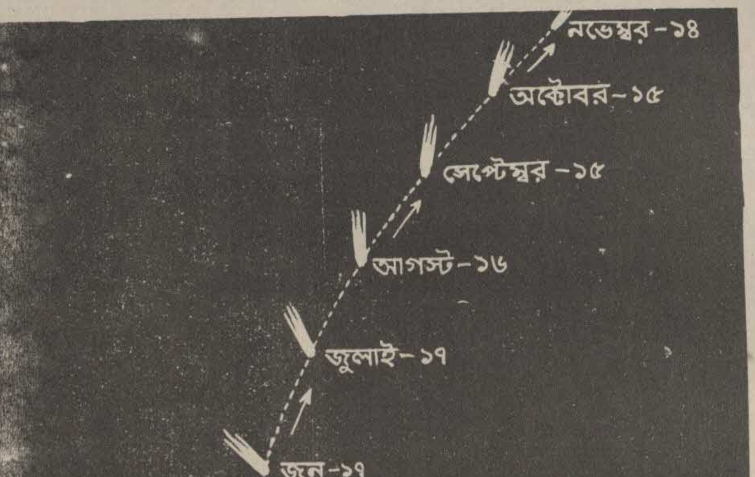


চন্দ্রগ্রহণ

পৃথিবীর মানুষ চাঁদে গিয়ে দেখে এসেছে। চাঁদে মেঘ, বিদ্যুৎ, রামধনু, বৃষ্টি, শব্দ, জল, হাওয়া, গাছ-

সূর্যের গ্রহণের মতো চন্দ্রেরও গ্রহণ

পৃথিবী ঘুরতে ঘুরতে সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে এলে সূর্যের আলো চন্দ্রে পড়তে পারে না। পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রে গিয়ে পতিত হয়। তখন চন্দ্রগ্রহণ হয়। চন্দ্রগ্রহণ আংশিক বা খণ্ডগ্রাসও হয়, পূর্ণগ্রাসও হয়। পূর্ণিমা ছাড়া চন্দ্রগ্রহণ হয় না। অবশ্য সব পূর্ণিমাতে চন্দ্রগ্রহণ হয় না।



একটি ধূমকেতুর ভ্রমণপথ

॥ ধূমকেতু ॥

ধূমকেতু (comet) মহাকাশের এক অত্যাশ্চর্য দর্শনীয় জ্যোতিষ্ক। এর আলোর লেজ দেখে লোকে একে বলে ঝাঁটা-তারা। ধূমকেতু গ্রহের মতো পর পর উপবৃত্তাকার পথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে না। গ্রহদের পাশ কাটিয়ে সূর্যের ধার দিয়ে মহাশূন্যে চলে যায়, আসেও সেইভাবে।

ধূমকেতুর দু'রকমের ভ্রমণপথ। এক উপবৃত্তাকার (elliptical), অন্যটি অধিবৃত্তাকার (parabolic)। প্রথমোক্ত ধূমকেতু নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ফিরে আসে

কিন্তু দ্বিতীয় প্রকার ধূমকেতুকে কখনও ফিরে আসতে দেখা যায় নি।

ধূমকেতুর ৩টি অংশ—মূল (nucleus), মূলকে ঘিরে কুয়াশার মতো আবরণ (coma) ও আলোক-পুঞ্জ (tail).

ধূমকেতুর মূল দেহ লোহা, পাথর, বরফ, কার্বন, নাইট্রোজেন, অ্যালুমিনিয়াম, অক্সিজেন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, নিকেল, ম্যাঙ্গানীজ, ক্রোমিয়াম, পটাসিয়াম, তামা, সিলিকন ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। প্রথমে তাকে একটুকরো ধোঁয়ার ন্যায় দেখায়। সূর্যের যত কাছে আসে ততই তার গা থেকে গ্যাস বেরিয়ে প্রকাণ্ড আলোর লেজ সৃষ্টি করে। সেই লেজ দেখতে ঝাঁটার মতো। তবে ঝাঁটা না বলে চুলের গোছা বলাই ভালো। comet মানেই লম্বা চুলওয়ালা।

সব সময়ে ধূমকেতুর লেজ সূর্যের বিপরীত দিকে



এডমাণ্ড হ্যালী

থাকে। ধূমকেতুর মূল দেহের ব্যাস বড় জোর কয়েক মাইল হয়ে থাকে। কোমার আয়তন ৮/১০ লক্ষ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। কিন্তু লেজের দৈর্ঘ্য ২৫/৩০ কোটি কিলোমিটারও হতে দেখা গেছে।

কখনও ধূমকেতুর দুটো, তিনটে, চারটে লেজও দেখা যায়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দ্য শীজো (De-Cheseux)-র ধূমকেতুর ছটা লেজ দেখা গিয়েছিল।

লোকের ধারণা, ধূমকেতুর লেজের ঝাপটায় পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। কিন্তু সে ধারণা



দোনাতির ধূমকেতু

ভুল। লেজ তো শুধু আলোর তৈরী। কাজেই দেখা গেছে, পৃথিবী সেই লেজের আলোর মধ্য দিয়ে গেলে পৃথিবীর কোন ক্ষতি হয় নি। ভূমিকম্প, ঝড়বৃষ্টি প্রভৃতি কিছুই হয় নি। একটা গাছের পাতারও কোন ক্ষতি হয় নি।

বিজ্ঞানী নিউটনের বন্ধু ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এডমাণ্ড হ্যালী (Edmund Halley, ১৬৫৬—১৭৪২ খ্রীঃ) যে ধূমকেতুটি আবিষ্কার করেন, তার নাম হ্যালীর

ধূমকেতু। ৪৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সেটি দেখা গিয়েছিল। হ্যালী হিসেব করে জানালেন, এই ধূমকেতুর ভ্রমণ-পথ উপবৃত্তাকার। ১৫৩১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আরম্ভ করে ৭৫ বছর অন্তর অন্তর আমাদের আকাশে দেখা গেছে। হ্যালীর মৃত্যুর ১৬ বৎসর পরে ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গিয়েছিল। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিলও হ্যালীর ধূমকেতু এসেছিল। আবার আসবে ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।



হ্যালীর ধূমকেতু

বহু ধূমকেতু বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি বড় বড় গ্রহের টান এড়িয়ে সৌরজগৎ ছেড়ে যেতে পারে নি। বৃহস্পতির আকর্ষণে ৩০টি ধূমকেতু বন্দী হয়ে আছে। হ্যালীর ধূমকেতু নেপচুনের বন্দী।

বিয়েলার ধূমকেতু (Biela's comet), দোনাতির ধূমকেতু (Donati's comet), এনকির ধূমকেতু



মোরহাউসের ধূমকেতু

(Encke's comet), মোরহাউসের ধূমকেতু (Morehouse comet) প্রভৃতি অনেক

ধূমকেতুকে আমাদের আকাশে দেখা গেছে। দোনাতির ধূমকেতুকে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দেখা গিয়েছিল। বড় সুন্দর দেখতে। অবশ্য বিয়েলার ধূমকেতু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। এনকির ধূমকেতু ১২০৬ দিন অন্তর অন্তর আসে। একে ৫১ বার পৃথিবীর আকাশে দেখা গেছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, ১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ধূমকেতুটি অবলুপ্ত হয়ে যাবে। উল্লেখযোগ্য ধূমকেতুর সংখ্যা প্রায় ১০০০।

॥ উল্কা ॥

রাত্রে অনেক সময়ে দেখা যায়, একটা জ্বলন্ত আলো তীব্রবেগে আকাশ থেকে ছুটে এসে মাটিতে



উল্কার ঝাঁক

পড়ে গেল। লোকে একে বলে 'তারা খসা'। কিন্তু তারা তো খসতে পারে না। তারা তো অনেক বড়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের পৃথিবীর চেয়ে অনেক অনেক বড়।

এগুলিকে বলে উল্কা (meteor)। বিয়েলার ধূমকেতুর মতো কোন ধূমকেতু সুদূর অতীতে ভেঙ্গে অসংখ্য টুকরার সৃষ্টি হয়েছে। সেই টুকরাগুলি



একটি ধূমকেতু

আকাশে ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণে পৃথিবীতে এসে পড়ে। রাত্রে এগুলি নজরে পড়ে। দুর্দান্ত বেগে ছুটে এসে পড়বার সময় সেগুলি বাতাসের সংঘর্ষে জ্বলে ওঠে। এই জ্বলন্ত টুকরা



আরিজোনার শয়তানের খাদ

কখনও একা বা কখনো ঝাঁক-বাঁধা অবস্থায় নজরে পড়ে। দিনেও উল্কাপতন হয় কিন্তু সূর্যের আলোর জন্য সেগুলি দেখা যায় না।

উল্কা নানা রকমের। একটা ছোট সরষের মতো আকারের উল্কা থেকে অতি প্রকাণ্ড আকারেরও হয়ে থাকে। যে-সব বড় উল্কাপিণ্ড আধপোড়া অবস্থায় মাটিতে এসে পড়ে তাদের ইংরেজীতে বলে meteorite। কোন কোন সময়ে এই উল্কাপিণ্ডের আকার এত বড় হয় যে তা পৃথিবীর মাটিতে পড়ে প্রকাণ্ড এক গহ্বরের সৃষ্টি করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায় একটা বিরাট উল্কাপিণ্ডের পতনের ফলে খুব গভীর গর্তের সৃষ্টি হয়েছে, তার ব্যাস ১ কিলো-মিটার। সেই গর্তের নাম শয়তানের খাদ (Canyon Diablo)। অবশ্য উল্কাপিণ্ডটি পাওয়া



গ্রীনল্যাণ্ডের কেপ ইয়র্কে প্রাপ্ত উল্কাপিণ্ড

যায় নি। তবে রিপোর্টারদের ধারণা, উল্কা-পিণ্ডটির ওজন ছিল ৫০ হাজার টন।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার গ্রটফ্রন-টিনের নিকটে হোবা ওয়েস্টে (Hoba West-এ) প্রাপ্ত উল্কাপিণ্ডের ওজন ৫৯ টন। এইটিই এ পর্যন্ত পাওয়া উল্কাপিণ্ডগুলির মধ্যে বৃহত্তম। দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ উল্কাপিণ্ডটি পাওয়া গেছে গ্রীনল্যাণ্ডের কেপ ইয়র্কে। তার ওজন ৩০.৩৯ টন। এই উল্কাপিণ্ডটি নিউ ইয়র্কের জাদুঘরে রক্ষিত আছে।



একটি বিরাট উল্কাপিণ্ড

উল্কা বা উল্কাপিণ্ড প্রধানতঃ লোহা ও পাথর দিয়ে তৈরী।



কয়েকটি উল্কাপিণ্ড

খুব ছোট উল্কা পৃথিবীর মাটী স্পর্শ করবার আগেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। কতকগুলি আধপোড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। বহু উল্কা বা উল্কাপিণ্ড

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। কলিকাতার জাদুঘরেও বহু উল্কা আছে।

সব দিনই একই সময়ে উল্কাপাত হয় না, সংখ্যায়ও তাদের হেরফের হয়। সাধারণতঃ ২১শে এপ্রিল, ৯ই থেকে ১১ই আগস্ট, ১২ থেকে ১৪ই ও ২৭শে থেকে ২৯শে নভেম্বর সব চেয়ে বেশী ঝাঁকে ঝাঁকে উল্কাপাত হয়ে থাকে।

১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে লিসবনের কাছে অতলান্তিক মহাসমুদ্রে অসংখ্য উল্কাপাত হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন সাইবীরিয়ায় এক বিশাল উল্কাপাত হয়। সেই উল্কাপিণ্ডের আকার ছিল খুবই বিরাট। তার পতনের ফলে বাতাসের ঝাপটায় ও আগুনের উত্তাপে ৩,৮৮৫ বর্গ কিলোমিটর বনের মধ্যেকার সব গাছ ধ্বংস হয়ে যায়। এই উল্কাপতনের শব্দ লণ্ডন, ওয়াশিংটন ও বাটাভিয়ায় শোনা গিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, ওটি কোন ভেঙ্গে-যাওয়া ধূমকেতুর মূল দেহ। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে উল্কা-পতনের স্থানটি পরিদর্শনকালে ২০০০টি বড় বড় গর্ত লক্ষ্য করা গেছে। অবশ্য, উল্কাপিণ্ডটি পাওয়া যায় নি।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ওরিগন শহরের নিকটে উইলামেট উপত্যকায় প্রাপ্ত উল্কাপিণ্ড

[The Willamette meteorite]



মানুষ যখন জানতে পারল, চাঁদ একটা রুপালী থালা নয়, পৃথিবীর মতো পাহাড়-পর্বত, মাটি-পাথরে গড়া একটা জোতিষ্ক, তখন থেকে চাঁদে যাবার জন্যে তার ইচ্ছে হল। কিন্তু যাব বললেই তো যাওয়া হয় না। পৃথিবী ছাড়িয়ে উপরে উঠতে গেলে মাধ্যাকর্ষণ ছাড়াতে হবে। তা না হলে মাধ্যাকর্ষণ তাকে টেনে পৃথিবীতেই নিয়ে আসবে। অবশ্য, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে যেতে পারলেই সমস্যা মিটবে না। যে পর্যন্ত মাধ্যাকর্ষণের জোর আছে, তার পরে অনেক অনেক দূরে ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার যেতে পারলে, তবে চাঁদে যাওয়া যাবে।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখলেন, কোন রকেট যদি ঘণ্টায় ৪০ হাজার কিলোমিটারের চেয়ে বেশী যায় তাহলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ তাকে টেনে নামাতে পারবে না।

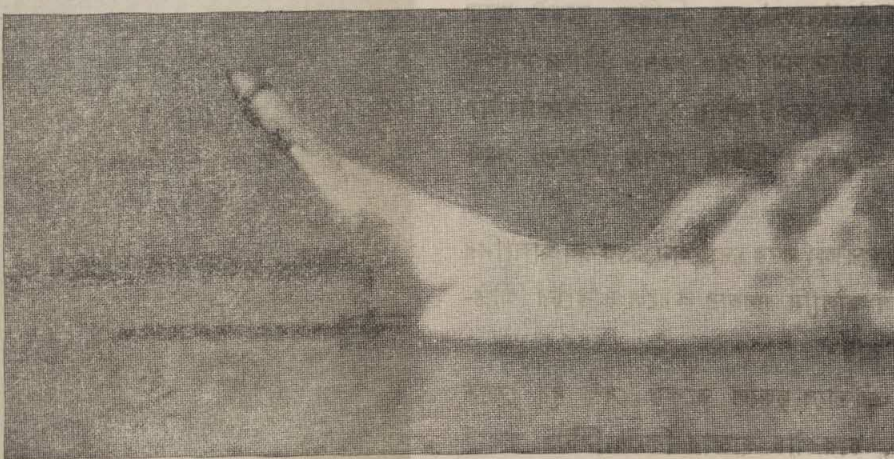
মানুষ তখন উঠে পড়ে লেগে গেল ৪০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশী বেগ-সম্পন্ন রকেট তৈরি করতে। বিজ্ঞানীরা সে কাজে সফল হলেন।

কিন্তু শুধু তো চাঁদ নয়, মহাকাশে সৌরজগতের



রকেট

অনেক গ্রহ ও তাদের উপগ্রহ, তারা, নক্ষত্র রয়েছে। সে সব জ্যোতিষ্ক এত দূরে যে সেখানে পৌঁছতে মানুষ পারবে কিনা, তাতে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে।



রকেট ছুটে চলেছে

এ পর্যন্ত আমরা জেনেছি, আলোর গতি সেকেণ্ডে ২,৯৯,৭৯২, কিলোমিটার। সেই আলোরমতো গতি সম্পন্ন কোন রকেট মহাকাশে যাত্রা করলে এমন জ্যোতিষ্কও আছে যেখানে পৌঁছতে ১৫ কোটি ৎবসর লেগে যাবে। শুধু তাই নয়। তার পরেও মহাকাশ পরিব্যাপ্ত। আবার মহাকাশ ক্রমশঃ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এই সম্প্রসারণ থেমে নেই।

মহাসমুদ্রের তীরে যত বালুকণা আছে, সংখ্যায় তাদের চেয়েও অনেক অনেক বেশী মহাকাশের জ্যোতিষ্ক। মানুষ তার সীমিত শক্তি নিয়ে কোনদিনই মহাকাশের শেষ প্রান্তে কেন, আমাদের সৌরজগতের প্রান্তেও যেতে পারবে না।

বিজ্ঞানীরা তাই সেই সব অতি দূরের জ্যোতিষ্কে যাওয়ার পরিকল্পনা করলেন না। শুধু আপাততঃ কাছের চাঁদে যাবার কথা ভাবতে লাগলেন। মঙ্গলগ্রহ ও শুক্রগ্রহে যাবার পরিকল্পনা তাঁদের মাথায় রইল।

॥ মহাকাশে যাত্রার উপায় ॥

কালীপূজোর সময় লোকে হাউই বাজি ছোড়ে। এই বাজিতে আগুন ধরিয়ে দিলে ভিতরের বারুদে বিস্ফোরণ হয়। সেই বিস্ফোরণের জন্য উলটো দিকে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। তারই চাপে হাউই বাজি উপরের দিকে উঠে যায়। যুদ্ধের সময় যে হাউই বা রকেট ব্যবহার করা হয় তাও বারুদে বিস্ফোরণের ফলে যে উলটা দিকে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, তার চাপে একস্থান থেকে বহু দূরে গিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে জার্মানরা ১২ টন ওজনের আর প্রায় ১৫.২৪০০ মিটার লম্বা যে ভি-টু (V-2) রকেট ফ্রান্স থেকে লণ্ডন শহরে নিক্ষেপ করত, তা শব্দের চেয়ে দ্রুত গতিতে আকাশ-পথে ছুটে যেত।

যতদূর জানা যায়, চীনে প্রথম রকেট নির্মিত হয়। ভারতে টিপু সুলতান যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে রকেট ব্যবহার করেছিলেন। আজকাল তো সব শক্তিশালী দেশেই যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে রকেট ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

এই ধরনের রকেটের সাহায্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

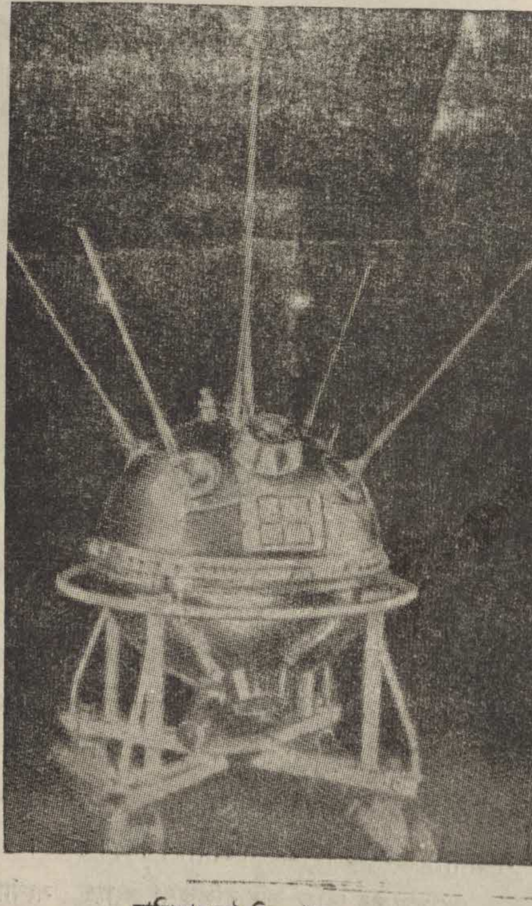
ও রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যাত্রার কথা ভাবতে লাগলেন। একাদশ শতাব্দীতে চীনে রকেট ব্যবহৃত হয়। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার K. E Tsiolkovsky-র নির্মিত রকেট শূন্যে বহুদূর পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হয়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন বিজ্ঞানী গডার্ডের রকেট ঘণ্টায় ১,১২৭ কিলোমিটার বেগে ২১,৩৩৬০০০ মিটার পর্যন্ত উঠতে সমর্থ হয়েছিল।

গডার্ড পরীক্ষা করে দেখলেন, শুকনো জ্বালানির বদলে তরল জ্বালানি ব্যবহার করলে রকেটের গতি-বেগ বেড়ে যায়।

কিন্তু এইভাবে ছুড়লে রকেট বেশী দূর যেতে পারবে না, চার-পাঁচ হাজার কিলোমিটার যাবার পরেই থেমে যাবে। কাজেই চাঁদে যেতে হলে রকেট-কে অন্ততঃ ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার যাবার মতো শক্তি অর্জন করতে হবে। সেইজন্য রিলে রেসের ন্যায় পর্যায়ক্রমে রকেট পাঠাবার ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত নিলেন বিজ্ঞানীরা। এই ব্যবস্থায় ভালো ফল পাওয়া গেল। একটা রকেট নির্দিষ্ট কিছু দূর গিয়ে খসে পড়বে। তার আগে তার মধ্য থেকে অন্য একটি রকেট বেরিয়ে পড়বে। সেটাও কিছু দূর গিয়ে খসে পড়বে। সেই সময়ে আর একটি রকেট বেরিয়ে আসবে। সব রকেটেই আগে থেকে জ্বালানি ভরে দেওয়া হবে। এইভাবে রিলে প্রথা চালু হওয়ার ফলে রকেটের সাহায্যে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

॥ মনুষ্যসৃষ্ট প্রথম উপগ্রহ স্পুটনিক ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়া দুই দেশই মহাশূন্যে রকেট প্রেরণের চেষ্টা করতে শুরু করে। প্রথম কৃতকার্য হয় সোভিয়েট রাশিয়া। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা মহাকাশে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি প্রেরণ করে তার নাম স্পুটনিক-১। এজন্য রিলে প্রথার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই কৃত্রিম উপগ্রহটির ওজন ছিল ৮৪ কিলোগ্রাম।



রাশিয়ার সৃষ্ট শিশু চাঁদ

ব্যাস ছিল ৬০ সেন্টিমিটার। আকার ছিল গোল। এতে চারটি আকাশ-তার (aerial) ছিল। একটি রেডিও ট্রান্সমিটারও এতে ছিল। স্পুটনিকটির গতিপথ ছিল উপবৃত্তাকার। বেশী পক্ষে ৯৪৬ কিলোমিটার এবং কম পক্ষে ২২৯ কিলোমিটার দূর দিয়ে স্পুটনিকটি এক সেকেণ্ডে ৮ কিলোমিটার (ঘণ্টায় প্রায় ২৯ হাজার কিলোমিটার) বেগে ৯৬ মিনিটে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। স্পুটনিকটি পুরাপুরি পৃথিবীর আবহাওয়া ছেড়ে উপরে চলে

যায় নি। তার ফলে বাতাসের সংঘর্ষে স্পুটনিকটি



স্পুটনিক-১

বা শিশুচাঁদটি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারী পুড়ে ধ্বংস হয়ে যায়।

॥ মার্কিন এক্সপ্লোরার ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা চুপ করে বসেছিলেন না। তাঁরা অল্প দিনের মধ্যে তাঁদের নির্মিত এক্সপ্লোরার-১ কে মহাকাশে পাঠালেন।

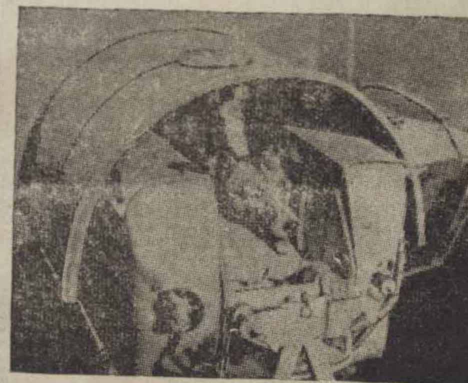
এর পর থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া একের পর এক কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে পাঠাতে থাকলেন। সেই সব উপগ্রহে নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বসানো হল। সে সবের দ্বারা নানা তথ্য পাওয়া যেতে থাকল।

॥ মহাকাশে জীবন্ত প্রাণী ও মানুষ ॥

শুধু যন্ত্রপাতি পাঠিয়ে বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট রইলেন না। তাঁরা রকেটে করে জীবন্ত প্রাণী ও মানুষ পাঠাবার চেষ্টা করতে থাকলেন।

রুশ বিজ্ঞানীরা প্রথম লাইকা বলে একটা কুকুরকে রকেটে পুরে মহাকাশে পাঠালেন। বলা যেতে পারে লাইকাই প্রথম মহাকাশযাত্রী।

লাইকা অবশ্য পৃথিবীতে ফিরে আসতে পারে নি। রকেটটি ফিরে আসতে না পারায় লাইকার মৃত্যু হয়।



প্রথম মহাকাশযাত্রী লাইকা

তারপর দুটি বানরকে মহাকাশ-যানে করে পাঠানো হল। তাতে পোকামাকড়, গাছপালা প্রভৃতিও ছিল।

এতেও বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট রইলেন না। তাঁরা মহাশূন্যে মানুষকে প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল রুশ বিজ্ঞানীরা ভোস্টক-১ নামক মহাকাশ-যানে করে মেজর য়ুরি গ্যাগারিনকে পাঠালেন। তিনিই প্রথম মানুষ মহাকাশযাত্রী।

গ্যাগারিন (Major Yuri Gagarin, ১৯৩৪-৬৮) তাঁর মহাকাশযানে চড়ে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করলেন। যাত্রার ১০৮ মিনিট বাদে প্যারাশুটে করে তিনি পৃথিবীতে নেমে এলেন।

মহাকাশে প্রেরণের সময় রকেটের ওজন ছিল ৪০০ টন। ভোস্টক-১-র ওজন ছিল প্রায় পাঁচ টন। ভোস্টক-১ পৃথিবী থেকে ৩২৭ কিলোমিটার পর্যন্ত উঁচু দিয়ে ঘুরেছিল। গ্যাগারিনই প্রথম ভারশূন্য অবস্থায় মহাকাশে অবস্থান করেন।

তাঁর মহাকাশযান ৮৯ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। দুঃখের বিষয়,



য়ুরি গ্যাগারিন

এই অসমসাহসী বীর য়ুরি গ্যাগারিন ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

।। মহাকাশে যাত্রার নানা বিপত্তি ।।

মহাকাশযানে করে যাত্রা ট্রেনে করে যাত্রা করার মতো সহজ নয়। মহাকাশে খুব উঁচু স্থানে বাতাস নেই। কাজেই বাতাসের চাপ নেই। বাতাসের চাপ না থাকায় দেহমধ্যস্থ রক্তের আয়তন ফেঁপে উঠবে। শরীর ফুলে উঠে মৃত্যু হবে।

উপরে তাপ খুব কম। সেই তাপে বরফ জমে ইটের চেয়ে বেশী শক্ত হয়ে যায়। সেই ঠাণ্ডায় মানুষের শরীর জমে শুকিয়ে মচমচে হয়ে যাবে।

মহাকাশে এত অন্ধকার যে তাতে মানুষ রীতিমতো অস্বস্তি অনুভব করবে। ধাবমান উল্কার সংঘর্ষে মহাকাশযান ভেঙ্গে, তুবড়ে ফুটো হয়ে যেতে পারে। কস্‌মিক রে বা ব্যোমরশ্মি শরীরের ভীষণ ক্ষতি করতে পারে। শ্বাসগ্রহণে অসুবিধা, নিঃশ্বাস-



স্পেস স্যুট-পরা মহাকাশযাত্রী

নির্গত কার্বন ডাই-অকসাইডের ভয়াবহ বিষময় প্রতিক্রিয়া, খাদ্যসমস্যা প্রভৃতি দ্বারা মানুষকে রীতি-মতো বিব্রত হতে হবে।

এই সব নানা অসুবিধা জয় করার জন্য বিজ্ঞানীরা একরকম পোশাক বার করলেন, যার নাম 'স্পেস স্যুট' (space suit)। সেই পোশাক খুবই মজবুত, সেটা পরে থাকলে বাইরের চাপ ও তাপ কোন ক্ষতি করতে পারে না। প্রোটিন, শ্বেতসার ও চর্বিজাতীয় উপাদান, প্রয়োজনীয় ভিটামিনে সমৃদ্ধ খাদ্য খুব অল্প জায়গায় আঁটে এমন পাত্রে রাখার ব্যবস্থা হল। ফলের রস, দুধ প্রভৃতি খুব ঘন করে মহাকাশযানে দেওয়া হল।



পাপেল-পোপোভিচ

॥ মার্কিনী অভিযান ॥

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে অ্যালান শেপার্ড নামে এক মার্কিনী ফ্রীডম-৭ নামক মহাকাশযানে করে ১৮৫ কিলোমিটার পর্যন্ত উপরে উঠে নীচে নেমে এলেন। তার পর ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে ফেব্রুয়ারি জন গ্লেন নামে এক মার্কিনী ফ্রেণ্ডশিপ-৭-এ করে তিনবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করলেন। তাঁর মোট সময় লেগেছিল ৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট।

॥ রুশ অভিযান ॥

১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই আগস্ট রুশ মহাকাশযান ভোস্টক-২ হারমান টিটভের পরিচালনায় ১৭ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করল। রুশ মহাকাশযাত্রী নিকোলায়েভ ৬৪ বার, পাপেল পোপোভিচ ৪৮ বার, বাই-কোভ্স্কি ৮১ বার, ভোস্কো



কোমারভ, ইয়েগোরভ ও ফিয়োক্ তিস্তভ

মহাকাশযানে করে কোমারভ, ইয়েগোরভ ও ফিওক্তিস্তভ ১৬ বার, লিওনভ ও বেলিয়াএভ ১৭ বার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করলেন।

রুশ চন্দ্রযান সোয়ুজ (Soyuz)-১১ চাঁদ সম্বন্ধে বহু তথ্য সংগ্রহ করে। এর অভিযাত্রী ছিলেন প্যাটসায়েভ, গেয়র্গি ডবরোভল্স্কি ও ভল্যাডিস্লাভ ভল্কভ।

প্রথম ও একমাত্র মহিলা মহাকাশযাত্রিণী ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভা (Valentina Vladimirovna Tereshkova Nikolayeva)। তিনি ৪৮ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।



প্যাটসায়েভ, গেয়র্গি ডবরোভল্স্কি ও ভল্যাডিস্লাভ ভল্কভ



ভ্যালেন্টিনা তেরেশকোভাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন এ নিকোলায়েভ

॥ মার্কিন মহাকাশযাত্রী ॥

মার্কিন মহাকাশযাত্রী গ্লেন ৩ বার, কার্পেন্টার ৩ বার, শিরা ৬ বার, কুপার ১২ বার, গ্রিসম ও ইয়ং ৩ বার, ম্যাকডিভিট ও হোয়াইট ৬২ বার, কুপার ও কনরাড ১২০ বার, বোরম্যান ও লোভেল ২০৬ বার, শিরা ও স্ট্যাফোর্ড ১৫ বার, আর্মস্ট্রং ও স্কট ৬'৬ বার, ইয়ং ও কলিন্‌স্ ৪৩ বার, কনরাড ও গর্ডন ৪৪ বার, লোভেল ও অলড্রিন ৬০ বার মার্কারি ও জেমিনি মহাকাশযানে করে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া কতবার যে মহাশূন্যে মহাকাশযান পাঠিয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

॥ মহাকাশযাত্রীদের বিচিত্র কাণ্ড ॥

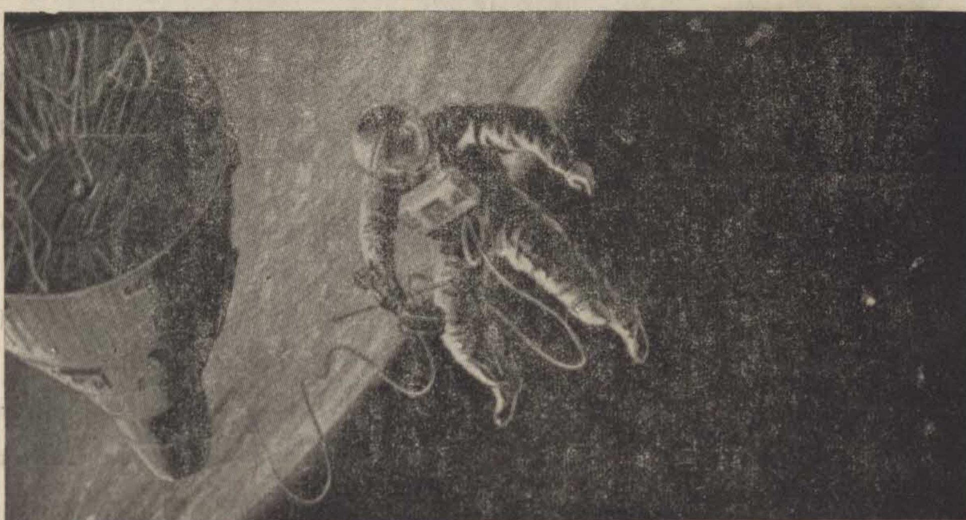
দু'দেশের বিজ্ঞানীরা নানাভাবে মহাকাশযান প্রেরণ করে বিচিত্র সব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। মার্কিন বিজ্ঞানীরা এক সঙ্গে কখনও ছুটি, কখনও তিনটি মহাকাশযান মহাশূন্যে পাঠিয়ে সেগুলির মিলন ঘটালেন। রুশ মহাকাশযাত্রী প্রথম মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে মহাশূন্যে ভ্রমণ করলেন। অত উর্ধ্বে মাধ্যাকর্ষণ নেই। কাজেই তিনি পড়ে গেলেন না। মার্কিন মহাকাশযাত্রী সারনানও অবলম্বনহীন অবস্থায় মহাশূন্যে বেড়িয়েছেন। তিনি প্রায় ২ ঘণ্টা মহাশূন্যে ছিলেন।

রুশ ও মার্কিন মহাকাশযাত্রীরা এক মহাকাশযান থেকে বেরিয়ে অন্য মহাকাশযানে উঠেছেন। এ যেন 'গাড়িবদল'।

এত সব করার পরও রুশ ও মার্কিন বিজ্ঞানীরা চুপ করে বসে ছিলেন না। তাঁরা চাঁদে মহাকাশযান প্রেরণ করলেন। চাঁদের অপর পিঠের ছবি তুললেন। চাঁদকে পরিক্রমা করলেন।

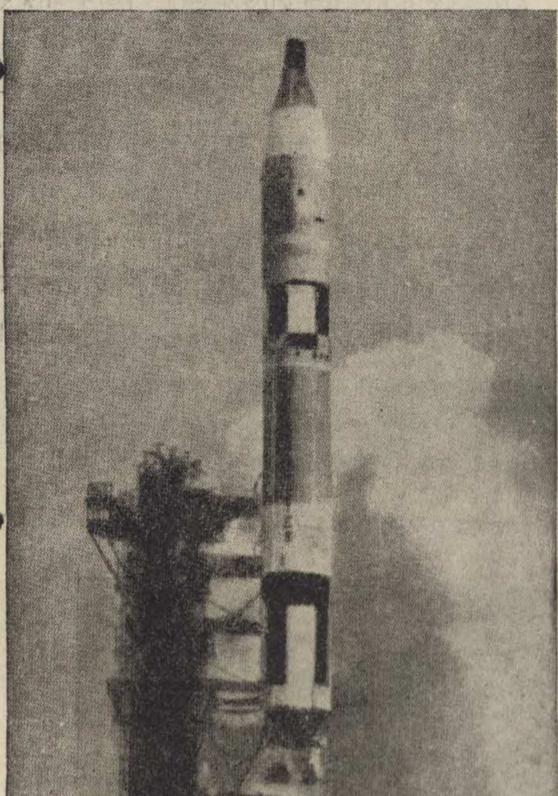
॥ চাঁদের দিকে অতিকায় রকেট ॥

১৯৬৮ সালের ২১শে ডিসেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেপ কেনেডি থেকে স্যাটার্ন-৫ নামে এক অতিকায় রকেট চাঁদের দিকে পাঠানো হল। এই



এক মহাকাশযাত্রীর মহাশূন্যে অবলম্বনহীন অবস্থায় ভ্রমণ

রকেটটি ছিল ত্রিশ তলা বাড়ির সমান উঁচু, ওজন ছিল ৩৩৯৩ টন। এতে কয়েক শ' টন তরল হাইড্রোজেন ও তা জ্বালাবার উপযোগী তরল অক্সিজেন ছিল।



কেপ কেনেডি থেকে মার্কিন রকেটের মহাশূন্যে যাত্রা

রকেটের মাথায় ছিল মহাকাশযান অ্যাপলো-৮। তিনটি রকেট-খোলস তিনবার ধাক্কা দিয়ে প্রচণ্ড গতিবেগ সৃষ্টি করল এবং একে একে মহাশূন্যে খসে পড়ল। অ্যাপলো-৮ বিপুল বেগে ছুটতে ছুটতে চাঁদের রাজ্যে প্রবেশ করল।

অ্যাপলো-৮-এর মার্কিন অভিযাত্রী বোরম্যান, লোভেল আর অ্যাণ্ডার্স। তাঁরা চাঁদ থেকে ৯৬'৫৬০২০ কিলোমিটার দূরত্বে থেকে প্রতি ২ ঘণ্টায় চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে থাকলেন এবং অসংখ্য ছবি তুলে টেলিভিশনে পৃথিবীতে পাঠাতে থাকলেন। চাঁদের উলটা দিকের অসংখ্য ছবি তাঁরা পাঠালেন। তারপর তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে এলেন। সময় বুঝে তাঁরা প্যারাশুট খুলে প্রশান্ত মহাসাগরের জলে নেমে পড়লেন। প্রথমে তাঁরা উঠলেন রবারের ভেলায়, পরে জাহাজে উঠে দেশে ফিরে এলেন।

॥ চাঁদের ভেলা ॥

আটটা পায়াযুক্ত একটা যন্ত্র তৈরি করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা নাম দিলেন লুনার এক্সকার্শন মড্যুল (Lunar Excursion Module—L. E. M.) বা চাঁদের ভেলা। লুনার মড্যুলকে চাঁদের বুকে নামিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো তাঁদের উদ্দেশ্য। চাঁদের ভেলা থেকে নানা পরীক্ষার পর আবার তাকে নিয়ে ফিরে আসার পরিকল্পনা করা হল।

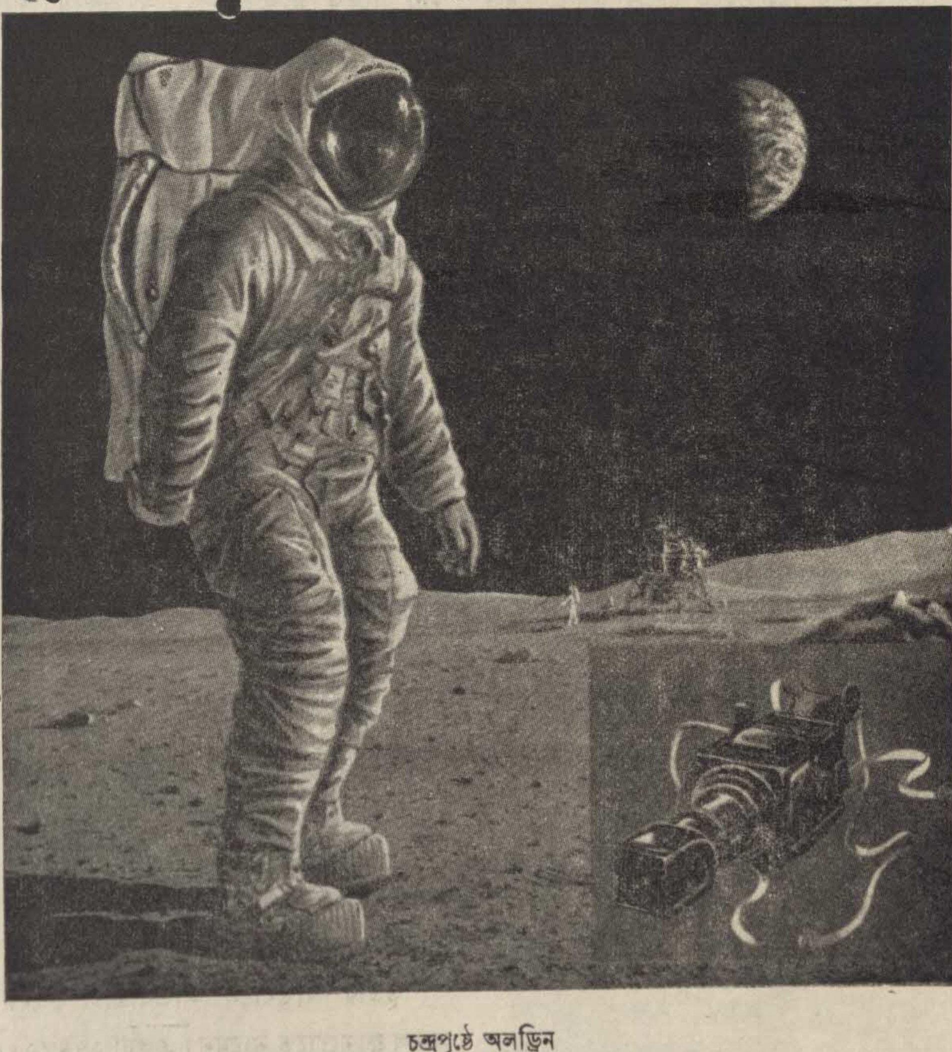
মহাকাশযানটির যাত্রী হলেন ইয়ং, সারনান ও স্ট্যাফোর্ড। ইয়ং মহাকাশযানেই থেকে গেলেন। চাঁদের ভেলায় করে সারনান ও স্ট্যাফোর্ড চাঁদের দশ মাইল দূর থেকে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন। পরে মহাকাশযানে উঠে এসে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

॥ চাঁদের মাটিতে প্রথম পদার্পণ ॥

সব দেখা হয়ে গেছে। এইবার অতি সন্তর্পণে

চাঁদের মাটিতে নামতে হবে। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই মহাকাশযান অ্যাপলো-১১ যথাসময়ে কেপ কেনেডি থেকে যাত্রা করল ৯২ হাজার রেল এঞ্জিনের শক্তি নিয়ে। যাত্রী হলেন নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্‌স্।

চাঁদের মাটি কোথাও ময়দার মতো মিহি, কোথাও চারিদিকে ছোট ছোট নুড়ি ছড়ানো রয়েছে, কোথাও ছোট ছোট গর্ত। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন একস্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকা পুতলেন। কতকগুলি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি বসিয়ে দিলেন। তার



চন্দ্রপৃষ্ঠে অলড্রিন

কলিন্‌স্ মূল মহাকাশ যান চালাতে থাকলেন। নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন চাঁদের ভেলায় করে চাঁদে নেমে গেলেন। পৃথিবীর লোক টেলিভিশনে সব দৃশ্য দেখতে থাকলেন।

পর বেশ কিছু ছোট বড় চাঁদের পাথর কুড়িয়ে নিলেন।

তাঁরা ঘণ্টা দুই-এরও কিছু বেশী সময় চাঁদের পিঠে পায়চারি করলেন। প্রায় ২১ ঘণ্টা ৩৬ মিনিট

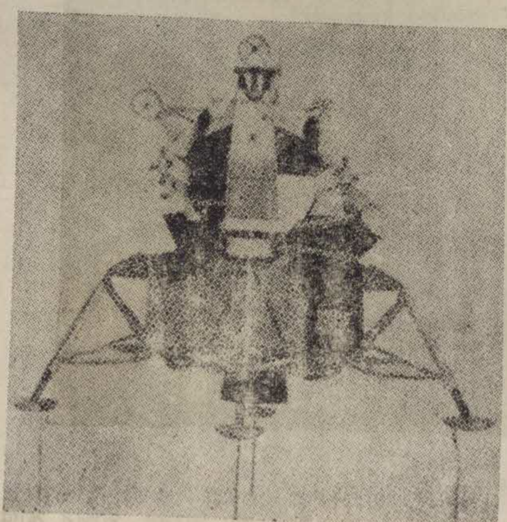
চাঁদে কাটাবার পর তাঁরা লুনার মড্যুলে উঠে চন্দ্রপৃষ্ঠ ত্যাগ করলেন।

কলিন্‌স্ একা মূল মহাকাশযান চালিয়ে চাঁদের চারদিকে পাক খাচ্ছিলেন। চাঁদের ভেলা থেকে আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন মূল মহাকাশযানে উঠে পড়লেন। চাঁদের ভেলাকে মহাশূন্যে ছেড়ে দেওয়া হল। সেটি কোথায় হারিয়ে গেল, তা কারো জানা নেই।

ফিরে এলেন তিন মহাকাশযাত্রী পৃথিবীতে। তাঁদের সঙ্গে কোন অতিসূক্ষ্ম অদৃশ্য জীবাণু বা ভাইরাস এসে গেছে কিনা, তা পরীক্ষা করতে তাঁদের ২১ দিন এক ঘরে বন্দী থাকতে হল। পরীক্ষার পর যখন দেখা গেল, কোন জীবাণু বা ভাইরাস তাঁদের সঙ্গে চাঁদ থেকে আসে নি তখন তাঁদের ওই ঘর থেকে বাইরে আসতে দেওয়া হল।

॥ দ্বিতীয় বার চাঁদে ॥

প্রথম অভিযানের প্রায় চার মাস পরে রিচার্ড



চন্দ্রপৃষ্ঠে চন্দ্রযান

গর্ডন, চার্লস কনরাড ও অ্যালান বীন অ্যাপলো-১২ মহাকাশযানে চড়ে চাঁদের দিকে যাত্রা করলেন।

রিচার্ড গর্ডন মূল মহাকাশযান চালাতে থাকলেন। কনরাড ও বীন চাঁদের ভেলায় করে চাঁদে নেমে গেলেন। এবার অভিযাত্রীরা চাঁদে রইলেন সাড়ে একত্রিশ ঘণ্টা।

প্রথমবারের অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিয়েছিলেন মাত্র ১৯ পাউণ্ড নুড়ি-পাথর, এবারকার অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিলেন ১২৮ পাউণ্ড নুড়িপাথর। তার পর নির্বিঘ্নে কনরাড ও বীন মূল মহাকাশযানে ফিরে এলেন। গর্ডন মূল মহাকাশযান চালিয়ে দিলেন। তার পর তাঁরা পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

॥ ব্যর্থ অভিযান ॥

অ্যাপলো-১৩ মহাকাশযান তৃতীয় বার চাঁদে যাবার জন্য যাত্রা করে। কিন্তু মূল মহাকাশযানে এক বিস্ফোরণ হয়। তার ফলে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দেয়। প্রায় দুই তৃতীয়াংশ অতিক্রম করেও তাই অভিযাত্রীদের পৃথিবীর বুকে ফিরে আসতে হয়। এত সব ঝামেলা বিপদ-আপদের মধ্যেও অভিযাত্রীদের মনোবল অক্ষুণ্ণ ছিল। চাঁদ ও মহাকাশ থেকে পৃথিবীর অসংখ্য আলোকচিত্র গ্রহণ করে তাঁরা নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এলেন।

॥ তৃতীয় ও চতুর্থ অভিযান ॥

এর পর শুরু হল তৃতীয় ও চতুর্থ অভিযান। অ্যাপলো-১৪ ও অ্যাপলো-১৫ মহাকাশযানে করে অভিযাত্রীরা চাঁদের দেশে যাত্রা করলেন।

তৃতীয় অভিযানে অভিযাত্রীরা চাঁদের পার্বত্য অঞ্চল ফ্রা মরোতে নামেন। একটা ২৭৪·৩২০০ মিটার উঁচু মৃত আগ্নেয়গিরির পাশে নেমে অভিযাত্রীরা তাঁদের নির্ধারিত কাজ শুরু করেন। মালপত্র বইবার জন্য একটা হাতে-টানা রিকশা তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন। তাতে অবশ্য অভিযাত্রীদের বড় বেশী

পরিশ্রম হয়েছিল। নানা কারণে তৃতীয় অভিযানের অভিযাত্রীরা তাঁদের নির্ধারিত সব কাজ শেষ করতে পারেন নি।

চতুর্থ অভিযানে অভিযাত্রীরা ৪,৫৭২ মিটার উঁচু অ্যাপেনাইন পাহাড়ের নীচে একটা ৩,৬৫৭ মিটার গভীর খাদের ধারে নামলেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন ঘোরাফেরা করার সুবিধার জন্য একটা বিদ্যুৎ-চালিত মোটরগাড়ি যার নাম লুনার রোভার। তাতে



জন ইয়ং, চার্লস ডিউক ও টমাস ম্যাটিংলি

করে অভিযাত্রীরা প্রায় ২৫ কিলোমিটার জায়গায় অল্প সময়ে ও কম পরিশ্রমে ঘুরে বেড়ালেন। অন্যান্য বারের তুলনায় চতুর্থ অভিযানে অভিযাত্রীরা চাঁদ সম্বন্ধে অনেক বেশী তথ্য সংগ্রহ করলেন।

॥ পঞ্চম অভিযান ॥

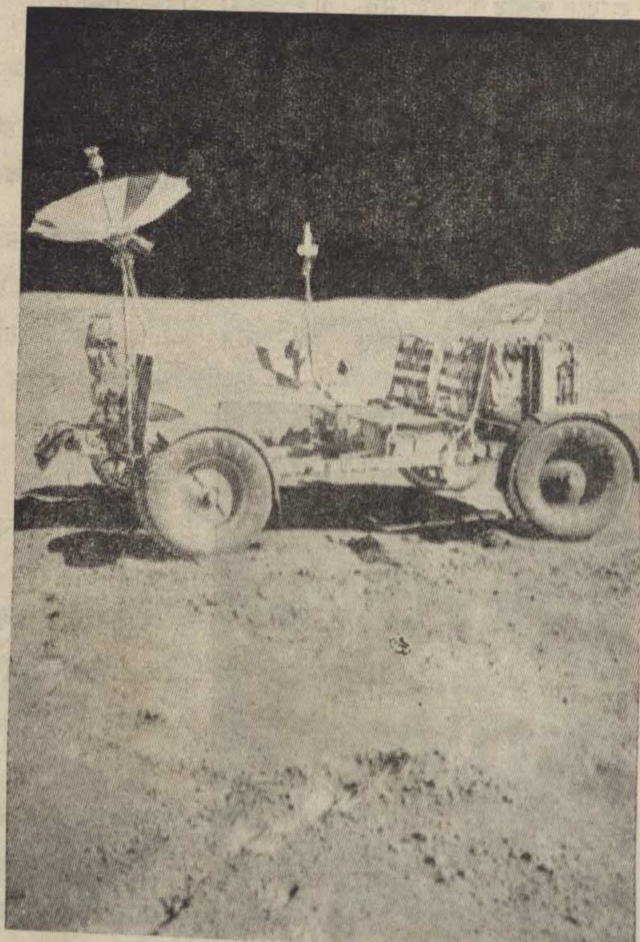
১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে অ্যাপলো-১৬ মহাকাশযানে করে জন ইয়ং, চার্লস ডিউক ও টমাস ম্যাটিংলি চাঁদের দেশে যাত্রা করলেন।

ম্যাটিংলি মূল মহাকাশযান চালাতে থাকলেন। ইয়ং ও ডিউক চাঁদের ভেলায় করে চাঁদে নেমে পড়লেন। তাঁরা সঙ্গে নিয়েছিলেন একটা জীপ গাড়ি। তাতে করে তাঁরা চাঁদের উপরে বহুদূর পর্যন্ত ঘোরাফেরা করলেন।

নেমেছিলেন 'ডেকার্টে' অঞ্চলে। তার চারদিকে অসংখ্য মৃত আগ্নেয়-গিরির জ্বালামুখ (crater)। সারা অঞ্চলটাই উঁচুনীচু, ছোট বড় পাথরে ভরতি। তাঁরা জীপে করে অতি সন্তর্পণে বহু দূর পর্যন্ত জায়গায় ঘোরাফেরা করলেন।

এবার অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিলেন প্রায় তিন মন পাথর। চাঁদের পিঠে বসালেন বেশ কয়েকটি স্বয়ং-ক্রিয় নানা ধরনের যন্ত্রপাতি। একটা অতিবেগুনী রশ্মিতে আলোকচিত্র তুলতে সফল একটা ক্যামেরা ও একটা বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র চাঁদের পিঠে তাঁরা বসিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি মূল্যবান্ যন্ত্র পায়ের ঠোক্কর লেগে অকেজো হয়ে যায়।

এবারের অভিযানে অভিযাত্রীরা সঙ্গে নিয়েছিলেন কয়েক কোটি জীবাণু ও ভাইরাস, চিংড়ি মাছের ডিম, ফলের বীজ, গাছের ভ্রূণ ইত্যাদি। সেগুলি চাঁদ থেকে ফেরার সময় ম্যাটিংলি খোলা



লুনার রোভার। অ্যাপলো ১৫, ১৬ ও ১৭-র মহাকাশযাত্রীরা এই চন্দ্রযান ব্যবহার করেছিলেন। ছাতার ন্যায় বস্তুটি অ্যানটেনা।

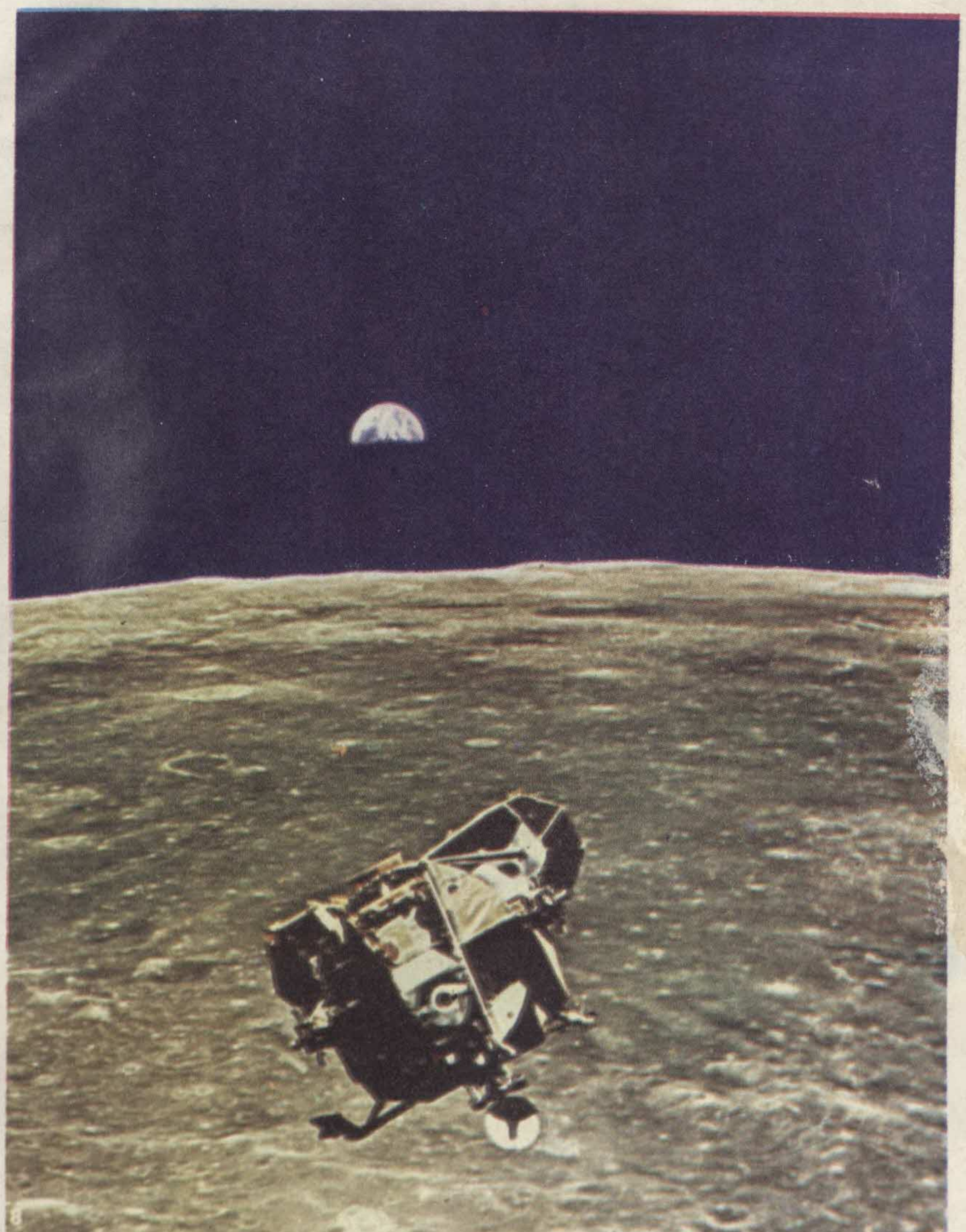
মহাকাশে রেখে দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, কসমিক রে-তে সে-সবের উপর কীরকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তা দেখা।

॥ ষষ্ঠ অভিযান ॥

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাপলো-১৭ শেষবারের মতো চাঁদের দেশে যাত্রা করে। এই অভিযান সম্পূর্ণ সফল হয়। এবারে অভিযাত্রীরা ২৫৩ পাউণ্ড পাথর সঙ্গে নেন। আগের কয়েক বারের তুলনায় বেশী আলোকচিত্র তুলে আনেন, ৭৪ ঘণ্টা ৫৯½ মিনিট চাঁদে কাটান। এবারে সারনান ও স্মিট চাঁদে নামেন। পৃথিবীর মানুষ টেলিভিশনে তাঁদের ক্রিয়াকলাপ ভালো ভাবে দেখতে পায়। আপাততঃ মার্কিন বিজ্ঞানীদের আর চাঁদে যাবার পরিকল্পনা নেই।

॥ রুশ অভিযান ॥

এ পর্যন্ত কোন রুশ অভিযাত্রী চাঁদের পিঠে নামেন নি। তবে তাঁদের অন্য ধরনের প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।



চাঁদ থেকে দৃশ্যমান পৃথিবী

পূর্বপৃষ্ঠার ছবি দেখে মনে হচ্ছে, আকাশে অর্ধচন্দ্র বিরাজিত। পৃথিবী থেকে সেই চাঁদকে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু যাকে অর্ধচন্দ্র বলে মনে করা হচ্ছে, তা চাঁদ নয়। যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, সেই পৃথিবী।

চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মহাশূন্যে পৃথিবীকে চাঁদের মতো দেখাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে, একটি চন্দ্রযান পৃথিবী থেকে যাত্রা করে চাঁদের বুকে নামবার জন্যে ছুটে চলেছে। সামনে প্রসারিত চন্দ্রপৃষ্ঠ, যেখানে চন্দ্রযানটি নামবে। আর আকাশে দৃশ্যমান পৃথিবী, যা থেকে যাত্রা করে চন্দ্রযান চাঁদের দিকে ছুটে এসেছে।

রুশ বিজ্ঞানীরা বেতারের সাহায্যে চাঁদের বুকে মহাকাশযান নামিয়ে দিয়েছেন। কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে সেই মহাকাশযানকে দিয়ে অনেক কাজ করিয়ে নিয়েছেন।

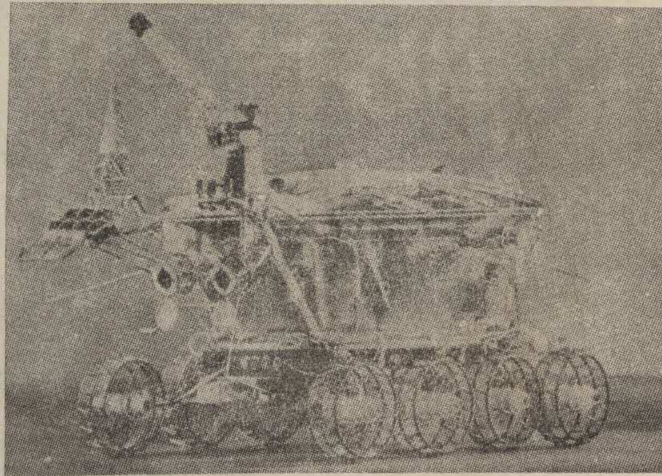
তাঁরা একটা আটচাকার স্বয়ংক্রিয় গাড়ি চাঁদের বুকে নামিয়ে দিয়েছেন। তার নাম 'লুনোখোদ'। সেই গাড়িতে করে শক্তিশালী টেলিভিশন যন্ত্র ও নানা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি পাঠানো হয়েছিল।

'লুনোখোদ' সৌর ব্যাটারির সাহায্যে চালিত হয়েছে।

॥ চাঁদ সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ ॥

বহু বৎসর ধরে নানাভাবে অভিযান চালিয়ে মার্কিন ও রুশ বিজ্ঞানীরা চাঁদ সম্বন্ধে অনেক নূতন তথ্য সংগ্রহ করেছেন।

কোন কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, পৃথিবী থেকেই চাঁদের সৃষ্টি। পৃথিবীর খানিকটা অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদ তৈরী হয়েছে। তার প্রমাণ, পৃথিবীর প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগর। পৃথিবীর অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যখন চাঁদের সৃষ্টি হয়, তখন পৃথিবীর যে-অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাই-ই প্রশান্ত মহাসাগর ও

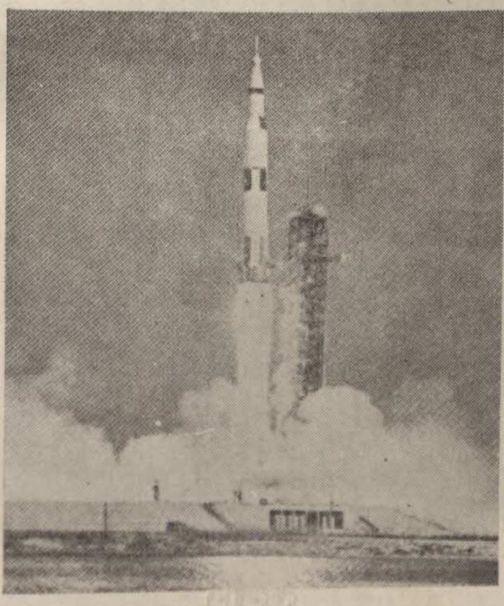


লুনোখোদ

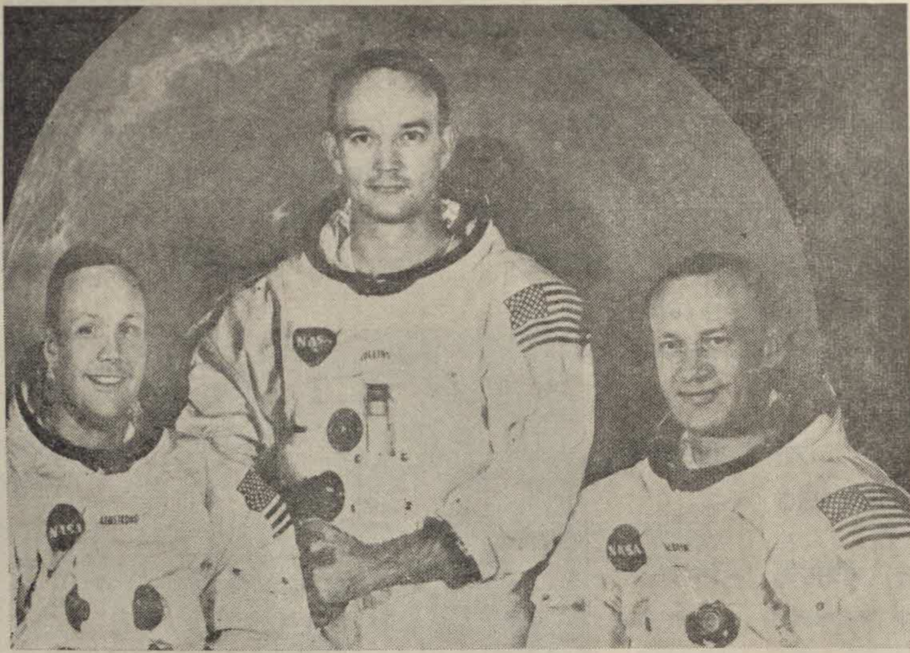
আটলান্টিক মহাসাগর। কিন্তু এখন কোন কোন বিজ্ঞানী বলছেন, এ কথা ঠিক নয়।

চাঁদ হয়তো মহাকাশের অন্য কোথাও ছিল। ঘুরতে ঘুরতে পৃথিবীর কাছাকাছি এসে পৃথিবীর আকর্ষণে বন্দী হয়ে তার চারিদিকে ঘুরছে।

কেহ বলেন, পৃথিবী ও চাঁদের একই সময়ে সৃষ্টি হয়। কেহ বলেন, চাঁদের সৃষ্টি পৃথিবী সৃষ্টির কয়েক কোটি বছর আগে। অবশ্য, এ সব তথ্য এখনও বিশিষ্ট বিজ্ঞানী-মহলে পূর্ণ স্বীকৃতি পায় নি। বরং পূর্বের ধারণা যে পৃথিবী থেকে চাঁদের সৃষ্টি তাই-ই এখনও অধিকাংশ বিজ্ঞানীর অভিমত।



স্যাটার্ন-৫ কর্তৃক অ্যাপলো-১১কে ঊর্ধ্বে ক্ষেপন



নীল আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিন্‌স্‌ ও এডুইন অলড্রিন

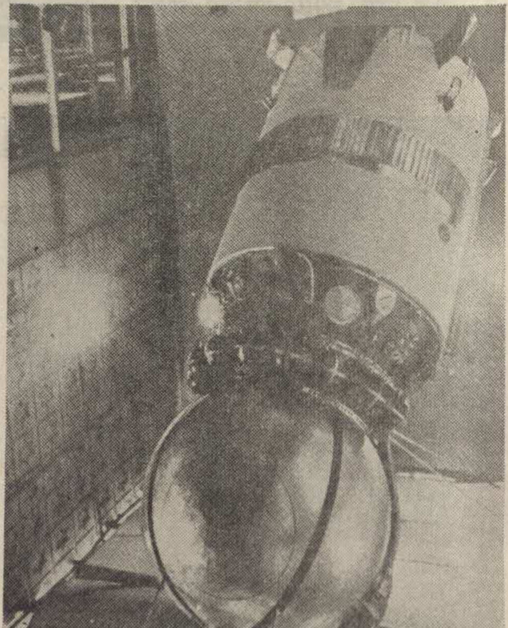
॥ অন্যান্য দেশের প্রচেষ্টা ॥

মহাকাশে রকেট পাঠানো এখন শুধু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি বহু দেশ থেকেই মহাকাশে রকেট পাঠানো হচ্ছে।

॥ ভারতের প্রচেষ্টা ॥

ভারতবর্ষ কয়েক বছর ধরেই শ্রীহরিকোটা থেকে মহাকাশে রকেট পাঠিয়ে আসছে। এখন ভারতীয় অভিযাত্রীর মহাকাশে যাবার চেষ্টা চলছে। ১৯৮৪ সালের মার্চ মাসে সম্ভবতঃ একজন ভারতীয় মহাকাশযাত্রী মহাকাশে পাড়ি দেবেন।

ভারত-রুশ যৌথ মহাকাশ অভিযানে উইং কমাণ্ডার আর মালহোত্রা ও স্কোয়াড্রন লীডার রাকেশ শর্মার মধ্যে একজনকে মহাকাশে প্রেরণ

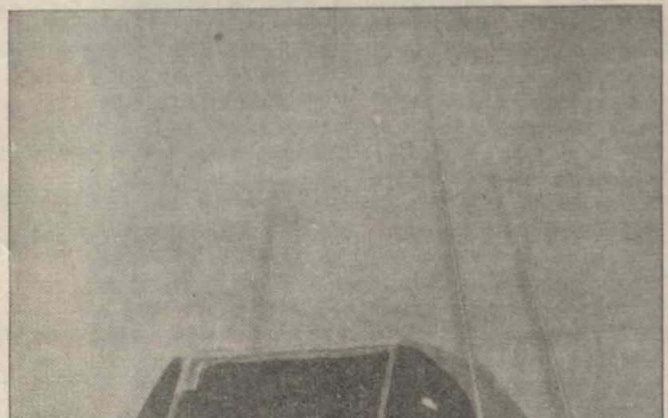


ভেনেরা-৭

করা হবে। দুজনেরই প্রবল তত্ত্বগত প্রশিক্ষণ চলছে।

নয়াদিল্লীর ভারতীয় বিজ্ঞান আকাদেমি ও বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স বিস্তারিত কর্মসূচী ঠিক করছেন। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে প্রস্তাবিত ভারতীয় মহাকাশযাত্রীদের প্রকৃত প্রশিক্ষণ শুরু হবে। সেই সময়ে শূন্য মহাকর্ষ-শক্তির অবস্থায় কাজ করার শিক্ষা দেওয়া হবে। অবশ্য, ইতিমধ্যেই বিমানে ও চাপকক্ষে মালহোত্রা ও রাকেশ শর্মার এক দফা ট্রেনিং হয়ে গেছে।

নির্বাচিত ভারতীয় মহাকাশযাত্রীর সঙ্গে রুশ অভিযাত্রীরা থাকবেন। সয়ুজ-টি (Soyuz-T) তে করে তাঁরা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করবেন। পরে সেই মহাকাশযান স্যালুট-৭ মহাকাশ কমপ্লেক্সের সঙ্গে মিলিত হবে।



ভারতের প্রথম ফলিত গবেষণামূলক উপগ্রহ রোহিণী

সম্প্রতি হরিকোটা থেকে রোহিণী মহাকাশে নিক্ষিপ্ত হয়ে নির্দিষ্ট পথে ঘুরছে এবং সংকেত ও আলোকচিত্র সাফল্যের সঙ্গে পাঠাচ্ছে।

॥ অন্য গ্রহে অভিযান ॥

চাঁদে গিয়েই পৃথিবীর মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা শেষ হয়ে যায় নি। অন্য গ্রহে, বিশেষ করে মঙ্গল ও শুক্র গ্রহে যাবার জন্যে বিজ্ঞানীরা নানা পরিকল্পনা তৈরি করছেন। অবশ্য, তাঁদের কোন পরিকল্পনাই প্রকৃত কাজের উপযোগী এখনও হয় নি।

সৌরজগতের সকল গ্রহের মধ্যে মঙ্গল গ্রহে মানুষের পদার্পণকে তাঁরা বেশী গুরুত্ব দিয়েছেন। মঙ্গল গ্রহে প্রাণী বা উদ্ভিদ্ আছে বলে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন নি। অত দূরে যেতে গেলে যে-ধরনের শক্তিশালী মহাকাশযানের প্রয়োজন তা এখনও তাঁরা তৈরি করতে পারেন নি।

মানুষ অভিযাত্রী মঙ্গল বা শুক্রের দিকে যাত্রা করতে না পারলেও শক্তিশালী রকেট মঙ্গল,

শুক্র, বৃহস্পতি, সূর্য প্রভৃতির দিকে পাঠানো হয়েছে।

মার্কিন রকেট মেরিনার-২ ১৯৬২ সালের ১৭ই আগস্ট শুক্রের দিকে প্রেরিত হয়। রকেটটি ঐ বৎসরের ১৪ই ডিসেম্বর শুক্রের ৩৫ হাজার কিলো-মিটার দূর দিয়ে চলে যায়। রকেটটিতে স্থাপিত বহু স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে পৃথিবীতে বসেই বিজ্ঞানীরা শুক্র সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানতে পেরেছেন। তাঁরা জানতে পেরেছেন শুক্রের পৃষ্ঠতাপ ৪৫০° সেন্টিগ্রেড। শুক্রে পৃথিবীর ন্যায় চুম্বকের ক্ষেত্র নেই। রুশ বিজ্ঞানীরা শুক্র গ্রহে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রপাতি সমেত একটি রকেটকে নামিয়ে দিয়েছেন। সেই সব যন্ত্রপাতি থেকে শুক্র সম্বন্ধে নানা কথা জানা গিয়েছে।

॥ শিশুগ্রহ ॥

এই সব মহাকাশযান বা রকেটের একটি তো সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। সেটি তাহলে শিশু গ্রহ। আরও রকেট সূর্যের দিকে পাঠানো হয়েছে। মার্কিন ও পশ্চিম জার্মানির যন্ত্রপাতিসহ একটি রকেট সূর্যের প্রায় ৪ কোটি কিলোমিটার দূরে যেতে সমর্থ হয়েছে।

॥ নূতন নূতন তথ্য ॥

রকেট বা মহাকাশযানগুলির স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র-পাতির সাহায্যে আমরা জানতে পেরেছি, বৃহস্পতির উপগ্রহের সংখ্যা ১৬-র বেশী। শনিরও উপগ্রহের সংখ্যা ১৬-র বেশী। তার বলয় অগণিত।

॥ পাইওনীয়ার—১০ ॥

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ মার্কিন বিজ্ঞানীরা পাইওনীয়ার—১০ নামে একটা মহাকাশযানকে বৃহস্পতির দিকে পাঠালেন। বৃহস্পতি সম্বন্ধে নানা তথ্য, যে-সব তথ্য দূরবীনের সাহায্যে জানা যায় নি, তা পাঠিয়ে মহাকাশযানটি শনিগ্রহের দিকে চলে গেল শনি সম্বন্ধে নানা কথা জানিয়ে সে অনেক দূরে চলে গেছে। সৌরজগতের বাইরে বহু দূরে চলে যাবার মতো শক্তি তার আছে।

২৬০ কেজি ওজনের পাইওনীয়ার—১০-এর গতিবেগ ঘন্টায় ৫৬,৩৫০ কিলোমিটার। এই প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে সে ১৩ই জুন, ১৯৮৩ তারিখে ইউরে-নাস, নেপচুন ও প্লুটোকে ছাড়িয়ে সৌরজগতের বাইরে চলে গেছে। এখন তার অতিক্রান্ত পথের দূরত্ব ৬৫০ কোটি কিলোমিটারেরও বেশী।

পাইওনীয়ার—১০ বৃহস্পতি গ্রহ সম্পর্কে বহু অজানা তথ্য জানিয়েছে। অসংখ্য আলোকচিত্র পাঠিয়েছে। দশম গ্রহ আছে কিনা, তাও সে জানাবে।

পাইওনীয়ার—১০ কতদিন কর্মশক্তিসম্পন্ন থাকবে, জানা নেই। তার কর্মশক্তি অক্ষয় হলেও সে নক্ষত্রলোকে যেতে পারবে কিনা, জানা যায় না। যে গতি তার আছে, তাতে তাকে পৃথিবীর নিকট-তম তারা প্রোক্সিমা সেন্টরিতে পৌছতেই কয়েক সহস্র বছরেরও বেশী লেগে যাবে। ততদিনে পৃথিবীর কী অবস্থা দাঁড়াবে তা কেউ বলতে পারে না।

আতদূরের নক্ষত্রের রাজ্যে পৌছতে মানুষের তৈরী মহাকাশযান কোন দিনই পারবে না। যদি ধরেই নেওয়া যায়, পৌছতে পারবে, ততদিনে অর্থাৎ অনেক হাজার কোটি বছর পরে হয়তো সূর্যই নিভে যাবে, পৃথিবী তো তার আগেই মহাশূন্যে বিলীন হয়ে যাবে।

অথচ পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টার অন্ত নেই। নক্ষত্রলোকে নিজেরা যেতে না পারলেও তাঁদের তৈরী মহাকাশযান যদি অন্ততঃ কিছুটা দূরত্বে পৌছতে পারে তাতেই তাঁরা খুশী।



পৃথিবী

এমন একদিন ছিল যেদিন যে-পৃথিবীতে আমরা বাস করি সেই পৃথিবী ছিল না। সে প্রায় পাঁচশত কোটি বছর আগেকার কথা।

মহাশূন্যে সূর্যের পাশ দিয়ে প্রচণ্ড বেগে যাবার সময় এক অতি প্রকাণ্ড জ্যোতিষ্কের টানে সূর্যদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সৌরজগতের গ্রহসমূহের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী সেই সব গ্রহের একটি।

কেহ কেহ বলেন, ঘূর্ণায়মান নীহারিকা থেকে অন্যান্য গ্রহের সঙ্গে পৃথিবীর সৃষ্টি।

যেভাবে হোক, পৃথিবীর যখন সৃষ্টি হয় তখন তার রূপ বর্তমান কালের পৃথিবীর মতো ছিল না। পৃথিবী ছিল এক প্রকাণ্ড অতিশয় উত্তপ্ত গ্যাসের গোলক। প্রাকৃতিক নিয়মে কোন জিনিস চিরকাল গরম থাকে না, ক্রমশঃ ঠাণ্ডা হয়ে যায়। গ্যাসের গোলক পৃথিবী বহু কোটি বৎসর ধরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হতে থাকল।

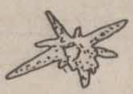
ক্রমে ক্রমে জলীয় বাষ্পগুলো ঠাণ্ডা হয়ে জলের আকার ধারণ করল। একটা পাকা ফল শুকিয়ে গেলে যেমন তা কুঁকড়ে যায়, তেমনই পৃথিবী ঠাণ্ডা হতে হতে কুঁকড়ে গেল। তার ফলে পৃথিবীর কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু হয়ে গেল।

উঁচু জায়গা হল ডাঙ্গা ও ডাঙ্গার উপরের পাহাড়-পর্বত। নীচু জায়গায় বৃষ্টির জল জমে সাগর-মহাসাগরের সৃষ্টি হল। তখনও পৃথিবীতে কোনও ধরনের প্রাণের আবির্ভাব হয় নি।

পৃথিবীর উপরটা শক্ত হয়ে গেলেও ভিতরটা

আজও তরল পদার্থে পূর্ণ। লোহা, নিকেল প্রভৃতির তরল সমুদ্র পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিরাজ করছে।

॥ প্রাণের আবির্ভাব ॥



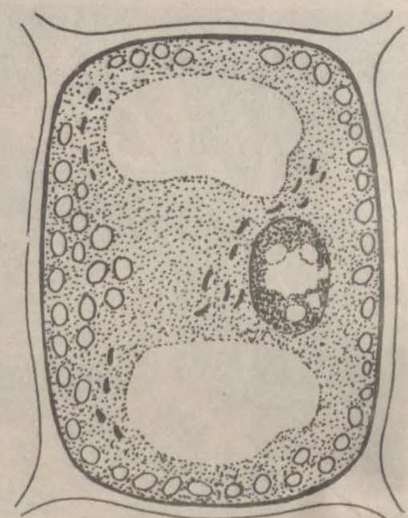
আজ সারা পৃথিবী গাছপালা, মানুষ, জীবজন্তু, কীটপতঙ্গে ভরা। কিন্তু আগে তো সে রকম ছিল না। পৃথিবীর স্থলে জলে কোথাও প্রাণের কোন চিহ্ন ছিল না। তাহলে প্রাণের আবির্ভাব কী করে হল?

অনেক ভেবে চিন্তেও বিজ্ঞানীরা ঠিক করতে পারলেন না, কেমন করে এই পৃথিবীতে প্রাণের আবির্ভাব ঘটল। তাঁরা বললেন, তিনটে কারণে প্রাণের আবির্ভাব হতে পারে।

প্রথম, এই পৃথিবীতেই প্রাণের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেন, স্বয়ম্ভবন (auto-germination) হয় না। জীব থেকেই জীবের সৃষ্টি হয়। কিন্তু যে প্রচণ্ড উত্তাপ সারা পৃথিবীতে ছিল তাতে কোন জীব থাকতে পারে না। কাজেই পৃথিবীতে কোন জীব ছিল না। জীব থেকে জীবের সৃষ্টি হয় নি। পৃথিবী-সৃষ্টির সময় প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্ত গ্যাসের মধ্যে কোন জীবকণা থাকতেই পারে না।

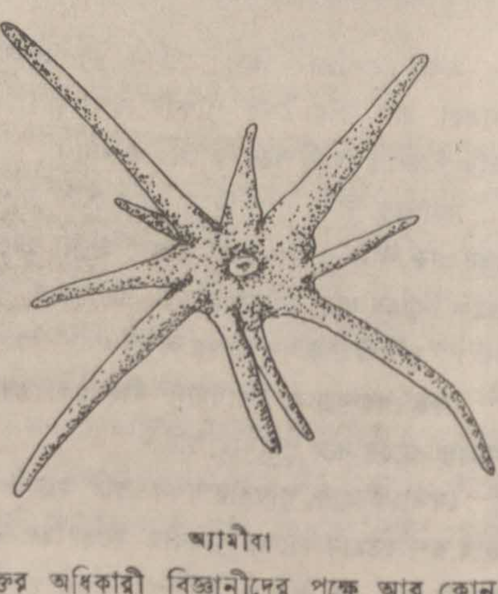
দ্বিতীয়, হয়তো মহাকাশ থেকে জীবকণা ভেসে এসেছে এই পৃথিবীতে। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অসম্ভব। কারণ, পৃথিবীর বাইরে অনেক উঁচুতে কোনও মাধ্যাকর্ষণ নেই। কাজেই সেই স্থির মহাকাশ দিয়ে পৃথিবীতে কোন জীবকণা ভেসে আসতে পারে নি। সেভাবে পৃথিবীতে জীবের আবির্ভাব ঘটে নি।

তৃতীয়, বিশ্বস্রষ্টা অনাদি অনন্ত, অসীম শক্তিমান্, সহস্র কোটি জ্যোতিষ্কের স্রষ্টা, অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ঈশ্বরের ইচ্ছায় পৃথিবীতে জীব-সৃষ্টি



প্রোটোপ্লাজম

হয়েছে। এই মতবাদ মেনে নেওয়া ছাড়া সীমিত



অ্যামীবা

শক্তির অধিকারী বিজ্ঞানীদের পক্ষে আর কোন উপায় নেই।

প্রাণের প্রথম স্পন্দন ঘটে ডাঙায় নয়, জলে, সাগরের তলায় শান্ত স্নিগ্ধ পরিবেশে। প্রথম প্রাণকণা ছিল ছুঁচের আগার ন্যায় খুব ছোট এক কণা আঠার মতো। সাগরের জলে ভেসে বেড়াত সেই প্রাণকণা। সেই আঠার ন্যায় আদিম জীবকণা থেকেই ক্রমে ক্রমে কুড়ি লক্ষেরও বেশী ধরনের জীবের সৃষ্টি হয়েছে।



নানাশ্রেণীর ডায়াটম

বিজ্ঞানীরা বলেন, কার্বন নামে মৌলিক পদার্থের প্রোটোপ্লাজম (protoplasm)-এর মধ্যে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। প্রোটোপ্লাজমের ২টি অংশ —একটা ঘন ডেলা, যার নাম নিউক্লিয়াস ও তাকে ঘিরে একটু পাতলা অংশ, যার নাম সাইটোপ্লাজম (cytoplasm)। প্রোটোপ্লাজম থাকে একটা কোষ (cell)-এর মধ্যে। অসংখ্য জীবকোষ দিয়ে গড়া জীবের দেহ।

কিন্তু এমন জীবও পৃথিবীতে আছে, যারা এককোষী, একটি মাত্র জীবকোষ দিয়ে গড়া। এককোষী জীবের সংখ্যা পৃথিবীতে কোটি কোটি।

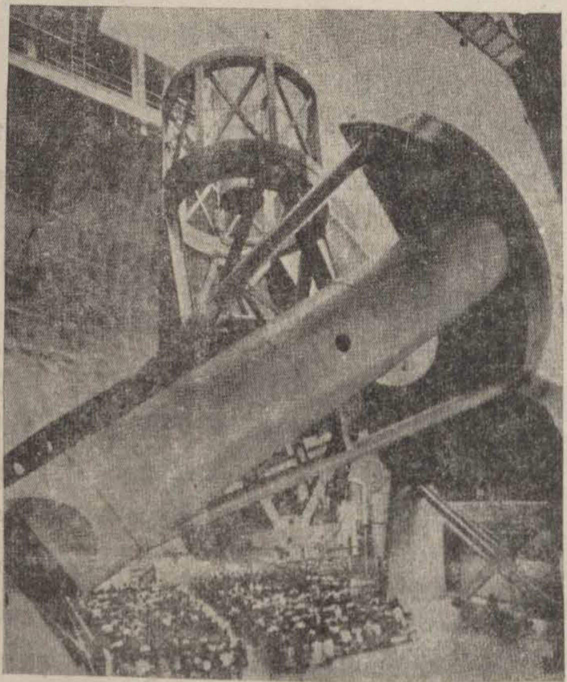
এককোষী জীব নানা রকমের। সে-সবের মধ্যে অ্যামীবা (amoeba) একটি। একটা অ্যামীবা থেকে বিচিত্র উপায়ে অসংখ্য অ্যামীবার সৃষ্টি হয়ে থাকে। ডায়াটম (diatom)-ও এককোষী জীব। এই ডায়াটম আকারে এত ছোট যে তাকে খুব শক্তিশালী দূরবীন ছাড়া দেখা যায় না। এককোষী জীব উদ্ভিদ্‌ও হতে পারে, প্রাণীও হতে পারে।

॥ ভাইরাস ॥

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখলেন, সাধারণ দূরবীনে দেখা যায়, এমন জীবাণুর চেয়ে অনেক অনেক ছোট জীবাণুও আছে। তারা জড় ও জীবের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে। এদের বলা হয় ভাইরাস (virus)। অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ (electron microscope) ছাড়া এদের দেখা যায় না। ইনফ্লুয়েঞ্জা, হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগ এই সব ভাইরাসের সৃষ্টি। এমন অদ্ভুত ব্যাপার যে এই ভাইরাসে প্রোটোপ্লাজম নেই।

পৃথিবী সৃষ্টির প্রায় ১০০ কোটি বৎসর পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাণের কোন চিহ্ন ছিল না। তার পরে

যে জীবের উদ্ভব হল তা সমুদ্রের জলে হল। পরে গাছপালা, কীটপতঙ্গ, জীবজন্তু ও একেবারে শেষে



ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ



ম্যাস্টডন

ধীরে ধীরে ডাঙায় জীবের সৃষ্টি হল। ক্রমশঃ মানুষের সৃষ্টি হল। আবার বর্তমান মানুষের সৃষ্টি

হতে বহু লক্ষ বৎসর লেগে গেছে। গাছপালা ও জীবজন্তুর সম্বন্ধেও ওই একই কথা। লক্ষ লক্ষ বৎসর



ব্রন্টোসরাস

আগে গাছপালার যে আকার ছিল, তা এখন নেই বললেই চলে। অতি বৃহদাকার প্রাণী যেমন



প্রাগৈতিহাসিক যুগের বৃহদাকার গণ্ডার

ম্যাস্টডন, ম্যামথ, ব্যালুচিথিরিয়াম, ডাইনোসর, ইকথিরিয়াস, ব্রন্টোসরাস, স্টেগোসরাস প্রভৃতি এখন পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে।

॥ পৃথিবীর আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতি ॥

পৃথিবী নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের চারদিকে লাট্টুর ন্যায় ঘুরছে। এই রকম ঘুরতে ঘুরতেই সে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। নিজের মেরুদণ্ডের চারদিকে ঘোরাকে বলে পৃথিবীর আহ্নিক গতি, আর সূর্যকে প্রদক্ষিণ করাকে বলে পৃথিবীর বার্ষিক গতি। দিনে প্রায় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪'০৯৯৬ সেকেণ্ডে পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর একবার আবর্তন করে। সৌর বৎসরে সে প্রায় ৩৬৭'২৫৬৪ দিনে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে।

॥ পৃথিবীর আকার ॥

পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতো গোল—উত্তর-দক্ষিণে কিছুটা চাপা। এই কারণে উত্তর থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিম ব্যাপী বিষুবরেখা অপেক্ষা প্রায় ৪৩ কিলোমিটার কম। পৃথিবী যে গোল তা বহু সহস্র বৎসর পূর্বে লিখিত সংস্কৃত গ্রন্থ থেকে জানা যায়। 'গোলাধ্যায়'-নামক পুঁথির একস্থানে লেখা আছে, করতলকলিতামলকবদমলং বিদন্তি যে গোলম্।—হাতের চেটোয় রাখা আমলকীর মতো গোল। আধুনিক যুগে গ্রীক পণ্ডিত পাইথাগোরাস (Pythagorus—৫৮২-৫০৭ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) পৃথিবী যে গোল তা জানান। বর্তমানে মহাকাশে প্রেরিত রকেটের সাহায্যে জানা গেছে, পৃথিবীর আকার গোল নয়, কতকটা নাশপাতির মতো।

॥ পৃথিবীর অভ্যন্তর ॥

পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন হয়ে গেলেও অভ্যন্তর ভাগ এখনও তরল পদার্থে পূর্ণ। উপরে ৪০ কিলো-মিটার ব্যাপী লিথোস্ফিয়ার বা শিলার স্তর। তার

নীচে ২,৮৯৮ কিলোমিটার ব্যাপী ম্যান্টল (mantle) নামে ঘন থকথকে শিলার স্তর। তার নীচে লোহা ও নিকেলের। স্তর এই স্তরের অনুমিত উত্তাপ ৩,৭০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (৬,৭০০ ডিগ্রী ফারেনহাইট)।

॥ পৃথিবীর ওজন ॥

পৃথিবীর ওজন কত হতে পারে তা বিজ্ঞানীরা অঙ্ক কষে বার করেছেন। তাঁরা জানিয়েছেন, ওজন ৫৮৮-র পর ১৯টি শূন্য বসালে যত হয় তত টন।

তলিয়ে গেছে, অসংখ্য লোকের জীবনহানি ঘটেছে, বাড়িঘর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

এই ভূমিকম্প কেন হয়েছে বা কেন হয় তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের তরল সমুদ্রে প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি হয়। অসম্ভব রকম উত্তপ্ত গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। তারই ধাক্কায় পৃথিবীপৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে। কোন কোন বিজ্ঞানী বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগের স্তরচ্যুতিই ভূমিকম্পের প্রধান কারণ।



১৯৬৮ সালে পশ্চিম সিসিলিতে ভূমিকম্পের ধ্বংসলীলা

॥ ভূমিকম্প ॥

অতীতে বহুবার নানা দেশে ভূমিকম্প হয়েছে। এখনও হয়। ভূমিকম্পের ফলে অতীতে নানা দেশে নানা বিপর্যয় ঘটে গেছে। কোন মহাদেশ দু'ভাগ হয়ে গেছে। দেশ ধ্বসে সমুদ্রের তলায়

লিসবন শহরের ভূমিকম্প (১৭৭৫), সানফ্রানসিস্কোর ভূমিকম্প (১৯০৬), দক্ষিণ ইটালীর ভূমিকম্প (১৯০৮), কলম্বিয়ার ভূমিকম্প (১৯০৬), ক্রাকাতাও দ্বীপের ভূমিকম্প (১৮৮৩), জাপানের ভূমিকম্প (১৯১৪ ও ১৯২৩), আসামের ভূমিকম্প (১৯৫০), কামচাটকার ভূমিকম্প (১৯৫২),

চিলির ভূমিকম্প (১৯৬০), আগাদিরের ভূমিকম্প (১৯৬০)—এই রকম কত যে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না।

সাইসমোগ্রাফ যন্ত্রে বৎসরে ৫ লক্ষ বার ভূমিকম্প সংঘটন ধরা পড়ে। তন্মধ্যে এক লক্ষ বার সাধারণভাবে অনুভূত হয় ও এক হাজার বার ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়।

১৫৫৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনের শেনসি, শানসি ও হোনান প্রদেশে যে ভূমিকম্প হয় তাতে ৮,৩০,০০০ লোক মারা যায়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব চীনের তাংশান ভূমিকম্পে ৭,৫০,০০০ জন মারা যায়।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানে যে ভূমিকম্প হয় তাতে নিহত ও নিরুদ্দেশ লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ১,৪২,৮০৭। টোকিও ও ইয়োকোহামায় বাড়ি ধ্বংস হয় ৫,৭৫,০০০টি।

॥ যুগ ॥

পাঁচশ' কোটি বছরের মধ্যে ৩০০ কোটি বছর পর্যন্ত পৃথিবীতে কোন প্রাণী ছিল না। সেই প্রাণহীন যুগকে ইংরেজীতে বলে অ্যাজোইক (Azoic) বা আর্কিওজোইক (Archaeozoic) যুগ। তারপর শুরু হল ইওজোইক (Eozoic) যুগ অর্থাৎ প্রথম জীবনের যুগ। মোটামুটি ১৯০ কোটি বছর জুড়ে এই যুগ চলে। এই যুগে খুব নিম্নশ্রেণীর জীব ছিল। আর ছিল শেওলা (algae)-জাতীয় উদ্ভিদ্।

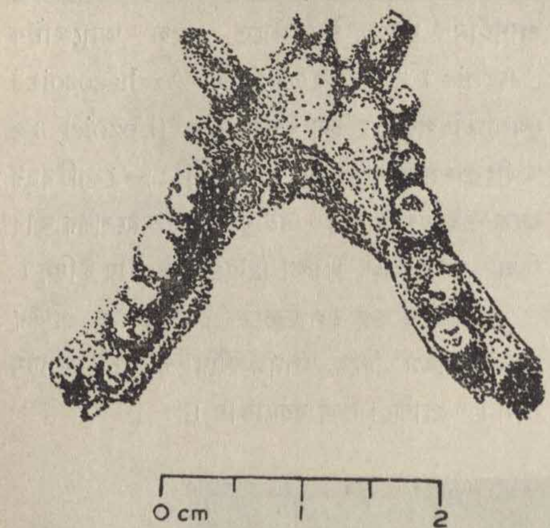
তারপরে শুরু হল উচ্চশ্রেণীর উদ্ভিদ ও প্রাণীর যুগ। প্রথম দিকে ফার্নজাতীয় গাছেরই প্রাচুর্য ছিল। প্রাণীরা ছিল বৃহদাকার।



ফার্ন গাছ

ওই সব যুগের উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের নানা ধরনের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল বা পুরো দেহাবশেষ পাওয়া গেছে। তার নাম জীবাশ্ম বা ফসিল (fossil)। সেই সব ফসিল দেখে বিজ্ঞানীরা সে যুগের উদ্ভিদ্ ও প্রাণীদের মোটামুটি একটা ধারণা করতে পেরেছেন। অনেক ফসিল পৃথিবীর নানা দেশের জাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

এই সব ফসিল সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সে-যুগের পৃথিবীর স্থল ও জলের অবস্থা,



প্রস্তরীভূত জীবাশ্ম





নানাধরনের ফসিল বা জীবাশ্ম

ভূস্তরের বিভিন্ন অবস্থা, আবহাওয়া প্রভৃতি জানতে পেরেছেন।

পৃথিবীর প্রাচীন যুগকে পণ্ডিতেরা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে ভাগ করেছেন। ষাট কোটি বছর আগে যে যুগ শুরু হয়, তার নাম প্যালিওজোইক (Paleozoic) যুগ অর্থাৎ পুরাজীবীয় যুগ বা প্রথম (প্রাইমারী) যুগ। এই যুগকে ছ' ভাগে ভাগ করা হয়। ক্যামব্রিয়ান (Cambrian) যুগ—৬০ থেকে ৫০ কোটি বছর পর্যন্ত স্থায়িত্ব। তারপরের যুগ অর্ডোভিসিয়ান (Ordovician) —স্থায়িত্ব ৫০ থেকে ৪২½ কোটি বছর। তার পরের সিলিউরিয়ান (Silurian) যুগ চলে ৪২½ কোটি থেকে ৪০½ কোটি বছর পর্যন্ত। তারপর শুরু হয় ডিভোনিয়ান (Devonian) যুগ, যার স্থায়িত্ব ৪০½ কোটি বছর থেকে ৩৪½ কোটি বছর পর্যন্ত।

এরপর যে যুগ আসে তা ৩৪½ থেকে ২৮ কোটি বছর পর্যন্ত চলে। সে যুগের নাম কার্বনিফেরাস (Carboniferous)। সব শেষে এল পার্মিয়ান (Permian) যুগ—স্থায়িত্ব ২৮ কোটি বছর থেকে ২০ কোটি বছর পর্যন্ত।

পার্মিয়ান যুগ শেষ হলে মেসোজোইক (Messozoic) যুগ শুরু হল। সে যুগ চলল ৬ কোটি ৩০ লক্ষ বছর। তার পরে আরম্ভ হল ট্রায়াসিক (Triassic) যুগ—স্থায়িত্ব ৪ কোটি ৯০ লক্ষ বছর। তার পরের ৪ কোটি ৬০ লক্ষ বছর ধরে জুরাসিক (Jurassic) যুগ। তার পরের ৭ কোটি ২০ লক্ষ বছর ধরে চলে ক্রেটেশাস (Cretaceous) যুগ।

ক্রেটেশাস যুগের পরে আসে কেনোজোইক (Cainozoic, Kainozoic বা Canozoic) বা নবজীবীয় যুগ। সেই যুগের প্রথম ভাগ চলে ৫০ লাখ বছর। সে যুগের নাম প্যালিওসীন (Paleocene যুগ। তারপর ইওসীন (Eocene) যুগ—

স্থায়িত্ব ২ কোটি ২০ লক্ষ বৎসর। তার পরে আসে ওলিগোসীন (Oligocene) যুগ। তা চলে ১ কোটি ১০ লক্ষ বৎসর। পরের যুগ মাইওসীন (Miocene)—স্থায়িত্ব ১ কোটি ১০ লক্ষ বৎসর। সবশেষে প্লাইওসীন (Pliocene) যুগ, যা চলে ১ কোটি ২০ লক্ষ বৎসর ধরে।

এর পরের ১০ লক্ষ বৎসর আধুনিক যুগ। তার দু' ভাগ—গ্লেশিয়াল বা তুষার-কাল ও পোস্ট-গ্লেশিয়াল বা তুষারোত্তর কাল। তুষার-কালে পৃথিবীর অনেকাংশ বরফে ঢেকে গিয়েছিল। সে-সময়ের পৃথিবীর চেহারা কিরূপ ছিল তা গ্রীনল্যাণ্ড ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল দেখলে কতকটা বোঝা যাবে।

॥ বঙ্গভূমির সৃষ্টি হয় কবে ॥

ভারতবর্ষের আরাবল্লী পর্বতের বয়স প্রায় ২৪০ কোটি বৎসর। পূর্বঘাট অঞ্চল ১৬০ কোটি বৎসরের পুরনো। হাজারিবাগের খনি এলাকার বয়সও ১০০ কোটি বছর বলে ধরা হয়েছে। কিন্তু বঙ্গভূমি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশ মাত্র পাঁচ লক্ষ বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত।

॥ গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড ॥

প্যালিওজোইক যুগের গোড়ার দিকে দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ ভারত, দক্ষিণ আফ্রিকা ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চল মিলে একটা বিরাট ভূভাগ ছিল। তার নাম গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড (Gondwanaland)।

আগে ভূমধ্যসাগর থেকে চীন পর্যন্ত এক বিস্তৃত সমুদ্র ছিল। তার নাম দেওয়া হয়েছে টেথিস সী (Tethys sea)। প্রায় ৬ কোটি বছর আগে এক বিরাট বিপর্যয়ে টেথিস সাগরের অস্তিত্ব রইল না। ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতে হাজার হাজার মিটার উচু হয়ে লাভার স্রোত জমে কঠিন হয়ে পর্বত ও কঠিন প্রস্তরময় ভূমির আকার ধারণ করল।

চার-পাঁচ কোটি বছর আগে গণ্ডোয়ানাল্যাণ্ড টুকরো টুকরো হয়ে গেল। বিভিন্ন মহাদেশের সৃষ্টি হল। সমুদ্র সে-সবের মধ্যে ব্যবধানের সৃষ্টি করল। টেথিস সাগরের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটল এবং হিমালয় পর্বতের উদ্ভব হল।

সেই হিমালয় থেকে বহু নদী পলি নিয়ে ঢালতে ঢালতে চলল। তার ফলে পলি জমে জমে পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও বঙ্গভূমির সৃষ্টি হল।



নদীর উৎপত্তি

॥ পৃথিবীতে একটানা দীর্ঘদিন ও রাত ॥

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশে একটানা দীর্ঘ দিন ও দীর্ঘ রাত। ২৩শে সেপ্টেম্বর থেকে ২১শে মার্চ পর্যন্ত উত্তর মেরু প্রদেশে কেবলই রাত, আর দক্ষিণ মেরুতে কেবলই দিন। ২১শে মার্চ থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এর ঠিক উলটো।

॥ মেরুজ্যোতি ॥

মেরুপ্রদেশের রাত সব সময়ে অন্ধকার নয়। যে কয় মাস একটানা রাত থাকে, সেই সময়ে

আকাশ সবুজ, বেগনী, লাল প্রভৃতি রঙের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এ আলো কখনও খুব উজ্জ্বল কখনও মৃদু। এই আলোকের নাম মেরুজ্যোতি (aurora polaris)।



মেরুজ্যোতি

দক্ষিণ মেরুর আলোককে বলে কুমেরুজ্যোতি বা অরোরা অস্ট্রেলিস বা প্রতীচ্য উষা (aurora australis)। উত্তর মেরুর আলোককে বলে সুমেরুজ্যোতি বা উদীচ্য উষা বা অরোরা বোরিয়েলিস (aurora borealis)।

॥ পৃথিবীর পরিধি ॥

পূর্ব-পশ্চিমে ৪০,০৭৫·০৩ কিলোমিটার। উত্তর-দক্ষিণে ৪০,০০৭·৮৯ কিলোমিটার।

॥ পৃথিবীর ব্যাস ॥

পূর্ব-পশ্চিমে ১২,৭৫৬·২৮০ কিলোমিটার। উত্তর-দক্ষিণে ১২,৭১৩·৫১০ কিলোমিটার ?

॥ উত্তরমেরু প্রদেশের বাসিন্দা ॥

এস্কিমো (Eskimo), ল্যাপ (Lapp), স্যামোয়েড (Samoyed), ফিন (Finn) প্রভৃতি জাতির লোক উত্তরমেরু প্রদেশের নানা স্থানে থাকে।

॥ তুন্দ্রা ও স্টেপ ও প্রেইরী ॥

উত্তর মেরু অঞ্চলের দক্ষিণে সুমেরু মহাসাগরের উপকূল-সংলগ্ন উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও এশিয়ার উত্তরাংশ ও তার কাছাকাছি জায়গাকে তুন্দ্রা (tundra) অঞ্চল বলে। তুন্দ্রা অঞ্চল বরফে ঢাকা থাকে। শেওলা ও ছোট ছোট গাছপালা ছাড়া সেখানে কিছুই জমে না। তুন্দ্রা অঞ্চলে এস্কিমো, ল্যাপ ও স্যামোয়েডদের বাস।

দক্ষিণ-পূর্ব রাশিয়া ও সাইবিরীয়ার বিশাল তৃণাচ্ছাদিত ভূভাগকে বলে স্টেপ (steppe)। এখানে বড় গাছপালা নেই।

উত্তর আমেরিকার বৃক্ষহীন তৃণাচ্ছাদিত বিশাল ভূভাগকে বলে প্রেইরী (prairie)।

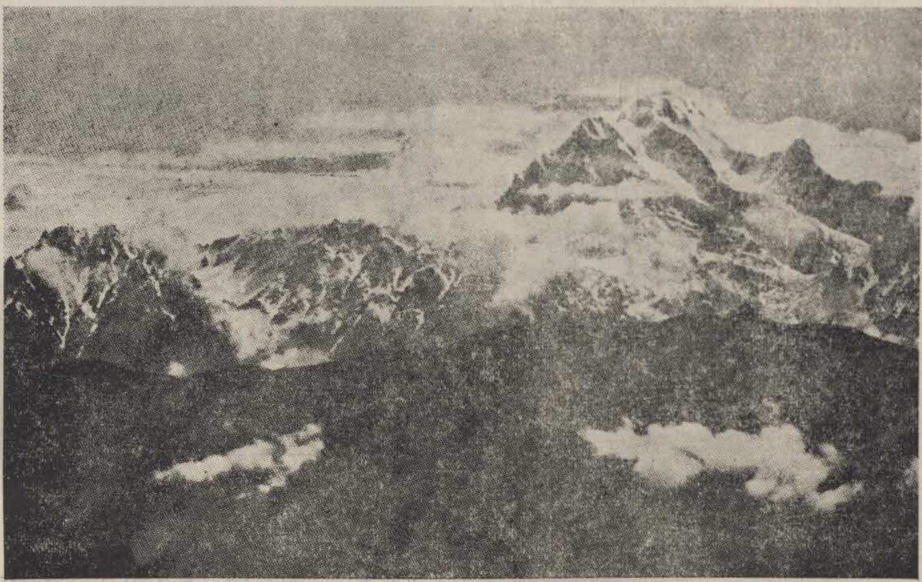
॥ দক্ষিণ মেরুর প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি ॥

এরেবাস (Erebus) দক্ষিণ মেরুর প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি। এটি একটি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি। উচ্চতা ৫,৬৩৩ মিটার। অ্যান্টার্কটিকার ভিক্টোরিয়া-ল্যাণ্ডে অবস্থিত।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু গিরিশৃঙ্গ ॥

পৃথিবীর সবচেয়ে উচু গিরিশৃঙ্গ নেপাল ও

তিব্বতের সীমান্তে অবস্থিত মাউন্ট এভারেস্ট। উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে জরিপ বিভাগের গণিতশাস্ত্রজ্ঞ কর্মচারী রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০ খ্রীঃ) অঙ্ক কষে ৮,৮৪০ মিটার বলে



পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট



জন হাণ্ট

এর উচ্চতা নিরূপণ করেন। জরিপ বিভাগের ভূতপূর্ব কর্তা স্যার জর্জ এভারেস্ট তখন বিলাতে ছিলেন। তাঁর নামে পর্বত-শৃঙ্গটির নাম হয় মাউন্ট এভারেস্ট (Mount Everest)।

॥ এভারেস্টে প্রথম পদক্ষেপ ॥

ব্রিটিশ অভিযাত্রী দলের নেতা জন হান্টের নেতৃত্বে ভারতীয় তেনজিং নোরগে ও নিউ জীল্যাণ্ডের এডমাণ্ড হিলারী ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ২৯শে মে প্রথম মাউন্ট এভারেস্টে পদার্পণ করেন।



তেনজিং নোরগে

॥ সবচেয়ে বড় মহাদেশ ॥

এশিয়া সবচেয়ে বড় মহাদেশ—আয়তন প্রায় ৪,৬০,২০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।



এডমাণ্ড হিলারী

॥ এশিয়া মহাদেশের লোকসংখ্যা ॥

এশিয়া মহাদেশের বর্তমান লোকসংখ্যা প্রায় ২৩০,০০,০০,০০০। পৃথিবীর জনসংখ্যার অর্ধেক।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মালভূমি ॥

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত পামীর মালভূমি (মধ্য এশিয়া) ৪,১৪৫ মিটার উচ্চ। একে বলা হয় পৃথিবীর ছাদ (Roof of the World)।

॥ পৃথিবীর শীতলতম স্থান ॥

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভোস্টক (Vostok) নামক স্থানের প্রায় ৮০৫ কিলোমিটার দূরে মির্নি (Mirny) পৃথিবীর শীতলতম স্থান। এখানে তাপ – ৮৮·৩^0 সেন্টিগ্রেড (– ১২৬·৯^0 ফারেনহাইট) পর্যন্ত নেমে যায়। স্থানটি ৩,৬৫৭ মিটার ফুট উচ্চে অবস্থিত।

॥ এশিয়া মহাদেশের শীতলতম স্থান ॥

উত্তর-পূর্ব সাইবিরীয়ার অন্তর্গত ভারখোয়ান্স্ক.

(Verkhoyansk) এশিয়া মহাদেশের শীতলতম স্থান। জানুয়ারি মাসে এর তাপমাত্রা -৫৯^0 ফারেনহাইট। এত শীতেও এখানে প্রায় ১৮০০ লোক বাস করে।

॥ পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান ॥

উত্তর আফ্রিকার লিবিয়ার অন্তর্গত অল আজিজিয়া পৃথিবীর উষ্ণতম স্থান—সর্বোচ্চ তাপ ১৩৬.৪^0 ফারেনহাইট। এর নীচে কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত ডেথ ভ্যালি—সর্বোচ্চ তাপ ১৩৪^0 ফারেনহাইট।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তর ও দক্ষিণে অবস্থিত শহর ॥

উত্তরের শহর নরওয়ের অন্তর্গত হ্যামারফেস্ট (Hammerfest)। লোকসংখ্যা ৫,৬০৪ (১৯৬১)। দক্ষিণের শহর দক্ষিণ আমেরিকার চিলির অন্তর্গত পুন্ট্যা অ্যারেন্যাস (Punta Arenas)। লোকসংখ্যা ৪৬,৮৭২ (১৯৬১)।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় দ্বীপ ॥ 

গ্রীনল্যাণ্ড (Greenland) সবচেয়ে বড় দ্বীপ। আয়তন ২১,৭৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১৮,৪০,৮০০ বর্গ কিলোমিটার চিরতুষারে আবৃত জনমানবহীন স্থান। গ্রীনল্যাণ্ড কত বড় দেশ, কিন্তু এর লোকসংখ্যা মাত্র ৩৭,০০০ (১৯৬৫)

॥ ল্যাপল্যাণ্ড ॥

ইউরোপের নরওয়ে, সুইডেন, ফিনল্যাণ্ড ও রাশিয়ার উত্তরাংশকে বলে ল্যাপল্যাণ্ড (Lapland)। ল্যাপল্যাণ্ড নরওয়ের উপকূল ভাগ থেকে শ্বেত সাগর (White Sea) পর্যন্ত বিস্তৃত। আয়তন ৩,৩৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা প্রায় এক লক্ষ।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা পর্বতশ্রেণী ॥

দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ (Andes) পর্বতমালা সবচেয়ে লম্বা পর্বতশ্রেণী—৭,২৪৫ কিলো-



আন্দিজ পর্বতশ্রেণী

মিটার লম্বা। পানামা থেকে কেপ হর্ন পর্যন্ত বিস্তৃত। মাত্র ৬৪.৪০ কিলোমিটার চওড়া। [হিমালয় গিরিশ্রেণী মাত্র ২,৫৭৬ কিলোমিটার লম্বা।]

॥ পীত নদী ॥ 

চীনের হোয়াং হো (Hwang Ho) নদীর অপর নাম পীত নদী (Yellow River)। ৪,৮৩০ কিলোমিটার লম্বা। হোয়াং হো নদীর (পীত নদীর) বন্যায় প্রতি বৎসর চীনদেশের একাংশের বিরাট ক্ষয়ক্ষতি হ'য়ে থাকে। এই জন্য পীত নদীকে চীনের দুঃখ বলা হয়।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মহাসাগর ॥

প্রশান্ত মহাসাগর (Pacific Ocean) সবচেয়ে বড় মহাসাগর। আয়তন ১৭,৬৮,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

॥ মহাসাগরের গভীরতম স্থান ॥

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়ামের নিকটবর্তী মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চ (১০,৯০০ মিটার) গভীরতম স্থান। টোঙ্গা ট্রেঞ্চ ১০,৮৮১ মিটার, কিউরিল ট্রেঞ্চ ১০,৫৪২ মিটার, মিণ্ডানাও-এর নিকটবর্তী সমুদ্রের গভীরতা

১০,৫৩৯ মিটার, আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টো রিকোর নিকটবর্তী স্থান—৯,২১৮ মিটার।



জীবন্ত প্রবাল



প্রবাল দ্বীপ

॥ প্রবাল দ্বীপ ॥



প্রধানতঃ প্রশান্ত মহাসাগরে অগণিত প্রবাল কীটের দেহাবশেষ জমে জমে যে বিরাট দ্বীপ গড়ে ওঠে তাকে বলে প্রবাল দ্বীপ। ভারত মহাসাগরেও প্রবাল দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়। ['সমুদ্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

॥ লবণাক্ত নয় আটলাণ্টিক মহাসাগরের এমন জায়গা ॥

দক্ষিণ আমেরিকার বিরাট নদী আমাজন এত জল সমুদ্রে ঢালে যে নদীর মোহনা থেকে আটলাণ্টিক মহাসাগরের ১৬১ কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গার জল লবণাক্ত নয়। পৃথিবীর অন্যান্য দু'এক জায়গায় মহাসাগরের জল লবণাক্ত নয় বলে জানা গেছে।

॥ পৃথিবীতে বেশী বৃষ্টিপাত ॥

মেঘালয়ের চেরাপুঞ্জিতে বছরে প্রায় ২,৬৪৬ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। চেরাপুঞ্জির নিকটবর্তী মসিনরামে সবচেয়ে বেশী বৃষ্টি হয় কিন্তু সে বৃষ্টি সারা বছর ধরে হয় না।

॥ অবিরাম বৃষ্টি ॥

দক্ষিণ আমেরিকায় প্যারাগুয়ের কোন কোন জায়গায় সারা বছর ধরেই বৃষ্টি হয়—কম বা বেশী। সৃষ্টির প্রথম থেকে কখনও শোনা যায় নি, ওই সব জায়গায় বৃষ্টি হয় নি।

॥ কম বৃষ্টিপাত ॥

মরুভূমিতে ও দুটি মেরু প্রদেশে কম বৃষ্টিপাত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর চিলির অন্তর্গত ইকিক (Iquique)-নামক স্থানে বৎসরে নামে মাত্র বৃষ্টিপাত হয়।

॥ পৃথিবীর আগ্নেয়গিরি ॥

ইটালীর বিসুবিয়স, জাপানের ফুজিয়ামা, আইসল্যাণ্ড দ্বীপের হেকলা, নোভা জেম্বলার সারিচেফ, সিসিলি দ্বীপের এটনা, লিপারি দ্বীপের স্ট্রম্বোলি, হাওয়াই দ্বীপের মৌনা লোয়া, অ্যান্টার্কটিকার এরেবাস, আলাস্কার ইলামনা প্রভৃতি অন্যান্য বিখ্যাত আগ্নেয়গিরি। ['আগ্নেয়গিরি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

॥ সারাজেভো ॥

সারাজেভো (Sarajevo) বর্তমানে যুগোশ্লাভিয়ার একটি নগরী। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্ডিনাণ্ড এখানে এক আততায়ীর দ্বারা নিহত হন। প্রধানতঃ এই হত্যাকাণ্ডকে উপলক্ষ করে প্রথম মহাযুদ্ধের সৃষ্টি হয়।

॥ পাঞ্জাব ॥

পাঞ্জাবকে ইংরেজীতে 'The Land of Five Rivers' বলে। এই পাঁচটি নদী—বিতস্তা (Jhelum), চন্দ্রভাগা (Chenab), ইরাবতী (Ravi), বিপাশা (Beas) ও শতদ্রু (Sutlej)।

॥ তিব্বতে ও আসামে ব্রহ্মপুত্র নদের নাম ॥

তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র নদের নাম ৎসাং-পো (Tsang-Po), আসামে ডিহং।

॥ আমেরিকা নাম ॥

কলম্বাস প্রথমে আমেরিকার কাছাকাছি দ্বীপে পৌঁছেছিলেন, পরে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় অভিযানে দক্ষিণ আমেরিকায় পৌঁছান। ইতালীয় নাবিক আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci, ১৪৫১-১৫১২) ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা মহাদেশে পৌঁছান বলে কেহ কেহ বলেন (এ বিষয়ে মতভেদ আছে)। তাঁরই নামানুসারে 'আমেরিকা' নাম হয়েছে।

॥ লাইবিরিয়া ॥

লাইবিরিয়া আটলাণ্টিক মহাসাগরের কূলে পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাফ্রী ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে এখানে তাদের বসবাসের ব্যবস্থা করা হয় (১৮২২ খ্রীঃ)। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লাইবিরিয়া প্রজাতন্ত্রী

রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আয়তন ১,১১,৮০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ১২,৫০,০০০ (১৯৬১)। রাজধানী মনরোভিয়া।

॥ সবচেয়ে বেশী লোকের বাস ॥

চীনদেশে সবচেয়ে বেশী লোকের বাস। লোকসংখ্যা ১০০ কোটি (১৯৮২)।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট রাজ্য ॥

দক্ষিণ ফ্রান্সে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী মোনাকো (Monaco) সবচেয়ে ছোট রাজ্য। আয়তন মাত্র ২০·৮ বর্গ কিলোমিটার। ভ্যাটিকান সিটির আয়তন ১০৮·৭ একর। এটি পোপের শাসনাধীন স্বাধীন রাজ্য।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু বাঁধ ॥

সোভিয়েট রাশিয়ার ন্যুরেক (৩০২ মিটার উঁচু) সবচেয়ে উঁচু বাঁধ। সুইটজারল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড ডিক্সেন্স ২৮৫ মিটার উঁচু, ইতালির ভ্যাজন্ট (Vajont) ২৬৬ মিটার, সুইটজারল্যাণ্ডের মভয়সিন ২৩৭ মিটার ও ভারতের ভাখরা নাঙ্গাল ২২৫ মিটার উঁচু।

॥ পৃথিবীর মরুভূমি ॥

আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত সাহারা মরুভূমি বৃহত্তম। আয়তন ৮৪,০০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। সুদান ও বারবারির মধ্যবর্তী, আটলান্টিক মহাসাগর থেকে নীলনদ পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব-পশ্চিমে ৫, ৫০ কিলোমিটার ও উত্তর-দক্ষিণে ১,২৭৫ থেকে ,২৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। সাহারা অঞ্চলে প্রায় ২৫ লক্ষ লোকের বাস। মধ্য এশিয়ার গোবি, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার কালাহারি, আরবের মরুভূমি, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি, ভারতের থর মরুভূমি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

॥ পৃথিবীর মহাসাগর ও মহাদেশ ॥

মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, দক্ষিণ মেরু মহাসাগর ও উত্তর মেরু মহাসাগর।

মহাদেশ—এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া বা ওশিয়ানিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা।

॥ সবচেয়ে উঁচু জায়গায় মানুষের বাস ॥

তিব্বতের হানির বৌদ্ধমঠে তিব্বতীয় ধর্মযাজক লামাদের বাস। স্থানটি ৪,৮৭৬ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

॥ পৃথিবীর প্রধান প্রধান নদী ॥

আফ্রিকার নীলনদ (৬,৬৭০ কিলোমিটার)। আফ্রিকার নাইজার (৪,২৬০ কিলোমিটার), দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন (৬,৪৩৭ কিলোমিটার), উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি-মিসৌরী-রেডরক (৬,২২০ কিলোমিটার), চীনের ইয়াংসি (৫,৬৩৫ কিলোমিটার), চীনের এনিসি (৫,৩১৩ কিলোমিটার), হোয়াং হো (৪,৮৩০ কিলোমিটার), মেকং (৪,৫০৮ কিলোমিটার), ইউরোপের ভলগা (৩,৭৪০ কিলোমিটার), ভারতের সিন্ধু (২,৮৯৮ কিলোমিটার), ব্রহ্মপুত্র (২,৭০৪ কিলোমিটার), গঙ্গা (২,৪৯৫ কিলোমিটার)।

॥ সবচেয়ে বড় হ্রদ ॥

কাস্পিয়ানকে সাগর বলা হলেও এটি প্রকৃতপক্ষে হ্রদ। এর আয়তন ৩,৭১,৮০০ বর্গ কিলোমিটার। লম্বায় ১,২২৫ কিলোমিটার।

॥ সর্ব্বাপেক্ষা গভীর হ্রদ ॥

সাইবিরীয়ার বৈকাল হ্রদ সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা ১,৯৪০ মিটার।

॥ নদীতে দু'রঙের জলের স্রোত ॥

আফ্রিকার অন্তর্গত সুদানের রাজধানী খার্তুমের কাছে ব্লু-নীল ও হোয়াইট নীলের সংযোগস্থলে একই খাদে পাশাপাশি দু' রঙের জল বয়ে যায়। প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সংগমেও সাদা ও নীল রঙের জল একই খাদে পাশাপাশি বয়ে যায়।

॥ সুপেয় জলের বৃহত্তম হ্রদ ॥

কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী সুপীরিয়র সুপেয় জলের বৃহত্তম হ্রদ। আয়তন ৮১,৩৫০ বর্গ কিলোমিটার। [কাস্পিয়ান হ্রদের জল লোনা।]

॥ বিভিন্ন মহাদেশের সর্বাপেক্ষা বড় হ্রদ ॥

এশিয়া ও ইউরোপের মধ্যে অবস্থিত কাস্পিয়ান সাগর—আয়তন ৩,৭১,৮০০ বর্গ কিলোমিটার। ইউরোপের লেনিনগ্রাডের নিকটবর্তী ল্যাডোগা—আয়তন ১৮,৪৬০ বর্গ কিলোমিটার। আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া—আয়তন ৬৭,৬০০ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর আমেরিকার সুপীরিয়র—আয়তন ৮১,৩৫০ বর্গ কিলোমিটার। সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের আরল—আয়তন ৬৮,০৩১ বর্গ কিলোমিটার। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী হিউরন—আয়তন ৬১,৩৮৮ বর্গ কিলোমিটার।

॥ বিভিন্ন দেশ ও তাদের ইংরেজী নাম ॥

(1) The Cock-pit of Europe, (2) The Land of the Rising Sun, (3) The Land of the Setting Sun, (4) The City of Palaces, (5) The Roof of the World, (6) The Gift of the Nile, (7) The Land of the Morning Calm, (8) The Switzerland of India, (9) The Ocean's Bridge, (10) The Land of the Midnight Sun, (11) The city of Seven Hills বা The Eternal City, (12) The Kashmir of Europe, (13) The Holy Land, (14) The Land of Thousand lakes, (15) The Land of White Elephant, (16) The Dark Continent, (17) The Playground of Europe, (18) The Island of Pearls, (19) The City of Skyscrapers, (20) The Gate-way of India, (21) The Key of the Mediterranean, (22) The Forbidden City.

(১) বেলজিয়াম, (২) জাপান, (৩) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, (৪) কলিকাতা, (৫) পামীর মালভূমি, (৬) ঈজিপ্ট, (৭) কোরিয়া, (৮) কাশ্মীর, (৯) গ্রেট ব্রিটেন (১০) নরওয়ে, (১১) রোম, (১২) সুইটজারল্যাণ্ড, (১৩) প্যালেস্টাইন, (১৪) ফিনল্যাণ্ড, (১৫) থাইল্যাণ্ড, (১৬) আফ্রিকা, (১৭) সুইটজারল্যাণ্ড, (১৮) বাহ্‌রায়েন, (১৯) নিউইয়র্ক, (২০) বোম্বাই, (২১) জিব্রাল্টার, (২২) লাসা।

॥ গ্রীনউইচে যখন ১২টা তখন পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের সময় ॥

ইংলণ্ডের অন্তর্গত গ্রীনউইচে যখন বেলা ১২টা, তখন কলিকাতায় ৫-৫৪ (বিকাল), বোম্বাইয়ে ৪-৫১ (বিকাল), মাদ্রাজে ৫-২১ (বিকাল), প্যারিসে ১২-৯ (দুপুর), রোমে ১২-৫০ (দুপুর), বার্লিনে ১২-৫৪ (দুপুর), লেনিনগ্রাডে ২-১ (দুপুর), মস্কোতে ২-৩০ (দুপুর), পিকিং-এ ৭-৪৬ (সন্ধ্যা), ব্রিসবেনে ১০-১২ (রাত), নিউ জীল্যাণ্ডের

ওয়েলিংটনে ১১-৩৯ (রাত), সানফ্রান্সিস্কোয় ৩-৫০ (শেষ রাত), নিউ অর্লিন্সে ৬-০০ (পরের দিন সকাল)।

॥ দেশ ও অধিবাসী ॥

ব্রিটিশ—ব্রিটেন, আইরিশ—আয়ার ও আয়ারল্যাণ্ড, ইংরেজ—ইংল্যাণ্ড, স্কচ—স্কটল্যাণ্ড, ফরাসী—ফ্রান্স, জার্মান—জার্মানি, হাবসী—ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া, মার্কিন—উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, আফগান—আফগানিস্তান, মুর—মরক্কো, গুর্খা—নেপাল।

॥ ইজরায়েল ॥

ইজরায়েল ইহুদীদের একমাত্র দেশ। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশটি ইহুদী রাজ্যে পরিণত হয়। রাজধানী জেরুজালেম।

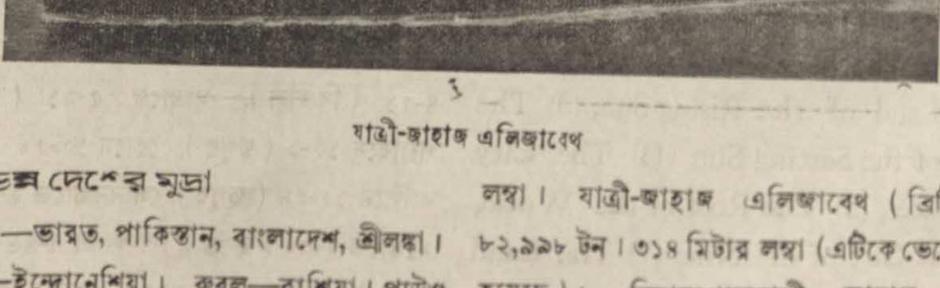
॥ **Adam's Bridge** ॥

Abam's Bridge কুমারিকা অন্তরীপ ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে পক প্রণালীর অন্তর্গত একটি বালির চড়া। ৩৫ কিলোমিটার লম্বা।

—যুক্তরাজ্য, সাইপ্রাস, ঈজিপ্ট, আয়ারল্যাণ্ড, ইজরায়েল, জ্যামাইকা, লেবানন, লিবিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, সুদান, সিরিয়া, তুরস্ক, জাম্বিয়া। রিয়াল—ইরান, সৌদি আরব। পেসো—আর্জেন্টিনা, কলম্বিয়া, কিউবা, ডোমিনিকান রিপাবলিক, মেক্সিকো, ফিলিপিন্‌জ্‌, উরুগুয়ে। পেসেটা—স্পেন। মার্ক—ফিনল্যাণ্ড। লিরা—ইতালি। লেভ—বুলগেরিয়া। ক্রোন—নরওয়ে, ডেনমার্ক। ক্রোনা—আইসল্যাণ্ড, সুইডেন। ফ্রাঙ্ক—ফ্রান্স, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যাণ্ড, ক্যামেরুন, চাদ, ডাহোমে, গ্যাবন, গিনি, আইভরি কোস্ট, মালাগাসি সাধারণতন্ত্র, মালি, নাইজার, সেনেগ্যাল, টোগো, আপার ভোল্টা। ডলার—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইথিওপিয়া, হংকং, লাইবিরিয়া, সিঙ্গাপুর। আফগানি—আফগানিস্তান। দিনার—আলজিরিয়া, ইরাক, জর্ডন, কুওয়াইট, তিউনিসিয়া, যুগোশ্লাভিয়া।

॥ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় জাহাজ ॥

যাত্রী-জাহাজ নরওয়ে—৩১৫.৬৬ মিটার



যাত্রী-জাহাজ এলিজাবেথ

॥ বিভিন্ন দেশের মুদ্রা

টাকা—ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা। রুপিয়া—ইন্দোনেশিয়া। রুবল—রাশিয়া। পাউণ্ড

লম্বা। যাত্রী-জাহাজ এলিজাবেথ (ব্রিটিশ)—৮২,৯৯৮ টন। ৩১৪ মিটার লম্বা (এটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে)। বিমানপোতবাহী জাহাজ মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের এণ্টারপ্রাইজ—৮৫০০০ টন। এটি ৩৩৫ মিটার লম্বা। উচ্চতায় জাহাজটি ২৫ তলা বাড়ির সমান।

॥ পৃথিবীর বৃহত্তম মন্দির ॥

কাম্পুচিয়ার বিস্ময়কর বিষ্ণুমন্দির আঙ্করভাট পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। এটি ২৪২ মিটার লম্বা ও ১৭৯ মিটার চওড়া।

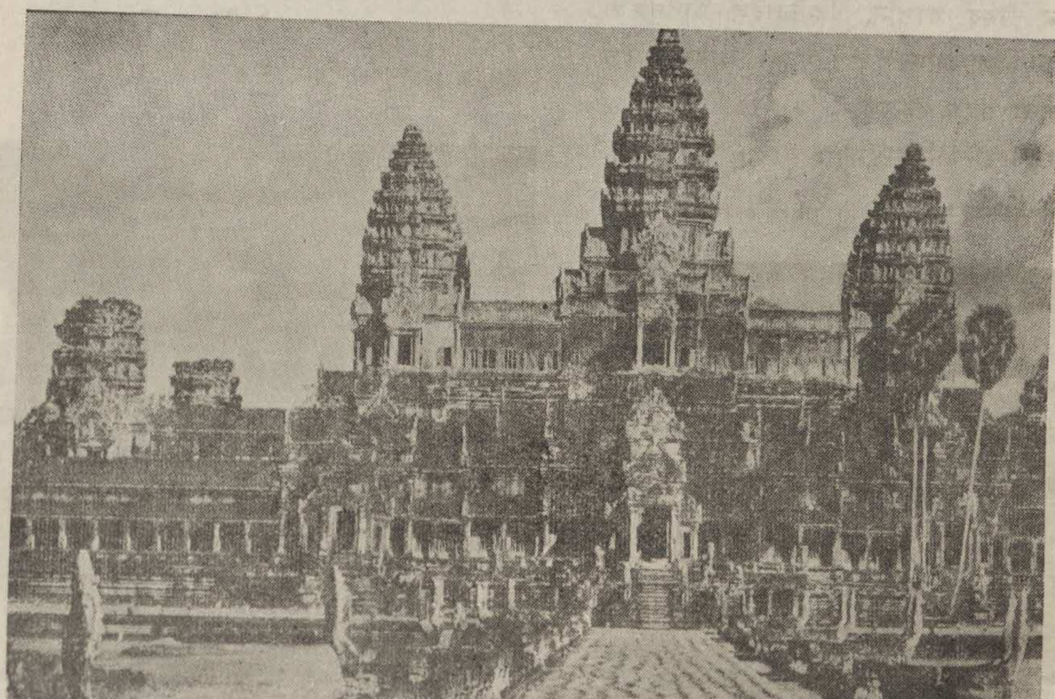
নিউইয়র্ক বন্দরের প্রবেশপথে বেডলো'র দ্বীপে স্থাপিত স্বাধীনতার মূর্তি (Statue of Liberty) মাত্র ৪৬ মিটার দীর্ঘ (অবশ্য পাদদেশ থেকে মূর্তি সমেত উচ্চতা ৯২ মিটার)।

॥ সুয়েজ খাল ॥

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত এক শিলালিপিতে দেখা যায়, পারস্য-সম্রাট্ দরায়ুস (৫২১—৪৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রথম সুয়েজ খাল কাটান।

অবশ্য সেই সুয়েজ খাল লোহিত সাগর (Red Sea)-এর সঙ্গে নীলনদের সংযোগ ঘটিয়েছিল।

প্রাচীনকালের কোন কোন গ্রীক লেখকের লেখায় এ কথা লক্ষ্য করা যায়।



আঙ্করভাট

॥ পৃথিবীর বৃহত্তম মূর্তি ॥

সোভিয়েট রাশিয়ার ভলগোগ্রাডের নিকটবর্তী এক পাহাড়ের উপরের মাতৃভূমি (Motherland)-নামক মূর্তি বৃহত্তম। এটি একটি নারীমূর্তি। মূর্তিটির ডান হাতে উঁচু-করা তরোয়াল। নীচু থেকে তরোয়ালের ডগা পর্যন্ত ৮২ মিটার।

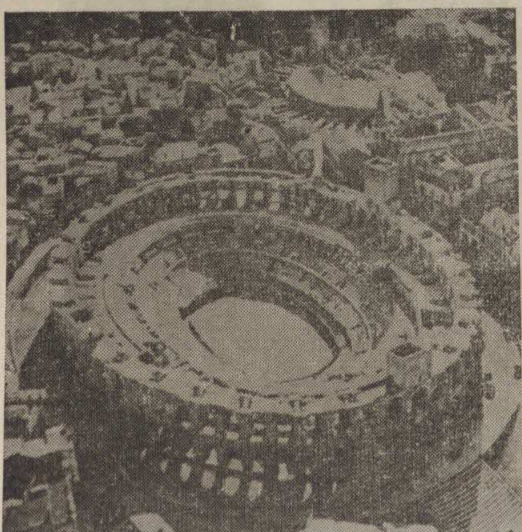
॥ পৃথিবী পরিক্রমা ॥

পোর্তুগালের ম্যাগেল্যান (Ferdinand Magellan—১৪৮০-১৫২১) ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর ৫ খানি জাহাজ ও ২৩৯ জন নাবিক নিয়ে পৃথিবী পরিক্রমা শুরু করেন।

॥ আইনু ॥

আইনু (Ainu) জাপানের আদিম জাতি। বর্তমানে উত্তর জাপান, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জ ও সাখালিন দ্বীপে এদের দেখা যায়। পুরুষ আইনু দীর্ঘ শ্মশ্রু রাখে, মেয়েরা উল্কি পরে। প্রধানতঃ মাছ ধরে এরা জীবিকা নির্বাহ করে।

॥ অ্যাম্ফিথিয়েটার (amphitheatre) ॥



অ্যাম্ফিথিয়েটার

প্রাচীন রোমের ডিম্বাকার বা বৃত্তাকার উন্মুক্ত রঙ্গস্থল বিশেষকে বলা হত অ্যাম্ফিথিয়েটার। সাধারণতঃ একটি খোলা জায়গার চারিদিক্ বেষ্টন করে ধাপে ধাপে সাজানো আসনে বসে লোকে বন্য জন্তুর ক্রীড়া ইত্যাদি দেখত।

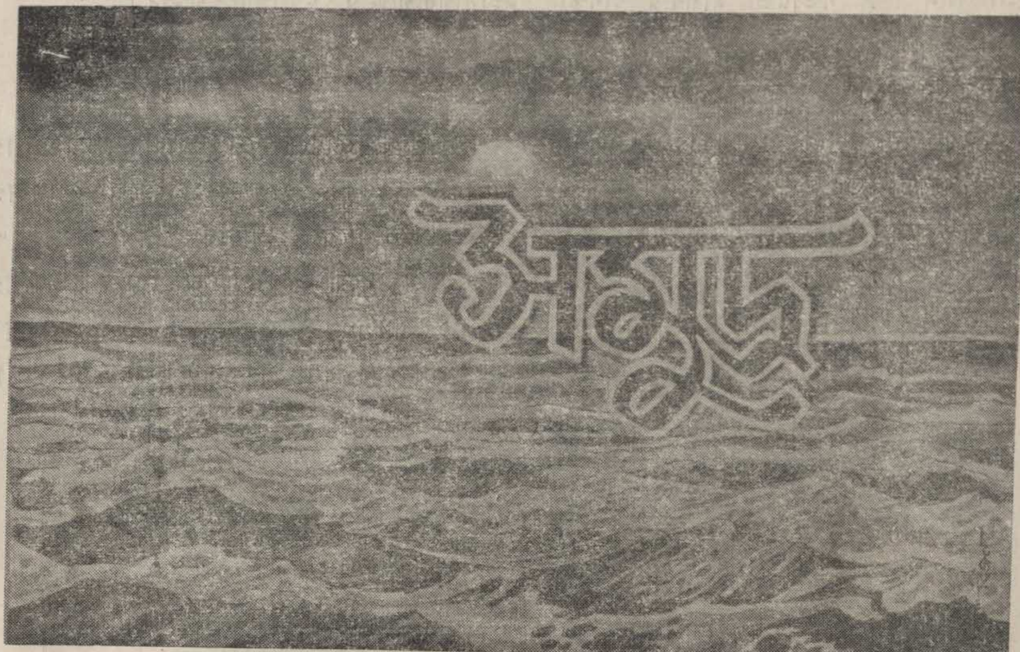
॥ কলোসিয়াম ॥

রোমক সম্রাট্ ভেসপেসিয়ান (Vespasions, ৯-৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) যে অ্যাম্ফিথিয়েটারটি তৈরি করতে শুরু করেন ও রোমক সম্রাট্ টিটাস (Titus, ৪০-৮১ খ্রীষ্টাব্দ) সম্পূর্ণ করেন, তার নাম কলোসিয়াম



কলোসিয়াম

(Colossium) বা ফ্লেভিয়্যান অ্যাম্ফিথিয়েটার। এতে ৮৭ হাজার লোক বসত। এটি লম্বায় ১৮৬ মিটার, চওড়ায় ১৫৭ মিটার। এর ধ্বংসাবশেষ দেখে আজও লোকে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়।



স্থল ও জল নিয়ে পৃথিবী—পৃথিবীর শতকরা ৭০·৯২ ভাগ জুড়ে সমুদ্র। পৃথিবীর জলভাগের আয়তন ৩৬,১৭,৪০,০০০ বর্গ কিলোমিটার। পৃথিবীব্যাপী জলের নাম দেওয়া হয়েছে, সমুদ্র ও মহাসমুদ্র।

সমুদ্র প্রকৃতপক্ষে একটাই। কিন্তু তাকে ভৌগোলিকরা নানাভাগে ভাগ করে সে-সবের এক একটা ভিন্ন নাম দিয়েছেন। সেই হিসাবে সমুদ্র পাঁচটি—প্রশান্ত মহাসাগর (the Pacific Ocean), আটলান্টিক মহাসাগর (the Atlantic Ocean), ভারত মহাসাগর (the Indian Ocean), উত্তর-মেরু মহাসাগর (the Arctic Ocean) ও দক্ষিণ মেরু মহাসাগর (the Antarctic Ocean)।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যখন গ্যাসীয় গোলক ঠাণ্ডা হতে হতে কঠিন আকার ধারণ করে তখন পৃথিবীটা কুঁকড়ে যায়। কোন স্থানটা উঁচু, কোন স্থানটা নীচু। বৃষ্টির জল পড়ে পড়ে সেই-সব নীচু জায়গা সমুদ্রের রূপ নেয়।

॥ সমুদ্রের আয়তন ॥

প্রশান্ত মহাসাগর—১৬,৫২,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার, আটলান্টিক মহাসাগর—৮,২৪,৩৯,৭০০ বর্গ কিলোমিটার, ভারত মহাসাগর—৭,৫৯,৯০,৬০০ বর্গ কিলোমিটার,উত্তরমেরু মহাসাগর—১,৫০,২২,০১৮বর্গ কিলোমিটার, দক্ষিণমেরু মহাসাগর—১,৪৭,৬৩,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

॥ সমুদ্রের গভীরতা ॥

সব সমুদ্র একই রকমের গভীর নয়। কোথাও কোথাও সামান্য গভীর, কোথাও কোথাও এত গভীর যে এভারেস্ট পর্বত (৮,৮৪৮ মিটার উঁচু) সেখানে সম্পূর্ণ ডুবে যেতে পারে।

অতি গভীর সমুদ্র তো আর ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। কাজেই নানাভাবে বিজ্ঞানীরা সমুদ্রের

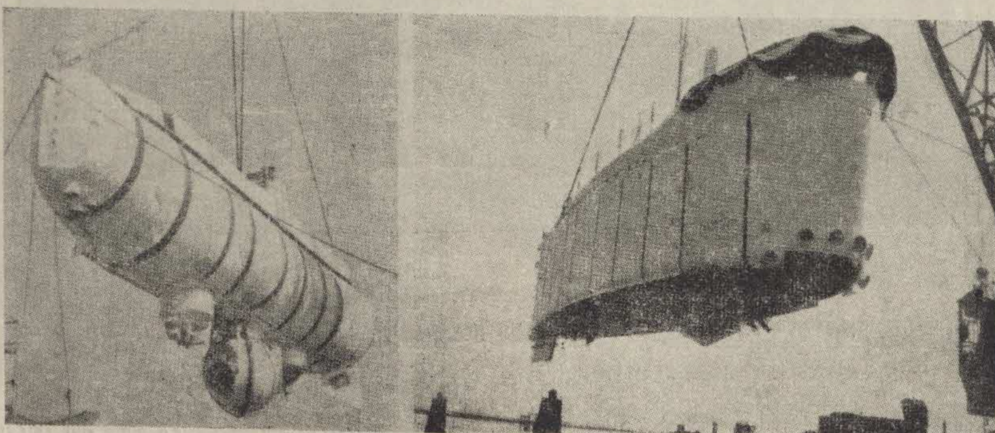
গভীরতা মাপবার চেষ্টা করতে থাকলেন। শেষ পর্যন্ত প্রতিধ্বনি দিয়ে গভীরতা মাপবার ব্যবস্থা করা হল।

এক ধরনের যন্ত্র দিয়ে শব্দ করলে, তার প্রতিধ্বনি সমুদ্রের তলায় ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে। প্রতিধ্বনি ফিরতে কত সময় লাগল, তা যন্ত্রটির কাঁটা নির্দেশ করে। তা থেকেই বোঝা যায়, ওই জায়গার সমুদ্র কত গভীর। জলের মধ্যে শব্দের গতি সেকেণ্ডে ১,৫৩২ মিটার। সেই অনুযায়ী হিসাব করে সমুদ্রের গভীরতা বার করা হয়।

গড়ে সমুদ্র ৩,৫৩৫ মিটার গভীর। প্রশান্ত মহাসাগর গড়ে ৪,২৬৭ মিটার গভীর।

॥ সমুদ্রের তলায় নামা ॥

সাধারণতঃ মুক্তার সন্ধানে ডুবুরীরা সমুদ্রের তলায় নামে। তারা বিনা পোশাকে ১৫ থেকে ৪৫ মিটার পর্যন্ত নামতে পারে। আধুনিক পোশাক পরে ও সাজসরঞ্জাম নিয়ে ডুবুরীরা সমুদ্রের অনেক গভীরে প্রায় ২৫ মিটার পর্যন্ত নামতে সমর্থ হয়েছে। অবশ্য আজকাল ব্যাথিস্ফীয়ার (bathysphere),

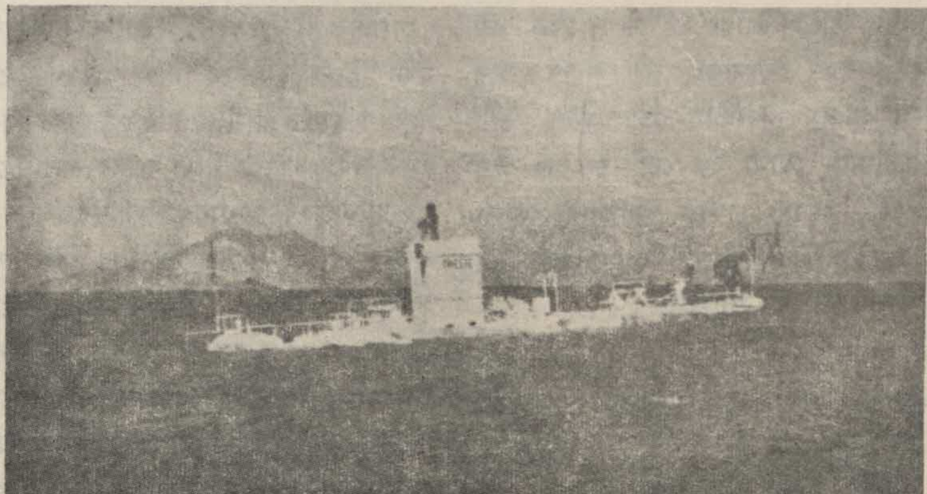


ব্যাথিস্কাফ

ব্যাথিস্কাফ (bathyscaph) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ সমুদ্রের তলায় নেমে সেই স্থান সম্বন্ধে নানা তথ্য আহরণ করেছে। উইলিয়াম বীব তাঁর যন্ত্রে করে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৯২২·৯৩৪১ মিটার গভীরে নামেন। পিকার্ড (Auguste Piccard, ১৮৮৪-১৯৬২) নামে সুইস পদার্থ-তত্ত্ববিদ্-এর ছেলে Jacques Piccard ব্যাথিস্কাফে করে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চে ১০,৯০০ ফুট অর্থাৎ প্রায় ১১ কিলোমিটার নেমেছিলেন। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী U.S. Navy

প্রশান্ত মহাসাগরের গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্য মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চ (the Marianas Trench) সবচেয়ে গভীর। ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে H. M. Survey Ship Challenger-এর বিজ্ঞানীরা এই স্থানের গভীরতা ১০,৯০০ মিটার, ৫,৯৬০ ফ্যাদম বলে জানান। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার জাহাজ Vityaz-এর গবেষকগণ জানান, ওই স্থানের গভীরতা ১১,০৩৩ মিটার, ৬০৩৩ ফ্যাদম। অবশ্য এই মাপ বিজ্ঞানী-মহলে অসমর্থিত।

Bathyscaphe Trieste মেরিয়ানাস ট্রেঞ্চে নামে।



U. S. Navy Bathyscaphe Trieste

॥ সমুদ্রের সম্পদ ॥

মুক্তা ও প্রবাল সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। শুধু মুক্তা ও প্রবাল নয়, রুপা, তামা, দস্তা, সীসা প্রভৃতি ধাতু, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম, ব্রোমিন, আর্সেনিক, আয়োডিন প্রভৃতি অনেক কিছু সাগরে আছে। অবশ্য, এই সব ধাতু বা রাসায়নিক পদার্থ জল থেকে বার করা খুবই কঠিন ও ব্যয়সাধ্য। তাই এ-সব জল থেকে আহরণ করা যায় না।

আমাদের খাবার নুনের বেশির ভাগই সাগরের জল থেকে পাওয়া যায়। বড় বড় দানাওয়ালা করকচ নুন সাগর থেকেই প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

কত রকমের মাছ যে সাগর থেকে পাওয়া যায় তা বলে শেষ করা যায় না। এই সব মাছের অধিকাংশই লোকের খাদ্য।

খড়ি, স্পঞ্জ প্রভৃতি সাগর থেকে পাওয়া যায়।

॥ সাগরের জল থেকে নুন সংগ্রহ ॥

সব সাগরের জলই নোনা। সাগরের জল ক্রমশঃই বেশী নোনা হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য, সব সাগরে বা সাগরের সব জায়গায় নুনের পরিমাণ এক রকমের নয়। যেখানে বড় বড় নদী সাগরে অপরিমেয় জল ঢালছে, সেই সব নদীর মোহনার কাছে বহু দূর পর্যন্ত জল নোনা নয়। আমাজন নদীর মোহনা থেকে ৩২২ কিলোমিটার পর্যন্ত সাগরের জল নোনা নয়। কঙ্গো, নাইজার প্রভৃতি নদীর মোহনার কাছাকাছি সাগরের জলও সুপেয়। বিষুবরেখা বরাবর বৃষ্টিপাত বেশী হয়, তাই সেই সব জায়গার সাগরের জল কম নোনা, মেরুর কাছাকাছি সাগরের জল কম নোনা।

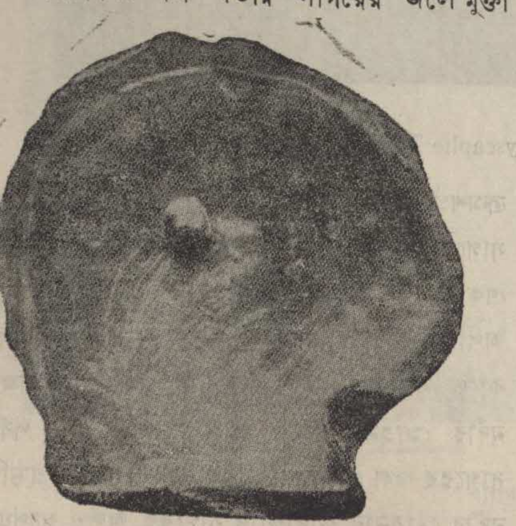
অস্ট্রেলিয়ায় ও কোন কোন দেশে বৃষ্টির জলের বেশ কিছুটা মাটিতে বসে যায়। সেই জল মাটির মধ্য দিয়ে সাগরের তলায় গিয়ে পৌঁছয়। মিঠা জল নোনা জলের চেয়ে হালকা, তাই সেই সব মিঠা জল সাগরের তলা থেকে উপরে উঠে আসে।

তার ফলে সাগরের উপরকার জলের নোনা ভাব থাকে না। সে-সব জায়গার সাগরের জল নোনা নয়।

সাগরের ধারে প্রায় সব দেশে বড় বড় কারখানা আছে। সাগরের জল পাম্প করে সেখানকার বড় বড় চৌবাচ্চায় তোলা হয়। তার পর নানা উপায়ে নোনা জল থেকে নুন বার করে নেওয়া হয়। কোন কোন জায়গায় খোলা চৌবাচ্চার জলে রোদ লাগে, জল বাষ্প হয়ে উঠে যায়। তলায় নুন পড়ে থাকে।

॥ মুক্তা আহরণ ॥

সাধারণতঃ কম গভীর সাগরের জলে মুক্তা



শুক্তির মধ্যে একটি নিটোল মুক্তা

পাওয়া যায়। এতদিন লোকে সাধারণতঃ বিনা পোশাকে ঝিনুক বা শুক্তি (pearl oyster) আহরণ করত। আজকাল ডুবুরীরা বৈজ্ঞানিক সাজপোশাক পরে সাগরের তলায় নেমে ঝিনুক আহরণ করে। কোথাও কোথাও এক ধরনের যান ব্যবহার করা হয় যাতে চড়ে লোকে নির্বিঘ্নে ও কম সময়ে বেশী ঝিনুক বা শুক্তি তুলে নিয়ে আসে।

অবশ্য, সব ঝিনুকের মধ্যে মুক্তা পাওয়া যায় না বা একই ধরনের মুক্তা মেলে না। ছোট, বড়, নানা আকারের, নানা রঙের মুক্তা পাওয়া যায়।

ঝিনুক বা শুক্তি এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণী। যখন ঝিনুক হাঁ করে খাদ্য আহরণ করে, সেই সময়ে ঝিনুকের পাটি দুটো একটু ফাঁক হয়। সেই সময়ে শুক্তির দেহের মধ্যে বালির কণা ঢুকে যায়। এই বালির কণা থাকার ফলে ঝিনুক বেশ অস্বস্তি অনুভব করে। তখন ঝিনুকের দেহ থেকে এক রকম রস বেরিয়ে বালির কণাকে ঢেকে দেয়। ক্রমাগত রস বেরিয়ে বেরিয়ে বালির কণার চার ধার পুরু হয়ে ওঠে। রস শুকিয়ে মোলায়েম হয়ে গেলে ঝিনুকের বা শুক্তির অস্বস্তি বা যন্ত্রণাবোধ থাকে না। বালির কণার চার ধারের পুরু আস্তরণই মুক্তা।

গোল মুক্তার দাম বেশী। সাদা মুক্তার চেয়ে কালো বা গোলাপী বা অন্য রঙের মুক্তার দাম বেশী। সাদা মুক্তাই বেশী পাওয়া যায়। ভারত মহাসাগর, লোহিত সাগর, পারস্য উপসাগর, মেক্সিকো উপসাগর, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার সংলগ্ন সাগর, জাপানের কাছের প্রশান্ত মহাসাগর ও পৃথিবীর নানা সাগরে সাদা মুক্তা পাওয়া যায়। কালো মুক্তা কখনও কখনও প্রশান্ত মহাসাগরে পাওয়া যায়।

সবচেয়ে বড় ও দামী মুক্তার নাম Pearl of Laotze। ফিলিপিনের পালাওয়ান নামক স্থানে ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মে সেটি পাওয়া যায়। সেটির ওজন ১৪ পাউণ্ড ১ আউন্স (৬·৩৭ কেজি), লম্বায় ২৪·১৩ সেন্টিমিটার। ব্যাস ১৩·৯৭ সেন্টিমিটার। সানফ্রান্সিস্কোর পিটার হফম্যান নামে এক রত্ন-ব্যবসায়ী ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মে এটি কিনে নেন। এর বর্তমান মূল্য ২ লক্ষ ডলার।

এ পর্যন্ত বেরেসফোর্ড হোপ (Beresford Hope) মুক্তাকে সবচেয়ে দামী মুক্তা বলা হত। তার ওজন ১৮০০ গ্রেন।

মুক্তা শুধু ঝিনুক থেকেই পাওয়া যায় না। শামুকজাতীয় নানা খোলা-ওয়ালা প্রাণী (mollusc)-র দেহের মধ্যেও মুক্তা পাওয়া যায়।

॥ জোয়ার-ভাঁটা ॥

চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীর সাগরসমূহে জোয়ার-ভাঁটা হয়। চাঁদের টানে জল যতক্ষণ ফুলে উঠতে থাকে ততক্ষণ জোয়ার (flow tide), আর যতক্ষণ জলের স্ফীতি কমতে থাকে ততক্ষণ ভাঁটা (low tide বা ebb tide).



সাগরতলায় আধুনিক সাজে সজ্জিত ডুবুরী

আসল মুক্তা প্রয়োজনমতো প্রচুর পাওয়া কঠিন। তাই জল থেকে শুক্তি তুলে এনে তার মধ্যে বালির কণা ঢুকিয়ে পুনরায় জলে রেখে দেওয়া হয়। তিন চার বছর বাদে সেই সব শুক্তির কোন কোনটায় মুক্তা জন্মে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুক্তিগুলি মারা যায়। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে যে সব মুক্তা পাওয়া যায়, সে সবকে বলা হয় cultured pearls। এই সব নকল মুক্তার দাম আসল মুক্তার তুলনায় কম হয়।

চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘুরতে ঘুরতে এমন জায়গায় আসে যেখান থেকে চাঁদের দূরত্ব অপেক্ষাকৃত কম হয়। সেই সময় চাঁদের আকর্ষণের মাত্রা বেশী হওয়ার ফলে সাগরের জল ফুলে উঠতে থাকে। দিনে দুবার জল ফুলে ওঠে অর্থাৎ দুবার জোয়ার হয়। দুবার জলের স্ফীতি কমে যায় অর্থাৎ দুবার ভাঁটা হয়।

প্রতিদিন জোয়ার ভাঁটার সময় ৪৫-৫০ মিনিট পিছিয়ে যায়। এক ভরা জোয়ারের

পর আর এক ভরা জোয়ার আসে বারো ঘণ্টা বাদে।

সূর্য ও চন্দ্র পৃথিবীর এক পাশে এক লাইনে এসে যায় অমাবস্যার দিন। সে দিন সূর্য ও চন্দ্রের সম্মিলিত টান বেশী হয়। জোয়ার জোরালো হয়। সেই জোয়ারকে বলে ভরা কটাল (spring tide)। দুই অষ্টমী তিথিতে চাঁদের আকর্ষণ হয় সোজা, সূর্য টানে পাশ থেকে। তাই সে সময়ে জোয়ার তত জোরালো হয় না। সেই জোয়ারের নাম মরা কটাল (neap tide)।

সাগরের জল উথলে উঠলে স্রোত নদীপথে ছুটে যায়। কখনও কখনও এই ছুটে যাওয়া হয় প্রচণ্ড বেগে। তখন বলে নদীতে বান (bore) এসেছে। এই বান সব নদীতে বা উপসাগরে সর্বত্র সমান জোরালো হয় না। যে সব নদীর বা উপসাগরের মুখ খুব চওড়া কিন্তু ভিতরের দিকটা সরু এবং সেই সব স্থানের দুই পাড় খুব উঁচু সেই সব জায়গায় দুবেলাই জোরালো বান দেখা দেয়।

পূর্ব চীনের হ্যাং-চৌ-কে-তে ৭·৬২ মিটার উঁচু হয়ে ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার বেগে বান আসে। বানের শব্দ ২২·৫৪ কিলোমিটার দূর থেকে শোনা যায়। হুগলী নদীতে ঘণ্টায় ২৭ কিলোমিটার বেগে ১১২ কিলোমিটার দূর থেকে বান আসে।

কানাডার অন্তর্গত নিউ ব্রান্‌জ্‌উইক ও নোভা স্কোসিয়ার মধ্যবর্তী ফাণ্ডী (Fundy) উপসাগরে সবচেয়ে উঁচু বান আসে। তার উচ্চতা ১৬ মিটার পর্যন্ত হয়।

বানের সময় তীব্রবেগে জল ছুটে চলার জন্য প্রচণ্ড শব্দ হয়। এই রকম শব্দ হওয়াকে বলে বান ডাকা।

॥ সারগাসো সাগর ॥

উত্তর আটলান্টিকের দক্ষিণ-পশ্চিমে মহাসাগরের জলে সারগাসাম (Sargassum) নামে এক ধরনের আগাছা জন্মায়। সে-সবের সংখ্যা এত বেশী যে প্রায় ৮০৫ কিলোমিটার ব্যাপী জল ঠাসাঠাসি ভাবে পূর্ণ হয়ে আছে। গাছের ডালে ডালে ফলের মতো হাওয়া-ভরা ছোট ছোট থলি থাকে। সেই থলির জন্য সারগাসামের জলে ভেসে থাকতে অসুবিধা হয় না।

সারগাসাম-ভরা জলরাশিকে বলে সারগাসো সাগর (Sargasso Sea)। এই সাগর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যাওয়া এক কঠিন ব্যাপার। কলম্বাস এই জায়গার নাম দিয়েছিলেন সারগাসো সাগর। তাঁর জাহাজ এখান দিয়ে যাওয়ার সময় খুব অসুবিধায় পড়েছিল।

॥ সমুদ্রস্রোত ॥

সূর্যের কিরণ পড়ে সাগরের জল বেশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। জল গরম হলে ফেঁপে ওঠে। তখন সেই ফাঁপা জল প্রচণ্ড বেগে ছুটে যায়। জলের এই প্রচণ্ড বেগে ছুটে যাওয়াকে বলে সমুদ্রস্রোত। প্রচণ্ড ঝড়ের ফলেও সমুদ্রস্রোত দেখা দিয়ে থাকে।

কখনও কখনও সাগরের জলের নীচেও সমুদ্রস্রোত দেখা দেয়।

গাল্‌ফ স্ট্রীম (Gulf Stream), ল্যাব্রাডর স্রোত (Labrador Current), কুরো সিউও (Kuro Siwo অর্থাৎ কালস্রোত), হামবোলট স্রোত (Humbolt Current) বা পেরুস্রোত প্রভৃতি বহু বিখ্যাত স্রোত আছে।

সবচেয়ে প্রসিদ্ধ স্রোত Antarctic circum-polar Current বা West Wind Drift Current। দক্ষিণ আমেরিকা ও অ্যান্টার্কটিকার মধ্য দিয়ে এই সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত। মেক্সিকো উপসাগরের গালফ স্ট্রীমের চেয়ে এই স্রোত প্রায়

তিনগুণ বড়। চওড়ায় ২৯৭ থেকে ১,৯৯৬ কিলোমিটার। সবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন স্রোত ব্রিটিশ কলম্বিয়ার Slingsby Channel-এর Nakawakto Rapids। এই স্রোত ঘণ্টায় ২৯·৬ কিলোমিটার (১৬·০০ নট) বেগে প্রবাহিত হয়।

॥ **হিমশৈল** ॥

সমুদ্রে ভাসমান বিরাট বিরাট বরফের স্তূপকে বলা হয় হিমশৈল (iceberg)। সাধারণতঃ চির-তুষারে আবৃত গ্রীনল্যাণ্ডের অত্যুচ্চ বরফের পাহাড় ভেঙে সমুদ্রে এসে পড়ে। সেই বরফের পাহাড় ভাসতে ভাসতে দক্ষিণ দিকে বহু দূরে চলে আসে।

বৎসরে প্রায় দু'হাজার হিমশৈল সমুদ্রে এসে পড়ে। পরে গরমে সেই হিমশৈল গলতে গলতে সমুদ্র জলের সঙ্গে মিশে যায়।

সাধারণতঃ হিমশৈলের যতটা জলের উপরে থাকে তার অন্ততঃ সাতগুণ অংশ থাকে জলের তলায়। সমুদ্রের জাহাজসমূহকে এই সব হিমশৈল থেকে সাবধান হতে হয়। কারণ, এর ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে পারে।

শুধু যে গ্রীনল্যাণ্ড থেকে হিমশৈল নেমে সমুদ্রে ভাসে, তা নয়। উত্তর ও দক্ষিণের সব সমুদ্রেই হিমশৈল দেখা যায়। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় হিমশৈল যা দেখা গেছে তার নাম Antarctic tabular berg। তা লম্বায় ছিল ৩৩৪ কিলোমিটার, চওড়ায় ছিল ৯৬ কিলোমিটার। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের স্কট দ্বীপের ২৪১ কিলোমিটার পশ্চিমে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর এটি দেখা গিয়েছিল।

সবচেয়ে উঁচু হিমশৈল দেখা গিয়েছিল ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম গ্রীনল্যাণ্ডের কাছে, যার উচ্চতা ছিল ১৬৭ মিটার।



হিমশৈল

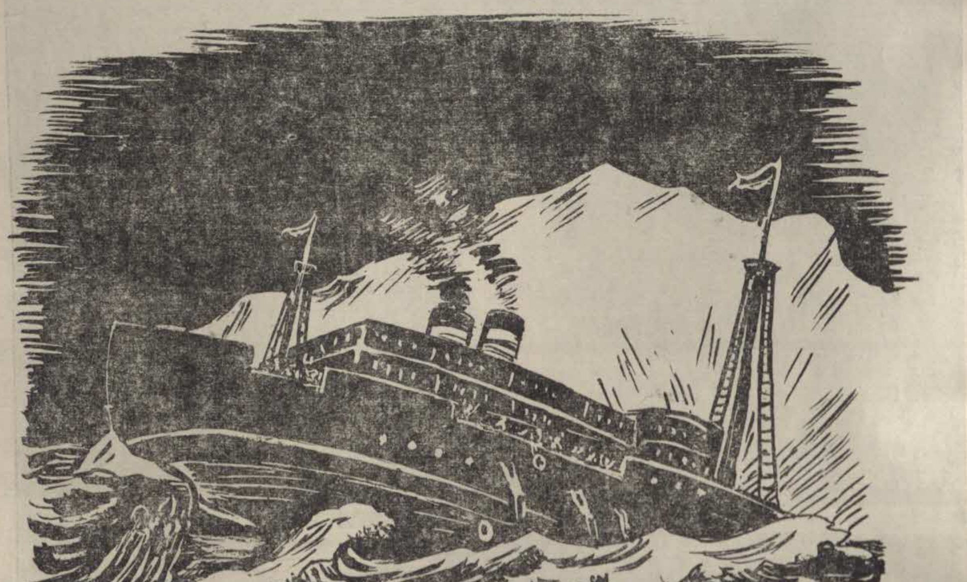
॥ টাইট্যানিক ধ্বংসের কথা ॥

একটা প্রকাণ্ড হিমশৈলের সঙ্গে ধাক্কা লেগে প্রসিদ্ধ জাহাজ টাইট্যানিক ধ্বংস হয়।

গালফ স্ট্রীম ও ল্যাব্রাডর স্রোতের কাছাকাছি জায়গায় খুব ঘন কুয়াশা জন্মে। সেই জায়গার নাম গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্ক (Grand Bank)। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড থেকে একটা ৪৫ হাজার টনের জাহাজ ২২০১ জন যাত্রী নিয়ে আটলান্টিকের উপর দিয়ে নিউইয়র্কের দিকে অগ্রসর হয়।

কড অন্তরীপ থেকে ১৪৪৯ কিলোমিটার দূরে টাইট্যানিক গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কে এসে পড়ল। মধ্য রাত। যাত্রীরা সবাই গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন, এমন সময় জাহাজে বিপদ-সংকেত বেজে উঠল।

ঘন কুয়াশায় পোতচালক লক্ষ্য করেন নি, একটা প্রকাণ্ড হিমশৈল সম্মুখে ভাসমান অবস্থায় চলেছে। সেই হিমশৈলের প্রচণ্ড ধাক্কায় টাইট্যানিকের তলা ফেঁসে গেল। হু হু করে জল উঠে চার ঘণ্টার মধ্যে জাহাজটা অতলে তলিয়ে গেল।



টাইট্যানিক ডুবছে

এঞ্জিনীয়ারদের গর্বের বস্তু ছিল এই টাইট্যানিক জাহাজ। তাঁরা বলেছিলেন, এমন নিখুঁত ভাবে মজবুত করে জাহাজটা তৈরী যে তা কোনও ভাবে বিপদগ্রস্ত হবে না। নাম দেওয়া হল টাইট্যানিক (Titanic)।

জাহাজের সঙ্গের জীবনতরী করে মাত্র ৭১১ জনের প্রাণরক্ষা হল। বাকী সবাই মারা গেল।

॥ সমুদ্রের গাছপালা ॥

উপর থেকে দেখলে বুঝতে পারাই যাবে না, সমুদ্রে কত বিচিত্র ও কত সহস্র রকমের গাছপালা

আছে। পানা, শেওলা, আগাছা, লতা প্রভৃতি নানা ধরনের গাছে সব সাগরের জল ভরা। এই সব গাছ নানা আকারের, নানা রঙের।

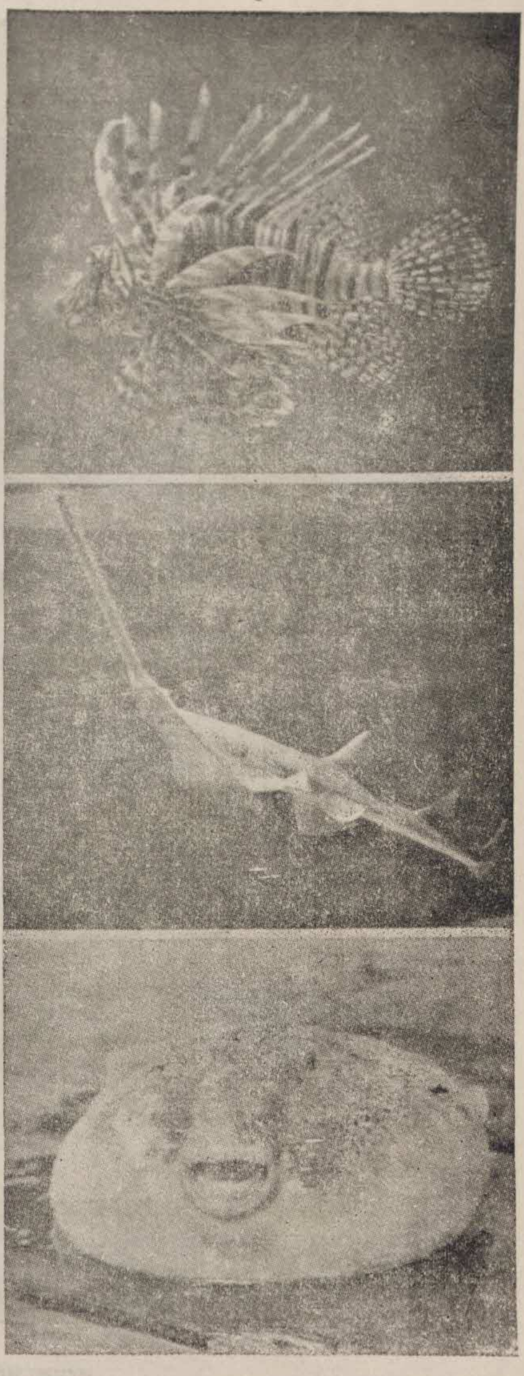
লাল রঙের শেওলা থাকার জন্য লোহিত সাগর (Red Sea)-এর জলকে লাল দেখায়। সার্গাসাম আগাছার জন্য দুর্গম সাগরের অংশকে বলা হয় সার্গাসো সাগর।

আটলান্টিক আর প্রশান্ত মহাসাগরে তীরের কাছে প্রচুর পরিমাণে কেল্‌প্ (Kelp) লতা হয়। এই কেলপ লতা ৫৯ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এই লতা দিনে ৪৫ সেন্টিমিটার করে বাড়ে। চীন, জাপান, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে কেল্‌প্ লতা থেকে উত্তম খাদ্য তৈরী হয়। এই লতা থেকে আয়োডিনও উৎপন্ন হয়ে থাকে।

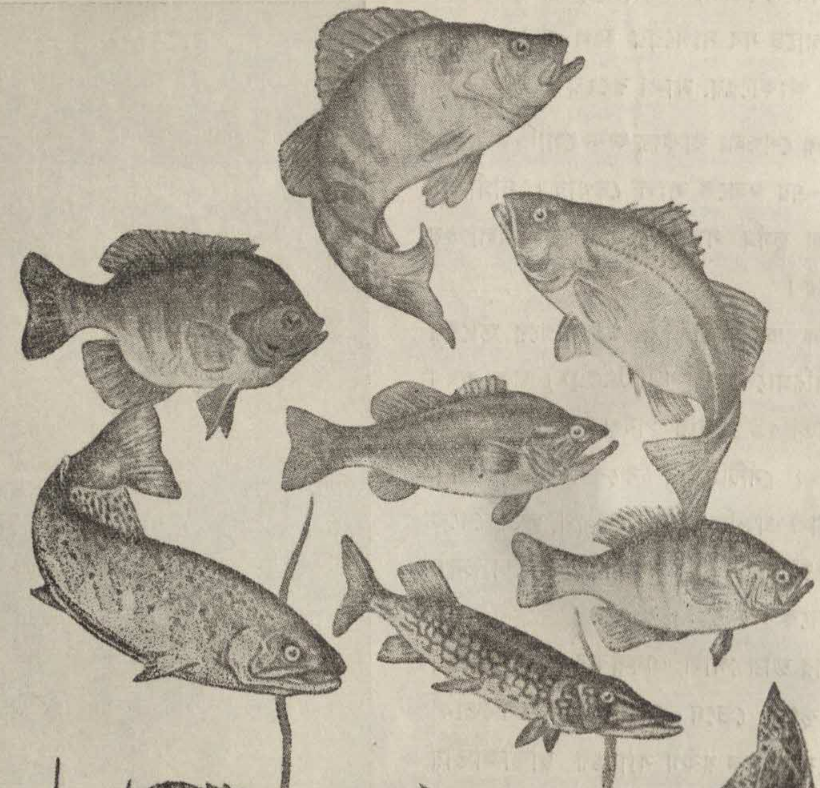
কদমফুলের ন্যায় গোল একরকম পানা সাগরের জলে নানা স্থানে ভেসে বেড়ায়। জলে ডোবা পাহাড়ের গায়ে অনেক রকম ব্যাঙের ছাতাজাতীয় গাছ, পাম গাছের মতো গাছ, ফার্ন গাছ দেখা যায়। তাছাড়া বহু পতঙ্গভুক্ গাছ আছে। এক ধরনের গাছ নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকে। কাছে কোন ছোট মাছ গেলে ডাল মেলে ধরে খায়।

॥ সমুদ্রের প্রাণী ॥

স্যামন (salmon), গোল্ডফিশ, সানফিশ, (sunfish), স্টার্জন (sturgeon), ক্যাটফিশ, গোবি, কড, হেরিং, পমফ্রেট, পার্চ, রেনবো ফিশ সার্ডিন, রোচ, কই ভোলা, ভেটকি, ভাঙ্গন, পার্শে, ইলিশ, চিংড়ি, আড়, শংকর, বোয়াল, পায়রাচাঁদা প্রভৃতি কত রকম মাছ যে সমুদ্রে আছে তা গণনা করে বলা শক্ত। এই সব মাছের আকার, রঙ, প্রভৃতি নানা রকমের। সব মাছই মানুষের খাদ্য নয়। বরং বহু বিষাক্ত মাছও আছে। সে সবের

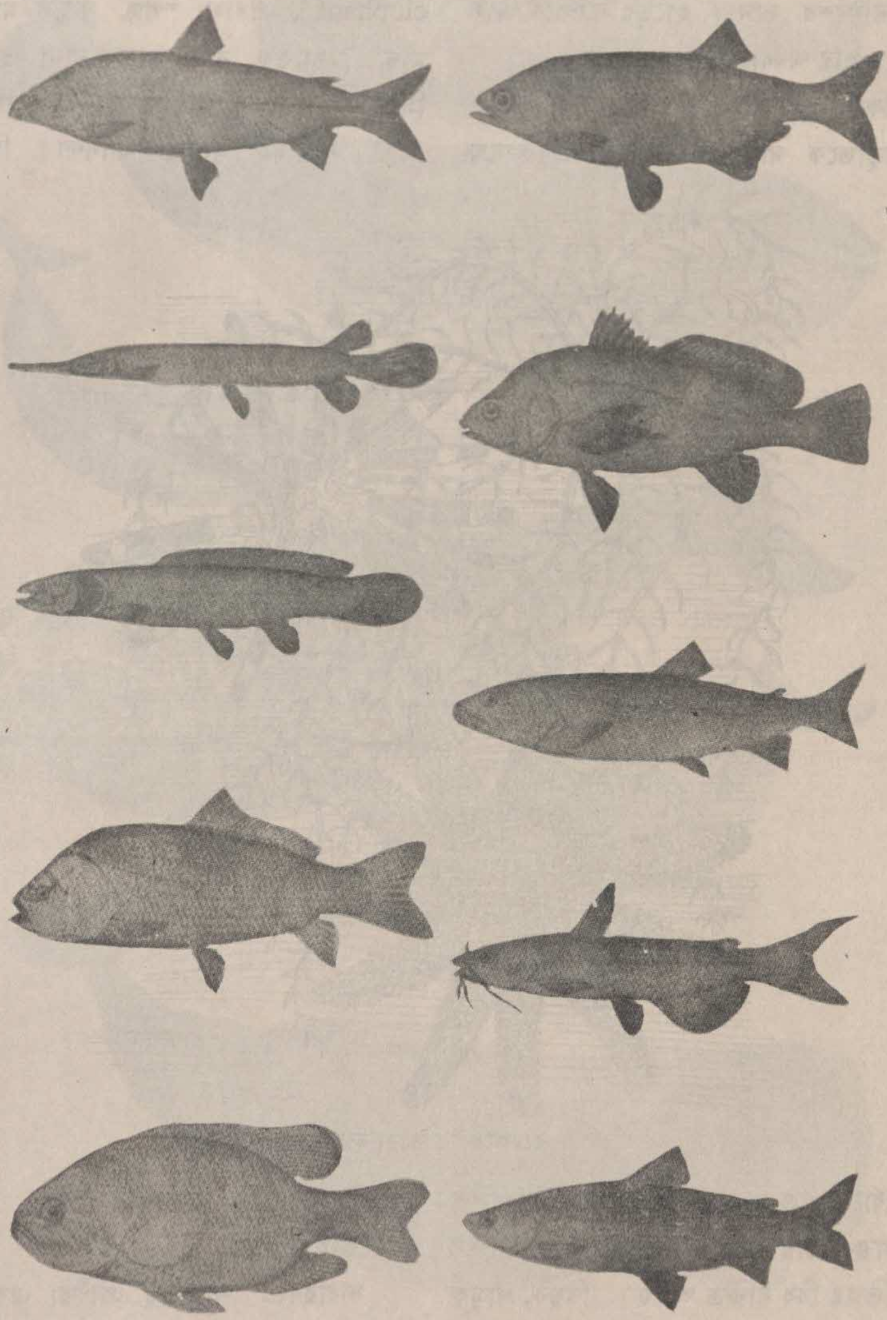


তিনরকমের অদ্ভুত মৎস্য [উপরে The Lionfish, মধ্যে The Sawfish ও নীচে The Northern puffer।]



কয়েকশ্রেণীর সামুদ্রিক মৎস্য

[উপরের সারি : Yellow Perch। দ্বিতীয় সারি : Bluegill ও White Perch। তৃতীয় সারি : Large Mouth Bass। চতুর্থ সারি : Brook Tout, Pickerel ও Crappie। পঞ্চম সারি : Calico Bass ও Muskellunge। ষষ্ঠ সারি : Rock Bass। সপ্তম সারি : Brook Sucker ও Catfish.]

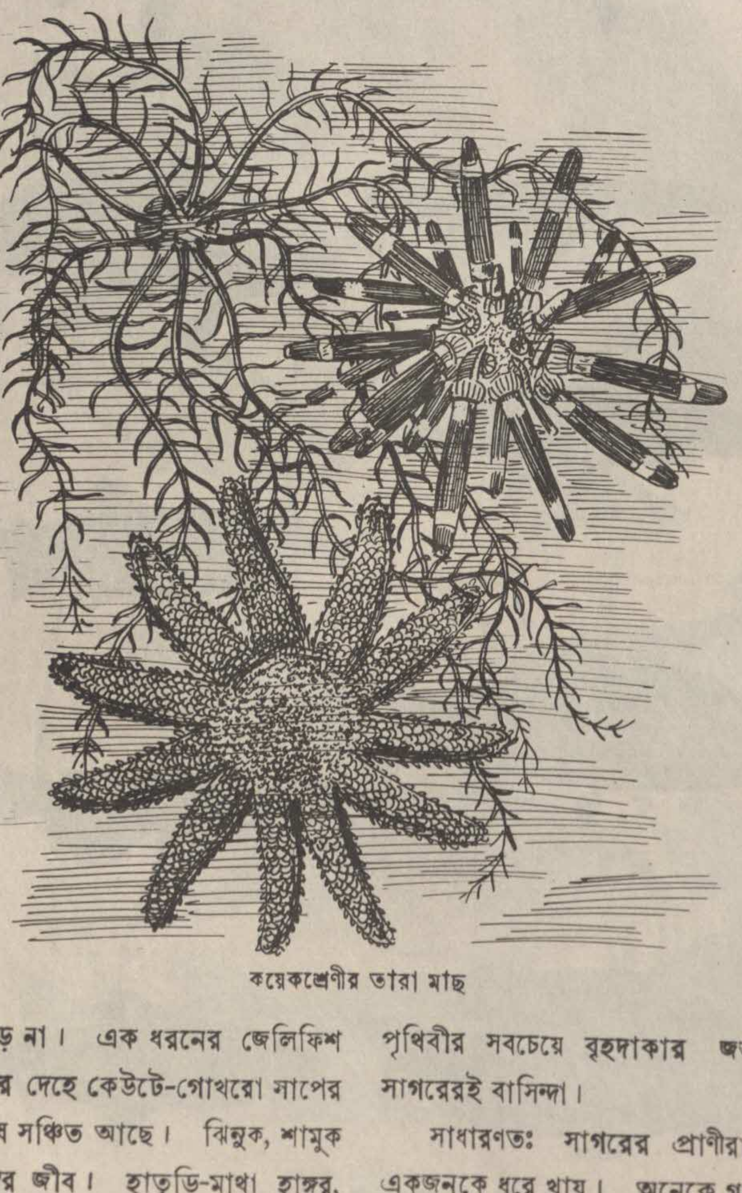


কয়েকশ্রেণীর মিষ্টি জলের মাছ

[উপরের সারি : Whitefish, Mooneye। দ্বিতীয় সারি : Gar Pike, Drumfish। তৃতীয় সারি : Bowfin, Great lakes trout। চতুর্থ সারি : Smallmouth buffalofish, Channel Catfish। পঞ্চম সারি : Sunfish, Lake Herring

মধ্যে স্টোনফিশের ডানার হাড়ের সংস্পর্শে এলে জীবের মৃত্যু প্রায় অবধারিত।

জেলিফিশ (jellyfish), তারামাছ (starfish) প্রভৃতিকে মাছ বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে elephant), প্রবাল, স্পঞ্জ, কুড়ুল মাছ, দানব মাছ, বৈদ্যুতিক বান মাছ, নানা ধরনের সাপ, মিডিউসা, প্ল্যাঙ্কটন, কাঁকড়া প্রভৃতি অসংখ্য রকমের প্রাণী সাগরের জলের বাসিন্দা। তিমি তো

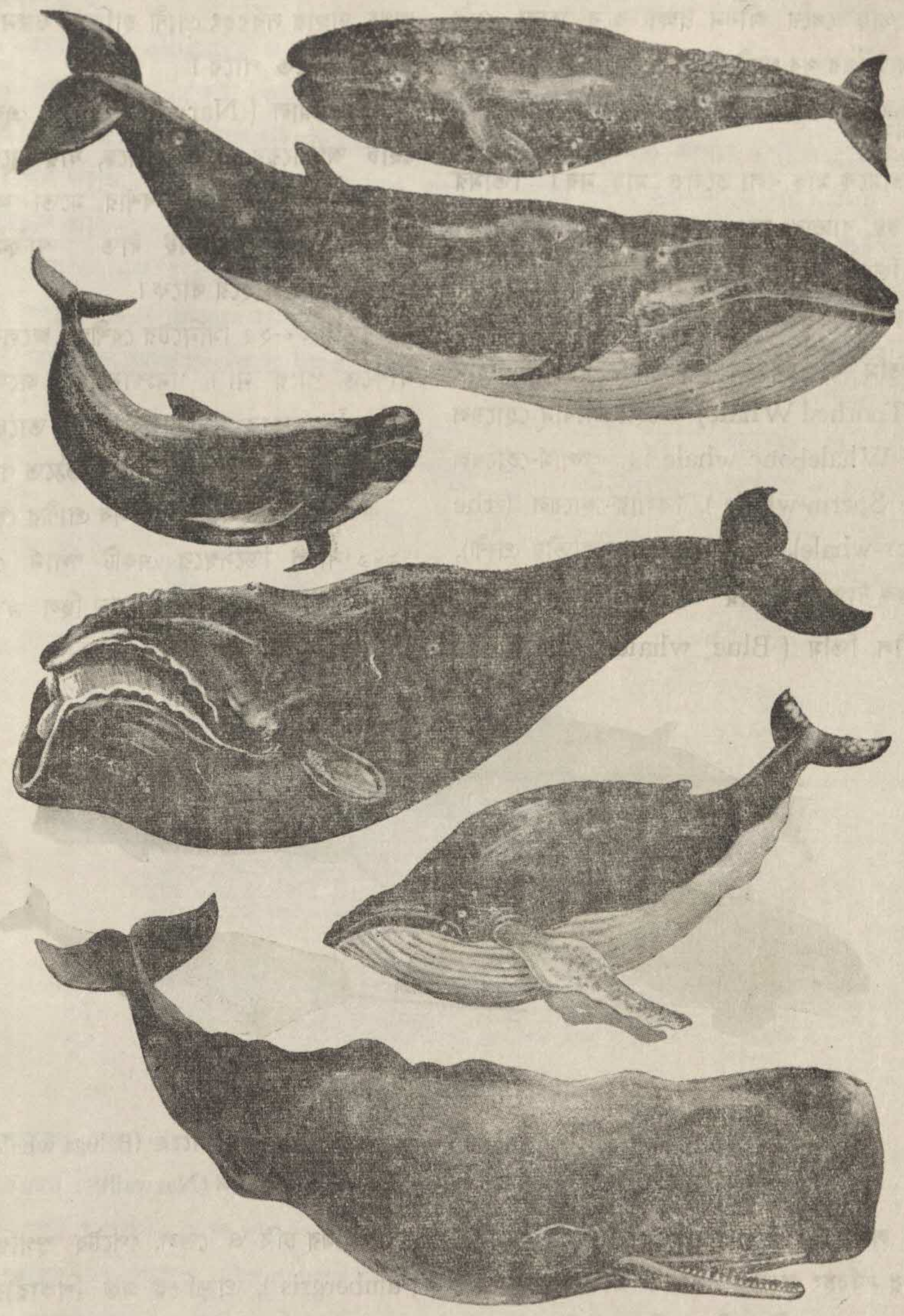


কয়েকশ্রেণীর তারা মাছ

মাছের পর্যায়ে পড়ে না। এক ধরনের জেলিফিশ খুবই বিষাক্ত। তার দেহে কেউটে-গোখরো সাপের মতো ক্ষতিকর বিষ সঞ্চিত আছে। ঝিনুক, শামুক শাঁখ প্রভৃতি সমুদ্রের জীব। হাতুড়ি-মাথা হাঙ্গর, অক্টোপাস, উড়ুক্কু মাছ (flying fish), স্কুইড, শার্ক, তরোয়াল মাছ (swordfish), সিন্ধুঘোটক সী-হর্স, সিন্ধুসিংহ (sealion) সিন্ধু-হস্তী (sea-

পৃথিবীর সবচেয়ে বৃহদাকার জন্তু। এই তিমি সাগরেরই বাসিন্দা।

সাধারণতঃ সাগরের প্রাণীরা একজন আর একজনকে ধরে খায়। অনেকে গাছ খেয়ে বাঁচে। সূর্যের আলো না পেলে গাছ বাঁচে না। সাগরের খুব গভীরে সূর্যের কিরণ পৌছায় না। তাই বেশী গভীরে গাছ বাঁচতে পারে না। যে সব মাছ বা



নানাধরনের তিমি

[উপর থেকে—গ্রে হোয়েল (Gray whale), ফিন্ হোয়েল (Fin whale), পাইলট হোয়েল (Pilot whale), রাইট হোয়েল (Right whale), হাম্পব্যাক হোয়েল (Humpback whale), স্পার্ম হোয়েল (Sperm whale)]

প্রাণী গাছ খেয়ে জীবন রক্ষা করে তারা সেই কারণে জলের খুব গভীরে চলাফেরা করে না।

॥ তিমি ॥

তিমিকে মাছ বলা হলেও মাছ নয়। তিমির বাচ্চা হয়, বাচ্চারা মায়ের দুধ খায়। মাছের মতো তারা ডিম পাড়ে না। ঠাণ্ডা জলে তিমির বাস। মেরুসাগরে বহু তিমি দেখা যায়।

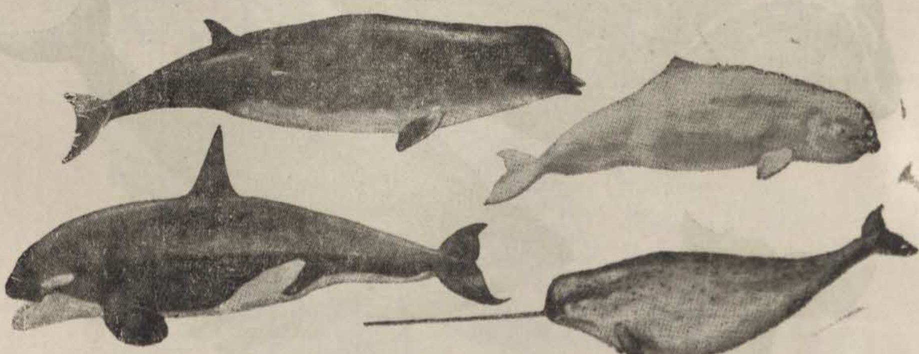
তিমি সাধারণতঃ দু'রকমের—দাঁতাল তিমি (the Toothed Whale) ও হোয়েলবোন্ হোয়েল (the Whalebone whale)। স্পার্ম-হোয়েল (the Sperm-whale), কিলার-হোয়েল (the Killer-whale), Porpoise (শুশুকজাতীয় প্রাণী), ও শুশুক দাঁতাল তিমির অন্তর্গত।

নীল তিমি (Blue whale) ৩০ মিটারের মতো লম্বা হয়। এই নীল তিমি বর্তমানে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ প্রাণী। সাউথ জর্জিয়ার কাছের সাগরে একটা স্ত্রীজাতীয় নীল তিমি পাওয়া গিয়েছিল, যেটি লম্বায় ছিল ৩৩ মিটারের বেশী। নীল তিমির ওজন ১০০ টনের বেশীও হয়ে থাকে। অথচ ডাঙ্গার সর্ববৃহৎ প্রাণী হাতির ওজন মাত্র ৫ টন পর্যন্ত হতে পারে।

নারওয়াল (Narwhal) নামে এক ধরনের ছোট আকারের তিমি আছে, যার মুখে একটা, কখনও কখনও দুটো বর্শার মতো লম্বা দাঁত বেরিয়ে থাকে। সেই দাঁত আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তিমি ২০-২৫ মিনিটের বেশীক্ষণ জলের তলায় থাকতে পারে না। নিঃশ্বাস নিতে জলের উপরে উঠে আসে। তারা দম ছাড়বার সময় তাদের মাথার ফুটো দিয়ে ফোয়ারার মতো জল উঠতে থাকে।

স্পার্ম হোয়েলের মস্তিষ্ক সব প্রাণীর চেয়ে বড়। ১৯৪৯ সালে ডিসেম্বরে একটি স্পার্ম হোয়েলের মস্তিষ্ক দেখা যায়। তার ওজন ছিল ৯·২ কেজি, তা লম্বায় ছিল ১৫ মিটার।



আরও কয়েকশ্রেণীর তিমি

[উপরের সারিতে—বট্‌লনোজ্ হোয়েল (Bottlenose whale), বেলুগা হোয়েল (Beluga whale)
নীচের সারিতে—কিলার হোয়েল (Killer whale), নারওয়াল (Narwall)

তিমির চর্বি ও তেল, পেটের সুগন্ধি জিনিস (ambergris), প্রভৃতির জন্য শিকারীরা তিমি সংহার করে। বর্তমানে যাতে তিমি পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে না যায়, তার জন্যে বেশী তিমি শিকারে বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছে।

॥ হাঙ্গর ॥

Crocodile, alligator ও gavial-কে বাংলায় বলা হয় কুমীর। কেউ কেউ হাঙ্গরও বলেন। কিন্তু হাঙ্গর-এর ঠিক ইংরেজী shark। পূর্বোক্ত জীবগুলি জলজ জন্তু কিন্তু হাঙ্গর সামুদ্রিক মৎস্য-শ্রেণীভুক্ত প্রাণী।

হাঙ্গর ভয়ানক হিংস্র সামুদ্রিক মাছ। এদের ক্ষুধা অপরিমিত। হাঙ্গর নানা জাতের। এক শ্রেণী মানুষকে আক্রমণ করে থাকে, আর এক শ্রেণী সমুদ্রের মাছ খায়, মানুষকে আক্রমণ করে না। এমন হাঙ্গরও আছে যারা মানুষের, বিশেষ করে সমুদ্রের জেলেদের পোষ মানে।

হাঙ্গরের মুখ মাথার নীচের দিকে। তাতে অনেক ধারাল দাঁত। সেই সব দাঁত দিয়ে মানুষ, মাছ, তিমি, সীল প্রভৃতির মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

এক ধরনের হাঙ্গর আছে যাকে বলা হয় হাতুড়ি-মাথা হাঙর (Hammer-head shark)। এই হাঙ্গর দেখতে খুবই অদ্ভুত। তাদের হাতুড়ির মতো দেখতে মাথার দুপাশে দুটো বড় বড় চোখ। তারা লম্বায় অনেক বড় হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জুন একটা হাতুড়ি-মাথা হাঙ্গর শিকার করা হয়েছিল যার ওজন ছিল, ৭১৭ পাউণ্ড (৩২৫·২৩ কেজি.)।

Whale shark, Basking shark, Blue shark, Mako shark, Porbeagle shark, White shark, Six-gilled shark, Thresher shark প্রভৃতি নানা ধরনের shark বা হাঙ্গর দেখা যায়।



হাতুড়ি-মাথা হাঙ্গর

কোন কোন শ্রেণীর হাঙ্গর লম্বায় ১৮।২০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ১৯১৯ সালে শ্যাম উপসাগরে একটা Whale shark ধরা পড়েছিল, তার ওজন

ছিল ৪২·৪ টন। সেটি লম্বায় ছিল প্রায় ১৯ মিটার।

মানুষখেকো একটা White shark ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে কানাডার নিকটবর্তী নিউ ব্রানজউইকের হোয়াইট হেড দ্বীপের কাছের সাগরে ধরা পড়েছিল। সেটি লম্বায় ছিল প্রায় ১২ মিটার।

সাধারণতঃ হাঙ্গরেরা সাগরের উষ্ণ অঞ্চলের বাসিন্দা।

হোয়েল শার্কের ডিম সব প্রাণীর ডিমের চেয়ে বড়। ১৯৫৩ সালের ২৯শে জুন মেক্সিকো উপসাগরে ৩১ ফ্যাদম জলের তলায় একটি হোয়েল শার্কের ডিম পাওয়া গিয়েছিল। খোলাসমেত সেটির আয়তন ছিল ৩০ × ১৪ × ৯ সেন্টিমিটার।

॥ অক্টোপাস ॥

অক্টোপাস (octopus) সমুদ্রের এক ভয়াবহ প্রাণী। তাদের মাথা একটা ঢিপির মতো। তা থেকে আটটা লম্বা শুঁড় বেরিয়ে থাকে। সেই সব শুঁড়ের নীচের পিঠে অসংখ্য রক্ত-চোষা ছিদ্র থাকে। শুঁড়ের জোর সাংঘাতিক। তারা সেই সব শুঁড় দিয়ে কোন প্রাণীকে সবলে জড়িয়ে ধরে ও রক্ত চুষে খায়। এদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন!

অক্টোপাস যখন বেগতিক দেখে পালাতে থাকে তখন তাদের শরীর থেকে এক রকম কালো কালির মতো রস বেরোয়। সে রসে সমুদ্রের জল মলিন হয়ে যায়। আক্রমণকারী সেই মলিন জলে দিক্ হারিয়ে ফেলে।

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কাছে সমুদ্রতীরে একটা ৬-৭ টন ওজনের অক্টোপাস পাওয়া যায়। এর শুঁড় ছিল লম্বায় প্রায় ৬০ মিটার।

॥ স্কুইড ॥

স্কুইড (squid) এক ধরনের বৃহদাকার সামুদ্রিক প্রাণী, অক্টোপাসজাতীয় জীব। স্কুইডের মাথা থেকে শুঁড় বেরোয়।



অক্টোপাস

১৮৭৮ সালের ২রা নভেম্বর কানাডার নিউ-ফাউণ্ডল্যাণ্ডের কাছে একটা স্কুইড ধরা পড়ে। তার মাথা ও শরীর ছিল ৬.০৯ মিটার, শুঁড় ১০.৬৬ মিটার, মোট ১৬.৭৫ মিটার। এর ওজন ছিল প্রায় ২ টন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবরে নিউ জীল্যাণ্ডের নিকটবর্তী লায়াল বে (Lyall Bay)-তে ১৭.৩৭ মিটার লম্বা একটা giant squid ধরা পড়ে। তার শুঁড় ছিল ১৪.৯৩ মিটার।

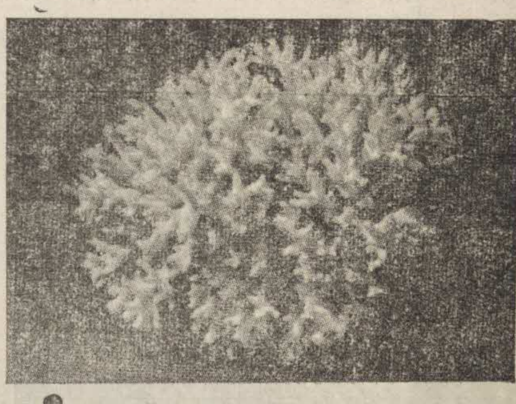
আক্রমণকারীদের কবল থেকে বাঁচবার জন্য স্কুইড সিপিয়া রঙের দেহরস বার করে সাগরের জল ঘোলাটে করে পালিয়ে যায়।

Giant squid-এর চোখ সব প্রাণীর চোখের চেয়ে বড়। চোখের ব্যাস প্রায় ৩৮ সেন্টিমিটার।

॥ প্রবাল ॥

প্রবাল (coral) এক ধরনের খুব ছোট পোকা। এদের গা থেকে চুনের মতো একরকম পদার্থ বেরোয়। তাকে বলে খড়ি (chalk) বা চা-খড়ি। সেই খড়ি জমে জমে সাগরের ধারে খড়ির পাহাড় গড়ে ওঠে।

কোটি কোটি প্রবালের দেহাবশেষ দিয়ে গড়া সাগরের প্রবালদ্বীপ। প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য প্রবালদ্বীপ দেখা যায়। কোথাও কোথাও বহু কিলোমিটার ব্যাপী বিরাট প্রবালদ্বীপ দেখা যায়। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের কোয়া-জ্যালেন (Kwajalein) পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রবালদ্বীপ। এই দ্বীপটির ২৮৩ কিলোমিটার লম্বা প্রবাল প্রাচীর ২,৮৬০ বর্গ কিলোমিটার একটি উপহ্রদ (lagoon)-কে বেষ্টন করে রেখেছে। মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরের লাইন দ্বীপপুঞ্জের ক্রিসমাস (Christmas) দ্বীপ একটি প্রকাণ্ড প্রবালদ্বীপ। এর স্থলভাগ ৪৭৮ বর্গ কিলোমিটার। উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যাণ্ডের কিছু দূরে অবস্থিত Great Barrier Reef-ই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা প্রবাল প্রাচীর—লম্বায় ২,০২৮ কিলোমিটার।



প্রবাল (mushroom coral)

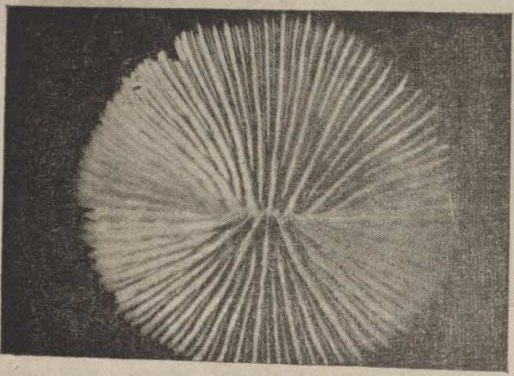
আকারে অতি ক্ষুদ্র কিন্তু অকল্পনীয়ভাবে সংখ্যাতীত প্রবাল কীটের দেহাবশেষে সাগরের মধ্যে বড় বড় দ্বীপ গড়ে উঠেছে।

প্রবালের দেহাবশেষ নানা ধরনের—গাছ, পাখা, ব্যাঙের ছাতা প্রভৃতি নানা আকারের। যে-সব প্রবাল আমরা দেখি, তা অসংখ্য প্রবালকীটের দেহাবশেষ জুড়ে জুড়ে এই ধরনের আকারে গড়ে উঠেছে। প্রবাল নানা রঙের। রক্তবর্ণ প্রবাল সাধারণতঃ ভারত মহাসাগরে ও ভূমধ্যসাগরে দেখা যায়।



প্রবাল (rose coral)

লাল রঙের প্রবাল কেটে আংটি, হার প্রভৃতি গহনায় বসানো হয়। চলিত কথায় তাকে বলে পলা।

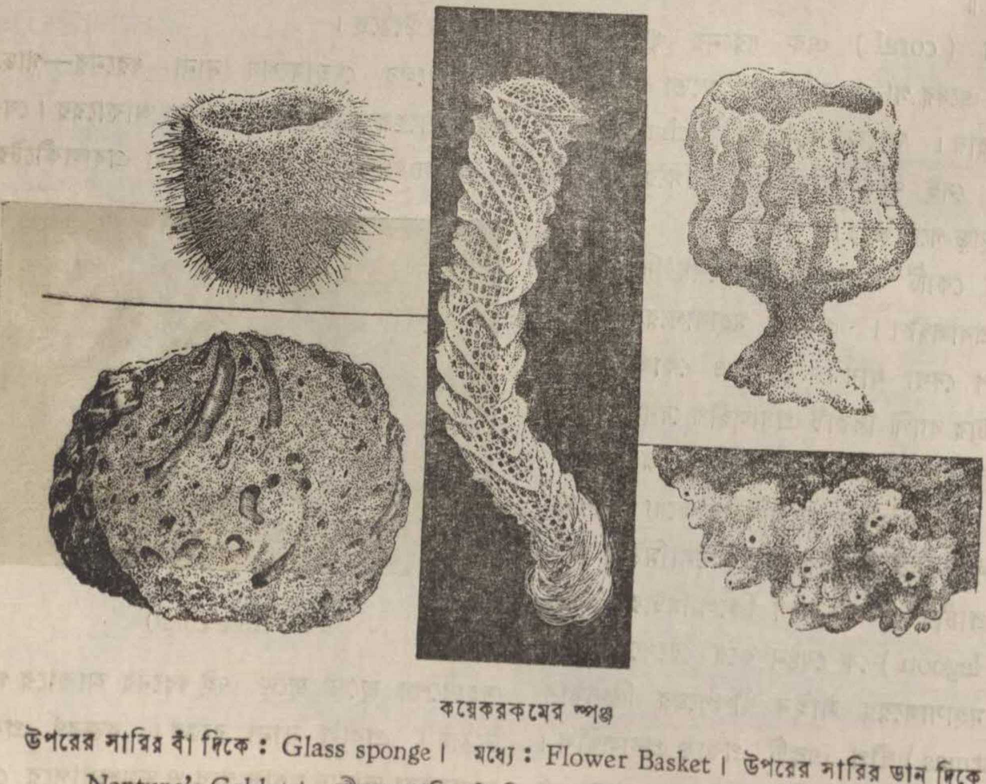


প্রবাল (mushroom coral)

॥ স্পঞ্জ ॥

যে-সব স্পঞ্জ দেখা যায়, তা একরকম সামুদ্রিক জীবের নরম, ফাঁপা ও হালকা দেহকঙ্কাল। এই স্পঞ্জে অসংখ্য ফুটো থাকে। সেইজন্য তাকে চেপে ধরলে ছোট হয়ে যায়, আবার ছেড়ে দিলে আগের মতো আকার পায়।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ফ্লোরিডার মধ্যবর্তী সাগরে সবচেয়ে বড় স্পঞ্জ পাওয়া গেছে। তা ১'০৬৬৮ মিটার উঁচু, ব্যাস '৯১৪৪ মিটার। ইন্দো-নেশিয়ার নেপচুন'স কাপ ১'২০ মিটার উঁচু হয়। ১৯০৯ সালে বাহামা দ্বীপপুঞ্জের কাছে একটি ১'৮৩ মিটার পরিধি-বিশিষ্ট উল স্পঞ্জ পাওয়া গিয়েছিল।



কয়েকরকমের স্পঞ্জ

উপরের সারির বাঁ দিকে : Glass sponge। মধ্যে : Flower Basket। উপরের সারির ডান দিকে। Neptune's Goblet। নীচের সারির বাঁ দিকে : জীবন্ত স্পঞ্জকে কেটে দেখানো হয়েছে। ডান দিকে : Encrusting sponge।]

সবচেয়ে ছোট স্পঞ্জ যা জানা গেছে তা মাত্র ৩ মিলিমিটার উঁচু হয়।

৫৬৩৮ মিটার জলের তলা থেকেও স্পঞ্জ পাওয়া গেছে।

॥ উড়ুক্কু মাছ ॥

যাদের বলা হয় উড়ুক্কু মাছ (flying fish), তাদের প্রকৃতই ওড়বার ক্ষমতা নেই। তাদের বড় বড় পাখনা আছে। সাগরজল থেকে লাফিয়ে উঠে



উড়ুক্কু মাছ

সেই সব পাখনায় ভর করে প্রায় '৪০ কিলোমিটার পর্যন্ত বাতাসে ভেসে চলতে পারে। তার পর ঝুপ করে জলে পড়ে যায়। এই মাছের শূন্যে ভেসে চলার গতি ঘণ্টায় ৬৪ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

॥ তরোয়াল মাছ ॥



তরোয়াল মাছ (sword fish)-এর ঠোঁটটি লম্বা সরু হয়ে এগিয়ে থাকে মাথার সামনে। এই সরু ঠোঁটকে তরোয়াল বলা হয়। তাই থেকে মাছটার নাম হয়েছে তরোয়াল মাছ। এই তরোয়াল দিয়ে এরা শত্রুকে আক্রমণ করে। বিরাট আকারের তিমিও এর আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় না। সমুদ্রগামী নৌকার আরোহীরা তরোয়াল মাছকে ভীষণ ভয় করে।

॥ সিন্ধুঘোটক ঃ সীল ॥

সিন্ধুঘোটক (walrus) ঠাণ্ডার দেশের সমুদ্রে বাস করে। শুধু সমুদ্রের জলে নয়, অনেক সময় তারা ডাঙ্গাতেও কাটায়। এদের ওজন কখনও কখনও ২ টনেরও বেশী হয়।

এদের মাথা ছোট। মুখের দুপাশ দিয়ে ৩৮ সেন্টি-মিটার থেকে ৬০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা দাঁত বেরোয়।

সিন্ধুঘোটক সীলেরই অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধুসিংহ (sea lion), সিন্ধুহস্তী (sea elephant বা elephant seal), Monks seal, Weddel seal, Californian sea lion, Grey seal, Crabeater seal, Ringed seal, Baikal seal প্রভৃতি নানা জাতের (প্রায় ৩১ রকম) সীল দেখা যায়।

এদের মধ্যে কোন কোন জাত অপেক্ষাকৃত উষ্ণ জলের বাসিন্দা।

এ পর্যন্ত দক্ষিণদেশীয় হস্তী সীলকে লম্বায় ৫ মিটার পর্যন্ত হতে দেখা গেছে। সে-সব সীলের ওজন হয় প্রায় ৫০০০ পাউণ্ড (২'১৮ টন)। সবচেয়ে বড় হস্তী সীল যা পাওয়া গেছে তার ওজন ছিল প্রায় ৪ টন, সেটি লম্বায় ছিল ৬½ মিটার।

সুমেরু সাগরের Ringed seal ও বৈকাল হ্রদের Baikal seal আকারে খুব ছোট হয়। এরা সাধারণতঃ লম্বায় হয় দেড় মিটার। ওজন ২৮০ পাউণ্ড পর্যন্ত হয়।



সিন্ধু-সিংহ

দক্ষিণ মেরু সমুদ্রের Crabeater seal সংখ্যায় খুব বেশী হয়। ১৯৭৮ সালে এদের সংখ্যা প্রায় দেড় কোটির মতো মনে হয়েছে।

Californian sea lionকে ঘণ্টায় ৪০ কিলো-মিটার গতিতে সাঁতার দিতে দেখা গেছে। একটি



একপাল সীল

পুরুষ Weddel seal-কে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু সাগরে ৬০০ মিটার পর্যন্ত জলের তলায় যেতে দেখা গেছে।

কোন সীলের শুঁড় থাকে, কারো ঘাড়ে সামান্য লোম হয়, কারো থাকে **গজদন্ত**।

॥ সী-হর্স ॥

সাগরের যে প্রাণীকে বলা হয় সী-হর্স (sea-horse) তার সঙ্গে ডাঙ্গার জন্তু ঘোড়ার কোনই মিল নেই। শুধু তার মুখটা ঘোড়ার মতো ছুঁচলো।

Sea-horse বেশির ভাগই গরম জলের সাগরে বাস করে। জলে বেশীক্ষণ থাকে না। সে তার বড়জোর ফুটখানেক লম্বা দেহ নিয়ে সাগরের জলের কোন গাছকে লেজ দিয়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে। লেজ কতকটা কুমীরের লেজের মতো।



সী-হর্স

Sea-horse মৎস্যশ্রেণীভুক্ত। প্রায় ২০ জাতের Sea-horse দেখা যায়। তারা খাড়াভাবে জলে সাঁতার দেয়।

॥ সমুদ্রের প্রাণীর সম্বন্ধে নানা কথা ॥

সমুদ্রের অনেক গভীরে গাঢ় অন্ধকার। সেই অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। বেঁচে থাকতে গেলে খেতে হবে। সেই জন্যে সেই অন্ধকার রাজ্যের প্রাণীদের বিশেষ করে মাছেদের আহারের সন্ধানে বেরোতে হয়।

প্রকৃতি তাদের অন্ধকারে দেখতে পাওয়ার মতো শক্তি দিয়েছে। তাদের দেহের নানা স্থান থেকে নানা রঙের আলো বেরোয়। সেই আলোতে তারা শিকার অন্বেষণ করে।

যারা অন্ধ তাদের পাখনা খুব সরু ও লম্বা। তাই দিয়ে তারা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলে।

কত রকমের মাছ ও প্রাণী যে আছে, তা বর্ণনাতীত। বহু ভয়ংকর আকৃতির ও হিংস্র প্রকৃতির মাছ ও প্রাণী আছে। বৈদ্যুতিক বান মাছের মতো অনেক মাছের গা থেকে রীতিমতো তেজঃসম্পন্ন বিদ্যুৎ বেরোয়। তার শক্ খেলে বড় বড় প্রাণীরাও মূর্ছিত হয়ে পড়ে। অনেক মাছ বা প্রাণীর গায়ে বড় বড় ধারালো কাঁটা থাকে। সেই কাঁটার জন্য শত্রুরা তাদের কাছে ঘেঁষতে ভয় পায়।

অনেক মাছ বা প্রাণী খুব বিষাক্ত। তাদের খাওয়া তো দূরের কথা, তাদের স্পর্শে অন্য মাছ বা প্রাণীকে মৃত্যু বরণ করতে হয়।

ভীষণাকৃতি দানব মাছের মতো বহু মাছ আছে, যাদের দেখলে ভয়ে অন্য কোন মাছ বা প্রাণী তাদের কাছে ঘেঁষে না।

স্থলভাগের বেশির ভাগ জীব আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু সাগরের জলের, বিশেষ করে গভীর জলের মাছ ও প্রাণীর সম্বন্ধে যতই আমরা জানতে পারছি, ততই বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ছি।



উদ্ভিদ্ বা গাছপালা ও জীবজন্তু নিয়ে পৃথিবী। পৃথিবীতে জীবজন্তুর উদ্ভবের অনেক আগেই গাছ-পালার সৃষ্টি হয়েছে। সৃষ্টির আদিম যুগের গাছ-পালার চেহারা বর্তমান যুগের মতো মোটেই ছিল না। প্রথমে সাগরের জলে এক ধরনের শেওলার উৎপত্তি হয়। তা-ই পৃথিবীর প্রথম গাছ। তাতেই প্রাণের আবির্ভাব সূচিত হয়। সে আজ থেকে প্রায় দুশো কোটি বছর আগেকার কথা।

সুদীর্ঘ কালের মধ্য দিয়ে গাছপালা তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। এ রূপেরও পরিবর্তন হবে। সৃষ্টির আদিম যুগে গাছপালা বড় হতে হতে বিরাট আকার ধারণ করে। তখনকার দিনে বেশির ভাগ গাছ ছিল ফার্ন জাতীয়। সে-সব ফার্নজাতীয় গাছের উচ্চতা ছিল ৯/১০ মিটার।

॥ উদ্ভিদের প্রাণ ॥

উদ্ভিদের জন্ম, বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। উদ্ভিদ্ খায়, ঘুমায়। সাধারণ প্রাণীর মতো তাদের চলার শক্তি নেই, তাদের কণ্ঠ বলে এমন কিছু নেই, যা থেকে কোন রকম স্বর বেরোয়। তবুও তাদের



শ্রাবজাতীয় গাছ

যে প্রাণ আছে, তা আমাদের দেশের ঋষিরা বহু



অ্যারিস্টটল



লিনিয়াস (৯৭ পৃঃ)

সহস্র বৎসর আগে বলে গেছেন। এ যুগে সকল দেশের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, গাছের প্রাণ আছে। জগতের শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের সাহায্যে দেখিয়েছেন, গাছের প্রাণ আছে, গাছের সুখদুঃখবোধ আছে, গাছ কাঁদে, ঘুমায়।

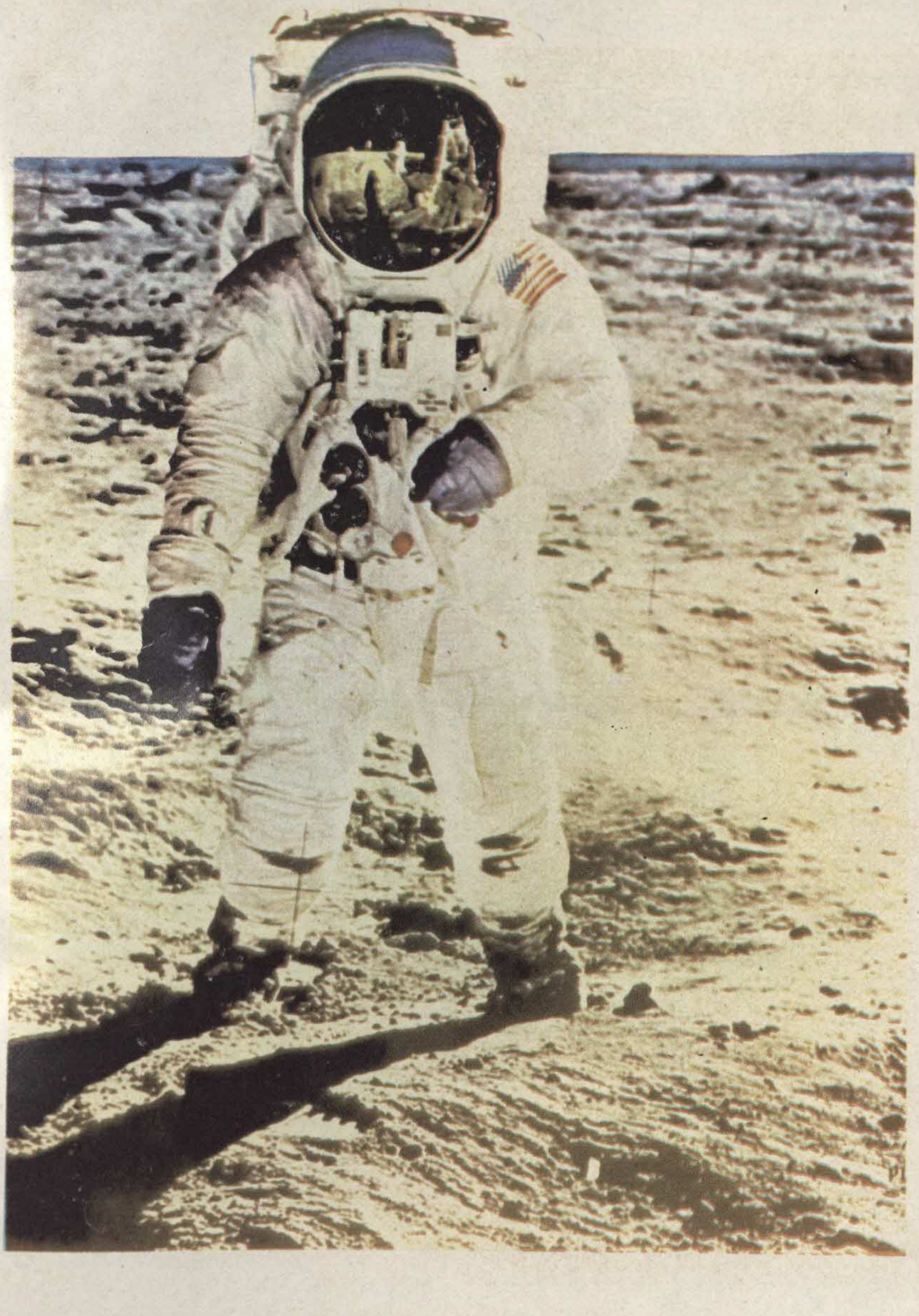
পৃথিবীতে নিত্য নূতন গাছ আবিষ্কৃত হচ্ছে। এ পর্যন্ত প্রায় ৪ লক্ষ গাছের বিবরণ বিজ্ঞানীরা লিপিবদ্ধ করেছেন। উচ্চ পর্বতের গভীর অরণ্যে, সমুদ্রের অতলে আরো বহু রকম গাছ অনাবিষ্কৃত হয়েই আছে।

॥ উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ ॥

উদ্ভিদ্ কত প্রকারের, তা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন মনীষী বলে গেছেন। বিজ্ঞানী অ্যারিস্টটল বলেছিলেন, গাছপালাকে গুল্ম (herb), ঝোপ গাছ বা শ্রাব (shrub) ও মহীরুহ এই তিন ভাগে ভাগ করা চলে। তাঁর শ্রেণীবিভাগ বিজ্ঞানী-মহলে স্বীকৃত হয় নি।

ভারতের প্রাচীন যুগের ঋষি শুক্রাচার্যের গাছপালা সম্বন্ধে শ্রেণীবিভাগ পুরাপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক বলা হয় না। তিনি সব গাছপালাকে মাত্র দুটি ভাগে ভাগ করেছিলেন—ফলীন ও আরণ্যক। তাছাড়া আর একটি ভাগের কথাও তিনি বলেছিলেন, নিত্যপ্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্।

চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপাণি সব গাছপালাকে চারিটি ভাগে ভাগ করেছিলেন—বনস্পতি, বানস্পত্য, ওষধি ও বীরুধ্। বনস্পতি তাদের বলে যে-সব গাছে ফল ধরে কিন্তু ফুল হয় না। ফুল ও ফল দুই-ই হয় এমন গাছ বানস্পত্য। ফল ধরার পর যে-সব গাছ মরে যায় সেই সব গাছকে বলা হয় ওষধি। বীরুধ্ মানে লতা।



চাঁদে প্রথম মানুষ

পূর্ণিমার রাত্রে আকাশের দিকে তাকালে চাঁদকে মনে হয় একটা রূপোর থালা। কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে চাঁদ থালা নয়। প্রায় ৩,৪৭৫ কিলোমিটার চওড়া একটা বিরাট মাটি-পাথরে গড়া গোলক। আমাদের পৃথিবী থেকে ৩,৮৪,৪০০ কিলোমিটার দূরত্বে মহাশূন্যে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করছে।

দুঃসাহসী মানুষ সেই চাঁদে পৌঁছবার জন্যে বহুদিন ধরে চেষ্টা করে এসেছে। সোভিয়েট রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচেষ্টা অতি প্রশংসনীয়। ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই নীল আর্মস্ট্রং, এডউইন অলড্রিন ও মাইকেল কলিন্স মহাকাশগামী রকেটে চড়ে চাঁদে গিয়ে পৌঁছেন। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চন্দ্রযানে করে চন্দ্রপৃষ্ঠে পদার্পণ করেন।

পূর্বপৃষ্ঠার ছবিতে চন্দ্রপৃষ্ঠে অলড্রিনকে দেখা যাচ্ছে। আর্মস্ট্রং তাঁর আলোকচিত্র গ্রহণ করেন।

['মহাকাশ অভিযান' দ্র.]

'অমরকোষ' প্রণেতা অমরসিংহ সব গাছপালাকে ছয় শ্রেণীতে ভাগ করে বলেছিলেন—বৃক্ষ, ক্ষুপ, লতা, ওষধি ও তৃণদ্রুম। নানা দেশের নানা মনীষী এইভাবে গাছপালাকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় কিন্তু পুরাপুরি বিজ্ঞানভিত্তিক না হওয়ায় বর্তমান যুগের বিজ্ঞানী-মহলে স্বীকৃত হয় নি।

সুইডেনের ডাক্তার ও উদ্ভিদবিজ্ঞানী লিনিয়াস (Carl Von Linne Linnaeus, ১৭০৭-৭৮ খ্রী.) উদ্ভিদের যে শ্রেণীবিন্যাস করেন ও সব গাছপালার ল্যাটিন নামকরণ করেন তা-ই মোটামুটি বর্তমানে প্রচলিত। তাঁকে উদ্ভিদের আধুনিক শ্রেণী-বিন্যাসের জনক বলা হয়। জর্জ বেন্থাম, যোশেফ এবং আরো অনেকে বিভিন্ন সময়ে নানাভাবে উদ্ভিদের শ্রেণীবিভাগ করেন। শেষ পর্যন্ত শ্রেণীবিন্যাস এই ভাবে করা হয়—



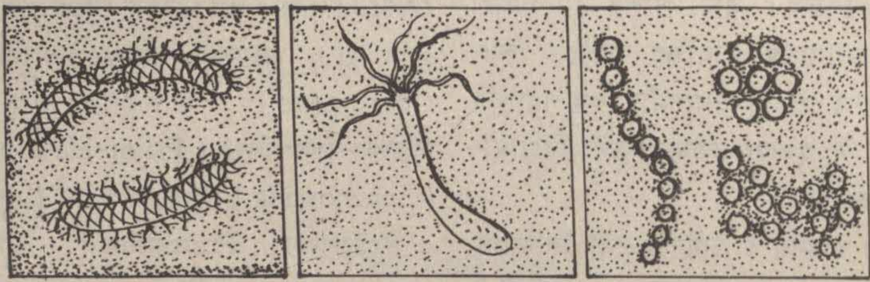
(১) থ্যালোফাইটা (Thallophyta), (২) ব্রায়োফাইটা, (Bryophyta) (৩) প্‌টেরিডোফাইটা (Pteridophyta) ও (৪) স্পারম্যাটোফাইটা (Spermatophyta)। প্রথম তিনটি অপুষ্পক বা ক্রিপটোগ্যাম্‌স্ (Cryptogams), চতুর্থ শ্রেণী সপুষ্পক বা ফ্যানারোগ্যাম্‌স (Phanerogams)।

সমগ্র উদ্ভিদ্‌জগতের বিস্তৃত শ্রেণীবিভাগ এই রকম—নন্‌-ভ্যাসকুলার (Non-vascular) ও ভ্যাসকুলার (Vascular)। নন্‌-ভ্যাসকুলার চার শ্রেণীতে বিভক্ত—ব্যাকটিরিয়া (Bacteria), ফাংগাই (Fungi), অ্যালজী (Algae) ও ব্রায়োফাইটা (Bryophyta)। ভ্যাসকুলার চার শ্রেণীতে বিভক্ত—সিলপসিডা (Psilopsida), স্ফেনপসিডা (Sphenopsida), লাইকোপসিডা (Lycopsida) ও প্‌টেরপসিডা (Pteropsida)। প্‌টেরপসিডা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—ফিলিসিনী (Filicinne), জিম্‌নস্পারমী (Gymnospermae) ও অ্যানজিওস্পারমী (Angiospermae)। অ্যানজিওস্পারমী পুনরায় দুভাগে বিভক্ত—মনোকটিলিডোনিজ (Monocotyledones) ও ডাইকটিলিডনিজ (Dicotyledones)।

॥ ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু ॥

ব্যাকটিরিয়া বা জীবাণু এককোষী উদ্ভিদ। কোষের মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম। এরাই পৃথিবীর সবচেয়ে পুরানো বাসিন্দা। এদের দেহে ক্লোরোফিল (chlorophyll) নেই। তাই তারা খাদ্য তৈরি করতে পারে না। তাদের পচা গলা খাদ্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এ ক্ষেত্রে তাদের বলা হয় মৃতজীবী (Saporophyte)। তারা যেহেতু অন্য গাছ বা প্রাণীর দেহ থেকে

খাদ্য সংগ্রহ করে, তাদের বলা হয় পরজীবী (Parasite)। ছত্রাক যা সহজেই চোখে পড়ে সে-সব ছত্রাককে গাছের গুঁড়িতে বা মোটা ডালে দেখা যায়।



নানা আকারের জীবাণু

জীবাণুদের আকার তিন রকমের—ছোট বলের মতো (Coccus), বাঁকানো বা পেঁচানো (Spirillum) ও লম্বা লাঠির ন্যায় (Bacillus)। যে সব জীবাণু গতিসম্পন্ন তাদের মাথায় এক বা একাধিক সরু চুলের ন্যায় জিনিস থাকে যার নাম ফ্ল্যাজেলা (Flagella)।

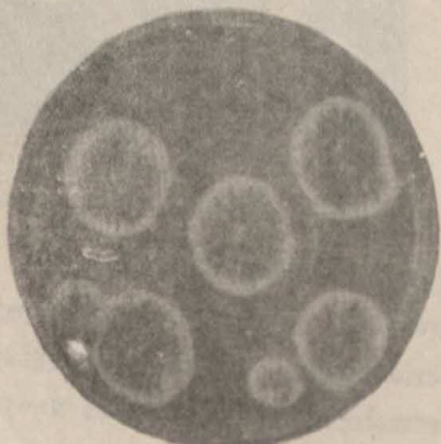
কোষবিভাগ করে জীবাণুরা বংশবৃদ্ধি করে।

উপকারী ও অপকারী দুরকম জীবাণুই আছে। উপকারী জীবাণুরা পাট গাছ পচিয়ে আঁশ আলাদা করায় সাহায্য করে। দুধ থেকে দই তৈরি করতে হলে এই ধরনের জীবাণুর প্রয়োজন। গাছের খাদ্য ও সার তৈরিতে এই সব জীবাণু যথেষ্ট সহায়তা করে। চীজ তৈরি ও চীজের সুগন্ধ জীবাণুদের দ্বারাই সংঘটিত হয়। জীবাণুর সাহায্যেই ভিনিগার তৈরী হয়। এইভাবে অসংখ্য প্রকারে উপকারী জীবাণুরা মানুষ, প্রাণী ও উদ্ভিদ্-জগৎকে সাহায্য করে আসছে।

অপকারী জীবাণুদের দ্বারাই নানা রোগের সৃষ্টি হয়।



ছত্রাক



পেনিসিলিন

॥ ছত্রাক বা ফাংগাই (Fungi) ॥



ছত্রাক ছোট বড় নানা ধরনের। এককোষী ছত্রাকদের খালি চোখে দেখা যায় না। বড় বড়

ছত্রাক উপকারী ও অপকারী দুই-ই হয়। ঈস্ট,

পেনিসিলিন প্রভৃতি উপকারী ছত্রাক। রুটি-বিস্কুট ফোলাবার বা ফাঁপাবার জন্য ঈস্টের প্রয়োজন হয়। ঈস্ট থেকে ভিটামিন বি বা রিবোফ্লাভিন পাওয়া যায়।

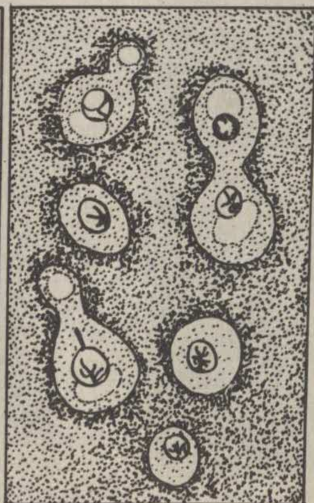
পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, অরিওমাইসিন, ক্লোরোমাইসিটিন, টেরামাইসিন, এরিথ্রোমাইসিন, টেট্রাসাইক্লিন প্রভৃতি বহু জীবনদায়ী ঔষধ উপকারী ছত্রাক থেকেই তৈরী হয়ে থাকে।

॥ পেনিসিলিন আবিষ্কার ॥

বর্তমানে পেনিসিলিন এক বিস্ময়কর ঔষধ।



পেনিসিলিয়াম
(Penicillium)



ঈস্ট
(Yeast)



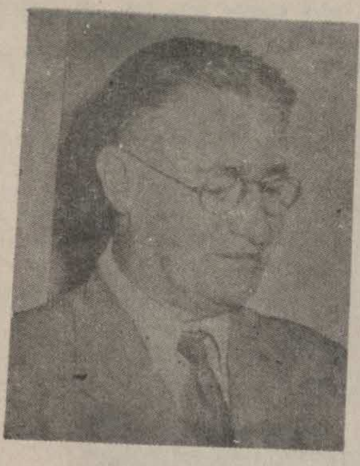
গবেষণাগারে ফ্লেমিং (১০০ পৃঃ)

স্তার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Sir Alexander Fleming, ১৮৮১—১৯৫৫) গবেষণাগারে বসে ১৯২৮ খ্রীঃ এক ধরনের ছত্রাক আবিষ্কার করেন যার নাম Penicillium notatum।



চেন

বিজ্ঞানী ফ্লোরে (Florey) পেনিসিলিনকে ব্যবহারযোগ্য করে তোলেন। বিগত মহাযুদ্ধের



ফ্লোরে

সময় পেনিসিলিন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং, ফ্লোরে ও চেন (Chain) যুগ্মভাবে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। যে ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন তৈরী হয়, তা লেবুজাতীয় ফলের গায়ে জন্মে থাকে।

॥ অপকারী ছত্রাক ॥



বহু ছত্রাক যেমন উপকারী, অপকারীর সংখ্যাও কম নয়। ব্যাঙের ছাতা মানুষে খায়। নানা দেশে



ব্যাঙের ছাতা

সেই সব ধরনের ভক্ষ্য ব্যাঙের ছাতার ব্যাপক চাষ হয়ে থাকে। কিন্তু বহু অপকারী ব্যাঙের ছাতা আছে। সেই সব ছাতা রীতিমতো বিষাক্ত। পাড়া-গাঁয়ের গরিব লোকে বাছবিচার না করে সেইসব বিষাক্ত ব্যাঙের ছাতা খেয়ে জীবন পর্যন্ত হারায়।

অনেক রকম ছত্রাক বড় বড় গাছের ভীষণ ক্ষতি করে। সেই সব ছত্রাক বহুসংখ্যক ছত্রাকের সৃষ্টি করে গাছের আয়ু কমিয়ে দেয়।

॥ লাইকেন ॥

নীরস পাথরের খাঁজে খাঁজে কোন গাছ জন্মাতে পারে না। কিন্তু লাইকেন জন্মায়। এ এক অদ্ভুত গাছ—ছত্রাক ও শেওলার মিলিত অবস্থা। শেওলায় ক্লোরোফিল থাকে বলে খাবার তৈরি করতে পারে। ছত্রাক সেই খাদ্যের অংশ গ্রহণ করে এবং শেওলার সবুজ অংশকে রক্ষা করতে ও জমিয়ে

রাখতে সাহায্য করে। ছত্রাক ও শেওলা পরস্পরের সাহায্য করে, কেউ কারো অনিষ্ট করে না।

লাইকেনের দেহাবশেষ জমা হয়ে হয়ে জমি উর্বরা হয়। তার ফলে অন্য গাছের পক্ষে সেই উর্বরা মাটিতে ভালো ভাবে বেড়ে উঠে ফলফুল প্রদানের সুবিধা হয়।



৩
লাইকেন

॥ ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা ॥

ব্রায়োফাইটা (Bryophyta) ও টেরিডোফাইটা (Teridophyta) অপুষ্পক গাছপালা। মস্ ও মস্‌জাতীয় গাছপালারা ব্রায়োফাইটা শ্রেণীভুক্ত। আদিম যুগে সারা পৃথিবী ঢাকা ছিল ব্রায়োফাইটা গাছে।

বহু লক্ষ বৎসর আগে পৃথিবীময় ছিল টেরিডোফাইটার আধিপত্য। এই গাছেদের আকার ছিল খুব বড়। আজকালকার ট্রি ফার্ন (Tree fern) টেরিডোফাইটা শ্রেণীভুক্ত। তবে এখন এই সব গাছ ৩ থেকে ৪.৫ মিটারের বেশী উঁচু হয় না। সে যুগে এদের উচ্চতা ৯ থেকে :২ মিটারেরও বেশী ছিল।

এই টেরিডোফাইটা গাছের বন প্রাকৃতিক কারণে মাটি চাপা পড়ে যায়। ভীষণ চাপে ও তাপে সেই সব গাছ কয়লায় পরিণত হয়ে যায়।

আজকালকার টেরিডোফাইটা গাছের অন্তর্ভুক্ত ফার্ন গাছের আঁশ দিয়ে গদি ও তোশক তৈরী হয়। হাওয়াই দ্বীপে এই গদি ও তোশক তৈরির চলন বেশী। নিউ জীল্যাণ্ডে কয়েকরকম ট্রি ফার্নের কাণ্ড ভক্ষ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কাণ্ড থেকে কয়েক রকম ওষুধও তৈরী হয়ে থাকে।

॥ স্পারম্যাটোফাইটা ॥

স্পারম্যাটোফাইটা (Spermatophyta) সপুষ্পক গাছ। এদের ফুল ও ফল হয়। বীজ থেকে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। স্পারম্যাটোফাইটার দু'টি ভাগ—জিমনোস্পারম (Gymnosperm) ও অ্যানজিওস্পারম (Angiosperm)। জিমনো-স্পারম গাছকে সাধারণতঃ বিলিতী ঝাউ বলা হয়। পাইনজাতীয় গাছ জিমনোস্পারম। পাইন, সুগা, জুনিপার, অ্যাবিস, থুজা, ক্রিপটোমেরিয়া প্রভৃতি পার্বত্য গাছ জিমনোস্পারম।

যে জিমনোস্পারম গাছে 'কোন্' (cone)

নামে শক্ত ধরনের ফল ফলে তাকে বলে কনিফার (conifer)। কনিফার গাছের আয়ু, উচ্চতা ও বেড় পৃথিবী-বিখ্যাত।

অ্যানজিওস্পারম সর্বাপেক্ষা উন্নত গাছপালা। এই গাছ খুব বড় হয়, অনেক দিন বাঁচে।

॥ পাতা ॥

পাতায় গাছের খাদ্য তৈরী হয়। শিকড় থেকে খনিজ পদার্থ মিশানো রস পাতায় চলে আসে। কার্বন ডাই-অক্সাইড ও সূর্যরশ্মি থেকে শক্তি ধরে পাতা সদ্ব্যবহার করে। ক্লোরোফিল বা পত্রহরিৎ নামের সবুজ কণিকা খাদ্য তৈরিতে সাহায্য করে।

পাতার তিনটি অংশ—ফলক, বোঁটা বা বৃন্ত ও গোড়া। সব পাতায় বৃন্ত থাকে না। তারা অবৃন্তক পাতা। আকন্দ, শিয়ালকাঁটা প্রভৃতি অবৃন্তক পাতা। অশ্বত্থ, বট, আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতির পাতা সবৃন্তক অর্থাৎ এদের পাতায় বৃন্ত বা বোঁটা আছে।

শ্বাসত্যাগের কাজ চলে। স্টোমাটার ছিদ্রপথেই অতিরিক্ত জল বাইরের বায়ুমণ্ডলে বেরিয়ে যায়। এর নাম প্রস্বেদন বা ট্রান্সপিরেশন।

॥ ফুল ॥

ফুল থেকে ফল হয়। ফলের বীজ দ্বারা উদ্ভিদের বংশরক্ষা হয়। ফুল শুধু বাইরের সৌন্দর্যের জন্য সৃষ্ট নয়। তবে ফুলের সৌন্দর্য ও গন্ধ কীট-পতঙ্গাদিকে আকর্ষণ করে। তার ফলে পরাগ-সংযোগ (pollination) ঘটে থাকে। ফুল থেকে ফল হতে গেলে পরাগ-সংযোগ হতেই হবে। কীট-পতঙ্গাদি ছাড়া, জলের স্রোত, হাওয়া প্রভৃতির দ্বারাও পরাগ-সংযোগ ঘটে থাকে।

ফুল বিধাতার এক অপূর্ব মনোহর সৃষ্টি।

॥ উদ্ভিদের আত্মরক্ষা ॥

উদ্ভিদের চলাফেরার ক্ষমতা নেই। শত্রুর আক্রমণ থেকে বাঁচবার জন্য এদিক্ ওদিক্ করতে



সাপফুল দেখে হরিণ পালাচ্ছে (১০৩ পৃঃ)

সূর্যের আলোর সাহায্যে পাতার ক্লোরোফিল জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সঙ্গে রাসায়নিক ক্রিয়ায় খাদ্য তৈরি করে ও স্টোমাটা (stomata) বা পাতার ছিদ্র দিয়ে অক্সিজেন ছেড়ে দেয়। এই প্রণালীর নাম সালোক-সংশ্লেষ বা অঙ্গার আত্তীকরণ (carbon assimilation)।

স্টোমাটার ছিদ্রপথেই উদ্ভিদের শ্বাসগ্রহণ ও

পারে না, হস্তস্বরূপ শাখাসঞ্চালন করা তার ক্ষমতার বাইরে। তাই প্রকৃতি তাদের কিছু কিছু আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেছে।

গোলাপ, বেগুন গাছ, শিয়ালকাঁটা, ফণীমনসা, বেল গাছ, কুল গাছ প্রভৃতি কাঁটার দ্বারা আত্মরক্ষা করে। এই কাঁটা গাছগুলির বর্শার মতো।

বিছুটি গাছের ডাঁটা, পাতা বা ফলে বিষাক্ত

শুঁয়া আছে। সেই শুঁয়ার সংস্পর্শে প্রাণীর গা জ্বালা করে। সেই জ্বালার ভয়ে প্রাণীরা গাছের কাছে যায় না।

ভেরেণ্ডা, পুনর্নবা, করবী, কলকে, বট প্রভৃতি গাছের পাতায় ডালে আঠা থাকায় ছাগল, গরু প্রভৃতি জীব এ গাছ খেতে চায় না।

আফিমের মরফিন, তামাকের নিকোটিন, সিনকোনার কুইনিন পশুদের আক্রমণ থেকে বাঁচার পক্ষে সহায়।

ওল, কচু গাছ খেলে গলা মুখ চুলকোয়। সেই জন্যে প্রাণীরা এ সব গাছ খায় না।

এক ধরনের ফুল আছে, যাকে দেখলে মনে হয় সাপ ফণা ধরে আছে। তাই দেখে কোন জন্তু কাছে যায় না। ভয়ে পালিয়ে যায়।

॥ বীজ ছড়ানো ॥

বীজ থেকে গাছ হয়। গাছ সব সময়েই বংশ রক্ষার জন্য উদ্‌গ্রীব। কিন্তু উদ্ভিদ্ তো চলাফেরা করতে পারে না। কি করে তারা তাদের বীজ ছড়িয়ে দেবে।

কিন্তু প্রকৃতির ব্যবস্থায় তাদের বীজ আপনা-আপনি নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ে। মটর, দোপাটি, অপরাজিতা ইত্যাদির ফল পাকলে তার ভিতরকার বীজ ছিটকে কিছু দূরে গিয়ে পড়ে।

শিয়ালকাঁটা, পোস্ত প্রভৃতির বীজ বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। শিমূল তুলোর বীজ বাতাসে ভেসে অনেক দূরে চলে যায়।

নারকেল জলে ভেসে দূর দূরান্তরে চলে যায়। পদ্মফুলের চাক জলে ভেসে যায়। তার মধ্যকার বীজ কোন জায়গায় গিয়ে পড়লে গাছ জন্মায়।

চোরকাঁটা, বনওকড়া, বাঘনখ প্রভৃতির বীজ জীব-জন্তুর গায়ে লেগে যায়। তার ফলে সেই সব বীজ অনেক দূরের জায়গায় গিয়ে অঙ্কুরিত হয়।

শাল, সজনে প্রভৃতির বীজ বাতাসে ভেসে যায়। এইভাবে গাছ নিজে চেষ্টা না করে তার বংশ রক্ষা করে।

এই রকম নানা দিক্ দিয়ে প্রকৃতি চলচ্ছক্তিহীন গাছপালাকে যথাসম্ভব বংশ বিস্তার করতে সাহায্য করে।

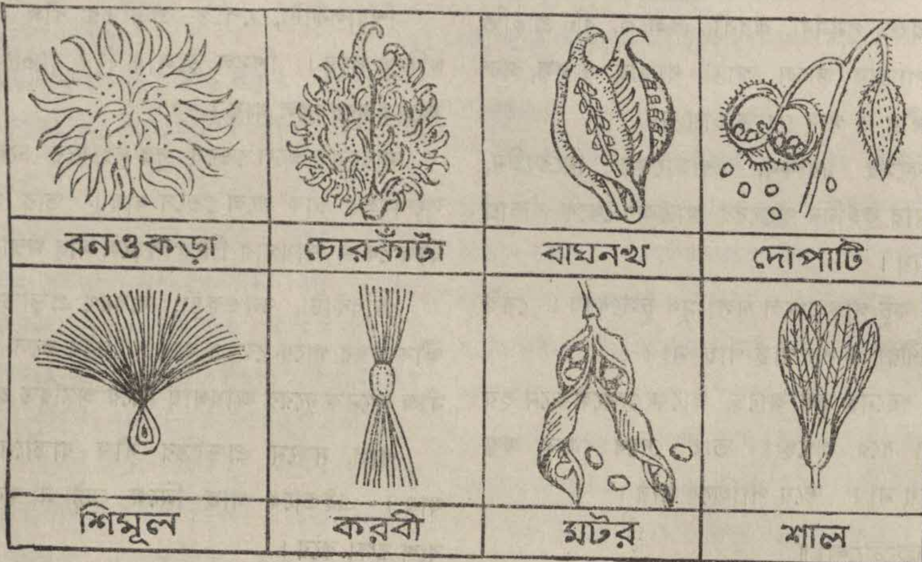


॥ পতঙ্গভুক উদ্ভিদ্ ॥

কোন কোন গাছ শুধু সালোক-সংশ্লেষ দ্বারা

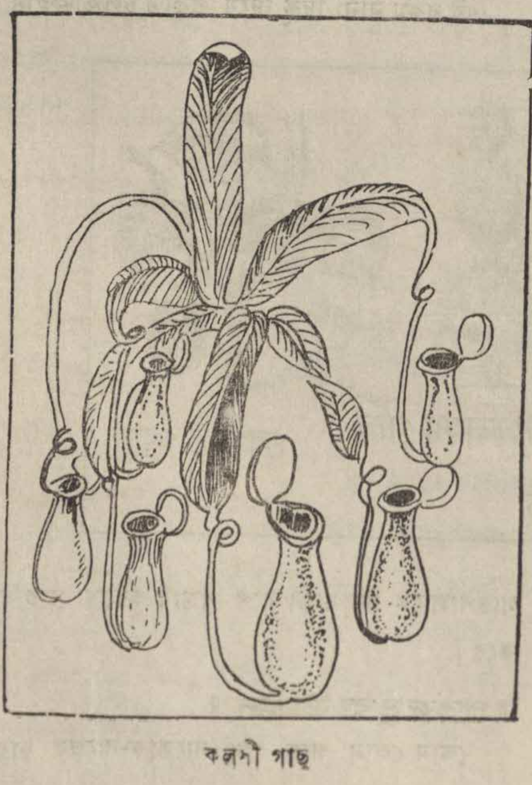
খাদ্য গ্রহণ করে না। ছোট ছোট কীটপতঙ্গ ধরে খায় এমন অনেক গাছ আছে। এদের বলে পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ (insectivorous plants)।

কলসী গাছ (pitcher plant) এক ধরনের অতি পরিচিত পতঙ্গভুক্ গাছ। ভারতের গারো, খাসি, জয়ন্তিয়া প্রভৃতি পাহাড় অঞ্চলে ও পৃথিবীর



নানা স্থানে এই গাছ দেখা যায়। এই গাছের পাতার ডগায় কলসীর ন্যায় চেহারা তৈরী হয়। কলসীর মধ্যে এক ধরনের রস থাকে। উপর থেকে পিঁপড়ে, ফড়িং, প্রজাপতি প্রভৃতি ভিতরে প্রবেশ করলে সেই রসে জীর্ণ হয়ে যায়। এইভাবে কলসী গাছের প্রোটিন সংগ্রহে সুবিধা হয়।

ব্লাডার ওয়ার্ট (bladder wort), নেপেন্থিজ (Nepenthes), ভিনাসেস ফ্লাই-ট্র্যাপ (Venus's fly-trap), বাটারওয়ার্ট বা পিংগুইকিউল্যা (butterwort or Pinguicula), মালাক্কা ঝাঁজি প্রভৃতি বহু ধরনের পতঙ্গভুক্ উদ্ভিদ দেখা যায়।


কলসী গাছ

॥ পরজীবী ও পরাশ্রয়ী ॥

আলোকলতা বা স্বর্ণলতা এক ধরনের লতা, যা অন্য গাছের উপর হয়। এদের পাতা নেই। এরা নিজেরা খাদ্য তৈরি করতে পারে না। অন্য

গাছের গায়ে শিকড় চালিয়ে সেই গাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। এদের বলা হয় পরজীবী বা পরভোজী (parasite)।



আলোকলতা

কোন কোন গাছ কিছুটা নিজে খাদ্য তৈরি করে। কিছুটা অন্য গাছ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। তাদের বলা হয় আংশিক পরজীবী (partial parasite)। চন্দন গাছ আংশিক পরজীবী। পরজীবীরা অন্য গাছের দেহে যে শিকড় চালিয়ে খাদ্য সংগ্রহ করে, সেই শিকড়ের নাম হস্টোরিয়া haustoria)।

পরাশ্রয়ী (epiphytes) গাছ অন্য গাছের উপরে বা অন্য গাছকে জড়িয়ে বেড়ে উঠলেও সেই গাছের দেহ থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে না। এই ধরনের গাছকে বলে পরাশ্রয়ী গাছ। অশ্বথ, বট প্রভৃতি বড় বড় গাছকে কখনও কখনও তাল, খেজুর প্রভৃতি গাছের উপরে জন্মাতে দেখা যায়। তারা তাল খেজুর গাছের দেহ থেকে খাদ্য আহরণ করে না।

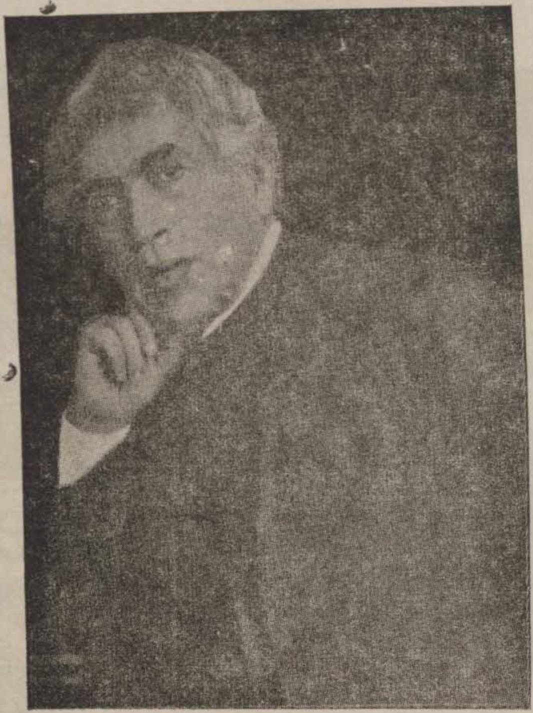


পরজীবী

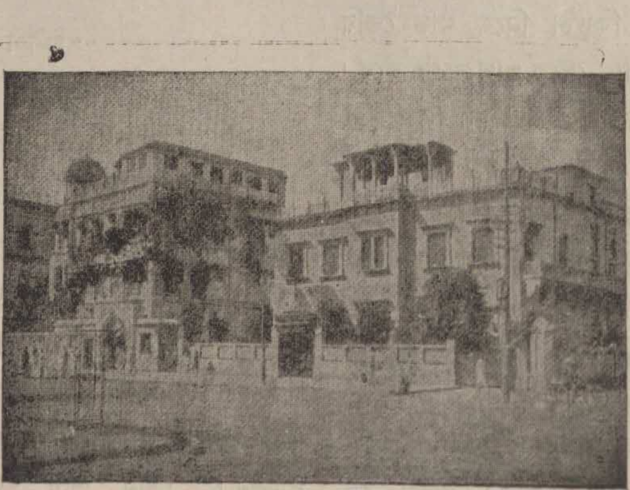
॥ শ্রেষ্ঠ উদ্ভিদ্-বিজ্ঞানী ॥

আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রথমে পদার্থতত্ত্ববিদ্ ছিলেন। বেতারযন্ত্রের তিনিই উদ্ভাবক। ধাতুর যে এক ধরনের প্রাণ আছে, তা তিনিই আবিষ্কার করেন। আরও অনেক আবিষ্কার করে পদার্থ-বিদ্যার জগতে অমর হয়ে আছেন। তিনি পদার্থ-তত্ত্বের গবেষণা ছেড়ে উদ্ভিদ্‌তত্ত্বের গবেষণা করতে থাকেন। তিনি তাঁর উদ্ভাবিত ক্রেস্কোগ্রাফ (Crescograph) যন্ত্রের দ্বারা গাছের আহার,

বৃদ্ধি, হৃদ্‌স্পন্দন প্রভৃতি দেখান। তিনি ক্রেস্কো-গ্রাফ ছাড়া আরো কয়েকটি যন্ত্রের আবিষ্কর্তা। তাঁর সৃষ্ট কলিকাতার বসুবিজ্ঞানমন্দিরে বহু উন্নততর গবেষণা হয়ে থাকে।



জগদীশচন্দ্র বসু



বসু বিজ্ঞানমন্দির

॥ উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে উন্নততর গবেষণা ॥

গ্রেগর যোহান মেণ্ডেল (Gregar Johann Mendel, ১৮২২-৮৪ খ্রীঃ) ছিলেন অস্ট্রিয়ার ব্রুন গির্জার এক পাদরী। তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মটরশুঁটির গাছ নিয়ে গবেষণা করে জেনেটিকস বিজ্ঞানের মূল ভিত্তি আবিষ্কার করেন।



মেণ্ডেল

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুথার বারবাঙ্ক (Luther Burbank, ১৮৪৯-১৯২৬ খ্রীঃ) ২২০টি নূতন বা উন্নত ধরনের গাছপালা, ফল ফুল তৈরি করেন। তাঁকে বলা হয় গাছপালার জাদুকর (Plant Wizard)।

রাশিয়ার উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী আই. ভি. মিচুরিন (I. V. Michurin, ১৮৫৫-১৯৩৫ খ্রীঃ) বহু উন্নত ধরনের ফল সৃষ্টি করেন। তাঁর উদ্ভাবিত পন্থায় বর্তমানে বহু উন্নত ধরনের বর্ণসংকর গাছের সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে।

॥ সূর্যের আলোর অভাবে গাছের পাতা সাদা হয়ে যাওয়া ॥

গাছের পাতায় যে পত্রহরিৎ বা ক্লোরোফিল (chlorophyll) থাকে তার জন্যে পাতাকে সবুজ দেখায়। সূর্যের আলো ছাড়া পত্রহরিৎ জন্মে না। সেইজন্য সূর্যের আলো না পেলে পাতা সাদা হয়ে যায়। অন্ধকারে বা কোন জিনিসে চাপা পড়লে গাছের পাতা সাদা হয়ে যায়। ঘাসের উপর কিছুদিন একটা ইট চাপা দিয়ে রাখলে পাতার রঙের পরিবর্তন সহজে লক্ষ্য করা যায়।

॥ অ্যালো ॥

ঘৃতকুমারী জাতীয় গাছ। এর একটি প্রজাতি ভারতের ঘৃতকুমারী। পাতার আকার লম্বা ও অত্যন্ত স্থূল। ঘৃতকুমারীর পিচ্ছিল অংশের দ্বারা আয়ুর্বেদীয় ঔষধ তৈয়ারী হয়। কোন কোন জাতির অ্যালো (aloe) গাছে লম্বা ডাঁটির মাথায় সুদৃশ্য ফুল ফোটে। একজাতীয় অ্যালোর কাণ্ড ১·৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে।

॥ অ্যালামাণ্ডা ॥



দলকমল বা অলকনন্দা বা নীলকণ্ঠ নামে পরিচিত পশ্চিমবঙ্গের গাছ। গুল্ম বা লতানে। ফুলের রং গাঢ় হলুদ। সারা বছরই ফুল ফোটে। তবে গ্রীষ্মে ও বর্ষায় অপেক্ষাকৃত বেশী ফোটে। নীলকণ্ঠ নামীয় গাছের ফুলের রং নীলচে বেগুনী।

॥ অ্যালফালফা ॥

পশু খাদ্যরূপে ব্যবহৃত একপ্রকার গাছ। ইংলণ্ডে এর নাম লুসার্ন (lucerne)। অ্যালফালফা (alfalfa) গাছ জলাভাব ও আবহাওয়ার

ধকল সহ্য করতে পারে। এই গাছকে সবুজ সার হিসাবেও ব্যবহার করা হয়।



অ্যালফালফা

॥ অ্যাসপেন ॥

একজাতীয় পপলার গাছ। অ্যাসপেন (aspen)



অ্যাসপেন

গাছের পাতা কাঁপার জন্য বিখ্যাত। প্রধানতঃ ইউরোপে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়।

॥ অ্যাসপ্যারাগাস ॥

বহুবর্ষজীবী বাহারী পাতার গাছ। লতানে স্বভাব। পাতা ফার্নের মতো। ডাল কণ্টকময় ও সরু। পাতার জন্য এর খুব আদর। ফুল অতি সাধারণ। ভারতীয় শতমূলী বা শতাবরী অ্যাসপ্যারাগাসের একটি প্রজাতি। মূল মূলা বা গাজরের ন্যায় স্থূল। একটি প্রজাতির গাছ লোকে খায়।



॥ অ্যাস্টার ॥

একজাতীয় বিদেশী মরশুমী ফুল। বহুবর্ষজীবী গাছ ও মরশুমী জাতীয় গাছ। শীতকালে সাধারণতঃ



অ্যাস্টার

এই গাছের চাষ করা হয়। গাছ ·৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। ফুলে বর্ণে ও আকারে বহু বৈচিত্র্য।

॥ অ্যাশ ॥

একধরনের বড় গাছ। অ্যাশ (ash) গাছের প্রজাতি ৬৫টি। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ ও

এশিয়ার উত্তরাঞ্চল, মেক্সিকো, যবদ্বীপ প্রভৃতি নানা স্থানে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়। সাদা অ্যাশের কাঠ খুব মজবুত। নীল অ্যাশ উত্তর আমেরিকার মধ্যাঞ্চলে প্রচুর জন্মায়।

॥ অ্যাঞ্জেলিকা ॥

একধরনের ছোট গাছ। এই গাছের শিকড় ও ফল থেকে যে অ্যাঞ্জেলিকা তেল নিষ্কাশিত হয় তা দিয়ে প্রসাধন দ্রব্য, মিষ্টান্ন দ্রব্য ইত্যাদি সুগন্ধি করা হয়। অ্যাঞ্জেলিকা (angelica) গাছ নানা স্থানে লোকে সবজি হিসাবে ব্যবহার করে। উত্তর আমেরিকা, ইউরোপ, আইসল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি নানা স্থানে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়।

॥ অ্যাকেশা ॥

অ্যাকেশার (acacia) বিশিষ্টতম প্রজাতি ভারতের বাবলা গাছ। ফুল গোলাকৃতি ও সুগন্ধি।



অ্যাকেশা

ট্যানিন, আঠা ও কাঠ এই গাছ থেকে পাওয়া যায়। এর আঠা কাপড় ছাপা, সিল্ক পালিশ ও স্নিগ্ধ ঔষধে লাগে। এর ট্যানিন দিয়ে চামড়া ট্যান করা হয়। এদের পত্রকন্টক তীক্ষ্ণাগ্র ও যমজ।

॥ আইরিস ॥

কন্দমূল লিলিজাতীয় ফুল বিশেষ। আইরিস (iris) গাছে সাদা, হলুদ, গাঢ় নীল, বেগুনী, প্রভৃতি নানা রঙের ফুল হয়ে থাকে। বীজ ও কন্দ থেকে গাছ হয়। এদের বহু প্রজাতি।

॥ অশোক গাছ ॥

এই গাছ ৮/১০ মিটার পর্যন্ত উচু হয়। পাতা ১৭/১৮ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। ফুল গুচ্ছ ও লাল। মার্চ-এপ্রিলে ফুল ফোটে। পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ও ভারতের নানা স্থানে এই গাছ দেখা যায়। চৈত্রমাসে অশোক ষষ্ঠী ও অষ্টমী তিথিতে বহু স্ত্রীলোক ফুলের কুঁড়ি ভিজিয়ে খেয়ে থাকে।

॥ অ্যাডোনিস ॥

অ্যাডোনিস (adonis) ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়ার এক 'শ্রেণীর ছোট গাছ ও তার



অ্যাডোনিস

ফুল। পাতা ফার্নের মতো। ফুল আকারে পপির ন্যায়। বহুবর্ষজীবী বা মরশুমী গাছ। সাদা,

হলদে, গোলাপী, লাল, গাঢ় লাল রঙের ফুল হয়। গাছ প্রায় .৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়।

॥ অ্যাজেলিয়া ॥

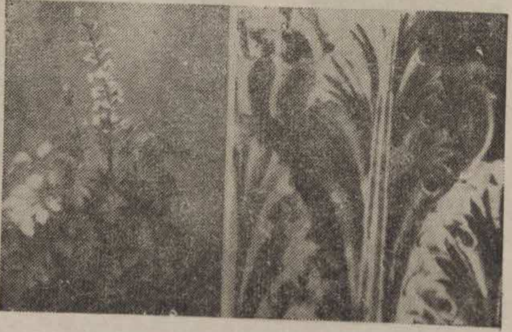
রডোডেনড্রনের একটা বৃহদংশকেই শুধু অ্যাজেলিয়া (azalia) বলা হয়। বাকী অ্যাজেলিয়া গাছ পাহাড়ী অঞ্চলে ভালো জন্মে। দুইটি শ্রেণী— পত্রমোচী ও চিরহরিৎ। টবেও এদের চাষ করা হয়। অনেকে পত্রমোচী জাতিকেই শুধু অ্যাজেলিয়া বলে থাকেন।

॥ অর্জুন ॥

এক ধরনের খুব বড় গাছ। প্রায় ২১/২২ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। পাতা ১৭/১৮ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৮/৯ সেন্টিমিটার পর্যন্ত চওড়া হয়ে থাকে। গ্রীষ্মে গাছে ফুল ধরে। শীতে ফল পাকে। উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গে এবং বিহারে এই গাছ অনেক দেখা যায়। এই গাছের ছাল, ফল ও পাতা ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

॥ অ্যাক্যান্থাসী ॥

বর্ষজীবী বা বহুবর্ষজীবী বীরুৎ বা গুল্ম বা লতা। বাসক-গোত্রীয় উদ্ভিদ্। চিত্রের অ্যাক্যান্থাসী-



অ্যাক্যান্থাসী

গোত্রের অন্তর্ভুক্ত একশ্রেণীর উদ্ভিদ্ অ্যাক্যান্থাসের পাতা ও ফুল।

॥ অর্কিড ॥

সাধারণতঃ পরাশ্রয়ী শ্রেণীর উদ্ভিদ। বহুবর্ষ বাঁচে। ফুল নানা আকারের ও নানা রঙের হয়ে থাকে। প্রায় ৮০০০ রকমের অর্কিড গাছ দেখা যায়। হিমালয়, সিকিম, আমেরিকা, মালয়েশিয়া প্রভৃতি স্থানে নানাজাতীয় অর্কিড দেখা যায়। এই গাছ সপুষ্পক ও একবীজপত্রী। পরাশ্রয়ী হলেও টবে জন্মানো চলে। অর্কিড গাছ ছায়াযুক্ত স্থানে ভালো জন্মায়।

॥ অসন ॥

পিয়াশাল নামে অধিক প্রচলিত এক শ্রেণীর গাছ। সংস্কৃতে এর নাম পীতসার, অসন ও বীজক। গাছ ৩০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা ২০/২৫ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। গাছের ছাল ফাটা ফাটা, ধূসর ও কৃষ্ণবর্ণ। বসন্তে ফুল ফোটে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ওড়িশা ও দক্ষিণ ভারতে এই গাছ প্রচুর দেখা যায়।

॥ অগ্যঘাস ॥

একধরনের সুগন্ধি ঘাস গাছ। অন্য নাম রসা ঘাস, মতিয়া বা সোফিয়া। পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ, মধ্যভারত, দক্ষিণ ভারত, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ও বাংলাদেশে দেখা যায়। এই ঘাস .৯ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা লম্বা। অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু। বর্ষাকালে ফুল ফোটে, শীতকালে ফল হয়।

॥ অতিবিষা ॥

একধরনের গাছ। অন্য নাম আতইচ, বৃন-প্রিয়া ও ঘূর্ণা। পশ্চিম হিমালয়ের নাতিশীতোষ্ণ প্রদেশ, কুমায়ুন প্রভৃতি স্থানে ২৪৩৮ মিটার উঁচুতে জন্মায়। গাছ প্রায় .৯ মিটার উঁচু হয়। মূল ও কন্দ ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

॥ অড়হর ॥

একধরনের কলাইজাতীয় গাছ। অন্য নাম আঢ়কী, তুরবী, করবীরভুজা, পীতপুষ্পা। গাছ লম্বায় ৩½ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। জুলাই মাসে গাছে ফুল ধরে, শীতকালে ফল হয়। একর পিছু প্রায় আড়াই কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন হয়। ভালো সার প্রয়োগে ফলন একর পিছু ৮/৯ কুইন্টালও হয়। ভারতের পশ্চিমাঞ্চলে অড়হর ডাল বেশী ব্যবহৃত হয়।

॥ অগুরু বা অগরু ॥

হিমালয়, কাছাড়, খাসিয়া ও গারো পাহাড়, নাগাপাহাড়, মণিপুর, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি স্থানের একধরনের গাছ। অগুরু চার প্রকার—কৃষ্ণ-অগুরু, কাষ্ঠ-অগুরু, দাহ-অগুরু ও মঙ্গল্যা অগুরু। এদের মধ্যে কৃষ্ণ-অগুরু শ্রেষ্ঠ। অগুরু গাছ থেকে যে আঠা পাওয়া যায়, লোকে তাই ব্যবহার করে।

॥ অগস্ত্য ॥

বকফুলের এক নাম অগস্ত্য। অগস্ত্যোদয়ে অর্থাৎ বর্ষার শেষে এই ফুল ফোটে বলে এর নাম অগস্ত্য।

॥ অগ্নিমন্থ ॥

অগ্নিমন্থের আর এক নাম গণিয়ারী। অনেক ডালপালাবিশিষ্ট ৫/৬ মিটার উঁচু গাছ। গাছের ছাল খুব পাতলা। পাতা সরু, মসৃণ ও তীব্র গন্ধ-যুক্ত। গাছ একটু বড় হলে ছোট ছোট শাখা কাঁটায় পরিণত হয়। এই গাছের অন্যান্য নাম—তনুত্বচা, গন্ধপত্রা ও গন্ধমূলা।

॥ **smoke tree** ॥

দক্ষিণ ইউরোপের এক ধরনের গাছ। ফুল ফুটলে দূর থেকে গাছকে ধোঁয়ায় ঢাকা বলে মনে হয়। লম্বায় ৯ মিটার উঁচু হয়।



smoke tree

॥ অ্যামারিলিস ॥

অ্যামারিলিস (amaryllis) গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কন্দজ গাছ। নার্সিসাস (narcissus) অ্যামারিলিস পরিবারভুক্ত। অ্যামারিলিস-এর কন্দ থেকে লম্বা ডাঁটি বার হয়ে তার মাথায় ৪/৫টা পাপড়িযুক্ত কয়েকটি ফুল ফোটে। মার্চ-এপ্রিলে ফুল ফোটে। কন্দ থেকে গাছ জন্মায়। অ্যামারিলিসের দেশীয় নাম 'কিরীটিনী'।

॥ অ্যানিমনি ॥

সাধারণতঃ শীতপ্রধান দেশের ফুলের গাছ। অ্যানিমনি (anemone) গাছ কন্দ থেকেই ভালো হয়। বীজ থেকেও গাছ হয়ে থাকে। ফুলের রং সাদা, গোলাপী, লাল, বেগুনী ইত্যাদি। সারা পৃথিবীর নানা দেশে নানা জাতের অ্যানিমনি দেখা যায়।

॥ অন্তমূল ॥

আকন্দ গোত্রের অন্তর্ভুক্ত লতা বিশেষ। অন্তমূলের ৫০টি প্রজাতি বর্তমান। এর মূল, পাতা ইত্যাদি ঔষধে ব্যবহৃত হয়। পশ্চিমবঙ্গে অল্পবিস্তর দেখা যায়। মাদ্রাজের করমণ্ডল উপকূলে প্রচুর জন্মে থাকে।

॥ অদৃশ্য গাছের গুড়ি ॥

কলাগাছের গুঁড়ি বাইরে থেকে দেখা যায় না। থোড় কলাগাছের গুঁড়ি বা কাণ্ড। সেই থোড় গাছের বাকলা দিয়ে ঢাকা থাকে।

॥ গাছের বৃদ্ধি ॥

বাঁশ গাছ সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে। লাইকেন (lichen) গাছ পঞ্চাশ বছরে এক হাতের বেশী বড় হয় না। লাইকেন গাছের পরমায়ু প্রায় দুশো বছর। লাইকেন গাছ পাথরের উপরে জন্মাতে পারে।

॥ সব থেকে বড় ঘাস ॥

বাঁশ গাছকে সবচেয়ে বড় ঘাস বলা চলে। কারণ বাঁশ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্।

॥ ঘাস থেকে চিনি বা গুড় ॥

আখগাছ থেকে চিনি বা গুড় হয়। আখগাছ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ্। তাই আখকে ঘাস বলা হয়েছে।

॥ গাছ থেকে জল ॥

মরুভূমির দেশে পান্থপাদপ-নামক গাছের পাতার গোড়ার দিকে নীচে খোঁচা দিলে যে জল বেরোয় তা দিয়ে পথিকেরা তৃষ্ণা নিবারণ করে, একথা সকলেরই জানা।

পান্থপাদপের চেয়ে বিচিত্র এক গাছ আছে। তার নাম Ravenala। মালাগাসি দ্বীপে (মাদাগাস্কারে) এই গাছই সাধারণতঃ দেখা যায়। এই গাছের কাণ্ডে জোর করে খোঁচা দিলে এক পাঁইট জল ঝরে পড়ে। সেই জল সুস্বাদু পানীয়।

॥ পাখি-ধরা গাছ ॥

গাছ পাখি ধরে, এ এক অদ্ভুত কথা। কিন্তু সত্য সত্যই নিউ জীল্যাণ্ডের পাইসোনিয়া ক্রনোয়িনা গাছ পাখি ধরে থাকে। এই গাছের কাণ্ড থেকে যে আঠা বেরোয় তাতে পেঁচার মতো বড় বড় পাখিও আটকা পড়ে। এইভাবে গাছ পাখি ধরে।

॥ ডালিয়া ॥

ডালিয়া (বা ডেলিয়্যা) ফুলের নাম বিখ্যাত সুইডিশ উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭—১৭৭৮ খ্রীঃ)-এর ছাত্র উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্ অ্যাণ্ডু ডাল-এর নাম থেকে এসেছে। মিঃ ডাল ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকো থেকে এই ফুল গাছ এনে সুইডেনে চাষ করেন। তিনি ক্রমে ক্রমে সেই গাছের ফুলকে নানা পদ্ধতিতে নানা আকারের ও নানা রঙের করে তৈরি করেন। কালক্রমে এই ডালিয়া ফুল সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে।

॥ আঁশফল গাছ ॥

আঁশফল লিচুর মতো একধরনের ফল। তবে পুরোপুরি গোল। স্বাদ মিষ্ট। পাতা কতকটা লিচু পাতার ন্যায়। গ্রীষ্মকালের ফল। আঁশফল এক বিচিত্র গাছ। কলকাতার দক্ষিণে বেহালা ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহে এবং বারুইপুর থেকে আমতলা পর্যন্ত জায়গায় এই গাছ প্রচুর পরিমাণে দেখা যায়। এই অঞ্চল ছাড়া ভারতের অন্যান্য জায়গায় দু' একটা দেখা যায়। কিন্তু তেমন ফল হয় না বা গাছ ভালো হয় না।

॥ সবচেয়ে উঁচু গাছ ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়ায় খুব উঁচু গাছ আছে। এত প্রচুর উঁচু গাছ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এক একটা গাছ ১০০ মিটারের চেয়ে বেশী উঁচু হয়। এই গাছের নাম রেড উড ট্রী। সবচেয়ে উঁচু গাছ কালিফোর্নিয়ার একটি রেড উড ট্রী, উচ্চতা ১১১ মিটার। এখানের এই গাছটির উচ্চতা ৮৫ মিটার। এর নাম জেনারেল শারম্যান (General Sherman)।

॥ শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেন ॥

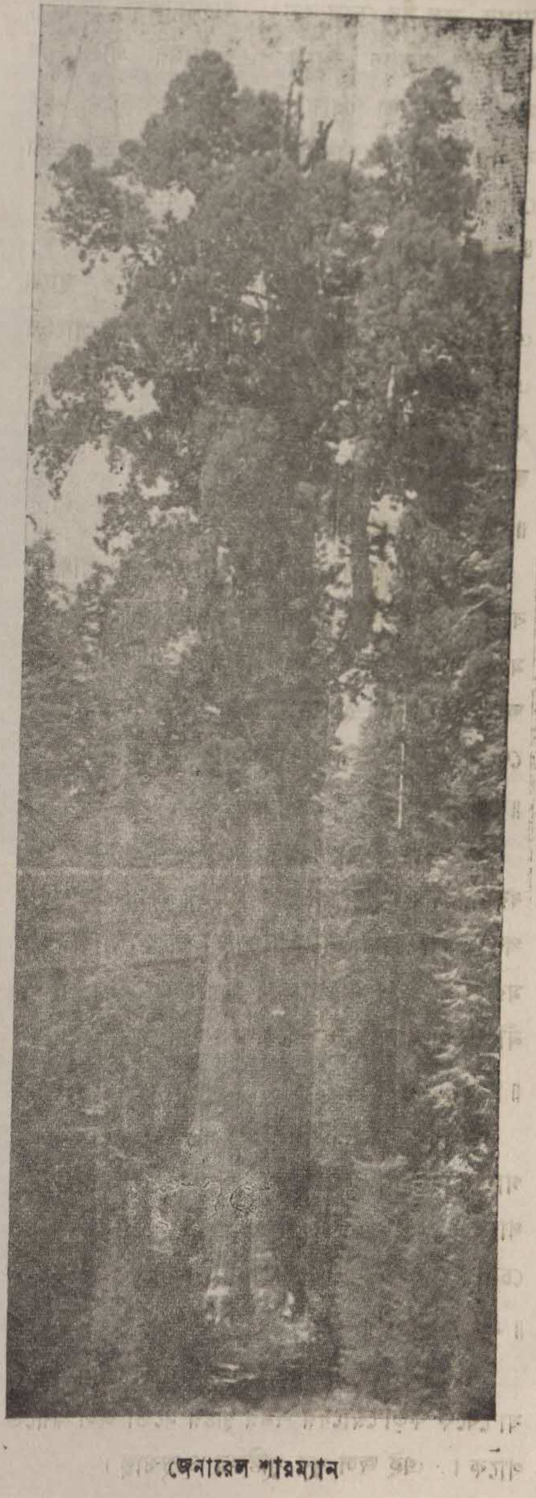
১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়ার এই সর্ববৃহৎ উদ্ভিদ্-উদ্যানটি প্রতিষ্ঠিত হয়। আয়তন ২৭৩ একর। এখানে প্রায় দেড় লক্ষ গাছ আছে। লতাপাতার সংরক্ষণশালায় প্রায় ২৫ লক্ষ শুষ্ক গাছ, লতা, পাতা প্রভৃতির নমুনা সংরক্ষিত আছে। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ রক্সবার্গ এই উদ্ভিদ্-উদ্যানের সুপারিন্টেন্ডেন্ট্ হন।

॥ সোঁদাল ফুল ॥

সোঁদাল ফুল অনেকেরই জানা। সোনালী ফুলের লম্বমান গোছা। বসন্তে ফোটে, গ্রীষ্মের শেষ পর্যন্ত থাকে। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, ঋতুসংহারে এর উল্লেখ আছে। এই ফুলের নানা নাম—বাঁদর লাঠি, কর্ণিকার, ফিশ্চুলা, গোল্ডেন শাওয়ার, ল্যাবার্নাম, কেসিয়া। ওড়িশায় এর নাম সুনারি বা সন্ধারী, গুজরাটে গুরমালা, আসামে সোনারু, পাঞ্জাবে অলশ। হিন্দীতে একে বলে অমলতাস, বন্দর লাঠি; মালয়ালম ভাষায় ভাবা, বহাবা; তামিল ভাষায় তিরুকোটই, কোন্নই, অপ্পই; তেলেগু ভাষায় অরগবাধুম; কানাড়ী ভাষায় কক্কী ইত্যাদি। ভারতবর্ষ এই ফুলের জন্মস্থান।

॥ সব চেয়ে বড় ফুল ॥

র‍্যাফলেসিয়া আরনল্ডি (Rafflesia larnoldii)-



জেনারেল শারম্যান

নামক ফুল সব চেয়ে বড়। মালয়েশিয়া, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে একধরনের গাছে যে ফুল ফোটে, তা প্রায় .৯ মিটার চওড়া। এই ফুলের গাছ পরগাছাজাতীয়। সাধারণতঃ বড় গাছের গোড়ার মোটা শিকড়ের উপর এই গাছ জন্মায়।

॥ আবলুস কাঠ ॥

শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, ভারতবর্ষ প্রভৃতি স্থানে এবনি (ebony) নামে যে গাছ জন্মে, সেই গাছের এক জাতির সারাংশ খুব কালো ও শক্ত। সেই কাঠ দিয়ে পিয়ানোর চাবি প্রভৃতি তৈরী হয়। তাকে আবলুস কাঠ বলে।

॥ 'দুগ্ধ-পাদপ' ॥

এক ধরনের গাছ। এই গাছকে গো-পাদপও বলে। দুগ্ধ-পাদপের গায়ে ছিদ্র করলে দুধের মতো সাদা তরল পদার্থ বার হয়। তার স্বাদ অনেকটা গরুর দুধের মতো। এই গাছের ছাল থেকে যে রুটি তৈরী হয়, তা খুব সুস্বাদু।

॥ পান্থপাদপ ॥

কতকটা কলাগাছের মতো পাতাযুক্ত একধরনের গাছ। পাতাগুলি গাছের দুপাশে একটার পর একটা চেপটাভাবে সাজানো থাকে। সাধারণতঃ মরুভূমির দেশে এই গাছ দেখা যায়। পাতার ডাঁটার নীচে জোরে আঘাত করলে জল ঝরে পড়তে থাকে।

॥ দিগ্‌দর্শন বৃক্ষ ॥

উত্তর আমেরিকার একধরনের গাছ। এই গাছের পাতার এক দিক্ সব সময়ে উত্তর দিকে থাকে। এই পাতা দেখে কোন্‌টা কোন্ দিক্ তা চেনার সুবিধা হয়।

॥ বর্ষণবৃক্ষ ॥

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে একধরনের গাছ, যা থেকে কড়া রোদের সময় বৃষ্টির মতো জল ঝরতে থাকে। এই জল খুব পুষ্টিকর ও সুস্বাদু।

॥ লবঙ্গ ॥

পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, জাঞ্জিবার, মালাগাসি, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি স্থানে এক ধরনের গাছের শুকনো ফুল হলো লবঙ্গ।

॥ দারুচিনি ॥

শ্রীলঙ্কা, যবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানের একধরনের গাছের ছাল।

॥ লজ্জাবতী গাছ ॥

যে গাছের নাম লজ্জাবতী, তার পাতা স্পর্শ করা মাত্রই মুড়ে যায়—যেন লজ্জা পেয়েছে। কিছুক্ষণ বাদে পাতা আবার খুলে যায়। খুব ছোট ঝোপ গাছ। পাতা কতকটা তেঁতুল পাতার মতো। ইংরেজী নাম the mimosa.

॥ হোগলা গাছ ॥

এক ধরনের গাছ। জলা জায়গায় জন্মে।

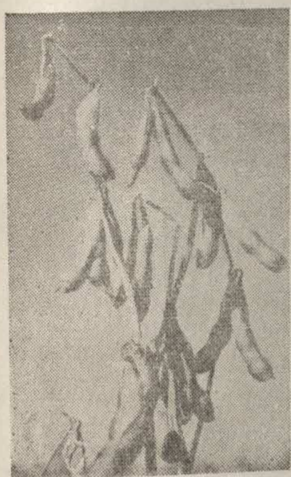


হোগলা ফুল

এর পাতা বেশ লম্বা হয়। সেই পাতা দিয়ে ঘর ছাওয়া হয় বা মাত্নরের মতো আস্তরণ তৈরী হয়। এই গাছের ফুল দেখতে কতকটা মশালের মতো।

॥ সয়াবীন ॥

সয়াবীন ডালজাতীয় শস্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান্ ফসল। এতে শতকরা প্রায়




সয়াবীন

৪৩.২ ভাগ প্রোটীন, ২০.৫ ভাগ কার্বোহাইড্রেট আছে। সয়াবীনের দুধ গোদুগ্ধজাত প্রোটীনের মতো। সয়াবীনের দুধে ৩.৫ ভাগ প্রোটীন, ২.৮ ভাগ চর্বি ও ৩.১ ভাগ কার্বোহাইড্রেট থাকে। সয়াবীনের দুধ থেকে দই, ছানা, মাখন তৈরি করা যায়।

॥ ভিক্টোরিয়া রিজিয়া ॥

দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের পদ্ম। এ পদ্মফুল প্রায় ·৩০৪৮ মিটার পর্যন্ত চওড়া হয়। পাতার ব্যাস প্রায় ১.৫ মিটার। কানা উঁচু থালার মতো দেখতে। শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনসে এই গাছ আছে।

॥ ডুমুরের ফুল ॥

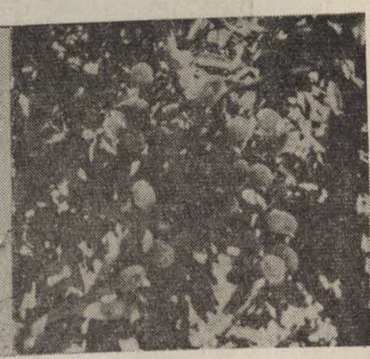
ডুমুরের ফুল হয় না। এ ধারণা ভুল। ডুমুরের ফুল হয়। ফুলের শেষের দিক্‌টা ক্রমশঃ মোটা ও বড় হয়ে ডুমুরে পরিণত হয়।

॥ অ্যালমণ্ড, অ্যামণ্ড ॥

অ্যালমণ্ড (almond)-কে কাগজী বাদাম বলা হয়। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল ও পশ্চিম এশিয়ায় ব্যাপকভাবে চাষ করা হয়। এর দুটি প্রজাতি। একটি amara। তার ফল তিক্ত ও খাদ্য হিসাবে অস্বাস্থ্যকর। দ্বিতীয় প্রজাতি dulcis। তার ফল সুস্বাদু ও অতিশয় পুষ্টিকর।



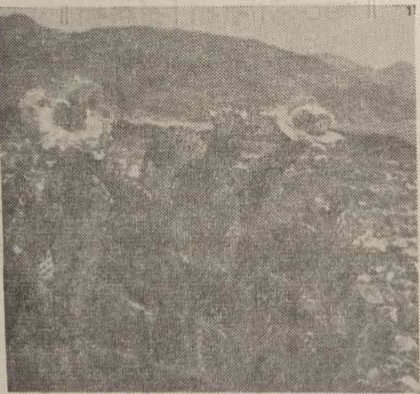
অ্যালমণ্ড গাছ



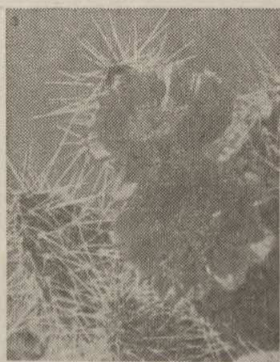
অ্যালমণ্ড ফল

॥ ক্যাকটাস ॥

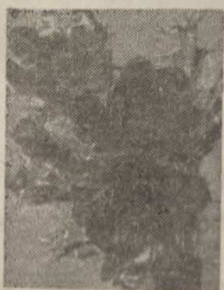
ক্যকটাস (cactus) এক ধরনের গাছ, যাতে নানাধরনের ফুল ফোটে। সেই ফুল অনেকদিন স্থায়ী হয়। প্রায় ১ হাজার রকম ক্যাকটাস গাছ দেখা যায়। অধিকাংশ ক্যাকটাস গাছে কাঁটা থাকে। এই গাছ খুব শুষ্ক আবহাওয়ায় ভালোভাবে















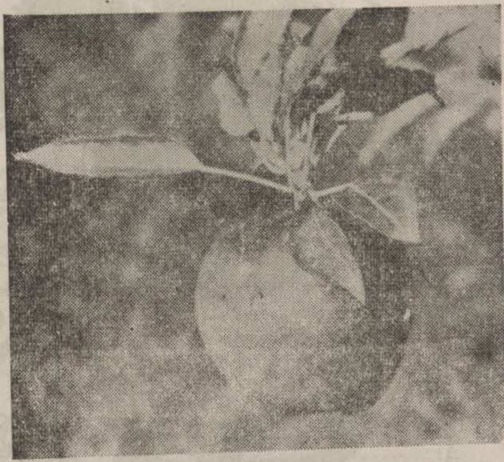


কয়েক রকমের ক্যাকটাস গাছ ও ফুল

জন্মাতে পারে। মরুভূমিতে কয়েক ধরনের ক্যাকটাস গাছ দেখা যায়। এই গাছের পাতা নেই বললেই চলে। গাছের কাণ্ডই সূর্যরশ্মি থেকে খাদ্য আহরণ করে।

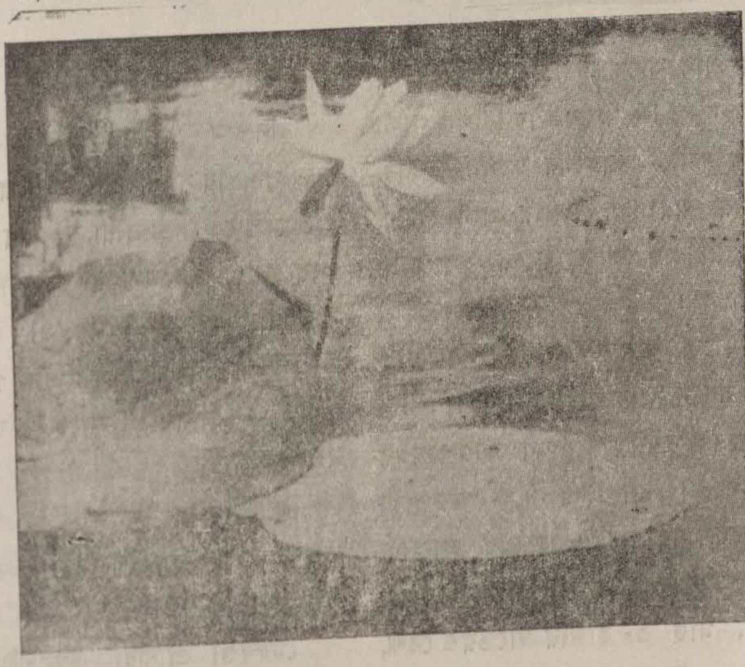
॥ বিভিন্ন শ্রেণীর গাছ, ফুল ও ফল ॥

বাতাবি লেবু, কাগজী লেবু, করমচা, জলপাই, লকেট, লিচু, আম, কাঁঠাল, জামরুল, কালজাম, গোলাপজাম, ফলসা, চালতা, পাতি লেবু, কলা, পেঁপে, নারিকেল, ডুমুর, আঙুর, শশা, টমেটো, বেগুন, ঢেঁড়শ, শিশু গাছ, সুপারি, তাল, খেজুর কদম, কলকে, অতসী, তুলসী, জবা, টগর, নিম, ডেঁফল, তেঁতুল, ঝাউ, শিউলী, গন্ধরাজ, বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, মালতী, চামেলী, হাসনু হানা, সজনে, নজনে, লঙ্কা, ধান, গম, যব, কুমড়ো, উচ্ছে, করলা, পদ্ম, ডালিম, বেদানা, স্থলপদ্ম, কাজুবাদাম, পাট, ফুলকপি, বাঁধাকপি, ওলকপি, গাজর, বীট, কৃষ্ণকলি, আপেল, আনারস, আখ, আতা, আমড়া,



আপেল

আখরোট, কমলালেবু, কয়েতবেল, কুল, তরমুজ,



পদ্ম ফুল

পেয়ারা, লাউ, হলুদ, শটী, আদা, রবার, সরষে, সুন্দরী, গরান, বরবটী, আলু, মুগ, মসুর, দেবদারু, নোনা, পীচ, মহুয়া, সপেটা, গোলাপ, সূর্যমুখী প্রভৃতি অসংখ্য রকমের গাছ দেখা যায়।



গাছপালার প্রাণ আছে কিন্তু তাকে জীবজন্তুর পর্যায়ভুক্ত করা হয় না। মানুষ জীব। গাছপালা ও মানুষ বাদ দিয়ে যতরকমের স্তন্যপায়ী জীব, বনের জানোয়ার, সরীসৃপ, উভচর প্রাণী, পাখি, মাছ, কীটপতঙ্গ, জীবাণু আছে তাদের বলা হচ্ছে পশু-পক্ষী কীটপতঙ্গ।

সারা পৃথিবীতে কত যে পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ আছে তার পূর্ণ সন্ধান মানুষ আজও পায় নি। এ পর্যন্ত দশ লক্ষেরও বেশী পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের সন্ধান পাওয়া গেছে। সে-সবের মধ্যে স্তন্যপায়ী ৩ হাজার জাতের, সরীসৃপ ৬ হাজার জাতের, উভচর প্রাণী ৩ হাজার জাতের, পাখি প্রায় দশ হাজার জাতের, মাছ ৩০ হাজার জাতেরও বেশী, কীটপতঙ্গ প্রায় আট লক্ষ জাতের, জীবাণুর জাতের সংখ্যা নিরূপণ সঠিকভাবে আজও বিজ্ঞানীরা করে উঠতে পারেন নি।

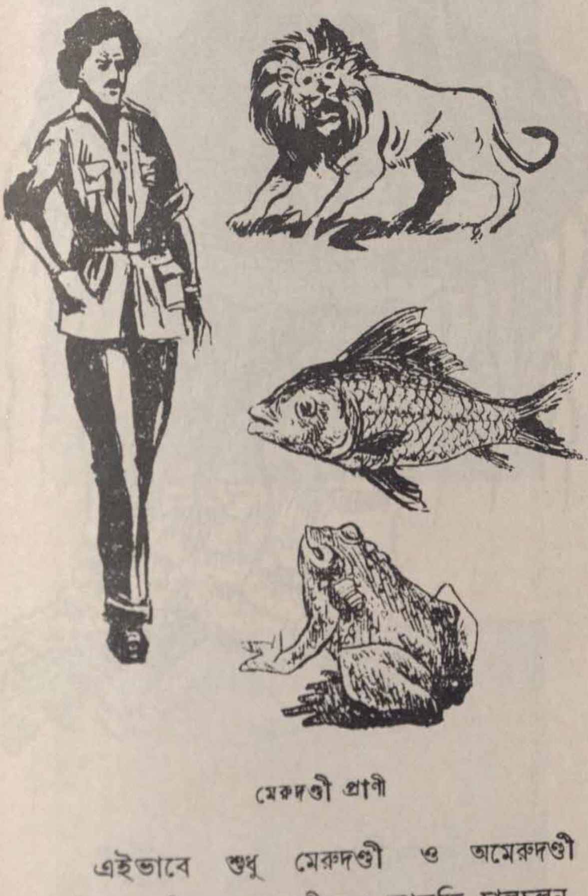
॥ শ্রেণীবিভাগ ॥

বাসস্থান, আকার, চালচলন প্রভৃতির দিক্ দিয়ে পৃথিবীর সমগ্র প্রাণীজগতের প্রাণীদের বৈচিত্র্য এত বেশী যে বিজ্ঞানীরা সুবিধার জন্য শ্রেণীবিভাগ করেছেন। প্রথমে তাঁরা দুটি ভাগে ভাগ করেছেন সারা প্রাণিজগৎকে—মেরুদণ্ডী (vertebrate) ও অমেরুদণ্ডী (invertebrate)। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া আছে। তাদের 'অস্থিক'ও বলা হয়।

অমেরুদণ্ডীর মেরুদণ্ড বা শিরদাঁড়া নেই। তাদের দেহে হাড়ই নেই। তাদের নিরস্থিক বলা যেতে পারে।

মেরুদণ্ডী প্রাণীরা উচ্চশ্রেণীর। অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা নিম্নশ্রেণীর। স্থলে জলে এই উভয়শ্রেণীর প্রাণীই বিদ্যমান। সাধারণতঃ অমেরুদণ্ডী প্রাণী আকারে ছোট হয়। যত কীটপতঙ্গ সবই

অমেরুদণ্ডী। আবার খুব বড় আকারের অমেরুদণ্ডী প্রাণীও আছে। যেমন সাগরের জলের অক্টোপাস। কোন কোন শ্রেণীর অক্টোপাস খুব বড় হয়।

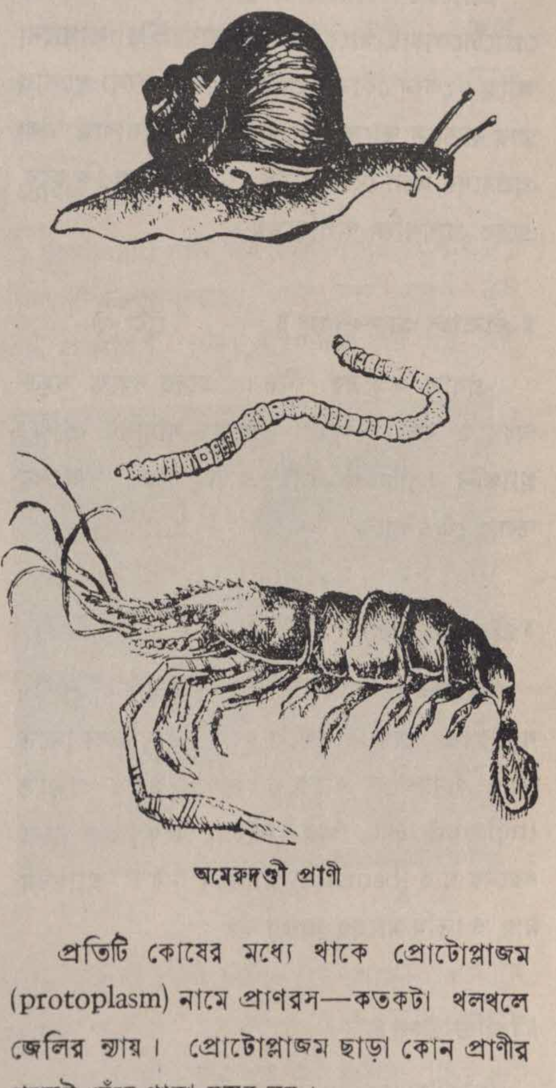


মেরুদণ্ডী প্রাণী

এইভাবে শুধু মেরুদণ্ডী ও অমেরুদণ্ডী শ্রেণীর প্রাণী বললে প্রাণীদের আকৃতি, চালচলন, বৈশিষ্ট্য বোঝাতে অসুবিধা হয়। সেই কারণে বিজ্ঞানীরা প্রাণীদের ২২টি পর্ব বা ফাইলামে ভাগ করেছেন। এই ২২ প্রকার পর্ব ও ফাইলাম (phylum)-এর মধ্যে ২১ প্রকার অমেরুদণ্ডী প্রাণী। মাত্র ১ প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণী।

সৃষ্টির প্রারম্ভে যে প্রাণীর প্রথম আবির্ভাব ঘটে তার নাম প্রোটোজোয়া (protozoa)। এরা এককোষী জীব।

ছোট বড় সকল প্রাণীর শরীর কোষ দিয়ে গঠিত। একটি থেকে আরম্ভ করে কোটি কোটি পর্যন্ত কোষ দিয়ে গড়া জীবের দেহ।



অমেরুদণ্ডী প্রাণী

প্রতিটি কোষের মধ্যে থাকে প্রোটোপ্লাজম (protoplasm) নামে প্রাণরস—কতকটা থলথলে জেলির ন্যায়। প্রোটোপ্লাজম ছাড়া কোন প্রাণীর পক্ষেই বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।

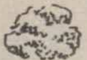
প্রধানতঃ প্রোটোপ্লাজমের ২টি অংশ—নিউ-ক্লিয়াস (nucleus) ও সাইটোপ্লাজম (cytoplasm)। নিউক্লিয়াস প্রোটোপ্লাজমের বেশ খানিকটা ঘন অংশ।

প্রোটোজোয়াদের মধ্যে অ্যামীবাই সম্ভবতঃ প্রথম জীব। এই অ্যামীবা এক অতি অদ্ভুত

প্রাণী। ক্ষণে ক্ষণে আকৃতি বদলানো এর স্বভাব।

প্রোটোজোয়া অসংখ্য রকমের। কোন কোন প্রোটোজোয়ার গায়ে সুতোর ন্যায় শুঁড় লাগানো আছে। কোন কোন প্রোটোজোয়া শুকনো ধুলোর ন্যায় বাতাসে ভাসে। কোন কোনটা আবার উষ্ণ প্রস্রবণের জলে বেঁচে থাকে। ছোট হলে কি হবে, এদের প্রাণশক্তি অপরিমেয়।

॥ প্রবাল ও স্পাঞ্জ ॥



প্রবাল সমুদ্রের কীট। এদের সম্বন্ধে 'সমুদ্র' অধ্যায়ে, বলা হয়েছে। স্পঞ্জও সামুদ্রিক প্রাণী। প্ল্যাঙ্কটন (plankton) এদের খাদ্য। জলের তলায় বেঁচে থাকে।

॥ প্ল্যাঙ্কটন ॥

প্ল্যাঙ্কটন (plankton) খুব ছোট গাছ বা প্রাণী। সাধারণতঃ দেখতে গেলে দূরবীনের সাহায্য নিতে হয়। সমুদ্রজলে থাকে। মাছ, স্কুইড প্রভৃতি (nekton) এবং স্পঞ্জ, ঝিনুক, কাঁকড়া ও নানা ধরনের গাছ (benthos) প্ল্যাঙ্কটন নয়। প্ল্যাঙ্কটন মাছ ও তিমি মাছের খাদ্য।

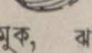
॥ মিডিউসা ॥

মিডিউসা (medusa)-কে দেখতে অদ্ভুত ধরনের জলের শেওলা বা ঝাঁজির ন্যায়। কিন্তু এরা প্রকৃতপক্ষে সামুদ্রিক প্রাণী। এদের শরীর খুব নরম, জেলির মতো। সাগরের তলায় যেখানে জলের স্রোতের জোর কম, যেস্থান অন্ধকারে ভরা সেই রকম জায়গায় এদের দেখা যায়। চেহারা অনেকটা ব্যাঙের ছাতার মতো। কিন্তু এদের শরীর ব্যাঙের ছাতার ন্যায় শক্ত নয়। মিডিউসা একধরনের জেলী ফিশ।



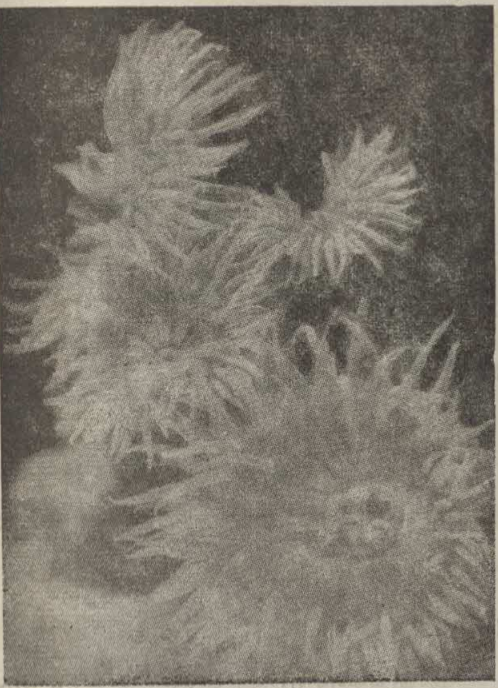
মিডিউসা

॥ সী-অ্যানিমোনি ॥



সাগরের জলে শাঁখ, কড়ি, শামুক, ঝনুক থেকে আরম্ভ করে অক্টোপাস, স্কুইড প্রভৃতি প্রাণী আছে। 'সী-অ্যানিমোনি' (sea-anemone) বলে একরকম প্রাণী আছে, যাকে দেখলে মনে হবে, একটা ফুল। এরা কখনও কখনও যোগী কাঁকড়া (hermit crab)-র পিঠে চড়ে বসে। এতে তাদের শিকারে খুব সুবিধা হয়। কাঁকড়া চলতে থাকে। সে পিঠে চড়ে চড়ে নানাস্থানে শিকার করে বেড়ায়।

সাগরের তলায় বৈদ্যুতিক বান মাছ বৈদ্যুতিক



সী-অ্যানিমোনি



যোগী কাঁকড়ার পীঠে সী-অ্যানিমোনি

শক মারে, কোন প্রাণী আলো দেয়, কোন প্রাণীর গায়ে অসংখ্য কাঁটা, কারো দেহ অত্যন্ত বিষাক্ত।

সমুদ্রের জলের অক্টোপাস, শার্ক, তরোয়াল মাছ প্রভৃতিকে 'সমুদ্রের আতঙ্ক' বলা হয়।

তিমি পৃথিবীর সব চেয়ে বড় প্রাণী। ডাঙ্গার সব চেয়ে বড় প্রাণী হাতির চেয়ে আকারে, ওজনে অনেক বড় তিমি।

॥ অক পাখি ॥

অক (auk) পাখি উত্তরমেরু সাগর, প্রশান্ত ও আটলান্টিক মহাসাগরের কূলে বাস করে। এর ২২টি প্রজাতি। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বড় অক

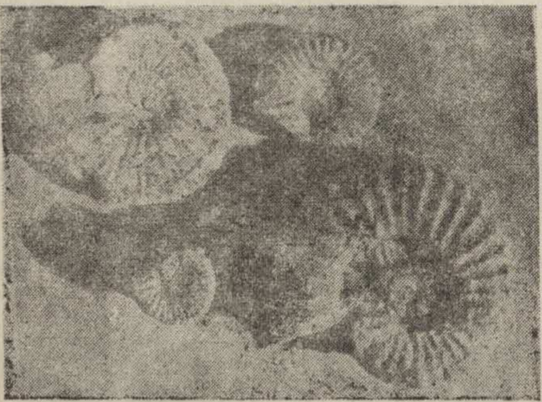


অক পাখি

পাখি ধরাপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে ক্ষুরচঞ্চু অক বা রেজরবিল (rajorbill) অককে দেখা যায়। আগেকার বড় অক উড়তে পারত না। এই অক উড়তে পারে, ভালো সাঁতারু ও ডুবুরী। এরা দলবদ্ধভাবে থাকে। সব প্রজাতির অকের মধ্যে গীলমট (guillemot) ও পাফিন উল্লেখ-যোগ্য। শীতের সময়ে এরা দক্ষিণের গ্রীষ্মপ্রধান-দেশে পরিযাণ করে।

॥ অ্যামোনাইটস ॥

বর্তমানকালে লুপ্ত শম্বুকাকৃতি কুণ্ডলীকৃত প্রাণী বিশেষ। নানাস্থানে অ্যামোনাইটস (ammonites)-এর জীবাশ্ম বা ফসিল পাওয়া গেছে। প্রায় আট

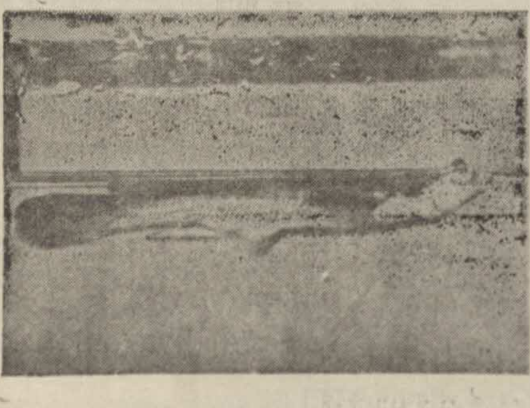


অ্যামোনাইটস

হাজার রকম অ্যামোনাইটসের সন্ধান মিলেছে। প্রায় ১·২৭ সেন্টিমিটার থেকে ১·৮ মিটার পর্যন্ত লম্বা অ্যামোনাইটসের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে।

॥ অ্যানাব্‌লেপ্‌স ॥

চারচোখো মাছ। লম্বায় ২০ সেন্টিমিটার হয়। এই মাছের তিনটি শ্রেণী বর্তমান। ব্রেজিলে এই



অ্যানাব্‌লেপ্‌স

মাছের প্রাচুর্য। অন্যান্য বহু স্থানে এই মাছ দেখা যায়। চোখ এমনভাবে গঠিত যে নদী বা সাগর-জলের ঠিক তলা দিয়ে যাবার সময় জলের উপরে চোখের যে অংশ থাকে তা দিয়ে অ্যানাব্‌লেপ্‌স্ (anableps) উপরের সব কিছু দেখতে পায়। চোখের নীচের অংশ দিয়ে জলের তলার সব কিছু দেখতে পায়।

॥ অ্যানোফেলিজ ॥

একধরনের মশা। এক জাতের অ্যানোফেলিজ (anopheles) ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণুবাহী। স্ত্রী অ্যানোফেলিজই মনুষ্যদেহের রক্তপান করার সময় ম্যালেরিয়া রোগের বীজ সংক্রমণ করে।

॥ আইবেক্স ॥

পার্বত্যঅঞ্চলবাসী বন্য ছাগল। এদের চারিটি প্রজাতির প্রত্যেকেরই শিং পিছন দিকে বাঁকানো। সামনের পা পিছনের পায়ের চেয়ে ছোট। ইউরোপ আফ্রিকা ও এশিয়ার নানা পাহাড়িয়া অঞ্চলে আইবেক্স (ibex) দেখা যায়। ভারতের উচ্চ উপত্যকায় আইবেক্স দেখা যায়। আল্পস পর্বতের আইবেক্সকে স্টাইনবক (steinbock) বলে।

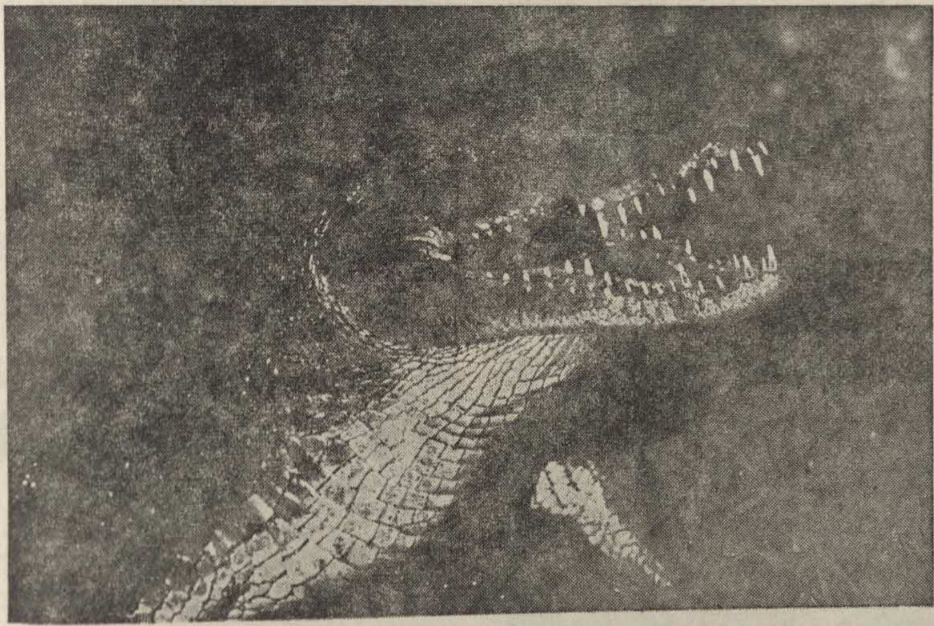
॥ আইবিস ॥

সারসজাতীয় পাখি। গলা লম্বা, পা লম্বা, ঠোঁট লম্বা ও বাঁকানো। পৃথিবীর সর্বত্রই কমবেশী আইবিস (ibis) দেখা যায়। লম্বায় প্রায় ·৯ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। নলখাগড়াজাতীয় গাছের মধ্যে বাসা বাঁধে। মাছ বা অন্যান্য ছোট ছোট ব্যাঙ ইত্যাদি খায়।

॥ অ্যালিগেটর ॥

কুমীরের ন্যায় একধরনের সরীসৃপ। মাছ, ছোট ছোট পাখি প্রভৃতি খায়। হ্রদে, বিলে বা

নদীতে বাস করে। অ্যালিগেটর (alligator) উভচর। বহু সময়ে ডাঙ্গায় উঠে রোদ পোহায়।



অ্যালিগেটর

অ্যালিগেটর স্ন্যাপার (alligator snapper) দক্ষিণ-পূর্ব আমেরিকার একপ্রকার বিশালাকার কচ্ছপ। লম্বায় ১·৫ মিটার পর্যন্ত হয়। ওজনে হয় প্রায় ২০০ পাউণ্ড।

॥ **অশ্ব** ॥

অশ্ব অর্থাৎ ঘোড়া পাঁচ কোটি বছর আগেও ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। আগে ঘোড়া বন্যই ছিল। মানুষ তাকে পোষ মানিয়ে নিজের কাজে লাগিয়েছে। আজও মঙ্গোলিয়ায় বুনো ঘোড়া দেখা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে বন্য অশ্ব মানুষের বশ মেনেছে। অশ্বকে যুদ্ধের কাজে বহু কাল থেকেই লাগানো হয়েছে। ঘোড়দৌড়ের প্রচলন বৈদিক যুগ থেকেই দেখা গেছে। অশ্ব ২১/৩০ বছর পর্যন্ত বাঁচে।

॥ অ্যান্টিলোপ ॥

অ্যান্টিলোপ (anelope) একশ্রেণীর হরিণ-

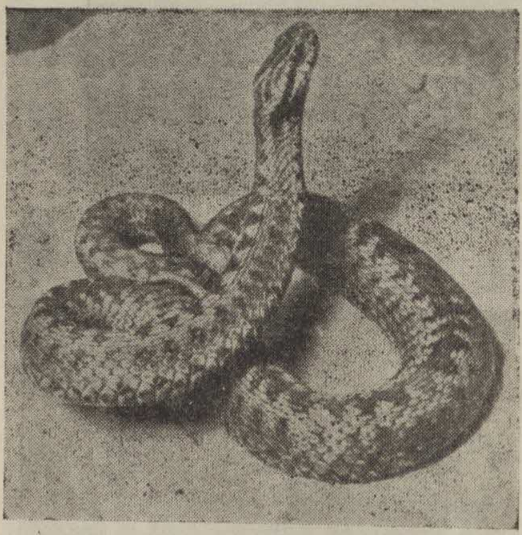


অ্যান্টিলোপ

জাতীয় পশু। নীলগাই, চৌশিঙ্গা, কৃষ্ণসার, চিঙ্কারা প্রভৃতি অ্যান্টিলোপের অন্তর্গত। উঁচু পাহাড়, প্রান্তীয় বনভূমি, স্টেপজাতীয় তৃণভূমি, মরুভূমি প্রভৃতি সবস্থানেই অ্যান্টিলোপদের দেখা যায়। সাধারণতঃ ঘাস, ছোট ছোট গুল্মের পাতা ও ডাল খায়।

॥ অ্যাড্যার ॥

একজাতীয় বিষধর সাপ। অ্যাডার (adder) সাপকে ইউরোপে সর্বত্র দেখা যায়। এশিয়ার প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলেও দেখা যায়। মেয়ে



অ্যাড্যার

অ্যাডার প্রায় ·৯ মিটার লম্বা হয়। পুরুষ অ্যাডার তার চেয়ে ছোট হয়। ছোট ছোট জন্তুজানোয়ারের উপর ইহার বিষ তীব্রভাবে ক্রিয়া করে। মানুষ এর বিষে বিশেষ কাবু হয় না।

॥ অজগর ॥

অতিকায় সাপ। অন্য নাম ময়াল (python), অ্যানাকণ্ডা (anaconda)। এই সাপ লম্বায় প্রায় ১১ মিটার পর্যন্ত হয়। কোন কোন ধরনের অজগরের ওজন ১১৩ কে. জি. পর্যন্ত হয়ে থাকে। সাধারণতঃ পাহাড়ী অঞ্চলে থাকে। এরা শিকারকে প্রচণ্ড শক্তিতে পাক দিয়ে মেরে ফেলে। এদের আয়ু ২৫ বৎসরের বেশী। এরা রাতেই বেশী চলাফেরা করে। ছাগল, হরিণ, শিয়াল, বাঁদর, নানাবিধ পাখি ও



অ্যানাকণ্ডা

সরীসৃপ প্রভৃতি ধরে খায়। ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারলেও এরা অলস প্রকৃতির, এই সাপ নির্বিষ।

॥ অ্যাম্ফিঅক্সাস ॥

ক্ষুদ্রাকৃতি একজাতীয় মাছ। অ্যাম্ফিঅক্সাস (amphioxus) মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে অতিশয়



অ্যাম্ফিঅক্সাস

নিম্নস্তরের। একেবারে আদিম প্রকৃতির। লম্বা কাঠির মতো দেহের গড়ন। জলচর হলেও প্রধানতঃ ভিজা বালিতেই থাকে।

॥ অপোসাম ॥

অপোসাম বা ওপোসাম (opossum) একধরনের জন্তু। দেখতে ধেড়ে ইঁদুরের মতো। আকারে কখনও কখনও বিড়ালের চেয়েও বড় হয়। পোকামাকড়, ঘাসপাতা, ছোট পশুপাখি, পচা মাংস খায়। এরা ভূমিচারী ও বৃক্ষবাসী। সাধারণতঃ নিশাচর। মাছ ধরার জন্য কোন কোন জাতির অপোসাম জলে লাফিয়ে পড়ে।

॥ অনকোজেনিক ভাইরাস ॥

ক্যানসার সৃষ্টিকারী একধরনের ভাইরাস। ক্যানসার সৃষ্টির অনেকগুলি কারণের মধ্যে ভাইরাসও একটি কারণ বলে বিজ্ঞানীদের অভিমত। অনকোজেনিক ভাইরাস (oncogenic virus) অনেক শ্রেণীতে বিভক্ত।

॥ নানাশ্রেণীর পশুপক্ষী ও কীটপতঙ্গ ॥

সিংহ, ব্যাঘ্র. তরক্ষু, গণ্ডার, জিরাফ, জেব্রা, হিমালয়ের টাহ্র, বন্য অজ, উট, উটপাখি, জলহস্তী,

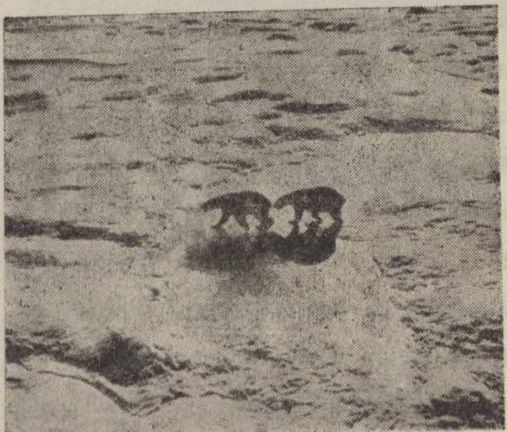


বন্য অজ

শিম্পাঞ্জী, বেবুন, বানর, নীলগাই, গরু, ষাঁড়, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, আরগ্যালি (বন্য ভেড়া), গাধা, বিড়াল, কাঠবিড়াল, ভোঁদড়, শজারু, সিন্ধুশকুন, পেঁচা, চিল, বাজ, দাঁড়কাক, বক, সারস, জাগুয়ার, চড়াই, টিয়া,



হিমালয়ের টাহ্র



মেরু-ভল্লুক

কাক, ময়না, শালিক. কাকাতুয়া, পায়রা, ঘুঘু, কোকিল পাপিয়া, দোয়েল, শ্যামা, মেরুভল্লুক, ভল্লুক,

নেকড়েবাঘ, ক্যাঙ্গারু, প্ল্যাটিপাস, হাতি, ময়ূর, চিতাবাঘ, ইঁদুর, বীবর, পাইথন, সীল; কাঠঠোকরা, মোরগ, শিয়াল, খরগোশ, বুলবুল, টুনটুনি, হাড়িচাঁচা ফিঙ্গে, বাবুই, মাছরাঙ্গা; প্রজাপতি, ফড়িং, পঙ্গপাল, হাঁস, ব্যাঙ, শকুন, খঞ্জন, বসন্তবউরী, ইয়াক, চাতক, ডাহুক, কুকুর, ধনেশ পাখি, গাংচিল, নীলকণ্ঠ, কচ্ছপ প্রভৃতি পশুপাখি সারা পৃথিবীতে দেখা যায়।

॥ প্রাগৈতিহাসিক যুগের জানোয়ার ॥

প্রাগৈতিহাসিক জানোয়ারেরা ছিল অতি বৃহদাকার। সে-সব প্রাণী লুপ্ত হয়ে গেছে। তাদের ফসিল বা জীবাশ্ম অথবা দেহাবশেষ পাওয়া গেছে, তাই থেকে সে-যুগের জানোয়ারদের অস্তিত্ব জানা গেছে।

ম্যাস্টডন, ব্রন্টোসরাস, ডাইনোসর, ম্যামথ, টেরোডাকটিল প্রভৃতি প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জীব।

॥ ওকাপি ॥

ওকাপি (okapi) একরকম জিরাফজাতীয় তৃণভোজী নিশাচর প্রাণী। আফ্রিকার অন্তর্গত কঙ্গোয় দেখা যায়। জিরাফজাতীয় হলেও এদের গলা জিরাফের মতো লম্বা নয়। এদের পা জিরাফের মতো ডোরাকাটা। গাত্রবর্ণ বাদামী। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য আফ্রিকার আলবার্ট ও এডওয়ার্ড লেকের মধ্যবর্তী অরণ্যে প্রথম এদের দেখা যায়। ওকাপি ক্রমশঃ নিশ্চিহ্ন হয়ে আসছে।

॥ হামিং বার্ড ॥

হামিং বার্ড সব থেকে ছোট পাখি। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় এদের দেখা যায়। প্রায়



হামিং বার্ড

৪/৫ শ রকমের হামিং বার্ড আছে। সব চেয়ে ছোট হামিং বার্ড কিউবার ফেয়ারী বা প্রিন্সেস হেলেন'স হামিং বার্ড। এদের ঠোঁট খুব লম্বা। সেই ঠোঁট দিয়ে ফুলের মধু খায়। হামিং বার্ড ওড়বার সময় যে শব্দ হয় তা তার মুখ থেকে বেরোয় না। দ্রুত পাখা নড়ার শব্দই আমরা শুনতে পাই।

॥ উড়ুক্কু সাপ ॥

মালয়েশিয়ার জঙ্গলে ও যবদ্বীপের গাছে এক ধরনের সাপ দেখতে পাওয়া যায়—সেই সাপ প্রয়োজনমতো পাতলা ফিতের ন্যায় আকার ধারণ করে ও একগাছ থেকে অন্য গাছে ওড়বার ভঙ্গীতে যাতায়াত করে। ওড়বার শক্তি সেই সাপের না থাকলেও এদের পাতলা শরীর কিছুক্ষণ বাতাসে ভেসে থাকতে পারে। বৈজ্ঞানিক নাম Chrysopelea ornata। বর্মা, দক্ষিণ চীন, সুমাত্রা, বোর্নিও ও আসামের পার্বত্য অঞ্চলেও এদের দেখা যায়। এই সাপকে ধরে চিড়িয়াখানায় রাখবার চেষ্টা করা হয়েছে কিন্তু বাঁচানো যায় নি। এর সাধারণ নাম সোনালী গেছো সাপ (Golden Tree snake)।

॥ মাছ গাছে ওঠে ॥

মালয়েশিয়ায় এক ধরনের মাছ আছে—সে মাছ গাছে উঠতে পারে। তীরভূমি থেকে জল সরে গেলে মাছগুলি ডাঙ্গায় উঠে পড়ে এবং পোকামাকড়ের খোঁজে তীরের কাছাকাছি গাছে ওঠে। এই মাছের চোখ বড় এবং এর ডানা দুটিও বড়। এর নাম Periophthalmus Schlosseni। এই মাছ goby মাছ জাতীয়। যখন ঝাঁক বেঁধে গাছে উঠতে থাকে তখন সে দৃশ্য খুব চমৎকার দেখায়।

॥ ইয়াক ॥

ইয়াক (yak) তিব্বতীয় গরু বিশেষ। প্রায় ২০ হাজার ফুট উঁচুতে বিচরণ করে। এদের পায়ে তীক্ষ্ণ ক্ষুর আছে। ইয়াক সাধারণতঃ বন্য প্রাণী। কিন্তু পোষ মানালে পোষ মানে। এদের গায়ে প্রচুর বড় বড় লোম আছে। তিব্বতের লোকেরা ইয়াককে ভারবাহী পশু হিসাবে ব্যবহার করে। দুধ ও মাংসের জন্যও এর ওদেশে খুব কদর।

॥ আর্ডভার্ক ॥

ওলন্দাজ আর্ড (aarde) শব্দটির অর্থ মাটি ও ভার্ক (vark) শব্দটির অর্থ শূকর। আর্ডভার্ক (aardvark)কে তাই মেটে শূকর বলা হয়। এ একরকম পিপীলিকা ও উইভোজী প্রাণী। লম্বায়

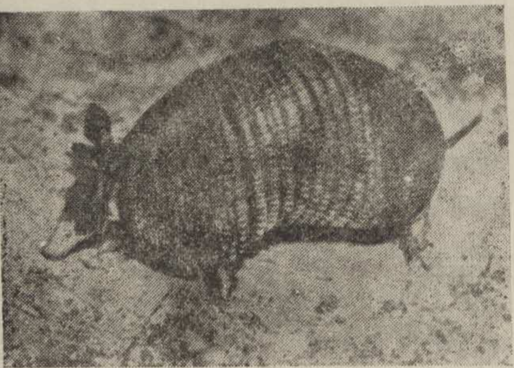


আর্ডভার্ক

প্রায় দেড় মিটার হয়। জিভ সরু ও খুব লম্বা। দিনের বেলায় গর্তে কাটায়। রাত্রে আহারের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সাধারণতঃ উইয়ের ঢিপি ভেঙ্গে উই পোকা খায়। দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখতে পাওয়া যায়। বুয়ররা এই প্রাণীর নামকরণ করেছিল।

॥ আর্মাডিলো ॥

আর্মাডিলো (armadillo) দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের পিপীলিকাভোজী প্রাণী। এদের পিঠ শক্ত আবরণে ঢাকা। এদের মুখ ছুঁচালো এবং দেখতে বড় ইঁদুরের মতো। এক শ্রেণীর আর্মা-



আর্মাডিলো

ডিলো ভয় পেলে শরীরটাকে পাকিয়ে বলের মতো করে ফেলতে পারে।

॥ অ্যাস্প ॥

অ্যাস্প (asp) এক ধরনের ছোট বিষধর সাপ। অ্যাস্প সাপ নানা জাতের – দক্ষিণ ইউরোপের ভাইপেরা অ্যাস্পিস (Vipera aspis), ক্লিওপেট্রার



অ্যাস্প

অ্যাস্প (সম্ভবত: horned viper), ছ বিবলিক্যাল অ্যাস্প (সম্ভবত: Naja Haje), ছ কোবরা ডা ক্যাপেলো (the cobra da capello)। মিশরের রানী ক্লিওপেট্রা একটি অ্যাস্প দ্বারা নিজেকে দংশন করিয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

॥ ওরাং-উটান ॥

ওরাং উটান (orang-utan) সবচেয়ে বড় মনুষ্যাকৃতি বানর। শুধু ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত বোর্নিও ও সুমাত্রায় দেখা যায়। পূর্ণবয়স্ক ওরাং-উটান উচ্চতায় প্রায় দেড় মিটার হয়। তখন তার ওজন হয় প্রায় ১৫০পাউণ্ড। এদের হাত খুব লম্বা।



ওরাং-উটান

ওরাং-উটান নিরামিষাশী। ফল খেয়ে এদের জীবন কাটে। প্রায় সময়েই এরা গাছে গাছে বেড়ায়। গাছেই বাসা বাঁধে।

॥ কিউয়ি ॥

নিউ জীল্যাণ্ডে কিউয়ি (kiwi) নামে এক ধরনের পাখি আছে, যার ডানা নেই, লেজও নেই। দেখতে কতকটা মুরগীর মতো। এ পাখি দিনের



কিউয়ি

বেলায় ঝোপজঙ্গলে লুকিয়ে থাকে, রাত্রে পোকা-মাকড় খাবার জন্যে বেরিয়ে পড়ে।

॥ পাখির দৈহিক তাপ ও হৃদ্‌স্পন্দন ॥

পাখির দৈহিক তাপ মানুষের চেয়ে অনেক বেশী। চিলের দৈহিক তাপ ১০০ ডিগ্রি ফারেন-হাইট, চড়ুই-এর ১১১ ডিগ্রি ফারেনহাইট। ১১২ ডিগ্রি ফারেনহাইট শারীরিক উত্তাপ হলে মানুষের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়।

মানুষের হৃদ্‌স্পন্দন মিনিটে সাধারণতঃ ৭২ বার। আর পাখির হৃদ্‌স্পন্দন মিনিটে ১২০ বার। দ্রুত উড়ে যাবার সময় তাদের হৃদ্‌স্পন্দন খুব বেড়ে যায়।

॥ তিমির দুটো মাথা ॥

অন্যান্য জীবের ন্যায় তিমি মাছের মাথা একটাই হয়। কিন্তু একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত দক্ষিণ জর্জিয়ার উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরে একটা তিমি ধরা পড়ে। বিস্ময়ের সঙ্গে সকলেই দেখে, তার দু'টি মাথা।

॥ পাখির মুখে কুকুরের ডাক ॥

দক্ষিণ আমেরিকার অন্তর্গত চিলির মাঝামাঝি স্থানের জঙ্গলে এক ধরনের পাখি দেখা যায়, যাদের গলার স্বর অনেকটা কুকুরের ডাকের মতো। স্থানীয় অধিবাসীরা একে বলে 'guid-guid'। স্পেনীয় উপনিবেশীদের কয়েকজন ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে একবার কুকুর নিয়ে আন্দিজ পর্বতের ধারে ওই জঙ্গলে শিকার করিতে গিয়েছিল। ওই পাখির ডাক শুনে সেই দিকে সঙ্গের কুকুরেরা গেছে ভেবে গিয়ে দেখে, কুকুর নয়, গাছে বসে পাখি ডাকছে।

॥ হিমালয়ের প্রকাণ্ড পাখি ॥

কথামালায় আছে, ঈগল পাখি ছোঁ মেরে একটা মেষশাবককে নিয়ে আকাশে উড়ে গেল। এ ধরনের শক্তিশালী পাখির অস্তিত্ব এতদিন কারো জানা ছিল না। তুষারমানবের সন্ধানে গিয়ে অভিযাত্রিদলের ডঃ বিশ্বাস এক খুব বড় ধরনের পাখি শিকার করে এনেছেন। এই রকম পাখি শকুনজাতীয়। আকারে এত বড় যে ছাগল-ভেড়ার ছোট বাচ্চা নিয়ে আকাশে ওড়ার ক্ষমতা তার আছে। হিমালয়ের বাসিন্দারা বলে, আগে এ রকম পাখি অনেক দেখা যেত, এখন কমে এসেছে।

॥ ট্যারাণ্টুলা ॥

ইতালিতে এক ধরনের বড় মাকড়সা আছে, যার নাম ট্যারাণ্টুলা (tarantula)। তারা মাটিতে গর্তে থাকে, জাল বোনে না। শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে ধরে খায়।

আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার ট্যারাণ্টুলার স্বভাব ভিন্ন ভিন্ন ধরনের। ['মাকড়সা' দ্রষ্টব্য।]

॥ মাকড়সা পাখি ধরে ॥

দক্ষিণ আমেরিকার ব্রেজিলে সাধারণতঃ আমাজন নদীর ধারের গভীর অরণ্যে এক ধরনের খুব বড় মাকড়সা দেখতে পাওয়া যায়, তারা ছোট ছোট পাখি গিরগিটি, ইঁদুর প্রভৃতি ধরে খায়।

॥ শ্রু ॥

একধরনের খুব ছোট স্থলচর ছুঁচো-জাতীয় প্রাণী। আগে মনে করা হত, এরা বিষধর। এরা নিশাচর. এদের চোখ খুব ছোট।



যে মাকড়সা পাখি ধরে

॥ উটেরা জল না খেয়ে আট দশ দিন পথ চলে ॥

উটের দেহে যে চর্বি থাকে তা থেকে রস বেরিয়ে তার জলের অভাব মিটায়। সাধারণের ধারণা, উট পাকস্থলীর ধারের থলিতে জল ভরে নিয়ে যায়। সে কথা ঠিক নয়।

॥ স্লথ ॥

স্লথ (sloth) এক ধরনের চতুষ্পদ প্রাণী। বেশির ভাগ সময়ে মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার গাছের ডাল আঁকড়ে ঝুলে থাকে। সেই সময়ে তাদের মাথাটাও ঝুলতে থাকে। এইরকম ঝুলতে ঝুলতে তারা এ গাছ থেকে ওগাছে ঘুরে বেড়ায়। মাটির উপরে এরা মোটেই ভালো ভাবে চলতে পারে না।



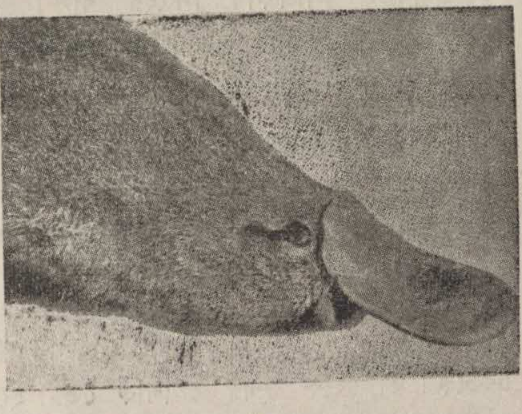
স্লথ

॥ বাঘ ॥

ভারতবর্ষ, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, রাশিয়া ও মালয়েশিয়ায় বাঘ দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকায় বাঘ নেই।

॥ স্তন্যপায়ী প্রাণী ডিম পাড়ে ॥

প্ল্যাটিপাস ও একিডনা স্তন্যপায়ী প্রাণী হলেও ডিম পাড়ে। প্ল্যাটিপাস (platypus) দেখা যায় অস্ট্রেলিয়ায় ও তাসমানিয়ায়। এদের আর এক নাম ডাক-বিল (duck-bill)। প্ল্যাটিপাস জলচর। পা জোড়া, চঞ্চু হাঁসের মতো, লেজ চওড়া ও চেপটা।



প্ল্যাটিপাস

একিডনা (•echidna) দেখা যায় অস্ট্রেলিয়া, তাসমানিয়া ও নিউ গিনিতে। একিডনার দাঁত নেই, স্তন্যপায়ী হলেও ডিম পাড়ে। এরা নিশাচর। এদের জিভ লম্বা।

॥ স্বর্গের পাখি ॥

স্বর্গের পাখির ইংরেজী নাম bird of paradise। নিউ গিনি ও তার পাশাপাশি দ্বীপে এদের দেখা যায়। এদের লেজের রং নানা রকম। প্রায় ৪০ রকমের bird of paradise দেখা গেছে।

॥ শ্বেতহস্তী ॥

থাইল্যাণ্ডে এবং কখনও কখনও ব্রহ্মদেশে শ্বেতহস্তী দেখা যায়। শ্বেতহস্তী থাকার জন্য থাইল্যাণ্ডকে 'শ্বেতহস্তীর দেশ' বলা হয়।

॥ শুশুক ॥

তিমিজাতীয় স্তন্যপায়ী প্রাণী। dolphin ও porpoise-কে বাংলায় শুশুক বলে। dolphin ১.৮২ থেকে ২.৪৩ মিটার লম্বা হয়। গঙ্গা, আমাজন প্রভৃতি নদীতে ও উষ্ণপ্রধান অঞ্চলের সাগরে বাস করে। এরা ঝাঁক বেঁধে খুব দ্রুত গতিতে সাঁতার কেটে যায়। porpoise স্তন্যপায়ী সামুদ্রিক প্রাণী। সাধারণতঃ উত্তর সমুদ্রে দেখা যায়। লম্বায় ১.২১ থেকে ১.৫২ মিটার হয়। এরাও ঝাঁক বেঁধে দ্রুতগতিতে সাঁতার কেটে চলে। চলবার সময় শুশুক বারবার ওঠানামা করে।

॥ মাকড়সার জাল ॥

মাকড়সার শরীর থেকে একরকম রস বার হয়। সঙ্গে সঙ্গেই তা বাতাসে শুকিয়ে সরু সুতোর মতো আকার ধারণ করে। মাকড়সা তাই দিয়ে জাল বোনে। মাছি, মশা প্রভৃতি সেই জালে আটকা পড়ে যায়। মাকড়সা এই ভাবে শিকার ধরে।

॥ ক্যাঙ্গারু ॥

ক্যাঙ্গারু (kangaroo) অস্ট্রেলিয়া ও তার পাশাপাশি দ্বীপের এক ধরনের অদ্ভুত প্রাণী। এদের পিছনের পা দুটি লম্বা। পিছনের পা ও মোটা শক্ত লেজের উপর ভর দিয়ে চলে। সময় বিশেষে ৩ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত লাফাতে পারে। এরা পেটের সংলগ্ন থলিতে শাবক বহন করে।

এরা লম্বায় ১'৮২ মিটার পর্যন্ত হয়। ওজন হয় প্রায় ২০০ পাউণ্ড।



ক্যাঙ্গারু

॥ র‍্যাট্‌ল্ স্নেক ॥

র‍্যাট্‌ল্ স্নেক (rattle snake) এক ধরনের তীব্র বিষধর সাপ। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় শুধু দেখা যায়। ইংরেজী rattle শব্দের অর্থ খট খট করা। এই সাপের লেজে যে-সব হাড়ের গ্রন্থি আছে, চলবার সময় তাতে ঠোকাঠুকি লেগে খট খট শব্দ হয়। ভয় পেলে ও উত্তেজিত হলে তারা লেজের খট-খট শব্দ বাড়িয়ে তুলতে পারে। বাংলায় এই সাপকে বলে ঝুমঝুমি সাপ বা খটখটে সাপ।

॥ স্পঞ্জ ॥

স্পঞ্জ বলে যে জিনিস আমরা ব্যবহার করি তা স্পঞ্জ নামে একরকম সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ। স্পঞ্জ চলাফেরা করতে পারে না। দেখতে কতকটা গাছের মতো। ['সমুদ্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য]

॥ বাইসন ॥

আমেরিকা ও ইউরোপের বড় মাথাওয়ালা মোষের ন্যায় চতুষ্পদ জন্তু। বাইসন (bison)-এর থুতনির নীচে দাড়ি আছে।

॥ সিংহের বাসভূমি ॥

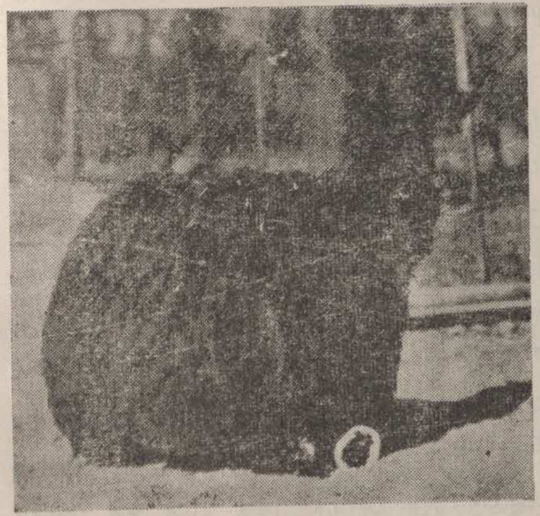
প্রধানতঃ আফ্রিকায় সিংহের বাস। এ ছাড়া ভারতের একমাত্র গুজরাটের গির অরণ্যে কয়েকটি সিংহ আছে। পৃথিবীর আর কোথাও সিংহ দেখতে পাওয়া যায় না।

॥ আলপাকা ॥

আলপাকা (alpaca) দক্ষিণ আমেরিকার এক ধরনের চতুষ্পদ জন্তু। এদের গায়ের লোম খুব চকচকে। তা থেকে সুন্দর পোশাক তৈরী হয়ে থাকে। দক্ষিণ আমেরিকার পেরু প্রভৃতি দেশে গৃহপালিত জীব হিসাবে দেখা যায়।

॥ লামা ॥

লামা (llama) দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের চতুষ্পদ জন্তু। উটের মতো গলা লম্বা। তবে উটের চেয়ে এদের আকার অনেক ছোট। উটের মতো এদের কোন কুঁজ নেই। গায়ে প্রচুর বড় বড় লোম গজায়। ভারবাহী গৃহপালিত পশু হিসাবে এদের ব্যবহার হয়ে থাকে।



লামা

॥ হাতির বাসভূমি ॥

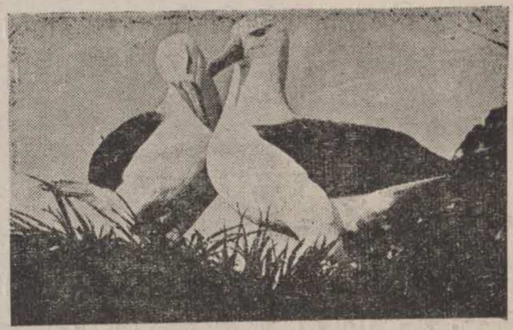
ভারতবর্ষ, আফ্রিকা, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, মালয়েশিয়া ও শ্রীলঙ্কায় হাতি দেখা যায়। আফ্রিকার হাতি সবচেয়ে বড় ; তার কানও বড়। ভারতীয় হাতি সহজেই পোষ মানে; আফ্রিকার হাতি পোষ মানে না।

॥ সিন্ধুঘোটক ॥

মেরু সাগরের এক ধরনের বৃহৎ স্তন্যপায়ী প্রাণী। এরা উভচর। সীলের মতো এদের আকার। ঘোটক বা ঘোড়ার চেহারার সঙ্গে কোন মিল নেই। মুখের উপর চোয়ালে ৩৮ সেন্টিমিটার থেকে ৬০.৯৬ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা দুটি দাঁত আছে। সিন্ধুঘোটক (walrus) ৩.৬৫ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে থাকে।

॥ অ্যালব্যাট্রস ॥

অ্যালব্যাট্রস সব চেয়ে বড় পাখি। কখনও কখনও ডানা ৩ মিটার লম্বা হয়। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে বাস করে।



অ্যালব্যাট্রস

॥ পাখি হলেও উড়তে পারে না ॥

উটপাখি, পেঙ্গুইন, এমিউ (emu), কিউয়ি (kiwi), ক্যাসোয়ারি (cassowary) প্রভৃতি পাখি উড়তে পারে না।

॥ টেপির ॥

টেপির (tapir) মধ্য আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা ও মালয়েশিয়ার বন্য চতুষ্পদ প্রাণী। আকারে ছোট ঘোড়া বা গাধার ন্যায়। সাধারণতঃ



টেপির

জলের ধারে চরে বেড়ায়। উপরের ঠোঁটকে দেখতে ছোট শুঁড়ের মতো। সামনের পায়ে চার টি করে

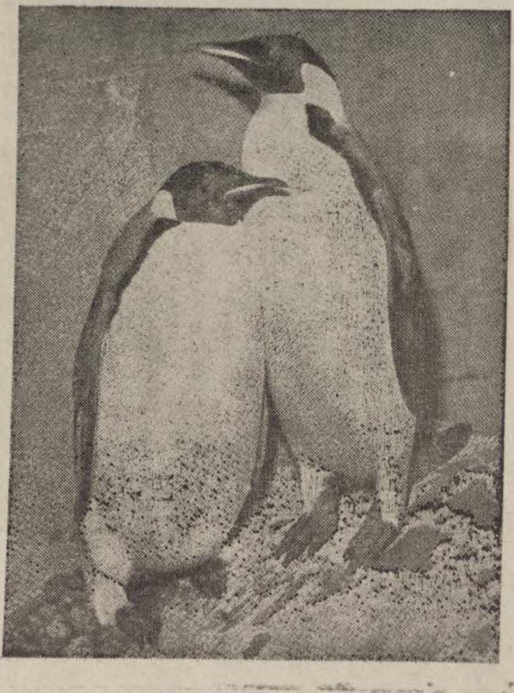
আঙুল, পিছনের পায়ে তিনটি করে। মালয়ের টেপির উচ্চতায় ১·২১ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে।

॥ পাণ্ডা ॥

ভল্লুকজাতীয় একধরনের দুষ্প্রাপ্য জন্তু। এদের বলা হয় বিড়াল ভল্লুক (cat-bear)। এদের লেজ খুব লম্বা; কান বেশ বড়। সংখ্যায় এরা ক্রমশঃ কমে আসছে। দু জাতের পাণ্ডা দেখা যায় —লাল পাণ্ডা বা আসল পাণ্ডা (red or true-panda) এবং বড় পাণ্ডা (giant panda)।

॥ আই-আই ॥

মালাগাসির বৃক্ষবাসী নিশাচর প্রাণী। আই-আই(aye-aye) আকারে বিড়ালের ন্যায়। এর লেজ বেশ লম্বা। ফল, বাঁশের শাঁস, আখ প্রভৃতি খায়।



পেঙ্গুইন

॥ পেঙ্গুইন ॥

সামুদ্রিক পাখি। উড়তে পারে না। দল বেঁধে থাকে। দক্ষিণ গোলার্ধের অধিবাসী। পেঙ্গুইন (penguine) খুব ভালো সাঁতার কাটতে পারে। সহজেই মানুষের পোষ মানে।

॥ কালো ভল্লুক ॥

উত্তর আমেরিকার কালো ভল্লুক সাধারণতঃ ফলভোজী। তারা ফল খেতে খুব ভালোবাসে। তারা জোর করে চেরি গাছকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে চেরি ফল খায়। এরা আকারে সাধারণ ভল্লুকের চেয়ে ছোট। কিন্তু গায়ে খুব জোর। কখনও কখনও হরিণ, ভেড়া ইত্যাদি মেরে খায়।



কালো ভল্লুক

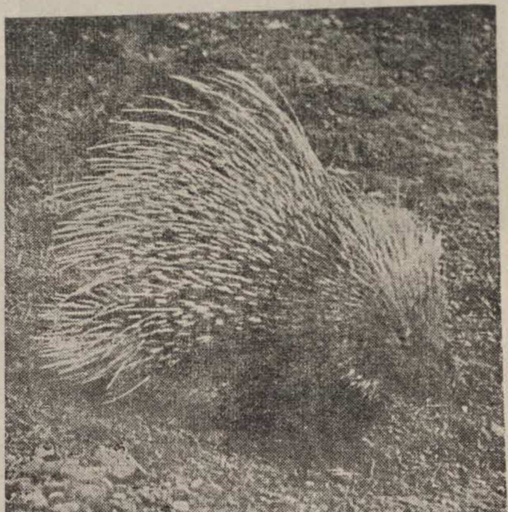
॥ ধনেশ পাখি ॥

আসামের একধরনের পাখি। এর ঠোঁট খুব বড় ও মোটা। তার উপরে টুপির মতো আবরণ। এদের লেজও খুব বড়।



ধনেশ পাখি

॥ শজারু ॥

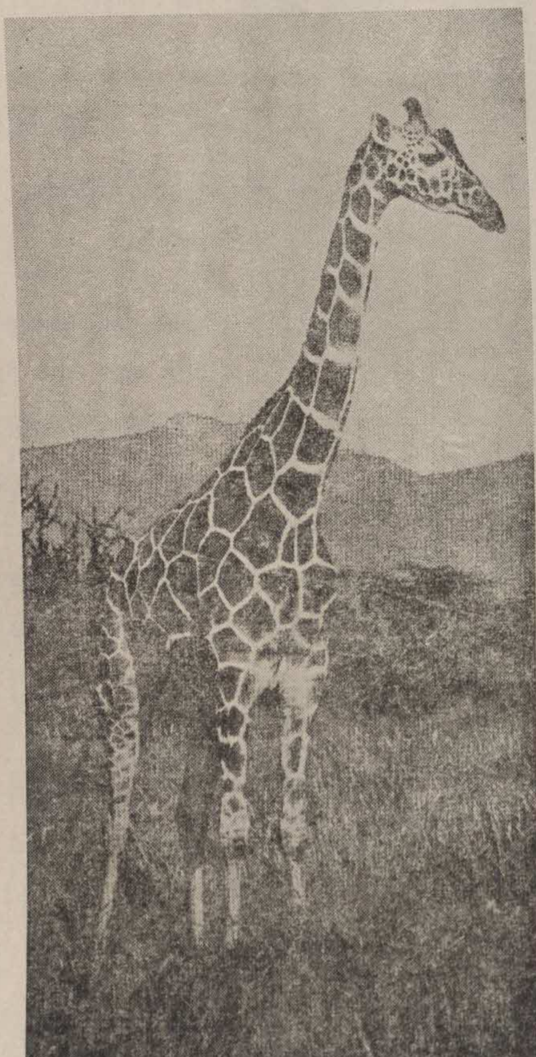


শজারু

শজারু (porcupine) তার পিঠের উপরের লম্বা লম্বা কাঁটা দ্বারা আত্মরক্ষা করে থাকে। পৃথিবীর নানা দেশে এদের দেখা যায়। দিনের বেলায় গর্তে লুকিয়ে থাকে। রাত্রে খাদ্যান্বেষণে বার হয় এরা গাছের শিকড়, পাতা, ছাল ইত্যাদি খায়। যখন চলে তখন ঝুমঝুম শব্দ হয়।

॥ জিরাফ ॥

জিরাফ (giraffe) খুব লম্বা প্রাণী। প্রায় ৬ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এদের গলা খুব লম্বা। এদের স্বর এত মৃদু যে কাছে না গেলে সে স্বর

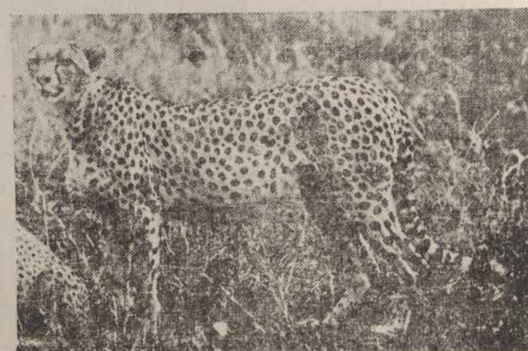


জিরাফ

শোনা যায় না। এরা খুব জোরে ছুটতে পারে। জিরাফ নিরামিষাশী। জিরাফের বাস আফ্রিকায়।

॥ চিতা ॥

সব চেয়ে দ্রুতগামী চতুষ্পদ প্রাণী। ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। তবে ৪৫৭ মিটারের পর এই ছোটার দ্রুততা কমে যায়। এদের গা ছোপ ছোপ কালো রঙে চিত্রবিচিত্র। এরা হিংস্র প্রাণী। আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ায় দেখা যায়।



চিতা

॥ স্কুইরেল বানর ॥

দক্ষিণ আমেরিকার ছোট আকারের বানর। এরা সাধারণতঃ কাঠবিড়ালীর মতো আকারের।



স্কুইরেল বানর

তবে কোন কোন শ্রেণী একটু বড় হয়। এদের লোম খুব কোমল। আমাজন নদের তীরের ধারে স্কুইরেল বানর (squirrel monkey) বহু

সংখ্যায় দেখা যায়। পোকামাকড় ও ফল খেয়ে জীবনধারণ করে।



॥ মৌমাছি ॥

ফুলের মধু সংগ্রহ করে এনে মৌমাছিরা তাদের তৈরী চাকের মধ্যে জমা করে। তারা যে মোম তৈরি করে তা দিয়েই চাক তৈরী হয়। মৌমাছি তিন রকমের—রানী বা স্ত্রী; পুরুষ ও কর্মী। রানী মৌমাছি শুধু ডিম পাড়ে। পুরুষ মৌমাছি কিছু করে না। কর্মী মৌমাছি সব কাজ করে। তারা মধু সংগ্রহ; চাক তৈরি, বাচ্চাদের লালনপালন, শত্রুর সঙ্গে লড়াই—সব কাজই করে থাকে। মৌমাছি সামাজিক জীব।

প্রজাপতির পাখনার রং খুব সুন্দর। তাতে কত রকমের কারুকার্য!

প্রজাপতি ও মথ শুধু ফুলের মধু পান করে। এদের বলে লেপিডোপ্‌টেরা (lepidoptera)।

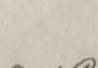
প্রজাপতি দুর্বল ও ক্ষণজীবী। কিন্তু এরা পরিযায়ী পাখিদের মতো দুরদূরান্তরে পরিযাণ করে। অবশ্য তারা তাদের পুরাতন জায়গায় ফিরে যেতে পারে না। হয় যাবার পথেই তাদের মৃত্যু হয়, নয় যেখানে যায় সেখানেই মারা যায়।

॥ গুটি পোকা ॥

এক জাতের পোকার গুটি থেকে রেশম তৈরী হয়। এই পোকাকে বলা হয় গুটিপোকা।



মৌমাছি

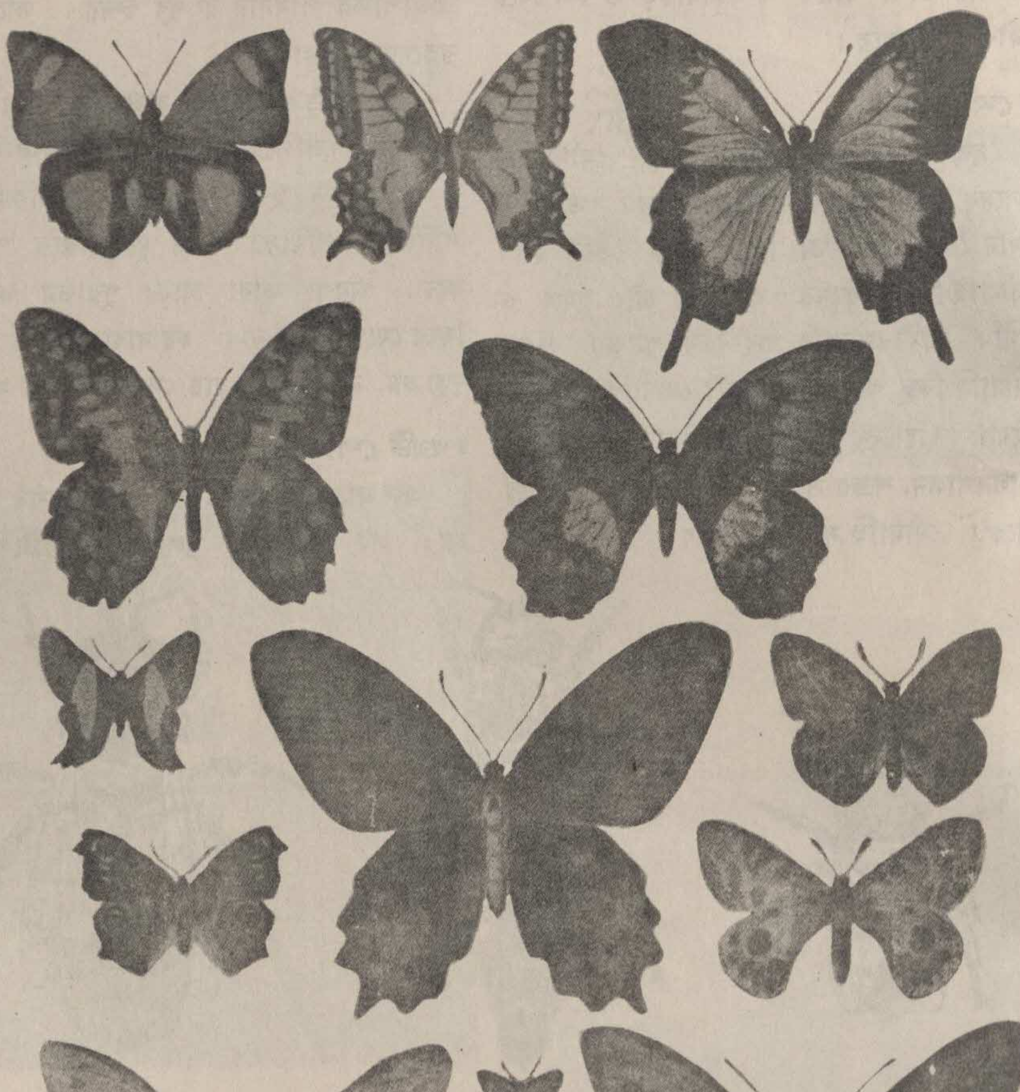


॥ প্রজাপতি ও মথ ॥

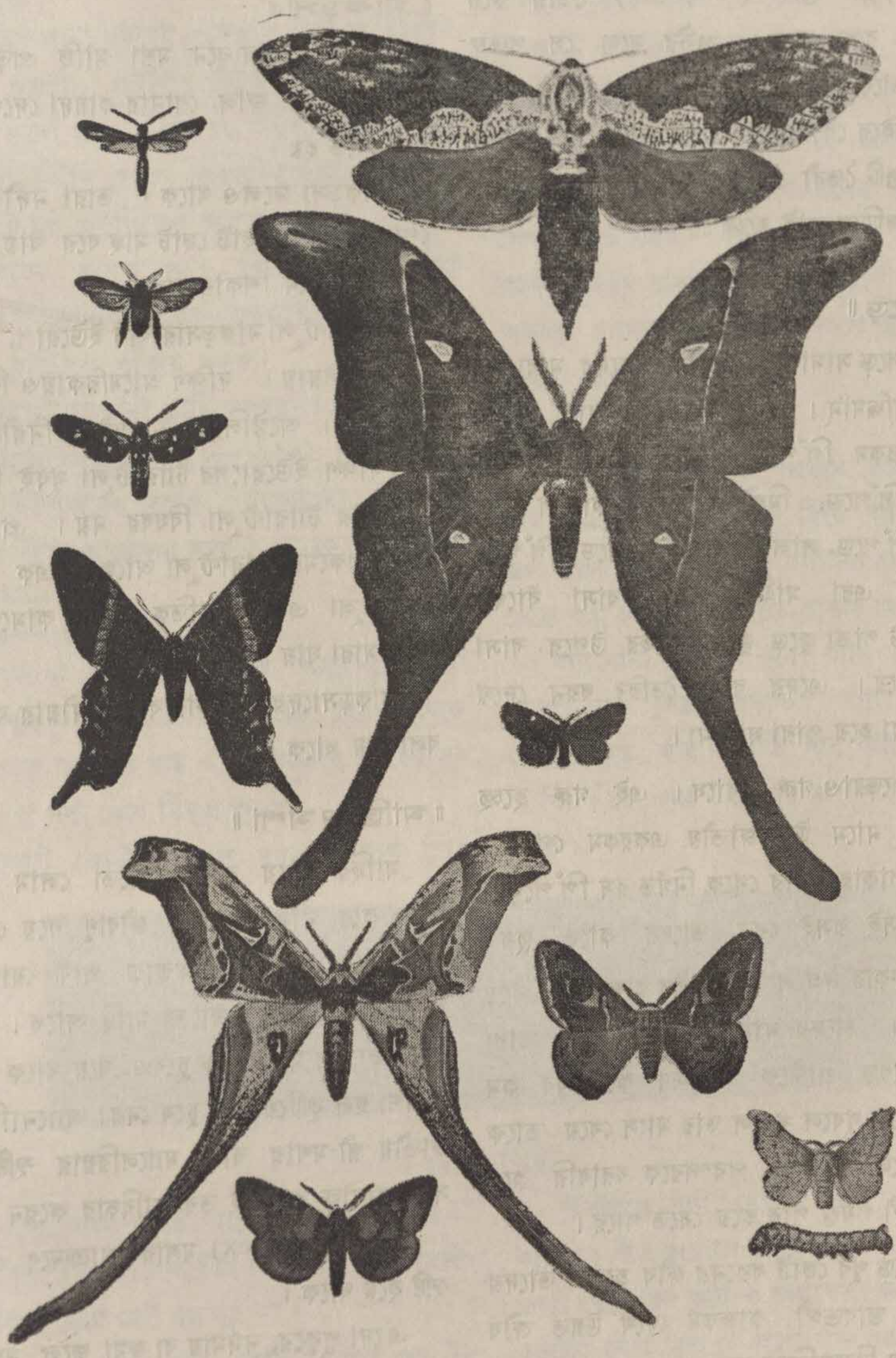
প্রজাপতি ও মথ এক জাতের পতঙ্গ নয়। লোকে ভুল করে মথকেও প্রজাপতি বলে। প্রজাপতি দিনে ওড়ে, মথ ওড়ে রাত্রে। অবশ্য কোন কোন মথ দিনেও ওড়ে। প্রজাপতির শুঁড় (antenna)-এর আগাটা মোটা, মথের শুঁড় সরু। তবে বারনেট (burnet) মথের শুঁড় প্রজাপতির শুঁড়ের মতোই।

আগে ব্যাধি হওয়ার ফলে গুটিপোকার মড়ক হত। তার জন্যে রেশমশিল্প ধ্বংস হবার মতো হয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur) (1892–95) সেই ব্যাধি নিরাময়ের ব্যবস্থা করেন।

পৃথিবীর নানা স্থানে গুটিপোকার চাষ হয়। চীনে চার হাজার বছর আগেও গুটিপোকার চাষ হত।



বিভিন্ন শ্রেণীর প্রজাপতি



বিভিন্ন শ্রেণীর মথ

প্রজাপতি গুটি (cocoon) তৈরি করে পতঙ্গকে রক্ষা করে। গুটির মধ্যে যে পতঙ্গ থাকে তাকে বলে chrysalis। পতঙ্গ গুটি কেটে বাইরে বেরোবার আগেই তাকে মেরে ফেলা হয়। গুটি তৈরী হয় যে সূক্ষ্ম পদার্থ চারদিকে জড়িয়ে জড়িয়ে তাই হচ্ছে রেশম।

॥ পিঁপড়ে ॥

পিঁপড়ে সামাজিক ও কীটপতঙ্গদের মধ্যে সব চেয়ে বুদ্ধিমান্। এরা দল বেঁধে বাস করে। অনেক রকম পিঁপড়ে আছে। চাষী পিঁপড়ে, সৈন্য পিঁপড়ে; মিস্ত্রী পিঁপড়ে, কাঠপিঁপড়ে, ডেয়ো পিঁপড়ে, লাল পিঁপড়ে সড়সড়ে পিঁপড়ে প্রভৃতি। এরা মাটির তলায় বাসা বাঁধে। কেউ কেউ পাতা জুড়ে জুড়ে গাছের উপরে বাসা তৈরি করে। এদের বাসা তৈরির ধরন দেখে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

পিঁপড়েরাও গরু পোষে। এই গরু হচ্ছে অ্যাফিড নামে উকুনজাতীয় একরকম পোকা। এই সব পোকার শরীর থেকে নির্গত রস পিঁপড়েরা খায়। সেই রসই যেন তাদের কাছে দুধ।

আফ্রিকার জঙ্গলে এক শ্রেণীর রাক্ষুসে পিঁপড়ে বা আছে। তাদের নাম ড্রাইভার অ্যাণ্ট। তারা কোন জীবন্ত প্রাণীকে আক্রমণ করে খুব কম সময়ের মধ্যে খুবলে খুবলে তার মাংস খেয়ে তাকে মেরে ফেলে। তারা পরস্পরকে ধরাধরি করে সাঁতরে নদী পর্যন্ত পার হয়ে যেতে পারে।

পিঁপড়ে খুব ছোট ধরনের জীব হলেও তাদের চালচলন, ভাবভঙ্গী কাজকর্ম দেখে উন্নত জীব মানুষ পর্যন্ত বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যায়।

॥ মাকড়সা ॥

মাকড়সা জাল বুনে মশা মাছি প্রভৃতি ধরে খায়। এদের জাল বোনার কায়দা দেখে অবাক্ হয়ে যেতে হয়।

মাকড়সা জলেও থাকে। তারা নদী-সাগরের পোকামাকড় ও ছোট ছোট মাছ ধরে খায়। কেউ কেউ জাল বুনে শিকার ধরে।

ট্যার‍্যাণ্টুলা মাকড়সার বাস ইউরোপ, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়ায়। দক্ষিণ আমেরিকায়ও কিছু কিছু দেখা যায়। অস্ট্রেলিয়ার ট্যারাণ্টুলা নিরীহ জীব। কিন্তু দক্ষিণ ইউরোপের ট্যারাণ্টুলা খুবই বিষধর। আফ্রিকার ট্যারাণ্টুলা বিষধর নয়। প্রায় চার হাজার রকমের ট্যারাণ্টুলা আছে। এক ধরনের ট্যারাণ্টুলা এত সাংঘাতিক যে তার কামড়ে মানুষ পর্যন্ত মারা যায়।

মাকড়সাদের বাস্তুকার বা এঞ্জিনীয়ার বা তাঁতী বলা হয়ে থাকে।

॥ মাছি ও মশা ॥

মাছির পায়ে বুরুশের মতো লোম আছে। তাতে করে নানা রোগের জীবাণু বয়ে বেড়ায়। তার ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী রোগাক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক জাতের মাছি আছে। কোন কোন জাতের মাছি রক্ত চুষেও খেয়ে থাকে।

মশা হুল ফুটিয়ে রক্ত চুষে নেয়। অ্যানোফিলিস-জাতীয় স্ত্রী-মশার দ্বারা ম্যালেরিয়ার সৃষ্টি হয়। সার রোনাল্ড রস এই তত্ত্ব আবিষ্কার করেন।

কিউলেক্স (culex) মশার আক্রমণে গোদের সৃষ্টি হয়ে থাকে।

এঁদো পুকুরে, নর্দমায় বা জমা জলে মশা ডিম পাড়ে। তাই থেকে মশার জন্ম হয়।

॥ **বিছে** ॥

বিছে নানা রকমের –তেঁতুলে বিছে ও কাঁকড়া বিছে তন্মধ্যে প্রধান। বিছের কামড়ে শরীরে ভীষণ যন্ত্রণা হয়। এরা শুধু মানুষকে কামড়ে কাবু করে না, ঝিঁঝি পোকা, গুবরে পোকা, মাকড়সা, ব্যাঙ, ইঁদুর প্রভৃতিকেও কামড়ায়।

বিছের অনেক পা। বিশেষ করে তেঁতুলে বিছের। সাধারণতঃ এরা অন্ধকার জায়গায় কোন কিছুর আড়ালে লুকিয়ে থাকে।

ফরাসী বিজ্ঞানী আঁরি ফাবর (Jean Henri Casimir Fabre, ১৮২৩—১৯১৫) সারা জীবন ধরে কীটপতঙ্গের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বিছের চালচলন সম্পর্কে অনেক তথ্য প্রকাশ করেছেন।

॥ **পঙ্গপাল** ॥

অসংখ্য পঙ্গপাল একসঙ্গে শস্যক্ষেতে হানা দিয়ে খুব ক্ষতি করে। তারা এক জায়গা থেকে উড়ে অন্য জায়গায় যায় ও সেখানকার গাছের সব পাতা ও শস্য খেয়ে নির্মূল করে।

কোটি কোটি পঙ্গপাল যখন আকাশ দিয়ে উড়ে যায়, তখন সূর্যের আলো পর্যন্ত ঢেকে যায়।

পঙ্গপাল ফড়িংজাতীয়। এরা ৭।৮ সেন্টিমিটারের চেয়ে বেশী বড় হয় না।

কখনও কখনও এরা একদিনে প্রায় ৩০০ টন পাতা ও শস্য খেয়ে ফেলে। দলে থাকে প্রায় ৩০।৪০ হাজার কোটি পঙ্গপাল। এরা কোন দেশে শস্যহানি করে দুর্ভিক্ষ ঘটাতে পারে।

॥ **জোনাকি** ॥

জোনাকির শরীর থেকে যে আলো বেরোয় তাতে কোন তাপ নেই, আগুনের মতো কোন শিখা তাতে নেই। এদের শরীরে লুসিফেরিন বলে একরকম রাসায়নিক জৈব পদার্থ আছে. তা তাদের শ্বাসের অম্লজানের সংস্পর্শে এলে তা থেকে আলো বেরোয়।

॥ **ব্যাং** ॥

ব্যাং উভচর প্রাণী। প্রথমে জলে জন্মগ্রহণ করে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যাং তার পূর্ণ রূপ ধারণ করে। প্রথমে ব্যাঙাচি হয়, পরে তাই থেকে ব্যাং হয় ও জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসে।

ব্যাং নানা শ্রেণীর—কুনো ব্যাং, সোনা ব্যাং, কোলা ব্যাং, বুলফ্রগ প্রভৃতি। ব্যাং ছোট ছোট পোকামাকড়, মাছ প্রভৃতি ধরে খায়। বুলফ্রগ পাখি, ইঁদুর, এমন কি ছোট সাপ পর্যন্ত ধরে খেয়ে থাকে।

শীতকালে ব্যাং বেশির ভাগ সময় ঘুমিয়ে কাটায়। শীত ফুরোলে তাদের ঘুম ভাঙে। তখন তারা খেতে শুরু করে ও চলাফেরা করে। বর্ষাকালে ব্যাঙের খুব আনন্দ। পল্লী অঞ্চলের ডোবা, বিল, খানা প্রভৃতি থেকে তাদের ডাক শোনা যায়।



তেঁতুলে বিছে



মানুষ

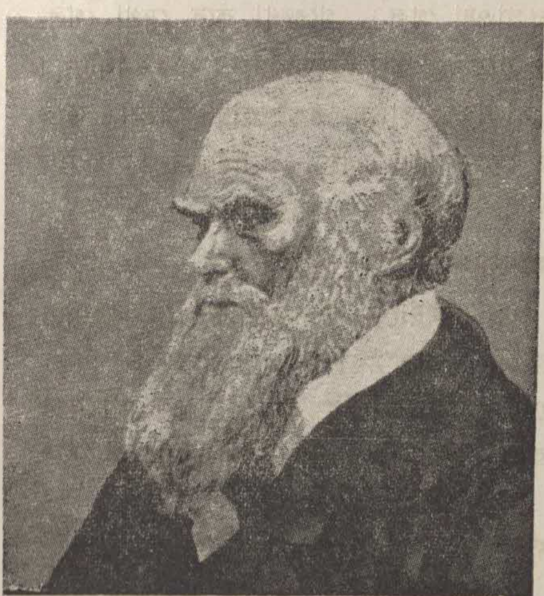
সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবীতে গাছপালার আবিষ্কার হয়। তারপর আসে জীবজন্তু। শেষে মানুষের সৃষ্টি হয়। কিন্তু কবে ও কেমন করে মানুষ পৃথিবীতে এল সে সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়েছেন।

পুরাণের কথা বাদ দেওয়াই ভালো। কারণ, পুরাণে বলে, মনু ছিলেন প্রথম মানুষ। সেই মনু থেকে মানুষ বা মানব কথাটা এসেছে। এ তো গেল হিন্দুদের পুরাণের কথা। অন্য ধর্মে বলে, আদম (Adam) পৃথিবীর প্রথম মানুষ, ইভ বা হবা (Eve) প্রথম নারী। এই আদম কথাটা থেকে আদমী অর্থাৎ মানুষ কথাটার উৎপত্তি। নানা দেশে নানা শাস্ত্রে মানুষসৃষ্টির সম্বন্ধে নানা কথা লেখা আছে। সে সবের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে নানা দেশে নানা আকারের মানুষ দেখা যায়। কোন দেশের মানুষের রং কালো, কোন দেশের সাদা, কোন দেশের মানুষের গায়ের রং বাদামী। কেউ বেঁটে, কেউ লম্বা। কারো টানা-টানা চোখ, কারো চোখ বসা, কারো চোখ ছোট। আকারে, কথা-বার্তায়, আচার-ব্যবহারে, বেশভূষায়, খাওয়াপরার রীতিতে নানা দিক্‌ দিয়ে কত পার্থক্য। কিন্তু যখন বিজ্ঞানীরা বলেন, বর্তমানের মানুষের চেহারা আগেকার দিনের মানুষের মতো ছিল না, ছিল বনের গরিলা বা বনমানুষের মতো, তখন বিস্মিত না হয়ে থাকা যায় না।

॥ ডারউইনের মতবাদ ॥

ইংরেজ বিজ্ঞানী ডারউইন (Charles Robert Darwin, ১৮০৯-১৮৮২) বললেন, কোটি কোটি বছর আগে মানুষ বলে কিছু পৃথিবীতে ছিল না। অন্য ধরনের অন্য জাতের প্রাণী নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে মানুষের রূপ পেয়েছে। বানর থেকে বনমানুষ, বনমানুষ থেকে মানুষের সৃষ্টি। তাঁর মতবাদকে বিবর্তনবাদ (theory of evolution) বলা হয়।



ডারউইন

॥ প্রাইমেটীজ ॥

স্তন্যপায়ী প্রাণীদের কিছু কিছু গাছে গাছে ঘুরে বেড়াত। সে সবের মধ্যে শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাং-উটান প্রভৃতি প্রাণীর লেজ নেই। তাদের বলা হয় বনমানুষ। এই বনমানুষদের প্রাইমেটাজ (Primates) বলে।

॥ প্রোকনসাল ॥

সেকালের মানুষও প্রাইমেটীজ। তারা আগে গাছে গাছে ঘোরাফেরা করত। পরে গাছ ছেড়ে মাটিতে চলাফেরা করতে থাকে।

প্রায় আড়াই কোটি বছর আগে তারা গাছ ছেড়ে মাটিতে চলাফেরা শুরু করে। প্রথম যারা মাটিতে ঘোরাফেরা করত, তারাই মানুষের পূর্বপুরুষ। সেই পূর্বপুরুষকে প্রোকনসাল (Proconsul) বলা হয়।

এই প্রোকনসালকে বিজ্ঞানীদের ভাষায় মানুষ বলা হলেও কোন কালের মানুষের মতো তাদের চেহারা ছিল না। তাদের চেহারা ছিল কতকটা গরিলার ন্যায়। এই প্রোকনসাল থেকে ধীরে ধীরে প্রায়-মানুষের উদ্ভব।

হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ দিকে শিবালিক পাহাড়ে একটা প্রাইমেটীজের হাড় পাওয়া গেলে তা থেকে লোকের ধারণা হয়েছিল, ভারতেই প্রথম মানুষের উদ্ভব হয়েছিল। যে-হাড় পাওয়া গিয়েছিল তা শিবপিথেকাস শ্রেণীর মানুষের। পরে নৃতত্ত্ববিদ্-



প্রাইমেটীজ

দের চেষ্টায় পৃথিবীর নানা স্থানে নানা ধরনের প্রায় মানুষের হাড় পাওয়া যেতে থাকে। তা থেকে বোঝা যায়, শিবালিকের শিবপিথেকাস শ্রেণীর মানুষ প্রায়-মানুষের অনেক আগেকার।

॥ অস্ট্রালোপিথীসীন ॥

দক্ষিণ আফ্রিকার এক চুনা পাথরের খনিতে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে এক শ্রেণীর প্রায় মানুষের হাড় পাওয়া যায়। সেই প্রায় মানুষকে বলা হয় দক্ষিণী বনমানুষ বা অস্ট্রালোপিথীসীন (Australopithecene)।

হাড় পাওয়া গেল। গবেষণা করে দেখা গেল, সেই হাড় যার তার উচ্চতা ছিল ১·২১৯২ মিটার। সে সোজা হয়ে হাঁটত, পশুশিকার করত। তার নাম দেওয়া হল হোমো হ্যাবিলিস (Homo habilis) অর্থাৎ নিপুণ মানুষ।

॥ জাভা মানুষ ॥

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের ইউজীন ডুবোয়া নামে এক ডাক্তার যবদ্বীপে প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগেকার কয়েকটি খুলির হাড় ও দাঁত আবিষ্কার করেন। এই হাড় ও দাঁত যার তাকে বলা হল





প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মাথার হাড়ের ফসিল

॥ জিনজানথ্রোপাস ॥

১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মধ্যপূর্ব আফ্রিকার টাঙ্গানাইকাতে সাড়ে সতেরো লক্ষ বৎসর আগেকার যে প্রায়-মানুষের হাড় পাওয়া যায়, তার নাম হল জিনজানথ্রোপাস (Zinjanthropus), অস্ট্রালোপিথীসীন ও জিনজানথ্রোপাস শ্রেণীর প্রায়-মানুষ সোজা হয়ে হাঁটত, পশুশিকার করে জীবনযাপন করত।

॥ হোমো হ্যাবিলিস ॥

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে টাঙ্গানাইকাতেই ১৮ লক্ষ ২০ হাজার বছর আগেকার প্রায়-মানুষের বেশ কিছু

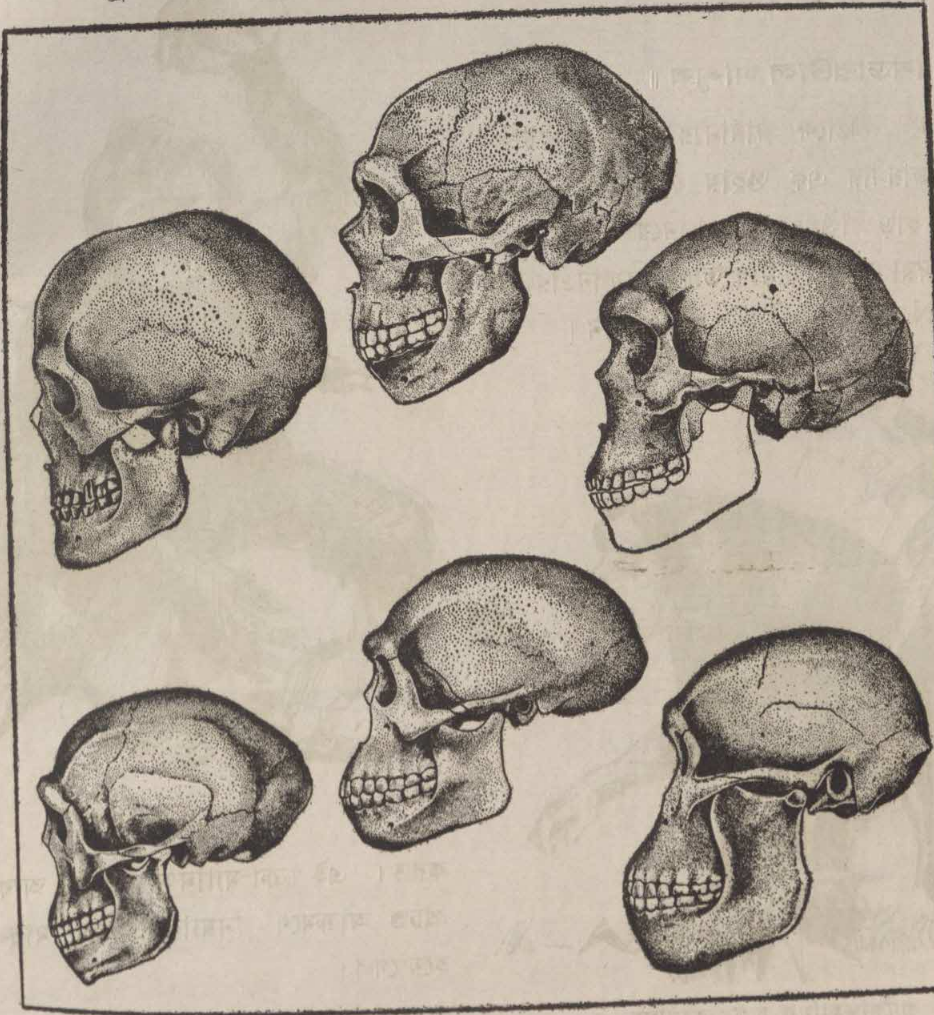
পিথিক্যানথ্রোপাস ইরেক্টাস (Pithiecanthropus Erectus) অর্থাৎ সোজা বানর-মানুষ। একেই বলা হয় জাভা মানুষ (Java Man)।

॥ পিকিং ম্যান ॥

সারা পৃথিবী জুড়ে নৃতত্ত্ববিদ্‌রা আগেকার যুগের মানুষের দেহাবশেষ খোঁজ করতে থাকলেন। তাঁরা খুঁজতে খুঁজতে দেড় লক্ষ বছর আগেকার এক শ্রেণীর মানুষের কয়েকটি হাড় পেলেন ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে চীনের পিকিং শহরের কাছাকাছি চৌকাওটিয়েন (Choukowtien) গুহায়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে

জানালেন, এই শ্রেণীর মানুষ অনেকটা উন্নত ছিল। এদের বলা হল পিকিং ম্যান (Peking Man) ও সিনানথ্রোপাস (Sinanthropus)।

কয়েক লক্ষ বছর ধরে ধীরে ধীরে মানুষ তার বর্তমান রূপ পেয়েছে। এর আগে যে কয়শ্রেণীর মানুষের কথা বলা হয়েছে, তারা নামেই মানুষ।



মানুষের মাথার খুলি

প্রথম সারির মধ্যের : নিয়্যানডারট্যাল মানুষ
দ্বিতীয় সারির বাঁ দিকে : ক্রো ম্যানিওঁ মানুষ
দ্বিতীয় সারির ডান দিকে : রোডেশিয়ান মানুষ
তৃতীয় সারির মধ্যের : পিথেক্যানথ্রোপাস মানুষ
তৃতীয় সারির বামদিকের : পিকিং মানুষ
তৃতীয় সারির ডানদিকের : অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষ

প্রকৃত মানুষ এরা কেউই নয়। দেড় লাখ বছর আগেও প্রকৃত মানুষের সৃষ্টি হয় নি। প্রায় চল্লিশ হাজার বছর আগে প্রকৃত মানুষের সৃষ্টি হয়, বলা চলে।

॥ নিয়্যানডারটাল মানুষ ॥

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানীর নিয়্যানডারটাল নামক জায়গার এক গুহায় যে হারানো দিনের মানুষের হাড় পাওয়া যায়, তা নিয়ে গবেষণা করে নৃতত্ত্ববিদেরা সেই হাড় যার তাকে নিয়্যানডারটাল মানুষ (Neanderthal Man) বলেছেন।



প্রাগৈতিহাসিক যুগের বনমানুষ

॥ ক্রো-ম্যানিঅঁ মানুষ ॥

ফ্রান্সের ক্রো-মানিঅঁ (Cro-magnon) নামে এক জায়গায় যে অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের মানুষের আবির্ভাব হয় তাহাদের চেহারা ছিল বড়, মগজ ছিল বড়, শক্তি ছিল বেশী। তারা শিকারে খুব পটু ছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, বাইসন প্রভৃতি শিকারের কাজে তারা পাথর ও হাড়ের তৈরী যন্ত্র ব্যবহার



ক্রো-ম্যানিঅঁ মানুষ

করত। এই ক্রো-ম্যানিঅঁ মানুষের আকস্মিক ও প্রচণ্ড আক্রমণে নিয়্যানডারটাল মানুষ ধ্বংস হয়ে গেল।

॥ যুগ ॥

মানুষ ক্রমশঃ বুদ্ধিমান্ ও সভ্য হয়ে উঠতে থাকল। বুদ্ধিমান্ মানুষ (Homo Sapiens)-এর যুগকে প্রধানতঃ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রস্তর যুগ (Stone Age), নূতন প্রস্তর যুগ (New Stone Age), ব্রোঞ্জ যুগ (Bronge Age) ও লৌহ যুগ (Iron Age)।



অস্ট্রালোপিথেকাস পিথেক্যানথ্রোপাস নিয়্যানডারটাল ক্রো-ম্যানিওঁ

॥ পুরাতন প্রস্তরযুগ ॥

প্রস্তরযুগের মানুষেরা আত্মরক্ষার জন্য, শিকারের জন্য প্রথম প্রথম পাথর ছুড়তে লাগল, তাতে পুরোপুরি ফল না পাওয়ায় পাথরকে চেঁচে ধারালো ও ছুঁচলো করে তুলল। বড় বড় জন্তুরা সাংঘাতিক শিং, নখ আর দাঁত নিয়েও সে-যুগের মানুষের কাছে হার মানতে থাকল। প্রস্তর-যুগের প্রথম দিক্‌কার সময়কে পুরাতন প্রস্তরযুগ বলা হয়। সে যুগ দশ হাজার বছর আগেই শেষ হয়ে গেছে, শুরু হয়েছিল প্রায় এক লক্ষ বছর আগে। এযুগের শেষের দিকে মানুষ সাগর, হ্রদ, নদী প্রভৃতি থেকে মাছ ধরা শুরু করল। এই যুগেই মানুষ বনের কুকুরকে পোষ মানিয়ে নানা কাজে লাগাতে থাকল। ঘর তৈরি, মাটির থালা-বাসন তৈরি, নৌকো তৈরি প্রভৃতি কাজ তারা শিখল।

॥ নূতন প্রস্তরযুগ ॥

এর পর এল নূতন প্রস্তরযুগ (New Stone Age)। এতদিনে মানুষ অনেক সভ্য হয়েছে। এযুগের মানুষ চাষ করা, জীবজন্তু পোষা, ঘর বেঁধে মিলে মিশে এক জায়গায় বসবাস করা, রান্না করা, গয়না তৈরি করা প্রভৃতির দিক্ দিয়ে সভ্যতার অনেক ধাপ পেরিয়ে গেল।

॥ ব্রোঞ্জযুগ ॥

নূতন প্রস্তরযুগের পরের যুগ ব্রোঞ্জ যুগ (Bronge Age)। ভারতের সিন্ধুনদের তীরে, টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর ধারে চীনে; ব্যাবিল-নিয়ায়, মিশরে সে যুগের মানুষের অনেক কীর্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। তামা আর টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করে তা দিয়ে অস্ত্র তৈরি করার জন্য এ যুগকে বলা হয় ব্রোঞ্জযুগ। অবশ্য, শুধু তামার ব্যবহার অনেকে করত। সবাই ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানত না। এ প্রায় ৫।৬ হাজার বছর আগেকার কথা।

॥ লোহযুগ ॥

ব্রোঞ্জযুগের পরে এসেছে লৌহযুগ (Iron Age)। বর্তমানে লৌহযুগই চলছে। মানুষ মাত্র সাড়ে তিন হাজার বছর আগে লোহা আবিষ্কার করে। লোহা তৈরি শুরু হলে ব্রোঞ্জের অস্ত্র তৈরি বন্ধ হয়ে গেল। লোহা দিয়ে নানা

রকম অস্ত্র তৈরি শুরু হল। শুধু অস্ত্র কেন লোহা দিয়ে সভ্য মানুষের পক্ষে নানা প্রয়োজনীয় জিনিস তৈরি হয়েছে।

॥ গাত্রবর্ণের দিক দিয়ে শ্রেণীবিভাগ ॥

গায়ের রঙের বিচারে মানুষকে বিজ্ঞানীরা মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন – মঙ্গোলিয়ান (Mongolian), নিগ্রো (Negro), ককেশিয়ান (Caucasian), অস্ট্রালয়েড (Australoid) ও আমেরিকান ইণ্ডিয়ান (American Indian)। এশিয়ার হলদে রঙের মানুষ মঙ্গোলিয়ান, আফ্রিকার কালো রঙের মানুষ নিগ্রো, ইউরোপের সাদা রঙের মানুষ ককেশিয়ান, অস্ট্রেলিয়ার বাদামী রঙের মানষ অস্ট্রালয়েড ও আমেরিকার তামাটে লাল রঙের মানুষ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান।

॥ দক্ষিণ ভারতের আদিবাসী ॥

দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে একধরনের আদিবাসীদের বাস। তাদের পূর্বপুরুষ পুরাতন প্রস্তরযুগের লোক। এখনও পুরাতন প্রস্তর-যুগের ন্যায় বন্য পরিবেশে আদিম ধরনের জীবন-যাত্রা এদের। এরা চাষ করতে জানে না। বনের পশুপাখি, মধু প্রভৃতি দিয়ে গ্রামের চাষী-দের কাছ থেকে চাল নিয়ে ভাত রেঁধে খায়। এদের নাম মালাসার, পুলিয়া, উরুলা, কাডার প্রভৃতি। এই সব আদিবাসীদের আচার-আচরণ ভারতের প্রাচীন নেগ্রিটো (Negrito) জাতির প্রায় কাছাকাছি। এদের চেহারা বেঁটে, নাক থেবড়া ধরনের, চুল কোঁকড়া।

॥ প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ॥

প্রোটো-অস্ট্রালয়েড ধাঁচের একধরনের মানুষ বাইরে থেকে ভারতে এসে প্রবেশ করে। তারা বেঁটে; মাথা লম্বাটে, নাক ছোট ও চেপটা ধরনের ছিল। তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ও সংগ্রামে নেগ্রিটোরা পিছিয়ে পড়তে থাকে। আবার নূতন নূতন জাতির লোকেদের আক্রমণে প্রোটো অস্ট্রালয়েড ধাঁচের লোকেরা হটে যেতে থাকল। যারা টিকে রইল তাদের আজও তামিলনাড়ু, মধ্যপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, ছোটনাগপুর প্রভৃতি জায়গায় দেখা যায়। সাঁওতাল, কোল, ভীল, ওরাওঁ, মুণ্ডা, গোঁড় বা গোণ্ড্ প্রভৃতি বা বেঙ্কু, জুয়াং, বোঢ্রা, কুড়ুম্বা প্রভৃতি আদিবাসীরা সেই সব টিকে-থাকা মানুষের বংশধর।

॥ সাঁওতাল ॥

এদের মধ্যে সাঁওতালরা আমাদের সবচেয়ে পরিচিত। সাঁওতালরা আদিবাসী হলেও অনেক দিক্ দিয়ে সভ্য হয়ে উঠেছে। তারা নাচ-গান খুব ভালবাসে, ঢোলক, মাদল, বাঁশী প্রভৃতি বাজানো, তীর ধনুক চালানো, চাষ করা, লেখা-পড়া শেখা, অফিসে কাজ করা, লোকের বাড়িতে জন খাটা প্রভৃতি কাজ করে।

সাঁওতালরা চরিত্রবান্, সত্যবাদী, নির্ভীক ও সরল হয়। আজকাল বহু সাঁওতাল ভালোভাবে লেখাপড়া শিখে সমাজে স্থান করে নিয়েছে। কিসকু, মুরমু, সোরেন, হাঁসদা, হেমব্রম, টুডু প্রভৃতি পদবীধারী বহু আদিবাসী সমাজে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছেন।

সাধারণ সাঁওতালরা ইঁদুর, গোসাপ, কাঠ-বিড়াল পর্যন্ত খেয়ে থাকে। মহুয়ার ফল বা মদ এদের খুব প্রিয়।

সাঁওতালরা শূকর বা মুরগী বলি দিয়ে মাদল

বাজিয়ে দেবদেবীর পূজা করে। এরা দেবকে বলে বোঙ্গা, দেবীকে বুঙ্গি।

ফুল এরা খুব ভালবাসে। মেয়েরা খাট কাপড় পরে মাথায় ফুল গুঁজে থাকে। পুরুষেরা মাদল বাজায়।



সাঁওতাল

সাঁওতালদের সাহিত্যও আছে এবং তার ভাব ও ভাষা খুব সুন্দর।

॥ মেডিটারেনিয়ান ॥

প্রোটো-অষ্ট্রালয়েডদের পরে যারা বাইরে থেকে এসে ভারতে বসবাস করতে থাকে তাদের আদি-বাস ছিল ইউরোপের দক্ষিণ দিক্‌স্থ ভূমধ্যসাগরের ধারে এবং পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার কোথাও কোথাও। এদের বলা হয় মেডিটারেনিয়ান (Mediterranean)। যে-সব মেডিটারেনিয়ানরা ভারতে আসে তারা প্রধানতঃ পশ্চিম ও মধ্য এশিয়ার লোক।

মেডিটারেনিয়ানরা এলে তাদের সঙ্গে যুঝতে না পেরে সে যুগের সাঁওতাল, কোল ও ভীলরা পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে চলে গেল।

মেডিটারেনিয়ানরা তামার অস্ত্রশস্ত্র ও বাসন-কোসন তৈরি করত, দুর্গ নির্মাণ করত। এদের মেয়েরা গহনা পরত। রাস্তাঘাট তৈরি, পাকা নরদমা, বাড়িঘর তৈরি প্রভৃতি করতে তারা বেশ পটু ছিল।

মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পায় তাদের সভ্যতার বহু চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক পুরাতত্ত্ববিদ্‌ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯২-১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পা আবিষ্কার করেন।

॥ দ্রাবিড় ॥

মেডিটারেনিয়ানরা চিরকাল ভারতের মাটিতে পূর্বগৌরব নিয়ে বজায় রইল না। তাদের মধ্যে একদল দাক্ষিণাত্যে চলে গেল। তামিলনাড়ু, অন্ধ্র, কর্ণাটক, কেরলের অধিবাসীরা মোটামুটি তাদের বংশধর বলা চলে। এদের বলা হয় দ্রাবিড়'। অবশ্য, প্রকৃত দ্রাবিড় জাতির অস্তিত্ব এখন নেই। এই দ্রাবিড় জাতিকে প্রোটো-ড্রাভিডিয়ান Proto Dravidian বলা হয়।

॥ আলপাইন জাতি ॥

ইউরোপের আল্পস পর্বতের আশেপাশে এক জাতি বাস করত। তাদের গড়ন ছিল মাঝারি ধরনের। তাদের গায়ের রং ছিল সাদা। তারা ককেশিয়ান জাতির অন্তর্ভুক্ত। তাদের বলা হত আলপাইন জাতির লোক।

আলপাইনরা প্রোটো-দ্রাভিডিয়ানদের পরে ভারতে এসেছিল। কিন্তু আলপাইন জাতির লোক হলেও তারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে আসে। বাঙ্গালী, গুজরাটী ও মারাঠীরা আলপাইনদের বংশধর। অবশ্য, সে-যুগের আলপাইনরা নানা জাতের মানুষের সঙ্গে মিশে বর্তমান রূপ পেয়েছে।

॥ আর্য ॥

প্রাচীন ভারতের আর্যরা ভারতের লোক নয়। তারা মধ্য এশিয়া থেকে ভারতের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে। সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার কথা।

যারা এসেছিল তারা ককেশিয়ান জাতের নর্ডিক শাখার লোক। তাই তাদের বলা হয় ককেশিয়ান-নর্ডিক (Caucasian-Nordic)। এই জাতির কিছু লোক পারস্যেও গিয়ে পৌঁছয়।

এদের শরীর লম্বা, রং ফরসা ও খাড়া নাক। এদের বলা হয় আর্য (Aryan)।

অনেক ঐতিহাসিকের অভিমত, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসে নি। ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এসেছে মাত্র। তখনকার দিনে ভারতবর্ষ কশ্যপ সাগর (Caspian Sea) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আর্যরা এই কশ্যপ সাগরের তীরবর্তী স্থান থেকে উত্তর ভারতে এসেছিল।

বর্তমান কালের কাশ্মীরী, পাঞ্জাবী ও উত্তর প্রদেশের লোকেরা সেই আর্যদের বংশধর।

দ্রাবিড়রা আর্যদের সঙ্গে সংগ্রামে হটে গেল। দ্রাবিড়দের স্থান হল দক্ষিণ ভারতে। উত্তর ভারতের এক বিরাট অংশ জুড়ে আর্যরা বসবাস করতে লাগল।

॥ সব চেয়ে লম্বা নারী ॥

মধ্য চীনের Yujiang গ্রামের Zeng JinIian পৃথিবীর জীবিত নারীদের মধ্যে সব চেয়ে লম্বা— উচ্চতা ২.৪৪ মিটার।



সবচেয়ে লম্বা নারী

॥ ভারতে বহু জাতির আগমন ॥

ভারতে শুধু আর্যরাই আসে নি, মঙ্গোল বা মঙ্গোলিয়ানরা উত্তর-পূর্ব দিক্ দিয়ে এসেছে। উত্তর পশ্চিম দিক্ দিয়ে ব্যাকট্রিয়ান, গ্রীক, শক, হুন, মোগল, পাঠান কেউ বন্ধুভাবে, কেউ বা শত্রুভাবে এসেছে। জলপথে আবিসিনিয়ার হাবসীরা, আরব-পারস্যের লোক ও ইহুদীরা নানা সময়ে ভারতে প্রবেশ করেছে।

॥ মঙ্গোলিয়ান ॥

দাফলা, মিকির, নাগা, গারো, খাসিয়া, কুকী, মিজো, মিশমী, সিন্টেং, আবর এবং আরও অনেকে মিশ্রিত মঙ্গোলিয়ান। এদের মধ্যে খাসিয়াদের রং খুব ফরসা। এরা বহুকাল আগে ভারতে বসবাস করতে শুরু করলেও পুরোপুরি বৈচিত্র্য হারায় নি। এরা সবাই আগের মতো অশিক্ষিত নয়। এদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার ব্যাপক প্রসার ঘটেছে।

॥ যাযাবর ॥

পৃথিবীতে এমন জাতের লোকও আছে, যারা কখনও ঘর বেঁধে এক জায়গায় থাকে না। তাদের সঙ্গে থাকে তাঁবু বা গাড়ি। সে গাড়ি কোথাও ঘোড়ায় টানে, কোথাও উটে টানে, তাদের বলা হয় যাযাবর (nomad)। বাংলায় তাদের সাধারণতঃ বলা হয় বেদে। জিপসী, রাশিয়ার কিরঘিজ, কালমুক প্রভৃতি যাযাবর। এদের মধ্যে জিপসীদের চেহারা খুব সুন্দর। যাযাবর জাতির লোকেরা অনেকেই কুকুর পোষে। এরা গান, বাজনা, নাচের মাধ্যমে জীবিকা অর্জন করে। কেউ কেউ টোটকা ঔষধ দেয়, কেউ হাত গোনে, কেউ বাত সারায়, কেউ কানের পোকা বার করে। সারা পৃথিবীতে নানা ধরনের যাযাবরের দেখা মেলে। সব চেয়ে বেশী দেখা যায় পশ্চিম এ ।ও পূর্ব ইউরোপে। ভারতের সর্বত্র নানা ঋতুতে এদের দেখা যায়। কলিকাতার



মরুভূমির বেদুইন

গড়ের মাঠে প্রায়ই এই সব যাযাবর বা বেদেদের দেখা মেলে।

জিপসীদের উদ্ভব ভারতেই বলে অনেকে মনে করেন।

আরবের মরুভূমির বেদুইনরা যাযাবর। সাহারা মরুভূমির উত্তর দিকের তুয়ারেগ ও গোবি মরুভূমির মঙ্গোল জাতও যাযাবর।

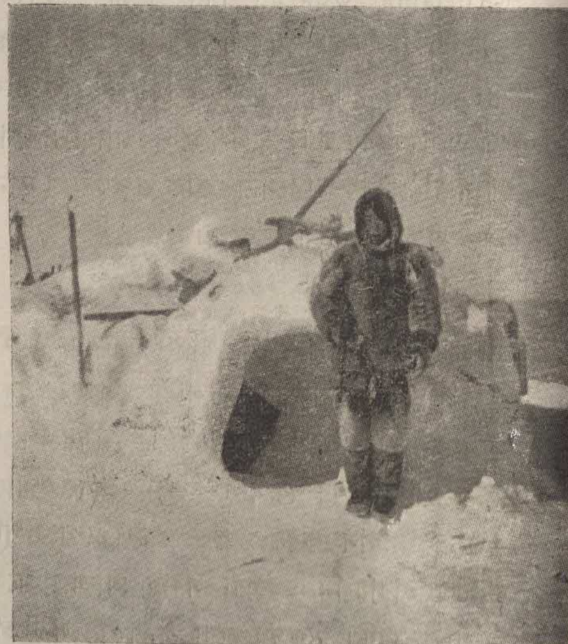
মরুভূমির প্রচণ্ড গরম থেকে গা বাঁচানোর জন্যে বেদুঈন, তুয়ারেগ ও মঙ্গোলরা পা পর্যন্ত ঝোলানো আলখাল্লা ও মাথা-ঘাড় ঢাকা টুপি পরে। তুয়ারেগরা নাকটা ঢাকে। মঙ্গোলদের পায়ে চামড়ার উঁচু বুটজুতা থাকে।

যাযাবররা নীচু ধরনের তাঁবুতে বাস করে। সেই তাঁবু চামড়ার তৈরী। এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার সময় সেই তাঁবু যাযাবররা সঙ্গে নিয়ে যায়।

॥ এস্কিমো ॥

গ্রীনল্যাণ্ডে ও উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশে প্রচণ্ড শীত। সারা বছর সে-সব জায়গা বরফে ঢাকা থাকে। এখানে এস্কিমোদের বাস।

এস্কিমোরা বরফের ঘরে বাস করে। বরফের বড় বড় চাঁই সাজিয়ে উপুড় করা বাটির মতো ঘর তৈয়ারি করে। সেই ঘরকে বলে ইগলু। ঘরে ঢুকতে গেলে হামাগুড়ি দিয়ে একটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ-পথে ঢুকতে হয়। বাইরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা হাওয়া



ইগলু

ও তুষার-ঝঞ্ঝা থেকে আত্মরক্ষার জন্য তারা এই ঘরে আশ্রয় নেয়। ঘরের মধ্যে জ্বলে চর্বির বাতি।



কুকুরে-টানা স্লেজ গাড়ী

ঘরের ভিতরটা ধোঁয়ায় ভরে যায়। কারণ, সরু দরজা ছাড়া জানালা ধরনের কোন কিছু নেই, যা দিয়ে ধোঁয়া বাইরে যেতে পারে।



কায়াকে করে এস্কিমোরা শিকারে চলেছে

এস্কিমোরা বেঁটে ও মোটাসোটা। নাক চেপটা, চুল কালো ও খাড়া খাড়া। রংটা হালকা বাদামী। কিন্তু স্নান করে না বলে ময়লা জমে জমে গাকে কালচে দেখায়। তারা পরস্পরের গা চেটে গা পরিষ্কার করে।

এরা বল্‌গা হরিণ পোষে। কুকুরও পোষে। বল্‌গা হরিণের দুধ, মাংস খায়। বল্‌গা হরিণ ও কুকুর এদের স্লেজ গাড়ি টানে। এ গাড়ির কোন চাকা নেই।

এস্কিমোরা শ্বেতভল্লুক, শিয়াল, খরগোশ, দু চার রকমের পাখি শিকার করে তার মাংস ও চর্বি খায়। পশুদের চামড়া দিয়ে তৈরী পোশাক পরে। কখনও কখনও বরফে ঢাকা সাগরের ফাটলের মধ্য দিয়ে ছিপ ফেলে মাছ ধরে।

এরা যে নৌকা চড়ে শিকারে যায়, তার নাম কায়াক। খুব হালকা কাঠ দিয়ে তৈরী কায়াক। নৌকার পিঠ সীলের চামড়া বা বল্‌গা হরিণের চামড়া দিয়ে ঢাকা থাকে।

সীল শিকার করার ব্যাপারে এদের প্রচণ্ড সাহস, বুদ্ধি ও শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বর্শা দিয়ে গেঁথে সীল শিকার করে।

অধিকাংশ এস্কিমোর বাস গ্রীনল্যাণ্ডে। গ্রীনল্যাণ্ডের বেশির ভাগ ডেনমার্কের অধীন। বর্তমান ডেনমার্ক সরকার বহু এস্কিমো উপনিবেশে ভালো ভালো ইটের বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল প্রভৃতি তৈরি করিয়ে দিয়েছে। এস্কিমোরা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠতে থাকলেও নিজেদের ভাষা, চালচলন ভুলে যায় নি। অনেক এস্কিমো আমেরিকা ও ইউরোপে চাকুরি করতে চলে গেছে। এস্কিমোরা চলচ্চিত্রে অভিনয় পর্যন্ত করেছে।

॥ বুশম্যান ॥

কালাহারি মরুভূমির আশে পাশে কাঁটা ঝোপের মধ্যে একশ্রেণীর যাযাবর জাতের লোক বাস করে। তাদের নাম বুশম্যান (Bushman)। তারা বেঁটে. তাদের গড় উচ্চতা প্রায় ১·৫ মিটার। বনের ফলমূল খেয়ে জীবন-ধারণ করে। আধুনিক জগতের সভ্যতার কোন স্পর্শ এদের মধ্যে সঞ্চারিত হয় নি।



বুশম্যান

নিগ্রোদের মাথার চুল কোঁকড়ানো, নাকের হাড় চাপা, ঠোঁট পুরু। গায়ে লোম বা মুখে গোঁফদাড়ি বিশেষ নেই। দক্ষিণ ও মধ্য আফ্রিকার



নিগ্রো

নিগ্রোরা বাণ্টু নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ জুলু জাত বাণ্টুদেরই অন্তর্গত। নিগ্রোরা সাহসী যোদ্ধা। এদের পরাধীন করতে শ্বেতাঙ্গদের বহু দিন ধরে বহু বেগ পেতে হয়েছে।

নিয়াম-নিয়াম নামের কাফ্রীরা নরখাদক। এরা এখনও রীতিমতো অসভ্য ও বন্য।

॥ পিগমী ॥

পিগমী (Pigmy) লম্বায় সাধারণতঃ ১'৩ মিটার হয়। মধ্য-আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে বাস করে। এরা শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করে। বিষমাখানো তীর দিয়ে এরা হাতি পর্যন্ত মারে। পিগমীরা যে-অঞ্চলে বাস করে, সে-অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গরা যেতে ভয় পায়।

॥ নিগ্রো বা কাফ্রী ॥

প্রধানতঃ আফ্রিকার বাসিন্দা হলেও নিগ্রোরা সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে। বিশেষ করে উত্তর আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে এদের সংখ্যা অনেক বেশী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোরা সুশিক্ষিত, সুগায়ক, ভালো স্পোর্টসম্যান। মুষ্টিযোদ্ধায় এদের সমকক্ষ নেই বললেও চলে। ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এরা বহু স্বর্ণ ও রৌপ্যপদক লাভ করেছে।



প্রথম সারি : ফরাসী অস্ট্রিয়ান

দ্বিতীয় সারি : পূর্বভারতীয় বর্মী চীনা

তৃতীয় সারি : জাপানী মায়া ইণ্ডিয়ান এস্কিমো



প্রথম সারি : ইথিওপিয়ান জুলু
দ্বিতীয় সারি : বোর্নিওর অধিবাসী পলিনেশিয়ান

বুশম্যান, পিগমী, বাণ্টু, কেনিয়ার কিকিউয়ু (Kikuyu), ঘানার আশাণ্টি (Ashanti), দক্ষিণ আফ্রিকার হটেনটট (Hottentots), নাইজীরিয়ার ইওরুবা (Yoruba) সকলেই নিগ্রো জাতির অন্তর্গত।

॥ জুম চাষ ॥

সাধারণতঃ আদিবাসীরা এক অদ্ভুত প্রথায় জমি চাষ করে। তারা প্রথমে বনে আগুন লাগিয়ে দেয়। পরে পোড়া ছাইয়ের উপরে এক একটা গর্ত করে তাতে সব রকম বীজ একসঙ্গে পুতে দেয়। তাতে সার দেওয়া নেই। কোন যত্ন করা নেই। সেই গর্ত থেকে যে-সব চারা বেরোয় তা বড় হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে ফসল দেয়। এই প্রথায় ফসল তেমন ভালো হয় না।

স্থানবিশেষে এই চাষকে কোথাও বলে জুম চাষ, কোথাও দাহি, কোথাও বেওরা।

সাঁওতালরা ধীরে ধীরে জুম চাষ ছেড়ে আধুনিক প্রথায় চাষ শুরু করে দিয়েছে।

॥ নানা জাতির লোক ॥

পৃথিবীতে নানা জাতির লোকের বাস। তাদের সংখ্যা অনেক। তাদের আচার-আচরণ, ভাষা, বেশভূষা ইত্যাদি নানা ধরনের।

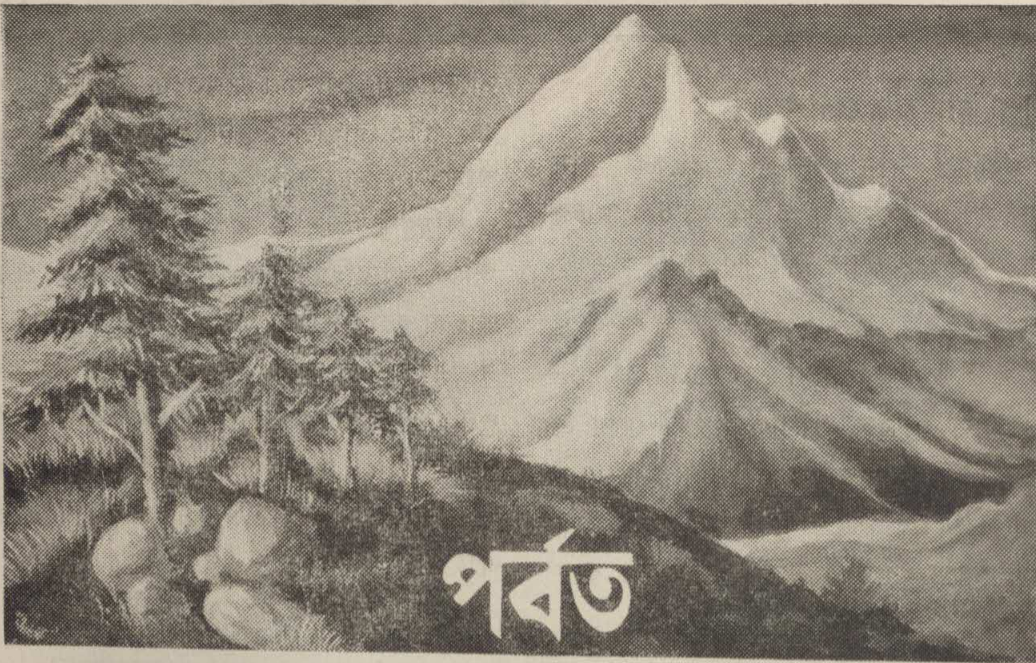
॥ শেরপা ॥

ভারত, তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি দেশে এক জাতির লোক পাহাড়িয়া অঞ্চলে বাস করে। তারা পর্বতারোহণে খুব দক্ষ। খুব কম বয়স থেকেই তারা পাহাড়ে পর্বতে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করে। তাদের বলে শেরপা। শেরপারা বিভিন্ন সময়ে বহু পর্বতারোহীকে নানাভাবে সাহায্য করে আসছে। তাদের ছেলেমেয়েরা হৃষ্টপুষ্ট, কষ্টসহিষ্ণু ও হাসিখুশী। তারা একদিন বড় হয়ে বহু দুর্গম পর্বতে আরোহণ করে। খাদ্য, কাঠ প্রভৃতি আহরণ করাই তাদের পর্ব্বতারোহণের উদ্দেশ্য।

এ পর্যন্ত ভারত ও পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে যত পর্বতারোহীদের দল হিমালয়ের বিভিন্ন গিরি-শৃঙ্গে আরোহণ করতে এসেছে, শেরপারা মালবহন, পথ দেখানো প্রভৃতি কাজে তাদের সাহায্য করেছে এবং আজও করে।



শেরপাদের ছেলেমেয়ে



পর্বত

নদ, নদী, সমুদ্র, হ্রদ, অরণ্য, মরুভূমি, পর্বত নিয়ে পৃথিবী। এ-সবের মধ্যে পর্বত সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান। পর্বত পাথরের স্তূপ। তার উপরে মাটি ও বনজঙ্গল। উঁচু পর্বতে ঝরনা আছে। নদ-নদীর বেশির ভাগের উৎপত্তিই উঁচু পর্বত থেকে। অনেক পর্বতের উপরে মানুষ বাস করে, নানা জীবজন্তু ঘোরাফেরা করে, অনেক হ্রদও আছে। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছোট বড় পর্বত আছে। সেই-সব পর্বতের যেগুলি খুব উচ্চ, তাদের চূড়া বরফে ঢাকা। খুব উঁচু পর্বতের বেশী উপরে কোন গাছপালা জন্মায় না।

সব পর্বতের পুরোপুরি একরকম আকার নয়। তবে মোটামুটি একই ধরনের বলা চলে।

॥ পর্বতের সৃষ্টি ॥

সৃষ্টির প্রথম দিকে পৃথিবী ছিল অতি উত্তপ্ত গ্যাসের গোলক। তখন না ছিল ডাঙ্গা, না সমুদ্র, না পর্বত। ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে স্থলের সৃষ্টি হল। কিন্তু উপরটা ঠাণ্ডা হলেও ভিতরটা এখনও পুরোপুরি শক্ত ও ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি। গরম বাষ্প উপর দিকে উঠতে চায়। পৃথিবীর অভ্যন্তরের অতি উত্তপ্ত গ্যাস বাইরে বেরিয়ে আসার সময়ে প্রচণ্ড ধাক্কা দিলে পৃথিবীর স্থলভাগ স্থানে স্থানে উঁচু হয়ে গেল। এই উঁচু স্থানই পর্বতের রূপ নিয়েছে।

কখনও পৃথিবীর ত্বকের ভাঙাগড়ার ফলে পর্বতের উদ্ভব হয়েছে। কোথাও কোথাও পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ ক্ষয়ে ক্ষয়েও ছোটখাট পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রধানতঃ পৃথিবীর অভ্যন্তরের বহির্মুখী গ্যাসের অকল্পনীয় প্রচণ্ড ধাক্কায় স্থলভাগ বিদীর্ণ হয়ে পর্বতের উদ্ভব হয়েছে।

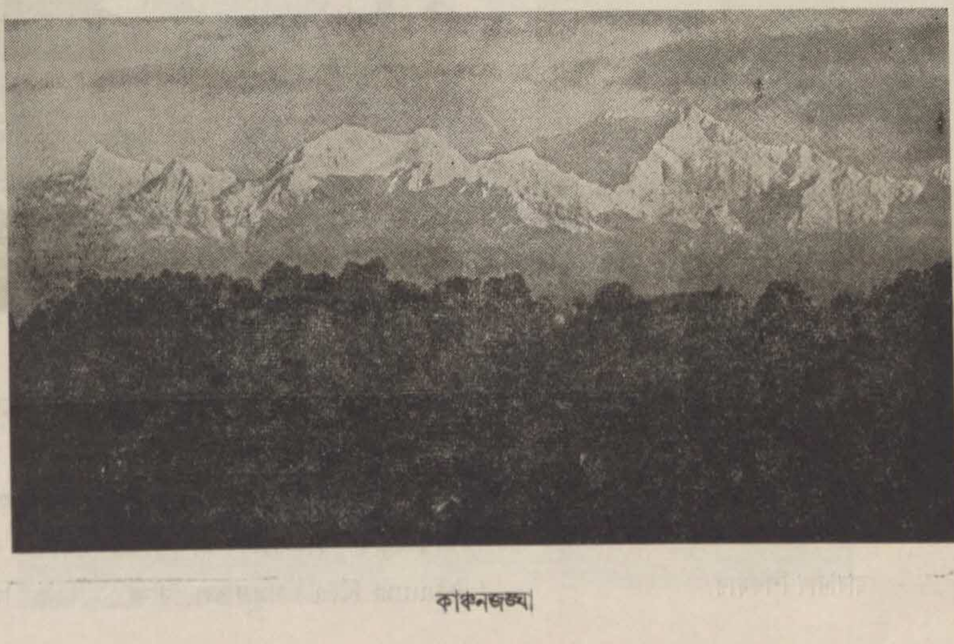
॥ উচ্চ পর্বত ॥

সব মহাদেশেই পর্বত আছে। সে-সবের মধ্যে হিমালয় গিরিশ্রেণী সর্বোচ্চ। তার পরেই কারাকোরাম পর্বতশ্রেণী। হিমালয় পর্বতমালা

সর্বোচ্চ হলেও সবচেয়ে লম্বা নয়। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ২,৫৭৬ কিলোমিটার। দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পর্বতশ্রেণীর দৈর্ঘ্য প্রায় ৭,২৪৫ কিলোমিটার। পৃথিবীর মধ্যে এই আন্দিজই সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ।



কাশ্মীরে হিমালয় গিরিশ্রেণী



কাঞ্চনজঙ্ঘা

হিমালয়ের অত্যুচ্চ পর্বতশৃঙ্গের সংখ্যা অনেক। এভারেস্ট সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ। উচ্চতা ৮,৮৪৮ মিটার।

কাঞ্চনজঙ্ঘা—৮,৫৮২ মিটার, মহাকাল ৮,৪৭০ মিটার, ধবলগিরি ৮,১৬৭ মিটার, নাঙ্গা পর্বত ৮,১১৪ মিটার, অন্নপূর্ণা-১—৮,০৭৮ মিটার, গোঁসাই থান ৮,০১৭ মিটার, নন্দাদেবী ৭,৮১৬ মিটার, কামেত ৭,৭৬৫ মিটার, মান্ধাতা ৭,৭২৮ মিটার, তিরিচমীর ৭,৭০০ মিটার, গৌরীশংকর ৭,১৪৫ মিটার, ত্রিশূল ৭,১৩৪ মিটার। এছাড়া ৬,০৯৬ মিটারের উপরে বহু শৃঙ্গ আছে। পৃথিবীতে ১০৯টি শৃঙ্গ ৭,৩১৫ মিটার-এর বেশী উচ্চ। তন্মধ্যে কারাকোরাম পর্বতমালার গিরিশৃঙ্গ ৯৬টি।

॥ এভারেস্ট ॥

বাঙালী গণিতশাস্ত্রজ্ঞ রাধানাথ শিকদার (১৮১৩-১৮৭০ খ্রীঃ) হিমালয়ের সর্বোচ্চ চূড়া নিরূপণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত সার্ভেয়ার জেনারেল সার জর্জ এভারেস্ট (Sir George Everest, ১৭৯০-১৮৬৬ খ্রীঃ)-এর নামানুযায়ী পর্বতশৃঙ্গটির নামকরণ হয় 'এভারেস্ট'। তখন এভারেস্ট সাহেব বিলাতে ছিলেন। এভারেস্ট পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ।

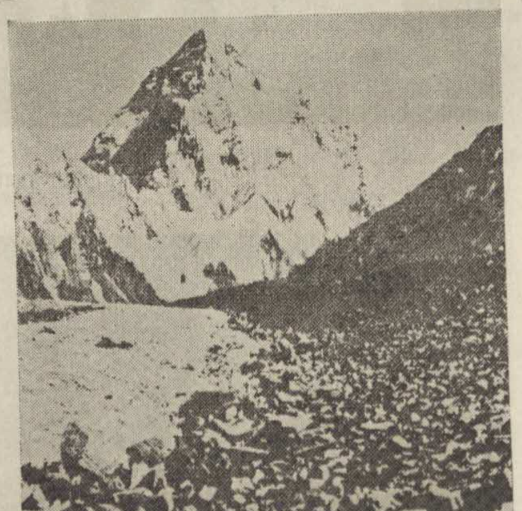


রাধানাথ শিকদার

॥ দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ॥

গডউইন অস্টেন-K2 (Godwin Austen-K2) পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ। এটি কারাকোরাম পর্বতমালার অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে এটি হিমালয় গিরিশ্রেণীরই একটি শৃঙ্গ।

এভারেস্ট ভূপৃষ্ঠ থেকে ৮,৮৪৮ মিটার উচ্চ। একে পৃথিবীর সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ বলা হয়। কিন্তু সমুদ্রতল থেকে মাপ ধরলে সেরো অ্যাকনক্যাগুয়া



পৃথিবীর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ K2

(Cerro Aconcagua) ১১,৮২৬ মিটারের চেয়েও বেশী উচু (৬,৯৬০ মিটার জলের উপরের মাপ অনুযায়ী) অথবা পেরু-চিলি-ট্রেঞ্চের উপরে ১৩,০৫৫ মিটার উচু। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মৌনা কিয়া (Mauna Kea) সমুদ্রতল থেকে ১০,০২৩ মিটার

উঁচু (জলের উপরের মাপ অনুযায়ী ৪,২০৭ মিটার উঁচু)।

॥ চাঁদের পর্বত ॥

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল মার্কিন মহাকাশযাত্রী ক্যাপটেন জন ওয়ালটার ইয়ং ও মেজর চার্লস এম. ডিউক জুনিয়ার চাঁদে গিয়ে একটি পর্বতের উচ্চতা নির্ধারণ করেন ৭,৮৩০ মিটার।

॥ কয়েকটি উঁচু পর্বতশৃঙ্গ ॥

পৃথিবীর সব মহাদেশেই পর্বত আছে। তন্মধ্যে উত্তর আমেরিকার সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ম্যাককিনলী



ম্যাককিনলী পর্বত



এভারেস্ট

(Mckinley) ৬,১৯৪ মিটার উঁচু, দক্ষিণ আমেরিকার সেরো অ্যাকনক্যাগুয়া (Cerro Aconcagua) ৬,৯৬০ মিটার উঁচু, ইউরোপের এলব্রুস (Elbrus) ৫,৬৩৩ মিটার, এশিয়ার এভারেস্ট (Everest) ৮,৮৪৮ মিটার, আফ্রিকার কিলিম্যানজারো (Kilimanjaro) ৫,৮৯৫ মিটার, ওশেনিয়ার জেয়াকুসুম (Jayakusum) ৪,৮৮৩ মিটার ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশের ভিনসন ম্যাসিফ (Vinson Massif) ৫,১৪০ মিটার উঁচু।

॥ পর্বতের উপকারিতা ॥

পর্বত থেকে নদী বেরিয়ে সমুদ্র বা হ্রদে গিয়ে পড়ে। নদীর দুধারের জমি উর্বরা হয়, তীরে তীরে বহু নগরী গড়ে ওঠে। পর্বতের উপরের বনের কাঠ লোকে নানাভাবে ব্যবহার করে। বহু ঔষধের গাছগাছড়া পর্বত থেকে পাওয়া যায়। পর্বতের উপরের সমতলে বহু লোক বাস করে। পর্বতচারী ভেড়া, ছাগল প্রভৃতি বহু পশুর লোম দিয়ে নানা জিনিস তৈরী হয়। পর্বতে নানা মঠ ও মন্দির



প্যাটাগোনিয়ান আন্দিজের ফিৎজ রয় শৃঙ্গ

মহাসমুদ্রের বহু দ্বীপে খুব উঁচু পর্বত আছে। অনেক দ্বীপ শুধু পর্বত দিয়েই গড়া। গভীর সমুদ্রের জলে বহু ডুবো পর্বত আছে। জলের উপর থেকে সে-সব পর্বত দেখা যায় না বলে অনেক সময় সমুদ্রগামী জাহাজ ধাক্কা খেয়ে জখম হয়, ডুবেও যায়।

আছে। এইভাবে নানা দিক্ দিয়ে পর্বতের দ্বারা মনুষ্যসমাজের বহু হিত সাধিত হয়ে থাকে।

পর্বতের উপরে পথ তৈরী হয়। তাতে করে লোক এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করে। মহাযুদ্ধের সময়ে যে বার্মা রোড তৈরী হয়েছিল,

তার উপর দিয়ে খাদ্য, যুদ্ধাস্ত্র ইত্যাদি চলাচল করে।



বার্মা রোড

সমতলের মানুষ উঁচু উঁচু পর্বতচূড়া দেখে তার উপরে যাবার জন্যে অভিলাষী হয়। ছোট-খাট পর্বতে সহজেই লোকে ওঠে, বসতি স্থাপন করে; কিন্তু তুষারাবৃত সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গে ওঠা সহজ নয়। তাই মানুষ নানা কৌশল অবলম্বন করে, নানা যন্ত্রপাতি সঙ্গে নেয়।

পর্বতে আরোহণ করতে গিয়ে নানাভাবে বহু মানুষকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কিন্তু মানুষের দুর্জয় সাহস ও অদম্য প্রচেষ্টা মৃত্যুভয়ে পর্বতারোহণে বিরত করে নি। বিশেষ করে যে-সব পর্বত দুরারোহ ও দুর্গম, চিরতুষারে আবৃত, সে-সবের উপরে ওঠবার আগ্রহই দুঃসাহসী মানুষের বেশী। পর্বতারোহণের বিজয়গর্ব লাভ করার আকাঙ্ক্ষায় নানাদেশের মানুষ বহু বৎসর ধরে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে।

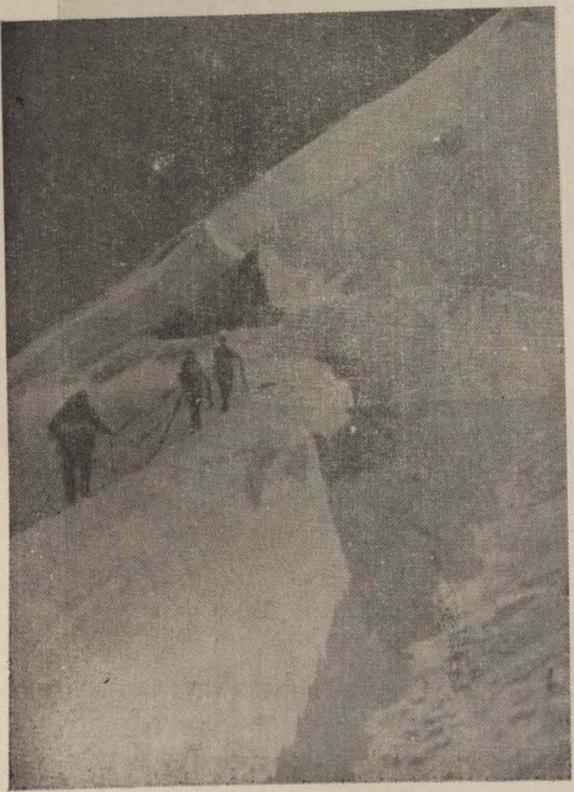


শৃঙ্গে আরোহণের উদ্দেশ্যে পর্বতারোহীদের যাত্রা

॥ পর্বতারোহণের বাধাবিপত্তি ॥

খুব উপরের আবহাওয়া সমতলবাসী মানুষের পক্ষে কষ্টজনক। তুষার-ধস (avalanche) আরোহীকে চাপা দিতে পারে। অক্সিজেন উপরের দিকে ক্রমশঃ কমে গেছে। নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝা (blizzard) আরোহীকে উড়িয়ে নিয়ে অতল খাদে ফেলে দিতে পারে, যাতে মৃত্যু অবধারিত। অসম্ভব রকমের ঠাণ্ডায় শরীরে

কাঁপুনি ধরতে পারে। বরফের ঠাণ্ডায় পায়ের আঙুল হেজে যেতে বা অসাড় হয়ে যেতে পারে। অত্যন্ত সাদা বরফের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকে দৃষ্টিশক্তি হারাতে পারে। বিপদ ও বাধা অনেক রকমের। তবু মানুষের ক্ষান্ত হওয়ার কোন লক্ষণই নেই। শুধু পুরুষ কেন, মেয়েরাও পর্বতারোহণে পিছিয়ে পড়ে নেই।



এভারেস্টের পথে পর্বতারোহিগণ

॥ মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট ॥

কি করে পর্বতে উঠতে হবে, কোন্ কোন্ সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হবে, পর্বতে ওঠার উপযুক্ত সময় কখন, প্রভৃতি নানা বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বহু দেশে বিদ্যালয় আছে। সাধারণতঃ এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের নাম মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট। হিমালয়ের নানা গিরিশৃঙ্গে আরোহণের কৌশল শিক্ষাদানের জন্য ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দার্জিলিঙে যে বিদ্যালয় গঠিত হয়, তার নাম হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউট।

॥ পর্বতারোহণের সাজসরঞ্জাম ॥

পর্বতে আরোহণের জন্য এমন জুতো দরকার যার নীচে শক্ত ক্র্যাম্পন নামে একধরনের কাঁটাওয়ালা ফ্রেম লাগানো হয়। তার ফলে বরফের উপর দিয়ে যাবার সময় পা হড়কে যায় না। প্রত্যেক আরোহীর হাতে থাকে একটা কুঠার, যা দিয়ে শক্ত বরফের উপরে ধাপের সৃষ্টি করা হয়। কখনও কখনও কুঠার বরফের গায়ে আটকে হড়কে পড়ে যাবার সম্ভাবনা বন্ধ করতে হয়। পর্বতের বড় বড় ফাটল বা তুষারনদী বা হিমবাহ (glacier) পার হবার সময় দড়ির মই লাগে। পর্বতে উঠতেও মই-এর দরকার হয়। সঙ্গে থাকে শক্ত নাইলনের দড়ি। তা দিয়ে কাউকে উপরে টেনে তোলা চলে।

চাকা-লাগানো লাঠি নিয়ে যেতে হয়। তাতে পা হড়কাবার ভয় থাকে না। প্রেশার কুকার, বাতাসভরা বালিশ ও গদি, অক্সিজেনের সিলিণ্ডার, হালকা ও মজবুত তাঁবু, কৌটোয় রাখা খাদ্য, রান্নার নানা সাজ-সরঞ্জাম, স্টোভ, বরফের পাহাড়ে পোঁতবার জন্যে পিটন (piton) বা গজাল, পরস্পরের সঙ্গে বেঁধে চলবার কাছি প্রভৃতি অনেক কিছু সাজসরঞ্জাম সঙ্গে নিতে হয়। সবচেয়ে দরকার পাহাড়িয়া কুলীদের। হিমালয়ের কুলীদের বলে শেরপা। এরা কষ্টসহিষ্ণু, ভারবহনক্ষম ও পর্বতারোহণে পূর্ব থেকেই অভ্যস্ত।

॥ পর্বতারোহণের প্রয়াস ॥

ব্রোঞ্জ যুগেও যে মানুষেরা বিভিন্ন দেশে পর্বতে আরোহণ করেছে, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সুইজারল্যাণ্ডের ২,৯২৭ মিটার উঁচু রিফেলহর্ন শৃঙ্গে ব্রোঞ্জ যুগের অস্ত্রাদি পাওয়া গেছে। অবশ্য, ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে নিয়মিত লোকে পর্বতে



সুইজারল্যাণ্ডের পর্বতে
এক পর্বতারোহী অপরকে টেনে তুলছে

আরোহণের প্রয়াস চালিয়ে আসছে। ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্র্যান্সিস্কো মণ্টানো মেক্সিকোর ৫,৪৫২ মিটার উঁচু পোপোক্যাটিপেটি শৃঙ্গে আরোহণ করেন। তারপর চিম্বোরজো, অ্যাকনক্যাগুয়া, ত্রিশূল, পিক লেনিন, নেপাল পিক, কামেত, নন্দাদেবী, অন্নপূর্ণা—১, মঁ ব্লাঁ, ম্যাটারহর্ন, কিলিম্যানজারো, মাউন্ট লোগান, নাঙ্গা পর্বত,



পর্বতারোহী পিটন মেরে উপরে উঠছেন

কাঞ্চনজঙ্ঘা, গডউইন অস্টেন (K2) প্রভৃতি অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গে নানা পর্বতারোহীর পদার্পণ ঘটে।

হিমালয়ের অভিযান শুরু হয় ১৮০৫ খ্রীঃ। তারপর থেকে বহুবার বহু পর্বতারোহী হিমালয়ের বিভিন্ন শৃঙ্গে আরোহণের চেষ্টা করেন। অনেকে সফল হন।

॥ এভারেস্ট বিজয় ॥

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গে কর্নেল হেনরী সিসিল জন হান্টের নেতৃত্বে নিউ জীল্যাণ্ডের এডমাণ্ড পার্সিভ্যাল হিলারী ও শেরপা



তেনজিং নোরগে

তেনজিং নোরগে আরোহণ করেন। তাঁদের দলে ছিলেন টমাস স্টোবার্ট (Thomas Stobart), জর্জ সি. ব্যাণ্ড (George C. Band), চার্লস জিওফ্রে উইলি (Charles Geofrey Wylie), টমাস বুর্দিলোঁ (Thomas Bourdillon), আর. সি. ইভান্স (R. C: Evans), জর্জ লোয়ে (George Lowe), উইলফ্রিড নইস (Wilfrid Noyce), এল. জি. পাফ (L. G. Pugh), আলফ্রেড গ্রেগরি (Alfred Gregory) ও মাইকেল ওয়েস্টম্যাকট (Michael Westmacott)।

তেনজিং নোরগের বাড়ি ছিল নেপালের ওখালডুঙ্গায়। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রত্যেকটি পর্বতারোহীর দলে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। তিনি বর্তমানে ভারতবাসী।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পর বহুবার এভারেস্টে অভিযান হয়েছে। অনেকেই এভারেস্টে উঠতে সমর্থ হয়েছেন। ১৯৬৫ খ্রীঃ ভারতীয় অভিযাত্রী দল লেফটেন্যাণ্ট কম্যাণ্ডার এম. এস. কোহলির নেতৃত্বে দলের এ. এস. চীমা ও শেরপা নাওয়াং গোম্বু ২০শে মে চূড়ায় ওঠেন।

১৯৮০ খ্রীঃ পর্যন্ত ১০৫ জন অভিযাত্রী এভারেস্টে আরোহণ করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে পাঁচ জন দু'বার এভারেস্টে উঠেছেন। অস্ট্রিয়ার ফ্রাঞ্জ ওপার্গ (Franz Oppurg) ১৯৭৮ খ্রীঃ ১৫ই মে একা এভারেস্টে আরোহণ করেন। বিনা অক্সিজেনে ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট ইটালীর রেনহোল্ড মেসনার (Reinhold Messner) এভারেস্টে উঠতে সমর্থ হন। ১৯৭৫ খ্রীঃ ১৬ই মে চার জন মহিলা এভারেস্টে পদার্পণ করেন। তন্মধ্যে প্রথম জুঙ্কো তাবেই (জাপান) আরোহণ করেন।

জর্জ লে ম্যালরী (George Leigh Mallory), আরভিন ও আরও অনেকে এভারেস্ট অভিযান করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন।



হিমালয়ের কুড়ি হাজার ফুট উপরে তেনজিং



এডমাণ্ড হিলারী



পর্বতের উপরে বিশ্রামরত হিলারী



কয়েকজন মহিলা পর্বতারোহিণী



নাওয়াং গোম্বু

॥ মহিলা পর্বতারোহিনী ॥

হিমালয়ের হনুমান টিব্বায় (৫,৩১৮ মিটার উচ্চ) আরোহণের জন্য ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে মোট ছয় জন মহিলা যাত্রা করেন। তাঁদের দলের নেত্রী ছিলেন এম. সি. উষা ! শোভা, রানী, সুধা ও ভারতী দলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। দলের ডাক্তার ছিলেন তৃপ্তা দত্ত। সঙ্গে কয়েকজন বলিষ্ঠ ও শক্ত-সমর্থ শেরপা ছিল। তাঁরা কুলু-মানালির মাউন্টে-নিয়ারিং ইনস্টিটিউট থেকে তাঁদের সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম সংগ্রহ করেন।

তাঁদের পর্বতারোহণে যাত্রার কাহিনী অতি বিচিত্র। যাত্রার প্রথম কয়েকদিন তাঁদের বেশ ভালোই কাটে। ঝড়ঝঞ্ঝা, তুষারপাতে তাঁদের বিব্রত হতে হয় নি।

৩,৬৭৩ মিটার উঁচু বেয়াকুণ্ডে পৌঁছে দলের সকলে কিছুক্ষণের জন্য বিশ্রাম করে ১লা অক্টোবর ৪,৬৩৩ মিটার উঁচুতে ১নং তাঁবুতে পৌঁছলেন। বরফ পড়ে পথ রীতিমতো পিছল হয়ে গিয়েছিল। পথ সম্পূর্ণ এবড়োখেবড়ো। সে পথে যেতে তাঁদের খুবই কষ্ট হয়েছিল।

এইভাবে চলতে চলতে তাঁরা ২রা অক্টোবর ২নং তাঁবুতে পৌঁছে গেলেন। দেরি করলে প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিব্রত হতে হবে, এই ভয়ে তাঁরা বিশেষ বিশ্রাম না করে ৩রা অক্টোবর ৩নং তাঁবুতে ও ৪ঠা অক্টোবর ৪নং তাঁবুতে পৌঁছলেন।

এর পরের পথ খুবই দুর্গম। মাঝে মাঝে তুষারঝঞ্ঝা তাঁদের বিব্রত করে তুলছিল। পথের জমা বরফের উপর দিয়ে তাঁদের যেতে খুবই পরিশ্রম হচ্ছিল। কিন্তু কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সকলে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে যাত্রা করে ৫ই অক্টোবর হনুমান টিব্বায় পৌঁছলেন। তখন বেলা ৩-৩০টা। জয়ের গর্বে উদ্বেল হয়ে তাঁরা শৃঙ্গ থেকে অপরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখলেন এবং সকল ক্লান্তি ভুলে গেলেন।

॥ শেরপা ॥

শেরপাদের সহায়তা ব্যতীত হিমালয়ের শৃঙ্গ-সমূহে আরোহণ করা খুবই কঠিন। এরা কর্মঠ, পর্বতারোহণে অভ্যস্ত, দুঃসাহসী ও ভারবহনক্ষম। শেরপা শব্দের অর্থ তুষারের বাঘ (শের = বাঘ, পা = তুষার)।

এভারেস্টে আরোহণের প্রচেষ্টার আজও বিরাম নেই। বিভিন্ন দেশ থেকে পর্বতারোহীরা ভারত, নেপাল ও তিব্বতের কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে এভারেস্ট ও অন্যান্য শৃঙ্গে আরোহণের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। দুর্জয়কে জয় করার, অজানাকে জানার আগ্রহ তাঁদের সীমাহীন।



আগ্নেয়গিরি

পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা ও শক্ত হয়ে গেছে। মাটি ও পাথরে গড়া পর্বত মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তরল পদার্থ জল আছে মহাসমুদ্রে, হ্রদে ও নদনদীতে। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও ভয়াবহ উত্তপ্ত তরল পদার্থ ও গ্যাসে ভরা।

কিন্তু পৃথিবীর কোন কোন স্থানে ফাটল আছে। তার মধ্য দিয়ে ধাতু-গলা উত্তপ্ত তরল পদার্থ, লাভা, ছাই প্রভৃতি মাঝে মাঝে সবেগে বেরিয়ে আসে। এই ফাটলকে বলে জ্বালামুখ (crater)। আর যে অত্যুচ্চ স্থানের ফাটল ভেদ করে সবেগে লাভা, ভস্ম প্রভৃতি বেরোয়, সেই স্থানকে বলে আগ্নেয়গিরি (volcano)।

পৃথিবীর উপরের জল নানা ফাটল দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে তরল ধাতব পদার্থাদির সমুদ্রে পড়ে। তখন সেই জল থেকে উত্তপ্ত বাষ্পের সৃষ্টি হয়। সেই উত্তপ্ত বাষ্প কোন ফাটল দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়। তার ফলে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ দিয়ে অতি উত্তপ্ত বাষ্প, গলিত ধাতব পদার্থ, ভস্ম প্রভৃতি বাইরে বেরোতে থাকে। একে বলে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গম। যে-সব গলিত পদার্থ বেরিয়ে আসে, তাকে বলে ম্যাগমা (magma)। আগ্নেয়পর্বতের ঠিক নীচে যে গহ্বরে



আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখ

উত্তপ্ত গলিত পদার্থ থাকে, তাকে বলে ম্যাগমা চেম্বার (magma chamber)।

॥ আগ্নেয়গিরির সংখ্যা ॥

আগ্নেয়গিরি তিন প্রকার—জীবন্ত, সুপ্ত ও মৃত। জীবন্ত বা সক্রিয় (active) আগ্নেয়গিরি থেকে

মাঝে মাঝে অগ্ন্যুদ্গিরণ হয়। সুপ্ত আগ্নেয়গিরি থেকে বর্তমানে অগ্ন্যুৎপাত না ঘটলেও একদিন না একদিন তা সক্রিয় হয়ে উঠতে পারে। মৃত আগ্নেয়গিরি চিরকালের মতো নির্বাপিত। তা থেকে কোন দিন অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাবনা নেই।

জীবন্ত বা সক্রিয় আগ্নেয়গিরির সংখ্যা পৃথিবীতে ৪৫৫টি। জলের তলার আগ্নেয়গিরির সংখ্যা প্রায় ৮০টি। ইন্দোনেশিয়ায় সবচেয়ে বেশী আগ্নেয়পর্বত বর্তমান—১৬৭টি আগ্নেয়গিরির মধ্যে সাম্প্রতিক কালে ৭৭টির অগ্ন্যুদ্গিরণ ঘটেছে। মোট আগ্নেয়গিরির সংখ্যা এক হাজারেরও বেশী।

॥ সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ লাভাস্রোত ॥

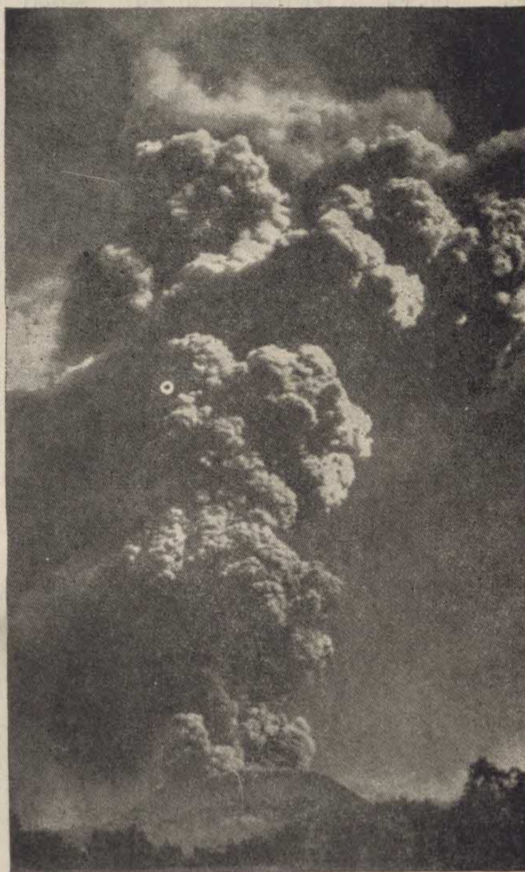
দেড় কোটি বছর আগে উত্তর আমেরিকার রোজা ব্যাসল্ট (Roza basalt) থেকে ৪৮০ কিলোমিটার লম্বা লাভাস্রোত প্রবাহিত হয়। বর্তমান কালে ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব আইসল্যাণ্ডের লাকিতে যে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয় তাতে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ লাভাস্রোত প্রবাহিত হয়।

॥ সর্বাপেক্ষা উচ্চ সক্রিয় বা জীবন্ত, সুপ্ত বা মৃত আগ্নেয়গিরি ॥

আর্জেন্টিনার সক্রিয় আগ্নেয়গিরি ভলকান অ্যান্টোফ্যাল্যা (Volcan Antofalla)-র উচ্চতা ৬,৪৫০ মিটার। চিলির সক্রিয় আগ্নেয়গিরি Guayatiri বা Guallatiri-র উচ্চতা ৬,০৬০ মিটার। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে এটিতে অগ্ন্যুদ্গিরণ ঘটে।

সর্বাপেক্ষা উচ্চ সুপ্ত আগ্নেয়গিরি চিলি ও আর্জেন্টিনার সীমান্তে অবস্থিত Volcan Llullaillaco—উচ্চতা ৬,৭২৩ মিটার। জাপানের ফুজিয়ামা একটি সুপ্ত আগ্নেয়গিরি।

বালি দ্বীপের আগুং (Agung) ১২০ বৎসর সুপ্ত থাকার পর অগ্ন্যুদ্গিরণ করে। আন্দিজ পর্বতমালার অন্তর্গত সেরো অ্যাকনক্যাগুয়া (Cerro Aconcagua) মৃত বা নির্বাপিত সর্বোচ্চ আগ্নেয়গিরি—উচ্চতা ৬,৯৬০ মিটার।

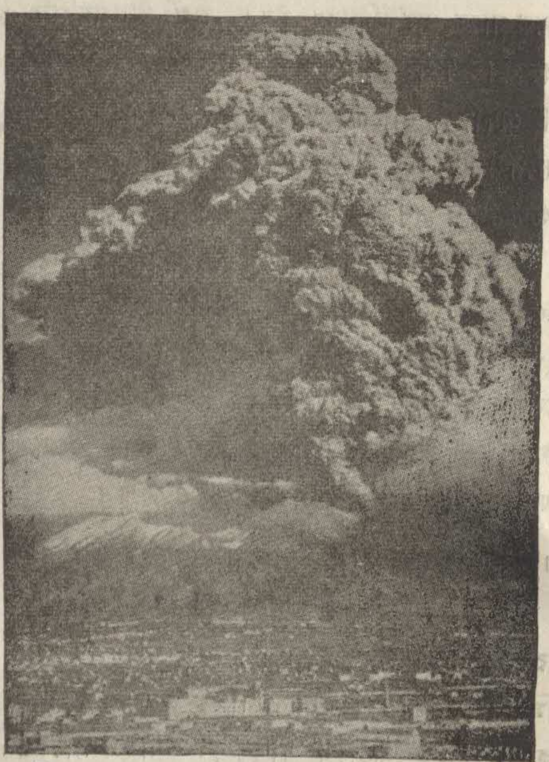


মেক্সিকোর প্যারিকুটিন আগ্নেয়গিরি থেকে ধূম ও লাভা উদ্গিরণ

॥ সর্ববৃহৎ জ্বালামুখ

জাপানের কিউশিউতে অবস্থিত মাউণ্ট অ্যাসো (Mount Aso)-র জ্বালামুখ উত্তর-দক্ষিণে ২৭ কিলোমিটার ও পূর্ব-পশ্চিমে ১৬ কিলোমিটার বিস্তৃত। পরিধি ১১৪ কিলোমিটার।

॥ অবিরাম ও সবিরাম আগ্নেয়পর্বত ॥



ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুদ্গিরণ

কোন কোন আগ্নেয়পর্বত থেকে বিরামবিহীন-ভাবে অগ্ন্যুদ্গিরণ হয়। প্রায় কোন বৎসরেই অগ্ন্যুৎপাতের বিরাম থাকে না। এই ধরনের আগ্নেয়পর্বতকে বলে অবিরাম আগ্নেয়পর্বত। ইটালীর দক্ষিণ দিকের লিপারী দ্বীপের স্ট্রম্বলী (Stromboly) একটি অবিরাম আগ্নেয়গিরি।

মেক্সিকোর প্যারিকুটিন আগ্নেয়গিরি থেকে ১৯৪৩ ও ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গিরণ হয়।

যে সব আগ্নেয়পর্বত থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুদ্গিরণ হয় সেগুলিকে বলে সবিরাম আগ্নেয়-পর্বত। ইটালীর ভিসুভিয়াস (Vesuvius) একটি সবিরাম আগ্নেয়পর্বত।

ইটালীর অন্তর্গত উত্তর-পূর্ব সিসিলির এটনা (Etna) একটি প্রসিদ্ধ আগ্নেয়গিরি। ১৯৭১ সালে এর অগ্ন্যুৎপাতে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়।



এটনা থেকে অগ্ন্যুদ্গিরণ

॥ অতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ॥

ঈজিয়ান সাগরের সান্তোরিনিতে ১৪৭০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার সুমাত্রা ও যবদ্বীপের মধ্যবর্তী সুণ্ডা প্রণালী (Sunda Strait)-র ক্রাকাতোয়া দ্বীপে এক অতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হয়। তাতে ১৬৩টি গ্রাম ধ্বংস হয়। ৩৬,৩৮০ জন লোক ৯ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসে মারা যায়। ৫৫ কিলোমিটার উর্ধ্বে পাথর ছড়িয়ে পড়ে। ১০ দিন পরে ৫,৩৩০ কিলোমিটার দূর পর্যন্ত ভস্ম নিক্ষিপ্ত হয়। ২৪১ কিলোমিটারের বেশী স্থান জুড়ে ভয়ংকর ঝড় ওঠে। পৃথিবীর $\frac{1}{3}$ অংশ থেকে এই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছিল।

॥ পম্পেয়ী ও হারকিউলেনিয়াম ধ্বংস ॥

প্রায় দু'হাজার বছর আগে পম্পেয়ী (Pompeii)ও হারকিউলেনিয়াম (Herculaneum) নামে দুটি সুন্দর শহর ছিল। ইটালীর নেপলস শহর থেকে দূরে (হারকিউলেনিয়াম ১১ কিলোমিটার দূরে, পম্পেয়ী ২১ কিলোমিটার দূরে) ভিসুভিয়সের নিম্নদেশে শহর দুটি অবস্থিত ছিল। ৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিসুভিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে শহর দুটি চাপা পড়ে যায়। সব জীবজন্তু, মানুষ মারা যায়। সব কিছু ধ্বংস হয়। ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা পম্পেয়ীকে খনন করে আবিষ্কার করেন, হারকিউলেনিয়াম আবিষ্কৃত হয় ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে।

॥ অগ্ন্যুৎপাতের ভালো মন্দ দুই দিক্ ॥

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে সারা পৃথিবীর নানা দেশে নানা সময়ে বহু ধ্বংসলীলা সাধিত হয়েছে। কত জনপদ ধ্বংস হয়েছে, অগণিত মানুষ, জীবজন্তু মারা গেছে। বহু ক্ষেত্রে সর্বনাশা আগ্নেয়পর্বতের লাভা, প্রস্তর, ভস্মাদিতে বহু গ্রাম শহর সম্পূর্ণ চাপা পড়ে গেছে।

অনেক ক্ষেত্রে আগ্নেয়গিরি দ্বারা কল্যাণ সাধিত হয়ে থাকে। তন্মধ্যে লাভাস্রোত বয়ে বয়ে পৃথিবীর নানা স্থানে মালভূমির সৃষ্টি হয়। ভারতের দাক্ষিণাত্যে ৫ লক্ষ ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার স্থান এই ভাবে গড়ে উঠেছে। এই স্থানকে বলে কৃষ্ণমৃত্তিকা অঞ্চল। এই অঞ্চল খুবই উর্বর।

অনেক সময়ে সাগরের বুকে আগ্নেয়পর্বতের অগ্ন্যুদ্গিরণের ফলে দ্বীপের সৃষ্টি হয়। বহু আগ্নেয়-পর্বতের গহ্বর থেকে মূল্যবান্ খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়। পৃথিবীতে যত গন্ধক পাওয়া যায় তার বেশির ভাগ আগ্নেয়পর্বতের নিকটবর্তী স্থান থেকেই পেয়ে থাকি।

॥ নূতন আগ্নেয়পর্বত ॥

সৃষ্টির আদি থেকে কখনও শোনা যায় নি এমন আগ্নেয়পর্বতের অগ্ন্যুদ্গিরণও ঘটে থাকে। সাধারণ পর্বতের শিখরদেশ বিদীর্ণ হয়ে প্রচণ্ডবেগে অগ্নির উদ্গিরণ হতে থাকে। আইসল্যাণ্ডের কাছে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এরূপ একটি নূতন আগ্নেয়গিরির উদ্ভব হয়।



নদনদী

পর্বতের উপরে বৃষ্টি হলে সেই বৃষ্টির জল নানা পথ বেয়ে নীচে নেমে আসে। উপরে কোথাও কোথাও ঠাণ্ডায় জল জমে বরফ হয়ে থাকে। সেই বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়ে তা যখন গলে যায় তখন জলের আকারে সমতলে নেমে আসে। বিরাট বিরাট বরফের স্তূপ খুব ধীরে ধীরে নামতে থাকে। বরফের সেই স্তূপ কখনও কখনও খুব চওড়া ও লম্বা হয়। সমতলে নামবার আগে বরফ গলে জল হতে থাকে। এই খুব চওড়া ও লম্বা বরফরাশিকে বলা হয় হিমবাহ (glacier)। কোথাও কোথাও উচ্চে অবস্থিত হ্রদ থেকে জলধারা সমতলের দিকে ধাবিত হয়। এই সব জলস্রোতের সাধারণ নাম নদী।

॥ নদ ও নদী ॥

নদ ও নদী একই। শুধু লিঙ্গভেদ। পৃথিবীতে সব অবিরাম জলস্রোতকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নদী বলা হয়, নদ নামধেয় অবিরাম জলপ্রবাহের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নদী আছে। কাজেই ছোট বড় মিলিয়ে নদ-নদীর সংখ্যা অগণিত বলা চলে।

নদী পর্বত থেকে নেমে নানা জনপদের উপর দিয়ে বয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়ে, কখনও কখনও কোন হ্রদে গিয়ে মেশে। সাগরে গিয়ে পড়া নদীর সংখ্যাই বেশী।

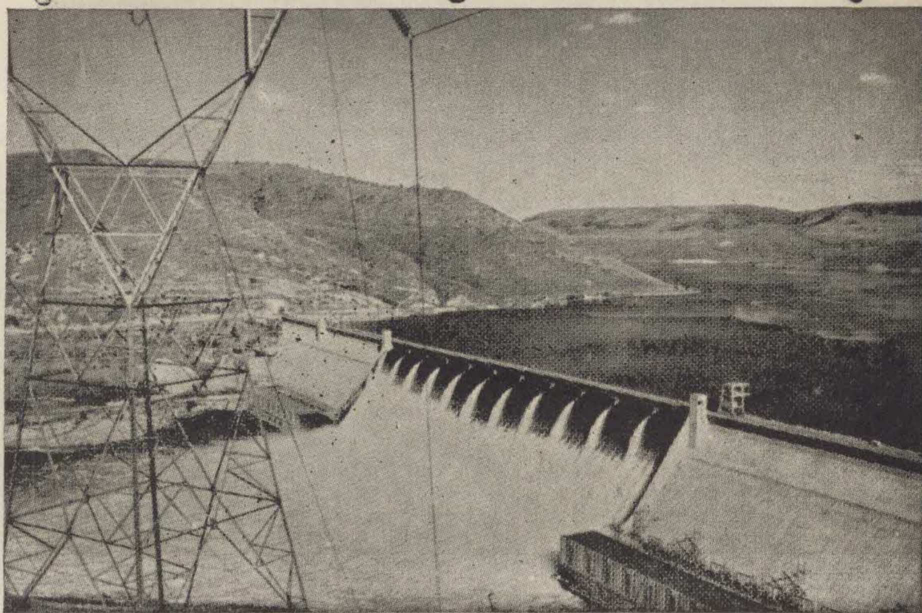
কখনও কখনও কোন নদী আর এক নদীর সঙ্গে গিয়ে মিলিত হয়, তখন তার নাম উপনদী। নদী থেকে জলস্রোত ভিন্ন পথ ধরে বয়ে গেলে তাকে বলে শাখানদী। কোন কোন সময়ে নদী মাটির নীচ দিয়ে বয়ে যায়, যেমন বিহারের ফল্গুনদী।

ক্রমওয়েল কারেন্ট (Cromwell current) প্রশান্ত মহাসাগরের ৯০ মিটার নীচে দিয়ে বয়ে গেছে। এটি ৪০০ কিলোমিটার চওড়া ও ৫,৬২৫ কিলোমিটার লম্বা। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে নদীটি আবিষ্কৃত হয়।

॥ নদী দ্বারা কি কি উপকার হয়? ॥

নদীর জলে তীরের দুপাশের জমি উর্বরা হয়। নদীর জলে বাহিত হয়ে যে পলিমাটি জমে, তাতে ভালো চাষ হয়, বাসের যোগ্য জমিও গড়ে ওঠে। নদীর ধারে ধারে সুন্দর নগরী গড়ে ওঠে। নদীতে নৌকা ও জাহাজ চলে। তাতে মাল চলাচল ও

যাতায়াতের সুবিধা হয়। নদী থেকে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য মাছ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কোন কোন নদীর তলদেশ থেকে মুক্তা আহরণ করা হয়। নদীর জল পরিস্রুত করে পানীয় জল হিসাবে ব্যবহার করা হয়। নদীতে বাঁধ (dam) বেঁধে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করা হয়। নদীর উপরে বহু সেতু নির্মিত হয়। প্রায় সব নদীর উপরে সেতু আছে। সেই সেতুর উপর দিয়ে যানবাহন ও লোক চলাচল করে।



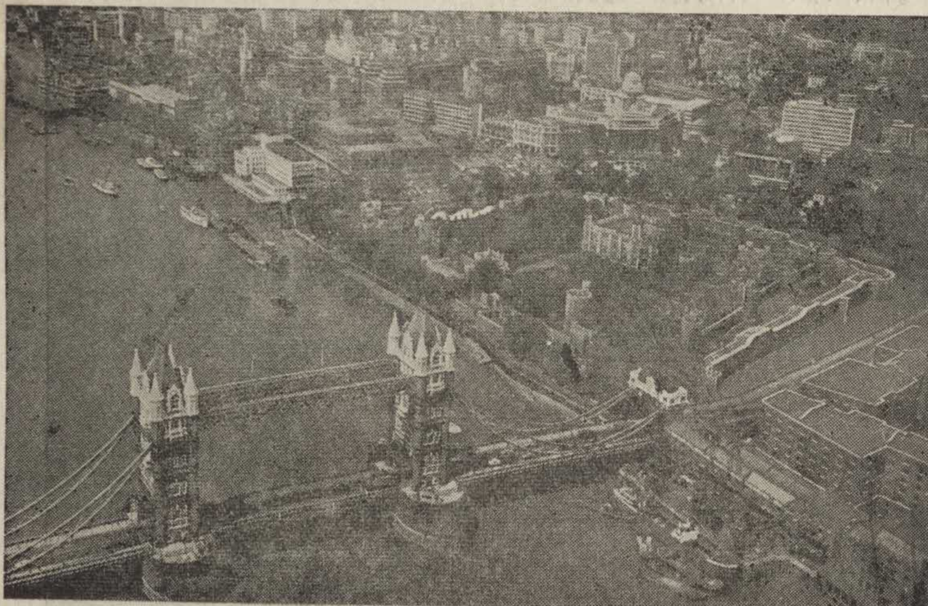
ওয়াশিংটনের গ্র্যাণ্ড কুলী ড্যাম (Grand coulee dam)

॥ পৃথিবীর নানা নদী ॥

দক্ষিণ আমেরিকার আমাজন (দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসমুদ্রে পতিত হয়েছে। এর দৈর্ঘ্য ৬,৪৩৭ কিলোমিটার), আন্দিজ পর্বতশ্রেণী থেকে উত্থিত হয়েছে। এর একটি উপনদী ম্যাডিরা (Madeira)-র দৈর্ঘ্য প্রায় ৩,৩৮০ কিলোমিটার। ঘুরপথ ধরলে আমাজনের দৈর্ঘ্য ৬,৭৫০ কিলোমিটার। সেই দিক্ দিয়ে আমাজন পৃথিবীর সব চেয়ে দীর্ঘ নদী।



নীলনদ

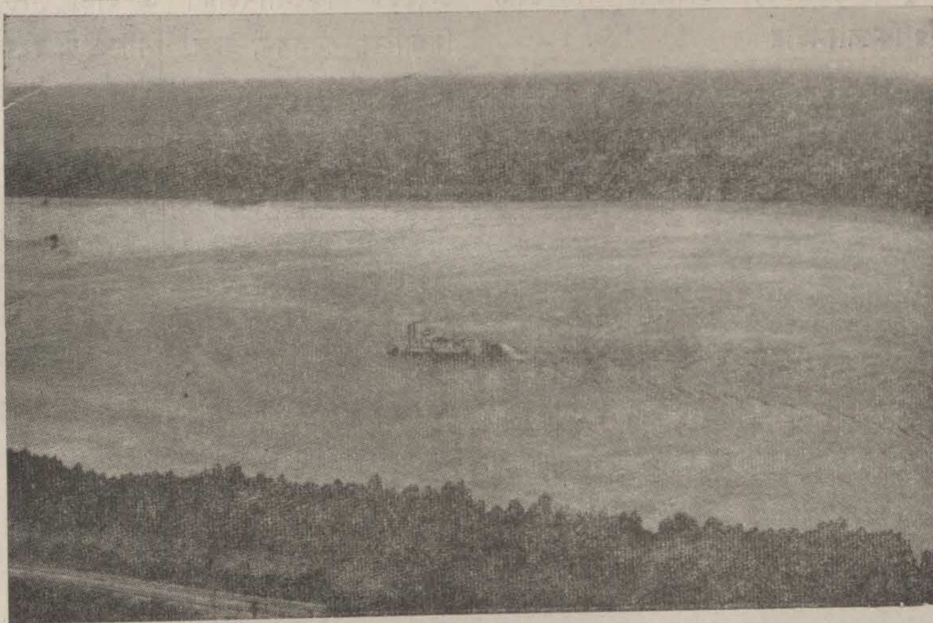


টেমস নদীর উপরের টাওয়ার ব্রিজ



কায়রোয় প্রবহমান নীলনদে পালতোলা নৌকা

নীলনদ (the Nile) পৃথিবীর দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদ (৬,৬৭০ কিলোমিটার দীর্ঘ)। নিরক্ষরেখার দক্ষিণে ভিক্টোরিয়া হ্রদ থেকে উৎপন্ন হয়ে আলবার্ট হ্রদের মধ্য দিয়ে উত্তরাভিমুখে সুদান ও ঈজিপ্টের উপর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে পতিত হয়েছে। নীলনদের জন্য



লুইসিয়ানায় প্রবহমান মিসিসিপি নদী

সমগ্র ঈজিপ্ট উর্বরা হয়েছে। ঈজিপ্টকে নীলনদের দান বা The gift of the Nile বলা হয়। কারো কারো মতে নীলনদই পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম।

মিসিসিপি-মিসৌরি (Mississippi-Missouri) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নদী। মিসিসিপি মেক্সিকো উপসাগরে পতিত হয়েছে। দৈর্ঘ্য ৩৭৮৩'৫০ কিলোমিটার। মিসৌরী ও রেড রক উপনদীর মিলিত দৈর্ঘ্য ৬,২২৪'৬০ কিলোমিটার।

ইয়াংসি (Yangtse)—দৈর্ঘ্য ৫,৬৩৫ কিলোমিটার। তিব্বতের উপত্যকা থেকে উদ্ভূত হয়ে সাংহাই-এর নিকটে প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্গত চীন সাগরে পড়েছে।

কঙ্গো (Congo)—দৈর্ঘ্য ৪,৮৩০ কিলোমিটার আফ্রিকার নদী।

আমুর (Amur) এশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য ৪,৮৩০ কিলোমিটার।

হোয়াং হো (Howang Ho। পীত নদী) চীনের নদী। দৈর্ঘ্য ৪,৮৩০ কিলোমিটার।

লেনা (Lena) রাশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য ৪,৫০৮ কিলোমিটার।

মেকেঞ্জি (Mackenzie) কানাডার নদী। দৈর্ঘ্য ৪২৪২'৩৫ কিলোমিটার।

মেকং (Mekong) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য ৪,৫০৮ কিলোমিটার।

নাইজার (Nizer) আফ্রিকার নদী। দৈর্ঘ্য

৪,১৮৬ কিলোমিটার।

এনিসে (Yenisey) রাশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য ৫,৩১৩ কিলোমিটার।

ভলগা (Volga) রাশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য ৩৭৪৩.২৫ কিলোমিটার।

দানিয়ুব (Danube) ইউরোপের নদী। দৈর্ঘ্য ১,৭৭৭.২৫ কিলোমিটার।

জাম্বেজী (Zambesi) আফ্রিকার নদী। দৈর্ঘ্য ২,৬৫৬.৫০ কিলোমিটার।

ডন (Don) রাশিয়ার নদী। ১,৯৩২ কিলোমিটার দীর্ঘ।

টাইগ্রিস (Tigris) এশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য ১৮,৫১.৫০ কিলোমিটার। এ ছাড়া সেন্ট লরেন্স, সিরদরিয়া, নেলসন, উরল, প্যারাগুয়ে, কলোরাডো,



রাইন নদী

ইউফ্রেতিজ (Euphrates) এশিয়ার নদী। দৈর্ঘ্য ২,৭৩৭ কিলোমিটার।

সিন্ধু (Indus) এশিয়ার নদ। দৈর্ঘ্য ২,৮৯৮ কিলোমিটার।

ব্রহ্মপুত্র (Brahmaputra) এশিয়ার নদ। দৈর্ঘ্য ২,৭০৪.৮০ কিলোমিটার।

গঙ্গা (Ganges, Ganga) ভারতের নদী। দৈর্ঘ্য ২,৪৯৫.৫০ কিলোমিটার।

অরেঞ্জ, ইরাবতী, ওহিও, কলাম্বিয়া, আঙ্গারা, শাতিল আরব, ওব, পেচোরা, ভিশ্চুলা, এলব্, রাইন, সেন, টেগাস, গোয়াডালকুইভার, নিস্টার, ফ্রেজার, লা-প্লাটা, টেম্‌স্, ফোর্থ, হাম্বার প্রভৃতি বহু নদনদী পৃথিবীর সর্বত্র বিদ্যমান।

॥ ভারতের নদনদী ॥

গঙ্গা ভারতের প্রধান নদী। সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্রের

কতকাংশ ভারতবর্ষের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ভারতের অন্যান্য নদ-নদীর নাম—গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী, পেনার, চন্দ্রগিরি, দামোদর প্রভৃতি অসংখ্য ছোট বড় নদী ভারতে বিদ্যমান।

॥ উপনদী ॥

শতদ্রু, বিতস্তা, ইরাবতী ও চন্দ্রভাগা সিন্ধুর উপনদী। গঙ্গার উপনদী অলকানন্দা, যমুনা, শোণ, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা (সরযূ), গণ্ডকী ও কুশী। মানস, তিস্তা, করতোয়া, ডিবং, ডিহং, লোহিত, ধনশ্রী ব্রহ্মপুত্রের উপনদী। মহানদীর উপনদী ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী। প্রাণহিতা, ইন্দ্রবতী ও মঞ্জীরা গোদাবরীর উপনদী। ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা কৃষ্ণার উপনদী।

এখানে শুধু ভারতের নদনদীর উপনদীর কথা বলা হল। পৃথিবীর অসংখ্য নদনদীর উপনদীর সংখ্যাও অসংখ্য।

॥ সব চেয়ে ছোট নদী ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লিঙ্কন সিটির D River ডেভিলস হ্রদ থেকে বেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পড়েছে। দৈর্ঘ্য মাত্র ১৩৪ মিটার।

॥ সর্বাপেক্ষা বড় ব-দ্বীপ ॥

গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের দ্বারা সৃষ্ট ব-দ্বীপ সর্বাপেক্ষা বড় ব-দ্বীপ। আয়তন প্রায় ৭৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

॥ সবচেয়ে বড় অববাহিকা ॥

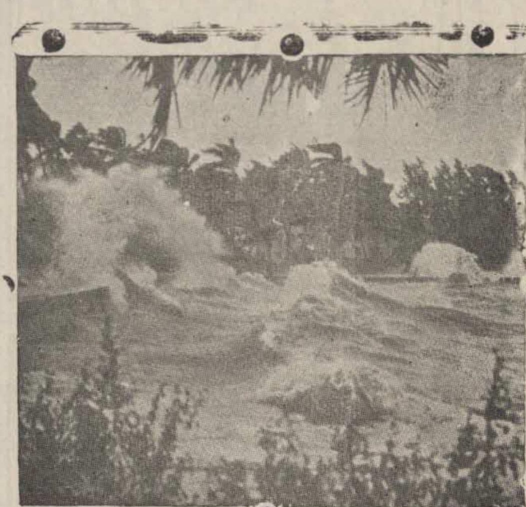
আমাজনের অববাহিকা সর্বাপেক্ষা বড়। আয়তন ৭০,৪৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার।

॥ সর্ববৃহৎ মোহনা ॥

উত্তর রাশিয়ার ওব (Ob') নদীর মোহনা সর্ববৃহৎ। সব চেয়ে চওড়া জায়গা ৮০ কিলোমিটার। এই মোহনা বেশির ভাগ সময়ে বরফে ঢাকা থাকে।

॥ নদীর বান ॥

হুগলী নদীতে ঘণ্টায় ২৭ কিলোমিটার বেগে ১১০ কিলোমিটার দূর থেকে বান আসে। পূর্ব চীনের হ্যাং-চাউ-ফে (Hand-chou-fe-তে ঘণ্টায়



নদীত বান

২৪ কিলোমিটার বেগে ৭.৫ মিটার উঁচু হয়ে বান আসে।

॥ গঙ্গা সম্বন্ধে পৌরাণিক কাহিনী ॥

গঙ্গা ভারতের সর্বাপেক্ষা পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ নদী। পুরাণে আছে, সূর্যবংশীয় রাজা সগরের ষাট হাজার ছেলে কপিল মুনির কোপানলে ভস্মীভূত হয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্বকে কপিল মুনির আশ্রমে পাওয়া গেলে সগর রাজার ছেলেরা কপিল মুনির উপর নির্যাতন শুরু করে। মুনির কোপানলে তারা

ভস্মীভূত হয়। সূর্যবংশীয় ভগীরথ স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে মর্তে নামিয়ে আনেন। গঙ্গা ভগবান্ বিষ্ণুর চরণ



ভগীরথ কর্তৃক গঙ্গাকে আনয়ন

থেকে নিঃসৃত হন। পরে আসবার সময়ে জহ্নু মুনির আশ্রম গঙ্গার জলে ভেসে যেতে থাকলে মুনি গঙ্গাকে পান করে ফেলেন। ভগীরথ মুনিকে স্তবে তুষ্ট করলে তিনি গঙ্গাকে নিজ শরীর থেকে বার করে দেন। জহ্নু মুনির দেহ থেকে বেরোনোর জন্য গঙ্গার আর এক নাম জাহ্নবী।

গঙ্গা আসতে আসতে তার ধারার কিছুটা অন্য পথে চলে যায়। সেই ধারাই পদ্মা।

ভগীরথ গঙ্গাকে নিয়ে কপিল মুনির আশ্রমে গেলে সগর রাজার ভস্মীভূত ছেলেরা প্রাণ ফিরে পায়।



জহ্নু মুনির দেহ থেকে গঙ্গার নির্গমন

গঙ্গা হিমালয়ের যেখান থেকে বেরিয়েছে তার নাম গোমুখী। গঙ্গা গঙ্গোত্রী থেকে সমতলের দিকে ধাবমান হয়েছে।

॥ গঙ্গা শ্রেষ্ঠ নদী ॥

গঙ্গার তীরে হরিদ্বার, কানপুর, এলাহাবাদ, কাশী, পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ

নগর বিদ্যমান। কেহ কেহ বলেন, অনেক দিক্ দিয়ে বিচার করলে গঙ্গা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নদী।



গোমুখী

কালীঘাট মন্দিরের ধার দিয়ে যে শীর্ণকায়া নদী প্রবাহিত, সেটাই আসল গঙ্গা। প্রায় আড়াইশ' বছর আগে সেখান দিয়ে বইত। এখন যে প্রশস্ত গঙ্গা, যাকে বড় গঙ্গা বলা হয় সেটা দিয়েই অধিকাংশ জলস্রোত বয়ে যায়।

॥ পদ্মা নদীর কাহিনী ॥

গঙ্গা, সরস্বতী ও লক্ষ্মী স্বর্গে বসে একদিন তুমুল ঝগড়া করতে থাকলেন। তাঁরা পরস্পরকে অভিশাপ দিলেন। তার ফলে তিনজনকে মর্ত্যে নদীর রূপ ধারণ করতে হল। লক্ষ্মীর এক নাম পদ্মা। তিনি হলেন পদ্মা। সরস্বতী হলেন একটি ছোট নদী।

॥ পদ্মার সৃষ্টি ॥

গঙ্গা উত্তরপ্রদেশ ও বিহারের মধ্য দিয়ে বয়ে এসে রাজমহল পাহাড়ের কাছে বঙ্গদেশে প্রবেশ করেছে। মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের কাছে ভাগীরথী ও পদ্মা নামে দু'টি প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়েছে।

পদ্মা প্রধানতঃ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পদ্মা বিরাট চওড়া নদী—বর্ষায় প্রায় ৮।১০ কিলোমিটার চওড়া হয়। ব্রহ্মপুত্র-যমুনার মিলনস্থল সাগরের মতো বহু-বিস্তৃত।

॥ যমুনা ॥

যমুনা দুটো। একটা ব্রহ্মপুত্রের শাখা, পদ্মায় এসে পড়েছে। সে যমুনা বাংলাদেশের নদী। আর এক যমুনা হিমালয়ের যমুনোত্রী থেকে বেরিয়ে দিল্লী, মথুরা, বৃন্দাবন, আগ্রা পার হয়ে এলাহাবাদে (প্রয়াগে) গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

এই যমুনার মোট দৈর্ঘ্য ১,৩৮৪·৬০ কিলোমিটার। যে চম্বল নদীর ধারের জঙ্গলে চম্বলের দস্যুদের আস্তানা সেই চম্বল নদী আগ্রার কিছু দূরে যমুনায় মিশেছে।

যমুনা নদীর জলের রং একটু কালচে ধরনের। তার আর এক নাম কালিন্দী। পুরাণে বলে, যমুনা সূর্য অর্থাৎ কলিন্দের মেয়ে। তাই তার নাম কালিন্দী। যমুনা যমরাজার বোন। ভাইফোঁটার দিন যমুনা তার দাদাকে ফোঁটা দেয়।

॥ ব্রহ্মপুত্র ॥

পুরাণে আছে ব্রহ্মপুত্র ব্রহ্মার পুত্র। জন্মের সময় দেখা গেল, তার শরীর জলের তৈরী। তাই তাকে চারপাহাড়ের মাঝখানে ব্রহ্মকুণ্ড নামক স্থানে রেখে দেওয়া হল। পরশুরাম সেখানে এসে স্নান করলে



পরশুরাম পাহাড় কেটে ব্রহ্মপুত্রকে প্রবাহিত করছেন

তাঁর পাপ দূর হয়ে গেল। তখন এইরকম একটা পবিত্র জলকে বদ্ধ না রেখে তিনি কুড়াল দিয়ে পাহাড় কেটে পথ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই বদ্ধ জল প্রবাহিত হয়ে ব্রহ্মপুত্র নদ হয়ে গেল।

তিব্বতে মানস সরোবরের কাছে ৎসাং-পো (Tsang-Po) নদী বেরিয়েছে। এই ৎসাং-পোই ব্রহ্মপুত্র। আসামে তার নাম ডিহং।

ব্রহ্মপুত্রের ধারে প্রথম শহর সদিয়া। তারপর নদটি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে হতে ডিব্রুগড়, তেজপুর, গৌহাটী, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ী ছাড়িয়ে গারো পাহাড়ের পাশ দিয়ে বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় এসেছে। এখান থেকে ব্রহ্মপুত্র ও তার শাখানদী যমুনা পদ্মার সঙ্গে মিশেছে।

॥ গণ্ডকী ॥

গণ্ডকী গঙ্গার এক উপনদী। পুরাণে আছে,

ভগবান্ বিষ্ণু শনির ভয়ে পাথর হয়ে এক জায়গায় লুকিয়ে পড়েন। শনি তাঁকে খুঁজে বার করেন ও পাথররূপী বিষ্ণুকে কুরে কুরে ফুটো করে দেন। তার ফলে বিষ্ণুর খুব কষ্ট হয়। তিনি ঘামতে থাকেন। সেই ঘাম থেকে গণ্ডকী নদীর জন্ম হয়। বিষ্ণু চলে গেলে পাথরটা পড়ে থাকে। ক্রমশঃ পাথরটা বহু টুকরো হয়ে যায়। এই সব টুকরোই শালগ্রাম শিলা। পূজার সময় শালগ্রাম শিলার প্রয়োজন হয়। গণ্ডকী ছাড়া আর কোথাও শালগ্রাম শিলা পাওয়া যায় না।

॥ নর্মদা ও তাপ্তী ॥

বিন্ধ্য পর্বতের পূর্বভাগে অমরকণ্টক পাহাড়ে নর্মদা নদীর উৎপত্তি। মহাদেব পাহাড়ে তাপ্তীর উৎপত্তি। নদী দুটি সাতপুরা পর্বতের উত্তর দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে কাম্বে উপসাগরে পড়েছে। নর্মদা জব্বলপুরের কাছে এক জায়গায় মার্বেল পাহাড় ভেদ করে বয়ে গেছে। নর্মদা পাহাড় থেকে নামবার সময় বেশ কয়েকটি জলপ্রপাতের সৃষ্টি করেছে। মার্বেল পাহাড়ের ধুঁয়াধার জলপ্রপাত খুব প্রসিদ্ধ। এই জলপ্রপাত দেখতে বহু পর্যটক প্রতি বৎসর গিয়ে থাকেন। জব্বলপুর নর্মদার ধারে অবস্থিত। নর্মদার দৈর্ঘ্য প্রায় ১,২৮৮ কিলোমিটার।

তাপ্তীর এক নাম তাপী। তার দৈর্ঘ্য ৭২৪·৫০ কিলোমিটার। সুরাট বন্দর তাপ্তীর তীরে অবস্থিত। তাপ্তী অজন্তা গুহা ও বাঘ গুহার পাশ দিয়ে বয়ে গেছে। নর্মদা ও তাপ্তীর কোন ব-দ্বীপ নেই। তাপ্তীনদীও কাম্বে উপসাগরে পড়েছে।

॥ দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত নদী ॥

মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী—এই চারিটি নদী দক্ষিণ ভারতে প্রধান। মহানদীর দৈর্ঘ্য ৮৩৭·২০ কিলোমিটার। নদীটি সাতপুরা পর্বতে উৎপন্ন হয়ে মধ্যপ্রদেশ, ছোটনাগপুর ও ওড়িশার মধ্য দিয়ে বয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। মহানদীর প্রধান উপনদী ব্রাহ্মণী ও বৈতরণী। কটক ও সম্বলপুর মহানদীর তীরে অবস্থিত।

গোদাবরীকে গঙ্গার ন্যায় পবিত্র বলে গণ্য করা হয়। তার দৈর্ঘ্য ১,৪৪৯ কিলোমিটার, দক্ষিণ ভারতের সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ নদী। নাসিক নগরের কাছে উপকূল থেকে ৮০·৫০ কিলোমিটার দূরে পশ্চিমঘাট পর্বতে উৎপন্ন হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। রাজমন্ত্রী বা রাজমাহেন্দ্রী এর তীরবর্তী বড় শহর। প্রাণহিতা (পেনগঙ্গা, ওয়ার্ধা ও বেন-গঙ্গার মিলনে উৎপন্ন), ইন্দ্রবতী ও মঞ্জীরা গোদাবরীর প্রধান উপনদী।

পুরাণে আছে, গঙ্গা তো মহাদেবের মাথার জটার মধ্যে থাকতেন। এতে মা-দুর্গা মনে মনে কষ্ট অনুভব করেন। তখন কার্তিক ও গণেশ ফন্দী করলেন। কার্তিক গরু সেজে গৌতম মুনির আশ্রমে উৎপাত শুরু করলে গরুরূপী কার্তিককে গৌতম তাড়া করলেন। কার্তিক তখন পালাতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন ও মরার ভান করে মাটিতে পড়ে রইলেন। গৌতম তো ভীষণ চিন্তিত হলেন। মহাপাপ হয়ে গেছে। তখন গণেশ পরামর্শ দিলেন, মহাদেবের জটা থেকে গঙ্গাকে নামিয়ে আনলে তার জলস্পর্শে মহাপাপ দূর হবে। গৌতম তপস্যা করে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করলেন। গঙ্গা জটা ভেদ করে নীচে নেমে এলেন। তার জল গায়ে লাগাতে গৌতমের সকল পাপ দূরীভূত হল। সেই থেকে গঙ্গার নাম হল গৌতমী গঙ্গা। তাই-ই হচ্ছে গোদাবরী।

কাবেরী নদী ভারতের সব নদীর দক্ষিণে

অবস্থিত। তার দৈর্ঘ্য ৭৬৪·৭৫ কিলোমিটার। কুর্গে উৎপন্ন হয়ে কর্ণাটক (মহীশূর) ও তামিলনাড়ুর মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। তার গতিপথে মাঝে মাঝে ছোট ছোট দ্বীপের সৃষ্টি হয়েছে। কর্ণাটক রাজ্যে শিবসমুদ্রম, শ্রীরঙ্গপত্তনম, শ্রীরঙ্গম পার হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। তিরুচিরাপল্লী ও কুম্ভকোনম্ শহর কাবেরীর তীরে অবস্থিত। শ্রীরঙ্গপত্তনম্ একটি দ্বীপে অবস্থিত। কাবেরী নদী পর্বত থেকে সমভূমিতে নামবার সময়ে প্রসিদ্ধ শিবসমুদ্রম্ জলপ্রপাত ও আরও কয়েকটি সুন্দর জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

কাবেরী নদীর নামকরণ সম্বন্ধে কেউ কেউ বলেন যে তিনি হলেন কাবের ঋষির কন্যা। সেইজন্য তার নাম কাবেরী। কেউ কেউ বলেন, এক উগ্রতপা ঋষির শাপে কাবেরীর নির্মল জল ঘোলা হয়ে যায়। সেইজন্য তাকে বলা হয় কাবেরী। কাবেরী শব্দের অর্থ যার শরীর কুৎসিত।

কৃষ্ণা নদীর উৎপত্তি পশ্চিমঘাট পর্বতে। সমুদ্র থেকে তার দূরত্ব ৬০ কিলোমিটার। কিন্তু নানা ঘুরপথে যাওয়ার ফলে তার দৈর্ঘ্য হয়েছে প্রায় ১,২৮৮ কিলোমিটার। কৃষ্ণা বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। ভীমা ও তুঙ্গভদ্রা তার প্রধান উপনদী। সাতারা ও বিজয়বাড়া (বেজোয়াদা) কৃষ্ণার তীরে অবস্থিত।

দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য উল্লেখযোগ্য নদী—উত্তর ও দক্ষিণ পেনার, ভাইগাই, এরা পূর্ববাহিনী। পেরিয়ার ও চন্দ্রগিরি পশ্চিমবাহিনী। এছাড়া পূর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট থেকে অনেক ছোট নদী সমুদ্রে পতিত হয়েছে।

দক্ষিণভারতের নদী অনুচ্চ পর্বত থেকে উৎপন্ন বলে বর্ষাকালেই জলপূর্ণ থাকে। অন্য সময়ে অতি শীর্ণ হয়ে যায়। স্থানে স্থানে একেবারে শুকিয়ে যায়।

নদীগুলি খরস্রোতা বলে বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্ন করার পক্ষে প্রশস্ত।

বিজ্ঞানীরা বলেন, দশ লক্ষ বৎসর আগেও গঙ্গা, যমুনা ও ব্রহ্মপুত্র ছিল না। প্রায় ৫/৬ লক্ষ বছর আগে হিমালয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

———



মেঘ, কুয়াশা, শিশির, বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, বিদ্যুৎ, বাজ, ঝড়, ঘূর্ণিঝড়, বাতাস মোটামুটি সব কিছু সম্বন্ধে যে বিদ্যার বলে নানা তথ্য আহরণ করতে পারা যায়, সেই বিদ্যার নাম আবহবিজ্ঞান। আবহবিজ্ঞানের ইংরেজী meteorology। বায়ুমণ্ডল ও জলবায়ু নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে আবহবিজ্ঞান গড়ে উঠেছে।

আমরা বায়ুর মধ্যে ডুবে আছি। আমাদের উপরে বায়ু, পাশে বায়ু, নীচে বায়ু। এই বায়ু না থাকলে জীব বাঁচতে পারে না। এই যে বায়ু সারা পৃথিবীকে বেষ্টন করে আছে, তার নাম বায়ুমণ্ডল। বায়ুমণ্ডল পৃথিবীরই একটা অংশ।

আমাদের মাথার উপরে আকাশ (sky)। তারও উপরে মহাকাশ (space)। আকাশের নীচে বায়ুমণ্ডল (atmosphere)।

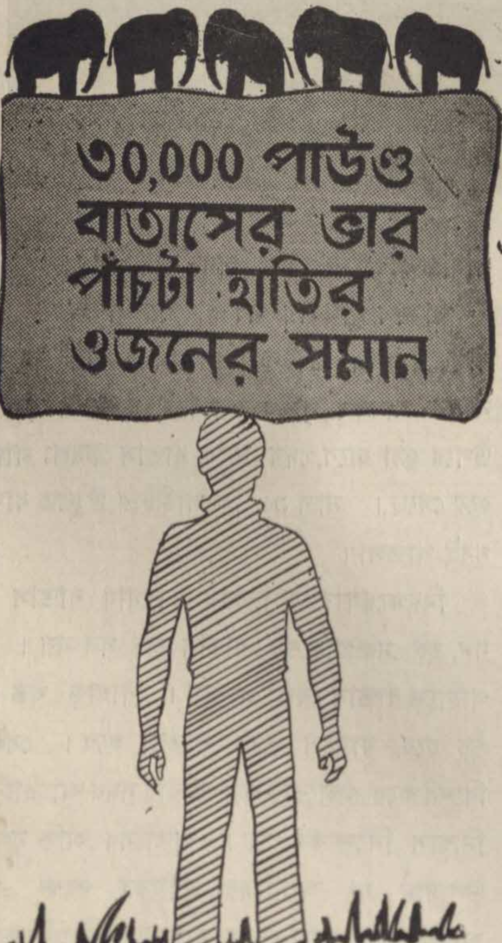
বায়ুমণ্ডল মোটামুটি ৪৮৩—৫৬৩ কিলোমিটার পুরু অর্থাৎ উপর দিকে ৪৮৩—৫৬৩ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ু পরিব্যাপ্ত। অবশ্য, তার উপরেও সামান্য সামান্য বাতাসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বাতাস পৃথিবীর সব জায়গায় সমান ঘন নয়। সাগরের ধারে ও উপরে বাতাস সব চাইতে ঘন। নীচের বাতাস পৃথিবীর সর্বত্রই বেশী ঘন। যত উপরে ওঠা যাবে, দেখা যাবে, বাতাস ক্রমশঃ পাতলা হয়ে গেছে। মাত্র ৯৬ কিলোমিটার উঁচুতে বাতাস খুবই পাতলা।

নিরক্ষরেখার উপরকার জায়গায় বাতাস যত ঘন, দুই মেরুপ্রদেশের বাতাস তত ঘন নয়। উঁচু পাহাড়ে বাতাস বেশ পাতলা। পাহাড় যত বেশী উঁচু হবে, বাতাস ততই পাতলা হবে। সেইজন্য বিশেষ করে এভারেস্ট শৃঙ্গে ওঠবার সময় আরোহীদের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। বাতাসের অতি মূল্যবান্ উপাদান যা আমাদের শরীরের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, তা কমে যেতে থাকায় আরোহীদের সঙ্গে করে অকসিজেন-ভরা পাত্র নিতে হয়।

বাতাসের চাপও নীচের দিকে খুব বেশী। যত উপর দিকে ওঠা যাবে, বাতাসের চাপ তত কম হবে।

সাগরের ধারে বা উপরে বাতাসের চাপ অর্থাৎ ওজন অন্যান্য জায়গার চেয়ে বেশী। সেই চাপ জলের ওজনের ৮০০ ভাগের ১ ভাগ। ৪৮৩ কিলোমিটার উঁচু জায়গার বাতাসের চাপ নীচু জায়গার ২·৫৪ সেন্টিমিটার লম্বা, ২·৫৪ সেন্টিমিটার চওড়া জায়গার উপরে ১৪·৭ পাউণ্ড (প্রায় ৬⅔ কিলোগ্রাম) চাপের সমান। এই হিসেব অনুযায়ী কোন মানুষের উপর বাতাসের চাপ পড়ে প্রায় ৩০ হাজার পাউণ্ড অর্থাৎ



মানুষের উপরে বাতাসের চাপ

প্রায় ৪।৫টা হাতির ওজনের সমান।

এই যে ভীষণ চাপ তা মানুষ তার শরীরের উপরে সহ্য করে। শরীর পিষে যায় না। কারণ, আমাদের শরীরে ভিতর থেকে একটা চাপ বাইরের দিকে আসে। তা বাতাসের চাপের সঙ্গে সমান। এই কারণে বাতাসের যে প্রচণ্ড চাপ তা আমরা বুঝতেই পারি না।

পর্বতের উপরে ডাল মাংস ইত্যাদি সহজে সিদ্ধ হতে চায় না। এর কারণ, বাতাসের চাপ কম থাকে বলে কম উত্তাপেই জল ফুটে ওঠে। তাই ওই রকম হয়।

মানুষ যত উপরে উঠতে থাকবে, ততই তার শরীরের ভিতরের চাপ আর বাইরের বাতাসের চাপের পার্থক্য ঘটবে। তার ফলে মানুষের কষ্ট হয়। খুব বেশী উঁচুতে উঠলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এই জন্যে বিশেষ ধরনের পোশাক পরে উপরের দিকে যেতে হয়। সেই পোশাক পরার দরুন বাইরের বাতাসের চাপের ফলে শরীরের কোন ক্ষতি হয় না। এরোপ্লেনে করে বেশী উঁচু দিয়ে যাবার সময় যাত্রীদের ঘরে বেশী করে বাতাস পুরে রাখা হয়। এই ধরনের ঘরকে বলে প্রেশারাইজ্‌ড্ ক্যাবিন (pressurized cabin)।

ইটালীর বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর ছাত্র ইভ্যানজেলিস্টা টরিচেলি (Evangelista Torricelli, ১৬০৮—১৬৪৭ খ্রীঃ) প্রথম বাতাসের চাপ মাপেন। তাঁর আবিষ্কৃত বাতাসের চাপ-পরিমাপক যন্ত্রের নাম ব্যারোমিটার (barometer)।

॥ বাতাসের উপাদান ॥

অনেক উপাদান নিয়ে বাতাস। তন্মধ্যে নাইট্রোজেন (nitrogen) গ্যাস সব চেয়ে বেশী,

শতকরা ৭৮ ভাগ। এর পর অক্সিজেন (oxygen), শতকরা ২১ ভাগ। বাকী থাকে মাত্র ১ ভাগ। তাতে অনেকরকম গ্যাস, কার্বন ডাই-অক্সাইড (carbon di-oxide), আর্গন (argon), জেনন (zenon), হিলিয়াম (hilium), নিওন (neon), ক্রিপটন (crypton) প্রভৃতি সামান্য পরিমাণে থাকে।

॥ নীল রঙের পাহাড় বা আকাশ ॥

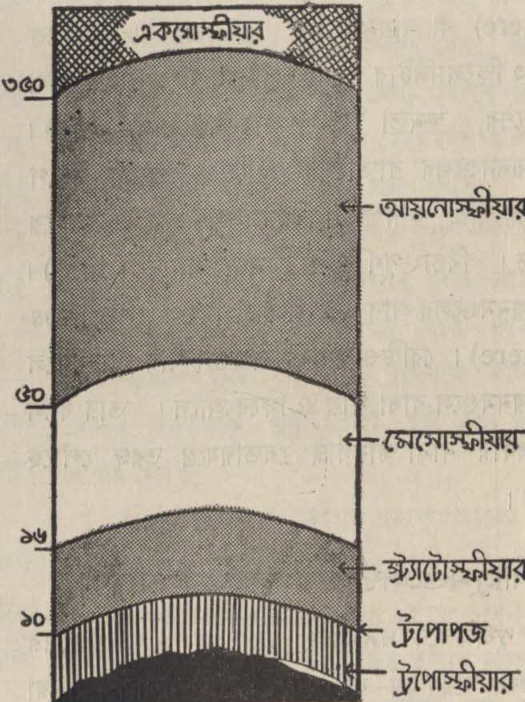
বাতাস চোখে দেখা যায় না। কারণ, বাতাসের কোন রঙ্ নেই। বাতাসের কণা সূর্যের আলোর সাতটা রঙের নীল রঙটা শুষে নিতে পারে। সেই জন্য দূর থেকে বেশ খানিকটা বাতাস সূর্যের নীল রঙ্ শুষে নিলে বাতাসকে নীল রঙের বলে মনে হয়। দূরের পাহাড় বা আকাশের রঙ্কে নীল মনে হলেও সেই নীল রঙ্ আসলে বাতাসেরই, পাহাড় বা আকাশের নয়। কাছের কম বাতাস যা আমাদের চোখে পড়ে, তাতে বাতাসের কোন রঙ্ বুঝতে পারি না।

॥ বায়ুমণ্ডলের স্তরবিভাগ ॥

সারা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল একটাই। কিন্তু বিজ্ঞানীরা সেই বায়ুমণ্ডলকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়েছেন। সব জায়গায় বায়ুমণ্ডলের স্তরের উচ্চতা একরকম নয়।

সব চেয়ে নীচের স্তরের নাম ঘনমণ্ডল বা ট্রপোস্ফীয়ার (troposphere)। নিরক্ষরেখার উপরে সমুদ্র থেকে ঘনমণ্ডল ১৬ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। দুই মেরুর উপরে উচ্চতা ১০/১১ কিলো-মিটার। ঝড়-বৃষ্টি সব ঘনমণ্ডলের মধ্যেই হয়ে থাকে।

ট্রপোস্ফীয়ারের উপরের দিকের শেষ মাথাটার নাম ট্রপোপজ (tropopause)। নিরক্ষরেখার উপরের ট্রপোপজ ১৬,৪৫৯ মিটার উপরে কিন্তু দুই মেরুতে ৮,৫৩৪ মিটার উপরে।



ট্রপোপজের উপর থেকে আরম্ভ হয়েছে সূক্ষ্মমণ্ডল বা স্ট্র্যাটোস্ফীয়ার (stratosphere)। সূক্ষ্মমণ্ডলে বৃষ্টি নেই, মেঘ নেই, ঝড়-ঝঞ্ঝা নেই। ট্রপোপজের উপরে ১৬ থেকে ২৫ কিলোমিটার পর্যন্ত স্ট্র্যাটো-স্ফীয়ার বিস্তৃত।

স্ট্র্যাটোস্ফীয়ারের পর ৮০ কিলোমিটারব্যাপী মেসোস্ফীয়ার (mesosphere) বা অন্তর্মণ্ডল। এই অন্তর্মণ্ডলের প্রথম অংশে ওজোন (ozone) গ্যাসের স্তর। ওজোন এক ধরনের অক্সিজেন। এতে পরমাণুর সংখ্যা তিন (অক্সিজেনে দুই)। ওজোন নীচের বায়ুমণ্ডলে বেশী নেই। কিন্তু উচুতে বেশী

আছে। ওজোন সূর্যের ক্ষতিকর তেজ আটকে রেখে পৃথিবীর জীবদের দেহকে বাঁচায়। পাতাল রেলপথে ওজোন ব্যবহার করা হয়। ওজোনের বহু ধরনের বীজাণু ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে।

মেসোস্ফীয়ারের পর আয়নোস্ফীয়ার (ionosphere) বা আয়নমণ্ডল। এই স্তর ৪৮৩ থেকে ৫৬৩ কিলোমিটার পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সূর্যের তাপ গ্রহণের ক্ষমতা শুধু আয়নমণ্ডলেরই আছে। আয়নমণ্ডলের বাতাসের অক্সিজেন সূর্যের তাপে ভেঙ্গে যায়, কণাগুলো বিদ্যুতে পূর্ণ হয়ে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যুৎ-পূর্ণ কণার নাম আয়ন (ion)। আয়নমণ্ডলের আর এক নাম তাপমণ্ডল (thermosphere)। রেডিও-তরঙ্গ সব মণ্ডল পার হয়ে গেলে আয়নমণ্ডলে বাধা পায় ও ফিরে আসে। তার ফলে পৃথিবীর নানা জায়গার বেতারযন্ত্রে তরঙ্গ পোঁছে যায়।

॥ বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহের তাপ ॥

সূর্যকিরণে ঘনমণ্ডল, সূক্ষ্মমণ্ডল ও অন্তর্মণ্ডলের বাতাস গরম হয় না। যে গরম বাতাস আমরা পাই তা পৃথিবীর জল-মাটির তাপে গরম হয়। মাটি ছেড়ে যত উঁচুতে ওঠা যাবে, ততই বাতাস ঠাণ্ডা হতে থাকবে। উঁচু পাহাড়ের উপরে খুব ঠাণ্ডা। এত ঠাণ্ডা যে জল জমে বরফ হয়ে যায়। সূক্ষ্মমণ্ডলের তাপ আগাগোড়া ৬৭° সেন্টিগ্রেড। তারপর আয়নমণ্ডলে পৌঁছে গেলে ঠাণ্ডা আর থাকবে না। সেখানে অসম্ভব রকম গরম। ৫৬৩ কিলোমিটার উঁচুতে বাতাসের উত্তাপ দাঁড়ায় এত গরম যে তাতে লোহা সহজেই গলে যেতে পারে।

॥ হাওয়ার গতি ॥

হাওয়া এক জায়গায় থেমে থাকে না। এদিকে ওদিকে ঘোরাফেরা করে। এই হাওয়ার গতি সব সময়ে সব জায়গায় একরকম নয়। হাওয়া পৃথিবীর ঘোরার সঙ্গে ঘণ্টায় ১৬১০ কিলোমিটার বেগে ঘুরে থাকে। আমরাও পৃথিবীর ঘোরার ফলে ঘণ্টায় ১৬১০ কিলোমিটার বেগে ঘুরি। এইজন্য হাওয়ার গতি বুঝতে পারি না।

হাওয়ার গতির সাধারণ নিয়ম, গরম হাওয়া স্থান ত্যাগ করে যে দিকে ঠাণ্ডা হাওয়া সে দিকে ছুটে যায়। ঠাণ্ডা হাওয়া গরম হাওয়ার ছেড়ে-যাওয়া শূন্য জায়গা পূর্ণ করতে ছুটে আসে।

দিনের বেলায় ডাঙ্গা বেশী গরম হয়ে ওঠে, রাত্রে জল বেশী গরম হয়। এই কারণে দিনের বেলায় নদী-সাগর থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া গরম ডাঙ্গার দিকে ছুটে যায়। রাতের বেলায় ডাঙ্গার হাওয়া নদী-সাগরের দিকে ছুটে যায়। গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ বাংলায় দক্ষিণ দিক্ থেকে বাতাস বয়। সেই বাতাস দক্ষিণের সাগর থেকে বয়ে আসে। এই বাতাসকে আমরা মলয় বাতাস বলি।

শীতকালে উত্তর দিক্ থেকে বাতাস বয়ে আসে। সেই বাতাস উত্তরের পর্বতশ্রেণীর ঠাণ্ডা বাতাস।

॥ মৌসুমী বায়ু ॥

আমাদের দেশে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে ভীষণ গরম পড়ে। তার ফলে বাতাসের চাপ কমে যায়। জ্যৈষ্ঠ মাস নাগাদ সেই চাপ ক্রমশঃই কমে যায়। ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। তখন সেখানকার বাতাস অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, তাতে চাপ বেশী। সেই ঠাণ্ডা বাতাস গরম বাতাসের জায়গার দিকে বয়ে আসতে থাকে। আসবার সময় সাগরের জলের উপর দিয়েই বেশী আসতে হয়, ফলে সেই বাতাস বেশী জলো বাষ্পে ভরে যায়। তাই চাপও বাড়ে।

সাগরের এই জলো বাষ্পে ভরা ভারী বাতাস

ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ থেকে বয়ে আসে। কিন্তু পৃথিবীর ঘোরার ফলে সোজা উত্তরে না যেতে পেরে উত্তর-পূর্ব দিকে চলে আসে।

এই যে বাতাস একে বলা হয় মৌসুমী বায়ু (monsoon)। মৌসুম কথার অর্থ ঋতু। সারা বৎসর ধরে এই মৌসুমী বায়ু বয় না।

যে ঠাণ্ডা বাতাস ভারত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক্ থেকে বয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে চলে আসে, তারই নাম মৌসুমী বায়ু। এই মৌসুমী বায়ু অর্থাৎ জলীয় বাষ্পে ভরা দক্ষিণ-পশ্চিম ভারত মহাসাগরের বায়ুই পশ্চিম বঙ্গ, আসাম প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টি ঘটায়।

॥ বাতাসের আর্দ্রতা ও গুমোট ॥

বাতাসে জলকণা বা জলীয় বাষ্প থাকার নাম বাতাসের আর্দ্রতা (humidity)। বৎসরের সব সময়ে বাতাসের আর্দ্রতা সমান থাকে না।

বাতাসের বাষ্পকে চোখে দেখা যায় না। কিন্তু অদৃশ্য মিহি জলকণাসমূহই ঠাণ্ডায় চাপ বেঁধে যায়। তখন তাকে দেখতে পাওয়া যায়। এই চাপ-বাঁধা জলকণাই মেঘ।

আকাশে মেঘ নীচুতে থাকলে পৃথিবীর গরম উপরে যেতে গিয়ে মেঘে ঠেকে ফিরে আসে। তার ফলে গরম ও আর্দ্রতা বেড়ে যায়। গুমোট বা ভ্যাপসা গরমের সৃষ্টি তখনই হয়।

॥ মেঘ ॥

আকাশের উপর দিকের জমাট-বাঁধা বাষ্পকেই মেঘ বলা হয়। সময়বিশেষে এই মেঘ থেকেই বৃষ্টি হয়।

মেঘের কোন রং নেই। মেঘের উপর সূর্যের আলো পড়লে সাদা, লাল ইত্যাদি রঙের বলে মনে হয়। জলভরা মেঘ নীচু দিকে থাকে। তাতে পৃথিবীর ছায়া পড়ে। তাই সেই মেঘকে কালো দেখায়।

আকার ও প্রকৃতির দিক থেকে মেঘের নানা নাম — আবর্ত মেঘ, পুষ্কর মেঘ, দ্রোণ মেঘ, সংবর্ত মেঘ বা ধুলো মেঘ, হেঁড়ে মেঘ (বাদল বা নীরদ), সিঁদুরে মেঘ বা স্তূপ-মেঘ, অলক-মেঘ, স্তর-মেঘ, জল-মেঘ অথবা জল-স্তূপ মেঘ, অলক-স্তর মেঘ, স্তূপ-স্তর মেঘ প্রভৃতি। স্তূপ-মেঘের আর এক নাম পুঞ্জ-মেঘ, অলক-মেঘের নাম ঘন-মেঘ।

যে মেঘে বৃষ্টি হয় না, তাকে বলে আবর্ত মেঘ। যে মেঘ থেকে বৃষ্টি হতেও পারে তার নাম পুষ্কর মেঘ। যা থেকে প্রচুর বৃষ্টি হয়, যার ফলে ক্ষেত মাঠ ফসলে ভরে যায় সেই মেঘকে বলে দ্রোণ মেঘ। যা থেকে খুব বেশী বৃষ্টি হয় তার নাম সংবর্ত মেঘ।

ঝড় ওঠার আগে মেঘের রঙকে কালো দেখায়। সেই কালো মেঘকে বলে ধুলো মেঘ। খুব কালো মেঘকে গ্রাম্য ভাষায় বলা হয় হেঁড়ে মেঘ। হেঁড়ে মেঘ বলার মানে রান্নার হাঁড়ির তলার মতো কালো মেঘ। এই হেঁড়ে মেঘকে বাদল মেঘ বা নীরদ মেঘ (nimbus)ও বলা হয়ে থাকে। সন্ধ্যার আগে মেঘের উপর সূর্যের লাল আলো পড়লে মেঘ লাল দেখায়। এই মেঘকে সাধারণতঃ সিঁদুরে মেঘ বলা হয়।

শরৎকালের রাত্রিতে আকাশে এক শ্রেণীর মেঘকে স্তরে স্তরে সাজানো দেখা যায়। এই মেঘকে বলা হয় স্তর-মেঘ (stratus cloud)। ৬০৯ মিটার থেকে ১,০৬৬ মিটারের মধ্যে এই মেঘের অবস্থান। দেখলে মনে হয় যেন আকাশের গায়ে সিঁড়ির ধাপ। সূর্য উঠলেই এ মেঘ মিলিয়ে যায়। এ মেঘ থেকে বৃষ্টি হয় না।

গ্রীষ্মে, বর্ষায় ও শরতে আকাশে পেঁজা তুলোর

গ্রীষ্মে কতকগুলো সাদা মেঘ দেখা যায়। কখনও কখনও শীতকালেও এই মেঘ দেখা যায়। পেঁজা



স্তূপ-মেঘ

তুলোর স্তূপের মতো বলে এই মেঘগুলিকে স্তূপ-মেঘ (cumulus) বলা হয়। একে পুঞ্জ-মেঘও বলে। সাধারণতঃ সকালে সন্ধ্যায় এদের বেশী দেখা যায়। মেঘের চেহারা দেখে মনে হয়, ঝড়-বৃষ্টি হবে কিন্তু তা হয় না।

স্তূপ-মেঘের অনেক উপরে প্রায় ২০,০০০ মিটার উপরে এক শ্রেণীর মেঘ দেখা যায়, তাদের বলে কিউমিউলো-নিম্বাস (cumulo-nimbus)।

সাধারণতঃ উপরের স্তরে যে-সব মেঘ দেখা যায়, তার নাম অলক-মেঘ বা ঘন-মেঘ (cirrus)। কোঁকড়ানো চুল, পাখির পালক, পশুর লেজ প্রভৃতি নানা আকারের এই মেঘ দেখতে খুব সাদা। গড়ে ৮,২৫০ মিটার উঁচুতে এই মেঘ দেখা যায়। সাধারণতঃ খুব ভোরে ও বিকেলের দিকে আকাশে ভেসে বেড়ায়। অত উঁচুতে ঠাণ্ডায় মেঘের বারিকণা জমে খুব মিহি বরফে পরিণত হয়। খুব হালকা ও মিহি বলে তা বাতাসে ভেসেই থাকে, মাটিতে ঝরে পড়ে না।

জল-মেঘ বলা হয় সেই সব মেঘ, যা থেকে বৃষ্টি হয়, যার রং ঘোর ধূসর এবং যা আকাশের বেশী উঁচুতে থাকে না। বিভিন্ন শ্রেণীর মেঘের সংমিশ্রণে জল-স্তূপ, অলক-স্তর, স্তূপ-স্তর প্রভৃতি মেঘের সৃষ্টি হয়।

॥ বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টি ॥

উপরে ঠাণ্ডা বাতাসের সংস্পর্শে মেঘও ঠাণ্ডা ও ভারী হয়। ক্রমে মেঘের উপরে মেঘ জমতে থাকে।

শেষে বাতাস আর ভারী মেঘগুলিকে ধরে রাখতে পারে না। মেঘের ভারী বারিকণা বৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে ঝরে পড়ে।

আকাশে শুধু বাষ্পই ওঠে না, ধূলিকণাও উঠে থাকে। এই ধূলিকণার চারদিকে বাষ্পের আবরণ থাকে। যে বৃষ্টি আকাশ থেকে পড়ে তার প্রতিটি জলকণার মধ্যে থাকে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা। বিজ্ঞানীরা বলেন, আকাশে ধূলিকণা না জমলে মেঘের সৃষ্টি হত না, বৃষ্টিও হতে পারত না।

কখনও কখনও বৃষ্টি হবার সময়ে মাঝ পথে ভীষণ ঠাণ্ডায় বৃষ্টির ফোঁটা জমাট বেঁধে বরফের ডেলা



হয়ে যায়। সেই বরফের ডেলা মাটিতে এসে পড়ে। তখন বলা হয় শিলাবৃষ্টি (hailstorm) বা করকাপাত হচ্ছে। এই শিলা খুব মিহি থেকে আরম্ভ করে বেশ বড় আকারের হয়ে থাকে। ঝাঁকে ঝাঁকে বড় বড় শিলাবর্ষণের ফলে অনেক জায়গায় মানুষ ও জীবজন্তু মারাও পড়ে। সব চেয়ে বড় শিলা এ পর্যন্ত যা জানা গেছে, তার ওজন ছিল ১·৬৭ পাউণ্ড (ব্যাস ১৯ সেন্টিমিটার, পরিধি ৪৪·৪৫ সেন্টিমিটার)। এটি পড়েছিল ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত কানসাসের কফিভিল (Coffeville)-নামক স্থানে। শিলা স্বচ্ছ ও কতকটা ফাঁপা।

॥ শিশির ॥

কার্তিক মাসে একটু একটু ঠাণ্ডা পড়তে থাকে। সেই ঠাণ্ডায় বাতাস তেমন ঠাণ্ডা হয় না, কিন্তু ঘাস, গাছের পাতা, শানবাঁধানো জায়গা প্রভৃতি ঠাণ্ডা হয়। বাতাসের ভিতরে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা এই সব জিনিসে ঠেকলে জল হয়ে যায়। সাধারণতঃ রাত্রে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে। তাই সেই সময়ে ওই সব জিনিসে বেশী করে জল জমে। এই জমা জলই শিশির বা হিম। গাছের পাতার উপরে যে-সব শিশির জমে তা নীচে ঝরে পড়ে। তখন আমরা বলি হিম পড়ছে। অনেক সময়ে গাছের পাতা বা ডালের উপরকার জমা জল বাইরের বাতাসের জলীয় বাষ্প থেকে হয় না। গাছের মধ্যকার জলীয় পদার্থ পাতার বা ডালের সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে এসে পাতায় বা ডালে জমে।

। কুয়াশা।

কুয়াশা আর মেঘ একই। মেঘ উঁচু আকাশে ভেসে বেড়ায়, কুয়াশা মাটি, জল প্রভৃতির উপরে জমে। কুয়াশাকে ভারী মেঘ বলা চলে। বাতাসের ভিতরকার জলীয় বাষ্প ঠাণ্ডা লেগে ধোঁয়ার মতো আকার ধারণ করে কিন্তু মাটিতে ঝরে পড়ে না। সন্ধ্যার পর থেকে ভোর পর্যন্ত কুয়াশা

জমে। রোদ উঠলে কুয়াশা কেটে যায়।

শীতের দেশে রোদের তেজ কম। সেই জন্য সেখানকার কুয়াশা সহজে কাটতে চায় না। বেশী বেলা পর্যন্ত থেকে যায়।

শহরের কুয়াশা গ্রামের কুয়াশার চেয়ে বেশী ঘন হয়। শুধু তাই নয় গ্রামের চেয়ে শহরে বেশী কুয়াশা দেখা যায়।

ধোঁয়া, কুয়াশায় মিশে যে খুব ঘন কুয়াশার সৃষ্টি হয়, তাকে বলে ধোঁয়াশা (smog)। এই ধোঁয়াশায় শুধু ধোঁয়া থাকে না। ধূলিকণা থাকে। অনেক ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের পক্ষে রীতিমতো ক্ষতিকর।

কানাডার অন্তর্গত নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের গ্র্যাণ্ড ব্যাঙ্কে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী কুয়াশা জমে। বৎসরে প্রায় ১২০ দিন। একসঙ্গে তা কয়েক সপ্তাহ ধরে থাকে।

॥ তুষার ॥

গরমের দেশে মাটির উপর তুষার-কণা পড়ে না বেশী শীতের দেশে জলকণা জমাট বেঁধে বরফে পরিণত হয় ও মাটিতে ঝরে পড়ে। এই বরফকে বলে তুষার (snow)।

শীতের দেশে তো বটেই, গরমের দেশে উঁচু পর্বতের উপরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় জল জমে তুষার বা বরফ হয়ে থাকে। কখনও কখনও তুষার-স্তূপ নদীর আকারে ধীরে ধীরে নীচে নামতে থাকে। তাকে বলে তুষার-নদী বা হিমবাহ (glacier)।

মেরুপ্রদেশে বিরাট বিরাট বরফের পাহাড় গড়ে উঠেছে। সেই পাহাড় থেকে খুব বড় বড় বরফের চাঁই ভেঙ্গে পড়ে জলে ভাসতে ভাসতে দূরে চলে যায়। এগুলিকে বলে হিমশৈল (iceberg)।

বেশির ভাগ শীতের দেশে ঝড়ের সময় হালকা



সুইটজারল্যাণ্ডের পর্বতের একটি তুষারনদী



শিয়াল

শিয়াল বনের জন্তু। ভারী ধূর্ত। ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা মহাদেশের জঙ্গলে নানা ধরনের শিয়াল দেখা যায়। সেই সব শিয়ালের মধ্যে মেরু শৃগাল ও উত্তর আমেরিকার লাল শিয়াল খুব প্রসিদ্ধ।

সাধারণতঃ লাল শিয়াল (red fox) জঙ্গলের পাশা-পাশি অঞ্চলে গৃহস্থের বাড়িতে হানা দেয়। সেখান থেকে হাঁস-মুরগী মুখে করে নিয়ে পালায়। খুব ভোরে, সন্ধ্যের পরে ও গভীর রাতে এই সব শিয়ালের দৌরাত্ম্য বাড়ে। জঙ্গলের ধারে যে সব গৃহস্থের বাস, তারা তার দিয়ে হাঁস-মুরগীর খাঁচা ঘিরে রাখে। তাহলেও যখন সেই সব হাঁস-মুরগী বাইরে বেরোয়, শিয়াল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে তাদের ধরে নিয়ে যায়।

লাল শিয়াল অনেক সময় অতর্কিতে গৃহস্থের বারান্দায় উঠে খুব ছোট শিশুকে পর্যন্ত আক্রমণ করতে ছাড়ে না। তারা মাংসাশী প্রাণী। খরগোশ, পাখি, হাঁস, মুরগী শিকার করে খায়।

[পূর্বপৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছবিটি লাল শিয়ালের]

ও পাতলা তুষার উড়তে থাকে। সেই সব তুষার মাটি, বাড়িঘর, গাছপালা ইত্যাদিকে ঢেকে ফেলে। সেই ঝড়কে বলে তুষার-ঝঞ্ঝা (snowstorm)।



হিমবাহ

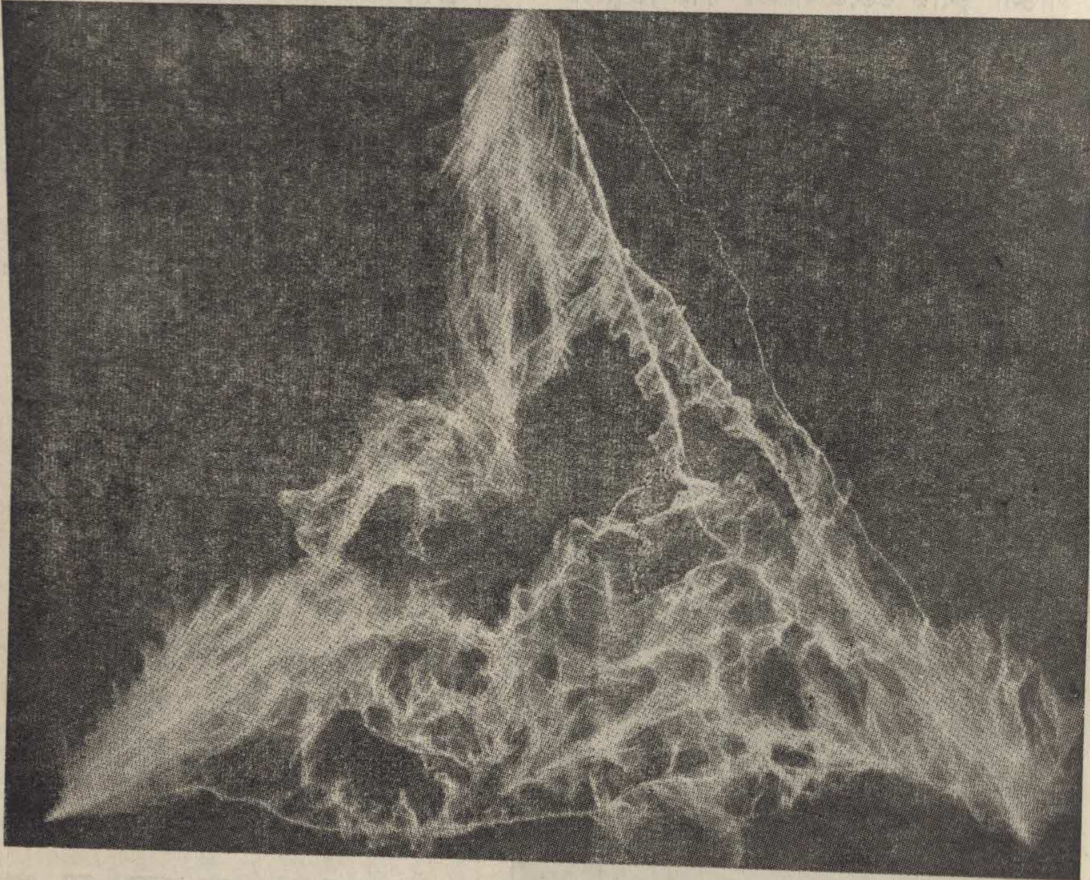
॥ বজ্র-বিদ্যুৎ ॥

কোন মেঘে থাকে পজিটিভ বিদ্যুৎ, কোন মেঘে থাকে নেগেটিভ বিদ্যুৎ। সাধারণতঃ বর্ষাকালে বা গ্রীষ্মকালে বিকালের পর এই ধরনের দুটো মেঘ খুব কাছাকাছি হলেই একটার পজিটিভ, আর অন্যটার নেগেটিভ বিদ্যুৎ লাফ দিয়ে এসে মিলে যায়। তখন আলোর যে ঝলকের সৃষ্টি হয় তাই-ই মেঘের বিদ্যুৎ (lightning)।

বিদ্যুৎ-চমকের সময় কম-বেশী শব্দ হয়। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুতের স্ফুরণের সময় প্রচণ্ড শব্দ হয়। সেই শব্দ বহু দূর থেকেও শোনা যায়। বিদ্যুৎ-স্ফুরণের সময় প্রচণ্ড তাপের ফলে বাতাসের প্রসারণ ঘটে, পরক্ষণেই সংকোচন হয়। বাতাসের এই প্রসারণ-সংকোচনের ফলেই শব্দের সৃষ্টি হয়। এই শব্দকে মেঘের ডাক বলা হয়। মেঘের বিদ্যুৎ প্রচণ্ড গতিতে মাটিতে নেমে আসে। তখন যে অতি প্রচণ্ড শব্দ হয় তাকেই বলা হয় বাজের শব্দ। বাজ বা বজ্র বলে আলাদা কোন জিনিস নেই। গাছে বা বাড়িতে যে বাজ পড়ে, তা কোন শক্ত জিনিস নয়। অতি উচ্চ শক্তির, কখনও কখনও বহু লক্ষ ভোল্ট বিদ্যুতের অতি প্রচণ্ড গতিতে মাটির বিদ্যুতের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য যাত্রার সময় গাছ পুড়ে যায়, বাড়ি ভেঙ্গে পড়ে।

॥ ঝড় ॥

বাতাস গরম হলে হালকা হয় এবং তা উপর দিকে উঠে যায়। ঠাণ্ডা বাতাস ভারী। কোন জায়গার বাতাস গরমে হালকা হয়ে উপরের দিকে উঠে গেলে আশে-পাশের ঠাণ্ডা বাতাস সেই শূন্য জায়গা পূরণ করতে বেগে ছুটে আসে। বাতাসের এই বেগে ছুটে আসার নামই ঝড় (storm)। আমরা সাধারণতঃ সবরকম শক্তিশালী ও বেগবান্ বাতাসকে ঝড় বলে থাকি কিন্তু বিজ্ঞানীরা তা বলেন না। তাঁরা ঘণ্টায় ৫১ থেকে ৬১ কিলো-মিটার জোরে বাতাস বইলে বাতাসকে বলেন জোরালো হাওয়া (high wind)। বাতাসের গতি



দশলক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ

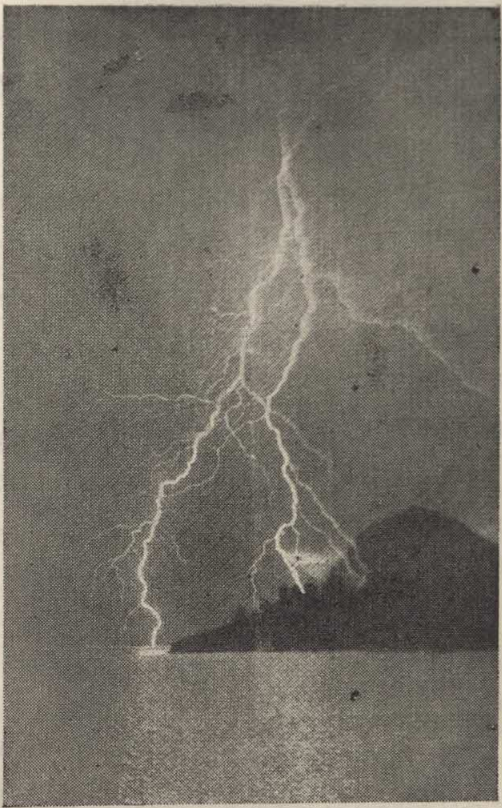
ঘণ্টায় ৬২ থেকে ১০১ কিলোমিটার হলে তাকে বলা হয় gale, ১০৩ থেকে ১২০ কিলোমিটার হলে storm বলে, আর যখন ঘণ্টায় ১২০ কিলোমিটারের বেশী হয় তখন বলা হয় হারিকেন (hurricane)। বাংলায় বাত্যা, ঝটিকা আর ঝঞ্ঝা বলা চলে।

ব্যারোমিটার বা বায়ুচাপমান যন্ত্রের সাহায্যে বাতাসের চাপ ও হ্রাস-বৃদ্ধি জানা যায়। বাতাসের চাপ কম হলেই বুঝতে পারা যায়, ঝড় আসবে। চৈত্র-বৈশাখে বিকালের দিকে বাতাসের চাপ কমে যায়, আর প্রচণ্ড ঝড় আসে। এই ঝড়কে বলা হয় কালবৈশাখী।

ঝড় নানা ধরনের—টাইফুন, সাইক্লোন, হারিকেন, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো, সিমুম, সিরকো ও মিস্ট্রাল।

চীন সমুদ্রে গ্রীষ্মকালের শেষে বা তার পরে যে প্রচণ্ড ঝড় ওঠে তার নাম টাইফুন (typhoon)। সাইক্লোন (cyclone) দেখা দেয় ভারত মহাসাগরে,

আর হারিকেন (hurricane) দেখা দেয় প্রশান্ত মহাসাগরে।



বজ্রপাত

দুটো বাতাস উলটো দিক্ থেকে মুখোমুখি ধাক্কা খেয়ে ঘুরতে থাকলে ঘূর্ণিঝড় (whirlwind)-এর সৃষ্টি হয়। ডাঙার উপরের টর্নেডো (tornado) একধরনের ভয়াবহ বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড়। টর্নেডো কালো সরু মেঘের মতো পাক খেতে খেতে উপর দিকে উঠে যায়। আর ঘণ্টায় ৩২২ কিলো-মিটারেরও বেশী জোরে মাত্র কয়েক শত ফুট জায়গার উপর দিয়ে ছুটে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেকসাসের Wichita falls-এ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা এপ্রিল ঘণ্টায় ৪৫০ কিলোমিটার বেগে টর্নেডো বয়ে গিয়েছিল। টর্নেডোর শক্তি এত প্রচণ্ড যে তাতে গাছপালা, বাড়িঘর ভেঙে তুবড়ে মুচড়ে যায়। জলাশয়ের জল ঊর্ধ্বগামী হয়। কখনও কখনও ছোট জলাশয়ের সব জল নিঃশেষ হয়ে যায়। এই রকম একটা টর্নেডো ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ২৪ পরগণার গাইঘাটায় প্রলয়ংকর ধ্বংসলীলার সৃষ্টি করে। মিসিসিপি অঞ্চলে খুব বেশী টর্নেডোর দৌরাত্ম্য লক্ষ্য করা গেছে। সারা পৃথিবীর নানা স্থানে টর্নেডোর ধ্বংসলীলা দেখা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের টানে সাগর বা নদীর জলে জলস্তম্ভের সৃষ্টি হয়। এই জলস্তম্ভ (waterspout) সময়বিশেষে অনেক



হারিকেন

উঁচু হয়।

সিমুম (simoom) এশিয়া ও আফ্রিকার মরুভূমির ধূলিঝড়। লিবিয়ার মরুভূমি থেকে উত্তপ্ত ধূলিঝড় সিরকো (sirocco) ভূমধ্যসাগর পার হয়ে ইটালী, সিসিলি, মাল্টা প্রভৃতি স্থানে পৌঁছে যায়।



টর্নেডো

মিস্ট্রাল (mistral) ফ্রান্সের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও শুষ্ক ঝড়।

ভারতে, বিশেষ করে পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে একধরনের প্রচণ্ড ধূলি ঝঞ্ঝা ওঠে। সেই ধূলোর ঝড়কে কখনও বলে আঁধি। কখনও ব'লে 'লু'।

। আবহাওয়া অফিস ॥

আবহাওয়ার পূর্বাভাস জানা থাকলে লোকের অনেক সুবিধা হয়। সেইজন্য পৃথিবীর নানাস্থানে বহু আবহাওয়া অফিস স্থাপিত হয়েছে। সেখানে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি রাখা হয়েছে। সে-সবের দ্বারা কখন কোথায় ঝড় উঠবে, কবে বৃষ্টি হবে, খরা কবে নাগাদ দূর হবে, কোথায় উচ্চ চাপ বা নিম্নচাপ দেখা দিয়েছে, কত বেগে ঝড় ছুটে গেছে, ঘূর্ণিঝড় কেন হল ইত্যাদি নানা বিষয়ে জনসাধারণকে দৈনিক সংবাদপত্রের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয়। এতে মানবসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

। খনার বচন ॥

খনা ছিলেন একজন অতি বিদূষী জ্যোতির্বিজ্ঞান-জানা মহিলা। কেহ বলেন, তিনি ছিলেন একজন সিংহলী মহিলা। কেহ বলেন, বাঙ্গালী। তাঁর নামে আবহাওয়া-সম্বন্ধে যে-সব ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত আছে, সে সবকে বলে খনার বচন। হয়তো বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পল্লীবাসী সেই সব খনার বচনের মধ্যে আরো অনেক বচন প্রক্ষিপ্ত করেছেন। সে যাই হোক, সেগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে আবহাওয়া সম্বন্ধে সুন্দর আভাস দেয়।



ভূগোলের নানা কথা

নদ-নদী, সাগর-উপসাগর, অরণ্য-পর্বত, আগ্নেয়-গিরি, প্রস্রবণ, মরুভূমি, দেশ-মহাদেশ প্রভৃতি নিয়ে আমাদের পৃথিবী। এই পৃথিবীর নানা দেশে অসংখ্য নরনারীর বাস, এই সব কিছুর বিবরণ-সংক্রান্ত বিদ্যা বা শাস্ত্রের নাম ভূগোল (Geography)।

পৃথিবী মহাশূন্যে ভাসমান এক প্রকাণ্ড গোলক, যার আকার গোল। কিন্তু পৃথিবী যে গোল, তা গ্রীক পণ্ডিত পাইথাগোরাস (Pythagoras, আনুমানিক ৫৮২-আনুমানিক ৫০৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), ভারতীয় পণ্ডিত আর্যভট (জন্ম ৪৭৬ খ্রী), বরাহমিহির (বিক্রমাদিত্যের নবরত্নের অন্যতম), ভাস্করাচার্য (মৃত্যু ১১১৪ খ্রী.), অনেক পরে পাঁচশ বছর আগে পোলিশ বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস (Nicolas Coparnicus, ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রী.) বলে গেলেও সাধারণ লোকে মেনে নিতে পারে নি। লোকের ধারণা ছিল, পৃথিবী চেপটা থালার মতো, গোল বলের মতো নয়।

শেষে পোর্তুগিজ নাবিক ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজেল্যান বা ম্যাগেলান (Ferdinand Magellan, ১৪৮০-১৫২১ খ্রী.) ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজে করে পৃথিবী পরিক্রমায় বার হলেন। তাঁর জাহাজ ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত পোর্তুগালেই ফিরে এল। তখন সকলেই বুঝল, পৃথিবী চেপটা থালার মতো হলে জাহাজ পৃথিবীর শেষ প্রান্তে পৌঁছে যেত। গোল বলের মতো বলেই যে স্থান থেকে তিনি বেরিয়েছিলেন সেই স্থানেই ফিরে এসেছেন।

পৃথিবী যে গোল, তার নানা প্রমাণ পাওয়া গেছে। বিস্তীর্ণ বিশাল সমুদ্রের দূর প্রান্ত থেকে



ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজেল্যান

একটা জাহাজ আসবার সময় তাকে প্রথম দিকে দেখাই যায় না, পরে প্রথমে তার মাস্তুল দেখা যায়, তারপর জাহাজের মধ্য ভাগ নজরে পড়ে।

শেষে জাহাজ আরো নিকটবর্তী হলে পুরা জাহাজ-টাই চোখে পড়ে। এ থেকে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়, পৃথিবী চেপটা থালার মতো নয়, তার আকার গোল বলের মতো, উপরটা কুমীরের পিঠ বা উপুড়-করা বাটির মতো।

মহাকাশে রকেট পাঠিয়ে পৃথিবীর যে-সব আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়েছে, তাতে পৃথিবীকে গোল বলের মতোই দেখা গেছে। অবশ্য, রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের প্রেরিত রকেট থেকে তথ্য আহরণ করে বলা হয়েছে, পৃথিবীর আকার কমলালেবুর মতো নয়। কতকটা নাশপাতির মতো।

সাতটি মহাদেশ নিয়ে স্থলভাগ—এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ওশেনিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা। জলভাগ —প্রশান্ত মহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, সুমেরু মহাসাগর ও কুমেরু মহাসাগর।

সম্পদ্। সোভিয়েট রাশিয়ার শতকরা ৩৪ ভাগ বনভূমি। উত্তর সোভিয়েট রাশিয়ার বনভূমির আয়তন ২,৭০,০০,০০,০০০ একর। এই বনভূমি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। আমাজন নদের তীরের অরণ্য দুর্ভেদ্য ও বিশাল। ভারতের হিমালয় পর্বতের পাদদেশ অঞ্চল ও কিছু দূর উঁচু পর্যন্ত বনভূমি ঘনসন্নিবিষ্ট। আসাম রাজ্য অরণ্যের জন্য প্রসিদ্ধ। দেখা গেছে, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে বেশী গাছ জন্মে। পার্বত্য অঞ্চলে বনের প্রাচুর্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কালিফোর্নিয়ায় বহু অত্যুচ্চ গাছ বিদ্যমান। অরণ্যের গাছসমূহ থেকে কাঠ, আঠা, ফল, ফুল, ঔষধ অনেক কিছু পাওয়া যায়। মরু-ভূমিতে ওয়েসিস ব্যতীত কোথাও ছোট বা বড় গাছ হয় না।

॥ পবিত্র পর্বত ॥

পর্বতের কথা 'পর্বত' অধ্যায়ে বলা হয়েছে।



গ্র্যানাইট পাথরে গড়া পর্বত

॥ অরণ্য ॥

স্থলভাগে পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি, নদ-নদী, গুহা, প্রস্রবণ প্রভৃতি বিরাজিত। সব দেশেই অরণ্য আছে। অরণ্য মূল্যবান্ প্রাকৃতিক

মানুষ সর্বযুগে সর্বদেশে পর্বতকে পবিত্র বলে মনে করে এসেছে। হিমালয়ে অসংখ্য তীর্থ বিরাজিত, হিমালয়কে দেবস্থান বলা হয়। গ্রীসের ওলিম্পাস পর্বত দেবতাদের পবিত্র বাসস্থান বলে মনে করা

হয়েছে। জাপানের ফুজিয়ামা জাপানীদের নিকট অতি পবিত্র। বহু দেশেই লোকে সেখানকার পর্বতকে শ্রদ্ধা করে, অর্চনা করে।

॥ জলপ্রপাত ॥

পর্বতের উপর থেকে নদী নীচে নামবার সময় সামনে খাদ পেয়ে হু হু করে নেমে পড়তে থাকে। একে বলে জলপ্রপাত। প্রায় সব উঁচু পর্বতেই জলপ্রপাত আছে। পৃথিবীতে সব চেয়ে উঁচু জলপ্রপাত ভেনেজুয়েলার সালটো এঞ্জেল (Salto Angel)। এটি ক্যারাও (Carrao) নদীর এক শাখার জলপ্রপাত। এর মোট উচ্চতা ৯৭৯ মিটার। জলপ্রপাতটির একটি ধাপের উচ্চতা ৮০৭ মিটার।

সব চেয়ে বড় জলপ্রপাত ব্রাজিল ও প্যারাগুয়ের মধ্যবর্তী সালটো পারানা নদীর গুয়েইরা (Guaira) জলপ্রপাত। উচ্চতা মাত্র ১১৪ মিটার কিন্তু বৎসরে ৪,৮৫০ মিটার চওড়া জলধারা থেকে ৪,৭০,০০০ কিউসেক জল নির্গত হয়। এক এক সময়ে এ থেকে ১৭,৫০,০০০ কিউসেক জল পর্যন্ত নির্গত হয়ে থাকে।

পৃথিবীতে সব চেয়ে চওড়া জলপ্রপাত লেয়স বা লাওস (Laos)-এর খোন (Khone) জলপ্রপাত—১০'৮ কিলোমিটার চওড়া। বৎসরের কোন



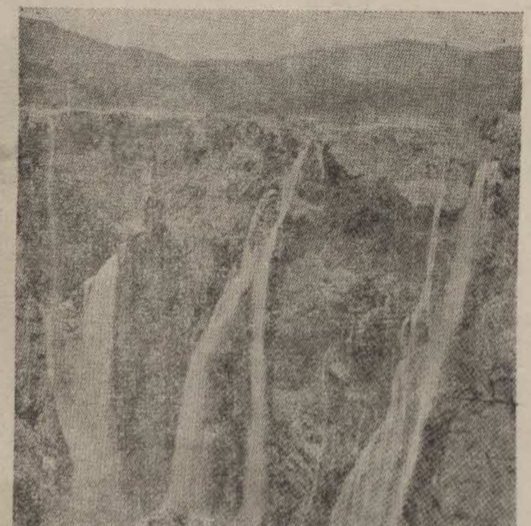
পোটারো নদীর কেইটুর (Kaietur) জলপ্রপাত



ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

কোন সময়ে এই জলপ্রপাত থেকে ১৫,০০,০০০ কিউসেক জল নিম্নদেশে প্রবাহিত হয়।

আফ্রিকার জাম্বেজী নদীর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ১৭০০ মিটার চওড়া। এটি ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে লিভিংস্টোন কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যবর্তী নায়েগারা নদীর জলপ্রপাত খুব প্রসিদ্ধ। এটির উচ্চতা মাত্র ৫০ মিটার কিন্তু খুব চওড়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যোসেমাইট (Josemite) জলপ্রপাত, নিউ জীল্যাণ্ডের সাদারল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার টুগেলা ও কিং জর্জেস



গারসোপ্পা জলপ্রপাত

জলপ্রপাত (King George's falls), পোটারো (Potaro) নদীর কেইটুর (Kaietur) জলপ্রপাত প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

ভারতে কর্ণাটকে যোগ বা, গারসোপ্পা জলপ্রপাতের উচ্চতা সব চেয়ে বেশী। রাঁচীর হুড্রু বা জোহ্না, দার্জিলিঙের ভিক্টোরিয়া, শিলঙের বীডন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

॥ ঝরনা ॥

পৃথিবীর সব পর্বতেই ঝরনা আছে। পাহাড়ের ফাটল দিয়ে বৃষ্টির জল বা নদী বা হ্রদের জল চুইয়ে চুইয়ে এসে নীচে নেমে পড়ে। তা থেকেই ঝরনার সৃষ্টি। ঝরনা বা নির্ঝরের জলধারা সব সময়েই শীর্ণ।

॥ উষ্ণপ্রস্রবণ ॥

যে-সব ঝরনা থেকে অনেক সময়ে গরম জল পড়ে, তাকে বলে উষ্ণপ্রস্রবণ (hot spring)। বিভিন্ন খনিজ পদার্থ থাকার জন্যে বা পৃথিবীর ভিতরের উত্তাপের জন্যে জল গরম হয়ে যায়। সেই গরম জল বেরিয়ে এসে উষ্ণ প্রস্রবণের সৃষ্টি করে। রাজগীর, বীরভূমের বক্রেশ্বর প্রভৃতি স্থানে উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ড, চট্টগ্রামের বাড়বাকুণ্ড, কেদারনাথের পথের গৌরীকুণ্ড, বদ্রিনাথের উষ্ণ কুণ্ড প্রভৃতি গরম জলে ভরা গর্ত বা কুণ্ড। এই জলে লোকে রোগ-নিরাময়ের জন্যে স্নান করে। বক্রেশ্বরে তো একটা বড় পুকুরের মতো জায়গা গরম জলে ভরা। আইসল্যাণ্ডে উষ্ণ প্রস্রবণের সংখ্যা অনেক। ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালী, রাশিয়া, চীন, সুইজারল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর বহু দেশে অনেক উষ্ণ প্রস্রবণ আছে।

॥ বরফের রাজ্য ॥

পৃথিবীর সব জায়গা সমান গরম নয়। এমন সব জায়গা আছে যেখান চিরকাল বরফে ঢাকা থাকে। সেই সব স্থান এত ঠাণ্ডা যে জল জমে

বরফ হয়ে থাকে, সে-সব দেশেও শীত গ্রীষ্ম কাল আছে। কিন্তু কোন সময়েই বরফ গলে জল হয়ে যায় না। কিছু কিছু জায়গায় গ্রীষ্মকালে বরফ গলে জল হয়। শীতকালে নদী-সাগর-হ্রদের জল জমে বরফ হয়ে যায়। তখন তার উপর দিয়ে লোকে চলতে তো পারেই, গাড়িও চলতে পারে।

পৃথিবীর দুই প্রান্ত সুমেরু ও কুমেরুপ্রদেশ অনন্ত বরফে ঢাকা। গ্রীনল্যাণ্ডের আয়তন ২১,৭৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। এত বড় একটা জায়গার লোকসংখ্যা মাত্র হাজার চল্লিশেক। কারণ, এই প্রকাণ্ড দ্বীপের অধিকাংশ স্থান চির তুষারে ঢাকা। অনেক খুব উঁচু পাহাড় সেখানে আছে, সে-সবই বরফের পাহাড়।

চিরতুষারের রাজ্য সুমেরু ও কুমেরুপ্রদেশ এক অদ্ভুত জায়গা। এখানে কোথাও কোথাও একটানা ছ'মাস বা তারও বেশী দিন। যখন ছ'মাস বা তারও বেশী সময় রাত্রি, সেই সময়ে আকাশে সূর্য ওঠে না। চির অন্ধকার দূর করার জন্যে মেরুপ্রদেশের আকাশে এক ধরনের স্নিগ্ধ সবুজ, গোলাপী, বেগুনী প্রভৃতি রঙের আলো দেখা যায়। এই আলোকের নাম মেরুজ্যোতি (Aurora polaris)। কুমেরুপ্রদেশের সেই আলোর নাম কুমেরু জ্যোতি বা প্রতীচ্য উষা (Aurora australis), সুমেরুপ্রদেশের জ্যোতির নাম সুমেরু জ্যোতি বা উদীচ্য উষা (Aurora borealis)। এই আলো কখনও কখনও উজ্জ্বল, কখনও মৃদু।

নরওয়ের উত্তর দিকে বৎসরের কয় মাস রাত্রেও সূর্য দেখা যায় অর্থাৎ সেই কয় মাস কেবলই দিন। এই কারণে নরওয়েকে নিশীথ সূর্যের দেশ (Land of the Midnight Sun) বলা হয়।

সুমেরুপ্রদেশে যখন গ্রীষ্মকাল তখন কোন কোন স্থানে বরফ গলে যায়। সেই সব জায়গায় ছোট ছোট ঘাস বা শেওলা জন্মায়। বল্গা হরিণেরা তাই খায়। সেই অঞ্চলকে বলে তুন্দ্রা অঞ্চল। তবে, সুমেরু বা কুমেরুপ্রদেশের যে অংশ মেরুর চারদিকে অবস্থিত সেখানে বৎসরের কোন সময়ে গাছপালা জন্মায় না। সেখানকার নীচে মাটি নেই, শুধুই সমুদ্র। কুমেরুপ্রদেশ তো চিরতুষারে ঢাকা এক বিরাট মহাদেশ।

॥ হ্রদ ॥

পাহাড়-পর্বত থেকে যে-সব জলস্রোত সমতলের দিকে নেমে যায়, যদি সে-সবের জল একটা জায়গায় আটকে যায়, তাহলে সেই জমা জল প্রকাণ্ড গর্ত বা খাদে থেকে যায়। সেই জলভরা খাদের নাম হ্রদ (lake)। অনেক সময় হ্রদের জল কানায় কানায় ভরতি হয়ে উপচে পড়ে নদীর সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর নানা দেশে বহু হ্রদ আছে। সে-সবের মধ্যে সব চেয়ে বড় কাসপিয়ান সাগর (Caspian Sea)। চারিদিকে স্থলবেষ্টিত জলভাগ বলে কাসপিয়ান একটি হ্রদ। কিন্তু এই হ্রদ এত বড় যে তাকে সাগর বলা হয়। রাশিয়ায় একে বলা হয় Kaspiskoye More। দক্ষিণ রাশিয়া ও ইরানের এই সুবিশাল হ্রদটির আয়তন ৩,৭১,৮০০ বর্গ কিলোমিটার। দৈর্ঘ্য ১,২২৫ কিলোমিটার। এই হ্রদের ১,৪৩,৫৫০ বর্গ কিলোমিটার ইরানের মধ্যে (সেখানে নাম Darya-ye-khazar)। হ্রদটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৮·৫ মিটার নীচে। এর সব চেয়ে অধিক গভীরতা ১,০২৫ মিটার। কাসপিয়ান সাগরের জল লোনা।

উত্তর আমেরিকার সুপীরিয়র হ্রদ (Lake Superior) পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মিষ্টি জলের হ্রদ।

আয়তন ৮২,৩৫০ বর্গকিলোমিটার। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১৮২ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে অবস্থিত কৃষ্ণ সাগর (Black Sea) নামে সাগর হলেও বিরাট হ্রদ। ১,১৯১ কিলোমিটার লম্বা, চওড়ায় ৬২৭ কিলোমিটার। দানিয়ুব, নীপার, নীস্টার, ডন, বাগ প্রভৃতি নদী এই হ্রদে পড়েছে।

পূর্ব আফ্রিকার ভিক্টোরিয়া হ্রদ সুবিশাল। আয়তন প্রায় ৬৭,৬০০ বর্গকিলোমিটার। এই হ্রদ থেকে নীল নদ নির্গত হয়েছে। এটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,১২৯ মিটার উপরে অবস্থিত। ইজরায়েল ও জর্ডনের মধ্যবর্তী ডেড সী (Dead Sea)-র জল ভীষণ লোনা। এতে মানুষ দিব্যি ভেসে থাকতে পারে, ডুবে যায় না। এটি ভূমধ্যসাগরের পৃষ্ঠদেশ থেকে ৩৯১ মিটার নীচে। ডেড সীর আয়তন ৮৮৪ বর্গ কিলোমিটার, এর সর্বাধিক গভীরতা ৩৯৯ মিটার। জর্ডন নদী এই হ্রদে পড়েছে।

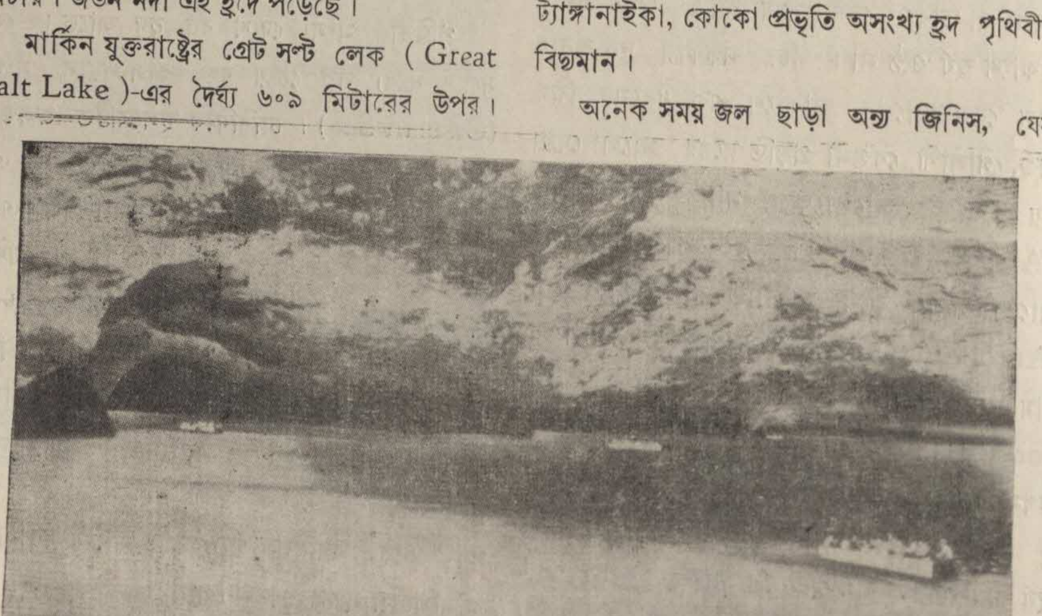
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গ্রেট সল্ট লেক (Great Salt Lake)-এর দৈর্ঘ্য ৬০৯ মিটারের উপর। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১,২৮৫ মিটার উচ্চে অবস্থিত, এই হ্রদের জলও ভীষণ লোনা।

ভারতের রাজস্থানের সম্বর হ্রদের জলও খুব লোনা। এই রকম লোনা জলের হ্রদ পৃথিবীতে অনেক আছে, এই সব লোনা জলের হ্রদ থেকে লবণ, পটাশ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

তিব্বতের মানস সরোবর পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থানে অবস্থিত। এভারেস্টের নিকটে ৫,৮৮০ মিটার উচ্চে একটি অনামা হ্রদ আছে। তিব্বতের Nam Tso হ্রদ (আয়তন ১৯৫৬ বর্গ কিলোমিটার) ৪ ৫৭৮ মিটার উচ্চে অবস্থিত। দক্ষিণ আমেরিকার টিটিকাকা (Titicaca) হ্রদ প্রায় ৩,৮১১ মিটার উচ্চে অবস্থিত। এটি ২০৯ কিলোমিটার লম্বা।

আরল সী, বৈকাল, নিয়াসা, ল্যাডোগা, বলখাশ, চাদ, ওনেগা, ভোল্টা, নিকারাগুয়া, রুডলফ, আলবার্ট, ম্যানিটোবা, হুরন, মিচিগান, ট্যাঙ্গানাইকা, কোকো প্রভৃতি অসংখ্য হ্রদ পৃথিবীতে বিদ্যমান।

অনেক সময় জল ছাড়া অন্য জিনিস, যেমন



ডেড সী

গলা পিচের হ্রদও আছে। ত্রিনিদাদ দ্বীপে এই রকম একটা হ্রদ আছে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে লাভা ভরতি একটি প্রকাণ্ড হ্রদ আছে।

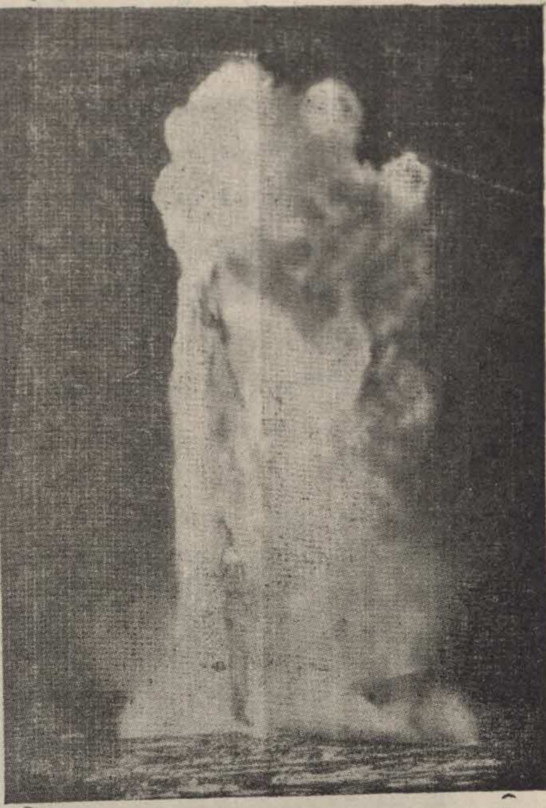
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেনেসীতে Craighead Caverr, Sweetwater একটি ভূগর্ভস্থ হ্রদ। তার নাম দ্য লস্ট সী (The Lost Sea)। আয়তন মাত্র ৪½ একর। ভূগর্ভস্থ হ্রদসমূহের মধ্যে এইটিই সর্ববৃহৎ।

॥ গেজার (Geyser) ॥

আগ্নেয়গিরি থেকে প্রচণ্ড বেগে আগুন, লাভা, শিলাখণ্ড প্রভৃতি উৎক্ষিপ্ত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় মাঝে মাঝে সেই রকম সবেগে লাভা, শিলাখণ্ডাদির পরিবর্তে খুব গরম জল ঊর্ধ্বে উত্থিত হয়। এই ধরনের গরম জলের উৎক্ষেপকে বলা হয় geyser। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্ক, আইসল্যাণ্ড, নিউ জীল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে এই রকম বহু গেজার দেখা যায়।

১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জীল্যাণ্ডের The Waimangu geyser-এর জল ৪৫৭ মিটার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। তারপর থেকে এই গেজার থেকে জলোৎক্ষেপ হয় নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল পার্কস সারভিস স্টীমবোট গেজারে ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৫ থেকে ১০ দিন অন্তর অন্তর ৭৬-১১৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চে জল উৎক্ষিপ্ত হয়েছিল। আইসল্যাণ্ড দ্বীপের মাউন্ট হেকলায় ৫৫ মিটার পর্যন্ত উচ্চে জলের উৎক্ষেপ ঘটেছে।

ইয়েলোস্টোন ন্যাশনাল পার্কের ওলড ফেথ্‌ফুল গেজার (Old faithful geyser) খুব সুদৃশ্য ও প্রসিদ্ধ। এটি থেকে ৬৫/৭০ মিনিট বাদে বাদে প্রায় ৫৩⅓ মিটার উঁচুতে জলের উৎক্ষেপ ঘটে।



ওল্ড ফেথ্‌ফুল গেজার

॥ গিরিপথ ॥

কখনও কখনও দুই উচ্চ পর্বতশ্রেণীর মধ্যে এক ধার থেকে অন্য ধারে যাবার পথ থাকে। উচ্চ পর্বতের উপর দিয়ে লোকজন গাড়িঘোড়া পার হতে পারে না। সেই পথ ধরে লোকে গাড়িঘোড়া নিয়ে ওপারে যেতে পারে। এই পথকে বলা হয় গিরিপথ বা গিরিবর্ত্ম (pass)।

গিরিপথ সাধারণ পথের মতো নয়। এটি উঁচু নীচু, অসমান। গিরিপথ অনেক সময় বেশ এঁকে বেঁকে যায়। পথে খাদ পড়ে, ঝরনা, নদী পড়ে। তবু লোকে এই পথ ধরে যাতায়াত করে, কারণ পর্বতের উপর দিয়ে বিপদ্‌সংকুল পথ দিয়ে যাওয়ার চেয়ে এই গিরিপথ অনেক ভালো, অনেক নির্বিঘ্ন।

সব দেশেরই লম্বা পর্বতশ্রেণীর মধ্যে গিরিপথ আছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তানকে যে পথ সংযুক্ত করেছে, তার নাম খাইবার পাস। পথটির দৈর্ঘ্য আকাবাঁকা পথে ৫৩ কিলোমিটার। চওড়া মাত্র ৩ মিটার। এই পথ দিয়ে গ্রীক, শক, হুণ, মোগল, পাঠান—সব যুগে যুগে ভারতে প্রবেশ করেছে। এই পথ দিয়েই আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট ভারতে প্রবেশ করেন। ইংরেজরা দুইবার অভিযান চালায়। এই পথ পেশোয়ার থেকে কাবুল যাবার গিরিপথ। সরু পথ হলে কি হবে, এই গিরিপথ খুবই প্রসিদ্ধ।

নানা জাতির লোক ভারতে প্রবেশ করেছে। বর্তমানে বোলান ও খাইবার দুটি গিরিপথের একাংশ পাকিস্তানের অন্তর্গত।

স্কটল্যাণ্ডের কিলিক্র্যাঙ্কি (Killecrankie) গিরিপথ সুপ্রসিদ্ধ। এই পথের উপর একটি রেলপথ আছে। পাশ দিয়ে হাঁটাপথও আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গিরিপথ তিব্বতের খালেব থেকে Hsin-chi-fu পর্যন্ত বিস্তৃত ১৩ কিলোমিটার দীর্ঘ Kang-ti-suu-র গিরিপথ। গিরিপথটির কোথাও কোথাও উচ্চতা ৬,০৮০ মিটার। দক্ষিণ-পশ্চিম সিংকিয়াং ও তিব্বতের



খাইবার পাস

আফগানিস্তানের কান্দাহার ও বেলুচিস্তানের কোয়েটাকে যে পথ সংযুক্ত করেছে, তার নাম বোলান পাস। এই গিরিপথ দিয়েও নানা সময়ে মধ্যকার ১,১৮০ কিলোমিটার দীর্ঘ গিরিপথে গাড়ি চলাচল করে। এই পথের কোথাও কোথাও উচ্চতা ৫,৬৩২ মিটার।

সারা পৃথিবী জুড়ে পর্বতশ্রেণী, আর অসংখ্য গিরিপথ। এই গিরিপথ না থাকলে দীর্ঘ গিরিপথের এক ধার থেকে অপর ধারে পৌঁছানো সহজ হত না। আন্দিজ, আল্পস, পীরেনিজ, হিমালয়, কিবো-কিলিম্যানজারো প্রভৃতি সব দীর্ঘ পর্বতশ্রেণীর এপার থেকে ওপারে যাওয়ার বহু গিরিপথ বিদ্যমান।

॥ সুড়ঙ্গ ॥

অনেক জায়গায় সুবিধাজনক গিরিপথ (pass) নেই। থাকলেও সে-পথে যেতে অনেক ঘুরপথ ধরে যেতে হয়। সেজন্যে মানুষ পর্বতের মধ্য দিয়ে সুড়ঙ্গ বা টানেল কেটে যাতায়াতের ব্যবস্থা করেছে। এই সুড়ঙ্গনির্মাণ এঞ্জিনীয়ারদের এক অপূর্ব কীর্তি।

কোন কোন সুড়ঙ্গ রেলচলাচলের জন্য নির্মিত হয়েছে। এ ধরনের সুড়ঙ্গের সংখ্যা অনেক। পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে দীর্ঘ রেলপথের টানেল জাপানের মধ্য হনশিউয়ে তানিগাওয়া পর্বতের নীচ দিয়ে গেছে। এর দৈর্ঘ্য ২২ ২ কিলোমিটার।

জলের তলা দিয়ে রেলপথের টানেল পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে দীর্ঘ জাপানের Seikan Rail Tunnel। এই সুড়ঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৪০ মিটার জলের তলায় সমুদ্রের তলদেশের ১০০ মিটার নীচে দিয়ে গেছে। এটির দৈর্ঘ্য ৫৩·৯ কিলোমিটার।

সেন্ট গটহার্ড রোড টানেল পৃথিবীর মধ্যে এই শ্রেণীর সর্বাপেক্ষা দীর্ঘ সুড়ঙ্গপথ।' এই পথ সুইজারল্যাণ্ড থেকে ইটালী পর্যন্ত বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য ১৬·৩২ কিলোমিটার।

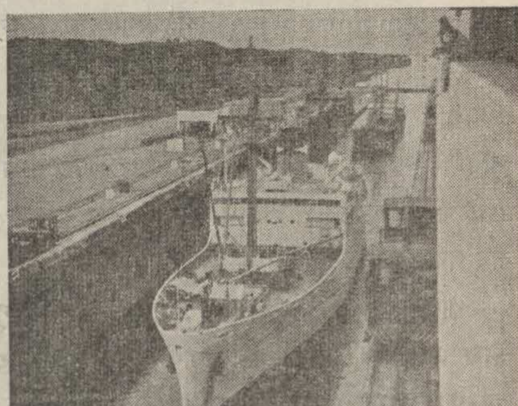
এ ছাড়া বহু রকম সুড়ঙ্গ বা টানেল আছে।

কাশ্মীরের জহর টানেল সুপ্রসিদ্ধ। লণ্ডনের টেমস নদীর তলা দিয়ে যে সুড়ঙ্গ গেছে তা মানুষকে বহু কাল ধরে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে রেখেছে।

॥ খাল ॥

সুয়েজ খাল ও পানামা খাল খুব প্রসিদ্ধ। ফরাসী মনীষী কাউন্ট ফার্দিনান্দ দ্য লেসেপ্‌স্ (Count Ferdinand de Lesseps, ১৮০৫-১৮৯৪ খ্রী.)-এর তত্ত্বাবধানে সুয়েজ খাল কাটা হয়। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি জাহাজ চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। খালটি ১৬১·৯ কিলোমিটার লম্বা ও ৬০ মিটার চওড়া। সুয়েজ খাল লোহিত সাগরের সঙ্গে ভূমধ্যসাগরের সংযোগ ঘটিয়েছে।

পানামা খাল আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ ঘটিয়েছে। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট এই খাল দিয়ে জাহাজ চলাচল শুরু হয়। খালটি ৮০ কিলোমিটারের চেয়ে কিছু বেশী লম্বা। গভীরতা ১২ থেকে ২৫ মিটার।



পানামা খাল দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা ইরিগেশন ক্যানাল (irrigation canal) বা সেচ খাল রাশিয়ার Kara-kumskiy kanal। লম্বায় ৮৫০ কিলোমিটার।

যতদূর জানা গেছে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে পুরাতন খাল ইরাকের ম্যাণ্ডালির কাছের খাল। ৪০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এটি কাটা হয়েছিল।

ভলগা-বাল্টিক খাল পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা—২,৩০০ কিলোমিটার।

চীনের গ্র্যাণ্ড ক্যানাল (পিকিং থেকে হ্যাংচাউ পর্যন্ত) ৫৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কাটা শুরু হয়। ৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে কাটা শেষ হয়। দৈর্ঘ্য ১,৭৮১ কিলো-মিটার।

রাশিয়ার হ্ব বিলোয়ে মোর (হোয়াইট সী) বাল্টিক ক্যানাল ২২৭ কিলোমিটার লম্বা।

॥ পর্বতের সৃষ্টি ॥

লক্ষ লক্ষ বছর আগে পৃথিবীপৃষ্ঠের নানারকম পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে পর্বতের সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ চার রকমে পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে—চ্যুতি পর্বত (block mountain), ভঙ্গিল পর্বত (fold mountain), লাভার পর্বত (mountain of accumulation) ও ভূপৃষ্ঠক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট পর্বত (mountain of denudation)।

পৃথিবীর শৈশবে পৃথিবীপৃষ্ঠ খুব নরম ছিল। পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তপ্ত গ্যাসের প্রচণ্ড ধাক্কায় সেই নরম ভূপৃষ্ঠের পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে যে সব পর্বতের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় চ্যুতি-পর্বত।

পৃথিবীর অভ্যন্তরের গ্যাসাদির ধাক্কায় ভূপৃষ্ঠ ভাঁজ হয়ে বা কুঁচকে গেলে যে-সব পর্বতের উদ্ভব হয়, তার নাম ভঙ্গিল পর্বত।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় রাশি রাশি লাভা বহু দিন ধরে জমে জমে যে-সব পর্বত গড়ে উঠেছে, সে-সব পর্বতকে বলা হয় লাভা-জমা পর্বত।

বহুদিনের নানা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়ে ক্ষয়েও অনেক পর্বতের সৃষ্টি হয়েছে। সেই সব পর্বতকে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট পর্বত বলা হয়।

॥ **পর্বতের উচ্চতা নির্ধারণ** ॥

জমি মাপবার ফিতে দিয়ে মেপে পর্বতের উচ্চতা নির্ধারণ করা হয় না। অলটিমিটার (altimeter), হিপসোমিটার (hypsometer), ট্র্যানজিট (transit) প্রভৃতি যন্ত্রের সাহায্যে পর্বতের উচ্চতার পরিমাপ করা হয়।

রাধানাথ শিকদার ট্র্যানজিট যন্ত্রের সাহায্যে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ দেখে পর্বতশৃঙ্গের রেখা একটি কাল্পনিক রেখার সাহায্যে কিরূপ কোণের সৃষ্টি করল তা জেনে নেন। পরে ত্রিকোণমিতির (trigonometry-র) সাহায্যে পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা নির্ধারণ করেন। এই ভাবে উচ্চতা নির্ধারণ সব সময়ে পুরোপুরি ঠিক না হলেও প্রায় ঠিক হয়ে থাকে।

অলটিমিটারের সাহায্যে পর্বতশৃঙ্গের উপরের বাতাসের চাপ নির্ধারণ করে সেই স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কত উঁচুতে তা জানা যায়।

বাতাসের চাপ কম হলে কম তাপেই জল ফুটে ওঠে। তা থেকে হিসেব করে হিপসোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা নির্ধারণ মোটামুটি ঠিক করা যায়।

॥ **অ্যাভালাঁশ** ॥

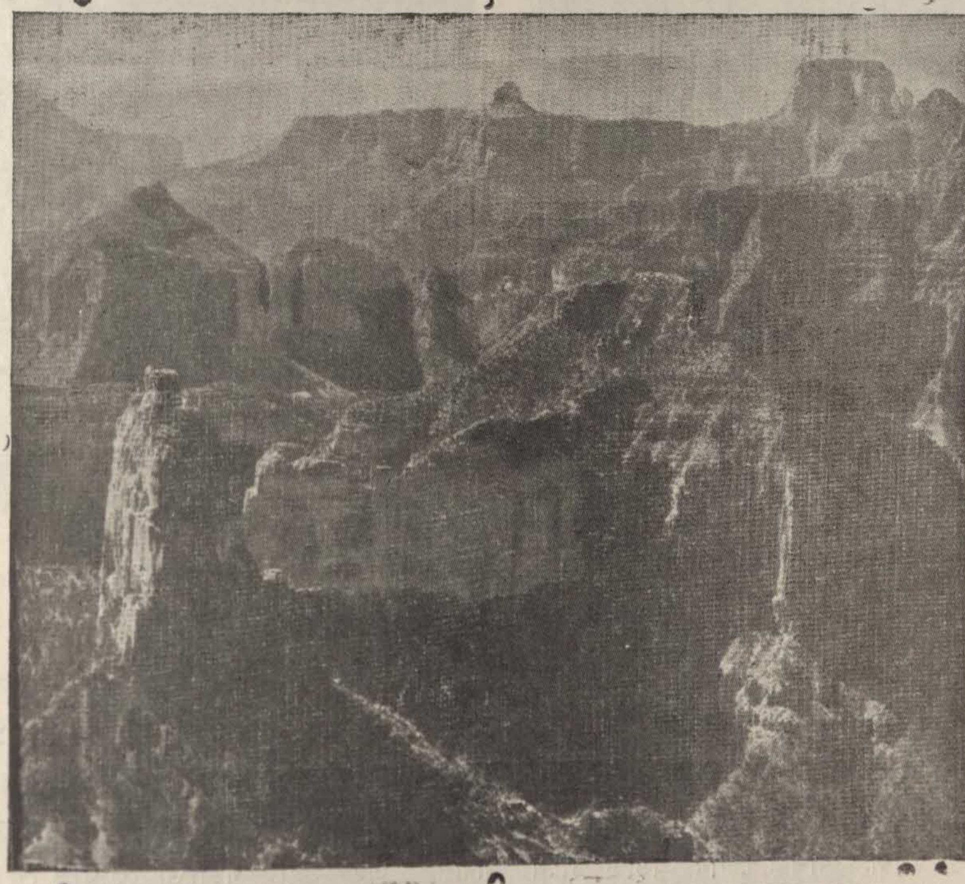
পর্বতের ঢালু গাত্রে বরফ জমে বেশী ভারী হলে একদিন ধস নামে। তার ফলে অনেক সময়ে বহু জনপদ ধ্বংস হয়ে যায়, বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। এই বরফের ধসকে বলা হয় অ্যাভালাঁশ (avalanche)। অ্যাভালাঁশকে হিমানীসম্প্রপাতও বলে। অ্যাভালাঁশ থেকেই হিমবাহ বা তুষার-নদীর সৃষ্টি।

॥ গ্রাণ্ড ক্যানিয়ন ॥

কলোর‍্যাডো (Colorado) উত্তর আমেরিকার পশ্চিম দিকের একটি নদী। গ্র্যাণ্ড ও গ্রীন নামের তুইটি নদীর মিলনে উৎপন্ন। দৈর্ঘ্য ৩,২২০ কিলোমিটার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরিজোনায় কলোর‍্যাডো নদী এক অদ্ভুত প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৃষ্টি করেছে। এই নদী বহু লক্ষ বৎসর ধরে আরিজোনার মালভূমির নরম পাথরকে ক্ষইয়ে ক্ষইয়ে একটা গিরিখাতের সৃষ্টি করেছে। তার ফলে গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন-এর সৃষ্টি। গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন দেড়-তুই থেকে সাতাশ-আটাশ কিলোমিটার পর্যন্ত চওড়া। আর প্রায় ২ কিলোমিটার পর্যন্ত গভীর।

॥ গুহা ॥

গুহা বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, পর্বতের ছোট বড় গুহা। সেই সব গুহায় আদিম যুগের মানুষেরা বাস করত। সেই সব গুহা যুগে যুগে সাধু-সন্ন্যাসীদের তপস্যার স্থল। দক্ষিণ আফ্রিকার কয়েকটি গুহায় দশ লক্ষ বছর আগেকার মানুষের জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। বেলজিয়াম, জার্মানি, ইটালি, ফ্রান্স, স্পেন, চীন প্রভৃতি দেশের বহু গুহায় আদিম যুগের মানুষদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র ও নানা জিনিস পাওয়া গেছে। অনেক গুহায় আদিম যুগের লোকেদের আঁকা প্রাচীরচিত্র দেখা গেছে। ভারতের অজন্তা গুহার অভ্যন্তরে প্রায় তু'



আরিজোনার গ্র্যাণ্ড ক্যানিয়ন

হাজার বছর আগেকার আঁকা বহু বিস্ময়কর চিত্র আছে। ইলোরা গুহায় বহু মূর্তি দেখা যায়।



অজন্তার গুহা নং ১৭—রাহুল ও তাহার মাতা যশোধরা

কিন্তু মাটির তলায় বহু কিলোমিটারব্যাপী গুহার সন্ধান পাওয়া গেছে। উত্তর আমেরিকার কেনটাকি, ভার্জিনিয়া, আরাকানসাস, মিসৌরী, ডাকোটা, উইসকনসিন, টেক্সাস এবং মেক্সিকো, পোল্যাণ্ড, মরক্কো, ইরান, যুগোস্লাভিয়া অষ্ট্রিয়া, আয়ার্ল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, স্পেন, প্রভৃতি স্থানে অসংখ্য গুহা বর্তমান। চুনা পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে বেশির ভাগ গুহার সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন যুক্ত-রাষ্ট্রের অন্তর্গত কেনটাকির ম্যামথ কেভ অতি বিস্ময়কর গুহা। এর মধ্যে নদী, বিস্তীর্ণ প্রান্তর, খুব লম্বা লম্বা ঘাস, নানা কীটপতঙ্গ, চিংড়ি মাছ, বাদুড় প্রভৃতি দেখা যায়। গুহাটি আঁকা বাঁকা পথে



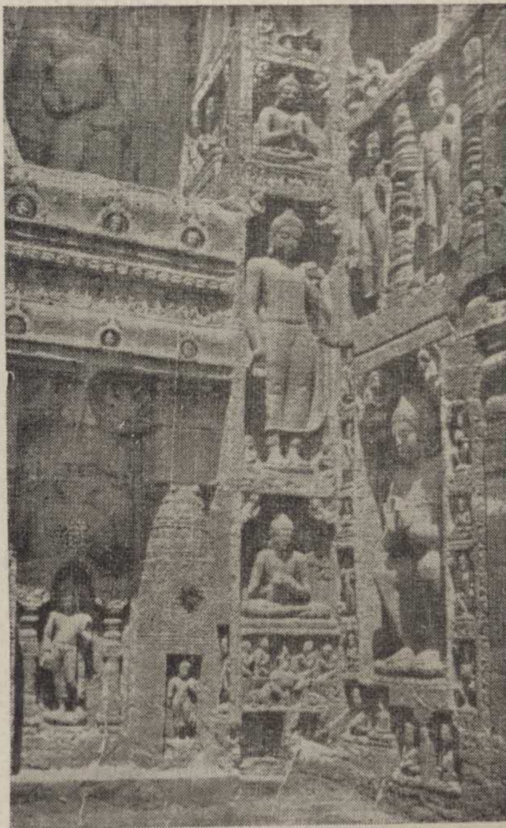
অজন্তার ২৯ নং গুহার চিত্র—নাগরাজ

৩৪১ কিলোমিটার লম্বা। ৬ কোটি বৎসর পূর্বে সৃষ্ট কার্লসবাদ ক্যাভার্নস-এ বহু ৩০৪ মিটার চওড়া ঘর আছে। এই গুহার সব চেয়ে বড় ঘরে ১০টা ফুটবল মাঠ হতে পারে। এই গুহার ছাদের কোথাও কোথাও উচ্চতা ৩০ তলা বাড়ির উচ্চতার সমান। এই গুহার গভীরতা কোথাও কোথাও ৪০২ মিটার। গুহায় ৭৫২ সেন্টিমিটার লম্বা অন্ধ বাগদা চিংড়ি, মাকড়সা, অন্ধ গিরগিটি, ঝিঁঝি পোকা, লক্ষ লক্ষ বাদুড় প্রভৃতি দেখা যায়।

ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা



অজন্তা গুহা নং ১৭— অপ্সরা



অজন্তা গুহা নং ১৯-এর বহির্ভাগের একাংশ



অজন্তা গুহা নং ১৭—ছাদের অলংকরণ

—সর্বত্রই অসংখ্য গুহা বিদ্যমান। কেনটাকির ম্যামথ কেভের নিকটে গ্রেট ওনিক্স কেভ, ভার্জিনিয়ার



অজন্তা গুহা নং ১৯—বুদ্ধদেব, উপদেশ দিবার ভঙ্গীতে

লুজে ক্যাভার্ন, দক্ষিণ ডাকোটার উইণ্ড কেভ, সিসিলির সাইরাকিউজের দি ইয়ার অব ডাইওনিসাস, অস্ট্রেলিয়ার ওরিয়েন্ট কেভ, ইয়র্কশায়ারের জিংলিং হোল ও ভিক্টোরিয়া কেভ, ইংলণ্ডের গুহা Wookey Hole প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ইটালীর নেপলস শহরের নিকটে অবস্থিত ব্লু গ্রটো (Blue Grotto)-র মুখ সমুদ্রের দিকে। জলের উপরে নীল আলো ঝলমল করে বলে এর নাম ব্লু গ্রটো। সারাওয়াক কেভের গুহাকক্ষ সবচেয়ে বড়। লম্বায় ৭০০ মিটার চওড়ায় ৩০০ মিটার, উচ্চতা ৭০ মিটারের উপর।

॥ মরুভূমি ॥

সারা পৃথিবীর নানা দেশে ছোট বড় মরুভূমি



কার্লসবাদ গুহার অভ্যন্তরের স্তম্ভশ্রেণী

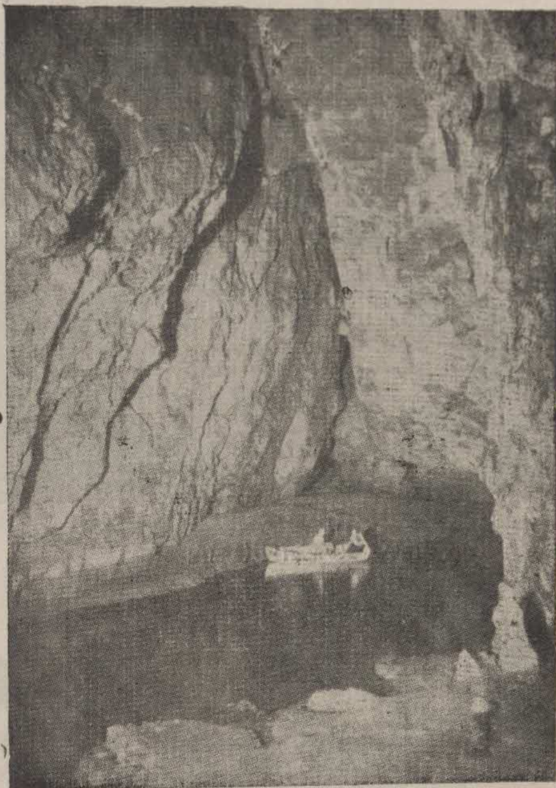
বিরাজিত। বৃক্ষলতাহীন, জলহীন বিস্তীর্ণ বালুকাময় ভূভাগের নাম মরুভূমি (desert)।

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় মরুভূমি আফ্রিকা মহাদেশের সাহারা। কালাহারি, গোবি প্রভৃতি মরুভূমি পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ। ভারতের রাজস্থানের থর মরুভূমি বিখ্যাত।

মরুভূমির উপর দিয়ে লোকে উটে চড়ে দলবদ্ধ ভাবে যাতায়াত করে। সেইসব মরুযাত্রীদের বলা হয় ক্যারাভান। উটকে বলা হয় মরুভূমির জাহাজ।

মরুভূমির আশেপাশে বহু লোক বাস করে।

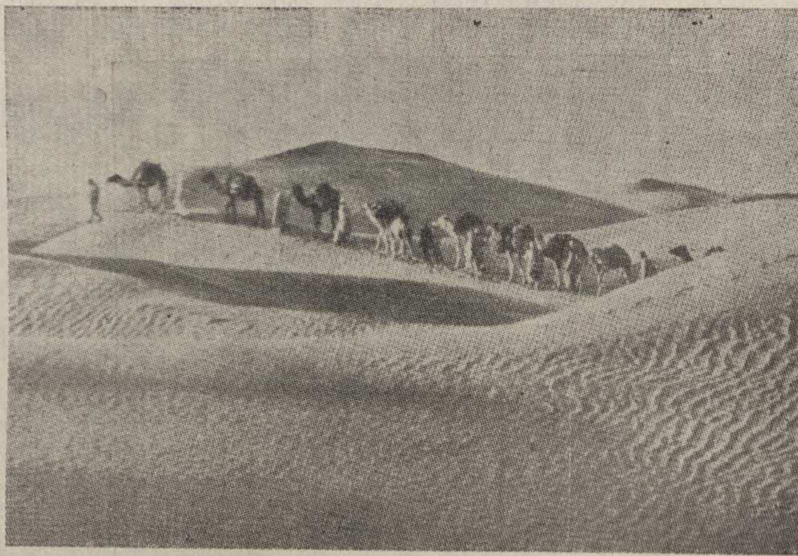
অভ্যন্তরে জল-বৃক্ষ-সমন্বিত স্থান কোথাও কোথাও থাকে। সেই স্থানকে বলা হয় ওয়েসিস (মরূদ্যান)।



ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত গুহা Wookey Hole



সাহারা মরুভূমির বালিয়াড়ি বা বালির স্তূপ



মরুভূমিতে উটের সারি (ক্যারাভান)



সুণ্ডা প্রণালীর ক্রাকাতোয়া দ্বীপে আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড অগ্ন্যুদ্গার (১৮৮৩ খ্রী.)



শীতকালে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় গেলে দেখা যায়, সেখানকার দীঘিটা পাখিতে ভরে গেছে। গরমের সময় আর তাদের দেখা যায় না। এই সব পাখি শীতকালের শুরুতে বহু দূর জায়গা থেকে উড়ে এখানে আসে। গরম পড়তে শুরু করলে আবার উড়ে যেখানকার পাখি সেখানে চলে যায়।

সারা পৃথিবীতে একরকম শীত বা গরম পড়ে না। পৃথিবীর উত্তর দিকে শীতকালে প্রচণ্ড শীত পড়ে। বরফে সে-সব জায়গা ঢেকে যায়। সেই সময়ে সেখানকার পাখিরা প্রচণ্ড শীত এড়াতে যে-সব দেশে শীত কম পড়ে, সেই সব স্থানে শীতকালটা কাটাতে যায়। শীতকালে থাকবার জায়গা থাকে না, খাদ্য পাওয়া যায় না। তাই যে-সব দেশে শীতকালে থাকবার জায়গা পাওয়া যায়, খাদ্যের অভাব হয় না, সেই সব দেশে পাখিরা উড়ে আসে। এদের বলে পরিযায়ী (migratory) পাখি বা অভিবাসনকারী পাখি।

সাইবীরিয়া, মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয় ভূমি, বৈকাল হ্রদের ধারের জায়গা, তিব্বতের উপত্যকা, উত্তর হিমালয়ের দুর্গম পাদদেশ, পশ্চিম আলাস্কা, চীনের মালভূমি প্রভৃতি জায়গা থেকে পরিযায়ী পাখির দল ভারতের নানা স্থানে উড়ে আসে। শুধু আলিপুরের চিড়িয়াখানায় নয়, কালিন্দী নদীর ধারে, মুর্শিদাবাদে পদ্মার চরে, সাহেবখালির চরে, সুন্দরবন এলাকার বনবাদাড়ে, গোসাবা থানার নদীর ধারে, আরও নানা জায়গায় পাখির দল আসে।



ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি শীত কাটাতে গরম দেশের জলায় এসেছে

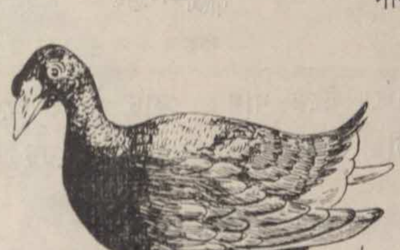
॥ অতি বিচিত্র পাখির ক্ষমতা ॥

ছোট ছোট পাখি। নরম পালকে ঢাকা শরীর। গায়ে তাদের সামান্যই জোর। অথচ তারা হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে উড়ে আসে। অনেক সময় তাদের তিব্বতের উপর দিয়ে হিমালয় পার হয়ে আসতে হয়। তারপর গরম পড়তে শুরু করলে আবার তারা তাদের পুরনো জায়গায় ফিরে যায়। তাদের দিক্ ভুল হয় না, জায়গা চিনে নিতেও অসুবিধা হয় না। অতি বিচিত্র এই সব পাখির ক্ষমতা।

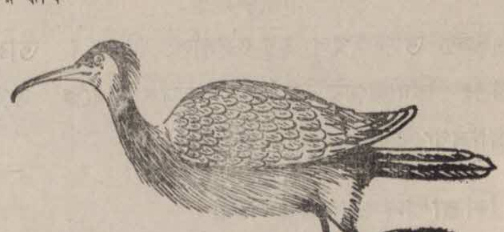
সারা পৃথিবী জুড়ে এই সব পাখির আনাগোনা। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, ভারতের নানা জায়গা, দক্ষিণ ইউরোপ, পশ্চিম আফ্রিকা, মালয়েশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ইন্দোনেশিয়া, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, সাহারা মরুভূমির ওয়েসিসসমূহ প্রভৃতি নানা জায়গায় পরিযায়ী পাখির দল শীত কাটাতে আসে।



পরিযায়ী পাখিদের ঝাঁক



পানমোরগ



করমোরাণ্ট (পানকৌড়ি)

বুনো হাঁস, মরাল, খৈরি পানমোরগ, বাচকা, করমোরাণ্ট, জলপিঁপি, সুরখিয়া, গাংচিল, চকাচকী, স্টর্ক, মানিকজোড়, কাণ্ঠুঁটি প্রভৃতি নানা পাখির দল ভারতের নানা জায়গায় শীতকালটা কাটিয়ে যায়।

খৈরি



খৈরি

॥ হুইসলিং টিলস ॥

হুইসলিং টিলস (whistling teals) বা শরাল আকাশ দিয়ে দল বেঁধে উড়ে আসবার সময় কলরব করতে থাকে। মনে হয় তারা যেন শিস দিচ্ছে।



মানিকজোড়

এইজন্য তা'দের বলা হয় হুইসলিং টিলস। তারা উত্তর হিমালয়ের দুর্গম পাদদেশ থেকে উড়ে আলিপুরের চিড়িয়াখানায় আসে।

॥ নিরাপদ স্থানে আসা ॥

সাইবীরিয়া থেকে কম্ব পাতিহাঁস, গিনটেল, গ্যারগেনে বা গিরিয়া প্রভৃতি পরিযায়ী পাখিরা



গাংচিল

শীতের শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের নানা নিরাপদ স্থানে এসে পৌঁছয়। তারপর এপ্রিল-মে মাসে উড়ে যে যার জায়গায় ফিরে যায়। নিরাপদ স্থান বলতে এমন সব জায়গাকে বোঝায়; যে-সব জায়গায় তাদের প্রাণহানির সম্ভাবনা নেই, খাদ্যের অভাব হয় না। তারা দল বেঁধে বিকেলের দিকে



স্টর্ক

খাদ্যান্বেষণে উড়ে যায়। ছোট পাখি হলে কি হবে, তারা তাদের নিরাপত্তা ভালো করেই বোঝে।

॥ গোল্ডেন প্লোভার ॥

গোল্ডেন প্লোভার দক্ষিণ-পুর্ব সাইবীরিয়া ও পশ্চিম আলাস্কার পাখি। তারা শীত কাটায় প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। কোথায় সাইবীরিয়া ও আলাস্কা, কোথায় হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ! এত দূর থেকে পাখিরা ঠিক উড়ে আসে, গরম পড়তে শুরু হলে ফিরেও যায়।

রঙিন পানকৌড়ি, বনঘুঘু, মালয়ী বক, মরাল, নীলশিরা, সাহেব বুলবুল, হরিয়াল, কালিজ ফেজাণ্ট, পাহাড়ী তিতির : সাইবীরিয়া, মানস সরোবরের ধারের জায়গা, বৈকাল হ্রদের ধারের



সাহেব বুলবুল

বনভূমির পাখি। তারা ভারতের নানাস্থানে উড়ে আসে।

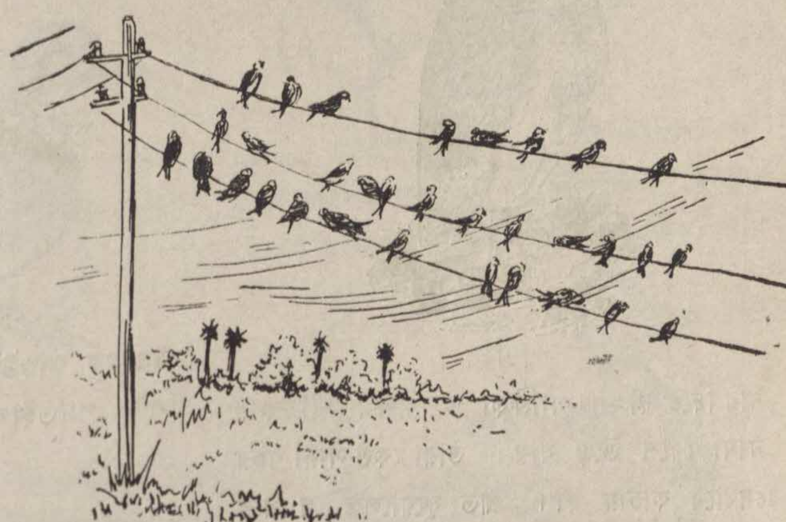
তারা শীতপ্রধান দেশের পাখি। শীত ফুরোলেই যে যার নিজের জায়গায় ফিরে যাবে। তাই তারা বাসা বাঁধে না। সাধারণতঃ কাকের বাসায় ডিম



কোকিল



হরিয়াল



পরিযায়ী পাখিরা টেলিগ্রাফের তারে বসেছে

॥ কোকিল ॥

কোকিলকে বলা হয় বসন্তের পাখি। তারা শীতকালে এদেশে আসে। শীত ফুরোলে আকাশকে কুহুতানে ভরিয়ে দিয়ে তাদের জায়গায় ফিরে যায়।

পাড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা বাসা থেকে কাকের ডিম ফেলে দিয়ে নিজের ডিম রেখে যায়।

বসন্তকালে কোকিলের ডাক শোনা যায়। তার পরে আর শোনা যায় না। তবে কিছু কিছু

কোকিল এদেশে থেকে যায়। কেউ কেউ দেরিতে ফেরে। তার ফলে বসন্তের পরেও তাদের ডাক শোনা যায়।

॥ হুইটোর পাখি ॥

হুইটোর পাখিকে গ্রীনল্যাণ্ডের দক্ষিণ উপকূল ভাগ থেকে উড়ে প্রায় দু' হাজার মাইল দূরের স্পেনের উপকূলে যেতে দেখা গেছে।

॥ সোয়ালো ॥

ইউরোপীয়ান সোয়ালো ও অন্যান্য অনেক ধরনের পাখি জিব্রাল্টার পেরিয়ে সাহারা মরুভূমির



তিতির

ধার দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা ও পশ্চিম আফ্রিকার নানা দেশে উড়ে যায়। তারা কেউ সারা বছর সেখানে কাটায় না। শীত ফুরোলেই যে যার জায়গায় ফিরে যায়। অবশ্য ফেরবার সময় যে পথ ধরে এসেছিল প্রায় সময়েই সেই পথ ধরে না গিয়ে অন্য পথে সাহারা মরুভূমির উপর দিয়ে যায়।

॥ আর্কটিক টার্ন ।

আর্কটিক টার্নও দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়। তারা আটলান্টিক মহাসাগরের অনন্ত জলরাশির উপরের আকাশপথ দিয়ে ১৬/১৭ হাজার কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। ফিরেও যায় সেই পথ দিয়ে। কি করে যে সীমাহীন জলরাশির উপরের আকাশ-পথ ধরে যায়, এতটুকু দিক্ ভুল হয় না, তা ভাবলে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

॥ পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ॥

পরিযায়ী পাখি অনেক রকমের—আট হাজারেরও বেশী। গ্যানেট, স্লাইলার, স্টার্লিং,



স্নেকবার্ড (গয়ার)

লিটল অক, স্যাণ্ডউইচ টার্ন, স্নেকবার্ড, ল্যাপউইগ, ব্রাহ্মণী, পাতিহাঁস, ওয়াক্সউইঙ্গ, শীরওয়াস্টার,



বাচকা (বক্কা)

ওয়ার্বলার, হামিং বার্ড প্রভৃতি নানা নাম সে সব পাখির।

ইংল্যাণ্ডের সোয়ালো পাখিরা স্পেন ও ফ্রান্সের সোয়ালো পাখিদের সঙ্গে মিশে পশ্চিম আফ্রিকায় শীত কাটাতে যায়। ফেরবার সময় ফ্রান্সের পাখি ফ্রান্সে চলে যায়, স্পেনের সোয়ালো স্পেনে যায়, আর ইংল্যাণ্ডের সোয়ালো ইংল্যাণ্ডের পল্লী-অঞ্চলে চলে যায়। কারো নিজের নিজের দেশ ও জায়গা চিনে নিতে ভুল হয় না।

॥ বাওয়ার বার্ড ॥

বাওয়ার বার্ড বলে এক ধরনের নীলচে ধরনের পাখির বাড়ি পূর্ব অস্ট্রেলিয়া। তারা খুব সুন্দর বাসা তৈরি করতে পারে। শুধু তৈরি করা নয়,



বুনোহাঁস

সেই বাসাকে সুন্দরভাবে সাজায়। অথচ এই যে সাধের বাসা তাকেও ফেলে তারা উড়ে চলে যায়। আবার ফিরে এসে বাসা বাঁধে। সারা জীবন ধরেই তারা বাসা তৈরি করে।

॥ পাখিদের পরিযানের প্রমাণ ॥

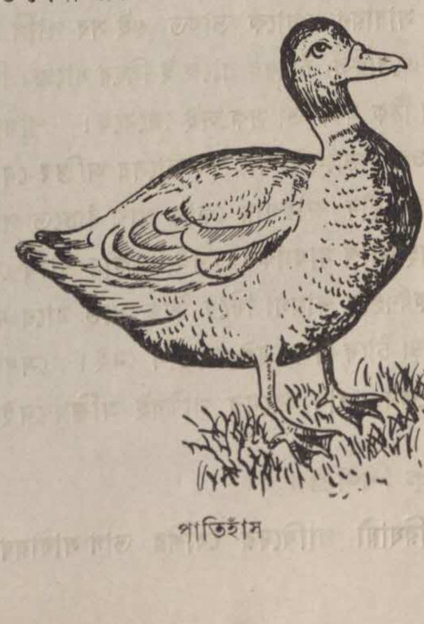
ইংল্যাণ্ডের পল্লী-অঞ্চল থেকে যে সোয়ালো পাখি শীতের শুরুতে পশ্চিম আফ্রিকার পথে পাড়ি দিয়েছিল, তারা যে গরম পড়বার পর তাদের ঠিক নিজের নিজের জায়গায় ফিরে যায়, তার প্রমাণ সংগ্রহ করা হয়েছে। লণ্ডনের কয়েকজন সাংবাদিক নানাভাবে পরীক্ষা করে অব্যর্থ প্রমাণ পেয়েছেন।

আগেকার দিনে উদয়পুরের লেকে যে সব পাখি নামত। রাজকুমারেরা তাদের পায়ে খুব ছোট আংটি বেঁধে দিতেন। সেই আংটির মধ্যে নাম ঠিকানা লেখা ছোট কাগজ পুরে দেওয়া হত।



রাজকুমার পাখির পায়ে আংটি পরাচ্ছেন

সেই পাখিকে ধরে দিতে পারলে পুরস্কার দেওয়ার কথাও লেখা থাকত। এই ধরনের অনেক পাখি



পাতিহাঁস

উত্তর ইংল্যাণ্ড থেকে ধরে লোকে পুরস্কার লাভ করেছে।

॥ কত উঁচু দিয়ে ওড়ে ॥

পরিযায়ী পাখিরা সাধারণতঃ তিন চার হাজার মিটার উপর দিয়ে উড়ে যায়। তবে তার চেয়েও উঁচুতে অনেক পাখির ঝাঁককে উড়ে .যতে দেখা গেছে। পাঁচ, দশ, পনের, কুড়ি হাজার মিটার উপর দিয়েও পাখিরা উড়ে যায়।

॥ কত বেগে ওড়ে ॥

এই সব পাখি সাধারণতঃ ঘণ্টায় কুড়ি থেকে তিরিশ কিলোমিটার বেগে উড়ে যায়। কোন কোন সময়ে তাদের আরও বেশী বেগে উড়ে যেতে লক্ষ্য করা গেছে।

॥ চাঁদ থেকে আসে না ॥

পড়ন্ত রৌদ্রে রাঙা বা চাঁদের আলোয় ঝলমল আকাশ দিয়ে পরিযায়ী পাখিরা উড়ে যাবার সময় সাধারণ লোকে ভাবত, ওই সব পাখি চাঁদ থেকে এসেছিল, চাঁদের রাজ্যেই ফিরে যাচ্ছে। কিন্তু তা যে ঠিক নয়, তা সকলেই জেনেছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়ালেই আর বাতাসের অস্তিত্ব নেই। সেই বায়ুহীন জায়গায় কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। মহাকাশে মাধ্যাকর্ষণ নেই। কোন পাখি সেই মাধ্যাকর্ষণহীন জায়গা দিয়ে উড়ে যেতে পারে না। তা ছাড়া চাঁদে জল নেই, বাতাস নেই। সেখানে পাখি কেন, কোন ধরনের প্রাণীরই অস্তিত্ব নেই।

॥ দিক্ নির্ণয় ॥

পরিযায়ী পাখিদের বেশির ভাগ সাধারণতঃ রাত্রে ওড়ে। তারা অকূল সমুদ্র, নিবিড় অরণ্য, অনন্ত মরুভূমি, বিশাল পর্বতশ্রেণীর উপরের আকাশপথে কি করে দিক্ ঠিক করে, তা রীতিমতো বিস্ময়ের ব্যাপার। অনেক ভেবে বিজ্ঞানীরা এই



জলপিঁপি

ধারণার বশবর্তী হয়েছেন যে, তারা সূর্য ও তারার অবস্থান দেখে দিক ঠিক করে।

জার্মানির প্ল্যানেটেরিয়ামে পরিযায়ী পাখি ছেড়ে দেখা গেছে, সে-সব পাখি আকাশের তারা চিনে পথ ঠিক করে।

॥ পরিযায়ী প্রাণী ॥

শুধু পাখি নয়, প্রজাপতি, হরিণ, বল্গাহরিণ, মাছ, পঙ্গপাল, বাইসন, সীল প্রভৃতি বহু প্রাণী পৃথিবীর এক ধার থেকে আর এক ধারে পরিযাণ করে।



পরিযায়ী বল্‌গাহরিণের পাল



পরিযায়ী পেঙ্গুইনের ঝাঁক

॥ পরিযায়ী প্রজাপতি ॥

পরিযায়ী প্রজাপতির পরিযাণ সব চেয়ে বিস্ময়কর। মনার্ক প্রজাপতি নামে এক ধরনের প্রজাপতি কানাডায় ও উত্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাদের আশ্রয়স্থলে ডিম পেড়ে মেক্সিকো, ফ্লোরিডা, টেক্সাস, কালিফোর্নিয়া প্রভৃতি স্থানে উড়ে যায়। সাধারণতঃ একা ওড়ে। তারা আগের জায়গায় আর ফিরে যেতে পারে না। কালিফোর্নিয়ায় কোন কোন গাছ হাজার হাজার প্রজাপতিতে ছেয়ে যায়।

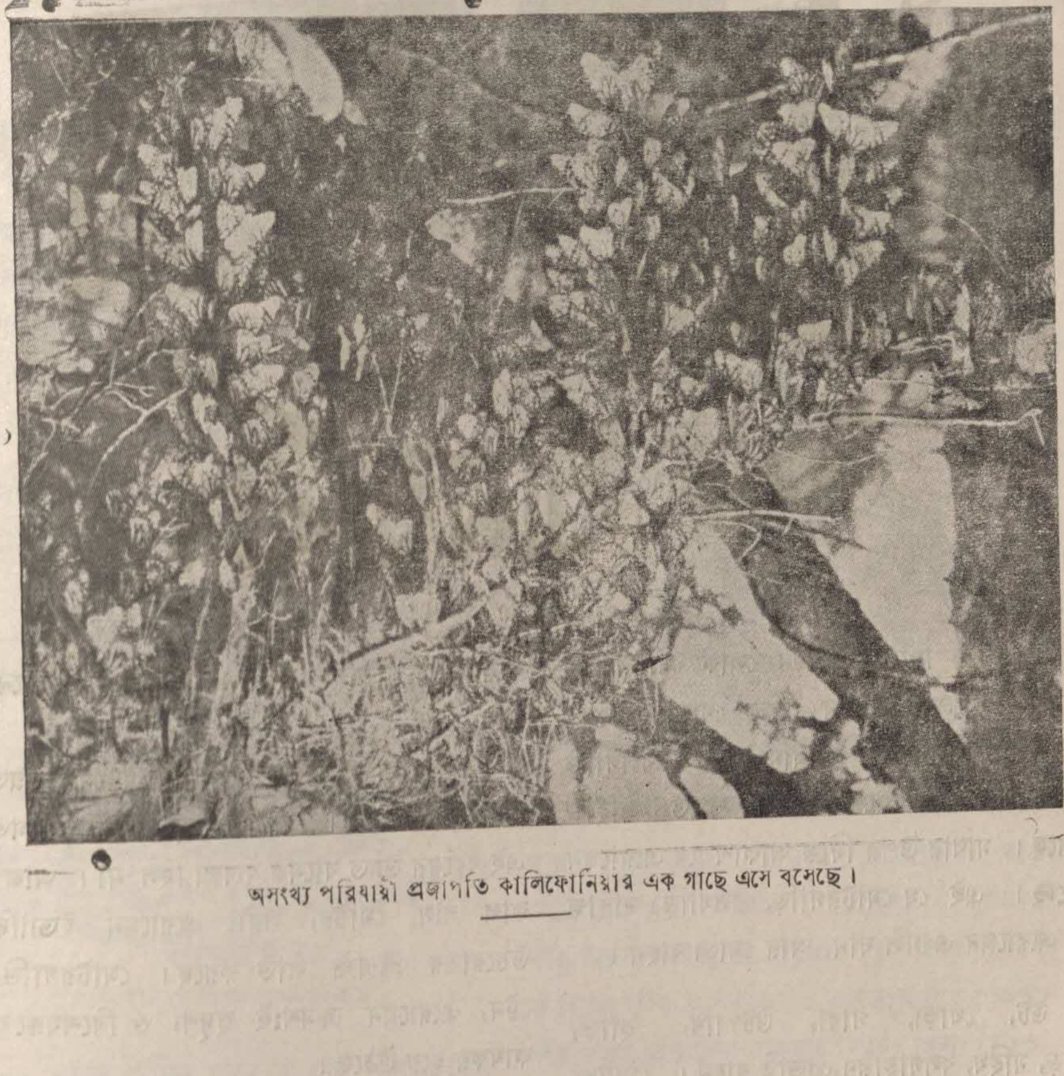
সব চেয়ে আশ্চর্যজনক ব্যাপার এই যে তারা যে সব ডিম পেড়ে এসেছিল, তা থেকে প্রজাপতির সৃষ্টি হলে সেগুলি তাদের পূর্বপুরুষরা যে দেশে যে গাছে গিয়ে বসেছিল সেই সেই জায়গাতেই যায়। এ এক রকম অবিশ্বাস্য অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু প্রতি বৎসরই তাই ঘটে। ছোট ছোট প্রজাপতিদের দূর দূর জায়গায় উড়ে যাওয়ার কথা তবু ভাবা যায়, কিন্তু কি করে ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে সেই বাচ্চারা তাদের পূর্বপুরুষদের পরিযাণ-পথ ধরে উড়ে যায় ও যে গাছে তারা বসেছিল, ঠিক ঠিক সেই গাছেই উড়ে গিয়ে বসে, বিজ্ঞানীরা সহস্র চেষ্টা করেও তার প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারেন নি।

হরিণেরা দল বেঁধে তাদের জায়গা ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সেই রকম যায় হাজার হাজার রকমের মাছ, বাইসন, সীল প্রভৃতি। তবে তারা পাখিদের ন্যায় অত দূরে যায় না এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পাখিদের মতো আগেকার জায়গায় ফিরে যায় না।

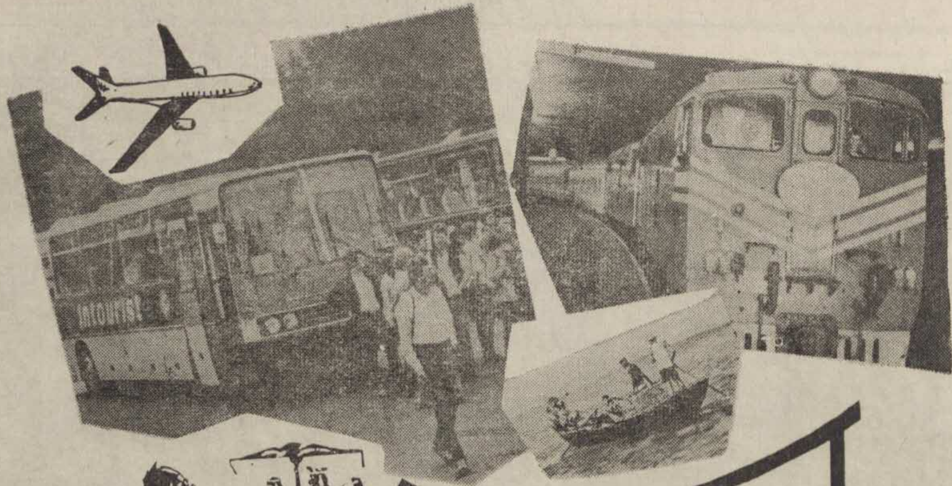
পরিযায়ী পাখিই হোক, আর অন্য জীবজন্তু হোক, তারা প্রধানতঃ শীত ও খাদ্যাভাবের জন্য সাময়িকভাবে স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র যায়।



মাছের পরিযাণ



অসংখ্য পরিযায়ী প্রজাপতি কালিফোর্নিয়ার এক গাছে এসে বসেছে।





যানবাহন

রাজপথ দিয়ে একজন লোক মোটরগাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, একজন যাচ্ছে ঘোড়ায় চড়ে। পাশেই রেললাইন। সেখান দিয়ে রেলগাড়ি চলেছে। তার পাশে নদী। তাতে জাহাজ চলছে। মাথার উপর দিয়ে আকাশপথে এরোপ্লেন যাচ্ছে। এই যে মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, জাহাজ বা এরোপ্লেন এগুলি যান, আর ঘোড়া বাহন।

উট, ঘোড়া, গাধা, উটপাখি, হাতি, ষাঁড়, মহিষ, বল্গাহরিণ প্রভৃতি বাহন। মোটর-গাড়ি, লরী, বাস, জাহাজ, ট্রেন, এরোপ্লেন, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, উটে-টানা গাড়ি, বাই-সাইকেল, মোটরবাইক, নৌকা, ডোঙা, শালতি, কায়াক, উমিয়াক, ক্যানো, গণ্ডোলা, হেলিকপটার প্রভৃতি যান।

সময় সংক্ষেপ করার জন্যে ও পরিশ্রম কমাবার জন্যে লোকে যানবাহন ব্যবহার করে। যানবাহনে করে মানুষ যাতায়াত করে, মালপত্র বহন করানো হয়।

এ যুগে পৃথিবীর সব দেশে নানা ধরনের উন্নত যান চলাচল করে। মাত্র শ' দুই বছর আগেও এই ধরনের উন্নত যানের ব্যবস্থা ছিল না। আজ-কাল বাস, মোটর, লরী, এরোপ্লেন ইত্যাদি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। মোটরগাড়ি, ট্রেন, এরোপ্লেন ক্রমশঃই সুদৃশ্য ও বিশেষরূপে কার্যকর হয়ে উঠছে।

আগেকার দিনে স্থলপথে লোকে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হেঁটেই যেত। জলপথে অবশ্য নৌকার প্রচলন অনেক দিন আগের। ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, মিশর প্রভৃতি দেশে বহুকাল আগেই নৌকার প্রচলন শুরু হয়েছে।

॥ পায়ে হেঁটে পর্যটন ॥

প্রসিদ্ধ ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo, ১২৫৬-১৩২৩ খ্রী.) ভারতবর্ষ,

চীন ও অন্যান্য দেশ পর্যটন করেছিলেন পায়ে হেঁটেই। তীর্থযাত্রীরা দূরদূরান্তরের মঠ-মন্দিরে হেঁটেই যেতেন। তাঁরা কত দুর্গম পথ অতিক্রম করে তাঁদের গন্তব্যস্থলে পোঁছতেন।

আজকাল দেশের একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে লোক সহজে, নিরাপদে, কম পরিশ্রমে ও কম সময়ে পোঁছে যায়। পথের দূরত্ব যতই হোক, তাদের গন্তব্যস্থলে পোঁছবার কোন চিন্তা নেই।

॥ পৌরাণিক যানবাহন ॥

যানবাহনের কথা বলতে গেলে মনে পড়ে যায়, পৌরাণিক কালের দেবদেবীদের যানবাহনের



নারদমুনি ঢেঁকিতে চড়ে যাচ্ছেন

কথা। নারদ মুনির বাহন বা যান ছিল ঢেঁকি। ঢেঁকিতে চড়ে তিনি আকাশপথে যাতায়াত করতেন। সূর্যদেব সাতটা ঘোড়ায়-টানা সোনার রথে ভ্রমণ করেন। মহাদেবের বাহন ষাঁড়, দুর্গাদেবীর বাহন সিংহ, শীতলা দেবীর বাহন গাধা, গণেশের বাহন ইঁদুর, লক্ষ্মীদেবীর বাহন পেঁচা, মরাল সরস্বতীর বাহন, কার্তিকের ময়ূর, গঙ্গা দেবীর মকর ইত্যাদি। গ্রীক পুরাণে বলে, মিনার্ভার বাহন পাখাওয়ালা চটিজুতা, ব্যাকাসের বাহন চিতাবাঘ। শুধু হিন্দু বা গ্রীক পুরাণে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশের পুরাণে দেবদেবীদের নানা বাহনের কথা বলা হয়েছে।

॥ ঘোড়া ॥

যে সব জন্তুকে লোকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে তাদের মধ্যে ঘোড়া খুব জোরে চলে ও প্রভু-ভক্ত। লোকে ঘোড়ায় চড়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে



ঘোড়ার পিঠে মানুষ

যায়। যুদ্ধ করে। ঘোড়ায় চড়ে দৌড় বা ঘোড়-দৌড় তো খুব জনপ্রিয় ও প্রসিদ্ধ। দিগ্বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের ঘোড়ার নাম ছিল বিউসে-ফ্যালাস (Bucephalus)। প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুত বীর রাণা প্রতাপের ঘোড়ার নাম ছিল চৈতক। চৈতক রণক্ষেত্র থেকে প্রতাপকে নিয়ে পলায়নের সময় এক পাহাড়ী নদী পার হতে গিয়ে মৃত্যুবরণ করে। তার রং ছিল নীলচে।

॥ হাতি ॥

হাতিতে চড়ে শিকারে যাওয়া, যুদ্ধে যাওয়া, শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করা আগেকার দিনে সংগতিপন্ন লোকেদের মধ্যে বেশ প্রচলন ছিল। আগেকার দিনের মতো তত অধিক মাত্রায় না

হলেও আজকালও লোকে ভারত, থাইল্যাণ্ড,



হাতির পিঠে মানুষ

শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশে হাতিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

॥ গাধা ॥

লোকে গাধায় চড়ে ও তাতে মোট চাপিয়ে স্থান থেকে স্থানান্তরে যায়। ধোপাদের মধ্যেই গাধার ব্যবহার বেশী।

॥ উট ॥

রাজস্থান, আরব, মঙ্গোলিয়া, উত্তর আফ্রিকা, আরব উপদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে লোকে উটের পিঠে চড়ে যাতায়াত করে। ওই সব দেশে উটকে দিয়ে মাল বহন করানো হয়। আরব, রাজস্থান প্রভৃতির মরু অঞ্চলে উটই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাহন।



উটের পিঠে বেদুইন



উটপাখির পিঠে বালক

॥ উটপাখি ॥

আফ্রিকায় লোকে, বিশেষ করে ছেলেমেয়েরা উটপাখিকে বাহন হিসাবে ব্যবহার করে। উট পাখির পা সরু সরু হলেও তাতে খুব জোর। মানুষকে পিঠে নিয়ে উটপাখি খুব দ্রুত ছুটতে পারে।

॥ স্লেজ গাড়ি ॥

সুমেরুপ্রদেশের লোকে যে গাড়িতে করে বরফের উপর দিয়ে যাতায়াত করে তাতে চাকা লাগানো থাকে না। বলগাহরিণ বা কুকুরের দল



বল্‌গাহরিণে-টানা স্লেজ গাড়ি

সেই গাড়ি বরফের উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। বরফ পিছল বলে চাকা না থাকলেও গাড়ির চলাচলে অসুবিধা হয় না। এই গাড়ির নাম স্লেজ (sledge) গাড়ি।

॥ ট্রাভয় ॥

উত্তর আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা এক ধরনের গাড়ির ব্যবহার করে। তাতে চাকা লাগানো নেই। গাড়িটাকে দেখতে একটা সাধারণ মইয়ের ন্যায়। কুকুর ও ঘোড়ায় এই গাড়ি টানে। সেই গাড়িতে মাল চাপানো হলে কুকুরে বা ঘোড়ায় টানতে থাকে। গাড়িটার শেষের দিক্ মাটিতে ঘষটাতে থাকে। লোকেও এইভাবে গাড়িটাকে টেনে



ঘোড়ায়-টানা ট্রাভয়

নিয়ে যায়। অবশ্য, বর্তমানে এই ধরনের গাড়ির তেমন প্রচলন নেই। এর নাম ট্রাভয় (travois)।

॥ গাড়ির চাকা ॥

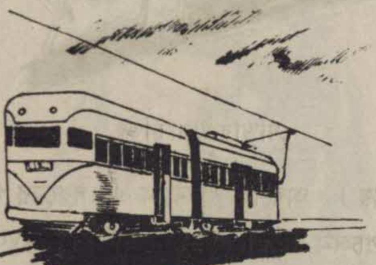
আজকাল সব দেশে গাড়ি মাত্রেরই চাকা আছে। চাকা লাগানো গাড়ির প্রচলন অনেক হাজার বছর আগেও ছিল। আগে চাকা ছিল নিরেট গোল চাকতি। পরে চাকাকে হালকা করার জন্য তাতে পাখি (spoke)-র ব্যবস্থা করা হয়। মহেন-জো-দরোর সভ্যতা অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর আগেকার। মহেন-জো-দরোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে নিরেট চাকা পাওয়া গেছে। ৩২০০ বছর আগে ট্রয়ের যুদ্ধে পাখিওয়ালা চাকা



চাকার বিবর্তন

লাগানো রথ ব্যবহার করা হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে যে-সব রথ ব্যবহার করা হত,

সে-সবে নিরেট ও পাখিওয়ালা চাকা লাগানো থাকত। পাটনার জাদুঘরে একটা পাখিওয়ালা চাকা আছে। সেটা ২২০০ বছর আগেকার। অনেক জাদুঘরে পাখিওয়ালা চাকা লাগানো রথ বা নিরেট চাকা-লাগানো রথ পাথরে খোদাই করা অবস্থায় দেখা যায়।



ট্রামগাড়ি

চাকা আবিষ্কারের পর থেকে লোকে নানা-রকমের গাড়ি ব্যবহার করে আসছে। সাইকেল,



দু' ঘোড়ায়-টানা সেকালের রথ

রিকশা, মোটর-সাইকেল, স্কুটার, মোটরগাড়ি, লরী, বাস, টেমপো, রেলগাড়ি ট্রামগাড়ি, গরুর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি ইত্যাদি সব গাড়িতেই চাকা লাগানো থাকে।

ঠেলা-গাড়িতে সাধারণতঃ যে চাকা লাগানো থাকে, তাতে পাখিওয়ালা কাঠের চাকার উপর লোহার বেড় পরানো থাকে। আজকাল কোথাও



চাকায় বেড় পরানো

কোথাও তাতে হাওয়া-ভরা টায়ার ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

মোটরগাড়ি, বাস, লরী, টেমপো, স্কুটার, সাইকেল, মোটর সাইকেল প্রভৃতিতে হাওয়া-



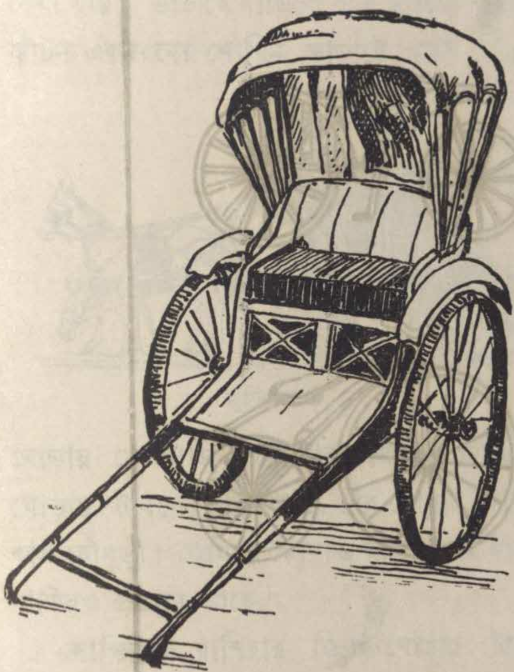
ঠেলা গাড়ি

ভরা টায়ার লাগানো থাকে। ট্রামগাড়ি, রেলগাড়ির চাকা লোহার।

॥ রিকশা ॥

'জিনরিকশা' জাপানীদের দেওয়া নাম। জিন (মানুষের) রিকি (জোরে), শা (গাড়ি)।

সাধারণতঃ রিকশা গাড়ি মানুষে টানে। সাইকেলের সাহায্যে যে রিকশা চলে তার নাম সাইকেল-



হাতে-টানা রিকশা

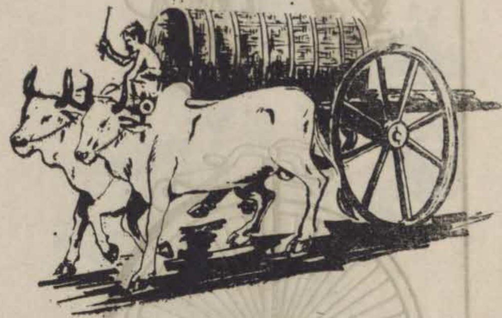
রিকশা। জাপান, চীন, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ফিলি নজ, থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া প্রভৃতি দেশে রিকশা ও সাইকেল-রিকশা চলে। মানুষে-টানা রিকশার প্রচলন কমে আসছে। সব জায়গায় সাইকেল রিকশা বেশী চলে।

॥ ভিলোসিপীড ॥

জার্মানিতে দেড়শ' বছর আগে সাইকেলের চলন শুরু হয়। তখন তার নাম ছিল ভিলোসিপীড (velocipede)। এই ভিলোসিপীডের চেহারা ছিল অদ্ভুত। তার পিছনের চাকাটা ছোট, সামনের চাকাটা খুব বড়। অবশ্য, নানা সময়ে এই ভিলোসিপীডের নানা পরিবর্তন ঘটে। ক্রমে ক্রমে দুটো চাকাই সমান হয়ে বর্তমানের সাইকেলের রূপ পায়।

॥ গরুর গাড়ি ॥

গরুর গাড়ি জোড়া বলদে টানে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে এখনও গরুর গাড়ি চলে। তাতে করে



গরুর গাড়ি

মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। লোকে ছইওয়ালা গরুর গাড়িতে করে যাতায়াত করে।

॥ ঘোড়ার গাড়ি ॥

ঘোড়ার গাড়ির চলন আগে কলিকাতায় ও ভারতের অন্যান্য শহরে খুব বেশী ছিল। এখন শহরাঞ্চলে ঘোড়ার গাড়ি বড় একটা দেখা যায় না।



এক্কা গাড়ি

ঘোড়ার গাড়ির আকার নানা রকমের—ব্রুহাম, ল্যাণ্ডো, বগি ইত্যাদি। কলকাতায় আজও দু-



নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সাইকেলের উদ্ভব

চারটে ঘরের মতো চেহারার পালকি ঘোড়ার গাড়ি দেখা যায়। ভাড়াটে গাড়িকে বলে ছ্যাকড়া গাড়ি। ফীটন একধরনের শৌখিন ভাড়াটে গাড়ি। এক



জুড়ি গাড়ি

ঘোড়ায় যে গাড়ি টানে তার নাম এক্কা গাড়ি, দু ঘোড়ায় টানলে জুড়ি গাড়ি, চার ঘোড়ায় টানলে বলে চৌঘুড়ী। কোথাও কোথাও ছয় ঘোড়ায় টানা গাড়িরও প্রচলন আছে।

সোভিয়েট রাশিয়ার তিন ঘোড়ায় টানা ঘোড়ার গাড়ির নাম ট্রইকা (troika)। পৃথিবীর নানা দেশে নানা ধরনের ঘোড়ার গাড়ি আজও দেখা যায়।

আগেকার দিনে রাজা বা জমিদারেরা বহু ঘোড়ার গাড়িতে করে যেতেন। ধনী লোকের বিয়েতে ত্রিশ-চল্লিশটা ঘোড়ায় টানা গাড়ি ব্যবহার করা হত।

॥ ভেলা ॥

হাজার হাজার বছর আগে লোকে ভেলায় করে জলপথে যাতায়াত করত। গাছের লম্বা গুঁড়ি বা কাটা কলাগাছ সাজিয়ে ভেলা তৈরী হয়। তার উপরে চড়ে লোকে সাধারণতঃ নদী পার হয়। বেহুলা তাঁর মৃত স্বামী লখিন্দরকে নিয়ে যে কলাগাছের ভেলায় করে নদীপথে যাত্রা করেছিলেন, তার নাম মান্দাস। লম্বা বাঁশের লগি দিয়ে জলের তলার মাটিতে খোঁচা দিয়ে ভেলা চালানো হয়।

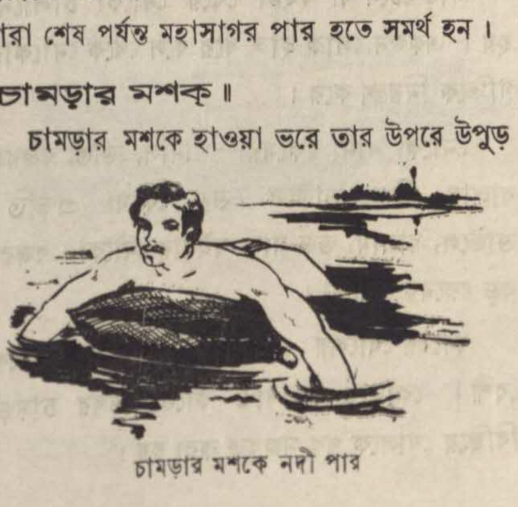


ভেলা

কন-টিকি নামে একটা ভেলায় চড়ে দু'জন দুঃসাহসী লোক বছর কয়েক আগে নরওয়ে থেকে যাত্রা করে প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়। তাঁদের এই অভিযান নানা দুঃসাহসিক কাহিনীতে ভরা। মহাসাগরের উপর দিয়ে যাবার সময় তাঁদের শার্ক, সামুদ্রিক সাপ প্রভৃতির আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাতে হয়েছিল। অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁরা শেষ পর্যন্ত মহাসাগর পার হতে সমর্থ হন।

॥ চামড়ার মশক্ ॥

চামড়ার মশকে হাওয়া ভরে তার উপরে উপুড়



চামড়ার মশকে নদী পার

হয়ে শুয়ে দু'হাত দিয়ে জল টেনে কোথাও কোথাও লোকে নদী পার হয়। এই ধরনের মশকের সাহায্যে বাদশাহ্ হুমায়ুন গঙ্গা পার হয়ে প্রাণ বাঁচান। তিনি যুদ্ধে হেরে গিয়ে পলায়নের সময় এক ভিস্তিওয়ালা তার মশকের সাহায্যে তাঁকে নদী পার করিয়ে দেন।

॥ নৌকো ॥

পৃথিবীর সর্বত্র কয়েক সহস্র বৎসর আগে থেকে নানা ধরনের নৌকোর প্রচলন হয়। আজও নৌকোর প্রচলন সর্বত্রই দেখা যায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পালতোলা নৌকো ব্যবহার করা হয়। নৌকোর মাঝখানে পোঁতা একটা উঁচু খুঁটি, যার নাম মাস্তুল, তাতে ক্যানভাসের পাল টাঙ্গানো হয়। সেই পালে হাওয়া লাগে। সেই হাওয়ার জোরে নৌকো চলে।

প্রাচীন মিশরে প্যাপাইরাসের ফালি দিয়ে পাল তৈরী হত। প্রাচীন চীনে মাদুর বুনে পাল তৈরি করা হত। আজকাল নাইলনের পাল ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

দাঁড় টেনে বা বইঠা বেয়ে নৌকো চালানো হয়। একজন লোক হাল ধরে বসে থেকে নৌকোর গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

নৌকো নানা রকমের—পানসি, ডিঙি, বজরা, বালাম, ছিপ, ভাউলে, ভড়, কোষা প্রভৃতি। ভাউলে, বালাম, ভড় মাল বইবার নৌকো। বজরা বড় ধরনের নৌকো।

কাঠের খোলের নৌকোর চলনই সব দেশে বেশী। কোথাও কোথাও কাঠের উপর চামড়া বিছিয়ে খোলকে খুব মজবুত করা হয়।

কোথাও কোথাও নৌকোর উপর লোকে বাস করে। কাশ্মীরে অনেক নৌকো-বাড়ি দেখা যায়। চীনের ক্যান্টনে, ইটালির ভেনিসে বহু লোক নৌকোয় বাস করে।

॥ খেয়া নৌকো ॥

নদী পারাপারের নৌকোকে সাধারণতঃ খেয়া নৌকো বলে। আজও ভারতের নানাস্থানে খেয়া নৌকোর বেশ চলন দেখা যায়। যে ঘাট থেকে নৌকো ছাড়ে তাকে বলে খেয়া ঘাট।

॥ গহনার নৌকো ॥

সাধারণতঃ বাংলাদেশে বড় বড় ভাড়াটে নৌকো করে অনেক যাত্রী একসঙ্গে নদীপথে যাতায়াত করে। নৌকোর উপর দরমার ছই থাকে। এই ধরনের নৌকোকে বলে গহনার বা গয়নার নৌকো।

॥ কায়াক ॥

সুমেরু অঞ্চলের এস্কিমোরা কাঠ ও তিমির হাড় সীল-এর চামড়া দিয়ে মুড়ে এক ধরনের নৌকো করে যাতায়াত করে, সীল ও সিন্ধুঘোটক শিকারে বেরোয়। এই নৌকো খুব হালকা ও দ্রুতগামী। অবশ্য, এই নৌকোয় ভারী বোঝা চাপানো চলে না। সাধারণতঃ একজন লোক মাত্র এতে বসে যেতে পারে। এই নৌকোর নাম কায়াক (kayak)।

॥ উমিয়াক ॥

বড় ধরনের নৌকো যাতে করে এস্কিমোরা মালপত্র, পরিবারের লোকজন নিয়ে যাতায়াত করে তার নাম উমিয়াক (umiak)।

॥ ক্যানু ॥

উত্তর আমেরিকার ও নিউজীল্যাণ্ডের নদীপথে একধরনের চামড়ার খোলের হালকা নৌকো দেখা



নদীতে ক্যান্থ

যায়। রেড ইণ্ডিয়ানরা এই নৌকো ব্যবহার করে। এর নাম ক্যান্থ (canoe)। ক্যান্থ বেশ লম্বা হয়। তাতে পাল টাঙ্গানোও থাকে। তাতে করে রেড ইণ্ডিয়ানরা মালপত্র বয়, লোকেরা যাতায়াত করে।

। ডোঙা ও শালতি ।

আমাদের দেশে গ্রামাঞ্চলে ডোঙা ও শালতির প্রচলন দেখা যায়। খালে-বিলে লগি দিয়ে ঠেলে এই ডোঙা ও শালতি চালানো হয়। ডোঙা সাধারণতঃ তালগাছের গুঁড়ির এক ধারটা খুদে



ডোঙা

ফেলে তৈরী হয়। শালতি কাঠের লম্বা নৌকো। এর তলা চেপটা। এতে পাল, ছই কিছু থাকে না।

॥ গুন-টানা নৌকো ॥

নদীপথে দাঁড় বেয়ে নৌকো চালাতে অসুবিধা হলে লোকে নৌকোতে দড়ি বেঁধে সেই দড়ি ডাঙার উপর দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। এই দড়ির নাম গুণ। এভাবে নৌকো চালানোকে বলে গুণ টানা।



গুন-টানা নৌকো

সুদূর পল্লী অঞ্চলে আজও অনেক ক্ষেত্রে গুন-টানা নৌকো দেখা যায়।

॥ গণ্ডোলা ॥

ইটালির ভেনিসকে খালের শহর বলা চলে। জলপথে যাতায়াতের জন্যে সেখানে যে নৌকো ব্যবহার করা হয় তার নাম গণ্ডোলা (gondola)। একজন লোক গণ্ডোলা চালায়। যাত্রীরা মাঝখানে বসে।



ভেনিসের গণ্ডোলা



মে-ফ্লাওয়ার জাহাজ

॥ কলম্বাসের পাল-তোলা জাহাজ ॥

কলম্বাস স্পেন থেকে বেরিয়ে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছান। তিনি যে তিনটি জাহাজে করে যান তাদের নাম সান্তা মেরিয়া, পিণ্টা ও নিনা। এগুলিকে জাহাজ বলা হলেও আসলে পাল-তোলা বড় নৌকো। সে-সব নৌকোকে হাওয়া আর স্রোতের জোরে চলতে হত।

॥ মে-ফ্লাওয়ার ॥

১৬২০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর ১০১ জন ইংরেজ পিউরিটান একটা পাল-তোলা নৌকোয় করে হল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করে, ৪ঠা ডিসেম্বর ম্যাসাচুসেটসের প্লিমাথে পৌঁছায়। তারা দণ্ড এড়াবার জন্যে হল্যাণ্ডের নির্বাসিত জীবন ত্যাগ করে যাত্রা



কলম্বাসের জাহাজ

করে। পাল-তোলা নৌকো হলেও সেটি মে-ফ্লাওয়ার (May-flower) জাহাজ নামে প্রসিদ্ধ। এই ১০১ জন যাত্রীকে বলা হয় Pilgrim Fathers।

॥ রোমকদের জাহাজ ॥

রোমকরা আগেকার দিনে দোতলা, তিনতলা বড় নৌকো ব্যবহার করত। দোতলা নৌকোকে বলা হত বাইরীম (bireme), তিনতলা নৌকোকে বলা হত ট্রাইরীম (trireme)। কোথাও কোথাও ছ'তলা নৌকোরও প্রচলন ছিল। এ সব নৌকো খুব লম্বা ছিল। তাতে প্রায় দুশো দাঁড় থাকত।

॥ বাষ্পীয় জাহাজ ॥

নৌকো চলে মানুষ, হাওয়া আর স্রোতের জোরে। তাতে নৌকো তত দ্রুত যায় না। মানুষের পরিশ্রমও বেশী হয়। তাই মানুষ ভেবে চিন্তে বাষ্পের জোরে নৌকো চালাবার উপায় বার করল। বাষ্পীয় শক্তিতে নৌকো চালাতে চালাতে লোকে বাষ্পশক্তিতে জাহাজ চালাবার ব্যবস্থা করল।

॥ ক্লারমণ্ট ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের চিত্রকর রবার্ট ফুলটন (Robert Fulton, ১৭৬৫ ১৮১৫ খ্রী.) একটি বাষ্পীয় জাহাজ তৈরি করালেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে হাডসন নদীতে সেটি ৩২ ঘণ্টায় ২৪১ কিলোমিটার অতিক্রম করল। এর নাম ক্লারমণ্ট (Clermont)। এটিকে অবশ্য জাহাজ না বলে স্টীমার বলাই ভালো।

॥ এণ্টারপ্রাইজ ॥

যে বাষ্পীয় জাহাজ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ১১৩ দিনে কলকাতায় এসেছিল, তার নাম এণ্টারপ্রাইজ (Enterprise)। যখন জাহাজটি কলকাতায় এসে পৌঁছোয় তখন তাকে দেখতে বহু লোক সমবেত হয়। তাতে বাষ্পীয় এঞ্জিন বসানো ছিল, আবার পাল টাঙ্গানোও ছিল।

॥ গ্রেট ওয়েস্টার্ন ॥

গ্রেট ওয়েস্টার্ন (Great Western) নামে যে বাষ্পীয় পোত ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে তাতে শুধু বাষ্পীয় এঞ্জিনই ছিল, পাল টাঙ্গানোর ব্যবস্থা ছিল না।

॥ গ্রেট ব্রিটেন ॥

'গ্রেট ব্রিটেন' (Great Britain) জাহাজের খোল ছিল লোহার। আর তার পিছন দিকে স্ক্রু-প্রোপেলার ছিল। সেই স্ক্রু-প্রোপেলার ঘুরিয়ে জল কাটানো হত। সেই থেকে সব জাহাজে স্ক্রু-প্রোপেলার লাগানো হয়ে আসছে, আর সব জাহাজের খোল কাঠের পরিবর্তে লোহার বা অন্য কোন ধাতুর পাত দিয়ে তৈরী হয়ে থাকে।

॥ মোটরশিপ ॥

বর্তমানে কয়লা পুড়িয়ে বাষ্প তৈরি করা হয়। পেট্রলের সাহায্যে যে জাহাজের এঞ্জিন চলে তাকে বলে মোটরশিপ। আজকাল বিদ্যুতের সাহায্যে বহু জাহাজ চালিত হয়। কোন কোন জাহাজ পারমাণবিক শক্তিতে চলে।

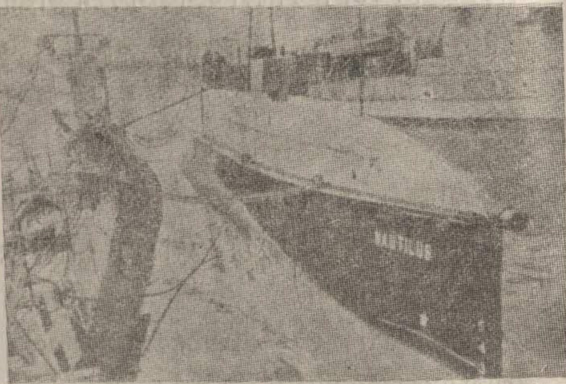
॥ ভাইকিংদের নৌকো ॥

নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্কের জলদস্যুদের বলা হত ভাইকিং (viking)। তারা অষ্টম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত কাঠের নৌকো করে জলপথে দস্যুবৃত্তি করে বেড়াত। ভাইকিংদের নৌকোয় অনেক দাঁড় থাকত।

॥ লম্বা ও বড় যাত্রী-জাহাজ ॥

পৃথিবীর সব চেয়ে লম্বা ও বড় যাত্রী-জাহাজ 'নরওয়ে'। এটি লম্বায় ৩১৫.৬৬ মিটার। এটি ৭০,২০২.১৯ গ্রস টনের জাহাজ। ব্রিটেনের RMS Queen Elizabeth-2 ৬৬,৮৫১ গ্রস টনের জাহাজ। লম্বায় ২৯৩ মিটার।

RMS Queen Elizabeth এক সময়ে বড় যাত্রী-জাহাজ ছিল। এটি লম্বায় ছিল ৩১৪ মিটার ; চওড়ায় ছিল ৩৬ মিটার। এটি ১৯৭৭ সালে প্রায় বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে।



পরমাণুশক্তি-চালিত নটিলাস

॥ যুদ্ধ-জাহাজ ॥

যুদ্ধ-জাহাজ নানা ধরনের—ব্যাটলশিপ, পকেট ব্যাটলশিপ, ডেস্ট্রয়ার, পারমাণবিক জাহাজ, সাবমেরিন, বিমানবাহী জাহাজ প্রভৃতি। বর্তমানে সবচেয়ে বড় ব্যাটলশিপ বা রণতরী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের USS New Jersey। এটি লম্বায় ২৭০ মিটার।

॥ পরমাণুশক্তি-চালিত জাহাজ ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'সাভানা' একটি পরমাণু শক্তি-চালিত যাত্রী-জাহাজ। এটি একদমে তিন লক্ষ মাইল যেতে পারে। মাঝপথে জ্বালানি ভরতে হয় না।

॥ পরমাণুশক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত 'নটিলাস' (Nautilus) একটি পরমাণুশক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ। এটি বরফে ঢাকা মেরু সমুদ্রের মধ্য দিয়ে উত্তরমেরু পার হয়ে গিয়ে এক আশ্চর্য কাণ্ড করে।

'ট্রাইটন' আর একটি বিখ্যাত পরমাণুশক্তি চালিত ডুবোজাহাজ।



পরমাণুশক্তি-চালিত ডুবোজাহাজ ট্রাইটন

॥ পেরিস্কোপ ॥

ডুবোজাহাজ জলের তলায় ডুবে থেকে উপরের পেরিস্কোপের সাহায্যে শত্রুজাহাজ দেখে টর্পেডো ছুড়ে জাহাজ ধ্বংস করতে পারে। বর্তমানে সব শক্তিশালী দেশেরই অনেক ডুবোজাহাজ আছে।

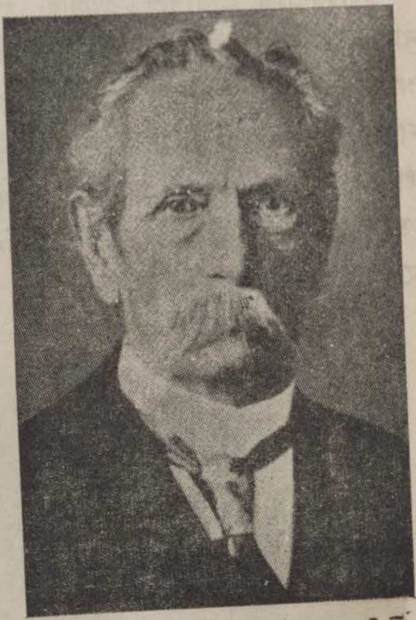
॥ বাষ্প, পেট্রল, ডিজেল ও বিদ্যুতের সাহায্যে গাড়ি চালানো ॥

লোকে সাধারণ ঘোড়ার গাড়ি, গরুর গাড়ি প্রভৃতি ব্যবহারে সন্তুষ্ট না থেকে জলীয় বাষ্প, পেট্রল ডিজেল, বিদ্যুৎ প্রভৃতির সাহায্যে গাড়ি চালাবার ব্যবস্থা করল। স্কুটার, মোটরসাইকেল, টেমপো, মোটরগাড়ি, লরী, বাস প্রভৃতি পেট্রল ও ডিজেলের সাহায্যে চালাবার ব্যবস্থা হল। ট্রামগাড়ি আগে ঘোড়ায় টানত। আজকাল বিদ্যুতের শক্তিতে চলে।

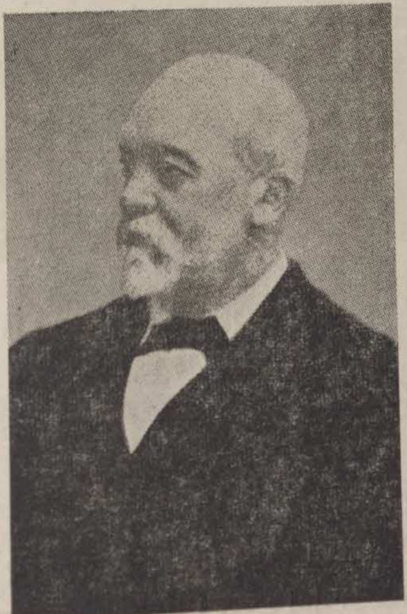
১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় বিদ্যুতের শক্তিতে ট্রাম চলা শুরু হয়। তলায় ট্রামলাইন পাতা থাকে। তার উপর দিয়ে ট্রামগাড়ি চলে। উপরের তার থেকে ট্রলীর মাধ্যমে বিদ্যুৎ এঞ্জিনে পৌঁছে যায়। তার ফলে গাড়ি চলে।

॥ পেট্রল-চালিত মোটরগাড়ি ॥

জার্মান এঞ্জিনীয়ার গটলিয়েব ডেমলার (Gottlieb Daimler, ১৮৩৪-১৮৯০ খ্রী.) ও কার্ল বেনৎস্ (Karl Benz, ১৮৪৪-১৯২৯ খ্রী.) পেট্রল-চালিত মোটরগাড়ি উদ্ভাবন করেন। কার্ল বেন্‌ৎসের উদ্ভাবিত Internal Combustion Engine-চালিত মোটরগাড়ি নূতন যুগের



কার্ল বেন্‌ৎস্



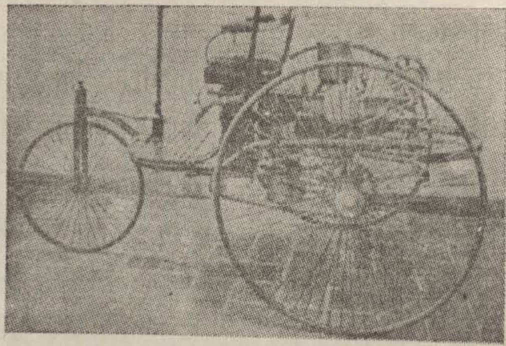
গটলিয়েব ডেমলার



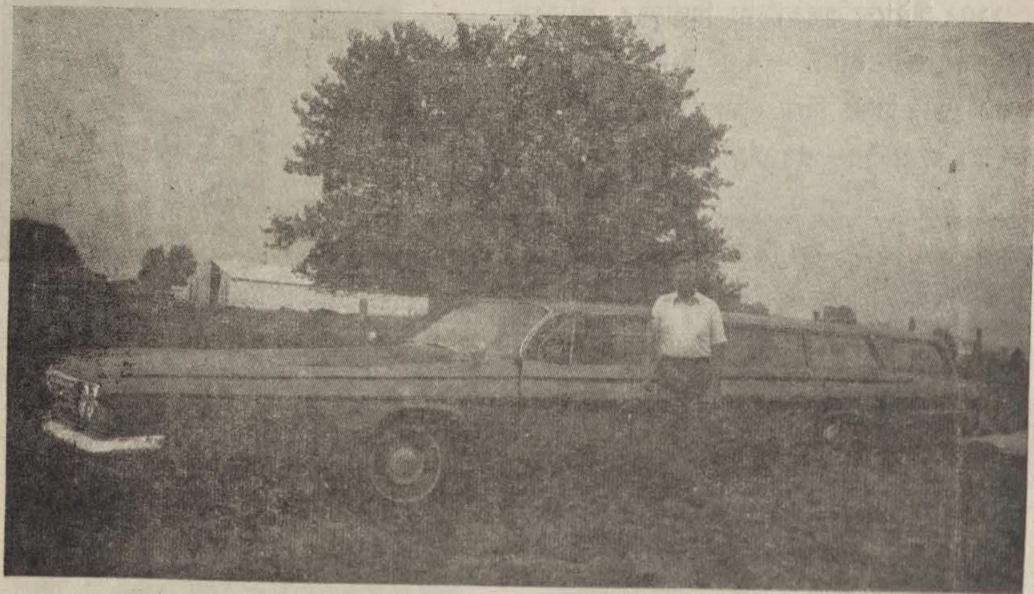
ডেমলারের আবিষ্কৃত মোটরগাড়ি

সূচনা করে। এই এঞ্জিন-চালিত মোটরগাড়ি ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়।

মোটরগাড়ি উদ্ভাবিত হওয়ার পর থেকে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মোটরগাড়ির আকারে ও উৎকর্ষে অনেক উন্নতি সাধিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, ইংলণ্ড, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দেশে নানা ধরনের মোটরগাড়ি তৈরী হয়েছে। ভারতেও মোটরগাড়ি তৈরী হচ্ছে।



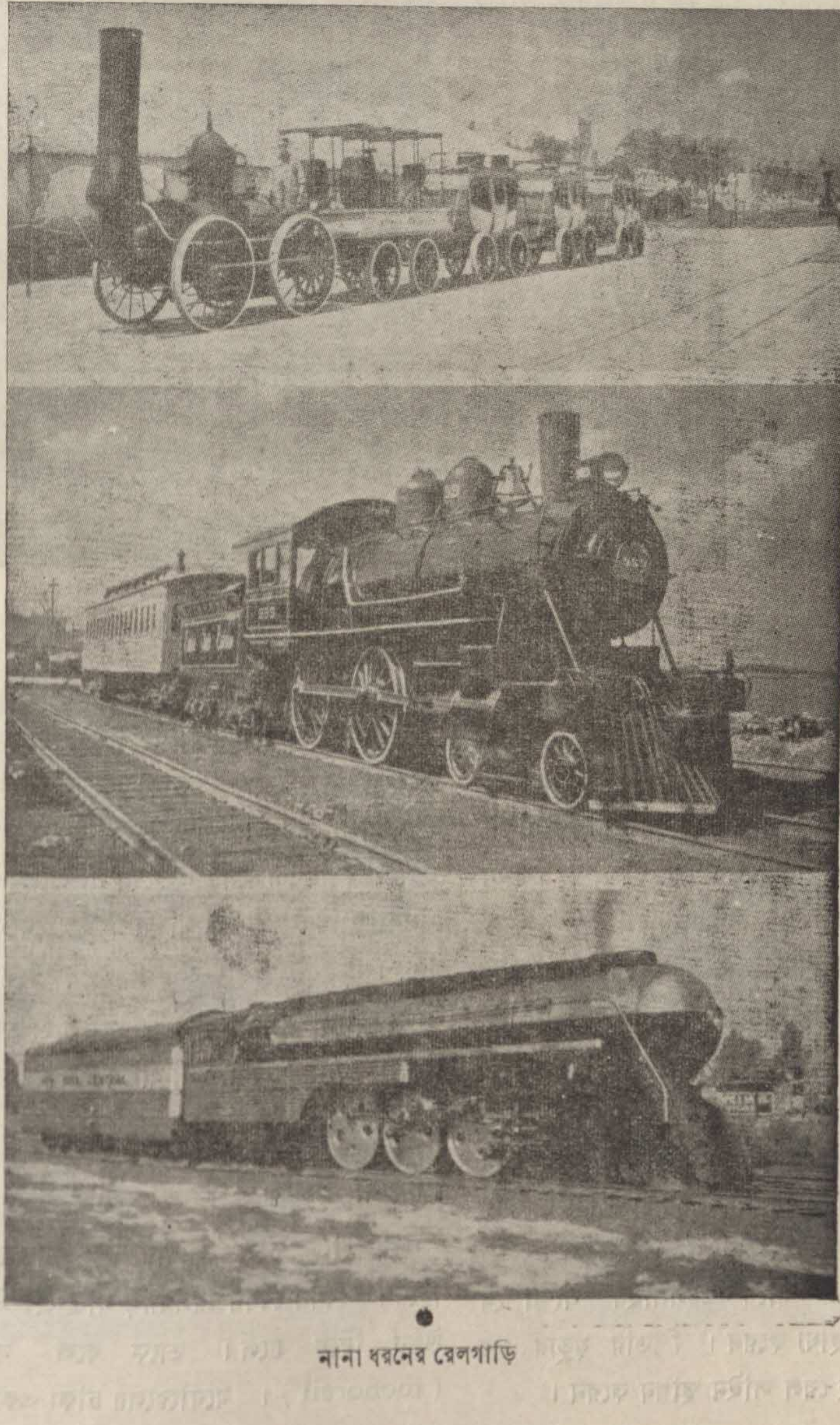
বেন্‌ৎস্‌-এর আবিষ্কৃত মোটরগাড়ি



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মোটরগাড়ি। ১৯৬২ সালে নির্মিত এই শেভ্‌রলে মোটরগাড়িটি লম্বায় ৯·৮৫ মিটার (৩২ ফুট ৪ ইঞ্চি)। ভার্জিনিয়ার মিড্‌লটাউনের রেভারেণ্ড Gerald R. Manning এটি নির্মাণ করান। এর ওজন ২,০৪০ কেজি।

॥ রেলগাড়ি ॥

রেলগাড়ি চলে লোহার রেলের উপর দিয়ে। রেলগাড়ি বাষ্পীয় শক্তিতেও চলে, বিদ্যুতের শক্তিতেও চলে। প্রায় সব উন্নত দেশেই রেলগাড়ি আছে। রেলগাড়িতে করে বেশী লোক একসঙ্গে যাতায়াত করে। রেলগাড়ি করে মালপত্র এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়।



নানা ধরনের রেলগাড়ি



ফুজিয়ামা পর্বতের সামনে দিয়ে চলছে জাপানের এক দ্রুতগামী রেলগাড়ি।

॥ বাষ্প-চালিত এঞ্জিন ॥

জেমস ওয়াট (James Watt, ১৭৩৬-১৮১৯ খ্রী.) ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর উদ্ভাবিত বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের পেটেণ্ট গ্রহণ করেন। জেমস ওয়াট ও তাঁর বন্ধু ম্যাথু বোলটন (Matthew Boulton) বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন। মার্ডক-ও বাষ্পচালিত এঞ্জিন তৈরি করেন।

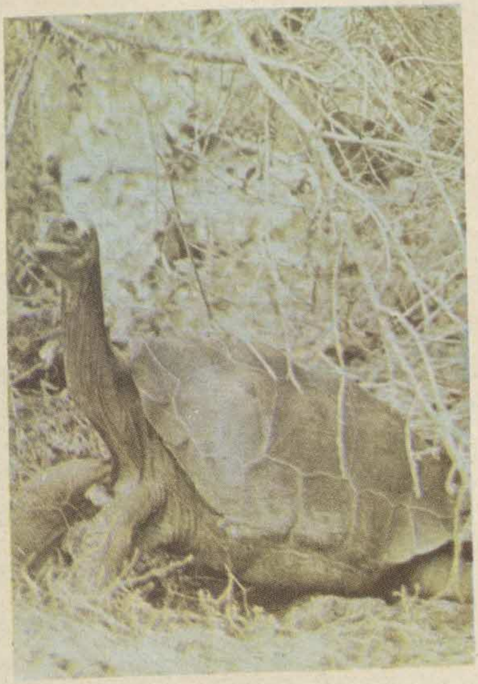
জর্জ স্টিফেনসন (George Stephenson, ১৭৮১—১৮৪৮ খ্রী.) বাষ্প-চালিত এঞ্জিনের সাহায্যে রেলগাড়ি চালাবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর একমাত্র পুত্র রবার্ট (Robert, ১৮০৩-১৮৫৯ খ্রী.) পিতাকে বিভিন্ন স্থানে রেললাইন সংস্থাপনে বিশেষভাবে সাহায্য করেন। পিতার মৃত্যুর পর রবার্ট নিজে বহু রেল লাইন স্থাপন করেন।

প্রথম প্রথম দুর্ঘটনা এড়াবার জন্যে একজন লোক ঘোড়ায় চড়ে পতাকা হাতে রেলগাড়ির আগে আগে ছুটত। পরে সে ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হয়। স্টিফেনসনের রকেট এঞ্জিন-চালিত রেলগাড়ি ঘণ্টায় ৩৫ মাইল পর্যন্ত বেগে ছুটতে থাকে।

বর্তমানে রেলগাড়ির গতি অনেক দ্রুত হয়েছে। অনেক দেশে ১২০।১২৫ মাইল বেগে রেলগাড়ি ছুটে থাকে।

॥ মনোরেল ॥

রেলগাড়ি চলে লোহার দুটি রেলের উপর দিয়ে। কোন কোন রেলগাড়ি মাত্র একটি রেলের উপর দিয়ে চলে। তাকে বলে মনোরেল (monorail)। মনোরেলের চাকা একটার পর



শতবর্ষজীবী কচ্ছপ

প্রশান্ত মহাসাগরের গ্যালাপ্যাগস (Galapagos) দ্বীপপুঞ্জে এক ধরনের খুব বড় কচ্ছপ দেখা যায়। এরা সাধারণতঃ একশ' বছর পর্যন্ত বাঁচে। কোন কোন কচ্ছপের ওজন হয় প্রায় ২১৫ কেজি (৫০০ পাউণ্ড)। এক সময়ে সারা দ্বীপপুঞ্জ এই ধরনের বৃহদাকার কচ্ছপে পূর্ণ ছিল। লোকে, বিশেষ করে নাবিকরা হাজার হাজার কচ্ছপ মেরে এদের প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছে।

[পূর্বপৃষ্ঠার ডান দিকের উপরের ছবি]

টুকান পাখি

দক্ষিণ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান স্থানে টুকান (toucan) নামে এক ধরনের পাখি দেখা যায়। এদের চঞ্চু খুব বড়। তাদের দেখলে মনে হয়, এই পাখি হয়তো ওজনে খুব ভারী। তা নয়, অত বড় চঞ্চু থাকলেও ওই পাখির ওজন বেশী নয়।

টুকান পাখির চঞ্চু বা ঠোঁটের খুব জোর। সেই ঠোঁট দিয়ে তারা শক্ত ফল ভেঙ্গে খায়। বড় ঠোঁট থাকার আর এক সুবিধা গাছের ডালপাতার মধ্যে ঠোঁট প্রবেশ করিয়ে টুকান সহজেই ফল আহরণ করতে পারে।

[পূর্বপৃষ্ঠার বাঁ দিকের উপরের ছবি]

মাকড়সা বানর (spider monkey)

পৃথিবীর নানা দেশে অনেক রকমের বানর দেখা যায়। পূর্বপৃষ্ঠায় যে বানরের ছবি দেখা যাচ্ছে, তার নাম মাকড়সা বানর (spider monkey)। সাধারণতঃ আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এদের দেখা যায়। এরা বেশির ভাগ সময়েই গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়। কদাচিৎ মাটিতে নামে। ফল খেয়ে পেট ভরায়। বাদাম এদের প্রিয় খাদ্য। এদের সারা গা এলোমেলো লম্বা লোমে ঢাকা।

[পূর্বপৃষ্ঠার ডান দিকের নীচের ছবি]

কোয়ালা (koala)

কোয়ালা দেখতে মনে হয়, ছোট খেলনা-ভালুক (teddy bear)। কোয়ালা ভালুক নয়, অন্য পৃথক্ এক ধরনের জানোয়ার। এরা গাছে গাছে ঘুরে বেড়াতে খুব অভ্যস্ত। ইউক্যালিপটাস বা ঐ জাতীয় গাছের পাতা খায়।

অস্ট্রেলিয়া এদের বাসস্থান। এরা উচ্চতায় বড় জোর ০.৬০৯৬ মিটার (২ ফুট)।

[পূর্বপৃষ্ঠার বাঁ দিকের নীচের ছবি]

একটা থাকে। জোড়ায়-জোড়ায় থাকে না। মনোরেল সব দেশে চলে না। এর তেমন চলন নেই।

॥ পাতাল-রেল ॥

মাটির নীচে দিয়ে রেল চালাবার ব্যবস্থা অনেক উন্নত দেশেই হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, স্পেন প্রভৃতি দেশে পাতাল-রেলের ব্যবস্থা আছে। লণ্ডনের পাতাল রেলকে বলে টিউব রেলওয়ে বা আণ্ডার-গ্রাউণ্ড রেলওয়ে। টেমস নদীর তলা দিয়ে যে সুড়ঙ্গ আছে, তার মধ্য দিয়ে রেল চলে। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে এঞ্জিনীয়ার স্যার মার্ক ইসামবার্ড ব্রুনেল (Sir Mark Isambard Brunel, ১৭৬৯-১৮৪৯ খ্রী.)-এর পরিচালনায় টেমস্ নদীর তলায় সুড়ঙ্গ কাটা হয়। পৃথিবীর মধ্যে এই সুড়ঙ্গপথে প্রথম রেল চলে। মস্কোর পাতাল-রেলকে বলে 'মেট্রো'। বর্তমানে কলকাতায় টালিগঞ্জ থেকে দমদম পর্যন্ত পাতাল-রেল চলবার জন্যে রেললাইন পাতা হচ্ছে। ভারতে এইটিই হবে একমাত্র পাতাল-রেল।

॥ এসক্যালেটর ॥

পাতাল-রেলে নামতে গেলে চলমান সিঁড়ি বা এসক্যালেটর (escalator) ব্যবহার করা হয়। এই সিঁড়িতে করে নামতে হয় না, সিঁড়িই যাত্রীদের নিয়ে নেমে যায় ও উপরে উঠে আসে।

॥ আকাশপথে পরিভ্রমণের চেষ্টা ॥

মানুষ ডাঙ্গায় ও জলে চলবার ব্যবস্থা করেই সন্তুষ্ট রইল না। আকাশপথে বেড়াবার কথা ভাবতে লাগল। রামায়ণে যে পুষ্পক রথের কথা লেখা আছে, তাতে করে মাটির মানুষ আকাশপথে সহজে বিচরণ করত। গ্রীক পুরাণেও আকাশে পরিভ্রমণের কথার উল্লেখ আছে। ডীডেলাস ও আইকেরাস পালক জুড়ে জুড়ে ডানা তৈরি করে সাগরের উপরে উড়েছিলেন।

পাঁচশ বছরেরও আগে দান্তে নামে এক বিজ্ঞানী নকল পাখায় ভর করে আকাশে ওড়েন। তিনি একটা বাড়ির উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় পড়ে যান। তাতে তাঁর পা ভেঙে যায়।

অটো লিলিয়েন্থাল (Otto Lilienthal) একরকম পাখা তৈরি করে ওড়ার চেষ্টা করেন। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই আগস্ট পড়ে গিয়ে মারা যান।

॥ বেলুন ॥

ফ্রান্সের জোসেফ মঁগলফিয়ে (Joseph Michel Montgolfier, ১৭৪০-১৮১০ খ্রী.) ও তাঁর ভাই জ্যাক এতিয়েন মঁগলফিয়ে (Jacques Etienne Montgolfier, ১৭৪৫-১৭৯৯ খ্রী.) লক্ষ্য করলেন, অগ্নিকুণ্ডের উপর ছোট কাগজ ফেললে তা উপরে উঠে যায়। তাঁরা বুঝলেন, হাওয়া গরম হলে উপরে ওঠে। তাঁরা একটা খোলামুখ ফানুসের তলায় আগুন জ্বেলে দেখলেন, ফানুসটা গরম হাওয়ায় ভরতি হয়ে ফুলে উঠল এবং উপরে উঠে গেল। তাই দেখে তাঁদের মাথায় বেলুন তৈরির পরিকল্পনা জাগল। তাঁরা ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই জুন প্রথম আকাশে বেলুন ওড়ালেন। ঐ বৎসরের ২১শে নভেম্বর মানুষ বেলুনে চড়ে উপরে উঠতে সমর্থ হলেন।

ঐ বৎসরের ১লা ডিসেম্বর হাইড্রোজেন গ্যাস-ভরা বেলুনে করে মানুষ উপরে উঠে যেতে পারল। তারপর থেকে নানা দেশে নানা

আকারের বেলুন ব্যবহার করা হয়ে আসছে। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে কক্সওয়েল ও গ্লেশিয়ার নামে দু'জন ইংরেজ বেলুনে করে ১১ কিলোমিটার উপরে উঠলেন। পিকার্ড ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বেলুনে চড়ে ১৬ কিলোমিটার উপরে উঠলেন। চার বৎসর বাদে মার্কিন বেলুন 'এক্সপ্লোরার দ্বিতীয়' কয়েকজন বিজ্ঞানীকে ও একটি গবেষণাগার নিয়ে ২২ কিলোমিটার ঊর্ধ্বে উঠল। তারপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অনেক উন্নত ধরনের বেলুন ব্যবহার করা হল।

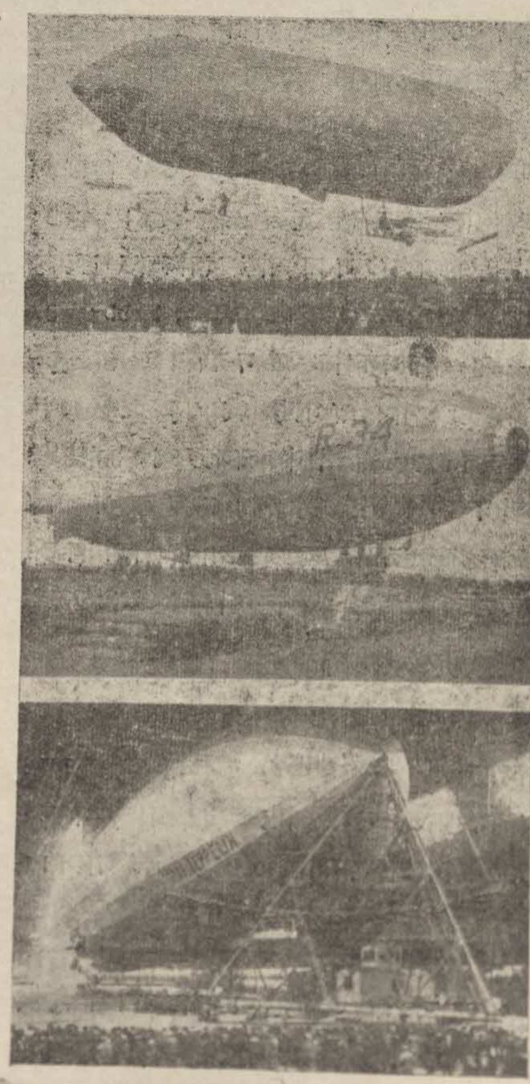
॥ জেপেলিন ॥

বেলুন হাওয়ার উপর নির্ভর করে ওড়ে। শেষে এমন একধরনের বেলুন উদ্ভাবিত হল, যাকে ইচ্ছা-মতো বহু সময় ধরে আকাশে চালানো যাবে। জার্মানীর কাউন্ট ফার্ডিনাণ্ড জেপেলিন বা ৎসেপেলিন (Count Ferdinand Zeppelin, ১৮৩৮-১৯১৭ খ্রী.) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে একটি যন্ত্রচালিত বেলুন তৈরি করলেন। তার নাম দেওয়া হল 'জেপেলিন'। বিরাট চুরুটের মতো তার আকার, কয়েকশ' মিটার লম্বা। তাতে করে কয়েকজন যাত্রী যেতে পারল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জেপেলিনের ব্যবহার হয়েছিল। জার্মানীর গ্রাফ (Graf) জেপেলিন II ছিল লম্বায় ২৪৫ মিটার। কত বড় জেপেলিন কিন্তু তাতে মাত্র ২০ জন যাত্রী বহন করা চলত। ১৯২৯ খ্রী. জেপেলিন প্রায় ২২ দিনে পৃথিবী পরিক্রমা করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'অ্যাক্রন' জেপেলিন লম্বায় ছিল ২৩৮ মিটার। ইংরেজদের তৈরী R-101 জেপেলিন ছিল লম্বায় ২৩৬·৮ মিটার। সেটা অবশ্য আগুন লেগে ধ্বংস হয়ে যায়।

জেপেলিনের চেয়ে বেশী কার্যকর এরোপ্লেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইলবার রাইট (Wilbur Wright, ১৮৬৭-১৯১২ খ্রী.) ও তাঁর ভাই অরভিল রাইট (Orville Wright, ১৮৭১-১৯৪৮



কয়েকটি উন্নত ধরনের জেপেলিন

খ্রী.) অনেক বছর ধরে অনেক চেষ্টা করে এরোপ্লেন তৈরি করেন।

॥ এরোপ্লেন ॥

ফ্রান্সে লুই ব্লেরিয়ট (Louis Bleriot, ১৮৭২-১৯৩৬ খ্রী.), অ্যালবার্টো স্যান্টস ডিউমণ্ট (Alberto Santos-Dumont, ১৮৭৩-১৯৩২ খ্রী.) ও আঁরি ফারম্যান (Henry Farman, ১৮৭৪-১৯৫৮ খ্রী.) প্রভৃতি এরোপ্লেন তৈরি করিয়ে আকাশপথে বিচরণ করেন। তাঁদের দেখাদেখি অনেক দেশেই এরোপ্লেন তৈরি করার ও আকাশপথে বিচরণ করার প্রয়াস শুরু হয়।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় যুদ্ধের প্রয়োজনে জার্মানী, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে নানা উন্নত ধরনের বিমান তৈরী হতে থাকে। অবশ্য আগেকার দিনে মাত্র একজন বিমানে করে যেতে পারত। পরে বেশী লোক ও মালপত্র নিয়ে বিমান আকাশে উড়তে থাকল।



অরভিল রাইট ও উইলবার রাইট



ল্যাংলি



গ্লেন কার্টিস



রিচার্ড ই. বার্ড



অ্যালবার্টো স্যান্টস ডিউমণ্ট



এ. লিণ্ডবার্গ





দুটি উন্নত ধরনের বিমান

॥ বাঙালী বৈমানিক ॥

বাঙালী বৈমানিক ইন্দ্রলাল রায় প্রথম মহাযুদ্ধে যোগদান করে বিমান চালনা করেন। তিনি মেসোপটেমিয়ার এক বিমানযুদ্ধে মারা যান।

বিমানে করে ইংলিশ চ্যানেল পার হলে সারা পৃথিবীতে হইচই পড়ে যায়। পরে বিমানে আটলান্টিক মহাসাগর পার হয়ে বৈমানিকরা অশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্যার আর্থার ব্রাউন (Sir Arthur Brown, ১৮৮৬—১৯৪৮ খ্রী.) ও স্যার জন অ্যালকক (Sir John Alcock, মৃত্যু ১৯১৯ খ্রী.) বিমানে ১৬ ঘণ্টা ১২ মিনিটে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ড থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চার্লস এ. লিণ্ডবার্গ (Charles A. Lindbergh) তাঁর 'স্পিরিট অব সেণ্ট লুই' নামক বিমানে করে একা দুস্তর আটলান্টিক পার হতে সমর্থ হন।

॥ বিমানে পৃথিবী পরিক্রমা ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াইলি পোস্ট (Wiley Post) ও হ্যারল্ড গ্যাটি (Harold Gatty) সাড়ে আট দিনে ১০৬ ঘণ্টায় বিমানে করে সারা পৃথিবী পরিক্রমা করেন।

॥ মেরু পরিক্রমা ॥

রিয়ার-অ্যাডমিরাল রিচার্ড ইভলিন বার্ড (Rear-Admiral Richard Evelyn Byrd, ১৮৮৮—১৯৫৭ খ্রী.) বিমানে সাড়ে পনের ঘণ্টায় উত্তর মেরু ঘুরে আসেন। তিনি ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরুও পরিক্রমা করেন।

॥ যুদ্ধে বিমান-ব্যবহার ॥

বর্তমানে সকল উন্নত দেশে নানা ধরনের বহু উন্নত বিমান তৈরী হয়েছে। তাতে করে একসঙ্গে বহু যাত্রী ও অনেক মালপত্র বহন করানো চলে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, কোরিয়ার যুদ্ধে, ভিয়েটনামের যুদ্ধে, ইজরায়েলের সঙ্গে আরব দেশসমূহের যুদ্ধে ব্যাপকভাবে উন্নত ধরনের বিমান ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব বিমানে শুধু যোদ্ধারাই যায় নি, তাতে করে বহু বিধ্বংসী বোমা বয়ে নিয়ে গিয়ে শত্রুসৈন্য ও শত্রুদেশের উপর ফেলা হয়েছে। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে যে পারমাণবিক বোমা

ফেলা হয় তা বিমানে করেই বয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

।বিমানে যাতায়াত ও ডাক পরিবহন॥

শুধু যুদ্ধের কাজে নয়, বর্তমানে যাত্রী ও মালপত্র বহনের কাজে সব দেশেই ব্যাপকভাবে উন্নত ধরনের বিমান ব্যবহার করা হয়ে থাকে। পূর্বে জলপথে যাত্রার জন্যে জাহাজের ব্যবহার খুব বেশী ছিল, আজকাল বিমানের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। বিমানে করেই আজকাল সব দেশে ডাকের চিঠিপত্র, পার্শেল, সংবাদপত্র, ঔষধপত্র ইত্যাদি বহন করা হয়ে থাকে।

॥হেলিকপ্টার॥

বর্তমানে এক ধরনের বিমান তৈরি হয়েছে যা সোজা উপরে উঠতে বা নামতে পারে, ওঠানামার জন্যে তার বেশী জায়গার দরকার হয় না। আকাশে উঠে তা প্রয়োজনমতো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারে, পাশের দিকে যেতে পারে, পিছু হঠতেও পারে। তার নাম হেলিকপ্টার (helicopter)।

১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম জার্মান হেলিকপ্টার সাফল্যের সঙ্গে আকাশে উঠতে সমর্থ হয়। তার নাম ফক উলফ ৬১ (Focke-Wulf 61)। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভি. এস-৩০০ নামীয় হেলিকপ্টার আকাশ পথে বিচরণ করতে সমর্থ হয়। Igor Sikorsky এই হেলিকপ্টার নির্মাণ করান। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বহু উন্নত ধরনের হেলিকপ্টার নির্মিত হয়েছে। সাধারণতঃ পার্বত্য অঞ্চলে হেলিকপ্টার বিশেষভাবে কাজ দেয়।

॥শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান॥

শব্দের গতি সেকেণ্ডে ৩৩৫ মিটার অর্থাৎ ঘণ্টায় ১২০৭ কিলোমিটার। বর্তমানে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতি বিমান নির্মিত হয়েছে। এর চেয়েও অনেক অনেক বেশী দ্রুতগতিতে বিমান চলাচল করতে সমর্থ হয়েছে। বিমান ঘণ্টায় ৬,৪৪০ কিলোমিটারের চেয়েও বেশী যেতে পেরেছে।

॥রকেট॥

রকেটে করে লোকে পৃথিবী ছাড়িয়ে চাঁদে গিয়ে ফিরে এসেছে। তার গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৩৯,৮৯৭ কিলোমিটার। রকেট শুধু চাঁদের দেশে যায় নি। মানুষ নিয়ে যেতে না পারলেও রকেট শুক্র, সূর্য, মঙ্গল প্রভৃতির দিকে গেছে। পাইওনীয়ার-10 রকেট তো সৌরজগৎ ছাড়িয়ে চলে গেছে ('মহাকাশ অভিযান' দ্র.)।

॥অটো-জাইরো॥

অটোজাইরো (autogiro, autogyro) বলে বিমান ঠিক এরোপ্লেনও নয়, হেলিকপ্টারও নয়। এর মাথায় চিৎ-করা পাখা অর্থাৎ রোটর থাকে, আবার এরোপ্লেনের মতো পাখা অর্থাৎ প্রোপেলারও থাকে। Juan de le Cierva (স্পেন) এর উদ্ভাবক।

। বিভিন্ন যান সম্বন্ধে নানা কথা॥

আনুমানিক ৭২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক মূল ভূখণ্ড থেকে মিলস (Melos) দ্বীপে নৌকোযোগে যাতায়াতের প্রমাণ পাওয়া গেছে। ডেনমার্ক ও ইংল্যাণ্ডের জলাভূমিতে খ্রীষ্টজন্মের আট হাজার বছর আগেকার নৌকোর দাঁড় পাওয়া গেছে।

আনুমানিক ১৫১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের একটি নৌকো মিশরের খুফুর পিরামিডের কাছে মৃত্তিকামধ্যে প্রোথিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। এটি লম্বায় ৪৩·৪ মিটার।

আনুমানিক ২৪৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের একটি জাহাজের ধ্বংসাবশেষ গ্রীসের হাইড্রা দ্বীপের নিকটে পাওয়া গিয়েছে। এটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন নৌকোর নিদর্শন।

সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ২৮৩০ টনের ফরাসী ডেস্ট্রয়ার Le Terrible। ১৯৩৫ খ্রী. ঘণ্টায় ৮৩·৪২ কিলোমিটার বেগে এটি চলেছিল।

সবচেয়ে বড় ৯১,৪০০ টনের মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী জাহাজ USS Nimitz ও Dwight D. Eisenhower লম্বায় ৩৩২ মিটার। ৯ লক্ষ মাইল চলার পর জাহাজ দুটিতে জ্বালানি ভরবার প্রয়োজন হয়। USS Enterprise সবচেয়ে লম্বা যুদ্ধজাহাজ ৩৩৫·৮ মিটার লম্বা।

সবচেয়ে বড় সাবমেরিন USSR Typhoon class code named Oscar। এটি ৩০ হাজার টনের সাবমেরিন। এর দৈর্ঘ্য ১৮০ মিটার।

সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন পারমাণবিক শক্তি-চালিত The Russian Alfa-class সাবমেরিন। ৯১৪·৪ মিটার জলের তলা দিয়ে ঘণ্টায় ৪২ নট বেগে চলতে পারে।

সবচেয়ে বড় তৈল বা খনিজ পদার্থবাহী জাহাজ ১,৩৩,৭৪৮ গ্রস টনের লাইবীরিয় World Gala। দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ মিটার।

সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বরফ ভাঙ্গা জাহাজ রাশিয়ার ২৫,০০০ টনের পারমাণবিক শক্তিতে চালিত আর্কটিকা (Arktika)। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে এটি ৪ মিটার বরফ ভেদ করে উত্তর মেরুতে পৌঁছেছিল।

সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বরফ বিদীর্ণকারী জাহাজ ১,৫০,০০০ টনের ৩০৬·৯ মিটার লম্বা SS Manhattan।

সবচেয়ে লম্বা ক্যানু নিউজীল্যাণ্ডের মাওরিদের ৩৫·৭ মিটার লম্বা ২০ টনের Nga Toki Matawhaorua। ১৯৪০ সালে ৭০ জন লোক দাঁড় বেয়ে ক্যানুটিকে নিয়ে গিয়েছিল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের United States নামীয় জাহাজ ১৯৫২ সালে নিউ ইয়র্ক থেকে যাত্রা করে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে পৌঁছায়। এই জাহাজ প্রথম আটলান্টিক মহাসাগর সর্বাপেক্ষা দ্রুত অতিক্রম করে।

Sealand Commerce নামীয় জাহাজ ১৯৭৩ সালে ইয়োকোহামা থেকে কালিফোর্নিয়ায় পৌঁছায়। তার সময় লাগে ৬ দিন ১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট। এই জাহাজ প্রথম সর্বাপেক্ষা দ্রুত প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করে।

১৯৬৯ সালের ২৬শে মে সারনান, ইয়ং ও



ম্যালকম ক্যাম্পবেল

স্ট্যাফোর্ড যে রকেটে করে চন্দ্র পরিক্রমা করেন তার গতি ছিল ঘণ্টায় ৩৯,৮৯৭ কিলোমিটার।

১৯৬১ সালের ৭ই মার্চ মেজর রবার্ট হোয়াইট কালিফোর্নিয়া থেকে যে বিমান চালনা করেন তার গতি ছিল ঘণ্টায় ৪,৬৭৫·১ কিলোমিটার।

ফ্রান্সের Sadi Lecoinite ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে সেপ্টেম্বর ঘণ্টায় ৩৩৯ কিলোমিটার বেগে মোটর চালনা করেন।

আনুমানিক ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তুরস্কের আনাতোলিয়ায় এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ৫৫ কিলোমিটার বেগে অশ্বচালনা করেন।

আনুমানিক ৬৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ফিনল্যাণ্ডের হেইনোলা (Heinola)-তে এক ব্যক্তি ঘণ্টায় ৪০ কিলোমিটার বেগে স্লেজ চালনা করেন।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে বার্লিনের কাছে Siemens ও Halske ইলেকট্রিক এঞ্জিন-চালিত রেলওয়ে ২১০·২ কিলোমিটার বেগে চলে। হাওয়াই দ্বীপে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পর্বতের উপরে ৭০ কিলোমিটার বেগে স্লেজ চালনা করা হয়।

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন রাশিয়ার ভ্যালেন্টিনা ভ্লাডিমিরভনা তেরেস্কোভা-নিকোলায়েভ ভোস্টক ৬-এ করে মহাশূন্যে যাত্রা করেন। এই ভোস্টক ৬-এর গতি ছিল ঘণ্টায় ২৮,১১৫ কিলোমিটার। এরূপ গতিসম্পন্ন রকেটে যাত্রা নারীর পক্ষে এই প্রথম।

॥ ম্যালকম ক্যাম্পবেল ।

ম্যালকম ক্যাম্পবেল (Sir Malcolm Campbell, ১৮৫৫-১৯৪৯ খ্রী.) একজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইংরেজ মোটরগাড়ি-চালক। তাঁর মোটরগাড়ির নাম 'ব্লুবার্ড'। তিনি স্পীডবোট চালিয়েও অপরিসীম দক্ষতা প্রদর্শন করেন। তিনি যে স্পীডবোট চালান, তার নামও ব্লুবার্ড ২ (Bluebird II)।



অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট

॥ অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট ॥

অ্যামেলিয়া ইয়ারহার্ট (Amelia Earhart, ১৮৯৮-১৯৩৭ খ্রী.) প্রথম মহিলা যিনি একা বিমানে আটলান্টিক সমুদ্র অতিক্রম করেন। তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ডের হারবার গ্রেস থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডে একা বিমানযোগে গমন করেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে একা বিমানে হাওয়াই থেকে আমেরিকায় যান। তিনি বিমানে বিশ্বপরিক্রমা করবার উদ্দেশ্যে ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রেডারিক নূন্যানের সঙ্গে যাত্রা করেন এবং যাত্রাপথে সমুদ্রে পড়ে মারা যান।

শারীর বিজ্ঞান



সকলেই চায় সুস্থ শরীরে বেঁচে থাকতে। শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে প্রত্যেককে নানা উপায় অবলম্বন করতে হয়। উপযুক্ত খাদ্যগ্রহণ, নিয়মিত পরিশ্রম, বিশ্রাম ও নিদ্রা শরীরকে সুস্থ রাখার পক্ষে আবশ্যক। পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য মানুষকে নানা রোগে ভুগতে হবেই। সেই রোগ ভালো করার জন্যে ঔষধ, পথ্য ও পরিচর্যার প্রয়োজন।

কোন কলকবজাকে চালু অবস্থায় রাখতে হলে তাতে নিয়মিত তেল দিতে হয়। বাষ্প, বিদ্যুৎ, পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। আমাদের শরীর কলকবজা বা যন্ত্রের মতোই। এই শরীরের গঠনকে লক্ষ্য করলে তার মধ্যকার নানা প্রত্যঙ্গের বৈচিত্র্য দেখা যায়। যন্ত্র বা কলকবজার চেয়ে কোন অংশে আমাদের শরীরের গঠনপ্রণালী কম বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। এই দেহযন্ত্রকে সক্রিয় ও সুস্থ রাখতে মানুষকে সারা জীবন ধরে নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়।

॥ ইন্দ্রিয় ॥

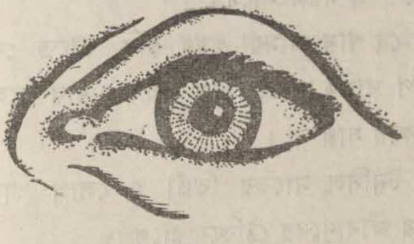
যার দ্বারা কোন জিনিস সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ হয় ও কাজ চালানো হয় তার নাম ইন্দ্রিয়। ইন্দ্রিয় তিন রকমের—জ্ঞানেন্দ্রিয়, অন্তরিন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি—চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক্ বা চামড়া। অন্তরিন্দ্রিয় চারটি—মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত। কর্মেন্দ্রিয় পাঁচটি—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। সাধারণতঃ শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে চোখ, কান, নাক, জিভ ও ত্বক্ সম্বন্ধে সতর্ক থাকতে হয়।

॥ চোখ ॥

চোখ দিয়ে আমরা দেখি। চোখ মেললেই আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই দেখার জন্যে যে কতরকম দেহযন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়, সাধারণতঃ তা আমরা জানি না বা জানবার চেষ্টা করি না।

চোখ দুটি দেখতে ছোট ছোট বলের ন্যায়। একটা কঠিন আবরণের মাঝখানে সেই দুটি বসানো

আছে। সামনের দিকে খানিকটা অংশ বেশ স্বচ্ছ। তার নাম অচ্ছোদপটল (cornea)। তার ঠিক



চোখ

পিছনে একটা কালো পর্দা আছে যেটার মাঝখানের ফুটো দিয়ে বাইরের আলো চোখের ভিতরে ঢোকে। এই কালো পর্দাটার নাম কনীনিকা (iris)। এই কনীনিকাকে বলা হয় চোখের তারা। এটি কালো না হয়ে নীল বা বাদামী রঙেরও হতে পারে। পর্দাটার মাঝখানের ফুটোটার নাম তারারন্ধ্র (pupil)। এই তারারন্ধ্রের মধ্যে আছে একটা পেটমোটা লেন্স।

চোখের অস্বচ্ছ শ্বেত অংশকে বলে শ্বেতমণ্ডল (sclera বা sclerotic)।

তারারন্ধ্রের ভিতরকার লেন্সের সামনের দিকে যে জলের মতো জিনিস থাকে তার নাম জলীয় রস (aqueous humour)। তার পিছনে থাকে তার চেয়ে ঘন জলবৎ রস (vitreous jelly)। অক্ষি-গোলকের গঠন ঠিক রাখতে এই জলীয় রসের প্রয়োজন হয়। এই রস স্বচ্ছ।

চোখের একেবারে পিছন দিকে আছে একটা পাতলা আলোকগ্রাহী পর্দা, যাকে বলা হয় অক্ষিপট (retina)। অক্ষিপটের উপরে বাইরের যে ছবি পড়ে তা একটি স্নায়ু (optical nerve) মারফত মস্তিষ্কের পিছন দিকে চলে যায়। তখন আমরা দেখতে পাই। কোন কিছু দেখতে হলে এত রকম দেহযন্ত্রাংশের প্রয়োজন হয়। অবশ্য, অন্ধকারে বাইরের ছবি অক্ষিপটে প্রতিফলিত হয় না বলে আমরা অন্ধকারে দেখতে পাই না।

চোখের লেন্স যখন ঠিকমতো কাজ করতে সমর্থ হয় না, তখন আমরা চশমা ব্যবহার করি। চোখের লেন্স ঘোলা হয়ে গেলে আমরা দেখতে পাই না। এই ঘোলা হওয়াকে বলে ছানি পড়া। চোখের ছানি (cataract) যন্ত্রের সাহায্যে চক্ষুচিকিৎসকেরা অপসারিত করে দিলে আবার দেখতে পাওয়া যায়। অবশ্য, সকল ক্ষেত্রে ছানি কাটা সফল হয় না।

চোখ শুকিয়ে গেলে আমাদের দেখতে অসুবিধা হয়। চোখের পর্দা ভেজাবার জন্যে অশ্রুগ্রন্থি আছে। চোখের পাতা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে অশ্রুগ্রন্থি থেকে জলবৎ রস বার হয়ে চোখের পর্দা ভিজিয়ে দেয়।

চোখের পাতার ভিতর দিক্ সব সময়ে ভিজে থাকে। পলক পড়লে ভিজে পাতা দুখানি চোখের তারা ও মণির গায়ে বুলিয়ে যায়। তার ফলে মণি ও তারা কখনও শুকিয়ে যায় না।

তীব্র আলো, ধুলো, বালি থেকে চোখ দুটিকে রক্ষা করবার জন্যেও পলক পড়ে।

দুটি চোখ না থাকলে কোন কিছুকে পুরোপুরি দেখতে অসুবিধা হত। দুটো চোখ থাকার ফলে ডাইনে বাঁয়ে ও উঁচুতে নীচুতে কোন কিছুকে ভালো করে দেখা যায়। চোখের পাতা পড়তে ১ সেকেণ্ডের ১৬ ভাগের ১ ভাগ সময় লাগে।

তীব্র আলো চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময় চোখে সামান্য রঙিন চশমা দেওয়া ভালো। বরফের উপর সূর্যকিরণ পড়ে ঝকঝক করে। সেদিকে বেশীক্ষণ তাকালে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অনেক সময় লোকে অন্ধ হয়ে যায়। সেই জন্য বরফের উপর দিয়ে চলবার সময় লোকে রঙিন চশমা পরে।

চোখের পাতার মাংসপেশীর কাঁপনকে আমরা

চোখ নাচা বলি। নানা কারণে চোখ নেচে থাকে।

॥ কান ॥

কান দিয়ে আমরা শুনি। বাইরে কোন শব্দ হলে যে তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা কর্ণপটহ (tympanum)-এ আঘাত করে। কানের যে তিনটি অংশ বহিঃকর্ণ, মধ্যকর্ণ ও অন্তঃকর্ণ, সেই বহিঃকর্ণ ও মধ্যকর্ণের মাঝখানে থাকে কর্ণপটহ।

বাইরের শব্দ এসে কর্ণপটহে আঘাত করলে যে স্পন্দনের সৃষ্টি হয় তা অন্তঃকর্ণের দরজার পর্দাকে আঘাত করে। তার ফলে আমরা শুনতে পাই।

অন্তঃকর্ণের ভিতরটা ফাঁপা। অন্তঃকর্ণ অনেকটা শামুকের খোলের মতো। এর মধ্যকার স্নায়ুর পর্দায় শব্দ আঘাত করলে মস্তিষ্কে তার স্পন্দন পৌঁছে যায়। তখনই আমরা শুনতে পাই।

প্রচণ্ড শব্দ হলে কানের পর্দায় জোরে আঘাত করে। তার ফলে আমরা সাময়িকভাবে বধির হয়ে যাই। অনেক দিন ধরে বহুবার প্রচণ্ড শব্দের আঘাত কানের পর্দার ক্ষতি করতে পারে। এর ফলে কখনও কখনও লোকে পুরোপুরি বধির হয়ে যেতে পারে।

কানে খোল জমতে দিতে নেই। স্নানের সময় জল ঢুকলে তা সঙ্গে সঙ্গে বার করে দিতে হয়। তা না হলে পুঁজ হতে পারে।

॥ নাক ॥

নাকের প্রধান কাজ শ্বাসগ্রহণ ও নিঃশ্বাস ত্যাগ। নাক দিয়ে আমরা গন্ধ অনুভব করি।

হাওয়ার সঙ্গে অনেক ধুলোবালি, জীবাণু প্রভৃতি থাকে। নাকের মধ্যে যে লোম থাকে তাতে সে-সব আটকে যায়।

লোকে যখন শ্বাসগ্রহণ করে তখন সেই হাওয়া ঠাণ্ডা হলেও শরীরের গরম রক্তে লেগে তা গরম হয়ে ওঠে। তাই নাক দিয়ে যে হাওয়া বেরিয়ে আসে তা গরম লাগে।

যে শ্বাস আমরা গ্রহণ করি তাতে যে জলীয় বাষ্প থাকে তা ফুসফুসে যায়। তার ফলে ফুসফুস শুকিয়ে যায় না।

টনসিল, নাকের ঝিল্লী ও লোম শ্বাসগ্রহণের সময় জীবাণুদের ঠেকিয়ে রাখে।

সাধারণতঃ ঘুমের সময়ে নাক ডাকে। নাক দিয়ে শ্বাসগ্রহণের সময়ে স্বরযন্ত্রের দোষে বাতাস বাধা পেলে যে শব্দ হয়, তাকেই আমরা বলি নাক ডাকা। শোওয়ার দোষে বা নাকের বদলে মুখ দিয়ে শ্বাসগ্রহণের জন্যে এই রকম শব্দ বার হয়ে থাকে।

॥ জিভ ॥

জিভ দিয়ে আমরা খাদ্যের স্বাদ বুঝতে পারি। জিভের উপরে কতকগুলি উঁচু উঁচু খুব ছোট ছোট মাংসগ্রন্থি (taste buds) দেখা যায়। সেই সবের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি খাদ্যের স্বাদ তেতো, টক, মিষ্টি না ঝাল।

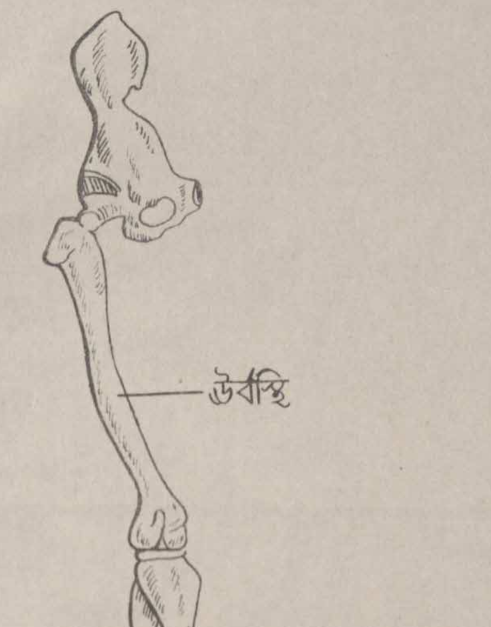
জিভের আর একটা কাজ, খাদ্য দাঁত দিয়ে চিবোনোর ফলে মণ্ডে পরিণত হলে তা খাদ্যনালী (gullet বা oesophagus)-তে ঠেলে দেওয়া।

॥ ত্বক্ বা চামড়া ॥

আমাদের সারা শরীর খুব পাতলা আবরণ দিয়ে ঢাকা। এই আবরণের নাম ত্বক্ বা চামড়া। ত্বক্ শুধু গায়ের সাধারণ আবরণ নয়, এটা বাইরের নানা উৎপাত থেকে রক্ষা করে। বলা যেতে পারে, ত্বক্ গায়ের উপরকার বর্ম। ত্বক্ সুস্থ থাকলে তা ভেদ করে রোগজীবাণু শরীরের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না। ত্বক্ দিয়ে অনবরত আমাদের শরীর থেকে

ঘাম বেরিয়ে যাচ্ছে। এই ঘামের মধ্য দিয়ে শরীরের নানা ময়লা বেরিয়ে যায়। ত্বকের উপর অসংখ্য ছিদ্র আছে। সেই ছিদ্রপথেই ঘাম নিঃসারিত হয়।

ত্বক্ বা চামড়ার সাতটি স্তর। প্রথম পাঁচটি স্তর বহিস্ত্বক (epidermis)। বহিস্ত্বকের বাইরের



পায়ের হাড়

স্তরটি মরাকোষের স্তর। তা ক্ষয়ে ক্ষয়ে শরীর থেকে ঝরে পড়ে।

আসল ত্বক্ বহিস্ত্বকের নীচে। তার মধ্যে বহু নার্ভ-তন্তু ও রক্তনালী থাকে।

ত্বকের একটি কাজ শরীরকে শীত ও গরম থেকে রক্ষা করা।

ত্বকে যে বহু নার্ভের প্রান্ত বা প্যাপিলী (papilae) আছে তা দিয়ে তৈরী হয়েছে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়। এই স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি আমাদের গায়ে কিছুর স্পর্শ লেগেছে কিনা। ঠাণ্ডা বা গরম এই স্পর্শেন্দ্রিয়ের সাহায্যেই বুঝতে পারা যায়। গায়ে বাতাস লাগলে, কেউ ছুঁলে বা চিমটি কাটলে জানতে পারি বা ব্যথা অনুভব করি।

॥ হাড় ও মাংসপেশী ॥

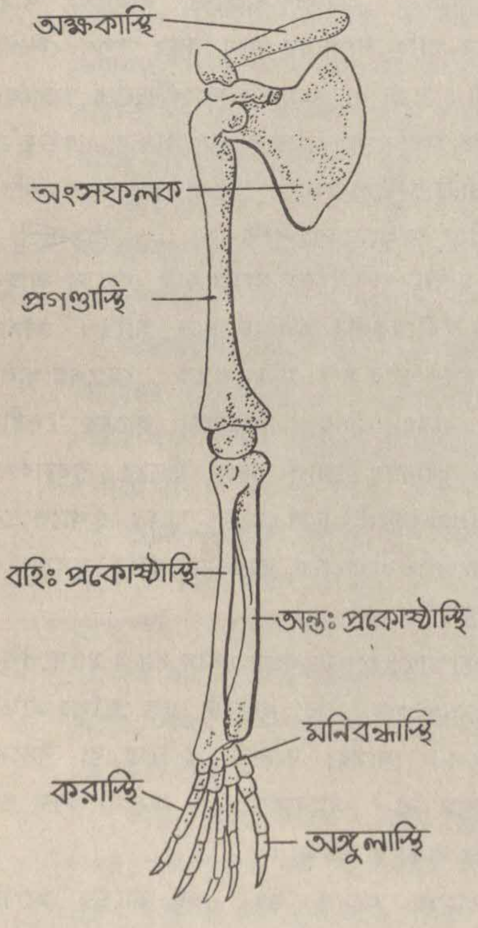
মাথার খুলি থেকে আরম্ভ করে পায়ের আঙ্গুল পর্যন্ত শরীরের সব জায়গায় হাড় আছে। মাথার খুলির খোপের মধ্যে মস্তিষ্ক থাকে। চোখের খুলির মধ্যে চোখ থাকে। শিরদাঁড়া হাড়ের তৈরী। তার মধ্যকার খোপ দিয়ে পিঠের সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) চলে গেছে। বুকের দুপাশে যে হাড়ের পাঁজরা রয়েছে, তার মধ্যে থাকে ফুসফুস ও হৃদ্‌যন্ত্র।

তা ছাড়া হাড়ের গায়ে লেগে থাকে মাংসপেশী। হাড় না থাকলে সারা শরীরটা হত জেলির মতো থলথলে। আমরা দাঁড়াতে, হাঁটতে বা বসতে পারতাম না। মাংসপেশীর যে অসংখ্য কাজ তা হাড়ের অভাবে হত না।

হাড়ের অনেক গুণ। এই হাড়ের মধ্যেই ক্যালসিয়াম ও রক্তকণিকা থাকে।

সারা শরীরে হাড়ের সংখ্যা মোট ২০৬টি। আমাদের পিঠের শিরদাঁড়া বা মেরুদণ্ড (spine) ৬টি কশেরুকা (vertebra) দিয়ে তৈরী। শিরদাঁড়ার একেবারে নীচের দিক্‌টার নাম অনুত্রিক (coccyx)। এই অনুত্রিক কতকটা লেজের ন্যায়। বিজ্ঞানীরা বলেন, এটি মানুষের লুপ্ত লেজের চিহ্ন।

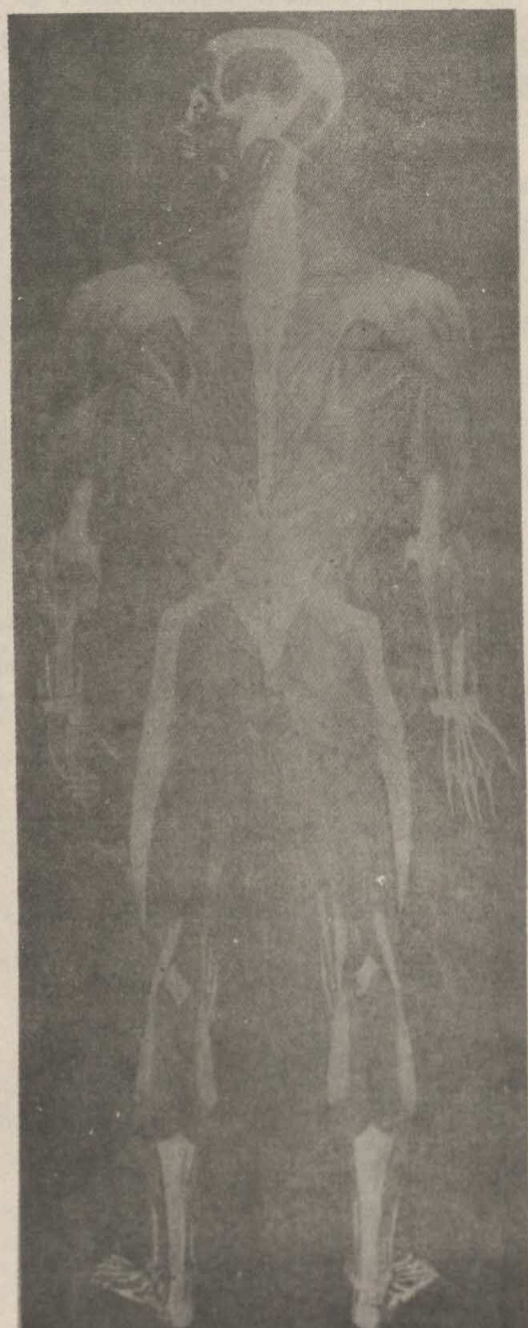
শিরদাঁড়ার মধ্য দিয়ে সুষুম্নাকাণ্ড (spinal cord) নেমেছে। তা থেকেই বহু নার্ভ বেরিয়ে শরীরের সব জায়গায় গেছে।



বাহুর হাড়

শিরদাঁড়ার উপরের অংশ থেকে পাঁজরার হাড় বেরিয়ে বুকের খাঁচা তৈরি করেছে। ১২ জোড়া হাড় দিয়ে বুকের খাঁচা তৈরী। এই খাঁচার একেবারে নীচের দিকের দু'জোড়া হাড় ছোট। তাই সে দুটি বেঁকে খাঁচার সঙ্গে মেশে নি। বাকি ১০ জোড়া বুকের মাঝখানের যে হাড়ে এসে মিলেছে তাকে বলা হয় উরঃফলক (sternum)।

কাঁধের নীচে সামনের দিকে থাকে দুটি কণ্ঠা বা অক্ষক (clavicle বা collar bone)। পিছনের



মাংসপেশীর পিছনের দৃশ্য



হৃৎপিণ্ড ও রক্তনালী



শরীরের শিরা ও ধমনীসমূহ

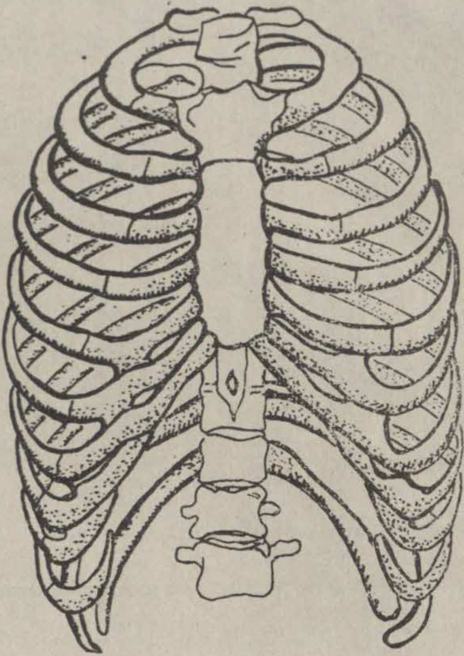
দিকে থাকে তিনকোণা আকারের অংসফলক (scapula বা shoulder blade)।



শিরদাঁড়ার হাড়

মুখ তৈরী ১৪টি হাড়ে। কানে থাকে ৬টি হাড়। গলায় ১টি হাড়। মাথার উপরে থাকে ৮টি হাড়। মোট ২৯টি হাড় দিয়ে মাথা তৈরী। সেই সব হাড়ের নাম ছাদাস্থি, প্রাচীরাস্থি, কর্ণ-মূলাস্থি, মূলাস্থি, হনু-অস্থি।

উপর হাতে একটি করে লম্বা হাড় থাকে। তাকে ইংরেজীতে বলে humerus। বাংলায় বলে প্রগণ্ডাস্থি। নীচের হাতে থাকে পাশাপাশি ২টি লম্বা হাড় (ulna ও radius)। বাংলায় বলা হয় বহিঃপ্রকোষ্ঠাস্থি ও অন্তঃপ্রকোষ্ঠাস্থি। এদের সঙ্গে হাতের কবজিতে অর্থাৎ মণিবন্ধে এসে লেগেছে ৮টি হাড় (carpal bones)। তাদের



বুকের খাঁচা

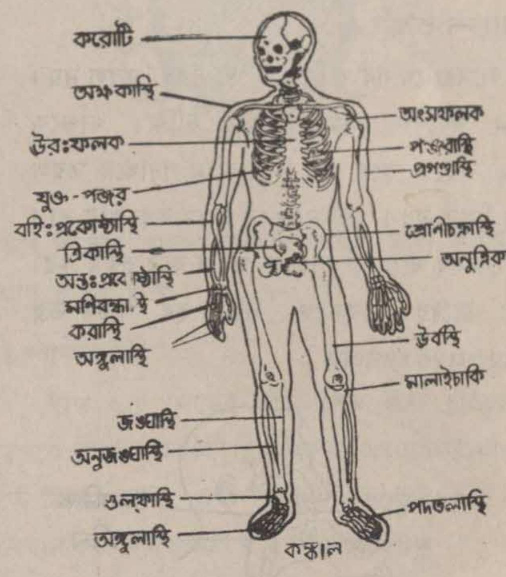
বলা হয় মণিবন্ধাস্থি। হাতের চেটোয় থাকে পাঁচটি করে হাড় (meta-carpal bones), যাদের নাম করাস্থি। আঙ্গুলে থাকে মোট ১৪টি হাড়—বুড়ো আঙ্গুলে ২টি, অন্য আঙ্গুলগুলিতে ৩টি করে।

হাঁটুর উপরের ছোট হাড়কে বলে মালাইচাকি (knee cap)

কোমরে আছে ২টি হাড়, যার নাম শ্রোণীচক্র (pelvis)। হাঁটুর নীচ থেকে যে হাড় দুটি নেমে গেছে পায়ের সেই দুটি হাড়ের নাম (tibia ও fibula)। পায়ের উরুর হাড়ের নাম উর্বস্থি বা femur।

পায়ের পাতার পাঁচটি হাড়ের সঙ্গে সাতটি হাড় লেগেছে। এই সাতটি হাড় গুলফ-সন্ধি (ankle)-র। পায়ের আঙুলের হাড়গুলি পায়ের পাতার হাড়গুলির সঙ্গে লেগেছে।

হাড়ের সঙ্গে যাতে হাড় জোড়া থাকে তার জন্যে তাতে অস্থি-সন্ধি (joint) থাকে। এই অস্থি-সন্ধির জন্যে হাড়ের মধ্যে নড়াচড়ার সুবিধা

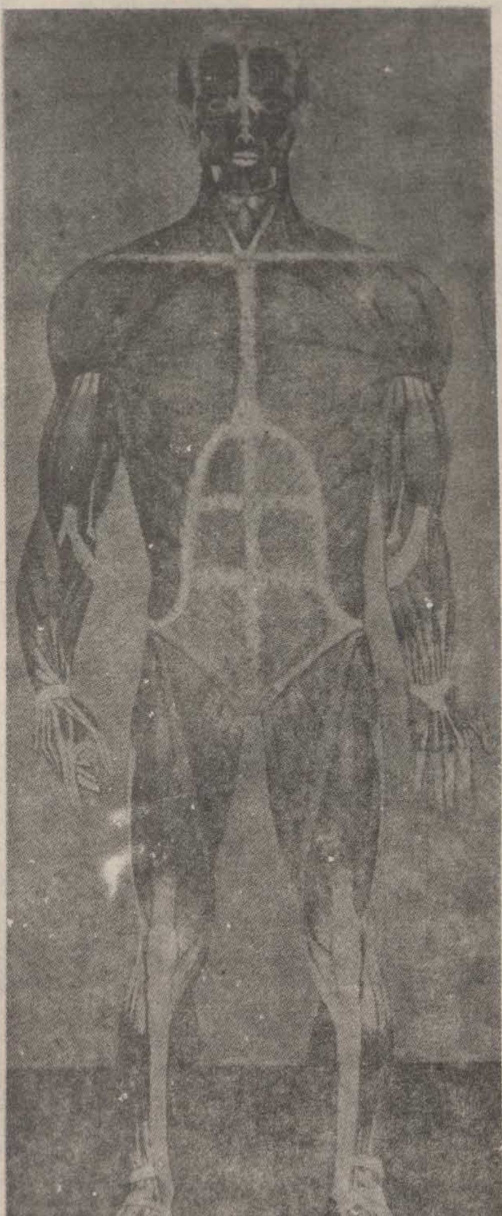


দেহের নানা স্থানের অস্থি

হয়। দুই হাড়ের মধ্যে কোমলাস্থি (cartilage) থাকে, আর থাকে তেলের ন্যায় তরল পদার্থ। তার জন্যে হাড়ের সঙ্গে হাড় ঘষে ক্ষয়ে যায় না। অস্থি-সন্ধিগুলিকে দড়ির ন্যায় কতকগুলি সন্ধিবন্ধনী (ligaments) ধরে রাখে। প্রায় ছশো মাংসপেশী ২০৬টি হাড়কে নাড়িয়ে নিয়ে চলে। তারই ফলে লোকের চলাফেরার সুবিধা হয়।

মাংসপেশীর মাঝখানটা বেশ মোটা আর দুদিকটা খুব সরু। সরু দিক্‌গুলিই হাড়ের সঙ্গে লাগানো থাকে। মাংসপেশী শুধু একদিকেই কাজ করতে পারে।

মাংসপেশী দু'রকমের—ঐচ্ছিক ও অনৈচ্ছিক।



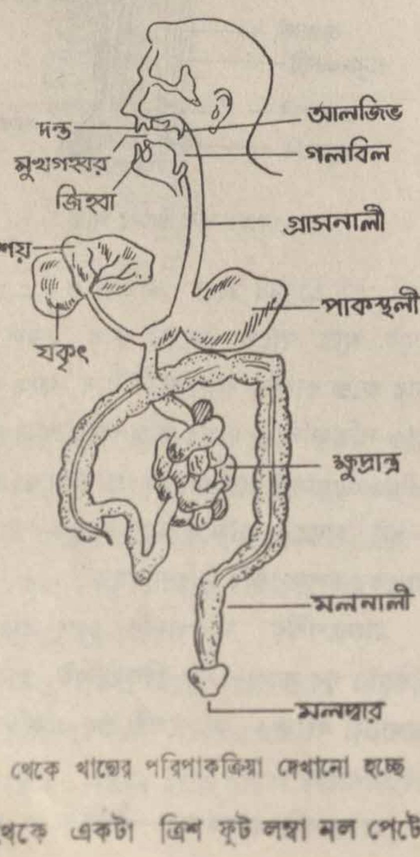
মাংসপেশীর সম্মুখের দৃশ্য

ঐচ্ছিক (voluntary) মাংসপেশীগুলি ইচ্ছানুযায়ী নাড়ানো যায়। হাতে পায়ে ঐচ্ছিক মাংসপেশী আছে। অনৈচ্ছিক (involuntary) মাংসপেশী আপনা থেকেই সব কাজ করে। সেগুলি আমরা ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারি না। ফুসফুস বা হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী অনৈচ্ছিক।

॥ পাচনতন্ত্র ॥

আমরা যে-সব খাদ্য খাই তা সবই তরল নয়। কঠিন পদার্থও আমরা খেয়ে থাকি। খাদ্যকে হজম করতে হলে এই সব কঠিন পদার্থকে তরল করে নিতে হয়। তা না হলে হজম করা যায় না।

যে-সব যন্ত্রে সব খাদ্যকে তরল করে হজম করা হয় তাদের একসঙ্গে বলা হয় পাচন-তন্ত্র (digestive system).।



লালাগ্রন্থি থেকে খাদ্যের পরিপাকক্রিয়া দেখানো হচ্ছে

মুখ থেকে একটা ত্রিশ ফুট লম্বা নল পেটের মধ্যে নেমে গেছে। এর নাম পৌষ্টিক নালী (alimentary canal)। এই নালীর মধ্য দিয়ে খাবার নীচে নেমে যায়। ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদন্ত্র, পাকস্থলী



সবই ঐ পৌষ্টিক নালীর অংশ। এর আশেপাশে আছে যকৃৎ (liver) ও অগ্ন্যাশয় (pancreas)।



এ দুটি থেকেও রস বেরিয়ে খাদ্যকে হজম করতে সাহায্য করে।

মুখের মধ্যে খাদ্য গেলে দাঁত খাদ্যকে টুকরো

টুকরো করে মণ্ডে পরিণত করে। জিভ এ-কাজে সহায়তা করে। খাদ্যের প্রধানতঃ তিনটি ভাগ—শর্করা (carbohydrates), প্রোটিন (proteins) ও স্নেহপদার্থ (fats)। আমিষজাতীয় খাদ্যে

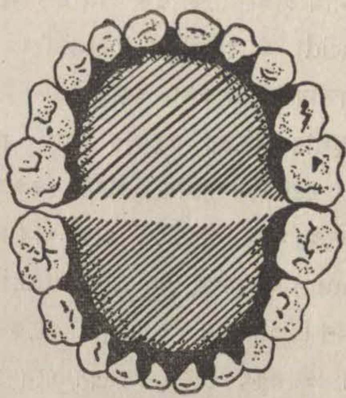


প্রোটিন থাকে। এদের মধ্যে শর্করাজাতীয় খাদ্য মুখের মধ্যেই হজম হতে থাকে। মুখের দুপাশের গ্রন্থি ও নীচের চোয়ালের নীচের দিকের দুটো গ্রন্থি থেকে যে লালা বেরোয় তাই শর্করা-জাতীয় খাদ্যকে হজম করায়।

॥ দাঁত ॥

আমাদের দাঁতের সংখ্যা মোট ৩২টি। ছ' থেকে ন' মাস বয়স পর্যন্ত যে ২০টি দাঁত গজায় তা শেষ পর্যন্ত পড়ে যায়। এই দাঁতের নাম দুধে দাঁত। তার পর ১২ বছর বয়সের মধ্যে সব দাঁত ওঠে। ১৯/২০ বছর বয়সে আক্কেল দাঁত ওঠে।

দাঁত নানা আকারের। সে-সব দাঁতের বিভিন্ন কাজ। কোন কোন দাঁত খাদ্যকে কাটে। কোন কোন দাঁত খাদ্যকে পেষে। দাঁতের বাইরে থাকে এনামেল। ভিতরে থাকে ডেনটিন (dentine)।

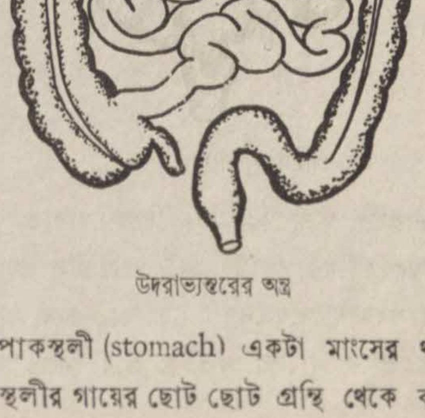


দাঁত

তার ভিতরে থাকে মজ্জা। তারই মধ্যে থাকে স্নায়ু ও রক্ত-জালি।

॥ পাকস্থলী ॥

দাঁত আর জিভের কাজ শেষ হলে খাদ্যের মণ্ডকে জিভ খাদ্যনালী (gullet বা oesophagus)-তে ঠেলে দেয়। এই খাদ্যনালী ন'দশ ইঞ্চি। সেখান থেকে খাদ্য চলে যায় পাকস্থলীতে।



উদরাভ্যন্তরের অন্ত্র

পাকস্থলী (stomach) একটা মাংসের থলি। পাকস্থলীর গায়ের ছোট ছোট গ্রন্থি থেকে কয়েক

রকম রাসায়নিক পদার্থ বেরিয়ে খাদ্যকে হজম করায়। সে-সবের নাম হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড (hydro-cloric acid) ও পেপসিন (pepsin)। এগুলি প্রোটিনজাতীয় পদার্থ হজম করায়।

পাকস্থলীর নীচের দরজার নাম pyloric valve। প্রোটিনজাতীয় পদার্থ হজম হলে সেখান দিয়ে খাদ্য গ্রহণীতে চলে যায়। গ্রহণী (duodenum) ক্ষুদ্রান্ত্রের (small intestine)-এর প্রথম অংশ। এখানে অগ্ন্যাশয় থেকে নানা-রকম রস ও যকৃৎ থেকে পিত্তরস এসে প্রধানতঃ স্নেহজাতীয় পদার্থকে হজম করায়। শর্করাজাতীয় পদার্থের কিছু হজম হতে বাকী থাকলে তা-ও হজম করায়।



পরিপাকযন্ত্রাদিসহ উদর

তারপর ক্ষুদ্রান্ত্রের মধ্য দিয়ে যাবার সময় ক্ষুদ্রান্ত্রের গায়ের ছোট ছোট গ্রন্থিগুলি খাদ্যকে জলীয় অবস্থায় শুষে নেয়। তা রক্তে চলে যায়।

এইভাবে খাদ্যের যতটুকু শুষে নিতে বাকী থাকে তা বৃহদন্ত্রে যায়। সেখানেও খাদ্যের জলবৎ পদার্থ রক্তে চলে যায়। এবার খাদ্যের যা কিছু রইল তা মলের আকারে শরীর থেকে বেরিয়ে যায়।

হজম ভালভাবে না হলে মলের পরিমাণ বেশী হয়। অনেক সময়ে পেট খারাপ করে।

॥ প্লীহা ও যকৃৎ ॥

পেটের বাঁদিকে যে গ্ল্যাণ্ড থাকে তার নাম প্লীহা বা পিলে (spleen)। প্লীহা রক্তকণিকার সৃষ্টি করে। কোন কোন অসুখে বিশেষ করে ম্যালেরিয়ায় প্লীহা ফুলে বড় হয়।

পেটের ডানদিকে থাকে যকৃৎ (liver)। এ থেকে পিত্তরস (bile) বেরিয়ে গ্রহণীতে পড়ে। যকৃৎ ময়লা ছেঁকে রক্তকে পরিষ্কার করে। যকৃৎ শরীরের সব চেয়ে বড় গ্ল্যাণ্ড।

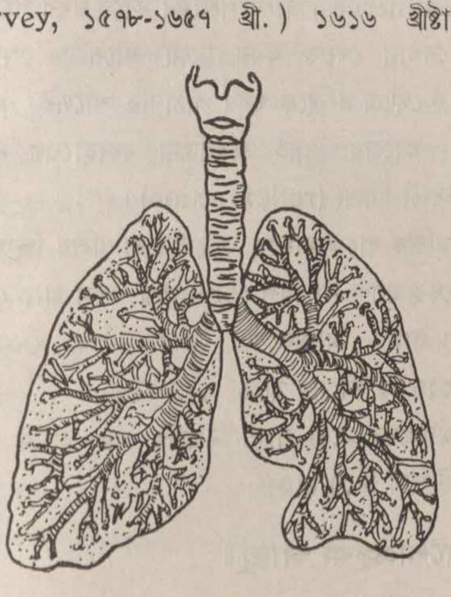
॥ হৃৎপিণ্ড ॥

হৃৎপিণ্ড আমাদের বুকের প্রায় মাঝখানে, একটু বাঁ দিক্ ঘেঁষে পর্দা বা ঝিল্লী দিয়ে ঢাকা পাম্প করার যন্ত্র। হৃৎপিণ্ড সারা দেহে রক্ত পাঠায় এবং তা ফিরিয়ে নিয়ে আসে।

হৃৎপিণ্ডের দুপাশে দুটো ফুসফুস আছে। হৃৎপিণ্ডের দুটো ভাগের মাঝখানে একটা পর্দা থাকে। ভাগ দুটির মাঝখানে আছে কপাটক (valve), তা উপর থেকে রক্তকে নীচে নামতে দেয় কিন্তু রক্তকে উপরে উঠতে দেয় না। উপরের ভাগকে বলে অলিন্দ (auricle)। নীচের ভাগকে নিলয় (ventricle)।

অলিন্দ থেকে রক্ত মহাধমনী (aorta) দিয়ে দেহের সব জায়গায় প্রবাহিত হয়। শরীরের মধ্যে ঘণ্টায় প্রায় সাত মাইল বেগে রক্ত চলাচল করে। প্রথম চার্লস ও প্রথম জেমসের

ইংরেজ চিকিৎসক উইলিয়াম হারভে (William Harvey, ১৫৭৮-১৬৫৭ খ্রী.) ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে



ফুসফুস

জানান, যে খাদ্য আমরা গ্রহণ করি রক্তই তা নিয়ে ছুটোছুটি করে।

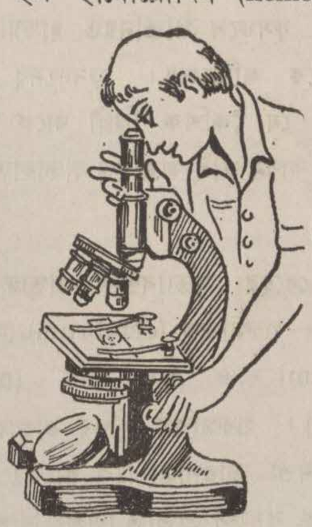
॥ রক্তের কথা ॥

রক্ত শুধু খাদ্য নিয়ে বিভিন্ন কোষে পৌঁছে দেয় না, কোষের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও আবর্জনা ফিরিয়ে নিয়ে আসে এবং অক্সিজেন ও পুষ্টি-বৃদ্ধির সব উপাদান কোষে কোষে পৌঁছে দেয়। তাছাড়া রক্তের নানা উপকারী জীবাণু ক্ষতিকর জীবাণুদের ধ্বংস করে শরীরকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করে।

সাধারণতঃ মানুষের দেহের যত ওজন তার তের ভাগের একভাগ রক্তের ওজন।

রক্তে লাল ও শ্বেত কণিকা ও প্লেটলেট বলে একধরনের কণিকা থাকে। রক্তরস (plasma) একরকম তরল পদার্থ। তাই হচ্ছে রক্ত।

রক্তের দশ ভাগের এক ভাগই লাল কণিকা (red corpuscle)। এই লাল কণিকা খুবই ছোট, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা যায় না। এক ফোঁটা রক্তে প্রায় ২৫০ কোটি লাল কণিকা থাকে। রক্তের লাল রং হল হীমোগ্লোবিন (hemoglobin)।



অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা হচ্ছে

অক্সিজেন গ্রহণ করার জন্য রক্ত লাল হয়। কিন্তু কার্বন ডাই-অক্সাইড নিলে রক্তের রং নীল হয়ে যায়।

হাড়ের মধ্যে লাল কণিকা তৈরী হয়। লাল কণিকার সংখ্যাল্পতা হলে লোকে অ্যানিমিয়া (anaemia) বা রক্তাল্পতায় ভোগে। রক্তের লাল কণিকা কোষে কোষে অক্সিজেন যোগান দেয় ও দূষিত কার্বন ডাই-অক্সাইড ফুসফুসের ভিতর দিয়ে বাইরে বার করে দেয়।

রক্তের শ্বেতকণিকা দেহে কোন ক্ষতিকর জীবাণু প্রবেশ করলে তাকে ধ্বংস করে। ক্ষতে যে পুঁজ হয় তা মৃত শ্বেতকণিকা।

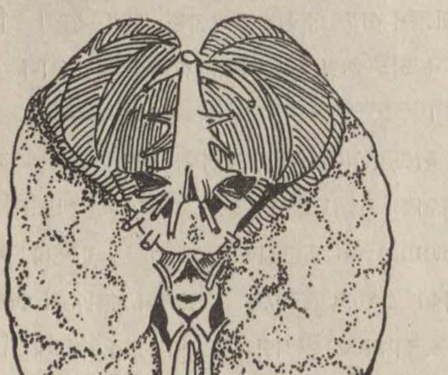
কোন জায়গায় কেটে গেলে রক্ত বার হতে থাকে। সেই রক্ত বার হওয়া বন্ধ না হলে লোকের মৃত্যু হতে পারে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মে রক্তের প্লেটলেট নামক কণিকারা রক্ত জমে যেতে সাহায্য করে। তার ফলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

রক্তকণিকাদের কাজ কোষে কোষে অক্সিজেন

যোগান দেওয়া ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বার করে দেওয়া। আমরা শ্বাসগ্রহণের মাধ্যমে অক্সিজেন গ্রহণ করি। ফুসফুসে প্রতিনিয়ত হাওয়া যাচ্ছে, তাতেই থাকে অক্সিজেন। ফুসফুসের অসংখ্য থলির সঙ্গে যে কৈশিক ঝিল্লী থাকে তা দিয়ে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড যাতায়াত করে।

॥ মস্তিষ্ক ॥

মস্তিষ্ক দেহের অত্যাবশ্যক প্রত্যঙ্গ। এর তিনটি ভাগ—গুরুমস্তিষ্ক (cerebrum), লঘুমস্তিষ্ক (cerebellum) ও সুষুম্না-শীর্ষক (medulla oblongata)। গুরুমস্তিষ্ক বুদ্ধির ভাণ্ডার। লঘু-মস্তিষ্ক প্রধানতঃ ভারসাম্য ঠিক রাখে। সুষুম্না-শীর্ষক হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ অঙ্গ চালাবার কেন্দ্র।



মস্তিষ্ক

আমাদের শরীরের সব কাজ চালায় স্নায়ুতন্ত্র (nervous system)। মস্তিষ্ক থেকে বারো জোড়া করোটিক স্নায়ু চোখ, কান, নাক, জিভ, মুখ, গলা প্রভৃতির খবর নিয়ে মস্তিষ্কে পৌঁছে দেয় ও মস্তিষ্কের নির্দেশ যথাস্থানে পাঠিয়ে দেয়।

সুষুম্না-শীর্ষক থেকে ৩১ জোড়া মেরু-স্নায়ু (spinal nerves) মাংসপেশীদের কাছে খবর পাঠায় বা সেখান থেকে খবর নিয়ে আসে। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে মস্তিষ্কে খবর পাঠাবার আগেই কাজ হয়। কাজের এই স্বয়ংক্রিয় ব্যবহারের নাম প্রতিবর্তী ক্রিয়া (reflex action)।

মস্তিষ্ক থাকে মাথার করোটির বা খুলির ভিতর। মস্তিষ্কের মগজ বা ঘিলু (brain)-র ওজন প্রায় দেড় কিলোগ্রাম। মস্তিষ্ককে উপর থেকে দেখতে আখরোটের শাঁসের মতো কোঁচকানো।

মস্তিষ্কের মধ্যে সাদা নার্ভের স্তর আছে তা তিনটি পর্দা দিয়ে ঢাকা

॥ অনৈচ্ছিক স্নায়ু ॥

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের ইচ্ছামতো স্নায়ুরা কাজ করে। কিন্তু হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস, পাচনতন্ত্র প্রভৃতি আমাদের ইচ্ছামতো চলে না। তারা রাতদিন সব সময়েই কাজ করে যাচ্ছে। এই সর্বক্ষণ কাজ করার ফলে আমরা বেঁচে যাচ্ছি। এই সব স্নায়ুকে বলা হয় অনৈচ্ছিক স্নায়ু (involuntary nerve)।

॥ নানা ধরনের গ্রন্থি ॥

মাথার খুলির মধ্যে একটা ছোট খোপের মধ্যে একটা ছোট গ্রন্থি আছে। তার নাম পিটুইটারী (pituitary) গ্রন্থি। এই গ্রন্থি অন্ততঃ আট রকম রস তৈরি করে—সামনের ভাগে ছ'রকম, পিছনের ভাগে দু'রকম।

সামনের ভাগের রসের প্রধান কাজ থাইরয়েড (thyroid) গ্রন্থির কাজ ও অ্যাড্রিন্যাল (adrenal) গ্রন্থির কাজ নিয়মিত করা, মায়ের বুকে দুধ যোগানো ইত্যাদি।

থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে থাইরক্সিন (thyroxine

বা thyroxin) নামে এক রকম রস নিঃসৃত হয়, যা থাকলে মানুষের বুদ্ধিশুদ্ধি ঠিক থাকে। এই থাইরয়েড গ্রন্থি গলার সামনে থাকে।

অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির দুটি ভাগ—কর্টেক্স (cortex) ও মেডালা (medulla)। অ্যাড্রিন্যালিন হৃৎপিণ্ডের কাজ বাড়ানো, রক্তে শর্করা জমা করা, নিঃশ্বাসের গতি বাড়ানো প্রভৃতি অনেক কাজ করে। কর্টেক্সের রস মাংসপেশীর কাজে সাহায্য করে, বৃক্ক বা কিডনির লবণ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে, প্রোটিন ও শর্করাজাতীয় খাদ্য হজম করায় এবং এই ধরনের নানা কাজ করে জীবকে বাঁচিয়ে রাখে। বৃক্ক বা কিডনির মাথার উপর টুপির ন্যায় দুটি গ্রন্থি থাকে, তাদেরই নাম অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থি।

॥ বৃক্ক বা কিডনি (kidney) ॥

আমাদের পেটের দুদিকে দুটো বৃক্ক বা কিডনি আছে। এই কিডনিকে দেখতে অনেকটা শিমের বীচির মতো। কিডনির প্রধান কাজ রক্ত থেকে নিঃসৃত দূষিত জিনিস যার পরিমাণ প্রায় দেড় লিটার, মূত্রের আকারে শরীর থেকে বার করে দেওয়া। কিডনি প্রতিদিন প্রায় ২০০ লিটার রক্ত পরিষ্কার করে। শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় জিনিস যাতে শরীর থেকে বেরিয়ে না যায়, সেদিকেও কিডনি লক্ষ্য রাখে।

অনেক সময় একটা কিডনি খারাপ হয়ে গেলে আর একটা কিডনি কাজ চালিয়ে নেয়। কিন্তু তাতে সেই কিডনির উপর চাপ বেশী পড়ে। যাদের দুটো কিডনি অচল হয়ে যায়, তাদের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা থাকে না।

কোন সুস্থ ব্যক্তির একটি কিডনি যদি অসুস্থ ব্যক্তির শরীরে বসানো যায় তাহলে সে বেঁচে থাকতে পারে। অনেক সময় রোগীর আত্মীয়েরা টাকা দিয়ে বা দান হিসাবে একটা কিডনি গ্রহণ করে রোগীর শরীরে বসিয়ে তার জীবনরক্ষার চেষ্টা করে।

॥ ইনসুলিন ॥

আমাদের শরীরের অগ্ন্যাশয়ের কোষগুলির রস বার হবার কোন নল নেই। কোষগুলির চারিদিকে যে সরু কেশবৎ ঝিল্লী থাকে তাকে বলে কৈশিক ঝিল্লী। তারা ইনসুলিন (insulin) তৈরি করে রক্তে ঢেলে দেয়।

ইনসুলিনের অভাবে শর্করাজাতীয় খাদ্য ভালো



ফ্রেডারিক ব্যানটিং ও চার্লস বেস্ট

ভাবে হজম হয় না। তার ফলে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র বা মধুমেহ রোগ দেখা দেয়। তখন চিকিৎসকেরা ইনসুলিন ইনজেকশন করে ডায়াবেটিসের চিকিৎসা করেন। কানাডার ডাক্তার ব্যান্টিং (Sir Frederick Grant Banting, ১৮৯১-১৯৪১ খ্রী.) ও তাঁর সহকারী বেস্ট বহুমূত্রের

ঔষধ ইনসুলিন আবিষ্কার করেন। প্রস্রাবে শর্করা আছে কিনা তা পরীক্ষা করে বহুমূত্র রোগ নির্ধারণ করা সহজ।

॥ আয়ুর্বেদ ॥

শরীর থাকলে অসুখ করবেই। নানা কারণে এই অসুখ হয়। হাজার হাজার বছর আগেও লোকের অসুখ হত। তখনকার দিনে এখনকার মতো উন্নত ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতি ছিল না। কিন্তু মানুষ রোগ সারাবার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করেছে। ঝাড়ফুঁক করা, জলপড়া খাওয়া, ওঝা দিয়ে মন্ত্র আওড়ানো, কবচ-তাবিজ পরা প্রভৃতির দ্বারা পৃথিবীর নানা দেশে রোগ সারাবার চেষ্টা করা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে বা অনুন্নত দেশে, বনভূমিতে মরুঅঞ্চলে, এ ধরনের চেষ্টা আজও চলে। সে-সবে প্রায় কোন কাজই হয় না। শুধু মনের উপর প্রভাব পড়বার ফলে রোগী নিজেকে কিছুটা সুস্থ মনে করে।

লোকে, বিশেষ করে আমাদের দেশের মনীষীরা নানাভাবে গবেষণা করে বুঝতে পারলেন, গাছ-গাছড়ার সাহায্যে রোগচিকিৎসা সম্ভব। খনিজ পদার্থের ব্যবহার করেও রোগ সারানো চলে। তবে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে ভারতীয় ঋষিরা গাছগাছড়ার সাহায্যে চিকিৎসার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন।

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। সংখ্যায় চারটি —ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব। অথর্ব বেদের পরিশিষ্টের নাম আয়ুর্বেদ। আয়ুর্বেদই প্রাচীনতম চিকিৎসাশাস্ত্র।

সে যুগে ধন্বন্তরি আয়ুর্বেদমতে চিকিৎসা করে বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি ছিলেন দেব-দেবীদের চিকিৎসক। পুরাণে বলে, তিনি সমুদ্র-মন্থনের সময়ে উদ্ভূত হয়েছিলেন। ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী জানা যায়, তাঁর প্রণীত প্রসিদ্ধ পুস্তকের নাম 'চিকিৎসাতত্ত্ব-বিজ্ঞান'।

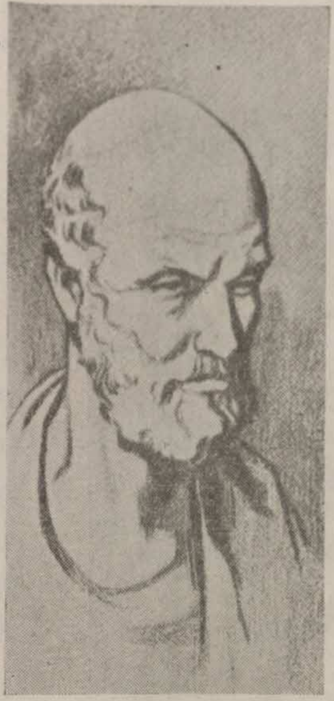
অনন্তদেব চররূপে পৃথিবীতে এসে লক্ষ্য করেন, লোকে নানা ব্যাধিতে জর্জরিত। তিনি অত্রিপুত্র ভরদ্বাজের কাছে আয়ুর্বেদ শিক্ষা করেন ও প্রসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় গ্রন্থ চরক-সংহিতা প্রণয়ন করেন। তিনি চররূপে পৃথিবীতে এসেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় চরক। চরক-সংহিতাকে ভারতীয় চিকিৎসাবিজ্ঞানের মূল বলা চলে। এই পুস্তকে শাস্ত্রীয় চিকিৎসাপন্থা, শরীরসংস্থান, রোগনিদান, নানা ঋতুতে স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন বিধিনিয়ম, নানা গাছগাছড়ার গুণাগুণ প্রভৃতি নানাকথা বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বর্ণিত আছে। অগণিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহায়তায় বর্তমানে যে চিকিৎসাপদ্ধতি গড়ে উঠেছে আশ্চর্য হতে হয়, সে যুগে তার মতো চিকিৎসাতত্ত্ব বিনা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে কি করে গড়ে উঠল!

শল্যচিকিৎসা বা সার্জারিরও প্রচলন সে যুগে শুরু হয়েছিল। চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা ঋষি সুশ্রুত তাঁর প্রণীত সুশ্রুত সংহিতায় শল্যচিকিৎসার কথা লিখে গেছেন।

॥ আকুপাংচার ॥

বর্তমানে শরীরে সূচ বিদ্ধ করে যে চিকিৎসা করা হয় তাকে বলে আকুপাংচার। সাধারণের ধারণা, আকুপাংচার চীনে উদ্ভাবিত হয়। কিন্তু সে কথা ঠিক না-ও হতে পারে। 'সুশ্রুত-সংহিতায়' আকুপাংচারের সাহায্যে রোগনিরাময়ের কথা লেখা আছে। তাতে একে বলা হয়েছে 'সূচিবেধ চিকিৎসা'। সুশ্রুত সংহিতায় আকুপাংচারের সাহায্যে চিকিৎসার বিস্তৃত নিয়ম সুন্দরভাবে লিখিত আছে।

মানুষের শরীরে চৌদ্দটা আসল মেরিডিয়ান আছে। এই সব মেরিডিয়ান দিয়েই জীবনীশক্তি চলাচল করে। এই সব মেরিডিয়ানের মধ্যে প্রায় এক হাজার আকুপাংচার পয়েন্ট আছে। কোন কারণে জীবনীশক্তির চলাচল ব্যাহত হলে শরীরে রোগ দেখা দেয়। কৌশলে ছুঁচ ফুটিয়ে জীবনীশক্তির চলাচলে সমতা আনা হলে রোগী সুস্থ হয়। আকুপাংচারের এইটেই মূল কথা। সুশ্রুত-সংহিতায় সব কথা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। তবে বর্তমানে চীনদেশে আকুপাংচারের প্রচলন বেশী।


হিপোক্রেটিস

॥ আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় ॥

বুদ্ধদেবের সময়ে জীবক নামে একজন বিখ্যাত আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন। সে-সময়ে তক্ষশিলায় এক বিরাট আয়ুর্বেদ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল।

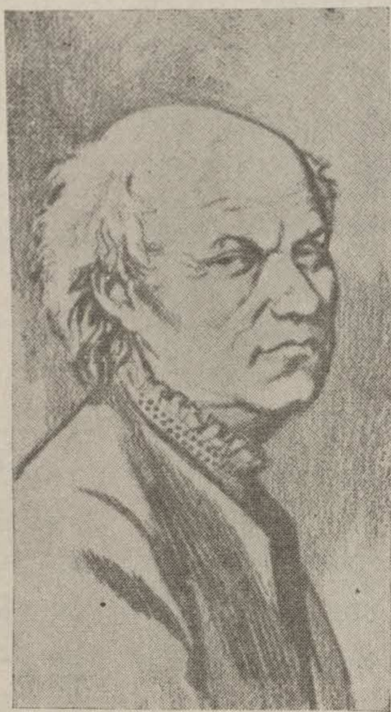
আয়ুর্বেদমতে বায়ু, পিত্ত ও কফ—এই তিনের কোনটির দোষ ঘটলে অর্থাৎ বাড়াবাড়ি হলে অসুখ হয়। যখন তিনটিই প্রবল হয় তখন শরীর ভীষণভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই ভীষণ অসুস্থতার নাম সন্নিপাত।


গ্যালেন

॥ আধুনিক চিকিৎসা ॥

আধুনিক চিকিৎসাকে পাশ্চাত্ত্য চিকিৎসা বলা হয়। যতদূর জানা গেছে, প্রসিদ্ধ গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস (Hippocrates, খ্রীষ্টপূর্ব ৪৬০-৩৫৭ অব্দ) পাশ্চাত্ত্য দেশে চিকিৎসাবিদ্যার প্রবর্তন করেন। তাঁকে বর্তমান চিকিৎসাবিদ্যার জনক বলা হয়।

গ্রীক চিকিৎসক ক্লডিয়াস গ্যালেন (Claudius Galen, ১৩১-২০১ খ্রী.) সে-যুগে যে চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা তেমন বিজ্ঞানসম্মত ছিল না। কিন্তু হাজার বছর ধরে সেই ধরনের



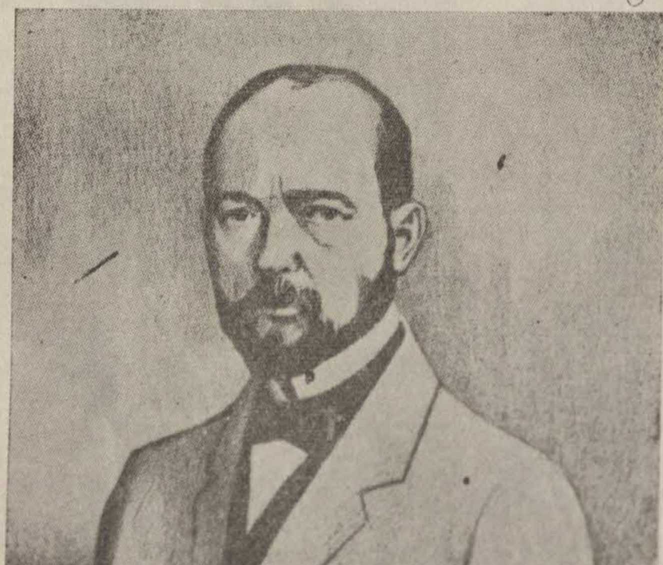
প্যারাসেলসাস

চিকিৎসা চলে। আজও তাঁর প্রবর্তিত চিকিৎসার ধারা কিছু কিছু চালু আছে।

সুইস চিকিৎসক ও অপরসায়নবিদ্ ফিলিপ্পাস অরিওলাস প্যার‍্যাসেলসাস (Philippus Aureolus Paracelsus, ১৪৯৩-১৫৪২ খ্রী.) মধ্য-যুগে চিকিৎসাবিদ্যার প্রবর্তন করে বিশেষরূপ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর লিখিত পুস্তকের ইংরেজী অনুবাদ 'One Hundred and Fourteen Experiments and Cures' ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রকৃত নাম থিওফ্র্যাস্টাস বোম্বাস্টাস ফন হোহেনহাইম (Theophrastus Bombastus von Hohenheim)।

গারহার্ড ডোমাক জীবাণুনাশক শক্তিশালী 'sulfa dye' আবিষ্কার করেন।

জার্মান বিজ্ঞানী এমিল অ্যাডল্ফ ফন বেরিং শরীরের মধ্যকার শোণিতজাত ক্ষতিকর পদার্থের ক্রিয়াশক্তি-নষ্টকারী ঔষধ আবিষ্কার করেন।



এমিল ফন বেরিং



গারহার্ড ডোমাক

জার্মান বিজ্ঞানী পল এরলিক (Paul Ehrlich) বহু গবেষণার পর ১৯০৯ খ্রীস্টাব্দে সিফিলিসের ঔষধ আবিষ্কার করেন।



পল এরলিক

॥ ক্যান্সার ॥



ক্যান্সার বা কর্কটরোগ এক দুরারোগ্য ব্যাধি। প্রথম দিকে ধরা পড়লে চিকিৎসার সাহায্যে ক্যান্সার সারানো যায়। রোগ পুরনো হলে কোন চিকিৎসাতেই রোগ-নিরাময় সম্ভব হয় না।

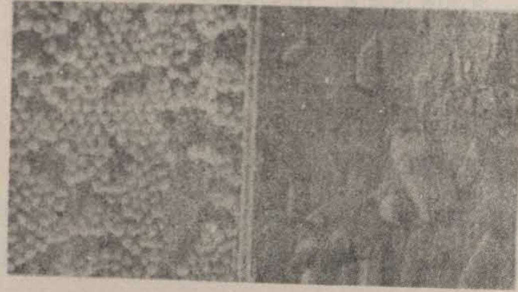
ভাইরাসের দ্বারা ক্যান্সার হতে পারে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘর্ষণজনিত কারণে, হজমের গোলমালে, অস্বাভাবিক রক্তক্ষরণে ও অন্যান্য বহু কারণে ক্যান্সার হয়ে থাকে। ম্যাডাম ক্যুরি ও পিয়েরে ক্যুরি যে রেডিয়াম আবিষ্কার করেন তার দ্বারা ক্যান্সারের চিকিৎসা হয়ে থাকে। তবে তা



অণুবীক্ষণযন্ত্রে দৃষ্ট নানাধরনের জীবাণু

ছাড়া বর্তমানে অন্যান্য বহু বিস্ময়কর ঔষধ বেরিয়েছে বা চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছে।

প্রথম দিকে ক্যান্সার হয়েছে কিনা বুঝতে পারা যায় না। এক পক্ষ কালের বেশী স্বরবিকৃতি, পাকস্থলী থেকে রক্তক্ষরণ, মুখের মধ্যের যে ক্ষত সারতেই চায় না প্রভৃতি দেহের নানা স্থানে নানা অস্বাভাবিক অস্বস্তি ও যন্ত্রণা দেখা দিলে চিকিৎসককে দিয়ে রোগপরীক্ষা করা অত্যাবশ্যক।



ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে দৃষ্ট পোলিও ভাইরাস



স্কুটারির হাসপাতালে ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল

॥ হাসপাতাল ॥

রোগ হলে ঔষধ, পথ্য, সেবা, বিশ্রাম প্রভৃতির প্রয়োজন। অনেক সময়ে বাড়িতে অনেক রোগের চিকিৎসা ভালোভাবে হয় না। এজন্য নানা স্থানে হাসপাতালের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

বর্তমানে প্রায় সব শহরেই উন্নত ধরনের হাসপাতাল আছে। কিন্তু হাসপাতাল শুধু একালের নয়। ভারতে, বিশেষ করে পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত দেশে কয়েক হাজার বছর আগে হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা জানা গেছে। বর্তমানে বড় বড় শহরের হাসপাতালে নানা উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি থাকায় চিকিৎসার সুব্যবস্থা হয়। বর্তমানে অ্যালোপ্যাথিক হাসপাতাল, হোমিওপ্যাথিক হাসপাতাল ও আয়ুর্বেদীয় হাসপাতাল প্রতিষ্ঠিত হয়ে রোগীদের অশেষ সেবা করে যাচ্ছে।

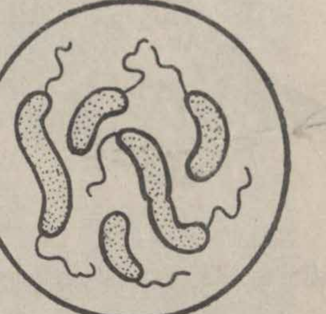
॥ ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল ॥

হাসপাতালের কথা বলার সময়ে সেবাব্রতী ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের কথা এসে যায়। নাইটিংগেল (Florence Nightingale, ১৮২০-১৯১০ খ্রী.) ইটালীতে জন্মগ্রহণ করলেও পিতা-মাতার সঙ্গে লণ্ডনে বাস করতেন। তিনি প্রথমে লণ্ডনে একটি ছোট হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেন।

৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়াতে যুদ্ধ বাধলে তিনি যুদ্ধে আহত সৈনিকদের সেবার ভার নেন। স্কুটারির হাসপাতালে তিনি ৩৮ জন শিক্ষিতা নার্স নিয়ে সৈনিকদের সেবা করেন। তিনি গভীর রাত্রে দীপ হাতে নিয়ে রোগীদের দেখাশোনা করতেন। সেইজন্য তাঁর নাম হয়েছিল The lady with the Lamp—দীপধারিণী মহিলা।

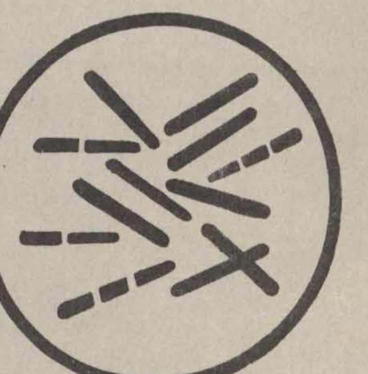
॥ জীবাণুর কথা ॥

বিভিন্ন দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানীরা নানা গবেষণার দ্বারা জানতে পারলেন, অধিকাংশ রোগ জীবাণুর দ্বারা সংঘটিত হয়। এই সব জীবাণু সাধারণ মাইক্রস্কোপ বা অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু বহু জীবাণু এত ক্ষুদ্র যে সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে দেখা যায় না। অতিশক্তিশালী



কলেরার জীবাণু

ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে তাদের দেখা যায়। হেপাটাইটিস (hepatitis), ইনফ্লুয়েঞ্জা



যক্ষ্মার জীবাণু

(influenza), পোলিওমাইলাইটিস (polio-myelitis), হাম (measles) প্রভৃতি রোগের জীবাণু এত ছোট যে তাদের দেখতে গেলে ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্য নিতে হয়। এই সব জীবাণুদের বলে ভাইরাস (virus)।

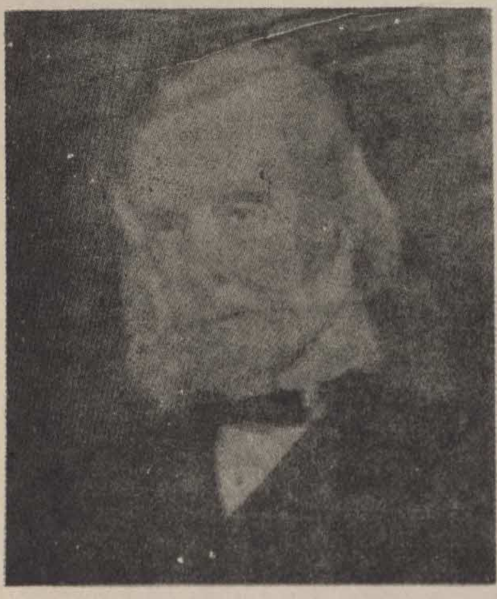
ফরাসী বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর (Louis Pasteur,

১৮২২-১৮৯৫ খ্রী.) জানালেন, জীবাণু দ্বারা নানা



লুই পাস্তুর

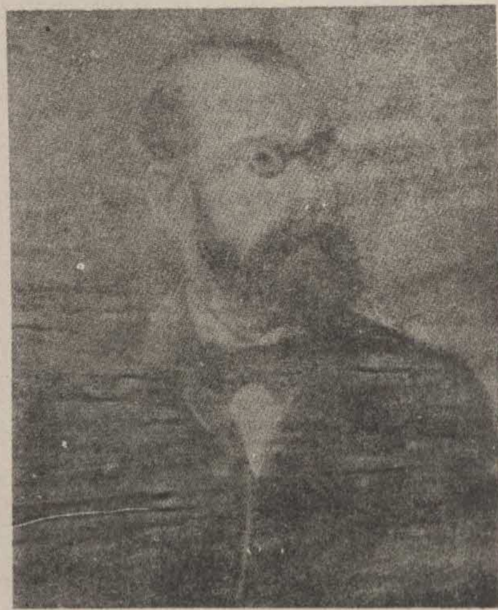
রোগ সংঘটিত হয়। ইংরেজ চিকিৎসক লর্ড লিস্টার



লর্ড লিস্টার

(Lord Lister, ১৮২৭-১৯১২ খ্রী.) গবেষণা করে জলাতঙ্ক ও অ্যানথ্রাক্স (anthrax) রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার করেন।

জার্মান চিকিৎসা-বিজ্ঞানী রবার্ট কক (Robert Kock, ১৮৪৩-১৯১০ খ্রী.) যক্ষ্মার জীবাণু, কলেরার জীবাণু, প্লেগের জীবাণুর সন্ধান পান। তাঁর



রবার্ট কক

যুগান্তকারী আবিষ্কারের ফলে মনুষ্যসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

ইংরেজ চিকিৎসক এডওয়ার্ড জেনার (Edward Jenner, ১৭৪৯-১৮২৩ খ্রী.) গোবসন্তের জীবাণু



এডওয়ার্ড জেনার

মানুষের শরীরের রক্তে অল্প পরিমাণে প্রবেশ



জেনার টিকা দিচ্ছেন

করিয়ে প্রমাণ করলেন, যার শরীরে গোবসন্তের জীবাণু প্রবেশ করানো হল, তার বসন্ত হবার ভয় থাকে না। এইভাবে জীবাণু প্রবেশ করাকে vaccination বা টিকা দেওয়া বলে। এইভাবে টিকা দিয়ে বসন্ত রোগকে প্রায় নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু জলবসন্তের কোন প্রতিষেধক আজও বার করা সম্ভব হয় নি।

পোলিওমাইলাইটিস রোগে ছেলেমেয়েদের প্যারালিসিস হয়। Dr. Salk ও Dr. Sabin শিশুদের infantile paralysis থেকে রক্ষা করার প্রতিষেধক টিকা বার করলেন। ছুঁচ ফুটিয়ে Salk ভ্যাকসিন দিতে হয়, আর Sabin ভ্যাকসিন খাওয়াতে হয়। এই ব্যবস্থার ফলে শিশুদের পোলিওমাইলাইটিস বা পোলিও হবার ভয় বিদূরিত হয়েছে।



স্যার রোনাল্ড রস

ইংরেজ চিকিৎসক স্যার রোনাল্ড রস (Sir Ronald Ross, ১৮৫৭-১৯৩২ খ্রী.) অ্যানোফেলীস মশকীর দ্বারা যে মনুষ্যশরীরে ম্যালেরিয়া রোগের সৃষ্টি হয় তা আবিষ্কার করেন। তিনি কলকাতায় বসে এই আবিষ্কার করেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Sir Alexander Fleming, ১৮৮১-১৯৫৫ খ্রী.) পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। পেনিসিলিনের মতো বহু অ্যান্টিবাইওটিক ঔষধ আবিষ্কৃত হয়েছে, যে-সবের দ্বারা টনসিলের রোগ, যক্ষ্মা, টাইফয়েড, টিটেনাস, ডিপথিরিয়া, হুপিং কাশি প্রভৃতির সুচিকিৎসা হচ্ছে।

ভারতীয় চিকিৎসক উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৫-১৯৪৬ খ্রী.) ইউরিয়া স্টিবামাইন (Eurea Stibamine) আবিষ্কার করলেন। তার দ্বারা কালাজ্বর দেশ থেকে নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

॥ শল্যচিকিৎসা ॥

শল্যচিকিৎসার ইংরেজী সার্জারি (surgery)। বহু রোগ শুধু ঔষধ প্রয়োগে সারে না। সে-সব ক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়।

শল্যচিকিৎসা করতে গেলে কাটা ছেঁড়া করতে হয়, তাতে রোগী ভীষণ যন্ত্রণাবোধ করে। তা দেখে চিকিৎসকেরাও খুব বিব্রত বোধ করেন। সেই জন্যে রোগীকে ইথার শুঁকিয়ে বা লাফিং গ্যাস (নাইট্রাস অক্সাইড) ব্যবহার করে তার দেহে অস্ত্রোপচার করার ব্যবস্থা হল। আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল যখন ডাঃ সিম্পসন (Sir James Young Simpson, ১৮১১-১৮৭০ খ্রী.) ক্লোরোফরম ব্যবহার করে রোগীকে অচেতন করিয়ে অস্ত্রোপচারের ব্যবস্থা করলেন।

সিম্পসন ক্লোরোফরম ব্যবহার করতে শুরু করলেও তার আবিষ্কর্তা জার্মান চিকিৎসক জুস্টুস বারোন ফন লাইবিগ (Justus Baron von Liebig)।

রোগীকে অচেতন করে বর্তমানে টিউমার, কিডনি, অ্যাপেনডিক্স, গল ব্লাডার প্রভৃতি কেটে বাদ দেওয়া হচ্ছে। কোন কোন প্রত্যঙ্গের পরিবর্তন করা হচ্ছে। এমন কি হৃদ্‌যন্ত্রেরও অপসারণ ও কৃত্রিম হৃদ্‌যন্ত্র সংস্থাপন হচ্ছে।

॥ এক্সরে ॥

বাংলায় যাকে রঞ্জনরশ্মি বা রন্টজেন রশ্মি



রোণ্টগেন

বলা হয় তা-ই হচ্ছে এক্স-রে (X-Ray) বা অজ্ঞাত রশ্মি। জার্মান বিজ্ঞানী অধ্যাপক উইলহেলম কনরাড



হাতের হাড়

রোণ্টগেন (Prof. Wilhelm Konrad Rontgen, ১৮৪১-১৯২৩ খ্রী.) বিজ্ঞানাগারে গবেষণাকালে আকস্মিকভাবে এক্স-রে আবিষ্কার করেন। তার সাহায্যে শরীরের মধ্যকার হাড়, ফুসফুস ইত্যাদির আলোকচিত্র নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

॥ হোমিওপ্যাথি ও অ্যালোপ্যাথি ॥

অ্যালোপ্যাথি (allopathy), হোমিওপ্যাথি (homeopathy), আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসাপদ্ধতি, হেকিমী প্রভৃতি নানা ধরনের চিকিৎসার সাহায্যে রোগনিরাময়ের চেষ্টা করা হয়। জার্মান চিকিৎসক স্যামুয়েল ক্রিডরিখ হানিমান (Samuel Christian Friedrich Hahnemann, ১৭৫৫-১৮৪৩ খ্রী.) হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাপদ্ধতি আবিষ্কার করেন। । যে জিনিসে কোন রোগের সৃষ্টি হয় তা অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োগের দ্বারা হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করা হয়।

অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসাপদ্ধতির প্রসারই সারা পৃথিবীতে বেশী। জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশে অ্যালোপ্যাথিক (allopathic) ঔষধের অসংখ্য বড় বড় কারখানা তৈরী হয়েছে। হেকিমী চিকিৎসা সাধারণতঃ মুসলমানী প্রথায় করা হয়।

॥ ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ ॥

ফরাসী আবিষ্কারক কার্টিয়ের (Jacques Cartier, ১৪৯১-১৫৫৭ খ্রী.) যখন জাহাজে করে নিউ ফাউণ্ডল্যাণ্ডের দিকে যান তখন তাঁর জাহাজের বহু লোক স্কার্ভি রোগে (scurvy) ভুগে মারা যায়।

বিখ্যাত নাবিক কাপ্টেন জেমস কুক (Captain James Cook, ১৭২৮-১৭৭৯ খ্রী.) সঙ্গে করে ফলের রস, বিশেষ করে লেবুর রস নিয়ে যান। তাই খেয়ে তাঁর জাহাজের লোকজনেরা রোগের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়।



কার্টিয়ের

ইংরেজ চিকিৎসক স্যার হপকিনস (Sir Frederick Hopkins, ১৮৬১-১৯৪৭ খ্রী.) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রবাসী পোল্যাণ্ডের ডাক্তার ফুঙ্ক (Casimir Funk, ১৮৮৪-১৯৬৭ খ্রী.) ও হল্যাণ্ডের একজন ডাক্তার খাদ্যপ্রাণের নাম দেন ভিটামিন।

আইকমান (Christiaan Eijkman) ও



আইকমান

অন্যান্য বহু গবেষকের দ্বারা বিভিন্ন সময়ে বহু ধরনের ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে।



নোবেল পুরস্কার

মানুষ বহুকাল আগে থেকে বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করে আসছে। খ্রীষ্টজন্মের পূর্বে চীন দেশে বারুদ আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু ইউরোপ থেকে ১৪শ শতাব্দীতে পৃথিবীর নানা দেশে বারুদ রপ্তানী হয়।

পটাসিয়াম নাইট্রেট (সল্টপিটার), কাঠকয়লা ও গন্ধকের মিশ্রণে আগে বারুদ তৈরী হত। ১৯শ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত সেই পদ্ধতিতে বারুদ তৈরী হতে থাকে।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে Schoenbein নামে একজন জার্মান রসায়নবিদ্ তুলার আঁশের সঙ্গে ঘনীভূত নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশিয়ে এক-ধরনের সাদা তুলার আঁশের মতো পদার্থের সৃষ্টি করেন। তার নাম নাইট্রো সেলুলোজ বা গান-কট্ন্। সাধারণ বারুদের চেয়ে এই নব-সৃষ্ট পদার্থটি অপেক্ষাকৃত বেশী শক্তিশালী বিস্ফোরক বলে প্রমাণিত হয়।

প্রায় একই সময়ে Ascanio Sobrero নামে একজন ইতালীয় সাধারণ গ্লিসারিন নিয়ে পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন। তিনি কড়া নাইট্রিক ও সালফিউরিক অ্যাসিডের উপরে সেই গ্লিসারিন ফোঁটা ফোঁটা ফেললে যে নাইট্রো-গ্লিসারিনের সৃষ্টি হল তা গান-কট্নের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী হল।

॥ ডিনামাইট আবিষ্কার ॥

এর প্রায় ২০ বৎসর পরে সুইডিশ রসায়নবিদ্ ও এঞ্জিনীয়ার আলফ্রেড বার্নহার্ড নোবেল (Alfred Bernhard Nobel, ১৮৩৩-৯৬ খ্রী·) ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে ডিনামাইট আবিষ্কার করেন।

নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে নাড়াচাড়া করা খুব বিপজ্জনক। সহজেই তা বিস্ফোরিত হয়ে বিপদ ঘটায়। একদিন তিনি আগ্নেয়গিরিজ হালকা মৃত্তিকা কিজল্গুর (kieselguhr)-এর বাক্স করে কয়েক পাত্র নাইট্রোগ্লিসারিন নিয়ে যাচ্ছিলেন। একটা পাত্র থেকে ছিদ্রপথে কিছু নাইট্রোগ্লিসারিন নিঃসৃত হয়। তা কিজল্গুরের সঙ্গে মিশে কঠিন পদার্থে পরিণত হয়। এই পদার্থই ডিনামাইট।



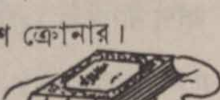
আলফ্রেড নোবেল

তা নাড়াচাড়া করা অপেক্ষাকৃত নিরাপদ্ ও বারুদের চেয়ে আটগুণ শক্তিশালী।

॥ নোবেলের উইল ॥

নোবেল ছিলেন অকৃতদার ও পরোপকারী। তিনি পাহাড় ফাটিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করা, কয়লার খনিতে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে কয়লা নিষ্কাশন, পাথুরে জায়গায় খাল কাটা প্রভৃতির জন্য ডিনামাইট আবিষ্কার করেন। ওই সব কাজ ডিনামাইট দ্বারা ভালোভাবে হলেও মানুষ যুদ্ধের সময় ডিনামাইট ব্যবহার করতে থাকল। তার ফলে বহু লোক মারা পড়তে থাকল। এতে নোবেল খুব ব্যথিত হলেন। তিনি তাঁর স্বোপার্জিত অর্থ ও সম্পত্তি মানবজাতির কল্যাণের জন্য দান করে যান। মৃত্যুর এক বৎসর পূর্বে তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি উইল করে যান। অর্থ ও সম্পত্তির মূল্য ছিল ৯২ লক্ষ ডলার। বর্তমানে মূল্য ৫০ কোটি সুইডিশ ক্রোনার।

॥ নোবেল পুরস্কার ॥



নোবেল সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সম্পত্তির আয় থেকে বৎসরে পাঁচটি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়। এই পাঁচটি বিষয়—পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শান্তি।

॥ নোবেল ফাউণ্ডেশন ॥



নোবেলের মৃত্যুবার্ষিকী দিবস ১০ই ডিসেম্বর এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ওই দিবসে নোবেল ফাউণ্ডেশন নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। নোবেল পরলোকগমন করেন ১৮৯৬ সালে। কিন্তু প্রথম পুরস্কার দেওয়া হয় ১৯০১ সালে। এত দেরি হওয়ার কারণ, নোবেলের সব সম্পত্তি আটটি দেশে ছড়ানো ছিল। নোবেলের আত্মীয়স্বজনরা ও ওই সব দেশের সরকার বিরোধিতা করায় অনেক মামলার সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত সম্পত্তির ভার অর্পিত হয় একটি প্রতিষ্ঠানের উপর, যার নাম নোবেল ফাউণ্ডেশন।

ঠিক হয়, সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের পুরস্কার দেবেন, চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞানের পুরস্কার দেবেন সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের বা স্টকহোলমের ক্যারোলিংস্কা ইনস্টিটিউট, সাহিত্যের পুরস্কার দেবেন স্টকহোমের বা স্টকহোলমের অ্যাকাডেমি ও শান্তির পুরস্কার দেবেন নরওয়ের পার্লামেণ্ট (স্টর্টিং)। অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের সদস্য-সংখ্যা ২৪০। তন্মধ্যে ১৪০ জন সুইডিশ ও বাকী ১০০ জন বিদেশী।

প্রতি বৎসর ৩১শে জানুয়ারি পুরস্কারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। কিন্তু পুরস্কার দেওয়া হয় ১০ই ডিসেম্বর।

নোবেল পুরস্কার বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে

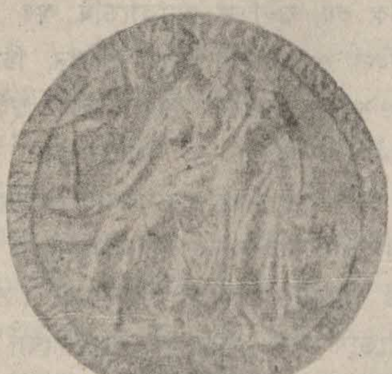
গৌরবময় পুরস্কার। এই পুরস্কার বিতরণের ব্যাপারে দেশ বা জাতির বিচার করা হয় না। অত্যন্ত গোপনীয় ভাবে পুরস্কার-প্রাপকের নাম নির্বাচিত করা হয়।

॥ অর্থবিদ্যায় পুরস্কার ॥

প্রথমদিকে পাঁচটি বিষয়ে পুরস্কার দেওয়ার কথা ঘোষিত হলেও ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থবিদ্যায় আর একটি পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

॥ নোবেল পুরস্কারের মূল্য, মেডল্‌ ও সার্টিফিকেট ॥

১৯৮০ সালে প্রতিটি পুরস্কারের মূল্য ধার্য হয় ৮,৮০,০০০ সুইডিশ ক্রোনার (৮৮,৬২০ পাউণ্ড)। বর্তমানে প্রায় ২০ লক্ষ টাকা। পুরস্কারের অর্থদানের সঙ্গে একটি সোনার মেডল্‌ দেওয়া হয়। তার এক পিঠে আলফ্রেড নোবেলের প্রতিকৃতি থাকে।



জ্ঞানের দেবী

পদার্থবিদ্যা ও রসায়নের মেডলের অন্য পিঠে দেখানো হচ্ছে প্রকৃতির মুখ থেকে জ্ঞানের দেবী অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করছেন। চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞানের মেডলের অন্য পৃষ্ঠে দেখানো হচ্ছে আরোগ্যদায়িনী দেবী অসুস্থ ব্যক্তিকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন।

অর্থ ও সোনার মেডল্‌ ছাড়া একটি করে ডিপ্লোমাও দেওয়া হয়।

॥ সব চেয়ে বেশী পুরস্কার লাভ ॥

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে হিসাবে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সব চেয়ে বেশী নোবেল পুরস্কার লাভ করেছে। পদার্থবিদ্যায় ৪২, রসায়নে ২২, চিকিৎসাবিদ্যা ও



আরোগ্যদায়িনী দেবী

শারীর বিজ্ঞানে ৫৪, সাহিত্যে ৯, শান্তি বিষয়ে ১৭ ও অর্থনীতিতে ৮ জন মোট ১৫২ জন নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন।

যুক্তরাজ্য পেয়েছে মোট ৭৩টি। পদার্থবিদ্যায় ২০, রসায়নে ২২, চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞানে ১৪, শান্তি বিষয়ে ৯, সাহিত্যে ৫ এবং অর্থবিদ্যায় ৩ জন মনীষী নোবেল পুরস্কার জয় করেছেন।

জার্মানী রসায়নে ২২টি পুরস্কার লাভ করেছে। ফ্রান্স সাহিত্যে ১২টি পুরস্কার পেয়েছে।

॥ এক ব্যক্তির একাধিকবার পুরস্কার লাভ ॥

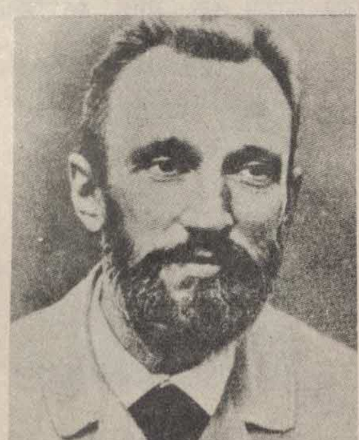
সাধারণতঃ এক ব্যক্তি একবার করে নোবেল

পুরস্কারবিজয়ী হয়েছেন কিন্তু কয়েকজন একই ব্যক্তি দুটি করে পুরস্কার পেয়েছেন। কালিফোর্নিয়ার অধ্যাপক Dr. Linus Carl Pauling (জন্ম ১৯০১ খ্রী.) ১৯৫৪ সালে রসায়নে ও ১৯৬২ সালে



মেরী ক্যুরি

শান্তি বিষয়ে পুরস্কার পান। ম্যাডাম মেরী ক্যুরি



পিয়েরে ক্যুরি

(Madame Marie Curie, ১৮৬৭—১৯৩৪ খ্রী.) ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্বামী পিয়েরে ক্যুরি (Pierre Curie, ১৮৫৯—১৯০৬ খ্রী.) ও আঁরি বেকারেল (Antoine Henri Becquerel, ১৮৫২—১৯০৮ খ্রী.)-এর সহিত একযোগে পদার্থবিদ্যায় নোবেল



ম্যাডাম ক্যুরি, পিয়েরে ক্যুরি ও আইরিন ক্যুরি

পুরস্কারজয়ী হন। পরে ম্যাডাম ক্যুরি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে এককভাবে রসায়নে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। অধ্যাপক জন বারডীন (জন্ম ১৯০৮ খ্রী.) ১৯৫৬ ও ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় পুরস্কারজয়ী হন। অধ্যাপক ফ্রেডারিক স্যাংগার (জন্ম ১৯১৮ খ্রী.) ১৯৫৮ ও ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নে পুরস্কার পান। রেডক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি ১৯১৭, ১৯৪৪ ও ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

॥ বেশীবয়স্ক ব্যক্তির পুরস্কার লাভ ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধ্যাপক ফ্র্যান্সিস পিটন রাউস (Francis Peyton Rous, ১৮৭৯—১৯৭০ খ্রী.) ৮৭ বৎসর বয়সে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনিই সর্বাপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ নোবেল পুরস্কারবিজয়ী।

॥ কমবৎসরবয়স্ক নোবেল পুরস্কার-জয়ী ॥

অধ্যাপক স্যার উইলিয়াম লরেন্স ব্র্যাগ (William Lawrence Bragg, ১৮৯০—১৯৭১ খ্রী.) ২৫ বৎসর বয়সে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর পিতা স্যার উইলিয়াম হেনরী ব্র্যাগ (William Henry Bragg, ১৮৬২ – ১৯৪২ খ্রী.)-এর সহযোগে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার পান। যোসেফ রুডিয়ার্ড কিপলিং (Joseph Rudyard Kipling, ১৮৬৫—১৯৩৬ খ্রী.) ১৯০৭ সালে ৪১ বৎসর বয়সে সাহিত্যে পুরস্কার লাভ করেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রেভারেণ্ড ডঃ মার্টিন লুথার কিং, জুনিয়ার (Rev. Dr. Martin Luther King, Jr, ১৯২৯—



মার্টিন লুথার কিং

১৯৬৮ খ্রী.) ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫ বৎসর বয়সে শান্তি বিষয়ে পুরস্কার অর্জন করেন।

॥ উল্লেখযোগ্য পুরস্কারবিজয়ীদের নাম ॥

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পাঁচটি বিষয়ে এবং ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ছয়টি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। তাঁদের সকলের নামের উল্লেখ করতে গেলে এই পুস্তকের বেশ কয়েক পৃষ্ঠা লেগে যাবে। কাজেই সকলের নামোল্লেখ না করে মাত্র কয়েকজনের নাম জানানো হল।

॥ পদার্থবিদ্যা ॥

জার্মান ডবলিউ সি. রোণ্টগেন (১৯০১), ফরাসী এইচ. বেকারেল (১৯০৩), জার্মান এফ. ব্রন ও ইতালীয় মার্কোনি (১৯০৯), ইংরেজ ডব্লিউ. এইচ. ব্র্যাগ



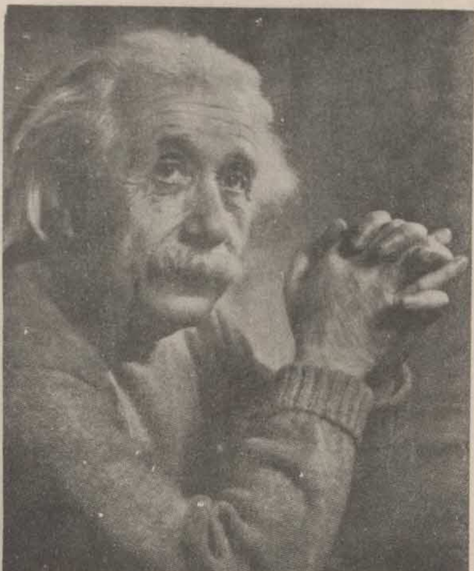
মার্কোনি

ও ইংরেজ ডব্লিউ এল ব্র্যাগ, জার্মান এম. প্ল্যাঙ্ক



পরিণত বয়সে মার্কোনি

(১৯১৮), জার্মান এ. আইনস্টাইন (১৯২১), ডেনিশ এন. বোর (১৯২২), জার্মান জে. ফ্র্যাঙ্ক ও জার্মান জি. হের্ৎজ (১৯২৫), ভারতীয় সি. ভি রমন (১৯৩০), ইতালীয় ই ফার্মি (১৯৩৮)।



আলবার্ট আইনস্টাইন

॥ রসায়ন ॥

ডেনিস জে. এইচ. হফ্ (১৯০১), জার্মান ই. ফিশার (১৯০২), ব্রিটিশ ই. রাদারফোর্ড (১৯০৮), ফরাসী মেরী ক্যুরি (১৯১১), ফরাসী এফ. জোলিও,

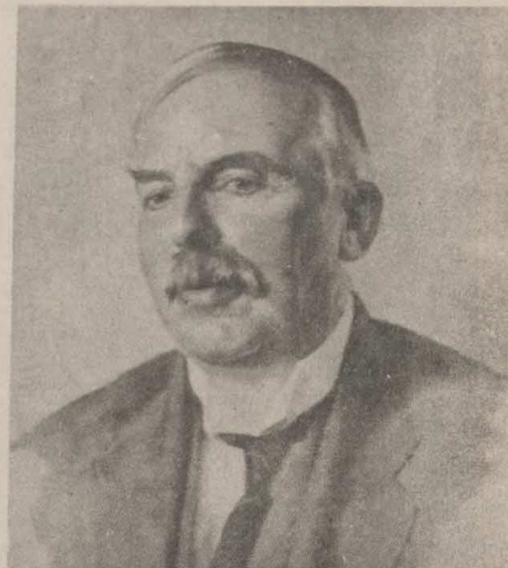


ফার্মি

ফরাসী আই. জোলিও ক্যুরি (১৯৩৫), জার্মান অটো হান (১৯৪৪)।

॥ চিকিৎসাবিদ্যা ও শারীর বিজ্ঞান ॥

জার্মান ই. ভি. বেরিং (১৯০১), ব্রিটিশ আর. রস (১৯০২), জার্মান আর. কক (১৯০৫), ক্যানা-



রাদারফোর্ড

ডিয়ান এফ. জি. ব্যানটিং (১৯২৩), ব্রিটিশ স্যার এ. ফ্লেমিং, স্যার এইচ ফ্লোরে. ও ই. বি. চেন (১৯৪৫),



রোনাল্ড রস

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় এস. ওয়াকসম্যান (১৯৫২), ভারতীয় হরগোবিন্দ খোরানা (১৯৬৮)।

॥ সাহিত্য ॥

ফরাসী আর. এফ. এ. সুলি প্রুধোম (১৯০১) জার্মান টি মমসেন (১৯০২), পোলিশ এইচ. সিয়েঙ্কিয়েউইজ (১৯০৫), ব্রিটিশ রুডিয়ার্ড কিপলিং



আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

(১৯০৭), সুইডিশ সেলমা লাগেরলফ (১৯০৯), বেলজিয়ান এম. মেটারলিঙ্ক (১৯১১), জার্মান জি. হাউপ্টম্যান (১৯১২), ভারতীয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

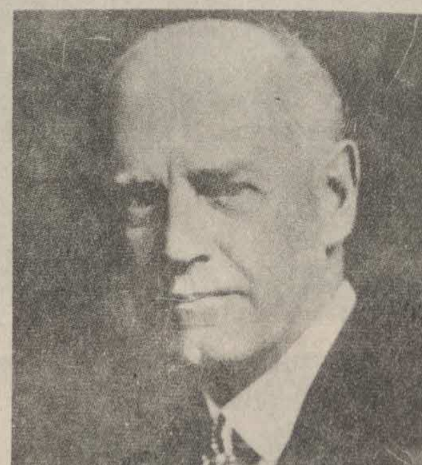


আনাতোলে ফ্রান্স

(১৯১৩), নরওয়েজিয়ান ন্যুট হামসুন (১৯২০), ফরাসী আনাতোলে ফ্রান্স (১৯২১), আইরিশ ডবলিউ. বি ইয়েটস (১৯২৩), ব্রিটিশ জর্জ বার্নার্ড শ' (১৯২৪), ইতালীয় জি. দেলেদ্দা (১৯২৬), ফরাসী আঁরি বার্গসঁ (১৯২৭), নরওয়েজিয়ান এস. আনড্‌সেট (১৯২৮), জার্মান টি. মান (১৯২৯), মার্কিন যুক্ত-

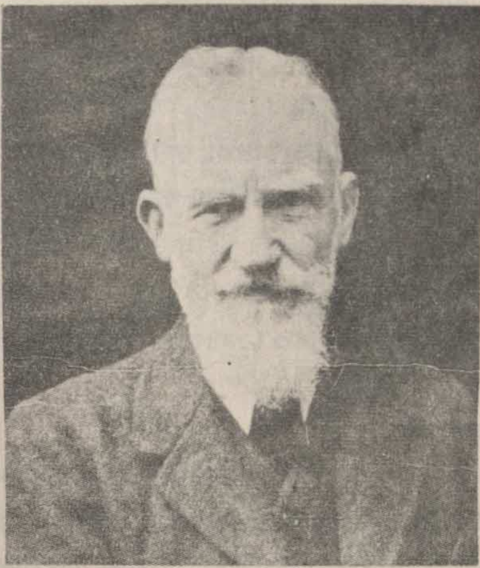


ইয়েট্‌স্



জন গলস্‌ওয়ার্দি

রাষ্ট্রীয় এস. লিউয়িস (১৯৩০), ব্রিটিশ জন গলস-ওয়ার্দি (১৯৩২), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ই. ও'. নীল (১৯৩৫), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্ল এস. বাক (১৯৩৮), ব্রিটিশ টি. এস. ইলিয়ট (১৯৪৯), ব্রিটিশ লর্ড রাসেল (১৯৫০), ব্রিটিশ স্যার ডবলিউ এস. চার্চিল (১৯৫৩), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় ই. হেমিংওয়ে (১৯৫৪), রাশিয়ান বি প্যাস্তারন্যাক (১৯৫৮), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় জে. স্টাইনবেক (১৯৬২), রাশিয়ান এম. শোলোখভ (১৯৬৫), জাপানী ওয়াই. কাওয়াবাতা (১৯৬৮), আইরিশ স্যামুয়েল বেকেট (১৯৬৯), চিলির পাবলো নিরুদা (১৯৭১)।



বার্নাড শ'



চার্চিল



পার্ল এস. বাক

॥ শান্তি ॥



বরিস প্যাস্তারন্যাক



স্টাইনবেক



হ্যামারশীল্ড

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় টি. রুজভেল্ট (১৯০৬), নরওয়েজিয়ান এফ· নানসেন (১৯২২), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় এফ. বি· কেল্লগ (১৯২৯), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় জেনারেল জি· মার্শ্যাল (১৯৫৩), সুইডিশ ডি. হ্যাম্যারশীল্ড (১৯৬১), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় মার্টিন লুথার কিং (১৯৬৪), পশ্চিম জার্মানির উইলি ব্র্যাণ্ড্ট্ (১৯৭১), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় হেনরী কিসিংগার (১৯৭৩), রাশিয়ার এ· শাখারভ (১৯৭৫)। মাদার টেরেসা (১৯৭৯)।

॥ অর্থবিদ্যা ॥

নরওয়েজিআন র‍্যাগনার ফ্রিশ ও হল্যাণ্ডের টিনবার্গেন (১৯৬৯), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় স্যামুয়েলসন (১৯৭০), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রীয় সাইমন কুজনেটস (১৯৭১), জন হিকস (১৯৭২), কেনেথ অ্যারো ভ্যাসিলি লিওটিয়েফ (১৯৭৩)।



মাদার টেরেসা

॥ পুরস্কারবিজয়ী নির্বাচনে ত্রুটি ॥

নোবেল পুরস্কারবিজয়ীর তালিকা দেখলে বুঝতে পারা যায়, নোবেল কমিটি প্রধানতঃ ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার মনীষীদের মনীষারই বিচার করেন। এশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, ভারত ও অন্যান্য স্থানের সম্বন্ধে তাঁদের তথ্যানুসন্ধানকে ত্রুটিমুক্ত বলা চলে না। ভারতের আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু প্রকৃতই বেতারের আবিষ্কারক। তাছাড়া ধাতুর প্রাণ আছে বলে তিনি জানান। উদ্ভিদ্‌তত্ত্বে তাঁর সমতুল্য ব্যক্তি পৃথিবীতে নেই বললেই চলে। অথচ তাঁকে কোন পুরস্কার দেওয়া হয় নি। মাদার টেরেসা শান্তি পুরস্কার পেলেন। অথচ আচার্য বিনোবা ভাবে, মহাত্মা গান্ধীকে শান্তি পুরস্কার দেওয়া হল না। সাহিত্যের দিক্ দিয়েও বহু ভারতীয় সাহিত্যিকের স্থান খুব উচ্চে। তাঁদের সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয় নি।

মেরু অভিযান



পৃথিবীর সর্বদক্ষিণ প্রান্তকে বলে দক্ষিণমেরু বা কুমেরু। আর সর্বোত্তর প্রান্তকে বলে উত্তর-মেরু বা সুমেরু। দুই প্রান্তেই প্রচণ্ড শীত। বৎসরের সকল সময়ে কুমেরু ও সুমেরু বরফে ঢাকা থাকে। কুমেরু ও সুমেরু অঞ্চল জনমানবহীন এই দুটি স্থানে গাছপালা, জীবজন্তুরও দেখা মেলে না।

দুর্গমের প্রতি দুঃসাহসী মানুষের চিরকালই প্রবল আগ্রহ। বহুকাল থেকে ওই বরফে ঢাকা প্রচণ্ড শীতের জায়গায় যাবার জন্য লোকে চেষ্টা করে আসছে।



॥ কুমেরুর সঙ্গে সুমেরুর পার্থক্য ॥

কুমেরুর সঙ্গে সুমেরুর অনেক পার্থক্য। কুমেরু অঞ্চল বা অ্যান্টার্কটিকা (Antarctica) প্রায় ৩০৫ থেকে ৬১০ মিটার পুরু বরফে ঢাকা। সুমেরু অঞ্চলের নীচে ডাঙা নেই, আছে শুধু জল। সেই জলের উপর অতি কঠিন বরফের স্তর। কুমেরু অঞ্চল পুরু বরফে ঢাকা ডাঙা।



কুমেরু অঞ্চল

কুমেরু অঞ্চলের তটরেখা ২২,৫৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ। তার মধ্যে মাত্র ৬,৪৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ স্থান বরফে ঢাকা নয়। বাকী সবটাই চিরতুষারে আচ্ছাদিত।



॥ কুমেরু অঞ্চলের আগ্নেয়গিরি ॥

কুমেরু অঞ্চলে অনেক পাহাড় আছে। সে-সব শত শত মিটার উঁচু। পাহাড়গুলিও তুষারাবৃত। অনেক পাহাড় শুধু কঠিন বরফ দিয়ে গড়া। এমন অদ্ভুত ব্যাপার যে এই চিরতুষারাবৃত অঞ্চলেও আগ্নেয়গিরি আছে। সে সবের মধ্যে এরেবাস (Erebus) ৩,৭৯৫ মিটার উঁচু। এটি জীবন্ত বা সক্রিয় (active)। এরেবাস অ্যান্টার্কটিকার রস আইল্যাণ্ডে অবস্থিত। এই সক্রিয় আগ্নেয়গিরির ভিতরটা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড, কিন্তু উপরটা কঠিন তুষারে আবৃত। ক্যাপ্টেন জেমস ক্লার্ক রস (Captain James Clark Ross, ১৮০০-৬২ খ্রী.) এই আগ্নেয়গিরিটি আবিষ্কার করেন। অধ্যাপক ট্যান্যাট উইলিয়াম এজওয়ার্থ ডেভিড (Professor Tannatt William Edgeworth David, ১৮৫৮—১৯৩৪ খ্রী)-এর নেতৃত্বে পাঁচজন ব্রিটিশের একটি দল ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই মার্চ প্রথম এই আগ্নেয়গিরির শৃঙ্গে আরোহণ করেন।

অ্যান্টার্কটিকার সর্বোচ্চ পর্বত ভিনসেন ম্যাসিফ ৫,১৪০ মিটার উঁচু।



তুষারাবৃত পর্বত

আগে লোকে তিমি, সীল প্রভৃতি শিকারের জন্যে ও কয়লার জন্যে প্রায় দেড় শতাব্দী কাল ধরে সুমেরু অঞ্চলে অভিযান চালিয়েছে।



তিমি শিকার

॥ দক্ষিণে চলো ॥

তখনকার দিনে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের লোকেরা বলত 'দক্ষিণে চলো' (Southward



কুমেরু অঞ্চলে বরফের স্তূপ

ho)! তারা কুমেরু অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে একটি বিস্ময়কর তথ্য আবিষ্কার করেছিল। তুষারাবৃত অঞ্চলের তলায় কয়লা পাওয়ার ফলে মনে হয়, সেই অঞ্চল একদিন অরণ্যময় ছিল। সেই সব অরণ্য কয়লায় পরিণত হয়ে গেছে।

তিমি, সীল প্রভৃতি শিকারীরা দক্ষিণ শেটল্যাণ্ড, দক্ষিণ জর্জিয়া প্রভৃতি দ্বীপ আবিষ্কার করে।



॥ দুঃসাহসী অভিযান ॥

শুধু যে কয়লা সংগ্রহ বা তিমি-সীল শিকারের



সীল শিকার

জন্য দুঃসাহসী লোকেরা অপরিসীম দুঃখকষ্ট বরণ



ক্যাপ্টেন কুক

করে, মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে কুমেরু অঞ্চলে যেতেন, তা নয়। তাঁরা বিভিন্ন তথ্য আহরণ করার জন্যে অভিযান চালাতেন। এইরকম দুঃসাহসী অভিযাত্রী ছিলেন জেমস ওয়েডেল (James Weddell) ও জন বিসকো (John Bisco)। তাঁদের সংগৃহীত

বহু তথ্য পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে।

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার ভাইকিংরা দেড়শ বছর ধরে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে অ্যাণ্টার্কটিকায় কাঠের জাহাজে করে যায়। তারাও অনেক কথা ইউরোপের লোককে শোনায়।

যে বাষ্পীয় পোত প্রথম অ্যাণ্টার্কটিকা পার হয়, তার নাম দ্য চ্যালেঞ্জার। ক্যাপ্টেন জেমস কুক (James Cook, ১৭২৮-১৭৭৯ খ্রী.) তাতে করে অ্যাণ্টার্কটিকা পার হন।



॥ নানা দ্বীপ ও সাগর আবিষ্কার ॥

ক্যাপ্টেন ভন বেলিংহাউসেন (Captain von Bellinghausen) একটি রুশ দল নিয়ে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবী পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েন। তিনি আলেকজাণ্ডার দ্য ফার্স্ট দ্বীপ ও পীটার দ্য ফার্স্ট দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

এর পর বহু যাত্রী কুমেরু অঞ্চলে অভিযান চালান ও বহু দ্বীপ ও সাগর আবিষ্কার করেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েডেল যে সাগর আবিষ্কার করেন তারই নাম ওয়েডেল সাগর।

বিসকো অ্যাডেলেড দ্বীপ, বিসকো দ্বীপপুঞ্জ, গ্রাহাম দ্বীপ আবিষ্কার করেন।

আগ্নেয়গিরিময় ব্যালিনী দ্বীপপুঞ্জ যাঁর আবিষ্কার তাঁর নাম জন ব্যালিনী (John Balleny)। ব্যালিনীকে কয়েকদিন তাঁর আবিষ্কৃত ব্যালিনী দ্বীপপুঞ্জে কাটাতে হয়েছিল। তাঁর জাহাজ মেরামত করতে তাঁর দ্বীপে তাঁবু খাটিয়ে থাকতে হয়। সেই সময়ে তিনি বেশ কিছু জীবাশ্ম, আগ্নেয় প্রস্তর প্রভৃতি সংগ্রহ করেন।

মার্কিন অভিযাত্রী চার্লস উইলকিস (Charles Wilkes, ১৭৯৮—১৮৭৭ খ্রী.) ও স্কটিশ অভিযাত্রী স্যার জেমস ক্লার্ক রস (Sir James Clark Ross, ১৮০০—১৮৬২ খ্রী.)-এর সঙ্গে অভিযানে বেরিয়ে ফরাসী নৌবিভাগের লোক দ্য উরভিল (D' Urville) তিন বৎসর ধরে ঘুরে উরভিল সাগর আবিষ্কার করেন।

॥ দক্ষিণ মেরুবিন্দু আবিষ্কারের জন্য যাত্রা ॥

স্যার জেমস ক্লার্ক রস এরেবাস ও টেরর নামে ২টি জাহাজ নিয়ে দক্ষিণ মেরুবিন্দু আবিষ্কারে বহির্গত হলেন। সঙ্গী হলেন ক্রোজিয়ার (Crozier)। তিনি গ্রেট আইস ব্যারিয়ার পার হয়ে গেলেন। ভিকেটারিয়া ল্যাণ্ড তিনিই আবিষ্কার করেন ও তার নামকরণ করেন। মাউন্ট স্যাবিন (৩,০৪৮ মিটার উঁচু) তাঁরই আবিষ্কার। মাউন্ট এরেবাস ও মাউন্ট টেরর জেমস রসেরই আবিষ্কার। রস ৭৮ ডিগ্রী ৫০ মিনিট পর্যন্ত গিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হন। দক্ষিণ মেরুকেন্দ্রে পৌঁছনো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

১৮৭৪ খ্রী. স্যার জর্জ নেয়্যারস (Sir George Nares, ১৮৩১—১৯১৫ খ্রী.) দ্য চ্যালেঞ্জার নামে এক বাষ্পীয় জাহাজ নিয়ে অ্যাণ্টার্কটিকায় গিয়েছিলেন।

১৮৯৭ সালে বেলজিকা জাহাজে করে বেলজিয়ান অভিযাত্রী অ্যাড্রিয়েন দ্য গার্লাচি অ্যাণ্টার্কটিকায় যাত্রা করলেন। সঙ্গে ছিলেন দুঃসাহসী মেরু-অভিযাত্রী আমানসেন। কিন্তু উত্তর-মেরু প্রদেশের চেয়েও দক্ষিণমেরু প্রদেশে শীত অনেক বেশী। তুষারঝঞ্ঝার প্রকোপও প্রচণ্ড। তাঁদের জাহাজ বরফের মধ্যে জমে গিয়েছিল। তাঁরা শীত সহ্য করতে না পেরে অন্য একটি স্টীমারে করে ফিরে এলেন।



॥ বরফের স্তরের নীচে নদী ॥

নরওয়েজিয়ান অভিযাত্রীদের এক দল অ্যান্টার্কটিকায় গিয়েছিলেন। তাঁদের দলের



বরফের নীচে নদী

নিকোলাই হ্যানসেন শীত সহ্য করতে না পেরে মারা গেলেন। সেখানকার বরফ এত কঠিন যে হ্যানসেনকে কবর দিতে গিয়ে বরফ খুঁড়তে পারলেন না। পরে ডিনামাইট দিয়ে বরফ ফাটিয়ে হ্যানসেনকে কবর দিলেন। তাঁরা লক্ষ্য করলেন, কঠিন বরফের স্তরের নীচ দিয়ে একটা নদী বয়ে গেছে।

দক্ষিণমেরু প্রদেশে শীতকালে কোন জীবজন্তু দেখা যায় না। শুধু গ্রীষ্মকালে সাগরের ধারে পেঙ্গুইনদের দেখা যায়। জলে সীল ও সিন্ধুঘোটক দেখতে পাওয়া যায়।



॥ স্কটের অভিযান ॥

ডিভনপোর্টের রবার্ট ফকন স্কট (Robert Falcon Scott, ১৮৬৮—১৯১২ খ্রী) ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে স্যার আর্নেস্ট হেনরী শ্যাকলটন (Sir Earnest Henry Shackleton, ১৮৭৪ – ১৯২২ খ্রী.), ডাঃ ই. এ. উইলসন ও আরও কয়েকজনের সঙ্গে ডিসকভারি (Discovery)-নামক জাহাজে করে মেরু-অভিযানে যাত্রা করেন।

স্কট রস দ্বীপের টেরর পাহাড়ের নীচে নেমে পরে গ্রেট ব্যারিয়ার ধরে পুবদিকে চললেন। তিনি এক ভূভাগ আবিষ্কার করে তার নাম দিলেন কিং এডওয়ার্ড দ্য সেভেনথ ল্যাণ্ড।

ম্যাকমার্ডো সাউণ্ড (Mcmurdo Sound)-এ তিনি সারা শীতকাল কাটিয়ে দিলেন। সে কী দুর্জয় শীত! তুষারঝঞ্ঝাও সন্ধ্যার পর থেকে মাঝে মাঝে



কুকুরে-টানা স্লেজ গাড়ি

অতি প্রচণ্ড। তারপর এল বসন্ত ঋতু। উইলসন শ্যাকলটনকে নিয়ে কুকুরে-টানা স্লেজে করে দক্ষিণের অতি দুর্গম পথ দিয়ে যাত্রা করলেন।

পথে শীত, ঝঞ্ঝা, ক্ষুধা, অবসাদ প্রভৃতির জন্যে সব কুকুর মারা গেল। শ্যাকলটনের হল স্কার্ভি রোগ। তিনি অতিশয় দুর্বল হয়ে পড়লেন। বাধ্য হয়ে অভিযানের লোকদের ৮২° ১৭′ দক্ষিণ অক্ষাংশে পৌঁছে ফিরে আসতে হল (১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দ)। সকলেই বিস্ময়ে লক্ষ্য করল, একজন শীর্ণকায় ব্যক্তি ইংল্যাণ্ডে ফিরে এসেছে। তাঁকে চেনাই যাচ্ছিল না। তিনি এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে তাঁর বাড়ির দরজায় শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন। লোকে ধরাধরি করে তাঁকে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। তিনি শ্যাকলটন।

॥ শ্যাকলটনের পুনরায় মেরু-অভিযান ॥

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে হেনরি শ্যাকলটন নিমরড জাহাজে করে পুনরায় মেরু-অভিযানে বেরোলেন। গ্রীষ্মঋতুর শেষাশেষি তিনি কেপ রয়েডে পৌঁছলেন। শীত শুরু হবার আগে তাঁর জাহাজ কিং এডওয়ার্ড দ্য সেভেনথ ল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করল। কিন্তু বরফ পড়ে পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল।

শীতকালটা কাটিয়ে আবার যাত্রা করবেন, এই ছিল তাঁর ইচ্ছা। কিন্তু কয়লা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।



তিনি স্লেজ টানবার জন্যে সঙ্গে এনেছিলেন মঙ্গোলিয়ান টাট্টু। একদিন একটা ফাটলের মধ্যে বহু মালপত্র ও আটটা টাট্টুঘোড়া পড়ে গেল।



মঙ্গোলিয়ান টাট্টুতে-টানা স্লেজগাড়ি

ঘোড়াদের ও জিনিসপত্রসমূহ উদ্ধার করবার কোন উপায় হল না। এর উপর ঘণ্টায় প্রায় দেড়শ মাইল বেগে তুষার-ঝঞ্ঝা বইতে থাকল।

এত সব বিপদের মধ্যেও বহু চেষ্টায় শ্যাকলটন ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জানুয়ারি কিং এডওয়ার্ড দ্য সেভেনথ ল্যাণ্ডের মালভূমিতে পৌঁছলেন। সঙ্গের সব টাট্টুঘোড়া মারা গেছে। জিনিসপত্রের দারুণ অভাব। কয়লা নেই বললেই চলে। কাজেই ৮৮°২৩' অক্ষাংশ পর্যন্ত পৌঁছে বাড়ির পথে যাত্রা করতে হল। সেখান থেকে দক্ষিণ মেরুকেন্দ্র মাত্র ৯৭ মাইল দূরে। কিন্তু নিজেরা স্লেজ টেনে টেনে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছিলেন। বাধ্য হয়ে শ্যাকলটনকে দেশে ফিরে আসতে হল।



॥ ম্যাসনের অভিযান ॥

ডাঃ ডগলাস ম্যাসন (Dr. Douglas Mawson, ১৮৮৮—১৯৫৮ খ্রী.) অধ্যাপক এজওয়ার্থ ডেভিড (Prof Edgeworth David) ও ডাঃ ম্যাকে (Dr Mackay)-কে নিয়ে মেরু-অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী তাঁরা ৭২°১৫' অক্ষাংশে পৌঁছলেন।

ম্যাসন ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে লেফটেন্যাণ্ট নিনিস (Ninnis) ও জেভিয়ার মার্জ (Xavier Merts)-কে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। নিনিস পথে এক বরফের ফাটলের মধ্যে পড়ে প্রাণ হারালেন। তাঁর সঙ্গে দলের ভালো ভালো কুকুরগুলো ও অধিকাংশ খাবারদাবার ফাটলের নীচে পড়ে গেল।

মার্জ নিদারুণ ক্লান্তিতে ও অসুস্থতায় পথেই মারা পড়লেন। দুই বন্ধু মারা গেছেন। সঙ্গের সব কুকুর মারা পড়েছে। খাবারদাবার বলতে কিছু বাদাম ও কিশমিশ। তাই খেতে খেতে ম্যাসন কোনক্রমে তাঁর তাঁবুতে ফিরে এলেন। দেখলেন, পাঁচজন লোক, কিছু খাদ্য ও জিনিসপত্র রেখে তাঁর জাহাজ চলে গেছে।

বাধ্য হয়ে দুঃসহ শীতকাল তাঁকে তাঁবুতে কাটাতে হল। পরে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে জাহাজ এল। তাতে করে তিনি দেশে ফিরে এলেন। সব হারিয়ে এলেও যে অমূল্য সব তথ্য

তিনি সংগ্রহ করে এনেছিলেন তা দ্বারা ভাবীকালের অভিযাত্রীদের পরম উপকার সাধিত হয়েছিল।

॥ আমানসেনের অভিযান ॥

এর পর চরম দুঃসাহসী ও দুর্জয় শক্তিধর ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড আমানসেন (Captain Roald Engebereth Gravning Amundsen, ১৮৭৮—১৯২৮ খ্রী) ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর কুমেরু-কেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করলেন।



ক্যাপ্টেন রোয়াল্ড আমানসেন

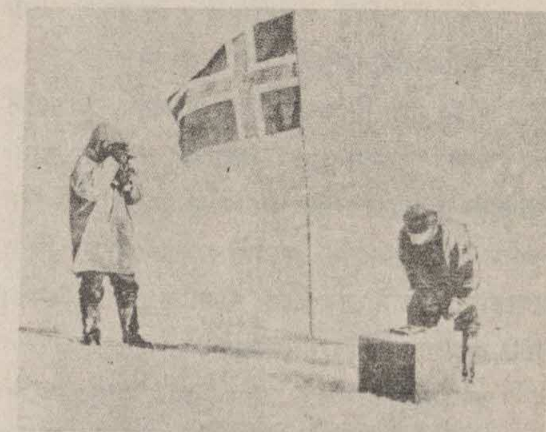
এর আগে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আমানসেন উত্তর-পশ্চিমের পথ (North-West Passage) আবিষ্কার করেন। তিনি তারপর সুমেরু-কেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি তখন জানতে পারলেন, রবার্ট এডুইন পিয়েরি (Robert Edwin Peary, ১৮৫৬—১৯৫০ খ্রী.) ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল সুমেরু-কেন্দ্রে পৌঁছেছেন। উত্তরমেরু-কেন্দ্রে প্রথম পৌঁছবার কৃতিত্ব অর্জন করা আর হবে না জেনে আমানসেন গোপনে পথ থেকেই ফিরে আসেন।

আমানসেন দুর্গম পথের কোন বাধাবিপত্তির কথা মনে না এনে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর কুমেরু-কেন্দ্রের অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল ৫২টি কুকুর। সঙ্গে ছিলেন Olav Olavson Bjaaland, Helmer Hanssen, Sverre H. Hassell ও Oskar Wisting।

যাত্রাপথে দলের হেলমার হ্যানসেন তুষারের ফাটলে পড়ে গেলেন। দলের উইস্টিং (Wisting) কোনক্রমে তাঁকে টেনে তুললেন।

আমানসেনকে একটা ৩,০৪৮ মিটার উঁচু পাহাড় পেরিয়ে যেতে হয়েছিল।

ক্ষুধার জ্বালা মিটাতে তাঁদের ২৪টি কুকুরকে মেরে খেতে হয়েছিল।



দক্ষিণ মেরুকেন্দ্রে আমানসেন

প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝা, হিমাঙ্কের বহু নীচের তাপ, পথের শ্রম সব কিছু উপেক্ষা করে আমানসেন



টেরা নোভা জাহাজ

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর ১০২ মিটার উঁচু পাথরের উপরে বরফে ঢাকা ২,৭৭৯ মিটার উঁচু

৯০° অক্ষরেখা কুমেরু কেন্দ্রে পৌঁছলেন। দক্ষিণ-মেরুকেন্দ্রে পৌঁছবার কৃতিত্বের তিনিই প্রথম অধিকারী হলেন।



॥ স্কটের অভিযান ॥

দুর্জয় অভিযাত্রী স্কট ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুন টেরা নোভা (Terra Nova) জাহাজে করে লণ্ডন থেকে যাত্রা করেন। তিনি রস আইল্যাণ্ডে শীতকালটা কাটালেন। বসন্ত ঋতুতে তাঁর দলের লোকজন দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁদের যে সব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এত বাধাবিপত্তি আমানসেনকে পেতে হয় নি।

স্কটের সঙ্গে ছিলেন ওটস, উইলসন, বাওয়ার্স ও ইভান্স। সকলে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই জানুয়ারী দক্ষিণমেরু-কেন্দ্রে পৌঁছলেন। তার ১ মাস ৬ দিন আগে আমানসেন কুমেরুকেন্দ্রে পৌঁছে ফিরে গেছেন। তিনি নরওয়ের রাজাকে লেখা একটা চিঠি কুমেরুকেন্দ্রে রেখে গেছেন।

স্কট বিষণ্ণ হলেন। তাঁর প্রথম কুমেরুকেন্দ্রে



ভাসমান বরফস্তূপের গুহা

পৌঁছবার কৃতিত্ব অর্জন করা হল না। তিনি আমানসেনের চিঠিটা নিয়ে প্রত্যাবর্তন করতে থাকলেন।

স্কট কুকুর দিয়ে স্লেজ গাড়ি টানার বিরোধী ছিলেন। বেশির ভাগ সময়ে ইভান্স ও বাওয়ার্স স্লেজ টানছিলেন। ১৭ই ফেব্রুয়ারি বেয়ার্ডমোর তুষারনদী পার হতে গিয়ে ইভান্সের মতো সবল অভিযাত্রী মারা গেলেন। তাঁর মারা যাওয়ার কারণ, পথশ্রমে, অর্ধাহারে, অনাহারে, প্রচণ্ড শীতে তিনি মৃতপ্রায় হয়ে গিয়েছিলেন। গ্রীষ্মকালেও আবহাওয়া দুর্যোগপূর্ণ ই থাকল। তাঁবু থেকে বেরোনোই একরকম অসম্ভব হয়ে উঠল। ক্রমশঃ খাদ্য ফুরিয়ে আসতে থাকল। ওটসের হাত-পায়ের আঙ্গুল তুষারে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। তিনি বুঝলেন, মৃত্যু তাঁর হবেই। কাজেই তাঁবুর আর সকলের বোঝা হয়ে থেকে লাভ নেই। অন্যদের খাদ্যে ভাগ বসানোও তাঁর পক্ষে অনুচিত। তাই তিনি ভয়ংকর ঝড়ের মধ্যে কাউকে না বলে তাঁবুর বাইরে চলে গেলেন। তুষারঝঞ্ঝাঘাতে তাঁর অবসন্ন দেহ বরফের উপরে লুটিয়ে পড়ল।



॥ স্কটের দলের সকলের মৃত্যু ॥

তারপর বাওয়ার্স ও উইলসন মারা গেলেন। সব শেষে মারা গেলেন মৃত্যুঞ্জয় বীর স্কট।

এই শোচনীয় ঘটনার আট মাস পরে স্কটের ডায়েরি, আমানসেনের চিঠি স্কটের সংগৃহীত কয়লা, নানা জীবাশ্ম, প্রবালখণ্ড, ধাতুখণ্ড প্রভৃতি পাওয়া গেল।

ওটসের দেহকে যেন ঝড়ে কোথায় উড়িয়ে নিয়ে ফেলেছিল বা বরফে চাপা পড়েছিল তাঁর দেহ। তাঁর দেহ পাওয়া যায় নি। স্কট, বাওয়ার্স ও উইলসনের মৃতদেহ পাওয়া গিয়েছিল। দেহগুলি বরফের তলায় সমাহিত করা হয়েছিল।



তুতানখামেনের সিংহাসনের চিত্র

মিশর (ইজিপ্ট) পৃথিবীর অন্যতম সুপ্রাচীন সভ্য দেশ। তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বেও মিশরে বিস্ময়কর প্রাচীন সভ্যতা বিরাজিত ছিল। তখনকার দিনে মিশরের সম্রাট্‌কে বলা হত ফেরো (**Pharaoh**)। বহু ফেরো মিশরে রাজত্ব করেন। তুতানখামেন (**Tutan-khamen**) বা তুতানখামুন (**Tutankhamun**) তন্মধ্যে একজন। তিনি ১৩৫০ থেকে ১৩৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন।

তুতানখামেন মাত্র ৯ বা ১০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। তাঁর সঙ্গে আনুখেসেনামুনের বিবাহ হয়। রানীর বা সম্রাজ্ঞীর সব সময়ে রাজার স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি ছিল।

তুতানখামেন যে স্বর্ণমণ্ডিত ও রত্নখচিত কাঠের সিংহাসনে বসতেন তার হেলান দেওয়ার অংশে যে ছবি আছে, তাতে দেখা যায়, রানী রাজার দেহে সুগন্ধি প্রলেপাদি দ্বারা প্রসাধন করছেন। সেই ছবিটি পূর্ব পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে।

অজ্ঞাত কারণে ১৩৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জানুয়ারি মাসে তুতানখামেন মারা যান। তখন তাঁর বয়স মাত্র ১৮ বছর।

॥ অ্যান্টার্কটিকায় প্রথম মহিলার পদক্ষেপ ॥

মিসেস ক্যারোলিন মিকেলসেন (Mrs. Karoline Mikelsen) প্রথম মহিলা যিনি অ্যান্টার্কটিকায় পদক্ষেপ করেন।



॥ বিমানে দক্ষিণমেরুকেন্দ্রে ॥

১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই নভেম্বর Lois Jones, Eilean McSaveney, Jean Pearson, Terry Lee Tickhill (সকলেই আমেরিকান), Kay Lindsay (অস্ট্রেলিয়ান) ও Pam Young (নিউ জীল্যাণ্ডবাসী) বিমানে দক্ষিণমেরুতে পৌঁছেন।

॥ দুই মেরুতে একই ব্যক্তির উপস্থিতি ॥

দুই মেরুতে যান ডেভিড এস পোর্টার (জন্ম ১৯৩৮ খ্রী.)। তিনি ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই ডিসেম্বর U. S. Navy-র অতিথি হিসাবে দক্ষিণ মেরুতে যান (তখন সেখানকার তাপমাত্রা -৩৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট) এবং ১৯৭৯ সালের ৯ই এপ্রিল উত্তর মেরুতে যান (তখন সেখানকার তাপমাত্রা ৩৯ ডিগ্রী ফারেনহাইট)।

॥ অ্যান্টার্কটিকা অতিক্রম ॥

আন্তর্জাতিক ভূপ্রকৃতিবিদ্যা বৎসর (Interna-tional Geophysrcal Year, ১৯৫৭-৫৮ খ্রী.)-এ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অভিযাত্রীরা অ্যান্টার্কটিকা অভিযানে যান। তাঁরা আড়াআড়িভাবে অ্যান্টার্কটিকা অতিক্রম করেন। প্রথম অভিযান সকল হয় ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ। কুমেরু-কেন্দ্রের উপর দিয়ে শ্যাকলটন বেস থেকে স্কট বেসে যেতে অভিযাত্রীদের ৯৯ দিন লাগে। তাঁদের ৩,৪৭৩ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়। যুক্তরাজ্যের পক্ষ থেকে স্যার ভিভিয়ান ফুসের নেতৃত্বে এক দল ফকল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করেন। নিউ জীল্যাণ্ডের পক্ষ থেকে স্যার এডমাণ্ড হিলারীর নেতৃত্বে একদল নিউ জীল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করেন। স্যার ভিভিয়ান ফুসের দলকে ৬৬ দিনে ৪,১৮৫ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে হয়।

॥ কুমেরুপ্রদেশে ভারতীয় অভিযাত্রী দল ॥

কুমেরুপ্রদেশে ভারতীয় অভিযাত্রীরা সকল অভিযান চালান। দুবার দুটি দল যাত্রা করে। প্রথম দল 'দক্ষিণ গঙ্গোত্রী' নামে একটি যন্ত্রচালিত স্টেশন তৈরি করেন ও বহু বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চালান।

ভারতীয় অভিযাত্রীরা যে কতদূর কষ্টসহিষ্ণু, তা ব্রিটিশ, আমেরিকান ও রাশিয়ান অভিযাত্রীরা বুঝতে পারেন। প্রথম দলের সকল অভিযানের পর দ্বিতীয় দল অভিযানে বহির্গত হন।



সুজিত চক্রবর্তী

দ্বিতীয় অভিযাত্রী দলের সদস্যরা ৩মাস অ্যান্টার্ক-টিকায় ছিলেন। তাঁরা দক্ষিণ গঙ্গোত্রীর কাছে একটি বিমানঘাঁটি নির্মাণ করেন। দেশের ৭টি বিজ্ঞান-সংস্থা থেকে সদস্য নির্বাচন করা হয়েছিল, অভিযাত্রী-দলে ছিলেন ২৮ জন বিজ্ঞানী ও ১২ জন নাবিক। তন্মধ্যে দুজন বাঙালী ছিলেন—অমিতাভ

সেনগুপ্ত ও সুজিত চক্রবর্তী। নেতা ছিলেন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষক দপ্তরের অধিকর্তা ভি. কে. রাইনা।

যাতায়াতে তাঁদের ২০ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হয়। প্রথম দল একটি মূল্যবান্ ক্যাসেট হারিয়ে ফেলেছিলেন। দ্বিতীয় দল সেটি উদ্ধার করে আনেন। তাঁরা নরওয়ের জাহাজ 'মেরুবৃত্ত'কে ভাড়া করে দেশে ফেরেন।

পৃথিবীর শীতলতম অঞ্চলে মন ও শরীরের কিরূপ অবস্থা হয়, তুষারের অবস্থা কিরূপ, শেওলা-জাতীয় উদ্ভিদ্ ও অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রাণের আদিম রূপ সম্বন্ধে তাঁরা গবেষণা করেন।

অ্যান্টার্কটিকায় মার্কিন অভিযাত্রী. ব্রিটিশ দল, জার্মান দল ও রাশিয়ান দলের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয় ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়।

ভারতীয় অভিযাত্রিদল যে বরফ সঙ্গে এনেছেন, তাতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত তেজস্ক্রিয় পদার্থের অস্তিত্ব পেয়েছেন। সম্ভবতঃ ফরাসী পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে এই তেজস্ক্রিয় পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে।

তৃতীয়বার ভারতীয় অভিযাত্রী দল কুমেরু অঞ্চল পরিক্রমার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। তৃতীয় অভিযানে দুজন ভারতীয় মহিলা বিজ্ঞানী যাচ্ছেন।

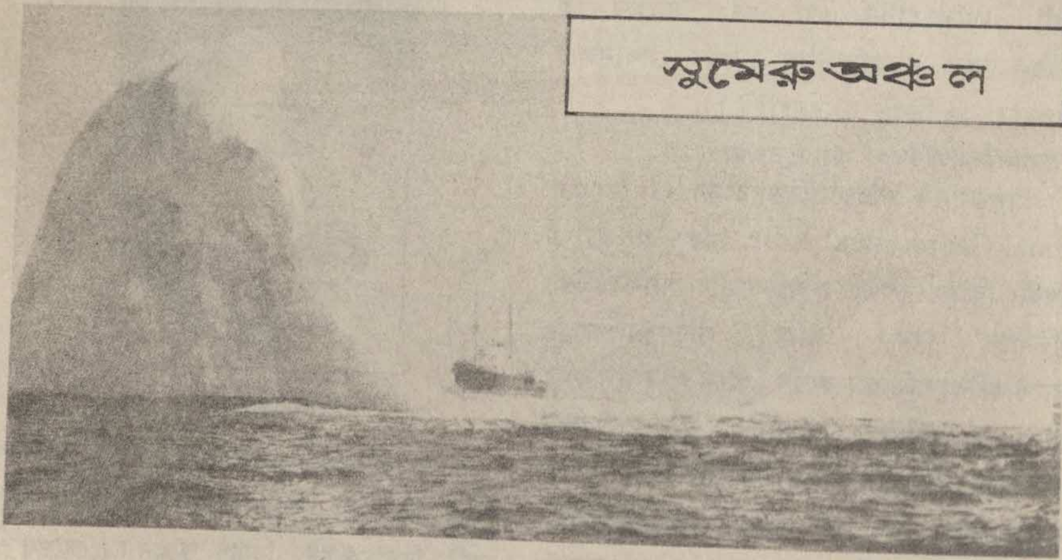
॥ সুমেরু অঞ্চলে অভিযান ॥



পৃথিবীর সর্বোত্তর দিকের নাম উত্তরমেরু বা সুমেরু। দক্ষিণমেরুর মতোই উত্তরমেরু চির-তুষারে ঢাকা। ষোড়শ শতাব্দীর আগে ইউরোপ ও আমেরিকার কেউ উত্তরমেরু অভিমুখে যাত্রা করেছেন বলে জানা নেই। ইংরেজ, ওলন্দাজ, জার্মান, নরওয়েজিয়ান, সুইডিশ, আমেরিকান, কানাডিয়ান, বেলজিয়ান প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে সুমেরু অভিযানে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল্যবান্ ধাতু সংগ্রহ, তিমি, সীল প্রভৃতি জন্তু শিকার ইত্যাদির জন্য যেতেন। অজানাকে জানা, অদেখাকে দেখার উদ্দেশ্য বর্তমানে অভিযাত্রীদের মধ্যে যতটা ছিল ততটা তাঁদের ছিল না।

বহুকাল ধরে বহু অভিযাত্রিদল সুমেরুপ্রদেশে

সুমেরু অঞ্চল



সুমেরু অঞ্চল

গিয়েছেন। তাঁদের সকলের কথা বলা সম্ভব নয়।

জন ফ্র্যাঙ্কলিন (Rear-Admiral Sir John Franklin, ১৭৮৬-১৮৪৭ খ্রী.) একদল নাবিককে সঙ্গে নিয়ে এরেবাস ও টেরর জাহাজে করে মেরু-অভিযানে বহির্গত হন। কিন্তু প্রচণ্ড দুর্যোগের জন্যে অবর্ণনীয় কষ্টভোগের পর অভিযাত্রীদের সকলেই মারা পড়েন। ফ্র্যাঙ্কলিনকে খুঁজতে ৮৫২



এস্কিমো পরিবার

খ্রীষ্টাব্দে স্যার অগাস্টাস ইংগলফিল্ড (Inglefield) বেরিয়ে পড়েন। অনেক চেষ্টা করেও ফ্র্যাঙ্কলিনকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। কেবল তাঁর মেরু-অভিযান সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে।

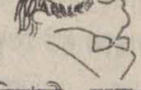
ইংগলফিল্ড কেপ স্যাবিন ও এলজমিয়ার (Ellesmere) দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এলজমিয়ার দ্বীপ উত্তর কানাডার একটি অনুর্বর জনমানবহীন দ্বীপ। এর আয়তন ১০৬৬৬ বর্গ কিলোমিটার।

তার পরের বছর ফিলাডেলফিয়ার চিকিৎসক এলিশা কেণ্ট কেন (Elisha Kent Kane, ১৮২০-১৮৫০ খ্রী.) সুমেরু অভিযানে বেরিয়ে বহু বিচিত্র তথ্য সংগ্রহ করেন। সেই সব তথ্য পরবর্তী কালের অভিযাত্রীদের বহু উপকারে লাগে।

॥ মেরু অভিযানে এস্কিমোদের সহায়তা ॥

এভারেস্ট অভিযানে যেমন শেরপাদের সহায়তা অত্যাবশ্যক, তেমনই সুমেরু অভিযানে এস্কিমোদের সাহায্যের খুবই প্রয়োজন। এস্কিমোরা সাহসী, বিশ্বাসী, কষ্টসহিষ্ণু ও শীতসহনক্ষম। কেণ্ট কেন একথা বুঝেছিলেন বলেই প্রথম এস্কিমোদের সাহায্য গ্রহণ করেন। হ্যানস হেনড্রিক নামে একজন গ্রীনল্যাণ্ডবাসী এস্কিমো যুবককে কেন সঙ্গে নেন। সে কেনের লোকদের ভল্লুক শিকার করতে শেখায়। তার ফলে কেনের দলের লোকদের কোন দিন খাদ্যাভাব হয় নি। ভল্লুকের মাংস তাঁদের খাদ্যের অভাব পূরণ করেছে।

কেন যে বেসিন আবিষ্কার করেন, তার নাম দেওয়া হয় কেন বেসিন।



॥ অভিযাত্রী কেনের মৃত্যু ॥

কেন দুঃসাহসী কষ্টসহিষ্ণু অভিযাত্রী হলেও শেষ পর্যন্ত বরফের মধ্যে জমে প্রাণত্যাগ করেন। তিনি যে স্লেজ গাড়িতে করে অভিযানে অগ্রসর হচ্ছিলেন তা বরফে আটকে যায়। অনেক চেষ্টা করেও সেই স্লেজকে বরফ থেকে উদ্ধার করা যায় নি।

কেনের দলে এক ডাক্তার ছিলেন, তাঁর নাম হেজ (Iaac Israel Hayes, ১৮৩২-১৮৮১ খ্রী)। তিনি সাহসভরে অগ্রসর হলেও অভিযান কার্যকর হয় নি। তাঁর দলের সন্ট্যাগ (Sontag) স্লেজে চড়ে যেতে যেতে ঠাণ্ডায় জমে মারা যান।

ওহিওর চার্লস্ ফ্রান্সিস হল (Charles Francis Hall, ১৮২১-১৮৭১ খ্রী) ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ফ্র্যাঙ্কলিনকে খুঁজতে যে-দল সুমেরুর পথে গিয়েছিল সেই দলে ছিলেন। এর দু' বছর বাদে তিনি ফ্র্যাঙ্কলিনের দলের লোকদের হাড়গোড় খুঁজে বার করেন।

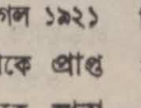
॥ ফ্রান্সিস হলের মৃত্যু ॥

ফ্রান্সিস হল পাঁচ বৎসর এস্কিমোদের সঙ্গে কাটিয়েছিলেন। শীত সহ্য করতে তিনি বেশ অভ্যস্ত হন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন সরকার 'পোলারিস' জাহাজের ক্যাপ্টেন করে তাঁকে সুমেরু-অভিযানে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি গ্রীনল্যাণ্ডের এক শহরে অসুস্থ হয়ে পরলোকগমন করেন।

পোলারিস জাহাজের ১৯ জন অভিযাত্রী ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে নিরুদ্দেশ হন। পোলারিস জাহাজ ধ্বংস হয়ে যায়। এক তিমি-শিকারী ১৯ জন অভিযাত্রীকে কেপ ইয়র্ক থেকে উদ্ধার করেন।

১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি জারমানিয়া ও হানসা নামে দুটি জাহাজকে সুমেরু অভিযানে পাঠায়। জাহাজ দুটি কিছু দূর গিয়ে বরফে আটকা পড়ে গেল। অভিযাত্রীদের বেশী দূর অগ্রসর হওয়া চলল না।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই অস্ট্রিয়ার লেফটেনাণ্ট কার্ল উইপ্রেক্‌ট্ (Carl Weyprecht ও জুলিয়াস পেয়ার (Julius Payer) জাহাজে করে মেরু অভিযানে বহির্গত হলেন। দু' বৎসর ধরে অবর্ণনীয় কষ্টের মধ্য দিয়ে তাঁদের জাহাজ ঘুরে বেড়াল। তারপর তাঁদের জাহাজ বরফের জন্যে এগোতে না পারায় তাঁরা জাহাজ ছেড়ে হাঁটা পথে চললেন। কিন্তু বেশী দূর এগোতে পারলেন না। তারপর তাঁদের কি হল তা জানা গেল ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে পেয়ারের পরিত্যক্ত জাহাজ থেকে প্রাপ্ত এক লিখিত বিবরণী থেকে। তা থেকে জানা গেল, জাহাজ ছেড়ে পায়ে হেঁটে যেতে গিয়ে দুঃসহ শীতে, প্রচণ্ড তুষারঝঞ্ঝায় তাঁরা প্রাণ হারিয়েছিলেন।



॥ ডিঙিতে করে অভিযান ॥

বেঞ্জামিন লে স্মিথ (Benjamin Leigh Smith) ও জেমস ল্যামণ্ট (James Lamont) নামে দু'জন ইংরেজ একদিন এক দুঃসাহসিক পরিকল্পনা করে বসলেন। মজবুত স্টীমারে করে মেরু অভিযানে গিয়েও মানুষেরা মৃত্যুর হাত থেকে



ডিঙিতে করে অভিযান

রেহাই পায় নি। তাঁরা ডিঙি নৌকো করে সমুদ্রে ভাসলেন। ল্যামণ্ট স্পিটসবার্গেন (Spitsbergen)-নামক জায়গায় গিয়ে একটা কয়লার খনি আবিষ্কার করলেন। তাঁর লোকেরা তিন দিন ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রায় দশ টন কয়লা তুলে ফেললেন।

লে স্মিথ পাঁচবার সমুদ্র-অভিযান করেন। তিনি স্পিটসবার্গেনে গিয়ে দেখলেন, ১০১ জন লোক সেখানে অনাহারে দিন কাটাচ্ছেন। স্মিথ তাদের খাদ্য যোগালেন ও উদ্ধার করলেন। স্মিথের ডিঙি নৌকোর নাম ছিল এইরা (Eira)। সমুদ্রে যেতে যেতে এইরা বরফে আটকে গেল। তিনি লোকজনকে নিয়ে ডাঙায় নেমে পাথর ও কাদা দিয়ে একটা ঘর তৈরি করলেন। সেখানে শীতকালটা তাঁদের কাটল। ভালুক, সিন্ধুঘোটক ও পাখি মেরে তাঁরা খাদ্যের অভাব ঘোচালেন।

গ্রীষ্মকাল এলে তিনি আর অগ্রসর না হয়ে

ডিঙিতে করে দেশে ফিরে এলেন। তিনি যেসব মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তা পরের অভিযাত্রীদের খুব কাজে লেগেছিল।

এরপর নানা দেশ থেকে বহু অভিযানকারীদের দল বিভিন্ন সময়ে উত্তরের পথে যাত্রা করেন। তাঁদের দুঃসাহসিক অভিজ্ঞতার কথা বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে।

॥ নেয়ারসের বিফল অভিযান ॥

স্যার জর্জ নেয়ারস (Sir George Nares, ১৮৩১-১৯১৫ খ্রী.) তিনটি ছোট জাহাজে করে উত্তরাভিমুখে সমুদ্রপথে যান। সঙ্গে ছিল অনেক দুঃসাহসী লোক।



বরফের রাজ্যে পেঙ্গুইনের দল

নেয়ারস বহু চেষ্টা করেও উত্তর মেরু-কেন্দ্রে পৌঁছতে পারেন নি। তিনি প্রাণিতত্ত্ব, ভূ-বিদ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনি ওয়াশিংটন আর্ভিংল্যাণ্ডে পাথরের স্তূপে লাইকেন দেখেন, স্যাণ্ডারলিং (sanderling) পাখিদের পরিত্যক্ত বাসা দেখেন। সেখানে যে একদিন এস্কিমোদের বাস ছিল তা বুঝতে পারা গিয়েছিল। এস্কিমোদের কিছু ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি বরফে ঢাকা পড়েছিল। নেয়ারস সেইস্থানে কয়লার অস্তিত্বও লক্ষ্য করেন।

শীত এসে গেল। সে কী প্রচণ্ড শীত! গ্লাসের জল মুখে তুলতে না তুলতেই বরফ হয়ে যায়। চোখের জল বরফ হয়ে ঝরে পড়ে। বহু কষ্টে শীতকালটা কাটিয়ে গ্রীষ্মের প্রথমে নেয়ারস দেশে ফেরবার জন্যে যাত্রা করলেন। আর বেশীদূর অগ্রসর হবার সাহস তাঁর হল না।



॥ অভিযাত্রী ডি লঙের মৃত্যু ॥

সানফ্রানসিস্কোর জর্জ ওয়াশিংটন ডি লঙ (George Washington De Long, ১৮৪৪-১৮৮১ খ্রী.) ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে মেরু-অভিযানে বেরোলেন। দুমাস বাদে তিনি হেরাল্ড দ্বীপ ছাড়িয়ে গেলেন। কিন্তু প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় বরফ জমে জাহাজের পথ অবরুদ্ধ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত



মেরু-অভিযাত্রীর জাহাজ

বরফের ধাক্কায় জাহাজ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

নৌকোয় করে কিছু লোক ফিরতে পারল কিন্তু ডি লঙ ঠাণ্ডায় ও অনাহারে মারা গেলেন। আহ্ সান নামে একজন কমবয়সী অতি বিশ্বস্ত চীনা রাঁধুনীও মারা গেল। ডি লঙের ডায়েরীতে তার কর্মপটুতা ও বিশ্বস্ততার কথা সবিস্তারে লেখা ছিল।

॥ ন্যানসেনের অভিযান ॥

নরওয়ের ন্যানসেন (Fridtjof Nansen, ১৮৬১-১৯৩০ খ্রী.) ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মেরু অভিযানের জন্যে অতিশয় মজবুত করে তৈরী জাহাজ

Fram-এ চড়ে উত্তরাভিমুখে যাত্রা করেন। ৩৫



ন্যানসেন

মাস চলার পর জাহাজ ৮৫° অক্ষাংশ ও ৬৬° দ্রাঘিমায় পৌঁছল।

॥ বেলুনে ব্যর্থ অভিযান ॥

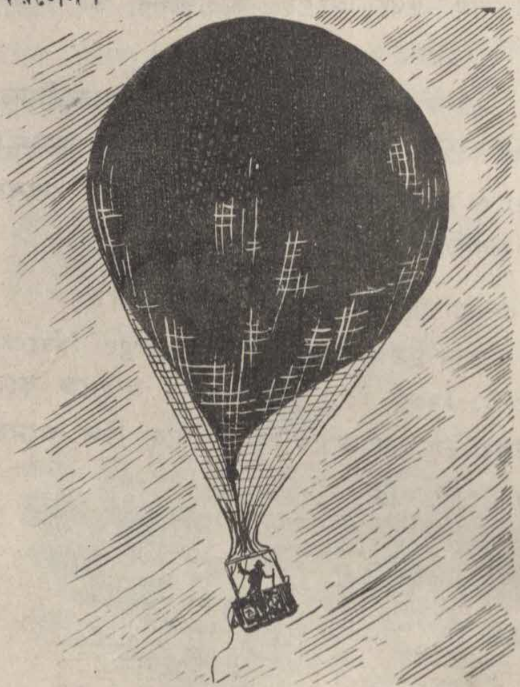


ন্যানসেনের সঙ্গে দেখা হল স্পিটসবার্গেনে সুইস সলোমন অগাস্ট আন্দ্রের সঙ্গে। তিনি বেলুনে চড়ে উত্তরমেরুতে পৌঁছবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হন নি। তিনি মারা পড়েন।

ন্যানসেন ফ্রেডারিক হ্যালমার জোহানসেন (Frederick Hjalmar Johansen) নামে এক বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসী লোক এবং কয়েকটি কুকুর ও স্লেজ গাড়ি নিয়ে জাহাজ থেকে বরফের রাজ্যে নেমে পড়লেন।

তাঁরা ৮৬° ১৪' অক্ষাংশে এসে তাঁবু ফেললেন। কিন্তু চারদিকে দুর্ভেদ্য বরফের বিশাল স্তূপ। কাজেই তাঁদের আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না।

একটা জাহাজ খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নিয়ে এসেছিল। তাতে করে ন্যানসেন জোহানসেনকে সঙ্গে নিয়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন।



বেলুনে চড়ে অভিযান

॥ মেরু-অভিযাত্রী পিয়েরির সফল অভিযান ॥

পেনসিলভ্যানিয়ার কমাণ্ডার (পরে রেয়ার অ্যাডমিরাল) রবার্ট এডুইন পিয়েরি (Robert Edwin Peary, ১৮৫৬-১৯২০ খ্রী.) বুঝেছিলেন প্রচণ্ড শীতের দেশের মানুষ এস্কিমোদের মধ্যে বাস করে তাদের চালচলন, আদবকায়দা না শিখতে পারলে শীতের রাজ্য সুমেরু প্রদেশে সফল অভিযান চালানো যাবে না। তিনি বহুকাল এস্কিমোদের সঙ্গে কাটান।

পিয়েরি আটবার সুমেরু-অভিযানে গিয়েছিলেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি রুজভেল্ট নামক জাহাজে চেপে সুমেরু-অভিযানে বহির্গত হন। তাঁর জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিলেন রবার্ট বার্টলেট (Robert Bartlett)।

পিয়েরির দলে ছিলেন সাতজন শ্বেতাঙ্গ, সতের

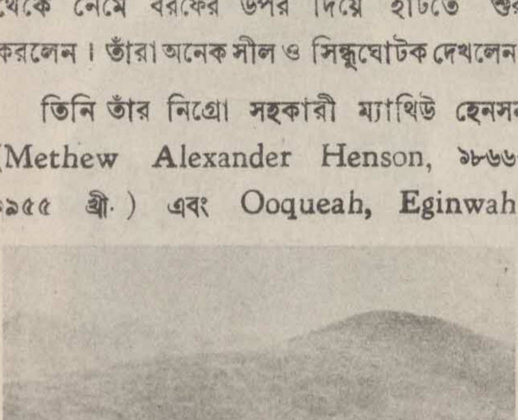


সিন্ধুঘোটক

জন এস্কিমো, একজন নিগ্রো, উনিশটি স্লেজগাড়ি ও ১৩৩টি কুকুর।

১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে তিনি জাহাজ থেকে নেমে বরফের উপর দিয়ে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁরা অনেক সীল ও সিন্ধুঘোটক দেখলেন।

তিনি তাঁর নিগ্রো সহকারী ম্যাথিউ হেনসন (Methew Alexander Henson, ১৮৬৬-১৯৫৫ খ্রী.) এবং Ooqueah, Eginwah,



সীলের পাল

Seegloo ও Ootah (১৮৭৫-১৯৫৫ খ্রী.)-নামে চারজন এস্কিমোকে নিয়ে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল উত্তর মেরু-কেন্দ্রে পৌছেন।

॥ ডঃ কুকের সুমেরুকেন্দ্রে উপস্থিতির কথা ॥



ফ্রেডারিক কুক

মার্কিন মেরু-অভিযাত্রী ডঃ ফ্রেডরিক আলবার্ট কুক (Dr. Frederick Albert Cook, ১৮৬৫-১৯৪০ খ্রী) Ah-pellah ও Etukishook-নামে দুজন এস্কিমো, ২টি স্লেজ গাড়ি, ২৬টি কুকুর নিয়ে যাত্রা করে ১৯০৮ সালের ২১শে এপ্রিল উত্তরমেরুকেন্দ্রে পৌছেন। কিন্তু পিয়েরি বা কুকের সুমেরুকেন্দ্রে পৌছনো সম্পূর্ণ সন্দেহাতীত নয় বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

॥ উত্তর মেরুকেন্দ্রে মার্কিন মেরু-অভিযাত্রী ॥

মার্কিন মেরু-অভিযাত্রী Ralph Plaisted তাঁর তিন সঙ্গীকে নিয়ে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল সুমেরুকেন্দ্রে পৌঁছেন।



॥ সফল জাপানী অভিযাত্রা ॥

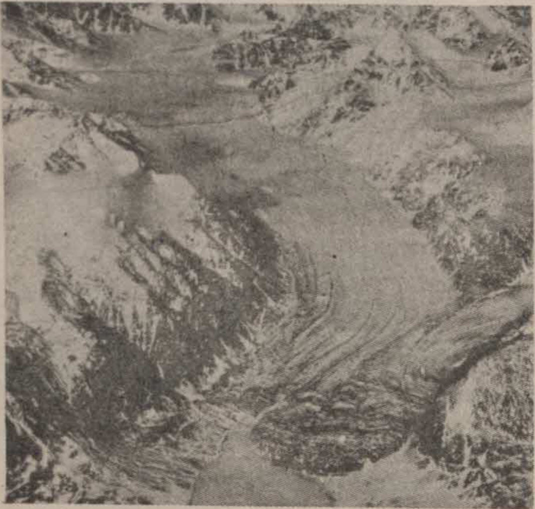
জাপানী অভিযাত্রী Naomi Uemura (জন্ম ১৯৪১ খ্রী) ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে সকাল ৪-৪৫ মিনিটের সময়ে একা সুমেরুকেন্দ্রে পৌছতে সমর্থ হন।

॥ সুমেরুকেন্দ্রে প্রথম মহিলার পদক্ষেপ।

কানাডার বৈমানিক ওয়েলডি ফিপসের স্ত্রী মিসেস ফ্রান ফিপস ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল উত্তরমেরুকেন্দ্রে পৌছেন। তিনিই প্রথম মহিলা যিনি সুমেরুকেন্দ্রে পদক্ষেপ করেন।

॥ বরফ ভাঙ্গা জাহাজে করে সুমেরু-কেন্দ্রে পৌঁছানো ॥

Galina Aleksandrovna Lastovskaya (জন্ম ১৯৪১ খ্রী.) ও Lilia Vladislavovna



সুমেরুবৃত্তের উপরে Norwigean Glacier

Minina (জন্ম ১৯৫৯ খ্রী.) রাশিয়ান বরফ-ভাঙ্গা জাহাজ আর্কটিকায় করে ১৯১৭ সালের ১৭ই আগস্ট সুমেরুকেন্দ্রে পৌঁছেন।

॥ স্কি-এ করে সুমেরু-কেন্দ্রে উপস্থিতি ॥

Dmitri Shparo, Yuri Khmelevsky, Vladimir Ledenev, Anatoly Melnikov, Vadim Davydov, Vladimir Rakhmanov ও Vasily Shishkarev নামে সাতজন অভিযাত্রী স্কি-এ করে ৭৭ দিনে (১৫ই মার্চ থেকে ৩১শে মে) ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সুমেরুকেন্দ্রে পৌঁছেন।

॥ স্লেজে করে সফল সুমেরু অতিক্রম ॥

ব্রিটিশ ট্রান্স-আর্কটিক এক্সপিডিশন (British Trans-Arctic Expedition) আলাস্কার পয়েন্ট ব্যারো থেকে যাত্রা করে ৪৬৪ দিনে ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে স্পিটসবার্গেনের উত্তর-পূর্বে সেভেন আইল্যাণ্ড আর্কিপেলাগোয় পৌঁছেন। অভিযাত্রী দলে ছিলেন ওয়ালি হারবার্ট (নেতা, ৩৪), মেজর কেন হেজেস (৩৪), অ্যালান গিল (৩৮) ও ডঃ রয় কোয়েরনার (৩৬)। তাঁদের সঙ্গে ছিল ৪০টি লোমশ কুকুর। অভিযাত্রী দলকে -৪৭ ডিগ্রী ফারেনহাইট শীত সহ্য করতে হয়েছিল। তাঁরা স্লেজে করে সুমেরু কন্দ্রের উপর দিয়ে গমন করেন।

রেয়ার-অ্যাডমিরাল রিচার্ড ইভ্‌লিন বার্ড



ইভ্‌লিন বার্ড

(Rear-Admiral Richard Evelyn Byrd, ১৮৮৮—১৯৫৭ খ্রী.) একজন দুঃসাহসী বৈমানিক ও মেরু-অভিযাত্রী। তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-মেরুকেন্দ্রের উপর দিয়ে বিমানে গমন করেন এবং বিমানে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ মেরু অতিক্রম করেন। তিনি ১৯৩৩-৩৫, ১৯৩৯ ও ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে বিমানে দক্ষিণ মেরুপ্রদেশ অতিক্রম করেন।

অস্ত্রশস্ত্র



অস্ত্র অর্থে যা ছুড়ে মারা হয়, যেমন বর্শা, তীর প্রভৃতি। শস্ত্র অর্থে যা হাত দিয়ে ধরে আঘাত করা হয় যেমন তরবারি, খড়্গ ইত্যাদি। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অস্ত্র ও শস্ত্রের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় না। যেমন অস্ত্রধারী, শস্ত্রধারী। অস্ত্রশস্ত্র বলতে সাধারণতঃ শত্রুর বিরুদ্ধে প্রযোজ্য বন্দুক, কামান, তরবারি, বর্শা, তীর, মাইন প্রভৃতি সব কিছুকে বোঝায়।

॥ আদিম যুগের লোকেদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার ॥

আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত লোকে শত্রু বিনাশের জন্যে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করে আসছে। আদিম যুগে লোকে বড় বড় হিংস্র জানোয়ারের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাতে অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবহার করত। বাঁচতে গেলে খেতে হবে তাই খাদ্যের সংস্থান করতে আদিম যুগের মানুষকে জন্তুজানোয়ার বধ করতে হত। সেই সব জন্তুর মাংসই ছিল তাদের একমাত্র খাদ্য। তারা চাষ করতে জানত না বলে কোন ধরনের শস্যকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারত না। অবশ্য, জন্তু জানোয়ারের কাঁচা মাংস ছাড়া গাছের ফলমূলও তারা খেত।

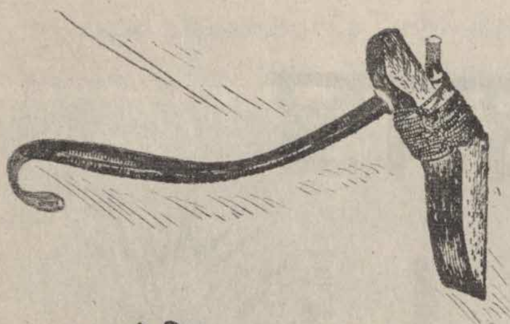
॥ পাথরের অস্ত্র ॥



পাথরের তৈরী হাত-কুড়ুলের ফলা (লক্ষ বছর আগেকার)

জন্তুজানোয়ারকে বধ করতে হলে অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন। সে-যুগে কোন রকম ধাতু আবিষ্কৃত হয় নি। কাজেই তারা পাথর কেটে বা ঘষে-মেজে নানারকম ছোট বড় অস্ত্র তৈরি করত। যে-

যুগের কথা বলা হচ্ছে, তা প্রস্তরযুগ। পাথর কেটেই তারা পাথরের বাইস তৈরি করতে শিখল।



হাওয়াই দ্বীপে প্রাপ্ত পাথরের বাইস

॥ আগুন জ্বালাতে শেখা ॥

পাথর নিয়ে ঠোকাঠুকি করতে গিয়ে আগুনের ফুলকি বার হল। সেই ফুলকি শুকনো পাতায়



নানা ধরনের পাথরের অস্ত্রশস্ত্র

পড়ে আগুন জ্বলে উঠল। তা দেখে আদিম যুগের মনুষেরা আগুন জ্বালাতে শিখল। সেই আগুনে মাংস সেঁকে বা পুড়িয়ে খাওয়া আরম্ভ করতে করতে রান্না করা শিখল।

॥ তাম্রযুগ ॥

প্রস্তরযুগের পরের যুগ তাম্রযুগ। সে যুগের লোক মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে তামা ও রাঙ পেল। তা দিয়ে তারা আগুনের সাহায্যে অস্ত্র তৈরি করতে শিখল। তামা ও রাঙ মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরী হয়। এই ব্রোঞ্জ তামার চেয়ে শক্ত। সেই ব্রোঞ্জ দিয়ে তারা নানারকম অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে শিখল।

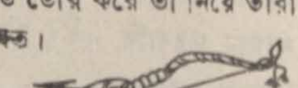
॥ ব্রোঞ্জের অস্ত্র ॥



ব্রোঞ্জের অস্ত্র তৈরি করে তা দিয়ে আদিম যুগের মানুষ শুধু পশুশিকার করত না, মাটি খুঁড়ে চাষ করা, ঘর বাড়ি তৈরি করা আরম্ভ করল। এ-যুগের লোকে পশুপালন করতেও শেখে।

॥ লোহার অস্ত্র ॥

তার পরে অর্থাৎ কয়েক সহস্র খ্রীষ্টপূর্বাব্দ আগে লৌহ আবিষ্কৃত হল। লৌহ আবিষ্কারের পর থেকেই ভারত, সুমের, অ্যাসিরিয়া, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের লোক নানা অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করে তা দিয়ে বিভিন্ন কাজকর্ম করতে থাকে। বর্শা, তীর, ঢাল, তরোয়াল প্রভৃতি তৈরি করে তা নিয়ে তারা যুদ্ধ বা শিকার করতে যেত।



॥ তীর-ধনুক ॥

প্রাগৈতিহাসিক যুগে তীর-ধনুকের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তীর-ধনুকের সাহায্যে শুধু পশুপাখি শিকার করা হত না শত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করাও হত। পৌরাণিক যুগে যুদ্ধের প্রধান হাতিয়ার ছিল তীর-ধনুক। ভারত, গ্রীস, মিশর,



পাখিশিকারী আদিবাসী



তীর হাতে আদিবাসী

চীন, রোম প্রভৃতি স্থানে হাজার হাজার বছর আগে লোকে যে তীর-ধনুক ব্যবহার করত, তার অজস্র প্রমাণ পাওয়া যায়।

॥ শব্দভেদী বাণ ॥

রামায়ণ-মহাভারতে নানা রকম ধনুক ও বাণের উল্লেখ আছে। দশরথের শব্দভেদী বাণে অন্ধক মুনির পুত্র সিন্ধু মারা গিয়েছিল। শব্দ যে দিক্ থেকে আসছে এই বাণ সে দিকে ছুটে যেতে পারত। রাজা দশরথ শিকারে বেরিয়ে সিন্ধুর কলসীতে জল ভরার শব্দ শুনে ভাবলেন, দূরে নদীতে কোন হরিণ জল পান করছে। তারই শব্দ ভেবে তিনি শব্দভেদী বাণ ছুড়লেন। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখলেন, যাকে হরিণ ভেবেছিলেন, সে হরিণ নয়। সিন্ধুর বুকে বাণ বিঁধেছে। সে মরে পড়ে আছে।

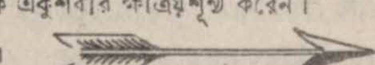
॥ পৌরাণিক যুগের নানাধরনের ধনুর্বাণ ॥

পৌরাণিকযুগে নানা রকম বাণ ও ধনুকের নাম পাওয়া যায়। অর্জুনের ধনুকের নাম ছিল গাণ্ডীব, শিবের ধনুকের নাম ছিল পিনাক। বিজয়ধনু, বৈষ্ণবধনু প্রভৃতি ধনুকের নামের উল্লেখ পুরাণে আছে। নানা নামের বাণের কথা আমরা পুরাণ পড়ে জানতে পারি। কত বিচিত্র সে-সব নাম—অর্ধচন্দ্রবাণ, বরুণবাণ, ব্রহ্মবাণ, অন্তর্বাণ, আকস্মিক-বাণ, নারাচ, কর্ণের একাঘ্নীবাণ প্রভৃতি। নালীক বাণ থেকে আগুন বার হত। অনেকে বলেন, এই নালীক পৌরাণিক যুগের বন্দুক।

॥ পরশুরামের ধনুক ॥

বিজয়ধনু ছিল ঈশ্বরের ষষ্ঠ অবতার পরশুরামের অতি শক্তিশালী ধনুক। এই ধনুকের সাহায্যে তিনি পৃথিবীকে একুশবার ক্ষত্রিয়শূন্য করেন।

॥ ব্রহ্মাবাণ ॥



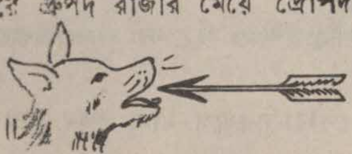
রামচন্দ্র ব্রহ্মবাণ দিয়ে রাবণকে বধ করেন। সেই বাণ নাকি রাবণকে বধ করে রামচন্দ্রের তূণে ফিরে আসে।

॥ হরধনুভঙ্গ ॥

রাজা জনকের ঘরে ছিল হরধনু। সেই ধনুতে ছিলা পরাতে কেউ পারে নি। রামচন্দ্র এমন জোরে ধনুক বেঁকিয়ে তাতে ছিলা পরাবার চেষ্টা করেন যে তাতে সেই ধনুক ভেঙ্গে যায়। এরই নাম হরধনুভঙ্গ। এই ধনুক ভঙ্গের দ্বারা রামচন্দ্র জনকের প্রতিশ্রুতিমতো শর্ত পালনের ফলে জানকীকে অর্থাৎ সীতাকে লাভ করেন।

॥ অর্জুনের লক্ষ্যভেদ ॥

মহাভারতে দেখা যায়, ব্রাহ্মণবেশী অর্জুন লক্ষ্যবেধ করে দ্রুপদ রাজার মেয়ে দ্রৌপদীকে লাভ করেন।

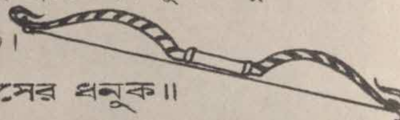


॥ একলব্য ॥

ব্যাধরাজ হিরণ্যধনুর পুত্র একলব্য সে-যুগে বিখ্যাত শিক্ষাগুরু দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষা করতে যান। কিন্তু নীচজাতীয় বলে দ্রোণ অস্ত্র-শিক্ষা দিতে অস্বীকৃত হন। তখন একলব্য বনের মধ্যে দ্রোণের মূর্তি গড়ে তার সামনে অস্ত্রচালনা শিক্ষা করতে থাকেন। দ্রোণাচার্য শিষ্যদের নিয়ে সেই বনে গেলে তাঁদের সঙ্গের একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করতে থাকে। তখন একলব্য বাণ মেরে তার মুখ বন্ধ করে দেন। কুকুরটাকে সেই অবস্থায় দেখে দ্রোণাচার্য ও আর সকলে খুব অবাক্ হয়ে গেলেন। তাঁরা দেখলেন কুকুর একটুকু আহত হয় নি। তার মুখমণ্ডল থেকে রক্তপাত হয় নি। অথবা এমন সুকৌশলে বাণ প্রয়োগ করা হয়েছে, যাতে কুকুরটার মুখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার ঘেউঘেউ করার সামর্থ্য ছিল না। এই ধরনের নানা ধনুক ও বাণের আলৌকিক কাহিনী রামায়ণ-মহাভারত পড়ে জানা যায়।

॥ সুদর্শন চক্র ॥

মহাভারতে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণের ছিল সুদর্শন চক্র। এই চক্র প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে ঘুরতে শত্রুর শিরশ্ছেদ করত।



॥ ইউলিসিসের ধনুক ॥

গ্রীক পুরাণোক্ত ইউলিসিসের ধনুক ছিল আইবেক্স (ibex) হরিণের শিং দিয়ে তৈরী। সেই ধনুক ব্যবহারের সামর্থ্য ইউলিসিস ছাড়া আর কারও ছিল না।

॥ উইলিয়াম টেল ॥

সুইটজারল্যাণ্ডের প্রসিদ্ধ দেশভক্ত বীর উইলিয়াম টেল (William Tell, ১৩-১৪শ শতক) রাজার আদেশে নিজের পুত্রের মাথায় রক্ষিত একটি আপেলকে তীরবিদ্ধ করেন। তাঁর তীরের সাহায্যে লক্ষ্যভেদের ক্ষমতা ছিল অত্যদ্ভুত।

॥ লং-বো ॥

আগেকার দিনে—ক্রশ-বো (cross-bow) নামে এক ধরনের ধনুকের প্রচলন ছিল। পরে



পঞ্চদশ শতাব্দীর ক্রশ-বো

লং-বো (long-bow)-র প্রচলন হয়। ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ (Hun-

dred Years' War, ১৩৩৮—১৪৫৩ খ্রী.) সংঘটিত হয়, তাতে লং-বোর ব্যবহার হয়েছিল। ক্রেসি (Crecy), পইটিয়াস (Poitiers) ও এজিনকোর্ট (Agincourt)-এর যুদ্ধ এই সময় ঘটে। এ-সবে long-bow ও অন্যান্য ধরনের ধনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ইংল্যাণ্ডের রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ড, পঞ্চম হেনরী ও ষষ্ঠ হেনরীর আমলে এই যুদ্ধ চলে।



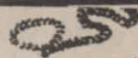
॥ লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ ॥

আগ্নেয়াস্ত্র আবিষ্কারের আগে যোদ্ধারা যখন তরোয়াল, বর্শা, তীর-ধনুক ইত্যাদির সাহায্যে যুদ্ধ করত তখন তারা দেহকে শত্রুর অস্ত্রাঘাত থেকে রক্ষা করার জন্যে লৌহনির্মিত বর্ম পরত। মাথায় পরত শিরস্ত্রাণ। মুসলমানেরা জেরুজালেম দখল করে রাখলে ইউরোপ থেকে খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীরা নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়। তখন খ্রীষ্টান রাজারা ও বীর যোদ্ধারা জেরুজালেম দখল করতে যুদ্ধযাত্রা করে। এর নাম ক্রুসেড (Crusade) বা ধর্মযুদ্ধ। ১০৯৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২৭২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ন'বার ধর্মযুদ্ধ চলে। যোদ্ধারা লৌহবর্ম ও শিরস্ত্রাণ পরে যুদ্ধ করে। জেরুজালেম দখল করতে লক্ষ লক্ষ প্রাণহানি হয়, অপরিমেয় অর্থক্ষতি হয়। কিন্তু জেরুজালেম মুসলমানদের দখলেই থেকে যায়।

॥ টুর্নামেন্ট ॥

মধ্যযুগে তরবারি ও বর্শা নিয়ে সামরিক নাইটরা নকল যুদ্ধ করত। বর্ম-পরা অবস্থায় তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। প্রথম প্রথম নকল যুদ্ধ হলেও পরে প্রকৃত যুদ্ধের অবতারণা হয়। নর্ম্যানরা ইংল্যাণ্ডে টুর্নামেন্টের প্রবর্তন করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে টুর্নামেন্ট উঠে যায়। সাধারণতঃ ঘোড়ায় চড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হত। মাটিতে দাঁড়িয়েও হত।

॥ ল্যাসো ॥



বিভিন্ন দেশে নানা কৌশলে বন্য জন্তুদের ধরা হয়। ল্যাসো (lasso) নামে একধরনের শক্ত দড়ির ফাঁস বন্যজন্তুর গলায় আটকে তাকে ধরা হয়। আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকার নানা স্থানে ল্যাসোর সাহায্যে বন্যজন্তু ধরা হয়। যারা ধরে তারা ঘোড়ায় চড়ে বা মোটরে চড়ে বা নৌকোয় থেকে ল্যাসো নিক্ষেপ করে। কখনও কখনও গাছের উপর থেকেও ল্যাসো ছোড়া হয়। আবার গাছের উপরের জন্তুকে ল্যাসোর সাহায্যে ধরা হয়। মাদাগাস্কারের বানরজাতীয় জন্তু লিমার (lemur)-কে ল্যাসো দিয়ে ধরা হয়ে থাকে। ল্যাসোর ফাঁস জন্তুর গলায় গিয়ে পড়লে সেই জন্তু যত ছুটতে থাকে ততই তার গলায় বসে যায়। শেষে কতকটা শ্বাসরুদ্ধ হয়ে নির্জীব হয়ে পড়লে শিকারীরা তাকে ধরে ফেলে।



॥ বুমেরাং ॥

বুমেরাং (boomerang) এক ধরনের কাঠের বাঁকানো অস্ত্র, তার মধ্যে বাঁকানো ধাতুর ফলা লাগানো থাকে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা কোন জন্তুর উদ্দেশ্যে এটা ছুড়ে থাকে। এই বুমেরাং ছুড়ে মারলে সেটি কোন জন্তুকে বা শত্রুকে আঘাত করে নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে যায়। আগের মতো বহুল প্রচলিত না হলেও এর যথেষ্ট প্রচলন আছে। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতাব্দীর বুমেরাং তুতেনখামেনের সমাধির মধ্যে পাওয়া গেছে। বর্তমানে বুমেরাং ঘোড়ার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। Jeff Lewry বিশ্ব বুমেরাং প্রতিযোগিতায় ১৯৭০, ১৯৭১, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এবং অস্ট্রেলিয়ান বুমেরাং প্রতিযোগিতায় ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জয়ী হন। সুইটজারল্যাণ্ডের Leo Meier ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এবং লং আইল্যাণ্ডে Al Gerh-

ards ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সর্বাপেক্ষা দূরে বূমেরাং বিক্ষেপ করেন ও সেই বূমেরাং নিক্ষেপকারীর কাছে ফিরে যায়।



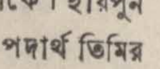
॥ বোলাস ॥

দক্ষিণ আমেরিকার ইণ্ডিয়ানরা রিয়া (rhea) পাখি ধরার জন্যে দুটো বল লাগানো এক ধরনের ফাঁস ব্যবহার করে। একে বলে বোলাস (bolas)। সাধারণতঃ শিকারীরা ঘোড়ায় চড়ে রিয়া শিকার করে। বোলাস ছুড়লে বল দুটো রিয়া পাখির গলায় জড়িয়ে যায়। রিয়া পাখি উড়তে পারে না। এরা উটপাখির মতো দেখতে, তবে আকারে অনেক ছোট। রিয়ার লেজ নেই।



॥ তিমি শিকারের হারপুন ॥

তিমি সব চেয়ে বড় প্রাণী। নীল তিমি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। নৌকো বা জাহাজ থেকে দড়ি-বাঁধা হারপুন (harpoon)-নামক বর্শা ছুড়ে এর গায়ে বেঁধা হয়। তিমি পালাতে থাকলে নৌকো বা জাহাজ সঙ্গে সঙ্গে যেতে থাকে। ক্রমে তিমি নির্জীব হয়ে পড়লে তাকে ধরা হয়। বর্তমানে হারপুনের মাথায় বিস্ফোরক পদার্থ থাকে। হারপুন তিমির শরীরে বিঁধলে সেই বিস্ফোরক পদার্থ তিমির মৃত্যু ঘটায়।



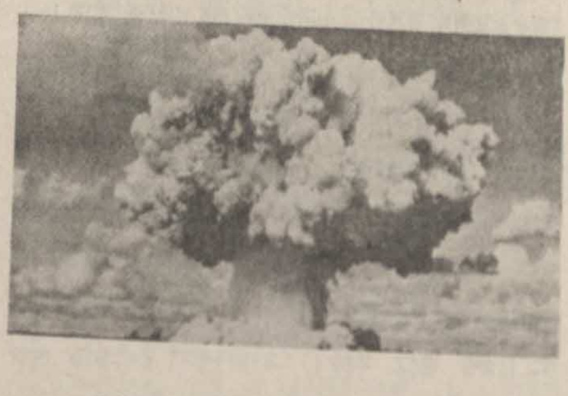
॥ আধুনিক যুগের অস্ত্রশস্ত্র ॥

বারুদ আবিষ্কার হবার পর থেকে যুদ্ধে তীর-ধনুক, তরোয়াল, বর্শা প্রভৃতির ব্যবহার কমে গেছে। বর্তমানে বন্দুক, রাইফেল, রিভলভার, পিস্তল, মেশিনগান, স্টেনগান, ভাসমান মাইন, কামান, গ্রেনেড, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, টর্পেডো, যুদ্ধ-বিমান, বোমাবর্ষী বিমান, বিমানপোতবাহী জাহাজ, ব্যাটলশিপ, ডেস্ট্রয়ার, ফ্রিগেট, ক্রুজার, ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা, পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা,



ট্যাঙ্ক

রেডার, বিমান-ধ্বংসী কামান, রকেট প্রভৃতি অসংখ্য রকম যুদ্ধাস্ত্রাদি তৈরি হয়েছে। ক্রমশঃ মানুষ মারতে ও শত্রুসম্পত্তি ধ্বংস করতে প্রতিটি উন্নত দেশ অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হচ্ছে।



বিকিনিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ

॥ দু'শ্রেণীর অস্ত্রশস্ত্র ॥

সমরনীতির দিক্ দিয়ে অস্ত্রশস্ত্রকে প্রধানতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়, যথাঃ প্রায় সব দেশের সৈন্যরা সচরাচর যে-সব অস্ত্র ব্যবহার করে সেগুলিকে বলা হয় কনভেনশন্যাল ওয়েপন্‌স্ (conventional weapons) অর্থাৎ গতানুগতিক ভাবে সচরাচর প্রয়োগের অস্ত্র ; আর, বিশেষ ধরনের ও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে প্রয়োগের অস্ত্র-গুলিকে বলা হয় স্ট্র্যাটেজিক ওয়েপন্‌স্ (strategic weapons)।

বিভিন্ন শক্তিশালী দেশ যেভাবে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে উঠছে তাতে মনুষ্যজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কার কারণ দেখা দিয়েছে।

॥ সবচেয়ে কম দিনের যুদ্ধ ॥

সবচেয়ে কম দিনের যুদ্ধ হয় যুক্তরাজ্য ও (বর্তমানে তানজানিয়ার অন্তর্গত) জাঞ্জিবারের মধ্যে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৭ শে আগস্ট বেলা ৯টা ২ মিনিট থেকে ৯ টা ৪০ মিনিট পর্যন্ত। ৩৮ মিনিট ধরে বোমা পড়ার পর সুলতান সৈয়দ খালিদ প্রাসাদ ত্যাগ করলে যুদ্ধবিরতি হয়। নূতন সুলতান হন হামুদ ইব্‌ন্ মহম্মদ।

॥ বিশ্বযুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সব চেয়ে বেশী লোক মারা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১,৫৬,০০,০০০ জন যোদ্ধা প্রাণ হারায়। যোদ্ধা ও নাগরিক মিলিয়ে মোট ৫,৪৮,০০,০০০ লোক মারা যায়। তন্মধ্যে ২,৫০,০০,০০০ রাশিয়ানের মৃত্যু হয়। চীনের ৭৮,০০,০০০ মারা পড়ে। পোলাণ্ডের সব চেয়ে বেশী ক্ষতি হয়। ২,৭০,০৭,০০০ অধিবাসীদের মধ্যে ৬০,২৮,০০০ লোকের মৃত্যু ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ৯৭,০০,০০০ যোদ্ধার প্রাণহানি হয়।

॥ সবচেয়ে বেশী দিনের অবরোধ ॥

জার্মান সৈন্যগণ ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে আগস্ট থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী পর্যন্ত (মোট ৮৮০ দিন) লেনিনগ্রাডকে অবরোধ করে।

॥ সৈন্য সংখ্যা ॥

চীনের সৈন্যসংখ্যা ৪৪,৫০,০০০ (১৯৮০ খ্রী.)। ঐ সময়ে রাশিয়ান সৈন্যসংখ্যা ৩৫,৬৮,০০০ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্যসংখ্যা ২০,৫০,০০০।

॥ সবচেয়ে বড় বোমা ॥

সব চেয়ে বড় বোমা পড়ে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ জার্মানিতে। বোমাটি ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ার ফোর্সের 'গ্র্যাণ্ড স্লাম' ফেলে। এর ওজন ছিল ৯,৯৭৫ কেজি। এটি লম্বায় ছিল ৭·৭৪ মিটার।





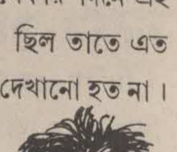
সার্কাসের কথা

শহরে বা গ্রামে যখনই শোনা যায়, সার্কাস এসেছে, তখন লোকেদের, বিশেষ করে বালক-বালিকাদের মধ্যে খুব সাড়া পড়ে যায়। সাধারণতঃ শীতকালে কোন ফাঁকা জায়গায় প্রকাণ্ড তাঁবু খাটিয়ে সার্কাসের নানারকম খেলা দেখানো হয়। গ্রামের যেখানে প্রকাণ্ড মেলা বসে, সেখানে সার্কাস পার্টি জন্তুজানোয়ার, খেলোয়াড়ের দল নিয়ে হাজির হয়। লোকে সার্কাস দেখবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়। সার্কাসের নানা ধরনের খেলা দেখে প্রচুর আমোদ পায।

সার্কাসে বাঘ-সিংহ-হাতি-ঘোড়া প্রভৃতি জন্তুর নানা ধরনের খেলা দেখানো হয়। খেলোয়াড়দের সাইকেল চালনা, নানাধরনের জিমন্যাস্টিক, ক্লাউন-দের রঙ্গতামাশা প্রভৃতি দেখানো হয়। প্রকাণ্ড তাঁবুর তলায় চারিদিকের গ্যালারিতে ও গ্যালারির সামনের চেয়ারে দর্শকেরা রুদ্ধশ্বাসে নানারকম অসমসাহসিক খেলা দেখে।

শুধু ভারতবর্ষে নয়, পৃথিবীর প্রায় সব দেশে সার্কাস পার্টি আছে। কিন্তু আগেকার দিনে এই সব সার্কাস পার্টি ছিল না। যা ছিল তাতে এত রকমের খেলা জাঁকজমক সহকারে দেখানো হত না।

॥ প্রাচীন রোমের সার্কাস ॥



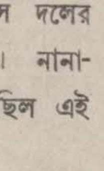
প্রাচীন রোমে সার্কাস দেখানোর ব্যবস্থা ছিল। এক বিরাট চত্বর যার নাম ছিল সার্কাস ম্যাক্সিমাস (Circus Maximus), সেখানে সার্কাস দেখানো হত। তাতে প্রথম দিকে শুধু রথের দৌড় দেখাবার ব্যবস্থা ছিল। হৃষ্টপুষ্ট ঘোড়া এই সব রথ টানত। তাছাড়া দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা ও নানা কসরত দেখানো, ব্যায়ামের নানা খেলাও দেখানো হত। যেখানে এই সার্কাস দেখানো হত, তার নাম কলোসিয়াম (Collosseum)। বহু শত বৎসর

আগের তৈরী সেই কলোসিয়াম এখনও আছে, তবে তা ভগ্নদশায়। শত শত লোক পাথরের গ্যালারিতে দর্শক হিসাবে বসত। সব চেয়ে বড় কলোসিয়ামের নাম ফ্লেভিয়ান অ্যাম্ফিথিয়েটার (Flavian amphitheatre)। ৮০ খ্রীষ্টাব্দে এর নির্মাণকার্য শেষ হয়। ৫ একর (২ হেক্টার) জায়গার উপরে এটি নির্মিত হয়। এতে ৮৭ হাজার লোক স্বচ্ছন্দে বসে সার্কাস দেখত। এটি লম্বায় ছিল ১৮৭ মিটার। এর সব চেয়ে বেশী প্রস্থ ছিল ১৭৫ মিটার।

॥ ইংল্যাণ্ডের সার্কাস ॥

বর্তমানে সার্কাস বলতে আমরা যা দেখি, তা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে। প্রথম দিকে ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দল এক শহর থেকে আর এক শহরে যেত। সঙ্গে থাকত একটা ঘোড়ায়-টানা গাড়ি। প্রধানতঃ সেই গাড়ি সার্কাস দলের লোকদের সাজঘর হিসাবে ব্যবহৃত হত। নানা-ধরনের ব্যায়ামের কসরত দেখানোই ছিল এই ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দলের প্রধান কাজ।

গ্রামের মেলায় ও হাটবাজারে গিয়ে সার্কাস দল খেলা দেখাত। নির্দিষ্ট কোন রকম দর্শনী দিতে হত না। কেবল খেলার শেষে সার্কাস পার্টির ম্যানেজার টুপি হাতে ঘুরে ঘুরে দর্শকদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করতেন।



॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্কাস ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফিলাডেলফিয়ায় ও নিউ ইয়র্ক শহরে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সার্কাস দেখাবার ব্যবস্থা চালু হয়। সেই সার্কাস বড় ধরনের ছিল না। আজকালকার মতো নানাধরনের খেলা দেখাবার ব্যবস্থাও তাতে ছিল না। তবু লোক ভিড় করে খেলা দেখত। এমন কি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington, ১৭৩২-১৭৯৯ খ্রী.)-ও আগ্রহের সঙ্গে সেই সার্কাস দেখেছিলেন।



॥ ভ্রাম্যমাণ সার্কাস ॥

পরে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অনেক সার্কাস দলের আবির্ভাব হয়। সে-সবের অধিকাংশই ভ্রাম্যমাণ সার্কাস। গাড়িতে করে সেই সব সার্কাস দল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এক শহর থেকে আর এক শহরে যেত। শুধু দিনের বেলাতেই খেলা দেখানো হত। ৯টি ঘোড়া ও ৭ জন খেলোয়াড় নিয়ে সার্কাস দল গঠিত



আগেকার দিনের ইংল্যাণ্ডের ভ্রাম্যমাণ সার্কাস।

হত। সার্কাস দলের সঙ্গে থাকত ব্যাণ্ডপার্টি। তাতে একটি হার্ডি-গার্ডি (hurdy gurdy), একটি ক্ল্যারিনেট (clarinet) ও একটি বাস ড্রাম (bass drum) থাকত। শহরে বা গ্রামে সার্কাস দল এসেছে শুনলে রীতিমতো সাড়া পড়ে যেত। বর্তমান কালের চেয়ে তখনকার দর্শকদের কম আগ্রহ ছিল না।

॥ রাত্রে সার্কাস দেখানোর ব্যবস্থা ॥

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ সার্কাস বর্তমান কালের মতো রূপ ধারণ করে। বড় তাঁবু, মাঝখানে একটা

কাঠের লম্বা খুঁটি, সেই খুঁটির উপরে বাতি, বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়, নানাধরনের জন্তুজানোয়ার নিয়ে সার্কাস দল গঠিত হত। বাতির ব্যবস্থা থাকায় রাত্রেও খেলা দেখানো হত। যত দিন যেতে থাকল, খেলা, খেলোয়াড় ও জন্তুজানোয়ারের সংখ্যা তত বাড়তে থাকল। ক্রমে রেলে করে দূর দুরান্তরে সার্কাস দল যেতে থাকল। পি. টি. বার্নাম (P. T. Barnum) তাঁর সার্কাস দল নিয়ে রেল গাড়িতে করে নানা স্থার্নে যেতে শুরু করলেন।



॥ নানা দেশে সার্কাস ॥

ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশেও অনেক সার্কাস পার্টি গড়ে উঠল।

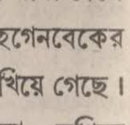


সার্কাসে হাতির পাল খেলা দেখাচ্ছে।

তাতে সিংহ, বাঘ, হাতি, শিম্পাঞ্জী, গরিলা, ওরাং-ওটাং, সীলমাছ, পেঙ্গুইন, কুকুর, ঘোড়া, ভালুক, বানর প্রভৃতি নানা জন্তু নিয়ে সার্কাস দল গঠিত হল। চীন, জাপান, ভারতেও নানা সার্কাস পার্টি খেলা দেখাবার ব্যবস্থা করল। তাতে সাইকেল চালনা, ঘোড়া নিয়ে নানা কসরত দেখানো, জন্তু-জানোয়ারদের নানাধরনের বিস্ময়কর খেলা দেখানো, ব্যায়ামের নানা কৌশল দেখানো হতে থাকল।

॥ সার্কাসে জন্তুজানোয়ারদের বিচিত্র সমাবেশ ॥

অধিকাংশ ক্ষেত্রে আজকাল ভ্রাম্যমাণ সার্কাস দল শুধু এক দেশে নয়, সারা পৃথিবীর নানা দেশে ঘুরে ঘুরে খেলা দেখায়। জার্মান হেগেনবেকের সার্কাস এক সময় অত্যাশ্চর্য খেলা দেখিয়ে গেছে। রাশিয়ান সার্কাস পার্টিও ভারতে খেলা দেখিয়ে গেছে। সাধারণতঃ নানাধরনের শারীরিক কৌশল দেখিয়ে রাশিয়ান সার্কাস জনচিত্ত বিমোহিত করেছিল। হেগেনবেক সার্কাসে জন্তুজানোয়ারের বিচিত্র সমাবেশ ছিল। তাদের দলের সঙ্গে তাঁবুর বাইরে মিন্যাজ্যারি (menagerie) অর্থাৎ জন্তু-জানোয়ারের সংগ্রহশালা ছিল। সেই সংগ্রহশালা দেখতেও প্রচুর লোকসমাগম হত। আজকাল বহু ভ্রাম্যমাণ সার্কাস পার্টির সঙ্গে মিন্যাজ্যারি থাকে।



॥ সার্কাসে ক্লাউন ॥

জিমন্যাস্টিক বা দৈহিক কসরত, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারদের পোষা কুকুরের মতো খেলা .খলা প্রভৃতি দেখে দর্শকেরা খুবই আমোদ পায়।



সার্কাসের ক্লাউন

সেই সঙ্গে ক্লাউনরা তাদের সাজসজ্জা বেশভূষা, কার্যকলাপ দেখিয়ে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দেয়। ক্লাউনরা মুখে রং মাখে, ঢিলেঢালা পোশাক পরে, মাথায় ঘুন্টিওয়ালা টুপি পরে, বোকার মতো কাজ করে, অসংলগ্ন কথা বলে, শিস দেয় ও চলাফেরা করে। ক্লাউন না থাকলে সার্কাস জমে না। শুধু ক্লাউন নয়, বামনও অনেক সার্কাস পার্টিতে দেখা যায়। ক্লাউমরা বোকার মতো খেলা দেখায় কিন্তু তারা খুবই পাকা খেলোয়াড়। লোকদের হাসাবার জন্যে বোকামির ভান করে।

॥ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ স্থায়ী সার্কাস ভবন ॥

বর্তমানে একস্থানে স্থায়িভাবে সার্কাস দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। অনেক দেশে স্থায়ী সার্কাস ভবন আছে। সব চেয়ে বড় সার্কাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নেভাদার লাস ভেগাসে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর খোলা হয়। এর নাম সার্কাস সার্কাস (Circus Circus)। ১১,৯৮৪ মিটার জায়গায় ২৭'৪৩ মিটার উঁচু তাঁবুর আকারের নমনীয় কাচের ছাদের নীচে সার্কাসটি অবস্থিত। এটি তৈরি করতে দেড় কোটি ডলার মুদ্রা খরচ হয়।

॥ সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ভ্রাম্যমাণ সার্কাস ॥

সব চেয়ে বড় ভ্রাম্যমাণ সার্কাস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সার্কাস ভার্গাস (Circus Vargas)। বিরাট এক তাঁবুর নীচে ৫ হাজার লোক বসে খেলা দেখতে পারে।

॥ সার্কাসে মেয়ে খেলোয়াড় ॥

সার্কাসে শুধু পুরুষেরাই খেলা দেখায় না, মেয়েরাও খেলা দেখায়! মেয়েরা ভারসাম্যের খেলা দেখানো, নানা ধরনের শারীরিক কৌশল দেখানো, সাইকেল চালানো, এমন কি হিংস্র ভালুক বাঘ-সিংহের খেলা দেখানো প্রভৃতিতে বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। বহু বাঙালী মেয়ে সার্কাসে অসমসাহসিক খেলা দেখিয়ে প্রভূত নাম করেছে।



ভালুক সাইকেল চালাচ্ছে

॥ সার্কাসের নানা ধরনের খেলা ॥

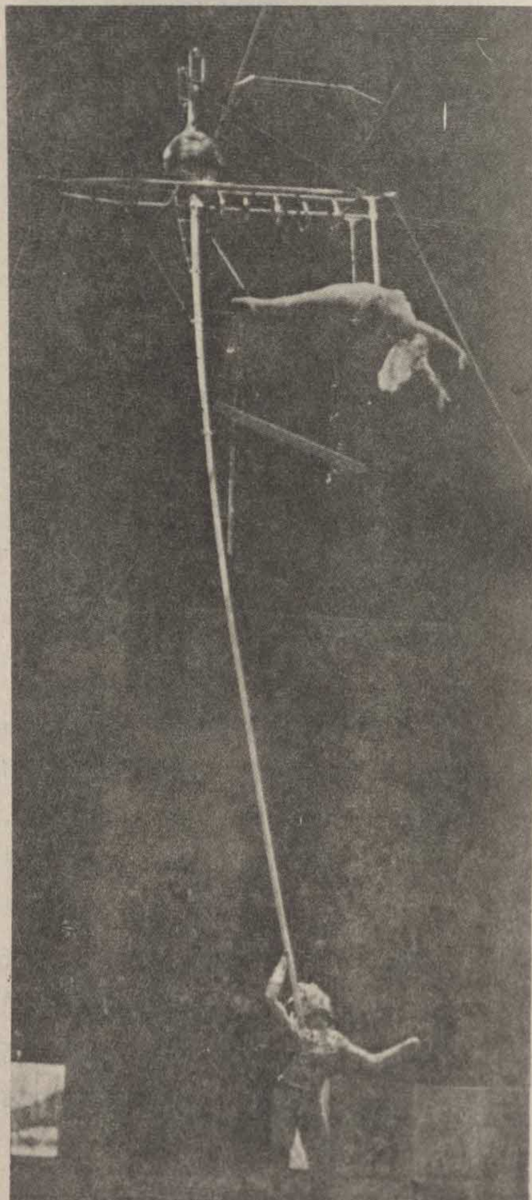
আজকাল সব সার্কাসেই টান টান করে খাটানো সরু দড়ির উপর দিয়ে হাঁটা বা তার উপর দাঁড়িয়ে নানা কৌশল দেখানো, ঘোড়ার পিঠে চড়ে খালি



সার্কাসে ঘোড়ার খেলা

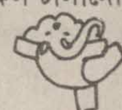


কামান ছুঁড়লে মানুষ গোলার মতো বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে



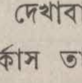
সার্কাসে খেলোয়াড়ের কাঁধের উপরেরলাঠিতে অন্য একজন খেলোয়াড়ের খেলা দেখানো। ব্যালান্সের রোমহর্ষক নিদর্শন

হাতে ভারসাম্য দেখানো, জোড়া ঘোড়ায় চড়া, ট্রাপিজ (trapeze)-এর খেলা, মোটর গাড়ির এক জায়গা থেকে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গা লাফ দিয়ে পার হয়ে যাওয়া, মোটরবাইক চালানোর নানা কসরত দেখানো, নানা ভঙ্গীতে ও কায়দায় সাইকেল চালানো, এক চাকার সাইকেল চালানো প্রভৃতির ব্যবস্থা আছে।



॥ বাঙালীর সার্কাস ॥

বাঙালীরা সার্কাসে বেশ সুনাম অর্জন করেছে। সার্কাসে কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীম ভবানী, সুশীলা প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শারীরিক কৌশল দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন। শুধু খেলা দেখানো নয়, বাঙালীদের তত্ত্বাবধানে বহু সার্কাস পার্টি গঠিত হয়েছে। এক সময় প্রোফেসর বোসের সার্কাস খুব নাম করেছিল। প্রায় ৮০ বৎসর আগে হিন্দু-মেলায় নবগোপাল মিত্র প্রথম সার্কাস দেখাবার ব্যবস্থা করেন। প্রোফেসর বোসের সার্কাস তার ২০-২৫ বৎসর পরে গড়ে ওঠে। প্রোফেসর বোস অর্থাৎ প্রিয়নাথ বোস এই সার্কাসের প্রতিষ্ঠাতা। হরিমোহনের সার্কাস একসময়ে বেশ নাম করেছিল। হরিমোহন অর্থাৎ হরিমোহন রায় রাজা রামমোহন রায়ের পৌত্র। কৃষ্ণলালের হিপোড্রোম সার্কাস (Hippodrome Circus) খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করে। হিপোড্রোম শব্দের অর্থ ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও রথের দৌড়ের মাঠ। কৃষ্ণলালের হিপোড্রোম সার্কাসে প্রধানতঃ নানা ঘোড়ার খেলা দেখানো হত। কৃষ্ণলালের অনেক রংবেরঙের বলিষ্ঠ ঘোড়া ছিল।



॥ বাঘের খেলা ॥

পৃথিবীতে সব চেয়ে সুন্দর ও বলবান্ বাঘ সুন্দরবনের বাঘ, যার নাম রয়েল বেঙ্গল টাইগার। এই অতি হিংস্র প্রকৃতির বাঘ নিয়ে বাঙালীরা



বাঘের জ্বলন্ত আগুনের রিং-এর মধ্য দিয়ে লাফ

প্রথম তাদের সার্কাসে খেলা দেখায়। রাশিয়ার সাইবীরিয়ান বাঘও খুব প্রসিদ্ধ। রাশিয়ান সার্কাসে সাইবীরিয়ান বাঘের খেলা দেখানো হয়। ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের সার্কাসেও বাঘের খেলা দেখানো হয়। বড় খাঁচায় করে বাঘকে তাঁবুর মধ্যে দর্শকদের সামনে আনা হয়। তার আগে তাঁবুর মধ্যের খেলা দেখাবার জায়গা লোহার রেলিং দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। তার পর খাঁচা থেকে বাঘকে খোলা জায়গায় ছেড়ে দেওয়া হয়। যিনি বাঘের খেলা দেখান, তিনি বেত হাতে দাঁড়িয়ে বাঘ বা সিংহকে নানা খেলা দেখাতে বাধ্য করেন। দর্শকেরা রুদ্ধশ্বাসে সেই অসম-সাহসিক খেলা দেখে বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়।

॥ শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৮ খ্রী.) ছিলেন একজন ভারতবিখ্যাত মল্লবীর ও যোগী। ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি দু'বছর ত্রিপুরার মহারাজের পার্শ্বচর ছিলেন। পাটনার নবাবের বাঘিনী 'বেগম'কে

বশ করে তিনি ঐ বাঘিনী ও দু'হাজার টাকা পুরস্কার পান। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ফ্রেডকুকের ইংলিশ সার্কাসে হিংস্র জন্তুর খেলা দেখাবার জন্যে দেড় হাজার টাকা বেতনে নিযুক্ত হন। এর এক বৎসর পরে ঐ সার্কাস ছেড়ে দিয়ে নিজে এক সার্কাস দল গঠন করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী যিনি বুকে পাথর ভাঙা দেখিয়ে নাম করেন। ৪২ বৎসর বয়সে তিনি তিব্বতী বাবার নিকট দীক্ষা নিয়ে সোহহং স্বামী নামে পরিচিত হন ও হিমালয়ের ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর লেখা 'সোহহং গীতা', 'সোহহং তত্ত্ব', 'বিবেকগাথা', 'Truth' প্রভৃতি কয়েকটি বই আছে। তাঁর দৈহিক শক্তি ছিল অপরিসীম, মানসিক শক্তিও ছিল তেমনি অসাধারণ। তিনি বাঘের মুখের মধ্যে নিজের মাথা পর্যন্ত প্রবেশ করিয়ে দিতে পারতেন। তাঁর দৃষ্টিশক্তির প্রভাবে হিংস্র জন্তুরা বশীভূত হত।



॥ ভীম ভবানী ॥

ভীম ভবানী (ভবেন্দ্র সাহা) ছিলেন প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর। তিনি কলিকাতার বীডন স্ট্রীটের অধিবাসী ছিলেন। রসরাজ অমৃতলাল বসু তাঁকে ভীম ভবানী নাম দেন। নানাস্থানে সার্কাস দেখিয়ে তিনি ১২০টি স্বর্ণ ও রৌপ্য পদক লাভ করেন। ভীম ভবানী (১২৯৮-১৩২৯ বঙ্গাব্দ) সার্কাসে বুকের উপরে হাতি ধারণ করা দেখাতেন ও একসঙ্গে তিনখানি মোটরের গতিরোধ করতে পারতেন।

॥ কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস ॥

সুরেশ বিশ্বাস (১৮৬১-১৯০৫ খ্রী.) ছিলেন একজন বিখ্যাত বাঙালী বীর। নদীয়া জেলার নাথপুর তাঁর জন্মস্থান। তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৭ বৎসর বয়সে তিনি একটি জাহাজে স্টুয়ার্ড হয়ে লণ্ডনে যান। একটি সার্কাস দলে যোগ দিয়ে সেখান থেকে তিনি জার্মানি ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান (১৮৮৫)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি মেক্সিকোয় যান। সেখান থেকে যান ব্রাজিলে। ব্রাজিলে সৈন্যদলে যোগ দিয়ে কর্নেল পদে অধিষ্ঠিত হন। ব্রাজিলের তদানীন্তন রাজধানী রিও ডি জ্যানিরোয় পরলোকগমন করেন। তিনি সার্কাসে হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের খেলা দেখাতেন। বার ও রিং-এর খেলাতেও তাঁর খুব নাম ছিল।

। জন্তুজানোয়ারদের খেলা ॥

সীল মাছ জলে থাকে। তাকে এমন ভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে সে নাকের উপর বল রেখে খেলা দেখাতে পারে। পেঙ্গুইন সামুদ্রিক পাখি। তারা সার্কাসের খেলোয়াড়ের নির্দেশ পালন করে চলাফেরা করে। শিম্পাঞ্জী হুবহু মানুষের মতো আচরণ করে। শিম্পাঞ্জী খুব বুদ্ধিমান্ জানোয়ার। তার উপরে সুশিক্ষা পেয়ে অদ্ভুত সব কৌশল প্রদর্শন করে সার্কাসের দর্শকদের স্তম্ভিত করে দেয়। গরিলা, বাঘ, সিংহ পোষা কুকুরের মতো খেলোয়াড়ের কথামতো কাজ করে। হাতি, ঘোড়া তো পোষ মানেই, তার উপরে উপযুক্ত শিক্ষালাভের ফলে দর্শকদের চিত্তজয়ের মতো আকর্ষক খেলা দেখাতে পারে।

॥ ভারতের বিভিন্ন সার্কাস ॥



ভারতে রেমন সার্কাস, কমলা সার্কাস, অলিম্পিক সার্কাস, জেমিনি সার্কাস, ন্যাশনাল সার্কাস প্রভৃতি বহু সার্কাস নানা স্থানে খেলা দেখিয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছে।



বর্তমান যুগে পৃথিবীর সব দেশেই স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, টোল, মাদ্রাসা প্রভৃতি আছে। কিন্তু প্রাগৈতিহাসিক যুগে সে-সব ছিল না। লোকে সে-সময়ে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে বাস করত। তখনকার দিনে তাদের বাসের গৃহ পর্যন্ত ছিল না। কোনরকমে জন্তুজানোয়ার মেরে পেট ভরাত। চাষ করতে পর্যন্ত জানত না।

ক্রমশঃ যত দিন যেতে লাগল, তারা থাকবার ঘর তৈরি, চাষ-আবাদ করা, ভেলা বা নৌকোয় করে মাছ ধরতে যাওয়া প্রভৃতি শিখল। তারপর এমন দিন এল যখন তারা একসঙ্গে বসে নানা বিষয়ে পরামর্শ করে কাজ করতে শিখল। পরস্পরের সঙ্গে যে ভাষায় কথা বলত, তা লেখবার পদ্ধতি আবিষ্কার করল। ছবি আঁকা, গান গাওয়া, বাজনা বাজানো প্রভৃতি দলবদ্ধভাবে করতে শিখল। এমনি করে নানা বিষয়ে শিক্ষা করার ও শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হল। ক্রমে ক্রমে আজকালকার মতো না হলেও একসঙ্গে বসে শিক্ষালাভের জন্যে সমবেত হতে শিখল। সেই থেকেই পাঠশালা, টোল প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা।



গুহার ভিতরে দেয়ালে আঁকা ছবি

সারা পৃথিবীতে আজ দেশের সংখ্যা অনেক, লোকসংখ্যা প্রায় ৪৫০ কোটির উপর। দেশ

বলতে যা বোঝায় আগে তত দেশ পৃথিবীতে ছিল না। লোকের সংখ্যাও ছিল অনেক কম। তখনকার দিনে নানাভাবে জ্ঞানী লোকদের কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা শিক্ষা লাভ করত।

॥ স্কুল বা বিদ্যালয়ের সৃষ্টি ॥



লোকে কথা বলে মনের ভাব প্রকাশ করে আসছে কয়েক লক্ষ বছর আগে থেকেই। কিন্তু লিপি বা সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। লিপি বা সাংকেতিক চিহ্ন আবিষ্কারের পর থেকেই স্কুল বা বিদ্যালয় গড়ে উঠতে থাকে।



সুমেরীয় লিপি

কোন্ দেশে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তা বলা কঠিন। তবে সুমেরীয়, মিশরীয়, ভারতীয়, চীনা প্রভৃতি সভ্যতার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে বুঝতে পারা যায়, অতি প্রাচীন কালে বহু বিদ্যালয় ছিল এবং সে-সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা নানা বিষয়ে শিক্ষালাভ করত।

॥ বিভিন্ন দেশে শিক্ষা-ব্যবস্থার আরম্ভ ॥

আর্যসভ্যতা অতি প্রাচীন। আর্য ঋষিরা বনের মধ্যে নিজ নিজ গৃহে শিষ্যদের বিভিন্ন বিদ্যা শেখাতেন।

দ্রাবিড় সভ্যতার পীঠস্থান মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষের মধ্যে সে-যুগের বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। সুমেরীয়রা যে-সব মন্দির নির্মাণ করেছিল সেই সব মন্দির ধ্বংস হয়ে গেছে। মন্দির-সংলগ্ন বহু বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। মন্দিরের পূজারীরাই সাধারণতঃ সেই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা-দান করতেন।

মিশরের প্রাচীন ইতিহাস পাঠে জানা যায়, সেখানকার মন্দিরের পুরোহিতরা শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতেন।

গ্রীসে খ্রীষ্টজন্মের বহু সহস্র বৎসর পূর্বে বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। এক একটা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে বহু শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত। সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল প্রভৃতি শিক্ষাগুরুরা শিক্ষার্থীদের নানা বিষয়ে শিক্ষাদান করতেন।

চীনে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে অনেক বিদ্যালয় ছিল। চীনের সম্রাটদের আনুকূল্যে সেই সব বিদ্যালয় সুসংগঠিত ছিল।

॥ মায়া-সভ্যতা ॥

মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ মেক্সিকোয় মায়া-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। মায়ারা দেশের নানাস্থানে বহু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল। সেই সব বিদ্যালয়ের বহু ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

মায়ারা এশিয়ার লোক। তারা বেরিং প্রণালী হয়ে প্রথমে আলাস্কায় যায় ও ক্রমশঃ



মায়াদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির

গরমের দেশ মধ্য আমেরিকায় পাকাপাকিভাবে বসতি স্থাপন করে। দেখা গেছে, যেখান দিয়ে তারা আমেরিকায় এসেছিল, সেই সব স্থানে কিছুকাল বসবাস করবার সময়ে নানা ধরনের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান তারা গড়ে তুলেছিল। স্থান-ত্যাগের সময় তারা তাদের তৈরী শিক্ষা-ভবনগুলি ধ্বংস করে যায় নি। কালের প্রভাবে সেগুলি আপনাআপনি ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু সে-সবের ধ্বংসাবশেষ আজও বর্তমান।
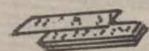
॥ ইন্‌কা সভ্যতা ॥

প্রায় ১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পেরুতে এক বিস্ময়কর সভ্যতা গড়ে ওঠে। বিভিন্ন জাতি বিভিন্ন সময়ে পেরুতে আধিপত্য করে। তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ছিল। সকলের শেষে আসে ইন্‌কারা। তারা ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে রীতিমতো সমৃদ্ধিশালী হয়ে ওঠে। ইন্‌কাদের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে অনেক শিক্ষার্থী শিক্ষালাভ করত। শেষে স্পেনীয়রা ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইন্‌কাদের পরাজিত করে তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ধ্বংস করে।



ইন্‌কাদের গড়া মন্দির

॥ সুমেরীয় সভ্যতা ॥



সুমেরীয়দের নিজস্ব লিপি ছিল। তখনকার দিনে এখনকার মতো কাগজ ছিল না। প্যাপাইরাস গাছের মজ্জা বা ভারতের মতো তালপাতায় তারা লিখত না। পাতলা পাতলা পাথরের ফলকে বা পোড়া মাটির ফলকে লিখত।

শিক্ষার্থীরা সেই সব ফলক থেকে শিক্ষা লাভ করত। উর (Ur) ছিল সেকালের একটি সুসভ্য সুমেরীয় শহর। সুমেরীয় অন্যান্য বহু শহরের মতো উরের অধিবাসীরা ইউফ্রেতিজ নদীর পূর্ব তীরে বহু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল। তারা জ্যোতির্বিদ্যা শিক্ষার জন্যে মানমন্দির পর্যন্ত গড়েছিল। প্রায় ২৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উরের অধিবাসীরা টাইগ্রিস বা ইউফ্রেতিজ নদী থেকে কাদা নিয়ে ইট তৈরি করেছিল এবং সেই সব ইট দিয়ে বহু বাড়ি, মন্দির, বিদ্যালয় গড়েছিল।

সুমেরীয়রা যেখানে বাস করত সেখান থেকে মিশরের দূরত্ব ছিল বহু শত মাইল। কিন্তু মিশরীয়দের সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয় সভ্যতার বহু আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করা যায়। যেমন লক্ষ্য করা যায়, মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পার সভ্যতার সঙ্গে সুমেরীয়, মিশরীয় ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতার বহু মিল।

॥ হরপ্পা ও মোহেন-জো-দরোর শিক্ষা-ব্যবস্থা ॥

হরপ্পায় মোহেন-জো-দরোর চেয়েও কিছুটা উন্নততর শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল বলে জানা গেছে।



মোহেন-জো-দরো

প্রায় ৫ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হরপ্পা ও মোহেন-জো-দরোর অধিবাসীরা যে-সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিল, তার ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। অবশ্য সেখানে প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় নি।

॥ চীনা সভ্যতা ॥

চীনা সভ্যতা প্রথমে গড়ে ওঠে পীত নদীর

তীরে। এখানেই চীনারা তাদের বহু শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের কৃষি, শিল্প, জ্যোতির্বিদ্যা, প্রভৃাত বিষয়ে শিক্ষাদান করত।

॥ ফিনিসীয়দের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ॥

প্রাচীন ফিনিসীয়রা জলপথে নৌকা-জাহাজাদি চালাতে ভালোভাবেই জানত। তারা ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ইজরায়েলে ও লেবাননের পাশ্চম উপকূলে এসে বসতি স্থাপন করে। তারা বয়নবিদ্যা, কাচ তৈরি, কৃষিবিদ্যা, নৌকো তৈরি, মৃৎশিল্প প্রভৃতিতে পটু ছিল। তাদের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল বলে জানা গেছে। ফিনিসীয়রা তাদের প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের যত্নের সঙ্গে শিক্ষাদান করত।

পৃথিবীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে ভালো ভাবেই বুঝতে পারা যায়, চীন থেকে আরম্ভ করে ভারত, মেসোপোটেমিয়া, অ্যাসিরিয়া, ফিনিসিয়া, মিশর, ব্যাবিলনিয়া, মেক্সিকো, পেরু, গ্রীস, রোম প্রভৃতি দেশে সুপ্রাচীন সভ্যতা ছিল এবং সব দেশেই শিক্ষা-ব্যবস্থা ছিল। সব স্থানের শিক্ষা-ব্যবস্থা একরকম না হলেও সকলেরই লক্ষ্য ছিল দেশ ও সমাজের উন্নতিকল্পে নানা ধরনের শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সুশিক্ষিত করে তোলা।

॥ ক্যুইনটিলিয়্যান ॥

প্রথম শতাব্দীতে রোমে ক্যুইনটিলিয়্যান (Marcus Fabius Quintilianus) নামে একজন প্রখ্যাত বাগ্মীর ধারণা ছিল, বক্তৃতা করতে না জানলে জ্ঞানের পরিচয় দেওয়া যায় না, জনসাধারণকেও জ্ঞানী করে তোলা যায় না। তিনি বক্তৃতা শেখাবার একটা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর লিখিত একটি পুস্তকও ছিল। তাতে তিনি লিখেছিলেন, শিক্ষার্থীরা যাতে স্বতঃস্ফূর্ত-ভাবে জ্ঞানলাভের জন্যে আগ্রহান্বিত হয়, তার জন্যে ব্যবস্থা করতে হবে। জোর করে কাউকে জ্ঞানদান করতে গেলে সুফল পাওয়া যাবে না।

॥ অ্যালক্যুইন ॥

অ্যালক্যুইন (Alcuin, ৭৩৫-৮০৪ খ্রী.) একজন ইংরেজ ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ ও কবি। তাঁর বহুমুখী কর্মধারার মধ্যে একটি হল গির্জার সংলগ্ন বিদ্যালয়সমূহের কর্তৃত্বগ্রহণ। তিনি নানাভাবে ওই সব শিক্ষাভবনে শিক্ষার্থীদের ঈশ্বরোপাসনা শিখিয়েছেন।

॥ ইরেসমাস ॥

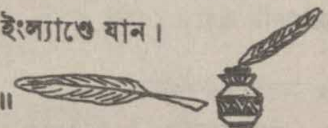
অ্যালক্যুইনের দেহাবসানের পর ইউরোপের নানা স্থানে বহু শিক্ষাব্রতী মনীষীর উদ্ভব হয়। তাঁর পরলোকগমনের প্রায় সাত শত বৎসর পরে



ইরেসমাস

ইরেসমাস ডেসিডেরিয়াস (Erasmus Desiderius, ১৪৬৬-১৫৩৬ খ্রী.) নামে একজন ওলন্দাজ জনসাধারণকে শিক্ষাদানকার্যে ব্রতী হন। তিনি শৈশব থেকেই নিজে পড়তেন ও সেই

সঙ্গে তাঁর সমবয়সী বহু শিক্ষার্থীকে শিক্ষালাভে সাহায্য করতেন। গির্জার সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। প্রথমে তিনি প্যারিসে যান। পরে সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে যান।



॥ জন কলেট ॥

ইরেসমাস ইংল্যাণ্ডে গিয়ে জন কলেট (John Colet, ১৪৬৭-১৫১৯ খ্রী.) নামে এক ধর্মাচারীর সঙ্গে মিলিত হন ও ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে কলেট সেন্ট পল'স স্কুল প্রতিষ্ঠা করলে সেই স্কুলে নূতন ধারায় শিক্ষাদান করতে থাকেন।

॥ টমাস মোর ॥

ইউটোপিয়া (Utopia)-নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের লেখক ও ধর্মযাজক স্যার টমাস মোর (Sir Thomas More, ১৪৭৮-১৫৩৫ খ্রী.) ইরেসমাসের বন্ধু ছিলেন। ইরেসমাসের সঙ্গে মিলিতভাবে তিনি গির্জা-সংলগ্ন বিদ্যালয়ে বিশেষ করে ধর্মীয় শিক্ষা দান করেন। টমাস মোর অষ্টম হেনরীর অধীনে লর্ড চ্যান্সেলার ছিলেন। বিরুদ্ধ ধর্মমত-প্রচারের জন্য মোর প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলে ইরেসমাস গির্জা-সংলগ্ন বিদ্যালয়ে মোরের অসমাপ্ত শিক্ষাদান কার্য চালিয়ে যেতে থাকেন।

ইরেসমাস জন কলেটের উৎসাহে গ্রীক ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন ও প্রতি বিদ্যালয়ে বাইবেল শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন।

॥ গ্রামার স্কুল ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে লণ্ডনে 'গ্রামার স্কুল' প্রতিষ্ঠিত হয়। এই স্কুল এক ধরনের প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামার স্কুল কেবল লণ্ডনেই প্রতিষ্ঠিত হয় নি, জার্মানি, ইটালি প্রভৃতি দেশেও স্থাপিত হয়। গ্রামার স্কুলে ছোটরা আধুনিক কালের মতো সকালে বা দুপুরে বিদ্যাশিক্ষা করত। পরে কোথাও কোথাও আবাসিক বিদ্যালয় (residential school) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর ফলে বিশেষ করে দূরবর্তী স্থানের শিক্ষার্থীরা স্কুল-সংলগ্ন বাসভবনে থাকবার সুযোগ পায়।

প্রকৃত শিক্ষা কি, তা আজও সঠিকভাবে নিরূপিত হয় নি। প্রকৃত শিক্ষাদান বিষয়ে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন শিক্ষাগুরুরা গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তার ফলে বিভিন্ন শিক্ষাদানের ধারার নানা পরিবর্তন সাধিত হয়।

॥ কোমেনস্কি ॥

চেকোস্লোভাকিয়ার যোহান অ্যামস কোমেনিয়াস (Johann, Amos Comenius, ১৫৯২—১৬৭০ খ্রী.), চেক ভাষায় প্রথম চিত্রের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। তিনি ভাষাশিক্ষা ও বিজ্ঞানশিক্ষার প্রথার প্রবর্তন করেন।

কোমেনস্কি প্রথম ছবিওয়ালা বই প্রকাশ করেন। তাঁর লেখা প্রথম বই ফরাসী ভাষায় প্রকাশিত হয়। পরে বইটি কমপক্ষে ১৫টি ভাষায় অনূদিত হয়।

॥ পেস্তালৎসি ॥

সুইটজারল্যাণ্ডের বিখ্যাত লেখক ও শিক্ষাগুরু যোহান হাইনরিখ পেস্তালৎসি (Johann Heinrich Pestalozzi, ১৭৪৬—১৮২৭ খ্রী.) ছিলেন একজন দানশীল উদারহৃদয় ব্যক্তি। তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি জনসাধারণের কল্যাণে ব্যয় করেন। তিনি দরিদ্র বালকবালিকাদের শিক্ষাদানের জন্যে তাঁর দানের একাংশ ব্যয় করেন।

তিনি খুব অস্থিরমতি লোক ছিলেন। নানা সময়ে নানা ব্যবসায় শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর ব্যবসায়ে প্রভূত লোকসান হয়। তিনি তাঁর

গোলাবাড়িতে ২০টি গরিব ছাত্র নিয়ে স্কুল খোলেন। বলা যেতে পারে এটিই প্রথম শিল্প-বিদ্যালয়।

ফরাসীরা সুইটজারল্যাণ্ড আক্রমণ করলে তিনি বহু গৃহহীন ছাত্রদের নিয়ে বহু আবাসিক বিদ্যালয় ও সুইটজারল্যাণ্ডে অন্যান্য বহু স্কুল খোলেন।

॥ কিণ্ডারগার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি ॥

জার্মান শিক্ষাব্রতী মনীষী ফ্রবেল বা ফ্রোবেল (Friedrich Frobel বা Froebel, ১৭৮২-১৮৫২ খ্রী.) কিণ্ডারগার্টেন প্রথার প্রবর্তক। এই প্রথানুযায়ী শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষালাভের সঙ্গে নিজ নিজ প্রকৃতি-অনুযায়ী হাতের কাজ শেখানো হয়। ব্যায়ামশিক্ষার মধ্য দিয়ে চরিত্র গঠনে সহায়তা করা হয়। এই কিণ্ডারগার্টেন প্রথা এখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। এই প্রথায় পুতুল, ছবি, খেলা, নাচ, গান, হাতের কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে ছোটদের শিক্ষাদান করা হয়। ফ্রোবেল ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রথার উদ্ভাবন করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে এই প্রথা পুরোপুরি চালু হয়।

ফ্রোবেল ছিলেন একজন মন্ত্রীর পুত্র। তিনি শৈশবে মা-বাবাকে হারিয়ে অসহায় হয়ে পড়েন। প্রথমে তিনি তিনটি ছাত্রের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন। ছাত্র তিনজন তাঁর সঙ্গে পেস্তালৎসির একটি বিদ্যালয় দেখতে যান। বিদ্যালয়টিতে যেভাবে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল, তা দেখে তাঁরা মুগ্ধ হন।

পরে ফ্রোবেল পেস্তালৎসির চেয়েও সরল ও ব্যবহারিক ভাবে শিক্ষাদান প্রথার প্রবর্তন করেন। সেই থেকেই কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতির উদ্ভব। জার্মান ভাষায় কিণ্ডারগার্টেন (Kindergarten) শব্দের অর্থ ছোটদের বাগান। ফ্রোবেল ছোটদের ফুলের গাছ হিসাবে কল্পনা করে তাদের শিক্ষাভবনকে কিণ্ডারগার্টেন বা ছোটদের বাগান বলতেন।

অবশ্য সারা পৃথিবীতে ফ্রোবেলের কিণ্ডারগার্টেন পদ্ধতি ছড়িয়ে পড়লেও নানা দেশে তার কিছুটা পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

॥ মন্তেসরি পদ্ধতি ॥

ডঃ মেরিয়া মন্তেসরি (Dr. Maria Montessori M. D. D. Litt, ১৮৬৯-১৯৫২ খ্রী.) রোম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা এম. ডি.। তিনি রোমের এক বস্তিতে ৩ থেকে ৬ বৎসরের বিকলাঙ্গ ও জড়বুদ্ধি শিশুদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর বিদ্যালয় সে যুগে বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তাঁর বিদ্যালয়ে শিক্ষাদানপদ্ধতি ছিল অভিনব ধরনের। এই পদ্ধতি-অনুযায়ী শিক্ষার্থী স্বাধীন-ভাবে লিখতে পড়তে পারে। ৬ বৎসরের আগেই শিক্ষার্থীরা অঙ্ক কষতে পারে। হাতের কাজ, খেলাধুলা, ব্যায়াম, ছবি আঁকা, পুতুল গড়া প্রভৃতির মধ্য দিয়ে মন্তেসরি পদ্ধতি (Montessori System)-তে শিক্ষাদান করা হয়। পৃথিবীর নানা দেশে মন্তেসরি পদ্ধতিতে শিক্ষাদান চালু হয়েছে।

॥ গান-বাজনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা ॥

কাম্বোডিয়া (বর্তমান নাম কামপুচিয়া) ভারতীয় হিন্দুসভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত দেশ। সে-দেশের স্কুলকলেজে যেভাবে শিক্ষাদান করা হয় তাতে ছাত্রছাত্রীদের আনন্দলাভের সঙ্গে শিক্ষা-লাভের ব্যবস্থা আছে। বহু বিদ্যালয়ে গান-বাজনার মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়। এ ধরনের শিক্ষা-দানের প্রথা আর কোন দেশে আছে বলে মনে হয় না।

॥ মনিটরিয়াল পদ্ধতি ॥

মনিটর (monitor) শব্দের অর্থ সর্দার পড়ুয়া। স্কুলের শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব এই সব মনিটরের উপর। অবশ্য বর্তমানে মনিটর দ্বারা শ্রেণীর শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রথা তেমন চালু নেই। আণ্ড্ বেল নামে একজন বিদেশী ভারতভ্রমণে এসে মাদ্রাজে গিয়ে এক পাঠশালায় সর্দার পড়ুয়াদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। তিনি বুঝতে পারেন, এই প্রথায় স্কুলের শ্রেণীতে শৃঙ্খলা বজায় রাখলে পড়াশোনা ভালো হয়। দেশে ফিরে গিয়ে তিনি এই প্রথা চালু করেন।

জোসেফ ল্যাঙ্কাস্টার নামে একজন ইংরেজ দক্ষিণ লণ্ডনে সর্দার পড়ুয়াদের দ্বারা স্কুলের শ্রেণীতে শৃঙ্খলারক্ষার ব্যবস্থা করেন। এই প্রথাকে বলা হয় মনিটরিয়াল পদ্ধতি। পৃথিবীর সব দেশে এই প্রথা চালু হয় নি, বর্তমানেও চালু নেই।

॥ ব্রেইল পদ্ধতি ॥

লুই ব্রেইল (Louis Braille, ১৮০৯-১৮৫২ খ্রী.) একজন ফরাসী শিক্ষাবিদ্। তিনি এক দুর্ঘটনায় তিন বৎসর বয়সে অন্ধ হয়ে যান। তিনি অন্ধ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। অন্ধেরা যাতে লিখতে পড়তে পারে তার জন্যে তিনি এক অভিনব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এর নাম ব্রেইল পদ্ধতি (Braille System)।

কাগজের উপরে উঁচু উঁচু ডুমো ডুমো চিহ্ন তৈরি করে তার উপরে হাত বুলিয়ে অন্ধ শিক্ষার্থীরা অক্ষর শিক্ষা করে। এই উঁচু উঁচু ডুমো ডুমো চিহ্ন দিয়ে হাজার হাজার বই লেখা হয়েছে। সে-সবের সাহায্যে অন্ধরা বিদ্বান্ হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে এই ব্রেইল পদ্ধতি প্রচলিত।

রেভারেণ্ড লালবিহারী সাহা (১৮৬২-১৮৯২ খ্রী.) বাংলা ব্রেইল পদ্ধতির প্রবর্তক। তাঁর চেষ্টায় বেহালার অন্ধ বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিতে অন্ধদের বাংলা শিখানো হয়।

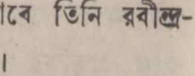
বর্তমানে কাগজের উপর ডুমো তোলবার জন্য টাইপরাইটারের মতো যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে। তার ফলে অন্ধদের শিক্ষালাভ সহজ হয়েছে।

॥ হেলেন কেলার ও মূকবধিরদের শিক্ষা ॥

হেলেন কেলার (Helen Adams Keller, ১৮৮০-১৯৬৮ খ্রী.) একজন অপূর্ব প্রতিভাশালিনী মার্কিন মহিলা। তিনি অসুস্থতার জন্য ১৯ মাস বয়সে অন্ধ, বধির ও মূক হয়ে যান। কিন্তু অদ্ভুত প্রতিভাবলে লিখতে, পড়তে, কথা বলতে শিখে-ছিলেন। তিনি মানুষের ঠোঁটে হাত দিয়ে তার কথা বুঝতে পারতেন। এইভাবে তিনি রবীন্দ্র-নাথের কথা বুঝতে পেরেছিলেন।

হেলেন কেলার বি-এ পাস করেন ও অধ্যাপিকা হন। তিনি 'Story of My Life,' 'The world I live in,' 'Mid-stream' প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন।

কথা শুনতে না পেলে কথা বলা শেখা যায় না। কাজেই বধির অর্থাৎ কালা লোকেরা মূক অর্থাৎ বোবাই হয়ে থাকে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় মূকবধিররাও পুরোপুরি না পারলেও কিছুটা কথা বুঝতে ও বলতে পারছে। এজন্যে পৃথিবীর নানা স্থানে মূকবধির বিদ্যালয় আছে।



॥ বোরস্টাল স্কুল ॥

কম বয়সের শিশুরা অপরাধ করে ও আদালতের বিচারে দণ্ডিত হয়। যাদের বয়স ১৬ বছরের,

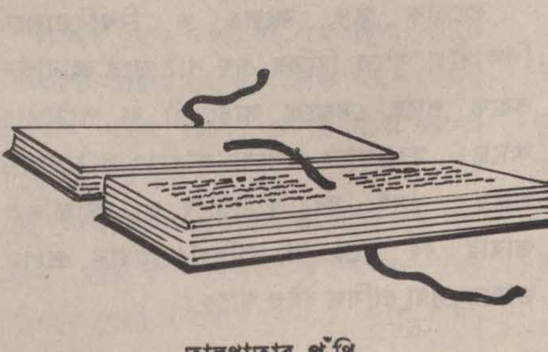
কোথাও কোথাও ২৩ বছরের কম, তাদের শুধু দণ্ডদান করেই সরকার ক্ষান্ত থাকেন না। সরকার থেকে তাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করা হয়। তাদের নানাভাবে শিক্ষা দিয়ে, উপদেশ দিয়ে, তাদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করে তাদের মনের পরিবর্তন ঘটানো হয়। এর ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে শিশু ও কিশোরদের মনের উন্নতি ঘটে, চরিত্র সংশোধিত হয়ে থাকে। তাদের যে কারাগারে পাঠানো হয়, তাকে বলা যেতে পারে সংশোধনী বিদ্যালয়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কেন্টের রচেস্টারের নিকটে বোরস্টাল গ্রামে এই ধরনের সংশোধনী কারাগার স্থাপিত হয়। তারই নাম বোরস্টাল স্কুল (**Borstal School**)। প্রথমে চারটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তিনটি ছেলেদের জন্যে, একটি মেয়েদের জন্যে।

বর্তমানে বোরস্টাল স্কুল নাম রাখা না হলেও এই ধরনের সংশোধনী বিদ্যালয় পৃথিবীর নানা দেশে স্থাপিত হয়েছে।

॥ ভারতের শিক্ষাপদ্ধতি ॥

সহস্র সহস্র বৎসর পূর্বে শিক্ষার্থীরা গুরুগৃহে থেকে শিক্ষালাভ করত। শিক্ষাশেষে গুরুর আশীর্বাদ নিয়ে নিজ নিজ গৃহে ফিরে যেত। এই ধরনের গুরুরা তপোবনে থাকতেন। গুরুই শিক্ষার্থীর সব খরচ বহন করতেন। আর সেই খরচ দেশের রাজারা যোগাতেন।



তালপাতার পুঁথি

প্রাচীনকালের সেই সব দিনের প্রথম দিকে কোন বই ছিল না। ছাত্ররা গুরুর মুখ থেকে শুনে সব বিদ্যা মুখস্থ করত। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বেদাধ্যয়ন হত। ন্যায়শিক্ষা, নানা শাস্ত্রপাঠ তখনকার দিনে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল।

পরে তালপাতার পুঁথির প্রবর্তন হয়। ভালো ভালো বই তালপাতার পুঁথিতে লেখা হত এবং শিক্ষানুরাগীরা সে-সবের নকল করত। সকল ক্ষেত্রেই সংস্কৃত ও পালি ভাষায় বই লেখা হত বা অধ্যাপনার কাজ চলত।

বুদ্ধদেবের পরবর্তী সময়ে তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী প্রভৃতি স্থানে বিরাট বিরাট বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছিল আবাসিক। এখানে প্রায় দশ হাজার শিক্ষার্থী থাকত। সুদূর চীন, জাপান, শ্যামদেশ, বলিদ্বীপ, সিংহল (শ্রীলঙ্কা), তিব্বত প্রভৃতি স্থান থেকে শিক্ষার্থীরা এখানে এসে বিদ্যার্জন করত।

কালক্রমে নালন্দা ও অন্যান্য স্থানের বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হয়ে গেলে মিথিলায় ন্যায়ের অধ্যাপনা-কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাংলা থেকে শিক্ষার্থীরা সেখানে ন্যায়ের উপাধি গ্রহণ করতে যেত ('দর্শনশাস্ত্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

আমাদের দেশে ইংরেজী ভাষা শিক্ষা প্রচলিত হবার আগে সংস্কৃত ও পালিভাষাই ছিল শিক্ষার বাহন। অবশ্য পালিভাষাও মধ্যপথে বন্ধ হয়ে যায়। পণ্ডিতেরা চতুষ্পাঠী বা টোল খুলে

শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান করতেন। ব্যাপকভাবে না হলেও চতুষ্পাঠী ভারতের, বিশেষ করে বাংলার সর্বত্রই বিদ্যমান। আগে রাজারা বা জমিদাররা চতুষ্পাঠীকে অর্থসাহায্য করতেন। এখন সরকার সীমিতভাবে সাহায্য করে থাকেন। চতুষ্পাঠীতে কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদান করা হয় ও উপাধি দান করা হয়। আগেকার নবদ্বীপ ছিল সংস্কৃত শিক্ষার পীঠস্থান। বর্তমানে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানে সংস্কৃত ভাষার চর্চা হয়ে থাকে। ভারত সরকার সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের মহামহোপাধ্যায় উপাধি দেন।

॥ শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমে 'শান্তিনিকেতন' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন কালের আশ্রমের মতো করে শান্তিনিকেতনকে গড়ে তোলা হয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্রহ্মচর্য বিদ্যালয় ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে সারা পৃথিবীর নানা দেশের পণ্ডিতেরা শিক্ষাদান করেছেন। পৃথিবীর সব পর্যটক শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী ও শ্রীনিকেতন (রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত) পরিদর্শন করতে এসেছেন।

রবীন্দ্রনাথ আম্রকুঞ্জে প্রাচীনকালের ঋষিদের মতো শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন। নাচ, গান, অঙ্কন, শাস্ত্র অধ্যয়ন, নানাবিষয়ে শিক্ষালাভ শান্তিনিকেতনের কার্যের অঙ্গ।

বিশ্বভারতী এখন একটি সরকার-নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে শান্তিনিকেতন বা বিশ্বভারতী রবীন্দ্রনাথের আদর্শ থেকে অনেক দূরে সরে গেছে।

॥ সারা পৃথিবীব্যাপী নানা শিক্ষায়তন ॥

সারা পৃথিবী জুড়ে সব দেশে অসংখ্য স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। ভারতে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বহু। সাধারণ শিক্ষালয় ছাড়া বহু কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয়, চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিদ্যালয়, এঞ্জিনীয়ারিং স্কুল, চিত্রাঙ্কন শেখার বিদ্যালয় প্রভৃতি সর্বত্র গড়ে উঠেছে। প্রায় সব কলেজেই বিজ্ঞানশিক্ষা-বিষয়ক ল্যাবরেটরী বা গবেষণাগার আছে।

ভারতে মঠ, মন্দির, তীর্থস্থান-সংলগ্ন বহু বিদ্যালয় আছে। সে-সব শিক্ষাভবনে ধর্মশিক্ষাই প্রধান।

সেই সব শিক্ষালয়ে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করা হয়, ধর্মগ্রন্থ পাঠ, স্তোত্র আবৃত্তি, ধর্মসংগীত করা হয়।

॥ মক্তব ও মাদ্রাসা ॥

ভারতীয় মুসলমানেরা, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের মুসলমানেরা মক্তব ও মাদ্রাসায় পড়েন। আগে মক্তব ও মাদ্রাসার সংখ্যা বেশী ছিল, বর্তমানে অনেক কমে গেছে।

॥ পাঠাগার ॥

প্রত্যেক স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যা'তে বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করে জ্ঞানার্জন করতে পারে, সেজন্যে লাইব্রেরী বা পাঠাগার আছে। স্বতন্ত্রভাবে অসংখ্য সাধারণ পাঠাগারও আছে। সেই সব পাঠাগারে শুধু আঞ্চলিক ভাষার বই থাকে না, পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষায় লেখা প্রসিদ্ধ বইও থাকে।



খেলাধুলা

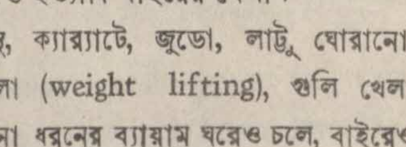
বেঁচে থাকতে হলে মানুষকে কাজ করতে হয়। সে-কাজ নানা ধরনের। চাষবাস থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের কারিগরী কাজ, শিক্ষার্থীদের পড়ানো, অফিসে কেরানীগিরি, বই লেখা, অভিনয়, গানবাজনা করা, ছবি আঁকা—এমনই কত ধরনের কাজ মানুষকে করতে হয়। শিক্ষার্থীরা স্কুলকলেজে পড়ে, আর্টস্কুলে ছবি আঁকা শেখে, দল বেঁধে বেড়াতে যায়। কিন্তু শুধু কাজ নিয়ে থাকলে চলে না। কাজের ফাঁকে সকলকেই খেলাধুলা করতে হয়। তাতে ব্যায়াম হয়, মনে স্ফূর্তি আসে। তাই সকল দেশে সকল বয়সের লোকে নানা ধরনের খেলায় মেতে থাকে।

এই খেলা যে কত রকমের, তা বলে শেষ করা যায় না। তবে তা প্রধানতঃ দু'রকমের—ঘরের মধ্যে থেকে খেলা ও বাইরে খেলা। তাস, দাবা, পাশা, পিংপং, বিলিয়ার্ডস, টেবলটেনিস, ক্যারম, ব্যাগ্যাটেলি প্রভৃতি খেলা ঘরের মধ্যেই হয়ে থাকে।

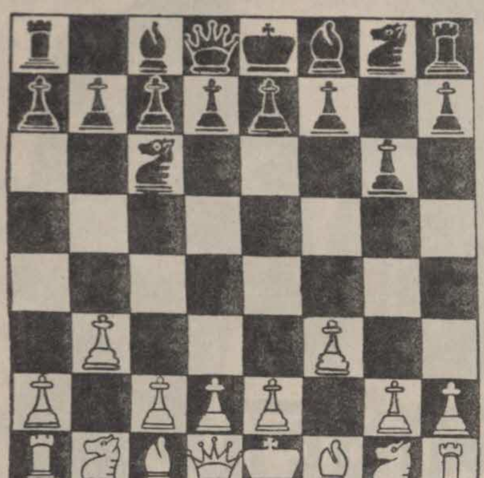
ফুটবল, রাগবি, ক্রিকেট, হকি, পোলো, গল্‌ফ্‌, বক্সিং, দৌড়, কপাটি, ডাংগুলি, ঘুড়ি ওড়ানো, ব্যাডমিন্টন, তীর ছোড়া, ঘোড়ায় চড়া, লাঠিখেলা, ভলিবল, লন-টেনিস, বাস্কেট বল, বাইচ, স্কেটিং, সাঁতার, স্কি-ইং, বেসবল, সাইকেল চালানো, শিকার, কুস্তি ইত্যাদি বাইরের খেলা।

জুজুৎসু, ক্যারাটে, জুডো, লাট্টু ঘোরানো, ভার তোলা (weight lifting), গুলি খেলা প্রভৃতি নানা ধরনের ব্যায়াম ঘরেও চলে, বাইরেও চলে।

॥ দাবা ॥



পৃথিবীতে কবে যে দাবা খেলার সৃষ্টি হয়েছিল, তা সঠিকভাবে বলা যায় না। যতদূর জানা গেছে,



দাবা খেলার ছক

৫/৬ হাজার বছর আগে ভারতে 'চতুরঙ্গ' খেলার প্রচলন ছিল। তখনকার দিনে হাতি, ঘোড়া, রথ ও পদাতিক—এই চাররকম ঘুঁটি নিয়ে 'চতুরঙ্গ' খেলা হত। এর বহু পরে পারস্যের (ইরানের) লোকেরা এই খেলা খেলবার সময় নিয়মকানুন কিছুটা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই খেলার নাম রাখে 'শতরঞ্চ'।

ইরান থেকে শতরঞ্চ খেলা ইউরোপে গেল। সেখানে এই খেলার নামও পালটে গেল, নিয়ম-কানুনও পালটে গেল।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইটালীতে দাবা খেলায় খুব উন্নতি হয়। বর্তমানে রাশিয়াতে দাবা খেলার চলন খুব বেশী। পূর্বে যে-নিয়মে দাবা খেলা হত, এখন সে-সব নিয়মের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন, পোর্তুগাল, নরওয়ে, সুইডেন, চীন, জাপান, মেক্সিকো প্রভৃতি সকল দেশে দাবা খেলার প্রচলন আছে। অন্যান্য খেলার মতো দাবা খেলোয়াড়দের মধ্যে যাঁরা প্রসিদ্ধি লাভ করেন, তাঁরা পরে আর তত প্রসিদ্ধ থাকতে পারেন না। নূতন খ্যাতিমান্ খেলোয়াড়েরা ক্রীড়ামোদীদের নিকট থেকে প্রশংসা অর্জন করে থাকেন। কাপাব্লাঙ্কা, আলেখিন, বরিস স্প্যাস্কি, সুলতান খাঁ, বট্‌ভিনিক প্রভৃতি দাবাড়ুরা যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমানে আমেরিকার ববি ফিশার একজন বিখ্যাত দাবাড়ু। ভারতের কিশোর দাবাড়ু দিব্যেন্দু বড়ুয়া খুব সামান্য বয়সে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন (জন্ম ১৯৬৬খ্রী.)। দিব্যেন্দু মেক্সিকো, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে প্রভূত সুনাম অর্জন করেছেন।

দাবা দুজনের মধ্যের খেলা। একটা চৌকো ছকে ৬৪টি ঘর কাটা থাকে। তার এক মাথায় দু' সারিতে ৮টা করে ষোলটা, অন্য মাথায় দু'





দাবা খেলার ঘুঁটি

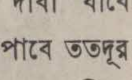
সারিতে ৮টা করে ষোলটা ঘুঁটি সাজিয়ে খেলা শুরু হয়।

প্রত্যেক খেলোয়াড়ের ১৬টি করে ঘুঁটি থাকে। একজন রাজা (King), একজন রানী (Queen), দুটো গজ বা পিল (Bishop), দুটো নৌকো (Rook বা Castle), দুটো ঘোড়া (Knight), আটটা বোড়ে (Pawn) থাকে। একজন খেলোয়াড়ের ঘুঁটি সাদা, অপর জনের ঘুঁটি হয় কালো রঙের।

দাবা খেলার মূল উদ্দেশ্য হল, ঘুঁটি চেলে চেলে রাজাকে বন্দী করা অর্থাৎ রাজাকে এমন অবস্থায় ফেলা যাতে রাজা নড়তে চড়তে না পারে। একেই বলে কিস্তিমাত। এতেই খেলা শেষ হয়।

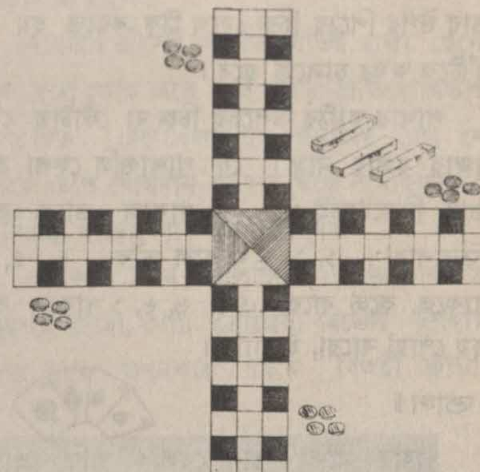
এদেশের দাবার ঘুঁটির চেহারা ও নাম বিদেশের দাবার ঘুঁটির চেহারা ও নাম থেকে পৃথক্।

প্রত্যেক ঘুঁটির চাল পৃথক্। দাবা যাবে কোনাকুনি বা সোজা। যতদূর ফাঁকা পাবে ততদূর গিয়ে অন্য ঘুঁটিকে মারতে পারবে। ঘোড়া সবদিকে আড়াই ঘর অর্থাৎ দুঘর সোজা গিয়ে তার পর বাঁ বা ডান পাশের ঘরে চলতে পারবে। বোড়ে সামনের দিকে একঘর যেতে পারবে, তবে অন্য পক্ষের ঘুঁটিকে কেবল কোনাকুনি ঘরে গিয়ে মারতে পারবে। গজ কেবল কোনাকুনি যাবে, নৌকো যাবে কেবল সোজা, তবে যেদিকে তার ইচ্ছা। রাজা একবারে প্রথমে আড়াই ঘর যেতে পারবে, তারপর এক ঘর করে যাবে যে কোন দিকে।



॥ পাশা ॥

পাশা খেলা তাস খেলার মতোই ভারতের সুপ্রাচীন কালের খেলা। মহাভারতে ভালোভাবেই পাশা খেলার উল্লেখ আছে। যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের সঙ্গে পাশাখেলায় হেরে গিয়ে রাজত্ব ত্যাগ করে বারো বৎসরের জন্যে বনবাসে ও এক বৎসরের জন্যে অজ্ঞাতবাসে যান। শকুনির কপটতায় যুধিষ্ঠিরকে



পাশা খেলার ছক

পরাজয় স্বীকার করতে হয়। পাশা খেলার অন্য নাম অক্ষক্রীড়া বা দ্যূতক্রীড়া। অক্ষ শব্দের অর্থ পাশা।



যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের পাশা খেলা। পাশে শকুনি।

পাশা খেলা কতকটা লুডো খেলার মতো। খোপ-কাটা ছকে ঘুঁটি চেলে এ খেলা খেলতে হয়। চিহ্ন-দেওয়া ৩টি লম্বা চৌকোনা কাঠ, হাড় বা

হাতির দাঁতের তৈরী কাঠি হাতে নিয়ে ফেললে তার উপর পিঠের চিহ্ন দেখে ঠিক করতে হয় যে ঘুঁটিকে ক'ঘর চালতে হবে।

পাশার কাঠির উপরের চিহ্ন বা ফোঁটার বেশ মজার মজার নাম। যে পাশাগুলি ফেলা হবে তার তিনটেতেই ১, ১, ১ থাকলে তাকে বলে তিনপোয়া ; ১, ১, ২ থাকলে চৌক ; ৬, ৫, ১ থাকলে কচ্চে বারো এবং ৬, ৬, ১ থাকলে বলা হয় পোয়া বারো, ইত্যাদি।

॥ তাস ॥

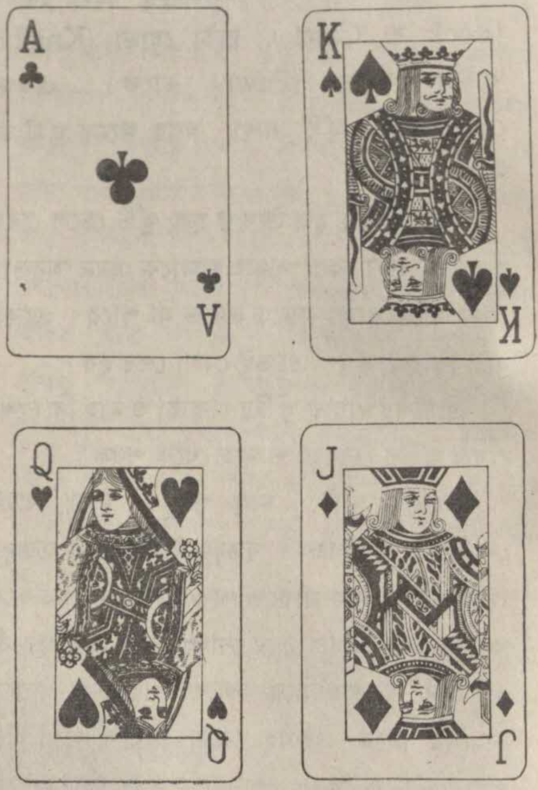


দাবার মতো তাস খেলাও অতি প্রাচীন কালের ভারতীয় খেলা। তখনকার দিনে তাসে পদ্ম, শঙ্খ, গদা, বৃত্ত ও দেবদেবীর মূর্তি আঁকা থাকত। সেই সময়ের তাসখেলার নিয়মও ছিল অন্য।

পরে ভারত থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার নানা দেশে তাস খেলার প্রচলন হয়। প্রথমে ইউরোপের তাসে পাতা, ওক গাছের ফল, ঘণ্টা প্রভৃতি আঁকা থাকত। পরে নানা জন্তুজানোয়ারের ছবি আঁকা থাকত।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজেরা যে তাসখেলার প্রচলন করে, বর্তমানে এদেশে তাই-ই চালু আছে। এখন তাসে ইস্কাপন, চিড়িতন, হরতন, রুহিতন ও টেক্কা থাকে।

তাস খেলা নানা রকমের—টোয়েন্টিনাইন, বিন্তী, ব্রিজ, পেশেন্স (patience), সোলো হুয়িস্ট (solo whist), হুয়িস্ট (whist) ইত্যাদি। সাধারণতঃ লোকে বিন্তী ও টোয়েন্টিনাইন খেলে। ব্রিজ খেলা সব চেয়ে বুদ্ধির খেলা। বিভিন্ন স্থানের প্রতিযোগিতায় ব্রিজ খেলাই হয়ে থাকে।



তাসে ইস্কাপন, চিড়িতন, হরতন ও টেক্কা

ব্রিজ খেলা নানা রকমের—Auction Bridge, Contract Bridge ইত্যাদি। এ সবের মধ্যে Contract Bridge সব চেয়ে প্রসিদ্ধ।

প্রায় একশত বৎসর পূর্বে ব্রিজ খেলার প্রচলন হয়। হুয়িস্ট খেলা থেকেই এর উদ্ভব। এই ধরনের খেলা ডেনমার্ক, তুরস্ক, ইজিপ্ট ও রাশিয়ায় চালু ছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে Dutch whist নামে প্রচলিত হয়। পরে নাম হয়

রাশিয়ান হুয়িস্ট ও বিরিচ (Biritch)। পরে ১৮৯৫ সালে ব্রিজ খেলার নিয়মকানুন চালু হয়। ১৯০৮ সালে Auction Bridge নামে ব্রিজ খেলা চালু হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে কনট্রাক্ট ব্রিজ খেলা শুরু হয়। বর্তমানে কনট্রাক্ট ব্রিজ খেলা বিশেষভাবে প্রচলিত।

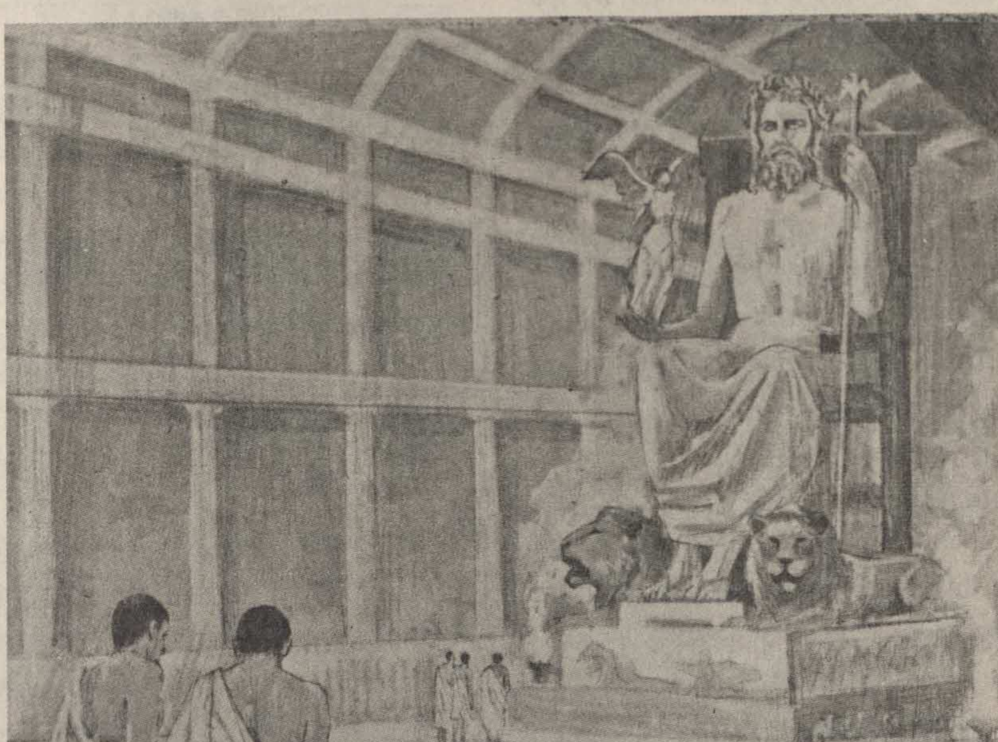


॥ ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা ॥

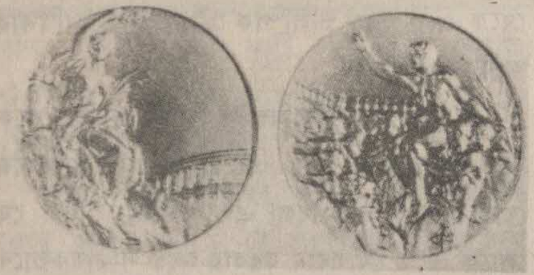
প্রাচীন কালে গ্রীস দেশের লোকেরা গ্রীসের পেলোপনেসাসের অন্তর্গত ওলিম্পিয়া (Olympia)-নামক পাহাড়ের পাদদেশে দেবতাদের রাজা জীউসের সম্মানার্থে প্রতি পঞ্চম বৎসরে একটা ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করত। এরই নাম ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতা। খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৭৭৬ থেকে ৩৯৩ পর্যন্ত ওলিম্পিক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়েছিল।

সে সময়ে গ্রীসের অন্তর্গত বিভিন্ন রাজ্য থেকে দলে দলে লোক এসে এই ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগ দিত। এই খেলা এত জনপ্রিয় ছিল যে লোকে এতে যোগদান করবার জন্যে সাময়িকভাবে যুদ্ধবিগ্রহ, ঝগড়াবিবাদ বন্ধ করে দিত।

এখনকার দিনে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে সোনা, রুপা, ব্রোঞ্জের মেডেল উপহার দেওয়া হয়। তখনকার সময়ে বিজয়ী ক্রীড়া-প্রতিযোগী পেতেন কেবল লরেল গাছের (এক ধরনের জলপাই গাছের) পাতার মুকুট। সেই মুকুট পাবার জন্যে ক্রীড়া-প্রতিযোগীরা উন্মুখ হয়ে



দেবতাদের রাজা জীউসের মন্দির



ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার মেডেল

থাকত।

প্রতি চার বছর অন্তর ক্রীড়া অনুষ্ঠান হত। প্রথম ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় শুধু দৌড়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। তাতে এত লোক যোগ দিয়েছিল যে সেই দৌড়ের খেলাই চলেছিল অনেকদিন ধরে।

প্রথম ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় এলিস (Elis) -এর কোরোয়বস (Coroibos) নামে এক পাচক দৌড়ে প্রথম স্থান অধিকার করে।

পরে কুস্তি, চাকতি ছোড়া, একসঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ ও মল্লযুদ্ধ (pancratium) প্রভৃতি খেলার প্রচলন হয়। পেণ্টাথলন (pentathlon) (অর্থাৎ লাফ, বর্শা ছোড়া, দৌড়, চাকতি ছোড়া ও কুস্তির সমষ্টি)-এ জয়লাভ করতে পারা সে যুগে ছিল সব চেয়ে বড় সম্মান।

প্রথম দিকে মেয়েদের ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় যোগ দেওয়া দূরে থাক, এই প্রতিযোগিতায় দর্শক হিসাবে উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ ছিল। পরে সে নিয়ম উঠে যায়। মেয়েরা নানা ক্রীড়াতে যোগ দেয়। একবার বেলিসিকা (Belisicha) নামে এক মহিলা রথচালনা (chariot race)-তে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

রোমক সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াস দ্য গ্রেট, (৩৪৬-৩৯৫ খ্রী.) ৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে মিলানে এক আদেশ জারি করেন। তার ফলে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা বন্ধ হয়ে যায়।



ব্যারন দ্য কুবার্তাঁ

পিয়েরে দ্য ফ্রেডি, ব্যারন দ্য কুবার্তাঁ)Pierre de Fredi, Baron de Coubertin, ১৮৬৩-১৯৩৭ খ্রী.) নামে এক ফরাসী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ইউরোপে যে ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করেন, তাই-ই বর্তমান কালের ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগিতা চালু হয়।

প্রতি চার বৎসর অন্তর এই প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়। প্রথম অনুষ্ঠান হয় অ্যাথেন্সে (১৮৯৬ খ্রী.)। প্যারিস (১৯০০), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেণ্ট লুই (১৯০৪), অ্যাথেন্স (১৯০৬), লণ্ডন (১৯০৮), স্টকহোম (১৯১২), বার্লিন (১৯১৬), বেলজিয়ামের অ্যাণ্টোয়ার্প (১৯২০), প্যারিস (১৯২৪), আমস্টার্ডাম (১৯২৮), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলস (১৯৩২), বার্লিন (১৯৩৬), ১৯৪০ ও ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ক্রীড়ানুষ্ঠান হয় নি, লণ্ডন (১৯৪৮), হেলসিংকি (১৯৫২), মেলবোর্ন (১৯৫৬), রোম (১৯৬০), টোকিও (১৯৬৪), মেক্সিকো (১৯৬৮), পশ্চিম জার্মানির ম্যুনিক (১৯৭২), কানাডার মনট্রেয়াল (১৯৭৬), মস্কো (১৯৮০)। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লস অ্যাঞ্জেলসে হবার কথা।

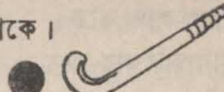
॥ ম্যারাথন রেস ॥

খ্রী. পূ. ৪৯০ অব্দে ফাইডিপ্পাইডিস (Pheidippides) নামে এক যোদ্ধা ম্যারাথন থেকে অ্যাথেন্সে যুদ্ধজয়ের সংবাদ নিয়ে যান। ম্যারাথন থেকে অ্যাথেন্সের দূরত্ব ৪২ কিলোমিটার ৩২৫ মিটার (২৬ মাইল, ৩৮৫ গজ)। অ্যাথেন্সে পৌঁছেই যোদ্ধাটি মারা যান। ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানের একটি প্রধান প্রতিযোগিতা ম্যারাথন রেস। প্রাচীন কালের ম্যারাথন থেকে অ্যাথেন্সে দৌড়ে যাবার ব্যাপার স্মরণীয় করে রাখবার জন্য এই প্রতিযোগিতা হয়। এই প্রতিযোগিতার দৌড়ের পাল্লা ম্যারাথন থেকে অ্যাথেন্সে দৌড়-পাল্লার মতোই ৪২ কিলোমিটার ৩২৫ মিটার।



॥ ওলিম্পিক প্রতিযোগিতা ॥

ওলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে দৌড়, ম্যারাথন রেস, হাঁটা, হাই জাম্প, লং জাম্প, পোল ভল্ট, চাকতি ছোড়া, বর্শা ছোড়া, সাঁতার, পোলো, হকি, বাস্কেট বল, শুটিং, রোয়িং, টাগ অব ওয়ার, ভলিবল, ওয়াটার পোলো, ভারোত্তোলন, কুস্তি প্রভৃতি বিষয়ে প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।



॥ ওলিম্পিক হকি ॥

হকি খেলায় ভারতবর্ষ একসময়ে পৃথিবীর মধ্যে



ভারতীয় খেলোয়াড়ের হকি খেলা

সর্বশ্রেষ্ঠ ছিল। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ওলিম্পিকে হকি খেলায় ভারত জয়ী হয়। তারপর ১৯৩২, ১৯৩৬, ১৯৪৮, ১৯৫২ ও ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পর পর ওলিম্পিকে ভারত জয়ী হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় দল ওলিম্পিকে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত পাকিস্তানকে হারিয়ে বিজয়ীর



ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় হাই জাম্প

সম্মান লাভ করে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারত তৃতীয় স্থান অধিকার করে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১ম, ২য় ও ৩য় কোন স্থানই অধিকার করতে পারে না। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত জয়ী হয়।

॥ ওলিম্পিক হকি খেলার ফলাফল ॥

	জয়ী (১ম) (সোনার মেডেল্)	রানার্স আপ (২য়) (রুপার মেডেল)	তৃতীয় (ব্রোঞ্জ মেডেল)
১৯০৮	ইংল্যাণ্ড	আয়ার্ল্যাণ্ড	স্কটল্যাণ্ড ও ওয়েলস
১৯২০	ব্রিটেন	ডেনমার্ক	বেলজিয়াম
১৯২৮	ভারত	নেদারল্যাণ্ডস	জার্মানি
১৯৩২	ভারত	জাপান	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
১৯৩৬	ভারত	জার্মানি	নেদারল্যাণ্ডস
১৯৪৮	ভারত	ব্রিটেন	নেদারল্যাণ্ডস
১৯৫২	ভারত	নেদারল্যাণ্ডস	ব্রিটেন
১৯৫৬	ভারত	পাকিস্তান	জার্মানি
১৯৬০	পাকিস্তান	ভারত	স্পেন
১৯৬৪	ভারত	পাকিস্তান	স্পেন
১৯৬৮	পাকিস্তান	অস্ট্রেলিয়া	ভারত
১৯৭২	পশ্চিম জার্মানি	পাকিস্তান	ভারত
১৯৭৬	নিউ জীল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া	পাকিস্তান

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত বিজয়ী হয়ে স্বর্ণপদক লাভ করে।



॥ ধ্যানচাঁদ ॥

ভারতবর্ষের ধ্যানচাঁদ জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ হকি খেলোয়াড় বলে বিবেচিত হয়েছেন। তাঁর খেলায় মুগ্ধ হয়ে লোকে তাঁকে হকির জাতুকর (Wizard of the Hockey stick) আখ্যা দেয়। কেউ কেউ তাঁকে বলেন 'কালো বিদ্যুৎ'। অবশ্য তিনি হকি খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভাই রূপ সিংও একজন ভালো খেলোয়াড়। তিনিও অবসর নিয়েছেন।

হকি খেলা প্রথম কোন্ দেশে চালু হয়, তা



হকির জাতুকর ধ্যানচাঁদ

জানা যায় না। তবে আনুমানিক ২০৫০ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দের ইজিপ্টের বেনি হাসানে যে ১৭ নং সমাধি-স্থল আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে হকির লাঠির মতো বাঁকা লাঠি পাওয়া গেছে। ১২৭৭ খ্রীষ্টাব্দে লিনকনশায়ারে হকি খেলা হয়েছিল বলে জানা গেছে।



॥ মেয়েদের হকি ॥

হকি মেয়েরাও খেলে। আনুমানিক ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত সারে (Surrey)-র



মেয়েদের হকি খেলা

পূর্ব মোলসি (East Molesey)-তে প্রথম মেয়েদের হকি খেলার ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়। ওয়েলস, ইংল্যাণ্ড স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নিউ জীল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, প্রভৃতি দেশের মেয়েরা বিভিন্ন সময়ে হকি খেলে সুনাম অর্জন করেছে।

॥ শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগী দেশ ॥

পূর্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অধিকাংশ সোনা, রুপা বা ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে ওলিম্পিকে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হত। এখন রাশিয়া সে স্থান অধিকার করেছে।

॥ বরফের উপর হকি খেলা ॥

যতদূর জানা গেছে, ষোড়শ শতাব্দীতে নেদারল্যাণ্ডসে বরফের উপর হকি খেলার প্রচলন ছিল। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে কানাডায় বর্তমান কালের বরফের উপর হকি খেলার প্রচলন হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন, এ খেলা হ্যালিফ্যাক্সে প্রথম চালু হয়।

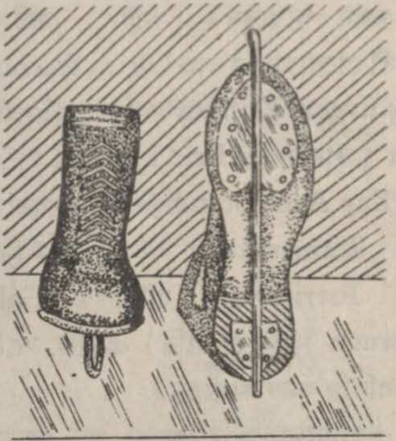
কানাডা বরফের উপর হকি খেলায় সুপ্রসিদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস প্রভৃতি বরফের উপর হকি খেলা (Ice hockey)-তে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছে।

॥ আইস স্কেটিং ॥



স্কেটিং

বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং করা যতদূর জানা গেছে, দ্বিতীয় শতাব্দীতে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় প্রচলিত ছিল। অবশ্য, তারও দশ শতাব্দী পূর্বে শীতপ্রধান



স্কেটিং-এর জুতো

দেশের তুষারাবৃত পাহাড়ে পর্বতে চালু ছিল বলে প্রত্নতাত্ত্বিকরা বলে থাকেন।



সোনজা হেনি

নরওয়ের সোনজা হেনি (Sonja Henie) নামে একটি তরুণী ও সুইডেনের Gillis Graafstrom বরফের উপর দিয়ে স্কেটিং করে পৃথিবীব্যাপী প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। আইস স্কেটিং-এ অন্যান্য কৃতী খেলোয়াড়ের নাম Ulrich Salchow (সুইডেন), Evgeni Kulikov (রাশিয়া), Gaetan Boucher (কানাডা), Eric Heiden (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), Kay Arne Stenshjemmet(নরওয়ে), Christa Rothenburger (পূর্ব জার্মানি), Natalia Petruseva (রাশিয়া), Gaby Schonbrunn (পূর্ব জার্মানি) প্রভৃতি আইস স্কেটিং-এ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

কাঠে লাগানো আর ছুমাথা উঁচু লোহার পাতকে বলে স্কেট। জুতোর তলায় তা আটকে নিয়ে বরফের উপর দিয়ে চলাকে বলে স্কেটিং। যে স্কেটের তলায় চাকা থাকে, তাকে রোলার স্কেট বলা হয়।

॥ মোটর সাইকেল রেসিং ॥



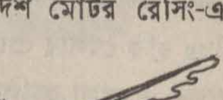
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইংল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, রোডোসয়া, ইটালী, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড, জাপান, ভেনেজুয়েলা, নেদারল্যাণ্ডস প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগীরা মোটর সাইকেল রেসিং-এ যোগদান করে বিভিন্ন সময়ে ও স্থানে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

॥ মোটর রেসিং ॥



যতদূর জানা গেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম মোটর রেসিং-এর প্রচলন হয়। এই রেসিং রীতিমতো বিপজ্জনক হলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, সুইটজারল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মেক্সিকো, ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, নেদারল্যাণ্ডস, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, নিউ জীল্যাণ্ড, কানাডা, ইটালী, সুইডেন প্রভৃতি দেশ মোটর রেসিং-এ প্রতিযোগিতা করেছে।

॥ ছিপ দিয়ে মাছ ধরা ॥



সব দেশেই ছিপ দিয়ে মাছ ধরার উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়। পুকুর, নদী, হ্রদ থেকে আরম্ভ করে সাগরে ও পাহাড়িয়া ঝরনায় নানাস্থানে লোকে



অনেকের এক সঙ্গে মাছ ধরা

ছিপ দিয়ে মাছ ধরে এবং নানাস্থানে এর প্রতিযোগিতাও হয়ে থাকে।

ভারতের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশে, চীন-জাপানে, অস্ট্রেলিয়া-নিউ জীল্যাণ্ডে ছিপ দিয়ে মাছ ধরার উৎসাহ বেশী দেখা যায়। মাগুর, শিঙ্গি, কই, রুই, বাটা, বান, ম্যাকারেল, হেরিং, হ্যালিবাট, কড, ট্রাউট, স্যামন, পাইক, টারবট, সানফিশ, হ্যাডক, পার্চ, পুঁটি, বেলে প্রভৃতি অসংখ্য রকম মাছ পুকুর,



সাগরে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা

নদী, সাগর প্রভৃতি থেকে ছিপ দিয়ে ধরা হয়।

সাধারণ মাছ ছাড়া বড় বড় শার্ক বা হাঙ্গরও ছিপ দিয়ে ধরা হয়।

এদেশে প্রায় দেখা যায়, কোন পুকুরের চার ধারে বসে বহু লোক ছিপ দিয়ে মাছ ধরছে। এই ক্ষেত্রে ছিপ ফেলার জন্যে জনপিছু কয়েক টাকা করে নেওয়া হয়ে থাকে।

॥ ধনুর্বিদ্যা (archery) ॥

তীর ছুড়ে বনের পশুপাখি মারা হয়। তীর-ধনুক ব্যবহার প্রায় সব দেশেই আছে। ধনুর্ধারীরা বনে বনে ঘুরে পশুপাখি শিকার করে। আদিম কাল থেকে তীর ছোড়া চলে আসছে। আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, ভারত প্রভৃতি দেশের আদিবাসীরা তীরধনুককে শুধু পশুপাখি শিকারের জন্য ব্যবহার করে না, শত্রুর ও বন্য জীবজন্তুর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করে আত্মরক্ষাও করে।



তীর ছোড়া

আজকাল তীর ছোড়া একটা খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত, স্পেন, জাপান, কানাডা, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, তুরস্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নিউ জীল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের স্ত্রী-পুরুষ তীরন্দাজরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভাবে তীর ছোড়ার প্রতিযোগিতায় যোগদান করেছে।

॥ ব্যাডমিন্টন ॥



চীনে বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ব্যাডমিন্টন খেলার মতো এক প্রকার খেলার প্রচলন ছিল। তবে আধুনিক ব্যাডমিন্টন খেলার আরম্ভ ভারতে (১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে)। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনায় (পুনেতে) প্রথম ব্যাডমিন্টন খেলার নিয়মকানুন তৈরী হয়। ভারত, ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড, আয়ারল্যাণ্ড, ওয়েলস, ইন্দোনেশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, জার্মানি প্রভৃতি দেশে লোকে, বিশেষ করে তরুণ-তরুণীরা ব্যাডমিন্টন খেলে ও বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় যোগদান করে।

আগে এই খেলার নাম ছিল 'পুনা'। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ সৈন্যরা ভারত থেকে শিখে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে এই খেলা চালু করে। গ্লস্টারের অন্তর্গত ব্যাডমিন্টন নামক স্থান থেকে 'পুনা' নামের পরিবর্তন হয় ও ব্যাডমিন্টন নাম হয়।



শাট্‌ল্‌কক্

ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট ১৩·৪ মিটার লম্বা হয়। সিঙ্গলস খেলা হলে ৫·২ মিটার চওড়া কোর্ট হয়। ডাব্‌লস্ হলে কোর্ট হয় ৬ মিটার চওড়া। একটা ২·৫৪ সেন্টিমিটার মোটা সোলার গুলির চার দিকে ১৪ বা ১৬টি পাখির পালক বসানো থাকে। তাকে বলে শাট্‌ল্‌কক্ (shuttle cock)। কোর্টের মাঝখানে দেড় মিটার উঁচুতে দুপাশে দুটো খুঁটিতে একটা জাল টাঙ্গানো থাকে। খেলোয়াড়রা শাট্‌ল্‌ককৃকে ব্যাট দিয়ে মেরে ওপারে মাটিতে ফেলবার চেষ্টা করে। একবার মাটিতে পড়লে এক পয়েন্ট। ১৫ বা ২১ পয়েন্ট পেলে এক গেমে জয়লাভ হয়। তিনবার খেলা হয়। তার মধ্যে দুবার জয়লাভ করলে গেমে জিত হয়।



॥ বেসবল ॥

বেসবল (baseball) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় খেলা। সাধারণতঃ এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে খেলা হয়। বেসবল কানাডার প্রধান গ্রীষ্মকালীন খেলা। অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন, জাপান

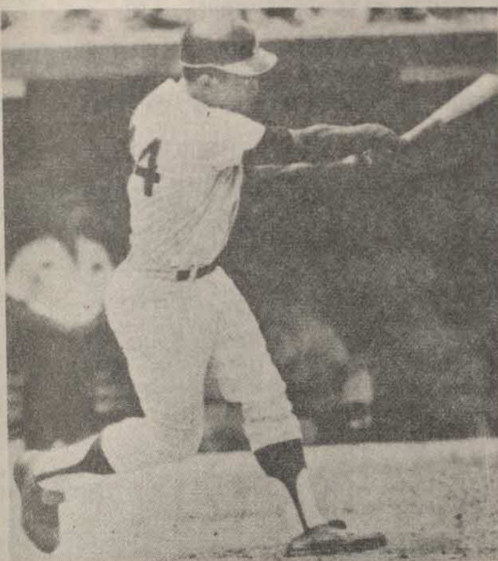


বেসবল খেলার স্টেডিয়াম

প্রভৃতি দেশেও এই খেলা হয়।

লম্বা ব্যাট দিয়ে এই খেলা হয়। বল সাদা শক্ত, ৫ আউন্স ওজনের।

হেনরী হাঙ্ক আরন (Henry Louis Hank Aaron) একজন বিশ্ববিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড়। Tyrus Raymond Cobb (১৮৮৬-১৯৬১ খ্রী.), George Herman 'Babe' Ruth (১৮৯৫-১৯৪৮ খ্রী.), Roger Eugene Maris (জন্ম ১৯৩৪ খ্রী.),



বিশ্ববিখ্যাত বেসবল খেলোয়াড় হেনরী হ্যাঙ্ক আরন

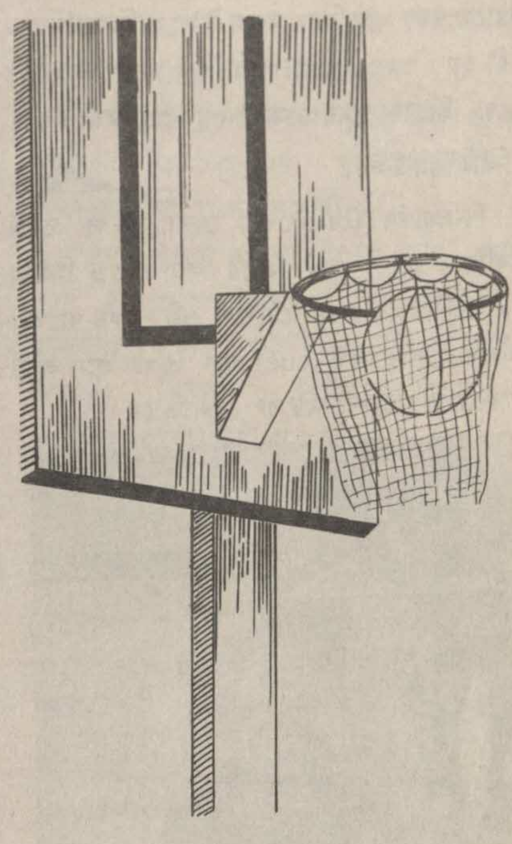
Roy Edward 'Dizzy' Carlyle (১৯০০-১৯৫৬ খ্রী.), Glen Edward Gorbous (জন্ম ১৯৩০ খ্রী.), Earnest Evar Swanson (১৯০২-১৯৭৩ খ্রী.), Don Larsen (জন্ম ১৯২৯ খ্রী.), Lynn Nolan Ryan (জন্ম ১৯৪৭ খ্রী.) প্রভৃতি বেসবল খেলোয়াড় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন।



॥ বাস্কেট-বল ॥

বাস্কেট-বল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বারা প্রবর্তিত হয় এবং প্রধানতঃ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বত্র এ খেলা হয়। তবে বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও এ খেলা হয়ে থাকে।

বাস্কেট-বল (basket-ball) ভলিবলের ন্যায় খেলা। বড় হলে বা ব্যায়ামাগারে অথবা উন্মুক্ত স্থানে এ খেলা হয়ে থাকে। যেখানে খেলা হবে সেই স্থানের দুমাথায় দুটো খুঁটির উপর একটা চারকোনা কাঠের পাটা থাকে। মাটি থেকে ৩ মিটার উঁচুতে তার মাঝখানে হাতখানেক ফাঁদ-ওয়ালা গোল রিং লাগানো থাকে। তা থেকে একটা মুখখোলা জাল ঝুলানো থাকে। এই রিং ও জালই বাস্কেট। একটা বলকে হাত দিয়ে ছুড়ে বাস্কেটের মধ্যে ফেলতে হয়।



বাস্কেট-বল ও নেট

খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে মেক্সিকোতে Pok-ta Pok বলে বাস্কেট-বল ধরনের খেলা প্রচলিত ছিল। অ্যাজটেকরা ষোড়শ শতাব্দীতে এই খেলায় কিছুটা পরিবর্তন সাধন করে খেলে। জার্মান খেলা Korb-ball থেকেই বর্তমান বাস্কেট-বল খেলার উদ্ভব। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সংশোধিত নিয়ম অনুযায়ী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই খেলা শুরু হয়।

ব্রাজিল, রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া, পশ্চিম জার্মানি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, লিবিয়া প্রভৃতি বাস্কেট-বল খেলায় যথেষ্ট খ্যাতি

অর্জন করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৬ থেকে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্যন্ত ওলিম্পিক বাস্কে-টবল প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া জয়লাভ করে। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জয়ী হয়।

॥ বিলিয়ার্ডস ॥



বিলিয়ার্ডস (billiards) খেলা ফ্রান্সে প্রথম প্রবর্তিত হয়। ৩·৬ মিটার লম্বা ও ১·৯ মিটার ৩·৮ সেন্টিমিটার চওড়া টেবিলে ৬টি পকেট থাকে। টেবিলের উপর কিউ (cue) বলে একটা লম্বা লাঠি দিয়ে ঠেলে সেই পকেটে বল ফেলতে হয়।



বিলিয়ার্ডস খেলা

ফ্রান্সের রাজা একাদশ লুই (Louis XI, ১৪৬১-১৪৮৩ খ্রী.)-এর একটা বিলিয়ার্ড টেবিল ছিল।

॥ স্নুকার ॥

স্নুকার (snooker) বিলিয়ার্ডস টেবিলেই খেলা হয়। সম্ভবতঃ বিলিয়ার্ডস-এর চেয়ে এই খেলা বেশী জনপ্রিয়। এই খেলায় ২২টি বলের প্রয়োজন হয়।

স্যার নেভিল ফ্র্যান্সিস ফিট্‌জেরাল্ড চেম্বারলেন (১৮৫৬-১৯৪৪ খ্রী.) নীলগিরির উতকামণ্ডে ১৮৭৫ সালে এই খেলা আরম্ভ করেন। ১৮৮৫ সালে স্নুকার ইংল্যাণ্ডে পৌছায়।

॥ ববস্লে ও টবগ্যানিং ॥

ববস্লে (bobsleigh) ও টবগ্যানিং (tobogganing) শীতপ্রধান দেশের শীতের সময়কার খেলা। দুটি খেলাই রোমাঞ্চকর ও বিপজ্জনক।



ববস্লে

একটি স্লেজে করে দুই, চার বা পাঁচ জন বরফের উপর দিয়ে ধাবমান হয়। প্রথম জন চাকা ধরে, শেষ জন ব্রেক ধরে। টবগ্যানিং-এ মাত্র একজন লোক সামনের দিকটা মোড়া একটা স্লেজের উপর



টবগ্যানিং

উপুড় হয়ে শুয়ে বরফের উপর দিয়ে যেতে থাকে। টবগ্যানিং কথাটি রেড আমেরিকান-ইণ্ডিয়ানদের tobaakon শব্দ থেকে এসেছে।

প্রথম ববস্লে খেলা হয় সুইটজারল্যাণ্ডে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে। ববস্লে খেলা ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত। চারজনের ববস্লে খেলায় সুইটজারল্যাণ্ড ১২ বার ১৯২৪, ১৯৩৬, ১৯৩৯, ১৯৪৭, ১৯৫৪-৫৭, ১৯৭১-৭৩ ও ১৯৭৫ সালে জয়ী হয়। ইটালী দুজনের ববস্লেতে ১৪ বার জয়ী হয় (১৯৫৪, ১৯৫৬-৬৩, ১৯৬৬, ১৯৬৮-৬৯, ১৯৭১ ও ১৯৭৫)।



॥ ভারোত্তোলন ॥

ভারোত্তোলন (weight lifting) প্রতিযোগিতা প্রথম শুরু হয় লণ্ডনের পিকাডিলিতে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে। ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত।

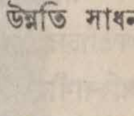


বিশ্ববিখ্যাত ভারোত্তোলনকারী Sultan Rakhmanov

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত মধ্য এশিয়ার Sultan Rakhmanov ওলিম্পিক-জয়ী এক বিশ্ববিশ্রুত ভারোত্তোলনকারী।

ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা নানা ধরনের। সেই সব প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন বৎসরে উত্তর কোরিয়া, রাশিয়া, পশ্চিম জার্মানি, জাপান, পূর্ব জার্মানি, ইটালী, কিউবা, বুলগেরিয়া ও চেকোশ্লোভাকিয়া জয়ী হয়েছে।

ভারোত্তোলনের প্রকারভেদ—ফ্লাইওয়েট (flyweight), ব্যান্টামওয়েট (bantamweight), ফেদারওয়েট (featherweight), লাইটওয়েট (lightweight), মিডলওয়েট (middleweight), লাইট হেভীওয়েট (light heavyweight), মিডল হেভীওয়েট (middle heavyweight), হেভীওয়েট (heavyweight), সুপার হেভীওয়েট (super heavyweight), ওয়েল্টারওয়েট (welter-weight)।



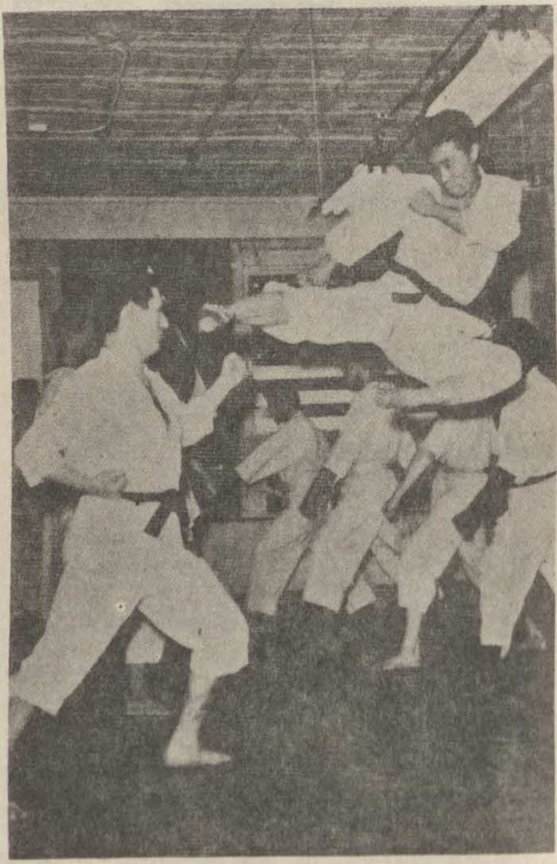
॥ জুডো ॥

জুডো (judo) জনপ্রিয় জিউজিৎসুরই প্রকারভেদ। Dr. Jigoro Kano (১৮৬০-১৯৩৮ খ্রী.) ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে জুডো খেলার অনেক উন্নতি সাধন করেন।

জুডোকে একরকম কুস্তি বলা চলে। জুডো শুধু খেলা নয়। এ থেকে আত্মরক্ষা করা যায়। কৌশলী জুডো খেলোয়াড় তার প্রতিযোগীকে বা কোন আক্রমণকারী শত্রুকে সহজেই কাবু করে ফেলতে পারে। জুডো বর্তমানে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত।



জুডো



ক্যারাটি

জাপানীদের দ্বারা উদ্ভাবিত হলেও রাশিয়া, নেদারল্যাণ্ডস, গ্রেট ব্রিটেন, নিউ জীল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা জুডোতে কৃতিত্ব অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে।



॥ ক্যারাটি ॥

আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে জাপানীদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্যে ওকিনাওয়ার অধিবাসীরা খালি হাতে লড়বার যে পন্থা উদ্ভাবন করে তাই-ই শেষ পর্যন্ত জাপানে গিয়ে ক্যারাটি (karate) নামে অভিহিত হয়।

বর্তমানে ভারতে ও পৃথিবীর নানা দেশে ক্যারাটির প্রচলন হয়েছে। এর দ্বারা খালি হাতে আক্রমণকারী শত্রুকে বিপর্যস্ত করা যায়।



॥ জিউজিৎস্যু ॥

জিউজিৎস্যু (ju-jitsu) একরকমের জাপানী কুস্তি। অবশ্য সাধারণ কুস্তির মতো নয়। জিউ-জিৎস্যুর প্রধান উদ্দেশ্য আক্রমণকারী শত্রুকে এমন কৌশলে কাবু করা যাতে সে পলায়ন করে বা আহত হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। জিউজিৎস্যুর সাহায্যে বিদ্যুৎগতিতে আততায়ীর পা, ঘাড়, পিঠ মুচড়ে দিয়ে তাকে ভূমিসাৎ করা হয়।

জাপানে উদ্ভাবিত হলেও ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য বহু দেশে এর প্রচলন হয়েছে।



তুতানখামেনের শবাধারের উপরের সোনার প্রতিমূর্তি

প্রাচীন মিশরের সম্রাট্ বা ফেরো (Pharaoh) তুতানখামেন (Tutankhamen) বা তুতানখামুন (Tutankhamun) মাত্র ৯ বা ১০ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ১৩৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের জানুয়ারিতে মাত্র ১৮ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

তখনকার দিনে মিশরবাসীদের ধারণা ছিল, লোক মারা গেলে তার সব শেষ হয়ে যায় না। একদিন সে নবজীবন লাভ করে পৃথিবীতে ফিরে আসে। তাই রাজা বা সম্রাটের দেহ 'মামি' করে ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষে সযত্নে রেখে দেওয়া হত বা বড় বড় পিরামিড তৈরি করে তার মধ্যে মামি-করা মৃতদেহ রাখা হত। সেই সঙ্গে রাজা বা সম্রাটের ব্যবহৃত মহামূল্য দ্রব্যাদি ও অতুল ঐশ্বর্য রেখে দেওয়া হত, যাতে রাজা বা সম্রাট্ নবজীবন লাভ করে সেই সব জিনিস উপভোগ করতে পারেন।

মিশরের নানা স্থানে এইরকম অসংখ্য ভূগর্ভস্থ সমাধিকক্ষ ছিল। দস্যুতস্করে সেই সব কক্ষ খনন করে সেখানকার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। কেবল সম্রাট্ তুতানখামেনের সমাধি ও সেখানকার অতুল ধনসম্পত্তির সন্ধান তারা পায় নি। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে হাওয়ার্ড কার্টার (Howard Carter, ১৮৭৪-১৯৩৯ খ্রী.) লর্ড কারনারভন (Lord Carnarvon)-এর সহযোগিতায় তুতানখামেনের সমাধিকক্ষ আবিষ্কার করেন। সেই সমাধিকক্ষে সম্রাটের মামির সঙ্গে যে অতুল ধনসম্পত্তি ও মহামূল্য দ্রব্যাদি রাখা হয়েছিল তা জনসাধারণ দেখে বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যায়।

পূর্বপৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে সেটি তুতানখামেনের একটি শবাধারের উপরকার সম্রাটের বিস্ময়কর নিরেট সোনার প্রতিমূর্তি।

[এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মিশরে ৩ হাজার বছরের পুরাতন পাঁচটি ভূগর্ভস্থ সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে।]

॥ ল্যাক্রোস্‌ ॥

ল্যাক্রোস (lacrosse) মূলতঃ আমেরিকান রেড ইণ্ডিয়ানদের খেলা। ১৮৬৭ সালে গ্রেট ব্রিটেনে আধুনিক ল্যাক্রোস খেলার প্রচলন হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৭ ও ১৯৭৪ সালে বিশ্ব ল্যাক্রোস প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। কানাডা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে হারিয়ে ১৯৭৮ সালে জয়লাভ করে।

এই খেলা মেয়েরাও খেলে থাকে। ১·৯ মিটার চওড়া ও ১·৯ মিটার উঁচু গোলের মধ্যে রবারের বল প্রেরণ করতে হয়। ইংল্যাণ্ডে ১২ জনকে নিয়ে এই খেলা হয়। কানাডা ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১০ জন নিয়ে খেলে।



॥ লন্‌ টেনিস্‌ ॥

বর্তমানে উন্মুক্ত স্থানে টেনিস খেলা হয়। ঘাস-জমিতে অর্থাৎ ময়দানে হলে বলা হয় লন টেনিস (lawn tennis), সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো জায়গায় হলে বলা হয় হার্ড কোর্ট টেনিস (hard court tennis), ছোট ছোট নুড়ি-বিছানো জায়গায় হলে বলা হয় গ্র্যাভেল কোর্ট টেনিস (gravel court tennis)।

আগে দেওয়াল-ঘেরা জায়গায় টেনিস খেলা হত। এখন আর তা হয় না। প্রধানতঃ ফাঁকা মাঠে এই খেলা হয়।

একপক্ষে একজন করে খেললে বলা হয় সিঙ্গল্‌স্‌ খেলা, দুজন করে খেললে ডাব্‌ল্‌স্‌ খেলা বলা হয়। দুজনের একজন নারী, অপরজন পুরুষ মিলে ডাব্‌ল্‌স্‌ খেললে বলা হয় মিক্‌স্‌ড্‌ ডাব্‌ল্‌স্‌।

সিঙ্গল্‌স্‌ খেলায় ৮·২ মিটার চওড়া কোর্ট ব্যবহৃত হয়, ডাব্‌ল্‌স্‌ খেলায় ১১ মিটার চওড়া কোর্ট লাগে। কোর্ট সব খেলাতেই ২৪ মিটার লম্বা হয়।

টেনিসের ব্যাটকে বলে র‍্যাকেট। বল ধরতে না পারলে ১ পয়েণ্ট হার হয়। ১ পয়েণ্ট মানে ১৫, তারপর ৩০, তারপর ৪০, তারপর ৫০। দুপয়েণ্ট এগিয়ে থেকে ৫০ করতে পারলে ১ সেট খেলায় জিত হয়। সাধারণতঃ তিন বা পাঁচ সেট খেলা হয়। যে বেশী সেটে জয়লাভ করে, তাকেই বিজয়ী বলে মেনে নেওয়া হয়।

পৃথিবীতে চারটি লন টেনিস প্রতিযোগিতা বিখ্যাত—উইম্‌ব্‌ল্‌ডন (Wimbledon), ডেভিস কাপ, অস্ট্রেলিয়ান ও ফরাসী প্রতিযোগিতা।

ইংল্যাণ্ডের লণ্ডন শহর থেকে প্রায় ১৩ কিলো-মিটার দূরে উইম্‌ব্‌ল্‌ডন-নামক জায়গায় ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দ থেকে যে লন টেনিস খেলা চলে আসছে তা পৃথিবী-প্রসিদ্ধ।

'ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা'ও পৃথিবী-প্রসিদ্ধ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ডি. এফ. ডেভিস (Dwight F. Davis) একটি সুন্দর রৌপ্যপাত্র



বিখ্যাত লন টেনিস খেলোয়াড় জন ম্যাকেনরো

উপহার দেন। তা দিয়ে টেনিস খেলা শুরু হয় এবং প্রতিযোগিতার নাম হয় 'ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা'।

এই প্রতিযোগিতা তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। এশিয়া অঞ্চল, ইউরোপীয় অঞ্চল ও আমেরিকা অঞ্চল। ইউরোপের বিজয়ী দেশের সঙ্গে আমেরিকার খেলা হয়। যে দেশ বিজয়ী হয় তার সঙ্গে এশিয়ার বিজয়ী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা হয়। সেই প্রতিযোগিতায় যে দেশ জয়ী হয়, সেই দেশ পূর্ববর্তী বিজয়ী দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। যে দেশ বিজয়ী হয়, সেই দেশ ডেভিস কাপ প্রাপ্ত হয়। ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৪৮, ১৯৪৯, ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬৩, ১৯৬৮-৭২ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জয়ী হয়। ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬১, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৬৫,



মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা

১৯৬৬, ১৯৬৭, ১৯৭৩ সালে অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন ম্যাকেনরো জুনিয়ার একজন প্রসিদ্ধ টেনিস খেলোয়াড়। মেয়েদের মধ্যে নাম-করা টেনিস খেলোয়াড় প্রাগের মার্টিনা নাভ্রাতিলোভা। সুইডেনের Bjorn Rune Borg বহুবার লন টেনিস খেলায় জয়ী হয়েছেন।

॥ টেবল টেনিস ॥



টেবল টেনিস (table tennis) বা পিং-পং (ping-pong) টেবিলের উপর খেলা হয়। ২·৮ মিটার লম্বা ও দেড় মিটার চওড়া টেবিলে খুব হালকা সেলুলয়েডের বল দিয়ে খেলা হয়। এটি ঘরের মধ্যের খেলা।



টেবল টেনিস খেলা

॥ গুলি খেলা ॥

প্রাচীন মিশরে প্রথমে এই খেলা চালু ছিল।

সেখান থেকে নিয়ে ১ম শতাব্দীতে রোমানরা ব্রিটেনে এই খেলা প্রচলন করে।

ভারত, বেলজিয়াম, চীন, কানাডা, ইরান, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, নিউ জীল্যাণ্ড, সিরিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রভৃতি স্থানে এ খেলা হয়ে থাকে।

॥ নেটবল ॥

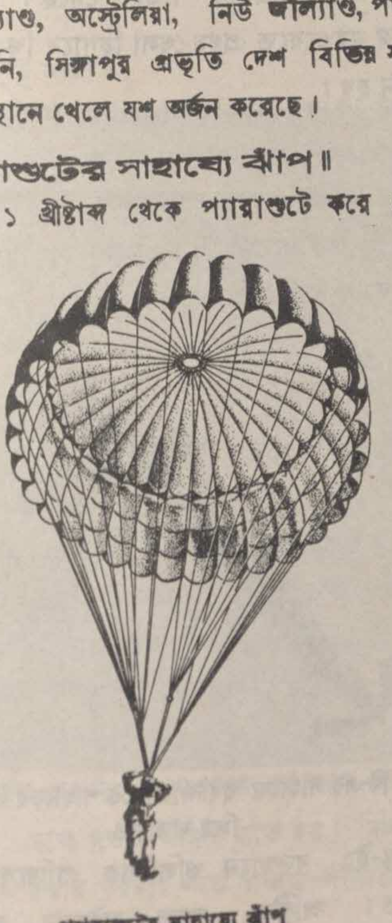
১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই খেলার উদ্ভাবন করে। Dr. Toles ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে এর প্রচলন করেন।

এ খেলা কেবল মেয়েরা খেলে। ফাঁকা জায়গায় এ খেলা হয়।

ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, পাপুয়া নিউ গিনি, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে খেলে যশ অর্জন করেছে।

॥ প্যারাশুটের সাহায্যে ঝাঁপ ॥

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্যারাশুটে করে নীচে

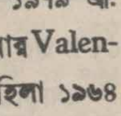


প্যারাশুটের সাহায্যে ঝাঁপ

ঝাঁপ দেওয়া একটা খেলা বলে পরিগণিত হয়েছে। নারীপুরুষ উভয়েই প্যারাশুটে করে ঝাঁপ দেয়।

রাশিয়ার পুরুষেরা ১৯৫৪, ১৯৫৮, ১৯৬০, ১৯৬৬, ১৯৭২, ১৯৭৬ ও ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়। মেয়েরা ১৯৫৬, ১৯৫৮, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭২ ও ১৯৭৩ সালে জয়ী হয়। বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও প্রতিযোগীরা পশ্চাৎপদ হয় না। অবশ্য এ পর্যন্ত কোন বড় রকমের দুর্ঘটনা হয় নি।

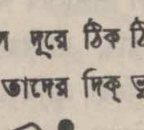
রাশিয়ার Anatoli Ossipov ১৯৭৯ খ্রী. পর্যন্ত ১০ হাজার বার ঝাঁপ দেয়। রাশিয়ার Valentina Zakoretskaya নামে এক মহিলা ১৯৬৪ খ্রী. পর্যন্ত ৮০০০ বার ঝাঁপ দেয়।



॥ পায়রা দৌড় ॥

পায়রাদের দ্বারা সংবাদ প্রেরণ কয়েক হাজার বৎসর পূর্বে সংঘটিত হতে শোনা গেছে। বর্তমানে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউরোপে পায়রাদের দ্বারা দৌড় (pigeon racing) প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে। আধুনিক কালে বেলজিয়ামে পায়রা দৌড়ের প্রবর্তন হয়। ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩২টি পায়রা লণ্ডন থেকে অ্যান্টোয়ার্পে গিয়ে পৌঁছয়।

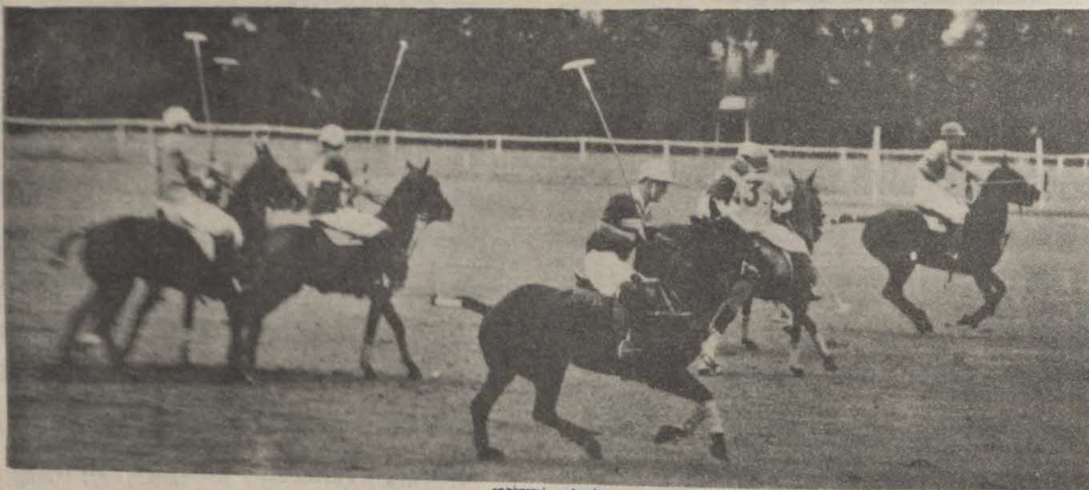
পায়রারা হাজার হাজার মাইল দূরে ঠিক ঠিক জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। এতে তাদের দিক্ ভুল হয় না।



॥ পোলো ॥

পোলোকে ঘোড়ায় চড়ে হকি খেলা বলা চলে। পোলো পারস্যের প্রাচীন খেলা। সেখান থেকে ভারত, চীন, তিব্বত, জাপান প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

ভারত থেকে এই খেলা ইংল্যাণ্ডে যায়। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশে পোলো



পোলো খেলা

খেলা শুরু হয়।

ঘোড়ায় চড়ে খেলতে হয় বলে পোলো খেলতে প্রকাণ্ড মাঠের দরকার হয়।

পোলো ১৯০০, ১৯০৮, ১৯২০, ১৯২৪ ও ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়।

যে হাতুড়ির মতো লাঠি নিয়ে পোলো বল মারা হয় তার দৈর্ঘ্য আজও নিরূপিত হয় নি।



॥ গুলি ছোড়া (shooting) ॥

খেলা হিসাবে গুলি ছোড়া হয়, আবার পশু-পক্ষী শিকারের জন্যেও গুলি ছোড়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফিনল্যাণ্ড, দক্ষিণ কোরিয়া, রুমানিয়া, ব্রাজিল, পশ্চিম জার্মানি, সুইটজারল্যাণ্ড, মেক্সিকো, নরওয়ে, গ্রীস, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ রাইফেল, রিভলভার প্রভৃতি দ্বারা বিভিন্ন সময়ে গুলি ছোড়ার ব্যাপারে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে। নারী-পুরুষ উভয়েই গুলি ছোড়ায় দক্ষতা প্রদর্শন করেছে।

॥ স্কি-ইং ॥

স্কি-ইং বা শীইং (ski-ing) শীতপ্রধান দেশের তুষারাবৃত পর্বতের উপরের খেলা। ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাশিয়ায় ও ২৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সুইডেনে স্কি-ইং করার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়েতে প্রথম খেলা হিসাবে স্কিং-ইং-এর প্রচলন হয়।



স্কি-এর সাহায্যে সুইটজারল্যাণ্ডে পাহাড়ের উপর দিয়ে যাতায়াত

স্কি-ইং বর্তমানে ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত। অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন, রাশিয়া,

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সুইটজারল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানি, লিকটেনস্টাইন বিভিন্ন বৎসরে স্কি-ইং-এ জয়ী হয়ে পদক লাভ করে। নারীপুরুষ উভয়েই স্কি-ইং-এ পারদর্শিতা দেখিয়েছে।

স্কি বা শী হচ্ছে প্রায় ১·৯ মিটার লম্বা, পায়ের মাপে চওড়া, কাঠের পাত। তার ডগার দিক্ নাগরা জুতোর মতো কতকটা পিছন দিকে ওলটানো। সেটাকে পায়ের সঙ্গে বেঁধে বরফের উপর দিয়ে দৌড়ঝাঁপ করতে হয়।

স্কি-ইং শুধু খেলার জন্যে হয় না, স্কি বা শী পরে লোকে সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বরফে ঢাকা পাহাড়ের উপর দিয়ে যাতায়াত করে।

॥ সফ্‌ট্‌বল ॥

সফ্‌ট্‌বল (softball) বেসবল থেকে উদ্ভাবিত এক ধরনের খেলা। বল আকারে বেসবলের চেয়ে বড়, তবে soft অর্থাৎ নরম নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ খেলা খুব জনপ্রিয়। ইংল্যাণ্ডেও এ খেলা প্রচলিত। নারীপুরুষ উভয়েই খেলে থাকে।

॥ সাঁতার ॥



পুকুর, হ্রদ, নদী, সমুদ্র প্রভৃতিতে নারীপুরুষ উভয়ে বিভিন্ন কায়দায় সাঁতার কাটে। সাঁতার নানা রকমের—চিৎ সাঁতার (back stroke), কাত সাঁতার (side stroke), বুক সাঁতার (breast stroke), হামাগুড়ি দিয়ে সাঁতার (crawl), প্রজাপতি সাঁতার (butterfly stroke), ট্রাজন (trudgeon) প্রভৃতি।

সাঁতার প্রধানতঃ স্বাস্থ্য অর্জনের জন্যে করা হয়ে থাকে। এতে গভীর আনন্দ লাভ হয়। নিমজ্জমান ব্যক্তিকে উদ্ধার করবার জন্যে সাঁতার-জানা লোকের বিশেষ প্রয়োজন। সাঁতার ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত। নারীপুরুষ উভয়েই সাঁতারে পটু।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পূর্ব জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, ইটালী, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইজিপ্ট, আর্জেন্টিনা, কানাডা, সৌদি আরব, কিউবা, জাপান, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি দেশের নারীপুরুষ বিভিন্ন সময়ে সাঁতারে অশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করেছে।

॥ মিহির সেনের কৃতিত্ব ॥

ভারতের (কলকাতার) মিহির সেন এক অসমসাহসী সাঁতারু। তিনি ১৯৬৬ খ্রী. ২৫ ঘণ্টা ৩৬ মিনিটে পক প্রণালী পার হয়ে শ্রীলঙ্কা থেকে ভারতে আসেন। ৮ ঘণ্টা ১ মিনিটে জিব্রাল্টার প্রণালী পার হন। ১৩ ঘণ্টা ৫৫ মিনিটে দার্দানেলিজ প্রণালী অতিক্রম করেন। ৪ ঘণ্টায় বসফরাস প্রণালী পার হন। ৩৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিটে পানামা খাল অতিক্রম করেন। তিনি ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পার হন।

॥ ওয়াটার পোলো ॥

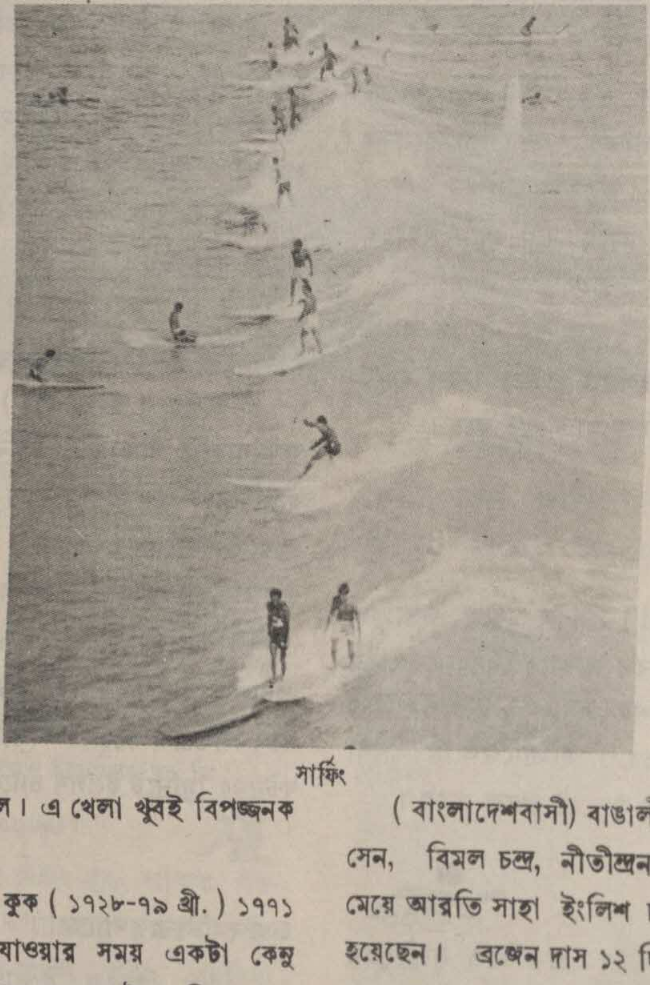


১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ওয়াটার সকার (water soccer) নামে ওয়াটার পোলো (water polo) খেলার প্রচলন হয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে এই খেলা ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়।

হাঙ্গেরী ছবার ও গ্রেট ব্রিটেন চারবার ওয়াটার পোলো খেলায় জয়ী হয়। অস্ট্রেলিয়া, হাঙ্গেরী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ ওয়াটার পোলো খেলায় দক্ষ।

॥ সার্ফিং ॥

উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়ে লম্বা কাঠের পাতের উপরে চড়ে বসে, দাঁড়িয়ে বা শুয়ে ধাবমান হওয়াকে



সার্ফিং

সার্ফিং (surfing) বলে। এ খেলা খুবই বিপজ্জনক ও দুঃসাহসের কাজ।

ক্যাপ্টেন জেমস কুক (১৭২৮-৭৯ খ্রী.) ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে তাহিতিতে যাওয়ার সময় একটা কেনু (canoe)-তে করে উত্তাল তরঙ্গের উপর দিয়ে যাত্রা করেন।

অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ, মেক্সিকো, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকে বিভিন্ন সময়ে সার্কিং-এ বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সার্ফিং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

॥ ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম ॥

ক্যাপ্টেন ম্যাথু ওয়েব ১৮৭৫ সালে প্রথম ২১ ঘণ্টা ৪৫ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল পার হন। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে গারট্রুড এডার্লি (Gertrude Ederle) নামে একটি মেয়ে ১৪ ঘণ্টা ৩৯ মিনিটে ইংলিশ চ্যানেল অতিক্রম করেন।

(বাংলাদেশবাসী) বাঙালী ব্রজেন দাস, মিহির সেন, বিমল চন্দ্র, নীতীন্দ্রনারায়ণ রায়, বাঙালী মেয়ে আরতি সাহা ইংলিশ চ্যানেল সাঁতরে পার হয়েছেন। ব্রজেন দাস ১২ দিনে ৬ বার ইংলিশ চ্যানেল পার হন।

॥ বিভিন্ন সন্তরণ প্রতিযোগিতা ॥

বহরমপুরের গঙ্গায় ৭২ কিলোমিটার সাঁতারের রেস, আর কলকাতার কাছের গঙ্গায় ৫০ কিলো-মিটার রেসই এ অঞ্চলের প্রধান সন্তরণ প্রতিযোগিতা।

ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে যে সন্তরণ প্রতি-যোগিতা হয়, তাতে প্রসিদ্ধ সাঁতারু বৈদ্যনাথ দাস প্রথম স্থান অধিকার করেন।

॥ এক নাগাড়ে সন্তরণ ॥

রবীন চ্যাটার্জী একাদিক্রমে ৭৩ ঘণ্টা ৩০ মিনিট, অরুণ নন্দী ৯০ ঘণ্টা ৫ মিনিট, দিলীপ দে ৮১ ঘণ্টা ৩৭ মিনিট ও প্রফুল্ল ঘোষ ৭৮ ঘণ্টা সাঁতার কাটেন।

॥ টাগ অব ওয়ার ॥

চীনে ও ঈজিপ্টে প্রথম টাগ অব ওয়ার-এর প্রচলন হয়। টাগ অব ওয়ার ওলিম্পিক প্রতি-যোগিতার অন্তর্ভুক্ত।

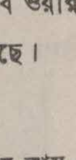
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট ব্রিটেন টাগ অব ওয়ার প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে।

॥ ভলিবল ॥

ভলিবল (volleyball) কাঁপা, ফুটবলের ন্যায়। ব্যাডমিন্টনের চেয়ে উঁচুতে নেট টাঙিয়ে এই খেলা হয়। নেটের দুপাশে দুদল থাকে। প্রতি দলে থাকে ৬ জন করে খেলোয়াড়। বলে চাপড় মেরে নেটের ওপারে ফেলতে হয়।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ভলিবল ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়। নারী পুরুষ উভয়েই খেলে।

রাশিয়া ভলিবল খেলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে।



॥ হাঁটা ॥

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঁটা (walking) ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এই হাঁটা প্রতিযোগিতা চলে আসছে।

৩০০০, ১০০০০, ২০০০০ ও ৫০,০০০ মিটার হাঁটার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা হয়। ইটালী, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, রুমানিয়া, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের হাঁটা প্রতিযোগিতায় কৃতিত্ব প্রদর্শন করে।

॥ কুস্তি ॥



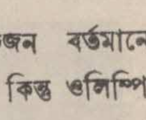
আড়াই হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দেরও আগে কুস্তির প্রচলন হয়। ৭০৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রাচীন ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় কুস্তির খুব সমাদর লক্ষ্য করা গিয়েছিল।

কুস্তি বর্তমান ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। কুস্তিতে ভারতীয়দের খুব নাম। গামা পালোয়ান, ইমাম, গুলাম, গোবরবাবু (যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ) প্রভৃতি নাম-করা কুস্তিগীর।

ইমাম ইউরোপের চ্যাম্পিয়ান জন লেমকে অতি সহজেই হারিয়ে দেন। বিশ্বচ্যাম্পিয়ান ডক্টর রোলারকে গামা দুমিনিটের মধ্যে হারিয়ে দেন। কুস্তিগীর বিস্কো গামার সঙ্গে লড়াইয়ে পাঁচ মিনিটের বেশী দাঁড়াতে পারেন নি।

পাঞ্জাবের পালোয়ান গুঙ্গা ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ কুস্তিগীর। তিনি ইমামকে পরাজিত করেন।

দারা সিং ও অন্যান্য কয়েকজন বর্তমানের নাম-করা শক্তিশালী কুস্তিগীর। কিন্তু ওলিম্পিক প্রতিযোগিতায় ভারত কুস্তিতে একবারও জয়ী হয় নি।



॥ গোবরবাবু ॥

গোবরবাবুর প্রকৃত নাম যতীন্দ্রচন্দ্র গুহ (১৮৯৪-১৯৭২ খ্রীঃ)। তিনি তাঁর সময়ের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যায়ামবীর ছিলেন। কুস্তিতে তাঁর সমকক্ষ কেউ ছিল না।

॥ শ্যামাকান্ত ॥

শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৫৮-১৯১৮ খ্রী.) ছিলেন একজন বিখ্যাত মল্লবীর ও যোগী। তিনি পাটনার নবাবের বাঘিনী 'বেগম'-কে বশ



বিখ্যাত মল্ল গোবরবাবু

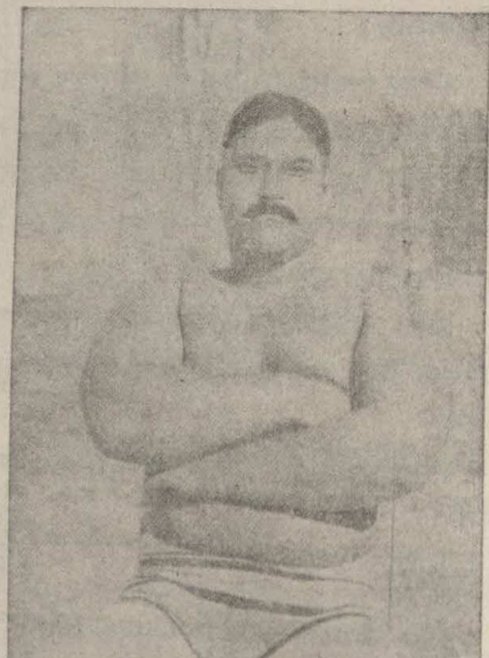


মল্লবীর ও যোগী শ্যামাকান্ত

করে এই বাঘিনীকে ও দু হাজার টাকা পুরস্কার পান। তাঁর নিজের সার্কাস দল ছিল। তিনিই প্রথম বুকে পাথর ভাঙ্গা দেখিয়ে নাম করেন। শেষ জীবনে তিনি 'সোহহং স্বামী' নাম নিয়ে হিমালয়ের ভাওয়ালী নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন।

॥ ভীমভবানী ॥

বিখ্যাত ব্যায়ামবীর। প্রকৃত নাম ভবেন্দ্র নাথ সাহা (১২৮৯-১৩২৯ বঙ্গাব্দ)। তিনি বুকের উপর দুটো হাতি তুলতে পারতেন ও একসঙ্গে

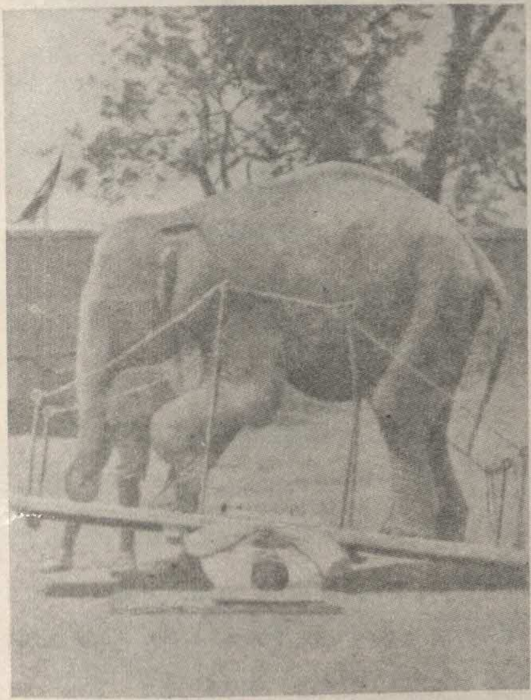


ভীমভবানী

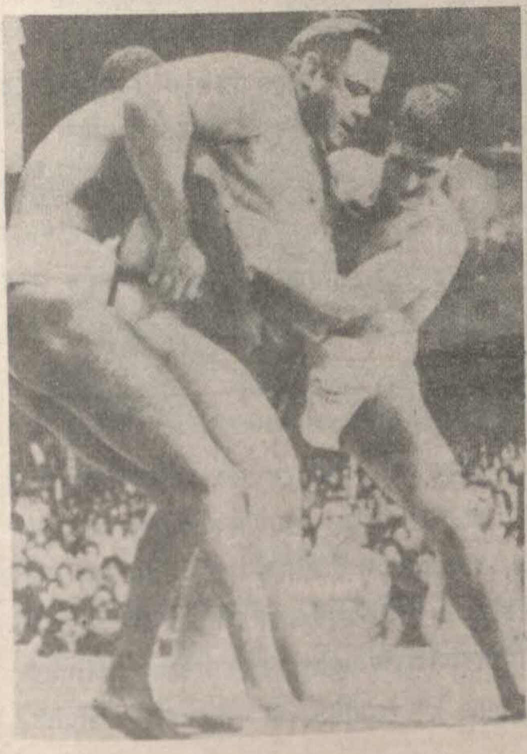
তিনখানি মোটরগাড়ি রোধ করতে পারতেন। সার্কাসে অসমসাহসিক খেলা দেখিয়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।

॥ রামমূর্তি ॥

রামমূর্তি নাইডু (১৮৭৯-১৯৩৮ খ্রী.) মাদ্রাজের (বর্তমানে তামিলনাড়ুর) প্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর।



রামমূর্তির বুকের উপর হাতি



সব চেয়ে ভারী কুস্তিগীর Jesse Kuhaulau

তিনি প্রথম বুকে হাতি তোলা দেখান।

জাপান, সুইডেন, রাশিয়া, হাঙ্গেরী, গ্রেট ব্রিটেন প্রভৃতি দেশ কুস্তিতে প্রসিদ্ধ।

Jesse Kuhaulau (হাওয়াইয়ে জন্ম। জাপানের নাগরিক) সব চেয়ে ভারী কুস্তিগীর (ওজন ২০১ কেজি)।



॥ ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই ॥

প্রধানতঃ স্পেনে ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইয়ের খেলা হয়ে থাকে। তৃতীয় শতাব্দী থেকে স্পেনে এই খেলা প্রচলিত আছে।

একটা ঘেরা স্টেডিয়ামের মধ্যের ফাঁকা জায়গায় একটা ষাঁড়ের সঙ্গে মানুষের লড়াই হয়।

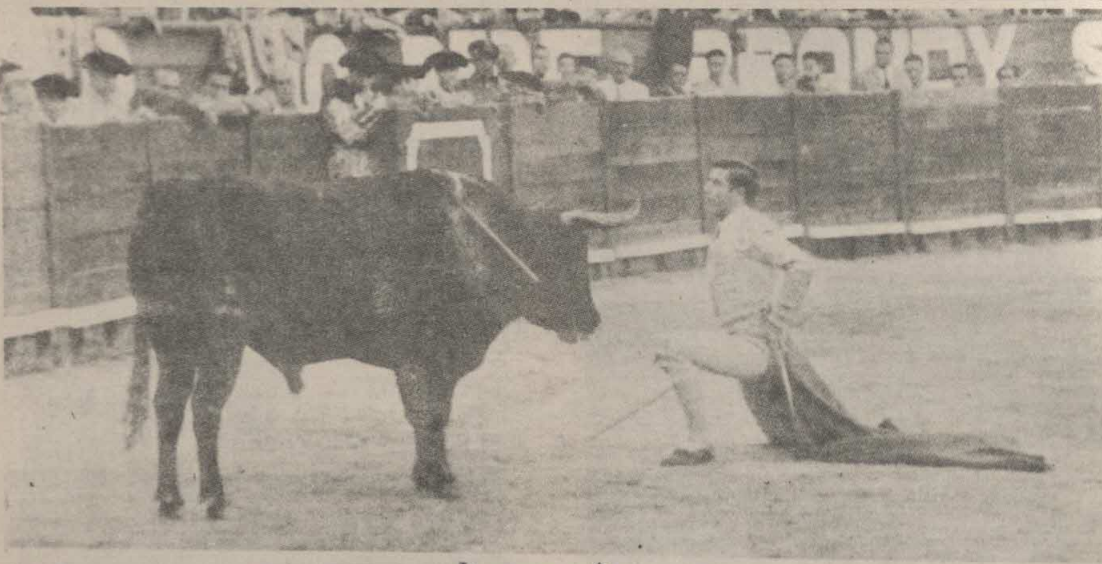
সফল ব্যক্তি ষাঁড়কে বর্শা দিয়ে বিঁধে বা তরোয়াল দিয়ে মেরে ফেলে। কখনও কখনও লোকটিও লড়াই করতে করতে ষাঁড়ের গুতোয় প্রাণ হারায়।

১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে এ পর্যন্ত ৪২ জন বিশিষ্ট যোদ্ধা (matador) মারা গেছেন। স্পেনে বর্তমানে প্রতিযোগীর সংখ্যা ১৯০।

মেক্সিকো, পোর্তুগাল, দক্ষিণ ফ্রান্স ও লাটিন আমেরিকায়ও এই ষাঁড়ের লড়াইয়ের প্রচলন আছে।

মেক্সিকোর প্লাজা ছিল সব চেয়ে বড় ষাঁড়ের লড়াইয়ের স্টেডিয়াম। তাতে ৪৮,০০০ দর্শকের বসবার জায়গা ছিল। সেই স্টেডিয়াম ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

মাদ্রিদের ষাঁড়ের লড়াইয়ের স্টেডিয়ামে ২৪ হাজার লোকের বসবার জায়গা আছে।


ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই

॥ প্রাচীন রোমের পশুযুদ্ধ ॥

প্রাচীন রোমে এক বিরাট স্টেডিয়ামের মধ্যের ফাঁকা জায়গায় মানুষে-মানুষে, মানুষে-পশুতে যুদ্ধ হত। প্রথম দিকে ক্রীতদাস ও কয়েদীদের সঙ্গে হিংস্র জন্তুর যুদ্ধ হত। পরে সাধারণ মানুষ যুদ্ধ করতে শুরু করে।

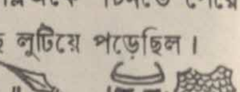
মানুষে-মানুষে তরোয়াল নিয়ে খুনোখুনি হত তা সেকালের লোক দেখে মজাই পেত। বেশী মজা পেত যখন দেখত, কোন হিংস্র পশু কোন মানুষকে ছিঁড়ে কুটে খাচ্ছে।

এই নৃশংস খেলায় যদি কোন যোদ্ধা (gladiator) জয়ী হত তখন দর্শকদের নির্দেশে তাকে হয়তো মেরে ফেলা হত বা তাকে বেঁচে থাকবার সুযোগ দেওয়া হত।

একবার আণ্ড্রোক্লিজ নামে এক ক্রীতদাসকে এক সিংহের সামনে ছেড়ে দেওয়া হল। দর্শকেরা ভেবেছিল সিংহটা এবার তাকে ছিঁড়ে-কুটে খাবে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে সকলে দেখল, সিংহটা তার কোন ক্ষতি না করে তার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল।

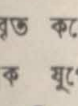
এর আগের কথা। এই সিংহ যে গুহায় থাকত আণ্ড্রোক্লিজ তার মনিবের কাছ থেকে পালিয়ে সেই গুহায় প্রবেশ করেছিল। আণ্ড্রোক্লিজ লক্ষ্য করল, সিংহটা যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছে। তখন সে সিংহটার কাছে সাহস করে এগিয়ে গেল, দেখলো সিংহের পায়ে একটা প্রকাণ্ড কাঁটা ফুটে রয়েছে। সে কাঁটাটা তুলে দিতে সিংহটা খুব আরাম পেল। এ সেই সিংহ, যে আণ্ড্রোক্লিজকে চিনতে পেরে কৃতজ্ঞতায় তার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়েছিল।

॥ জুস্টিং বা জাউস্টিং ॥



আগেকার দিনে ঘোড়ায় চড়ে নাইটরা (বীরপুরুষেরা) লোহার বর্মে গাত্র আবৃত করে বর্শা নিয়ে যুদ্ধ করত। সামন্ততান্ত্রিক যুগে নোবলরা এই খেলা খেলত।

॥ মুষ্টিযুদ্ধ ॥



মুষ্টিযুদ্ধ বা বক্সিং যে ১৫২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসে হত, তা জানা গেছে। আধুনিক কালের খেলা শুরু হয় ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে। বক্সিং-এর নানা শ্রেণী বিভাগ :—লাইট-ফ্লাইওয়েট (light-flyweight), ফ্লাইওয়েট (flyweight), ব্যাণ্টামওয়েট (bantam-weight), ফেদারওয়েট (featherweight),

লাইটওয়েট (lightweight), লাইট-ওয়েল্টার-ওয়েট (light-welterweight), ওয়েল্টারওয়েট (welterweight), লাইট মিডলওয়েট (light-middleweight), মিডলওয়েট (middle-weight), লাইট-হেভিওয়েট (light-heavy-weight), হেভিওয়েট (heavyweight) ও সুপার-হেভিওয়েট (super-heavyweight)।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বক্সিং-এর নিয়মকানুন ভালো-ভাবে বেঁধে দেওয়া হয়। চামড়ার নরম গদি-ওয়ালা দস্তানা পরে বক্সিং লড়তে হয়। লড়াই শুরু হলে যদি মার খেয়ে কোন যোদ্ধা পড়ে যায় ও ১০ গোনা পর্যন্ত উঠে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে



ল্যারি হোমস

তাকে বলে নক-আউট (knock-out)। রেফারী যদি দেখেন, কেউ হেরে গিয়ে আর লড়তে পারছে না, তাহলে তিনি লড়াই বন্ধ করে দেন।



কিউবার বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা Teofilio Stevenson

বিভিন্ন সময়ের ও বিভিন্ন শ্রেণীর বিখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধাদের নাম—জো লুই, মহম্মদ আলি (পূর্বনাম ক্যাসিয়াস ক্লে). সনি লিস্টন, জো ফ্রেজিয়ার, 'সুগার' রে রবিনসন, ড্যানি ও' সুলিভ্যান, প্রাইমো কারনেরা, ল্যারি হোমস, বিলি ওয়েলস, রকি মার্সিয়ানো, কিউবার Teofilio Stevenson প্রভৃতি।

অধিকাংশ মুষ্টিযোদ্ধা নিগ্রোবংশোদ্ভূত। জো লুই ১২ বৎসরের মধ্যে পরাজিত হন নি। ২৪ বার মুষ্টিযুদ্ধে চ্যাম্পিয়ন হবার পর তিনি খেতাব ত্যাগ করেন।

তারপরে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন সনি লিস্টন। তিনি মহম্মদ আলি (প্রকৃত নাম ক্যাসিয়াস ক্লে)-র কাছে হেরে যান। জো ফ্রেজিয়ার তাঁকে পরাস্ত করেন। পরে ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লে পুনরায় জো ফ্রেজিয়ারকে হারিয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হন।

মুষ্টিযুদ্ধ ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। মুষ্টিযোদ্ধারা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় অবিশ্বাস্য রকম অর্থ অর্জন করে থাকেন। ভারতে মুষ্টিযোদ্ধার সংখ্যা অনেক। কিন্তু ভারত এখনও বিশ্বে তেমন

মর্যাদা লাভ করে উঠতে পারে নি।



॥ লাঠি খেলা ॥

লাঠি ঘুরিয়ে আত্মরক্ষা করা আগেকার দিনে ভারতে খুব প্রচলিত ছিল। লাঠি খেলায় শুধু শক্তির প্রয়োজন হয় না, রীতিমতো কৌশলও আবশ্যক। আগেকার দিনে ঠ্যাঙাড়েদের হাত থেকে বাঁচতে গেলে লাঠিখেলা খুবই কাজে লাগত।

ভারতে বিশেষ করে বাংলায় অনেক কৃতী লাঠি খেলোয়াড় ছিল। তন্মধ্যে একজনের নাম খুব প্রসিদ্ধ। তাঁর নাম পুলিনবিহারী দাস। তিনি শুধু লাঠিচালনায় দক্ষ ছিলেন না। ছোরা চালানো ও জুজুৎসুতেও বিশেষরকম পটু ছিলেন।



॥ ফেন্সিং ॥

ফেন্সিং (fencing) অর্থাৎ তরোয়াল খেলা আনুমানিক ১৩৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরে প্রচলিত ছিল বলে জানা গেছে। ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপে এ খেলা চালু হয়।

ফেন্সিং খেলা ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত। আগেকার দিনে ধারালো তরবারি নিয়ে যোদ্ধা বা প্রতিযোগীরা আসরে নামতেন। তাতে প্রাণহানির সম্ভাবনা ছিল। এখন ভোঁতা তরোয়াল নিয়ে খেলা হয়। তাতে কোন বিপদের সম্ভাবনা থাকে না।

ভোঁতা তরোয়ালকে বলা হয় ফয়েল। এই ফয়েল নারীপুরুষ উভয়ে ব্যবহার করে। একটু ভারী ভোঁতা তরোয়ালকে বলে এপে (epee)। স্যাবার (sabre) হালকা ধরনের তরোয়াল। যারা ফেন্সিং খেলে তারা বিশেষ ধরনের দস্তানা, পুরু জামা ও মুখোশ পরে। আজকাল এই সব তরোয়াল প্রতিদ্বন্দ্বীর গায়ে যে বেশী বার ঠেকাতে পারে তার জয় হয়।

জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, কিউবা, ইটালি, রাশিয়া, ফ্রান্স, গ্রীস, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ বা দেশের প্রতিযোগীরা ফেন্সিং প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন সময়ে কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

॥ কপাটি ॥

কপাটি মূলতঃ ভারতের খেলা। এই খেলায় এক দল আর এক দলের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। সাধারণতঃ খালি গায়ে মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরে মাঠে ময়দানে এ খেলা হয়। কপাটি আজও বাংলার পল্লী অঞ্চলের জনপ্রিয় খেলা।

॥ নানা রকমের দেশী খেলা ॥

কানামাছি, কুমীর-কুমীর, চোর-চোর, ডাংগুলি, লাট্টু ঘোরানো, গুলি খেলা প্রভৃতি নানা ধরনের খেলা ভারতের, বিশেষ করে বাংলার ছেলেমেয়েদের মধ্যে প্রচলিত। এই সব খেলা সাধারণতঃ পল্লী অঞ্চলেই বেশী করে হয়ে থাকে।

যে সুতো লাট্টুর চার দিকে ঘুরিয়ে লাট্টুকে ছুঁড়ে দিতে হয় তার নাম লেত্তি। লাট্টু খেলায় 'চৌকোন', 'উড়নচৌকন', 'গচ্চা' প্রভৃতি নানা ধরনের মার বা কৌশল আছে।



॥ ঘুড়ি ওড়ানো ॥

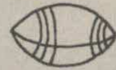
ঘুড়ি শুধু বড়রাই ওড়ায় না, ছোটরাও ওড়ায়। এদেশে বিশ্বকর্মা পূজোর দিনে ঘটা করে ঘুড়ি ওড়ানো হয়। সুতোতে নানা ধরনের মাঞ্জা দিয়ে তা শক্ত করে নিতে হয়। তাহলে অন্যের উড়ন্ত ঘুড়ির সুতো কেটে ঘুড়িকে মাটিতে নামানো সহজ হয়। ডিজাইন হিসাবে এদেশের ঘুড়ির নানা নাম —শতরঞ্চ, পেটকাট্টি, চাঁদিয়াল, চাপরাস ইত্যাদি।

জাপানে বড় বড় অদ্ভুত রকমের ঘুড়ি ওড়ানো হয়। চীনেও হয়। জাপানে ঘুড়ি ওড়ানোর প্রথা বহু শত বৎসর আগেকার।

॥ ক্যারম ॥

ক্যারমবোর্ড (carom-board) বলে উঁচু বেড়-

দেওয়া একটা চৌকো কাঠের বোর্ডের চারকোণে চারটা পকেট থাকে। বোর্ডের মাঝখানে সাদা আর কালো ঘুঁটি থাকে।। মধ্যে একটা লাল ঘুঁটিও থাকে। টোকা দিয়ে ঘুঁটিকে পকেটে ফেলতে হয়। যে প্রতিযোগী সকলের আগে তার সব ঘুঁটি পকেটে ফেলতে পারবে, সে জয়ী হয়।



॥ রাগবী ॥

ফুটবলে গোলকীপার ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় বল হাত দিয়ে ধরতে পারে না। রাগবী খেলায় হাত দিয়ে বল ধরে ছুটোছুটি করা চলে ও সুযোগ পেলে গোল করতে হয়। রাগবী রীতিমতো ধস্তাধস্তির খেলা।

রাগবী খেলা দুরকমের—রাগবী ইউনিয়ন (R.U.) ও রাগবী লীগ (R.L.)।

রাগবীর বল ফুটবলের মতো পুরোপুরি গোল নয়, কতকটা ডিমের মতো আকারের।

রাগবী ফুটবল খেলায় হাত-পা দুইই চালানো যায়। রাগবীর আর এক নাম রাগার (rugger)।

আগে ২০ জন করে প্রতি দলে খেলোয়াড় থাকত। আজকাল রাগবী ইউনিয়নে ১৫ জন করে প্রতি দলে এবং রাগবী লীগে ১৩ জন করে প্রতি দলে থাকে। তাদের মধ্যে রাগবী ইউনিয়নে ৭ জন ব্যাক ও ৮ জন ফরোয়ার্ড, রাগবী লীগে ৭ জন ব্যাক ও ৬ জন ফরোয়ার্ড থাকে।

রাগবী লীগ ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ও রাগবী ইউনিয়ন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে গঠিত হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ড, নিউ জীল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্কটল্যাণ্ড, ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশ রাগবী ইউনিয়নে এবং গ্রেট ব্রিটেন, অস্ট্রিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ রাগবী লীগ খেলায় বিভিন্ন সময়ে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছে।

॥ ফুটবল ॥



ফুটবল অতি জনপ্রিয় খেলা। এ খেলা চার রকমের—অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল, রাগবী, নর্দার্ন ইউনিয়ন গেম ও আইরিশ ফুটবল।

৪র্থ ও ৩য় খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে চীনে Tsu-chu নামে যে খেলা প্রচলিত ছিল তা কতকটা ফুটবল খেলার মতোই।

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (F. A.) গঠিত হয়। তাই থেকে অ্যাসোসিয়েশন ফুটবল খেলার নামকরণ হয়। সংক্ষেপে বলা হয় সকার (soccer)।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ফুটবল (সকার) এক অতি প্রসিদ্ধ খেলা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায়ও এ খেলা হয়ে থাকে। এ খেলায় গোলাকার ফুটবলকে পা দিয়ে মারতে হয়। গোলকীপার ছাড়া আর কোন খেলোয়াড় বলে হাত লাগাতে পারে না।

দুদলে ১১ জন করে খেলে। মাঠের দুধারে পোতা দুইটি গোলপোস্টের মধ্যে বল চালিয়ে দিতে পারলে ১ গোল হয়। এইভাবে যে দল বেশী গোল দিতে পারে সেই দল জয়ী হয়।

ফুটবল নাম হবার আগে এর নাম ছিল হারপটন, কিকিং দ্য ব্লাডার ও কিকিং দ্য ডেনাসে'স হেড।

ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন (F. I. F. A.) সারা পৃথিবীর ফুটবল খেলা পরিচালনার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান।

ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল খেলা চালু হয় ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে। ভারতের প্রধান প্রধান ফুটবল প্রতিযোগিতা—ফেডারেশন কাপ, আই. এফ. এ শীল্ড, বোম্বাই-এর রোভার্স কাপ, দিল্লীর ডুরাণ্ড কাপ, দার্জিলিংয়ের গোল্ড কাপ। তাছাড়া আরো অনেক ফুটবল প্রতিযোগিতা



রাত্রে ফুটবল খেলা

এদেশে হয়ে থাকে—ডি. সি. এম. ট্রফি, বরদলৈ ট্রফি, স্যার আশুতোষ মুখার্জী শীল্ড (সারা ভারত বিশ্ববিদ্যালয় চ্যাম্পিয়নশিপ), সুব্রত মুখার্জী কাপ (সারা ভারত স্কুল চ্যাম্পিয়নশিপ) ও সন্তোষ ট্রফি (আন্তঃরাজ্য ফুটবল প্রতিযোগিতা)।

মোহনবাগান ক্লাব ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে সাসেক্স রেজিমেণ্টকে ২-১ গোলে পরাজিত করে প্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড লাভ করে।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম আই. এফ. এ লীগ খেলায় একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর জয়লাভ করে চ্যাম্পিয়ান হয়।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আই. এফ. এ. শীল্ড খেলা শুরু হয়।

নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী আই. এফ. এ. খেলার প্রবর্তক।

ফেডারেশন অব ইণ্টারন্যাশনাল ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের ভূতপূর্ব সভাপতি মঁসিয়ে জুলে রিমে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ৪ কিলো ওজনের নিরেট সোনার পরীমূর্তি কাপ হিসাবে দান করেন। সেই থেকে বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। শর্ত ছিল, যে দেশ তিনবার এই প্রতিযোগিতায় জয়ী হবে, সেই দেশ কাপটি পাকাপাকিভাবে নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারবে। ১৯৭০ সালে কাপটি ব্রাজিল বরাবরের জন্য লাভ করে। উরুগুয়ে (১৯৩৪, ১৯৫০), ইটালী (১৯৩৪, ১৯৩৯) পশ্চিম জার্মানি (১৯৫৪,) ব্রাজিল (১৯৫৮, ১৯৬২ ১৯৭০), ইংল্যাণ্ড (১৯৬৬) প্রসিদ্ধ F. I. F. খেলার বিশিষ্ট বিজয়ী প্রতিযোগী।

ব্রাজিলের এডসন ভ্যারেণ্টেস ডু নাসিমেণ্টো ('পেলে' নামে প্রসিদ্ধ) পৃথিবীর সব চেয়ে নাম-করা খেলোয়াড় বলে বিবেচিত হয়েছেন। তিনি জীবনে এক হাজারেরও বেশী গোল করেন। পোর্তুগালের ইউসেবিও, হাঙ্গেরীর পুসকাস, গ্রেট ব্রিটেনের স্ট্যানলী ম্যাথুজ পৃথিবীপ্রসিদ্ধ খেলোয়াড়।

গোষ্ঠ পাল, কুমার, সামাদ, শৈলেন মান্না, চুনী গোস্বামী, হাবিব, শ্যাম থাপা, থঙ্গরাজ, পি.

কে. ব্যানার্জী, বলরাম, মেওয়ালাল প্রভৃতি এদেশের বিশিষ্ট খেলোয়াড় হিসাবে নাম করেছেন।

ডুরাণ্ড কাপে মোহনবাগান দল ১৯৫৩, ১৯৫৫, ১৯৬০, ১৯৬৩-১৯৬৫, ১৯৭৪, ১৯৭৫, ১৯৭৭, ১৯৭৯ সালে জয়ী হয়।

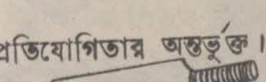
রোভার্স কাপে জয়ী হয় ইস্টবেঙ্গল ১৯৪৯, ১৯৬২ (অন্ধ্রপুলিশ সহ), ১৯৬৭, ১৯৬৯, ১৯৭২, ১৯৭৩ (মোহনবাগান সহ), ১৯৭৪, ১৯৮০ (মহমেডান স্পোর্টিং সহ)।

মোহনবাগান—১৯৫৫, ১৯৬৬, ১৯৬৮, ১৯৭০, ১৯৭৩ (ইস্টবেঙ্গল সহ), ১৯৭৬, ১৯৭৭ সালে জয়ী হয়।

মহমেডান স্পোর্টিং—১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৮০ (ইস্টবেঙ্গল সহ)।

লীগ চ্যাম্পিয়ানশিপ জয়ী : মহমেডান স্পোর্টিং দল—১৯৩৪-১৯৩৮, ১৯৪০, ১৯৪১, ১৯৪৮, ১৯৫৭, ১৯৬৭। মোহনবাগান দল—১৯৩৯, ১৯৪৩, ১৯৪৪, ১৯৫১, ১৯৫৪-১৯৫৬, ১৯৫৯, ১৯৬০, ১৯৬২-১৯৬৫, ১৯৬৯, ১৯৭৬, ১৮৭৮, ১৯৭৯। ইস্টবেঙ্গল দল—১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৬, ১৯৪৯, ১৯৫০, ১৯৫২, ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৭০-১৯৭৫, ১৯৭৭।

সকার ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্ভুক্ত।



॥ ক্রিকেট ॥

১২৫০ খ্রীষ্টাব্দে যে ক্রিকেট খেলা হত, তা একটা ছবি দেখে জানা যায়। বর্তমানকালে প্রথম খেলা হয় ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে। ক্রিকেট ইংল্যাণ্ডের জাতীয় খেলা। ইংল্যাণ্ড থেকেই ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, জ্যামাইকা, নিউ জীল্যাণ্ড, কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা, ইজিপ্ট, ক্যামেরুন প্রভৃতি দেশে ক্রিকেট ছড়িয়ে পড়ে। রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ক্রিকেট খেলার সমাদর নেই।

১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে এম. সি. সি. (M. C. C.—Marylebone Cricket Club) সারা ইংল্যাণ্ডে কর্তৃত্ব করে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনের সেণ্ট জন্‌স্ উড পাড়ায় টমাস লর্ড বলে এক ব্যক্তির কাছ থেকে জমি কিনে সেখানে M. C. C. খেলার ব্যবস্থা করে। সেই জায়গাকে বলা হয় লর্ডসের মাঠ।

সৌরাষ্ট্রের পূর্বতন জামনগর রাজ্যের রাজকুমার রণজিৎ সিংজী—সংক্ষেপে 'রণজি'—ক্রিকেট খেলায় খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আরও তিনজন



দলীপ সিংজী, ব্রাডম্যান ও অমরনাথ

রাজকুমার দলীপ সিংজী, পাতাউদির নবাব—পিতা ইথতিকার আলি ও পুত্র মনসুর আলি খান ক্রিকেট খেলায় খুব নাম করেন। মনসুর আলি খান (পাতাউদির নবাব) অনেকবার ভারতীয় ক্রিকেট দলের নেতৃত্ব করেন।

বিভিন্ন সময়ে ভিনু মানকড় বা মাঁকড়, লালা অমরনাথ, বিজয় হাজারে, পঙ্কজ রায়, সি. কে. নাইডু (Col. Cottari Kanakaiya Nayudu, ১৮৯৫-১৯৬৭ খ্রী.), ভিজিয়ানাগ্রামের (বিজয়নগরের) মহারাজকুমার (সংক্ষেপে 'ভিজি'), বিজয় মার্চেণ্ট, মুস্তাক আলি, নরী কণ্ট্রাক্টর, পলি উমরিগড়, এম. জে. গোপালন, কৃপাল সিং, হনুমন্ত সিং, বিশ্বনাথ, আব্বাস আলি বেগ, মহিন্দর, সুরিন্দর, অমরনাথ



হাজারে, অমরনাথ, পাতাউদ্দি, ভিজি, নাইডু

প্রভৃতি ক্রিকেট খেলোয়াড় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছেন। বর্তমানে সুনীল গাভাসকার, কপিলদেব, প্রভৃতি যথেষ্ট নাম করেছেন।



পঙ্কজ রায়

অস্ট্রেলিয়ার স্যার ডোনাল্ড জর্জ ব্রাডম্যান (Sir Donald George Bradman), ভিক্টর ট্রামপার, ডেনিস লিলি; ইংল্যাণ্ডের ইয়ং বথাম, জে. সি. লেকার, জিওফ বয়কট, ডক্টর গ্রেস, হব্স্, হ্যামণ্ড, লেন হাটন, কাউড্রে, রোডস; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের গারফিল্ড সোবার্স, ওরেল, কনস্ট্যানটাইন, লান্স গিব্স্; পাকিস্তানের মুস্তাক মহম্মদ, ইমরান,



পাকিস্তানের মুস্তাক মহম্মদ

হানিফ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ক্রিকেট খেলোয়াড়।

ভারত ১৯৮৩ সালে বিশ্ব ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়ে পৃথিবীব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে।

ফাঁক ফাঁক করে তিনখানি লাঠি (স্টাম্প) পুঁতে তার উপরে দুটো করে ছোট সাইজের বেল (bail) রাখা হয়। খেলার মাঠের দু প্রান্তে এই রকম স্টাম্প পোতা হয়। এর নাম উইকেট। দুটো উইকেটের মাঝখানের জায়গাকে বলে পিচ (pitch)। এই পিচ ঘাসের বা মাদুর-বিছানো (matting) হতে পারে।

উইকেটের সঙ্গে এক লাইনে ১'২ মিটার করে একটা সোজা দাগ টানা থাকে। এই দাগকে বলে বোলিং ক্রীজ (bowling crease)। উইকেট থেকে ১'২ মিটার দূরে আর একটা সমান্তরাল রেখা টানা থাকে। তার নাম পপিং ক্রীজ (popping crease)।

খেলার শুরুতে দুজন দুটো ব্যাট নিয়ে দুই পপিং ক্রীজে দাঁড়ায়। ব্যাটের হাতল হয় বেত দিয়ে মোড়া, ফলাটা হয় সাধারণতঃ উইলো কাঠের।

অন্য দলের ৯ জন মাঠে নেমে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়ায়। বোলার (bowler) উইকেট লক্ষ্য করে জোরে বল ছোড়ে। উইকেটের পিছনে যে বল ধরবার জন্যে দাঁড়ায় তাকে বলে উইকেটকীপার।

খেলার দুজন পরিচালককে বলে আম্পায়ার (umpire)। তাঁদের নিয়ে মোট ১৫ জন মাঠে থাকে।

বোলার বল ছুড়লে উইকেটে না গেলে দূরে চলে গেলে সেই ফাঁকে ব্যাটসম্যান একটা উইকেট থেকে আর একটা উইকেট পর্যন্ত ছুটে ব্যাট মাঠে ছোঁয়ায়। যতবার এইরকম করতে পারে, ততবার 'রান' হয়।

ব্যাটসম্যান বোলারের ছোড়া বল ব্যাট দিয়ে



ভিনু মানকড়

মারার জন্যে দাঁড়ায়। বোলারের বল মাঠ দিয়ে গড়াতে গড়াতে বাইরে চলে গেলে চার রান পাওয়া যায়। তাকে বলে বাউণ্ডারি। বল উপর দিয়ে মাঠ পেরিয়ে গেলে তাকে বলে ওভার বাউণ্ডারি। তাতে ৬ রান হয়। ১০০ রানে এক সেঞ্চুরি ও ২০০ রানে ডবল সেঞ্চুরি হয়।

রানের সংখ্যানুযায়ী জয়-পরাজয় হয়। যত রান হবে তা লিখে রাখবার জন্য স্কোরার থাকে।

বিভিন্ন কারণে কোন ব্যাটসম্যান আউট হলে অন্য ব্যাটসম্যান মাঠে নেমে ব্যাট ধরে। বোল্ড আউট, কট আউট, স্টাম্প্‌ড্‌ আউট, রান আউট, এল. বি. ডব্লিউ, হিট উইকেট প্রভৃতি কারণে ব্যাটসম্যান আউট হয়ে থাকে।

আজকাল মেয়েরাও ক্রিকেট খেলে।

॥ সাইকেল চালনা ॥

১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে যে ভেলোসিপীড রেস হয় তাকেই সর্বপ্রাচীন সাইকেল রেস বলা হয়। সেবার সাইকেল রেসের দূরত্ব ছিল ২ কিলোমিটার।



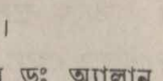
বাইসাইকেল চালনা

সাইকেল চালনা ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত।

মেক্সিকো, পশ্চিম জার্মানি, রাশিয়া, সুইটজারল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স, ইটালী, গ্রেট ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যাণ্ডস, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি দেশের সাইকেলারোহীরা বিভিন্ন সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

এ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ অ্যালান ভি. অ্যাবট ঘণ্টায় ২২৬.১ কিলোমিটার বেগে সাইকেল চালিয়ে রেকর্ড স্থাপন করেছেন।

মেয়েরাও সাইকেলচালনায় বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।



॥ ঘোড়দৌড় ॥

জকী (jockey) অর্থাৎ ঘোড়সওয়াররা ঘোড়া চালায়। সেই সব ঘোড়া একটা নির্দিষ্ট জায়গায় ছোটে। যে ঘোড়া আগে যেতে পারে, সে জয়ী হয় এবং ঘোড়ার মালিক মোটা টাকা পায়।

পৃথিবীর নানা দেশে ঘোড়দৌড়ের মাঠ (race course) আছে। বিলাতের সারে (Surrey) কাউন্টির অন্তর্গত এপসম নামে জায়গার ডার্বি রেস (Derby Race) খুব প্রসিদ্ধ। এই ঘোড়দৌড়ের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ডার্বির নামানুসারে ডার্বি রেস



ডার্বি রেসের মাঠ

হয়েছে। কলকাতায় গড়ের মাঠে ও টালিগঞ্জে ঘোড়দৌড়ের মাঠ আছে। কলকাতার প্রেসিডেন্ট'স কাপ রেস খুব প্রসিদ্ধ।



বিখ্যাত জকি
উইলিয়াম লী উইলি শুমেকার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)। তিনি ১৯৪৯ থেকে ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ৮ হাজার বার ঘোড়দৌড়ে জয়ী হন ও ৮০ লক্ষ ডলার অর্জন করেন।

ঘোড়দৌড় ওলিম্পিক প্রতিযোগিতার অন্তর্গত। পশ্চিম জার্মানি, চেকোস্লোভাকিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, চিলি, স্পেন, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি, আর্জেন্টিনা, পোর্টো রিকো প্রভৃতি দেশের জকিরা বিভিন্ন সময়ে বিশেষ সুখ্যাতি অর্জন করেছে।

॥ গল্‌ফ্ ॥

সম্ভবতঃ স্কটল্যাণ্ডে গল্‌ফ্ খেলার প্রবর্তন হয়। ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে স্কটিশ পার্লামেন্টে গল্‌ফ্ খেলা নিষিদ্ধ করে আইন পাস হয়। অবশ্য চীনারা বলে, গল্‌ফ খেলা চীনে ২য় খ্রীষ্টপূর্ব শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। তখন তার নাম ছিল Ch'ui Wan।

গল্‌ফ্ বল নিরেট রবারের তৈরী, খুব শক্ত ও ছোট। যে লাঠি দিয়ে বল মারা হয় তার নাম ক্লাব। যে প্রশস্ত জায়গায় গল্‌ফ্ খেলা হয়, তাকে বলে লিংক (link)।

বড় বড় লিংকে নানা জায়গায় ১৮টি গর্ত থাকে। ক্লাব দিয়ে মেরে বলকে গর্তে ফেলতে হয়। গলফ্ খেলা দল বেঁধে খেলা হয় না। এক একজন



ক্লাব হাতে গল্‌ফ্ খেলোয়াড়

গল্‌ফ্‌ খেলে। যে ক্লাব দিয়ে কম বার মেরে গর্তে ফেলতে পারে, তার জিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত, অস্ট্রেলিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, স্পেন, পেরু, তিব্বত, জাপান, চীন প্রভৃতি স্থানে গল্‌ফ্‌ খেলা হয়ে থাকে।

তিব্বতে ৪৮৭৫ মিটার উপরে গল্‌ফ্‌ খেলা হয়। কাশ্মীরে গুলমার্গে এই খেলা হতে দেখা গেছে।



॥ বাইচ খেলা ॥

নৌকো বাইবার প্রতিযোগিতার নাম বাইচ বা বাচ খেলা (boat race)। ইংল্যাণ্ডের টেমস নদীতে অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বাচ খেলা খুব প্রসিদ্ধ।

কলকাতায় ঢাকুরিয়া লেকে বাচ খেলা হয়। সারা পৃথিবীর নানা দেশে বাইচ খেলার প্রতিযোগিতা হয়ে থাকে।

যে-সব খেলার উল্লেখ করা হল, সে-সব ছাড়া আরও বহু খেলা নানা দেশে প্রচলিত—ব্যাগাটেল (bagatelle), গ্লাইডিং, বোলিং (tenpin), বোল্‌স্‌, ক্রোকে (croquet), হ্যাণ্ডবল, ফাইভস, ডাইভিং প্রভৃতি।

ধর্মের কথা



পৃথিবীর সকল দেশে সকল যুগে নানা ধর্মের উদ্ভব হয়েছে। ধর্ম বলতে কী বোঝায়, সে সম্বন্ধে নানা মনীষী নানা কথা বলে গেছেন। তবে ধর্মের মূল কথা ঈশ্বর।

আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, ঝড়ঝাপটা, বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ, ভূমিকম্প, জলোচ্ছ্বাস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত দেখে ভেবে আসছে, এই সব প্রাকৃতিক ব্যাপার কী করে সংঘটিত হচ্ছে? কেউ বললেন, প্রকৃতিই সব কিছুর মূলে। কেউ বললেন, এই যে প্রকৃতি তা কার প্রকৃতি?

প্রকৃতিতো প্রাণহীন। কোন প্রাণহীন বস্তু কি প্রাণের সৃষ্টি করতে পারে বা প্রাণীকে সর্বভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে? আসল কথা, একজন অনাদি অনন্ত, সহস্র কোটি জ্যোতিষ্কের স্রষ্টা, অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্ কেউ আছেন যিনিই সারা বিশ্বের সব কিছুরই স্রষ্টা। তাঁর কথা চিন্তা করতে গিয়ে মানুষের মনে যে অনির্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি হল, তাই হচ্ছে ধর্ম। ধর্মের মূল কথা যে কী, তা কেউ জানে না। নানা জ্ঞানী-গুণী মনীষীর রচিত শাস্ত্র থেকে জানা যায়, মহাপুরুষেরা যে পথ অবলম্বন করেছেন তাই-ই হচ্ছে ধর্মের পথ।

এই কথাই বলেছিলেন মহাভারতের জ্যেষ্ঠ পাণ্ডব যুধিষ্ঠির। মহাভারত পড়ে জানা যায়, পাণ্ডবেরা দুর্যোধনের সঙ্গে কপট পাশাখেলায় পরাজিত হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াবার সময় পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়লে তৃষ্ণানিবারণের জন্যে জলের খোঁজ করতে থাকেন।

কোথায় জল পাওয়া যায়, তারই খোঁজে একে একে সহদেব, নকুল, অর্জুন ও ভীম বেরোলেন। বহুক্ষণ কেটে গেল। তাঁদের কেউ ফিরলেন না। উদ্বিগ্ন যুধিষ্ঠির এবার নিজেই জলের ও ভায়েদের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন।

তিনি কিছুদূর গিয়ে দেখলেন, একটা প্রকাণ্ড জলাশয়ের ধারে তাঁর ভাই চারজনের প্রাণহীন দেহ পড়ে আছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে একটা বক। তৃষ্ণার্ত যুধিষ্ঠির জলপানের জন্যে জলাশয়ে নামতে গেলে বক মানুষের গলায় বলে উঠল, জলে নেমো না। জল স্পর্শ করলে তোমারও



জলাশয়ের ধারে যুধিষ্ঠির ও বক

দশা তোমার ভায়েদের মত হবে। আগে আমার কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দাও। সঠিক উত্তর দিতে পারলে তুমি পানের জল পাবে, ভায়েরাও বেঁচে উঠবে।

যুধিষ্ঠির বকের সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিলেন। সে-সবের মধ্যে একটা প্রশ্ন ছিল, ধর্ম কী?

যুধিষ্ঠির জানালেন, ধর্ম যে কী, তা কেউ জানে না। নানা মুনি ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা বলেন। তবে একটা কথা ঠিক যে মহাপুরুষদের অবলম্বিত পথই ধর্ম।

বেদা বিভিন্না স্মৃতয়ো বিভিন্না
নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

এই যে বক তিনি আর কেহ নহেন, বকরূপী ধর্ম। যুধিষ্ঠিরের কাছ থেকে সকল প্রশ্নের সঠিক উত্তর পেয়ে তিনি যুধিষ্ঠিরের চার ভাইকে বাঁচিয়ে তুললেন এবং সকলকে তৃষ্ণার জল পান করবার অনুমতি দিলেন। এতো গেল পুরাণের কথা। সকল দেশেই ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা প্রচারিত আছে।

আদিম যুগে বনচারী বা গুহাবাসী মানবেরা পাহাড়পর্বত, গাছপালা প্রভৃতির উপাসনা করত। পরবর্তী যুগে লোকে ঈশ্বরের উপাসনা করতে গিয়ে নানা দেবদেবীর উপাসনা করত। ঈশ্বর যে এক ও অদ্বিতীয় সে কথা বহু পরে মানুষ প্রচার করেছে।

ধর্ম বলতে আমরা যে ব্যাখ্যাই দিই না কেন, বর্তমানে এক এক জাতির উপাসনাপদ্ধতি ও আচার-আচরণ নিয়ে বিভিন্ন ধর্ম গড়ে উঠেছে— হিন্দু, ইহুদী, বৌদ্ধ, কনফুসি, তাও, খ্রীষ্টান, ইসলাম, পার্শী, জৈন, শিখ ইত্যাদি।

এই সব ধর্ম গড়ে তুলেছে, বিভিন্ন আচার-আচরণপালনকারী মনুষ্যসংঘ। বিভিন্ন ধর্মীয় লোকদের মধ্যে সব দেশে নানা সময়ে বহু সংঘর্ষ দেখা দিয়েছে এবং আজও দেয়।

এ-সব ধর্মের মধ্যে হিন্দু ধর্মই পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে পুরনো। এই ধর্মের কবে যে সৃষ্টি এবং তা কার সৃষ্টি সে কথা কারও জানা নেই।

আগে হিন্দুধর্মাবলম্বী বলা হত না, সনাতন-ধর্মী বলা হত। সিন্ধুনদের তীরের অধিবাসীদের প্রধানতঃ পারসিকেরা হিন্দু বলতে থাকে। তারা 'স' উচ্চারণ করতে পারত না। সেই থেকে হিন্দু শব্দের প্রচলন হয়। সে-ও কয়েক সহস্র বৎসর আগেকার কথা।

আর্যরা বাইরে থেকে প্রায় চার হাজার বছর আগে ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁরা প্রথমে উত্তর ভারতে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়দের পরাস্ত করে ক্রমশঃ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, আর্যরা ভারতের বাইরে থেকে আসেন নি। তাঁরা ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে পৌঁছেছেন মাত্র। বহু সহস্র বৎসর পূর্বে ভারতবর্ষ কাসপিয়ান সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইউরোপীয়রা, বিশেষ করে ইংরেজরা শ্রীহট্টকে বলেন Sylhet, কলকাতাকে Calcutta, বর্ধমানকে Burdwan ইত্যাদি। তেমনি কশ্যপ সাগরকে তাঁরা বলতে শুরু করেন Caspain Sea। এই কশ্যপ সাগরের তীরে পুরাণখ্যাত ঋষি কশ্যপের আশ্রম ছিল বলে জানা গেছে।

আর্যরা প্রধানতঃ কশ্যপ সাগরের তীরভূমি থেকে হিমালয়ের গিরিপথ দিয়ে ভারত ভূখণ্ডে প্রবেশ করেন। তখনকার দিনে আফগানিস্তান, পারস্য প্রভৃতি ভারতবর্ষেরই অন্তর্গত ছিল।

আর্যরা পরে হিন্দু নামে পরিচিত হন। তাঁদের প্রধান ধর্মগ্রন্থ বেদ। এই বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ।



ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করছেন

আগেকার দিনে বেদের কথা মুখে মুখে প্রচারিত হত। বেদের চারিভাগ—ঋক্‌বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ ও অথর্ববেদ। পরাশর-পুত্র ব্যাসদেব বেদের বিভাগ করেন। তাই তাঁর নাম হয় বেদব্যাস।



বেদপাঠরত শিষ্যগণ

বেদ হিন্দুদের প্রধান ধর্মশাস্ত্র। এ ছাড়া তাঁদের আরও বহু ধর্মশাস্ত্র আছে। শাস্ত্র বলতে বোঝায় এমন এমন গ্রন্থকে যাতে কি করা সংগত, কি করা অনুচিত প্রভৃতি থাকে।

বেদের নানা অংশ নিয়ে রচিত হয় উপনিষদ্। উপনিষদ্ অনেক। সর্বাপেক্ষা পুরাতন উপনিষদ্ ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক। আরও কয়েকখানি প্রসিদ্ধ উপনিষদের নাম—ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি ও শ্বেতাশ্বতর। এ ছাড়া আরও অনেক উপনিষদ্ আছে —জাবালোপনিষদ্, পরমহংসোপনিষদ্, সন্ন্যাসোপনিষদ্, আরুণেয়োপনিষদ্, কণ্ঠশ্রুত্যুপনিষদ্, পিণ্ডোপনিষদ্, আত্মোপনিষদ্, চুলিকোপনিষদ্ ও নীলরুদ্রোপনিষদ্।

অধিকাংশ উপনিষদেই ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয় বলা হয়েছে। এই ঈশ্বরকে ব্রহ্ম নাম দেওয়া হয়েছে।

কিন্তু বেশির ভাগ হিন্দু বহু দেবদেবীকে মেনে থাকেন। আর্যরা তো প্রথম দিকে মিত্র (সূর্য), বরুণ, সোম (চন্দ্র), অগ্নি প্রভৃতি তেত্রিশ জন দেবতাকে মানতেন। বর্তমানে পৃথিবীর নানা দেশের, বিশেষ করে ভারতের ও নেপালের হিন্দুরা অসংখ্য দেবদেবীর উপাসনা করেন। অবশ্য বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা ঈশ্বরকে এক ও অদ্বিতীয়ই বলে থাকেন।

বেদ, উপনিষদ্ ছাড়া হিন্দুদের বহু শাস্ত্রগ্রন্থ আছে। মনুসংহিতা একটি বিশিষ্ট শাস্ত্রগ্রন্থ। তা-ছাড়া অগ্নি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সংবর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ সংহিতা আছে।

ব্যাসাদি ঋষি-প্রণীত পুরাণের সংখ্যা আঠার —ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি।

এসব ছাড়া হিন্দুদের রামায়ণ, মহাভারত, গীতা প্রভৃতি অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষ ও নেপালের অধিকাংশ লোক হিন্দু। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, মরিশাস, বলিদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ফিজি প্রভৃতি স্থানে বহু হিন্দু বর্তমান। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা, ওশেনিয়া প্রভৃতি সব মহাদেশেই হিন্দু ধর্মের লোক আছে। সারা পৃথিবীতে হিন্দুর সংখ্যা ৫০ কোটির অধিক। সংখ্যায় পৃথিবীতে হিন্দুধর্মাবলম্বীদের স্থান তৃতীয়। প্রথম খ্রীষ্টান, দ্বিতীয় ইসলাম।

আগে ঈজিপ্ট নামের প্রচলন ছিল না। তখন বলা হত মিশর। বর্তমানে ঈজিপ্টের শতকরা ৯১.৪৬ জন মুসলমান, বাকী খ্রীষ্টান ও ইহুদী ও অন্য ধর্মের লোক।

কিন্তু মিশরে আগে অন্য ধর্মের প্রচলন ছিল। মিশরীয়রা নানা দেবদেবীর উপাসনা করত, সেই সব দেবদেবীর মধ্যে প্রধান ছিলেন সূর্যদেবতা 'রি' বা 'রা'। তাঁর চেহারা ছিল অদ্ভুত।

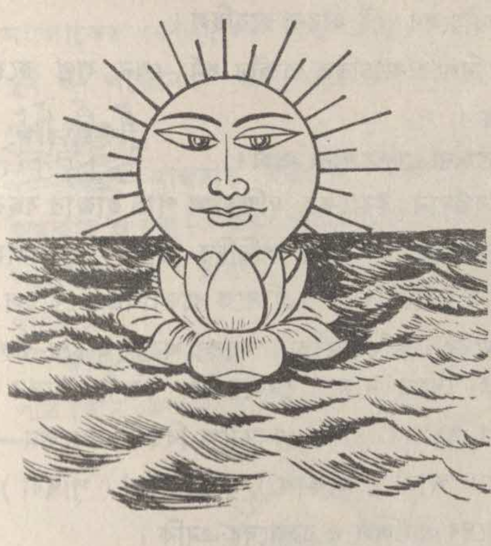


মিশরের দেবদেবী

সারা শরীর ছিল মানুষের মতো, কিন্তু মাথা ছিল বাজপাখির মতো। মাথায় থাকত একটি সাপ-জড়ানো গোল মুকুট।

ক্রমশঃ 'রা'-র নামের পরিবর্তন হতে থাকে। প্রথমে হয় আমন (Ammon), তার পরে আটন (Aton) ইত্যাদি।

সেকালের মিশরীয় শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে জানা যায়,



সমুদ্রে ভাসমান ফুল থেকে সূর্যদেবতার জন্ম

সৃষ্টির আদিতে এক বিশাল মহাসমুদ্রে একটি সুদৃশ্য ফুল ভাসতে থাকে। সেই ফুল থেকে সূর্যদেবতার জন্ম হয়। সূর্যদেবতার ছিল তিনটি ছেলে—শু (Shu), টেফনুট (Tefnut) ও নুট (Nut) এবং সেব (Seb) নামে একটি মেয়ে।

শু ও টেফনুট বায়ুমণ্ডল, নুট আকাশ এবং সেব পৃথিবী। সেবের ছিল দুই ছেলে ওসাইরিস (Osiris) ও সেট (Set) এবং দুই মেয়ে। মেয়েদের মধ্যে আইসিস হলেন ওসাইরিসের বউ।

সেবের ছেলে সেটের মুখ ছিল প্রকাণ্ড এক হাতির মতো। সেটের প্রকৃতি ছিল অতিশয় মন্দ। তিনি একরকম বিনা কারণে ওসাইরিসকে হত্যা করলেন। তখন আইসিস আনুবিস (Anubis) নামে দেবতার কাছে নালিশ জানালেন। আনুবিসের মুখ শিয়ালের মতো। আনুবিস ও আইসিস দুজনে নানা মন্ত্র আবৃত্তি করে ও মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে ওসাইরিসকে বাঁচিয়ে দিলেন।

ওসাইরিস প্রাণ পেয়ে নিজের স্থানে ফিরে গেলেন না। তিনি পাতালের রাজা হয়ে সেখানেই থেকে গেলেন।



ওসাইরিস

আইসিসের এক পুত্র হল। তার নাম হোরাস (Horus)। হোরাসের মাথাও ছিল বাজপাখির মতো, তিনিও ছিলেন সূর্যদেবতা। তিনি পিতার শত্রু সেটকে বিতাড়িত করে পৃথিবীর রাজা হলেন।

সেট তখন জ্ঞানের দেবতা থথ (Thoth)-এর কাছে নালিশ করলেন। থথের মুখ ছিল সারস-পাখির মতো। থথ বললেন, হোরাস ওসাইরিসের পুত্র। তাঁর রাজা হবার অধিকার ন্যায়সংগত। তখন সেটকে সে কথা মেনে নিতে হল।

এই ধরনের নানা কথা নিয়ে মিশরীয় পুরাণ। অন্যান্য দেশের মতো মিশরীয় পুরাণ বা ধর্মশাস্ত্র আজও ঈজিপ্টের লোকে সযত্নে পাঠ করে থাকে।

মিশরীয়রা বিশ্বাস করতেন, আত্মাই সব। মানুষের মৃত্যু হলে আত্মা নভোলোকে অবস্থান করে। পরে সময়মতো নবজাত মানুষের দেহে প্রবেশ করে বা আত্মা যে মৃতদেহ ত্যাগ করে চলে যায়, তাতে প্রবেশ করে। এই বিশ্বাসে মিশরীয়রা, বিশেষ করে রাজারাজড়ারা মারা গেলে তাঁদের মৃতদেহে নানা ধরনের মসলা মাখিয়ে মামি করত। সেই সব মামি মিশরের নানা কবরের মধ্যে পাওয়া গেছে।

কবরের মধ্যে সকল রকম উপকরণসহ তুতেন-খামেনের মামি রেখে দেওয়া হয়েছিল। একদিন মৃতদেহে তাঁর আত্মা প্রবেশ করলে তুতেনখামেন



মামি

বেঁচে উঠে সেই সব দ্রব্য ব্যবহার করতে পারবেন, মিশরীয়দের এই ধারণা হয়েছিল।

মিশরে আচরিত প্রাচীন ধর্ম এখন লুপ্ত হয়ে গেছে।



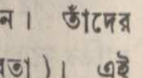
॥ সুমের দেশের ধর্ম ॥

বর্তমান ইরাকের দক্ষিণাংশ পাঁচ হাজার বছর আগে 'সুমের' নামে পরিচিত ছিল। সুমেরীয় সভ্যতা ক্রীট, মিশর ও গ্রীসকে প্রভাবিত করেছিল। সুমেরের অধিবাসীরা আকাশের সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্র দেখে নানা দেবদেবীর কল্পনা করেন। তাঁরা প্রধানতঃ চারটি দেবতাকে বিশ্বাস করতেন—পিতা 'আন' (আকাশ), মাতা 'কি' (পৃথিবী), পবনদেব এনলিল ও বরুণদেব এন্‌কি।

সুমেরীয়দের ধারণা, এই দেবতারাই মানুষ সৃষ্টি করেছেন। বিভিন্ন মন্দিরে এই সব দেবতার উপাসনা করাকেই সুমেরীয়রা ধর্ম বলে মনে করত।

পরে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় ব্যাবিলনিয়া বলে এক দেশ গড়ে ওঠে। ব্যাবিলন ছিল সেই দেশের রাজধানী।

সেই সময়ে ইরাকের নাম ছিল মেসোপটে-মিয়া। ইরাকের রাজধানী বাগদাদের ৬০ মাইল দক্ষিণে ব্যাবিলন অবস্থিত ছিল। ব্যাবিলনবাসীরা নানা দেবদেবীর উপাসনা করতেন। তাঁদের প্রধান দেবতা ছিলেন বেল (সূর্যদেবতা)। এই বেল পরে মার্ডুক নামে পরিচিত হন। ব্যাবিল-নিয়ার যুদ্ধদেবীর নাম ছিল 'ঈশতার্'। এই দেবীর মন্দিরে উপাসনা না করে ব্যাবিলনিয়ার অধিবাসীরা যুদ্ধে যেতেন না।



॥ জরথুস্ট্র ॥

এখন যে দেশের নাম ইরান আগে তার নাম ছিল পারস্য। এই পারস্যে প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০ অব্দে জরথুস্ট্র (জোরোয়াস্তার) নামে এক মহা-পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বর

এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর নাম অহুর মাজদা। তিনি আলোকের দেবতা, সব কিছু ভালোর দেবতা। সূর্য ও আগুনের রূপ ধরে তিনি আমাদের দেখা দেন।

অহুর মাজদার শত্রু আহ্‌রিমান। তিনি অন্ধকার ও মন্দ। অহুর মাজদার উপাসনা করলে আহ্‌রিমানের দ্বারা কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে না।

জরথুস্ট্রের রচিত ধর্মগ্রন্থের নাম আবেস্তা। পরে তিনি জেন্দ নামে গ্রন্থ রচনা করেন।



জরথুস্ট্র

ইসলামের প্রভাবে পড়ে জরথুস্ট্রের অনুগামীরা সবাই মুসলমান হয়ে যান। কিছুসংখ্যক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করে ভারতে চলে-আসেন। তাঁদের বলা হয় পার্শী। মহারাষ্ট্র ও গুজরাটেই তাঁদের অধিকাংশের বাস। তাঁরা ভারতে এলেও জরথুস্ট্রের ধর্মমতই মেনে চলেন।

পার্শীদের উপাসনালয়ে সকল সময়ে আগুন জ্বলে। পার্শীরা মৃতদেহকে কবর দেয় না বা দাহ করে না। একটা উঁচু টাওয়ারের উপর মৃতদেহ রেখে দেয়। শকুনেরা এসে সেই মৃতদেহ ভক্ষণ করে।

পার্শীদের উপাসনাগারের পুরোহিতকে দস্তুর বলা হয়। পার্শীদের সংখ্যা মাত্র লাখ দুয়েক।

॥ গ্রীস ও রোমের ধর্ম ॥

গ্রীস অতি প্রাচীনকালের সভ্য দেশ। গ্রীসের লোকেরা সেকালে নানা দেবদেবীর উপাসনা করতেন। ভারতে যেমন হিমালয় পর্বতে দেবদেবীদের বাস বলে কল্পনা করা হয়, গ্রীসের লোকেরা তেমনই কল্পনা করতেন যে, ওলিম্পাস পর্বতে দেবতাদের বাস।



দেবতাদের রাজা ছিলেন জীউস (Zeus)। তাঁর রানীর নাম ছিল হেরা (Hera)। জীউসের



পসাইডন

ভাই পসাইডন (Poseidon) ছিলেন সমুদ্রের রাজা। অন্য ভাই অন্ধকার রাজ্য পাতালের রাজা হেডিস (Hades)।

জীউসের পিতার নাম ক্রোনস (শনিদেবতা —Saturn)। ক্রোনসের পিতা উরানস (স্বর্গ), মাতা গোয়া (পৃথিবী)। ক্রোনস তাঁর পিতাকে বিতাড়িত করে স্বর্গের রাজা হন। তাই তাঁর সব সময়ে ভয় ছিল, তাঁর ছেলে বড় হয়ে তাঁকে স্বর্গচ্যুত করবে। সেই কারণে তিনি জন্মের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের প্রাণনাশ করতেন। কিন্তু পত্নী এক মেয়ে হেরা ও তিন ছেলেকে লুকিয়ে রেখে তাদের প্রাণ রক্ষা করেন।

সেই ছেলেদের একজনের নাম জীউস। এই জীউস বড় হয়ে ক্রোনসকে তাড়িয়ে দিয়ে স্বর্গ ও মর্ত্যের রাজা হলেন। জীউসের অস্ত্র ছিল বজ্র।

হেডিস বিয়ে করতে চাইলেন। বিয়ের কোন পাত্রী পাওয়া গেল না। কোন মেয়েই অন্ধকার রাজ্য পাতালের রাজাকে বিয়ে করতে চাইলেন না।

তখন বাধ্য হয়ে হেডিস শস্যের দেবী ডিমিটার (Demeter)-এর কন্যা প্রসারপাইন (Proserpine) বা পারসিফোনি (Persephone)-কে চুরি করে নিয়ে গেলেন।

কন্যার শোকে ডিমিটার চারিদিকে ছুটাছুটি করতে লাগলেন। ফলে পৃথিবীতে শস্যের ফলন বন্ধ হয়ে গেল। তখন দেবতারা হেডিসকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছ'মাস প্রসারপাইনকে মায়ের কাছে, ছ'মাস হেডিসের কাছে থাকার ব্যবস্থা করলেন। যে ছমাস প্রসারপাইন মার কাছে থাকেন তখন বসুন্ধরা হয় শস্যপূর্ণা। প্রসারপাইন পাতালে চলে গেলে পৃথিবীতে শস্য জন্মে না। গ্রীক পুরাণে এই ধরনের অনেক কথা লেখা আছে।

যে কজন দেবদেবীর কথা বলা হল তা ছাড়া গ্রীকদের আরও বহু দেবদেবী ছিলেন। যেমন, শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞানের দেবী এথেনী (Athene)। সূর্যদেব অ্যাপলো (Apollo) বা ফীবাস। ডেলফি শহরে অ্যাপলো দেবের মন্দির ছিল। ওলিম্পিয়ায় ছিল জীউসের মন্দির। অ্যাপলোর যমজ বোন চন্দ্রের দেবী আর্টেমিস (Artemis)। পসাইডনের ছেলের নাম ওরাইয়ন (Orion)।

গ্রীসের দেবদেবীরা রোমে ভিন্ন নামে পূজিত হতেন। রোমে জীউসের নাম ছিল জুপিটার, হেরার নাম ছিল জুনো। ক্রোনসকে বলা হত স্যাটার্ন। পসাইডনের নাম ছিল নেপচুন। হেডিসকে বলা হত প্লুটো। প্যালাস-এথেনীর নাম ছিল মিনার্ভা, আর্টেমিসের নাম ছিল ডায়েনা।

বর্তমানে অবশ্য গ্রীসে প্রাচীনকালের আচরিত ধর্মের অস্তিত্ব নেই। এখন গ্রীসের অধিকাংশই খ্রীষ্টান। গ্রীসে শতকরা ৯৮ জন খ্রীষ্টান।

রোম সাম্রাজ্যও বর্তমানে নেই, রোম বলে কোন দেশও নেই। রোম এখন বর্তমানে ইটালীর রাজধানী। ইটালীর অধিবাসীরা অধিকাংশই খ্রীষ্টান।

বর্তমানে দুই স্থানের ধর্ম যাই-ই হোক না কেন, গ্রীসে ও রোমে প্রাচীন পুরাণ ও পৌরাণিক কাহিনী পুরোপুরি প্রচলিত।

॥ নরওয়ের পৌরাণিক কাহিনী ॥



নরওয়ে ইউরোপের উত্তরাংশের একটি দেশ। বর্তমানে নরওয়ের অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী।

প্রাচীনকালে নরওয়েবাসীরা নানা দেবদেবীর পূজা করত। নরওয়ের পুরাণে বলে, দেবতারা থাকেন আস্‌গার্ড-নামক স্থানে। এই আস্‌গার্ড স্বর্গতুল্য। আস্‌গার্ডের রাজার নাম ওডিন (Odin) ও রানীর নাম ফ্রিয়া (Freya)। তাঁদের বহু পুত্রের মধ্যে থর খুব বলবান্‌ ছিলেন। তাঁর অস্ত্র ছিল একটা প্রকাণ্ড হাতুড়ি।

ওডিনের এক ছেলের নাম বল্ডার (Balder), তাঁর যমজ ভাই হোডার ছিলেন অন্ধ। লোকি



থর

নামে এক দুষ্ট দেবতা অন্ধ হোডারকে দিয়ে মিস্ল্‌টো (misletoe বা mistletoe)-র ডাঁটা বল্ডারের গায়ে ছুড়ে মারার ব্যবস্থা করেন। ফলে যে বল্ডারকে স্বর্গমর্ত্যের সবাই খুব ভালবাসত তাঁর মৃত্যু ঘটল। বল্ডারের মৃতদেহ একটা ভাসমান জাহাজের উপর রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হল।

এমনই সব নানা কাহিনীতে পূর্ণ নরওয়ের পুরাণ।

শুধু নরওয়ে কেন, চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড (শ্যামদেশ), কোরিয়া, ফিনল্যাণ্ড, স্পেন, পোর্তুগাল, মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নানা উপাখ্যানে ভরা আছে সে-সব দেশের পুরাণ। বর্তমানে সে-সব দেশে প্রাচীন কালের ধর্মরীতি পালিত হয় না কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী শহরে গ্রামে ছড়িয়ে আছে।



॥ বৌদ্ধ ধর্ম ॥

হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু (কপিলবাস্তু) নগরের কাছে লুম্বিনী (বর্তমান নেপালের অন্তর্গত রুম্মিনদেঈ) গ্রামে গৌতম বুদ্ধ (খ্রীষ্টপূর্ব ৫৬৮—৪৮৮ অব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শুদ্ধোদন। মাতা মায়াদেবী। গৌতম বুদ্ধের বাল্যনাম সিদ্ধার্থ, গৌতম ও শাক্যসিংহ। তিনি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের দুঃখ-কষ্ট-মৃত্যুর চিন্তায় বিভোর হন।

পিতা তাঁকে সংসারী করবার জন্যে যশোধরা



বুদ্ধদেবের স্বর্ণমূর্তি

নামে এক তরুণীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিলেন। রাহুল বলে তাঁর একটি সন্তানও হল। কিন্তু তিনি সংসারে রইলেন না। ২৯ বৎসর বয়সে তপস্যা করতে বনে চলে গেলেন। নিরঞ্জনা নদীর ধারে ঘোর তপস্যা করতে করতে অনশনে তাঁর শরীর কৃশ ও দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সুজাতা নাম্নী এক গৃহস্থবধূর পায়েস খেয়ে তিনি সুস্থ হলেন ও পুনরায় তপস্যায় বসলেন। পরে তিনি 'বোধি' বৃক্ষের তলায় পরম জ্ঞান লাভ করেন। সেই বৃক্ষের নাম বোধিদ্রুম। গাছটির চারা বুদ্ধগয়ায় এখনও আছে।

পরম জ্ঞান লাভের পর তাঁর নাম হল বুদ্ধ।



বুদ্ধের বিরাট প্রতিমূর্তি
(The Great Buddha)

তিনি কাশীর কাছে সারনাথে এক নূতন ধর্মের কথা প্রচার করলেন। সেই ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম বা সদ্ধর্ম।

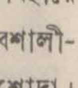
বৌদ্ধধর্মে ঈশ্বরের উপাসনার কথা বলা হয় নি। বুদ্ধের মতে জীবে দয়া ও অহিংসা পরম ধর্ম। কামনা বাসনা ত্যাগ করতে পারলে নির্বাণ লাভ হয় অর্থাৎ আর জন্মগ্রহণ করতে হয় না।

বৌদ্ধধর্মের তিনটি কথা—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি, সংঘং শরণং গচ্ছামি, ধর্মং শরণং গচ্ছামি।

বুদ্ধদেব আশি বৎসর বয়সে সারনাথে দেহত্যাগ করেন। তাঁর মহানির্বাণের পর বৌদ্ধরা দুটো দলে বিভক্ত হয়ে যান—হীনযান ও মহাযান। পরে বজ্রযান নামেও একটা দলের সৃষ্টি হয়।

ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি হলেও এখানে বৌদ্ধের সংখ্যা ৪০ লক্ষের বেশী নয়। চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ, কাম্পুচিয়া এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশে প্রায় ২৫ কোটি বৌদ্ধের বাস।

॥ জৈনধর্ম ॥

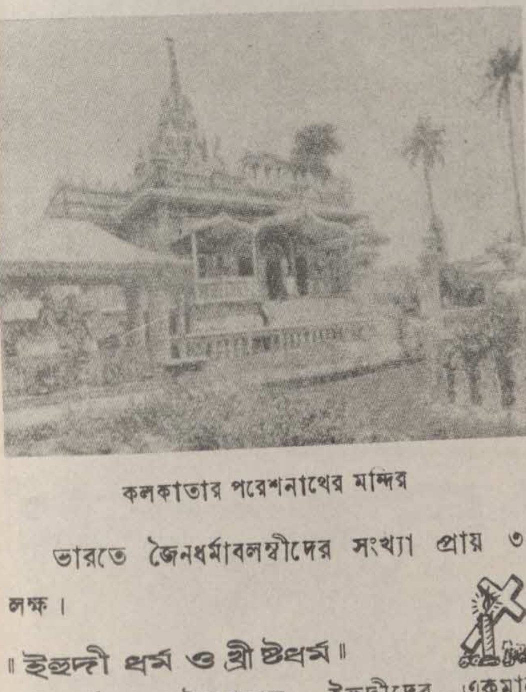


ভগবান্ বুদ্ধের সময়ে ভারতবর্ষে আর একজন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নাম মহাবীর। তিনি জৈনধর্মের সর্বশেষ বা চতুর্বিংশ তীর্থংকর। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল বর্ধমান। উত্তর বিহারে (বর্তমান মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত) বৈশালী-নগরে জন্মলাভ করেন। তাঁর পত্নীর নাম যশোদা। তাঁর একটি কন্যাও জন্মেছিল। তিনি ত্রিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি জিন (বা রিপুজয়ী) এবং নির্গ্রন্থ (বা সংসারবন্ধনবিমুক্ত) নামে পরিচিত হন।

২৩শ তীর্থংকর পার্শ্বনাথই (পরেশনাথই) প্রকৃত জৈনধর্মের প্রবর্তক। মহাবীর সেই ধর্মকে ব্যাপকভাবে চালু করেন।

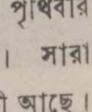
জৈনধর্মের মূলকথা অহিংসা ও জীবে দয়া। জৈনরা জীবকে হত্যা তো দূরের কথা কোনরকম কষ্ট দেওয়ার বিরোধী।

কলকাতায় তিন/চার জায়গায় পরেশনাথের মন্দির আছে। আর আছে রাঁচীতে, হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পাহাড়ে, আবু পাহাড়ে। এ ছাড়া ভারতের নানাস্থানে পর্বতের উপর পরেশনাথের মন্দির আছে।



কলকাতার পরেশনাথের মন্দির

ভারতে জৈনধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষ।



॥ ইহুদী ধর্ম ও খ্রীষ্টধর্ম ॥

বর্তমানে ইজরায়েল ইহুদীদের একমাত্র নিজস্ব দেশ। কিন্তু আগে সারা পৃথিবীতে তারা ছড়িয়ে ছিল। অবশ্য ইজরায়েল ছাড়াও পৃথিবীর নানা দেশে এখনও বহু ইহুদী আছে। সারা পৃথিবীতে বর্তমানে ২ কোটির উপর ইহুদী আছে। তন্মধ্যে ইজরায়েলে আছে প্রায় ৪০ লক্ষ।

বাইবেলের গোড়ার দিকের নাম ওল্ড টেস্টামেন্ট (Old Testament)। তাতে ইহুদীদের ইতিহাস বিবৃত আছে।

প্রায় ৪ হাজার বছর আগে সুমের দেশের উর শহরে আব্রাম নামে এক ইহুদী ছিলেন। তিনি ঈশ্বরের নির্দেশে কানান (বর্তমানের প্যালেস্টাইন)-নামক জায়গায় চলে যান। এই সময়ে আব্রাম নিজের নামের পরিবর্তন করে 'আব্রাহাম' রাখেন।

আব্রাহাম ঈশ্বরকে বলতেন 'যিহোবা'। আব্রাহাম বলতেন, ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়, তিনি নিরাকার, তাই ইহুদীদের মন্দিরে কোন মূর্তিপূজা হয় না। শুধু যিহোবার উপাসনা হয়।

ইহুদীরা মূর্তিপূজা প্রভৃতি অন্যায় কাজ করলে যিহোবা ক্রুদ্ধ হলেন। তখন ইহুদীরা ছিলেন মিশরে। মহাপুরুষ মোজেস বা মুশার প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে যিহোবা ইহুদীদের কানানে ফিরে যেতে বলেন।

যিহোবার প্রেরিত দেবদূত ইহুদীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। লোহিত সাগর দুভাগ হয়ে পথের সৃষ্টি হল। ইহুদীরা সেই পথে কানানের দিকে যাত্রা করলেন।

যিহোবা দশটি আদেশ (Ten Commandments) পাহাড়ের গায়ে বিদ্যুতের অক্ষরে লিখে মূশাকে দিলেন। সেই আদেশই ইহুদীদের ধর্মের মূল কথা।

ইহুদী ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থের নাম তালমুদ। তাতে যিহোবার নানা উপদেশ লিখিত আছে।

ইহুদীদের মধ্যে যে মহাপুরুষ নানা সুন্দর উপদেশ নিয়ে মনুষ্যজাতিকে ত্রাণ করতে এলেন, তাঁর নাম ইশা। এই ইশাই যীশুখ্রীষ্ট।

যীশুখ্রীষ্ট কুমারী মেরীর সন্তান। কানান দেশের বেথেলহেম নগরে এক আস্তাবলে তাঁর জন্ম হয়। যীশুর পালক পিতার নাম যোসেফ। তিনি ছিলেন একজন ছুতোর মিস্ত্রী।

যীশু ইহুদী হলেও ইহুদীদের মধ্যে যে-সব অনাচার দেখা দিয়েছিল, সে-সবের প্রতিবাদ জানালেন। তিনি ইহুদীদের সৎপথে চলতে বললেন, অপরাধকে ক্ষমা করতে বললেন, লোকের উপকার

করতে বললেন। তাঁর কথা ইহুদীদের ভালো লাগল না।

ছুটি চোরকে ছুটি কাঠের ক্রুশে বিঁধে যেখানে হত্যা করা হয়, যীশুকে সেই ছুটি কাঠের ক্রুশের



যীশুখ্রীষ্ট ও তাঁর শিষ্যগণ

যীশুর বারো জন শিষ্য ছিলেন। তাঁদের মধ্যে জুডাস ইসকেরিয়ট বলে একজন যীশুকে ধরিয়ে দিল। পন্টিয়াস পাইলেটের কাছে যীশুর বিচার হল। তাঁর অপরাধ, তিনি ইহুদীদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। বিচারে তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ দেওয়া হল।

মধ্যস্থলে আর একটা কাঠের ক্রুশে হাতে পায়ে পেরেক বিঁধে ঝুলিয়ে দেওয়া হল। সেই অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল। এমনভাবে হত্যা করা হলেও তিনি শত্রুদের ক্ষমা করেছিলেন। তাঁর বয়স তখন মাত্র ৩৩ বৎসর।

সেন্ট পল ছিলেন যীশুর প্রধান শিষ্য। তিনি

বাইবেলের শেষ অংশের নাম নিউ টেস্টামেন্ট (**New Testament**)। তাতে যীশু খ্রীষ্টের জীবন-কথা ও নানা উপদেশ লিখিত আছে।



আস্তাবলে নবজাত যীশু

যীশুর কাছে দীক্ষা নেন।



ক্রুশবিদ্ধ যীশু



মার্টিন লুথার

বর্তমানে খ্রীষ্টধর্ম তিনটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত—রোমান ক্যাথলিক, প্রোটেস্ট্যাণ্ট ও ঈস্টার্ন চার্চ।



সেণ্ট পল'স চার্চ

রোমের ভ্যাটিক্যান প্রাসাদে বাসকারী মহামান্য পোপ পৃথিবীর সকল রোমান ক্যাথলিকের গুরু।

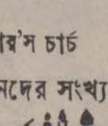
মার্টিন লুথার (Martin Luther, ১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রী.) পোপের অধীনতা স্বীকার না করে ১৫১৭ খ্রী. প্রোটেস্ট্যান্ট দল গঠন করেন।

পৃথিবীর সকল দেশেই খ্রীষ্টান আছেন। ইউরোপে, আমেরিকায়, কানাডায়, অস্ট্রেলিয়ায় এবং প্রায় সর্বত্র খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী বিদ্যমান।



সেন্ট পিটার'স চার্চ

বর্তমানে পৃথিবীতে খ্রীষ্টানদের সংখ্যা ১০০ কোটির উপর।



॥ ইসলাম ধর্ম ॥

প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম ইহুদী, খ্রীষ্টান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের তীর্থস্থান।

প্যালেস্টাইনের পাশেই আরব দেশ। আরবের রাজধানী মক্কা শহরে এক মহাপুরুষের জন্ম হয়। তাঁর নাম হজরত মোহাম্মদ। তিনি আরববাসীদের মধ্যে এক নুতন ধর্মমত প্রচার করলেন, তার নাম ইসলাম।

মোহাম্মদ বল্লেন, আল্লাহ্ (অর্থাৎ ঈশ্বর) একজন। তিনি সেই আল্লাহ্‌র প্রেরিত পয়গম্বর (দূত)।

মোহাম্মদ বহু যুদ্ধ, মারামারির মধ্য দিয়ে তাঁর ইসলাম ধর্ম প্রচার করলেন। ইসলাম ধর্মের গ্রন্থের নাম কুরান বা কোরান। তাতে আল্লাহ্‌র বাণী লিখিত আছে।

মোহাম্মদ মদিনায় দেহত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দামাস্কাসের রাজা এজিদ হজরত মোহাম্মদের মেয়ের বড় ছেলেকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করেন এবং ছোট ছেলেকে কারবালা প্রান্তরে নিয়ে গিয়ে জল খেতে না দিয়ে দলবলসহ প্রাণনাশ করেন। এই শোচনীয় ঘটনা স্মরণ করে শোকের উৎসব মহরম পালিত হয়।

মুসলমানদের দুটি প্রধান দল—শিয়া ও সুন্নী। দুই দলের মধ্যে ঝগড়া লেগেই আছে। এই দুটি দল ছাড়া আরও অনেক প্রকার দলে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা বিভক্ত।

বর্তমানে ইসলাম পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রধান ধর্ম। লোকসংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি।

॥ কনফুসি ধর্ম ॥

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে চীনে কংফুৎজি (Kung-fu-tze) বা কনফুসি (ইউরোপীয়েরা বলেন, কনফুসিয়াস, Confucius, ৫৫১-৪৭৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বলে এক জ্ঞানী পুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম কনফুসি। এই ধর্মে ঈশ্বরোপাসনা নেই, দেবদেবীর কথা নেই। কনফুসি ধর্মে সদাচার, ভাল ব্যবহার, পরোপকার প্রভৃতির কথা বলা হয়েছে।



কনফুসিয়াস

বর্তমানে চীনে কনফুসির সংখ্যা প্রায় ৪০ কোটি। তবে বহু কনফুসি বৌদ্ধধর্মও মানেন।

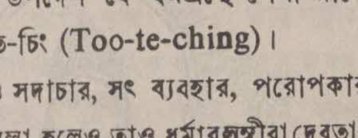
॥ লাওৎজু ॥

চীনের আর একটি প্রধান ধর্ম তাও ধর্ম। এই ধর্মের কথা প্রথম যিনি প্রচার করেন তাঁর নাম লাওৎসে বা লাওৎজু (Lao-tz›, আবির্ভাবকাল ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)।

লাওৎজুর উপদেশ যে ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে তার নাম তূ-তে-চিং (Too-te-ching)।

তাও ধর্মেও সদাচার, সৎ ব্যবহার, পরোপকার প্রভৃতির কথা বলা হলেও তাও ধর্মাবলম্বীরা দেবতা-উপদেবতাদের উপাসনা করেন, জাদুবিদ্যা, মন্ত্রতন্ত্র প্রয়োগ প্রভৃতি নিয়ে কাল কাটান। অনেক তাও ধর্মাবলম্বী বৌদ্ধধর্মকে অনুসরণ করে থাকেন।

বর্তমানে পৃথিবীতে তাও ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা পাঁচ কোটির উপর।



॥ শিখ ধর্ম ॥

লাহোরের নিকটবর্তী তালবন্দী (আধুনিক নাম নানকানা) গ্রামে এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁর নাম নানক (১৪৬০-১৫৩১ খ্রী.।) তিনি ২৭ বৎসর বয়সে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হন। তিনি যে ধর্ম প্রচার করেন তার নাম শিখ ধর্ম। সদ্‌গুরুর উপদেশ অবলম্বনই শিখ ধর্মের প্রধান



নানক

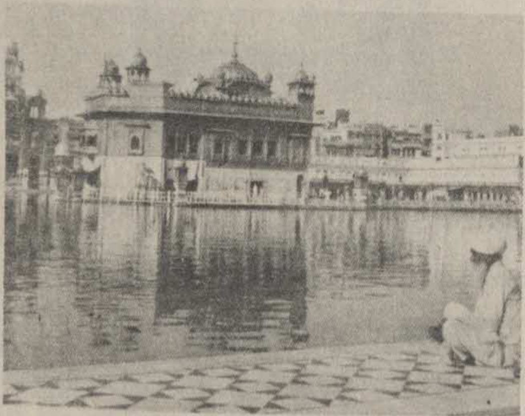
নীতি। শিখ ধর্মে বলে, ঈশ্বর এক। পরস্পরকে ভালবেসে সকলের শান্তিতে বাস করা কর্তব্য।

শিখদের দশম ও শেষ গুরুর নাম গুরুগোবিন্দ সিংহ (১৬৬২-১৭০৮ খ্রী.)। তাঁর পিতা নবম গুরু



শিখ

তেগবাহাদুর সিংহ। গুরু গোবিন্দ পাটনায় জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি শিখদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা তুলে দিয়ে খালসা-প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি যে ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার নাম গ্রন্থসাহেব। মুসলমানদের আক্রমণ থেকে রক্ষালাভের জন্যে শিখেরা যুদ্ধপ্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁদের বড় চুল-দাড়ি, হাতে লোহার বালা, কোমরে কৃপাণ



অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির

থাকে। অমৃতসরে তাঁদের স্বর্ণমন্দির বিখ্যাত ভজনালয়। ভারতের নানাস্থানে বহু শিখ ধর্মোপাসনাগার গুরুদ্বার অবস্থিত।

॥ শিণ্টো ধর্ম ॥

জাপানের আদিম ধর্মের নাম শিণ্টো ধর্ম। এই ধর্মের প্রধান উপাস্য দেবতা সূর্য। এক সময়ে সারা জাপানে এই ধর্মের ব্যাপক প্রচলন ছিল। বর্তমানে জাপানে বৌদ্ধ ধর্মেরই প্রচলন বেশী। অধিকাংশ জাপানীই বৌদ্ধ। জাপানে বহু বৌদ্ধ মন্দির অবস্থিত।

॥ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ॥

হিন্দুদের তিনজন প্রধান দেবতা—ব্রহ্মা, বিষ্ণু



ব্রহ্মা



বিষ্ণু



মহেশ্বর

ও মহেশ্বর। ব্রহ্মা সৃষ্টির দেবতা, বিষ্ণু সৃষ্টিরক্ষক ও মহেশ্বর সৃষ্টিনাশক।

॥ নানা দেবদেবী ॥

হিন্দুদের তিনজন প্রধান দেবতা ছাড়া দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি বহু দেবদেবী আছেন। অমরাবতী অর্থাৎ স্বর্গের রাজা ইন্দ্র। তাঁর পত্নীর নাম শচী। পুত্র জয়ন্ত। ইন্দ্রকে দানবদের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করতে হয়েছে। হিন্দুরা অগ্নি, পবন, বরুণ প্রভৃতি বহু দেবতার পূজা করেন। কিন্তু আসলে হিন্দুধর্মাবলম্বীরা এক ও অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী।

॥ হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে নানা কথা ॥

হিন্দুরা জন্মান্তরে বিশ্বাসী। তাঁরা বলেন, জীবাত্মা পরমাত্মার অংশ। জীবের মৃত্যুর পর জীবাত্মা এক দেহ থেকে অন্য দেহে প্রবেশ করে।

কপিল মুনির সাংখ্যসূত্রে ভগবানের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় নি। বেদান্তসূত্রে ভগবান্‌কে একমেবাদ্বিতীয়ম্ বলা হয়েছে।

॥ দশ অবতার ॥

হিন্দু ধর্মে বিষ্ণুর অবতার দশজন—মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রামচন্দ্র, বলরাম, বুদ্ধ ও কল্কী। কল্কী অবতার এখনও আবির্ভূত হন নি।

শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ অবতার বলা হয়েছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা পাঠে জানা যায়, তিনি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন।

॥ গীতা ॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা (সংক্ষেপে গীতা) হিন্দুদের এক পরম ধর্মগ্রন্থ। উপনিষদের মতো গীতা হিন্দুদের দ্বারা বিশেষরূপে আদৃত হয়ে থাকে। সারা পৃথিবীর ধর্মপিপাসুরা উপনিষদ্ ও গীতা পরম আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করে থাকেন।

॥ শংকরাচার্য ॥

ভারতে যুগ যুগ ধরে বহু মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়েছে। বিখ্যাত শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শংকরাচার্য (৭৮৮-৮২০ খ্রী.) তন্মধ্যে একজন। দাক্ষিণাত্যের মালাবার অঞ্চলে কালাদি-নামক স্থানে তিনি



শংকরাচার্য

জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অপরাজেয় তার্কিক ও

তীক্ষ্ণ মেধাবী বৈদান্তিক পণ্ডিত ছিলেন। তাঁকে অনেকে শিবের অবতার বলে মনে করেন। তাঁর চেষ্টায় ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হয়। তিনি



শংকরাচার্যের প্রস্তরমূর্তি

পুরী, যোশীমঠ, দ্বারকা ও শৃঙ্গেরী-নামক স্থানে চারটি মঠ স্থাপন করেন। তিনি মহাযোগী ছিলেন।

॥ রামানুজ ॥

দাক্ষিণাত্যের চোল রাজ্যে পরম্বদূর গ্রামে ১১শ শতকে মহাপুরুষ রামানুজের আবির্ভাব হয়। তিনি বৈষ্ণবধর্মের, বিশেষ করে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক।

প্রসিদ্ধ বিষ্ণুভক্ত রামানন্দ (১৪শ শতক) রামানুজের অনুগামী। ভক্তমাল -গ্রন্থে তাঁর কথা লেখা আছে।

॥ কবীর ॥

রামানন্দের প্রধান অনুগামী কবীর (১৫শ শতক)। মুসলমানের ঘরে তাঁর জন্ম হয়। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই তাঁর উপর প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তাঁর শিষ্যদের বলে কবীরপন্থী। কবীরের প্রণীত দোহাগুলি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী।



॥ চৈতন্যদেব ॥

চৈতন্যদেব (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রী.) আধুনিক প্রেম-ভক্তিমূলক বৈষ্ণবমতের প্রবর্তক। নবদ্বীপে তাঁর আবির্ভাব হয়। তাঁর মাতার নাম শচী দেবী, পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র।

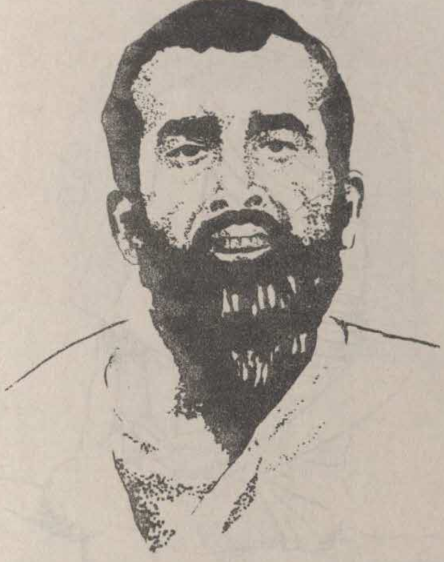


চৈতন্যদেব

নিমাই, গৌরাঙ্গ, বিশ্বম্ভর প্রভৃতি নানা নামে তিনি খ্যাত। তিনি ঈশ্বরপুরীর নিকট দীক্ষা নেন ও দণ্ডী কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে নীলাচলে গমন করেন। কাশীধাম, বৃন্দাবন প্রভৃতি নানাস্থানে তিনি তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। পুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

॥ নানা মহাপুরুষ ॥

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস (১৮৩৫-১৮৮৬ খ্রী.),



শ্রীরামকৃষ্ণ



বিবেকানন্দ



ত্রৈলঙ্গস্বামী

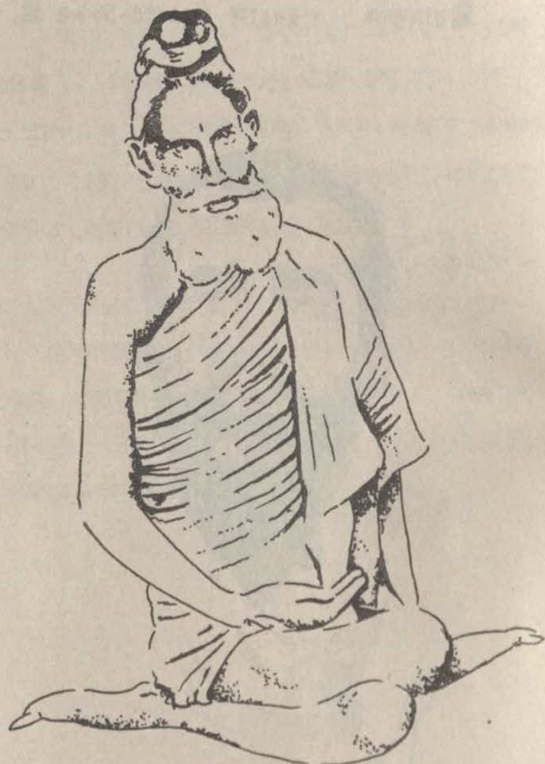
তাঁর প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রী.), ত্রৈলঙ্গস্বামী বা তৈলঙ্গস্বামী (১৬০৭-১৮৮৭ খ্রী.)



বামাক্ষেপা



প্রণবানন্দ



লোকনাথ ব্রহ্মচারী



রামপ্রসাদ

ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দ (১৮৯৬-১৯৪০ খ্রী.), বামা ক্ষেপা (১২৪১-১৩১৮ বঙ্গাব্দ), লোকনাথ ব্রহ্মচারী (বারদীর ব্রহ্মচারী, ১৭৩০-১৮৯০ খ্রী.), বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী (১৮৪১-১৮৯১ খ্রী.), শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী (সমর্থ রামদাস, ১৬০৮-১৬৮১ খ্রী.), কাঠিয়া বাবা (দেহত্যাগ ১৩১৬ বঙ্গাব্দে), কাঙাল হরিনাথ (১৮৩৩-১৮৯৬ খ্রী.), পওহারী বাবা (১৮৪০-১৮৯৮ খ্রী.), রামপ্রসাদ সেন (১৭২৩-১,৭৭৫ খ্রী.), স্বামী নিগমানন্দ (১২৮৬-১৩৪৬ বঙ্গাব্দ), আনন্দময়ী মা (১৩০৩-১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ ঠাকুর প্রভৃতি অসংখ্য মহাপুরুষের আবির্ভাবস্থান এই ভারতবর্ষ।



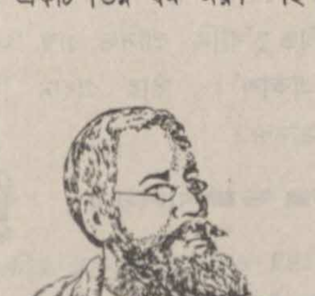
আনন্দময়ী মা



স্বামী নিগমানন্দ

॥ ব্রাহ্ম ধর্ম ॥

ব্রাহ্মধর্ম একটি ভিন্ন ধর্ম নয়। হিন্দুধর্মেরই এক অঙ্গ। তবে এই ধর্মের লোকেরা ব্রহ্মের উপাসনা করেন, হিন্দুদের মতো নানা দেবদেবীর উপাসনা করেন না, জাতিভেদ প্রথা মানেন না।



মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ



কেশবচন্দ্র সেন

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রী.) ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০০ খ্রী.) ব্রাহ্মসমাজ ও ব্রাহ্মধর্মের সব নিয়ম ঠিক করে দেন। তাঁর ব্রাহ্মসমাজকে আদি ব্রাহ্মসমাজ বলা হয়।



রামমোহন রায়



শিবনাথ শাস্ত্রী

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮-১৮৮৪ খ্রী.) ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। পরে তিনি 'নববিধান ব্রাহ্মসমাজ' গঠন করেন।

আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬ খ্রী.), শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯ খ্রী.) প্রভৃতি ধর্ম-গুরুরা 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ আর্যসমাজ ॥

কাথিয়াবাড়ের বৈদিক ধর্ম-সংস্কারক সন্ন্যাসী



দয়ানন্দ

দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪-১৮৮৩ খ্রী. । প্রকৃত নাম মূলশংকর) আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রণীত দু'খানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ঋগ্বেদ-ভাষ্য' ও 'সত্যার্থ-প্রকাশ'। তাঁর প্রধান শিষ্যের নাম স্বামী শ্রদ্ধানন্দ।

॥ বিভিন্ন ভজনালয় ॥



হিন্দুদের ভজনালয়ের নাম মন্দির, খ্রীষ্টানদের গির্জা, ইহুদীদের সিনাগোগ (Synagogue), তিব্বতী বৌদ্ধদের গোম্ফা, শিখদের গুরুদ্বার। মুসলমানেরা মসজিদে 'আল্লাহ'র নিকট প্রার্থনা করেন।

পৃথিবীর ধর্মের কথা, মহাপুরুষদের কথা বলে শেষ করা যায় না।

॥ সর্বপ্রাণবাদ ॥

পৃথিবীর প্রথম ধর্ম বা আদিম ধর্মমত সর্বপ্রাণবাদ (animism)। আগুন, জল, বায়ু, আকাশ প্রভৃতির উপাসনার মধ্য দিয়ে এই ধর্মের প্রকাশ। পৃথিবীতে এই ধর্মমতের অনুগামীর সংখ্যা এখনও বহু কোটি।





দমকলের কথা

যে এঞ্জিনের দ্বারা দম অর্থাৎ চাপ বাতাসের সাহায্যে জল নিক্ষেপ বা বর্ষণ করে আগুন নেভানো হয় তাকে বলে দমকল (fire-engine)। তবে সাধারণতঃ জলনিক্ষেপের পাম্প ইত্যাদি সমেত গাড়ি ও সুশিক্ষিত কর্মীদের নিয়ে গঠিত দমকল-বাহিনী (fire-brigade)-কেও দমকল বলা হয়ে থাকে। তাই থেকে বলা হয় দমকলের গাড়ি, দমকলের লোক ইত্যাদি।

॥ শহরে দমকলবাহিনীর কার্যালয় ॥

দমকল বা দমকলবাহিনীর কাজ কোথাও আগুন লাগলে তা যথাসত্বর নিভিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা। প্রত্যেক উন্নত দেশের শহরাঞ্চলে নানা স্থানে দমকলবাহিনীর অফিস আছে। পল্লী অঞ্চলে প্রধানতঃ রাস্তাঘাটের অসুবিধার জন্যে দমকল-বাহিনী যেতে পারে না, সে-সব স্থানে দমকল-বাহিনীর কোন স্থায়ী কার্যালয়ও নেই।

॥ আগুন ব্যবহারের প্রারম্ভ ॥

আদিম যুগের মানুষ আগুন জ্বালতে জানত না। বহু পরে আগুন জ্বালাতে শিখে সে-যুগের লোকে কাঁচা মাংস ও সবজি খাওয়া ছেড়ে মাংসাদি আগুনে সেঁকে বা পুড়িয়ে খেতে আরম্ভ করল। তার পর থেকে যত দিন যেতে লাগল লোকে নানাভাবে আগুনের ব্যবহার করতে লাগল। রান্না করা থেকে আরম্ভ করে নানা ধরনের কাজ তারা আগুনের সাহায্যে করতে থাকল।

॥ ঘরবাড়িতে আগুন লাগা

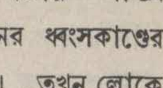
কারখানায় নানা শিল্প-দ্রব্য তৈরী হয়। এজন্যে আগুনের প্রয়োজন হয়। আলো জ্বালা ও

পাখা চালানোর জন্যে বিদ্যুতের দরকার। বিভিন্ন প্রয়োজনে আগুন জ্বালাতে বা বিদ্যুতের ব্যবহার করতে বাড়িঘরে আগুন লেগে যায়। যেখানে আগুন লাগে, সেই স্থান ছাড়িয়ে আশেপাশের বহু ঘরবাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভিয়ে ফেলতে না পারলে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়, মানুষের প্রাণহানি ঘটে, গৃহপালিত পশু মারা পড়ে।

॥ দমকলের সৃষ্টি ॥

লোকে তাদের সীমিত ক্ষমতায় আগুন নেভানোর চেষ্টা করে কিন্তু আগুনের ধ্বংসকাণ্ডের ভয়াবহতার সঙ্গে যুঝতে পারে না। তখন লোকে সংঘবদ্ধভাবে বৈজ্ঞানিক উপায়ে আগুন নেভাবার পথ বার করে। তাই থেকে দমকল বা দমকলবাহিনীর সৃষ্টি।

॥ টেলিফোনের সাহায্যে আগুন লাগার খবর জানানো ॥



৭০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইংল্যাণ্ডে পাম্পের সাহায্যে আগুন নেভানোর চেষ্টা শুরু হয়। প্রথম প্রথম আগুন নেভানোর জন্যে জলনিক্ষেপক পাম্পের তেমন সুব্যবস্থা হয় নি, শিক্ষিত কর্মীর সংখ্যাও ছিল কম। যত দিন যেতে থাকল, নানা দেশে নানাভাবে দমকল বা দমকলবাহিনীর উন্নতি ঘটতে থাকল। আগেকার দিনে কোথাও আগুন লাগলে ঘোড়ার গাড়িতে দমকলের লোকেরা যন্ত্রপাতি নিয়ে ছুটে যেত। তার ফলে দূরের জায়গায় যেতে বেশ দেরি হয়ে যেত। ততক্ষণে আগুনের ধ্বংসলীলায় বাড়িঘর সব বিনষ্ট হয়ে যেত। বর্তমানে দ্রুতগামী মোটরগাড়িতে করে দমকলের লোকেরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। আগে আগুন লাগার খবর দমকলের কার্যালয়ে বেশ দেরিতে এসে পৌছত। আজকাল সংবাদ পৌঁছতে দেরি হয় না। প্রথম প্রথম রাস্তার মোড়ে মোড়ে একটা লাল খাম্বা থাকত, দেখতে কতকটা চিঠি ফেলার ডাকবাক্সের মতো। তার সামনে থাকত কাচের আবরণ। কোথাও আগুন লাগলে পাড়ার লোকেরা ছুটে এসে সেই কাচ ভেঙ্গে ভিতরের একটা হ্যাণ্ডেল ঘোরালেই দমকলের লোকেরা আগুন লাগার সংবাদ পেয়ে যেত। এখন সে ধরনের ব্যবস্থা উঠে গেছে। টেলিফোনে সংবাদ দিলেই দমকলবাহিনী অতি দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়।

আগেকার দিনে দমকলের কর্মীরা পথে পথে রাত্রে কোথায় আগুন লেগেছে, তার সন্ধান করে বেড়াত। আগুন লাগা দেখলে চীৎকার করে বা বাঁশি বাজিয়ে লোকজন জড় করে তুলত। দমকলের লোকেরা ছুটে এসে আগুন নেভাবার চেষ্টা করত। অবশ্য, রাতের অন্ধকারে বহুদূর থেকেই আগুনের শিখা ও ধূম দেখা যেত। তাই দেখে দমকলের লোকেরা সেইদিকে ছুটে যেতেন।

॥ নানা কারণে আগুন লাগা ॥

মানুষের অসাবধানতায় শুধু যে আগুন লাগে, তা নয়। বনের গাছে গাছে ঘর্ষণ লেগে দাবানলের সৃষ্টি হয়। সেই দাবানলে শুধু বনের গাছপালা পুড়ে ছারখার হয়ে যায় না, বনের মধ্যের বা পাশাপাশি অঞ্চলের বাড়িঘরও আগুনে ধ্বংস হয়ে যায়। অনেক সময়ে বাজ পড়ে আগুন লাগে। বাজের আগুনে বাড়িঘর পুড়ে যায়।

॥ দ্রুত আগুন নেভানোর জন্যে ব্যবস্থা গ্রহণ ॥

যেভাবেই হোক, আগুন নেভানোর জন্যে দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে আগুন ভয়াবহ আকার ধারণ করে। ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানির সীমা থাকে না। মানুষ তাই দ্রুতগামী মোটরগাড়িতে করে সুদীর্ঘ জলের পাইপ, বালতি, মই, দড়ি, কুড়ুল প্রভৃতি নিয়ে যায়। সঙ্গের গাড়িতে জলভরতি ট্যাঙ্কও যায়। কারণ, অনেক সময় যেখানে আগুন লাগে তার

কাছে পিঠে জল পাওয়া যায় না। অনেক ক্ষেত্রে জল থাকে দূরে। তাই দমকলের গাড়িতে খুব লম্বা ক্যানভাসের পাইপ থাকে। তাই দিয়ে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা হয়। আজকাল শুধু জলের সাহায্যে আগুন নেভানো হয় না, অগ্নি-



আগুন-লাগা পেট্রোলবাহী গাড়ির আগুন
নেভানোর চেষ্টা

নির্বাপক গ্যাস ও তরল পদার্থ ব্যবহার করা হয়। তাতে আগুন তাড়াতাড়ি নিভে যায়।

যে-আগুন মানুষ কয়েক হাজার বছর ধরে সাধ্যসাধনা করে জ্বালাবার চেষ্টা করেছিল, তার দ্বারাই ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি হতে দেখে সব দেশেরই মানুষ রীতিমতো শঙ্কিত হয়ে উঠল। তারই ফলে দমকল বা দমকলবাহিনীর সৃষ্টি হল।

॥ সন্ধ্যার পর আগুন জ্বালায় নিষেধ ॥

আগেকার দিনে ইংল্যাণ্ডের অধিকাংশ বাড়ি ছিল কাঠের। কাঠের বাড়িতে সহজে আগুন লেগে যেত। সাধারণতঃ লোকে রাত্রে রান্নাবান্নার কাজ করে। প্রধানতঃ রান্নাঘরের আগুন থেকেই আগুন লাগবার ভয় থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে মোমবাতি বা কেরোসিনের আলোতে কাজকর্ম হত। রাত্রেই তাই তা থেকে আগুন লাগবার সম্ভাবনা প্রবল ছিল। বাধ্য হয়ে কর্তৃপক্ষ ইংল্যাণ্ডে সন্ধ্যা ৬টার পর কোন বাড়িতে কোনভাবে আগুন বা আলো জ্বালানো নিষেধ করে দিলেন। কোন্ সময় থেকে আগুন বা আলো জ্বালানো চলবে না তা প্রতিদিন ঘণ্টা বাজিয়ে জানানো হত। সেই ঘণ্টার নাম ছিল কারফিউ (curfew)। প্রথম উইলিয়াম দ্য কংকারার (William I the Conqueror, ১০২৭-৮৭ খ্রী.)-এর আমলে এই বিধিনিষেধের ব্যবস্থা হয়।



॥ লণ্ডনের অগ্নিকাণ্ড ॥

আগুন নেভানোর জন্যে দ্রুত ও কার্যকর উপায় গ্রহণের ব্যবস্থা করতে ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের লোক পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই তৎপর হয়।



লণ্ডনের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

ইংল্যাণ্ডে নানাভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হলেও ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে এক অতি ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হয়। পূর্ব থেকে পশ্চিমে, টাওয়ার থেকে টেম্পল চার্চ পর্যন্ত এবং উত্তরে হলবর্ন ব্রিজ পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। পুডিং লেনের এক পাঁউরুটি তৈরির দোকানে প্রথম আগুন লাগে। চার দিন ধরে আগুনের

ধ্বংসলীলা চলতে থাকে। এতে সেণ্ট পলস ক্যাথিড্রাল সমেত ৮৭টি গির্জা পুড়ে যায়, রয়্যাল এক্সচেঞ্জ, শুল্ক ভবন ও গিল্ডহল সমেত অগণিত বাড়ি আগুনে ধ্বংস হয়। ১৩,২০০টি বাড়ি ও ৪০০টি রাস্তা সেই অগ্নিকাণ্ডের কবলে পড়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রলয়ংকর অগ্নিকাণ্ডের পর ইংল্যাণ্ডবাসীরা উপযুক্ত দমকল বা দমকলবাহিনী গঠনের দ্বারা দ্রুত অগ্নিনির্বাপণের জন্যে সচেষ্ট হয়।



॥ পাড়াগাঁয়ে আগুন ॥

বাংলার পাড়াগাঁয়ের অধিকাংশ বাড়ি খড়পাতায় ছাওয়া ও কাঠ বাঁশ দিয়ে তৈরী। গরমের দিনে কোন বাড়িতে আগুন লাগলে সেই আগুন সহজে পাশাপাশি অবস্থিত বাড়িগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। পাড়ার লোকেরা বালতি বালতি জল ঢেলে আগুন নেভাতে চেষ্টা করে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তবে যে-সব বাড়িতে আগুন লাগে নি, সেই সব বাড়ির খড়-পাতার চাল জলে ভিজিয়ে দিয়ে সে-সব জায়গায় আগুন ছড়িয়ে পড়বার আশঙ্কা কতকটা দূরীভূত করতে পারে।

আগেকার দিনে ইংল্যাণ্ডে দমকলবাহিনী গঠনের কোন প্রচেষ্টা সরকারী মহল থেকে দেখা যায় নি। ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিওয়েদার (Merryweather) নামে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যে আগুন নেভানোর জন্যে দমকলের পত্তন করেন, দেখা যায় ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দেও সেই সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বংশের লোকেরা তা চালিয়ে যাচ্ছেন। বলিষ্ঠ ঘোড়ার গাড়ি করে আগুন নেভাতে যাওয়া হত। শেষ পর্যন্ত ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ গভর্নমেণ্ট দমকলবাহিনীর সাহায্যে অগ্নিনির্বাপণের প্রথা মেনে নেন।

॥ উন্নত দমকলবাহিনী ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুতে ইউরোপে উন্নত প্রথায় দমকলবাহিনী গঠন করা হয়। শুধু ইউরোপে নয়, এই সময়ে জাপানে, চীনে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায় ও ভারতে নানা ধরনের উন্নত ব্যবস্থাসমন্বিত দমকলবাহিনী গড়ে ওঠে। আগুনের



দমকলবাহিনীর লোকেরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করছে।

হলকা লেগে যাতে মুখ পুড়ে না যায়, সেজন্যে দমকলের সুশিক্ষিত ও বলিষ্ঠ লোকেরা বিশেষ ধরনের মুখোশ পরেন, গায়ে অগ্নিসহ (fire-proof) পোশাক পরেন। তাঁরা যেভাবে আগুনের সঙ্গে যুদ্ধ করেন তা খুবই দুঃসাহসিক ও বিপজ্জনক। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া সত্ত্বেও অনেকে আহত ও নিহত হন।

॥ দমকলের সাজসরঞ্জাম ॥

দমকলবাহিনীর সঙ্গে থাকে কোদাল, শাবল, কাটারি, দড়ি, জলের সুদীর্ঘ পাইপ, ভাঁজ-করা

মই, অগ্নিনির্বাপক গ্যাস ও এক ধরনের তরল পদার্থ, জাল, চাদর, ত্রিপল প্রভৃতি অনেক কিছু জিনিস। শহরের বহুতলবিশিষ্ট বাড়িতে আগুন লাগলে



ভাঁজ-করা মই খুলে লম্বা করে আগুন-লাগা বাড়ির গায়ে লাগানো হচ্ছে।

ভাঁজ-করা মই খুলে লম্বা করে তা দিয়ে দমকল-বাহিনীর লোকেরা উপরে উঠে যান ও উপরতলায় আটক-পড়া ব্যক্তিদের নিরাপদে নীচে নামিয়ে আনেন। কখনও কখনও নীচে একটা ত্রিপল কয়েকজন লোক টান টান করে মেলে ধরেন। শক্ত দড়ির সঙ্গে বেঁধে উপরের মানুষদের সেই ত্রিপলের উপরে নামানো হয়।

॥ দমকলের লোকেদের নানা কাজ ॥

দমকলবাহিনীর লোকেরা শুধু আগুন নেভানোর কাজই করেন না। কোন বিকৃত-মস্তিষ্ক লোক একটা প্রকাণ্ড গাছে বা কোন সেতুর মাথায় বসে থাকলে তাঁরা তাকে নামিয়ে আনেন, কোন জলে-ডোবা লোককে উদ্ধার করেন, কোন পশু রাস্তার ধারের খাদে পড়ে গেলে তাকে তোলবার ব্যবস্থা করেন, কোন বাস বা লরী পথের ধারের জলায় বা জলাশয়ে পড়ে গেলে বিপন্ন লোকদের উদ্ধার করেন ও বাস-লরীকে তোলবার ব্যবস্থা করেন, নৌকোডুবি হলে নিমজ্জমান ব্যক্তিদের উদ্ধার করেন ও নৌকোর মালপত্র তোলবার ব্যবস্থা করেন। আগুন-নেভানো ছাড়াও এমন বহু কাজ তাঁরা করেন।

॥ দমকলবাহিনীর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা ॥



দমকলের গাড়ি রাস্তা দিয়ে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে দ্রুতগতিতে ছুটে যায়। সেই ঘণ্টার শব্দ শুনে পথের গাড়ি ও লোক তাড়াতাড়ি সেই গাড়িকে নির্বিঘ্নে ছুটে যাবার সুবিধা করে দেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামার সময়ে দমকলের লোকেরা আহতদের তুলে নিয়ে হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। রেডক্রশ ও অ্যাম্বুলেন্সবাহিনীর মতো বহু কাজ করে দেশবাসীর প্রশংসা অর্জন করেন। দমকল-বাহিনী সমাজের বহু উপকার সাধন করে থাকেন। ভারত স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দমকলবাহিনীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে, তাদের কাজকর্মও অপরিসীম দক্ষতার সঙ্গে পালিত হচ্ছে। দমকলের লোকদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার ব্যবস্থাও হয়েছে। দমকল-বাহিনী সমাজের পক্ষে অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যক। এ আমাদের গৌরব।



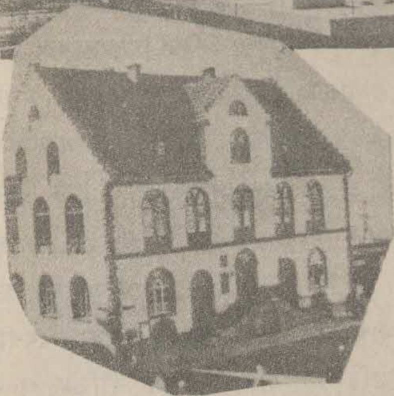
অজন্তার ১নং গুহার চিত্র পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব

পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব

মহারাষ্ট্র রাজ্যের ঔরঙ্গাবাদ জেলায় সহ্যাদ্রি পর্বত-মালার পাদদেশে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম অজন্তা বা অজণ্টা। প্রায় ৮০ মিটার উঁচু দু'সারি পাহাড়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত ওয়াঘেরা নদী যেখানে ক্রমান্বয়ে সাতটি জলপ্রপাত সৃষ্টি করে উপত্যকায় নেমে এসেছে সেখানে অর্ধচন্দ্রাকার পর্বতগাত্রে কয়েকটি গুহা অবস্থিত। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল ধরে সেই সময়ের শিল্পীরা এইসব গুহা খনন করে সে-সবের মধ্যে যে-সব অমূল্য প্রাচীর-চিত্র ও ভাস্কর্য সৃষ্টি করেছিলেন, সমগ্র বিশ্বে সেইসব চিত্র ও ভাস্কর্য অপরিসীম প্রশংসালাভ করেছে। প্রধানতঃ বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী নিয়ে এই সব চিত্র ও ভাস্কর্য। ২৯টি গুহার দেওয়ালে ও ছাদে অসংখ্য চিত্র বিদ্যমান। ভাস্কর্যের সংখ্যাও অগণিত। কালের প্রভাবে ও অত্যাচারী মানুষের বিধ্বংসী কার্য-কলাপে বহু চিত্র ও ভাস্কর্য নষ্ট হয়ে গেলেও এখনও যা আছে, সে-সব পৃথিবীপ্রসিদ্ধ। ১নং গুহার বিখ্যাত চিত্র পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের ছবিটি পূর্বপৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়েছে। অজন্তার গুহাগুলির মধ্যে চিত্র ঐশ্বর্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ হল ১নং গুহাটি। পদ্মপাণি বোধিসত্ত্বের করুণাঘন দৃষ্টি অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত।





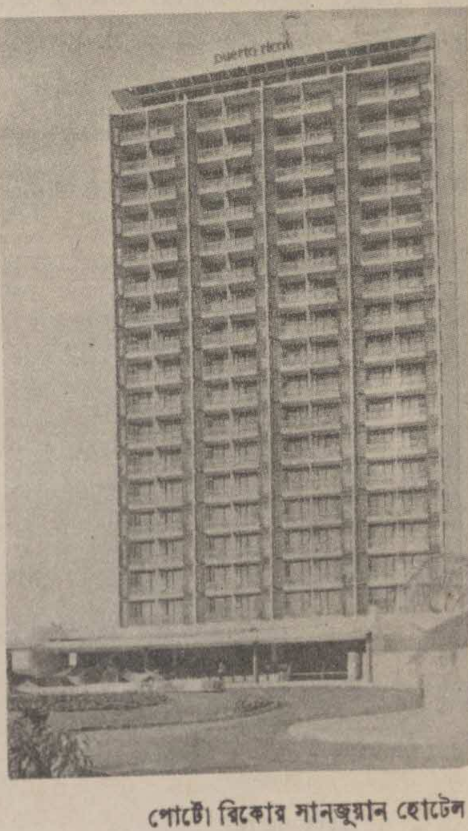


নানাদেশের ঘরবাড়ি

আদিম যুগের লোকেরা শীতবর্ষার প্রকোপ ও বন্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে আশ্রয় খুঁজতে খুঁজতে পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। সেই পাহাড়ের গুহাই আদিম যুগের মানুষদের ঘর। সেই সব গুহা-ঘরের জানালা-দরজা বলতে কিছু ছিল না। তবু যতটুকু পারা যায় তারা সেই গুহায় বাস করে প্রচণ্ড শীত গ্রীষ্ম বর্ষার হাত



গুহাবাসী মানুষ



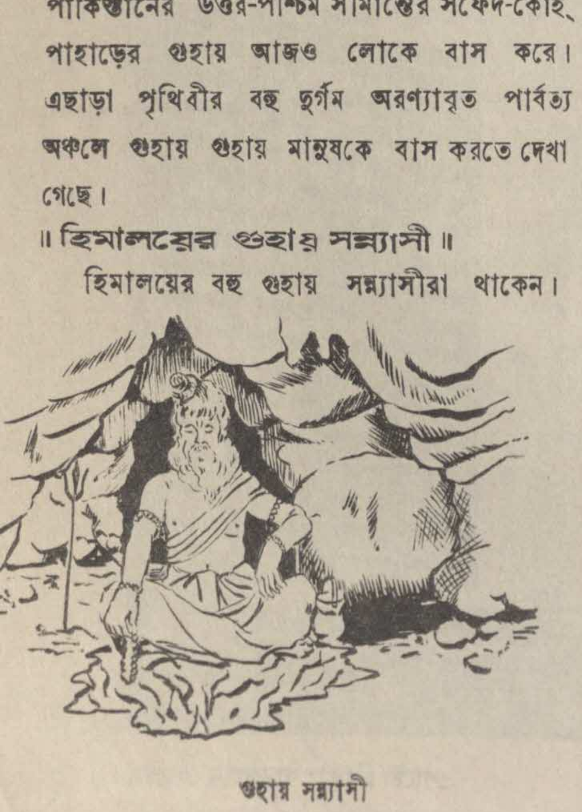
পোর্টো রিকোর সানজুয়ান হোটেল

থেকে নিজেদের বাঁচাত, বন্য জন্তুদের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করত।

বহু দিন কেটে গেলে তারা অতি সাধারণ ধরনের ঘর তৈরি করতে শিখল। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা গুহাতেই বাস করতে লাগল। এই সব গুহাবাসী (cave-man) প্রায় সব দেশেই ছিল। বর্তমান যুগে অ্যতুন্নত বাসস্থান তৈরী হয়েছে, আকাশচুম্বী বহুতল বাড়ি নির্মিত হয়েছে। তবু কিছু কিছু লোক আজও গুহায় বাস করে। তারা ধারাল অস্ত্র দিয়ে গুহাকে কেটে বড় করে নিয়েছে। কোন ক্ষেত্রে অতি সাধারণ দরজার মতো কিছু ব্যবস্থা করেছে। ইংলণ্ডের উস্টারশায়ার (Worcestershire)-নামক স্থানে, গোবি মরুভূমির পাহাড়, প্রশান্ত মহাসাগরের কোন কোন দ্বীপের পাহাড় ও পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সফেদ-কোহ্ পাহাড়ের গুহায় আজও লোকে বাস করে। এছাড়া পৃথিবীর বহু দুর্গম অরণ্যাবৃত পার্বত্য অঞ্চলে গুহায় গুহায় মানুষকে বাস করতে দেখা গেছে।

॥ হিমালয়ের গুহায় সন্ন্যাসী ॥

হিমালয়ের বহু গুহায় সন্ন্যাসীরা থাকেন।



গুহায় সন্ন্যাসী

সেই গুহাই তাঁদের ঘরবাড়ি। সন্ন্যাসীদের বাসস্থান এই ধরনের অসংখ্য গুহা হিমালয়ের নানা স্থানে দেখা যায়।



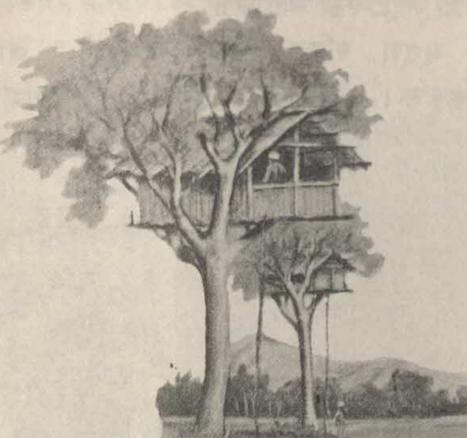
॥ হ্রদবাসী ॥

নবপ্রস্তর যুগে বা তাম্রযুগে লোকেরা হ্রদের জলের উপরে খুঁটি পুঁতে পুঁতে সে-সবের উপর কাঠ বিছিয়ে মাচা তৈরি করত। সেই মাচায় একের পর একটা ঘর তৈরি করত। অনেক সময়ে এত ঘর তৈরী হত যে একটা বড় গ্রাম গড়ে উঠত। এই গ্রাম থেকে তীরে যাবার জন্যে কাঠের পুল তৈরী হত। সুইটজারল্যাণ্ডের হ্রদে এ ধরনের গ্রাম তৈরি করে মানুষেরা বাস করত। ডাঙ্গায় যেখানে সহজে ঘর তৈরি করা যায়, সেখানে রীতিমতো কষ্ট করে জলের উপর মাচা করে ঘর তৈরি যে কেন করা হত, তা বুঝতে পারা যায় না। শুধু সুইটজারল্যাণ্ডের হ্রদে নয়, আরো অনেক দেশের হ্রদে ঘর তৈরি করে বাস করার প্রথা লক্ষ্য করা যায়। যারা এমনিভাবে বাস করত, তাদের বলা হয় হ্রদবাসী—ইংরেজিতে **lake-dwellers**। এই ধরনের হ্রদবাসীরা হ্রদের জলের উপরে ঘর তৈরি করে বাস করলেও অধিকাংশ সময়ে পর্বতে, অরণ্যে পশুশিকারের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াত।

॥ গাছের উপরে বাড়ি ॥



এতো গেল জলের উপরে ঘর বাঁধার কথা। আমাজন নদীর ধারের গহন অরণ্যে, আফ্রিকার কিলিম্যানজারো পর্বতের পাদদেশের অরণ্যে, প্রশান্ত মহাসাগরের অনেক দ্বীপে, বোর্নিওয়, ফিলিপিনজে এবং নানা স্থানে আজও লোকে উঁচু গাছের উপর ঘর তৈরি করে বাস করে। আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত গাছের উপরে ঘর বাঁধার প্রথা বর্তমান। বনের জন্তু, চোর ডাকাত প্রভৃতির

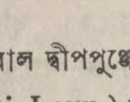


গাছের উপর বাড়ি

আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্যে গাছের উপরে এই ধরনের ঘর বাঁধার প্রয়োজন হলেও অনেক জায়গায় বর্তমান যুগে গাছের উপরে বাড়ি তৈরি একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে।

॥ ফিজি দ্বীপের বাড়ি ॥

দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের প্রবাল দ্বীপপুঞ্জে, ফিজির অন্তর্গত ভিটি লেভু (Viti Levu)-র বনে, নারিকেলকুঞ্জে লোকেরা কাঠের বাড়ি তৈরি করে। সে-সব বাড়ির ঘরের মেঝে, দেওয়াল প্রভৃতি কাঠের তৈরী হলেও দেওয়াল, ছাদ প্রভৃতি ঘাস, মাদুরকাঠি প্রভৃতির আস্তরণ দিয়ে আবৃত করা হয়। সেই সব বাড়িতে যে-সব ফিজিবাসী থাকে, তারা আধুনিক যুগের ফ্যাশনমাফিক পোশাকপরিচ্ছদ পরে, ঘরে এ যুগের মতো আসবাবপত্র রাখে।



॥ কাঠের দোতলা ॥

পাপুয়া-নিউ গিনির লোকেরা কাঠের দোতলা তৈরি করে। এই সব কাঠের দোতলার ছাদ প্রায় সময়েই ঘাস, খড় দিয়ে ছাওয়া হয় এবং বেশ ঢালু হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ধরনের বাড়ি তৈয়ারির



পাপুয়া-নিউ গিনির কাঠের দোতলা বাড়ি

রেওয়াজ আদিম অধিবাসীদের মধ্যে দেখা গেলেও সেখানকার আধুনিক সভ্যতা-পরিপুষ্ট মানুষেরাও কাঠের দোতলা বাড়ি তৈরি করে। তবে তাদের তৈরী বাড়ি কিছুটা উন্নত ধরনের।

কোথাও কোথাও কাঠের সরু সরু গুঁড়ি



কাঠের সরু গুঁড়ির বাড়ি

সাজিয়ে চাল, দেওয়াল ইত্যাদি তৈরি করে বাড়ি করা হয়।

॥ ক্রাল ॥

দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের গ্রামকে বলে ক্রাল (Kraal)। সেই গ্রামের ঘর-

বাড়িকেও ক্রাল বলে। এই ক্রাল দেখতে বড় ছাতার ন্যায়। বাঁশ-বাখারির তৈরী বাড়ি, উপরে ঘাস, নলখাগড়া, মাদুরকাঠি ধরনের গাছের ছাউনি।

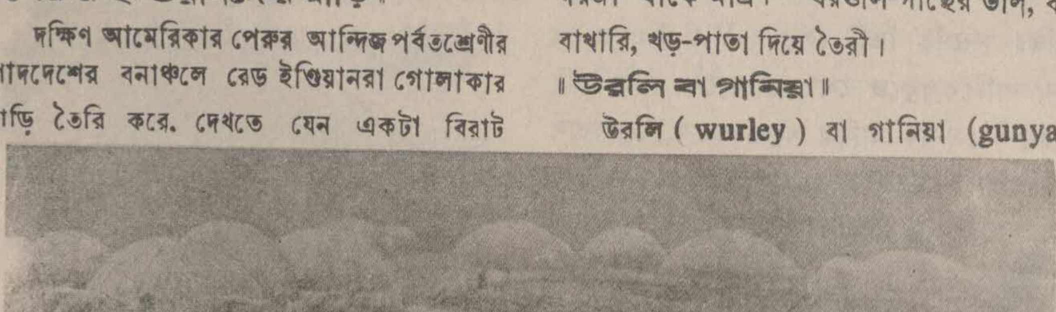


॥ হটেনটটদের বাড়ি ॥

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার হটেনটট (Hotten-tot) জাতির লোকেরা নিজেদের বলে খই-খইন (Khoi-Khoin)। সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ উপনিবেশিকরা তাদের হটেনটট নাম দেয়। আগে তারা কেপ কলোনির অনেকাংশে বাস করত। শ্বেতাঙ্গ শাসকদের দ্বারা বিতাড়িত হয়ে অন্যত্র চলে গেছে। কিছু হটেনটটের এখনও দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় বাস। তারা বুশম্যান ও বাণ্টুদের সঙ্গে সম্পর্কিত। হটেনটটেরা ঘাস-পাতা, নলখাগড়া ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া গোলাকার বাড়িতে বাস করে। বাড়িগুলি দেখতে ছাতার ন্যায়।

॥ পেরুর ইণ্ডিয়ানদের বাড়ি ॥

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুর আন্দিজপর্বতশ্রেণীর পাদদেশের বনাঞ্চলে রেড ইণ্ডিয়ানরা গোলাকার বাড়ি তৈরি করে. দেখতে যেন একটা বিরাট

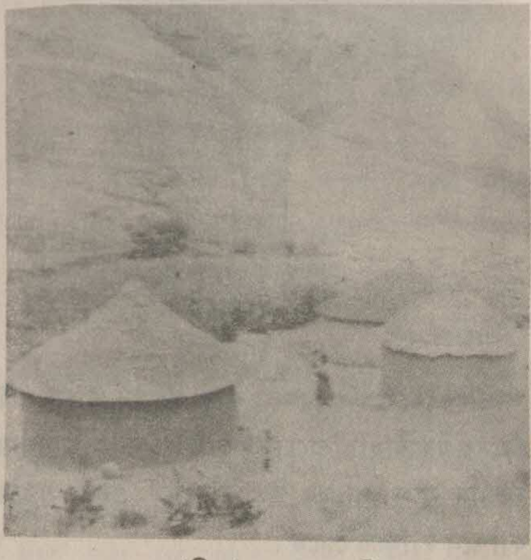


পেরুর রেড ইণ্ডিয়ানদের বাড়ি

ছাতা। বাড়ির ছাদ ঘাস-পাতা, নলখাগড়া, মাদুরকাঠির ন্যায় গাছ প্রভৃতি দিয়ে ছাওয়া। এই সব ঘর দেখতে এস্কিমোদের ইগলুর মতো। অবশ্য রেড ইণ্ডিয়ানরা সকলে আজকাল এই ধরনের বাড়িতে থাকে না। আধুনিক ইটের বাড়িতে বাস করে।

॥ জুলুদের বাড়ি ॥

জুলুরা দক্ষিণ আফ্রিকার বাণ্টু জাতির অন্তর্ভুক্ত। এরা একধরনের বিচিত্র ঘর তৈরি করে



আফ্রিকার জুলুদের বাড়ি

থাকে। তাতে জানালা নেই। একটা খুব নীচু দরজা থাকে মাত্র। ঘরগুলি গাছের ডাল, বাঁশ বাখারি, খড়-পাতা দিয়ে তৈরী।

॥ উরলি বা গানিয়া ॥

উরলি (wurley) বা গানিয়া (gunyah) অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের কুঁড়ে ঘর। একে হামপি (humpy)-ও বলা হয়। এই ঘর পাতাসমেত গাছের ডাল, শুকনো পাতা, গাছের ছাল, ঘাস-খড় ইত্যাদি দিয়ে ছাওয়া অতি সাধারণ ঘর। বাংলার খড়-উলুর মেটে কুঁড়ের মতো। তবে সেখানকার ঘরের দেওয়াল মাটির

নয়। বাঁশ-বাখারি, কাঠ, গাছের ডাল পাশাপাশি খাড়াভাবে বসিয়ে দেওয়াল তৈরি করা হয়। দরজা জানালাও বাঁশ-কাঠের তৈরী।

॥ হাওয়াই দ্বীপের কুঁড়ে ঘর ॥

প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপে বাঁশবনের সংখ্যা অনেক। সেই বাঁশবনে ও বাঁশবনের আশেপাশে দ্বীপবাসীদের অনেকে খড়-পাতায় ছাওয়া কুঁড়ে-ঘরে বাস করে। এই কুঁড়ে ঘর অতি নগণ্য হলেও কুটীরবাসীরা শীত-গ্রীষ্মে আরামেই থাকে।



॥ ঘানার কুটীর ॥

ঘানা (Ghana) পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। অনেক দিক্ দিয়ে এই রাষ্ট্র উন্নত। তাহলেও সাধারণ গ্রামবাসীরা একশ্রেণীর কুঁড়ে ঘরে বাস করে। এই ঘর ঘাস-খড়ে ছাওয়া। ঘরের দরজা খুব ছোট। হেঁট হয়ে ঘরে ঢুকতে হয়। ঘরে জানালা থাকে না। মেঝেতে বালি ছড়ানো থাকে। তার উপরে কাঠের লম্বা বেঞ্চে কাঠের বালিশ ও মোটা মাদুর বা কম্বল বিছানো থাকে। এই ধরনের ঘরে বাস করা খুবই অসুবিধাজনক মনে হলেও লোকে তা গ্রাহ্য করে না।

॥ জলাভূমির উপরে কাঠের বাড়ি ॥

প্রশান্ত মহাসাগরে অসংখ্য দ্বীপ। এমন অনেক দ্বীপ আছে, যে-সবের কথা পাশ্চাত্ত্য জগতের লোকেরা কমই জানে। অনেক দ্বীপে বিরাট জলাভূমির উপরে খুঁটি পুঁতে কাঠের বাড়ি তৈরি করা হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে-সব ঘর ঘাস-খড় দিয়ে ছাওয়া।

॥ উঁচু বাড়িতে বাসের অভিলাষ ॥

নিউ জীল্যাণ্ড, বোর্নিও, তাইওয়ান প্রভৃতি স্থানের আদিম অধিবাসীরা খুঁটির উপরে তৈরি-করা উঁচু ঘরে বাস করতে ভালবাসে। পূর্ব



খুঁটির উপর তৈরী বাড়ি

তাইওয়ানে এই ধরনের ঘর প্রচুর দেখা যায়। এ যুগে বহুতলবিশিষ্ট বাড়ির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। সব দেখে শুনে মনে হয়, সব জাতের, সব দেশের মানুষের উঁচুতে বাস করার ইচ্ছা অনেক দিনের।

॥ উইগওয়াম, উইকিআপ ও টেপী ॥

উইগওয়াম (**wigwam**) আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের একধরনের বাঁকানো বাঁশ বা গাছের ডালের উপরে মাদুরকাঠি, লম্বা লম্বা ঘাস, শুকনো পাতা প্রভৃতির ছাউনি-দেওয়া ঘর।

উইকিআপ (**wickiup**) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যাযাবর শ্রেণীর এক ধরনের অতি সাধারণ কুঁড়ে ঘর। এই সব ঘর মোচাকৃতি। বাঁশ, গাছের ডাল প্রভৃতির কাঠামোর উপর নলখাগড়া,



উইগওয়াম

মাদুরকাঠি, ঘাস-পাতা প্রভৃতির আবরণ-দেওয়া ঘর। দরজা বলতে একটা ফাঁক মাত্র। তাই



গাছের ছালে ঢাকা উইগওয়াম

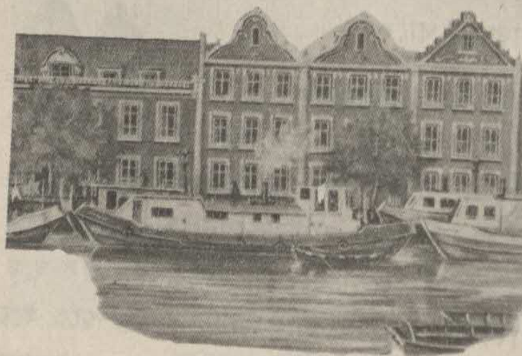
দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে হয়। জানালা বলে কিছু নেই।

টেপী (tepee) আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের মোচাকৃতি একধরনের তাঁবু-ঘর। টেপী প্রধানতঃ বাইসনের চামড়ায়, অভাবে মোটা ঠাস-বুনন সুতীর চাদর দিয়ে তৈরী। টেপীর মালিকেরা যাযাবর শ্রেণীর। প্রয়োজনবোধে তাঁবু-ঘর গুটিয়ে ঘোড়া বা গাধার পিঠে বেঁধে অন্যত্র চলে যায়।

॥ নৌকোয় বাড়ি ॥



চীন, হংকং, হল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থানে এক শ্রেণীর লোক সারা জীবন নৌকোয় বাস করে। সেখানে নৌকোয় হাটবাজার-দোকানও বসে থাকে, স্কুল-



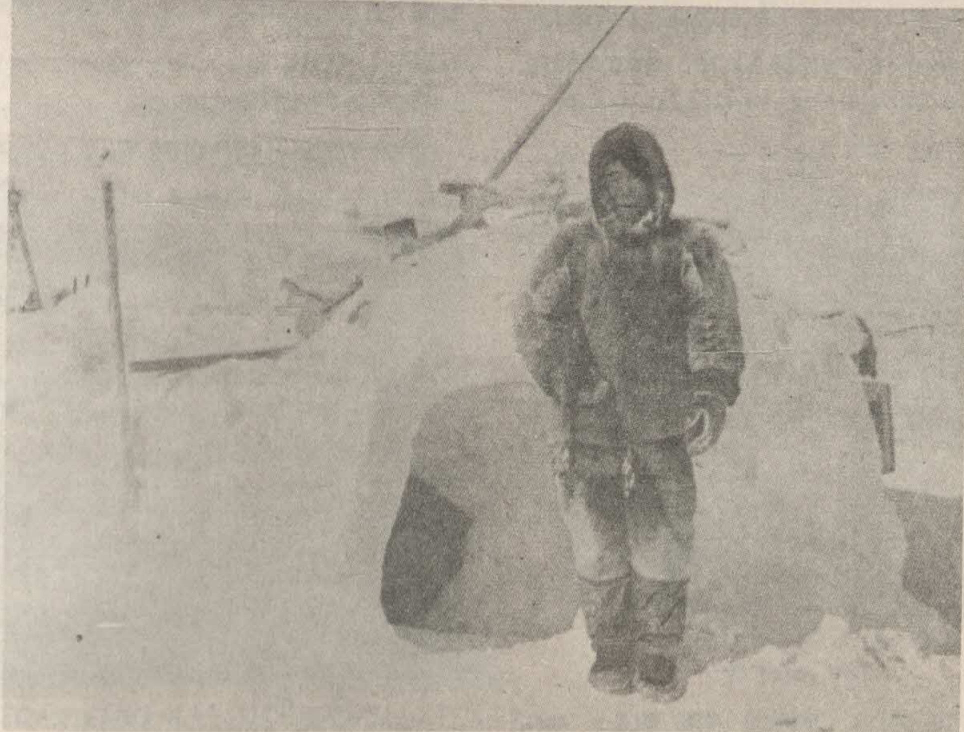
হল্যাণ্ডে নৌকোয় বাড়ি

হাসপাতালও নৌকোর উপরে দেখা যায়। ক্যাণ্টন নদীর মোহনায় প্রচুর নৌকোয় বাড়ি দেখা যায়। চীনে অন্য অনেক নদীতেও নৌকোয় বাড়ি আছে। আমাদের দেশে সংখ্যায় বেশী না হলেও কাশ্মীরের ডাল লেকে নৌকোয় বাড়ি দেখা যায়।

॥ ইগলু ॥



ইগলু (igloo) এস্কিমোদের বরফের ঘর। পাথরের মতো করে কাটা বড় বড় বরফের চাঁই সাজিয়ে উপুড়-করা বাটির মতো করে ইগলু তৈরি করা হয়। দরজা বলতে একটা সংকীর্ণ ফাঁক।



ইগলু

হামাগুড়ি দিয়ে তার মধ্যে যেতে হয়। জানালা নেই।

এস্কিমোরা শীতকালে বরফের ঘর ইগলুতে বাস করে, গরমের সময়ে সীল, শ্বেত ভল্লুক প্রভৃতির চামড়ার তাঁবুতে বাস করে।



॥ বলিভিয়ার বাড়ি ॥

বলিভিয়া দক্ষিণ আমেরিকার একটি দেশ। ব্রাজিল, প্যারাগুয়ে, আর্জেন্টিনা, চিলি ও পেরুর মধ্যে অবস্থিত। এ দেশে আন্দিজ পর্বতের পাদদেশে, আমাজন নদের একটি উপনদীর ধারে ইণ্ডিয়ানরা এক ধরনের পাথরের বাড়িতে বাস করে। ইণ্ডিয়ানরা বড় বড় পাথরের চাঁই সাজিয়ে পিরামিড বা বড় ধরনের ছুঁচলো ইগলুর মতো আকারের বাড়ি তৈরি করে। ঘরে কোনও জানালা নেই। একটি মাত্র দরজা।

॥ ইনকাদের বাড়ি ॥

দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে ইনকা (Inca) নামে এক উন্নত সভ্যতার অধিকারী জাতির বাস ছিল। ইনকারা একটা বিরাট রাজ্য গড়ে তুলেছিল। ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়রা তাদের ক্ষমতাচ্যুত করে তাদের রাজ্য অধিকার করে। ইনকাদের বাড়িঘর উন্নত ধরনের ছিল। কিন্তু কিছু ইনকা অতি সাধারণ ঘরে বাস করত। তাদের ঘরে কোন জানালা থাকত না, দরজা বলতে একটা ফাঁক। অবশ্য এই বাড়ি অনেক সময়ে দোতলা হত। সাধারণতঃ ইনকারা উপরের ঘরে থাকত। নীচের ঘরে গৃহপালিত পশুদের থাকবার স্থান ছিল।

॥ কিরঘিজদের বাড়ি ॥

মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলিয়ার বিস্তীর্ণ বৃক্ষহীন

তৃণভূমির নাম স্টেপ্‌স্ (steppes)। এখানে যাযাবর কিরঘিজ জাতির বাস। কিরঘিজেরা

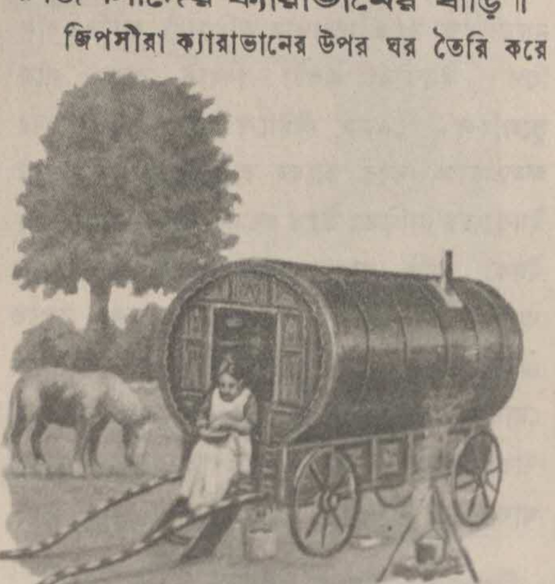


কিরঘিজদের তাঁবু

সহজে বহনযোগ্য তাঁবুতে বাস করে। যখন তারা স্থানত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায় তখন তাঁবুর অধিবাসীরা তাঁবু মাথায় বয়ে নিয়ে যায়।

॥ জিপসীদের ক্যারাভানের বাড়ি ॥

জিপসীরা ক্যারাভানের উপর ঘর তৈরি করে

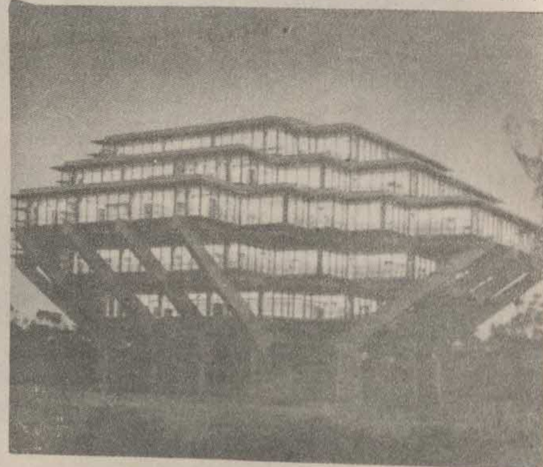


জিপসীদের ক্যারাভানের বাড়ি

তাতে থাকে এবং তাতে করেই নানাস্থানে যাতায়াত করে।

॥ চীনের বিশ্ববিদ্যালয় ॥

চীনে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় আছে। সে-সবের মধ্যে প্যাগোডার আকারে নির্মিত একটি বিশ্ব-

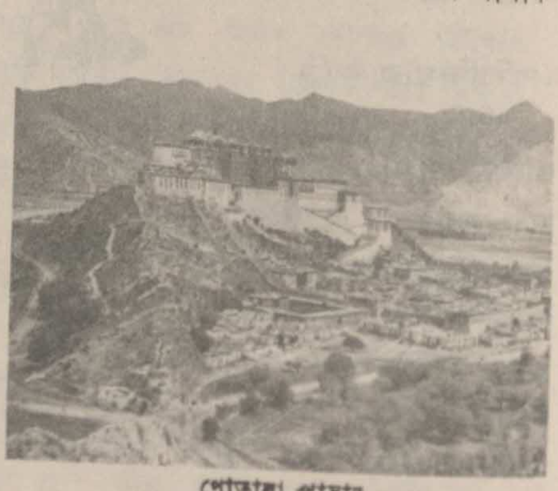


কালিফোর্নিয়ার সেণ্ট্রাল ইউনিভারসিটি

বিদ্যালয় অতি বিচিত্র। এটি নির্মিত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে চীন সম্রাট্ চি. এন.-এর আমলে তাঁরই তত্ত্বাবধানে।

॥ দলাই লামার প্রাসাদ ।

তিব্বতের ধর্মগুরু দলাই লামা এখন ভারতে। তিনি তিব্বতে যে প্রাসাদে থাকতেন তা প্রাসাদ-



পোতালা প্রাসাদ

দুর্গ পোতালা। একটা উঁচু পাহাড়ের গা জুড়ে

এক বিরাট বাড়ি। এর দৈর্ঘ্য ২৭৪ মিটার। সর্বোচ্চ গম্বুজটির উচ্চতা মাটি থেকে ১২১ মিটার।

॥ আলহামব্রা প্রাসাদ ॥

দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডার আলহামব্রা (**Alhambra**) প্রাসাদ মুরেরা ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে গড়ে তুলেছিল। এটি অপূর্ব কারুকার্যখচিত।



আফ্রিকার বুশ জাতির গ্রামের বাড়ি

বর্তমান যুগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইট-সিমেন্টের বাড়ি তৈরী হচ্ছে। আগেকার মতো অদ্ভুত ধরনের বাড়ির প্রচলন উঠে যাচ্ছে। জাপানে ঘন ঘন ভূমিকম্প হয়। সেইজন্যে সেখানে কাঠের

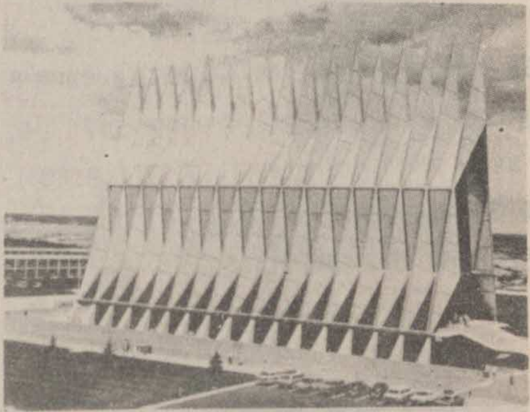


সুইটজারল্যাণ্ডের ঢালু চালের বাড়ি

বাড়ির প্রাচুর্য। শীতপ্রধান দেশে যেখানে শীতের সময় বরফ পড়ে সে-সব জায়গায় বাড়ির একতলা দোতলা বা তেতলার ছাদ সমতল করে তৈরী হয় না। বরফ যাতে গড়িয়ে নীচে পড়ে যায় সেজন্যে ছাদ ঢালু করা হয়।



কেনিয়ায় কিকিউদের বাড়ি



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহিনীর ভবিষ্যৎ নেতাদের জন্যে নির্মিত একটি বিচিত্র বাড়ি

॥ সর্বোচ্চ স্থানের বাড়ি ॥

ভারত-তিব্বত সীমান্তে **Basisi fort**-এর মনুষ্য-অধ্যুষিত বাড়িগুলি ৫,৯৮৮ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

আর্জেন্টিনা-চিলি সীমান্তে **Cerro Llullaillaco**-তে একটি তিন কক্ষের বাড়ি

আবিষ্কৃত হয়েছে। এটি ৬,৬০০ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

সারা পৃথিবীতে নানা দেশে অনেক বড় বড় ও



ভবঘুরে রেডইণ্ডিয়ানদের বাইসনের তাঁবু

উঁচু বাড়ি তৈরী হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেণ্টার (৪১১ মিটার), এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং (৪৪৯ মিটার, টেলিভিশন টাওয়ার সমেত), ক্রাইসলার বিল্ডিং (৩১৮ মিটার) ইত্যাদি অসংখ্য আকাশচুম্বী বাড়ি তৈরী হয়েছে।

॥ সব চেয়ে উঁচু বাড়ি ॥

বর্তমানে সবচেয়ে উঁচু বাড়ি শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার। ১১০ তলা, উচ্চতা ৪৪৩ মিটার (টেলিভিশন অ্যানটেনা সমেত ৪৭৫.১৮ মিটার)। আয়তন ১০১ একর।

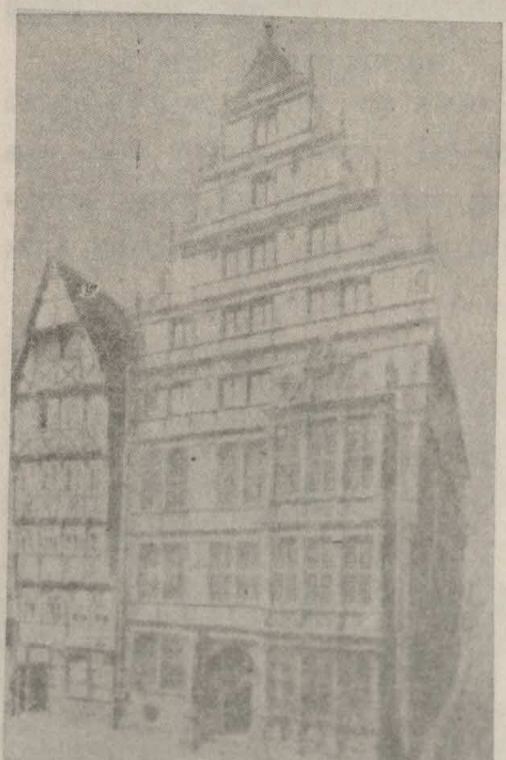
এশিয়ার সব চেয়ে উঁচু বাড়ি টোকিওর ৬০ তলা 'Sunshine 60'। উচ্চতা ২৪০ মিটার। বাড়িটি ভূমিকম্পের ধাক্কাসহনক্ষম।

॥ কলকাতার বাড়ি ॥

কলকাতায় বহু সুউচ্চ অট্টালিকা তৈরী হয়েছে এবং হচ্ছে। চাটার্জী'স ইণ্টারন্যাশনাল, এভারেস্ট বিল্ডিং, টাটা সেণ্টার, ইনস্যুরেন্স ভবন, নিউ সেক্রেটারিয়েট ভবন প্রভৃতি অনেক বহুতল বাড়ি তৈরী হয়েছে। বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল প্রভৃতি বাড়ি দর্শনীয়।

॥ নানা স্থানের নানা ধরনের বাড়ি ॥

পৃথিবীর সব দেশেই নানা ধরনের বাড়ি তৈরী হয়। এ সব বাড়ি যে কত রকমের তা বলে শেষ করা যায় না।



১৬০২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হানোভারের বাঁশিওয়ালার স্মারক ভবন



এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং



চীনা সাম্পান



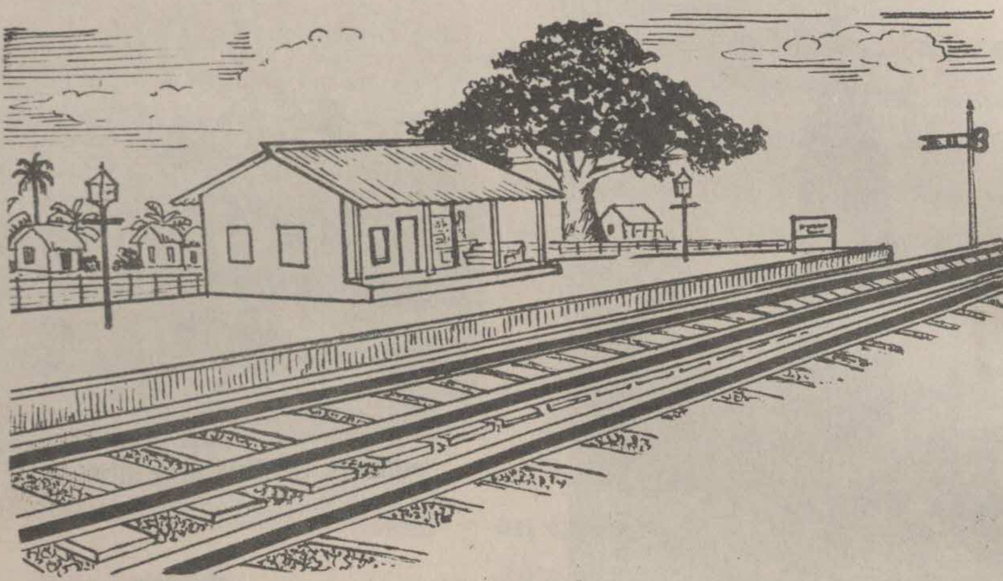
আফ্রিকার খড়-পাতায় ছাওয়া বাড়ি



জাপানীদের বাড়ি



আমাজন নদের উপরে নৌকোয় বাড়ি



রেলস্টেশনের ঘর



পাহাড়ের উপরের বাড়ি



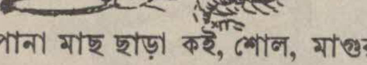
ঈজিপ্টের বাড়ি



বাংলার পাড়াগাঁয়ের ঘর



মৎস্য পালন

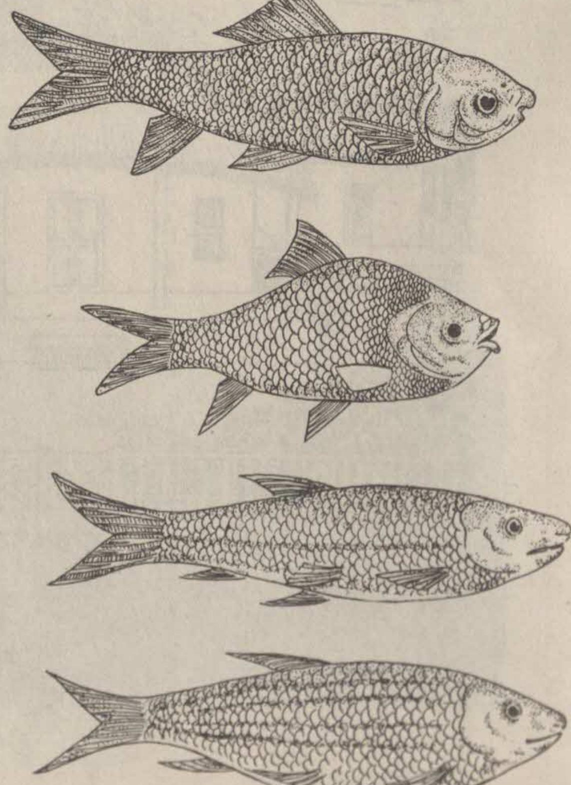
বাংলার পল্লীঅঞ্চলে অনেক পুকুর, ডোবা থাকে। তাতে ছোট ছোট মাছ ছেড়ে দিলে সেগুলি বড় হয়ে ওঠে। সাধারণতঃ রুই, কাতলা, মিরগেল, কালবোস, বাটা প্রভৃতি মাছের চারা পুকুরাদি জলাশয়ে ছাড়া হয়। অনেক সময়ে পোনা মাছের ডিম ছাড়া হয়। সেই ডিম ফুটে বাচ্চা হয়। বড় হলে লোকে ধরে খায়, বিক্রি করে। 

পোনা মাছ ছাড়া কই, শোল, মাগুর, শিঙ্গি, ভেটকি, পার্শে, বোয়াল, চিংড়ি প্রভৃতি মাছ জলাশয়ে ফেলে রাখলে সেগুলি বড় হলে ধরে খাওয়া ও বেচা চলে।

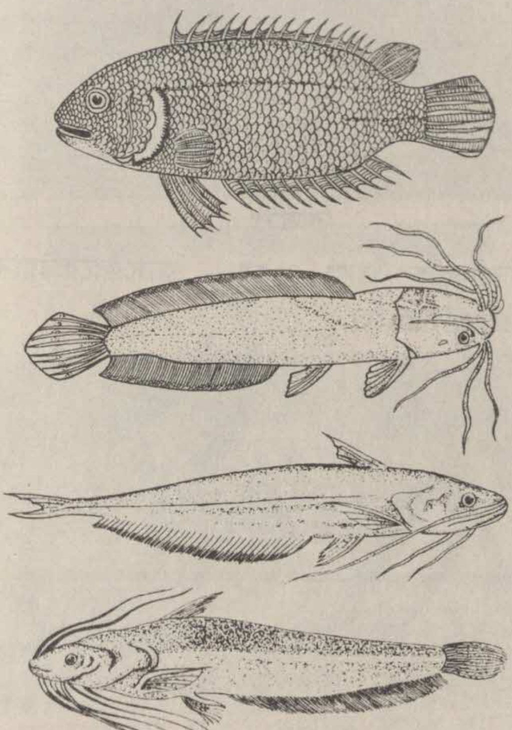
পুঁটি, মৌরলা মাছ সাধারণতঃ লোকে চাষ করে না। আপনা আপনি পুকুরে হয়। ধানক্ষেত জলে ভরে গেলে তাতে নেদস, পুঁটি, মৌরলা, টেংরা, ফলুই, পার্শে, ভেটকি প্রভৃতি মাছ জন্মে থাকে।

স্রোতের মধ্যে ঘুনি রেখে তাতে সেই সব মাছ ধরা হয়। কম গভীর জলাশয়ের জল শুকিয়ে যাবার আগে সে-সব জাল দিয়ে ধরে নেওয়া হয়।

অনেক সময় ধানক্ষেতের চারদিকে আল বেঁধে বর্ষার জমা জলে টেংরা, পার্শে, চিংড়ি প্রভৃতি

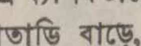


রুই, কাতলা, মিরগেল, বাটা মাছ



কই, মাগুর, বোয়াল, সিঙ্গি মাছ

জন্মানো চলে।

আজকাল টেলাপিয়া বা আফ্রিকান কই-এর চাষ বাংলার সর্বত্র ব্যাপকভাবে হয়ে থাকে। কারণ এই মাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে, পুকুরাদি জলাশয়ে এদের বংশবৃদ্ধি হয়। এ মাছ বিদেশ থেকে আমদানি-করা। 

আমেরিকান রুই, সিলভার কার্প প্রভৃতি মাছও বিদেশ থেকে আমদানি-করা। এই সব



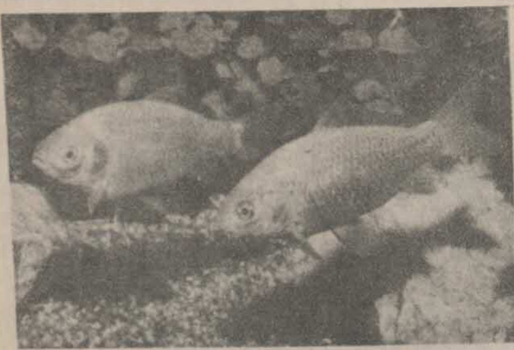
ঘুনি পেতে মাছ ধরা

মাছও সহজে এদেশের জলাশয়ে প্রচুর পরিমাণে জন্মে বলে এদের চাষ করার রেওয়াজ বেড়েই চলেছে।

ইলিশ, পমফ্রেট, সার্ডিন, হেরিং, স্যামন (salmon), শংকর প্রভৃতি মাছ লোকে চাষ করে না। এ সব সমুদ্রের মাছ। সমুদ্র থেকে

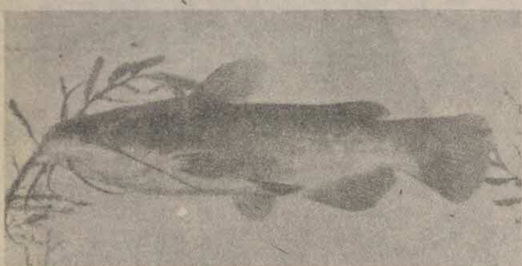


ছিপ দিয়ে মাছ ধরা



গোল্ডফিশ

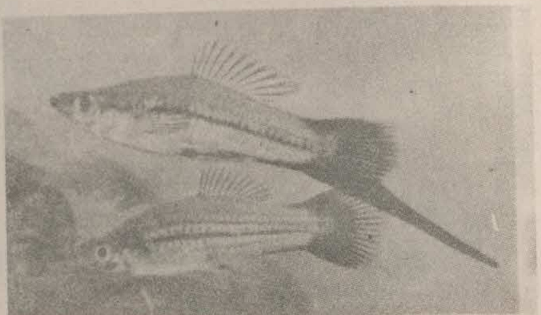
ধরে এনে বাজারে বিক্রি করা হয়। ইলিশ নদী থেকে ধরা হয়। কিন্তু সে মাছও সমুদ্রের। গঙ্গা, পদ্মা প্রভৃতি নদীর মিঠা জলে ডিম পাড়তে আসে। তখন লোকে নদী থেকে ধরে।



বুলহেড

মানুষ শখ করে এক ধরনের মাছ পোষে। এই সব মাছ খুব ছোট ধরনের। নানা আকারের ও নানা রঙের। সে-সব মাছের কত বিচিত্র নাম —গোল্ডফিশ, স্টিক্‌ল্‌ব্যাক, বুলহেড, টেট্রা, রেনবো, জেব্রা, সোর্ডটেল, এঞ্জেল, ছোট জাতের কুঁচে প্রভৃতি।

ছোট বা বড় কাচ দিয়ে ঘেরা বাক্সে এইসব মাছ রাখা হয় ও তাদের চালচলন দেখে লোকে আনন্দ পায়। এই কাচ দিয়ে ঘেরা বাক্স বা



সোর্ডটেল

চৌবাচ্চাকে বলা হয় অ্যাকোয়েরিয়াম (aquarium)।

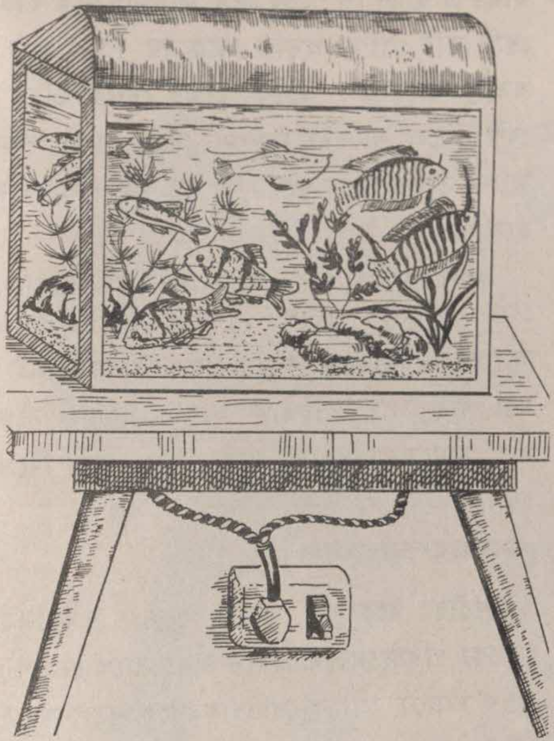


সিলভার এঞ্জেল

কলকাতা, দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানের চিড়িয়াখানায় বহু বড় বড় অ্যাকোয়েরিয়াম আছে। সে-সবের মধ্যে আলো জ্বেলে দেবার ব্যবস্থা আছে। সেই আলোয় মাছেদের চলাফেরা



স্টিক্‌ল্ ব্যাক



অ্যাকোয়েরিয়াম

ভালোভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেই সময়ে মাছেদের গায়ে নানা ধরনের রং ঝলসে ওঠে।

বাড়িতে লোকে আজকাল ছোট ধরনের অ্যাকোয়েরিয়াম রাখে। তাছাড়া বোতল, কাচের বয়াম, চীনামাটির পাত্র ইত্যাদিতে শখ করে মাছ রাখে।



একশ্রেণীর ডাকউইড

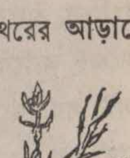
অ্যাকোয়েরিয়ামের মধ্যে ডাকউইড (duck-weed), পণ্ড-উইডস (pond-weeds), ক্যানাডিয়ান ওয়াটার-উইড (Canadian water-weed), ওয়াটার-মিলফয়েল (water-millfoil), ভ্যালিস্‌নিরিয়া (vallisneria), ওয়াটার-ক্রোফুট (water-crowfoot) প্রভৃতি নানা ধরনের গাছ রাখা হয়। এই গাছ রাখার উদ্দেশ্য, মাছেরা যে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস (carbonic acid gas) বার করে দেয় গাছগুলি সেই গ্যাস গ্রহণ করে অ্যাকোয়েরিয়ামের জলকে বিশুদ্ধ করে রাখে। তার ফলে মাছেদের বেঁচে থাকার পক্ষে সুবিধা হয়।

অ্যাকোয়েরিয়ামের জলে যাতে আলো-বাতাস পড়ে তার জন্যে উপরটা ফাঁকা ও প্রশস্ত হওয়া দরকার। অ্যাকোয়েরিয়ামের জল পুকুরের জল বা বৃষ্টির জল হওয়া ভালো। অভাবে পরিষ্কার কলের জল দেওয়া চলে।

মাঝে মাঝে জল বদলে দেওয়া আবশ্যক। সেই সময়ে যাতে মাছেরা আঘাত না পায়, তা দেখা দরকার।

অ্যাকোয়েরিয়ামের তলায় ছোট ছোট নুড়ি, বা নানা ধরনের পাথর রাখা ভালো। এই সব নুড়ি বা পাথরের গায়ে শেওলা জন্মালে মাছ তা খেতে পারে। প্রয়োজনবোধে পাথরের আড়ালে বিশ্রাম করে আরাম পায়।

॥ অ্যাকোয়েরিয়ামের গাছ ॥



ডাকউইড পানাজাতীয় গাছ, জলে ভেসে থাকে। সহজেই বেশ বাড়ে। মাঝে মাঝে কাঁচি দিয়ে এই গাছের ডালপালা কেটে দিতে হয়।

পণ্ড-উইডস পুকুরের শেঁওলা ঝাঁজিজাতীয় গাছ। এ গাছ অ্যাকোয়েরিয়ামে রাখবার কোন ঝামেলা নেই। সব ধরনের অ্যাকোয়েরিয়ামেই পণ্ড-উইডস রাখা উচিত।

ক্যানাডিয়ান ওয়াটার-উইড জলে বেশ

ভালোভাবে বেঁচে থাকে। মাছেদের নিঃশ্বাস-নির্গত কার্বনিক অ্যাসিড গ্যাস শুষে নিয়ে এই গাছ মাছেদের প্রয়োজনীয় অক্সিজেন যোগায়।

ওয়াটার-মিলফয়েলের পাতা খুব সরু সরু সুতোর মতো। গাছগুলি দেখতে বেশ সুন্দর। অ্যাকোয়েরিয়ামের শোভা বাড়াতে এই গাছের খুব প্রয়োজন।

ভ্যালিস্‌নিরিয়া গাছের পাতার আকার ফিতের মতো। এই গাছও দেখতে সুন্দর।

ওয়াটার-ক্রোফুটের পাতা জলেও ভাসে, কিছু ডুবেও থাকে। এই গাছে বসন্তকালে ছোট ছোট সাদা ফুল ফোটে। এই গাছও অ্যাকোয়েরিয়ামের শোভা বর্ধন করে, মাছেদের পক্ষে প্রয়োজনীয় অক্সিজেনও যোগায়।

যে কয় ধরনের গাছের কথা এখানে উল্লেখ করা হল, তাছাড়া আরও অনেক রকম গাছ অ্যাকোয়েরিয়ামে রাখা হয়। রাশিয়া, জাপান, চীন, ইটালি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, পোর্তুগাল, বেলজিয়াম, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, জার্মানি, পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, নরওয়ে, সুইডেন, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, মেক্সিকো, ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অ্যাকোয়েরিয়াম রাখার চলন আছে এবং সেই সব অ্যাকোয়েরিয়ামে নানা ধরনের গাছ রাখা হয়।

॥ খাদ্য ॥



জলের উপর বিস্কুটের গুঁড়ো ভাসিয়ে দিতে হয়। মাছেরা মুখ তুলে সেই সব ভেসে-থাকা বিস্কুট পরম আনন্দে খায়। সব চেয়ে ভালো খাদ্য খুব ছোট ছোট কেঁচোর বাচ্চা। একটা ছিদ্রওয়ালা কাচের পাত্রে সেগুলোকে রেখে অ্যাকোয়েরিয়ামের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। মাছগুলো কাঁচের পাত্রের তলার ছিদ্র দিয়ে একটা একটা বার করে খায়। এ ছাড়া পিঁপড়ের ডিম, কুচিকুচি করে কাটা ছোট ছোট পোকা প্রভৃতি মাছেদের প্রিয় খাদ্য। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু খাদ্যই দেওয়া উচিত। বেশী দিলে মাছেরা সব না খেতে পারার দরুন জলের তলায় গিয়ে জমে। তাতে জল অপরিষ্কার হয়ে যায়।

লক্ষ্য রাখতে হবে, যাতে অ্যাকোয়েরিয়ামে বেশী আলো প্রবেশ না করে। কখনও অ্যাকোয়েরিয়ামকে কড়া রোদে রাখতে নেই। মরা গাছপালা, পরিত্যক্ত খাবার ইত্যাদি সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকোয়েরিয়াম থেকে তুলে ফেলে দিতে হয়।

॥ মাছেদের রোগ ॥

শরীর থাকলেই রোগ হবে। কাজেই অ্যাকোয়েরিয়ামের মাছেরাও নানা রোগে ভোগে। অসুস্থ মাছকে অ্যাকোয়েরিয়াম থেকে তুলে অন্যত্র রাখতে হবে। তা না হলে তার সংস্পর্শে সুস্থ মাছেরাও রোগে ভুগবে।

মাছেদের পাখনার উপর ছাতা-পড়ার মতো দাগ দেখলে বুঝতে হবে তার পাখনায় fungus হয়েছে। এই মাছ প্রায় সময়েই বাঁচে না। তাদের আলাদা করে ফেলতে হবে। তারপরে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।

এক গ্যালন জলে চায়ের চামচের দু চামচ নুন মিশিয়ে তাতে অসুস্থ মাছকে রাখতে হয়। প্রতিদিন সেই জল বদলে নূতন করে নুন জলে অসুস্থ মাছকে রাখতে হয়। অনেক সময় এইরকম ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে মাছ সুস্থ হয়ে ওঠে।

অ্যাকোয়েরিয়াম বড় ছোট নানা আয়তনের হতে পারে। বড় হলে মাছেরা ভালোভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে। অনেক মাছও রাখা যায়। তবে সাধারণতঃ মাঝারি ধরনের অ্যাকোয়েরিয়াম বাড়ির বৈঠকখানায় রাখা হয়।

নানাদেশের বেশভূষা



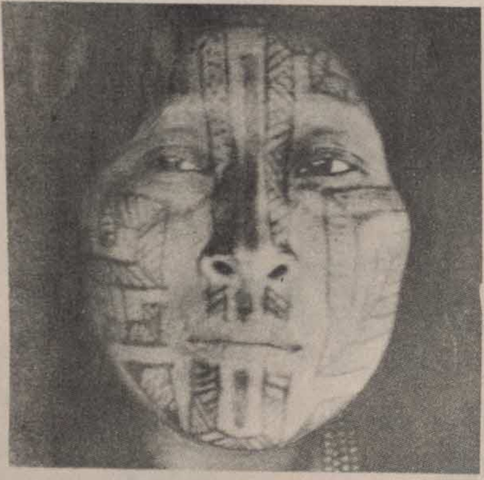
সারা পৃথিবীতে কত দেশ ! সে-সব দেশে কত মানুষ ! বড় বড় শহর থেকে আরম্ভ করে পার্বত্য অঞ্চল, বনভূমি, নদী, মরুভূমি, বরফের দেশ—সব জায়গাতেই নানা জাতের মানুষের বাস। সেই সব মানুষের বেশভূষা নানা ধরনের।

॥ প্রাগৈতিহাসিক যুগের বেশভূষা ॥

আগেকার দিনের বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক-যুগের মানুষের বেশভূষার সঙ্গে আজকালকার মানুষদের বেশভূষার কোন মিল নেই। প্রাগৈতিহাসিক যুগে লোকে বনে জঙ্গলে, পর্বতের গুহায় বাস করত। বাড়িঘর পর্যন্ত তাদের ছিল না। প্রথম দিকে তারা উলঙ্গ অবস্থায় ঘোরাফেরা করত। পরে ক্রমশঃ বিশেষ করে শীতের প্রকোপ থেকে দেহকে বাঁচাবার জন্যে গায়ে একটা সাধারণ আবরণ দেওয়ার চেষ্টা করত।

সেই আবরণ ছিল গাছের শুকনো পাতা, ছাল, পাখির পালক ইত্যাদি দিয়ে তৈরী। ক্রমশঃ মানুষের মনে লজ্জাবোধ হতে লাগল। তারা সারা গায়ে গাছের ছাল, পশুর লোম ইত্যাদি দিয়ে তৈরী একটা অতি সাধারণ আবরণ দিত। ভূষণ ছিল হাড়ের মালা বা রঙিন পাথর ইত্যাদি। সেই ভূষণ অর্থাৎ অলংকার তারা গলায় পরত,

কোমরে ঝোলাত, মাথার চুলে বাঁধত বা হাতে পরত।



দক্ষিণ আমেরিকার এক ইণ্ডিয়ানের নকশা-আঁকা মুখ

শুধু তাই নয়, সে যুগের অসভ্য মানুষেরা লতা-পাতার রস দিয়ে তৈরী রং বা খনিজ পদার্থ দিয়ে গায়ে নানা নকশা আঁকত। সেই ধরনের চিত্র-বিচিত্র আঁকার সাহায্যে দেহকে সুন্দর করে তোলবার চেষ্টা আদিমযুগেও যেমন ছিল, বর্তমান-কালের অরণ্যবাসী বা মরুবাসী মানুষদের মধ্যেও তেমন দেখা যায়।

যত দিন যেতে লাগল, মানুষের রুচির ততই পরিবর্তন হতে লাগল। যতই মানুষ সভ্য হতে লাগল, ততই নিজেদের নানা ধরনের উন্নত পোশাক-পরিচ্ছদে ও ভূষণে সজ্জিত ও ভূষিত করতে লাগল। এমন অনেক দেশ আছে, যে-সব দেশে হাজার হাজার বৎসরেও বেশভূষার তেমন পরিবর্তন হয় নি। কিন্তু ইউরোপ, আমেরিকা প্রভৃতি মহাদেশের সভ্য লোকেরা যে ধরনের পোশাকপরিচ্ছদ পরিধানের প্রথা চালু করেছে, তা সারা পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ছে।



॥ ধুতি-পাঞ্জাবি-শার্ট ও শাড়ী ॥

ভারতীয়দের ধুতি-পাঞ্জাবি বা শার্ট সাধারণ পোশাক হলেও অধিকাংশ স্থানে ইউরোপীয় প্রথায়



গায়ে নকশা-আঁকা



ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা ভারতীয়

কোট প্যাণ্ট পরার রেওয়াজ ব্যাপকভাবে প্রচলিত। অবশ্য, ভারতীয় নারীরা ইউরোপীয় মহিলাদের

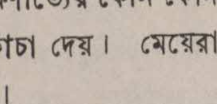


শাড়ী-পরা ভারতীয় নারী

পোশাকপরিচ্ছদের অনুকরণ করে নি। তারা আগের মতোই শাড়ী পরে থাকে। বিদেশে গেলেও তারা শাড়ী পরেই যায়।

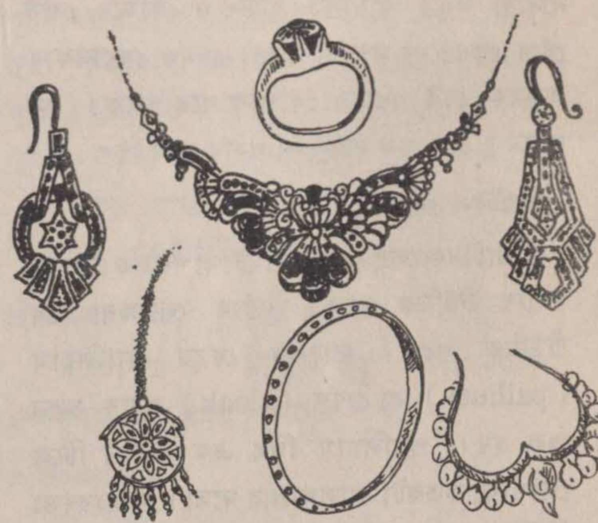
ভারতের নানা রাজ্যের লোকেদের পোশাক-পরিচ্ছদ একরকমের নয়। কেউ পাজামা পরে, দেহের পিছনের অংশে লম্বা কামিজ থাকে। কেউ মাথায় পাগড়ি দেয়। কেউ মালকোঁচা দিয়ে কাপড় পরে। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অংশের মেয়েরা পর্যন্ত মালকোঁচা দেয়। মেয়েরা কোথাও কোথাও ঘাগরা পরে।

আগেকার দিনের কোঁচানো ধুতি, কোঁচানো চাদর, গিলে-করা পাঞ্জাবি ব্যবহারের চলন বিশেষ আর নেই।



॥ অলংকার ॥

সব দেশের মেয়েরা গহনা পরতে ভালবাসে। মরুবাসী, অরণ্যবাসী, তুষাররাজ্যবাসী—সব



নানা ধরনের অলংকার

নারীই নানা ধরনের গহনা পরে। ইউরোপ, আমেরিকার শ্বেতাঙ্গ নারীরাও গহনা পরে থাকে। কিন্তু সব চেয়ে বেশী গহনা পরার প্রচলন ভারতে, বিশেষ করে বাংলায়। সোনা ও রুপোর চুড়ি, হার, তাগা, বালা, আংটি, টায়রা, দুল, নথ প্রভৃতি নানা-ধরনের গহনা পরার রেওয়াজ ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়।

॥ প্রাচীন পারস্য, মিশর ও অ্যাসিরিয়ার পোশাক ॥

প্রাচীন কালে পারস্যবাসীরা চামড়ার তৈরী কোট ও পাৎলুন পরত। মিশর ও অ্যাসিরিয়ার ধনী লোকেরা পশুলোমের তৈরী পোশাকের পরিবর্তে লিনেন বা শনের তৈরী পোশাক পরত। এইসব পোশাকে ছুঁচের সূক্ষ্ম কাজ-করা থাকত। সে-সব পোশাক নানা রঙের হত।

॥ ক্রীট ॥

মূল গ্রীস ভূখণ্ড থেকে প্রায় ৯৬ কিলোমিটার

দূরে পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের দ্বীপ ক্রীট (Crete)-এর নারীরা গায়ে আঁটসাট বডিস ও কোমরে বেল্ট বেঁধে একধরনের ঘাগরা পরত। এখনও সেখানকার অনেকে সেই ধরনের পোশাক পরে থাকে। সে স্থানে ছুঁচলো-মুখ বুটজুতো পরার চলন ছিল।

॥ প্রাচীন রোম ॥

প্রাচীনকালের রোমকরা টোগা পরত ও টোগার তলায় টিউনিক পরত। গরিব লোকেরা শুধু টিউনিক পরত। তারপর রোমে প্যালিয়াম (pallium) বা ক্লোক (cloak) পরার চলন শুরু হয়। প্যালিয়াম ছিল এক ধরনের ঢিলে পোশাক, কতকটা আলখাল্লার মতো। সাধারণতঃ শিক্ষিত রোমকরাই প্যালিয়াম পরত। রোমের নারীরা পরত স্টোলা (stola) ও প্যাল্যা (palla)।

॥ প্রাচীন গ্রীস ॥

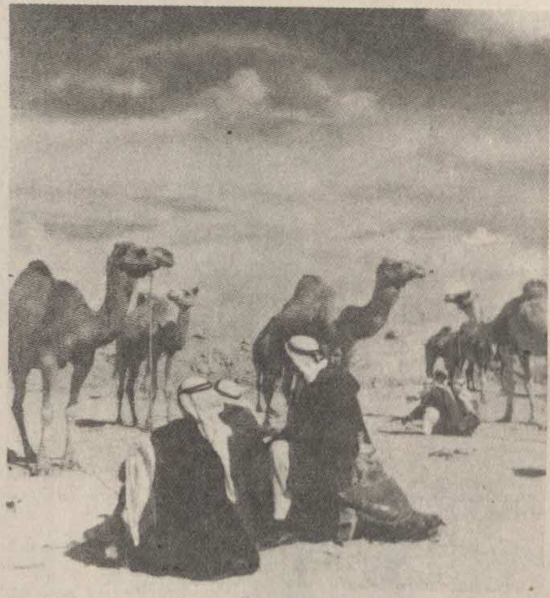
প্রাচীনকালের গ্রীকেরা বহির্বাস হিসেবে পশুলোমের পোশাক হিমেশন (himation) পরত, অন্তর্বাস হিসেবে তার তলায় থাকত কিটন (chiton)। পুরুষ ও নারীর হিমেশন ও ও কিটন পরার ধরনে পার্থক্য ছিল। পুরুষেরা কাঁধ পর্যন্ত আঁটা কিটন পরত। মেয়েরা আঁট করে বেল্ট বেঁধে সেমিজের মতো করে কীটন পরত।

॥ তুরস্ক ও ইজরায়েল ॥

তুরস্ক ও ইজরায়েলের ইহুদী ও মুসলমানেরা তাদের জাতীয় পোশাক পরার পরিবর্তে ইউরোপীয় পোশাক পরে থাকে। তবে সকলেই নয়।

॥ বেদুইন ॥

বেদুইন নারীরা পুরানো দিনের পোশাকই পরে থাকে।



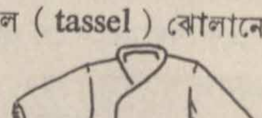
মরুভূমিতে বেদুইন

পুরুষেরা অনেকে সাধারণ আরবীয়ের মতো আব্বা বা হাতাহীন আলখাল্লা পরে।

॥ আরব ॥

আরবীয়েরা আলখাল্লা পরে ও আপাদমস্তক পোশাকে ঢেকে রাখে, যাতে গরম হাওয়া বা বালির ঝড় গায়ে লাগতে না পারে। অনেকে যে টুপি পরে তাতে ট্যাসেল (tassel) ঝোলানো থাকে।

॥ জাপান ॥



জাপানী পুরুষেরা উনবিংশ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় পোশাক পরা শুরু করেছে। অবশ্য কিমোনো (kimono) পরা বন্ধ হয়ে যায় নি। কিমোনো এক ধরনের ঢিলেঢালা বহির্বাস। এই কিমোনো চীনের তাং রাজবংশের পোশাক। জাপানীরা তাং রাজবংশের আমল থেকেই কিমোনো পরা শুরু করেছে। জাপানী মেয়েরা ও শিশুরা ওবি (obi) নামে একধরনের চওড়া



জাপানী পোশাক-পরিহিত নরনারী ও বালক-বালিকা

চাদরের মতো কাপড়ের কোমর-বন্ধনী আঁটে ওবির উপরের বিচিত্র ফুল-তোলা নকশা সুদৃশ্য।

॥ চীন ॥



জাতীয় পোশাকে চীনা সম্রাজ্ঞী

চীনা পুরুষেরা আলগা কোট পরে। তারা যে পাজামা পরে তা সাধারণতঃ সিল্কের হয়। তবে সুতী পাজামার চলনও কম নয়। মেয়েরা নানা ধরনের কোট পরে। সেই সব কোটে বিচিত্র ফুল-তোলা বা অন্য ধরনের ছুঁচের কাজ থাকে।

মেয়েরা মাথার চুলে কাঁটা ও ফুল পরে। অনেকের চুলে চিরুনি গোঁজা থাকে।

॥ মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়া ॥

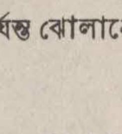
মঙ্গোলিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার নারীপুরুষের বেশভূষার ধরন প্রায় চীনাদের মতোই।

॥ তিব্বত ॥

তিব্বতীয়েরা ঢিলেঢালা পোশাক দিয়ে সারা গা ঢেকে রেখে শীত থেকে আত্মরক্ষা করে। তারা সবাই নানা ধরনের টুপি পরে। তাদের প্রায় সকলেরই পোশাক কাঁধ থেকে পা পর্যন্ত ঝোলানো।

॥ বর্মা ॥

বর্মার নারীপুরুষ সকলেই বিচিত্র লুঙ্গি (লৌঙ্গি) পরে। গায়ে থাকে খাটো-হাতা কোট, যার নাম এঞ্জি। মাথায় একখণ্ড রঙিন ও নকশা-কাটা কাপড়ের ফেট্টি থাকে। বর্মীরা যে জুতো পরে, তাকে বলে ফানা। ফানা এক ধরনের স্ট্র্যাপ-ওয়ালা চটি। অন্যান্য দেশের মতো বর্মীদের মধ্যে ইউরোপীয় পোশাক পরার চলন শুরু হয়ে গেছে। অবশ্য, যারা ইউরোপীয় পোশাক পরে, তারাও বাড়িতে লুঙ্গি ব্যবহার করে থাকে।



॥ এস্কিমো ॥

এস্কিমোরা প্রচণ্ড শীতের দেশের লোক। তুষাররাজ্যে থাকতে হয় বলে তাদের শীত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য পশুর চামড়ার পোশাক দিয়ে

সারা দেহ ঢেকে রাখতে হয়। কিছু কিছু এস্কিমোকে চাকরি বা ব্যবসা করতে বিদেশে যেতে



এস্কিমো জননী

হয়েছে। তারা অনেকে ইউরোপীয় পোশাক পরতে অভ্যস্ত হয়েছে। গ্রীনল্যাণ্ডে ডেনমার্ক সরকার অনেক আধুনিক বাড়ি, স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছে। এস্কিমোরা পাশ্চাত্ত্য কায়দায় থাকতে অভ্যস্ত হচ্ছে। কেউ কেউ ইউরোপীয় পোশাক-পরিচ্ছদ পরলেও অধিকাংশ এস্কিমো তাদের প্রথানুযায়ী পোশাক পরে থাকে।

॥ তাইওয়ান ॥

তাইওয়ানের (ফরমোসার) মেয়েরা একধরনের ঘাসের তৈরী পোশাক পরে। তাইওয়ানবাসী হলেও আসলে তারা চীনা। তাই তাইওয়ানের পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদ চীনাদের মতোই। তাইওয়ানের উত্তরাংশে বনাঞ্চলে যে-সব তাইওয়ান-বাসী পুরুষ শিকারীর বাস তারা যখন শিকারে যায়, তখন গায়ে জালের তৈরী জামা ও নেংটি পরে। অনেক সময়ে মেয়েরাও পুরুষদের সঙ্গে শিকারে যায়। তাদের গায়ে চিত্রবিচিত্র হাত-কাটা জামা থাকে। সকলেই খালি পায়ে যায়।

॥ পাপুয়া-নিউগিনি ॥

পাপুয়া-নিউগিনির অধিবাসীদের বেশভূষা অস্টেলিয়ানদের মতো। কিন্তু সেখানকার আদিম



থাইল্যাণ্ডের মহিলা

অধিবাসীরা নানা রঙের জবড়জং পোশাক পরে। তারা নানা ধাঁচে চুল বাঁধে, চুলে পাখির পালক গোঁজে, মাথায় পালকের লম্বা টুপি পরে, মেয়েরা নাকে, গলায়, কোমরে নানা ধরনের হাড়, রুপা, তামা প্রভৃতির বিচিত্র ধরনের গহনা পরে। গায়ে নানা ধরনের উল্কি পরে, নানা রঙের নকশা কাটে। নাক বিঁধিয়ে লম্বা হাড় বা কাঠি পরে। নর্তক-নর্তকীদের বেশভূষা অদ্ভুত ধরনের।



বলিভিয়ার রমণী

যোদ্ধাদেরও তাই। তারা যে ধরনের জবড়জং জমকালো রঙের পোশাক ও টুপি পরে, তা দেখে সাধারণ দর্শকেরা বিস্ময়বিমুগ্ধ না হয়ে পারে না।

॥ ইউরোপীয় পোশাক ॥



এখনকার দিনে সারা পৃথিবী জুড়ে যে ইউরোপীয় পোশাকের চলন দেখা যায়, দ্বাদশ শতাব্দীর আগে খোদ ইউরোপেই সে-রকম পোশাকের চলন ছিল না। সে সময়ে ইউরোপের লোকে প্রায়ই শার্ট বা খাটো জ্যাকেট পরত। হাতওয়ালা আলখাল্লার প্রচলন ইউরোপের প্রায়



ডাক-ডাক জাতির মাথার টুপি

সব দেশেই ছিল। স্ত্রীপুরুষ সবাই ঢিলেঢালা পোশাক পরত। মেয়েদের পোশাকের হাতা বড় ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মাথা গলিয়ে পোশাক পরার চলন শুরু হয়। মেয়েরা স্কার্ট পরতে শুরু করে। চতুর্দশ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের প্রারম্ভ। তখন থেকে নারীপুরুষরা পোশাকে বেশ পার্থক্য বজায় রেখে চলতে থাকল। প্রথম দিকে মেয়েরা খাটো ঘেরের ও ভাঁজে ভাঁজে ফোলানো গাউন পরা আরম্ভ করল। রানী এলিজাবেথের সময়ে ইউরোপে ধনী ও অভিজাতশ্রেণীর মেয়েরা লম্বা লেজুড়-ওয়ালা গাউন পরত। বালক ভৃত্যেরা সেই লেজুড় (trail) বয়ে নিয়ে যেত। অবশ্য



আয়নার সামনে ফিজি দ্বীপের মহিলা

সেই প্রথার চলন বেশী দিন ছিল না। ইংল্যাণ্ডে যদি বা কিছু দিন এই ধরনের গাউন পরা চালু ছিল, ইউরোপের অন্যান্য দেশে এই জবড়জং পোশাকের রেওয়াজ সহজেই উঠে গিয়েছিল।

নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ক্রমশঃ যাতে সহজে কাজকর্ম করা যায় বা ঘোরাফেরা করা যায় তার জন্যে নারীপুরুষ হালকা ধরনের পোশাক পরা আরম্ভ করল। বর্তমানে ইউরোপীয় পোশাক বলতে বোঝায়, গায়ে পুরো হাতাওয়ালা কোট, লম্বা প্যাণ্ট, পায়ে জুতো মোজা, মাথায় টুপি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোটের সামনের দিকের উপরের অংশ ভাঁজ করে খোলা, সেই খোলা জায়গায় টাই ঝোলানো হয়। হাফ প্যাণ্টের প্রচলন এখন সব দেশেই।

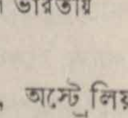
।। আদিম অধিবাসীদের বেশভূষা ।।



আমেরিকার আদিম অধিবাসী লাল ভারতীয় (রেড ইণ্ডিয়ান) মহিলা

আফ্রিকার নানা দেশ, বহু দ্বীপ, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে আদিম অধিবাসীরা বর্তমান যুগেও নানা বিচিত্র ধরনের পোশাক পরে থাকে। যুদ্ধে যাবার সময়ে বা উৎসবকালে নাচের সময়ে তাদের পোশাকে বহু বৈচিত্র্য দেখা যায়।

।। নারীর কেশ-পরিচর্যা ।।



নারীরা সব দেশেই কেশ-পরিচর্যা করে। নানা ধরনের খোঁপা বাঁধা এই কেশ-পরিচর্যারই অঙ্গ।

আফ্রিকা, মধ্য এশিয়া, উত্তর আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, প্রশান্ত মহাসাগরীয় বহু দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের মেয়েরা নানা ভাবে খোঁপা বাঁধে। বাংলায় ও উড়িষ্যায় (ওড়িশায়) এক সময়ে মেয়েদের মধ্যে বাহারী খোঁপা বাঁধার ব্যাপক প্রচলন ছিল। ভারতের আদিম অধিবাসী মেয়েরা আজও নানাভাবে খোঁপা বাঁধে, খোঁপায় চিরুনি গোঁজে।



কঙ্গোর অধিবাসীদের যুদ্ধের সাজ

॥ পরচুল ॥

সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নারীর মাথার চুল অধিকাংশ ক্ষেত্রে তেমন লম্বা হয় না। অথচ লম্বা চুল সব মেয়েরই কাম্য। তাই তারা পরচুল পরে চুলের দৈন্য ঢাকতে চেষ্টা করে।



॥ ববহেয়ার ॥

কেউ কেউ চুল ছেঁটে ফেলে, পাশ্চাত্ত্য জাতির মেয়েদের অনুকরণে ববহেয়ার করে। অবশ্য এই



ববহেয়ার

ববহেয়ার করার চলন বর্তমান কালেও নগণ্য বলা চলে।

॥ ভারতীয় স্ত্রী-পুরুষের পোশাক ॥

আজকাল অনেক ভারতীয় মেয়ে সালোয়ার কামিজ পরে, বর্মীদের পোশাকের অনুকরণ করে, ইউরোপীয় মেয়েদের মতো গাউন পরে, পা-পর্যন্ত ঝোলানো পোশাক (যার নাম ম্যাক্সি) পরে। অনেক মেয়ে পুরুষের মতো প্যান্ট পরে। পুরুষেরা ড্রেনপাইপ প্যান্ট পরে, বুশ শার্ট পরে। অনেকেই বাড়িতে লুঙ্গি পরে বা মেয়েদের শাড়ী লুঙ্গির মতো করে পরে।

॥ বোরখা ॥

আগেকার দিনে সব মুসলমান মহিলা বোরখা

পরত। এখন বোরখা পরার রেওয়াজ কমে এসেছে। তুরস্কে বোরখা উঠে গেছে।

॥ গেরুয়া কাপড় ও টুপি ॥

সাধুসন্ন্যাসীরা ও বিভিন্ন আশ্রমের নারীপুরুষ গেরুয়া রঙের শাড়ী বা ধুতী-পাঞ্জাবি পরে, পুরুষেরা মাথায় গেরুয়া রঙের টুপি পরে, কেউ কেউ গেরুয়া রঙের বস্ত্রখণ্ড পরে।

॥ ভারতীয় নারীর অলংকার ॥

সোনার দাম অসম্ভব রকম বেড়ে যাওয়ার জন্যে ভারতীয় মেয়েদের অনেকেই আগেকার দিনের মতো বহু সোনার গহনা পরতে পায় না। তারা অনেকেই রুপো, এমন কি ইমিটেশন গোল্ড বা স্টেনলেস স্টীলের গহনা পরে থাকে। অবাঙালী নারীরা পায়ে খুব ভারী রুপোর মল পরত, গ্রামের বাঙালী মেয়েরা কোমরে বেশ ভারী চন্দ্রহার পরত। এখন এ সবের চলন ক্রমশঃই উঠে যাচ্ছে। তবে, পায়ে হালকা ধরনের রুপোর গয়না পরার রেওয়াজ উঠে যায় নি। মাথায় টায়রা, নাকে নথ, কানে মাকড়ি, বাহুতে অনন্ত প্রভৃতি পরার প্রথা ক্রমশঃই উঠে গেছে। অবশ্য, আজকাল অনেক মেয়ে আগের মতোই কানে মাকড়ি পরা শুরু করেছে। দাক্ষিণাত্যের মেয়েদের মধ্যে নাকে নাকছাবি পরার ব্যাপক প্রচলন। বাঙালী মেয়েরা নাকে অনেকেই নাকছাবি পরে, কানে দুলের পরিবর্তে ফুল পরে। আফ্রিকা ও অন্যান্য স্থানের আদিম নারী অধিবাসীরা, মরুবাসিনী বা অরণ্য-চারিণীরা এই আধুনিক যুগেও নানা ধরনের জবড়জং গহনা পরে থাকে। অনেক সময়ে সে-সব গহনা সোনা-রুপোর হয় না, জীবজন্তুর হাড়, পালক, নানা ধরনের পাথর, কড়ি প্রভৃতির হয়ে থাকে।

॥ হালকা পোশাক ॥

বর্তমান যুগে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র নারী-পুরুষে হালকা, ছিমছাম পোশাক পরে থাকে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ধরনের হালকা পোশাকে কাজকর্ম করার বা চাকুরে মেয়েদের ট্রামেবাসে চড়ে যাতায়াতের সুবিধা হয়। পুরুষেরা তো ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে শার্ট পাঞ্জাবি ও প্যান্ট পরে থাকে। সারা পৃথিবী জুড়ে লোকে বেশভূষার আড়ম্বরপূর্ণ ও অনাবশ্যক ধরন ত্যাগ করছে।



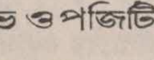
ফটোগ্রাফি (photography) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ আলোকচিত্র। শব্দটা গ্রীক photos ও graphein শব্দের মিলনে উৎপন্ন। photos-এর মানে আলো, graphein-এর অর্থ আঁকা। তাহলে ফটোগ্রাফি শব্দের অর্থ দাঁড়াল আলো দিয়ে আঁকা। তাই আলো দিয়ে আঁকা ছবিকে আমরা বলি ফটোগ্রাফ, সংক্ষেপে ফটো।

॥ ছবিতে ধরে রাখবার উপায় আবিষ্কার ॥

সূর্যের আলোই হোক, আর অন্য যে কোন ধরনের আলোই হোক, সব কিছুই কোন জিনিসের উপর পড়লে সেই জিনিসের ছায়া পড়ে। সেই ছায়া জলেও পড়ে এবং ডাঙ্গায়ও পড়ে। লোকে জলে নিজের ছায়া দেখে। সূর্যের আলোয় গাছের, ঘরবাড়ির, পাহাড়পর্বতের ছায়া ডাঙ্গায় পড়ে। আয়নায় লোকের মুখের ছবি দেখা যায়। সব কিছু দেখে দেখে মানুষ ভাবতে শুরু করে, এই সব ছায়া বা ছবি তো আলো সরে গেলে আর দেখা যায় না, সে-সবকে কি এমনভাবে ধরে রাখা যায় না যাতে যখন ইচ্ছে তাদের দেখা যায়, অথবা সেগুলি চিরকাল ধরে রাখা যায় ?

নানা দেশের নানা মনীষী বিভিন্ন সময়ে ছায়া বা ছবিকে ধরে রাখবার কথা ভাবতে ভাবতে উপায় আবিষ্কার করলেন।

॥ নেগেটিভ ও পজিটিভ ॥



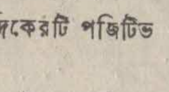
যে যন্ত্রের সাহায্যে ছবি তোলা যায় তারই নাম ক্যামেরা (camera)। নানা পদ্ধতিতে ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা যায়। প্রথমে ক্যামেরার মধ্যে আলোকগ্রাহী প্লেট বা ফিল্ম পুরতে হয়। তার পর ছবি তোলা হলে সেই প্লেট বা ফিল্ম অন্ধকার ঘরে রাসায়নিক পদার্থে ডুবিয়ে ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। তার পর তাকে হাইপো অর্থাৎ হাইপোসালফাইট (hyposulphite)-নামক পদার্থ-গোলা জলে ফেলে ফিক্স্ করতে হবে। তার পর সেই প্লেট বা ফিল্ম পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়ে খোলা বাতাসে শুকিয়ে নিতে হবে। এই প্লেট বা




বাঁদিকের ছবিটি নেগেটিভ। ডান দিকেরটি পজিটিভ বা প্রিণ্ট।

ফিল্মকে বলে নেগেটিভ। তারপর সেই নেগেটিভের উপর আলো ফেলে তার তলায় রাখা এক ধরনের কাগজে যে ছায়া পড়বে, তা-ই হবে ফটোগ্রাফ। সেটাকে বলে পজিটিভ বা প্রিন্ট। পরে তাকেও আবার আগের মতো হাইপো-গোলা জলে ফিক্‌স্ করে নিয়ে পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে। ধোয়া হয়ে গেলে বাতাসে মেলে দিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে। এইভাবে ফটোগ্রাফ পাওয়া যাবে।

॥ দাগেরের আবিষ্কার ॥



কিন্তু এই যে-সব ব্যাপারের কথা বলা হল, তাকে কার্যকর করতে বহু বৎসর ধরে বহু বিজ্ঞানীকে নানাভাবে চেষ্টা করতে হয়েছে। ফ্রান্সের নীপ্‌সে (Nicephore Niepce), তাঁর ভাই ও ছেলে এবং ফরাসী চিত্রকর লুই দাগের (Louis Jacques Mande Daguerre, ১৭৮৯-১৮৫১ খ্রী.) পৃথক্ পৃথক্ ভাবে গবেষণা করতে থাকলেন। পরে দাগের ও নীপ্‌সে মিলিতভাবে চেষ্টা চালিয়ে যেতে থাকলেন। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে দাগের দেখলেন, রুপোর পাতে আয়োডিনের বাষ্প লাগিয়ে নিয়ে তার উপরে আলো ফেললে যে ছবির সৃষ্টি হয়, তা প্রথম দিকে অদৃশ্যই থাকে। অন্ধকার ঘরে রাসায়নিক তরল



লুই দাগের

পদার্থে ফেলে সেই ছবিকে ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজন।

দাগের অদৃশ্য ছবিকে ফুটিয়ে তুলতে পারদের বাষ্প ব্যবহার করতে থাকেন। তিনি অন্ধকারে নুন-জল ও পটাসিয়াম সায়ানাইড প্রভৃতি ব্যবহার করে ছবিকে পাকা করতে অর্থাৎ ফিক্‌স্ করতে সমর্থ হন। এইভাবে তিনি আলোর সাহায্যে ছবি তুলে তা পাকা করবার ব্যবস্থা করেন। এইভাবে আলোর সাহায্যে ছবি তোলার প্রথাকে নীপ্‌সে



প্রথম দিকের তোলা দাগেরোটাইপ

নাম দিয়েছিলেন হেলিওগ্রাফি (heliography),

দাগেরের প্রথার নাম হল দাগেরোটাইপ Daguerrotype)।

॥ ওয়েজউডের আবিষ্কার ॥

১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ওয়েজউডই কাগজে বা পাতলা চামড়ায় সিলভার নাইট্রেট লাগিয়ে তাতে আলো ফেলে গবেষণা চালাতে থাকেন। পরবর্তী কালের বিজ্ঞানীরা আলোর সাহায্যে ছবি তুলতে সিলভার নাইট্রেট-মাখানো কাগজ ব্যবহার করেন। তার পরে সিলভার আইওডাইড ব্যবহার করা হতে থাকে।

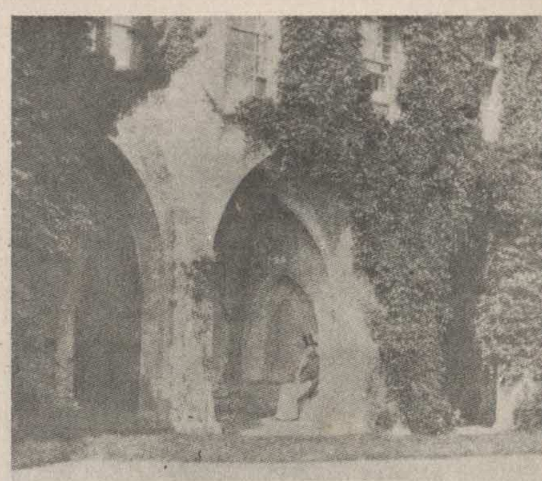
॥ ক্যালোটাইপ ॥

ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম হেনরী ফক্স ট্যালবট (William Henry Fox Talbot, ১৮০০-১৮৭৭



হেনরী ফক্স ট্যালবট

খ্রী) ছিলেন একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। তিনি ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ফটোগ্রাফির মুদ্রণপ্রথা আবিষ্কার করেন। তিনি কাগজের উপর সিলভার ক্লোরাইড মাখিয়ে তার উপরে ছবি তোলবার ব্যবস্থা করেন। এই ছবি তোলার পদ্ধতিকে ট্যালবট নাম দিয়েছিলেন



ক্যালোটাইপ পদ্ধতিতে ট্যালবটের তোলা ছবি

ক্যালোটাইপ (calotype)।

॥ হার্শেলের দেওয়া নাম ॥

প্রথমে যে উলটো ছবি ওঠে অর্থাৎ সাদা জায়গা কালো, আর কালো জায়গা সাদা হয়, বিখ্যাত বিজ্ঞানী হার্শেল তার নাম দেন নেগেটিভ। সেই নেগেটিভের মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে মসলা-মাখানো কাগজে পড়লে যে ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়, তার নাম দেন ফটোগ্রাফ। এই দুটি নামই আজও চলছে।

॥ ভিজে প্লেট ॥

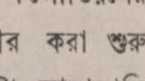
স্কট আর্চার নামে একজন ইংরেজ ভাস্কর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে কাচের প্লেটে কলোডিয়নের সঙ্গে সিলভার ব্রোমাইড-মেশানো তরল পদার্থ মাখিয়ে ছবি তোলবার ব্যবস্থা করেন। অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে কাচের প্লেটে সেই তরল পদার্থ লাগানো হত। লাগিয়েই সঙ্গে সঙ্গে ক্যামেরায় তা পুরে আলোক-চিত্র গ্রহণ করা হত এবং আলোকচিত্র তোলা হলেই অন্ধকার তাঁবুতে গিয়ে তা ডেভেলপ ও ফিক্স্ করা হত। এই ধরনের প্লেটকে বলা হত ভিজে প্লেট (wet plate)।



অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে ভিজে প্লেট তৈরি করা

॥ শুকনো প্লেট ॥

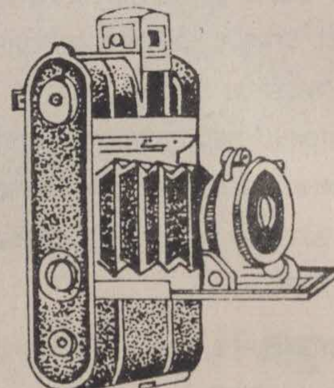
১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির ম্যাডকস কলোডিয়নের বদলে জিলেটিন ব্রোমাইড ব্যবহার করা শুরু করলেন। এর ফলে কাচের প্লেটটা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যেত ও আলোকচিত্র গ্রহণ ভালো হত। এই ধরনের প্লেটকে বলা হত শুকনো প্লেট (dry plate)।

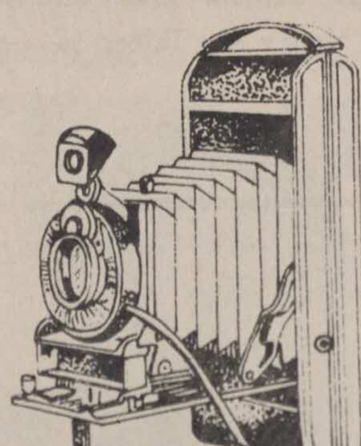


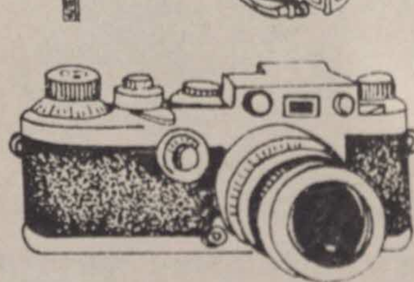
॥ ক্যামেরা ॥

সর্বক্ষেত্রেই আলোকচিত্র গ্রহণের জন্য ক্যামেরার প্রয়োজন হত এবং আজও হয়। প্রথম দিকে সাধারণ চৌকো বাক্সের মতো ক্যামেরার চলন হয়, যার নাম সূচীছিদ্র ক্যামেরা (pinhole camera)। সেই বাক্সের সামনের দিকের খুব ছোট ছিদ্র দিয়ে আলো গিয়ে পড়ত ভিতরে রাখা প্লেটের উপর। সেই প্লেটে বাইরের ছবি প্রতিফলিত হত। পরে অন্ধকার ঘরে সেই প্লেট ডেভেলপ ও ফিক্স্ করে তা ব্রোমাইড কাগজে ছাপা হত। সেই ভাবে আলোকচিত্র অর্থাৎ ফটোগ্রাফ পাওয়া যেত।





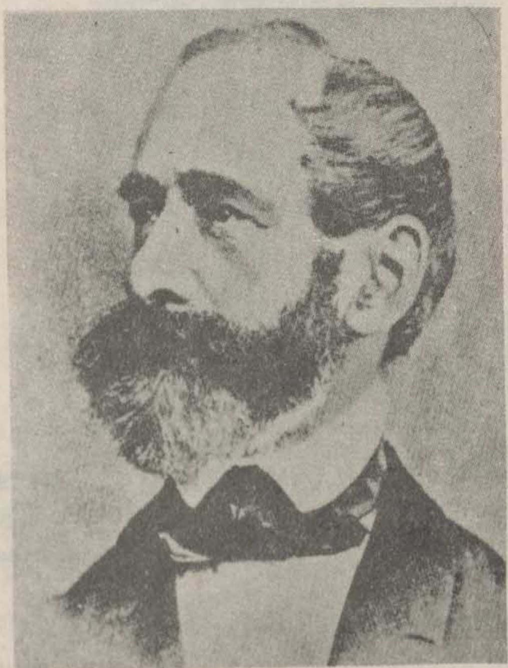




নানা ধরনের ক্যামেরা

॥ জাইসের তৈরী লেন্স্ ॥

বর্তমানে ফটো তোলবার নানা উন্নত ক্যামেরা তৈরী হয়েছে। সেই ক্যামেরার চেহারা নানা ধরনের। তাতে ফুটোর জায়গায় পরকলা কাচ বা লেন্স্ (lens) লাগানো থাকে। এই লেন্সের কাচ উৎকৃষ্ট ধরনের। জার্মানির চশমা-বিক্রেতা



কার্ল জাইস

কার্ল জাইস (Carl Zeiss, ১৮১৬-১৮৮৯ খ্রী.) পূর্ব জার্মানির জেনা (Jena)-নামক স্থানে ক্যামেরার লেন্স্ তৈরির এক কারখানা খুললেন। সেই কার-খানায় উৎকৃষ্ট ফটোগ্রাফের লেন্স্ তৈরী হতে লাগল। আজকাল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে বহু উৎকৃষ্ট ধরনের লেন্স্ তৈরী হয়ে থাকে কিন্তু তখনকার দিনে জাইসের কারখানায় তৈরী লেন্সের মতো অত ভালো লেন্স্ আর কোথাও তৈরী হত না। এই লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো গিয়ে ক্যামেরার ভিতরের প্লেট বা ফিল্মে লাগে।



॥ ফিল্ম ॥

আগে কাচের প্লেটেই বেশির ভাগ ফটো তোলা হত। আজকাল ফিল্মে তোলা হয়। সেই ফিল্ম কাটাও হয় গোটানোও হয়। গোটানো ফিল্ম অর্থাৎ রোল ফিল্ম (roll film)-এর চলন বেশী। কোন ফিল্মে আটটা, কোনটায় বারটা বা ষোলটা, কোনটায় তার চেয়ে অনেক বেশী ফটো তোলা যায়। ফিল্ম ডেভেলপ করার পর তা শুকিয়ে কেটে আলাদা করে নিতে হয়। এই কাটা ফিল্মকে বলে নেগেটিভ (negative)। এই নেগেটিভকে ব্রোমাইড কাগজের উপর রেখে আলোর সাহায্যে যে ফটোগ্রাফ পাওয়া যায় তাকে বলে পজিটিভ (positive) বা প্রিন্ট (print)।

॥ কোডাক ক্যামেরার উদ্ভাবক ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ঈস্টম্যান (George Eastman, ১৮৫৪-১৯৩২ খ্রী.) প্রথম গোটানো বা রোল (roll) ফিল্ম আবিষ্কার করেন। তিনিই কোডাক ক্যামেরার উদ্ভাবক। তিনি ক্যামেরা ও ফিল্মের ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থোপার্জন করেন এবং ৬ কোটি পাউণ্ডেরও বেশী অর্থ জনহিতকর কার্যের জন্যে দান করে যান।

সেলুলয়েডের স্বচ্ছ পাতের উপর মসলা মাখিয়ে ফিল্ম তৈরি করা হয়। ফিল্ম নানা ধরনের। সেই সব ফিল্মের সাহায্যে কম-বেশী সময়ের মধ্যে ফটো তোলা যায়। এমন ফিল্মও বর্তমানে বেরিয়েছে যাতে এক সেকেণ্ডের তিন হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র সময়ে বা তার চেয়ে আরো কম সময়ের মধ্যে

ফটো তোলা যায়। তার ফলে দ্রুতগামী কোন জীব, বিদ্যুৎ, গাড়ি প্রভৃতির আলোকচিত্র সঠিক-ভাবে নেওয়া সম্ভব হয়।

॥ ডেভেলপ করা ॥

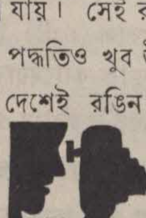
এই সব প্লেট বা ফিল্ম অন্ধকার ঘরে মৃদু লাল আলোয় ডেভেলপ করা হয়। পানক্রোম্যাটিক ফিল্ম মৃদু সবুজ আলোতে ডেভেলপ করা হয়। সেই সব নেগেটিভও প্রিন্ট করবার সময় মৃদু লাল বা সবুজ আলোর ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

॥ নানা ধরনের ফিল্ম ॥

এক ধরনের ফিল্ম শুধু ইনফ্রা-রেড (infra-red) বা অবলোহিত আলোয় তোলা হয়। এক্স্-রের সাহায্যেও ফটো তোলা হয়। শরীরের ভিতরের অংশের ফটো তুলতে গেলে এক্স্-রের সাহায্য নেওয়া হয়। সাধারণতঃ এক্স্-রে ফটোর ফিল্ম সাধারণ ফিল্মের চেয়ে বড়।

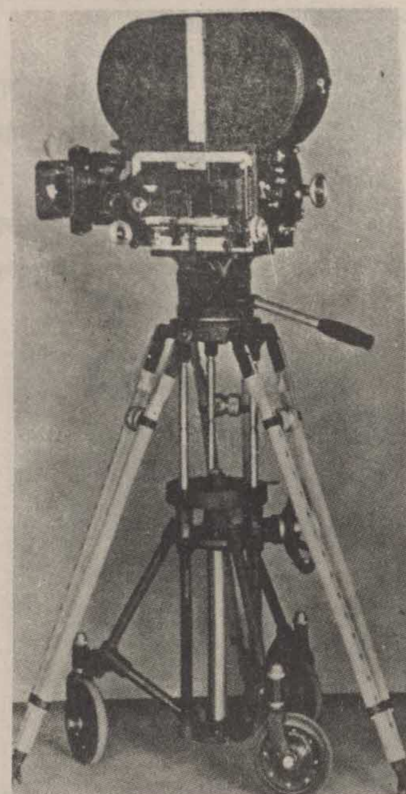
॥ রঙিন ছবি তোলা ॥

বর্তমানে রঙিন ছবিও তোলা যায়। সেই রঙিন ছবি ডেভেলপ ও প্রিন্ট করার পদ্ধতিও খুব উন্নত ধরনের। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই রঙিন ছবি তোলা হয়ে থাকে।



॥ মুভি ক্যামেরা ॥

আগে সিনেমার পর্দায় শুধু সাদা-কালো ছবি প্রতিফলিত হত। বর্তমানে বহু রঙিন চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়ে থাকে। সিনেমার ফিল্ম অনেক বড় হয়। তা রোল ফিল্ম। সিনেমার ছবি তোলবার ক্যামেরাও উচ্চশক্তিসম্পন্ন। সেই ক্যামেরাকে বলা হয় মুভি ক্যামেরা।



এক ধরনের মুভি ক্যামেরা



॥ অ্যাপারচার ॥

ক্যামেরার লেন্সের মধ্য দিয়ে আলোক-প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে মনোমত ফটো তোলা যায় না। তাই লেন্সের মধ্য দিয়ে আলো যাবার পথ নিয়ন্ত্রণের জন্যে অ্যাপারচার (aperture) আছে। এই অ্যাপারচারকে ইচ্ছামতো ছোট বা বড় করা যায়। তার ফলে লেন্সের মধ্য দিয়ে ইচ্ছামতো আলো প্রবেশ করানোর ব্যবস্থা হয়। এই অ্যাপার-চার F. 8, F. 11, F. 5·6, F. 4 প্রভৃতি নানা ধরনের হয়ে থাকে। লেন্সের শক্তি বা বাইরের আলোর তীব্রতা অনুযায়ী অ্যাপারচারকে ছোট বা বড় করা হয়।

॥ শাটার ॥

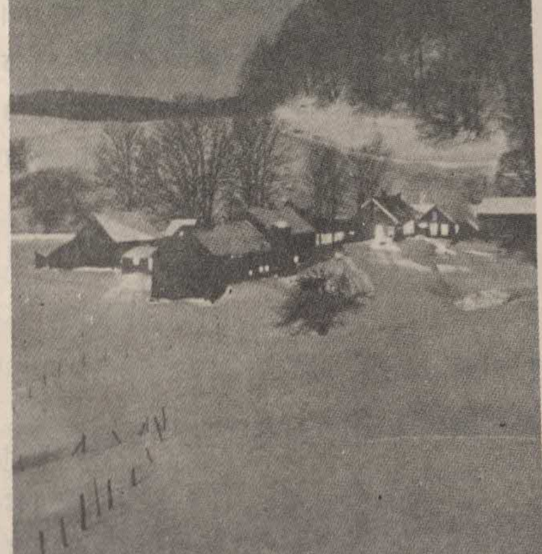
ক্যামেরার শাটার ক্যামেরার মধ্যে আলো

প্রবেশ করবার পথ বন্ধ করে রাখে। ফটো তোলবার আগে সেই শাটার নিমেষের জন্যে খুলেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। ভিতরের ফিল্মে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আলো লাগানো চলে না। বেশী আলো লাগলে ফটো খারাপ হয়ে যায়।

অ্যাপারচার ঢাকা থাকে একটা পাতের মতো জিনিস দিয়ে। তাকে বলে ডায়াফ্রাম (diaphragm)। এই ডায়াফ্রাম থাকে শাটারের মধ্যে।

॥ এক্সপোজার ॥

বাইরের আলোকে যতটুকু সময়ের জন্যে ক্যামেরার ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় তাকে বলে এক্সপোজার (exposure)। এক্সপোজার ঠিক ঠিক হওয়া দরকার। বেশী বা কম সময়ের জন্যে হলে চলবে না। আগেকার দিনে অনেকক্ষণ ধরে এক্সপোজার দিতে হত। তার ফলে যার বা যে জিনিসের ফটো তোলা হত, তা নড়ে গেলে ফটোও খারাপ হয়ে যেত। আজকাল খুব কম সময়ের জন্যে যাতে এক্সপোজার নেওয়া যায়, সেজন্যে ফিল্ম ও লেন্স্ শক্তিশালী করে তোলা হয়েছে।



শীতের রাত্রে চাঁদের আলোয় তোলা দৃশ্য। এই আলোকচিত্র গ্রহণ করতে ৫·৬ অ্যাপারচার খুলে ২ই মিনিট ধরে এক্সপোজার দিতে হয়েছে।

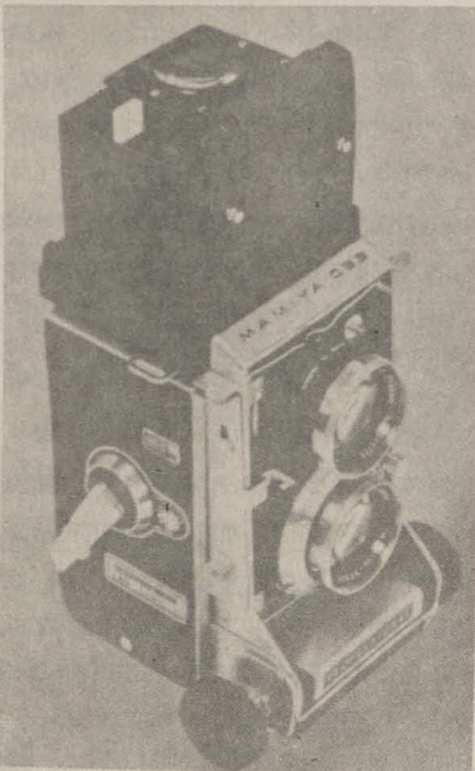
॥ ফোকাসিং ॥

যার বা যে জিনিসের ফটো নেওয়া হবে তার দূরত্ব অনুযায়ী লেন্স্‌কে সামনে বা দূরে সরাতে হয়। একে বলে ফোকাসিং করা। বর্তমানে ক্যামেরায় ফোকাসিং করার প্রথা খুব উন্নত ও সহজ হয়েছে। আগে লেন্স্‌কে আগে পিছে করবার জন্যে এক ধরনের ফোলডিং ক্যামেরার প্রচলন ছিল। বর্তমানে ফোলডিং ক্যামেরার প্রচলন কমে গেছে।



॥ বহু রকমের ক্যামেরা ॥

ক্যামেরা বহু রকমের বক্স ক্যামেরা (box camera), ফোলডিং ক্যামেরা (folding camera) রিফ্লেক্স ক্যামেরা (reflex camera), সিনেমার ছবি তোলবার মুভি ক্যামেরা (movie camera), ক্ষুদে ক্যামেরা বা মিনিয়েচার ক্যামেরা (miniature camera), গান ক্যামেরা (gun camera), ফিংগারপ্রিন্ট ক্যামেরা (fingerprint camera), মাইক্রোফিল্ম ক্যামেরা (microfilm camera), প্রেস ক্যামেরা (press camera), প্রসেস ক্যামেরা (process camera), এরিয়েল ক্যামেরা (aerial camera), দূরবীন-লাগানো ক্যামেরা, ভাইরাস ও অন্যান্য সূক্ষ্ম জীবাণুর ফটো তোলবার ক্যামেরা ইত্যাদি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, জাপান, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইটালি প্রভৃতি দেশে নিয়তই নানা আকারের ও বিভিন্ন শক্তির ক্যামেরা আবিষ্কৃত



জোড়া লেন্স-লাগানো রিফ্লেক্স ক্যামেরা



এই ক্যামেরার ফিল্ম ভরা ও গোটানো আপনাআপনি হয়, দিনের বেলায় ফটো তোলার জন্য এতে ইলেকট্রিক আই (electric eye) আছে।

হচ্ছে। এখন ক্যামেরায় নিজের ফটো নিজেই তোলা যায়। খুব কাছের বা দূরের ফটো তুলতে নানা ধরনের ক্যামেরার প্রচলন হচ্ছে। মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রাদির ফটো তোলবার অতি শক্তিশালী ক্যামেরা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব ক্যামেরার সাহায্যে কোটি কোটি মাইল দূরের নক্ষত্রের বা নীহারিকার আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব হয়েছে।



॥ প্রিন্ট করা ॥

ফটো তোলা হলে অন্ধকার ঘরে মৃদু লাল বা সবুজ আলোয় ডেভেলপ করতে হয়। ফিল্মে ছবি ফুটে উঠলে তা হাইপোর (হাইপোসালফাইটের) গোলা জলে ফিক্স্ করে নিয়ে পরিষ্কার জলে ধুতে হয়। পরে ফাঁকা জায়গায় বাতাসে ঝুলিয়ে রেখে শুকিয়ে নিতে হয়। রোল ফিল্ম হলে কেটে আলাদা আলাদা করে ব্রোমাইড কাগজের উপর প্রিন্ট করতে হয়। এ কাজও অন্ধকার ঘরে মৃদু লাল আলোয় করতে হয়। সেই প্রিন্টকেও হাইপো গোলা জলে ফেলে ফিক্স্ করে নিয়ে পরিষ্কার জলে ধুতে হয়। তার পর তা বাইরের বাতাসে শুকিয়ে নিতে হয়।

॥ প্রিন্ট করার কাগজ ॥

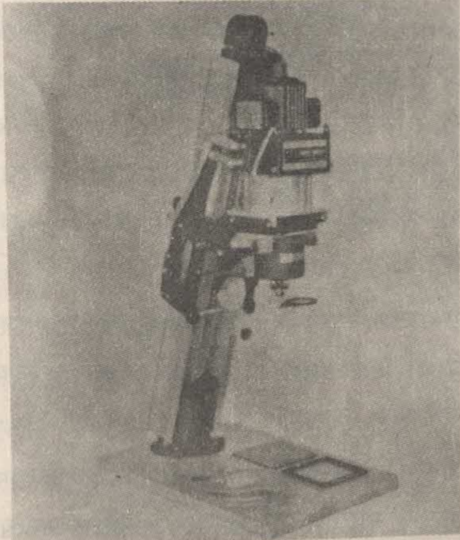
প্রিন্ট করবার কাগজ নানা ধরনের গ্লসি (glossy), ম্যাট (mat) প্রভৃতি। সাধারণতঃ প্রিন্ট-করা কাগজের উপর এক ধরনের ছোট রোলার চালিয়ে তাকে গ্লসি করা হয়। পরিষ্কার কাচের বা ক্রোমিয়াম প্লেটেড ধাতুর পাতের বা সেলুলয়েডের পাতের উপর ভিজে অবস্থায় প্রিন্টকে উপুড় করে রেখে তার উপর সামান্য চাপ দিয়ে রবারের রোলার চালাতে হয়। তাতে জল সব বেরিয়ে যায়।

কাগজটা শুকিয়ে গেলে কাচ থেকে প্রিন্ট তুলে নিতে হয় বা সেই কাগজ আপনা আপনি খসে পড়ে।



॥ এনলার্জার ॥

নেগেটিভের উপর আলো ফেলে এনলার্জার (enlarger)-এর সাহায্যে কোন ছবিকে ইচ্ছামতো



এক ধরনের এনলার্জার

বড় করা হয়। ছোট ফিল্ম থেকে বড় প্রিন্ট পেতে হলে এনলার্জারের ব্যবহার করা দরকার। সাধারণতঃ ৩৫ মিলিমিটার ফিল্মের নেগেটিভ থেকে এনলার্জারের সাহায্যে বড় প্রিন্ট করা হয়।

॥ ফটোগ্রাফির দ্বারা বহু উপকার সাধিত হচ্ছে ॥

ফটোগ্রাফি আবিষ্কার হবার পর থেকে মানুষ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। শুধু শখ মিটানোর জন্য ফটোগ্রাফির ব্যবহার হয় না, দলিলপত্রাদি ছোট করে কপি করা, চিকিৎসার প্রয়োজনে এক্স্-রে ফটোর সাহায্যে শরীরের ভিতরকার অংশের আলোকচিত্র গ্রহণ করা, বিমান থেকে দুর্গম অরণ্য, পর্বত, মরুভূমির আলোকচিত্র নেওয়া প্রভৃতি নানা কার্য সাধিত হচ্ছে।

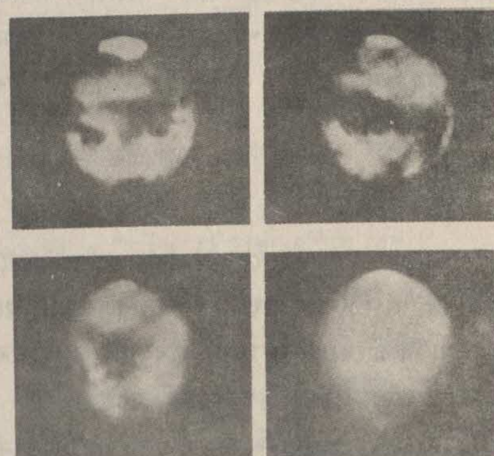
ভালো ফটো তোলা খুব সহজ ব্যাপার নয়, নেগেটিভ থেকে প্রিন্ট করাও সহজ নয়।

। সাজসরঞ্জাম ॥

লেন্স্ হুড (lens hood) দিয়ে লেন্সে বাইরের অপ্রয়োজনীয় অতিরিক্ত আলো লাগবার পথ আটকানো হয়।

ভিউ ফাইণ্ডার (view finder)-এর সাহায্যে যে ছবি তোলা হবে তার অবস্থান, আকৃতি ইত্যাদি দেখা যায়। ভিউ ফাইণ্ডার নানাধরনের—অপটিক্যাল ফাইণ্ডার (optical finder), ব্রিলিয়ান্ট ভিউ ফাইণ্ডার (brilliant view finder), ডাইরেক্ট্ ভিসন ফাইণ্ডার (direct vision finder) ইত্যাদি।

ফ্ল্যাশলাইট (flashlight)-এর সাহায্যে আলোর সৃষ্টি হয়। তাতে ফটো তোলা সহজ হয়।



নানারকম ফিল্টার দিয়ে তোলা মঙ্গল গ্রহের ছবি। ১মটিতে হলদে ফিল্টার, ২য়টিতে লাল ফিল্টার লাগিয়ে ফটো তোলা হয়েছে।

ফিল্টার (filter) নানা রঙের কাচ, যা ফিল্মের মুখে লাগিয়ে বিভিন্ন দৃশ্যের ছবি তোলা হয়। এই ফিল্টার লাল, নীল, সবুজ, হলদে, বেগুনি, কমলা প্রভৃতি রঙের হয়ে থাকে।

॥ এক্সপোজার মিটার ॥

কোন কিছুর ফটো তুলতে গেলে কত সময়ের জন্যে লেন্সের মুখ খোলা রাখতে হবে, তা এই মিটারের সাহায্যে বোঝা যায়। এক্সপোজার মিটার আলাদাও থাকে, ক্যামেরার সঙ্গে লাগানোও থাকে। যে-সব ক্যামেরার সঙ্গে এক্সপোজার মিটার লাগানো থাকে, সেই সব ক্যামেরাকে built-in-exposure meter ক্যামেরা বলে।



॥ ডার্করুম ॥

যত দিন যাচ্ছে ফিল্ম ততই দ্রুত আলোকগ্রাহী হয়ে উঠছে। তার ফলে ডার্করুম (darkroom)-এ অর্থাৎ অন্ধকার ঘরে মৃদু লাল আলোও সরাসরি ফিল্মের গায়ে যাতে না পড়ে তার জন্যে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। ডার্করুম ধূলিশূন্য, ধোঁয়াশূন্য হওয়া দরকার।

॥ নানা কথা ॥

কম এক্সপোজার-দেওয়া ফিল্ম থেকে ভালো প্রিন্টের আশা করা যায় না। বেশী এক্সপোজার-দেওয়া ফিল্ম থেকেও ভালো ছবি পাওয়া যায় না। কাজেই এক্সপোজার ঠিকভাবে দিতে হয়।

ভিজে বা শুকনো ফিল্মের উপরে হাত দিতে নেই। ফিল্মের ধার আঙুল দিয়ে টিপে ধরে তুলতে হয়।

প্রিন্টকে তুলির বা পেনসিলের সাহায্যে কিছুটা সংশোধিত করতে হলে ম্যাট কাগজে করতে হয়। গ্লসি কাগজে কোন রকম সংশোধন (retouching ও spotting) চলে না।

নানা রঙের তরল পদার্থে ডুবিয়ে প্রিন্টকে সিপিয়া, লাল, নীল প্রভৃতি রঙের করা যেতে পারে।

ভালো করে পরিষ্কার জলে প্রিন্ট থেকে হাইপো ধুয়ে ফেলতে হয়। তা না হলে প্রিন্ট কিছু দিন বাদে খারাপ হয়ে যায়।

কোন কিছুর উপরে বা তেপায়ার (tripod-এর) উপরে ক্যামেরাকে রেখে ফটো তোলা ভালো। তাহলে ক্যামেরা নড়ে গিয়ে ফটো খারাপ হবার সম্ভাবনা থাকে না।

সাধারণতঃ সূর্য বা আলো ফটোগ্রাফারের পিছনে বা এক ধারে যাতে থাকে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

লেন্সে যাতে ছাতা না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। মাঝে মাঝে লেন্সকে সামান্য সময়ের জন্যে রোদ্দুর খাওয়ালে লেন্সে ছাতা বা ছাতলা পড়তে পারে না।

লেন্সকে সব সময়ে পরিষ্কার রাখা দরকার। ফটো তোলবার আগে মোলায়েম নরম কাপড় দিয়ে লেন্সকে মুছে নিতে হয়।

চারদিকে ফটো কর্নার লাগিয়ে অ্যালবামে ফটোগ্রাফ এঁটে রাখতে হয়।

সাধারণতঃ লোকে শুধু ফটোই তোলে ও ফটোগ্রাফের দোকানে ফিল্ম ডেভেলপ ও প্রিন্ট করিয়ে নেয়। যারা নিজেরা ফিল্ম ডেভেলপ ও প্রিন্ট করতে চায় তাদের সলিউসন তৈরি, আলোর ব্যবস্থা, নেগেটিভ ধোওয়ার জন্য জলের ব্যবস্থা প্রভৃতির ব্যাপারে শিক্ষা গ্রহণ করতে হয়।



নানাদেশের জাতীয় সংগীত

পৃথিবীর প্রায় সব স্বাধীন দেশের একটি করে নিজস্ব জাতীয় সংগীত (National Anthem) আছে। কোন কোন দেশের জাতীয় সংগীত একাধিক।



॥ ভারতের জাতীয় সংগীত ॥

বহুকাল পরাধীন থাকবার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীন হয়। তখন থেকে জাতীয় পতাকা নির্ধারিত হয়। জাতীয় সংগীত নির্ধারণের জন্যে দেশের মনীষীরা ভারতের সকলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য একটি গানের সন্ধান করতে থাকলেন।

ভারতে ভাষা অনেক, মাতৃভাষা দেড় হাজারের উপর। প্রধান ভাষাই পনেরটি—বাংলা, অসমিয়া, মালয়ালম, হিন্দী, গুজরাটী, পাঞ্জাবী উর্দু, কাশ্মীরী, কানাড়া, মারাঠী, তেলেগু, তামিল, ওড়িয়া, সিন্ধী ও সংস্কৃত। যে দেশের লোক এত ভাষায় কথা বলে তাদের উপযোগী একটি মাত্র ভাষায় জাতীয় সংগীতের ব্যবস্থা করা খুবই দুরূহ কাজ।

স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'বন্দে মাতরম্' সংগীতের প্রথম দু'টি শব্দ 'বন্দে মাতরম্' আসমুদ্র হিমাচল ভারতের লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মুখে উচ্চারিত হয়। তাতে সকলেই অপরূপ প্রেরণা লাভ করে।

'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে স্বাধীনতাসংগ্রামীরা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্রিটিশ সরকারের পুলিস ও সামরিক বাহিনী তাদের উপর নির্মমভাবে অত্যাচার চালায়। 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি মুখে নিয়ে বহু ভারতসন্তান হাসিমুখে ফাঁসিকাঠে মাথা এগিয়ে দেয়।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা অমর উপন্যাস 'আনন্দমঠে' 'বন্দে মাতরম্' গানটি আছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নিবেদিতপ্রাণ 'সন্তান' নামীয় দেশকর্মীরা সেই গান গেয়ে নিজেরা প্রেরণা পেত, অপরের অন্তরে প্রেরণার সঞ্চার করত।

রাজনীতিক নেতারা অনেক ভেবে চিন্তে 'বন্দে

মাতরম্' সংগীতটিকে জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করলেন। মোট ছাব্বিশ ছত্রের গান বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা 'বন্দে মাতরম্'। প্রথম প্রথম সভাসমিতিতে সরকারী অনুষ্ঠানে গানটি পুরোই গাওয়া হত। কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে আপত্তি ওঠায় মাত্র কয়েক ছত্র গ্রহণ করে বাকী অংশ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়—

"বন্দে মাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্রজ্যোৎস্নাপুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।"

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত এর অনুবাদ করেন—

"বন্দনা করি মায়—
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা চন্দন-শীতলায়।
যাঁহার জ্যোৎস্নাপুলকিত রাতি,
যাঁহার ভূষণ বনফুলপাঁতি,
সুহাসিনী সেই মধুরভাষিণী
সুখদায়, বরদায়।"

বেশ কিছু কাল এই খণ্ডিত 'বন্দে মাতরম্' সংগীত সারা দেশে চলতে থাকল। রাজনীতিক নেতারা লক্ষ্য করলেন, এই খণ্ডিত 'বন্দে মাতরম্' সংগীতও একশ্রেণীর ভারতীয়দের মনঃপূত নয়। তখন আবার আর একটি জনপ্রিয় সংগীতের খোঁজ করা হতে লাগল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সারা ভারত কেন সারা বিশ্বের এক অতি প্রসিদ্ধ কবি-সাহিত্যিক। তাঁকে ধরা হল, একটা গান লিখে দিতে। তিনি 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি নির্বাচন করলেন।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে গানটি রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন। এটিকে তিনি ব্রহ্মসংগীত অর্থাৎ বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মের গান হিসাবেই রচনা করেন। গান রচনার কিছু দিন বাদে ভারতের ইংরেজ সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ দিল্লীর দরবারে অভিনন্দিত হন। কিছু লোক অযথা রটনা করল, গানটি পঞ্চম জর্জকে উদ্দেশ করে লেখা তাঁরই স্তুতিগান। অবশ্য, তাদের কথা অধিকাংশ লোকই মানে নি, আজও মানে না।

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে গানটি গাওয়া হল।

ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি নির্বাচিত হল। এ গানটিও বেশ বড়। তার প্রথম স্তবকটিই জাতীয় সংগীত হিসাবে গ্রহণ করা হল—

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে, ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য-হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে, ভারত ভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে!"

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষণা করেন, রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি ছাড়া 'বন্দে মাতরম্' গানটিও জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পাবে।

বর্তমানে সাধারণতঃ কোন সরকারী অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে 'জনগণমন-অধিনায়ক' গানটি গাওয়া হয়। শেষে 'বন্দে মাতরম্' সংগীত গীত হয়।

দু'টি গানেই রবীন্দ্রনাথ সুর দেন।

যতক্ষণ 'জাতীয় সংগীত' গাওয়া হয়, উপস্থিত সবাই উঠে দাঁড়িয়ে গানটির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে থাকে।

প্রথম দিকে জনগণমন-অধিনায়ক গান সম্বন্ধে কিছু কিছু আপত্তি উত্থিত হয়।

সংগীত-রচনার সময় ভারত ছিল অখণ্ড। 'সিন্ধু' ভারতের মধ্যেই ছিল। কিন্তু 'সিন্ধু' বর্তমানে ভারতের অন্তর্গত নয়। কাজেই 'সিন্ধু' কথাটি বাদ দিয়ে তার পরিবর্তে কামরূপ কথাটি জাতীয় সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করার কথা হল। অবশ্য, সেই কথা-মতো কাজ হয় নি।

আগে সিনেমা-গৃহে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের শেষে 'জাতীয় সংগীত' শোনানোর ব্যবস্থা ছিল। এখন আর শোনানো হয় না।

ভারত এখন আর ব্রিটিশের অধীন নয়। কাজেই কোন অনুষ্ঠানে ইংরেজদের জাতীয় সংগীত শোনানো হয় না।

॥ ইংল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত ॥

গ্রেট ব্রিটেনে ইংরেজদের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। তাকে জাতীয় সংগীত (National Anthem) বলা হলেও তাতে জাতি বা দেশের কথা নেই। আছে শুধু রাজার জয়গান—

"God save our Gracions King!
Send him victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us—
God save the King!"

গানটি কার রচনা, তা জানা যায় না। কেউ বলে, গানটির রচয়িতা জন বুল, কেউ বলে হেনরী বেরী।



॥ জাপানের জাতীয় সংগীত ॥

জাপানের জাতীয় সংগীতেও রাজার কথাই আছে—

কিমি গা ইও ওয়া
চিওনি ইয়াচিওনি
সিজারে ইশি নো
ই-ওয়াওতে নারিতে
কো কেনো মুস্থমাদে।"

বাংলায় অনুবাদ করলে এরূপ দাঁড়ায়—

আমাদের রাজা করুন শাসন
হাজার হাজার বছর ধরে,
শিলা জমে গিরি হক তত দিনে,
জমুক শেওলা সে গিরি-পরে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের অনুবাদ—

"অযুত যুগ ধরি বিরাজো, মহারাজ!
রাজ্য হক তব অক্ষয়,
উপল যতদিন না হয় মহীধর
প্রভূত শৈবালে শোভাময়।"

জাপানের বর্তমান সম্রাট্ হিরোহিতো Hirohito জন্ম ১৯০১ খ্রী.)। তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাপানীরা তাদের সম্রাট্‌কে খুব শ্রদ্ধা করে। তাদের জাতীয় সংগীতকে তেমনি গভীরভাবে শ্রদ্ধা জানায়।

জাপানের জাতীয় সংগীত পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে পুরনো। নবম শতাব্দী থেকে এটি প্রচলিত।

॥ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত ॥

পূর্ব পাকিস্তান ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন হয় ও বাংলাদেশ নাম গ্রহণ করে। এদেশেরও জাতীয় সংগীত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের রচিত। একই কবি দু দেশের জাতীয় সংগীতের রচয়িতা। পৃথিবীতে এ দৃষ্টান্ত আর নেই।

গানটি অনেক বড়। তার প্রথম কিছু অংশ বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত

হয়েছে—

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমার ভালবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস,
আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।
ওমা, ফাগুনে তোর আমের বনে
ঘ্রাণে পাগল করে
মরি হায় হায় রে—
ওমা অঘ্রাণে তোর ভরা ক্ষেতে
আমি কী দেখেছি মধুর হাসি!"

॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় পতাকার উপরকার বাঁদিকের কোণে পঞ্চাশটি তারকা আঁকা থাকে। এই তারকাগুলি রাষ্ট্রের প্রতীক অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ৫০টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত। এই পতাকাকে বলে 'দ্য স্টার-স্প্যাংগ্‌ল্‌ড ব্যানার' (The Star-spangled Banner—তারকা-খচিত পতাকা)। এই পতাকার নামেই জাতীয় সংগীত।

ফ্রান্সিস স্কট কী (Francis Scott Key, ১৭৭৯-১৮৪৩ খ্রী.) ছিলেন একজন মার্কিন ব্যবহার-জীবী। তিনি যুদ্ধে সৈন্য হিসাবে যোগদান করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে চেসাপীক উপসাগর (Chesapeake Bay)-এর ধারে ফোর্ট ম্যাকহেনরীর উপরে ইংরেজরা প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ শুরু করে। কী অন্যান্য মার্কিন সেনাদের সঙ্গে ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজে বন্দী অবস্থায় ছিলেন। কী-র মনে হল, দুর্গের সবটাই ভেঙে পড়বে।



দুর্গের উপরে পতাকাটি ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

রাতের অন্ধকারে ভালো করে দেখা গেল না। ভোর হলে, কী দেখলেন, দুর্গ ভেঙে গেছে কিন্তু দুর্গের উপরের পতাকাটি ঠিক দাঁড়িয়ে আছে।

এই দৃশ্য দেখে কী-র মনে অপূর্ব ভাবের উদয় হল। তিনি লিখলেন—

"Oh say! Can you see by the dawn's early light
What so proudly we hailed at the twilight's first gleaning?
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight
O'er the ramparts we watched were so gallantly streaming?"

"বল, প্রথম উষালোকে কি দেখতে পাচ্ছ, কাকে প্রভাতের প্রথম আলোকে অভিনন্দিত করলাম, কার উপরের চওড়া ডোরা ও উজ্জ্বল তারকাগুলি ভয়ংকর যুদ্ধের মধ্যে দুর্গের উপরে সগর্বে বিরাজমান দেখলাম?"

এই রচনাটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসাবে নির্বাচিত হয়। এর নাম 'দ্য স্টার-স্প্যাংগ্‌ল্‌ড ব্যানার।'

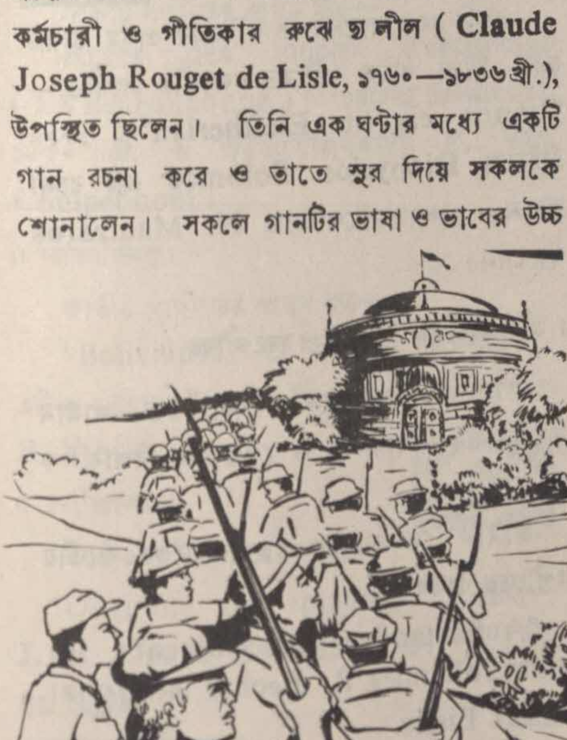
এই জাতীয় সংগীতে অবশ্য জাতি, দেশ বা কোন রাজার কথা নেই। দেশ বা জাতির প্রতীক পতাকার কথা আছে।

কী-র লেখা গানটি সারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু জাতীয় সংগীত হিসাবে নির্বাচিত হয় না। আগে 'আমেরিকা' ও 'হেল কলাম্বিয়া' (**Hail, Columbia**) নামে দুটি জাতীয় সংগীত দেশে চালু থাকে। পরে ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্কট কী-র গানটি জাতীয় সংগীত হিসাবে গণ্য হয়, গানটি রচনার ১১৭ বৎসর বাদে।



॥ ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত ॥

ফরাসী বিপ্লবের সময় ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের শহর স্ট্রাসবুর্গ (**Strasbourg**)-এর এক ভোজসভায় আলোচনা প্রসঙ্গে কথা উঠল, ফরাসীদের উদ্দীপক ও প্রেরণাদায়ক কোন জাতীয় সংগীত নেই। সেই সভাস্থলে ফরাসী সামরিক কর্মচারী ও গীতিকার রুঝে দ্য লীল (**Claude Joseph Rouget de Lisle**, ১৭৬০—১৮৩৬খ্রী.), উপস্থিত ছিলেন। তিনি এক ঘণ্টার মধ্যে একটি গান রচনা করে ও তাতে সুর দিয়ে সকলকে শোনালেন। সকলে গানটির ভাষা ও ভাবের উচ্চ প্রশংসা করল।



বিপ্লবীদের প্রাসাদ আক্রমণ

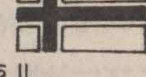
রুঝে দ্য লীলের গানটি মুখে মুখে সারা ফ্রান্সে ছড়িয়ে পড়ল। তিনি গানটির নাম দিলেন 'রাইন বাহিনীর যুদ্ধগীতি'। ঐ বৎসরের শেষের দিকে একদল বিপ্লবী মার্সেল্‌জ্ (**Marseilles**) শহর থেকে ঐ গান গাইতে গাইতে প্যারিসে তুই-লেরিজ (**Tuileries**) প্রাসাদ আক্রমণ করল। তখন থেকে রুঝে দ্য লীলের দেওয়া নাম 'রাইন বাহিনীর যুদ্ধগীতি' বদলে গিয়ে নাম হল 'লা মার্সেলেজ (**La Marseillaise**)।

গানটির প্রথম দুটি ছত্র—

"Allons enfants de la Patrie,
Le jour de gloire est arrive."

এতে বলা হয়েছে—

পিতৃভূমির সকল সন্তান, এস। যশো-লাভের সময় সমাগতপ্রায়।



॥ নরওয়ের জাতীয় সংগীত ॥

নরওয়ের জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Ja, vi elsker dette landet"
(হ্যাঁ, আমি এই দেশকেই ভালবাসি)

জাতীয় সংগীতটি রচনা করেন ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিয়র্নসন (**Bjornstjerne Bjornson**, ১৮৩২—১৯১০ খ্রী.) নামে একজন নরওয়েজিয়ান কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার। সুর দেন ঐ বৎসরেই **R. Nordaak**।

ভারতের জাতীয় সংগীত রচয়িতা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। বিয়র্নসনও নোবেল পুরস্কার-জয়ী সাহিত্যিক।

॥ সুইডেনের জাতীয় সংগীত ॥

আর. ডাইবেক (**R. Dybeck**) নামে একজন কবি ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের জাতীয়

সংগীত রচনা করেন। এটি লোকসংগীত। গানটির প্রথম ছত্র—

"Du gamla, du fria, du fjallhoga nord".

॥ সুইটজারল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত ॥

সুইটজারল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত কোন্‌টি হবে তা নিয়ে দেশের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ডে জার্মান ও ফরাসী ভাষা চলে। সব চেয়ে বেশী চলে জার্মান ভাষা। ২৫টি প্রদেশের ১৯টিতে জার্মান, ৬টিতে ফরাসী ভাষা চলে। মাত্র ১টি প্রদেশে কিছুটা ইতালীয় ভাষা চলে। তিন-তিনটি জাতীয় সংগীত এতদিন চলে আসছিল। ১৯৬২ সালে ফেডারেল কাউন্সিল কর্তৃক একটি জাতীয় সংগীত গৃহীত হয়।—

'Trittst im Morgenrot daher'. লিওনার্ড উইডমার (Leonard Widmer, ১৮০৮—১৮৮৮ খ্রী.) এটি রচনা করেন। Allerik Zwyssig (১৮০৮—১৮৫৪ খ্রী.) সুর দেন।

॥ রাশিয়ার জাতীয় সংগীত ॥

যতদিন রাশিয়া জারের অধীন ছিল ততদিন রাশিয়ার জাতীয় সংগীত যেটি ছিল, সেটির প্রচলন এখন নেই। বর্তমানে প্রচলিত জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Soyuz nerushimy respublic svobodnykh"। গানটি রচনা করেন এস. মিখালকভ (S. Mikhalkov) ও El-Registan এবং সুর দেন এ. ভি. আলেকজান্দ্রভ (A. V. Alexandrov)।

॥ চেকোশ্লোভাকিয়ার জাতীয় সংগীত ॥

চেকোশ্লোভাকিয়া (Czechoslovakia) ইউরোপের একটি দেশ। চেক (Czech) ও শ্লোভাক (Slovak) নামে দুটি জাতি নিয়েই এই দেশ। দুই জাতের মিলিত দেশ একটি হলেও জাতীয় সংগীত দুটি—একটি চেক ভাষার, অপরটি শ্লোভাক ভাষার।

"Kdo domov muj" (কোথা মোর দেশ) এবং "Nad Tatru sa blyska" (গিরিশ্রেণীর শিরে বিজলী ঝলে)।

প্রথম গানটির রচয়িতা J. K. Tyl ও সুরদাতা F. J. Skroup - ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দ, দ্বিতীয় গানটির রচয়িতা J. Matuska, ১৮৪৪ খ্রী.।

॥ গ্রীসের জাতীয় সংগীত ॥



একটি ১৫৪ অনুচ্ছেদের কবিতার প্রথম চারটি চরণ নিয়ে রচিত গ্রীসের জাতীয় সংগীত,— "Imnos eis tin Eleftherian"। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে Dionysios Solomos এটি রচনা করেন। ১৮২৮ সালে এতে N. Mantzaros সুর দেন।

॥ জার্মানির জাতীয় সংগীত ॥

জার্মানি বর্তমানে দ্বিধাবিভক্ত—জার্মান ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিক ও ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি।

জার্মান ডেমক্র্যাটিক রিপাবলিকের জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Auferstanden aus Ruinen"। এর রচয়িতা Johannes R. Becher এবং সুরদাতা Hanns Eisler.

ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Einigkeit und Recht und Freiheit."

এটির রচয়িতা এইচ. হফম্যান (H. Hoffmann) এবং সুরদাতা J. Haydn।

॥ আলবেনিয়ার জাতীয় সংগীত ॥

প্রথম ছত্র "Rreth Flamurit te per bashuar" (যে পতাকা সংগ্রামে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করেছিল)।



॥ আর্জেন্টিনার জাতীয় সংগীত ॥

প্রথম ছত্র "Oid, Mortales, el grito sagrado Libertad"। রচয়িতা V. Lopez y Planes, ১৮১৩ খ্রী. ও সুরারোপকারী J. Blas Parera।

॥ বেলজিয়াম ॥

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

Apres des siecles d'esclavage (La Brabanconne)। রচয়িতা Jennevel, ১৮৩০ খ্রী. ও সুরসংযোজনকারী F. van Campenhout।

॥ বলিভিয়া ॥

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Bolivianos, el hado propicio"। এটির রচয়িতা I. de Sanjines। সুরদাতা B. Vincenti।



॥ ব্রাজিল ॥

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

Ouviram do ipiaanga। কথা—J. O. Duque Estrada। সুর—F. M. da Silva.

॥ বুলগেরিয়া ॥

An arrangement of Mila Rodino (প্রিয় পিতৃভূমি) জনপ্রিয় জাতীয় সংগীত। ১৯৬৪ সালে রচিত হয়।

॥ চিলি ॥



জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র

"Dulce patria, recibe los votos।" রচয়িতা E. Lillo, ১৮৪৭ খ্রী.। সুরদাতা Ramon Carnicer, ১৮২৮ খ্রী.।

॥ চীন ॥

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র "March on, brave People of our nation" (আমাদের জাতির সাহসী লোকেরা অগ্রসর হও)। সুরারোপ করেন Nie Er।

॥ তাইওয়ান ॥

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"San Min Chu I"। ডঃ সান ইয়াট-সেন (Dr. Sun Yat-sen, ১৮৬৭-১৯২৫ খ্রী.) গানটি রচনা করেন। এতে সুর দেন Cheng Mao-yun।

॥ কলম্বিয়া ॥

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Oh! Gloria immarcesible"। কথা R. Nunez। সুর—O. Sindici।

॥ কোস্টা রিকা ॥

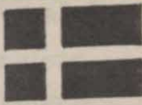
J. M. Zeledon ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় সংগীত রচনা করেন। প্রথম ছত্র – Noble patria, tu hermosa bandera। সুর দেন M. M. Guitierrez।



॥ কিউবা ॥

P. Figueredo ১৮৬৮ সালে যে জাতীয় সংগীত রচনা করেন, তার প্রথম ছত্র "Al combate corred bayameses"।

॥ ডেনমার্ক ॥



জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Kong Kristian stod ved hojen Mast" (রচয়িতা J Ewald, ১৭৭৮ খ্রী. ও সুরদাতা J. E. Hartmann, ১৭৮০ খ্রী.) এবং "Der er et yndigt land"।

॥ ডমিনিকান রিপাবলিক ॥

E. Prud'homme যে জাতীয় সংগীতটি রচনা করেন ও তাতে সুর দেন J. Reyes (১৮৮৩ খ্রী.) তার প্রথম ছত্র—

"Quisqueyanos valientes, alzemos।"

॥ ইকোয়েডর ॥

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Salve, oh patria !" রচয়িতা জে. এল. মেরা (J. L. Mera)। সুর এ. নিউম্যান (A. Neumann, 1866)।

॥ এল স্যালভ্যাডর ॥

জে. জে. ক্যানাস (J. J. Canas) কর্তৃক রচিত ও জে. অ্যাবার্লি (J. Aberle) দ্বারা সুর-দেওয়া জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Saludemos la patria orgnllosos।"

॥ ইথিওপিয়া ॥



জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—

"Ityopya, Ityopia kidemi"। এতে সুর দেন ডেনিয়েল যোহানেস (Daniel Yohannes, ১৯৭৫ খ্রী.)।

॥ ফিনল্যাণ্ড ॥

জাতীয় সংগীত—Maamme ; Swedish ; Vart Land। কথা—J. L. Runeberg, ১৮৪৩ খ্রী. ; সুর—F. Pacius, ১৯৪৮ খ্রী.

॥ ঘানা ॥

জাতীয় সংগীত : Hail the name of Ghana।

॥ গুয়াতেমালা ॥

জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র—Guatemala ! feliz। কথা J. J. Palma। সুর—R. Alvarez।

॥ হাইতি ॥

J. Lherisson-রচিত জাতীয় সংগীতের প্রথম ছত্র 'La Dessalinienne' : Pour le pays, pour les ancetres। সুর—N. Geffard, ১৯০৩ খ্রী.।

॥ হণ্ডুরাস ॥

জাতীয় সংগীতের প্রারম্ভ—Tu bandera es un lampo de cielo। কথা—A. C. Coello। সুর—C. Hartling।

॥ হাঙ্গেরী ॥

Ferenc Kolcsey-রচিত জাতীয় সংগীতের প্রারম্ভ God bless the Hungarians—Isten aldd meg a magyart। সুর—Ferenc Erkel।

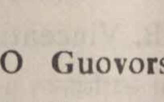
॥ আইসল্যাণ্ড ॥

জাতীয় সংগীতের প্রারম্ভ O Guovors lands। কথা—M. Jochumsson, ১৮৭৪ খ্রী.। সুর—S. Sveinbjornsson।

॥ ইন্দোনেশিয়া ॥

জাতীয় সংগীতের প্রারম্ভ 'Indonesia Raya'। কথা—Wage Rudolf Supratman, ১৯২৮ খ্রী.।

॥ ইজরায়েল ॥



জাতীয় সংগীতের প্রারম্ভ Hatikvah (The Hope)। কথা—N. N. Imber, ১৮৭৮ খ্রী.

॥ ইটালী ॥

জাতীয় সংগীত : Fratelli d' Italia। কথা—G. Mameli। সুর—M. Novaro, ১৮৪৭ খ্রী.।



॥ উত্তর কোরিয়া ॥

জাতীয় সংগীত : The Song of General Kim Il Sung.

॥ লাওস ॥

জাতীয় সংগীত : Peng Sat Lao (Hymn of the Lao People)।

॥ লেবানন ॥

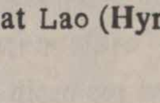
জাতীয় সংগীত : Kulluna lil watan lil 'ula lil' alam। কথা—Rashid Nachleh। সুর—Mitri El-Murr।

॥ লাইবিরিয়া ॥

জাতীয় সংগীত : 'All hail, Liberia, hail'। কথা : President Warner। সুর O. Lucas, ১৮৬০ খ্রী.।

॥ মাদাগাস্কার ॥

জাতীয় সংগীত : 'Ry tanindrazanay Malala O'।



॥ মেক্সিকো ॥

জাতীয় সংগীত : Mexicanos, al grito de guerra। কথা : F. Gonzalez Bocanegra। সুর : Jaime Nuno, ১৮৫৪ খ্রী.।

॥ দ্য নেদারল্যাণ্ডস্ ॥

জাতীয় সংগীত : Wilhelmus van Nassouen। কথা : Philip Marnix van St Aldegonde, আনুমানিক ১৫৭০ খ্রী.।

॥ নিউ জীল্যাণ্ড ॥

জাতীয় সংগীত : God Save the Queen ; God Defend New Zealand। কথা : Thomas Bracken। সুর : John J. Woods।



॥ পানামা ॥

জাতীয় সংগীত : 'Alcanzamos por fin la victoria'। কথা : J. de la Ossa। সুর : Santos Jorge, ১৯০৩ খ্রী.।

॥ প্যারাগুয়ে ॥

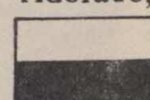
জাতীয় সংগীত : 'Paraguayos, repuplica O murete !' কথা—F. Acuna de Figueroa। সুর—F. Dupey।

॥ পেরু ॥

জাতীয় সংগীত : Somos Libres, seamoslo siempre। কথা : J. de la Torre Ugarte। সুর : J. B. Alcedo, ১৮২১ খ্রী.।

॥ ফিলিপিন্‌জ্‌ ॥

জাতীয় সংগীত : 'Tierro Adorado,' 'Land of the m rning'।



॥ পোল্যাণ্ড ॥

জাতীয় সংগীত : Jeszcze Polska nie zginela। কথা : J. Wybicki, ১৭৯৭ খ্রী.। সুর : M. Oginski।

॥ পোর্তুগাল ॥

জাতীয় সংগীত : A Portuguesa। কথা : Lopes de Mendonca, ১৮৯০ খ্রী.। সুর : Alfredo Keil।

॥ রুমানিয়া ॥

জাতীয় সংগীত : Trei culori (Three colours), ১৯১৭ খ্রী.। সুর : Ciprian Porumbescu।

॥ স্পেন ॥

জাতীয় সংগীত : 'Marcha real'।

॥ তুরস্ক ॥

জাতীয় সংগীত : 'Korkma ! Sonmez bu safaklarda yuzen al sancak'। কথা : Mehmed Akif Ersoy। সুর : Zeki Gungor।



॥ উরুগুয়ে ॥

জাতীয় সংগীত : Orientales, la patria o la tumba। কথা : Francisco Acuna de Figueroa। সুর : Fransisco Jose Deballi।

॥ ভেনিজুয়েলা ॥

জাতীয় সংগীত : 'Gloria al bravo pueblo', ১৮১১ খ্রী.। রচয়িতা : Vicente Salias। সুর : Juan Landaeta।

॥ ভিয়েতনাম ॥

জাতীয় সংগীত : 'Tien quan Ca' (সৈন্যদল অগ্রসর)।



॥ যুগোশ্লাভিয়া ॥

জাতীয় সংগীত : Hej, Slaveni, joste zivi rec nasih dedova (স্লাভগণ, আমাদের পূর্বপুরুষদের বাণী এখনও বর্তমান)।



জুলিয়াস সীজারের হত্যাকাণ্ড

বিখ্যাত রোমক অধিনায়ক (dictator) কেয়াস জুলিয়াস সীজার (**Caius Julius Caesar,** আনুমানিক ১০১-৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রাচীন কালের অতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। দুরন্ত ইচ্ছাশক্তি, দুর্জয় সাহস, বিরাট পাণ্ডিত্য তাঁকে সে যুগে খ্যাতির উচ্চ শিখরে আসীন করেছিল। পম্পেয়ী ও ক্র্যাসাসের সঙ্গে তিনি যুগ্মভাবে দেশে শাসন-কার্য চালান (ত্রয়ীর শাসন)। ৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি ফ্রান্সকে (Gau -কে) রোমক সাম্রাজ্যের অধীন করেন। তিনি ৫৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ব্রিটেন আক্রমণ ও জয় করেন। জার্মানিও তাঁর দ্বারা অধিকৃত হয়। ৪৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সীজার রোমক সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিনায়ক হন। তাঁর সঙ্গে ক্লিওপেট্রার বিবাহ হয়।

সীজারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি ক্রমশঃ সেনেটের সদস্যগণকে বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন করে তোলে। শেষ পর্যন্ত তিনি বার বার যাঁদের অপরাধ মার্জনা করেন, তাঁরাই এক জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হন। ৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের ১৫ই মার্চ (**Ides of March**) প্রধানতঃ ব্রুটাসের নেতৃত্বে তাঁদের দ্বারা তিনি সেনেটের মধ্যে ছুরিকাঘাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন। [পূর্বপৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছবি]।

জুলিয়াস সীজার **Julian Calendar**-এর প্রবর্তক হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। তিনি একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন।

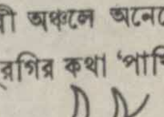


জীবজন্তু পোষা

লোকে নানা জীবজন্তু পোষে। সে-সবের মধ্যে কোন কোন জন্তুকে শখ করে পোষা হয়, কোন কোন জন্তু দ্বারা নানা উপকার হয়, তাই তাদের পোষ মানিয়ে বাড়িতে রাখা হয়।

গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, সাদা ইঁদুর, খরগোশ, গিনিপিগ, বেঁজি, হরিণ, বানর এমন কি বাঘ পর্যন্ত লোকে পোষে।

মাছ, পাখিও জীব। কিন্তু তাদের কথা অন্যান্য অধ্যায়ে বলা হয়েছে। পল্লী অঞ্চলে অনেকেই হাঁস মুরগি পোষে। এই হাঁস মুরগির কথা 'পাখি পোষা' অধ্যায়ে বলা হয়েছে।

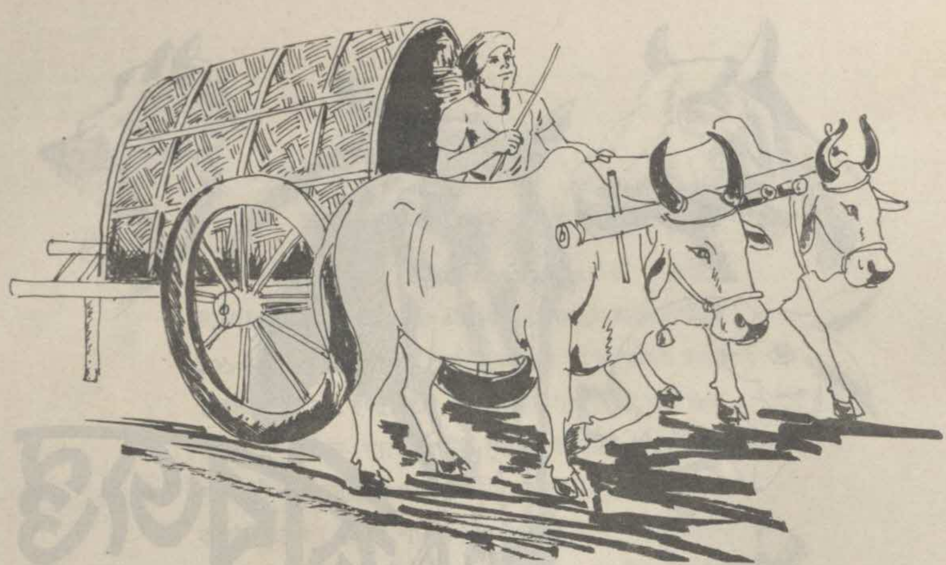


॥ গরু পোষা ॥

গরুর দ্বারা মানুষের অনেক উপকার হয়। দুধ দেওয়া, গোবর থেকে সার ও ঘুঁটে তৈরী হওয়া, বলদকে দিয়ে গাড়ি টানানো, জমিতে লাঙ্গল দেওয়া প্রভৃতি নানা কাজ হয়ে থাকে। গরু মানুষের পরম উপকারী জীব। পৃথিবীর সর্বত্রই লোকে গরু পোষে। ভারতে গরুর সংখ্যা সব দেশের চেয়ে বেশী। গরুর দুধ লোকে খায়, এই দুধ থেকে ছানা, মাখন, ঘি, পনীর প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে।

॥ মহিষ ॥

মহিষ প্রায় গরুর মতোই উপকারী জীব। মহিষ বেশী দুধ দেয়। এদের দুধ গরুর দুধের চেয়ে ঘন। মহিষ গাড়ি টানে, কোথাও কোথাও জমিতে লাঙ্গল দেওয়ার কাজ করে। মহিষের বিষ্ঠা জমির উৎকৃষ্ট সার। এ থেকে ঘুঁটেও হয়। গরুর



বলদ গাড়ি টানে

চেয়ে মহিষের সংখ্যা কম।

ভেড়ার সম্বন্ধে ওই একই কথা।



গরু দুধ দেয়



মহিষ

॥ ছাগল-ভেড়া ॥

ছাগল দুধ দেয়। লোকে ছাগলের মাংস খায়।



ভেড়ার পাল

॥ ঘোড়া ॥



ঘোড়া গাড়ি টানে, বিদেশে লাঙ্গল টানে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে লোকে যুদ্ধ করে। ঘোড়দৌড়ের ঘোড়া ক্রীড়ামোদীদের আনন্দ দেয়। পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই নানা জাতের ঘোড়া আছে।

॥ কুকুর পোষা ॥

কুকুর নানা জাতের। সব দেশের লোকই বাড়িতে কুকুর পোষে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে লোকে শখ করে কুকুর পোষে।

বন্য পশু শিকার করতে যাবার সময় শিকারীরা সঙ্গে কুকুর নেয়। বরফের দেশে কুকুর স্লেজ গাড়ি টানে। কুকুর বাড়ি পাহারা দেয়, ভেড়া ইত্যাদির পাল চরাবার সময় যাতে ভেড়া অন্য দিকে চলে না যায় সেদিকে পোষা কুকুর দৃষ্টি রাখে, কোথাও কোথাও ঘোড়দৌড়ের মতো কুকুরদৌড় (dog race) হয়। এমনি বহু রকম কাজ কুকুরের দ্বারা সাধিত হয়ে থাকে।

শখের জন্যে কুকুর পুষতে গেলে বাড়ির পরিবেশ অনুযায়ী কুকুর ঠিক করা দরকার। সব ধরনের কুকুর সব বাড়িতে পোষা চলে না।

অ্যালসেশিয়ান কুকুর পোষা সম্ভ্রান্ত লোকদের বাড়িতে আজকাল রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই কুকুর পোষা খুব ব্যয়সাধ্য। কাজেই কোন রকম বিবেচনা না করেই যে-সে বাড়িতে এই কুকুর পোষা উচিত নয়।

ভারতের চেয়ে পাশ্চাত্য দেশে বেশী সংখ্যায়

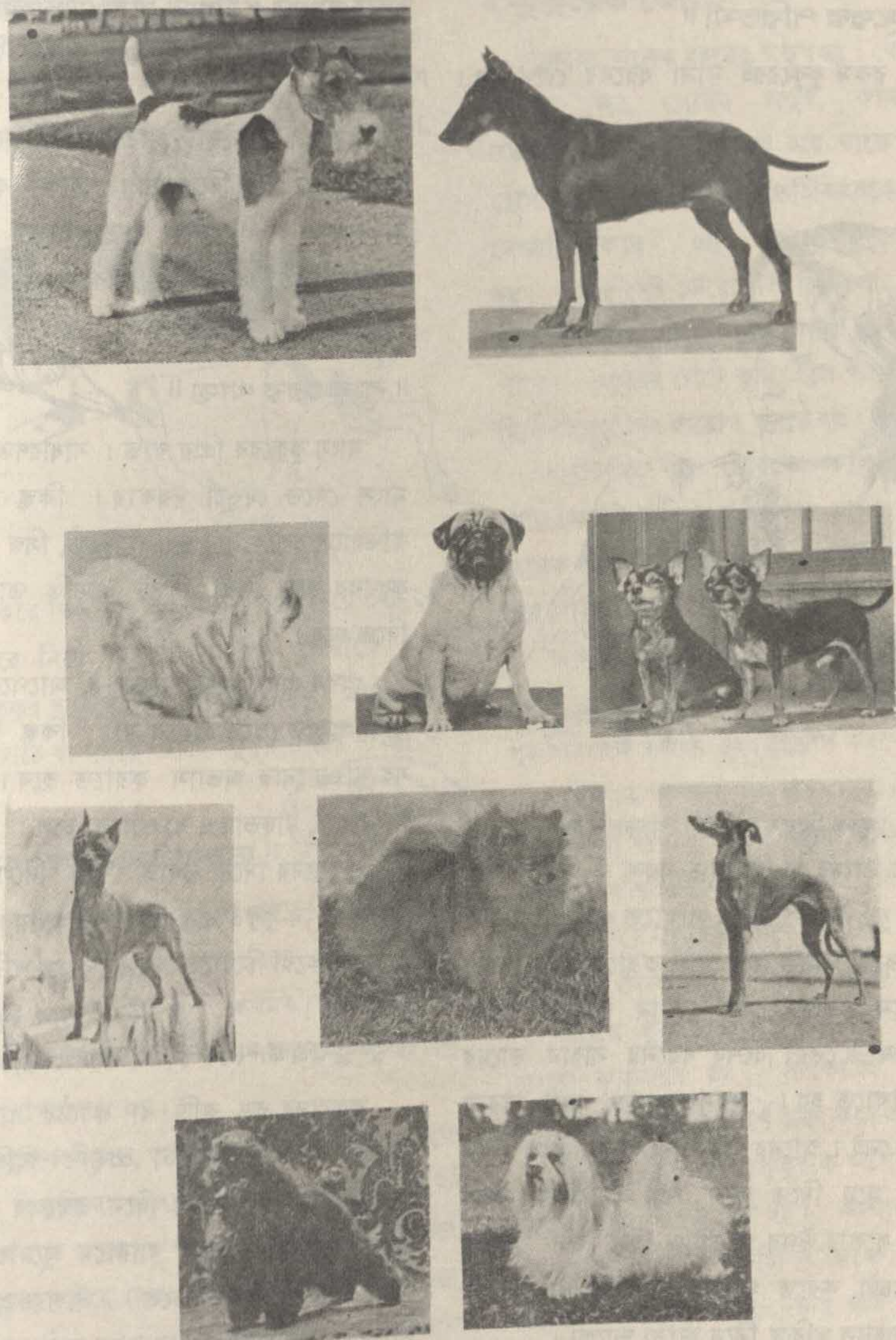


নানাধরনের ভেড়া

কুকুর পোষা হয়। সেই সব কুকুর যে কত রকমের তা বলে শেষ করা যায় না।

॥ বিভিন্ন রকমের নাম ॥

আফগান হাউণ্ডস, ব্লাডহাউণ্ডস, বরজোইস, ড্যাকসহুণ্ডস, (Dachshunds, নানা ধরনের), ডীয়ারহাউণ্ডস, ফক্সহাউণ্ডস, গ্রেহাউণ্ডস, রিট্রীভারস, স্পেনিয়েলস (নানা ধরনের), বুল টেরিয়ারস, ফক্স-টেরিয়ারস, স্কটিশ টেরিয়ারস, ওয়েলশ টেরিয়ারস, অ্যালসেশিয়ানস (জার্মান শেফার্ড ডগস), বুলডগস, ম্যাস্টিফস, পুড্‌ল্‌স্‌, পিরেনীজ মাউন্টেন ডগস, সেণ্ট বার্নাডস, তিব্বতীয় স্পেনিয়েলস, ইটালিয়ান গ্রেহাউণ্ডস, মাল্টিজ, ইয়র্কশায়ার টেরিয়ারস, আইস-ল্যাণ্ড ডগস, তিব্বতীয় ম্যাস্টিফস, পোলিশ শীপ্‌ডগস ইত্যাদি দুই শতাধিকের উপর জাতের কুকুর আছে। প্রত্যেক কুকুর ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করে মানুষের উপকার করে থাকে।



নানা জাতের কুকুর

॥ কুকুরের পরিচর্যা ॥

সব রকম কুকুরেরই নানা ধরনের রোগ হয়।



বুরুশ দিয়ে কুকুরের গা আঁচড়াতে হয়

সেইজন্যে তাদের গা নিয়মিত বুরুশ ও চিরুনি দিয়ে অাঁচড়ে চূর্ণ ঔষধ পাউডার লাগাতে হয়।

কুকুরকে ঈষদুষ্ণ জলে স্নান করাতে হয়। তবে বেশী স্নান করাতে নেই। স্নান করাবার আগে কুকুরের জন্যে তৈরী বিশেষ ধরনের সাবান তাদের গায়ে মাখাতে হয়। কখনও চোখে মুখে সাবান মাখাতে নেই। স্নানের পর পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে সারা গা মুছে দিতে হয়। তা না করলে কুকুর মেঝেতে ধুলোর উপর গড়াগড়ি দিয়ে জল শুকিয়ে নেবার চেষ্টা করতে পারে। স্নানের পর বাইরে ফাঁকা বাতাসে ঘুরিয়ে নিয়ে আসা ভালো।

বাড়ির পোষা কুকুরের নখ বড় হয়ে পায়ের তলার মাংসের পুঁটুলিতে বসে যেতে পারে। তাই নিয়মিত বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নখের ডগা কেটে দেওয়া দরকার।

কুকুরের দাঁত ছোট টুথব্রাশের সাহায্যে ভালো পেস্ট দিয়ে মেজে দিতে হয়। তা না করলে দাঁত অপরিষ্কার থাকার ফলে দাঁত ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা। দিনে দুবার (সকালে ও রাত্রে) দাঁত মেজে দেওয়া দরকার।

॥ কুকুরের খাদ্য ॥



মাংস কুকুরের প্রিয় খাদ্য। সাধারণতঃ আধসিদ্ধ মাংস খেতে দেওয়া দরকার। কিন্তু শুধু মাংস খাওয়ালে চলবে না। দুধ, পাঁউরুটি, সিদ্ধ শাকসবজি, কুকুরের জন্যে তৈরী বিস্কুট প্রভৃতি তাদের খেতে দিতে হবে।

প্রথম প্রথম কুকুর আলুসিদ্ধ, আপেলের ফালি, কলা প্রভৃতি খেতে চাইবে না। কিন্তু তাদের এ-সব খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হবে। দুধভাত, মাংসভাত, মাছভাতও খাওয়ানো চলে।

কুকুরদের দিনে দুবার খেতে দিলেই চলবে। কোন কোন কুকুর একবার মাত্র খায়। বড় বড় হাড়ের টুকরো চিবোতে দিলে কুকুরের পরিপাকশক্তি বৃদ্ধি পায়।

॥ কুকুরের থাকবার জায়গা ॥

কুকুরদের বড় ঝুড়ি বা কাঠের বাক্সের মধ্যে খবরের কাগজ, খড়কুটো প্রভৃতি বিছিয়ে শুতে দেওয়া ভালো। শীতের দিনে কম্বলের বা কাঁথার উপর শুতে দিলে কুকুর আরামে ঘুমোয়। খড়ের গদি ব্যবহার করাও চলে। সাধারণতঃ কুকুরেরা ঘরের বাইরে গিয়ে প্রস্রাব বাহ্য ত্যাগ করে, সেজন্য রাত্রে ঘরের দরজা খুলে রাখা দরকার।

॥ কুকুরের ব্যায়াম ॥

খুব সকালে কুকুরকে নিয়ে ফাঁকা জায়গায় বেড়াতে যেতে হবে। পথের কুকুর যাতে আক্রমণ না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। সকালে,



কুকুর বল মুখে করে নিয়ে আসে

বিশেষ করে বিকালে একটা বল ছুঁড়ে দিয়ে সেটাকে মুখে করে নিয়ে আসতে কুকুরকে শেখাতে হয়। তাতে কুকুর আনন্দ পায়, ব্যায়ামও হয়। সাধারণতঃ খোলা মাঠে বা নদীর ধারে কুকুর নিয়ে বেড়ানো ভালো।



॥ ভালো জাতের কুকুর ॥

কুকুর পুষতে গেলে ভালো জাতের কুকুর পুষতে হয়। যে-সব কুকুরের বংশপরিচয় ভালো, সেই সব কুকুর পোষাই ভালো। কখনও পথের কুকুরের বাচ্চা ঘরে আনতে নেই। সে-সব কুকুর অধিকাংশ সময়ে রোগাক্রান্ত হয়।

কুকুরকে বসতে, শুতে, উঠতে, দাঁড়াতে শেখাতে হয়। কিছুদিনের মধ্যেই কুকুর মালিকের কথামতো কাজ করতে পারে। খবরের কাগজ এনে দেওয়া, চটি জুতো বাইরে রেখে আসা, দরজা ভেজিয়ে দেওয়া, ভেজানো খিল-না-দেওয়া দরজা খুলতে বলা শেখালে সেইসব ধরনের কাজ কুকুর করতে পারে।

॥ কুকুরের রোগ ॥

কুকুরের অনেক ধরনের অসুখ হয়। কোষ্ঠকাঠিন্য, বদহজম, জ্বর, পেটের অসুখ, কানকামড়ানি, ব্রঙ্কাইটিস প্রভৃতি নানা রোগ হয়ে থাকে। এই সব রোগ সারানোর জন্যে পশুচিকিৎসকের সাহায্য নেওয়া দরকার। প্রায় সকল কুকুরের চর্মরোগ হয়। সময়ে সেই চর্মরোগের চিকিৎসা না করলে চর্মরোগ ধীরে ধীরে সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। কুকুরের পেটে কৃমি হলে পশুচিকিৎসকের নির্দেশমতো ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়।

সাধারণতঃ বুল টেরিয়ার কালা হয়ে যায়। প্রায় ক্ষেত্রেই কুকুরের কালা হয়ে যাওয়া সারে না। অনেক সময় অনুপযুক্ত খাদ্যের দোষে কুকুর কালা হয়ে যায়।

অনেক কুকুরের চোখের অসুখ হয়। চোখের কোণে বা ধারে ঘা হয়। চোখের অসুখের ক্ষেত্রে খুব সাবধানে ভালো ঔষধ প্রয়োগ করতে হয়। তা না হলে কুকুর অসময়ে অন্ধ হয়ে যেতে পারে।

দাঁত বা দাঁতের মাঢ়ীর অসুখ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুপযুক্ত খাদ্য গ্রহণের দোষে হয়। দাঁত নিয়মিত পরিষ্কার করে না দিলে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে খাদ্য-কণা জমে থেকে থেকে পূয হয়ে থাকে।

অনেক কুকুরের দেহে টিউমার হয়। কারো কারো ক্যানসার হয়। সর্বক্ষেত্রেই প্রথম হতেই পশু-চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করা একান্ত কর্তব্য।

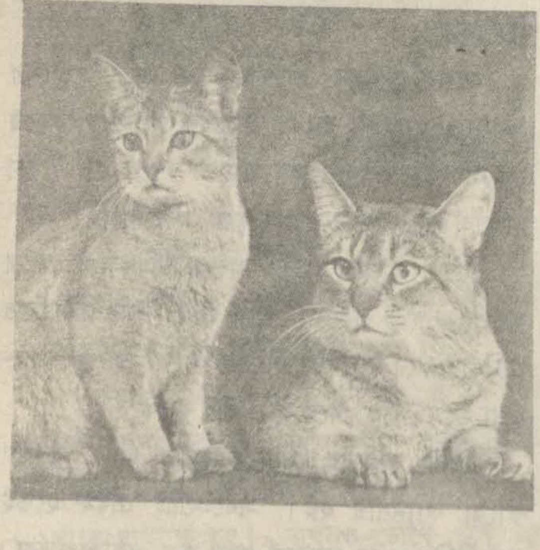
সাধারণ রোগ ছাড়া কুকুরকে অনেক সময়ে পথ চলতে গিয়ে আহত হতে হয়। আঘাত বড় রকমের হলে সঙ্গে সঙ্গে পশু-চিকিৎসককে ডেকে আনা উচিত। সামান্য কাটা-ছেঁড়ার জন্য বিশেষ রকম দুশ্চিন্তা না হলেও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা

করতে হয়। অনেক ক্ষেত্রে অন্য কুকুরের কামড়ে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। ক্ষত সামান্য হলেও অবহেলা করতে নেই। সময়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা না করলে ক্ষতস্থান গভীর ও বিস্তৃত হয়।

॥ বিড়াল পোষা ॥

আমাদের দেশে বেশির ভাগ বাড়িতে যত্ন করে বিড়াল পোষে না। অনেক সময় না চাইলেও বিড়াল এসে বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাড়ালেও বাড়ি ছেড়ে যায় না।

এদেশে ও বিদেশে যারা বিড়াল পোষে, তারা যথেষ্ট যত্ন নেয়। অনেকের বাড়িতে একাধিক



বাড়িতে বিড়াল ও বিড়ালছানা

বিড়াল থাকে। খাওয়া, থাকা, রোগ নিরাময় প্রভৃতির ব্যাপারে যথেষ্ট যত্ন নেওয়া হয়ে থাকে।

কুকুরের মতো না হলেও বিড়ালও নানা জাতের হয়। সব বিড়ালের রং একরকম নয়—কালো, সাদা, ধূসর, লাল, চিত্রবিচিত্র নানা ধরনের।

কালো নীলচোখো সাদা রঙের, কমলা রঙের চক্ষুবিশিষ্ট সাদা, নীল, লাল, টরটয়েজ সেল, ব্লু-ক্রীম, চিঞ্চিলা, সিলভার ট্যাবি, রেড ট্যাবি, ব্রাউন ট্যাবি প্রভৃতি বিড়ালের লোম বড়।

আবার উপরে যে-সব বিড়ালের নাম করা হল তারা খাটো চুলেরও হয়ে থাকে। তাছাড়া ব্রিটিশ ব্লু, ম্যাকারেল স্ট্রাইপড ট্যাবি, রাশিয়ান ব্লু, ম্যান্‌কস্‌, আবিসিনীয়ান, শ্যামদেশীয়, বর্মী প্রভৃতি বহু ধরনের বিড়াল আছে।

শ্যামদেশীয় বিড়াল (Siamese cat)-এর চোখ দুটি নীল, গায়ের রং হরিণের মতো গাঢ় বাদামী।

শ্যামদেশে আর এক শ্রেণীর বিড়াল আছে, যাদের বলা হয় মালয় বিড়াল। এই বিড়ালের একটা বিশেষত্ব এই যে, এর লেজ খুব বড়।

পারস্য (ইরান) দেশীয় বিড়াল হলেও Persian cat কে কাবুলী বিড়াল বলা হয়। আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে এই ধরনের বিড়াল অনেক দেখা যায়।

ইংল্যাণ্ড থেকে ৩০ মাইল দূরে আইরিশ সাগরের আইল অব ম্যান আদি বাসস্থান হলেও ম্যান্‌কস্‌ বিড়াল (Manx Cat) ইউরোপের বহু দেশে গৃহস্থেরা পুষে থাকে।

ইউরোপের সম্ভ্রান্ত পরিবারে তুরস্কের অ্যাঙ্গোরা (Angora) বিড়ালের খুব আদর। এই বিড়ালের লেজ বেশ লম্বা। গায়ের লোম খুব বড়। লোমগুলি ধবধবে সাদা ও রেশমের মতো নরম।



॥ ভালো জাতের বিড়াল ॥

বিড়াল যাতে ভালো জাতের হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। অতি সাধারণ বিড়াল পুষলে আনন্দ পাওয়া যায় না। বাড়িতে বিড়াল থাকলে











নানা জাতের বিড়াল

বাচ্চা হবেই। সে-বিড়াল যদি সাধারণ জাতের হয় তাহলে সেই বাচ্চা না পুষে বিলিয়ে দেওয়া ভালো।

ব্লু পারসিয়ান (Blue Persian) বিড়াল ইউরোপের গৃহস্থেরা খুব আদর করে পোষে। ইংল্যাণ্ড ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে বিড়ালের প্রদর্শনী (Cat show) হয়ে থাকে। তাতে ব্লু পারসিয়ান ও শ্যামদেশীয় বিড়াল দর্শকদের চিত্ত জয় করে থাকে।

॥ বিড়ালের অদ্ভুত ক্ষমতা ॥

বিড়ালের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে তাকে বাড়ি থেকে বহু দূরে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়েছে। দেখা গেছে, সেই বিড়াল পথ চিনে তার আগের বাড়িতে ফিরে এসেছে। কী করে যে এ সম্ভব হয়, তা বুঝতে পারা কঠিন। খুনীকে ধরবার জন্য শিক্ষিত কুকুরকে লাগানো হয়। সেই কুকুর গন্ধ শুঁকে শুঁকে খুনীকে গিয়ে ধরে ফেলে। কিন্তু কয়েক মাইল দূরে বস্তায় পুরে যে বিড়ালকে নিয়ে যাওয়া হল, আর বস্তার মুখ খুলে অন্ধকার বনের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আসা হল, সে কি করে পথ চিনে চিনে তার আগের বাড়িতে ফিরে আসে? পরিযায়ী পাখিরা হাজার হাজার মাইল দূর থেকে শীতকালে গরম দেশে উড়ে আসে। তার পর শীত ফুরোলে যে পথে তারা এসেছিল সেই পথেই ফিরে তাদের আগের ঠিক ঠিক জায়গায় ফিরে যায়, তা ভেবে পণ্ডিতেরা বিস্মিত হন। বিড়ালের ক্ষেত্রেও তাদের ওই ধরনের অদ্ভুত আচরণ কম বিস্ময়জনক নয়।

॥ বিড়ালের প্রভুভক্তি ॥

সাধারণতঃ দেখা গেছে, বিড়াল প্রভুভক্ত হয় না। কিন্তু বহু বিড়ালকে প্রভুভক্ত হতে দেখা গেছে। বিশেষ করে বাড়ির গৃহিণীর কথা শুনে তারা সেই মতো কাজ করতে পারে।

॥ বিড়ালের উপকারিতা ॥

বিড়াল গৃহস্থের বিশেষ উপকারে আসে না।



বিড়াল ইঁদুর ধরে

ইঁদুর, আরশোলা প্রভৃতি মেরে কিছুটা উপকার বিড়াল করে থাকে। তাছাড়া আর বিশেষ কোন উপকার তাকে করতে দেখা যায় না।

ছেলেমেয়েরা বিড়াল, বিশেষ করে বিড়ালছানা খুব ভালোবাসে। তাদের সঙ্গে খেলা করে আনন্দ পায়। খেলার সময় বিড়াল বা বিড়ালছানা তাদের নখ এমন ভাবে বাঁকিয়ে ব্যবহার করে যাতে ছেলে-মেয়েদের গা আঁচড়ে যায় না।

॥ থাকার জায়গা ॥

বিড়াল গরম জায়গা ভালোবাসে। তাদের থাকবার জন্য কাঠের বাক্স বা বড় ঝুড়িতে কাগজ, খড়কুটো পেতে দিতে হয়। বিড়াল সাধারণতঃ মানুষের বিছানায়, সোফায়, উনুনের ধারে শুয়ে থাকে।

বেশী শীত পড়লে বা শীতের দেশে সন্ধ্যার পর

বিড়ালকে জামা পরিয়ে রাখতে হয়।

।। বিড়ালের খাদ্য ।।

দুধভাত, আলুসিদ্ধ, মাছ, মাংস বিড়ালের খাদ্য। যাতে বিড়াল শুধু মাছ না খায়, তার জন্যে সিদ্ধ শাকসবজি, আলুসিদ্ধ, দুধভাত ইত্যাদি খাওয়ানোর অভ্যাস করাতে হয়। বেশী মাছ খেলে বিড়াল অসুস্থ হয়ে পড়তে পারে। বিড়ালকে দিনে রাতে দুবার খেতে দিলেই যথেষ্ট।

।। কুকুর-বিড়ালে ভাব ।।

কুকুর ও বিড়াল এক বাড়িতে থাকলে পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া হবার সম্ভাবনা। কিন্তু বেশী দিন থাকতে থাকতে তাদের পরস্পরের মধ্যে বেশ ভাব জমে যায়। তারা ঝগড়া তো করেই না, বরং একই জায়গায় শোয়, একই জায়গায় বসে খায়।



।। বিড়ালের রোগ ।।

বিড়াল কুকুরের মতো নানা রোগে ভোগে। যক্ষ্মা, চর্মরোগ, দাদ, কানের রোগ, পাকস্থলীতে কৃমি, পেটের অসুখ, জ্বর, প্রভৃতি রোগ বিড়ালের হয়ে থাকে। পশুচিকিৎসকের পরামর্শমতো তাদের রোগ-নিরাময়ের ব্যবস্থা করা উচিত।

আঘাত লেগে আহত হলে বা বিড়ালে বিড়ালে কামড়াকামড়ি করে গায়ে আঁচড় লেগে ক্ষতের সৃষ্টি হলে যথাসময়ে উপযুক্ত ঔষধ প্রয়োগ করা প্রয়োজন।

মাঝে মাঝে বড় চিরুনি দিয়ে বিড়ালের গায়ের লোম আঁচড়ে পরিষ্কার করতে হবে।

।। ইঁদুর পোষা ।।

বাগানে অনেকে নেংটি ইঁদুর, ধেড়ে ইঁদুর পোষে। তারা মাটির মধ্যে গর্ত করে থাকে চীনাবাদাম,



চিরুনি দিয়ে বিড়ালের গা আঁচড়ে দিতে হয়

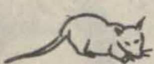
ছোলা, পাঁউরুটির টুকরা, বিস্কুট, মুড়ি প্রভৃতি ছড়িয়ে



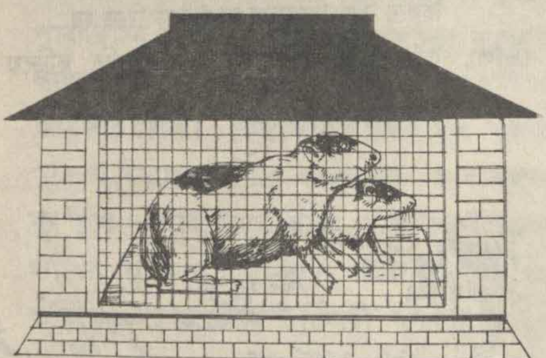
বাগানে নেংটি ইঁদুরের পাল

দিলে তারা আনন্দে খায় ও ক্রমশঃ সংখ্যায় বাড়তে থাকে। তারা লোক দেখে ভয় পেয়ে পালায় না। তবে খাবার দেওয়া বন্ধ হলে তারা নিজের নিজের গর্তে চলে যায়।

বিশেষ করে দাক্ষিণাত্যের বহু মন্দিরে অনেক ইঁদুরকে নির্ভয়ে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। তারা যাত্রীদের ভয় করে না, বরং যাত্রীরা খাবার দিলে আনন্দিত হয়।

॥ সাদা ইঁদুর ॥ 

লোকে শখ করে বাড়িতে সাদা ইঁদুর পোষে। এদের ধবধবে সাদা শরীর, চোখ সবুজ রঙের।



খাঁচার মধ্যে সাদা ইঁদুর

এদের একতলা থেকে দোতলা, তিনতলা পর্যন্ত খাঁচা করে দিতে হয়। তারা একতলা থেকে তিনতলা পর্যন্ত আনন্দে ছোটাছুটি করে।

সাদা ইঁদুরদের চীনাবাদাম, ছোলা, মটর, পাঁউরুটির টুকরা, বিস্কুট প্রভৃতি খেতে দিতে হয়।

প্রতিদিন খাঁচা পরিষ্কার করে দিতে হয়।

রোগ হলে পশুচিকিৎসককে দিয়ে ইনজেকশন দেওয়াতে ও ঔষধ দিতে হয়।

সাদা ইঁদুর পোষায় তেমন ঝামেলা নেই।

॥ বেঁজি ॥

বেঁজি পোষ মানলে পালকের কাঁধে উঠে ঘোরাফেরা করে। ইঁদুরের মতো খাঁচা করে দিলে তাতে থাকে।



বেঁজি

ছাড়া অবস্থায় পোষ-মানা বেঁজি বনে পালিয়ে যায় না।

বাড়িতে বেঁজি থাকলে সাপের ভয় থাকে না। বেঁজি সাপের ভীষণ শত্রু। বিষধর সাপ পর্যন্ত বেঁজিকে ভয় করে।

॥ গিনিপিগ ॥

গিনিপিগ দক্ষিণ আমেরিকার একধরনের ইঁদুর-জাতীয় প্রাণী। আগে গিনিপিগ (guinea-pig) পুরোপুরি বন্য ছিল। এখন পৃথিবীর সর্বত্রই লোকে



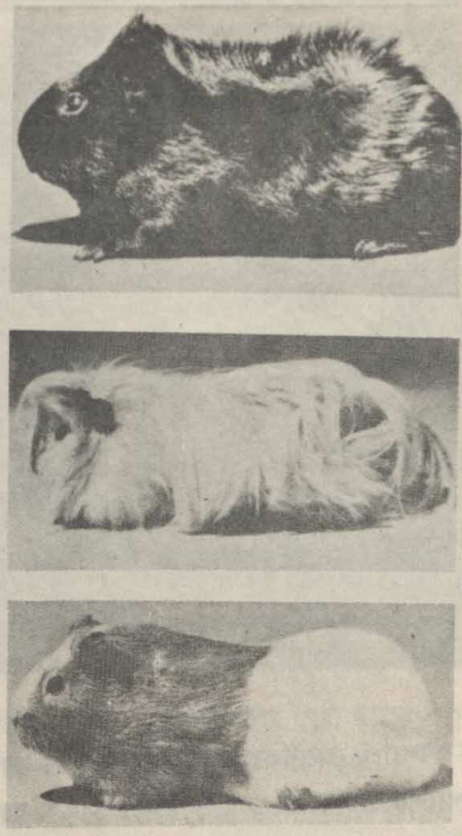
সাপে বেঁজিতে যুদ্ধ

গিনিপিগ পুষে থাকে। সাধারণতঃ ডাক্তারী গবেষণার জন্য গিনিপিগের প্রচলন ব্যাপক।

গিনিপিগ সাধারণতঃ তিন জাতের—গ্রেট ব্রিটেনের, আবিসিনিয়ার ও পেরুর। হিমালয় অঞ্চলেও গিনিপিগ পাওয়া যায়।

গিনিপিগের লেজ খুব ছোট। সাধারণতঃ গিনিপিগ ২/৩ বৎসর বাঁচে। এদের সামনের দু'-পায়ে চারটে করে আঙুল ও পিছনের দু'পায়ে তিনটে করে আঙুল থাকে। গিনিপিগকে ঘরের মধ্যে বা বাইরে খাঁচায় রাখা চলে। খাঁচা ছোট হলে গিনিপিগের অসুবিধা হয়। খাঁচা বড় ও উঁচু হওয়া দরকার। খাঁচা নিয়মিত পরিষ্কার করা উচিত। তা না হলে গিনিপিগের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়।

গম, চীনাবাদাম, ঘাসপাতা, শাকসবজি, গাজর, তিসির খোল, যবচূর্ণ, যই, কিছু দুধ ও নুন এবং খড়ি এদের খাদ্য। খাওয়া হয়ে গেলে খাঁচার মধ্যে যে অবশিষ্ট খাদ্য পড়ে থাকে তা সরিয়ে নিয়ে ঘরে ঝাঁট দিয়ে দিতে হয়।

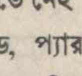


গিনিপিগ

গিনিপিগ খুব নিরীহ প্রাণী। আদর করতে গিয়ে তাদের উত্ত্যক্ত করতে নেই।

গিনিপিগ টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, শ্বাস-নালীর রোগ, চর্মরোগ প্রভৃতিতে ভোগে। যত্নের সঙ্গে সেই সব রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা করা কর্তব্য।

॥ খরগোশ ॥



আগে খরগোশ পুরোপুরি বন্য প্রাণী ছিল। পরে লোকে তাকে গৃহপালিত প্রাণীতে পরিণত করেছে।

খরগোশের খুব তাড়াতাড়ি বংশবৃদ্ধি হয়।



খরগোশ

নিউ জীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে এত বেশী খরগোশের সৃষ্টি হয়েছে যে সেখানকার লোকে বহুল পরিমাণে খরগোশের মাংস রপ্তানি করেও খরগোশের সংখ্যা কমাতে পারছে না। খরগোশ সে-সব দেশে ব্যাপক শস্য ধ্বংসকারী প্রাণীতে পরিণত হয়েছে।

খরগোশ নানা জাতের—অ্যাঙ্গোরা, সিটকা, হিমালয়ান, জাপানীজ, ইংলিশ, বেলজিয়ান, ব্লু ইম্পিরিয়াল, পোলিশ, হাভানা, চিঞ্চিলা, কোপেন-হাগেন, নিউ জীল্যাণ্ড হোয়াইট প্রভৃতি।

খাঁচার মধ্যে মেঝেতে কাঠের গুঁড়ো প্রভৃতি ছড়িতে দিতে হয়। সেই খাঁচা একটু বড় আকারের হলে ভালো হয়।

ধান, গম, যব, ছোলা, ঘাসপাতা, শাকসবজি, ভূষি, ভুট্টা, গাজর, কিছু নুন প্রভৃতি খরগোশের খাদ্য। খরগোশকে প্রচুর জল খাবার সুযোগ করে দিতে হয়।

কখনও শুধু কান ধরে খরগোশকে উপরে তুলতে নেই। খরগোশকে কোনভাবে উত্ত্যক্ত করতে নেই।

খরগোশ নিউমোনিয়া, রক্তাল্পতা, নানাপ্রকার চর্মরোগ, জ্বর, হৃদ্‌যন্ত্রের অসুখ প্রভৃতি নানা ধরনের রোগে ভোগে। উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হয়।



॥ হরিণ ও বানর পোষা ॥

লোকে শখ করে হরিণ, বানর প্রভৃতি পোষে। পোষ মানালে এ-সব জীব মানুষের নির্দেশমতো কাজ করে আনন্দ দেয়।



বানরের পাল

উপযুক্ত শিক্ষা পেলে বানরেরা নানা রকম খেলা দেখাতে পারে। বানর, হরিণ প্রভৃতি পোষায়



পোষা বাঘ

বিশেষ ঝামেলা নেই। নিয়মিত সময়ে উপযুক্ত খাদ্য যোগানো, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, রোগের চিকিৎসা করতে পারলেই হল।

যে-সব জীবজন্তুর নাম এখানে করা হল, এ ছাড়া নানারকম জীবজন্তু মানুষ পুষে থাকে।

॥ বাঘ ॥

বাঘ অতি হিংস্র জানোয়ার। হরিণাদি প্রাণী, মানুষ ছাড়া তাদের আর কোন খাদ্য নেই। এমন



শূকর ও শূকরের বাচ্চা

যে বন্য হিংস্র প্রাণী তাকেও মানুষ পোষ মানিয়ে বাড়িতে রাখে। সিমলিপালের খৈরী নামে বাঘটি এমনই মানুষের একান্ত বশীভূত হয়েছিল।

বাঘকে কতকটা পোষ মানিয়ে সার্কাসে খেলা দেখানো হয়।

॥ শূকর ॥



পল্লী অঞ্চলে লোকে শূকর পোষে। শূকরের একসঙ্গে অনেক বাচ্চা হয়। সাধারণতঃ মানুষ খাদ্যের জন্য শূকর পোষে। শূকরের মাংস মেদবহুল।

বন্য শূকর ভীষণ হিংস্র। লোকে ঘোড়ায় চড়ে, কুকুর নিয়ে বন্য শূকর শিকার করতে যায়।



কৃষি

পৃথিবীর প্রায় সব দেশই প্রধানতঃ কৃষি ও শিল্পের উপর নির্ভরশীল। এমন অনেক দেশ আছে, যেখানে বেশির ভাগ লোকই কৃষি বা চাষের কাজ করে থাকে। ভারত এক বিরাট দেশ। একে কৃষিপ্রধান দেশ বলা হয়।

॥ ভারতে চাষের জমির পরিমাণ ॥

ভারতের মোট ৩২'৮০ কোটি হেক্টার আয়তনের মধ্যে চাষের জমির পরিমাণ ১৫'৯৬ কোটি হেক্টার। জনসংখ্যার ৭০ শতাংশকে জীবিকার জন্যে কৃষির উপর নির্ভর করতে হয়। সারা ভারতের জাতীয় আয়ের ৫০ শতাংশ চাষ থেকে পাওয়া যায়।

অবশ্য চাষের জমির সবটাতেই খাদ্যশস্যের চাষ হয় না। বড় বড় শিল্পের জন্য কাঁচা মাল অর্থাৎ পাট, তূলা, নানারকমের তৈলবীজ, রবার, মেস্তা প্রভৃতির চাষও করা হয়। ভারতের প্রায় ১২ কোটি হেক্টার জমিতে গম, ধান, ছোলা, মসূর, মটর, মুগ, অড়হর, আলু, লঙ্কা, হলুদ, লাউ, কুমড়া, বেগুন, পটল, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, কপি, মূলা প্রভৃতি খাদ্যশস্যের চাষ হয়। বাকী জমিতে পাটশিল্প, চিনিশিল্প, কার্পাসশিল্প প্রভৃতি বৃহৎ শিল্পের জন্য পাট, কার্পাস, আখ প্রভৃতি কাঁচা মালের চাষ হয়।

॥ জনসংখ্যা ও খাদ্যশস্যের উৎপাদন ॥

ভারতের জমি খুব উর্বরা। কিন্তু জনসংখ্যা বিপুল। তাদের খাদ্য যোগাবার উপযোগী নানা শস্য অনেক সময় কম পড়ে যায়। কারণ, এদেশে

পুরোপুরি কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, আর্জেন্টিনা প্রভৃতি দেশের মতো বৈজ্ঞানিক উন্নত প্রণালীতে চাষ হয় না। তাই অনেক সময়ে কিছু খাদ্যশস্য বিশেষ করে গম বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়। কিন্তু ভারত কৃষিজাত নানা দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করে বৎসরে প্রায় তিনশ' কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি দেশ বিরাট। কিন্তু সে-সব দেশে লোকসংখ্যা অনেক কম। আর সে-সব দেশে নানা উৎকৃষ্ট সার দিয়ে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে চাষ করা হয়। তাই খাদ্যশস্য উদ্বৃত্ত থেকে যায়। সেই উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য ওই সব দেশ, ভারত, জাপান, ইউরোপের নানা দেশ প্রভৃতিতে পাঠাতে পারে।

লোকসংখ্যা বেশী হলেও ভারত যেভাবে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ শুরু করে দিয়েছে, তাতে ভবিষ্যতে তাকে আর বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হবে না। আগে প্রচুর পরিমাণে গম আমদানি করতে হত। এখন গমের ফলন ভালো হওয়ায় আর আমদানি করতে হয় না।

ভারতকে বৃষ্টির উপর নির্ভর করতে হয়। এই বৃষ্টি পর্যাপ্ত পরিমাণে না হলে চাষের ক্ষতি হয়। প্রচণ্ড খরায় চাষ করা অসম্ভব। তাই মাঝে মাঝে গম, চাল ইত্যাদি আমদানি না করে উপায় থাকে না।

জনসংখ্যায় পৃথিবীতে চীনের পরেই ভারতের স্থান। দুই দেশের আয়তন অনুযায়ী ভারতে লোকসমাবেশের আধিক্য চীনের চেয়েও বেশী। কাজেই ভারতকে তার অধিবাসীদের পর্যাপ্ত খাদ্য যোগাতে রীতিমতো উন্নত কৃষি-পন্থা গ্রহণ করতে হবে। এখন ভারতের লোক গড়ে জনপিছু মাত্র ১২·৪ আউন্স খাদ্য পায়। খাদ্যের এই পরিমাণ মানুষের ক্ষুধা মেটানোর পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়।

॥ খাদ্যশস্যের প্রকারভেদ ॥

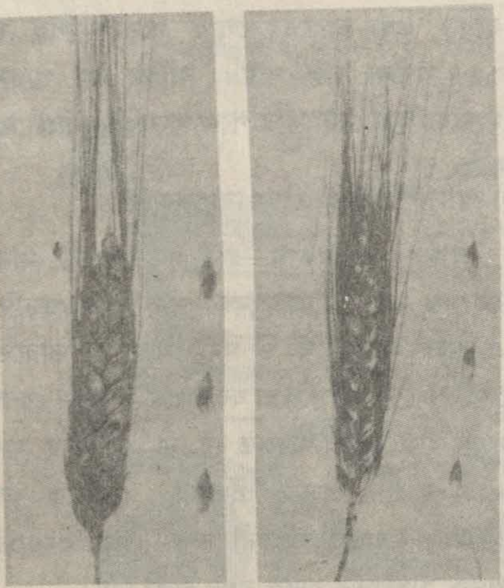
খাদ্যশস্য বহু প্রকার—ধান, গম, যব, ভুট্টা, নানারকমের ডাল, নানাধরনের শাকসবজি প্রভৃতি। এ সবের মধ্যে ধান ও গমই প্রধান। ভারতের কোথাও কোথাও ভুট্টা ও যব প্রধান খাদ্য। যে-সব ফসল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সে-সবের মধ্যে পাট, কার্পাস প্রভৃতি প্রধান। এগুলিকে বলা হয় নগদা ফসল বা অর্থকরী ফসল (cash crops) অর্থাৎ চাষী এর বদলে নগদ টাকা পায়।

॥ গম চাষ ॥

বর্তমানে ভারতে ৩৩·৫ মিলিয়ন একরে গমের চাষ হয়। হেক্টার-প্রতি গমের ফলনের পরিমাণ ১১·৬ কুইণ্টাল। আগেকার চেয়ে ভারতে গমের উৎপাদন অনেক বেড়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আগে গমের চাষ আশানুরূপ হত না। এখন উৎপাদন খুবই ভালো বলা চলে।

পৃথিবীর $\frac{১}{৩}$ ভাগ লোক খাদ্যের জন্য গমের উপর নির্ভরশীল। ১৯৭৩ সালে পৃথিবীতে ২২ কোটি ২১ লক্ষ ৭৪ হাজার হেক্টার জমিতে গমচাষ হয় ও ৩৭ কোটি ৪৪ লক্ষ ৩৮ হাজার মেট্রিক টন গম উৎপন্ন হয়।

গমের জমির পরিমাণ ও উৎপাদনের দিক্‌ থেকে পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ। এঁটেল-দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটিতে গম ভালো জন্মে। বহু গবেষণার পর গমের নানা উন্নত জাতের সৃষ্টি করা হয়েছে। লারমা রোহ, সোনারা-৬৪, সরবতী



গমের শীষ

সোনারা, কল্যাণ সোনা, সোনালিকা, সফেদ লারমা, ছোটি লারমা, জনক, গিরিজা প্রভৃতি উন্নত জাতের গম।

গমের জমিতে পচা আবর্জনা, গোবর, নাইট্রোজেন, ইউরিয়া, ফসফেট, হাড়ের গুঁড়া, পটাশ, সবুজ সার প্রভৃতি দিতে হয়।

ভালোভাবে লাঙ্গল দেওয়া, নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার করা, উপযুক্ত পরিমাণে সার দেওয়া, রোগ নিবারণের জন্যে ঔষধ প্রয়োগ গম চাষের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সাধারণ জমিতে হেক্টার-পিছু ১৫-২০ কুইন্টাল গম পাওয়া যায়। সেচ ও সার প্রয়োগে ২৫-৩০ কুইন্টাল গমের ফলন হয়।

॥ ধান চাষ ॥

সারা পৃথিবীতে ২৯৪ মিলিয়ন একর জমিতে ধান চাষ হয়। ধান উৎপন্ন হয় ২৫১ মিলিয়ন মেট্রিক টন। ভারত, চীন, জাপান, বাংলাদেশ, ভিয়েতনাম, ব্রহ্মদেশ, কাম্পুচিয়া, থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিন্‌জ্‌ প্রভৃতি এশিয়ার দেশসমূহেই পৃথিবীর মোট ধান্য-উৎপাদনের ৯০ শতাংশ হয়ে থাকে।



ধানগাছ

ধান্য-উৎপাদনে চীন প্রথম, ভারত দ্বিতীয়। চীন, ভারত, জাপান ও বাংলাদেশ এই চারটি দেশেই পৃথিবীর মোট ধান্য-উৎপাদনের ৭০ শতাংশ হয়ে থাকে।

ভারতে ৮৩·৬৭ মিলিয়ন একর জমিতে ধান চাষ হয়। ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী ধান উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে ৪·৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ধান উৎপন্ন হয়। ভারতবর্ষ বিদেশ থেকে এখনও প্রায় ৩ লক্ষ টন চাল আমদানি করে। খরার



ক্ষেতে ধানগাছের চারা বসানো হচ্ছে



সময়ে এই আমদানির পরিমাণ বেশী হয়।

ধানের জমিতে গোবর, খইল, পচা আবর্জনা, সবুজ সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, নাইট্রোজেন, পটাশ, ফসফেট, হাড়ের গুঁড়া, চুন প্রভৃতি দিতে হয়। ভালো করে লাঙল দিয়ে জমি তৈরি করতে হয়।

ধান প্রধানতঃ তিন প্রকার—আউশ, আমন ও বোরো। এ-সবের মধ্যে আমন ধানই উৎকৃষ্ট। বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের ধান চাষ করা হয়ে থাকে।

আই-আর-৮, জয়া, পদ্মা, বিজয়া, রত্না, বালা, কাবেরী, পঙ্কজ, জগন্নাথ, আই-আর-২০, সি. আর. এম-১৩, আই. ই টি—১০৩৯ ও ১৯৯১ প্রভৃতি উন্নতজাতের উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত।

বর্তমানে সারা বৎসর ধরে ধান চাষ হয়ে থাকে। ক্ষেতে জল সরবরাহ করতে পারলেই হল। বৃষ্টির অপেক্ষায় থাকতে হয় না।

মাজরা পোকা, গল মিজ, শ্যামা পোকা, গন্ধি পোকা ধানগাছের খুব ক্ষতি করে। রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগে এই সব পোকার আক্রমণ থেকে ধান গাছকে বাঁচাতে হয়।

॥ যব ॥

যব নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলেই ভালো জন্মে। ঠাণ্ডা ও আর্দ্র আবহাওয়া চাষের পক্ষে ভালো।

গোবর, পচা আবর্জনা, ফসফেট, নাইট্রোজেন, পটাশ প্রভৃতি সার যব-চাষের জমিতে দিতে হয়। গমের মতো যব-চাষের জমিতে তত চাষ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না।

সাধারণ জমিতে হেক্টার-পিছু ৮।১০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া যায়। সেচ ও সার প্রয়োগে ফলন



যবগাছ ও তার ক্ষেত

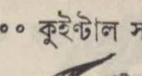
১৫৷২০ কুইন্টাল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

॥ ওট ॥

ভারতে, বিশেষতঃ পূর্ব ভারতে খুব সামান্য পরিমাণ জমিতে ওট (oat) বা যই-এর চাষ হয়। ভারতে শীতকালে ওটের চাষ হয়। দোআঁশ বা এটেঁল-দোআঁশ জমিতে ওট ভালো জন্মে।

নাইট্রোজেন, ফসফেট, গোবর, ইউরিয়া প্রভৃতি সার ওটের জমিতে দিতে হয়।

হেক্টার-প্রতি সাধারণতঃ ৬ থেকে ১০ কুইন্টাল দানা এবং ১৫০ থেকে ২০০ কুইন্টাল সবুজ পশুখাদ্য পাওয়া যায়।



॥ ভুট্টা ॥

ভুট্টা ভারতের সর্বত্রই প্রধানতঃ খাদ্যশস্য এবং কোথাও পশুখাদ্যের জন্যে চাষ করা হয়। পলিমাটি অঞ্চলে এবং নাইট্রোজেন ও ফসফেট-সমন্বিত জমিতে ভুট্টার চাষ ভালো হয়।



ভুট্টা গাছ

ভুট্টা নানা শ্রেণীর—পড করন্ (Pod Corn), পপ করন্ (Pop Corn), ডেন্ট করন্ (Dent Corn), ফ্লিন্ট করন্ (Flint Corn), ফ্লাওয়ার করন্ (Flour Corn), সুইট করন্ (Sweet Corn), ওয়াক্সি করন্ (Waxy Corn) ইত্যাদি।

পূর্ব ভারতে সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ৮ থেকে ১০ কুইন্টাল ভুট্টার দানা উৎপন্ন হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হেক্টার-পিছু ৫০৷৬০ কুইন্টাল ভুট্টার ফলন হয়।

গঙ্গা-১, ৩, ৪, ৫, গঙ্গা-১০১, সফেদ-২, হিমালয়ান-১২৩, ডেকান, রণজিৎ প্রভৃতি উৎকৃষ্ট

সংকর ভুট্টা এবং অম্বর, জহর, বিজয়, বিক্রম, কিষাণ প্রভৃতি উন্নত কম্পোজিট ভুট্টা।

॥ জোয়ার ॥

পূর্ব ভারতে জোয়ার গুরুত্বপূর্ণ ফসল নয়। পৃথিবীতে ধান, গম ও ভুট্টার পরেই জোয়ারের স্থান। জোয়ার প্রধানতঃ উষ্ণ অঞ্চলের ফসল। এঁটেল-দোআঁশ জমিতে জোয়ার ভালো জন্মে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে জোয়ার প্রচুর উৎপন্ন হয়।



জোয়ার গাছ

সাধারণ জমিতে হেক্টার-পিছু ৮-১০ কুইন্টাল জোয়ার উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ১৫-২০ কুইন্টাল দানা পাওয়া যায়।

॥ বাজরা ॥

ভারতে অন্ধ্রপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, মহারাষ্ট্র ও গুজরাটে প্রচুর বাজরার চাষ হয়। বেলে-দোআঁশ জমিতে বাজরা ভালো জন্মে। বাজরার জমিতে গোবর, পচা আবর্জনা, নাইট্রোজেন, ইউরিয়া, সুপার ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি সার দিতে হয়।

সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ৫।৬ কুইন্টাল বাজরা উৎপন্ন হয়। সেচ ও সার প্রয়োগে ফলন ১৫-২০ কুইন্টাল পর্যন্ত হতে পারে।

॥ অড়হর ॥

অড়হর ডালজাতীয় শস্য। দোআঁশ জমিতে ভালো জন্মে। জমিতে গোবর, পচা আবর্জনা, ফসফেট প্রভৃতি দিতে হয়।



অড়হর গাছ

বি-৭ (শ্বেতা), বি-৫১৭ (চুনী), বি-৫২৪,

সি-১১, প্রভাত ইত্যাদি উন্নত ধরনের অড়হর গাছ।

মে-জুনে বীজ বোনা হয়। বহুবর্ষজীবী গাছ হলেও দ্বিতীয় বর্ষ থেকে ফলন ভালো হয় না। হেক্টার-পিছু ৪।৫ কুইন্টাল দানা পাওয়া যায়। উপযুক্ত সার প্রয়োগে ফলন ১৫-২০ কুইন্টাল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

॥ ছোলা ॥

ছোলা ডালজাতীয় খাদ্যশস্য। দোআঁশ জমিতে ভালো জন্মে। গোবর, ফসফেট প্রভৃতি সার জমিতে দিতে হয়।

বি-৭৫, বি-৯৮, বি-১০৮ (মহামায়া-১), বি-১২৪ (মহামায়া-৪), বি-আর-১৭ প্রভৃতি উন্নত জাতের ছোলা।

সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ৬ থেকে ১০ কুইন্টাল ছোলা পাওয়া যায়। উপযুক্ত সার প্রয়োগে ফলন ১৫-২০ কুইন্টাল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

॥ মসুর ॥

মসুর ডালজাতীয় খাদ্যশস্য। উর্বর হালকা দোআঁশ জমি মসুর চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

গোবর, পচা আবর্জনা, ফসফেট, নাইট্রোজেন প্রভৃতি সার জমিতে দিতে হয়।

বি-০৭ (আশা), বি-২৩৫, সি-৩১ প্রভৃতি উন্নতজাতের মসুর। হেক্টার-পিছু ৫-৬ কুইন্টাল মসুর পাওয়া যায়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ফলন ১৪-১৫ কুইন্টাল পর্যন্ত হয়ে থাকে।

॥ মুগ ॥

মুগ পুষ্টিকর ও সুস্বাদু ডাল। উর্বর দোআঁশ জমিতে মুগের চাষ ভালো হয়। গোবর, পচা আবর্জনা, নাইট্রোজেন, ফসফেট প্রভৃতি সার হিসাবে মুগের জমিতে দিতে হয়।



ছোলা গাছ



মুগ গাছ

বি—১ (সোনালী), বি—১০৫ (পান্না), টি-৪৪, টি-৫১, পুসা বৈশাখী, পি. এস-১৬ প্রভৃতি উন্নত জাতের মুগ বীজ।

খুব পেকে বেশী শুকিয়ে যাবার আগে মুগের শুঁটি কেটে নেওয়া উচিত। তা না হলে শুঁটি ফেটে দানা মাটিতে পড়ে যেতে পারে।

হেক্টার-পিছু সাধারণতঃ ৪-৫ কুইন্টাল মুগ হয়। উপযুক্ত সার প্রয়োগে ৮-১০ কুইন্টাল পর্যন্ত ফলন হতে পারে।

॥ কলাই ॥

কলাই বা কড়াই দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ মাটিতে ভালো জন্মে। জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, গোবর, পচা আবর্জনা ইত্যাদি সার হিসাবে দিতে হয়।

বি-৭৬ (কালিন্দী), টি-৯, পি. এস-১, মাষ-৩৬, ৪৮ প্রভৃতি উন্নত জাতের কলাই।

হেক্টার-পিছু সাধারণতঃ ৭/৮ কুইন্টাল কলাই পাওয়া যায়। সার প্রয়োগে ১০।১২ কুইন্টাল কলাই-এর ফলন হয়ে থাকে।

॥ মটর ॥



মটর পুষ্টিকর ডাল। বেলে-দোআঁশ, এঁটেল-দোআঁশ মাটি মটর চাষের উপযোগী।

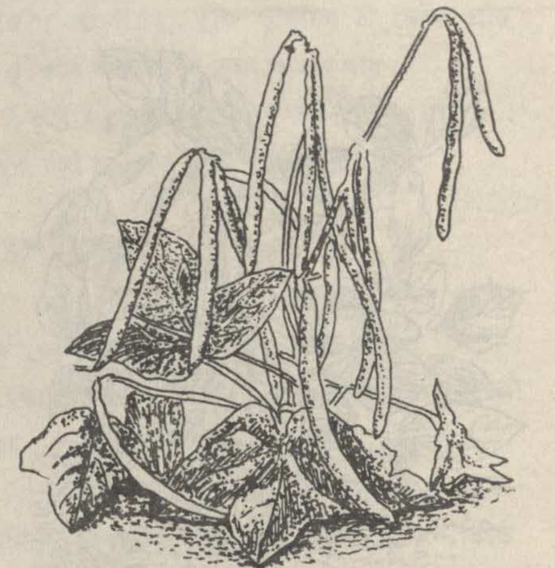
গোবর, নাইট্রোজেন, ফসফেট, ইউরিয়া সার হিসাবে মটরের জমিতে দিতে হয়।

বি-২২ (ধূসর), টি-১৬৩, বোনেভিল, এন. পি-২৯, লিঙ্কন, সিলভিয়া, টি-১৯ প্রভৃতি উন্নত জাতের মটর।

হেক্টার-প্রতি ৬ থেকে ৮ কুইন্টাল মটর দানা পাওয়া যায়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ১৫-১৬ কুইন্টাল ফলন হয়।

॥ বরবটি ॥

ডাল হিসাবে সাধারণতঃ বরবটির দানা ব্যবহৃত হয় না। সবুজ শুঁটি সবজি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বরবটি গাছ উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য।



বরবটি গাছ

বেলে ও দোআঁশ মাটি বরবটি চাষের উপযোগী। গোবর, ফসফেট, কম্পোস্ট সার জমিতে দিতে হয়।

পুসা বর্ষাতি, পুসা ফাল্গুনি, ব্ল্যাক আই, নিউ এরা প্রভৃতি উন্নত জাতের বরবটি।

সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ১৫০।২০০ কুইন্টাল সবুজ পশুখাদ্য ও ৮।১০ কুইন্টাল দানা উৎপন্ন হয়।

॥ সয়াবীন ॥

সয়াবীন ডালজাতীয় শস্য ও সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ও মূল্যবান্ ফসল। সয়াবীন থেকে যে দুধ পাওয়া যায় তা প্রায় গরুর দুধের মতো। তা থেকে ছানা হালুয়া, নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রস্তুত হতে পারে

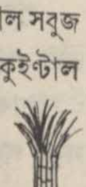
উর্বর দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ জমিতে সয়াবীনের গাছ ভালো জন্মে। সার হিসাবে জমিতে গোবর, সিঙ্গল সুপার ফসফেট ও মিউরিয়েট অব পটাশ দিতে হয়।



সয়াবীনের গাছ

ব্র্যাগ, কালিম্পং-হলদে, ক্লার্ক-৬৩, অঙ্কুর, অলংকার, ইমপ্রুভ্ড্ পেলিক্যান, আর-১৮৪, লী প্রভৃতি উন্নত জাতের সয়াবীন।

হেক্টার-পিছু সাধারণতঃ ১০০।২০০ কুইন্টাল সবুজ পদার্থ বা পশুখাদ্য এবং ২০ থেকে ৩৫ কুইন্টাল সয়াবীন দানা পাওয়া যায়।



॥ আখ ॥

আখকে নগদা ফসল (cash crop) বলা হয়। আখ থেকে গুড় ও চিনি হয়। আখের ছিবড়ায় কাগজ, কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি তৈয়ারী হয়। ভারতের সর্বত্র আখের চাষ হয়। আখের চিনি উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান তৃতীয়।



আখগাছের ক্ষেত

উষ্ণ আর্দ্র আবহাওয়া আখ চাষের পক্ষে অনুকূল। এঁটেল-দোআঁশ জমি চাষের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উপযোগী। সার হিসাবে জমিতে গোবর, নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, সবুজ সার, চুন প্রভৃতি দিতে হয়।

নানাশ্রেণীর উন্নত জাতের আখ সৃষ্ট হয়েছে। জলদি, মাঝারি ও নাবি জাতের সেই সব আখ ক্ষেতে লাগানো উচিত।

সাধারণতঃ কাটিং থেকে গাছ হয়। সারপ্রয়োগ, সেচ, আগাছা পরিষ্কার, ঔষধাদি প্রয়োগে রোগ ও ক্ষতিকর পোকার উপদ্রব নিবারণ করা প্রয়োজন।

পূর্ব ভারতে সাধারণতঃ হেক্টার-প্রতি ৫০ থেকে ৭৫ মেট্রিক টন আখ উৎপন্ন হয়। ১০০ কুইন্টাল আখ থেকে ১০ কুইন্টাল গুড় ও ১০ কুইন্টাল গুড় থেকে ৬.২৫ কুইন্টাল দানা চিনি পাওয়া যায়। চিনি-কলে ১০০ কুইন্টাল আখ থেকে ১০ কুইন্টাল দানা চিনি পাওয়া যায়।

॥ তুলা ॥

কার্পাস গাছ থেকে সব চেয়ে বেশী পরিমাণ তূলা উৎপন্ন হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তূলা উৎপাদনে পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ। ভারতের সর্বত্র কার্পাস গাছের চাষ হয়। রাশিয়া, চীন, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ইজিপ্ট, পাকিস্তান প্রভৃতি দেশে প্রচুর তূলা উৎপন্ন হয়।



কার্পাস গাছ

দোআঁশ জমিতে কার্পাস গাছ ভালো জন্মে। জমিতে সার হিসাবে গোবর, খইল, পচা আবর্জনা, অ্যামোনিয়াম সালফেট, ইউরিয়া প্রভৃতি দিতে হয়।

ভারতে কৃষ্ণা, এম. সি. ইউ-৫, পি. আর. এস-৭২, পি-২১৬ এফ, বিকানীর নরমা প্রভৃতি উন্নত জাতের কার্পাস গাছের চাষ করা ভালো।

ভারতে হেক্টার-পিছু ৪ থেকে ৬ কুইন্টাল কার্পাস বীজ পাওয়া যায়। বীজ ছাড়ালে তা থেকে প্রায় ২ কুইন্টাল বীজবিহীন তূলা পাওয়া যায়।

তূলা অত্যুৎকৃষ্ট নগদা ফসল (cash crop)। একে বলা হয় শ্বেত স্বর্ণ (white gold)।

॥ মেস্তা ॥

মেস্তা চাষ হয় আঁশের জন্যে। এর আঁশ পাটের আঁশের চেয়ে শক্ত কিন্তু অপেক্ষাকৃত মোটা। মেস্তার আঁশে থলে, ক্যানভাস, দড়ি প্রভৃতি তৈরী হয়।

দোআঁশ মাটি মেস্তার চাষের পক্ষে উপযুক্ত। জমিতে জৈব সার, সালফেট ও নাইট্রোজেন দিতে হয়।

পাটের মতোই জলে পচিয়ে মেস্তার আঁশ বার করা হয়।

সাধারণতঃ হেক্টার-প্রতি ১৭।১৮ কুইন্টাল মেস্তার আঁশ পাওয়া যায়।

॥ চা ॥

চা উৎপাদনে ভারতের স্থান পৃথিবীতে প্রশংসনীয়। ভারতে ৮ লক্ষের বেশী একর জমিতে চায়ের চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, কেরল, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক ও হিমাচল প্রদেশে চা-এর চাষ হয়। ভারতে ৫·৩০ লক্ষ মেট্রিক টন চা উৎপন্ন হয়। এর অর্ধেকের কিছু বেশী চা বিদেশে রপ্তানী হয়। চীনেই প্রথম চা পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারত, শ্রীলঙ্কা, চীন ও জাপানে সব চেয়ে বেশী চা উৎপন্ন হয়। সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও সুগন্ধ চা দার্জিলিং চা। আসামের চায়ে বেশী লিকার হয়।

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বড়লাট লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের নেতৃত্বে যে চা সমিতি (Tea Society) গঠিত হয়, তারই উদ্যোগে চীন থেকে চা-এর বীজ আনা হয় ও শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেনে সেই বীজ পোতা হয়। পরে সেখান থেকে চা-গাছের চারা আসাম, মাদ্রাজ ও মুসৌরীতে নিয়ে গিয়ে বসানো হয়।



চা-এর ক্ষেত

চা-গাছ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুতে ভালো জন্মে। একর-পিছু তিন হাজার চারা লাগানো চলে। চা-গাছ কড়া রোদ্দর সহ্য করতে পারে না। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় চা-গাছের বাছাই-করা বীজ লাগাতে হয়।

সব জায়গায় সব ক্ষেতে চা-গাছ সমান উঁচু হয় না। তবে সাধারণত: প্রায় ৬ মিটার উঁচু হতে পারে। প্রায় দেড় মিটার উঁচু চা-গাছের পাতা ছেঁটে দিতে হয়। তার ফলে চা-গাছ ঝোপ গাছের মতো দেখায়।



চা-এর পাতা তোলা

স্ত্রী-পুরুষ শ্রমিকেরা পিঠে লম্বা ঝুড়ি বেঁধে চা-গাছ থেকে দুটি কচি পাতা ও ১টি কুঁড়ি (পাতার কোরক) সংগ্রহ করে ঝুড়িতে বোঝাই করে। ৪০/৫০ বৎসর ধরে চা-গাছ থেকে পাতা ও কুঁড়ি সংগ্রহ করা হয়। তার পর নূতন গাছ বসাতে হয়।

বাগান থেকে সংগৃহীত চা-পাতাগুলি খোলা জায়গায় ছড়িয়ে দিতে হয়। সেগুলি ভালোভাবে শুকিয়ে গেলে বড় বড় ছাঁকনি দিয়ে চেলে নিতে হয় গুঁড়ো চা নীচে পড়ে। পাতা চা চালনির উপর থাকে। পরে কলের মধ্যে রেখে সামান্য উত্তাপে চা-পাতাগুলি আর একটু শুকিয়ে নিতে হয়। এই-ভাবে গুড়ো চা ও পাতা চা পাওয়া যায়।

কালো রঙের চা-এর সমাদর সব চেয়ে বেশী। কালো চা তৈরী করতে বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়।

ভালো চা তৈরী হয় মিশ্রণের কৌশলে। ভালো মিশ্রণ (blending) করার জন্য বিশেষজ্ঞ লোক থাকে।

চা-এর ইংরেজী টী (tea) কথাটা এসেছে চীনা ভাষা থেকে। চীনা শব্দ থি (Thea sinensis) বা দী (Thee) থেকে tea শব্দের উদ্ভব।

১৯৭৭ সালের হিসাবে দেখা যায়, জন-পিছু ০'৩১৪ আউন্স (৮৯ গ্রাম) চা ব্যবহৃত হয়। আয়ার্ল্যাণ্ডে ব্যবহৃত হয়, ০'৩৬ আউন্স (১০'২ গ্রাম)।

॥ কফি ॥

ভারতের লোক ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে কফি খেতে শুরু করেছে। কফি গাছের বীজচূর্ণ সিদ্ধ করে তার জল পানীয় হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ইথিওপিয়া বা আরব কফি গাছের জন্মস্থান। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সব দেশে অল্পবিস্তর কফি গাছের চাষ হয়ে থাকে।

কফি গাছ প্রায় ৫০ বৎসর বাঁচে। কফি গাছের সাদা ফুলে বেশ সুগন্ধ। ফুল থেকে ফল জন্মে। সাত আট মাসে ফল পাকে।



কফি গাছের ফুল ও ফল

পাকা কফি ফল প্রথমে রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। পরে তা থেকে বীজ বার করে নিয়ে সেই বীজ গুঁড়িয়ে ব্যবহারের উপযোগী কফি তৈরী হয়।

পৃথিবীতে ৫ লক্ষ টন কফি উৎপন্ন হয়। ভারতে কফি-উৎপাদনের পরিমাণ ৬০ হাজার টন। ব্রাজিল, মধ্য আমেরিকা, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর কফি উৎপন্ন হয়।

ইথিওপিয়া থেকে প্রথমে ইরানে ও তুরস্কে কফি চাষ শুরু হয়। সেখান থেকে ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম কফির দোকান খোলা হয়।

বর্তমানে সুইডেনে সব চেয়ে বেশী কফি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, জন-পিছু ৩২'১৮ গ্রাম (১'১৩ আউন্স) কফি ব্যবহৃত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে জ্যামাইকান ব্লু মাউন্টেন কফি প্রচলিত তা সব চেয়ে দামী—কেজি-পিছু ৩৭ ডলার বা পাউণ্ড-পিছু ১৬৮০ ডলার।

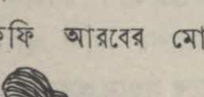
কফিতে ক্যাফিইন নামে এক উত্তেজক পদার্থ



গাছ থেকে কফি তোলা হচ্ছে

বিদ্যমান। এই ক্যাফিইন চা-এও আছে। তার জন্যে কফি উত্তেজক পানীয়।

সব চেয়ে উৎকৃষ্ট কফি আরবের মোকা (mocha)-জাতীয় কফি।

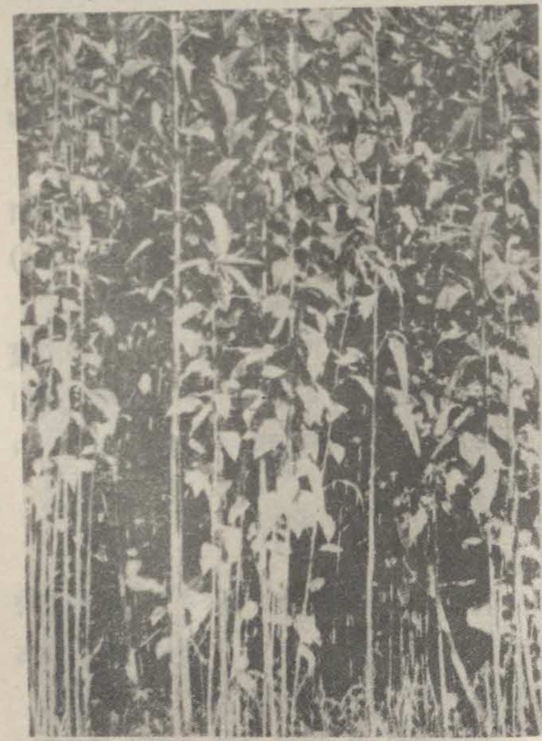


॥ পাট ॥

পাট খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না। পাটকে বলা হয় নগদা বা অর্থকরী ফসল (cash crop)। পাট বেচে চাষী নগদ টাকা পায়। তাই একে নগদা বা অর্থকরী ফসল বলে।

পাট বলতে পাট গাছের আঁশকে বোঝায়। পাট ও পাটজাত দ্রব্য (থলে, ক্যানভাস প্রভৃতি) রপ্তানি করে ভারত প্রায় ২০০ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। পাট ও পাটজাত দ্রব্য যুক্তরাজ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, ইটালি প্রভৃতি দেশে রপ্তানী হয়।

পৃথিবীর মোট পাট-উৎপাদনের ৯৬ শতাংশ ভারতীয় উপমহাদেশেই হয়ে থাকে। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৮২টি পাটকল অবস্থিত। তন্মধ্যে ৭০টি পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত। ১৯৭৮-৭৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, ভারতে প্রায় ৬৪৫৪ লক্ষ গাঁইট পাট উৎপন্ন হয়েছে।



পাট গাছ

আসাম, বিহার, মেঘালয়, নাগাল্যাণ্ড, ওড়িশা, ত্রিপুরা, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে পাটচাষ হয়ে থাকে।

পাট গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালীন ফসল। উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া পাট চাষের পক্ষে অনুকূল। এঁটেল,

বেলে-দোআঁশ, দোআঁশ জমি পাট চাষের উপযোগী। গোবর, কচুরিপানা, আবর্জনা-পচা সার, ছাই, পুকুরের পাঁকমাটি পাটচাষের জন্য সার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। রাসায়নিক সার অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতির ব্যবহার বড় একটা দেখা যায় না।

পাট দুরকমের, তিতা পাট (কেপস্যুলারিন) ও মিঠা পাট বা বগী পাট (অলিটেরিয়াস)। দুরকমের পাটেরই অনেকগুলি উন্নত জাত আছে।

পাটচাষ করতে গেলে ক্ষেতে লাঙ্গল দেওয়া, নিড়ানি দিয়ে আগাছা তোলা, সার দেওয়া, কীট-নাশক ঔষধ ছড়ানো ও উপযুক্ত সময়ে পাটগাছ কেটে পচিয়ে আঁশ বার করা আবশ্যক।

হেক্টার-পিছু ১৫ থেকে ২০ কুইন্টাল পাটের আঁশ পাওয়া যায়। উন্নত প্রণালীতে চাষ করলে ফলন হেক্টার-পিছু ৩০ কুইন্টাল পর্যন্ত হতে পারে। পাটের শুকনো আঁশের ওজন সবুজ গাছের ওজনের মাত্র শতকরা ৫/৬ ভাগ হয়।

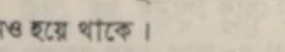
॥ সরিষা ॥

সরিষা বা সরষে তৈলবীজ জাতীয় ফসল। হলদে সরষে, বাদামী সরষে ও টোরিকে রেপ (rape) বলে। রাই সরষেকে **mustard** বলে। তারামিরাও সরিষা।

ভারতের সর্বত্র অল্পাধিক সরিষার চাষ হয়। উর্বর দোআঁশ মাটি সরিষা চাষের উপযোগী। জমিতে জৈব সারের সঙ্গে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিতে হয়।

টোরি—বি-৫৪ (অগ্রাণী), হলদে সরষে—বি-৯ (বিনয়), রাই, জটা রাই, টি-৫৯ (বরুণা), বি-৮৫ (সীতা) উন্নত জাতের সরিষা।

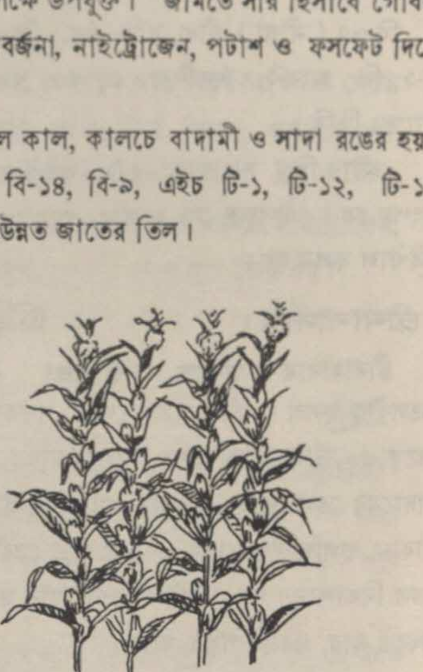
পূর্ব ভারতে হেক্টার-পিছু ৫/৬ কুইন্টাল সরষে পাওয়া যায়। উপযুক্ত সার প্রয়োগে ১০/১২ কুইন্টাল ফলনও হয়ে থাকে।

॥ তিল ॥ 

ভারতে তৈলবীজ ফসলসমূহের মধ্যে সরিষার পরেই তিলের স্থান। ভারতের সর্বত্র তিল উৎপন্ন হয়।

উর্বর দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটি তিল চাষের পক্ষে উপযুক্ত। জমিতে সার হিসাবে গোবর, পচা আবর্জনা, নাইট্রোজেন, পটাশ ও ফসফেট দিতে হয়।

তিল কাল, কালচে বাদামী ও সাদা রঙের হয়। বি-৬৭, বি-১৪, বি-৯, এইচ টি-১, টি-১২, টি-১৩ প্রভৃতি উন্নত জাতের তিল।



তিল গাছ

সাধারণতঃ হেক্টার-প্রতি ৫/৬ কুইন্টাল তিল পাওয়া যায়। উপযুক্ত সার ও সেচ প্রয়োগে ৮/১০ কুইন্টাল ফলন হয়। সাধারণ ঘানির সাহায্যে শতকরা ৩৮ থেকে ৪২ ভাগ তেল পাওয়া যায়।

॥ তিসি ॥

তিসি (linseed) ভারতের অন্যতম তৈলবীজ। বিদেশে তিসি (flax) গাছ থেকে লিনেন-আঁশ

পাওয়া যায়। তা থেকে লিনেন বস্ত্র তৈরী হয়। তিসি থেকে শতকরা ৪০ ভাগ তেল পাওয়া যায়। ভারতের সর্বত্র তিসি উৎপন্ন হয়।

দোআঁশ, পলি মাটি ও এঁটেল-দোআঁশ মাটিতে তিসি ভালো হয়। গোবর, পচা আবর্জনা, ফসফেট, নাইট্রোজেন ও পটাশ সার হিসাবে জমিতে দিতে হয়।

বি-৬৭ (নীলা), হীরা, মতি, এল. জি-৫, বি. টি-২, বি. আর-২, এন.পি-৫, ৯, ৩৫, ৪৫ উন্নত জাতের তিসি।

হেক্টার-পিছু সাধারণতঃ ৫/৬ কুইন্টাল তিসি উৎপন্ন হয়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ৮/১০ কুইন্টাল ফলন হয়।

॥ চীনাবাদাম ॥



চীনাবাদাম ভারতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ তৈলবীজ ফসল। চীনাবাদাম থেকে শতকরা ৪০ থেকে ৫০ ভাগ ভোজ্য তেল পাওয়া যায়। চীনাবাদামের তেল থেকে বনস্পতি বা উদ্ভিজ্জাত ঘি, সাবান, সুগন্ধি দ্রব্য, মোম, ঔষধ প্রভৃতি তৈরী হয়। তেল নিষ্কাশনের পর যে খইল পাওয়া যায় তা জমির উৎকৃষ্ট সার, গবাদি পশুর খাদ্য।

ভারতের সর্বত্র চীনাবাদামের চাষ হয়। জমিতে সার হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, চুন, জৈব সার দিতে হয়।

চীনাবাদাম গাছ দুরকমের—ছড়ানো জাত ও দাঁড়ানো বা গুচ্ছ জাত। টি. জি.-১ (বিক্রম), টি. জি.-৩, টি. এম. ভি-১, ২, ৫, গঙ্গাপুরী, পোল্লাচি-১, বি-৩০, ৩১, জে-১১ সুপিরিয়র বোল্ড, কাথিওয়ার বোল্ড উন্নত জাতের চীনাবাদাম।

হেক্টার-পিছু ৮/১০ কুইন্টাল খোসা-সহ বাদাম



সূর্যমুখী গাছ ও তার ফুল

উৎপন্ন হয় ও দানায় শতকরা ৪৮/৪৯ ভাগ তেল পাওয়া যায়।



। সূর্যমুখী ।

সূর্যমুখী ফুলের যথেষ্ট কদর আছে। কিন্তু বর্তমানে সূর্যমুখীর বীজ থেকে শতকরা ৪০/৫০ ভাগ তেল নিষ্কাশন করা হয়। এ দিক্ দিয়ে সূর্যমুখী বর্তমানে ভারতের অন্যতম প্রয়োজনীয় তৈলবীজ ফসল।

ইউ. পি. এস-২ ও ৫ নামক কম্পোজিট সূর্যমুখীর চাষে আশাতিরিক্ত ফলন হয়ে থাকে। ই. সি-৬৮৪১৩, ই. সি-৬৮৪১৪, ই. সি-৬৮৪১৫ সানরাইজ, মরডেন প্রভৃতি উন্নত জাতের সূর্যমুখী।

সার হিসাবে জমিতে গোবর, কম্পোস্ট সার,

নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ দিতে হয়। জমিতে ভালোভাবে মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে নেওয়া দরকার।

হেক্টার-পিছু ৯।১০ কুইন্টাল বীজ পাওয়া যায়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ১৫।২০ কুইন্টাল ফলন হয়।



॥ আলু ॥

আলু নানা রকমের—গোল আলু, মিষ্টি আলু বা রাঙ্গা আলু, চুপড়ি আলু প্রভৃতি। তন্মধ্যে গোল আলুই সবজি হিসাবে আমরা বেশী ব্যবহার করি। আলু উৎকৃষ্ট খাদ্য। ভারতের সর্বত্র আলুর চাষ হয়। ভারতে প্রায় ৭ লক্ষ ৯০ হাজার হেক্টার জমিতে আলুর চাষ হয় এবং ১ কোটি ৭১ লক্ষ ২৫ হাজার মেট্রিক টন আলু উৎপন্ন হয়।

উর্বর দোআঁশ মাটিতে গোবর, আবর্জনা সার, খইল, সবুজ সার, নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি দিতে হয়।

সাথা (satha), আপ-টু-ডেট, গ্রেট স্কট, কুফরি চন্দ্রমুখী, কুফরি অলংকার, রয়েল কিডনি, কুফরি চমৎকার, পিম্পারনেল, দার্জিলিং লাল প্রভৃতি জলদি, মাঝারি ও নাবী জাতের উন্নত আলু।



মাটির ভিতর থেকে আলু তোলা হয়েছে

ভালোভাবে মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করা, নিড়ানি দিয়ে আগাছা সাফ করা, সেচ দেওয়া, সার প্রয়োগ করা, রোগ ও কীটনাশক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা আলুচাষের পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সাধারণতঃ হেক্টার পিছু ১৫০ থেকে ৩০০ কুইন্টাল আলু উৎপন্ন হয়।

॥ মিষ্টি আলু ॥

মিষ্টি আলু বা রাঙ্গা আলু উৎকৃষ্ট সবজি। এ থেকে যে ময়দা তৈরী হয় তা স্টার্চ, সিরাপ, অ্যালকোহল, রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি তৈরিতে লাগে।

দোআঁশ ও বেলে-দোআঁশ মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, গোবর, সবুজ সার দিতে হয়।

হেক্টার-পিছু ১৫০ থেকে ৩০০ কুইন্টাল আলু উৎপন্ন হয়।



॥ লঙ্কা ॥

লঙ্কা ভারতে একটি জনপ্রিয় মসলা (spice)। রান্নার কাজে লঙ্কার প্রয়োজন প্রতিদিনের। এ ছাড়া লঙ্কা থেকে চাটনি, আচার প্রভৃতি তৈরী হয়ে থাকে।

বেলে দোআঁশ বা পলিযুক্ত দোআঁশ জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, গোবর প্রভৃতি প্রয়োগ করতে হয়।

লঙ্কা নানা আকারের ও নানা শ্রেণীর। এন পি. ৪৬-এ, এন পি ৪৫-১-৫, কালিফোর্নিয়া ওয়াণ্ডার, সূর্যমুখী প্রভৃতি লঙ্কার চাষ করা ভালো।

হেক্টার-পিছু ৬ থেকে ১০ কুইন্টাল শুকনো লঙ্কা ও ৩০ থেকে ৬০ কুইন্টাল কাঁচা লঙ্কা পাওয়া যায়। উপযুক্ত সেচ ও সার প্রয়োগে ১৫।২০ কুইন্টাল শুকনো লঙ্কা ও ৭০৮০ কুইন্টাল কাঁচা লঙ্কা উৎপন্ন হয়।



একজাতীয় লঙ্কার গাছ

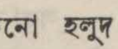
॥ হলুদ ॥

রান্নার কাজে হলুদ একটি জনপ্রিয় মসলা (spice)। বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ জমিতে প্রচুর পলিমাটি, সবুজ সার, পরিমাণমতো গোবর, খইল, ইউরিয়া প্রভৃতি দিতে হয়।

কাঁচা হলুদকে ভালোভাবে শোধন করে শুকিয়ে নিলে ব্যবহারোপযোগী হয়।

হেক্টার-পিছু ৪০।৫০ কুইন্টাল শুকনো হলুদ পাওয়া যায়।

॥ আদা ॥



আদা কাঁচা ও শুকনো দুইভাবেই ব্যবহৃত হয়। আদা উৎকৃষ্ট মসলা। উর্বর দোআঁশ জমিতে গোবর, ছাই, চুন, সুপার ফসফেট, খইল, ইউরিয়া, অ্যামোনিয়াম সালফেট প্রভৃতি দিতে হয়।

ভারতীয় আদা, জ্যামাইকান আদা ও জাপানী আদা—প্রধানতঃ এই তিন রকম আদার চাষ হয়। জ্যামাইকান আদা সব চেয়ে ভালো। তার পরেই কোচিন আদার স্থান। জাপানী আদার রং সাদা। এই আদা ঝাঁঝালো।

হেক্টার-পিছু ৭৫ থেকে ১০০ কুইন্টাল আদা উৎপন্ন হয়। তা থেকে ২৫।৩০ কুইন্টাল শুকনো আদা পাওয়া যায়।



॥ পিঁয়াজ ॥

পিঁয়াজ মসলা ও সবজি। ঝুরঝুরে হালকা-দোআঁশ বা পলিযুক্ত মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশ, কাঠের ছাই, জৈব সার ইত্যাদি দিতে হয়।

ইয়েলো গ্লোব, হোয়াইট গ্লোব, সিলভার স্কিন, পুসা-রেড, লার্জ-রেড, পাটনা-রেড, প্রাইজ-টেকার, মার্কেট-গার্ডেনার, হোয়াইট পোর্তুগাল, সুইট স্পেনিশ, রেড ইটালিয়ান, অস্ট্রেলিয়ান ব্রাউন প্রভৃতি নানা জাতের পিঁয়াজের চাষ হয়।

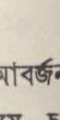
হেক্টার-পিছু ৫০।৬০ কুইন্টাল ফলন হয়ে থাকে।

॥ রসুন ॥

রসুন ভারতে বহুল ব্যবহৃত মসলা। বাত, ফুসফুসের রোগ, আন্ত্রিক রোগ প্রভৃতিতে রসুন ব্যবহৃত হয়।

উর্বর দোআঁশ মাটিতে গোবর, পচা আবর্জনা, নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি দিয়ে চাষ করতে হয়।

॥ বেগুন ॥



সবজি হিসাবে বেগুনের যথেষ্ট সমাদর। দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ জমিতে নাইট্রোজেন, পটাশ, সুপার ফসফেট প্রভৃতি দিতে হয়।

পুসা-পারপল-লং, পুসা-পারপল-রাউণ্ড, পুসা-পারপল গুচ্ছ প্রভৃতি বেগুনের চাষে ফলন বেশী হয়। বেগুন অপুষ্ট অবস্থায় তুলে নিয়ে সবজি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বেগুন নানা আকারের ও নানা রঙের হয়ে থাকে।



বেগুন

হেক্টার-পিছু ১০০ থেকে ১৫০ কুইন্টাল বেগুন পাওয়া যায়।

॥ টম্যাটো ॥



টম্যাটো ভিটামিন-সমৃদ্ধ অতি পুষ্টিকর সবজি বেলে দোআঁশ বা এঁটেল-দোআঁশ জমিতে পটাশ, সুপার ফসফেট, নাইট্রোজেন, অ্যামোনিয়াম সালফেট, গোবর প্রভৃতি দিতে হয়।

বেস্ট-অব-অল, বনি বেস্ট, লার্জ রেড, পুসা রুবি, পুসা আর্লি ডোয়ার্ফ, বিজয়, কুবের, মীরাটি প্রভৃতি উন্নত জাতের টম্যাটো।

হেক্টার-পিছু ১৫০ থেকে ২৫০ কুইন্টাল টম্যাটো



টম্যাটো গাছ

পাওয়া যায়।



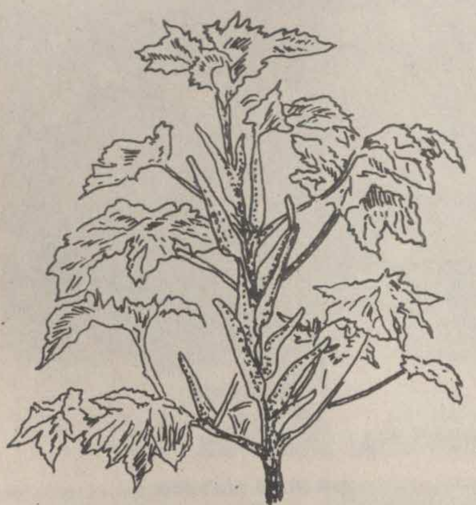
টম্যাটো

॥ ঢেঁড়স ॥

গ্রীষ্মকালীন জনপ্রিয় সবজি। ঢেঁড়শ গাছের

আঁশ কাগজশিল্পে ব্যবহৃত হয়।

দোআঁশ জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, অ্যামোনিয়াম সালফেট, গোবর, আবর্জনা সার দিতে হয়।



ঢেঁড়স গাছ

ভারতের প্রায় সর্বত্র পুসা-মখমলী, লং গ্রীন, লং হোয়াইট, লক্ষ্ণৌ-ডোয়ার্ফ, লাল ভিণ্ডি প্রভৃতি ঢেঁড়সের চাষ হয়।

হেক্টার-পিছু ৫০ থেকে ৯০ কুইন্টাল ঢেঁড়স পাওয়া যায়।

॥ মিষ্টি কুমড়া ॥



মিষ্টি কুমড়া ভারতীয়দের প্রয়োজনীয় সবজি। হালকা দোআঁশ জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, গোবর, পচা আবর্জনা প্রভৃতি দিতে হয়। মিষ্টি কুমড়া গাছ মাটিতে লতিয়ে ফল দেয়।

লার্জ রেড, লার্জ রাউণ্ড, অরকা চন্দন, অরকা সূর্যমুখী, টেবল কুইন প্রভৃতি উন্নত জাতের কুমড়ার চাষে ফলন বেশী হয়। কুমড়া নানা আকারের হয়ে থাকে।

হেক্টার-পিছু ২০০ থেকে ৩০০ কুইন্টাল কুমড়া পাওয়া যায়।

॥ লাউ ॥

লাউ জনপ্রিয় গ্রীষ্ম ও শীতকালীন সবজি। উর্বর দোআঁশ জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, গোবর, পচা আবর্জনা, অ্যামোনিয়াম সালফেট দিতে হয়। লাউ গাছ মাচায় বা ঘরের চালে উঠে ফল দেয়।

লাউ নানা আকারের। পুসা-মেঘদূত, পুসা-মঞ্জরী, পুসা সামার প্রলিফিক লং, পুসা সামার প্রলিফিক রাউণ্ড প্রভৃতি উন্নত জাতের লাউ।

হেক্টর-পিছু ৭৫ থেকে ১০০ কুইন্টাল লাউ পাওয়া যায়।

॥ ঝিঙ্গা ॥

ঝিঙ্গা উৎকৃষ্ট গ্রীষ্মকালীন সবজি। সহজে হজম হয়, শরীর ঠাণ্ডা রাখে। উর্বর দোআঁশ জমিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, পচা গোবর প্রভৃতি দিতে হয়।

পুসা-নসধর, পুসা-চিকনি, শটপুটিয়া প্রভৃতি উন্নত জাতের ঝিঙ্গা।

হেক্টার-পিছু ৭৫ থেকে ১২৫ কুইন্টাল ঝিঙ্গা পাওয়া যায়।

॥ করলা ও উচ্ছে ॥

করলা বড় ও লম্বা ধরনের, উচ্ছে ছোট। দুই-ই তেতো সবজি। মুখরোচক ও উপকারক।

দোআঁশ ও এঁটেল দোআঁশ জমিতে পচা গোবর, নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি দিতে হয়।

পুসা-দো-মৌসুমী ও কোয়েম্বাটোর-লং উন্নত জাত।

হেক্টার-পিছু ৬০ থেকে ১২০ কুইন্টাল করলা বা উচ্ছে পাওয়া যায়।

॥ পটল ॥



পটল অতি উপাদেয় সবজি। পটল গাছের কচি পাতা ও ডগা উৎকৃষ্ট মুখরোচক খাদ্য। উর্বর দোআঁশ মাটিতে নাইট্রোজেন, ফসফেট, পটাশ, গোবর প্রভৃতি সার দিয়ে চাষ করতে হয়। লতার কাটিং, গাছের মূল ও বীজ লাগিয়ে চাষ করা চলে।

পটল মাটিতে লতিয়ে ফল দেয়। হেক্টার-পিছু ১০০ থেকে ১৫০ কুইন্টাল পটল পাওয়া যায়।

॥ শশা ॥

শশা ভারতে সবজি ও কাঁচা খাওয়ার ফল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ জমিতে গোবর, ফসফেট, নাইট্রোজেন ও পটাশ সার হিসাবে দিতে হয়।

শশা প্রধানতঃ দু জাতের— ৩০-৩৫ সেন্টিমিটার লম্বা ও ৬-৮ সে. মি. মোটা শশা মাচায় ফলে। অন্য জাতের শশা ১২-১৮ সে. মি. লম্বা।

সাধারণতঃ হেক্টার-প্রতি ৬০ থেকে ১২০ কুইন্টাল শশা পাওয়া যায়।

॥ ফুলকপি ॥

শীতকালীন সবজি। উর্বর দোআঁশ বা এঁটেল-দোআঁশ জমিতে গোবর, নাইট্রোজেন, সুপার ফসফেট, পটাশ প্রভৃতি দিতে হয়।

ফুলকপি জলদি ও নাবী হয়। জলদি পাটনাই,



ফুলকপি

আর্লি-মার্কেট, পুসা-কটকি, স্নোবল, বেনারস মেনক্রপ, চায়না, পার্ল, লেট বেনারস প্রভৃতি ফুলকপির চাষ করা হয়।

বীজ থেকে চারা হয়। হেক্টার-পিছু ১০ থেকে ২০ কুইন্টাল ফুলকপি উৎপন্ন হয়।

॥ বাঁধাকপি ॥

বাঁধাকপি পুষ্টিকর সুস্বাদু শীতকালীন সবজি। এঁটেল-দোআঁশ ও এঁটেল মাটিতে গোবর, কম্পোস্ট সার, নাইট্রোজেন, ফসফেট, মিউরিয়েট অব পটাশ দিতে হয়।

জলদি, মাঝারি ও নাবী তিনজাতের বাঁধাকপির চাষ হয়। আর্লি ড্রাম-হেড, ইংলিশ বল, কোপেন-হেগেন মার্কেট, পুসা লেট, স্যাভয় প্রভৃতি নানা জাতের বাঁধাকপির চাষ ভারতের প্রায় সর্বত্র হয়।

সাধারণতঃ হেক্টার-পিছু ১৫০ থেকে ২৫০ কুইন্টাল বাঁধাকপি উৎপন্ন হয়।



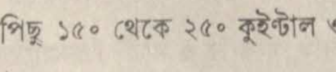
বাঁধাকপি

॥ ওলকপি ॥

ওলকপি শীতকালীন সবজি। বেলে-দোআঁশ, এঁটেল-দোআঁশ জমিতে গোবর, পচা আবর্জনা, নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার হিসাবে দিতে হয়। বীজ থেকে গাছ হয়।

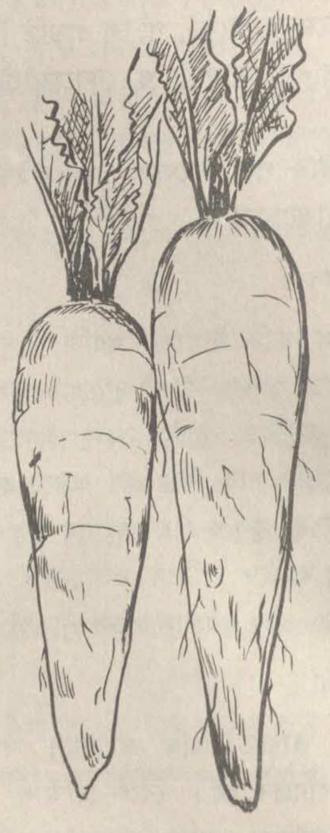
ওলকপি সাদা, হালকা সবুজ, বেগুনি, গোলাপী প্রভৃতি নানা রঙের হয়ে থাকে। আর্লি হোয়াইট, আর্লি ভিয়েনা, হোয়াইট ভিয়েনা, গ্রীন পার্ল, পারপল্ ভিয়েনা প্রভৃতি নানা উন্নত জাতের ওলকপির চাষ হয়ে থাকে।

হেক্টার-পিছু ১৫০ থেকে ২৫০ কুইন্টাল ওলকপি পাওয়া যায়।

॥ মূলা ॥ 

মূলা পুষ্টিকর জনপ্রিয় সবজি। বেলে-দোআঁশ ও এঁটেল-দোআঁশ জমিতে গোবর, পচা আবর্জনা, সুপার ফসফেট, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও ইউরিয়া সার হিসাবে দিতে হয়।

মূলা নানা আকারের ও নানা রঙের। কন্টাই



মূলা

রেড, রেড বোম্বাই, হিংলি, পুসা-দেশী, পুসা-রেশমী, পুসা-হিমানী, হোয়াইট আইসিক্‌ল্, স্কার্লেট গ্লোব, ফ্রেঞ্চ ব্রেকফাস্ট, জাপানীজ হোয়াইট প্রভৃতি নানা উন্নত জাতের মূলার চাষ হয়ে থাকে।

হেক্টার-পিছু ১৪০ থেকে ১৭৫ কুইন্টাল মূলা হয়। ইউরোপীয় জাতের মূলার ফলন কম হয় (হেক্টারে ৪৫-৭৫ কুইন্টাল)।

॥ শালগম ॥

শালগমের আকার গোল ও চেপটা। তরকারি

হিসাবে শালগমের চাষ হয়। শীতকালীন ফসল। বীজ থেকে চারা হয়। বেলে-দোআঁশ ও উর্বর দোআঁশ জমিতে গোবর, ফসফেট, নাইট্রোজেন, সুপার ফসফেট ও পটাশ দিতে হয়।

বেড় গ্লোব, হোয়াইট গ্লোব, পুসা কাঞ্চন, স্নোবল, গোল্ডেন বল, পারপল-টপ জাতের শালগম ভালো ফলন দেয়। হেক্টার-পিছু ১৫০ থেকে ২০০ কুইন্টাল শালগম উৎপন্ন হয়।



॥ গাজর ॥

শীতকালীন ফসল। স্যালাড ও তরকারি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গাজর উৎকৃষ্ট পশুখাদ্য। দোআঁশ জমিতে পটাশ, নাইট্রোজেন, ফসফেট, গোবর ইত্যাদি দিতে হয়।

গাজর কমলা, হলদে, সাদা, বেগুনি, কাল প্রভৃতি নানা রঙের ও নানা আকারের হয়ে থাকে। পুসা-কেশর, আর্লি-জেম, গোল্ডেন হার্ট, স্কার্লেট হর্ন ভালো ফলন দেয়।

হেক্টার-পিছু ১২৫ থেকে ২০০ কুইন্টাল গাজর পাওয়া যায়।

॥ বীট ॥

বীট স্যালাড ও তরকারি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একজাতীয় বীট (সুগার বীট) থেকে চিনি উৎপন্ন হয়। দোআঁশ জমিতে পটাশ, ফসফেট, নাইট্রোজেন, গোবর ইত্যাদি সার হিসাবে দিতে হয়।

ক্রিমসন গ্লোব, ডেট্রয়েট ডার্ক-রেড উন্নত জাতের বীট।

হেক্টার-পিছু ১২৫ থেকে ১৭৫ কুইন্টাল বীট পাওয়া যায়। সুগার বীটের ফলন হয় হেক্টার-প্রতি ৪০০ থেকে ৫০০ কুইন্টাল।

॥ নানাজাতের শাকসব্জি ॥

ধনে, জিরা, মৌরী, গোলমরিচ, শন, পান, এরারুট, শটী, রেড়ি, মটরশুঁটি, পালংশাক, নটেশাক প্রভৃতি নানা ধরনের চাষ ভারতের নানা স্থানে হয়ে থাকে।



॥ ফল চাষ ॥

আম, কাঁঠাল, জামরুল, কালজাম, গোলাপজাম, আতা, লিচু, আমড়া, আমলকী, পীচ, কলা, নারকেল, সুপারি, বেল, কয়েতবেল, কুল, চালতা, কমলা লেবু, পাতি লেবু, বাতাবি লেবু, কাগজী লেবু,

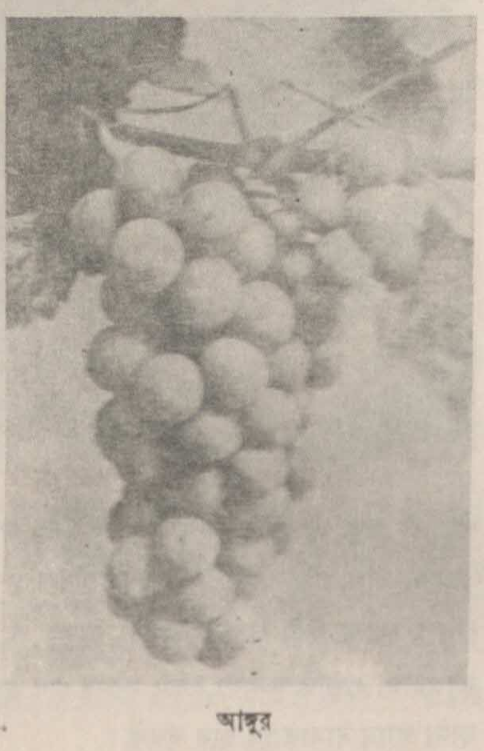


আনারস

শরবতী লেবু, আনারস, আপেল, জলপাই, ডালিম, তরমুজ, তাল, তেঁতুল, নাশপাতি, পানিফল, পেয়ারা, পেঁপে, ফলসা, ফুটি, বাদাম, সপেটা, আঙ্গুর, আঁশফল কামরাঙ্গা প্রভৃতি অসংখ্য রকম ফলের চাষ ভারতের নানা স্থানে নানাভাবে হয়ে থাকে।



ফলন্ত পেঁপে গাছ



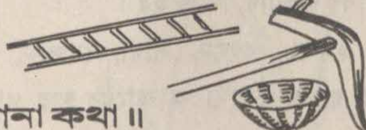
আঙ্গুর

॥ পরিচর্যা ॥

চাষের জন্য জমি নির্বাচন, মৃত্তিকার গুণাগুণ পরীক্ষা, উত্তমরূপে চাষ দেওয়া, সার প্রয়োগ, বীজ নির্ধারণ, সতর্কতার সঙ্গে চারা তৈয়ারি, আম্রাদি গাছের কলম করা, সেচের ব্যবস্থা, আগাছা সাফ করা, প্রয়োজনানুসারে কোন কোন গাছের ডাল ও শিকড় ছাঁটা, রোগ ও কীট পতঙ্গাদি নিবারণের জন্য নানাবিধ রাসায়নিক ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক।

॥ যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র ॥

মই, নিড়েন, খুরপি, ঝারি, পিচকারি, আঁচড়া, ছাঁটাইয়ের কাঁচি, ঝুড়ি, বালতি, কোদাল, শাবল, কাটারি, নারিকেল ছোবড়া, জালতি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি ও উপকরণ চাষের জন্য প্রয়োজন।



॥ নানা কথা ॥

পৃথিবীর জমির মাত্র শতকরা ২১ ভাগ জমি চাষযোগ্য। কিন্তু মাত্র শতকরা ৭·৬ ভাগ জমিতে চাষ হয় (বনাঞ্চলের হিসাব ধরা হয় নি)।

আন্দিজ পর্বতের ঢালে ইন্‌কা চাষীদের তৈরী চাষের জমি

১১,০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও যে চাষ হত তার নিদর্শন পাওয়া গেছে থাইল্যাণ্ডের Nok Nok Tha ও Spirit Cave থেকে।

কানাডার আলবার্টার লেথব্রিজের দক্ষিণ-পশ্চিমে এক লপ্তে ৩৫ হাজার একর (১৪,১৬০ হেক্টার) জমিতে গম চাষ হওয়ার কথা জানা যায়।

চাষের ইংরেজী agriculture। নানাবিধ পশু অর্থাৎ ছাগল, ভেড়া, শূকর, গরু, মহিষ, হাঁস, মুরগী প্রভৃতি পালনও কৃষিপর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত।



এঞ্জিনীয়ারিং

এঞ্জিনীয়ারিং (engineering) একটি ইংরেজ শব্দ। এর নানা বাংলা প্রতিশব্দ যন্ত্রবিজ্ঞান বা যন্ত্রবিদ্যা, প্রযুক্তিবিদ্যা, পূর্তবিদ্যা। শব্দটি এসেছে এঞ্জিন (engine) কথা থেকে। এঞ্জিন মানে যন্ত্র। ছুরি, কাঁচি, কোদাল, শাবল, কাস্তে, হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার, কর্নিক, দুরমুশ প্রভৃতি যন্ত্র। মোটর গাড়ি, জাহাজ, বিমান প্রভৃতির এঞ্জিন তো যন্ত্রই।

॥ এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রয়োজনীয়তা ॥

মানুষ বুদ্ধি খাটিয়ে নানা ধরনের যন্ত্রের সাহায্যে মনুষ্য সমাজের পক্ষে প্রয়োজনীয় নানা জিনিস তৈরি করছে। নদীর উপরে সেতু নির্মাণ বিরাট বিরাট অট্টালিকা তৈরি, রাস্তা, বাঁধ, জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি, কাপড়ের কল, তেলের কল, চিনির কল তৈরি, ভূগর্ভ থেকে পেট্রল উত্তোলন, সুড়ঙ্গ তৈরি, খাল কাটা, ট্রাম গাড়ি তৈরি, জলের পাম্প, রেফ্রিজারেটর, টেলিভিসন, রেডিও, দূরবীন, অনুবীক্ষণযন্ত্র, এক্স-রে মেসিন, রেডার, রকেট, সিমেন্ট, প্লাস্টিক, পলিথিন প্রভৃতি অসংখ্য রকমের জিনিস তৈরি করতে এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রয়োজন।

আগেকার যুগের মানুষের প্রয়োজন ছিল শুধু পশুশিকার ও খাওয়া। যত দিন যেতে লাগল তারা ততই বিভিন্ন জিনিসের প্রয়োজন বোধ করতে লাগল। চাষের কাজ করতে, মাছ ধরতে, নৌকা চালাতে, থাকবার ঘর তৈরি করতে তারা কিছু কিছু যন্ত্র ব্যবহার করতে লাগল। তখন থেকেই এঞ্জিনীয়ারিং-এর আরম্ভ। তবে আজকালকার মতো এত ব্যাপক নয়।

॥ এঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজ ॥

এখন মানুষ বড় বড় শহর তৈরি করছে। তাতে বড় বড় বাড়ি, প্রশস্ত রাস্তা রয়েছে। নদীর উপরে সেতু করে এপার থেকে ওপারে যাচ্ছে। পাহাড় কেটে সুড়ঙ্গ করে তার মধ্য দিয়ে মানুষ বা রেল-গাড়ি যাবার পথ তৈরি করেছে। নদীতে বা

সাগরে জাহাজ চলাচলের ব্যবস্থা করেছে। উড়োজাহাজে করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে যাচ্ছে ও মালপত্র পাঠাচ্ছে। মাটির উপর দিয়ে রেলগাড়ি তো চালাচ্ছেই আবার মাটির তলা দিয়ে, কখনও কখনও নদীর নীচ দিয়ে রেলগাড়ি যাবার ব্যবস্থা করেছে। দুর্গম পাহাড়ের উপর দিয়ে রেল চলাচল করার পথ তৈরি করেছে। খাল কেটে এক জলপথ থেকে আর এক জলপথে যাবার পথের দৈর্ঘ্য কমিয়ে এনেছে—যেমন পানামা খাল ও সুয়েজ খাল। পৃথিবীর সর্বত্র বড় বড় ঔষধ তৈরি, চিনি তৈরি, বস্ত্র তৈরি, দিয়াশলাই তৈরি, উদ্ভিজ্জ তৈল উৎপাদন প্রভৃতি নানা কাজ করছে। রকেটে চড়ে চাঁদে গিয়েছে, পৃথিবীকে পরিক্রমা করেছে, বিভিন্ন গ্রহের দিকে রকেট পাঠিয়েছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ব্লাস্ট ফারনেস (blast furnace) তৈরি করে লৌহপ্রস্তর গলিয়ে তা থেকে লোহা বার করেছে। এমনি কত যে কাজ করছে, তা বলে শেষ করা যায় না। এ সবই এঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে সুষ্ঠুভাবে করছে।

এঞ্জিনীয়ারিং মানুষের জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিচ্ছে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশের প্রযুক্তিবিদ্যা বা যন্ত্রবিজ্ঞান তত উন্নত।

॥ এঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে উন্নতি ॥

ছোট মহাদেশ ইউরোপ। শুধু যন্ত্রবিদ্যার সাহায্যে সেই মহাদেশের সকল দেশ অভূতপূর্ব উন্নতি করে চলেছে। ইউরোপের তুলনায় আফ্রিকা মহাদেশ অনেক বড়। সেখানে দেশ অনেক। কিন্তু উপযুক্ত প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে দেশগুলি অনেক পিছিয়ে পড়ে আছে। ভারত সুপ্রাচীন দেশ। নানা জ্ঞানের দিক্ দিয়ে অন্য বহু দেশের চেয়ে বহু সহস্র বৎসর আগে উন্নত ছিল। কিন্তু প্রযুক্তিবিদ্যার অভাবে পাশ্চাত্ত্যের বহু দেশের তুলনায় কম উন্নত ছিল। স্বাধীন হবার পর প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে ভারত ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণীর উন্নত দেশ হয়ে উঠছে।

॥ এঞ্জিনিয়ারিং-এর শ্রেণীবিভাগ ॥

এই যে প্রযুক্তিবিদ্যা বা এঞ্জিনীয়ারিং তা বহু রকমের। এঞ্জিনীয়ারিং-এর নানা বিভাগ। এঞ্জিনীয়ারিং-এ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের বলে এঞ্জিনীয়ার। একজন এঞ্জিনীয়ারের পক্ষে এঞ্জিনীয়ারিং-এর সকল বিভাগে পারদর্শিতা লাভ করা সম্ভব নয়। কাজেই সাধারণতঃ তাঁরা এক একটি বিভাগের কার্যে রত থাকেন।

আধুনিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর বিভাগ প্রধানতঃ ছয়টি-সিভিল (civil), কেমিক্যাল (chemical) ইলেকট্রিক্যাল (electrical), মাইনিং (mining), মেটালারজিক্যাল (metallurgical) ও মেকানিক্যাল (mechanical)।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর এই ছয়টি বিভাগকে অবলম্বন করে বহু এঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ গড়ে উঠেছে—উড়োজাহাজ-সংক্রান্ত ব্যাপারে এরোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং (aeronautical engineering) মোটরগাড়ি সম্বন্ধীয় ব্যাপারে অটোমোবাইল এঞ্জিনীয়ারিং (automobile engineering), কৃষিকার্যের সঙ্গে জড়িত এগ্রিকালচারাল এঞ্জিনীয়ারিং (agricultural engineering), জাহাজ শিল্প-সংক্রান্ত মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং (marine engineering), সংবাদ প্রেরণ-সংক্রান্ত ব্যাপারে টেলিকম্যুনিকেশন এঞ্জিনীয়ারিং (telecommunication engineering), জনস্বাস্থ্যের বহু দিকের সঙ্গে জড়িত পাবলিক হেলথ এঞ্জিনীয়ারিং

(public health engineering), রকেট পরিচালনার ব্যাপারে রকেট এঞ্জিনীয়ারিং (rocket engineering), ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ ব্যাপারে ইলেকট্রনিক এঞ্জিনীয়ারিং (electronic engineering) প্রভৃতি।

॥ আধুনিক যন্ত্রযুগ ॥

বহু প্রাচীন কালে মানুষ নগণ্য দুচারধরনের যন্ত্রের সাহায্যে নিজের শক্তিতে নানা জিনিস তৈরী করত। তারপর লোকে জীবজন্তুর সাহায্যে যন্ত্রপাতি চালাত। প্রাচীন যুগের এই ধরনের এঞ্জিনীয়ারিং-এর স্থূল প্রথার অবসান ঘটানোর জন্যে লোকে প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে লাগাতে থাকল। প্রথমে মানুষ বাষ্প-শক্তি, পরে বৈদ্যুতিক শক্তি, তার পরে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার করে আধুনিক যন্ত্রযুগের সৃষ্টি করল। সৃষ্টি হতে থাকল নূতন নূতন এঞ্জিনীয়ারিং-এর বিচিত্র সব কৌশল। মানুষ ধাপে ধাপে সভ্যতার শিখরে উঠতে থাকল।

॥ পিরামিড ॥



প্রথমে ধরা যাক্ নানা ধরনের সু-উচ্চ সমাধি-সৌধ ও বিরাট অট্টালিকার কথা। সু-উচ্চ সমাধিসৌধের কথা বলতে প্রথমেই মনে আসে মিশরের পিরামিডের কথা। কয়েক হাজার পূর্বের মানুষ কি অদ্ভুত কৌশলে পিরামিড তৈরি করেছে, তা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

মিশরে (ঈজিপ্টে) ৭০টি পিরামিড (pyramid) আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও ষোলটি ছিল বলে জানা গেছে। সব চেয়ে বড় পিরামিড নীল নদের পশ্চিম তীরে কায়রোর দক্ষিণ-পশ্চিমে এল গিজা (EL Giza) বা এল গিজে (EL Gizeh)-নামক স্থানে মিশরের চতুর্থ রাজবংশের ফেরো (pharaoh) অর্থাৎ সম্রাট খুফু (Khufu or Khwfw অথবা Cheops) কর্তৃক আনুমানিক ২,৫৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত হয়। পূর্বে এর উচ্চতা ছিল ১৪৬·৫ মিটার, বর্তমানে উপরের অংশ ভেঙ্গে



খুফুর পিরামিড ও স্ফিংক্স্

পড়ায় উচ্চতা ১৩৭ মিটার। এর ভিত্তি রেখা (base line) ২৩০ মিটার। ১৩ একর (৫ হেক্টার) জমির উপর অবস্থিত। ৪০০০ লোককে ৩০ বৎসর ধরে পরিশ্রম করিয়ে এই সুবৃহৎ পিরামিডটি গড়ে তুলতে হয়েছে। অবশ্য, হিরোডোটাস (Herodotus, আনুমানিক ৪৮৫-৪২৫ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ) বলে গেছেন, এক লক্ষ লোক (প্রায় সকলেই ক্রীতদাস) একনাগাড়ে কুড়ি বৎসর ধরে পরিশ্রম করে এই পিরামিডটি গড়ে তুলেছিল। এতে ২½ টন ওজনের ২৩ লক্ষ চুনাপাথরের চাঁই ব্যবহৃত হয়েছে। সব চাঁইয়ের মিলিত আয়তন ২৫,৬৮,০০০ বর্গ মিটার। প্রত্যেকটি চাঁই ৯ মিটার লম্বা। পাথরের চাঁইগুলি নীচে থেকে উপরে গেঁথে তোলা হয়েছে।

খুফুর পিরামিডের পাশে খুফু বা কিয়পস (Cheops)-এর উত্তরাধিকারী খা-ফ্-রা (Kha-f-Ra বা Khapra বা Khepren বা Chepr-en)-এর তৈরী পিরামিড অবস্থিত। এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম পিরামিড। খা-ফ্-রার ছেলে Mena Kaure (মাইসেরিনাস—Mycerinus) তৃতীয় পিরামিড নির্মাণ করেন। মাইসেরিনাসের পিরামিডের এক একটি পাথরের চাঁইয়ের ওজন ২৮৫ টন। তিনটি পিরামিডই সামান্য ব্যবধানে অবস্থিত।

সাকারার পিরামিড সব চেয়ে পুরাতন। এটি আনুমানিক ২৬৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নির্মিত হয়। এর উচ্চতা ৬২ মিটার।

মিশর ছাড়া মেক্সিকোতেও পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। আয়তনে সবচেয়ে বড় পিরামিড মেক্সিকো শহরের ১০১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে Cholula de Rivadabia-তে অবস্থিত Quetza-lcoatl পিরামিড। এটির উচ্চতা ৫৪ মিটার। এটি



সাকারার পিরামিড

৪৫ একর (১৮·২ হেক্টার) জমির উপরে অবস্থিত। এর ত্রৈমাত্রিক আয়তন ৩৩,০০,০০০ বর্গ মিটার।

আনুমানিক ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকোর লা ভেনটা (La Venta) দ্বীপে ওলমেক (Olmec) জাতির দ্বারা একটি পিরামিড নির্মিত হয়। এটি ৩০ মিটার উচ্চ। এর ভিত্তিভূমির ব্যাস ১২৮ মিটার।

পিরামিড নির্মাণের পরবর্তী কালে মিশরীয় রাজা বা সম্রাট্‌দের সমাধি দেওয়ার জন্যে আর পিরামিড নির্মিত হত না। এক ধরনের গুহা সমাধির মধ্যে রাজা বা সম্রাট্‌দের মমি ও অন্যান্য বহু মূল্যবান্ জিনিসপত্র রেখে দেওয়া হত। দস্যুতস্করে সেই সব সমাধি খুঁড়ে দামী জিনিসপত্র নিয়ে গিয়েছে। কেবল ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ফেরো তুতেন খামেন (Tut-Ankh-Amen, আনুমানিক ১৩৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর সমাধিস্থল অবিকৃত অবস্থায় হাওয়ার্ড কার্টার (Howard Carter, ১৮৭৩-

১৯৩৯ খ্রী.) কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। সমাধিস্থলের গুহাভ্যন্তরে স্বর্ণ-সিংহাসন, সোনার বহু আসবাব-পত্র, গহনা এবং অন্যান্য বহু মূল্যবান্ দ্রব্য এবং সম্রাটের মামি পাওয়া যায়।

যে-সব পিরামিডের কথা বলা হল, তাতে এঞ্জিনীয়ারিং-এর বিস্ময়কর পটুতার পরিচয় পাওয়া যায়।



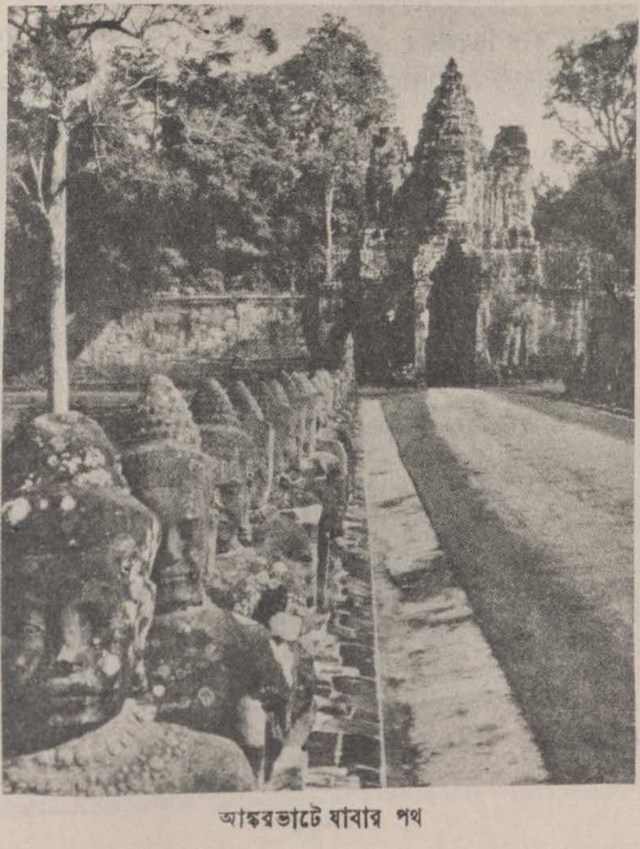
॥ দ্য গ্রেট স্ফিংক্স ॥

বৃহৎ পিরামিড তিনটির কাছে প্রযুক্তিবিদ্যার এক বিস্ময়কর নিদর্শন বর্তমান। সেটি দ্য গ্রেট স্ফিংক্স্ (the Great Sphinx)। এই গ্রেট স্ফিংক্স্ ইজিপ্টের এল গিজার একটি প্রকাণ্ড পাথরের মূর্তি। এর মুখ মানুষের মতো। এর দেহের নিম্নভাগ এক সিংহের মতো। সিংহটি তার দুই পা সামনের দিকে মেলে দিয়ে রয়েছে। মূর্তিটি উচ্চতায় ১৮ মিটার, দৈর্ঘ্যে ৫৭ মিটার।

গ্রেট স্ফিংক্স্ বলা হল এই জন্যে যে স্ফিংক্স্ শুধু মিশরে নয়, অ্যাসিরিয়া ও গ্রীস প্রভৃতি স্থানেও আছে। অবশ্য, অ্যাসিরিয়ার স্ফিংক্সের মাথা পুরুষের, কিন্তু গ্রীসের স্ফিংক্সের মাথা নারীর। এ ছাড়া মিশরে বহু স্ফিংক্স্ আছে। সে-সবের মাথা বিভিন্ন সম্রাটের মাথার মতো। এঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে কিরূপ বিস্ময়কর বস্তুর সৃষ্টি করা যায় তা স্ফিংক্স্ দেখলে বুঝতে পারা যায়।

॥ আঙ্করভাট ॥

নানা যুগে বিভিন্ন দেশে বহু মন্দির ও সু-উচ্চ



আঙ্করভাটে যাবার পথ

অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় মন্দির দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাম্বোডিয়ায় (কাম্পুচিয়ায়) নির্মিত বিরাট ও অতি বিস্ময়কর বিষ্ণুমন্দির আঙ্কর-ভাট (ওঙ্কারধাম। নগরমন্দির)। এটি ৪০২ একর (১৬২·৬ হেক্টার) জমির উপরে অবস্থিত। দ্বাদশ শতাব্দীতে খ্মের (Khmer) রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মন এই মন্দিরের নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন। ১৪৩২ খ্রীষ্টাব্দে এই নগরমন্দির পরিত্যক্ত হয়। তখন এর লোকসংখ্যা ছিল ৮০ হাজার। এই আঙ্কর-ভাট মন্দির নির্মাণে এঞ্জিনীয়ারিং-এর চরম পরাকাষ্ঠার নিদর্শন পাওয়া যায়।

॥ **বরবদুর (বরভূধর)** ॥

ইন্দোনেশিয়ায় যোগ্যকর্তা (**Jogja karta**) শহরের নিকটে ৮ম শতাব্দীতে নির্মিত সুবিশাল বৌদ্ধ মন্দির এক অপরূপ স্থাপত্যের নিদর্শন। এটি উচ্চতায় ৩১·৫ মিটার। এর চারিদিকের সীমারেখার দৈর্ঘ্য ১২৩ মিটার।

॥ **ভারতের স্থাপত্য** ॥

ভারতের পুরী, ভুবনেশ্বর, কোনারক, জয়পুর, বুদ্ধগয়া, নালন্দা, মহাবলীপুরম্, দিল্লী, আগ্রা, মহীশূরের বেলুড়, মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ, দাক্ষিণাত্যের অমরাবতী, নাসিক, খাজুরাহো প্রভৃতি স্থানের মন্দির, স্মৃতি-সৌধ, কারুকার্যময় গুহা প্রভৃতি এঞ্জিনীয়ারিং-এর দক্ষতার প্রকৃষ্ট পরিচয় ('ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

॥ **মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পা** ॥

ভারতীয় সভ্যতা ৫০০০ বছরেরও আগের। কেউ কেউ এই সভ্যতাকেই পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলেন। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা নামক স্থানে (বর্তমানে পাকিস্তানে) মোহেন-জো-দরো এবং প্রায় ৪৮৩ কিলোমিটার দূরে পাঞ্জাবের হরপ্পা (বর্তমানে পাকিস্তানে)-নামক স্থানে মাটি খুঁড়ে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার সভ্যতার নিদর্শন



বরবদুর

আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রসিদ্ধ বাঙালী প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মোহেন-জো-দরো শহরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। মোহেন-জো-দরো বা মহেন-জো-দরো সিন্ধী শব্দ। এর অর্থ মৃতের দেশ।

মোহেন-জো-দরোর চেয়ে হরপ্পা ছিল অধিকতর উন্নত ও আয়তনে বৃহত্তর।

দুটি স্থানে যে একদিন কি বিরাট সভ্যতা ছিল, ধ্বংসাবশেষ থেকে তার কিছুটা জানা যায়। এখানে বড় বড় বাড়ি (বেশির ভাগই দোতলা), উৎকৃষ্ট কূপ, পথ, পয়ঃপ্রণালী, উপাসনার স্থান প্রভৃতি ছিল। সব বাড়িঘর ইটের তৈরী ছিল।

মোহেন-জো দরো ও হরপ্পার সঙ্গে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয় ও মিশরীয় সভ্যতার অনেক মিল দেখা



মোহেন-জো দরোয় প্রাপ্ত একটি কূপ



মোহেন-জো-দরোয় প্রাপ্ত কয়েক ধরনের শীলমোহর

যায়। পিরামিড সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা থেকে মিশরীয় সভ্যতার উৎকর্ষের সম্বন্ধে কিছুটা জানা যায়।

॥ সুমেরীয় সভ্যতা ॥

মোহেন-জো-দরোর প্রায় একই সময়ে নিকট প্রাচ্যে তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর মধ্যস্থলে গড়ে-ওঠা সুমেরীয়দের এক বিরাট সভ্যতার অগ্রগতির কথা জানা যায়। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, সুমেরীয় সভ্যতা ভারতের সভ্যতার চেয়েও প্রাচীন। সুমেরীয় এঞ্জিনীয়াররা বড় বড় মন্দির, অট্টালিকা, রাজপ্রাসাদ, পথ, ড্রেন ইত্যাদি সমন্বিত সুদৃশ্য শহর গড়ে তুলেছিল। উর (Ur) ছিল সেই সব শহরের মধ্যে প্রধান। ইউফ্রেতিস নদীর পূর্ব তীরে উর শহর গড়ে ওঠে। পিরামিডের



জিগূরাট

আকৃতিবিশিষ্ট জিগূরাট (Ziggurat)-নামে মন্দির এঞ্জিনীয়ারিং-এর বৈশিষ্ট্যের নিদর্শন। জিগূরাটগুলি ছিল ৬/৭ তলা। ক্রমশঃ ধাপগুলি ছোট হতে হতে উপর দিকে উঠে গেছে। উপরে থাকত মন্দির মন্দিরে ওঠবার জন্যে ঢালু পথও ছিল।

॥ ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান ॥

বাগদাদের ৯৬ মাইল দূরে এক বিরাট ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্য গড়ে ওঠে। সুমের অঞ্চল ও তার আশেপাশের নানা দেশ বা অঞ্চল নিয়ে ব্যাবিলনীয় সাম্রাজ্যের সৃষ্টি হয়। ব্যাবিলনের রাজা নেবুক্যাডনেজার (Nebuchadnezzar) বা নেবুক্যাডরেজার (Nebuchadrezzar) (৬০৫-

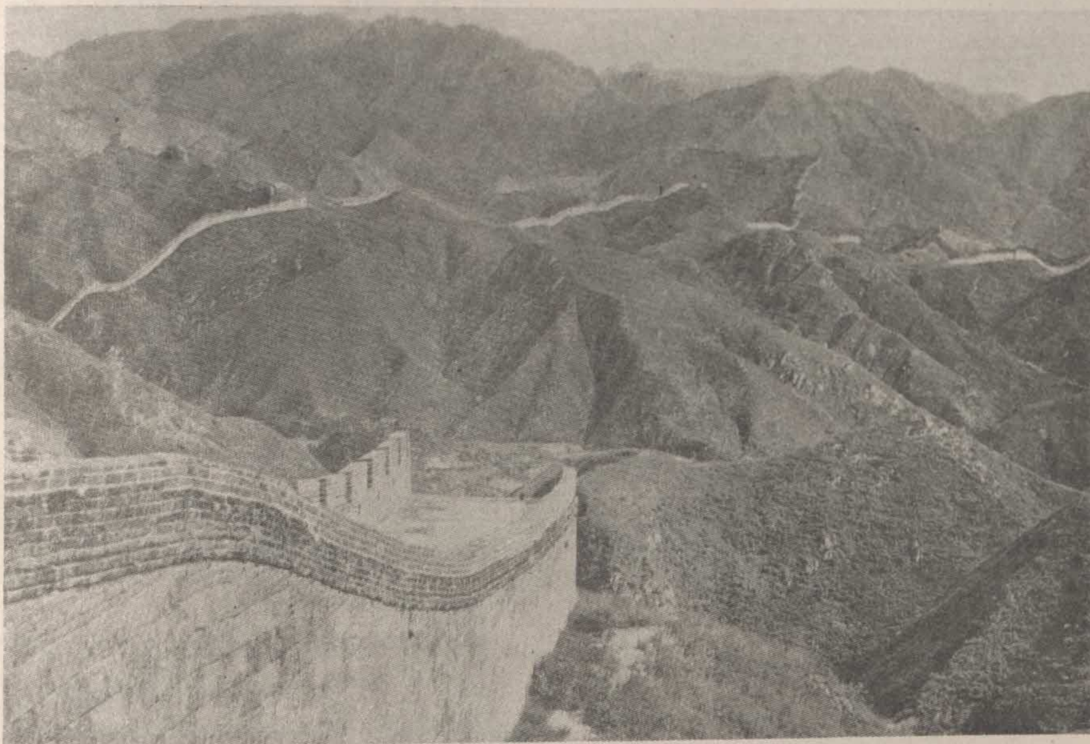


ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

৫৬২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সুবিশাল ঝুলন্ত বাগান বা ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান তৈরি করেন। এটিকে সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম বলা হয়। এই ঝুলন্ত বাগান (the Hanging Gardens of Semiramis at Babylon) বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। এর কোন চিহ্ন আর নেই। সুপ্রাচীন কালে ওই ধরনের শূন্যোদ্যান নির্মাণ যন্ত্রবিজ্ঞানে রীতিমতো উন্নত দক্ষতার পরিচয়।

॥ চীনের প্রাচীর ॥

চীন অনেক বিষয়ে বিস্ময়কর সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। চীনের রাজা বা সম্রাটেরা দক্ষ এঞ্জিনীয়ারদের দিয়ে বহু উন্নত ধরনের অট্টালিকা,

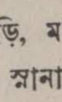


চীনের প্রাচীর

খাল বাঁধ ইত্যাদি তৈরি করিয়েছিলেন। ২২১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বিখ্যাত সম্রাট শি হুয়াং তি তাঁর সাম্রাজ্যকে উত্তরের মঙ্গোলদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবার জন্যে ১৫ বৎসর ধরে বিপুল পরিশ্রমে ও অর্থব্যয়ে প্রায় আড়াই হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ একটি সুবৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেন। এর উচ্চতা ৪.৬ মিটার থেকে ৯.২ মিটার পর্যন্ত। মাঝে মাঝে প্রহরার গম্বুজ (watch-tower) আছে। প্রাচীরটি ২০ মিটার চওড়া। এই চীনের প্রাচীর পর্বত, উপত্যকা, গিরিখাদ প্রভৃতির উপর দিয়ে গেছে। এঞ্জিনীয়ারিং-এর এই বিশাল নিদর্শন আজও বর্তমান।

॥ গ্রীক ও রোমক সভ্যতা ॥

গ্রীকেরা ও প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীরা বহু বিষয়ে উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিল। এঞ্জিনীয়ারিং-এ তাঁদের দক্ষতা ছিল অপরিসীম। তারা বহু থামবিশিষ্ট বিরাট বিরাট বাড়ি, মন্দির, মুক্ত ক্রীড়াঙ্গন ও নাট্যশালা, অত্যুন্নত স্নানাগার, সভাকক্ষ নির্মাণ করেছিল। সে-সবের বহু ভগ্নাবশেষ আজও দেখা যায়।



॥ পিসার হেলানো টাওয়ার ॥

ইটালীর পিসা শহরের নিকটবর্তী একটি গির্জার ঘণ্টাঘর হিসাবে বেলে জমিতে ১১৭৪ খ্রীষ্টাব্দে যে টাওয়ারটির নির্মাণকার্য শুরু হয় এবং ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণকার্য শেষ হয় সেটির মাথা ওলন-রেখা (plumb line) থেকে ৫ মিটার হেলে আছে। এরই নাম হেলানো টাওয়ার (Leaning Tower)। এটি উচ্চতায় ১৫ তলা বাড়ির সমান।



পিসার হেলানো টাওয়ার

এর উচ্চতা ৫৪'৫ মিটার। এটি আটতলা। এটিতে ৩০০ সিঁড়ি আছে। এর সর্বোচ্চ তলায় উঠলে বাইরের প্রায় ১০ কিলোমিটার স্থানের দৃশ্য দেখা যায়। এঞ্জিনীয়াররা বলেন, এইভাবে হেলে থাকলেও টাওয়ারের ভূমিসাৎ হবার সম্ভাবনা নেই।



॥ জাহাজ ॥

সারা পৃথিবী নদী, সমুদ্র ও হ্রদে পূর্ণ। জলরাশির উপর দিয়ে যাবার জন্যে বা মালপত্র বহন করানোর জন্যে বর্তমান যুগে জাহাজ তৈরী হয়েছে। এই সব জাহাজ বাষ্প, বিদ্যুৎ বা পরমাণুর শক্তিতে চলে।

পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম যাত্রী-জাহাজ নরওয়ে। এটি দৈর্ঘ্যে ৩১৫'৬৬ মিটার। নরওয়ে ৭০,২০২'১৯ গ্রস টনের জাহাজ। ব্রিটেনের সব চেয়ে বড় যাত্রী জাহাজ ৬৬, ৮৫১ গ্রস টনের, আর এম এস কুইন এলিজাবেথ দ্বিতীয়। এটি দৈর্ঘ্যে ২৯৩ মিটার। পূর্বে আর এম এস কুইন এলিজাবেথ ছিল পৃথিবীর সর্ববৃহৎ যাত্রী জাহাজ (৮২, ৯৯৮ গ্রস টন। দৈর্ঘ্য ৩১৪ মিটার, প্রস্থে ৩৬ মিটার)। এটি ভেঙে ফেলা হয়েছে।



॥ যুদ্ধজাহাজ ॥

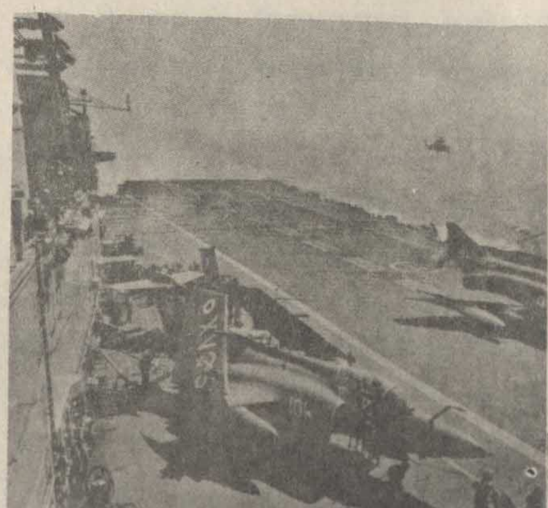
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ (battleship) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ জার্সি (New Jersey)। দৈর্ঘ্যে ২৭০ মিটার। ইউ. এস. এস. এন্টারপ্রাইজ (U. S. S. Enterprise) সবচেয়ে লম্বা রণতরী (warship)—দৈর্ঘ্যে ৩৩৫'৮ মিটার।

॥ সর্বাপেক্ষা দ্রুতগামী ডেস্ট্রয়ার ॥

ফরাসী ডেস্ট্রয়ার লে টেরিব্‌ল্ (Le Terrible) ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ঘণ্টায় ৮৩'৪২ কিলোমিটার (৪৫'২৫ নট) বেগে ছুটতে সমর্থ হয়। ১৯৫৭ সালে এটির কর্মবিরতি ঘটে।

॥ বিমানবাহী পোত ॥

ইউ এস এস নিমিৎজ (U. S. S. Nimitz) ও ডুইট ডি. আইজেনহাওয়ার (Dwight D. Eisenhower) দুটি সর্ববৃহৎ বিমানবাহী পোত (Aircraft carriers)। দুটিই দৈর্ঘ্যে ৩৩২ মিটার ও ঘণ্টায় ৫৬ কিলোমিটার (৩০ নট)



বিমানবাহী পোত





যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক যীশু খ্রীষ্ট বেথেলহেমে কুমারী মেরীর গর্ভে দেবী শক্তিতে জন্মগ্রহণ করেন। এক আস্তাবলে অতি দীন অবস্থায় তাঁর জন্ম হয়।

তাঁকে দেখবার জন্যে ওই আস্তাবলে জ্ঞানী লোকদের সমাগম হয়। তাঁরা বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে নবজাত শিশুর দিকে তাকিয়ে থাকেন।

ছবিতে নবজাত যীশু, মাতা মেরী ও জ্ঞানী লোকদের দেখা যাচ্ছে।

[পূর্বপৃষ্ঠার উপরের ছবি]

'মোনা লিসা' চিত্র অঙ্কনরত লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci, ১৪৫২-১৫১৯ খ্রী.) একজন বিশ্বখ্যাত চিত্রকর, স্থপতি, দার্শনিক, কবি, ভাস্কর, প্রাণিবিদ্যাবিৎ, গণিতজ্ঞ ও আবিষ্কারক। তিনি ছিলেন ইতালীয়। সারা জীবন ধরে তিনি যে কত ছবি এঁকেছেন ও মূর্তি গড়েছেন, তার ইয়ত্তা করা যায় না। তাঁর আঁকা **Last Supper, Mona Lisa** প্রভৃতি চিত্র জগদ্বিখ্যাত।

পূর্বপৃষ্ঠায় দেখা যাচ্ছে, লিওনার্দো তাঁর চিত্রশালায় বসে প্রসিদ্ধ চিত্র 'মোনা লিসা' আঁকছেন। চিত্রটির রহস্যময় হাসি পৃথিবীর সকল চিত্রপ্রেমিককে প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরে গভীর আনন্দ দিয়ে এসেছে।

'মোনা লিসা' চিত্রটি ১৫০৩ থেকে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অঙ্কিত হয়। চিত্রটির আয়তন৭৭ × ৫৩ সেণ্টিমিটার (৩০.৫ × ২০.৯ ইঞ্চি । চিত্রটি বর্তমানে প্যারিসের লুভ্‌র্ মিউজিয়ামে সযত্নে রক্ষিত আছে। ('চারুকলা' অধ্যায় দ্র.)।

[পূর্বপৃষ্ঠার নীচের ছবি]

বেগে ছুটতে সমর্থ। ১৪ লক্ষ ৫০ হাজার কিলো-মিটার চলবার পর বিমানবাহী পোত দুটির জ্বালানি নেবার প্রয়োজন হয়।



॥ সাবমেরিন ॥

পৃথিবীর বৃহত্তম সাবমেরিন (submarine) বা ডুবো জাহাজ সোভিয়েট রাশিয়ার U S S R Typhoon (Oscar)। এর দৈর্ঘ্য ১৮০ মিটার।

পরমাণুশক্তি-চালিত দু রাশিয়ান আলফা-ক্লাস সাবমেরিন ৯১৪ ৪ মিটার জলের তলা দিয়ে ঘণ্টায় ৭৭৮ কিলোমিটার (৪২ নট) বেগে যেতে পারে।



সাবমেরিন

॥ মালবাহী জাহাজ ॥

খনিজ পদার্থ বা তৈলবাহী বৃহত্তম জাহাজ লাইবেরিয়ান World Gala। এটি ৩,৩৩,৭৪৮ গ্রস টনের জাহাজ, দৈর্ঘ্যে ৩৩৮ মিটার।

॥ মনুষ্যবাহিত প্রাচীন কালের জাহাজ॥

আনুমানিক ২১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চতুর্থ টলেমির জন্যে মিশরের আলেকজান্দ্রিয়াতে যে মনুষ্য-বাহিত জাহাজ তৈরী হয়েছিল, সেটি দৈর্ঘ্যে ছিল ১২৮ মিটার। এতে ৪০০০ দাঁড় ছিল। ৮ জন দাঁড়ী ১৭৫ মিটার লম্বা ১টি দাঁড় বাইবার কাজে নিযুক্ত ছিল।

॥ মোটরগাড়ি, রেলগাড়ি, ট্রাম, বাস, উড়োজাহাজ ॥

'যানবাহন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

॥ অন্ধকার যুগ ॥

এঞ্জিনীয়ারিং-এর কাজকর্ম সারা পৃথিবীতে চলতে চলতে এক সময়ে হঠাৎ অগ্রগতি থেমে যায়। সভ্যতা থমকে দাঁড়ায়। প্রায় এক হাজার বছর ধরে নূতন কোন কর্মপ্রচেষ্টা দেখা যায় না। চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত এই ভাবেই চলে। এই অগ্রগতি-শূন্য স্তব্ধ সভ্যতার যুগকে বলা হয় অন্ধকার যুগ (Dark Age)।

॥ রেনেসাঁ ॥

তারপর ইটালীতে প্রথম নবজাগরণ শুরু হয়। সেখান থেকে সারা ইউরোপে নূতন সভ্যতা, নূতন সংস্কৃতি, নূতন কর্মপ্রচেষ্টার প্রচলন হয়। ১৪শ শতাব্দী থেকে ১৮শ শতাব্দী পর্যন্ত এই যুগের কর্ম-প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এই নব চেতনাকে, নব সভ্যতা-সংস্কৃতিকে বলা হয় রেনেসাঁ (Renaissance) অর্থাৎ পুনর্জন্ম।

কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, দেকার্ত, নিউটন, ডারউইন, ক্যুরি, পাস্তুর প্রভৃতি মনীষীর আবির্ভাবে নূতন নূতন বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে, এঞ্জিনীয়ারিং-এর ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সৃষ্টি মনুষ্য-সমাজকে বিমোহিত করে।

॥ ব্লাস্ট ফারনেস ॥

আকরিক লোহাকে গলানোর উদ্দেশ্যে নির্মিত

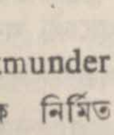


ব্লাস্ট ফারনেসের বাইরের দৃশ্য

যে চুল্লীটি (blast furnace) ১৯৭৬ সালে জাপানের কিউশিউতে গঠিত হয় সেটি পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। চুল্লীর ভিতরের ব্যাস ১৪'৮ মিটার। এতে বৎসরে ৪৩,৮০,০০০ টন লোহা গলানো হয়।

॥ সর্ববৃহৎ লেদ ॥

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াগনারের Dortmunder Rheinstahl-নামক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নির্মিত লেদ পৃথিবীতে বৃহত্তম। এটি ২১'৯ মিটার লম্বা। এর ওজন ৩৮৫ টন।



॥ সর্বোচ্চ বাড়ি ॥

শিকাগোর সিয়ার্স টাওয়ার (Sears Tower) পৃথিবীতে সর্বোচ্চ বাড়ি।

('নানাদেশের ঘরবাড়ি' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

॥ হ্যাংগার ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওহিওতে অবস্থিত গুডইয়ার এয়ারশিপ হ্যাঙ্গার (Goodyear Airship hangar) সর্ববৃহৎ। দৈর্ঘ্য ৩৫৮ মিটার, প্রস্থ ৯৯ মিটার, উচ্চতা ৬১ মিটার।

॥ গ্যারেজ ॥

শিকাগোর O'Hare Airport-এর গ্যারেজ পৃথিবীতে বৃহত্তম। এতে ৯,২৫০টি মোটর গাড়ি রাখবার জায়গা আছে।

॥ প্রাসাদ ॥

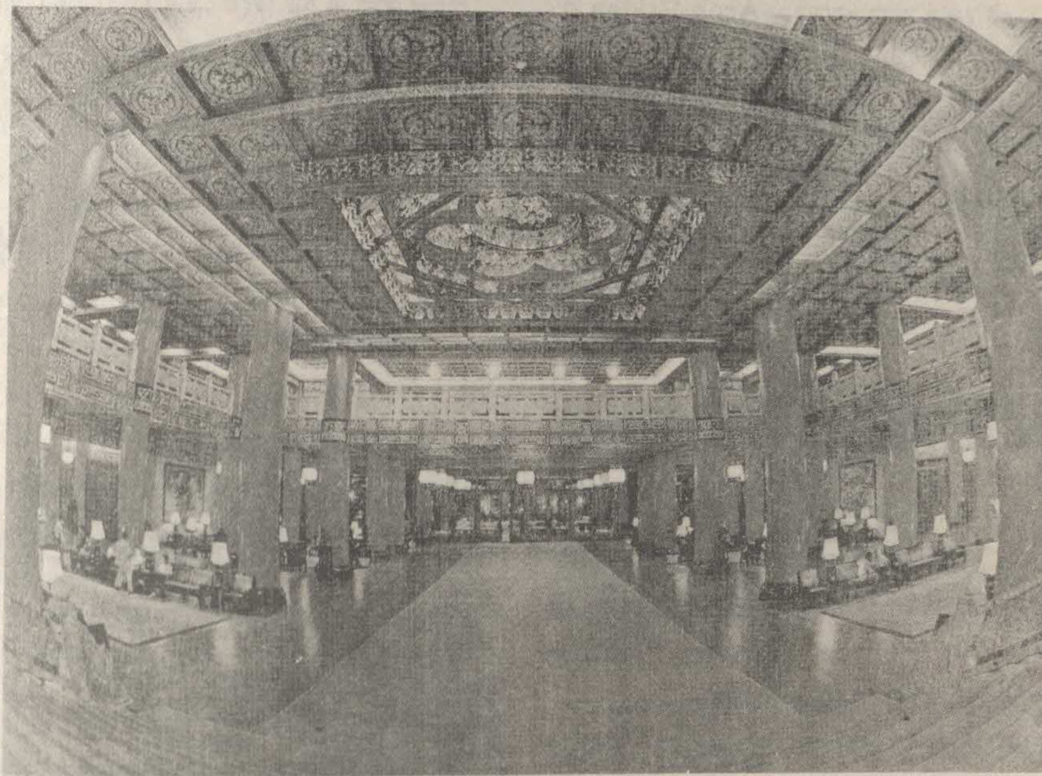
চীনের বেইজিং-এর মধ্যস্থলে অবস্থিত রাজকীয় প্রাসাদ (Imperial palace Gu gong) পৃথিবীতে বৃহত্তম। ১৭৭'৯ একর (৭২ হেক্টার) জমির উপরে এটি অবস্থিত। এটি চতুষ্কোণ (৯৬০-৭৫০ মিটার)। তৃতীয় মিং সম্রাট ইয়াং লোর আমলে নির্মিত হয়।



॥ হোটেল ॥

মস্কোর ১২ তলা হোটেল রোসিয়া (Rossiya) -য় ৩২০০ ঘর আছে। তাতে ৬০০০ আগন্তুক থাকতে পারে। ১৯৬৭ সালে এটি খোলা হয়। হোটেলে ৩০০০ লোক কাজ করে। ৯৩টা লিফট আছে। এই হোটেলের বলরুম পৃথিবীতে বৃহত্তম। অধিকন্তু হোটেল-প্রাঙ্গণে ২১ তলা প্রেসিডেনসিয়াল টাওয়ার অবস্থিত।

নিউ ইয়র্ক শহরের The Waldorf Astoria -নামক হোটেল পৃথিবীতে বৃহত্তম। ১'৮৭ একর (০'৭৫ হেক্টার) জমির উপরে এটি অবস্থিত। এটি ৪৭ তলা বাড়ি। এর উচ্চতা ১৯১ মিটার। এতে একসঙ্গে ১০ হাজার লোকের স্থান হতে পারে। হোটেলের কর্মচারীদের সংখ্যা ১৭০০। এতে ১৮৫২টি আগন্তুক কক্ষ (guests rooms) আছে। বাৎসরিক ইলেকট্রিসিটি বিল ওঠে ২০ লক্ষ ডলা



তাইওয়ানের গ্রাণ্ড হোটেল, তাইপে (মেঝে ১,৬৪৫ বর্গমিটার)

১৯৩১ সালের ১লা অক্টোবর এটি খোলা হয়।

সব চেয়ে উঁচু হোটেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত অ্যাটলাণ্টার ৭০ তলা Peachtree Center Plaza। এটির সামনের উচ্চতা ২২০·৩ মিটার, পিছনের প্রবেশপথের দিকের উচ্চতা ২২৭·৯ মিটার। এতে ১১০০ ঘর আছে।

॥ স্টেডিয়াম ॥

সুবৃহৎ স্টেডিয়াম চেকোস্লোভাকিয়ার প্রাহা (প্রাগ) শহরে অবস্থিত স্ট্র্যা-হভ স্টেডিয়াম (Stra-hov Stadium)। এতে ২,৪০,০০০ জন দর্শকের বসবার স্থান আছে। ১৯৩৪ সালে এটির নির্মাণকার্য শেষ হয়।

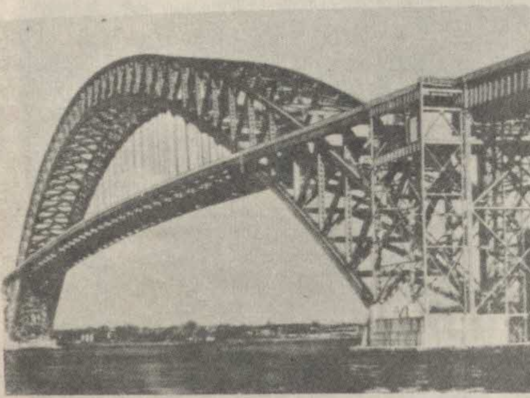
ব্রাজিলের রিও ডি জ্যানিরোতে অবস্থিত ফুটবলের স্টেডিয়াম পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম। এতে ২,০৫,০০০ জন দর্শকের স্থান হতে পারে, তন্মধ্যে ১,৫৫,০০০ জন বসতে পারে।

লুইসিয়ানার অন্তর্গত নিউ অর্লিন্সের ইনডোর স্টেডিয়াম পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। এটি ১৩ একর (৫·২৬ হেক্টার) জমির উপরে অবস্থিত। এটির উচ্চতা ৮৩.২ মিটার। এতে ৭৬,৭৯১ জন ফুটবল দর্শকের বসবার জায়গা আছে। সাধারণ অনুষ্ঠানে ৯৭,৩৬৫ জন বসতে পারে।

॥ সেতু ॥

নদী, খাল প্রভৃতির এক পার থেকে অন্য পারে যেতে গেলে সেতু দিয়ে পার হতে হয়। এই সেতু নির্মাণে আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত বিভিন্ন দেশের এঞ্জিনীয়ারদের রীতিমতো দক্ষতার পরিচয় পাওয়া

যায়। এই সেতু নানা ধরনের—**Arch Bridge** বা



দীর্ঘতম **Steel Arch Bayonne Bridge**

খিলান সেতু, **Suspension Bridge** বা ঝুলন্ত সেতু, **Cantilever Bridge** (এও একধরনের খিলান সেতু), **Girder Bridge**, **Floating Bridge** বা ভাসমান সেতু প্রভৃতি।

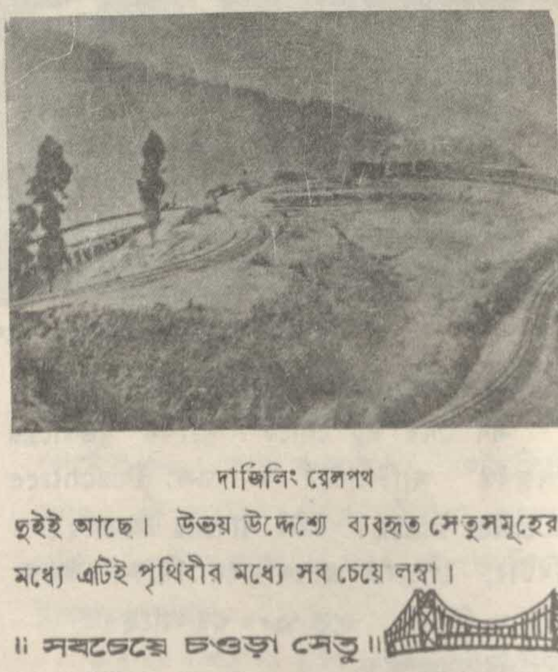
নদী, খাল, গিরিখাদ, জলপ্রপাত প্রভৃতির উপর দিয়ে যেতে গেলে বা রেল-বাস-লরী চলাচলের জন্যে পৃথিবীর সব দেশেই সেতু তৈরী হয়েছে। এই সেতু যে পাঁচ/ছয় হাজার বছর আগেও তৈরী হয়েছিল, তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। সুমেরীয়রা ৩,২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে খিলান সেতু তৈরি করেছিল। মিশরে ২,৬৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নীল নদের উপরে সেতু তৈরী হয়েছিল বলে জানা গেছে। তুরস্কের অন্তর্গত স্মার্না (বর্তমানে ইজমির) শহরে মেলেস নদীর উপরে আনুমানিক ৮৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে একটি সেতু তৈরী হয়েছিল। সেটি পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরী একটি খিলান সেতু। এই সেতু এখনও বর্তমান।

রোমানরা ২য় শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে পাথরের চাঁই-এর সেতু তৈরি করেছিল। তার ভগ্নাবশেষ নর্দাম্বারল্যাণ্ডে বর্তমান।

আগে কাঠ ও ইট দিয়ে সেতু তৈরী হত। পরে পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরী হতে থাকে। বর্তমানে সর্বত্র লোহা ও কংক্রিট দিয়ে সেতু তৈরি করা হয়ে থাকে।

॥ দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতু ॥

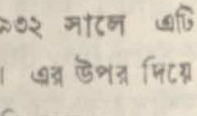
দীর্ঘতম রেলওয়ে সেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লুইসিয়ানার **Hue P. Long Bridge**। এটি ৭০০৯ মিটার লম্বা। এটির নির্মাণকার্য ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে শেষ হয়। চীনের নানকিং-এ ইয়াংসি নদীর উপরের সেতুতে চলাচলের পথ ও রেলপথ



দার্জিলিং রেলপথ

দুইই আছে। উভয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সেতুসমূহের মধ্যে এটিই পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে লম্বা।

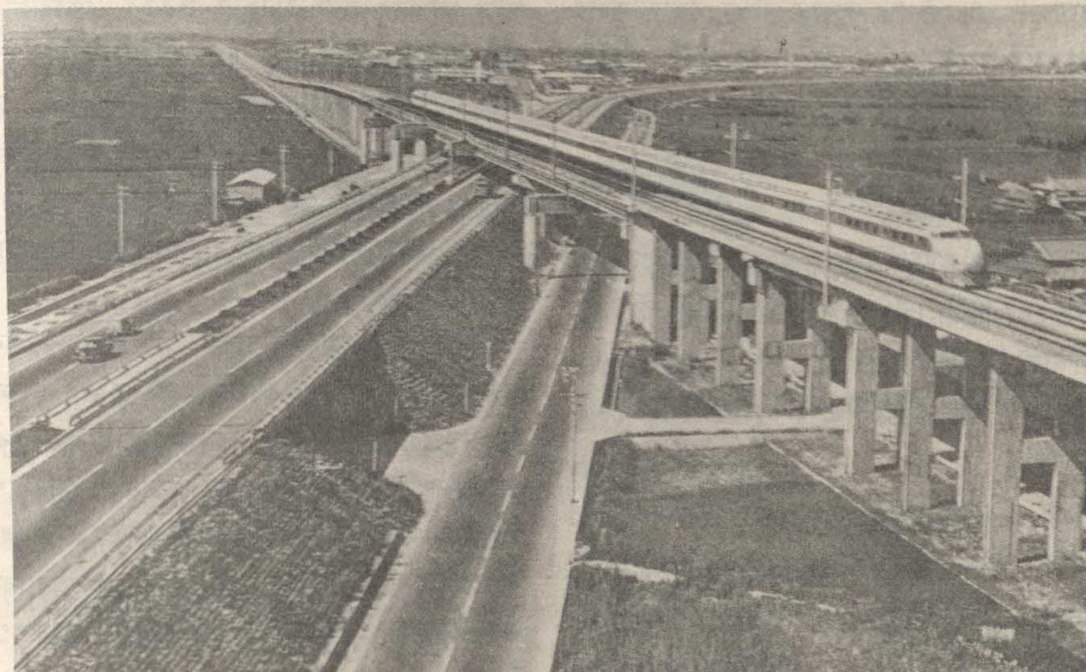
॥ সবচেয়ে চওড়া সেতু ॥



অস্ট্রেলিয়ার সিডনি হারবার ব্রিজ পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে চওড়া সেতু। এটি ৪৮ মিটার চওড়া। এর দৈর্ঘ্য ৫০২'৯ মিটার। ১৯৩২ সালে এটি ব্যবহারের জন্যে খুলে দেওয়া হয়। এর উপর দিয়ে লোক,সাইকেল, রেল গাড়ি প্রভৃতি চলে।

॥ উচ্চতম সেতু ॥

সব চেয়ে উঁচু সেতু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত

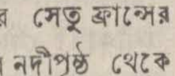


রেলওয়ে সেতু

কলোরাডোতে আরকানসাস নদীর Royal Gorge-এর উপরের সেতু। এটি ঝুলন্ত সেতু। জলের উপরে ৩২৯ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

সব চেয়ে উঁচু রেল চলাচলের সেতু ফ্রান্সের সিওউল (Sioule) নদীর উপরে নদীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৪১ মিটার উচ্চে অবস্থিত।

॥ বিভিন্ন প্রসিদ্ধ সেতু ॥



ইংল্যাণ্ডের দ্য হাম্বার এসটিউয়ারি ব্রিজ (ঝুলন্ত সেতু), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ম্যাকিনাক স্ট্রেটস ব্রিজ (ঝুলন্ত সেতু), জাপানের অন্তর্গত হনশিউর সঙ্গে শিকোকুর সংযোগ স্থাপনকারী আকাশি-কাইকিও (Akashi-Kaikyo) ব্রিজ (যানবাহন চলাচলের ওরেলগাড়ি চলাচলের সেতু), কানাডার সেন্ট লরেন্স নদীর উপরকার দ্য কুইবেক ব্রিজ, গ্রেট ব্রিটেনের দ্য ফোর্থ ব্রিজ (ক্যান্টিলিভার সেতু), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য সেকেণ্ড লেক ওয়াশিংটন ব্রিজ (ভাসমান সেতু), দ্য নায়াগ্রা ব্রিজ (ঝুলন্ত সেতু), লণ্ডনের টাওয়ার ব্রিজ (ঝুলন্ত সেতু), স্কটল্যাণ্ডের টে ব্রিজ, লোয়ার জাম্বেজী ব্রিজ, কলকাতা ও হাওড়ার মধ্যে অবস্থিত রবীন্দ্র সেতু (বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ক্যান্টিলিভার স্প্যান ব্রিজ), ঘানার ভোল্টা ব্রিজ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্য ভেরাজ্যানোন্যারোজ ব্রিজ, সান্‌ফ্রানসিসকোর গোল্ডেন ব্রিজ প্রভৃতি। পৃথিবীর প্রসিদ্ধ সেতুসমূহের মাত্র কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা গেল।

॥ কাঠের পাইল ও ট্রাস ॥

কাঠের পাইল (timber pile), কাঠের ট্রাস (কড়ি) সুইটজারল্যাণ্ডের অধিবাসীদের এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রতিভার নিদর্শন। সুইটজার-

ল্যাণ্ডের হ্রদের উপরে কাঠের বাড়ি তৈরি করার ব্যাপারে কাঠের পাইল বা কাঠের খুঁটির ব্যবহার করা হয়। সেই দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও কাঠের খুঁটির প্রচলন হয়।



॥ ঝুলানো সেতু ॥

উত্তরপ্রদেশের লছমনঝোলার সেতু আগে ছিল ঝোলানো সেতু। লোকে একটা দড়ি ধরে পাটাতনের উপর দিয়ে যাতায়াত করত। এখন অবশ্য সে স্থলে উন্নত ধরনের ঝুলন্ত সেতু তৈরী হয়েছে।

॥ ভাসমান সেতু ॥

ভাসমান সেতুর প্রচলন হয় পারস্য-সম্রাট্ সাইরাস (Cyrus)-এর আমলে। ভাসমান সেতুটি সে-যুগের প্রসিদ্ধ এঞ্জিনীয়ার মান্দ্রোক্লিস (Mandrocles)-এর তত্ত্বাবধানে বসফরাস প্রণালীর উপরে তৈরী হয়। এটির দৈর্ঘ্য ছিল ৯১৪ মিটার।

॥ সেতুনির্মাণে যন্ত্র ব্যবহার ॥

সেতুনির্মাণে খরচ কমাবার জন্যে ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীয় এঞ্জিনীয়ার অ্যাণ্ড্রিয়া প্যালাডিও (Andrea Palladio, ১৫১৮-৮০ খ্রী.) বিভিন্ন যন্ত্রের সাহায্যে সেতুনির্মাণের উপায় উদ্ভাবন করেন। এর প্রায় দেড়শ বছর পরে বিখ্যাত এঞ্জিনীয়ার, পদার্থতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিক রবার্ট হুক (Robert Hooke, ১৬৩৫-১৭০৩ খ্রী.)-এর Hooke's Law অনুযায়ী কোন কিছুর উপরে ভার পড়ার নিয়ম জানার ফলে এঞ্জিনীয়ারদের কাজে খুব সুবিধা হয়।

॥ যুদ্ধাস্ত্র ॥

সভ্যতাসৃষ্টির প্রথম থেকেই মানুষ যুদ্ধ করে আসছে। যুদ্ধের জন্য প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ অতি সাধারণ অস্ত্র ব্যবহার করত। পৌরাণিক যুগে ভারতের লোক রথে চড়ে তীরধনুক নিয়ে যুদ্ধ করত। বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ পড়ে জানা যায়, সে যুগে বন্দুকাদি আগ্নেয়াস্ত্রের মতো কোন ধরনের অস্ত্র ছিল। আজকাল তো কথাই নেই। যত দিন যাচ্ছে, ততই নানা ধরনের নূতন নূতন যুদ্ধাস্ত্র উদ্ভাবিত হচ্ছে।

রিভলভার, পিস্তল, বন্দুক, রাইফেল, কামান, বিমানধ্বংসী কামান, ট্যাঙ্ক, ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা, পরমাণু বোমা, বোমারু বিমান, রকেট, রণতরী, ডেস্ট্রয়ার, সাবমেরিন, মাইন, মর্টার, বিমানবাহী রণপোত প্রভৃতি কত রকমের যে যুদ্ধাস্ত্রের প্রচলন হয়েছে তা বলে শেষ করা যায় না। এঞ্জিনীয়ারিং-এর সাহায্যে এই সব যুদ্ধাস্ত্র ক্রমশঃ দুর্ধর্ষ হয়ে উঠছে।

॥ নৌকা নির্মাণে প্রযুক্তিবিদ্যা ॥

আগেকার দিনে যে-সব জাহাজ ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, সে-গুলির অধিকাংশই বড় পালতোলা নৌকা বা বাষ্পীয় শক্তিতে চালিত নৌকা। নৌকার প্রচলন আজও পৃথিবীর সর্বত্রই আছে। এই সব নৌকা নির্মাণে প্রযুক্তিবিদ্যার দক্ষতা পরিস্ফুট।

॥ কাপড়ের কল ॥

কাপড়ের কল ক্রমশঃই উন্নত হয়ে উঠছে। কোথাও বাষ্পীয় শক্তিতে, কোথাও বৈদ্যুতিক শক্তিতে এই সব কাপড়ের কল চলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে কল চালানো হয়। কাপড়ের কলের ভিতরের দৃশ্য না দেখলে বাইরে থেকে বোঝাই যায় না, এঞ্জিনীয়ারগণ কিরূপ পটুতা সহকারে এই সব কলের কাজ চালাবার ব্যবস্থা করেন। আজকাল এক সঙ্গে বহু মাকু চলে।

তাঁতীর ঘরে তো একজন একটা মাকু চালায়।

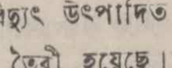
॥ ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং এক বিশেষ যুগের প্রবর্তন করেছে। বিদ্যুতের শক্তির সাহায্যে পাখা চলছে, আলো জ্বলছে, এঞ্জিনের দ্বারা কারখানা চলছে, পাম্প চলছে, টেলিগ্রাম করা যাচ্ছে, টেলিফোনে কথা বলা সম্ভব হচ্ছে—এমনি হাজারো রকম কাজ বৈদ্যুতিক শক্তিপ্রয়োগে করা সম্ভব হচ্ছে। ইলেকট্রন মাইক্রসকোপ, টেলিভিসন, রেডিও, অসিলোগ্রাফ, এক্স-রে, ট্রাম, ট্রেন, রেডার প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস ইলেকট্রিক এঞ্জিনীয়ারিং-এর দ্বারা তৈরী হচ্ছে।

॥ সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

রাস্তা, সেতু, খাল, বাড়ি, রেলপথ, বিমান বন্দর, নদীর বাঁধ, জাহাজঘাটা, কলকারখানা প্রভৃতি তৈরি সিভিল এঞ্জিনীয়ারিং-এর মধ্যে পড়ে। নদীতে বাঁধ দিয়ে জলশক্তি দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। পৃথিবীতে অসংখ্য বাঁধ তৈরী হয়েছে। সেগুলির জলস্রোতের সাহায্যে বিদ্যুতের সৃষ্টি হয়ে সভ্য জগৎকে আলো দিচ্ছে। এই বাঁধ তৈরি এঞ্জিনীয়ারদের অপূর্ব কীর্তি। প্রয়োজনের সময় বাঁধের দ্বারা সুরক্ষিত জলাধার থেকে জল ছেড়ে দিয়ে শস্যক্ষেত্রে দেবার ব্যবস্থাও হয়ে থাকে।

॥ ড্যাম বা বাঁধ ॥



Rogunsky Dam (রাশিয়া), ন্যুরেক (রাশিয়া), ইনগুরি (রাশিয়া), গ্র্যাণ্ড ডিক্সেন্স (সুইটজারল্যাণ্ড), ভ্যাজন্ট (ইটালী), মাইকা (ক্যানাডা), মভয়সিন (সুইটজারল্যাণ্ড), অরভিল (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), কনট্র্যা (সুইটজারল্যাণ্ড), ভাখরা (ভারতবর্ষ), হুভার (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র), সুক্কুর বাঁধ বা লয়েডস ব্যারেজ (পাকিস্তান), তারবেলা (পাকিস্তান), নাগার্জুন-সাগর (ভারত) কিয়েভ (রাশিয়া) প্রভৃতি বাঁধ প্রসিদ্ধ।

॥ বন্দর নির্মাণ ॥

বন্দর নির্মাণে এঞ্জিনীয়াররা অভূতপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সারা পৃথিবীতে প্রায় প্রতিটি দেশেই বন্দর বা জাহাজঘাটা আছে। ভারতে বিশাখাপত্নম্, হলদিয়া, কান্দলা, পরাদীপ, খিদিরপুর প্রভৃতি স্থানে অত্যুন্নত বন্দর অবস্থিত।

॥ মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

বোকারো, ভিলাই, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানের ইস্পাত কারখানা, জামসেদপুরে টাটার ইস্পাত কারখানা, রাঁচীর হেভি ইলেকট্রিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর কারখানা, ফরাক্কায় গঙ্গা নদীর উপরের ব্যারেজ, বোম্বাইয়ের কাছে তারাপুর ও রাজস্থানের কোটায় পারমাণবিক শক্তি উৎপাদনের সুবৃহৎ কারখানা এঞ্জিনীয়ারিং-এর চরম পরাকাষ্ঠার পরিচয়।

কারখানা চালাতে গেলে এঞ্জিনের প্রয়োজন। হাইড্রলিক যন্ত্র ও বয়লার চালাতে এঞ্জিন আবশ্যক। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের যন্ত্র, ক্রেন, কনভেয়ার ইত্যাদি চালাতে এঞ্জিন না হলে চলে না। এই এঞ্জিন তৈরি ও তার যন্ত্রপাতি তৈরি মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর আওতায় পড়ে। এরোনটিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং, অটোমোবাইল এঞ্জিনীয়ারিং, মেরিন এঞ্জিনীয়ারিং প্রভৃতি মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং থেকেই সৃষ্ট। কাজেই দেখা যাচ্ছে, মেকানিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং দ্বারা অনেক ধরনের কাজ হয়ে থাকে।

॥ মাইনিং ও মেটালার্জিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

খনি থেকে সোনা, তামা, সীসা, দস্তা, রূপা,

পারদ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, নিকেল, অভ্র, ইলমেনাইট, টাংস্টেন, জিপসাম, গন্ধক, মোনা-জাইট, বক্সাইট প্রভৃতি ধাতু, আকরিক লোহা, কয়লা প্রভৃতি উত্তোলন মাইনিং ও মেটালারজি-ক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং-এর আওতায় পড়ে।

মাইনিং এঞ্জিনীয়ারদের কাজ শুধু ধাতব পদার্থকে খনি থেকে তোলা নয়, খনির শ্রমিকদের যাতে কোন বিপদ্ না হয় সেজন্যে নানা বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা তাঁদের করতে হয়। খনির মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটানো, ভূগর্ভের জল পাম্প করে বাইরে আনা, শ্রমিকদের খনিগর্ভে নামানো ওঠানো—এমনি অসংখ্য কাজ মাইনিং এঞ্জিনীয়ারদের তত্ত্বাবধানে হয়ে থাকে।

লোহা পাথর বা লৌহমিশ্রিত বেলে পদার্থকে গলিয়ে তা থেকে লোহা বার করা, কারখানায় লোহার সাহায্যে নানা জিনিস তৈরি—সব কাজই মেটালারজিক্যাল এঞ্জিনীয়ারদের নিপুণ কাজ। বিশুদ্ধ লোহা নরম। তাকে শক্ত করার জন্যে তাতে খাদ মেশাতে হয়। এই ভাবেই ইস্পাত তৈরী হয়। মহাকাশগামী রকেট যাতে প্রচণ্ড তাপে গলে না যায় সেইভাবে সুকৌশলে লোহাকে কঠিন ও সর্বপ্রকার চাপ ও তাপ সহ্য করবার শক্তিসম্পন্ন করা হয়। এ সব কাজ মেটালারজিক্যাল এঞ্জিনীয়াররা সুষ্ঠুভাবে পালন করে থাকেন।

॥ কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং ॥

কাচ, সিমেন্ট, চিনি, তেল, সাবান, প্লাস্টিক, পলিথিন, সার, স্টার্চ (starch), অ্যাসিড, প্রসাধন দ্রব্য, নানা রং, কৃত্রিম রেশম ও সুতা, বিস্ফোরক, পেট্রল, পেট্রোলিয়াম-জাত নানা দ্রব্য (আলকাতরা, বেনজিন, স্যাকারিন প্রভৃতি), মৃন্ময় পাত্র প্রভৃতি তৈরি করতে এঞ্জিনীয়ারিং-এর প্রয়োজন। সে এঞ্জিনীয়ারিং রসায়নশাস্ত্রসম্মত। তাকে বলে কেমিক্যাল এঞ্জিনীয়ারিং।

এঞ্জিনীয়ারিং-এর যে-সব বিভাগের কথা বলা হল, তাছাড়া ছোটখাট আরো অনেক বিভাগ আছে। দিন যত এগোচ্ছে, জগৎ তত এগিয়ে চলেছে। সেই সঙ্গে নানা এঞ্জিনীয়ারিং-এর উদ্ভব হচ্ছে।

সারা পৃথিবী জুড়ে লক্ষ লক্ষ এঞ্জিনীয়ার তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা ও জ্ঞানের দ্বারা মনুষ্যসমাজের উপকার সাধন করে যাচ্ছেন। যে-সব বিজ্ঞানীর বিরামবিহীন গবেষণার ফলে এঞ্জিনীয়ারিং অর্থাৎ যন্ত্রবিজ্ঞান বা যন্ত্রবিদ্যা বা প্রযুক্তিবিদ্যা বা পূর্তবিদ্যা মনুষ্যসমাজের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করতে সমর্থ হয়েছে তাঁদের সংখ্যা কম নয়। সারা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই তাঁদের গবেষণাক্ষেত্র প্রসারিত ছিল এবং এখনও আছে। আর্কিমিডিস, গ্যালিলিও, নিউটন, ডারউইন, পাস্তুর, লিস্টার, ডবলিউ. সি. রোণ্টগেন, ই. বেরিং, ই. ফিশার, রোনাল্ড রস, এইচ. বেকারেল, রবার্ট কক, জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মার্কোনি, আর্নেস্ট রাদারফোর্ড, ক্যুরি, এম. প্ল্যাঙ্ক, আলবার্ট আইনস্টাইন, এডিসন, এন. বোর, ব্যান্টিং, সি. ভি রমন, হরগোবিন্দ খোরানা, ফার্মি, ফ্লেমিং, ক্লোরে, চেন, ওয়াকসম্যান, সুব্রহ্মণ্যম চন্দ্রশেখর, গ্রাহাম বেল, মর্স, ওয়েস্টিংহাউস, সিমেন্স, ম্যাক্সওয়েল, হের্ৎজ, ফ্যারাডে, গ্যালভানি, ভোলটা, হামফ্রি ডেভি প্রভৃতি অসংখ্য বিজ্ঞানীর ক্লান্তিহীন গবেষণার ফলে এঞ্জিনীয়ারিং-এর দ্রুত উন্নতি সম্ভব হয়েছে।



দর্শনশাস্ত্র

দর্শনশাস্ত্রের ইংরেজী ফিলসফি (philosophy)। কিন্তু আগেকার দিনে ফিলসফি বলতে অনেক কিছু বোঝাত। বিজ্ঞানের নানা শাখা ফিলসফির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিলসফি শব্দের অর্থ জ্ঞানের প্রতি ভালবাসা। জ্ঞান তো অনন্ত। বিজ্ঞান জ্ঞানের মধ্যেই পড়ে। আগে জ্যোতির্বিদ্যা, পুরাতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, বলবিদ্যা, জীববিদ্যা, শারীর বিজ্ঞান, মনোবিদ্যা ইত্যাদি সব কিছুই দর্শন শব্দের আওতার মধ্যে ছিল। আজকাল বিজ্ঞানের এই সব বিভিন্ন শাখাকে ফিলসফি থেকে পৃথক্ করে দেখা হয়।

আমাদের দেশে সংস্কৃতে বহু দর্শনশাস্ত্র লেখা হয়েছে। ইউরোপীয় ফিলসফি শব্দের সঙ্গে সেই দর্শনশাস্ত্রের অনেক পার্থক্য। যে শাস্ত্রে জ্ঞান থাকলে আত্মতত্ত্ব, পরলোকতত্ত্ব, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের কথা, ঈশ্বরতত্ত্ব, অদৃষ্টতত্ত্ব, জগতের কার্যকারণভাব প্রভৃতি জানা যায় তাকে সংস্কৃতে দর্শনশাস্ত্র বলা হয়। প্রধানতঃ সাংখ্য, পাতঞ্জল, ন্যায়, বৈশেষিক, মীমাংসা ও বেদান্ত এই ছয় শাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র নামে খ্যাত। এরই নাম ষড়্‌দর্শন। যে শাস্ত্র ওই সব ব্যাপারে জ্ঞান প্রদান করে তা-ই দর্শনশাস্ত্র—দর্শনদায়ক (জ্ঞানপ্রদ) শাস্ত্র।

ষড়্‌দর্শন ব্যতীত আরো নানা দর্শনশাস্ত্র আমাদের দেশে প্রচলিত—চার্বাকদর্শন, বৌদ্ধদর্শন, আর্হতদর্শন, পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন, নকুলীশ পাশুপতদর্শন, শৈবদর্শন, প্রত্যভিজ্ঞাদর্শন, রসেশ্বর দর্শন ও শাংকরদর্শন। এই সব দর্শনের কতকগুলি প্রায় চার হাজার বছর আগে রচিত হয়েছিল।

॥ সাংখ্য দর্শন ॥

মহর্ষি কপিল সাংখ্য দর্শনের প্রণেতা। সাংখ্য দর্শনে বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হলে পরমপুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়। মোক্ষ অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তি, ঈশ্বরলাভ নয়। কিভাবে এই ত্রিবিধ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ লাভ করা যায় তা-ও সাংখ্য দর্শনে লিখিত আছে। সাংখ্যদর্শনমতে প্রকৃতি দ্বারাই জগৎকার্য সাধিত হচ্ছে। কপিল বলেছেন. জগৎ মিথ্যা নয়; সত্য। কিন্তু ঈশ্বর বলে

যে কেউ আছেন, তার কোনও প্রমাণ নেই।



কপিল মুনি সাংখ্য দর্শন বোঝাচ্ছেন

ভাগবতমতে কপিল মুনি নারায়ণের পঞ্চম অবতার। তাঁর পিতা কর্দম প্রজাপতি, মাতা দেবহূতি। তিনি কোপবশে সগররাজার ষাট হাজার ছেলেকে ভস্মীভূত করেন।

॥ পাতঞ্জল দর্শন ॥

পতঞ্জলি ঋষি খ্রীঃ পূঃ ১৫০ অব্দে বর্তমান ছিলেন। তিনি পাতঞ্জল দর্শনের প্রণেতা, তিনি শুঙ্গবংশীয় পুষ্পমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন।

পাতঞ্জল দর্শন মূলতঃ যোগশাস্ত্র। এতে যোগের বিষয় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট আছে। এতে যোগপাদ, সাধনপাদ, বিভূতিপাদ ও কৈবল্যপাদ নামে চারিটি পাদ আছে। প্রথম পাদে যোগের লক্ষণ, সমাধি, দুঃখাদি ও চিত্তবিক্ষেপ নিবারণের উপায় বলা হয়েছে। দ্বিতীয় পাদে আছে ক্রিয়াযোগ, ক্লেশ-কর্মাদির বিবরণ ও আসনাদি লক্ষণ। তৃতীয় পাদে যোগের অন্তরঙ্গ ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি কথিত হয়েছে। চতুর্থপাদে সিদ্ধিপঞ্চক নিরূপণ, বিজ্ঞানবাদ নিরাকরণ, সাকারবাদ সংস্থাপন ও কৈবল্যের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পাতঞ্জল দর্শন মতে যোগ দ্বারাই ক্লেশাদি ও অবিদ্যার নিরাকরণ ও মোক্ষলাভ হয়। এতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়েছে।



ন্যায় দর্শন

অক্ষপাদ গৌতম ন্যায় দর্শনের প্রণেতা। এতে বলা হয়েছে, সকলের কর্তা পরমেশ্বর।

॥ বৈশেষিক দর্শন ॥

কণাদ উলূক বা উলুক ঋষি বৈশেষিক দর্শনের প্রণেতা। তিনিই জানিয়েছিলেন, পরমাণুর সমবায়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি এবং তাপ ও আলোক একই পদার্থ। বৈশেষিক দর্শনমতে ধর্মাধর্ম দ্বারা সুখদুঃখের উৎপত্তি হয়। দুঃখনিবৃত্তির নামই মুক্তি।

॥ মীমাংসা দর্শন ॥

বেদব্যাসের শিষ্য জৈমিনি ঋষি মীমাংসা দর্শনের প্রণেতা। এই দর্শনমতে দেবগণ শরীরী নন। বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য।

॥ বেদান্ত দর্শন ॥

বেদব্যাস বেদান্ত দর্শনের প্রণেতা। এই দর্শন মতে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম থেকে প্রকৃতির সৃষ্টি। প্রকৃতি থেকে মায়া ও অবিদ্যার উদ্ভব। মায়াশ্রিত চৈতন্য ঈশ্বর। অবিদ্যাশ্রিত চৈতন্য জীব।

॥ চার্বাক দর্শন ॥

বৃহস্পতির শিষ্য চার্বাক এই দর্শনের প্রণেতা। তাঁর মতে স্থূল দেহই আত্মা। পরলোক ও জন্মান্তর নেই। জগতের কর্তা কেউ নেই। যতদিন বেঁচে থাকা যাবে, সুখে থাকবার চেষ্টা করতে হবে, ঋণ করেও ঘি খাবে। বেদ, যজ্ঞ, পিতৃশ্রাদ্ধাদি মিথ্যা।

॥ বৌদ্ধ দর্শন ॥

এই দর্শনমতে জগৎ ক্ষণভঙ্গুর, আত্মা ক্ষণিক জ্ঞানরূপ।

॥ আর্হত দর্শন ॥

এই দর্শনমতে আত্মা স্থায়ী। সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর বিশ্বস্রষ্টা।

॥ রামানুজ দর্শন ॥

এই দর্শনমতে পদার্থ তিনপ্রকার—চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর। চিৎ জীব, অচিৎ জড় জগৎ। জগতের কর্তা ঈশ্বর।

॥ পূর্ণপ্রজ্ঞ দর্শন ॥

এই দর্শনমতে বেদ অপৌরুষেয় ও নিত্য। ঈশ্বর জগতের কর্তা।

॥ নকুলীশ পাশুপত দর্শন ॥

এই দর্শনানুযায়ী মহাদেবই পরমেশ্বর। তিনি পশু অর্থাৎ জীবগণের অধিপতি।

॥ শৈব দর্শন ॥

এই দর্শনেও শিবকে পরমেশ্বর ও পশু অর্থাৎ জীবগণের কর্তা বলা হয়েছে।

॥ প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন ॥

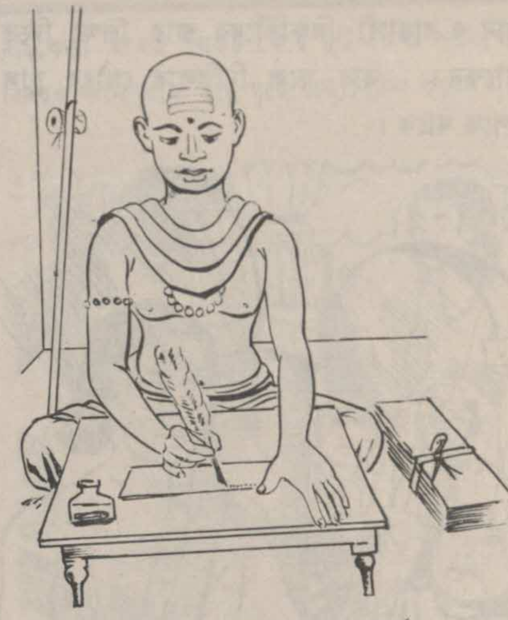
প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনমতে মহাদেবই জগদীশ্বর জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার ভেদ নেই।

॥ রসেশ্বর দর্শন ॥

এই দর্শনমতেও শিবকে পরমেশ্বর বলা হয়েছে। রসেশ্বর দর্শনমতেও জীবাত্মা ও পরমাত্মার প্রভেদ নেই।

॥ শাংকর দর্শন ॥

শংকরাচার্য-প্রণীত এই দর্শনে ব্রহ্মই সত্য, আর সব মিথ্যা।



শাংকর দর্শন প্রণয়নে রত শংকরাচার্য

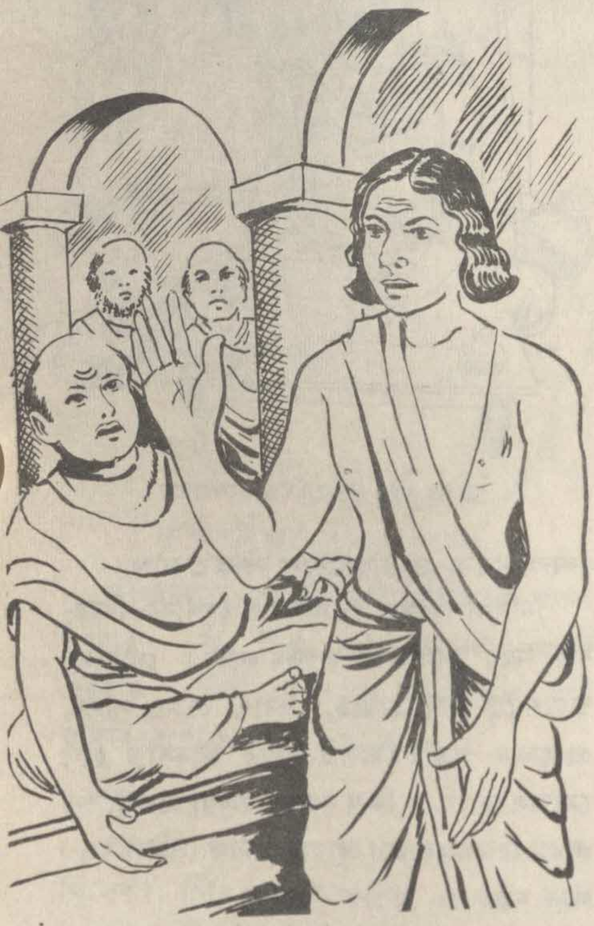
॥ নব্যন্যায় ও বাসুদেব সার্বভৌম ॥

মিথিলার গঙ্গেশ উপাধ্যায় ন্যায়দর্শনের বিষয়-বস্তু নিয়ে নব্যন্যায়ের প্রবর্তন করেন। গৌতমের ন্যায়শাস্ত্রে বলা হয়েছে, প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন প্রভৃতি ষোলটি বিষয়ে জ্ঞানলাভ হলে মোক্ষলাভ হয়। কিন্তু নব্যন্যায়ে বলা হয়েছে, শুধু প্রমাণের আলোচনা দ্বারাই মোক্ষ (নিঃশ্রেয়স্) লাভ সম্ভব।

তখনকার দিনে মিথিলা ন্যায়শাস্ত্রের কেন্দ্র ছিল। নদীয়ার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম (১৫শ শতক) পিতা মহেশ্বর ভট্টাচার্যের সম্মতিক্রমে মিথিলায় পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রের নিকট ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে যান।

মিথিলার গৌরব পাছে ক্ষুণ্ণ হয় এই ভয়ে কোন শিক্ষার্থীকে ন্যায়শাস্ত্রসম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ মিথিলার বাইরে নিয়ে যেতে দেওয়া হত না। বাসুদেব গঙ্গেশ উপাধ্যায়ের চারিখণ্ড চিন্তামণি ও কুসুমাঞ্জলি-নামক গ্রন্থ কণ্ঠস্থ করে নবদ্বীপে ফিরে

যান ও বাঙালী শিক্ষার্থীদের ন্যায় শিক্ষা দিতে থাকেন। তার ফলে মিথিলার গৌরব হ্রাস পেতে থাকে।



বাসুদেব সার্বভৌম

প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রঘুনাথ শিরোমণি ও শ্রীচৈতন্যদেব বাসুদেব সার্বভৌমের শিষ্য ছিলেন।

॥ রঘুনাথ শিরোমণি ॥

খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রঘুনাথ জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীচৈতন্যদেব তাঁর সহপাঠী ছিলেন। রঘুনাথ শ্রীহট্ট থেকে এসে নবদ্বীপে বাসুদেব সার্বভৌমের গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি মিথিলায় ন্যায়ের উপাধিলাভের জন্য গমন করেন ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পক্ষধর মিশ্রকে ন্যায়শাস্ত্রে পরাজিত করে 'শিরোমণি' উপাধি লাভ করেন।

রঘুনাথ ৩৮ খানি অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁরই সুব্যবস্থায় কোন শিক্ষার্থীকে মিথিলায় আর



শ্রীচৈতন্যদেব ও রঘুনাথ

ন্যায়শাস্ত্রে উপাধিলাভের জন্য যেতে হত না। নবদ্বীপেই উপাধিপ্রদানের ব্যবস্থা হয়।

॥ উপনিষদ্ ॥

উপনিষদ্‌কে বেদের নানা অংশের শেষ ভাগ বলা হয়। প্রত্যেকটি উপনিষদে ব্রহ্মজ্ঞান নিরূপিত হয়েছে। ('ধর্মের কথা' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

উপনিষদে বলা হয়েছে, ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত। তিনি অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ (ছোট থেকেও ছোট, বড় থেকেও বড়)। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সব কিছুর স্রষ্টা। তিনিই প্রাণ, তিনিই আনন্দ। তাঁকে জানা হলে সবই জানা হয়ে যায়। তিনি পূর্ণ। সেই পূর্ণ থেকে পূর্ণ বাদ দিলে পূর্ণই থেকে যায়। তিনি পরমাত্মা। সকল জীবাত্মা সেই পরমাত্মারই অংশ। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত যে মানুষ বহু দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে তা থেকে মুক্তি

পেতে হলে কামনা-বাসনা সম্পূর্ণ ত্যাগ ও ঈশ্বরোপাসনা দ্বারা মোক্ষ বা নির্বাণ লাভ করা প্রয়োজন।

॥ নচিকেতার উপাখ্যান ॥

কঠোপনিষদে আছে নচিকেতা বাজশ্রবা ঋষির



বাজশ্রবার বিশ্বজিৎ যজ্ঞ

পুত্র। বাজশ্রবা বিশ্বজিৎ যজ্ঞ করেন। তাতে তিনি সব কিছুই দান করেন। পুত্র নচিকেতা যজ্ঞশেষে পিতাকে বলেন, আমাকে আপনি কাকে দান করলেন? যজ্ঞ করতে করতে পিতা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি প্রথমে পুত্রের প্রশ্নের উত্তর দেন না। কিন্তু পুত্র পীড়াপীড়ি করতে থাকায় তিনি বলে বসেন, 'তোমাকে যমকে দিলাম।'

এই কথা শুনে পুত্র নচিকেতা যমালয়ে যাত্রা করেন। যখন তিনি যমভবনে পৌঁছলেন, তখন যম বাড়িতে ছিলেন না। দ্বারী সে কথা জানালে যমের দর্শনলাভের জন্যে নচিকেতা তিন দিন তিন রাত্রি অনশনে দ্বারদেশে পড়ে রইলেন। যম বাড়ি ফিরে তাঁকে কত বোঝালেন, কত প্রলোভন দেখালেন। কিন্তু তিনি পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত নচিকেতা যমের নিকট থেকে তিনটি বর ও পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞান লাভ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।



যমপুরীতে যমের সঙ্গে নচিকেতা কথা বলছেন। তিনি নির্ভয়ে পরমাত্মবিষয়ক জ্ঞানলাভের আগ্রহ প্রকাশ করলে যম তাঁর দিকে বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে তাকালেন।

॥ গীতা ॥

গীতা 'শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা'র সংক্ষেপ। এই গ্রন্থে বলা হয়েছে, অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সমবেত আত্মীয়স্বজনদের দেখেন, তখন যুদ্ধ করলে তাঁদের প্রাণনাশ হবে এ কথা ভেবে তিনি বিমর্ষ হয়ে রথে চুপ করে বসে থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন অর্জুনের রথের সারথি, তিনি অর্জুনকে যুদ্ধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে যে-সব কথা বলেন, তাই-ই গীতায় আছে। গীতায় জীবন, মৃত্যু, আত্মা, যোগ, জ্ঞান, ঈশ্বর, ধর্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ কথা লেখা আছে। ব্যাসদেব এই গ্রন্থ রচনা করেন।

গীতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত। গীতা পৃথিবীর অন্যতম বহুপঠিত এবং হিন্দুদের পরম পবিত্র গ্রন্থ। কিন্তু গীতাকে দর্শনশাস্ত্র বলা হয় না। কারণ এটি মোক্ষলাভমূলক ধর্মশাস্ত্র নয়।



ব্যাসদেব শিষ্যদের গীতার মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা করে শোনাচ্ছেন

॥ বুনো রামনাথ ॥

কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র শিবচন্দ্র শুনতে পান, রামনাথ নামে এক মহাপণ্ডিত বনের মধ্যে নির্জন স্থানে এক চতুষ্পাঠী স্থাপন করে অধ্যাপনা করছেন। তিনি তৎকালীন সর্বপ্রধান নৈয়ায়িক রামনারায়ণ তর্কপঞ্চাননের কাছে ন্যায়-শাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিরাট পণ্ডিত হন ও তর্কসিদ্ধান্ত উপাধি লাভ করেন।

রামনাথ খুব গরিব ও নিঃস্পৃহ ছিলেন। পঠদ্দশায় তাঁর বিবাহ হয়। রামনাথের পত্নী স্বামীর মতোই উদার ও নিঃস্পৃহ ছিলেন। রামনাথ সেকালের রীতি-অনুযায়ী রাজসাহায্যে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন নি। তিনি অত্যন্ত অনাড়ম্বরভাবে বনের মধ্যে পর্ণকুটীরে চতুষ্পাঠী স্থাপন করেন। বনের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীদের শিক্ষাদান করতেন বলে তাঁকে লোকে বলত 'বুনো রামনাথ'।

রাজা শিবচন্দ্র রামনাথের সঙ্গে দেখা করে তাঁর কোন অনুপপত্তি আছে কিনা তা জিজ্ঞাসা করেন। অনুপপত্তি শব্দের দুটি অর্থ—শাস্ত্রহৃদয়ংগম করার দৈন্য ও আর্থিক দৈন্য। রামনাথ প্রথম অর্থ বুঝে বললেন, শাস্ত্রহৃদয়ংগমের কোন অনুপপত্তি নেই।

রাজা বললেন, তিনি আর্থিক অনটনের কথা বলছেন। সে কথা শুনে রামনাথ তাঁর স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে বললেন। রাজা রামনাথের স্ত্রীর কাছে তাঁদের আর্থিক অভাব কিরূপ তা জানতে চান। রামনাথের পত্নী বললেন, কিসের অভাব? তেঁতুলগাছে অনেক পাতা আছে। সেই পাতার ঝোল খেয়ে তাঁদের বেশ চলে যায়। অভাব বলতে কিছু নেই।



বুনো রামনাথ ও শিবচন্দ্র

রাজা বিস্মিত হলেন। তিনি অতিশয় প্রীত হয়ে রামনাথকে অর্থসাহায্য করতে চাইলেন। রামনাথ দান গ্রহণ করতে অসম্মত হলেন।

রামনাথের মতো উঁচু দরের দার্শনিক কৃষ্ণনগরে থাকায় রাজা গর্ববোধ করলেন।

॥ ডাইয়জেনিজ ॥

গ্রীসে রামনাথের ন্যায় একজন নির্লোভ, নিরহংকার দার্শনিক ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সে যুগে দেশেবিদেশে পরিব্যাপ্ত ছিল। ডাইয়জেনিজ (Diogenes, ৪১২-৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এথেন্সের রাজপথের ধারে একটা শোয়ানো বড় স্নানের টবের মধ্যে থাকতেন। তিনি খুব মোটা কাপড় পরতেন, অতি সাধারণ খাদ্য খেতেন। তিনি বলতেন, দেহের সুখের দিকে মন দিলে জ্ঞান আহরণে বাধার সৃষ্টি হয়।

ডাইয়জেনিজ দিনদুপুরে একটা জলন্ত লণ্ঠন নিয়ে রাজপথে বিচরণ করতেন। এ ধরনের অদ্ভুত



ডাইয়জেনিজ ও আলেকজাণ্ডার

আচরণে বিস্মিত হয়ে লোকে তাঁকে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলতেন, তিনি জ্ঞানী লোক খুঁজে পান কিনা তার জন্যে এই রকম আলো হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার একদিন ডাইয়জেনিজের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তখন শীতকাল। ডাইয়জেনিজ গায়ে রোদ লাগাচ্ছিলেন। আলেকজাণ্ডার তাঁর জন্যে কিছু করতে পারেন কিনা তা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

ডাইয়জেনিজ নির্লিপ্তভাবে উত্তর দিলেন, আমার জন্যে কিছু করতে হবে না। অনুগ্রহ করে রোদটা আড়াল না করে সরে দাঁড়ান। আলেকজাণ্ডার তো অবাক্। ডাইয়জেনিজ কত কী চাইতে পারতেন, তা তিনি না করে শুধু রোদটা ছেড়ে দিতে বলছেন। কী নিঃস্পৃহ পণ্ডিত। দিগ্বিজয়ী বীর দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের নির্লোভ আচরণের কাছে হার মানলেন।

ডাইয়জেনিজের বহু উপদেশবাক্য আজো বর্তমান আছে।

॥ থেলিজ ॥

পাশ্চাত্ত্য জগতে গ্রীকদের মধ্যে দার্শনিক-সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। যে যুগের কথা বলা হচ্ছে, সে যুগে গ্রীসে সাতজন বিরাট জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। তন্মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ছিলেন থেলীজ (Thales of Miletus, আনুমানিক ৬২৪-৫৩৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। থেলীজ ৫৮৫ খ্রীষ্টাব্দের সূর্যগ্রহণ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। তিনি বলতেন, জলই সব পদার্থের মূল।

॥ পাইথাগোরাস ॥

পাইথাগোরাস (Pythagorus, আনুমানিক ৫৮২-৫০৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন গ্রীক বিজ্ঞানী দার্শনিক। তুরস্ক থেকে কিছু দূরে Samos দ্বীপে তাঁর জন্ম হয়। আনুমানিক ৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ ইতালীর গ্রীক শহর ক্রোটন (Croton)-এ

চলে যান। তিনি রহস্যানুসন্ধানী দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ ছিলেন। তিনি আত্মা ও জন্মান্তরে বিশ্বাসী ছিলেন।

॥ হেরাক্লিটাস ॥

হেরাক্লিটাস (Heraclitus of Ephesus, আনুমানিক ৫৪০-৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। তিনি বলতেন, জগতের সব-কিছু নিত্যপরিবর্তনশীল। আগুন সব কিছুর মূল। তাঁর দার্শনিক মতবাদ পারমেনিডিজ (Parmenides, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী), ডিমক্রিটাস (Democritus, আনুমানিক ৪৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), প্লেটো (Plato, ৪২৭-৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও সক্রেটিজ (Socrates, ৪৭০ ?-৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-কে প্রভাবিত করেছিল।

॥ সক্রেটিজ ॥

মহাজ্ঞানী সক্রেটিজ (Socrates, ৪৭০-৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন গ্রীসের ভাস্কর সফ্রোনিস্ক্‌স্ ও ধাত্রীবিদ্যানিপুণা ফিসারেটির পুত্র। সক্রেটিজ দেখতে অতিশয় কুশ্রী ছিলেন। তাঁর স্ত্রী জ্যান্তিপী (Xantippe) অতিশয় মুখরা ও ক্রোধপরায়ণা রমণী ছিলেন। সক্রেটিজ সম্পূর্ণ ক্রোধজয় করার জন্যে পত্নীর নিদারুণ বাক্যবাণ ও অত্যাচার অক্লেশে সহ্য করেন।

সক্রেটিজ তিনবার যুদ্ধে যান। পরে অ্যাথেন্সে স্থায়িভাবে বাস করতে থাকেন ও সকলকে অমূল্য দার্শনিক জ্ঞান প্রদান করতে থাকেন। তিনি গ্রীকদের, বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের সৎপথে থেকে জীবনযাপনের কথা বলেন। অধার্মিকতা ও যুবকদের নীতিহীন করার মিথ্যা অভিযোগে তাঁর প্রতি মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তিনি সহাস্য-বদনে হেমলক বিষ পান করে মৃত্যুবরণ করেন।

জেলের মধ্যে শিষ্যেরা কাঁদতে থাকলেন। একজন বললেন, বিনা দোষে বিচারের প্রহসন করে আপনাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে। সক্রেটিজ বললেন, তাহলে কি তোমরা চাও, দোষ করে আমি মৃত্যুবরণ করি ?

সক্রেটিজের শিষ্য ছিলেন প্রসিদ্ধ গ্রীক সেনাপতি জেনোফোন ও দার্শনিক প্লেটো। তিনি কিছু লিখে যান নি। তাঁর কথা প্লেটোর লেখা বই পড়ে জানা যায়।



সক্রেটিজের বিষপান

॥ প্লেটো ॥

প্লেটো (Plato, ৪২৭-৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন আলেকজাণ্ডারের গৃহশিক্ষক অ্যারিস্টটলের গুরু। প্লেটো অ্যাথেন্সবাসী একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক ছিলেন। তিনি অ্যাকেডেমি-নামক বিদ্যাভবনে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দান



প্লেটো

করতেন। প্লেটোর বিখ্যাত বইয়ের নাম Dialogues। Republic এই পুস্তকেরই অংশ। 'ডায়ালগস' পুস্তকে প্রশ্নোত্তরের ছলে দার্শনিক ও সামাজিক জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে।

॥ অ্যারিস্টটল ॥

প্লেটোর শিষ্য অ্যারিস্টটল (Aristotle, ৩৮৪-৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-কে সব জ্ঞানীদের গুরু বলা হয়। তিনি প্লেটোর পরলোকগমনের পর ম্যাসিডনে যান। তাঁর একটি বিখ্যাত বই পলিটিকস (Politics)।

॥ আবু-ইবন্-রশিদ ॥

আবু-ইবন্-রশিদ (১১২৬-৯৮ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ আরব দার্শনিক ও লেখক। স্পেনের



সশিষ্য অ্যারিস্টটল

কর্ডোভা শহরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি অ্যারিস্টটলের মতবাদকে তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেন। তাঁকে খ্রীষ্টানরা বলত আভেরোস (Averoes)।

॥ টমাস অ্যাকুইনাস ॥



টমাস অ্যাকুইনাস

টমাস অ্যাকুইনাস (Saint Thomas Aquinas, আনুমানিক ১২২৫-৭৪ খ্রী.) ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ও লেখক।

॥ ফ্রান্সিস বেকন ॥

মহাজ্ঞানী ইংরেজ দার্শনিক বেকন

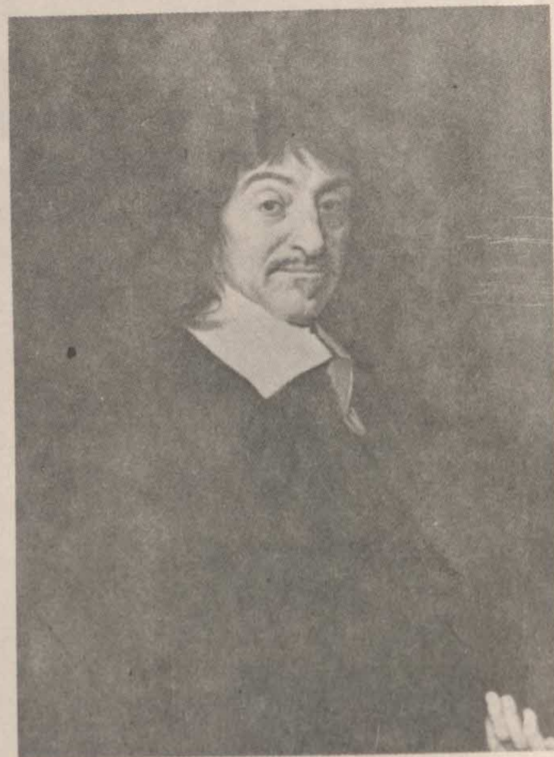


ফ্রান্সিস বেকন

(Francis Bacon, ১৫৬১-১৬২৬ খ্রী.) শুধু বিখ্যাত দার্শনিকই ছিলেন না, একজন প্রসিদ্ধ লেখকও ছিলেন। অনেকের ধারণা, শেক্‌স্‌পীয়ারের নামে যে-সব বই চলে, সে-সব তাঁরই লেখা।

॥ দেকার্ত ॥

ফরাসী দার্শনিক দেকার্ত(Rene Descartes, ১৫৯৬-১৬৫০ খ্রী.) গণিতজ্ঞ ও লেখক ছিলেন। তাঁর বিখ্যাত কথা, আমি চিন্তা করছি, কাজেই আমি আছি (I am thinking, so I exist)।



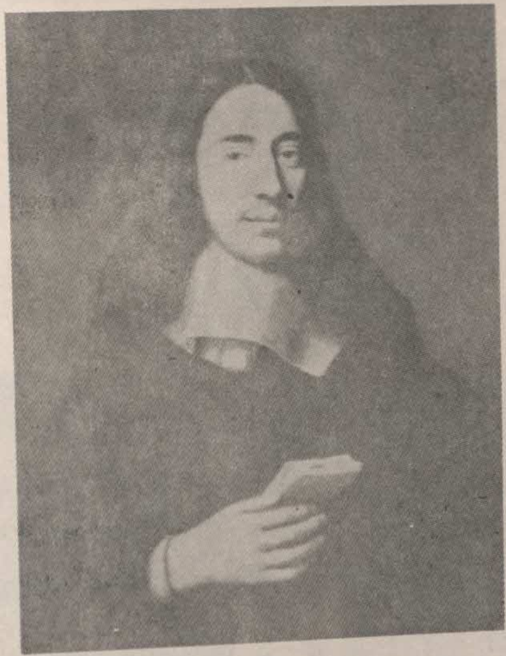
দেকার্ত

॥ স্পিনোজা ॥

স্পিনোজা (Baruch or Benedict Spinoza, ১৬৩২-৭৭ খ্রী.) এক পোর্তুগিজ ইহুদীর সন্তান। আমস্টার্ডামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি দেকার্তের ভাবধারার অনুগামী ছিলেন। অর্থে তাঁর লোভ ছিল না। তাঁর লিখিত বহু লেখা তাঁর জীবদ্দশায় প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় নি।

॥ ইম্যানুয়েল কাণ্ট ॥

জার্মান দার্শনিক ইম্যানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant, ১৭২৪-১৮০৪ খ্রী.) ছিলেন যুক্তিবাদী। তাঁর তিনখানি বিখ্যাত বই Critiquo of Pure Reason (১৭৮১), Critique of Practical Reason (১৭৮৮) ও Critique of Judgement (১৭৯০)।



স্পিনোজা



হেগেল



কান্ট

॥ হেগেল ॥

জার্মান দার্শনিক ও অধ্যাপক হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ১৭৭০-১৮৩১খ্রী.) ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক। স্টাটগার্টে তাঁর জন্ম হয়।

॥ শোপেনহাউয়ার ॥

জার্মান দার্শনিক শোপেনহাউয়ার (Arthur Schopenhauer, ১৭৮৮-১৮৬০ খ্রী.) দুঃখবাদ (pessimism) প্রচার করে বিখ্যাত হন। তিনি ভারতীয় দর্শনের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি প্লেটো ও হেরাক্লিটাসের ভক্ত ছিলেন।



শোপেনহাউয়ার

॥ কোঁত ॥

ফরাসী দার্শনিক কোঁত (Auguste Comte, ১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রী.) ১১ বৎসর পরিশ্রম করে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে ছয়টি বৃহৎ খণ্ডে তাঁর Positive Philosophy-নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর প্রচারিত মতবাদ positivism।

॥ লাইব্‌নিৎস ॥

জার্মান দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ লাইব্‌নিৎস (Gottfried Wilhelm Leibnitz, ১৬৪৬-১৭১৬ খ্রী.) নিউটনের সঙ্গে সঙ্গে Infinitesimal Calculus আবিষ্কার করেন। তা ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।



লাইব্‌নিৎস

॥ ভলতেয়ার ॥

অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী দার্শনিক ও লেখক ভলতেয়ার (Francois Marie Arouet de Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রী.)। 'Discourses on Man,' 'Essay on the Morals and Spirit of Nations' প্রভৃতি তাঁর প্রসিদ্ধ পুস্তক। তিনি ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট-এর আমন্ত্রণে ১৭৫০ থেকে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মানীতে অবস্থান করেন।

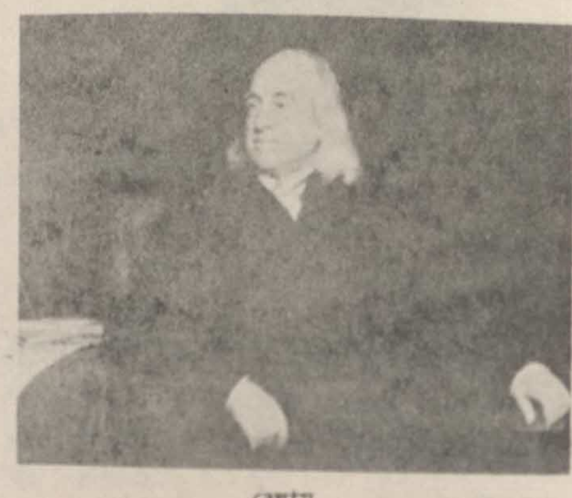


ভলতেয়ার

॥ রুসো ॥

প্রসিদ্ধ ফরাসী দার্শনিক রুসো (Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ খ্রী.) জেনেভায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মতবাদ ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলে মনে করা হয়।

॥ বেন্থাম ॥

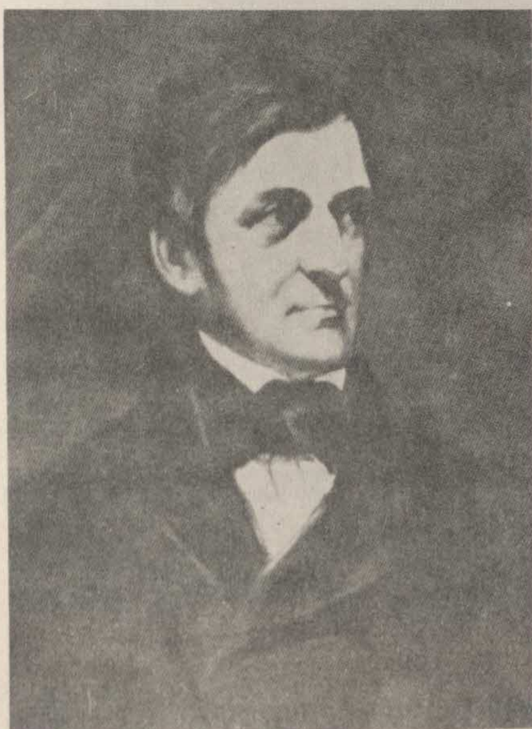


বেন্থাম

দার্শনিক বেন্থাম (Jeremy Bentham, ১৭৪৮-১৮৩২ খ্রী.) utilitarianism বা উপযোগবাদের প্রচারকর্তা। জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁরই ভাবশিষ্য।

॥ এমার্সন ॥

আমেরিকান দার্শনিক ও প্রবন্ধলেখক এমার্সন



এমার্সন

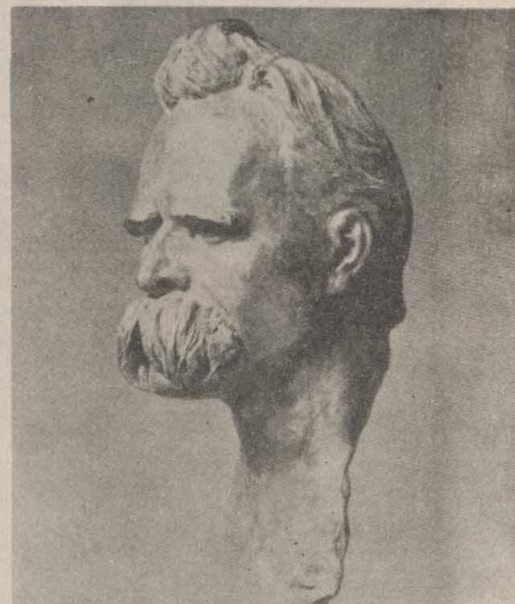
(Ralph Waldo Emerson, ১৮০৩-১৮৮২ খ্রী.) বহু উৎকৃষ্ট গ্রন্থের রচয়িতা।

॥ স্পেন্সার ॥

ইংরেজ দার্শনিক স্পেনসার (Herbert Spencer, ১৮২০-১৯০৩ খ্রী.) ক্রমবিবর্তনবাদের উপর ভিত্তি করে রচিত দর্শনশাস্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর The System of Synthetic Philosophy দশ খণ্ডে রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ।

॥ নীট্শে ॥

জার্মান দার্শনিক নীট্শে (Friedrich Wilhelm Nietzsche, ১৮৪৪-১৯০০খ্রী.)



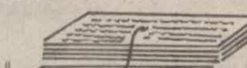
নীট্শে

ওয়াগনার ও শোপেনহাউয়ারের দার্শনিক মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত হন। তিনি বহু গ্রন্থের প্রণেতা।

॥ বের্গস ॥

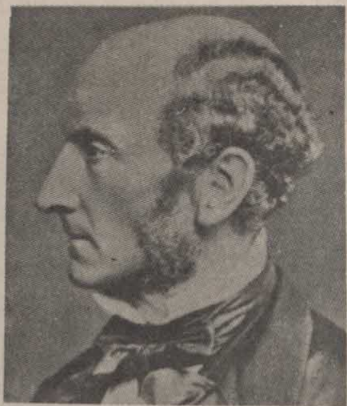
ফরাসী দার্শনিক আঁরি বের্গস (Henri Louis Bergson, ১৮৫৯-১৯৪১ খ্রী.) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন (১৯২৭ খ্রী.)। তাঁর দার্শনিক মতবাদকে vitalism বা প্রাণবাদ বলে।

॥ জন স্টুয়ার্ট মিল ॥

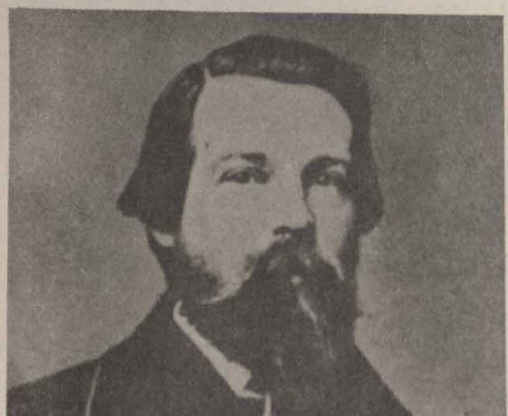


প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill, ১৮০৬-১৮৭৩ খ্রী.) ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত ন্যায়-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

যাঁদের নাম করা হল, তাঁরা ছাড়া আরো বহু দার্শনিক ছিলেন—যেমন হবস (Hobbes, ১৫৮৮-১৬৭৯ খ্রী.), হিউম (David Hume,



মিল



এঙ্গেলস



কার্ল মার্ক্‌স

১৭১১-১৭৭৬ খ্রী.), উইলিয়াম জেমস (William James, ১৮৪২-১৯১০ খ্রী.), লক (Locke, ১৬৩২-১৭০৪ খ্রী.!), ফিখ্‌টে (Fichte, ১৭৬২-১৮১৪ খ্রী.), এঙ্গেলস (Freidrich Engles, ১৮২০-১৮৯৫ খ্রী.), কার্ল মার্ক্‌স (Heinrich Karl Marx, ১৮১৮-১৮৮৩ খ্রী.) প্রভৃতি।

পাশ্চাত্ত্যের ন্যায় ভারতের সর্বত্র সর্বকালে অসংখ্য দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে। এত দার্শনিক পৃথিবীর অন্য কোন দেশে আবির্ভূত হন নি।

শুধু ভারত কেন, চীন, জাপান, আরব, রাশিয়া, স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশে বহু দার্শনিক জন্মগ্রহণ করেছেন।



সময় ও ঘড়ির কথা

সকাল বেলায় সূর্য ওঠে। মানুষ ঘুম থেকে উঠে নানা কাজে লেগে যায়। সারা দিন ধরে কাজ চলে। সূর্য অস্তে যায়। বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হয়। তারপর রাতের শুরু। বেশ কিছু রাত হলে মানুষ ঘুমোতে যায়। আবার ভোরে বিছানা ত্যাগ করে।

এই সকাল থেকে সন্ধ্যা বা রাত, আর রাত থেকে ভোর পর্যন্ত সময়কে মানুষ নিজেদের সুবিধের জন্যে ভাগ করে নিয়েছে। আগেকার দিনে হিন্দুরা সময়ের ভাগ করত এই ভাবে—

৬০ অনুপলে ১ বিপল
৬০ বিপলে ১ পল
৬০ পলে ১ দণ্ড
৬০ দণ্ডে ১ দিন
৭½ দণ্ডে ১ প্রহর
৮ প্রহরে ১ দিন ও রাত।

তারপর দিন, রাত, সপ্তাহ, মাস ও বৎসর ধরা হয়। সকালে সূর্য ওঠার সময় থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ১ দিন, সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত রাত। আবার দিন ও রাত মিলিয়ে দিনও ধরা হয়।

ইংরেজী মতে—

৬০ সেকেণ্ডে ১ মিনিট
৬০ মিনিটে ১ ঘণ্টা
২৪ ঘণ্টায় ১ দিন (দিনরাত)

ভারতীয়েরা বর্তমানে বিপল, পল, দণ্ড ছেড়ে ইংরেজী মতে সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা মানে ও সেই মতো সময়ের ভাগ করে।

পৃথিবী নিজের কল্পিত মেরুদণ্ডের উপর দিয়ে পাক খেতে খেতে ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪১ সেকেণ্ডে সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। মোটামুটি পৃথিবীর

ঘুরতে ১ দিন লাগে। এটা হল সৌর দিন।

সাধারণতঃ লোকে ভোর থেকে নতুন দিনের শুরু হয় বলে ধরে থাকে। কয়েক হাজার বছর আগে ব্যাবিলনিয়ার বিদ্বান্ লোকে তাই মানতেন। কিন্তু গ্রীক ও ইহুদীরা সূর্য অস্ত গেলে সন্ধ্যা থেকে দিন আরম্ভ হয় বলে ধরতেন। প্রাচীন কালের রোমানরা বলতেন, দিনের শুরু মাঝ রাত থেকে। ইংরেজরা রোমান পঞ্জিকা মানে বলে তারা মাঝ রাত থেকেই দিনের আরম্ভ বলে মানে।

এর ফলে ইংরেজ আমলে রেলের টাইম টেবলে রাত বারোটাকে শূন্য ধরা হয়েছে, আর সেই অনুযায়ী তখন থেকেই দিনের আরম্ভ। ০.২০ মানে রাত বারোটা বেজে কুড়ি মিনিট। তার পর তের ঘণ্টা বাদে ভারতীয়দের দুপুরকে ১টা ধরা হয় অর্থাৎ ১৩-২০ মিনিট মানে দুপুরে ১টা বেজে ২০ মিনিট। এই ভাবে চলতে চলতে ২৪ অথবা ০ (শূন্য) হলে রাত বারোটা।

সৌর দিন ছাড়া আর একটা দিন হিন্দুরা মানে, তাকে বলে তিথি। এ হল চান্দ্র দিন। চাঁদের কলা থেকে এই তিথি গণনা করা হয়। অমাবস্যার দিন চাঁদ দেখা যায় না। পনেরটা তিথি ধরে আলো বাড়তে বাড়তে পূর্ণিমা আসে। এই পনের দিনকে বলে শুক্লপক্ষ। আর পূর্ণিমা থেকে আলো কমতে কমতে পনের দিন বাদে অমাবস্যা হয় অর্থাৎ আকাশে একেবারে চাঁদ দেখা যায় না। এই পনের দিন কৃষ্ণপক্ষ। তিথি পনেরটি প্রতিপদ, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠি, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী, দশমী, একাদশী, দ্বাদশী, ত্রয়োদশী, চতুর্দশী ও পূর্ণিমা বা অমাবস্যা। শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ মিলে হয় এক চান্দ্রমাস।

সাতটা দিনে এক সপ্তাহ। সাতটা দিনের বা বারের ভিন্ন ভিন্ন নাম—রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি। রবিবার সূর্যের নামে, সোমবার চন্দ্রের নামে, মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র ও শনি সেই সেই নামের পাঁচটি গ্রহের নামে।

ইংরেজী মতে Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday ও Saturday। ইংরেজী নামের বারগুলি সূর্য চন্দ্র বা নানা দেবদেবীর নামে (ছবি দ্রষ্টব্য)।



সূর্যের নামে Sunday | চাঁদের নামে Monday | আকাশের দেবতা Tiw-এর নামে Tuesday | যুদ্ধের দেবতা Woden-এর নামে Wednesday | আলো ও হাওয়ার দেবতা Thor-এর নামে Thursday | রোমানদের সৌন্দর্যের দেবী Frig-এর নামে Friday | জলের শক্তির দেবতা Sater-এর নামে Saturday

বিভিন্ন বারের নামের উৎপত্তি

আমরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সময়কে বলি দিন ও সন্ধ্যা থেকে ভোর পর্যন্ত বলি রাত। এই দিন রাত বৎসরের ২১শে-২২শে মার্চ ও ২১শে-২২শে সেপ্টেম্বর ছাড়া সমান থাকে না। কখনও দিন বড়, রাত ছোট। কখনও রাত বড়, দিন ছোট। ২৩শে ডিসেম্বরের পর থেকে দিন বড় হতে থাকে।

হিন্দুদের কাজকর্ম সৌরমাস বা সৌর দিন নিয়ে। সেই মাসের কোনটা ৩০ দিনে, কোনটা ৩১ দিনে, আবার কোনটা ৩২ দিনে; কখনও কখনও কোন মাস ২৮ বা ২৯ দিনে। বাংলামাসগুলির নাম এক একটা নক্ষত্রের নামে। বিশাখা থেকে বৈশাখ, জ্যেষ্ঠা থেকে জ্যৈষ্ঠ, পূর্বাষাঢ়া থেকে আষাঢ়, শ্রবণা

থেকে শ্রাবণ, পূর্বভাদ্রপদ থেকে ভাদ্র, অশ্বিনী থেকে আশ্বিন, কৃত্তিকা থেকে কার্তিক; মৃগশিরা থেকে মার্গ শীর্ষ অর্থাৎ অগ্রহায়ণ, পুষ্যা থেকে পৌষ, মঘা থেকে মাঘ, পূর্বফল্গুনী থেকে ফাল্গুন এবং চিত্রা থেকে চৈত্র।

বৈশাখ মাসের পূর্ণিমায় চাঁদ অস্ত যাবার সময় বিশাখা নক্ষত্রকে তার কাছে দেখা যায় ও চৈত্র-পূর্ণিমায় চিত্রা নক্ষত্রকে চাঁদ অস্ত যাবার সময় তার কাছে দেখা যায়। এই কাছে মানে এই নয়, খুব কাছে, তা কোটি কোটি কিলোমিটার দূরে। আকাশের দিকে চাইলে যেমনটি মনে হয়, তাই বলা হয়েছে।

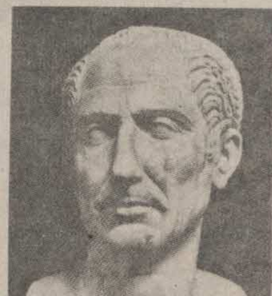
দিনের বেলায় আকাশে নক্ষত্র দেখা যায় না। কিন্তু দেখা না গেলেও নক্ষত্ররা আকাশে থাকে। সেই সব নক্ষত্রের প্রত্যেকটিকে বলে রাশি (sign)। রাশি বারোটা। বারোটা রাশিকে নিয়ে হয় রাশিচক্র (zodiac)। জ্যোতির্বিদরা হিসেব করে জানতে পারেন, সূর্য এক একটা নক্ষত্ররাজ্যের মধ্য দিয়ে যায়। সূর্য মাসে একবার একটা রাশির মধ্যে থাকে। এক রাশি থেকে অন্য রাশিতে যাবার বা সংক্রমণের সময়কে বলা হয় সংক্রান্তি। প্রতি বাংলা মাসের শেষ দিন সংক্রান্তি।

শুক্লপক্ষ ও কৃষ্ণপক্ষ নিয়ে এক চান্দ্র মাস। এই চান্দ্রমাসের ভিন্ন নাম। সে সব নামের চলন আমাদের মধ্যে নেই। চান্দ্রমাসের শুরু ও শেষ অমাবস্যায়। দিন হিসাবে চান্দ্রমাস হয় ২৭ দিনের একটু বেশী।

মুসলমানেরা চান্দ্রমাস ধরে সময়ের হিসাব করে। তাদের বারো মাসের নাম—মহরম, শফর, রবীঅল্ আউঅল, রবীঅস্সানি, জমাদিঅল্ আউঅল, জমাদি অস্সানি, রজব, শাবান, রমজান, শওয়াল, জেলকদ ও জেলহজ্জ।

ইংরেজী মাস January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November ও December-এর নামকরণ বাংলা মাসসমূহের মতোই নানাভাবে হয়েছে। বিপরীত দিকে ফেরানো দুই মুখওয়ালা রোমান দেবতা জেনাস-এর নামে জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি (প্রায়শ্চিত্তের উৎসব) থেকে ফেব্রুয়ারি, যুদ্ধদেবতা Mars থেকে মার্চ, লাতিন শব্দ এপ্রিলিস (Aprilis) থেকে এপ্রিল, মার্কারির মাতা Maia থেকে মে, জুপিটারের স্ত্রী Juno থেকে জুন হয়েছে।

আগে জুলাই মাসের নাম ছিল কুইন্টিলিস ও আগস্ট মাসের নাম ছিল সেক্স্টিলিস। দুটি শব্দের অর্থ পঞ্চম ও ষষ্ঠ। কারণ, সে সময়ে মার্চ মাসকে বছরের প্রথম হিসাবে ধরা হত। জুলিয়াস সীজার



জুলিয়াস সীজার

(Caius Julius Caesar, আনুমানিক ১৫১—৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কুইন্টিলিস মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর নামানুযায়ী কুইন্টিলিসের নাম রাখেন জুলিয়াস। সেই জুলিয়াস জুলাইয়ে পরিণত হয়েছে।

রোমক সম্রাট অক্টেভিয়ানাস অগস্টাস (Caius Octavianus, Augustus, ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-১৪ খ্রীষ্টাব্দ) সেক্স্টিলিস মাসে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামানুযায়ী সেক্স্টিলিসের নাম হয় আগস্ট মাস।



অক্টেভিয়ানাস অগস্টাস

সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর-এর অর্থ সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম। কারণ, আগেই বলা হয়েছে, পূর্বে মার্চ মাস থেকে বছর শুরু হত। এখন অবশ্য জানুয়ারি থেকেই বর্ষারম্ভ।

আগে জুলাই ও আগস্ট ৩০ দিনের মাস ছিল। সীজার জুলাই-এর দিনসংখ্যা ৩১ করলেন। অগস্টাসও অগস্টের দিনসংখ্যা ৩১ করলেন। তার ফলে বৎসরের দিনের সংখ্যা ঠিক রাখবার জন্যে ফেব্রুয়ারি মাসের সংখ্যা হল ২৮।

ইংরেজী মতে সৌর বৎসর ধরা হয়। কিন্তু সৌর বৎসর ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেণ্ডে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে একবার ঘুরে আসতে যত সময় লাগে তাই-ই সৌর বৎসর। কিন্তু বছরে প্রায় ছ ঘণ্টা করে কম ধরা হয়ে যায়। সেইজন্যে প্রতি চার বৎসর অন্তর ফেব্রুয়ারি মাসকে ২৯ দিনের মাস করা হয়। সেই বৎসরকে বলা হয় লীপ-ইয়ার (Leap-year)।

কিন্তু পুরোপুরি ঠিক হয় না। তাই প্রতি চারশ বৎসরে তিন বার লীপ-ইয়ারে ১ দিন বাড়ানো হয় না। এইভাবে সময়ের হিসাব অনেকটা নির্ভুল হয়।

অব্দ মানে বৎসর। তবে প্রধানতঃ এক একটা বিশেষ ঘটনা থেকে যে হিসাব করা হয় তাকে অব্দ বলা হয়। বঙ্গাব্দ, খ্রীষ্টাব্দ, চৈতন্যাব্দ, বিক্রমাব্দ, শকাব্দ সংবৎ অব্দ, রবীন্দ্রাব্দ প্রভৃতি নানা অব্দ প্রচলিত আছে।



যীশু খ্রীষ্টের জন্ম

যীশু খ্রীষ্ট যে বৎসর জন্মগ্রহণ করেছিলেন ভুল করে তার ৪ বা ৫ বছর পর থেকে যে অব্দ ধরা হয় তাই-ই খ্রীষ্টাব্দ।

বুদ্ধদেব যীশুখ্রীষ্টের জন্মের ৫৬৩ বৎসর আগে জন্মগ্রহণ করেন তাই বলা হয়, বুদ্ধদেব ৫৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জন্মগ্রহণ করেছেন।

৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে শকাব্দ ধরা হয় ও সংবৎ



বুদ্ধদেব

ধরা হয় ৫ খ্রীষ্টপূর্ব অব্দ থেকে। অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৮ বাদ দিলে শকাব্দ হয় ও খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে ৫৫ বৎসর যোগ করলে হয় সংবৎ অব্দ। ভারত সরকার সারা ভারতে শকাব্দ চালু করতে চেষ্টা করছেন। সংবৎ অব্দ সারা উত্তরভারতে প্রচলিত।

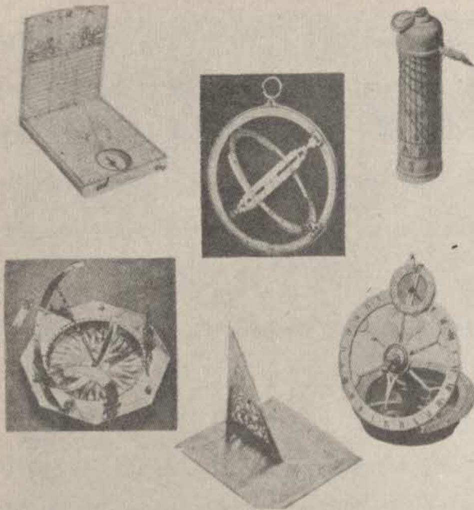
বাংলা বৎসরের হিসাবে বঙ্গাব্দ হয়। খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে ৫৯৩ বা ৫৯৪ যোগ করলে কত বঙ্গাব্দ তা জানা যাবে। ১লা বৈশাখ থেকে ১৬ই পৌষ পর্যন্ত ৫৯৩ যোগ করলে বঙ্গাব্দ পাওয়া যাবে। আর বঙ্গাব্দ পেতে হলে ১৭ই পৌষ থেকে ৩১শে চৈত্র পর্যন্ত ৫৯৪ যোগ দিতে হবে। ভারত সরকার শকাব্দ চালু করতে চাইলেও বাংলায় বঙ্গাব্দই পুরোপুরি চালু রয়েছে।

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মবৎসর থেকে হিসাব করলে চৈতন্যাব্দ, বিক্রমাদিত্যের জন্মবৎসর থেকে বিক্রমাব্দ, রবীন্দ্রনাথের জন্মবৎসর থেকে হিসাব করলে রবীন্দ্রাব্দ পাওয়া যাবে।

মুসলমানেরা হিজরী অব্দানুযায়ী কাজকর্ম করেন। ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হজরত মোহাম্মদ ৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত অর্থাৎ প্রস্থান করেন। সেই থেকে হিজরী অব্দ ধরা হয়। হিজরী অব্দের বৎসর চান্দ্রবৎসর অর্থাৎ ৩৫৪ দিনের, আর খ্রীষ্টাব্দের বৎসর ৩৬৫ দিনের। সেইজন্যে প্রতি বৎসর ১১ দিন করে খ্রীষ্টাব্দের সঙ্গে হিজরী অব্দের পার্থক্য হয়। এইভাবে ৩৩ বৎসরে পুরো এক বছর পার্থক্য হয়ে যায়।

আগেকার দিনে এখনকার মতো ঘড়িও ছিল না, ঘণ্টা, মিনিট, সেকেণ্ডও ছিল না। লোকে আকাশে সূর্যের অবস্থান থেকে সময় ঠিক করত। মেঘলা দিনে আকাশে সূর্য না থাকায় তাদের খুবই অসুবিধায় পড়তে হত। সূর্য অস্ত গেলে অন্ধকার ছেয়ে যেত। তখন রাত হয়েছে, বুঝতে হত।

ক্রমে ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরের লোক সূর্য ঘড়ি তৈরি করল। একটা পাথরের উপর দাগ কেটে তার উপর একটা কাঠি পুঁতে দেওয়া হত।



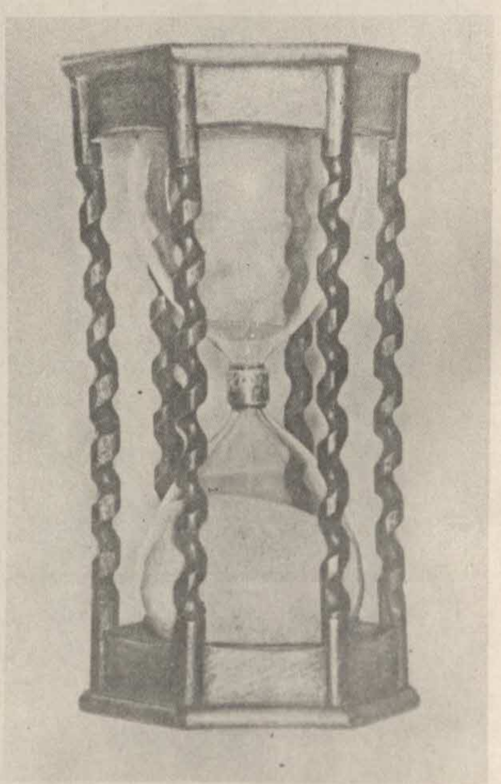
সূর্যঘড়ি

সূর্যের গতির সঙ্গে সঙ্গে সেই কাঠির ছায়াও সরে সরে যেত। তাই দেখে তখনকার লোকে সময় নিরূপণ করত। সূর্যঘড়ির অসুবিধা মেঘলা দিনে ও রাত্রে সে ঘড়ি কোন কাজেই লাগে না।



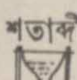
মিশরের জলঘড়ি

তারপর তৈরী হল জলঘড়ি বা clepsydra। একটা ছোট ফুটোওয়ালা পাত্রে জল ভরতি করে রাখা হত। সেই ফুটো দিয়ে জল পড়তে কি রকম সময় লাগে তা দেখে সময় ঠিক করা হত। এই



স্পেনীয় বালিঘড়ি

ভাবে ফুটোওয়ালা পাত্রে বালি ভরতি করে সময় নিরূপণের চেষ্টা হত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বালি-ঘড়ি নির্মিত হয়েছিল।



৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে I Hsing ও Liang Lingtsan কলকবজা দিয়ে ঘড়ি তৈরি করেন। ১৩৮৬ সালে উইল্টশায়ারের স্যালিসবেরি ক্যাথিড্রালে যে ঘড়ি বসানো হয়েছিল, তা আজও বর্তমান। সমরসেটের ওয়েলস ক্যাথিড্রালের ঘড়ি ১৩৫২ সালে চালু হয় বলে জানা যায়। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে

ন্যুরেমবার্গে প্রথম টেঁকঘড়ি তৈরী হয়।

পেণ্ডুলাম-চালিত ঘড়ির আবিষ্কর্তা হল্যাণ্ডের বিখ্যাত গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিদ ও পদার্থতত্ত্ববিদ ক্রিশ্চিয়ান হাইগেনজ (Christian Hygens, ১৬২৫-১৬৯৫ খ্রী.)। বড় বড় ঘড়িতে একটা জিনিস দোলে, তাকে বলে দোলক (পেণ্ডুলাম— pendulum)। পেণ্ডুলাম লম্বায় কমালে বা বাড়ালে তার দোলনের সময় বাড়ে বা কমে যায়। ইটালীর প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এই ব্যাপার লক্ষ্য করেন।

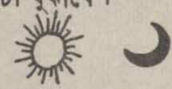
ঘড়ির ভিতরে স্প্রিং এর পেঁচ থাকে। পেঁচ কষে দম দিতে হয়; তাতে ঘড়ি চলে। 

আজকাল বহু ঘড়িতে দম দিতে হয় না। সে-সব ঘড়ি বিদ্যুতের সাহায্যে চলে। আবার পারমাণবিক শক্তিতে চালিত অত্যুন্নত ঘড়িও উদ্ভাবিত হয়েছে।

ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত গ্রীনিচ নামক স্থানের সময়কে বলে Greenwich Meridian Time বা G. M. T.। এখানে ইংল্যাণ্ডের প্রধান মানমন্দির ছিল। বর্তমানে তা হার্স্টমনসো ক্যাসল (Hurstmonceaux Castle)-এ স্থানান্তরিত করা হয়েছে। গ্রীনিচ ° দ্রাঘিমায় অবস্থিত, হার্স্টমনসো ক্যাসলও তাই। গ্রীনিচের দ্রাঘিমা-রেখা থেকে পৃথিবীর সব জায়গায় সময় নিরূপিত হয়। এই দ্রাঘিমা-রেখাকে বলে International Date Line। গ্রীনিচের সময় অনুযায়ী যখন বেলা বারোটা, তখন কলকাতায় ৫-৫৪ (বিকাল)।

সুইটজারল্যাণ্ড ঘড়ি তৈরির জন্য বিখ্যাত। এখানকার দক্ষ কারিগরদের সহযোগিতায় পৃথিবীর নানা দেশে বহু ঘড়ি তৈরির কারখানা তৈরী হয়েছে।

a. m. (ante merediem সূর্য ঠিক মাথার উপর (অর্থাৎ কোন দেশের মধ্য রেখার উপর) আসার আগে পর্যন্ত বারো ঘণ্টা অর্থাৎ রাত বারোটার পর থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত বোঝায়। আর p. m. post meridiem) সূর্য মধ্য রেখা অতিক্রম করবার পর থেকে বারো ঘণ্টা অর্থাৎ বেলা বারোটার পর থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত বোঝায়। 1 a. m. বললে রাত একটা, 9 a.m. বললে সকাল নটা, 1 p. m. বললে বেলা একটা ও 9 p. m. বললে রাত নয়টা বুঝাবে।

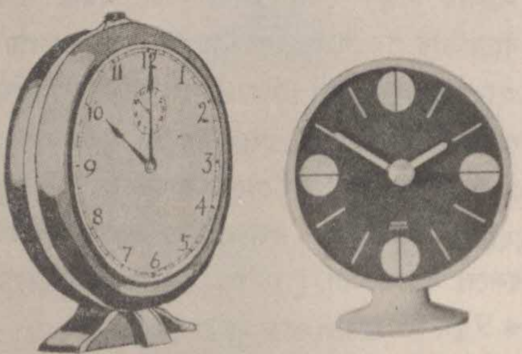
॥ B. C. ও A. D. ॥ 

B. C.-র অর্থ Before Christ অর্থাৎ খ্রীষ্ট-পূর্বাব্দ (যীশু খ্রীষ্টের জন্ম থেকে গণিত বৎসরের আগের বৎসর) এবং A. D.-র অর্থ Anno Domini বা in the year of our Lord অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দ।



নানারকমের ঘড়ি

ঘড়ি নানা রকমের—টাইমপীস, টেঁকঘড়ি, পকেটঘড়ি, হাতঘড়ি, দেওয়াল ঘড়ি (wall clock), অ্যালার্ম ঘড়ি ইত্যাদি। কোন ঘড়ির



টাইমপীস

কাঁটায় এমন জিনিস মাখানো থাকে যার জন্যে অন্ধকারে ঘড়িতে কটা বেজেছে তা জানা যায়। অ্যালার্ম ঘড়িতে আগে থেকে ঠিক করে রাখলে নির্দিষ্ট সময়ে ঘণ্টা বেজে ওঠে। কোন ঘড়ি প্রকাণ্ড বা অতি প্রকাণ্ড, কোনটা একেবারে ছোট।

ফ্রান্সের সেণ্ট পিয়েরের ক্যাথিড্রালের অ্যাস্ট্রনমিক্যাল ক্লক পৃথিবীর অতি বৃহৎ ঘড়ি। এটি ১৮৬৫-১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এর উচ্চতা ১২·১ মিটার, চওড়ায় ৬·০৯ মিটার, গভীরতা ২·৭ মিটার।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত উইসকনসিনের Allen-Bradey Company of Milwankee বাড়িতে যে চারমুখো ঘড়ি আছে সেটি সুবৃহৎ।



প্রজাপতি ঘড়ি (butterfly watch)

ঘড়ির প্রত্যেক মুখের ব্যাস ১২·২৮ মিটার, তার মিনিটের কাঁটা ৬·০৯ মিটার লম্বা।

সবচেয়ে উঁচুতে স্থাপিত চারমুখো ঘড়ি নিউ ইয়র্ক শহরের উইলিয়ামসবার্গ সেভিংস ব্যাঙ্কের ঘড়ি। এটি রাস্তা থেকে ১৩১ মিটার উঁচুতে বসানো আছে।



বিগ বেন

লণ্ডনের ওয়েস্টমিনস্টারের হাউস অব কমনসের

বিগ বেন (Big Ben) ঘড়ি এক বিখ্যাত ঘড়ি। এর মিনিটের কাঁটা ৪.২ মিটার লম্বা। দোলকটির ওজন ৪৫০ পাউণ্ড। ঘণ্টার অঙ্কগুলো .৬০৯৬ মিটার (২ ফুট) লম্বা।

ইংলণ্ডের লিভারপুলে একটা ঘড়ি আছে, তার ডালার ব্যাস ৭.৬ মিটার।

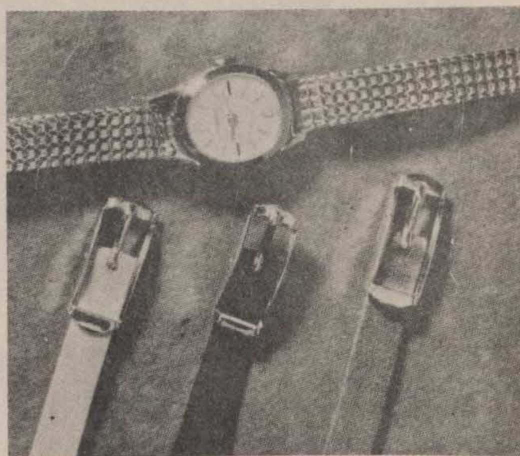
নিউ ইয়র্কের কলগেট কোম্পানির ঘড়ি ১১.৯ মিটার চওড়া।

ওয়াশিংটনের U. S. Naval Research Laboratoryতে ১৯৬৪ সালে সময়-পরিমাপক twin atomic hydrogen masers স্থাপিত হয়। ১৭ লক্ষ বছরে তার ১ সেকেণ্ড সময়ের হেরফের হতে পারে।



উনবিংশ শতাব্দীর একটা জার্মান ঘড়ি

জার্মানির অন্তর্গত ব্যাভেরিয়ার নুরেমবার্গের পিটার হেনলিনের ঘড়ি (Portable clock work time-keeper) সবচেয়ে পুরনো। এটি আনুমানিক ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। এটি বর্তমানে পেনসিলভেনিয়ার অন্তর্গত ফিলাডেলফিয়ার মেমোরিয়াল হলে আছে।



হাতঘড়ি

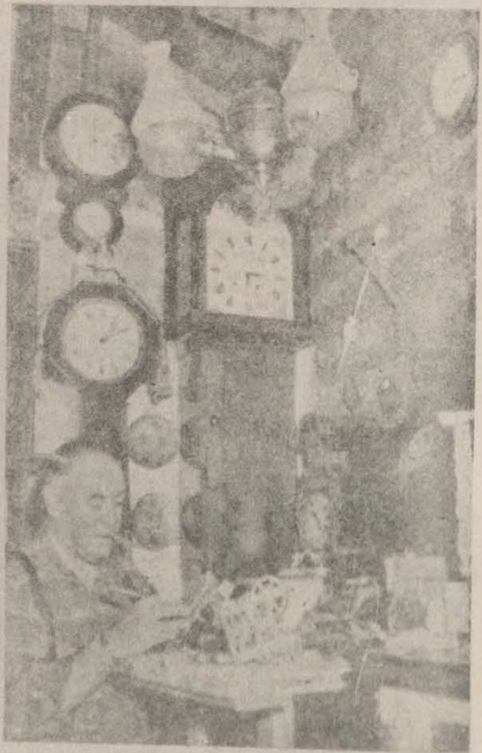
সব চেয়ে পুরনো হাতঘড়ি সুইটজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভার Jacquet Droz ও Leschot এর দুটি ঘড়ি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তৈরী।

সব চেয়ে ছোট ঘড়ি সুইটজারল্যাণ্ডের Jaeger Le Coutre-এর দ্বারা তৈরী একটি ঘড়ি যা লম্বায় ১.২ সেন্টিমিটার ও ০.৪৭৬ সেন্টিমিটার চওড়া। এটির ওজন ০.২৫ আউন্স।

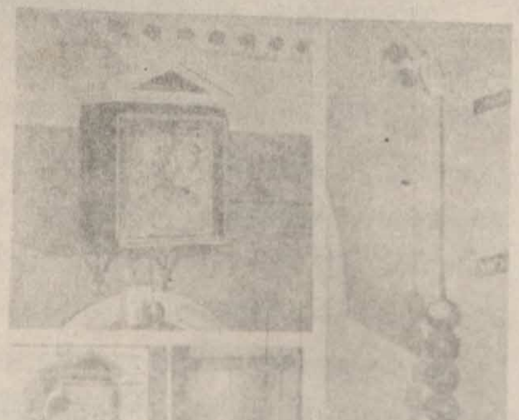
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ক্যালিফোর্নিয়ার জ্যাক উইলির ঘড়ি সংগ্রহের প্রবল বাতিক ছিল। তাঁর সংগ্রহে প্রায় ৪০০ ঘড়ি ছিল।



রোমক দেবী মিনার্ভার মূর্তির সঙ্গে একটি ঘড়ি লাগানো আছে। সেটি তাঁর হাতের ঢাল



জ্যাক উইলির সংগৃহীত ঘড়ি



জেফারসনের ঘড়ি



মিনার্ভার মূর্তির হাতের ঢাল

ঘড়িটি ঠিক ঠিক সময় দেয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট টমাস জেফারসন (Thomas Jefferson, ১৭৪৩-১৮২৬ খ্রী.) একটি অদ্ভুত ঘড়ি তৈরী করিয়েছিলেন। ভুপ্রস্থ কামানের গোলার সাহায্যে এই ঘড়ি চলত।

রত্নখচিত ঘড়ির মূল্য খুব বেশী। তার চেয়ে বেশী দামী অত্যন্ত পুরনো ঘড়ি। লোকে সহস্র সহস্র ডলার বা পাউণ্ড দিয়ে এগুলি কেনে। কখনও কখনও বিভিন্ন জাদুঘরে এগুলি সংরক্ষিত হয়।



ভারতবর্ষে আগে সব ঘড়িই বিদেশ থেকে আসত। আজকাল এদেশে অনেক উৎকৃষ্ট ঘড়ি তৈরির কারখানা হয়েছে। তার ফলে বিদেশ থেকে ঘড়ি আসা খুবই কমে গেছে। ভারতে নির্মিত ঘড়ি উত্তরোত্তর উন্নত হয়ে উঠছে





সংবাদপত্র

আমাদের দেশের নানাস্থানে প্রতিদিন কত ঘটনা ঘটছে। শুধু আমাদের দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে নিত্য নূতন নানা ঘটনা ঘটবার বিরাম নেই। অসংখ্য নদ-নদী, অরণ্য, পর্বত, সাগর-উপসাগর, মরুভূমি নিয়ে পৃথিবী। সেই সব স্থানে অহরহ বিভিন্ন ঘটনা ঘটে থাকে। সকলের মনে সেই সব ঘটনার কথা জানবার জন্যে প্রবল আগ্রহ।

॥ সংবাদপত্র (News paper)॥

সারা রাত অন্ধকারে ঘুমিয়ে থেকে ভোরে মানুষ জেগে ওঠে। ভোরের সোনার আলোয় দশ দিগন্ত ঝলমল করতে থাকে। মানুষ তখন জানতে চায়, কোথায় কী সব ঘটেছে। কিন্তু পৃথিবী তো ছোট নয়। পৃথিবীর নানা দেশ কত দূরে। পৃথিবীর কেন, আমাদের ভারতেরই বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব কম নয়। কাজেই অত দূর দূর জায়গার খবর জানা খুব সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু এই ব্যাপারকে সহজ করেছে সংবাদপত্র—যার ইংরেজী প্রতিশব্দ news-paper অর্থাৎ যে পত্রে বা কাগজে সংবাদ থাকে।

॥ কিছু পয়সা মূল্য হিসাবে দিলে বাড়িতে কাগজ এসে যায় ॥

সংবাদপত্রে থাকে দেশবিদেশের নানা খবর। সকালে উঠেই মানুষ সংবাদপত্রে চোখ বুলোবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়। বাড়িতে বসেই লোকে সংবাদ-পত্র পেয়ে যায়। ফেরিওয়ালা পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে করে বাড়িতে বাড়িতে সংবাদপত্র বা খবরের কাগজ পৌঁছে দিয়ে যায়। তারা সংবাদ-পত্রের অফিস থেকে সংবাদপত্র আনাবার ব্যবস্থা করে। বাড়ির লোকেদের কোন পরিশ্রম করতে



ফেরিওয়ালা সংবাদপত্র বিলি করছে।

হয় না। কিছু পয়সা মূল্য হিসাবে দিলেই হল। কাগজ বাড়িতেই এসে গেল।

॥ সংবাদপত্র প্রকাশে বিপুল মানসিক পরিশ্রম ও দৈহিক প্রয়াস ॥

সংবাদপত্রের অফিস থেকে সংবাদপত্র এনে বাড়িতে বাড়িতে সরবরাহ করার ব্যাপার যত সহজই হোক না কেন, এই সংবাদপত্র প্রকাশের ব্যাপারে যে বিপুল মানসিক পরিশ্রম ও দৈহিক প্রয়াসের প্রয়োজন হয়, তা মোটেই সহজ নয়। সেই দুরূহ ব্যাপারের কথা ভাবলে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়।

॥ সংবাদপত্রের ইতিহাস জানার প্রয়োজনীয়তা ॥

সংবাদপত্রের অফিস থেকে সংবাদপত্র প্রকাশ করার জন্যে যে-সব জটিল কাণ্ডকারখানার প্রয়োজন হয়, সেই সব নানা ধরনের ব্যাপার জানবার আগে আমাদের জানা দরকার সংবাদপত্রের ইতিহাস। সংবাদপত্র সৃষ্টির আগে হয় লিপি ও মুদ্রণের আবিষ্কার। তারও অনেক আগে পৃথিবীর মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে কোন সংবাদ পাঠাতে চাইলে পাথরের পাতলা চাঁইয়ের উপরে তা খোদাই করে পাঠাত বা কোন নির্দেশ বা উপদেশ পাথরে খোদাই করে সাধারণের জন্যে এক জায়গায় রেখে দিত।

পাথর ছাড়া কাদার উপর লিখে তা পুড়িয়ে যে-সব বাণী বা উপদেশ জনসাধারণকে জানানো হত, সে-সবের কিছু কিছু মিশর, ইরান, মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পায় পাওয়া গেছে।



মন্দিরগাত্রে হাইয়্যারোগ্লিফ



॥ হাইয়্যারোগ্লিফ ॥

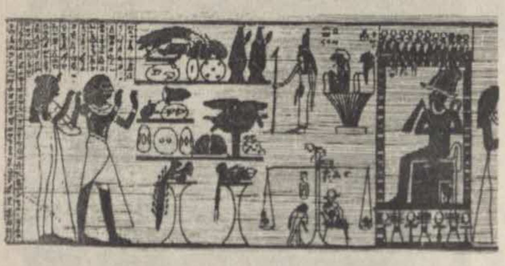
অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মন্দিরগাত্রে বা সমাধির উপরে লোকে ছবি এঁকে ও অক্ষর খোদাই করে অনেক কথা ও ব্যাপার জনসাধারণকে

জানাত। সেই সব ছবি ও লেখা থেকে প্রাচীন-কালের ইতিহাস জানা যায়। মিশরে, মেক্সিকোয়, পেরুতে, মেসোপটেমিয়ায় এই-ধরনের চিত্র ও লিপির সন্ধান মিলেছে। মিশরের চিত্রলিপির নাম হাইয়্যারোগ্লিফ (Hieroglyph)।

॥ প্যাপাইরাস থেকে পেপার ॥



আগেকার দিনে মিশরে নীলনদের উপত্যকায় প্যাপাইরাস (papyrus) নামে এক ধরনের জলজ শরজাতীয় গাছের মজ্জা ফালি ফালি করে কেটে ও চাপ দিয়ে জুড়ে কাগজের মতো করা হত। তার



প্যাপাইরাসের মজ্জায় হাইয়্যারোগ্লিফ

উপর লেখা হত। এই প্যাপাইরাস শব্দ থেকে বর্তমানের পেপার (paper) শব্দের সৃষ্টি। অবশ্য এখন খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে, শুধু মিশরে নয়, অন্যান্য বহু স্থানেও প্যাপাইরাস গাছ জন্মে থাকে। অবশ্য, সেই সব স্থানে প্যাপাইরাস থেকে কাগজের মতো কিছু তৈরি করা হয় নি। প্যাপাইরাস থেকে তৈরী কাগজের মতো বস্তুর উপরে লেখা অনেক কথা পাওয়া গেছে। সেগুলি প্রাচীনকালের ইতিহাসের কথা।

এভাবে পাথরই হোক, পোড়া মাটির টালিই হোক অথবা প্যাপাইরাস থেকে তৈরী কাগজের মতো জিনিসই হোক, সে-সবের উপর লিখে দূর দূরান্তরে প্রেরণ করা কোন দিন সম্ভব হয় নি। সে-সবে সংবাদজাতীয় কিছু থাকলেও সেগুলিকে সংবাদবাহক পত্রের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

॥ রোজেটা স্টোন ॥

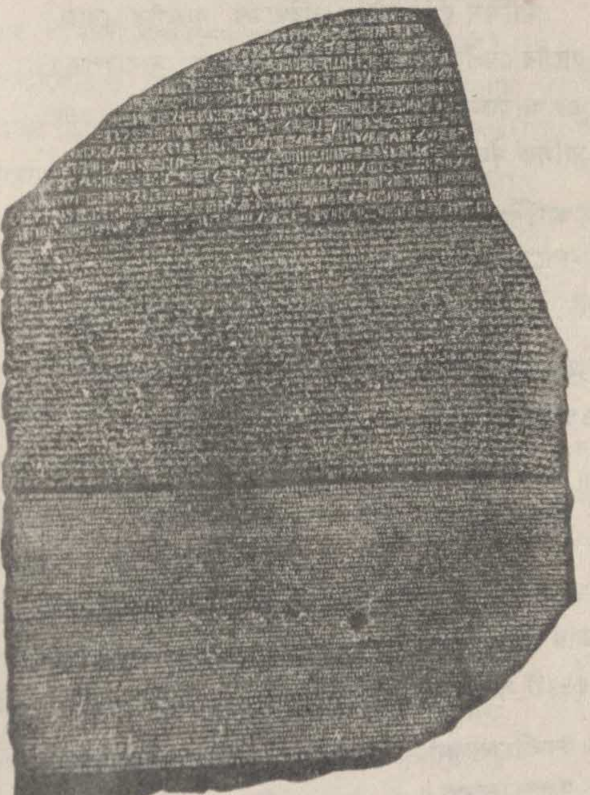
মিশরের (ঈজিপ্টের) রোজেটা-নামক স্থানে একটি কালো আগ্নেয় শিলাপ্রস্তরের উপরে হাইয়্যারোগ্লিফিক, ডিমটিক ও গ্রীক অক্ষরে ক্ষোদিত লিপি ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের দ্বারা আবিষ্কৃত হয়। এটি লম্বায় ৯১৪৪ মিটার। পঞ্চম টলেমি এপিফেনিস (Ptolemy V. Epiphanes, ২০৫-১৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর পুরোহিতদের নির্দেশ এতে আছে। এই মূল্যবান্ প্রস্তরটি বর্তমানে ব্রিটিশ জাদুঘরে আছে। এই প্রস্তরটি রোজেটা প্রস্তর (Rosetta Stone) নামে প্রসিদ্ধ।

॥ গেজেট ॥

ইটালীর অন্তর্গত ভেনিসে ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গেজেট নামে খুব কম দামের সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। সংবাদপত্রটির মূল্য ছিল ১ গেজেটা (Gazzetta)। গেজেটা ইটালীয়ান মুদ্রা, এক ফার্দিং-এর চেয়ে কম দামী। তাই থেকে গেজেট কথাটির উদ্ভব। ওই সময়ে জার্মানিতেও সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে জার্মানি ও ইটালীতে ছোট বড় নানা আকারের অনেক সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। প্রায় সংবাদপত্রই ফেরি-ওয়ালারা পথে পথে ফেরি করে বেড়াত। সেই সব কাগজের দেখাদেখি ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান ও ইটালীয় সংবাদপত্র থেকে সংবাদ আহরণ করে সে-সবের ইংরেজী অনুবাদ করে প্রকাশ করা হত।

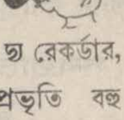
॥ গ্রেটব্রিটেনে সংবাদপত্রের প্রকাশ ॥

রানী অ্যানের সময়ে বহু ইংরেজী সংবাদপত্র



রোজেটা স্টোন

প্রকাশিত হয়। লণ্ডনে ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৫৩টি সংবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই নভেম্বর যে লণ্ডন গেজেট (পূর্বের নাম অক্সফোর্ড গেজেট) প্রকাশিত হয়, তা এখনও নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে থাকে। দ্য টাইম্স্ প্রথমে দ্য ডেলী ইউনিভারসাল রেজিস্টার নামে ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। পরে ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তার নাম হয় দ্য টাইম্স্। দ্য ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের প্রথম প্রকাশকাল ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে দৈনিক সংবাদপত্ররূপে এর প্রকাশ। দ্য স্কচম্যানের প্রতিষ্ঠা-বৎসর ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দ। দৈনিক সংবাদপত্র হিসাবে এর প্রকাশ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। দ্য গ্ল্যাসগো অ্যাডভারটাইজার সর্বশ্রেষ্ঠ স্কটিশ সংবাদপত্র। এটি ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্য গ্লোব সান্ধ্য সংবাদপত্র হিসাবে প্রকাশিত হতে থাকে। দ্য বেলফাস্ট নিউজ লেটার ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দৈনিক সংবাদপত্র দ্য পাবলিক লেজারের প্রকাশকাল ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুন।



॥ যুক্তরাজ্যের সংবাদপত্র ॥

নিউজ ক্রনিক্‌ল্, ডেলি এক্সপ্রেস, দ্য রেকর্ডার, ইয়র্কশায়ার পোস্ট, ডেলি হেরাল্ড প্রভৃতি বহু দৈনিক সংবাদপত্র ইংল্যাণ্ডে প্রকাশিত হয়। দি অবজারভার ও সানডে টাইম্স্ রবিবারের কাগজ। দি অবজারভার ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর প্রকাশিত হয়। এটি যুক্তরাজ্যের সর্বপুরাতন রবিবারের কাগজ। সাপ্তাহিক কাগজ স্পেক্টেটর, স্টেট্‌স্‌ম্যান অ্যাণ্ড নেশন, টাইম অ্যাণ্ড টাইড, দি ইকনমিস্ট, দ্য লিস্‌নার, টাইম্স্ উইকলী রিভিউ, ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান উইকলী প্রভৃতি ইংল্যাণ্ডের নাম-করা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। এ ছাড়া আরো বহু দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক প্রভৃতি সংবাদপত্র ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাণ্ড ও আয়ার্ল্যাণ্ড থেকে প্রকাশিত হয়।

॥ যুক্তরাজ্যের সর্বপুরাতন সংবাদ-পত্র ॥

যুক্তরাজ্যের সর্বপুরাতন সংবাদপত্র লয়েড্‌স্ লিস্ট (Lloyd's List)। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি সাপ্তাহিক ও ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে অর্ধসাপ্তাহিক হিসাবে প্রকাশিত হয়।

॥ বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্রের প্রকাশ ॥

জার্মানি, রাশিয়া, ইটালী, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ড্‌স্, ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, বেলজিয়াম, স্পেন, পোর্তুগাল, যুগোশ্লাভিয়া, ফিনল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক, ইরান, ইরাক, ইজরায়েল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, চীন, জাপান, কোরিয়া, ফিলিপিন্‌জ্, ভিয়েতনাম, দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশ প্রভৃতি স্থানে অগণিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে।

॥ সর্বপ্রাচীন সংবাদপত্র ॥

১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Post och Inrikes Tidningar পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সংবাদপত্র, যা এখনও প্রকাশিত হয়ে থাকে। এটি রয়্যাল সুইডিশ অ্যাকাডেমি অব লেটার্স থেকে প্রকাশিত হয়।

॥ সর্বপ্রাচীন বাণিজ্যিক সংবাদপত্র ॥

নেদারল্যাণ্ডসের Haarlems Dagblad/ Oprechte Haarlemsche Courant পৃথিবীর সর্বপুরাতন বাণিজ্যিক সংবাদপত্র।

॥ সব চেয়ে বেশী ওজনের কাগজ ॥

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই অক্টোবর রবিবারের নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্ সংবাদপত্রের ওজন ছিল ৩·৪০ কেজি। এতে ৯৪৬ পৃষ্ঠা ছিল ও ১২ লক্ষ লাইন বিজ্ঞাপন ছিল।

॥ বৃহত্তম সংবাদপত্র ॥



নিউ ইয়র্কের দ্য কনস্টেলেশ্‌ন্-নামক সংবাদ-পত্রের আয়তন ছিল ১৩০ × ৮৯ সে.মি.। এটি জর্জ রবার্টস্ কর্তৃক ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। আয়তনে পৃথিবীর মধ্যে এটিই সব চেয়ে বড়।

॥ ক্ষুদ্রতম সংবাদপত্র ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওরিগনের অন্তর্গত রোজ-বার্গের ডেলী ব্যানার পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম সংবাদপত্র। এর আয়তন ছিল ৭·৬ × ৯·৫ সেন্টিমিটার। এর মাসিক মূল্য ছিল মাত্র ২৫ সেন্ট।

॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দৈনিক সংবাদ-পত্রের সংখ্যা ॥

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের হিসাবে দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইংরেজী দৈনিক সংবাদপত্রের সংখ্যা ১৭৬৯।

॥ সংবাদপত্রের সব চেয়ে বেশী পাঠক ॥

সব চেয়ে বেশী সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা দেখা যায় সুইডেনে। সেখানে প্রতি হাজার জন পিছু ৫৬৪টি সংবাদপত্র বিক্রীত হয়।

॥ সর্বাপেক্ষা প্রবীণ সংবাদপত্র-সম্পাদক ॥

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে ২১শে এপ্রিলের হিসাবে দেখা যায়, দ্য ক্রিশ্চান হেরাল্ডের প্রধান সম্পাদক ডঃ টমাস রিড্‌ল্ (১৮৮৬ সালে জন্ম) ৯৫ বৎসর বয়সেও কাগজের সম্পাদনায় রত।

॥ সংবাদপত্রের প্রচারসংখ্যা ॥

প্যারিসের লে পেটিট জার্নালের প্রচারসংখ্যা ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে হয় দশ লক্ষ। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে দ্য ডেলি মেলের প্রচারসংখ্যা হয় দশ লক্ষ। বর্তমানে জাপানের বিখ্যাত দৈনিক সংবাদপত্র Yomiuri Shimbun-এর প্রচারসংখ্যা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১লা এপ্রিলের হিসাবে দেখা যায়, এর প্রচারসংখ্যা ১,৩৭,৪১,৯২১। এর মধ্যে সান্ধ্য সংস্করণের প্রচারসংখ্যা ৪৯,৫৬,৪৪৪ এবং প্রভাতী সংস্করণের প্রচারসংখ্যা ৮৭,৮৫,৪৭৭। যুক্তরাজ্যের দ্য নিউজ অব দ্য ওয়ার্লড-নামক সংবাদ পত্রের বিক্রয়সংখ্যা ৪১,৯৭,৬৫২ (১৯৮০)। যুক্ত-রাজ্যের দৈনিক সংবাদপত্র দ্য সান-এর বিক্রয়-সংখ্যা ৩৭,৪১,৩৭৩। ভারতে আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচারসংখ্যা সর্বাধিক—সাড়ে চার লক্ষের উপর।

॥ বঙ্গদেশে সংবাদপত্রের প্রকাশ ॥

ভারতবর্ষের প্রথম ইংরেজী সংবাদপত্র অগস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'। এটি ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য বাংলা ভাষায় 'বাঙ্গালা গেজেট' প্রকাশ করেন। তার সাত দিন পরে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে মে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে 'সমাচার দর্পণ' প্রকাশিত হয়। দুটিই সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। বাংলা প্রথম মাসিক পত্রের নাম 'দিগ্ দর্শন'। মার্শম্যান সাহেবের সম্পাদনায় ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুরের ছাপাখানা থেকে এটি প্রকাশিত হয়।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে জন বুল (John Bull) নামে যে সংবাদপত্রটি প্রকাশিত হয় পরে তার নাম হয় দি ইংলিশম্যান।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সমাচার দর্পণ বাংলা ও ইংরেজী দুই ভাষাতে প্রকাশিত হতে থাকে। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে পত্রিকাটি হয় অর্ধ-সাপ্তাহিক।

'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা প্রথমে ছিল সাপ্তাহিক, পরে সপ্তাহে তিনবার এটি প্রকাশিত হত। শেষে ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এটি দৈনিক সংবাদপত্র হয়ে দাঁড়ায়। এই কাগজই বাংলার প্রথম দৈনিক খবরের কাগজ।

॥ সংবাদপত্রের উন্নতি ॥

আগে সংবাদপত্রে শুধু সংবাদ থাকত। ক্রমশঃ তাতে সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন, মনীষীদের জীবনকথা, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি প্রকাশিত হতে থাকত। প্রথম দিকে কাগজের পৃষ্ঠা-সংখ্যা কম থাকত। ছাপাও উন্নত ছিল না। পরে ক্রমশঃ পৃষ্ঠাসংখ্যার বৃদ্ধি হয়, কাগজ ও মুদ্রণ উন্নত ধরনের হয়েছে।

॥ প্রথম বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র ॥

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে 'নিত্যপ্রকাশ' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। অনেকে বলেন, এটিই বাংলার প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র। সমাচার দর্পণ দৈনিক সংবাদপত্র রূপে বার হওয়ার আগেই নাকি এটির প্রকাশ।

॥ বিভিন্ন ভাষায় ভারতীয় সংবাদ-পত্রের প্রকাশ ॥

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ৮৩টি ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তন্মধ্যে ৬৭টি ভাষার বিশেষ প্রচলন নেই।

॥ ভারতের সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রের সংখ্যা ॥

১৯৭৬ সালের ডিসেম্বর মাসের হিসাবে দেখা

যায়, ভারতের সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের সংখ্যা ১৩,৩২০। তন্মধ্যে মহারাষ্ট্র থেকে প্রকাশিত হয় ১,৯৪৮টি। দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হয় ৪,২২০টি। দৈনিক সংবাদপত্র ছিল ৮৭৫টি, আর ৩,৮০১টি ছিল সাপ্তাহিক। ৬টি প্রধান ভাষায় প্রকাশের সংখ্যা—ইংরেজী ২,৭৬৫টি (প্রচারসংখ্যা ৭৮,২৮,০০০), ৩,২৮৯টি হিন্দী (প্রচার-সংখ্যা ৭৭,৩৮,০০০)। প্রায় ১১৫টি সংবাদপত্রের প্রতিটির সংখ্যা ৫০,০০০-এর উপর ছিল। মোট প্রচারসংখ্যা ছিল ৩,৪০,০০,০০০।

পরে সেই সংখ্যা দাঁড়ায় হিন্দী ৪৬১০, ইংরেজী ৩২৮৮, বাংলা ১২৫৯, উর্দু ১১৮০, মারাঠী ৯৮৪, তামিল ৭৫৫, মালয়ালম ৬৯৭, গুজরাটী ৬৭৪, কানাড়ী ৫৫৬ ও তেলেগু ৫০৩।

॥ বহুকাল ধরে যে-সব সংবাদপত্র চলে আসছে ॥

বহুকাল ধরে চলে আসছে—বোম্বাই সমাচার (গুজরাটী। ১৮২২), টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া (ইংরেজী। ১৮৩৮), ক্যালকাটা রিভিউ (ইংরেজী ত্রৈমাসিক। ১৮৪৪), গার্ডিয়ান (ইংরেজী পাক্ষিক। ১৮৫১), বেলগাঁও সমাচার (মারাঠী সাপ্তাহিক। ১৮৬৩), অমৃতবাজার পত্রিকা (ইংরেজী দৈনিক। ১৮৬৮), দ্য স্টেট্স্ম্যান (ইংরেজী দৈনিক। ১৮৭৫), হিন্দু (১৮৭৮) ইত্যাদি।

॥ সংবাদপত্র প্রকাশে পৃথিবীতে ভারতের স্থান ॥

UNESCO-এর বিবরণী থেকে জানা যায়, সংখ্যার দিক্ দিয়ে দৈনিক সংবাদপত্র মুদ্রণে পৃথিবীতে ভারতের স্থান দ্বিতীয়।

॥ বর্তমানে ভারতের প্রসিদ্ধ পত্রিকা ॥

বর্তমানে ভারতের বিখ্যাত পত্রিকা—আনন্দ-বাজার পত্রিকা (কলকাতা), যুগান্তর (কলকাতা), স্টেট্স্ম্যান (কলকাতা), বসুমতী (কলকাতা), আজকাল (কলকাতা), সত্যযুগ (কলকাতা), ট্রিবিউন, নর্দার্ন ইণ্ডিয়া পত্রিকা (এলাহাবাদ), হিন্দু (মাদ্রাজ), টাইমস অব ইণ্ডিয়া (বোম্বাই), বিশ্বামিত্র (কলকাতা, পাটনা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী ও নাগপুর), হিন্দুস্থান টাইম্স্ (নিউ দিল্লী), লীডার (এলাহাবাদ), বোম্বাই সমাচার (গুজরাট), পাইওনীয়ার (লক্ষ্ণৌ), ফ্রীপ্রেস জার্নাল (বোম্বাই), ন্যাশনাল হেরাল্ড (লক্ষ্ণৌ), ট্রিবিউন (সিমলা), দ্য সার্চলাইট ও ইণ্ডিয়ান নেশন (পাটনা), অন্ধ্রপ্রভা (অন্ধ্র), আসাম ট্রিবিউন ও অসমীয়া (গৌহাটি), দ্য টেলিগ্রাফ (কলকাতা) ইত্যাদি।

॥ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান ॥

বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টেলিগ্রাম করে, বেতার মারফত, টেলিপ্রিণ্টারে সংবাদপত্র অফিসে সংবাদ পাঠায়। সেই সব সংবাদ সংবাদপত্রে সন্নিবেশিত করে ছাপা হয়। দিনরাতের সকল সময়ে সংবাদপত্রের অফিস খোলা থাকে।

ইংল্যাণ্ডের রয়টার্স সার্ভিস, গ্লোব এজেন্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব আমেরিকা, ইউনাইটেড প্রেস অব আমেরিকা, রাশিয়ার টাস এজেন্সী, ভারতের প্রেস ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়া (P. T. I.), ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া (U. P. I.) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান।

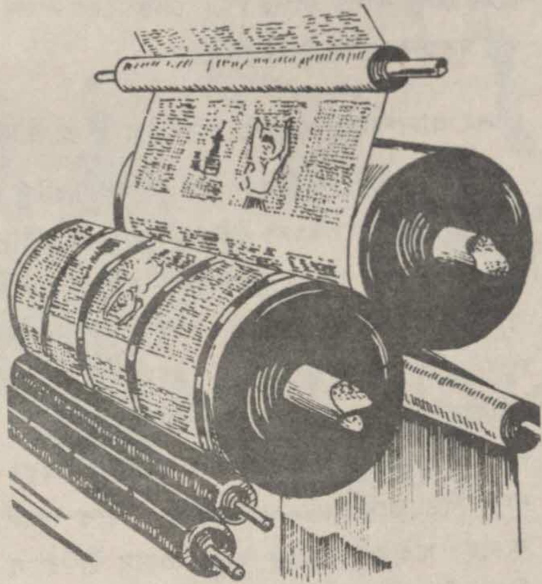
এছাড়া ঈস্টার্ন নিউজ এজেন্সী (বাংলাদেশ), ওয়াশিংটন পোস্ট নিউজ এজেন্সী (যুক্তরাষ্ট্র), ঘানা নিউজ এজেন্সী (ঘানা), কেনিয়া নিউজ এজেন্সী (কেনিয়া) প্রভৃতি বহু সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে।

এ জন্যে সংবাদপত্রসমূহকে নির্ধারিত মূল্য দিতে হয়।



॥ স্টপ প্রেস ॥

আগে সাধারণ ফ্ল্যাট মেশিনে সংবাদপত্র ছাপা হত। বর্তমানে প্রায় সকল বড় খবরের কাগজের

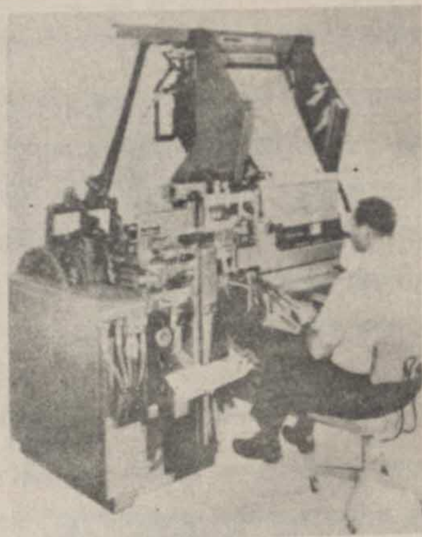


রোটারি মেশিন

অফিসে অতিশয় উন্নত ধরনের বৈদ্যুতিক রোটারি মেশিন আছে। লাইনো টাইপে কম্পোজ করে সেই সব মেশিনে দ্রুত ছাপা হয়ে থাকে। ছাপা প্রায় শেষ হওয়ার কিছু আগে কোন জরুরী সংবাদ এলে ছেপে দেবার ব্যবস্থা হয়। তার জন্যে আগে থেকেই কিছুটা জায়গা খালি রেখে দেওয়া হয়। সেই খালি জায়গায় দরকারী খবর সন্নিবেশিত করে ছাপার ব্যবস্থা হয়। Stop Press (বাংলায় 'শেষ সংবাদ') হেডিং দিয়ে সেই খবর ছাপা হয়।

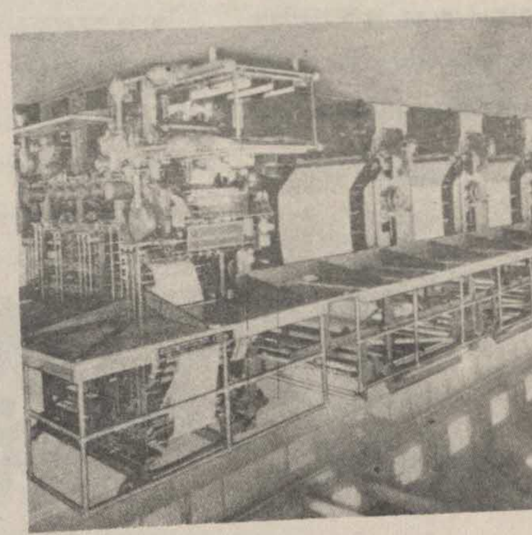
॥ সংবাদপত্র অফিসের কর্মচারী ॥

সংবাদপত্র অফিসে কম্পোজিটার, লাইনো



লাইনো টাইপ মেশিন

অপারেটার, ব্লক মেকার, আর্টিস্ট, মেশিনম্যান প্রভৃতি থাকেন। সম্পাদকীয় বিভাগে সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, প্রুফরীডার, অনুবাদক প্রভৃতি থাকেন।



উন্নত মুদ্রাযন্ত্র

॥ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা ॥

সাংবাদিকতা শিক্ষার জন্যে বিভিন্ন দেশে সুব্যবস্থা আছে। ভারতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষা দেওয়া হয় ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে ডিগ্রী ও ডিপ্লোমা দেওয়া হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা শিক্ষাদানের জন্যে দুবছরের ডিগ্রী কোর্স চালু আছে।

॥ বিভিন্ন কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

সারা পৃথিবী থেকে সংবাদসরবরাহ প্রতিষ্ঠান মারফত সংবাদপত্র অফিসে রাতদিন খবর আসে। তাছাড়া বড় বড় খবরের কাগজের নিজস্ব প্রতিনিধি, নিজস্ব ক্যামেরাম্যান থাকেন। তাঁরা বিভিন্ন দেশে গিয়ে ভূমিকম্প, বন্যা, যুদ্ধ প্রভৃতির ধ্বংসলীলা দেখে সংবাদ লিখে পাঠান। প্রাণের মায়া না করে যুদ্ধের নানা ছবি তোলেন। গহন অরণ্য, দুর্গম মেরু প্রদেশ, উত্তাল সমুদ্র প্রভৃতি স্থানে গিয়ে সংবাদ আহরণ করেন, ছবি তোলেন। এ জন্যে অনেকের প্রাণহানি ঘটেছে। তবু তাঁরা জনস্বার্থের খাতিরে তাঁদের মহান্ কর্ম থেকে বিরত হন না।

॥ সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ ॥

সংবাদপত্র মুদ্রণের অধিকাংশ কাগজ কানাডা, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া, রাশিয়া, পোলাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ থেকে আসে। ভারতের নেপানগরে ৭৫ হাজার টনের উপর কাগজ উৎপন্ন হয়। ভেলোরেও সংবাদ-পত্র মুদ্রণের কাগজ তৈরী হচ্ছে।

॥ সংবাদপত্রসমূহের অমূল্য প্রয়াস ॥

ভারত আজ স্বাধীন। বহু বৎসর ব্রিটিশের অধীন থাকবার পর ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে। এ জন্যে সহস্র সহস্র স্বাধীনতাসংগ্রামীদের অশেষ নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে, অপরিসীম ক্লেশ ভোগ করতে হয়েছে, বহু মহাপ্রাণ সংগ্রামী মৃত্যুবরণ করেছেন। স্বাধীনতা খুব সহজে আসে নি। ভারতের সংবাদপত্রসমূহও নানাভাবে অকুণ্ঠ সহযোগিতা করে স্বাধীনতা অর্জনের পথকে সুগম করেছে। সংবাদপত্রসমূহের অমূল্য প্রয়াস ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।



ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম

আফ্রিকা ও আমেরিকার নানা দেশ, ভারত, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতিকে পরাধীন করে সে-সব দেশের সম্পদ্ বহুকাল ধরে যারা লুণ্ঠন করেছিল তাদের মধ্যে ইংরেজ জাতি অন্যতম। স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, ডেনমার্ক প্রভৃতি দেশের মতো ইংল্যাণ্ড অন্যায়ভাবে অন্যান্য দেশকে পরাধীন করে শত শত কোটি টাকা নিজেদের দেশে নিয়ে গেছে।

ইংরেজ জাতি ভারতে বাণিজ্য করতে এসে ছলে বলে কৌশলে ভারতকে পরাধীন করে দুশো বছরের অধিক কাল লুণ্ঠন চালিয়েছে, অত্যাচার-উৎপীড়নে ভারতবাসীকে পর্যুদস্ত করেছে।

শেষ পর্যন্ত নির্যাতিত ভারতসন্তান ভারতকে স্বাধীন করবার জন্যে সংগ্রাম চালাতে শুরু করে। বহু ক্লেশবরণ, বহু লোকের ফাঁসি, বহু সম্পত্তি ধ্বংসের পর ভারত শেষ পর্যন্ত ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট স্বাধীন হয়, ভারতের আকাশে তার নিজস্ব তিনরঙা পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বিরাট ও বিচিত্র লোমহর্ষক ঘটনায় পূর্ণ।

॥ সিপাহী বিদ্রোহ ॥

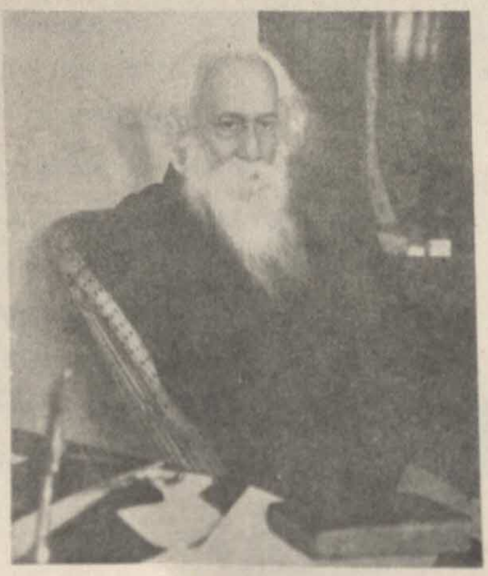
ভারতে ইংরেজ রাজত্ব শুরু হওয়ার একশো

বছর পরে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। ব্যারাকপুরে প্রথম সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। তারপর সেই বিদ্রোহ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজরা বহু কষ্টে সেই বিদ্রোহ দমন করে। অনেকে বলেন, এই বিদ্রোহই ভারতে প্রথম স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াস। ('ইতিহাস—ভারতীয় ও বৈদেশিক' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

তারপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কবি, ঔপন্যাসিক, সাহিত্যিক, দেশনেতা নানাভাবে ভারতের মনোবেদনা প্রকাশ করতে থাকলেন, ভারতবাসীকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্যে প্রেরণা যোগাতে থাকলেন।

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িই দেশকে নানাভাবে স্বাদেশিকতায় উদ্বুদ্ধ করে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিটি সন্তানই দেশে বিভিন্নভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা যোগান। প্রথমেই নাম করতে



রবীন্দ্রনাথ

হয় মহামনীষী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। তিনি তাঁর লেখা অজস্র গান, কবিতা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামের বীজ উপ্ত করেন। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১ খ্রী.)-রচিত গান গেয়ে, গানের ছত্র উচ্চারণ করতে করতে বিপ্লবী ভারত-সন্তানেরা হাসিমুখে ব্রিটিশের নির্যাতন সহ্য করেছে, জেল খেটেছে, ফাঁসির মঞ্চে প্রাণ উৎসর্গ করেছে।

॥ রাজা রামমোহন রায় ॥

রামমোহন (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রী.) বিলাতে গিয়ে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবাসীর দুঃখদুর্দশার কথা ব্রিটিশ সরকারের সামনে তুলে ধরেন। তিনি ছিলেন



রামমোহন রায়

একজন উচ্চশ্রেণীর সমাজসংস্কারক। তাঁরই চেষ্টায় দেশ থেকে বীভৎস সতীদাহ-প্রথা উঠে যায়। তিনি ধর্মের নামে যে-সব কুসংস্কার চলছিল, তার মূলে কুঠারাঘাত করেন।

॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

হেমচন্দ্র (১৮২৪-১৯০৩ খ্রী.) তাঁর বহু কবিতার

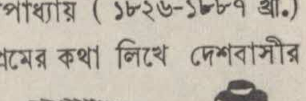


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম প্রচার করেন।

॥ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৭ খ্রী.) তাঁর কবিতায় স্বদেশপ্রেমের কথা লিখে দেশবাসীর মনে প্রেরণা যোগান।



॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

স্বাধীন ভারতের অন্যতম জাতীয় সংগীত 'বন্দে মাতরম্'-এর স্রষ্টা সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর অমর উপন্যাস আনন্দমঠের মধ্য দিয়ে স্বাদেশিকতার বাণী প্রচার করেন। 'বন্দে মাতরম্' শব্দ উচ্চারণ করে আসমুদ্রহিমাচল স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা সংগ্রামে রত হয়েছে, জেল খেটেছে, ফাঁসি গিয়েছে।



বঙ্কিমচন্দ্র

॥ স্বামী বিবেকানন্দ ॥

পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শ্রেষ্ঠ শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২ খ্রী.) তাঁর নিরলস কর্ম-



বিবেকানন্দ

সাধনার মধ্য দিয়ে জাতির মনকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে গেছেন।

॥ ভগিনী নিবেদিতা ॥

ভগিনী নিবেদিতা (১৮৬৭-১৯১১ খ্রী.) ছিলেন একজন ইংরেজ মহিলা (মিস মার্গারেট এলিজাবেথ



ভগিনী নিবেদিতা

নোবল)। তিনি স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও এদেশে থেকে প্রধানতঃ বিপ্লবীদের বিভিন্নভাবে তাদের কার্যকলাপে সহায়তা করেন।

॥ রাজনারায়ণ বসু ॥

প্রসিদ্ধ লেখক ঋষি রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯ খ্রী.) 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারণী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীনতা সংগ্রামের স্পৃহা জাগিয়ে তোলেন।

॥ শিশিরকুমার ঘোষ ॥



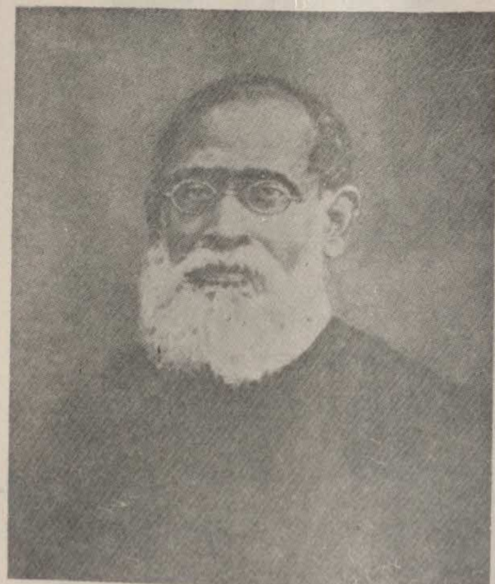
অমৃতবাজার পত্রিকার প্রথম সম্পাদক প্রসিদ্ধ সাংবাদিক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ 'ইণ্ডিয়া লীগ'-নামক জাতীয় প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

॥ আনন্দমোহন বসু ॥

প্রসিদ্ধ জাতীয়তাবাদী নেতা আনন্দমোহন বসু (১৮৪৭-১৯০৬ খ্রী.) ছিলেন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পৃষ্ঠপোষক। তিনি ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ কংগ্রেসে সভাপতিত্ব করেন।

॥ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্মরণীয় নেতা



সুরেন্দ্রনাথ

সুরেন্দ্রনাথ (১৮৪৮-১৯২৫ খ্রী.) 'ভারত সভা'র প্রতিষ্ঠা করেন (১৮৮৩ খ্রী.)। তাই থেকে ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক সমিতি কংগ্রেসের উদ্ভব (১৮৮৫ খ্রী.)। তিনি কংগ্রেসের পুনা অধিবেশনে (১৮৯৬ খ্রী.) ও আমেদাবাদ অধিবেশনে (১৯০২ খ্রী.) সভাপতিত্ব করেন। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন

বঙ্গদেশকে দুভাগে ভাগ করেন। তার ফলে দেশে তীব্র প্রতিবাদ আন্দোলন দেখা দেয়। লর্ড কার্জন বলেন, 'Partition of Bengal is a settled fact'। তার উপযুক্ত জবাবে সুরেন্দ্রনাথ বলেন, 'I will unsettle the settled fact'। হয়েও ছিল তাই। সারা দেশ জুড়ে যে প্রচণ্ড বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলন শুরু হয়, তাতে শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়ে যায়।

॥ উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সভাপতি (১৮৯২ খ্রী.) হন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (W. C. Bonnerji, ১৮৪৪-১৯০৬ খ্রী.)। ইংল্যাণ্ডে কংগ্রেস কমিটি তিনিই প্রতিষ্ঠা করেন।

॥ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ॥

ভারতের জাতীয় রাজনৈতিক মহাসভা কংগ্রেস প্রধানতঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে অ্যালান অক্টেভিয়ান হিউম নামে এক ইংরেজ সিভিলিয়ানের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে। তখনকার দিনে কংগ্রেসের মধ্যে দুটো দল ছিল—নরমপন্থী ও চরমপন্থী। নরমপন্থীরা আবেদন নিবেদনের মাধ্যমে আন্দোলন করার পক্ষপাতী ছিলেন। চরমপন্থীরা প্রচণ্ড আন্দোলন, প্রয়োজন হলে সশস্ত্র বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়াসী ছিলেন। লালা লাজপত রায়, বালগঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতি নেতা চরমপন্থী দলে ছিলেন।

। লালা লাজপত রায় ॥

পাঞ্জাবের জননেতা লালা লাজপত রায় (১৮৫৬-১৯২৮ খ্রী.) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় ও ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে জাতীয় কংগ্রেসের



লাজপত রায়

অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি দীর্ঘকাল কারাদণ্ড ভোগ করেন।

॥ বালগঙ্গাধর তিলক ॥

মহারাষ্ট্রের বিশিষ্ট জননায়ক বালগঙ্গাধর তিলক বা টিড়ক (১৮৫৭-১৯২০ খ্রী.) দেশের মানুষকে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি 'শিবাজী উৎসব' প্রবর্তন করেন ও কারাগারে দীর্ঘদিন কারাবাস করেন।

॥ বিপিনচন্দ্র পাল ॥

অসাধারণ বাগ্মী বিপিনচন্দ্র পাল (১৮৫৫-১৯৩২ খ্রী.) তাঁর নিরলস কর্মসাধনা ও উদ্দীপনাময় ভাষণের মধ্য দিয়ে দেশবাসীর মনে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রেরণা সঞ্চার করেছেন।

গোপালকৃষ্ণ গোখলে ॥

মহারাষ্ট্রীয় জননেতা গোপালকৃষ্ণ গোখলে



বিপিনচন্দ্র পাল

(১৮৬৬-১৯১৫ খ্রী.) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের



গোপালকৃষ্ণ গোখলে

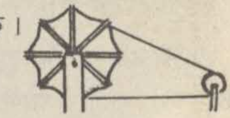
বেনারস অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন এবং নানা-ভাবে দেশবাসীকে, বিশেষ করে তরুণ ও যুবকদের ইংরেজের অত্যাচার-নিপীড়নকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টায় ব্রতী করে তোলেন।

॥ দাদাভাই নওরোজী ॥

প্রসিদ্ধ পার্শী জননায়ক দাদাভাই নওরোজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায়, ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে ও ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় তিনি অন্যতম প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

। পণ্ডিত মতিলাল নেহ্‌রু।

জওহরলালের পিতা মতিলাল নেহ্‌রু (১৮৬১-১৯৩১ খ্রী) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে অমৃতসরে ও ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের 'স্বরাজ্য পার্টি' গঠনে তিনি ছিলেন প্রধান সহায়ক।

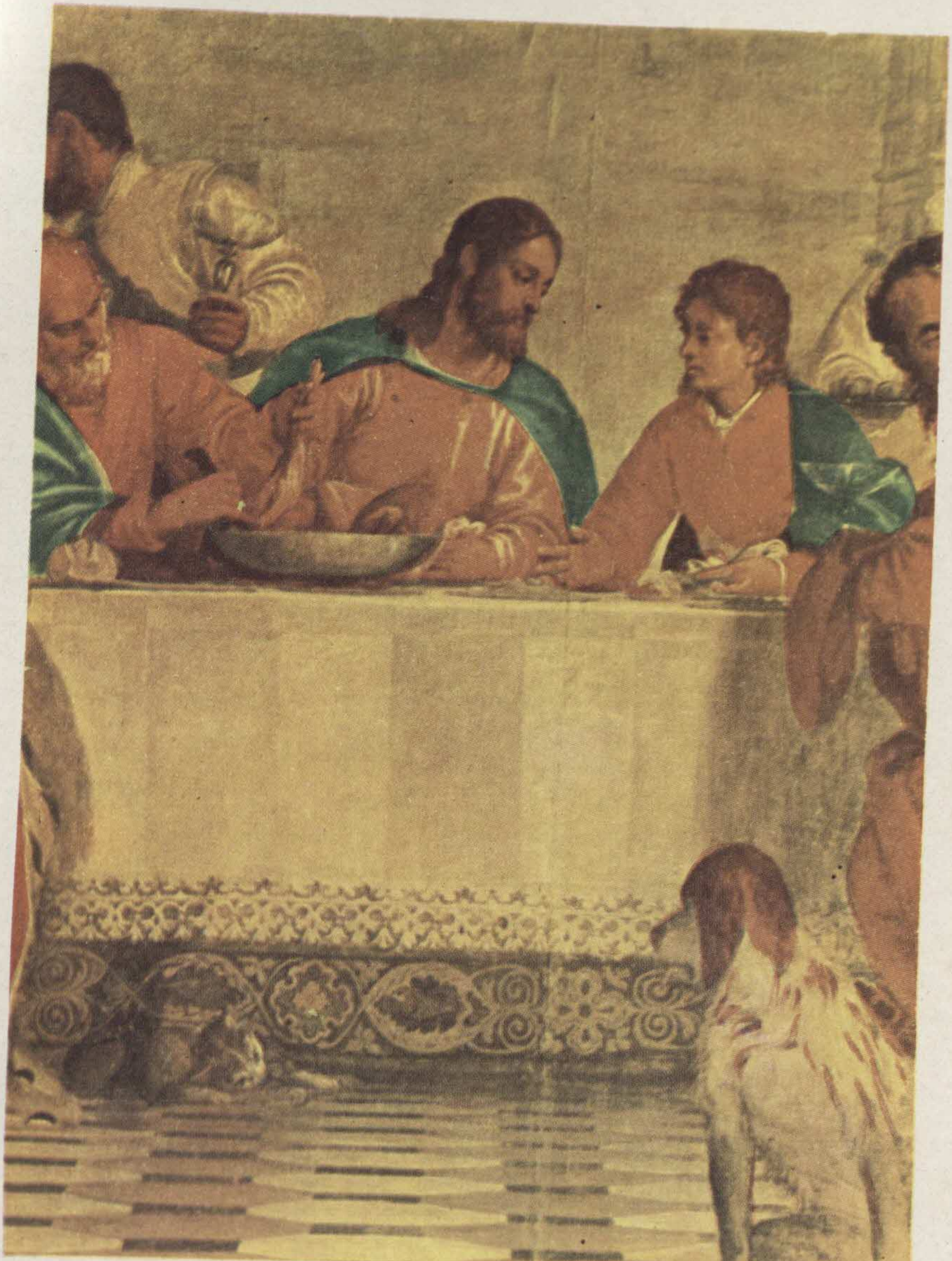


॥ মহাত্মা গান্ধী।

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রী.) অসহযোগ আন্দোলনের স্রষ্টা। প্রধানতঃ তাঁর



মহাত্মা গান্ধী চরকা কাটছেন

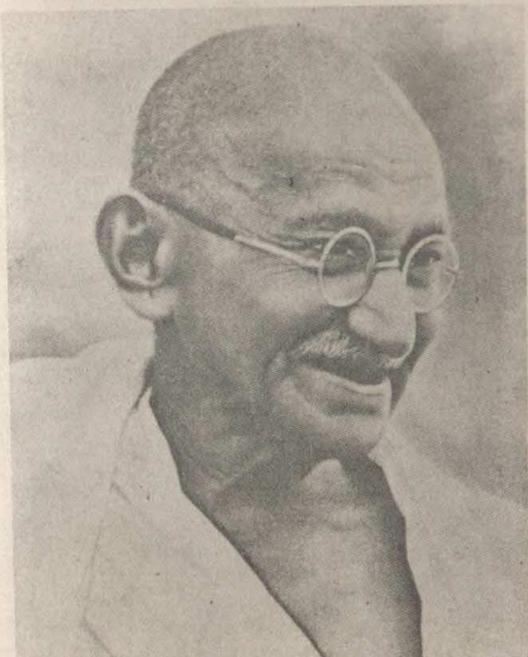


সশিষ্য যীশুখ্রীষ্ট

যীশু খ্রীষ্ট খ্রীষ্টান ধর্মের প্রবর্তক। প্যালেস্টাইনের রাজধানী জেরুজালেমের কাছে বেথলেহেম-নামক গ্রামে এক সূত্রধরের গৃহে তিনি আবির্ভূত হন। কুমারী মেরী তাঁর লৌকিক মাতা। যীশু তখনকার দিনে ধর্মের যত কুসংস্কার সবকিছুর বিরোধিতা করেন ও মানুষের মধ্যে সদ্বুদ্ধি, সদাচার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। তাঁর জনপ্রিয়তায় ঈর্ষ্যান্বিত হয়ে ইহুদীরা তাঁর প্রবল বিরোধিতা করে।

যীশুর বহু শিষ্য ছিলেন। সে-সবের মধ্যে পিটার, অ্যান্ড্রু, জেম্‌স, যোহন প্রভৃতি বারো জন অতি অন্তরঙ্গ শিষ্য ছিলেন। যীশু জানতে পেরেছিলেন, ইহুদীরা তাঁকে ধরে দণ্ডিত করবার চেষ্টা করছে। যীশু এক ভোজনসভায় শিষ্যদের বলেন, একজন তাঁর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে। জুডাস ইস্কেরিয়ট সেই বিশ্বাস-ঘাতক। সে যীশুকে ধরিয়ে দিলে বিচারের প্রহসন করে তাঁর প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হয়। আড়াআড়ি স্থাপিত দুইটি কাষ্ঠদণ্ডের (ক্রসের) উপরে হাতে-পায়ে পেরেক বিঁধে তাঁর প্রাণহানি ঘটানো হয়।

বিখ্যাত ইতালীয় চিত্রকর পল ভেরোনীসী বা পাওলো ক্যাগলিয়্যারি (১৫২৮-৮৮ খ্রী.) সশিষ্য যীশুর শেষভোজনের একটি অনবদ্য চিত্র আঁকেন। সেই চিত্রটি পূর্বপৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।



মহাত্মা গান্ধী

বহুমুখী চেষ্টায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে বলা চলে। তিনি বহুবার কারান্তরালে কাটিয়েছেন। 'চম্পারণ আন্দোলন', লবণ সত্যাগ্রহ, 'আইন অমান্য আন্দোলন', 'ভারত ছাড়ো আন্দোলন', 'বৃটিশ পণ্য-বর্জন' প্রভৃতির দ্বারা স্বাধীনতা-সংগ্রামকে দুর্বার পথে চালনা করেন। তিনি বহুবার অনশন করে উদ্দেশ্য সফল করার প্রয়াস চালান। তাঁর সংগ্রাম সম্পূর্ণ অহিংস পথে পরিচালিত হয়।

॥ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ॥

দেশসেবায় আত্মনিবেদিত প্রাণ একনিষ্ঠ কংগ্রেস-নেতা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৮৭০-১৯২৫ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টার। আলিপুর বোমার মামলার আসামী ঋষি অরবিন্দকে মুক্ত

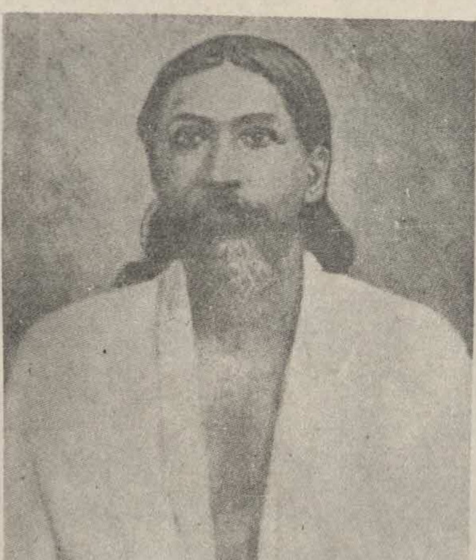


দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

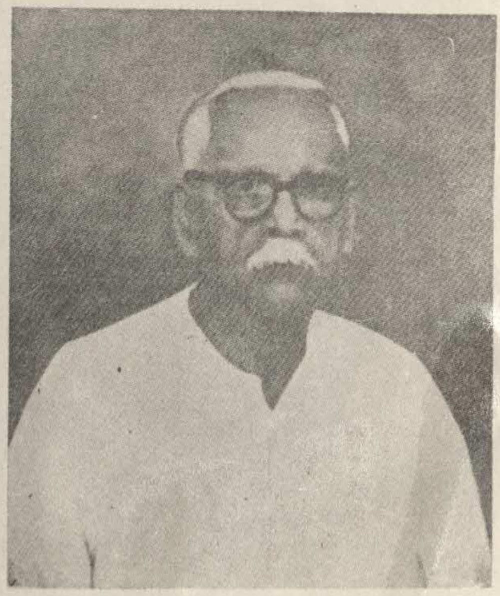
করেন। তিনি সহস্র সহস্র টাকা উপার্জনের পথ ছেড়ে দিয়ে দেশের কাজে সম্পূর্ণ আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে গয়ায় কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। সুভাষচন্দ্র বসু ও যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত তাঁর শিষ্যস্থানীয়।

॥ শ্রীঅরবিন্দ ॥

দেশকে স্বাধীন করতে গেলে কেবল কংগ্রেসের মাধ্যমে আন্দোলন করলে চলবে না, নির্মম অত্যাচারী বৃটিশদের বিরুদ্ধে বিপ্লব করার প্রয়োজন, একথা একশ্রেণীর তরুণ ও যুবক স্বাধীনতা-সংগ্রামী বুঝেছিলেন। তাঁদের আন্দোলনকে বলা হয় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলন। রিভলভার, বন্দুক, বোমা প্রভৃতির সাহায্যে ইংরেজদের এদেশ থেকে বিতাড়িত করতে বদ্ধপরিকর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিপ্লবীদের সহায়তা করতে যে স্বদেশপ্রেমিক এগিয়ে



শ্রীঅরবিন্দ



বারীন্দ্রকুমার ঘোষ

আসেন তাঁর নাম শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রী.)। তিনি আলিপুর বোমার মামলার সম্পর্কে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। দেশবন্ধু তাঁকে মুক্ত করেন কারাগারে থাকবার সময়ে শ্রীঅরবিন্দের মন আধ্যাত্মিক সাধনার জন্যে ব্যাকুল হয়। তিনি পণ্ডিচেরীতে এক আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে শেষ জীবন সেখানে ঈশ্বরের ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন ও সিদ্ধিলাভ করেন।

॥ বারীন ঘোষ ॥

বারীন ঘোষের পুরো নাম বারীন্দ্রকুমার ঘোষ (১৮৭০-১৯৫৯ খ্রী.)। তিনি শ্রীঅরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। তিনি ছিলেন একজন স্বদেশসেবায় উৎসর্গিত-প্রাণ বিপ্লবী। মানিকতলার বাগান থেকে তাঁকে ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত গুপ্ত, উল্লাসকর দত্ত, শচীন্দ্রনাথ সেনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিচারে তাঁর প্রতি প্রথমে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হল। পরে সেই আদেশের পরিবর্তন করে তাঁকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তিনি আন্দামানে দণ্ডভোগের পরে ফিরে এসে সাংবাদিকতা করেন।



॥ ক্ষুদিরাম বসু ॥

বিপ্লবী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর কাছ থেকে শিক্ষা পেয়ে ক্ষুদিরাম বসু (১৮৮৯-১৯০৮ খ্রী.) তরুণ বয়সে অসমসাহসী বিপ্লবী হয়ে ওঠেন। তিনি বারীন ঘোষের কাছ থেকে বোমা নিয়ে প্রফুল্ল চাকীর সঙ্গে মজঃফরপুরে যাত্রা করেন। ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কিংসফোর্ডকে হত্যা করতে গিয়ে ভুলক্রমে যে ফিটন গাড়িতে বোমা নিক্ষেপ করেন সেই গাড়ির আরোহী নিরীহ মিসেস ও মিস কেনেডি নিহত হন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে যান। তাঁর ফাঁসি হয়।



ক্ষুদিরাম বসু

॥ প্রফুল্ল চাকী ॥

ক্ষুদিরাম পুলিশের হাতে ধরা পড়বার সময়

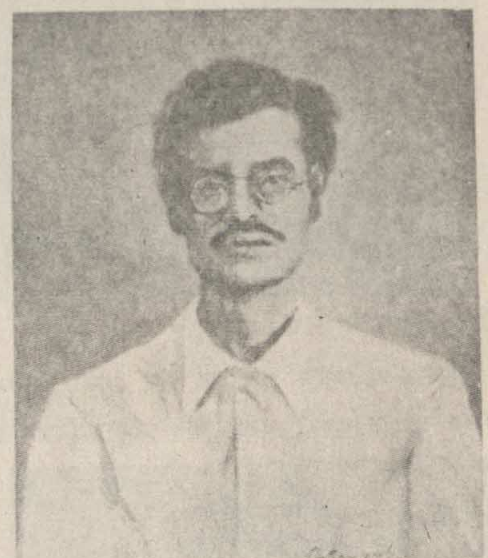


প্রফুল্ল চাকী

প্রফুল্ল চাকী নিজের পিস্তলে আত্মহত্যা করেন (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে)।

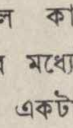
॥ কানাইলাল দত্ত ॥

ক্ষুদিরামের গ্রেপ্তারের পর বিপ্লবী কানাইলাল দত্ত (১৮৮৭-১৯০৮ খ্রী), সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও আরও



কানাইলাল দত্ত

অনেকে গ্রেপ্তার হন। তাঁদের দলের নরেন্দ্র গোস্বামী বা নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হলে কানাইলাল সত্যেন্দ্রনাথের সহযোগিতায় জেলের মধ্যেই নরেন গোঁসাইকে গোপনে যোগাড়-করা একটা রিভল-ভারের গুলিতে হত্যা করেন। বিচারে কানাই-লালের ফাঁসি হয়।



॥ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ॥

ঋষি রাজনারায়ণ বসুর ভাই সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৮২-১৯০৮ খ্রী.) কানাইলালের সঙ্গে একযোগে নরেন গোঁসাইকে হত্যা করলে তাঁরও ফাঁসি হয়।



সত্যেন্দ্রনাথ বসু

॥ সূর্য সেন ॥

মাস্টার-দা নামে পরিচিত সূর্য সেন ছিলেন একজন স্মরণীয় বিপ্লবী নেতা। তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের এক অস্ত্রাগার দখল করেন। তাঁর দল তাঁর নির্দেশে অস্ত্রাগারে আগুন ধরিয়ে দিলে ইংরেজরা দিগ্বিদিকে পলায়ন করতে থাকে। ইংরেজদের সশস্ত্র বাহিনী মেশিনগান থেকে গুলি বর্ষণ শুরু করলে সূর্য সেন দলের সকলকে নিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ে আশ্রয় নেন। ইংরেজ ও বিপ্লবীদের মধ্যে গুলি বিনিময় হতে থাকে। সূর্য সেন কয়েকজন বিপ্লবীর সঙ্গে পাহাড় থেকে নেমে শহরে চলে যান। এক বাড়িতে থাকবার সময় তাঁকে পুলিস গ্রেপ্তার করে। তিনি ও তাঁর সহকর্মী তারকেশ্বর ধরা পড়ে যান। তাঁদের ফাঁসি হয়।



॥ প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ॥

চট্টগ্রামের স্মরণীয়া বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২ খ্রী.) সূর্য সেনের যোগ্যা শিষ্যা ছিলেন। তিনি সূর্য সেনের নির্দেশে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ৮ জন সঙ্গী নিয়ে চট্টগ্রাম পাহাড়তলীর



সূর্য সেন



প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করেন। রক্ষী প্রহরীর নিক্ষিপ্ত একটি বোমার টুকরা এসে লাগে প্রীতিলতার বুকে। প্রীতিলতা পুলিসের হাতে ধরা না দিয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ভাবে এক অমূল্য জীবনের অবসান ঘটে।

॥ বিনায়ক দামোদর সাভারকর ॥

স্মরণীয় দেশহিতব্রতী মারাঠী বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকর (১৮৯৩-১৯৬৬ খ্রী.) বিলাতে থেকে ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবের আদর্শ প্রচার করেন। বিলাতে স্যার কার্জন ওয়াইলীকে হত্যার জন্য মদনমোহন ধিংড়ার ফাঁসি হলে পুলিস এই ধারণার বশবর্তী হয় যে সাভারকর ওই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত। তাঁকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্যে ভারতে পাঠানোর উদ্দেশ্যে এক জাহাজে তোলা হয়। দুঃসাহসী বীর সাভারকর জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপ দিয়ে ফ্রান্সের মার্সাই উপকূলে ওঠেন। হেগের আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারে তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হলে ফরাসী সরকার তাঁকে ভারতে পাঠিয়ে দেন। বিচারে তাঁর প্রতি যাবজ্জীবন কারাদণ্ড-ভোগের আদেশ হয়। তিনি চৌদ্দ বৎসর আন্দামানে কারাবাস করেন। মুক্তিলাভ করে তিনি ভারতীয় হিন্দু মহাসভার সভাপতি হন।

॥ যতীন দাস ॥

যতীন্দ্রনাথ দাস (১৯০৪-১৯২৯ খ্রী.) কংগ্রেস-কর্মী হিসাবে কয়েকবার জেল খাটেন। তিনি পরে বিপ্লবী হন। ভগৎ সিংকে তিনিই অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেন। লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সম্পর্কে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলে রাখা হয়। তিনি জেলের মধ্যে ৬৩ দিন একনাগাড়ে অনশন করে মৃত্যুবরণ করেন।



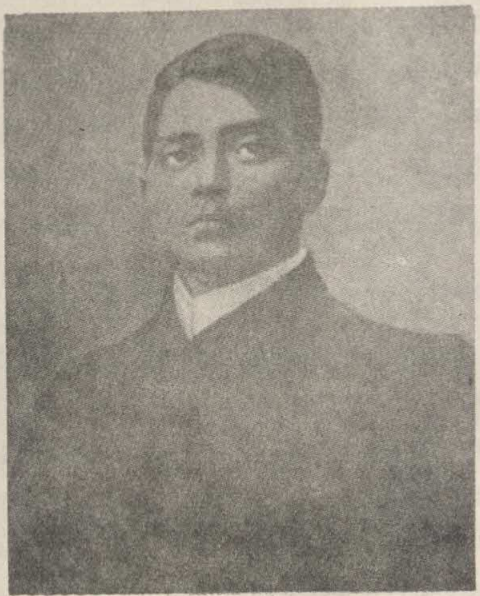
যতীন দাস

। ভগৎ সিং ॥

পাঞ্জাবের বীর বিপ্লবী ভগৎ সিং 'নওজোয়ান ভারত সভা' নামে একটা দল গঠন করে যুবকদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে সাইমন কমিশনের প্রতিবাদে বিরাট শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন পাঞ্জাবকেশরী লালা লাজপত রায়। স্যাণ্ডার্স নামে এক ইংরেজের পরিচালনায় পুলিস দল লাঠি চালনা করতে থাকে। লাজপত রায় লাঠির আঘাতে গুরুতর ভাবে আহত হন ও পরে মারা যান। ভগৎ সিং প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্যে দলবল নিয়ে স্যাণ্ডার্সকে হত্যা করেন। পরে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে বটুকেশ্বর দত্তের সঙ্গে লাহোরের পরিষদ ভবনে বোমা ফেলেন। ধরা পড়লে তাঁর ফাঁসি হয় (১৯৩০ খ্রী.)।



ভগৎ সিং



বাঘা যতীন

॥ বাঘা যতীন ॥

অসমসাহসী যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় (১৮৮০-১৯১৫ খ্রী.) কম বয়সে একটা বাঘ মেরে 'বাঘা যতীন' নামে ভূষিত হন। তিনি জার্মানি ও জাপান থেকে অস্ত্র আনবার চেষ্টা করেন। জার্মানি দু' জাহাজ অস্ত্র পাঠাতে রাজী হয়। একটি জাহাজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে রওনা হয়। উড়িষ্যার (ওড়িশার) বালেশ্বর উপকূলে জাহাজ ভেড়বার কথা হয়। কুখ্যাত পুলিস কমিশনার চার্লস টেগার্ট তিনশ পুলিস নিয়ে বুড়ীবালামের তীরে গিয়ে হাজির হলেন। যতীন্দ্রনাথ ও তাঁর সহকর্মীরা ট্রেঞ্চের মধ্যে থেকে নির্ভীকভাবে যুদ্ধ চালালেন। সকলকে বন্দী করে আহত অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল। বালেশ্বর হাসপাতালে যতীন্দ্রনাথের মৃত্যু হল। তাঁর দুই সহকর্মীর ফাঁসি হল, একজন যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হলেন।

॥ গোপীনাথ সাহা ॥

স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যা করতে গিয়ে

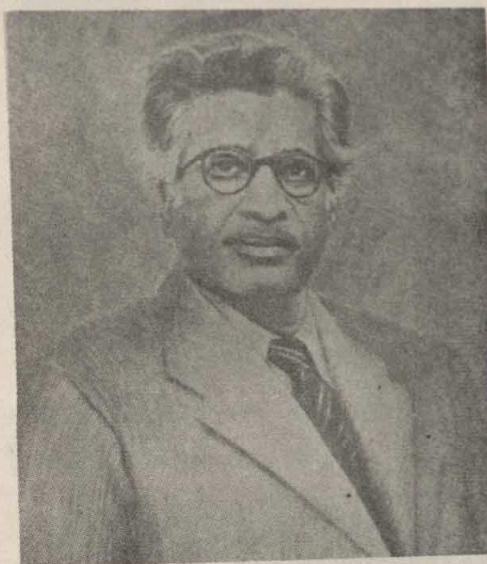


গোপীনাথ সাহা

গোপীনাথ সাহা ভুলক্রমে অন্য এক সাহেবকে হত্যা করে বসেন। পুলিসের হাতে ধরা পড়ে তাঁর ফাঁসি হয়।

॥ এম. এন. রায় ॥

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (১৮৯৩-১৯৫৪ খ্রী.) একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা-সংগ্রামী। পরবর্তীকালে



এম. এন. রায়

তিনি মানবেন্দ্রনাথ রায় (সংক্ষেপে এম. এন. রায়) নামে খ্যাত হন। তিনি চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে গিয়ে বিভিন্ন উপায়ে ভারতকে স্বাধীন করবার চেষ্টা করেন। লেনিন তাঁর উপর নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার দেন। কিন্তু পরে রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতে আসেন ও বিভিন্নভাবে দেশসেবার কাজ করেন।

॥ রাসবিহারী বসু ॥

অক্লান্ত দেশকর্মী রাসবিহারী বসু (১৮৮০-১৯৪৪ খ্রী.) বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন দিল্লীর দরবার উপলক্ষে হাতির পিঠে করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁকে লক্ষ্য করে বোমা নিক্ষেপ করেন। হার্ডিঞ্জ-পত্নী হাতি থেকে পড়ে যান, হার্ডিঞ্জ মূর্ছিত হন, হস্তীচালক মারা যায়। রাসবিহারী ভিড়ের মধ্য দিয়ে পলায়ন করেন। পরে তিনি পি. এন. ঠাকুর এই ছদ্মনামে জাপানে চলে যান। পরবর্তী জীবন তাঁর জাপানে কাটে। জাপানে থাকলেও তাঁর ভারতসেবার কাজ থেমে থাকে নি। তিনিই সুভাষচন্দ্রের উপর আজাদ হিন্দ ফৌজ পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন।

। প্রফুল্ল চক্রবর্তী।

রংপুর জাতীয় বিদ্যালয়ের ছাত্র প্রফুল্ল চক্রবর্তী ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে দেওঘরের রোহিণী পাহাড়ে অতি শক্তিশালী বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষা করতে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বারীন্দ্রকুমার ঘোষ, উল্লাসকর দত্ত, নলিনীকান্ত গুপ্ত প্রভৃতি জননেতারা। প্রফুল্ল যে বোমার বিস্ফোরণ ঘটান, তাতেই তাঁর দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁকেই স্বাধীনতার প্রথম শহীদ বলা উচিত।

॥ বিনয়-বাদল-দীনেশ ॥

যাঁদের নাম স্মরণীয় করে রাখবার জন্যে ডাল-হাউসি স্কোয়ারের নাম বদলে বি-বা-দী বাগ (বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগ) রাখা হয়েছে তাঁরা অর্থাৎ বিনয় বসু, বাদল গুপ্ত ও দীনেশ গুপ্ত ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ডিসেম্বর কলকাতার রাইটার্স বিল্ডিংস-এ গিয়ে রিভলভারের গুলিতে কারাবিভাগের তদানীন্তন ইন্সপেক্টর জেনারেল কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করেন। পুলিসের সঙ্গে গুলিচালনার যুদ্ধে কয়েক-জন ইংরেজ অফিসার নিহত হন। বিনয় ও দীনেশকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে পাঠানো হল।



বিনয় বসু



দীনেশ গুপ্ত



বাদল গুপ্ত

বাদল গুপ্ত ঘটনাস্থলেই পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মহত্যা করলেন। বিনয় বসু হাসপাতালে মারা যান। দীনেশ গুপ্তের ফাঁসি হয়।

॥ অশ্বিনীকুমার দত্ত ॥

বরিশালের একনিষ্ঠ দেশসেবক অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩ খ্রী.) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ

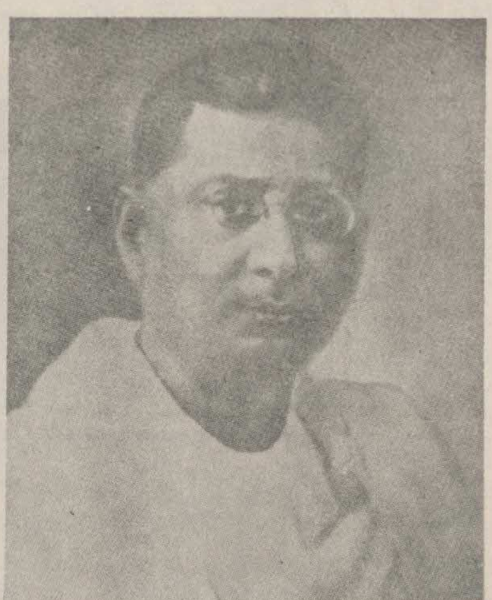


অশ্বিনীকুমার দত্ত

আন্দোলনে যোগ দেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে আন্দামানে নির্বাসিত হন। আন্দামান থেকে ফিরে তিনি আজীবন নানাভাবে দেশের সেবা করে গেছেন।

॥ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ॥

চট্টগ্রাম জেলার একনিষ্ঠ দেশকর্মী যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত (১৮৮৫-১৯৩৩ খ্রী.) ব্যারিস্টারি ত্যাগ করে পুরোপুরি দেশের কাজে লাগেন ও বহুবার জেল



যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত

খাটেন। তিনি পাঁচবার কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন। তাঁর পত্নী ইংরেজ রমণী নেলী সেনগুপ্তাও বিশিষ্ট দেশকর্মী ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভানেত্রী হন।

॥ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ॥

'লৌহমানব' বলে কথিত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল (১৮৭৫-১৯৫০ খ্রী) বার্দোলীর কৃষক সত্যাগ্রহে



বল্লভভাই প্যাটেল

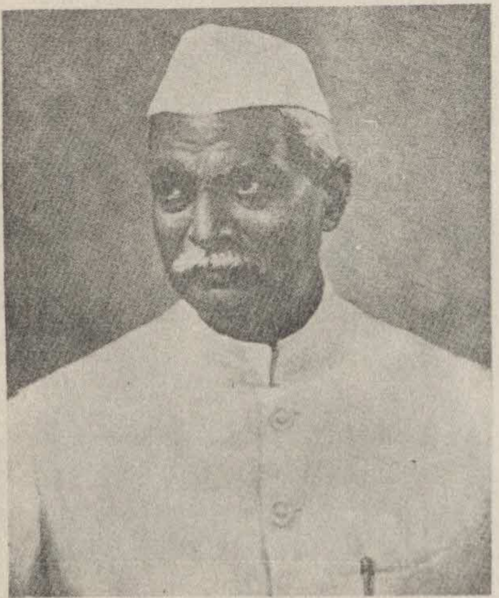
নেতৃত্ব করেন। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করেন। তাঁরই চেষ্টায় দেশীয় রাজ্যগুলি ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। তিনি স্বাধীন ভারতের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

॥ রাজেন্দ্রপ্রসাদ ॥

বিহারের ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ (১৮৮৪-১৯৬৩ খ্রী.) চম্পারণের কৃষক সত্যাগ্রহে নেতৃত্ব করেন। লবণ আইন অমান্য আন্দোলনেরও তিনি অন্যতম প্রধান সংগঠক। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে ও ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মীরাটে কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি সভাপতি হন। তাঁকে বহুবার জেল খাটতে হয়। তিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি।

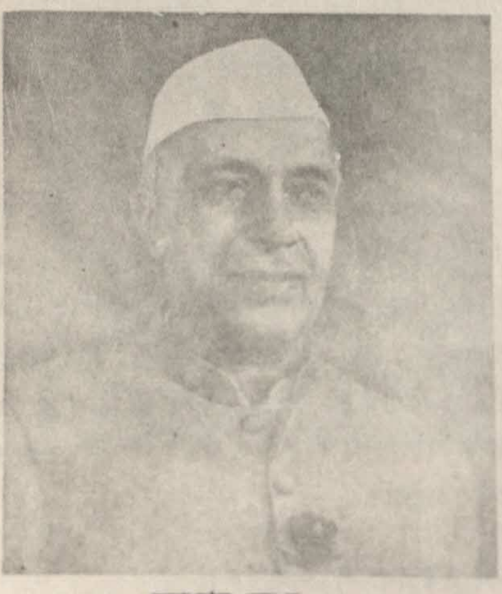
॥ জওহরলাল নেহরু ॥

পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর পুত্র জওহরলাল



রাজেন্দ্রপ্রসাদ

নেহ্‌রু (১৮৮৯-১৯৬৪ খ্রী.) গান্ধীজীর প্রিয় শিষ্য ছিলেন ও স্বাধীনতার আন্দোলনে যোগ দিয়ে বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বড়লাট



জহরলাল নেহ্‌রু

ওয়াভেলের আহ্বানে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তিকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীন হলে তিনি প্রধানমন্ত্রী হন ও আমৃত্যু সেই পদে আসীন ছিলেন।

॥ সুভাষচন্দ্র বসু ॥



অক্লান্তকর্মী অসমসাহসী দেশনেতা সুভাষচন্দ্র ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আই. সি. এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও সরকারী চাকরি গ্রহণ করেন নি। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আইন অমান্য



সুভাষচন্দ্র বসু

আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন। তাঁকে ইংরেজ সরকার মান্দালয় জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে স্বাস্থ্যহানি ঘটলে সরকার তাঁকে মুক্তি দেয়। তিনি বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হরিপুরা কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতি হন। পরবৎসরও ত্রিপুরী কংগ্রেসের সভাপতি হন। কিন্তু কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলাদলির জন্যে পদত্যাগ করেন ও 'ফরওয়ার্ড ব্লক' নামীয় রাজনৈতিক দল

গঠন করেন। তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভগ্নস্বাস্থ্যের জন্যে বাড়িতে অন্তরীণ রাখা হয়। সেখান থেকে তিনি গোপনে আফগানিস্তান হয়ে মস্কো যান। সেখান থেকে বার্লিনে যান। বার্লিন থেকে তিনি জাপানে গেলেন। সেখানে ক্যাপ্টেন মোহন সিং বন্দী ভারতীয় সেনাদের নিয়ে যে আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন করেন রাসবিহারী বসু তার পরিচালনার ভার তাঁর উপর অর্পণ করেন। তাঁর সৈন্যদল আসামে এসে পৌঁছায়। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে অন্তর্হিত হন। তিনি এখন কোথায় তা কারও জানা নেই।

॥ ডাঃ বি. এস. মুঞ্জে ॥

হিন্দুনেতা ও অক্লান্ত দেশকর্মী। তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেন। হিন্দুদের সামরিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেন।

॥ কে. এফ. নরীম্যান ॥

পার্শী দেশনেতা কে. এফ. নরীম্যান (১৮৮৫-১৯৩৯ খ্রী.) আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন। তিনি দীর্ঘকাল ভারতের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বোম্বাই-এর মেয়র হন।

॥ মদনমোহন মালব্য ॥

পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য (১৮৬১-১৯৪৬ খ্রী.) কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ



মদনমোহন মালব্য

করেন। তিনি ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে ও ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি হিন্দু মহাসভারও সভাপতি হন।

॥ সরোজিনী নাইডু ॥

প্রসিদ্ধ বাঙালী রাজনীতিক ও দেশকর্মী সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯ খ্রী.) ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের কানপুর অধিবেশনে সভানেত্রী হন। তিনি গান্ধীজীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন ও বহুবার কারাবরণ করেন। ভারত স্বাধীন হলে তিনি উত্তরপ্রদেশের গভর্নর হন।

॥ অ্যানি বেশান্ত ॥

ইংরেজ নারী হলেও অ্যানি বেশান্ত (Annie Besant, ১৮৪৭-১৯৩৩ খ্রী.) ভারতের জাতীয় আন্দোলনে যোগদান করেন ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে



সরোজিনী নাইডু

কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে সভানেত্রী হন।



অ্যানি বেশান্ত

॥ মাতঙ্গিনী হাজরা ॥

মেদিনীপুরের মহীয়সী বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা (১৮৭০-১৯৪২ খ্রী.) কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী



মাতঙ্গিনী হাজরা

ছিলেন ও কয়েকবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলনে যোগ দিয়ে পতাকা হস্তে এক শোভাযাত্রা পরিচালনা করেন। ইংরেজ সেনাবাহিনীর গুলিতে তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ ভিকাজী রুস্তম কামা ॥

ফ্রান্সে থেকে যে মহিলা নানাভাবে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেন তাঁর নাম ভিকাজী রুস্তম কামা (১৮৬১-১৯৩৬ খ্রী.)। বোম্বাই-এ তাঁর জন্ম হয়।

॥ শরৎচন্দ্র বসু ॥



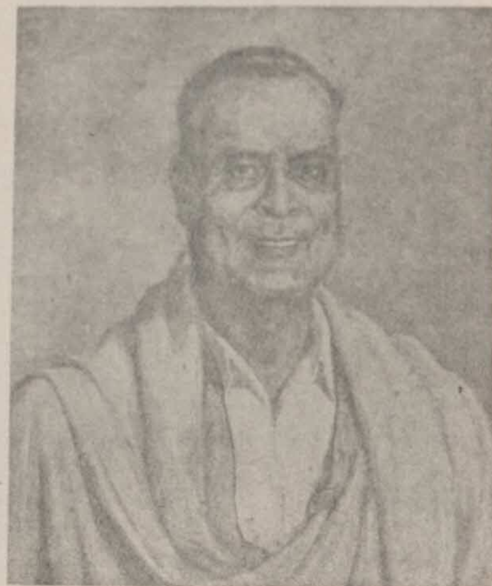
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু (১৮৮৯-১৯৫০ খ্রী.) রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য কয়েকবার কারারুদ্ধ ছিলেন।



ভিকাজী রুস্তম কামা

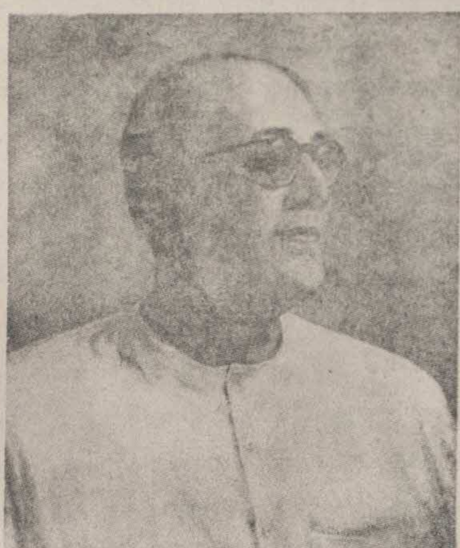
॥ বিধানচন্দ্র রায় ॥

সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার ও রাজনীতিক বিধানচন্দ্র রায় (৮৮২-১৯৬২ খ্রী.) ১৯৪২ থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ



বিধানচন্দ্র রায়

পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন। তিনি দেশবন্ধুর স্বরাজ্যপার্টিতে যোগদান করেন ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোটে পরাজিত করে বঙ্গীয় ব্যবস্থা পরিষদের সভ্য হন। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র ছিলেন। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আমৃত্যু পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী থেকে বহু সংগঠন কার্য করে খ্যাতি লাভ করেন। তিনি আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে কারাবরণ করেন।



শরৎচন্দ্র বসু

॥ ইন্দিরা গান্ধী ॥

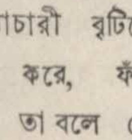
জওহরলাল নেহ্রুর কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী (জন্ম ১৯১৭ খ্রী.) কম বয়স থেকেই নানাভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে জড়িত থাকেন। তিনি একাধিকবার জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রী হন। প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রীর পরলোকগমনের



ইন্দিরা গান্ধী

পর তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন।

এই অধ্যায়ের স্বল্পপরিসরে অগণিত স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের মাত্র কয়েকজনের নামোল্লেখ করা হল। কত যে ভারত-সন্তান কতভাবে সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকে আগত অত্যাচারী বৃটিশের নির্যাতন সহ্য করে, কারাবরণ করে, ফাঁসি গিয়ে ভারতকে স্বাধীন করেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁদের অমর জীবন ইতিহাসে চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে।



।। ভারত বিভাগ ।।

নির্মম অবাঞ্ছিত বৃটিশ প্রায় দু'শো বছর ভারতের বুকে বসে অত্যাচার চালিয়ে তাদের ক্রূর আচরণ থেকে ক্ষান্ত হয় নি। ভারত ত্যাগ করে যাবার সময় অখণ্ড সোনার ভারতকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করে গেছে। তার বিষময় ফল ভারতবাসী এখনও ভোগ করছে। ভারত বিভাগ এক অতি বিষাদময় ঘটনা।

।। স্বাধীনতাসংগ্রামীদের কয়েক-জনের নাম ।।

এখানে মাত্র কয়েকজন স্বাধীনতাসংগ্রামীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে উচ্চারণ করে তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানানো হল—শহীদ অনাথবন্ধু পাঁজা, শহীদ অপূর্ব সেন, শহীদ চিত্তরঞ্জন মুখার্জী, শহীদ অতুল সেন, শহীদ অমলেন্দু ঘোষ, শহীদ অনন্তহরি মিত্র, শহীদ ব্রজকিশোর চক্রবর্তী, শহীদ ত্রিপুরা সেন, শহীদ অনিলকুমার দাস, শহীদ হরিগোপাল বল, শহীদ প্রমোদরঞ্জন চক্রবর্তী, শহীদ আবদুল করিম গোলাম জিলানী, শহীদ আসফাকুল্লা, শহীদ মতিলাল মল্লিক, শহীদ জীবন ঘোষাল, শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, শহীদ সঞ্জীবচন্দ্র রায়, শহীদ সুশীল সেন, শহীদ গুণধর হাজরা, শহীদ অনুজা সেন, শহীদ রামকৃষ্ণ রায়, শহীদ বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, শহীদ রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শহীদ আশুতোষ কুইলা, শহীদ চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী, শহীদ ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য শহীদ দেবপ্রসাদ গুপ্ত, শহীদ নির্মলজীবন ঘোষ, শহীদ তারকেশ্বর সেন, শহীদ দীনেশচন্দ্র মজুমদার. শহীদ সতীন্দ্রনাথ সেন, শহীদ হিমাংশু বসু. শহীদ হৃষীকেশ সাহা, শহীদ স্মৃতীশ ব্যানার্জী. শহীদ নলিনী বাগচী. শহীদ প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য, শহীদ নগেন্দ্রনাথ দত্ত, শহীদ মৃগেন্দ্রনাথ দত্ত, শহীদ তারাদাস ভট্টাচার্য, শহীদ নবজীবন ঘোষ. শহীদ নরেশ রায়, শহীদ পঞ্চানন পালিত, শহীদ প্রভাস বল, শহীদ ভূদেবপ্রসাদ সেন, শহীদ মনোরঞ্জন সেন, শহীদ মহেন্দ্রনাথ রায়, শহীদ মানকুমার বসুঠাকুর, শহীদ যতীশ গুহ, শহীদ রজত সেন, শহীদ রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী, শহীদ শচীন্দ্রনাথ মিত্র. শহীদ শৈলেশ চ্যাটার্জী, শহীদ সন্তোষকুমার

মিত্র, শহীদ সুশীল দাশগুপ্ত এবং অনিলচন্দ্র রায়, অবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য, চারণকবি মুকুন্দদাস, অবিনাশচন্দ্র চক্রবর্তী, কৃষ্ণকুমার মিত্র, আবুল কালাম আজাদ, রজনীকান্ত সেন, রাজাগোপালাচারী, অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, রঙ্গলাল গাঙ্গুলী জ্যোতিষচন্দ্র রায়, পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডন, ভাই পরমানন্দ, বীরেন্দ্রনাথ শাসমল, শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী, ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, গোবিন্দবল্লভ পন্থ, বাবা গুরুদিত সিং, হরিদাস মিত্র, ভোপৎকার, কামিনীকুমার দত্ত, পুলিনচন্দ্র দাস, পূর্ণচন্দ্র দাস, ফণিভূষণ দাশগুপ্ত, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, অম্বিকাচন্দ্র মজুমদার।



নলিনী বাগচী,



হিমাংশু বসু,



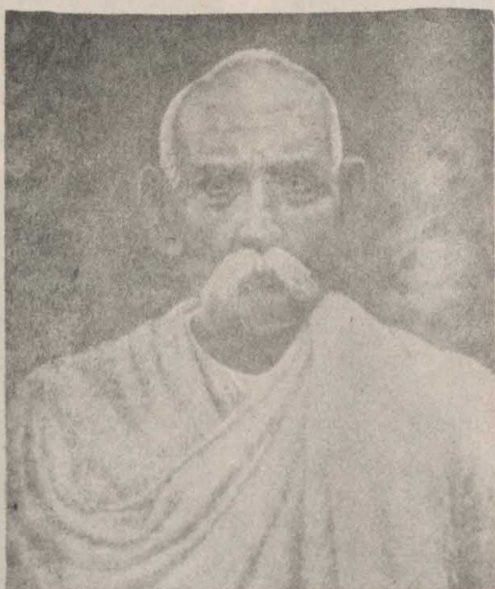
হৃষীকেশ সাহা,



ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৮০—১৯৬১ খ্রী.)



মতিলাল রায় (১৮৮২—১৯৫৯ খ্রী.)



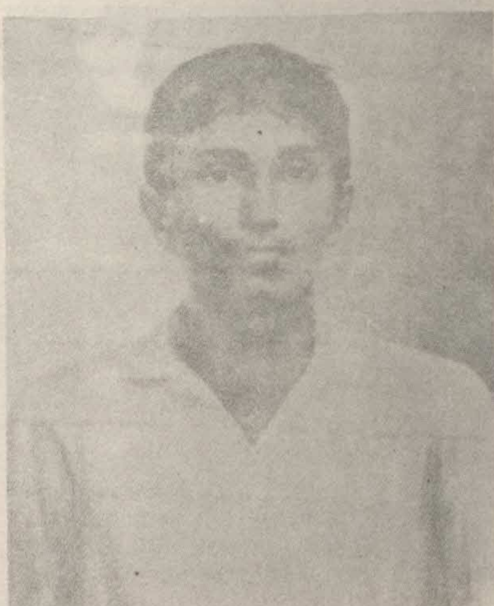
হরদয়াল নাগ (১৮৫৩—১৯৪২ খ্রী.)



অমলেন্দু ঘোষ (১৯২৬—১৯৪৭ খ্রী.)



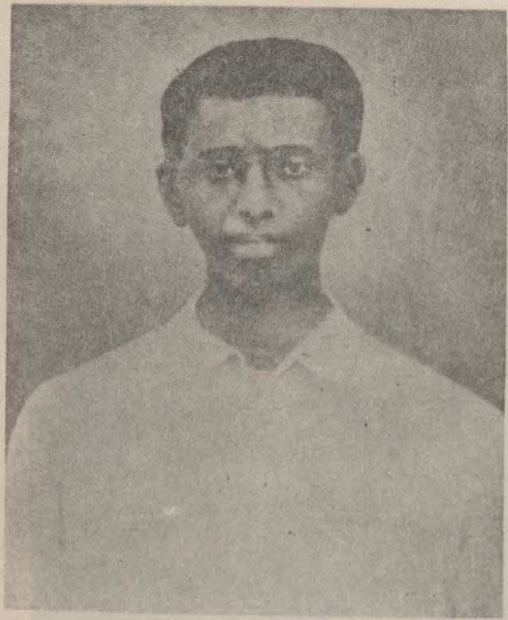
আবদুল করিম গোলাম জিলানী (১৯০৪—১৯৩২ খ্রী.)



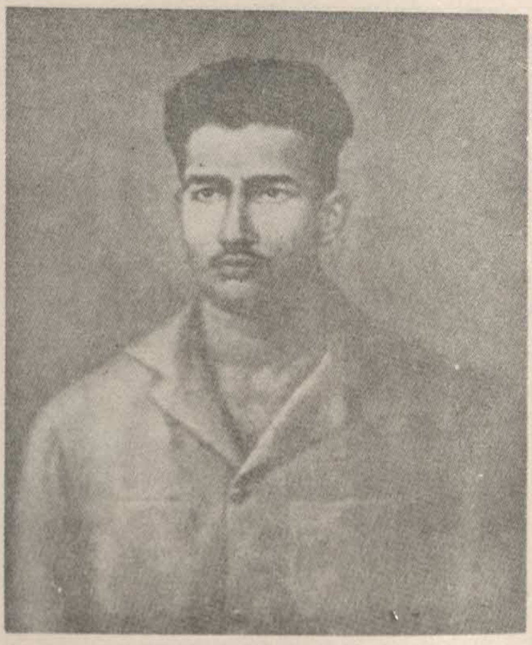
আশুতোষ কুইল্যা (মৃত্যু ১৯৪২ খ্রী.)



আসফাকুল্লা (মৃত্যু ১৯২৯ খ্রী.)



চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী



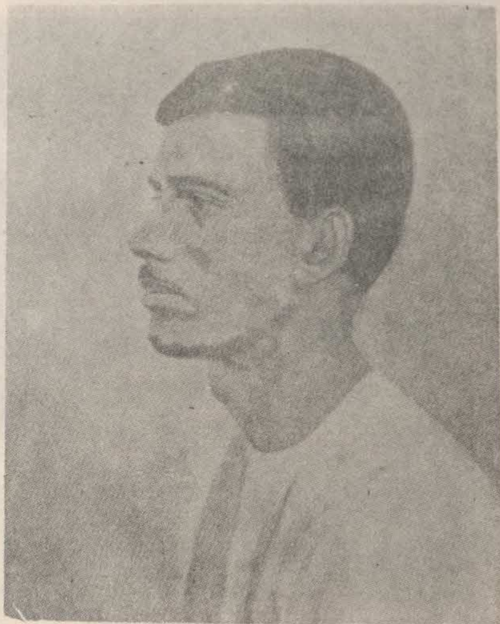
চিত্তরঞ্জন মুখার্জী (১৯১৯—১৯৪০ খ্রী.)



জীবন ঘোষাল (১৯১২—১৯৩১ খ্রী.)

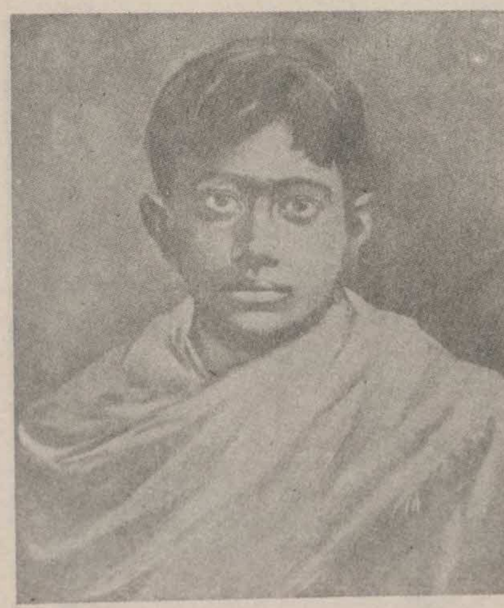


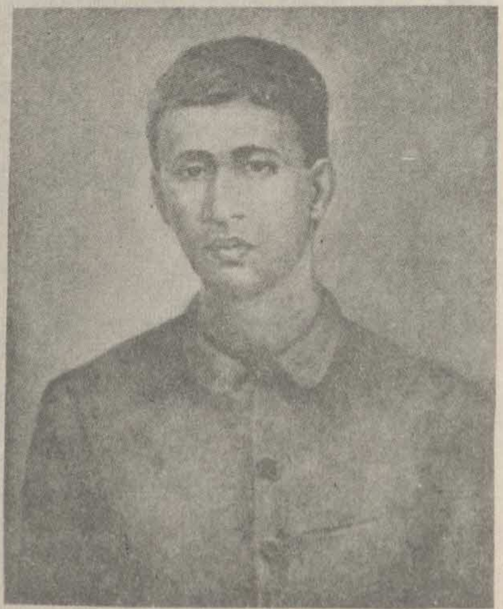
তারকেশ্বর দস্তিদার (মৃত্যু ১৯৩৪ খ্রী.)


তারকেশ্বর সেন (মৃত্যু ১৯৩১ খ্রী.)


ত্রিপুরা সেন (১৯১৩—১৯৩০ খ্রী.)


দীনেশচন্দ্র মজুমদার (১৩১৪— ১৩৪১ বঙ্গাব্দ)


নির্মলজীবন ঘোষ (১৯১৬—১৯৩৪ খ্রী.)



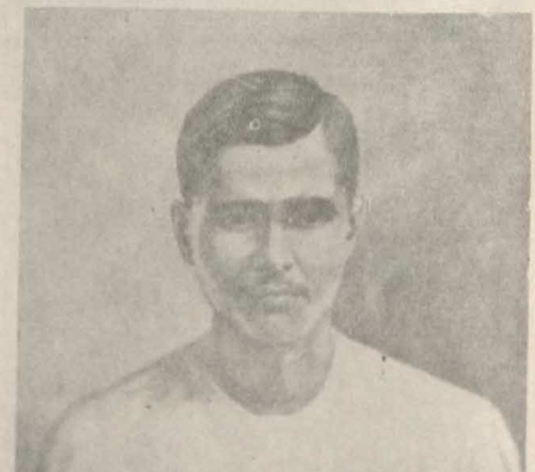
নীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত (১৮৯৬—১৯১৫ খ্রী.)



প্রদ্যোৎ ভট্টাচার্য (১৯১৩—১৯৩৩ খ্রী.)



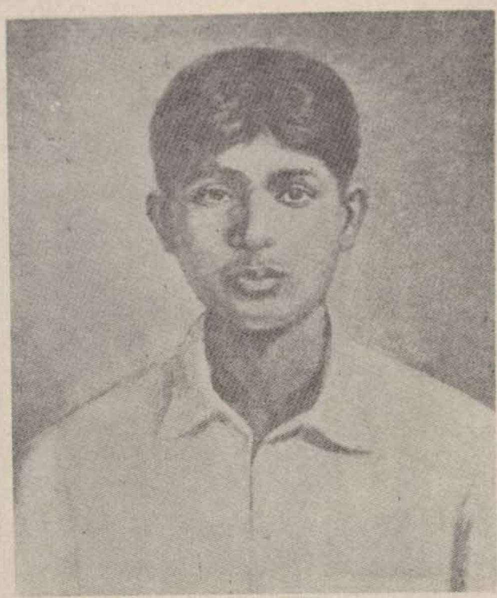
প্রমোদরঞ্জন চৌধুরী (মৃত্যু ১৯২৬ খ্রী.)



ব্রজকিশোর চক্রবর্তী (মৃত্যু ১৯৩৪ খ্রী.)



ভবানীপ্রসাদ ভট্টাচার্য (১৯১৪— ১৯৩৫ খ্রী.)



মতিলাল মল্লিক (১৯১২—১৯৩৪ খ্রী.)



মানকুমার বসুঠাকুর (১৯২০—১৯৪৩ খ্রী.)



রামকৃষ্ণ বিশ্বাস (মৃত্যু ১৯৩১ খ্রী.)



রামকৃষ্ণ রায় (মৃত্যু ১৯৩৪ খ্রী.)



রাজেন্দ্রনাথ লাহিড়ী (মৃত্যু ১৯২৭ খ্রী.)



সতীন্দ্রনাথ সেন (১৮৯৪—১৯৫৫ খ্রী.)



পুলিন দাস (১৮৭৭—১৯৪৯ খ্রী.)



পূর্ণচন্দ্র দাস (১৮৮৯—১৯৫৬ খ্রী.)



ফণিভূষণ দাশগুপ্ত (১৯০৭—১৯৪৩ খ্রী.)



বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী (১৮৮৭—১৯৫৪ খ্রী.



বীরেন্দ্রনাথ শাসমল (১৮৮১—১৯৩৪ খ্রী.)





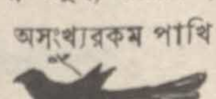
পাখি পোষা

মানুষ যত শক্তিমান্‌ই হোক না কেন, পাখিদের মতো উড়তে পারে না। বাঘ, সিংহ, হরিণ প্রভৃতি জন্তুরাও উড়তে পারে না। একমাত্র উড়তে পারে পাখি।

এই সব পাখিদের অনেকেরই পাখনার রং খুব সুন্দর। কোকিল, পাপিয়া, দোয়েল প্রভৃতির স্বর কত মধুর, যেন মনে হয়, তারা গান গাইছে। এই সব পাখি উড়ে বেড়ায়, এ গাছ থেকে ও গাছে গিয়ে বসে, ডানা মেলে আকাশে উঠে যায়।

মানুষের চিরদিনের ইচ্ছে, এই সব পাখিকে বাড়িতে রেখে দেয়, তাদের গান শোনে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা পাখিদের দেখে, তাদের কাছে গিয়ে আদর করতে পারলে খুশী হয়। আবার টিয়া, চন্দনা, ময়না, শালিক প্রভৃতি পাখিদের শেখালে বুলি বলে। এই সব কারণে পৃথিবীর সব দেশের লোক যত্ন করে পাখি পোষে। কোন কোন পাখিকে খাঁচায় রাখতে হয় না। নিজের খুশিমতো ঘোরাফেরা করে। উড়ে গেলেও ফিরে আসে, বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না—যেমন পায়রা। তবে বেশির ভাগ পাখিকেই খাঁচায় পুরে রাখতে হয়, দাঁড়ের উপর শিকল দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, তা নাহলে উড়ে পালায়।

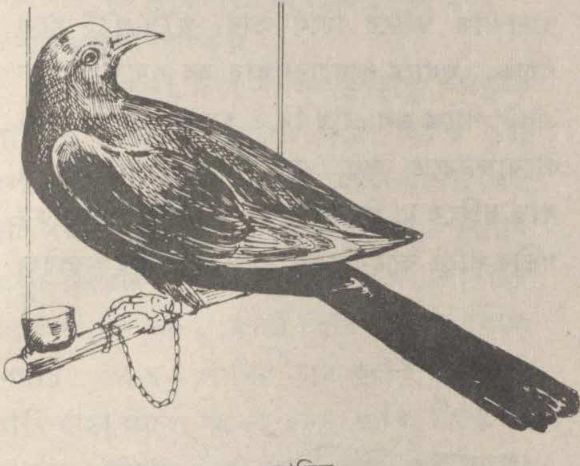
পায়রা, মুনিয়া, বদরিকা, ময়ূর, শালিক, টিয়া, চন্দনা, ময়না, কাকাতুয়া, হীরামন, কোকিল, ফিঞ্চ, ক্যানারী, বার্ড অব প্যারাডাইস, চড়ুই, দোয়েল, পাপিয়া, ফিঙ্গে, শ্যামা প্রভৃতি অসংখ্যরকম পাখি লোকে পুষে থাকে।



॥ কোকিল ॥

কোকিল পরিযায়ী পাখি। আমাদের দেশের

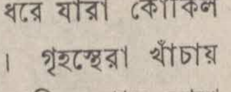
পাখি নয়। শীতের দেশ থেকে বসন্তকালে এদেশে উড়ে আসে। গ্রীষ্মকালে এদেশ ছেড়ে চলে যায়। পুরুষ কোকিলের কণ্ঠস্বর খুব মধুর। তার কুহুতান শুনে সকলেই তৃপ্তি পায়। কিন্তু গ্রীষ্মকাল এলেই তারা চলে যায়। তাই লোকে তাদের ধরে রাখতে চায়।



কোকিল

কোকিল বাসা বাঁধে না। কাক ও অন্যান্য পাখির বাসায় ডিম পাড়ে। কাক বা অন্য পাখি সেই ডিমের বাচ্চাকে নিজের মনে করে পালন্ করে।

পাখিশিকারীরা কোকিল ধরে যারা কোকিল পুষতে চায় তাদের বেচে দেয়। গৃহস্থেরা খাঁচায় কোকিল রেখে দেয়। সেই কোকিল প্রায় সারা বছর ধরে ডাকে। তাদের কুহু ডাক শুনে বাড়ির সকলে খুশী হয়। কোকিলকে নিয়মিত পোকামাকড় খেতে দিতে হয়। ক্রমশঃ তারা ফলপাকড়ও খেতে শেখে।



॥ পায়রা ॥

অনেকের বাড়িতে পায়রা থাকে। সাধারণতঃ পায়রার ঝাঁক থাকে। সেই সব পায়রাদের থাকবার জন্যে উঁচু বাঁশের মাচা করে দেওয়া হয়। তার উপরেই তারা বেশির ভাগ সময়েই কাটায়। মাঝে মাঝে আকাশে উড়ে যায় ও বেশ এক চক্কর দিয়ে ঘুরে আসে।

কোন কোন বাড়িতে দেওয়ালের কার্নিসে পায়রারা থাকে। কোথাও দেওয়ালের উপর দিকে কাঠের খোপ রেখে দেওয়া হয়। তাতেও পায়রারা থাকে।



॥ নানা জাতের পায়রা ॥

লোটন, মুক্ষি, সেরাজু, গোলা, পরপণ, লক্কা, গিরেবাজ প্রভৃতি নানা জাতের পায়রা আছে।

সব পায়রাই গলা ফুলিয়ে বকম্‌বকম্ করে ডাকে।

লোটন বা নোটন পায়রা ওড়বার সময় ডিগবাজি খায়। লক্কা পায়রা ময়ূরের মতো লেজ মেলে ধরতে পারে। গিরেবাজ পায়রা খুব উঁচুতে



শিস দিলে পায়রারা উপরে উড়ে যায়

উড়তে পারে। পরপণ পায়রার পায়ে পালক (পর) থাকে। গোলা পায়রা পোষার কোন ঝামেলাই নেই। তারা আপনাআপনি এসে গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। তাদের জন্যে থাকবার কোন জায়গা করে দিতে হয় না। তারা সাধারণতঃ ছাদের কানিসেই থাকে।

পায়রা পোষা যাদের রীতিমতো শখ তারা নীচে দাঁড়িয়ে শিস দিলেই পায়রারা উপরে উড়ে যায় ও ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকে। অনেকেই পায়রার সেই ঘুরে ঘুরে ওড়া, ডিগবাজি খাওয়া প্রভৃতি দেখে বেশ আনন্দ পায়।

॥ পায়রার সাহায্যে খবর পাঠানো ॥

পায়রাকে শিক্ষা দিলে এক বাড়ি থেকে বহু দূরের বাড়িতে খবর পৌঁছে দিতে পারে। তাদের পায়ে একটা ছোট কৌটো বেঁধে দিতে হয়। তার মধ্যে চিঠি থাকে। পায়রা সেই কৌটো সমেত ঠিক ঠিক জায়গায় পৌঁছে যায়। যুদ্ধের সময় পায়রার সাহায্যে ডাক পাঠানো আগেকার দিনে রীতিমতো রেওয়াজ ছিল। অবশ্য এখনও পায়রার সাহায্যে সংবাদ পাঠানো হয়ে থাকে।

॥ পরিচর্যা ॥

পায়রা যে খোপে থাকে, সেই খোপের সামনের দিক্‌টা একটু উঁচু করে রাখতে হয়। তা নাহলে তাদের ডিম গড়িয়ে নীচে পড়ে যেতে পারে। প্রতিটি খোপ তারের জাল দিয়ে ঘিরে দেওয়া দরকার।

পায়রাদের যাতে স্নানের কোন অসুবিধা না হয় তার জন্যে একটা বড় গামলায় করে পরিষ্কার জল রেখে দিতে হয়। পায়রা অনেক থাকলে লম্বা কম গভীর চৌবাচ্চা রাখা ভালো।

পায়রারা যে পাত্র থেকে জল খায় সেই পাত্রের মধ্যে একটা মরচে-ধরা পেরেক রেখে দিলে তাদের শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় লোহার যোগান হয়ে থাকে। এর ফলে পায়রাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে।

॥ খাদ্য ॥

গম, সরষে, ধান, যব, পায়রা-মটর প্রভৃতি পায়রাদের খাদ্য। এ সব ছাদে, উঠানে বা বারান্দায় ছড়িয়ে দিলে তারা খুঁটে খুঁটে খেতে পারে। যেখানে পায়রারা খায় সব সময়ে সেখানে একটা পাত্রে জল রেখে দিতে হয়। তাহলে তারা প্রয়োজনমতো জল খেতে পারে। পায়রাদের খাদ্য ছড়িয়ে না দিলেও চলে। একটা চওড়া কম গভীর পাত্রে করে দিলেও তাদের খাওয়ার অসুবিধা



পায়রারা খুঁটে খুঁটে শস্য খায়

হয় না।

দেখা গেছে, যেখানে সরষে, মটর, ছোলা ইত্যাদি বিক্রি হয়, সেখানে, বিশেষ করে রেলস্টেশনের ধারের মার্কেটে পায়রারা খাওয়ার আশায় ঝাঁক বেঁধে থাকে। কেনাবেচা করার সময় অনেক শস্য চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাদের সেই সব শস্য খুঁটে খুঁটে খাওয়ার সুবিধে হয়।

॥ বুলি-বলা পাখি ॥

ময়না, চন্দনা, টিয়া, শালিক, কাকাতুয়া প্রভৃতি পাখিকে শেখালে মানুষের মতো অনেক কথা বলতে পারে। এ-সবের মধ্যে ময়না খুব সহজেই বুলি বলতে শেখে। অনেক গৃহস্থ সকাল বেলায় ঠাকুর-দেবতার নাম তাদের মুখ থেকে শোনবার জন্যে তাদের তারা, কালী, হরি প্রভৃতি বলতে শেখায়। যে-সব পাখির নাম করা হল, সে-সব পাখি ছাড়া আরো অনেক রকম পাখি বিদেশের লোকের বাড়িতে পোষা হয়। তারা বেশ ভালো বুলি বলতে পারে। কোন কোন পাখিকে শেখাতে হয় না। তারা যা শোনে, তাই বলে। বুলি-বলা পাখিদের সব দেশেই খুব আদর।



॥ টিয়া ও চন্দনা ॥

টিয়া ও চন্দনা প্রায় একই ধরনের পাখি। চন্দনার গলায় একটা লাল ডোরা থাকে। টিয়া পাখির রং সবুজ, ঠোঁট লাল।

টিয়া পাখি ঝাঁক বেঁধে শস্যক্ষেতে নেমে ফসল খায়। সূর্যমুখী জাতীয় ফুলের বীজও খায়। এদের ঠোঁটের খুব ধার। অনেক সময় দেখা গেছে, ফুলসমেত ডাল কেটে মুখে করে নিয়ে টিয়াপাখি উড়ে যাচ্ছে।

লোকে টিয়াকে খাঁচাতেও রেখে পোষে, আবার পায়ে শিকল দিয়ে দাঁড়ের উপরেও রাখে।



টিয়া

এদের খাদ্য নানা ধরনের ফল, ছোলা, মটর ইত্যাদি। ছাতু, কলা, পেয়ারা ইত্যাদি এদের খুব প্রিয় খাদ্য।



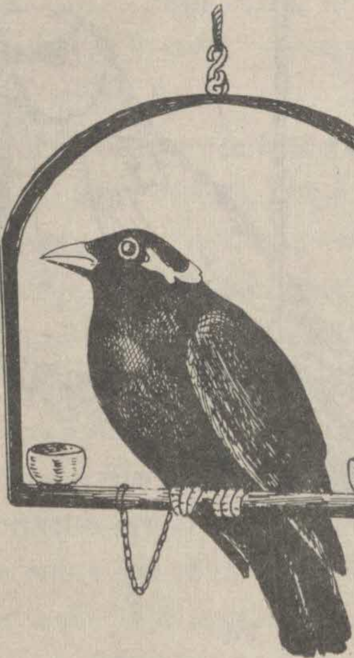
॥ ময়না ॥

ময়না পাখিকে কাঠের বা লোহার শিকের খাঁচায় পোষা হয়।

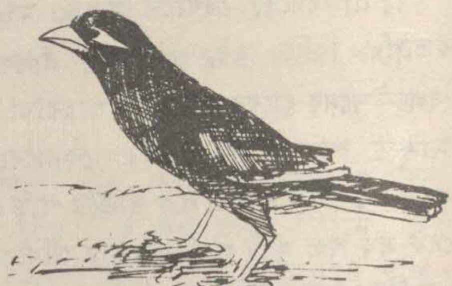
বাড়ির লোকে যে-সব কথা বলে, ময়না তার অনেক কিছুই অনুকরণ করে বলে থাকে। সাধারণতঃ আমাদের দেশের হরবোলা পাখিদের মধ্যে ময়নার কথা খুব স্পষ্ট ও মধুর। এদের কথায় বিশেষ জড়তা থাকে না।

ময়না নানা রকমের ফল, ছাতু, দুধ-ভাত ইত্যাদি খায়।

ময়না খুব সুখী পাখি। সহজেই রোগে আক্রান্ত হয় ও মারা যায়। সেইজন্যে তাদের দিকে বিশেষরূপ দৃষ্টি দিতে হয়।



ময়না







শালিক

॥ শালিক ॥

শালিক বাংলার পল্লী অঞ্চলের অতি সাধারণ পাখি। প্রায় সব সময়েই কিচিরমিচির করে। মনে হয়, ঝগড়া করছে, নিজেদের মধ্যে বাদবিতণ্ডা করছে।

শালিককে খাঁচায় রেখে পুষতে হয়। অনেক সময় পোষা শালিককে ছেড়ে দিলেও উড়ে পালায় না। কখনও উড়ে সামনের গাছে বসে, কখনও ছাদের কার্নিসে বা ঘরের চালে বসে। কিন্তু সন্ধ্যার আগেই উড়ে এসে খাঁচার মধ্যে প্রবেশ করে।

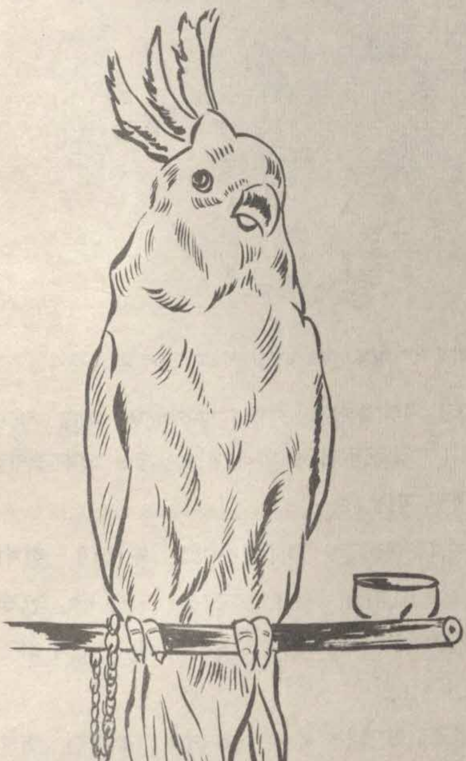
ছাতু, নানা ধরনের ফল, ফড়িংজাতীয় পতঙ্গ ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য।

শেখালে শালিক মানুষের কথার অনুকরণে কথা বলে কিন্তু এদের কথা খুব স্পষ্ট নয়।

॥ কাকাতুয়া।



কাকাতুয়ার মাথায় ঝুঁটি থাকে। আকারে অনেক বড় পাখি। সাধারণতঃ অস্ট্রেলিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী নানা দ্বীপে এদের দেখা যায়।



কাকাতুয়া

কাকাতুয়ার গায়ের রং সাদা। সাদা পালকে হলদে বা লাল রঙের আভাস দেখা যায়।

নিউ গিনির কাকাতুয়া ধূসর রঙের, ঠোঁট লালাভ। এদের ঠোঁটের জোর সাংঘাতিক। যে বাদাম ভাঙতে হাতুড়ির প্রয়োজন, তা এরা সহজেই ঠোঁটের চাপে ভেঙ্গে ফেলতে পারে।

কাকাতুয়াকে পায়ে শিকলি দিয়ে দাঁড়ে রেখে দেওয়া হয়।

কাকাতুয়া খুব ভালো বুলি বলতে পারে।

দাঁড়ের দুদিকে খাবারের বাটি থাকে। তাতে ছোলা, নানা ধরনের কাটা ফল ইত্যাদি রাখা হয়।

॥ বদরিকা ॥



বদরিকা budgerigar শব্দের বিকৃত উচ্চারণ। এই পাখি অনেকেই সযত্নে পোষেন। অস্ট্রেলিয়ার ঝোপে ঝাড়ে এই পাখি অনেক দেখা যায়।



বদরিকা (budgerigar)

বদরিকা পাখি বাইরের খাঁচায় রাখা চলে। তবে অনেকে ঘরের বারান্দায় রাখেন।

বন্দী অবস্থায় বদরিকা পাখি ৫/৭ বৎসর বেঁচে থাকে।

আফ্রিকার তোতাপাখি love-bird-কেও লোকে বদরিকা পাখি বলে। love-bird অনেক জাতের। তন্মধ্যে ছ'রকম পোষ মানে।

বদরিকা পাখি ধূসর, সবুজ, নীল প্রভৃতি নানা রঙের। এই পাখির আকার বড় নয়।

দুধ, নানারকমের ফল ও শস্য প্রভৃতি এদের খাদ্য।

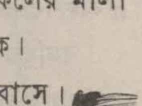
॥ মুনিয়া ॥



মুনিয়া নানা রঙের বেশ ছোট পাখি। একসঙ্গে অনেকগুলি পাখিকে খাঁচায় রেখে পোষা হয়।

খাঁচার মধ্যে টবসমেত গাছ রাখলে তাতে ঘোরাফেরা করে। গাছ থেকে নারকেলের মালা ঝুলিয়ে দিলে সেই মালার মধ্যেও থাকে।

এরা কাঁকনি দানা খেতে খুব ভালবাসে।



॥ বার্ড অব প্যারাডাইস ॥

বার্ড অব প্যারাডাইস (স্বর্গের পাখি) নিউ গিনি ও তার পার্শ্ববর্তী দ্বীপসমূহের পাখি। এদের লেজ খুব লম্বা ও সুন্দর।

৪০ জাতের এই পাখি দেখা যায়। সাধারণতঃ লোকে খুব উঁচু ও বড় খাঁচায় এদের পুষে থাকে।

॥ পাপিয়া ও দোয়েল ॥

পাপিয়া কোকিলজাতীয় পাখি (**hawk-cuckoo**)। খাঁচায় রেখে পুষতে হয়।

দোয়েলকেও খাঁচায় রাখতে হয়। পাপিয়া-দোয়েলের কণ্ঠস্বর খুব মিষ্ট।

এদের পাকা ফল খাওয়ানো হয়। ফড়িং ও অন্যান্য পোকামাকড়ও এরা খেয়ে থাকে।

॥ ময়ূর ॥

ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখি। পুরুষ পাখির পেখম অতি সুন্দর। বর্ষার সমাগমে পুরুষ পাখি পেখম তুলে নৃত্য করে। সে দৃশ্য খুবই সুন্দর।



বর্ষার সমাগমে পুরুষ ময়ূর পেখম তুলে নৃত্য করে

ভারতের বনেজঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্বতে ময়ূর ঘুরে বেড়ায়। ব্রহ্মদেশে ও মালয়েশিয়ায়ও একশ্রেণীর ময়ূর দেখা যায়।

পোষা ময়ূরকে সাধারণতঃ খাঁচায় রাখা হয় না। বাগানে ঘুরে বেড়ায়। তাদের জন্যে উঁচু করে যে দাঁড় রাখা হয়, তাতে বসে রাত কাটায়।

ময়ূরের ডাককে বলে কেকা। কবিরা সেই ডাককে নানাভাবে বর্ণনা করলেও, সে ডাক শুনতে তত মধুর নয়। সাধারণতঃ বর্ষাসমাগমে ময়ূরের কেকারব শোনা যায়।







লিপি ও মুদ্রণ

মানুষ থেকে আরম্ভ করে পৃথিবীর সব জীব তাদের কণ্ঠস্বর দিয়ে মনের ভাব প্রকাশ করে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা মুখ দিয়ে শব্দ করে কিন্তু তারা কী বলে, তা আমরা বুঝতে পারি না। অবশ্য, প্রাণীরা পরস্পরে তাদের কণ্ঠস্বরে কী ভাব প্রকাশিত হচ্ছে, তা বুঝতে পারে।

মানুষ কথা বলে তার মনের ভাব ব্যক্ত করে। সেই কথা এক বা একাধিক শব্দের সমষ্টি। যে-সব শব্দ পর পর উচ্চারণ করে মানুষ তার মনের ভাব প্রকাশ করে তার নাম ভাষা। পৃথিবীর সব জাতির মানুষেরই নিজস্ব ভাষা আছে।

এই ভাষা দিয়ে আমরা পরস্পরের মধ্যে ভাব-বিনিময় করি। বড় জোর একটা সভায় অনেককে মনের ভাব জানাই। যখন মনের কথা জানাই, তখন সকলেই বোঝে, কিন্তু বহু দিন পরে সে-সব কথা হারিয়ে যায়।

এইজন্যে মানুষ ভাষাকে ধরে রাখবার জন্যে লিপি বা অক্ষরমালার সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর সব দেশের সব জাতির লোকের নিজস্ব লিপি বা অক্ষরমালা আছে। সেই সব লিপি বা অক্ষরমালা হাতে লিখে বা ছেপে রেখে দিলে পরে তা পড়ে লোকে বুঝতে পারে, আগেকার সময়ে কী কথা বলা হয়েছিল। বহু যুগ পরেও সেই সব লিপি বা অক্ষরমালার মাধ্যমে মানুষের মনের কথা জানা যায়।

আদিম যুগে বনে জঙ্গলে, পাহাড়ে পর্বতে নানা দেশে নানা ধরনের মানুষ ছিল। তারা লিখতে পড়তে জানত না। তাদের কণ্ঠস্বরের মাধ্যমে পরস্পরে মনের ভাব বুঝত। সেই সময়ে তারাও কিছু এঁকে বা লিখে রাখবার চেষ্টা করত।

তারা যে-সব গুহায় বাস করত, সেই সব গুহার গায়ে তারা সে-যুগের দেখা জন্তু-জানোয়ারের ছবি আঁকতে শুরু করল। প্রাচীন প্রস্তরযুগের

শেষের দিকের মানুষেরা এই ভাবে পাহাড়ের গুহার গাত্রে অনেক ছবি আঁকত। শুধু তাই নয়, রঙ দিয়ে নানা রেখা বা চিহ্ন গুহাগাত্রে এঁকে রাখত। হয়তো সে-যুগের সেই সব চিহ্ন বা রেখাই লিপি বা অক্ষরমালা।

অবশ্য এই ধরনের রেখা বা চিহ্ন বেশী দেখা যায় নি। জন্তুজানোয়ারের ছবিরও সন্ধান বেশী পাওয়া যায় নি। নানা দেশের বিভিন্ন গুহাগাত্রের ছবি নিপুণভাবে আঁকা না হলেও সেগুলির মধ্যে বৈচিত্র্য খুঁজে পাওয়া গেছে।

যত দিন যেতে লাগল, মানুষ পাহাড়ের গুহার দেওয়ালে বা পাথরের গায়ে আরো নানা ছবি আঁকতে লাগল। এ-সব ছবি শুধু জন্তু-জানোয়ারের নয়, মানুষের নানা ধরনের কাজের ছবি। কোথাও দেখা গেছে, মানুষ পশু শিকার করছে, কেউ মাছ ধরছে, কেউ কেউ মধু সংগ্রহ করছে, কেউ কেউ দল বেঁধে যুদ্ধে যাচ্ছে, কেউ কেউ বা একসঙ্গে নাচছে। এ ধরনের ছবির সংখ্যা হয়তো পৃথিবীতে অনেক ছিল। কিন্তু কাঁচা রঙে আঁকা ছবি বহুকালের জলবৃষ্টিতে ধুয়ে গেছে। কাজেই সে-সবের সন্ধান খুব কমই পাওয়া গেছে।

সভ্যতার ইতিহাসে ধ্বন্যাত্মক অক্ষর বা বর্ণমালার উদ্ভব খুবই চিত্তাকর্ষক। ৬ হাজার বছরেরও আগে চিত্রলিপি থেকে ধ্বনিলিপির বিকাশ শুরু হয়। মানবসভ্যতার শুরু থেকে ভাষাকে লেখ্যরূপ দেবার আবশ্যকতা দেখা দেয়।

অতি প্রাচীন কালে মৃৎপাত্রের উপর যে-সব চিহ্ন বা প্রতীক ও অলংকরণের ধারা প্রচলিত ছিল তা থেকে লেখার পদ্ধতি দেখা দেয়।

অক্ষর বিকাশের চারটি স্তর—চিত্ররীতি, ভাবচিত্ররীতি, মিশ্ররীতি, অক্ষরলিপি ও সুমেরীয় লিপি।

॥ চিত্ররীতি ॥

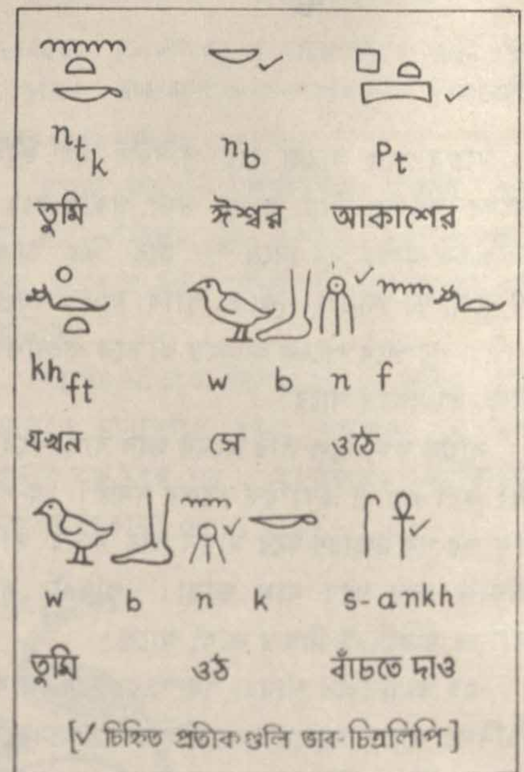
চিত্রের সাহায্যে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা।

॥ ভাবচিত্ররীতি ॥

প্রাচীনকালে চিত্ররীতি ছিল বস্তু বা ক্রিয়ার চিত্র অঙ্কনেই সীমাবদ্ধ। তা থেকেই বস্তুর গুণ-প্রকাশের চিত্ররূপ ব্যবহারের প্রয়াস দেখা দেয়। তাকেই বলে ভাবচিত্ররীতি বা **picto-ideagraphic method**।

॥ মিশ্ররীতি ॥

চিত্র বা প্রতীক দ্বারা ধ্বনি রূপায়ণের চেষ্টাকে বলে মিশ্ররীতি। মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ (**hieroglyph**) মিশ্ররীতির উদাহরণ।



মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ

॥ অক্ষরলিপি ॥

শব্দলিপি থেকে অক্ষরলিপি (**syllable**

script)-র উদ্ভব।

॥ সুমেরীয় লিপি ॥

বর্তমান ইরাকের ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর দোয়াব অঞ্চলে সুমেরীয়রা সর্বপ্রথম লিপির ব্যবহার শুরু করে।



সুমেরীয় লিপি

গ্রীকরা ইরাক ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহের নাম দিয়েছিল মেসোপটেমিয়া। এর সর্বদক্ষিণে বাস করত সুমেরীয়রা। তাদের রাজধানী ছিল ব্যাবিলনিয়া। উত্তরে বাস করত অ্যাসিরীয় জাতি। তারও উত্তরে বাস করত আক্কাদরা। এরা সকলেই সেমিতিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। সুমেরীয়রা কাঁচা মাটির ফলকে এক খণ্ড কাঠ বা শর দিয়ে লিখত। তাদের চিত্রাক্ষরগুলি ছিল বাণমুখ লিপি বা কীলকাক্ষর (cuneiform)।

আক্কাদরা সুমেরীয় লিপিই গ্রহণ করে। তারা প্রতীক বা চিত্র-সংখ্যা ৬০০তে কমিয়ে আনে।

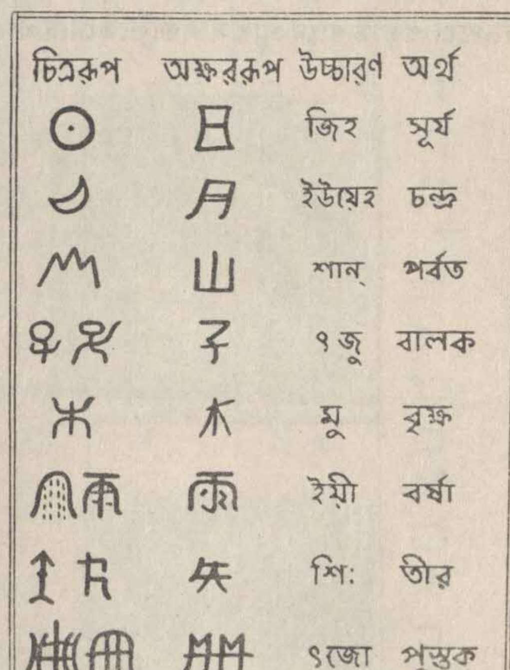
॥ মিশরীয় লিপি ॥

পণ্ডিতদের মতে মিশরীয় লিপি এশিয়া থেকে আনয়ন-করা কোন সেমিতিক লিপি থেকে জাত। মিশরীয় লিপি মিশ্ররীতির। মিশরীয় ধ্বন্যাত্মক লিপির ২৪টি চিহ্ন গ্রহণ করেই ফিনিসীয়রা ধ্বনিলিপির রূপদান করে। তা থেকেই ইউরোপীয় বর্ণমালা গঠিত হয়।



॥ চীনা লিপি ॥

সম্ভবতঃ চীন-সম্রাট্ ফু-শি (২৮৫২-২৭৩৮ খ্রী. পূর্বাব্দ) চীনা লিপির উদ্ভাবন করেন। চীনা ভাষা



চীনা লিপি

একাক্ষর শব্দবহুল বলে লিপি একাক্ষর রয়ে গেছে। এত দীর্ঘকালেও তার আর কোন রূপান্তর ঘটে নি। চীনা ভাষায় প্রায় ৫০ হাজার শব্দবাচক চিহ্ন আছে।

॥ জাপানী লিপি ॥

জাপানে চীনা লিপির প্রচলন ছিল। তা থেকে জাপানীরা ধ্বনিবাচক লিপি তৈরি করে নিয়েছে।

হাজার হাজার চীনা ভাবচিত্রলিপি তথা ধ্বন্যাত্মক অক্ষরের স্থানে জাপানীরা ৪৭টি অক্ষর বা syllable গড়ে তুলেছে।



॥ সিন্ধুলিপি ॥

সিন্ধু নদের অববাহিকায় হরপ্পা, মোহেন-জো-দরো প্রভৃতি স্থানে যে প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তা মিশরীয় বা সুমেরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। হরপ্পা, মোহেন-জো-দরো প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত সীলগুলিতে মোট প্রায়



মোহেন-জো-দরোর সীল

৪০০ চিহ্ন, প্রতীক বা অক্ষর দেখা যায়। আজও এইগুলির পাঠোদ্ধার করা যায় নি। কোন কোন প্রতীকে পরবর্তী কালে ভারতে প্রচলিত ব্রাহ্মী-লিপির ন্যায় স্বরচিহ্নের সংযোগ লক্ষ্য করা গেছে।

॥ আরামীয় লিপি ॥

পশ্চিম এশিয়ার সিরিয়ার উত্তর ভাগে প্রাচীন সেমিতিক লিপি গড়ে ওঠে। ডেড সীর তীরে এক পাহাড়ের গুহায় আরামীয় লিপিতে লেখা ওল্ড টেস্টামেন্টের চামড়ার গুটানো পুঁথি (Dead Sea Scroll) পাওয়া গেছে। তা থেকে পারস্যের পহ্লবী লিপি গড়ে উঠেছে। জরথুস্ত্রবাদীদের জেন্দ্-আবেস্তা পহ্লবী লিপিতে লেখা।

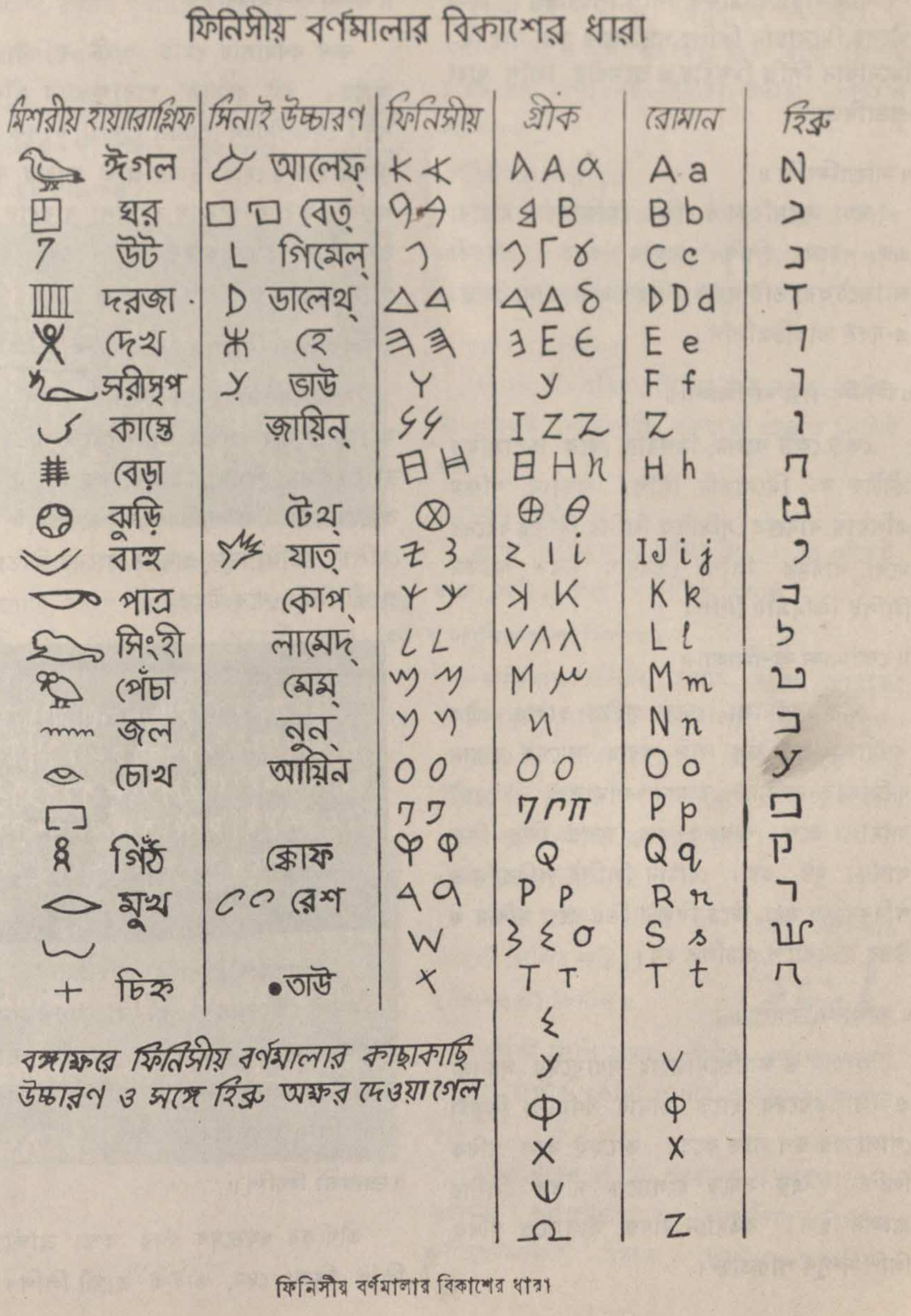
অশোকের অনুশাসনে ব্যবহৃত খরোষ্ঠী লিপি আরামীয় লিপি থেকে জাত।

আরবী হরফ থেকে তুর্কী, উর্দু, ফারসী ও আধুনিক মিশরীয় লিপির উদ্ভব



॥ মিনোয়ান লিপি ॥

ভূমধ্যসাগরের ক্রীট দ্বীপের মিনোস রাজাদের প্রাসাদে যে অজস্র লেখফলক পাওয়া গেছে, সে-সব দেখে মনে হয়, ক্রীটের অধিবাসীরা



ফিনিসীয় বর্ণমালার বিকাশের ধারা

মিশরীয় হায়ারোগ্লিফিক লিপি শিখেছিল। ক্রীট দ্বীপের মিনোয়ান লিপির পাঠোদ্ধার করা যায় নি মিনোয়ান লিপি মিশরীয় ও সুমেরীয় লিপি দ্বারা প্রভাবিত।

॥ মায়ালিপি ॥

মধ্য আমেরিকা ও দক্ষিণ মেক্সিকোর মায়ারা এক ধরনের লিপি ব্যবহার করত। পরবর্তী অ্যাজটেকরা তাই ব্যবহার করত বলে জানা গেছে। এ-সবই ভাবচিত্রলিপি।

॥ ফিনিসীয় বর্ণমালা ॥

কেউ কেউ বলেন, মিশরীয় থেকে রূপান্তরিত ক্রীটীয় বা মিনোয়ান লিপির প্রভাবে পশ্চিম এশিয়ায় ব্যবহৃত সেমিতিক লিপির বিভিন্ন ধরনের মধ্যে বাণমুখ লিপির প্রেরণায় উদ্ভূত অন্যতম লিপিই ফিনিসীয় লিপি।

॥ রোমান বর্ণমালা ॥

গ্রীক বর্ণমালা থেকে গৃহীত হলেও গ্রীক বর্ণমালা পূর্ণ রূপ লাভ করার আগেই রোমান বর্ণমালার সৃষ্টি। রোমান বর্ণমালাই ইংরেজী বর্ণমালা রূপে ব্যবহৃত হয়, অবশ্য কিছু কিছু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। রোমান লিপিই পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের মধ্য দিয়ে কিছুটা ভিন্ন রূপে পশ্চিম ও উত্তর ইউরোপে প্রচলিত হয়।

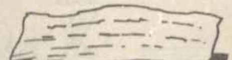
॥ গথিক লিপি ॥

জার্মান ও স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার মধ্যযুগের সন্ন্যাসী ও লিপিকরদের হাতে রোমান বর্ণমালা কিছুটা গোলাকার রূপ লাভ করে। তাকেই বলে গথিক লিপি। এক সময়ে ইংল্যাণ্ডে গথিক লিপির প্রচলন ছিল। বর্তমানে অবশ্য ইংল্যাণ্ডে গথিক লিপি সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত।

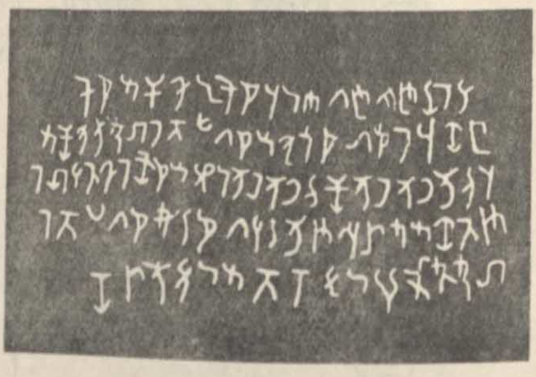
॥ রুশ বর্ণমালা ॥

রুশ বর্ণমালায় মোট ৩৩টি বর্ণ বা প্রতীক আছে। এই বর্ণমালা পরোক্ষভাবে গ্রীক থেকে সৃষ্ট। সেণ্ট সিরিল (Saint Cyril, ৮২৭-৮৬৯ খ্রী.) বুলগেরিয়া ও মোরাভিয়ার স্লাভ ভাষায় বাইবেল অনুবাদ করতে গিয়ে যে বর্ণমালা ব্যবহার করেন, তাই হচ্ছে সিরিলিক বর্ণমালা। তা থেকেই রুশ, পোল প্রভৃতি স্লাভ বর্ণমালা গড়ে ওঠে।

॥ ভারতীয় লিপি ॥



বর্তমানে ভারতবর্ষে যে-সব লিপি প্রচলিত আছে, সে-সব ব্রাহ্মী লিপি থেকে গঠিত। শুধু ভারতের নয়, শ্রীলঙ্কা, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া), ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপিন্‌জ্‌ প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন লিপি ব্রাহ্মী লিপি থেকে উদ্ভূত।



অশোকের অনুশাসন : খরোষ্ঠী লিপি

সম্রাট্ অশোকের লেখ বা অনুশাসন সবই প্রাকৃত ভাষায় এবং গ্রীক, খরোষ্ঠী, ব্রাহ্মী ও আরামীয় অক্ষরে লেখা। অধিকাংশ অনুশাসন ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা।

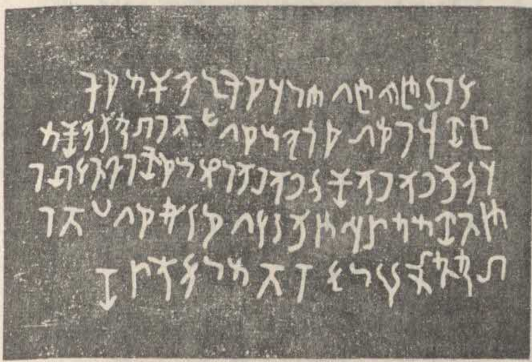
॥ ব্রাহ্মী লিপি ॥

তীর্থংকর ঋষভদেব তাঁর কন্যা ব্রাহ্মীকে যে লিপি শিক্ষা দেন, তাই-ই ব্রাহ্মী লিপি। কেউ

কেউ বলেন, ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত লিপিই ব্রাহ্মী।

॥ খরোষ্ঠী লিপি ॥

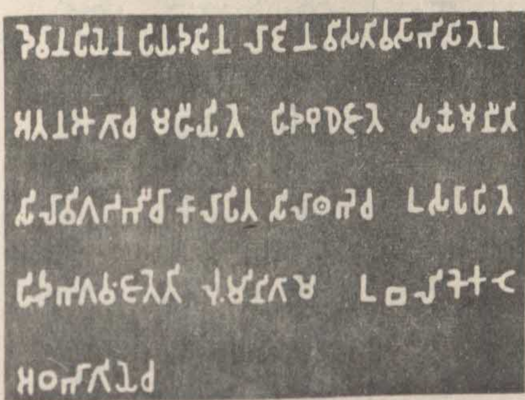
পশ্চিম এশিয়ার আরামীয় লিপির পরিবর্তিত অক্ষরগুলি খর বা গাধার ওষ্ঠের মতো দেখতে বলে খরোষ্ঠী এই নাম হয়।



অশোকের রুম্মিনদেঈ স্তম্ভ অনুশাসন

খরোষ্ঠী লিপি সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার অনুকূল নয় বলে কয়েক শতাব্দী পরে এর অবলুপ্তি ঘটে।

সম্রাট অশোকের পরে ধীরে ধীরে ব্রাহ্মী লিপির



অশোক লিপি

পরিবর্তন ঘটতে থাকে। গুপ্তযুগের পর-খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী থেকে ৯ম শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মী লিপির চারটি রূপ দেখা দেয়—উদীচ্য, প্রতীচ্য, প্রাচ্য ও দাক্ষিণাত্য।

॥ উদীচ্য লিপি ॥

উদীচ্য বা উত্তরাঞ্চলের লিপি শারদা লিপি নামে খ্যাত। এই শারদা লিপি থেকেই পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের গুরুমুখী লিপির উদ্ভব।

॥ প্রতীচ্য লিপি ॥

প্রতীচ্য বা পশ্চিমা লিপির নাম নাগর লিপি। তা থেকেই দেবনাগরী, গুজরাতী প্রভৃতি লিপির সৃষ্টি।

॥ প্রাচ্য লিপি ॥

প্রাচ্য লিপির নাম কুটিলা লিপি। এ থেকেই বাংলা, ওড়িয়া ইত্যাদি লিপির বিকাশ।

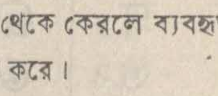
॥ দাক্ষিণাত্য লিপি ॥

দাক্ষিণাত্য লিপি অর্থাৎ দক্ষিণ ভারতের লিপিসমূহ ব্রাহ্মী অক্ষরমালা থেকে উদ্ভূত। তেলেগু ও কানাড়ী ব্রাহ্মী লিপি থেকে গড়ে উঠেছে। তামিড় বর্ণমালা থেকে কেরলে ব্যবহৃত মালয়ালম বর্ণমালা রূপ লাভ করে।

॥ সিংহলী লিপি ॥

ব্রাহ্মীর কোন দক্ষিণী রূপ থেকে শ্রীলঙ্কার সিংহলী লিপির সৃষ্টি।

॥ তিব্বতী লিপি ॥

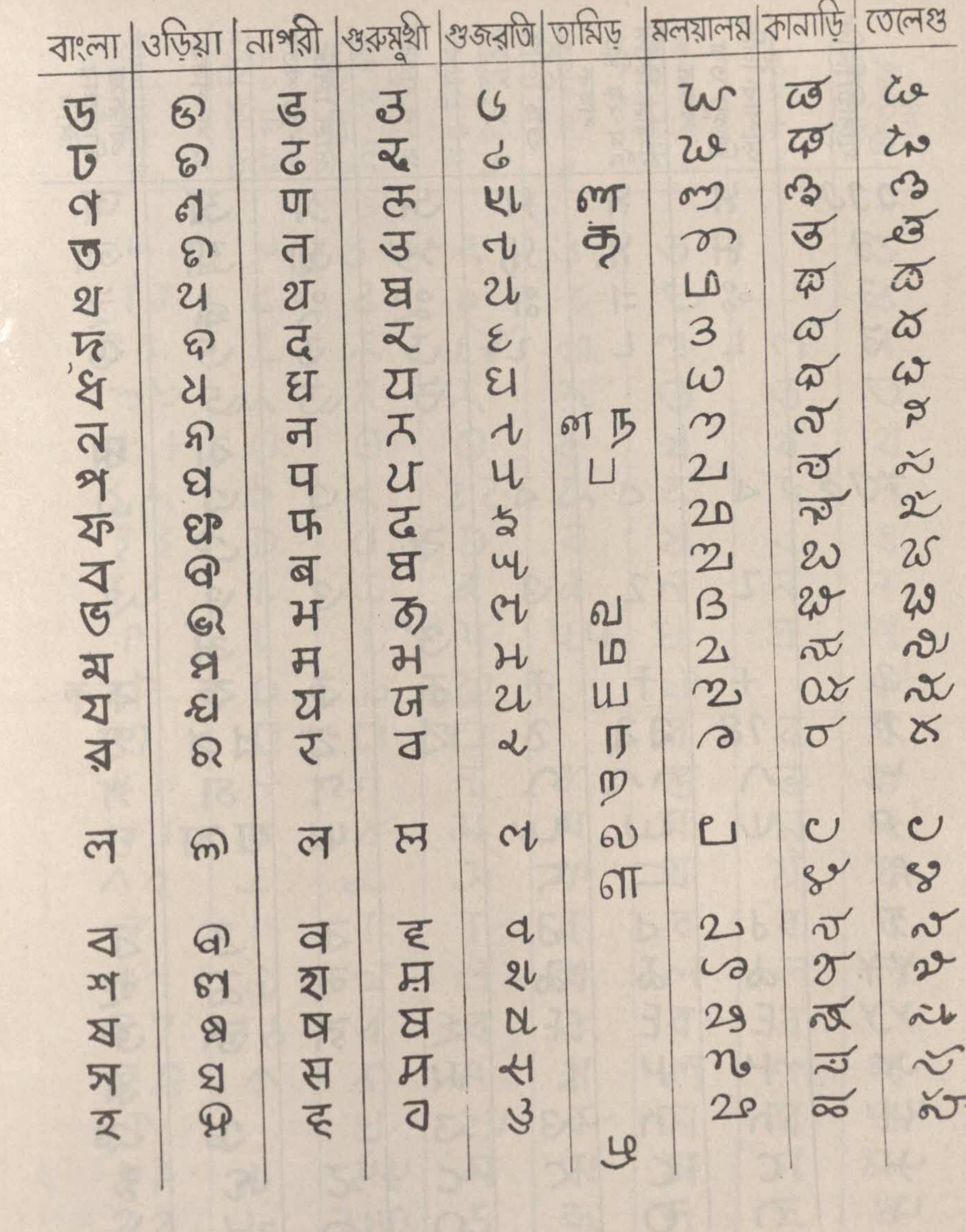


তিব্বতী লিপি সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় একাদশ-দ্বাদশ শতকে ব্রাহ্মীর কোন প্রাচীন রূপ অনুযায়ী গড়ে ওঠে।

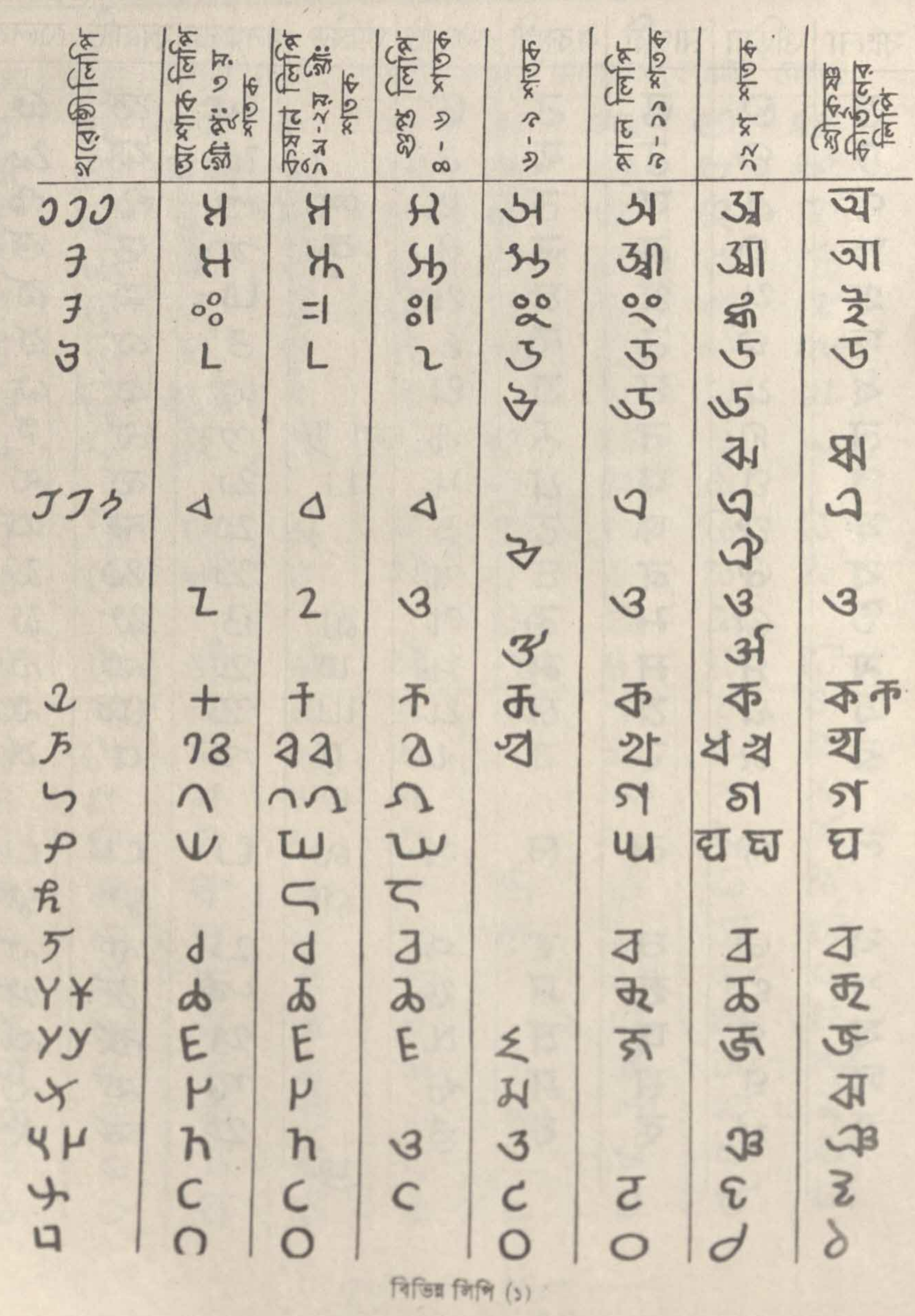
ভারতীয়দের দ্বারাই শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), কম্বোজ (কাম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়া), চম্পা (ভিয়েতনাম), সুমাত্রা, যবদ্বীপ, কোরিয়া,

বাংলা	ওড়িয়া	নাগরী	গুরুমুখী	গুজরাতী	তামিড়	মলয়ালম	কানাড়ি	তেলেগু
অ	ଅ	अ अ	ਅ	અ	அ	അ	ಅ	అ
আ	ଆ	आ आ	ਆ	આ	ஆ	ആ	ಆ	ఆ
ই	ଇ	इ	ਇ	ઇ	இ	ഇ	ಇ	ఇ
ঈ	ଈ	ई	ਈ	ઈ	ஈ	ഈ	ಈ	ఈ
উ	ଉ	उ	ਉ	ઉ	உ	ഉ	ಉ	ఉ
ঊ	ଊ	ऊ	ਊ	ઊ	ஊ	ഊ	ಊ	ఊ
ঋ	ଋ	ऋ	ਰਿ	ઋ		ഋ	ಋ	ఋ
এ	ଏ	ए	ਏ	એ	எ	എ	ಎ	ఎ
					ஏ	ഏ	ಏ	
ঐ	ଐ	ऐ	ਐ	ઐ	ஐ	ഐ	ಐ	ఐ
ও	ଓ	ओ	ਓ	ઓ	ஒ	ഒ	ಒ	ఒ
					ஓ	ഓ	ಓ	
ঔ	ଔ	औ	ਔ	ઔ	ஔ	ഔ	ಔ	ఔ
ক	କ	क	ਕ	ક	க	ക	ಕ	క
খ	ଖ	ख	ਖ	ખ		ഖ	ಖ	ఖ
গ	ଗ	ग	ਗ	ગ		ഗ	ಗ	గ
ঘ	ଘ	घ	ਘ	ઘ		ഘ	ಘ	ఘ
ঙ	ଙ	ङ	ਙ	ઙ	ங	ങ	ಙ	ఙ
চ	ଚ	च	ਚ	ચ	ச	ച	ಚ	చ
ছ	ଛ	छ	ਛ	છ		ഛ	ಛ	ఛ
জ	ଜ	ज	ਜ	જ		ജ	ಜ	జ
ঝ	ଝ	झ	ਝ	ઝ		ഝ	ಝ	ఝ
ঞ	ଞ	ञ	ਞ	ઞ	ஞ	ഞ	ಞ	ఞ
ট	ଟ	ट	ਟ	ટ		ട	ಟ	ట
ঠ	ଠ	ठ	ਠ	ઠ	ட	ഠ	ಠ	ఠ

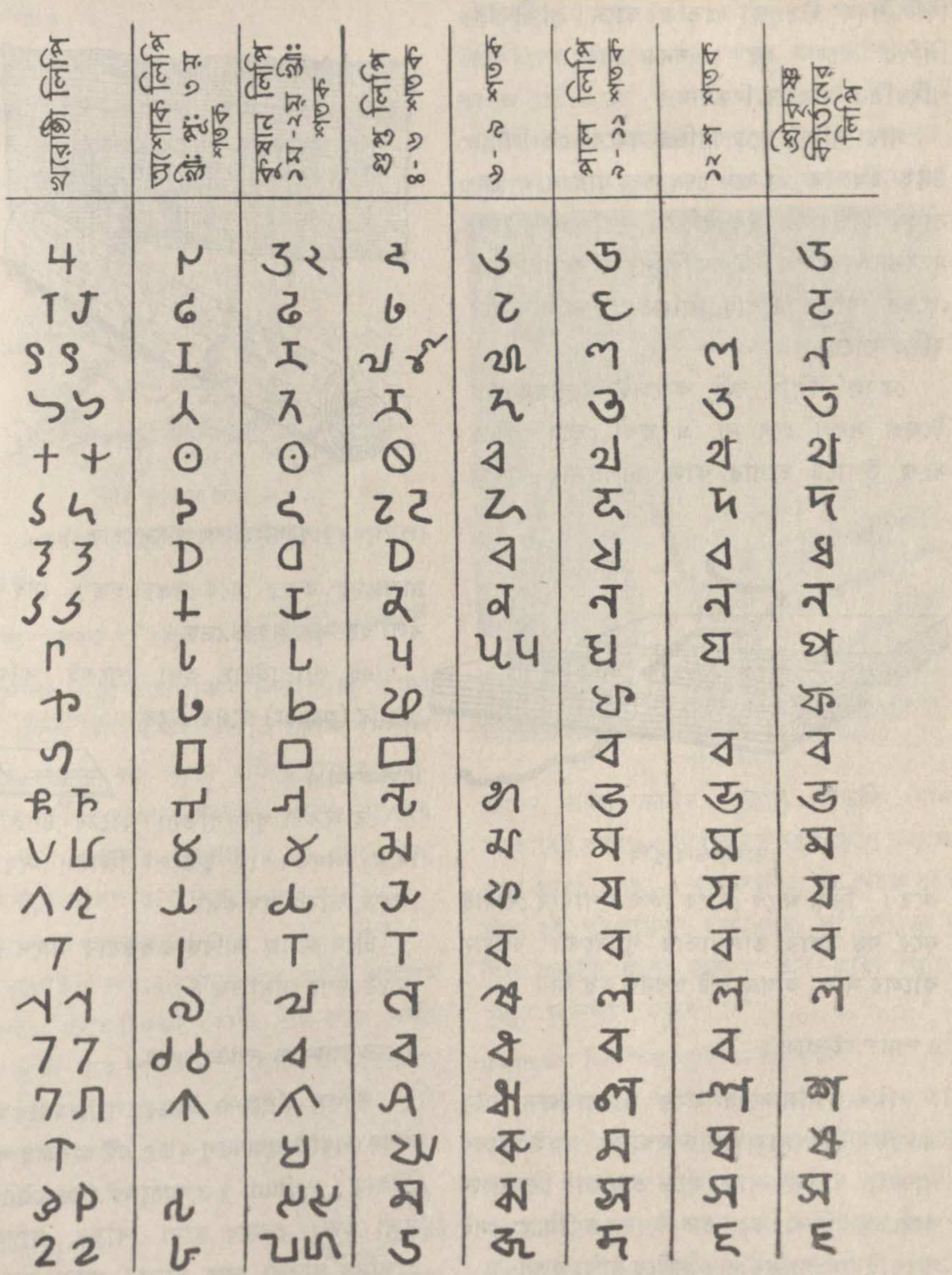
আধুনিক ভারতীয় লিপিসমূহ (১)



আধুনিক ভারতীয় লিপিসমূহ (২)


খরোষ্ঠী লিপি
অশোক লিপি খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক
কুষাণ লিপি ১ম-২য় খ্রীঃ শতক
গুপ্ত লিপি ৪-৬ শতক
৬-৯ শতক
পাল লিপি ৯-১১ শতক
১২শ শতক
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি

বিভিন্ন লিপি (১)


খরোষ্ঠী লিপি
অশোক লিপি খ্রীঃ পূঃ ৩য় শতক
কুষান লিপি ১ম-২য় খ্রীঃ শতক
গুপ্ত লিপি ৪-৬ শতক
৬-৯ শতক
পাল লিপি ৯-১১ শতক
১২শ শতক
শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লিপি

বিভিন্ন লিপি (২)

ফিলিপিন্‌জ্‌ দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মীজাত লিপির প্রচলন হয়। এখনও সেই সব লিপি পরিবর্তিত আকারে বিদ্যমান।

সারা পৃথিবী জুড়ে বিভিন্ন সময়ে এত লিপির উদ্ভব হয় যে তা বলে শেষ করা যায় না। সে-সবের ইতিহাসও খুব বিচিত্র। পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সেই-সব লিপির ইতিহাস বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় লিখিত পুস্তকে সবিস্তারে বর্ণিত আছে।

কেবল লিপি সৃষ্টি করলেই মনুষ্যসমাজের উদ্দেশ্য সফল হবে না, এ কথা ভেবে লোকে সহজ উপায়ে ছাপার কাজ চালানোর ব্যবস্থা



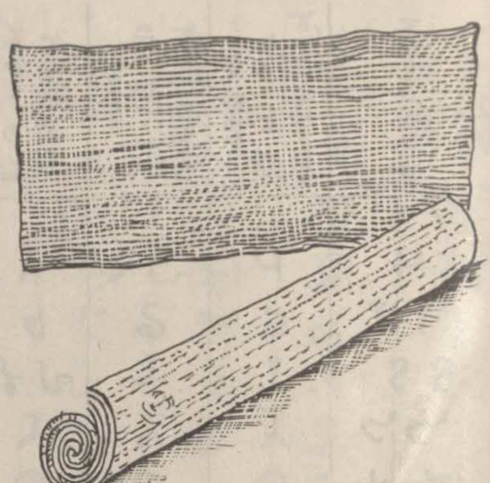
তালপাতার পুঁথি

করে। কিন্তু আগে লোকে লিখত পাথরে খোদাই করে, বড় জোর তালপাতার পুঁথিতে। বর্তমান কালের মতো কাগজ সৃষ্টি তখনও হয় নি।

॥ প্যাপাইরাস ॥

মিশরে নীল নদের ধারে প্যাপাইরাস নামে একরকম নলখাগড়ার গাছ জন্মায়। সেই গাছের পাতলা পাতলা পাত জুড়ে তখনকার দিনে লম্বা কাগজের মতো করা হত। তাতে লিখে সেই প্যাপাইরাস গাছের পাত গুটিয়ে রাখা হত।

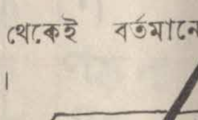
প্যাপাইরাসের পাতে লেখা বই মিশরের



প্যাপাইরাসের গুটানো পাত

রাজাদের কবরে রেখে দেওয়া হত। সেই বইকে বলা হয় 'বুক অব দ্য ডেড্‌'।

এই প্যাপাইরাস কথা থেকেই বর্তমানের পেপার (**paper**) শব্দের উদ্ভব।



॥ কলম ॥

রোমকেরা খুব পাতলা কাঠের উপর কালি দিয়ে লিখত। যে ছুঁচলো জিনিস দিয়ে তারা লিখত, তারই নাম কলম।

চীনে কাগজ আবিষ্কার হওয়ার আগে রেশমী বস্ত্রের উপর লেখা হত।

॥ ভেলাম ও পার্চমেণ্ট ॥

পশ্চিম এশিয়া ও ইউরোপে চামড়ার পাতের উপর লেখার প্রথা চালু হয়। এই চামড়ার পাতকে ভেলাম (**vellum**) ও পার্চমেণ্ট (**parchment**) বলা হত। ভেড়ার ছানা, বাছুর, ছাগলছানা প্রভৃতির পাতলা মসৃণ চামড়া থেকে ভেলাম ও পার্চমেণ্টের সৃষ্টি হত।

॥ ভূর্জপত্র ॥

আমাদের দেশে বহু কাল আগে ভূর্জপত্রে লেখা চালু হয়। এই ভূর্জপত্র কোন গাছের পাতা



ঋষি ভূর্জপত্রে লিখছেন।

নয়। একরকম গাছের ছালের উপরকার পাতলা আবরণ।

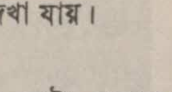
॥ তালপাতার পুঁথি ॥



ভূর্জপত্র ছাড়া তালপাতায় লিখে সেই পাতা গেঁথে বইয়ের আকার করা হত। ভারত, নেপাল প্রভৃতি দেশের বহু স্থানে হাজার হাজার তাল-পাতার পুঁথি পাওয়া গেছে। এখনও বাংলার সুদূর পল্লী অঞ্চলের পাঠশালায় বা টোলে বহু শিক্ষার্থীকে তালপাতায় লিখতে দেখা যায়।

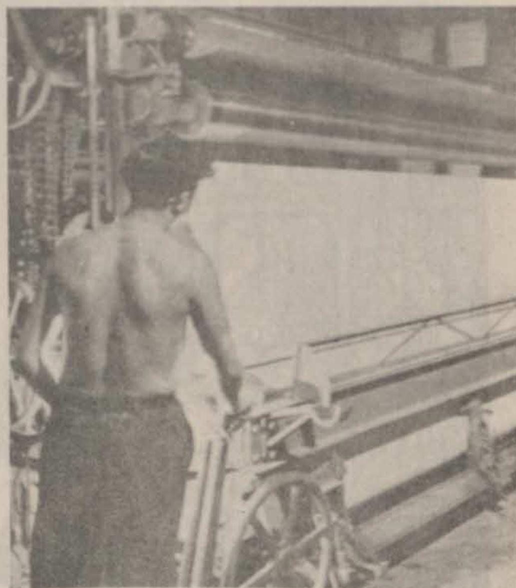
॥ তুলোট কাগজ ॥

তুলোট একধরনের হাতে-গড়া মোটা খসখসে কাগজ। এতে ঠিকুজী, কোষ্ঠী, দলিলপত্র, ধর্মীয় গ্রন্থ লেখা হয়ে থাকে। তুলোট কাগজে লেখা পুঁথিরও সন্ধান পাওয়া গেছে। সে-সব পুঁথি অধিকাংশই ধর্মীয় গ্রন্থ। এখনও কোথাও কোথাও তুলোট কাগজ চালু আছে।



॥ কাগজ ॥

ঘাস, আখের ছিবড়া, বাঁশ, নানা ধরনের গাছ, কাঠ প্রভৃতি ভিজিয়ে, পচিয়ে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে মণ্ড (pulp) করা হয়। সেই মণ্ড থেকে আধুনিক উন্নত যন্ত্রের সাহায্যে বহু রকমের, বহু আকারের কাগজ তৈরী হচ্ছে। সে-সব কাগজ কোনটা পুরু, কোনটা পাতলা, কোনটা খসখসে, কোনটা মসৃণ। ফুলস্ক্যাপ, ডবল ফুলস্ক্যাপ, ডিমাই, ডবল ডিমাই,



কাগজ কল

ক্রাউন, ডবল ক্রাউন, রয়্যাল প্রভৃতি নানা আকারের কাগজ পৃথিবীর সব উন্নত দেশে কাগজ-কলে প্রস্তুত হচ্ছে। কাগজসৃষ্টির পর থেকে সহস্র সহস্র বই, পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র, পুস্তিকা, হ্যাণ্ড-বিল প্রভৃতি ছাপা হচ্ছে। তার দ্বারা লোকে প্রভূত জ্ঞানলাভ করছে।

॥ বাংলা লিপির মুদ্রিত রূপ ॥

নবম শতকে বাংলালিপি প্রচলিত হলেও তার মুদ্রিত রূপ প্রথম দেখা যায় ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দের একটি বইয়ে। ১৭২৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির লাইপসিগ নগরে মুদ্রিত গেয়র্ক যাকব কের (Georg Jacob Kehr)-প্রণীত একটি লাতিন গ্রন্থে এক থেকে এগার পর্যন্ত বাংলা সংখ্যা ও শ্রীসরজন্ত বলপকাং

মারের (Sergeant Wolfgang Meryer) এই জার্মান নামটি বাংলা অক্ষরে ছাপা দেখা যায়।

১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ডের লাইডেন শহরে মুদ্রিত ডেভিড মিলিনস-প্রণীত লাতিন ভাষায় রচিত হিন্দুস্থানী ব্যাকরণেও বাংলা বর্ণমালার প্রতিলিপি দেখা যায়।



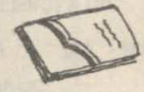
প্রাচীনকালের ছাপাখানা

এদেশে বাংলায় বই ছাপানোর প্রয়াস আরম্ভ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। দেশীয় ভাষায় হরফ তৈরির কারখানা কলকাতাতেই প্রথম স্থাপিত হয়। পরে শ্রীরামপুরে স্থানান্তরিত হয়।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইংরেজ করণিক স্যার চার্লস উইলকিন্স প্রাচীন পুঁথির অক্ষর এবং কালীকুমার রায় ও খুসমৎ মুন্সীর হস্তাক্ষর মিলিয়ে বাংলা অক্ষরসমূহের একটা রূপ দেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা ফলবতী হয় না।

পোর্তুগিজ পাদরীরাই সকলের আগে তিনখানি বাংলা বই ছাপেন। সেগুলি পোর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ছাপা হয়। একখানি বইয়ের নাম 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'। বইখানি বাংলা। তবে তা রোমান হরফে ছাপা হয়।

॥ বাংলা অক্ষরে ছাপা বই ॥



এদেশে সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষরে ছাপা বই হচ্ছে ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেড (Nathaniel Brassy Halhed, ১৭৫১-১৮৩০ খ্রী.) কর্তৃক ছাপা বাংলা অক্ষর, শব্দ ও বাক্য সমেত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ।

॥ পঞ্চানন কর্মকার ॥

স্যার চার্লস উইলকিন্স (Sir Charles Wilkins, ১৭৫০-১৮৩৮ খ্রী.) প্রথম বাংলা হরফ কাটেন। পঞ্চানন কর্মকার ও তাঁর জামাতা মনোহর কর্মকার এই কাজে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করেন।

পঞ্চানন কর্মকার শুধু বাংলা অক্ষর তৈরি করেই ক্ষান্ত হন নি। তিনি সর্বশুদ্ধ চৌত্রিশটি ভারতীয় ভাষা ও চৈনিক ভাষারও ধাতুনির্মিত অক্ষর তৈরি করেন।



কেরী সাহেবের ছাপাখানা

পঞ্চানন ও মনোহরের তৈরী হরফেই 'A Grammar to the Bengal Language'-নামক গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। 'সমাচার দর্পণ',

'দিগ্‌দর্শন' প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকা তাঁদের তৈরী হরফেই মুদ্রিত হয়। কেউ কেউ পঞ্চাননকে বাংলার ক্যাক্সটন বলেন।



শ্রীরামপুরের পাদরী উইলিয়াম কেরী (William Carey, ১৭৬১-১৮৩৪ খ্রী.) উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে ছাপাখানা খোলেন, তা ভারতের মুদ্রণ-চর্চার ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে।

যতদূর জানা গেছে, খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চীনদেশে মুদ্রণ-পদ্ধতির সূচনা হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে ও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমে পৃথক্‌ পৃথক্‌ হরফ তৈরী হয়। সে-যুগে অবশ্য চীনে মুদ্রণের উন্নতি হয় নি।

॥ যোহান গুটেনবার্গ ॥

১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির যোহান গুটেনবার্গ (Johann Gutenberg, ১৪০০-১৪৬৮ খ্রী.) প্রথম পৃথক্‌ পৃথক্‌ হরফ সৃষ্টি করেন ও সে-সবের দ্বারা মুদ্রণ-পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। হার্লেমের লরেন্স কোস্টার (Laurens Koster)-ও প্রথম পৃথক্‌ পৃথক্‌ হরফ সৃষ্টি করেন বলে দাবি করেন।



গুটেনবার্গ

॥ ক্যাক্সটন ॥

১৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাক্সটন (William Caxton, ১৪২২-১৪৯১ খ্রী.) ওয়েস্টমিনস্টারে প্রথম মুদ্রণ-যন্ত্র স্থাপন করেন।

॥ ধাতব মুদ্রাযন্ত্র ॥

এর প্রায় ৫০ বৎসর পরে ফ্রান্সের এঁতিয়েন দুপেঁর ও ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের আর্ল স্ট্যানহোপ (Earl Stanhope) ধাতব মুদ্রাযন্ত্র উদ্ভাবন করেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির স্যাক্সনিতে ফ্রিডরিখ কোয়েনিগ (Friedrich Koenig) ফ্ল্যাটবেড মুদ্রণযন্ত্রের আবিষ্কার করেন।

॥ লাইনোটাইপ মেসিন ॥

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লাইনোটাইপ যন্ত্র উদ্ভাবন

করেন মারগ্যানথ্যালার (Marganthaler)। লাইনোটাইপ যন্ত্রে একসঙ্গে একটা করে লাইন কম্পোজ্‌ড্‌ হয়ে ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে।

॥ মনোটাইপ মেসিন ॥

১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে টোলবার্ট ল্যান্সটন মনোটাইপ যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন। এতে প্রতিটি হরফ পৃথক্‌ পৃথক্‌ ঢালাই হয়ে বেরিয়ে আসে।

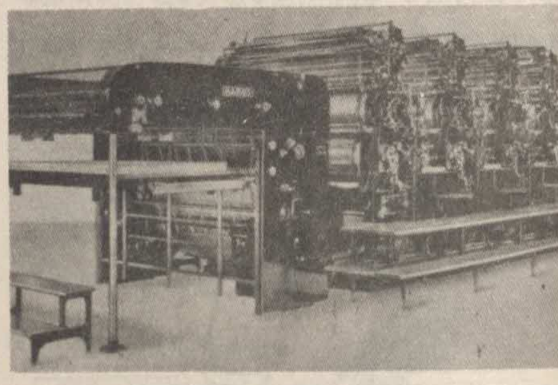
অফসেট মেসিন, রোটারি মেসিন, ছবি ছাপার মেসিন প্রভৃতি বহুপ্রকার মেসিন উদ্ভাবিত হওয়ার ফলে ছাপার কাজের খুব সুবিধা হয়েছে। সাধারণতঃ রোটারি মেসিনে সংবাদপত্র মুদ্রিত হয়।

॥ ছবি ছাপার ব্লক ॥



ছবি ছাপার জন্যে ব্লক তৈরী হয়। এই ব্লক দুরকমের—লাইন ব্লক ও হাফটোন ব্লক। অফসেট মেসিনে ছাপাতে গেলে ব্লক তৈরির প্রয়োজন হয় না।

ছাপার হরফ বহু রকমের। সে-সব টাইপ তৈরির কারখানায় তৈরী হয়। লাইনোটাইপের অনুকরণে লাইনো ফেস টাইপ তৈরি করা হয়। টাইপ—ছোট, বড়, বাঁকা, মোটা, ফ্ল্যাট প্রভৃতি নানা রকমের।



আধুনিক মুদ্রাযন্ত্র



নানা যুগে নানা দেশে কত ঘটনা ঘটেছে। সব ঘটনা সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু এমন কতকগুলি ঘটনার কথা আমরা ইতিহাস পড়ে জানতে পারি, যে-সব লোকে ভুলে যায় নি, কোনদিন হয়তো ভুলে যাবে না। এমনই সব ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে মাত্র কয়েকটির কথা এই অধ্যায়ে বলা হল।

॥ ম্যারাথনের যুদ্ধ ॥

প্রাচীন কালে গ্রীসে অনেক নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল। ৫৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পারসিক সাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। পারসিক সম্রাট একে একে গ্রীক রাষ্ট্রগুলি দখল করে নিতে থাকেন। অ্যাথেন্স, স্পার্টা প্রভৃতি গ্রীক রাষ্ট্র পারসিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সে কালে সব চেয়ে শক্তিশালী পারসিক সম্রাট ছিলেন প্রথম দরায়ুস (Darius I, ৫২১-৪৮৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। এশিয়া মাইনের রাজধানী সারদিস নগরী অ্যাথেন্সবাসীরা পুড়িয়ে ধ্বংস করে। দরায়ুস ৪৯২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অ্যাথেন্সকে শাস্তি দেবার জন্যে অভিযান চালান।

৪৯০ খ্রীষ্টাব্দে অ্যাথেন্সের ৩৫ কিলোমিটার দূরে ম্যারাথন-নামক স্থানে গ্রীকদের সঙ্গে পারসিকদের ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। দরায়ুস ৬০০ জাহাজে করে প্রায় ৪০ হাজার সৈন্য পাঠিয়েছিলেন। অ্যাথেন্সের সৈন্য-সংখ্যা ছিল ৯ হাজার। প্লেটিয়া শহর থেকে আরও ১ হাজার সৈন্য এসে যোগ দেয়। গ্রীক বীর মিলটিয়াডিস (Miltiades, আনুমানিক ৫৪০-৪৮৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মাত্র দশ হাজার সৈন্য নিয়ে বিপুল পারসিক বাহিনীর বিরুদ্ধে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করলেন। পারসিকরা পরাজিত হয়ে জাহাজে উঠে পালিয়ে গেল।

পালাবার সময়ে বহু পারসিক সৈন্য হতাহত হল। এই যুদ্ধ ইতিহাসে ম্যারাথনের যুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধ।

॥ থার্মোপীলির যুদ্ধ ॥



দরায়ুস বা ডেরিয়াসের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে জারক্সেস (Xerxes) সিংহাসনে বসলেন। তিনি পিতার পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ৪৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করেন। ঐতিহাসিক হিরোডোটাসের মতে তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ লক্ষ। গ্রীকদের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৭০০০। থার্মোপীলির সংকীর্ণ গিরিবর্ত্মে যুদ্ধ শুরু হল। পারসিকরা থ্রেস ও ম্যাসিডোনিয়ার মধ্য দিয়ে স্পার্টান সৈন্যদের সম্মুখীন হন। স্পার্টার রাজা লিওনিডাস (Leonidas, রাজত্ব আনুমানিক ৪৯০-৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) মাত্র বাছাই-করা ৩০০ জন সৈন্য নিয়ে পারসিকদের বার বার হটিয়ে দিলেন। জেরাক্সেস ৯০০ জাহাজ নিয়ে গিয়েছিলেন, গ্রীকদের ছিল মাত্র ৩০০ জাহাজ। একজন বিশ্বাসঘাতক গ্রীক জারক্সেসকে পথ দেখিয়ে দিল। জারক্সেস বনজঙ্গল পার হয়ে পিছন দিক্ থেকে গ্রীক সৈন্যদের আক্রমণ করলেন। অসমসাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করেও লিওনিডাস পরাজিত হলেন। স্পার্টান সৈন্যগণ নিহত হল। তিনিও মারা গেলেন। তখন স্পার্টান জাহাজগুলি তাড়াতাড়ি গিয়ে অ্যাথেন্সে পৌঁছে শহরের সব লোককে সরিয়ে নিয়ে গেল। পারসিক সৈন্যরা যুদ্ধজয়ের পর সেখানে গিয়ে দেখল, নগরী জনশূন্য। নিষ্ঠুর জারক্সেস নগরীটি ধ্বংস করে ফেলবার আদেশ দিলেন। এই যুদ্ধকে ইতিহাসে থার্মোপীলির যুদ্ধ বলে।

॥ সালামিসের নৌযুদ্ধ ॥



অধিকাংশ গ্রীক অ্যাথেন্সের বিপরীত দিকে অবস্থিত সালামিস (Salamis) দ্বীপে চলে যায়। অত্যাচারী জারক্সেস তাদের ধ্বংস করতে থার্মোপীলির যুদ্ধের পর নৌবাহিনী নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। অ্যাথেন্সের বিজ্ঞ রাজনীতিক থেমিস্টক্লিজ (Themistocles, আনুমানিক ৫১৪-



থার্মোপীলির যুদ্ধ



সালামিসের নৌযুদ্ধ



কুবলাই খাঁর দরবারে মার্কো পোলো

[পূর্বপৃষ্ঠার ছবি]

বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo, ১২৫৪-১৩২৪ খ্রী.) ছিলেন ভিনিসীয় ব্যবসায়ী নিকোলো পোলোর পুত্র। মার্কো পোলো তাঁর পিতা ও পিতৃব্য মাফিও পোলোর সঙ্গে আনুমানিক ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দে চীনে যাবার জন্যে পদব্রজে যাত্রা করেন। চীনের সম্রাট্ কুবলাই খাঁ (Kublai Khan, ১২১৬-১২৯৪ খ্রী.) তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা করেন। তাঁরা সেবার চীন থেকে ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভেনিসে ফিরে আসেন।

এর দুবছর বাদে তাঁরা পুনরায় চীনে যাবার জন্যে যাত্রা করেন। এবার তাঁরা পূর্বের পথ না ধরে অন্য পথ ধরেন। তখন মার্কো পোলোর বয়স ১৮। চার বৎসর বাদে তাঁরা পিকিং-এ গিয়ে পেঁছান। এবারও তাঁরা সম্রাট্ কুবলাই খাঁর কাছে বিপুল অভ্যর্থনা লাভ করেন। সম্রাট্ মার্কো পোলোকে নানা সম্মানজনক ও গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত করেন। সতের বছর চীনে কাটিয়ে মার্কো পোলো ১২৯০ খ্রীষ্টাব্দে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তাঁর বিস্ময়কর ভ্রমণ-কাহিনী লেখেন। সেই কাহিনী পড়ে ইউরোপীয়দের বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টি চীনের দিকে আবদ্ধ হয়। সে যুগে মার্কো পোলোর মতো দুঃসাহসী, শক্তিমান্ ও দৃঢ়চিত্ত পর্যটক ছিল না।

৪৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর নেতৃত্বে গ্রীক জাহাজগুলি বিপুল পারসিক জাহাজদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে পারসিকদের সম্পূর্ণ পরাজিত করে। জারক্সেস এক মার্বেল পাথরের সিংহাসনে বসে তাঁর নৌবাহিনীর পরাজয় দেখলেন। তিনি তাড়াতাড়ি নিজ দেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এর পর তিনি আর গ্রীসে যেতে পারেন নি। এই যুদ্ধ সালামিসের যুদ্ধ নামে ইতিহাসে খ্যাত হয়ে আছে।



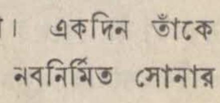
॥ হলদিঘাটের যুদ্ধ ॥

থার্মোপীলির যুদ্ধের সঙ্গে ভারত-প্রসিদ্ধ হলদিঘাটের যুদ্ধের তুলনা করা হয়। রাজস্থানের আরাবল্লী পর্বতের একটি গিরিসংকট গোগুণ্ডা বা হলদিঘাট নামে পরিচিত। এইখানে মোগল সম্রাট্ আকবরের সেনাপতি রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহের সঙ্গে প্রাতঃস্মরণীয় রাজপুতবীর



রাণা প্রতাপ

রাণা প্রতাপের যুদ্ধ হয়। রাণা প্রতাপ (মৃত্যু ১৫৯৭ খ্রী.) ছিলেন মেবারের প্রসিদ্ধ মহারাণা। মানসিংহ একবার তাঁর অতিথি হন। কিন্তু মানসিংহ মোগলদের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন বলে তাঁর আহারের সময় প্রতাপ নিজে উপস্থিত না থেকে পুত্র অমরসিংহকে পাঠিয়ে দেন। এতে মানসিংহ অতিশয় অপমানিত বোধ করেন এবং এই অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্যে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে এক বিরাট মোগল সৈন্যবাহিনী নিয়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্যে হলদিঘাটে সমবেত হন। ভারতগৌরব রাণা প্রতাপের সৈন্যসংখ্যা ছিল খুবই কম। সে তুলনায় মোগল সৈন্য সংখ্যায় ছিল অনেক। রাজপুত সৈন্যরা অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করেও পরাজিত হয়। রাজপুতদের এই গৌরবজনক যুদ্ধকে ইতিহাসে হলদিঘাটের যুদ্ধ বলে।



॥ ইউরেকা ॥

আর্কিমিডিস (Archimedes, আনুমানিক ২৮৭-২১২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন প্রাচীনকালের একজন প্রসিদ্ধ গ্রীক বিজ্ঞানী। একদিন তাঁকে সাইরাকিউজের রাজা তাঁর নবনির্মিত সোনার মুকুটে কতখানি খাদ মেশানো আছে, তা জানাতে বললেন। আর্কিমিডিস সেই সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে স্নানের চৌবাচ্চায় নামলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিছু জল উপচে পড়ে গেল এবং আর্কিমিডিস জলের মধ্যে নিজের শরীরটাকে কিছুটা হালকা বোধ করলেন।

তিনি বুঝতে পারলেন, তাঁর শরীরটা যে পরিমাণে হালকা মনে হচ্ছে, ঠিক সেই পরিমাণ জল চৌবাচ্চা থেকে উপচে পড়েছে। তখনই তিনি 'ইউরেকা', 'ইউরেকা' (আমি পেয়েছি, আমি পেয়েছি) বলতে বলতে চৌবাচ্চা থেকে নেমে নগ্ন অবস্থায় রাজবাড়িতে গিয়ে হাজির হলেন এবং রাজাকে বললেন, সোনার মুকুটে কতটা খাদ আছে,



আর্কিমিডিস

মুকুটটা না ভেঙ্গেই তা তিনি বলতে পারবেন। খাঁটী সোনার মুকুট জলে ডোবালে যতটা জল অপসারিত হবে, ভেজাল-দেওয়া সোনার মুকুটে ততটা জল অপসারিত হবে না।



॥ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ॥

ব্রিটিশ আমলে ভারতের বড়লাট লর্ড কার্জন (Lord Carzon, ১৮৫৯-১৯২৫ খ্রী.) ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকার্যের সুবিধার অজুহাতে বঙ্গদেশ দুভাগে ভাগ করেন। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও আসামকে একজন পৃথক্ শাসনকর্তার অধীন করা হয়। বঙ্গদেশকে এই ভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্যে সমগ্র বঙ্গদেশে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। প্রসিদ্ধ নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস যে আন্দোলন করে তারই নাম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। ব্রিটিশ সরকার অনেককে ধরপাকড় করে। কংগ্রেসের আন্দোলনের পাশাপাশি



সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিপ্লবীদের কার্যকলাপও দেখা যায়। বড়লাট বলেন, 'Partition of Bengal is a settled fact'। সুরেন্দ্রনাথ তেজোদ্দীপ্ত কণ্ঠে তার উত্তরে বলেন, 'I will unsettle the settled fact'। শেষ পর্যন্ত ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে ব্রিটিশ সম্রাটের আদেশে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়।



॥ ফরাসী বিপ্লব ॥

রুশো (Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২-১৭৭৮ খ্রী.), ভলটেয়ার (Francois Marie Arouet de Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রী.) প্রভৃতি মনীষীর লেখার দ্বারা অভিজাতশ্রেণীর বিভিন্ন ধরনের অত্যাচারে নিপীড়িত ফ্রান্সের দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে গণচেতনা জাগরিত হয়। ধূমায়িত অসন্তোষ থেকে ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে যে



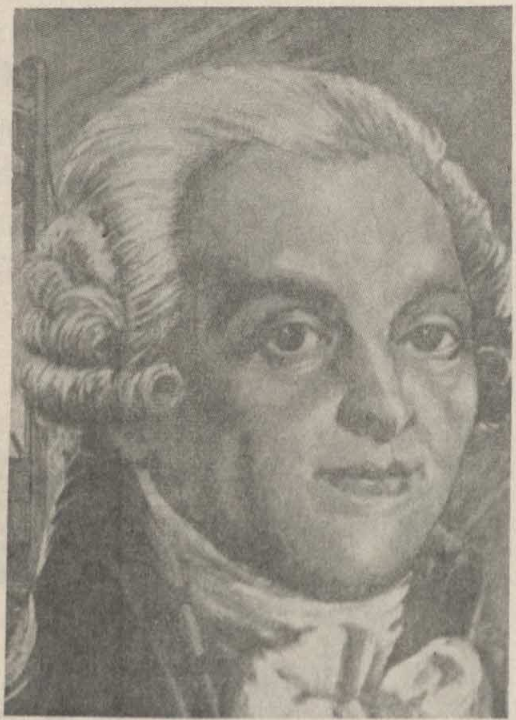
ফরাসী বিপ্লবের সময়ের একটি দৃশ্য

অভূতপূর্ব বিপ্লব সংঘটিত হয় তার নাম ফরাসী বিপ্লব (French Revolution)। নানা বিশৃঙ্খলার ঘটনার মধ্যে দেশের শাসনকার্য বিদ্রোহীদের করায়ত্ত হয়। প্রধানতঃ গিলোটিনের সাহায্যে বহু শত বিশিষ্ট লোকের শিরশ্ছেদ করা হয়। ফ্রান্সের রাজা ষোড়শ লুই Louis XVI, ১৭৫৬-১৭৯৩ খ্রী) ও রানী অ্যান্টয়নেট (Marie Antoinette, ১৭৫৫-১৭৯৩ খ্রী.) ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। লুই ও অ্যান্টয়নেট পলায়ন করতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু



লুই ও অ্যান্টয়নেটের পলায়নের চেষ্টা

সীমান্তে ধৃত হন। তাঁদের শিরশ্ছেদ করা হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই ফ্রান্সের কুখ্যাত কারাগার ব্যাস্টিল দুর্গের পতন হয়। বিদ্রোহী নেতা রোব্‌স্পীয়ার (Maximilien Francois Robespierre, ১৭৫৮-১৭৯৪ খ্রী.)-এর নির্দেশে বহু নিরীহ ফরাসীর শিরশ্ছেদ করা হয়। প্রধানতঃ তাঁরই কথায় রাজা লুই-এর শিরশ্ছেদ করা হয়। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্সে বিভীষিকা সৃষ্টির অপরাধে ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁরও শিরশ্ছেদ করা হয়। ড্যান্টন (Georges Jaacques Danton ১৭৫৯-১৭৯৪ খ্রী.) ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা হলেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। গিলোটিনের সাহায্যে অসংখ্য জমিদারের শিরশ্ছেদ করা হয়। জমিদারী-



রোবস্পীয়ার

প্রথা বিলুপ্ত হয়ে যায়। বড় বড় ধনী পাদ্রীদের সব সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হয়। অবশেষে ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রজাতন্ত্রের অধীনে ডিক্টেটরী শাসন প্রবর্তিত হলে ফরাসী বিপ্লবের অবসান ঘটে। ফরাসী বিপ্লবের মূল মন্ত্র ছিল সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা (egalite, liberte, fraternite)।

॥ আমেরিকার স্বাধীনতা-সংগ্রাম ॥

বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম স্বাধীন শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ। পূর্বে এই দেশ ছিল বৃটিশের অধীন। তখনকার দিনে মাত্র ১৩টি রাষ্ট্র ইংরেজরা আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করে। ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়া থেকে আরম্ভ করে ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে জর্জিয়া পর্যন্ত মোট ১৩টি উপনিবেশ ইংরেজরা আমেরিকায় প্রতিষ্ঠা করেছিল। ইংল্যাণ্ডের ইংরেজদের অধীনে আমেরিকার অধিবাসীরা নানাভাবে নিপীড়িত হতে থাকে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই ১৩টি উপনিবেশ সম্মিলিতভাবে কংগ্রেস নামে এক প্রতিনিধি সভা গড়ে তোলে। তারপর জর্জ ওয়াশিংটন (George



জর্জ ওয়াশিংটন

Washington, ১৭৩২-৯৯ খ্রী.)-এর নেতৃত্বে সৈন্য-দল ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। সাত বৎসর ধরে তুমুল যুদ্ধ চলে। ইংরেজরা পরাজিত হয়। তারপর ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভার্সাই-এর সন্ধিপত্রে ইংরেজরা আমেরিকার স্বাধীনতা স্বীকার করে নেয়। সম্মিলিত ১৩টি রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্র নামে খ্যাত হয়। ইউরোপের বিভিন্ন জাতির লোক, বিশেষ করে ইংরেজরা সেই যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী। ইংল্যাণ্ডের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে, ৬০টি রাষ্ট্র নিয়ে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

॥ রুশ-জাপান যুদ্ধ ॥

রাশিয়া প্রকাণ্ড দেশ। সে তুলনায় জাপানের আয়তন অতি নগণ্য। তাহলেও জাপান রীতিমতো শক্তিশালী। রাশিয়া ক্রমাগত কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়ার উপর প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করতে থাকলে জাপান খুব শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বেশ কিছুদিন ধরে মনোমালিন্য চলার পর ১৯০৪

খ্রীষ্টাব্দের ৮ই ফেব্রুয়ারি রাশিয়ার সঙ্গে জাপানের যুদ্ধ বাধে। রাশিয়ার স্থলসৈন্যের প্রধান ছিলেন কুরোপ্যাটকিন (Aleksei Nikolaevich Kuropatkin, ১৮৪৮-১৯২৫ খ্রী.)। জাপানের স্থলসৈন্যের প্রধান ছিলেন মার্শাল ওয়ামা। তাঁর অধীনে কাউন্ট নোগি যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করেন। তুমুল সংগ্রাম চলে। পোর্ট আর্থার ও মুকডেনের স্থলযুদ্ধে রাশিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয় হয়। নৌযুদ্ধে রাশিয়ার বালটিক নৌবহর জাপানী সেনাপতি অ্যাডমিরাল টোগোর নৌবাহিনী দ্বারা বিধ্বস্ত হয়। কোরিয়া ও সাখালিন দ্বীপ জাপান অধিকার করে নেয়। তদানীন্তন জার দ্বিতীয় নিকোলাস (Nicholas II, ১৮৬৮-১৯১৮ খ্রী.) জাপানের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধশেষে সন্ধির শর্তানুযায়ী জাপান লিয়াওটাং উপদ্বীপ, পোর্ট আর্থার ও ইলিয়ট দ্বীপপুঞ্জ লাভ করে। রুশ-জাপান যুদ্ধের পর জাপান পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী জাতি বলে গণ্য হয়।



জোয়ান অব আর্ক

॥ জোয়ান অব আর্ক ॥

ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম হেনরী (Henry V, ১৩৮৭-১৪২২ খ্রী.) ফ্রান্স আক্রমণ করে বহু যুদ্ধের পর ফ্রান্স দখল করে নেন। তাঁর ছেলে ষষ্ঠ হেনরী (Henry VI, ১৪২১-১৪৭১ খ্রী.) ফ্রান্সের সিংহাসনে বসেন। একটার পর একটা যুদ্ধে ফরাসীরা ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা পরাজিত হয়ে হতাশ হয়ে পড়েছিল। এই রকম ঘোর দুর্দিনে জোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc—Jeanne d' Arc, ১৪১২—৩১ খ্রী.) নামে এক কৃষক বালিকার মনে হল, ঈশ্বরের আদেশ, সে ফরাসী সৈন্যদের নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলে ফ্রান্স ইংরেজদের কবলমুক্ত হবে। সে সিংহাসনচ্যুত সপ্তম চার্লস (Charles VII)-এর সঙ্গে দেখা করে তাঁর কাছ থেকে সৈন্য চাইল। চার্লস তাকে একটি সাদা ঘোড়া ও কিছু সৈন্য দিলেন।

জোয়ান সেই ঘোড়ায় চড়ে একটা সাদা পতাকা নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করল। ফরাসী সৈন্যরা তার অধীনে অমিত বিক্রমে যুদ্ধ করে একটার পর



জোয়ানের বিচার

একটা জায়গা ইংরেজদের কাছ থেকে উদ্ধার করল। তারপর জোয়ান চার্লসকে সিংহাসনে বসাল। সে যে এই অসম সাহসিক বীরত্ব প্রদর্শন করে ফ্রান্সকে স্বাধীন করল, তার জন্যে সে কোনও পুরস্কার চাইল না।

ইংরেজরা একদিন এক বিশ্বাসঘাতক ফরাসীর সাহায্যে জোয়ানকে ধরে ফেলল। তারপর বিচারের প্রহসন করে তাকে ডাইনী আখ্যা দিয়ে প্রকাশ্যে একটা খুঁটিতে বেঁধে পুড়িয়ে মারল। বর্বর কাপুরুষ ইংরেজ সৈন্যরা এই নৃশংস দৃশ্য দেখে পৈশাচিক উল্লাসে ফেটে পড়ল। মৃত্যুর পূর্বে জোয়ানের কোনরকম দুর্বলতা দেখা গেল না। সে শুধু হাত দুখানি উঁচু করে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের কল্যাণ কামনা করল।

এরপর ইংল্যাণ্ড আর কোন দিন ফ্রান্সের মাটিতে ইংরেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে যায় নি। স্বাধীনতার পূজারিণী জোয়ান ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সাধ্বী জোয়ান (St. Joan) আখ্যায় ভূষিত হন।

॥ রাশিয়ার বিপ্লব ॥



আগে রাশিয়ার রাজাদের বলা হত জার (Czar, Tsar)। রাশিয়ার জনসাধারণ বিভিন্ন সময়ে এই সব স্বৈরাচারী জারের দ্বারা নানাভাবে নিপীড়িত হত। জারের নির্দেশে তাদের প্রায়ই গ্রেফতার করা হত, সাইবীরিয়ার মতো তুষারাচ্ছন্ন স্থানে নির্বাসিত করা হত। অনেকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হত। তাছাড়া জীবনধারণের উপযোগী উপযুক্ত গ্রাসাচ্ছাদন তাদের ভাগ্যে জুটত না। তখনকার দিনে রাশিয়ার সমাজে দু'শ্রেণীর লোক ছিল—অভিজাত (যারা খুব ধনী) এবং সার্ফ (Serf অর্থাৎ দাস। খুব গরিব)। এই সার্ফ শ্রেণীর লোকেরাই ছিল সংখ্যায় খুব বেশী। দেশের

বেশির ভাগ জমিজমা অভিজাত শ্রেণীর লোকদের দখলে ছিল। তাদের অবিচারে অত্যাচারে গরিব জনসাধারণের দুর্দশার সীমা ছিল না। আর্থিক দুর্গতির অবস্থা চরমে উঠলে গরিব লোকেরা অভিজাত শ্রেণীর বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে থাকে।

টলস্টয়, টুর্গেনিভ, ডস্টয়েভস্কি প্রভৃতি সাহিত্যিকদের লেখার মধ্য দিয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ পেতে থাকল। প্রথম মহাযুদ্ধে রাশিয়া মিত্রপক্ষে যোগদান করে কিন্তু জার্মানির সৈন্যদের দ্বারা বার বার পরাজিত হতে থাকে। তখন দেশের শ্রমিক, কৃষক প্রভৃতি জারের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে দলে দলে ধর্মঘট করতে লাগল। যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করতে লাগল।

রাশিয়ায় ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে নিহিলিস্ট (Nihilist) দল বলে একটা শক্তিশালী বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। তাদের হাতে বহু রাজকর্মচারী নিহত হল। এমন কি, জার দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (Alexander II, ১৮১৮-৮১ খ্রী.) নিহিলিস্ট দলের দ্বারা তাঁর গাড়ির তলায় নিক্ষিপ্ত বোমার আঘাতে ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই মার্চ সেণ্ট পিটার্স-বার্গে নিহত হলেন। এর পর নিহিলিস্ট দলের উপর নির্মমভাবে পীড়ন চলতে থাকে। তার ফলে সেই দল ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়।



লেনিন

সমাজতান্ত্রিক দল বলে একটা বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল, কৃষক ও শ্রমিকদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা। জারের নির্দেশে পুলিস ও সৈন্যদল তাদের লোকজনকে গ্রেফতার, নির্বাসনে প্রেরণ বা মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে দলকে ভেঙ্গে দিতে চেষ্টা করতে লাগল।

সহস্র চেষ্টা করেও দেশের বিপ্লব আন্দোলন দমানো গেল না। লেনিন (Vladimir Ilyich Ulyanov, ১৮৭০-১৯২৪ খ্রী.), লিও ট্রট্স্কি (Lev Davidovich Bronstein, ১৮৭৯-১৯৪০ খ্রী.), স্ট্যালিন (Joseph Vissarionovich Djuga-



স্ট্যালিন

shvili, ১৮৭৯-১৯৫৩ খ্রী.) প্রমুখ বড় বড় নেতার অধীনে রাশিয়ার জনগণ জারের শাসনের বিরুদ্ধে

তুমুল আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকল। লেনিন, ট্রট্স্কি ও স্ট্যালিন বার বার কারাবন্দী ও নির্বাসিত হলেন।

বর্তমান রাশিয়ার রাজধানী মস্কো। তখন রাজধানী ছিল সেন্ট পিটার্সবার্গ। বিদ্রোহী শ্রমিকরা মস্কো শহরকে দখল করবার চেষ্টা করল। নানা দিকের বিদ্রোহে জার ক্ষিপ্ত হয়ে ভীষণ অত্যাচার শুরু করে দিলেন।

ইতিমধ্যে সমাজতান্ত্রিক দল দুভাগে ভাগ হয়ে যায়—বলশেভিক (Bolshevik) ও মেনশেভিক (Menshevik)। বলশেভিকদের দলে ছিল বেশী লোক। মেনশেভিকদের দলে ছিল অনেক কম লোক। দেশব্যাপী আন্দোলন চলতে চলতে শেষে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম বলশেভিক বিপ্লব নামে খ্যাত বিপ্লব ব্যর্থ হয়ে গেল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি গ্যাপন নামে একজন পাদ্রী রুশ-জাপান যুদ্ধের ফলে দেশে যে নিদারুণ খাদ্যসংকট ও বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় সে-সম্বন্ধে দুঃখ জানাতে জারের সঙ্গে দেখা করতে সেন্ট পিটার্সবার্গে গেলেন। সঙ্গে ছিল কয়েক হাজার নিরস্ত্র নারী-পুরুষ ও বালক-বালিকা। তারা জারের প্রাসাদের কাছে গেলে কসাক সৈন্যরা তাদের চাবুক মেরে হঠাতে না পেরে তাদের উপর নির্মমভাবে গুলি চালাল। রাজপথ হতাহত লোকে ভরে গেল। এই মর্মন্তুদ ঘটনায় দেশের সর্বস্তরের লোক ভীষণ ক্ষেপে গেল।

জার তখন জনসাধারণকে শান্ত করতে ডুমা অর্থাৎ রাশিয়ান পার্লামেন্ট গঠন করে দেশের লোকদের হাতে কিছুটা ক্ষমতা দেবার ব্যবস্থা করলেন। তিনবার তিনভাবে ডুমা গঠন করা হল। দেশের লোক তাতে সন্তুষ্ট হল না।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সেন্ট পিটার্সবার্গে আড়াই লক্ষ শ্রমিক ধর্মঘট করল। তাদের দমন করতে যে-সব সৈন্য এল, তারাও শ্রমিকদের দলে যোগ দিল। জার বেগতিক দেখে মেনশেভিকদের উপর দেশের শাসনভার দিলেন। মেনশেভিকরা ছিলেন বড়লোক। তাঁরা বিপ্লব চাইতেন না। লেনিন সুইটজারল্যাণ্ডে নির্বাসিত জীবন যাপন করছিলেন। তিনি দেশে ফিরে এসে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। প্রকৃত বলশেভিক বিপ্লব শুরু হয়ে গেল। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর বলশেভিক দল সেন্ট পিটার্সবার্গ দখল করে নিল।

রাজপ্রাসাদে মেনশেভিক দলের কেরেনেস্কী (Aleksandr Feodorovich Kerenesky)-র



কেরেনস্কী

নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠক চলছিল। বলশেভিক দলের লোকেরা হুড়মুড় করে সেখানে গিয়ে হাজির হল। মন্ত্রীরা সবাই পালিয়ে গেলেন। প্রায় বিনা রক্তপাতে রাজপ্রাসাদ দখল করা হয়ে গেল।

ক্রমে সারা দেশের প্রায় সব স্থান বিপ্লবীদের দখলে এসে গেল। আগেই জার সপরিবারে নিহত হয়েছেন (১৯১৮ খ্রী. ১৬ই জুলাই)। এখন বিপ্লবীদের বাধা দেবার মতো কেউ নেই। কিন্তু ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক দেশগুলির প্রেরণায় রাশিয়ায় গৃহযুদ্ধ বেধে গেল। ট্রট্স্কি চার লক্ষ লাল ফৌজ নিয়ে সংগ্রাম চালিয়ে গৃহযুদ্ধের অবসান ঘটালেন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে রাশিয়ার বিপ্লবের অবসান হল।

১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে লেনিনের মৃত্যু হয়। লেনিন ছদ্ম নাম। আসল নাম ভ্ল্যাডিমির ইলইচ উলিয়ানভ। ট্রট্স্কি ছদ্ম নাম। আসল নাম লিওন ডেভিডোভিচ ব্রনস্টিন। তিনি মেক্সিকোতে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এক যুবকের হাতুড়ির আঘাতে নিহত হন।

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ॥

অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিন্যাণ্ড (Archduke Franz Ferdinand) সার্বিয়ায় বেড়াতে গেলে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে গ্যাব্রিয়েল প্রিন্‌ৎসিপ (Gabriel Prinzip) নামে এক সার্বিয়ান ছাত্রের গুলিতে সারাজেভো শহরে নিহত হন। এই ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগস্ট যে বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ বেধে যায়, তাকেই বলা হয় প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (First World War)। অস্ট্রিয়া প্রথম সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। জার্মানি অস্ট্রিয়ার পক্ষে যোগদান করে। জার্মানি বেলজিয়ামের মধ্য দিয়ে সৈন্যচালনা করতে গেলে বেলজিয়াম বাধা দেয়। তার ফলে বেলজিয়ামকে জার্মানির সঙ্গে যে যুদ্ধ করতে হয়, তাতে বেলজিয়ামের বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে এক পক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া, জার্মানি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া। অপর পক্ষে ছিল ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, রাশিয়া, গ্রীস, ইতালি, রুমানিয়া, পোর্তুগাল, জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি ২৩টি দেশ। প্রথম দিকে জার্মানি জয়লাভ করতে থাকলেও শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হয়। ফ্রান্সের ভার্সাই (Versailles) নগরীতে উভয়পক্ষ এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করে (১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে প্রায় এক কোটি লোক নিহত হয়। ১৮,৪০০ কোটি ডলার ব্যয়িত হয়।



অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে হত্যা

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে জার্মানি অতিশয় দুরবস্থার মধ্যে পতিত হয়। ডানজিগ বন্দরকে স্বাধীন আন্তর্জাতিক শহরে পরিণত করা হয় এবং পোলাণ্ডকে সেই বন্দর মারফত বৈদেশিক বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দেওয়া হয়। ডানজিগ বন্দরে যাবার জন্যে কিছুটা জায়গা ছেড়ে দেওয়া

হয়। সেই জায়গাই পোলিশ করিডর নামে খ্যাত। জার্মানির সমস্ত উপনিবেশ হাতছাড়া হয়ে যায়। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ একটা বিপুল অর্থ দাবি করা হয়। স্থির হয়, সেই টাকা বাৎসরিক কিস্তিতে শোধ করতে হবে। জার্মানির ভালো ভালো জায়গা আলসাস-লোরেন, সাইলিসিয়া প্রভৃতি হাতছাড়া হয়ে যাওয়ায় লোহা ও কয়লার খনিগুলিও হাতছাড়া হল।

সন্ধিশর্তানুযায়ী কয়লা ও লোহা দিতে দেরি করছে বলে ফ্রান্স জার্মানির খনি-প্রধান অঞ্চল রূঢ় দখল করে নিল। জার্মানির অর্থনৈতিক অবস্থা অচল হয়ে যাবার উপক্রম হল। ভার্সাই সন্ধির বিরুদ্ধে জার্মানিতে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিল এবং নানারকম দল গড়ে উঠতে লাগল। সে-সবের মধ্যে একটা দলের নাম ন্যাশনাল সোসালিস্ট দল। এই দলকে বলা হয় নাৎসী (Nazi) দল। এই দলের নেতা ছিলেন হিটলার (Adolf Hitler,



হিটলার

১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রী.)। তিনি প্রেসিডেন্ট হিণ্ডেনবার্গের



হিণ্ডেনবার্গ

মৃত্যুর পরের দিন (১৯৩৪ খ্রী. ৩রা আগস্ট) প্রেসিডেন্ট ও চ্যান্সেলার হয়ে ফুরার উপাধি গ্রহণ করলেন।

হিটলার লক্ষ লক্ষ মাইল পাকা রাস্তা তৈরি, অসংখ্য মোটর গাড়ি, এরোপ্লেন, জাহাজ প্রভৃতির কারখানা তৈরি, বড় বড় রাসায়নিক দ্রব্যের কারখানা তৈরি, উন্নত ধরনের বিভিন্ন শিল্পের কারখানা গঠন প্রভৃতির দ্বারা জার্মানিকে রীতিমতো উন্নত করে তুললেন। তিনি চেকোস্লোভাকিয়ার সুদেতানল্যাণ্ডকে ও অস্ট্রিয়াকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করলেন। তিনি পোলিশ করিডর ফিরিয়ে দিতে বললেন। পোল্যাণ্ড তা দিতে রাজী না হওয়ায় ১৯৩৯ খ্রী. ১লা সেপ্টেম্বর হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হল।

এর পর রাশিয়া, বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, নরওয়ে, পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, চীন, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশ জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে রত হল। জার্মানি, জাপান ও ইতালি সেই সব দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

চালিয়ে যেতে থাকল। প্রথম দিকে জার্মানি বহু যুদ্ধে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেও শেষ পর্যন্ত পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হল। জাপান ভালোভাবেই যুদ্ধ করছিল কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে অসংখ্য লোক হতাহত হল। তখন জাপ-সম্রাট্ হিরোহিতোর নির্দেশে জাপান যুদ্ধ বন্ধ করে মিত্রশক্তির নিকট সন্ধির প্রস্তাব করল।

যুদ্ধে জার্মানি সম্পূর্ণ পরাজিত হল। হিটলার ভূগর্ভস্থ কক্ষে আত্মহত্যা করলেন। হিটলারের সহকারী বহু লোক এবং জাপানের প্রধানমন্ত্রী তোজো প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। মুসোলিনীকে আগেই তার দেশবাসী বন্দী ও নিহত করে। বিরাট ক্ষয়ক্ষতির পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। জার্মানি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পশ্চিম জার্মানি (ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি) ও পূর্ব জার্মানি (জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক) নামে দু'টি পৃথক্ রাষ্ট্রে পরিণত হয়।



॥ ভাওয়ালের মামলা ॥

ভাওয়াল বর্তমান বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা জেলার একটি স্থান। এখানকার বিখ্যাত জমিদার বংশের মধ্যমকুমার রমেন্দ্রনারায়ণ রায় ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বিষক্রিয়ার ফলে মারা গেলে তাঁকে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়। রমেন্দ্রনারায়ণ দার্জিলিং-এ ছিলেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং দার্জিলিঙের শ্মশানেই তাঁকে দাহ করার জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়। সেদিন ছিল ভীষণ দুর্যোগ। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির জন্যে তাঁর মৃতদেহ দাহ না করেই শবযাত্রীরা গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। লোকশ্রুতি, এক নাগা সন্ন্যাসী তাঁকে বাঁচিয়ে তোলেন এবং সঙ্গে নিয়ে যান।

রমেন্দ্রনারায়ণ বেশ কয়েক বৎসর নাগা সন্ন্যাসীর সঙ্গে থাকেন। তাঁর যে স্মৃতিভ্রংশ হয়েছিল, তা দূর হলে তিনি ভাওয়ালে ফিরে এলে রমেন্দ্রনারায়ণের ভার্যা বিভাবতী তাঁকে রমেন্দ্র-নারায়ণ বলে স্বীকার করেন না। রমেন্দ্রনারায়ণের দিদি স্বীকার করেন, প্রজারাও স্বীকার করেন। নিজ সম্পত্তির অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্যে রমেন্দ্রনারায়ণ আদালতের দ্বারস্থ হন। বহুদিন ধরে অগণিত লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। বিচারক তাঁকে ভাওয়ালের মধ্যমকুমার রমেন্দ্র-নারায়ণ রায় বলে সিদ্ধান্ত করেন। এই মামলাই 'ভাওয়ালের মামলা' নামে প্রসিদ্ধ। অবশ্য মামলায় জয়লাভ করার পর বেশী দিন রমেন্দ্রনারায়ণ জীবিত থাকেন নি।

॥ জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ॥

জালিয়ানওয়ালাবাগ পাঞ্জাবের অন্তর্গত অমৃতসরের পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি উদ্যান। ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর-জেনারেল ভাইকাউন্ট চেম্‌স্-ফোর্ড (Viscount Chelmsford, শাসনকাল ১৯১৬-১৯২১ খ্রী.)-এর শাসনকালে রাউলাট অ্যাক্ট (Rowlatt Act) নামে এক কুখ্যাত পীড়নমূলক আইন বিধিবদ্ধ হয়। এই আইনের বিরুদ্ধে বিরাট প্রতিবাদ-আন্দোলন গড়ে ওঠে। জালিয়ান-ওয়ালাবাগে তিন দিক্-ঘেরা জায়গায় প্রতিবাদ-সভার অনুষ্ঠান হয়। ব্রিটিশ সরকার জেনারেল ডায়ারকে সেই সভাস্থলে প্রেরণ করে। ডায়ার সভায় সমবেত কয়েক হাজার নিরস্ত্র নর-নারী, বালক-বালিকার উপর নির্মমভাবে গুলি চালায়। সভাস্থল থেকে বার হবার মাত্র একটি পথ। সেই পথ আগলে দাঁড়িয়ে ডায়ার ও তার সশস্ত্র বাহিনী। লোকে পালাতে পারে না। ডায়ারের নৃশংস গুলিতে ঘটনাস্থলেই সরকারী হিসাবে

৩৭৯ জন নিহত হয় এবং ১২০০ আহত হয়। বেসরকারী হিসাবে হতাহতের সংখ্যা কয়েক সহস্র। এই ঘটনায় সরলা দেবী চৌধুরানীর স্বামী রামভুজ দত্ত চৌধুরী মারা যান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ একটি ওজস্বিনী ভাষায় ব্রিটিশ সরকারকে প্রতিবাদপত্র লিখে 'স্যার' উপাধি ত্যাগ করেন।



॥ নেতাজীর অন্তর্ধান ॥

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক সুভাষচন্দ্র বসু 'নেতাজী' উপাধিতে আখ্যাত। তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্যে বার বার গ্রেফতার হন এবং বিভিন্ন স্থানে কারাবন্দী হয়ে থাকেন। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে জেলে থাকার সময় তিনি মুক্তির জন্যে অনশন করেন। তার ফলে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন। ইংরেজ সরকার তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দিয়ে নিজ গৃহে অন্তরীণ করে রাখে। কর্মবীর সেখান থেকে নিরুদ্দেশ হবার পথ খুঁজতে থাকেন। তাঁর মুখে দাড়ি গজিয়েছিল। তিনি ছদ্মবেশে তাঁর বাড়িতে প্রহরারত পুলিসের চোখের সামনে দিয়ে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারি স্বগৃহ ত্যাগ করেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র তাঁকে মোটরে করে গোমো স্টেশন পর্যন্ত নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে তিনি ট্রেনে যাত্রা করে পেশোয়ারে গিয়ে পৌঁছলেন। তারপর সেখান থেকে গেলেন আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে। উত্তমচাঁদের বাড়িতে আশ্রয় লাভ করে কিছুদিন পরে মস্কোতে যান। মস্কোয় থাকার সুবিধা না হওয়ায় সেখান থেকে বার্লিনে যান।

বার্লিনে তিনি হিটলারের সঙ্গে দেখা করলেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। যে-সব ভারতীয় সৈন্য জার্মান ও ইতালিয়ানদের দ্বারা বন্দী হয়েছিল, তাদের নিয়ে সুভাষচন্দ্র ভারতীয় জাতীয় বাহিনী (Indian National Army) গড়ে তুললেন। প্রায় ৩৫ হাজার যুদ্ধবন্দী নিয়ে ভারতীয় জাতীয় বাহিনী গড়ে উঠল। তারপর বছর দুই বাদে তিনি সিঙ্গাপুরে গেলেন।

ভারতবর্ষকে স্বাধীন করবার জন্যে, জেনারেল মোহন সিং ভারতীয়, বিশেষ করে জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয় সৈন্যদের নিয়ে একটা বিরাট বাহিনী গড়ে তোলেন। তার নাম হয় আজাদ হিন্দ ফৌজ। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে আগস্ট জাপানপ্রবাসী বিখ্যাত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রকে আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক পদে অভিষিক্ত করেন। তখন থেকে সুভাষচন্দ্র 'নেতাজী' উপাধিতে ভূষিত হলেন। তিনি ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে স্বাধীন ভারত সরকারের প্রতিষ্ঠা করলেন। জার্মানি, ইতালি, জাপান, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি ৯টি দেশ সেই সরকারকে স্বীকৃতি দিল। আজাদ হিন্দ রেডিও ষ্টেশন স্থাপিত হল। আজাদ হিন্দ ডাক টিকিট বার হল।

এবার 'দিল্লী চলো' বলে আজাদ হিন্দ বাহিনীর লোকেরা ধ্বনি তুলল। নেতাজীর সৈন্যদল ভারত অভিমুখে যাত্রা করল। একদল গেল ইম্ফলের দিকে, একদল গেল কোহিমার দিকে (১৯৪৪ খ্রী.)। কিন্তু বেশীদূর আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষে অগ্রসর হওয়া সম্ভব হয় নি। তার প্রধান কারণ, জাপান তার প্রতিশ্রুতি পালন করে নি। প্রয়োজনীয় খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র, পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতি যোগান না দেওয়ার ফলে নেতাজীর বাহিনী ভারতের মাটিতে বেশী দূর যেতে পারল না। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান আত্মসমর্পণ করল। জার্মানী পরাজিত হল। নেতাজী জাপান

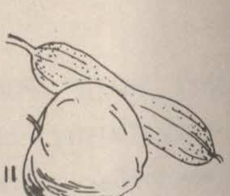
সরকারের নির্দেশে বিমানে টোকিওয় যাত্রা করলেন। শোনা যায়, সেই বিমান তাইওয়ান দ্বীপের তাইহোকুতে বিধ্বস্ত হয়। নেতাজী মারা যান। কিন্তু অনেকেই বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হওয়ার কাহিনীকে বিশ্বাস করেন না। পরের ঘটনা সম্পূর্ণ রহস্যাবৃত। নেতাজী কোথায় গিয়েছেন বা আছেন, তিনি এখনও জীবিত কি না, তা সঠিক জানা যায় না।

নানাদেশের খাদ্য



বেঁচে থাকতে গেলে প্রত্যেক জীবকে খেতে হবে। গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সবাইকেই। গাছপালা মাটি, সূর্যের আলো প্রভৃতি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে। পশুপাখি ফল, শস্য, গাছপালা, কীটপতঙ্গ, নানা জীবজন্তু খেয়ে বাঁচে। মানুষ ফল, শস্য, গাছপালা খায়, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতিও খায়। আদিম যুগে মানুষ প্রথম দিকে শুধু জীবজন্তুর কাঁচা মাংস খেত, পরে গাছের ফলমূলও খেতে থাকে। তারও পরে চাষ করতে শিখে নানা ফসল এবং মাছ ধরতে শিখে নদী-হ্রদের মাছ ধরে খেতে আরম্ভ করে। আগে তারা সব কিছু কাঁচাই খেত। পরে আগুনের ব্যবহার করতে শিখে মাছমাংস প্রভৃতি আগুনে সেঁকে বা ঝলসে খেতে থাকে।

বর্তমান যুগে মানুষ ফল, শস্য, মাছ, মাংস, ডিম, দুধ প্রভৃতি অনেক কিছু খায়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তারা রান্না করে খায়। এই রান্না-করা খাদ্য যে নানা দেশে কত ভাবে তৈরী হয়, তা বলে শেষ করা যায় না। সব দেশের মানুষের রুচি বা পছন্দ একরকম নয়।



॥ কাঁচা-খাওয়া খাদ্য ॥

লোকে নানা ধরনের ফল, যেমন শসা, মুলো, ভুট্টা, নারকেল, আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আনারস, আপেল, আঙুর, খেজুর, তরমুজ, বেল, টম্যাটো, নাশপাতি, বেদানা, কলা, কমলা লেবু, তাল প্রভৃতি কাঁচাই খায়। এ-সবের মধ্যে অনেক ফল পাকলে তবে খাওয়া হয়। অনেক ফল কাঁচাও খাওয়া হয়, রান্না করে বা আগুনে পুড়িয়েও খাওয়া হয়ে থাকে। বড় জাতের শসা যাকে বলে পালা শসা তা রান্না করে খাওয়া হয়, ভুট্টা পুড়িয়ে



নারকেল



নারকেল গাছ

খাওয়া হয়। মুলো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমরা রান্না করে খেয়ে থাকি, কাঁচা মুলোও খাই।



কলা

॥ রান্না-করা খাদ্য ॥



পৃথিবীর সব দেশেই লোকে নানাভাবে খাদ্য রান্না করে খায়। ফলশস্য, মাছমাংস, ডিম, দুধ সবই রান্না করে খাওয়া হয়। এই সব খাদ্য নানা দেশে নানাভাবে রান্না করা হয়ে থাকে। প্রতিটি বাড়িতে, হোটেলে, রেস্তোঁরায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রান্নাঘর থাকে। সেখানে নানা ধরনের খাদ্য রান্না করা হয়। ঝোল, ডাল, চচ্চড়ি, ভাজা, শুক্তো, ডালনা,অম্বল, চাটনি প্রভৃতি নানা মসলা ও ঘি তেল সহযোগে রান্না করা হয়ে থাকে। মোচার ঘণ্ট, মোচার চপ, ভেজিটেবল চপ, মাছের চপ, মাংসের চপ, চিংড়ির কাটলেট, মাটন কাটলেট, মুরগীর মাংসের কাটলেট, মাছের ফ্রাই, কচুরি,

শিঙ্গাড়া; নিমকি, ডালপুরি, রাধাবল্লভি, ঘুগনি, পোলাও, খিচুড়ি, ভাত, রুটি, চাপাটি, লুচি, পরটা, মুড়িঘন্ট, শাকভাজা, ঘণ্ট, ছেঁচকি, বড়া, ফুলুরি, বেগুনি, মাছের ঝাল, কোর্মা, কালিয়া, কোপ্তা, আলুর দম, পায়েস, হালুয়া, স্যালাড, টোস্ট, স্টু, পাই, স্যাণ্ডউইচ, পেঁয়াজি, বেগুন পোড়া, আলুর খোসা ভাজা প্রভৃতি অসংখ্য রকমের খাদ্য তৈরী হয়। এই সব রান্না করতে সরষের তেল, বাদাম তেল, নারকেল তেল, ঘি, মাখন, পিয়াঁজ, রসুন, হলুদ, লঙ্কা, নুন, আদা-বাটা, হিং, কাল জিরে, পাঁচফোড়ন, টক দই, জিরে, কিসমিস, গরম মসলা, মৌরি, তেজপাতা, নারকেল কোরা, চিনি, গুড়, ধনে প্রভৃতি নানা ধরনের তেল-মসলা ব্যবহার করা হয়। খাদ্যকে সুস্বাদু করতে এ সবের বিশেষ প্রয়োজন।



॥ দুধ ॥

দুধ মানুষের খুব প্রিয় খাদ্য। গরু, মোষ, ছাগল, ভেড়া, উট, বলগা-হরিণ প্রভৃতির দুধ লোকে খেয়ে থাকে। মরুভূমির দেশের লোকে উটের দুধ খায়। বরফের দেশের লোক এস্কিমোরা বলগা-হরিণের দুধ খায়। ছাগলের দুধে প্রোটীন বেশী আছে। লোকে প্রধানতঃ গরু মোষের দুধ বেশী ব্যবহার করে। দুধ সকল শ্রেণীর লোকের খাদ্য ও পুষ্টিকর পথ্য। দুধ থেকে ছানা, পনীর, ক্ষীর, রাবড়ি, দই প্রভৃতি তৈরী হয়। ছানা দিয়ে নানাধরনের খাবার তৈরী হয়; রসগোল্লা, রাজভোগ, সন্দেশ, পান্তুয়া, ক্ষীরমোহন, পেঁড়া, গুজিয়া, কালজাম, ছানার গজা, দানাদার, ছানার পায়েস, ছানার ডালনা, ছানার মালপোয়া, ক্ষীরের মালপোয়া, ছানার কালিয়া প্রভৃতি অতি মুখরোচক মিষ্টান্ন তৈরী হয়ে থাকে।

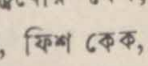
খাবারের দোকানে শুধু উপরে উল্লিখিত মিষ্টান্ন পাওয়া যায় না। খাস্তার গজা, নিমকি, শিঙ্গাড়া, পুরী, লুচি, রাধাবল্লভি, জিলাপি, অমৃতি, বোঁদে, জিভেগজা মিহিদানা, দরবেশ, শোনপাপড়ি, খাস্তার কচুরি, হিঙের কচুরি, সীতাভোগ প্রভৃতিও পাওয়া যায়। এসব খাদ্য শুধু দোকানেই পাওয়া যায় না, বাড়িতেও তৈরী হয়।



॥ পিঠে পায়েস ॥

পুলি পিঠে, রাঙাআলুর পুলি, মুগের পুলি, পাটি-সাপটা, মুগ সামালি, আস্কে পিঠে, সরু চাকলি, দুধ পুলি, মালপোয়া, তিলের নাড়ু, নারকেল নাড়ু, বাদামের বরফি, সুজি গাজর লাউ সফেদা প্রভৃতির হালুয়া, গোকুল পিঠে, চিঁড়ের পিঠে, আমক্ষীর, ক্ষীরকমলা, তালক্ষীর, চালের পায়েস, সুজির পায়েস, চিঁড়ের পায়েস, আলুর পায়েস, ফুলকপির পায়েস প্রভৃতি নানা ধরনের পিঠে পায়েস তৈরী হয়। দক্ষিণ ভারতের ইডলি, ধোসা বর্তমানে ভারতের নানা স্থানে পাওয়া যায়।

ছোট ছোট কচুরির মধ্যে মসলামাখা আলুসিদ্ধ রেখে তেঁতুলের জলে ডুবিয়ে যে জলকচুরি তৈরী হয়, তা বর্তমানে লোকেদের পরম প্রিয় খাদ্য।



॥ কেক ॥

কেক নানা ধরনের। মিল্ক কেক, ফ্রুট কেক, কুইন কেক, বার্থডে কেক, চকোলেট কেক, ক্রিসমাস কেক, কোকোনাট কেক, স্ট্রবেরি কেক, ডেসার্ট কেক, কনডেন্সড্ মিল্ক কেক, ফিশ কেক, এগ কেক, চীজ প্যানকেক,—এমনি বহু রকমের কেক বিদেশের লোকের প্রিয় খাদ্য। ভারতেও কেকের প্রচলন কম নয়। বিশেষ করে বড়-

দিনের সময়ে কেক প্রচুর বিক্রী হয়, বাড়িতেও তৈরী হয়।



॥ স্যাণ্ডউইচ ॥

পাঁউরুটির স্লাইসের মধ্যে টম্যাটো, মাংসের পাতলা ফালি, শশা, গাজর, বীট, পিঁয়াজ, মাছ, আদা, লঙ্কা, মসলা প্রভৃতি দিয়ে নানা ধরনের স্যাণ্ডউইচ তৈরী হয়।



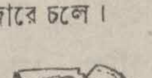
॥ পুডিং ॥

পুডিং প্রধানতঃ হোটেলে রেস্তোরাঁয় বিক্রী হলেও বাড়িতেও তৈরী হয়ে থাকে। কোকোনাট পুডিং, ব্রেড অ্যাণ্ড বাটার পুডিং, ক্যানারি পুডিং, চকোলেট ক্রীম পুডিং, রাইস পুডিং, পাইন অ্যাপ্‌ল্‌ পুডিং, জ্যামজেলি পুডিং প্রভৃতি ভালোভাবে তৈরি করতে পারলে অতি মুখরোচক খাদ্যে পরিণত হয়।



॥ বিস্কুট ॥

বিস্কুট সাধারণতঃ বাড়িতে তৈরি করা হয় না। থিন অ্যারোরুট, ক্রীম ক্র্যাকার, মেরী, নাইস, সার্কাস, কোকোনাট, জিঞ্জার নাট, অরেঞ্জ ক্রীম, জেম, চকোলেট ক্রীম প্রভৃতি নানা কোম্পানির নানা ধরনের নাম-দেওয়া বিস্কুট বাজারে চলে।



॥ পাঁউরুটি ॥

পাঁউরুটি পৃথিবীর সর্বত্রই চলে। ফালি ফালি করে কাটা পাউরুটিকে স্লাইস্‌ড্‌ ব্রেড বলে। মিল্ক ব্রেড, হোলমিল ব্রেড, চকোলেট ব্রেড, খেজুর বা কিসমিস-দেওয়া পাঁউরুটি, মিষ্টি বান রুটি প্রভৃতি প্রচুর চলে।



॥ স্যালাড ॥

স্যালাড মানুষের প্রিয় খাদ্য। এই স্যালাড নানা ধরনের—নিরামিষ ও আমিষ দু'রকমের। ডিমের স্যালাড, কাঁকড়ার স্যালাড, ডিম টম্যাটোর স্যালাড, গাজরের স্যালাড, ফুলকপির স্যালাড, চীনাবাদামের স্যালাড, শশা ও আনারসের স্যালাড বীট বিন আলু আদা পেঁয়াজ প্রভৃতির স্যালাড, প্রভৃতি বহু রকমের স্যালাড লোকে খায়। সব চেয়ে বেশী চলে মিক্স্‌ড্‌ ভেজিটেবল স্যালাড। তাতে বাঁধাকপি, গাজর, আলু, বিন, শশা, ফুলকপি, জলপাই, টম্যাটো, আপেল, বীট, কিসমিস, চীনাবাদাম, আনারস, মটরশুঁটি প্রভৃতি থাকে।



॥ সুপ ॥

সুপ নিরামিষ ও আমিষ—দুরকমেরই হয়। টম্যাটোর সুপ, পালংশাকের সুপ, মটরশুঁটির সুপ, শশার সুপ, গাজরের সুপ, আলুর সুপ, ডালের সুপ, মাছের সুপ, পাঁঠার মাংসের সুপ, চিকেন সুপ, প্রভৃতি নানা ধরনের সুপ খুব পুষ্টিকর ও উত্তম খাদ্য।



॥ মাছ ॥

নদী, পুকুর, ডোবা, জলা, সাগর, হ্রদ প্রভৃতি



মাছ-ধরা সোভিয়েট জাহাজ



সাগরে মাছের ঝাঁক

থেকে লোকে মাছ ধরে নানাভাবে রান্না করে খায়। পৃথিবীর সব দেশের লোকই মাছ খেয়ে



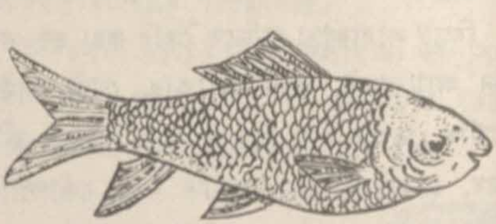
বরফের দেশে মাছ ধরা

থাকে। চিংড়ি মাছের কাটলেট, ভেটকি মাছের ফ্রাই, পোনা মাছের কালিয়া, মুড়িঘণ্ট, মাছের



সাগরে মাছ ধরা

চপ, মাছ ভাজা, মাছের অম্বল, মাছের ঝোল, কুচো চিংড়ির বড়া, বড় পোনা মাছের কোর্মা ও কালিয়া, চিংড়ির দম, টেংরা মাছের কোর্মা, চিংড়ি ভেটকি প্রভৃতি মাছের ঘণ্ট, ইলিশ মাছ ভাতে প্রভৃতি খাদ্য মাছ দিয়ে তৈরী হয়। রুই,



রুই মাছ

কাতলা, বাটা, মিরগেল, কালবোস, মাগুর, শিঙ্গি, টেলাপিয়া, সিলভার কার্প, বান, ইলিশ, পার্শে, বোয়াল, ভাঙ্গন, পমফ্রেট, কই, শোল, পুঁটি, মোরলা, ন্যাদস, আড়, টেংরা, সার্ডিন, হেরিং, কড, মোচা চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, কুচো চিংড়ি, লেঠা, বেলে, তপসে, শংকর প্রভৃতি অসংখ্য রকমের মাছ

লোকে খেয়ে থাকে। জাপানীরা বর্তমান যুগেও কাঁচা মাছ খায়। এস্কিমোরা কাঁচা মাছ খেতে অভ্যস্ত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের লোকে টম্যাটো বা লেবুর রসে ডুবিয়ে কাঁচা মাছ খেতে ভালোবাসে। পৃথিবীর অনেক দেশে বিশেষ করে নানা দ্বীপের লোক বর্তমান যুগেও কাঁচা মাছ খেয়ে থাকে।



।। মাংস ।।

পাঁঠা, ভেড়া, হরিণ, মুরগী, কচ্ছপ, শূকর, বলগা হরিণ, উট, নানাধরনের পাখি প্রভৃতির মাংস নানা দেশের লোকে নানাভাবে রেঁধে খায়। ইউরোপে রান্না-করা বিরাট বিরাট মাংসের চাংড়া টেবিলের এক পাত্রে রেখে দেওয়া হয়। লোকে সেই চাংড়া থেকে কেটে কেটে খায়। এদেশে মাংস টুকরো টুকরো করে কেটে নানা মসলা সহযোগে রান্না করা হয়। মাংসের চপ, কাটলেট, কোর্মা, কালিয়া, ডালনা, ঝোল, পোলাও প্রভৃতি নানারকম খাদ্য তৈরী হয়ে থাকে। মাংস রাঁধবার ধরন নানা দেশে নানা প্রকার। লোকে ঝিনুক, গেঁড়ির মাংসও খেয়ে থাকে।

।। পনীর ।।

সব দেশের লোকই পনীর (cheese) খায়। সব হোটেলে রেস্তোঁরায় পনীর পাওয়া যায়। বাড়িতে পনীর তৈরি করার চলন হয়েছে। এই পনীর সাধারণতঃ গরু ছাগল প্রভৃতির দুধ দিয়ে তৈরী হয়। এদেশে সাধারণভাবে পনীর তৈরী হয়ে থাকে। কিন্তু পাশ্চাত্যে নানাভাবে পনীর তৈরী হয়। পাঁচ শতের অধিক রকমের পনীর সারা পৃথিবীতে চলে। সমারসেটশায়ারের অন্তর্গত চেড্যার (Cheddar)-নামক স্থানে প্রথমে যে পনীর তৈরী হয়েছিল, তার নাম চেড্যার। এই পনীর আগে শুধু ব্রিটেনেই চলত। এখন কানাডা, নিউ জীল্যাণ্ড, অস্ট্রেলিয়া, হল্যাণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও চলে। সাধারণতঃ পনীরের তিনটি প্রধান বিভাগ —(১) নরম (ক্যামেমবার্ট, কেম্ব্রিজ), (২) blue-veined অর্থাৎ নীল শিরা (স্টিলটন, রোকফোর্ট, গরগনজোলা), (৩) hard-pressed অর্থাৎ কষে চাপ-দেওয়া (চেড্যার, চেশায়ার, পারমেস্যান ইত্যাদি)। আমস্টারডামের নিকটবর্তী ইডাম (Edam)-নামক স্থানে প্রথমে যে পনীর তৈরি হত, তা বর্তমানে সারা হল্যাণ্ডে চলে। তার নাম ইডাম পনীর। উত্তর-পূর্ব ফ্রান্সের ব্রী (Brie)-নামক স্থানের পনীর ব্রী নামে খ্যাত। এই পনীর খুব সাদা ও নরম। সুইটজারল্যাণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশের স্যাপস্যাগো (sapsago) একধরনের খুব কঠিন সবুজ রঙের পনীর। নানা দেশে নানা ধরনের পনীর তৈরী হয়ে থাকে।



।। নানা ধরনের ফল ।।

আম, জামরুল, কাঁঠাল, বেল, তরমুজ, আপেল,



আনারস



খেজুর

নাশপাতি, আনারস, কালোজাম, খেজুর, তাল,



এক ধরনের আঙুর

নারকেল, আখরোট, বেদানা, ডালিম, কলা, আঙুর,



পেয়ারা

আমড়া, টম্যাটো, পেয়ারা, আতা, আমলকী, আলু-



গ্রেপফ্রুট

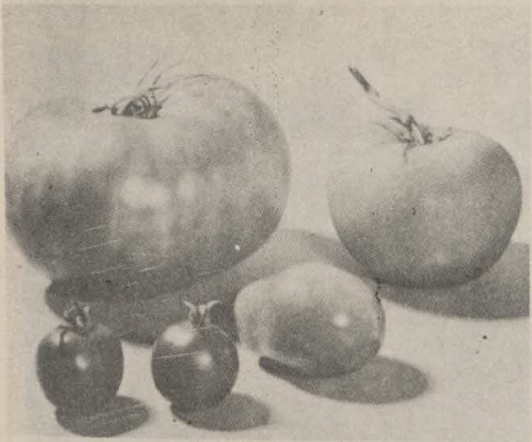
বোখারা, আঁশফল, লিচু, কামরাঙা, জলপাই, লকেট, ফলসা, কমলা লেবু, পাতি লেবু, কাগজী লেবু, খরমুজা, কয়েত বেল, আভোকাডো, কুল, গুজবেরি, গ্রেপফ্রুট, বাতাবি লেবু, চালতা, ডেফল, তরমুজ, তেঁতুল, নোনা, পানিফল, পীচ, স্ট্রবেরি



আঙুরের ক্ষেত



কমলালেবুর বাগান



টম্যাটো

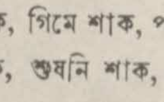


স্ট্রবেরি



পেঁপে

পেঁপে, রাস্পবেরি, বাদাম, মহুয়া, সপেটা, সুপারি প্রভৃতি নানাধরনের ফল লোকে খায়।



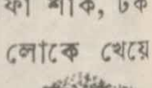
॥ সবজি ॥

গোল আলু, রাঙা আলু, শকরকন্দ আলু, কচু, মানকচু, গুঁড়ি কচু, শোলা কচু, ওল, আদা, হলুদ, পেঁয়াজ, রসুন, মুলো, গাজর, বীট, ওলকপি, বাঁধাকপি, ফুলকপি, শালগম, উচ্ছে, করলা, কাঁকরোল, ঝিঙ্গে, চিচিঙ্গে, লাউ, চাল কুমড়ো, মিষ্টি কুমড়ো, কাঁকুড়, ফুটি, পটল, বেগুন, টম্যাটো, লঙ্কা, ঢেঁড়শ, সীম, বরবটি, মটরশুঁটি, কাঁচকলা, থোড়, মোচা, সজনে ডাঁটা, এঁচোড়, ডুমুর প্রভৃতি বহু রকমের সবজি লোকে খেয়ে থাকে। এ-সবের মধ্যে বেশির ভাগ রান্না করে খাওয়া হয়।



॥ শাক ॥

পুঁই শাক, পালং শাক, কাটোয়া ডাঁটা, নটে শাক, কলমী শাক, গিমে শাক, পাট শাক, ব্রাহ্মী শাক, হিঞ্চে শাক, শুষনি শাক, থানকুনি, পিড়িং শাক, মেথি শাক, ধনে শাক, শুলফা শাক, টক পালং প্রভৃতি শাক নানাভাবে লোকে খেয়ে থাকে।



॥ চাল, গম ইত্যাদি শস্য ॥

চাল রেঁধে লোকে ভাত খায়। চাল ভেজেও খায়। চাল থেকে মুড়ি চিঁড়ে হয়। ধান থেকে খই হয়। গমের আটায় রুটি, চাপাটি, পুরি হয়। ময়দা থেকে লুচি, কচুরি, ডালপুরি, পরটা ও নানা ধরনের খাবার হয়। যব থেকে ছাতু, রোগীর পথ্য বার্লি হয়। ভুট্টার খই হয়। বাজরা ও জোয়ারের রুটি

হয়। যই (ওট্‌স্), চিনা, কাউন নানাভাবে খাওয়া হয়।

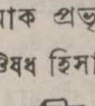


॥ ডাল ॥

অড়হর, মসূর, মুগ, ছোলা, কলাই, বিউলি, মটর, প্রভৃতি ডাল মানুষের প্রিয় খাদ্য।

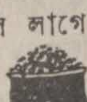
॥ শটী, চা, কফি, পান, তামাক, আফিম ॥

শটীর পালো ও অ্যারোরুট থেকে রোগীর পথ্য হয়। চা, কফি উত্তেজক পানীয় হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মুখশুদ্ধি হিসাবে ভারতের লোক খয়ের, চুন, সুপারি, বড় এলাচ, মৌরি, ধনের চাল ইত্যাদি সহয়োগে পান খায়। নেশার জন্যে তামাক পাতা থেকে তৈরী খইনি, দোক্তা, গুড়ুক তামাক প্রভৃতি খাওয়া হয়ে থাকে। আফিম নেশা ও ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত মাদক দ্রব্য।



॥ তেল ॥

সরিষা, তিল, চীনাবাদাম, সূর্যমুখীর বীজ, কাপাস তুলার বীজ, রেড়ি, তিসি প্রভৃতি থেকে তেল তৈরী হয়। সেই সব তেলের অধিকাংশ রান্নার কাজে লাগে। বনস্পতি তৈরিতে প্রধানতঃ চীনাবাদাম ও কাপাস তুলার বীজের তেল লাগে।



॥ সয়াবীন ॥

সয়াবীন থেকে যে দুধ পাওয়া যায়, তা গবাদি পশুর দুধের মতো গুণসম্পন্ন। সয়াবীনের দুধ খাওয়া চলে। তা থেকে ছানা, দই, নানা ধরনের খাবার তৈরি করা চলে। সয়াবীনের দুধ অতি পুষ্টিকর খাদ্য।

॥ সংরক্ষিত খাদ্য ॥

নানাধরনের জ্যাম, জেলি, মোরব্বা, আচার, চাটনি বহু রকমের ফল থেকে তৈরী হয়। এসব অনেক দিন ধরে রাখা চলে। টিন বা শিশিতে ভালোভাবে প্যাক করা হলে দীর্ঘদিন অবিকৃত থাকে। আম, লেবু, কুল, আনারস, আমড়া, লঙ্কা, জলপাই, বেল, আলুবোখারা, টম্যাটো, কয়েত বেল, তেঁতুল, পেঁপে প্রভৃতির আচার, মোরব্বা, চাটনি, জেলি, জ্যাম তৈরি করা হয়ে থাকে।

তাছাড়া নানাধরনের রান্না-করা মাছ বা মাংস টিনে ভরে বিদেশে রপ্তানী হয়। বিদেশভ্রমণের সময় এই সব টিনে প্যাক-করা খাদ্য খুব কাজে লাগে। অসময়ে টিন বা শিশি খুলে সেই সব সংরক্ষিত খাদ্য ব্যবহার করা চলে।

॥ দেশ-বিদেশের অদ্ভুত খাদ্য ॥

বাঙালীরা কুচো চিংড়ি মাছ খায়। দাক্ষিণাত্য, রাজস্থান প্রভৃতি অঞ্চলের লোকেরা কুচো চিংড়ি তো খায়ই না, বরং চিংড়ি মাছ খাবার নামে নাক সিঁটকোয়। এদেশে ব্যাঙ খায় না। ব্যাঙকে খাদ্য হিসাবে ভাবতে গেলে ঘৃণা বোধ করে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে ব্যাঙ অতি সুখাদ্য। ভারতের লোক জলাজমি, পুকুর প্রভৃতি থেকে ব্যাঙ ধরে বিদেশে পাঠায়। এতে প্রচুর অর্থাগম হয়।

উত্তর আফ্রিকার লোকেদের কাছে পঙ্গপাল সুখাদ্য। তারা পঙ্গপালকে কাঁচাই চিবিয়ে চিবিয়ে খায়। তারা শুধু পঙ্গপাল খায় না, পিঁপড়ের ডিমও খায়। অবশ্য, উত্তর আফ্রিকা কেন, পৃথিবীর নানা দ্বীপের মানুষ ও বন্য মানুষ পিঁপড়ের ডিম খেতে ভালোবাসে।

চীন, মঙ্গোলিয়া প্রভৃতি দেশের লোকেরা পাখির, বিশেষ করে সোয়ালো পাখির বাসা খায়।

ব্যাঙের ছাতা অধিকাংশই বিষাক্ত। তা খেলে মানুষের মৃত্যু হতে পারে। যে-সব ব্যাঙের ছাতা বিষাক্ত নয়, সে-সব লোকে খায়। বাংলার পল্লী অঞ্চলে কৌঁড়ক খায়। এই কৌঁড়ক ব্যাঙের ছাতা।

স্যাঁতসেঁতে জায়গায়, খড়ের গাদায়, মেটে ঘরের মেঝেতে কোঁড়ক জন্মায়। লোকে সেই কোঁড়ক মাংসের মতো রান্না করে পরম তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে থাকে।

বর্মার লোকে ঙাপ্পি বলে যে খাদ্য খায়, তার দারুণ দুর্গন্ধ। অন্য দেশের লোক তো ভাবতেই পারে না, বর্মীরা কী করে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে সেই খাদ্য খায়। তারা বলে, এই ঙাপ্পি বেশ কিছুদিন মাটিতে পুঁতে রাখলে খেতে খুব ভালো লাগে। সাপ, গোসাপ, ইঁদুর প্রভৃতিও বন্য জাতির লোকেরা খেয়ে থাকে। বিচিত্র এই পৃথিবী!

॥ খাদ্যের বিভাগ ॥

নির্বিচারে খাদ্য খেয়ে পেট ভরালেই চলে না। যে-জিনিস নিয়মিত খাওয়া হচ্ছে, তার খাদ্য-মূল্য কতখানি তা দেখা দরকার। প্রধানতঃ প্রোটীন, শ্বেতসার বা শর্করা ও আমিষজাতীয় পদার্থ-খাদ্যকে এই কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যাদের বহু-মূত্র রোগ আছে তাদের শর্করাজাতীয় খাদ্য অধিক পরিমাণে খাওয়া নিষেধ। বেশী স্নেহ বা চর্বিজাতীয় খাদ্য খেলে শরীরে বেশী মেদ জন্মে, তার ফল ভালো হয় না। ভিটামিন বা খাদ্যপ্রাণ বলে নানা শ্রেণীর যে অতি প্রয়োজনীয় পদার্থ খাদ্যের মধ্যে বিদ্যমান, সেই ভিটামিন-সংবলিত খাদ্য চিকিৎসকের পরামর্শমতো নির্দিষ্ট মাত্রায় গ্রহণ করা দরকার। উপযুক্ত ভিটামিনের অভাবে লোকে পীড়িত হয়ে থাকে। ভিটামিন এ, বি, সি, ডি প্রভৃতি অনেক রকম ভিটামিন আবিষ্কৃত হয়েছে ('শারীর বিজ্ঞান' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

সারা পৃথিবীতে অসংখ্য দেশে অসংখ্য রকমের খাদ্য প্রচলিত আছে। সে-সবের বর্ণনা তো দূরের কথা, সম্পূর্ণ নামোল্লেখ করাও এই অধ্যায়ের অল্পপরিসরে সম্ভব নয়।

নানা কথা

॥ ভোজসভায় সবচেয়ে বড় খাদ্য ॥

রান্না-করা ডিম রান্না-করা মাছের মধ্যে পুরে সেই মাছ রান্না-করা মুরগীর মধ্যে পুরে আগুনে ঝলসানো বা পোড়ানো ভেড়ার মধ্যে রাখার পর সেই ভেড়া একটা আস্ত ঝলসানো বা পোড়ানো উটের মধ্যে রাখলে একটা বিচিত্র খাদ্য তৈরী হল। কোন সম্ভ্রান্ত বেদুইনের বিবাহে সেই উটকে খাদ্য হিসাবে ভোজ-সভায় রাখা হয়। পৃথিবীতে এত বড় খাদ্য আর কোথাও কোন ভোজসভায় পরিবেশিত হয় না।

॥ সবচেয়ে বড় ও উচ্চতায় দীর্ঘ কেক ॥

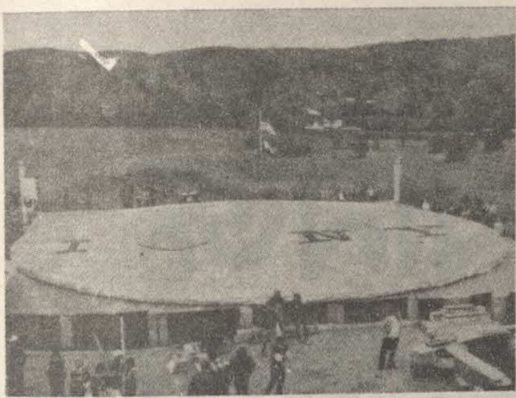
১৯৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখে তৈরী বাল্টিমোর সিটি বাইসেনটিয়্যাল কেক পৃথিবীতে এ পর্যন্ত তৈরী সবচেয়ে বড় কেক। এতে উপাদান লেগেছিল ৩১.১৮ টন। ১০ হাজার ডজন ডিম ও ৯৭৯৭ কেজি চিনি এই কেকটি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছিল। রয় বাটারওয়ার্থ ও ফ্র্যাঙ্ক ব্রেণ্যান ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে কানাডার নোভা স্কোসিয়াতে যে কেক তৈরি করেন, সেটি উচ্চতায় ছিল ৯.৯০ মিটার (৩২ ফুট ৬ ইঞ্চি)। এটি পৃথিবীতে এ পর্যন্ত তৈরী সবচেয়ে উঁচু কেক।

॥ সবচেয়ে বড় পাঁউরুটি ॥

নিউ ইয়র্কে ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর Franz Eichenauer একখণ্ড পাঁউরুটি তৈরী করেছিলেন। সেটি দৈর্ঘ্যে ছিল ৩২২.৭ মিটার ($\frac{১}{২}$ মাইল)।

॥ সবচেয়ে বড় ডিমের অমলেট ॥

১৯৭৯ সালের ২৯শে জুন কানাডার অন্টারিওর অন্তর্গত কিচেনারে Conestoga কলেজের ছাত্ররা ১২,৪৪০টি ডিম দিয়ে একটি অমলেট তৈরি করে। সেটি ৯.১ × ৩.০৪ মিটার (৩০ × ১০ ফুট)



সবচেয়ে বড় পিজা পাই

প্রস্তুত হয়। এটির ওজন ছিল ৮,৪৬৫ কেজি। আয়তনের পাত্রে তৈরি করা হয়েছিল।

॥ সবচেয়ে বড় পিজা পাই ॥

১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর লোরেকো আমাতো কর্তৃক তৈরী পিজা পাই (pizza pie) পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ। নিউ ইয়র্কের অন্তর্গত গ্লেন ফল্‌সের ওমা পিজা রেস্তোরাঁর জন্যে এটি এটির ব্যাস ছিল ২৪.৪ মিটার (৮০ ফুট ১ ইঞ্চি)। আয়তন ছিল ৪৬৮ বর্গ মিটার (৫০৩৭ বর্গ ফুট)। এটি কেটে ৬০,৩১৮ খণ্ড করা হয়।



॥ দীর্ঘতম সসেজ ॥

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে মে ফ্রান্সের ট্রেটস গ্রামে এক স্থানীয় উৎসবে যে একটানা সসেজ (পাতলা নলের ন্যায় আকারের ময়দার লেচির মধ্যে মাংসাদির পুর-দেওয়া খাদ্য বিশেষ) তৈরী হয়েছিল সেটি লম্বায় ছিল ৩.৮১ কিলোমিটার (২.৩৭ মাইল)।



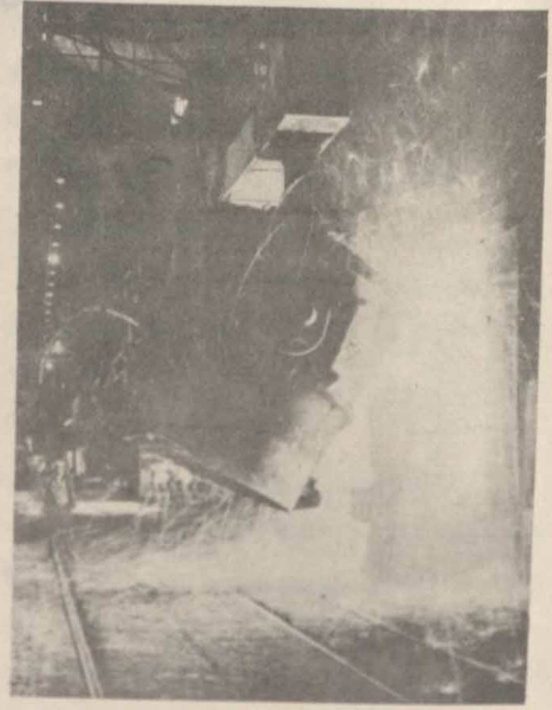
খনিজ সম্পদ

মাটির নীচে এমন কতকগুলি জিনিস থাকে যে-সব জিনিস মানুষের জীবনযাত্রার পক্ষে খুবই মূল্যবান্। শুধু ভূগর্ভে নয়, সমুদ্রে, পর্বতাভ্যন্তরেও এ-সব থাকে। কয়লা, লোহা, অভ্র, তামা, সোনা, গন্ধক, রুপা, হীরা, দস্তা, ম্যাঙ্গানীজ, সীসা, বক্সাইট, ক্রোমিয়াম, প্ল্যাটিনাম, টাংস্টেন, পারদ, ম্যাগনেসিয়াম, ইউরেনিয়াম, অ্যান্টিমনি, নিকেল, টিন, লিগনাইট, মোনাজাইট, বিসমাথ, ক্যাডমিয়াম, ফেলসপার, অ্যাপাটাইট, ক্রাইওলাইট, কাইনাইট ব্যারাইট্‌জ্‌, বেরিল, ডলমাইট, কোরাণ্ডাম, গ্র্যাফাইট, অ্যাজবেস্টস, থোরিয়াম, খনিজ তেল প্রভৃতি অসংখ্য দ্রব্য যেখান থেকে তুলে আনা হয়, সাধারণতঃ সেই সব স্থানকে খনি বলে ও সেই সব খনি থেকে উত্তোলিত উপরে উল্লিখিত নানা দ্রব্যকে বলে খনিজ দ্রব্য। এই সব জিনিস মানুষের বহু প্রয়োজনে লাগে এবং এগুলি খুবই মূল্যবান্, তাই এ-সবকে বলা হয় খনিজ সম্পদ।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই খনি আছে। সেই সব খনি থেকে নানা খনিজ দ্রব্য তোলা হয়। যে দেশ থেকে যত বেশী খনিজ দ্রব্য পাওয়া যায়, সে দেশ তত সমৃদ্ধ।

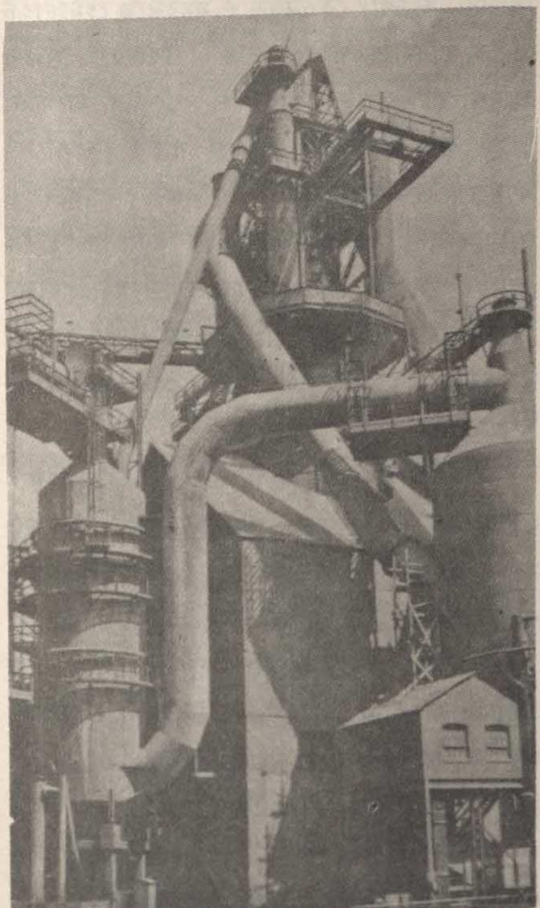
॥ লৌহ ॥

প্রথমেই আলোচনা করা যাক লৌহ বা লোহার



লোহা গলানো হচ্ছে

সম্বন্ধে। মনুষ্যসমাজে লোহা সব ধাতুর চেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়। খনি থেকে বা পাহাড় কেটে লোহা-পাথর বা আকরিক লোহা (iron ore) তুলে এনে প্রচণ্ড উত্তাপে তাকে গলিয়ে তা থেকে ব্যবহারযোগ্য লোহা বার করে নেওয়া হয়। এই লোহা বার করার ব্যাপারে রাসায়নিক প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হয়। পৃথিবীর নানা দেশে ও ভারতে লৌহ নিষ্কাশনের ও

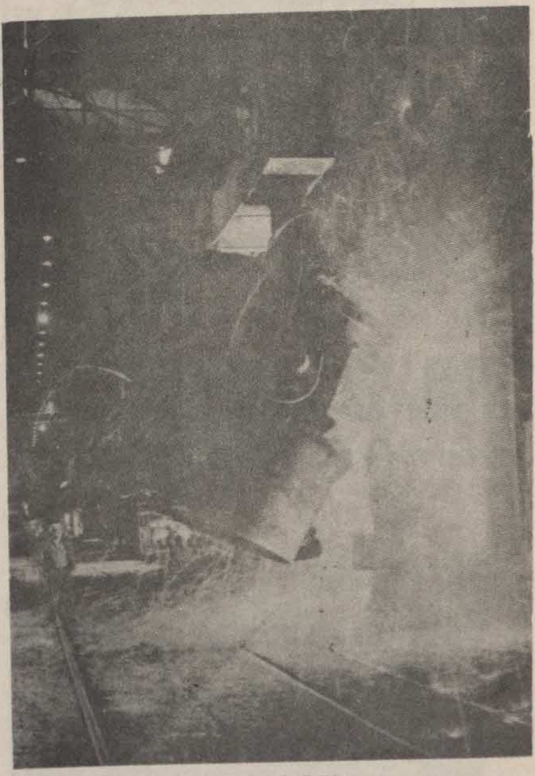


ব্লাস্ট ফার্নেস

তা থেকে নানা দ্রব্য তৈরি করার বড় বড় কারখানা আছে।

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী লৌহ উৎপাদিত হয় সোভিয়েট রাশিয়ায়। শুধু লোহা নয় খনিজ তৈল, সোনা, তামা, ম্যাঙ্গানীজ, অ্যালিউমিনিয়াম, প্ল্যাটিনাম, অ্যাজবেসটস, লবণ ও অন্যান্য বহু খনিজ দ্রব্যের দিক্ দিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া অতিশয় সমৃদ্ধ, বহু ক্ষেত্রেই পৃথিবীতে প্রথম স্থানাধিকারী। সোভিয়েট রাশিয়ার উরল পর্বত অঞ্চলে খনিজ দ্রব্য বেশী পাওয়া যায়।

সোভিয়েট রাশিয়ার আকরিক লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ বার্ষিক ৮০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ লোহার খনি সোভিয়েট রাশিয়ার কুর্স্ক্ (Kursk) অঞ্চলের আকরিক লৌহের খনি। এ থেকে ২০,৩০০ মিলিয়ন টন আকরিক লৌহ উৎপাদিত হয়।



লোহা গালানো হচ্ছে

বিজ্ঞানীরা বলেন, ভূ-ত্বকের শতকরা ৫ ভাগ লোহা। খাঁটি লোহা খুব নরম। এর সঙ্গে কার্বন মিশিয়ে ইস্পাত ও ঢালাই লোহা উৎপন্ন করা হয়। লোহার সঙ্গে শতকরা ৩৫ ভাগ কোবাল্ট মেশালে

ম্যাগনেটিক ইস্পাত, ১·৭৫ ভাগ ম্যাঙ্গানীজ মেশালে কঠিন ইস্পাত, ০·৬৮ ভাগ মলিবডেনাম মেশালে বয়লার ও বাষ্পীয় যন্ত্রাদি নির্মাণের উপযোগী ইস্পাত, ০·১৮ ভাগ ভ্যানাডিয়াম মেশালে রেলের এঞ্জিন ইত্যাদি তৈরির উপযোগী ইস্পাত, ১৮ ভাগ ক্রোমিয়াম ও ৮ ভাগ নিকেল মেশালে স্টেনলেস স্টীল, ২ ভাগ সিলিকন ও ০·৭৫ ভাগ ম্যাঙ্গানীজ মেশালে রেলগাড়ির স্প্রিং ইত্যাদি তৈরির উপযোগী ইস্পাত, ১৮ ভাগ টাংস্টেন, ৪ ভাগ ক্রোমিয়াম ও ১ ভাগ ভ্যানাডিয়াম মেশালে যন্ত্রাদি কাটবার উপযোগী 'high speed steel' তৈরী হয়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগে পৃথিবীর লোকে প্রথম দিকে লোহার ব্যবহার জানত না কিন্তু তা না জেনেই লোহা-পাথর দিয়ে অস্ত্র তৈরি করে জীবজন্তু শিকার করত। তার পরে তারা একটা একটা করে ধাতুর ব্যবহার করতে শেখে।

সব কিছুর আগে যে যুগ আরম্ভ হয় তার নাম পুরাতন প্রস্তর যুগ। তার পরের যুগের নাম নূতন প্রস্তর যুগ। এর পর তামা, পরে ব্রোঞ্জ এবং তার পরে লোহার প্রচলন শুরু হয়। তাই থেকে তাম্র যুগ, ব্রোঞ্জযুগ ও লৌহযুগ কথার সৃষ্টি।



খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত লোহার কাস্তে

আনুমানিক ৪৭ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে হেমাটাইট আকরিক লৌহ (Fe_2O_3) ব্যবহৃত হয়। সোয়াজিল্যাণ্ডের Hhohho জেলায় তার নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ভারতে প্রধানতঃ চাররকম আকরিক লৌহ পাওয়া যায়—ম্যাগনেটাইট, ল্যাটেরাইট, অ্যালয় লৌহ-প্রস্তর ও হেমাটাইট। এ সবের মধ্যে বিহারের সিংভূম, ওড়িশার কেওনঝড় ও ময়ূরভঞ্জে হেমাটাইট প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। বিহার, হিমাচল প্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও ওড়িশায় ম্যাগনেটাইট আকরিক লৌহ পাওয়া যায়। আসামের কামরূপ জেলায় বোকোর নিকটে হামিদে ও গোয়ালপাড়া জেলার চন্দরদিঙ্গায় প্রচুর আকরিক লৌহের সন্ধান পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রদেশের বৈলাডিল্লা, বস্তার ও ডাল্লি, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও বাঁকুড়া অঞ্চলে আকরিক লৌহ পাওয়া যায়।

ভারতের উচ্চশ্রেণীর লৌহ উৎপাদনের পরিমাণ ২১ হাজার মিলিয়ন টন—পৃথিবীতে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী। নিম্নশ্রেণীর আকরিক লৌহের ভাণ্ডার প্রায় এক লক্ষ মিলিয়ন টন।

ভারতে বহু লৌহ উৎপাদন ও লৌহনির্মিত দ্রব্যের কারখানা আছে। রাউরকেলা, ভিলাই, দুর্গাপুর, মহীশূর আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল লিঃ, বোকারো দি ইণ্ডিয়ান আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ, টাটা আয়রন অ্যাণ্ড স্টীল কোং লিঃ প্রভৃতি লৌহ উৎপাদন ও লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি তৈরির জন্য প্রসিদ্ধ।

এ ছাড়া রাঁচির হেভি এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন, দুর্গাপুরের মাইনিং অ্যাণ্ড অ্যালয়েড মেসিনারী কর্পোরেশন, এলাহাবাদের ত্রিবেণী স্ট্রাকচার‍্যালস লিঃ, তুঙ্গভদ্রা স্টীল প্রোডাক্ট্স লিঃ, বিশাখাপত নমের ভারত হেভি প্লেট্স্ অ্যাণ্ড ভেসল্স্ লিঃ, রাঁচির

হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ, কলকাতার হিন্দুস্থান স্টীল ওয়ার্কস কনস্ট্রাকশন লিঃ ও নিউদিল্লীর এঞ্জিনীয়ারিং প্রোজেক্ট্স্ (ইণ্ডিয়া) লিঃ প্রভৃতি সংস্থা সরকারী অর্থানুকুল্যে চালু আছে।

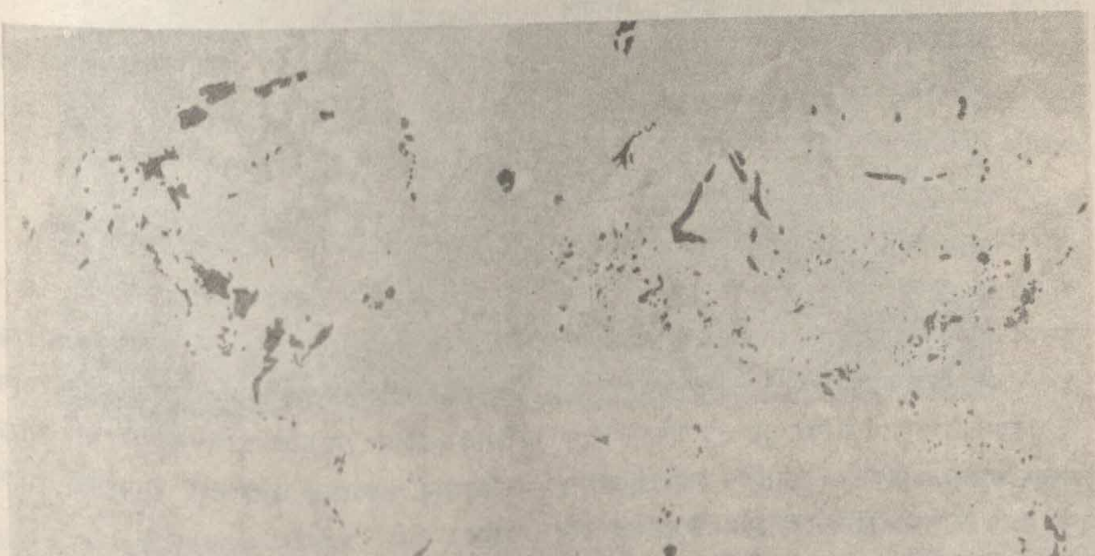
॥ কয়লা ॥



কয়লা অতি প্রয়োজনীয় খনিজ দ্রব্য। কয়লা শুধু রান্নার কাজে লাগে না, রেলগাড়ি, জাহাজ প্রভৃতি চালাতে, বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্যে, এঞ্জিন চালাতে, নানা ধরনের কলকারখানা চালাতে কয়লার প্রয়োজন। কয়লা থেকে আলকাতরা পিচ, জ্বালানী গ্যাস উৎপন্ন হয়। ন্যাপথ্যালিন, স্যাকারিন বেঞ্জিন, অ্যানিলীন, নানা ধরনের রং, কার্বলিক অ্যাসিড, বেকেলাইট, নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রভৃতি আলকাতরা থেকে তৈরী হয়।

বহু কোটি বৎসর আগে পৃথিবীর কোন কোন অংশে সুবৃহৎ ফার্ন গাছের মতো বিরাট বিরাট গাছের বন ছিল। ভূমিকম্পের ফলে বা অন্য প্রাকৃতিক কারণে সেই সব বন মাটির নীচে চাপা পড়ে যায়। সুদীর্ঘকাল মাটির নীচে থেকে প্রচণ্ড চাপে ও তাপে সেই সব বনের গাছপালা অঙ্গার বা কয়লায় পরিণত হয়ে যায়।

লোকে কোনক্রমে কোথাও সেই কয়লার সন্ধান পায়। তারপর থেকে সারা পৃথিবী জুড়ে কয়লার সন্ধান শুরু হয়ে যায়। কিন্তু কয়লা তো ২০/২৫ হাত মাটির তলায় থাকে না। থাকে অনেক গভীরে। নানা রকম যন্ত্রপাতির সাহায্যে সুড়ঙ্গ কেটে নীচে নামবার ব্যবস্থা হয়েছে। খাঁচার মতো কুঠুরিতে বা লিফ্টে করে খনির মজুররা নীচে নামে। কয়লা স্তরে স্তরে থাকে। শাবল-কোদাল দিয়ে বা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে সেই কয়লা কেটে উপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৫/২০ জন মানুষ যতটা কয়লা কাটতে পারে একটি Iron man-নামক যন্ত্রের সাহায্যে ততটা কয়লা কাটা



পৃথিবীর কয়লাকেন্দ্র

হয়ে থাকে।

খনির ভিতরটা গাঢ় অন্ধকার। শ্রমিকরা আলো হাতে সেখানে ঘোরাফেরা করে। আগে এই আলো থেকে অনেক বিপদ্ ঘটত। গ্যাস জ্বলে উঠে প্রলয়ংকর কাণ্ড ঘটাত। স্যার হামফ্রি ডেভি (Sir Humphry Davy, ১৭৭৮-১৮২৯ খ্রী.) ১৮১৬ সালে যে সেফ্টি ল্যাম্প উদ্ভাবন করেন বর্তমানে তাই ব্যবহার করা হয়। আগুন জ্বলে ওঠবার ভয় থাকে না।

কয়লার খনিতে পদে পদে বিপদ্। উপরের কয়লার স্তর ভেঙ্গে পড়তে পারে। এতে অনেক শ্রমিক মারা পড়ে। নিরাপত্তার জন্যে বড় মোটা মোটা শালের খুঁটিকে ঠেকনো হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

ভূগর্ভের জল বেরিয়ে এসে খনিকে ভরিয়ে তুলতে পারে। তাতে বহু শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটে। সেই রকম বিপদ্ থেকে উদ্ধারের জন্য উন্নত ধরনের পাম্পের সাহায্যে জল তুলে ফেলবার ব্যবস্থা আছে।

বিষাক্ত গ্যাসে শ্রমিকদের মৃত্যু হতে পারে। সেজন্যে শ্রমিকরা গ্যাস-মুখোশ পরে।

পৃথিবীর মোট সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৫০,০৮৩ বিলিয়ন মেট্রিক টন। যে পরিমাণ কয়লা বর্তমানে ব্যয়িত হয়ে থাকে, তাতে এই কয়লায় ২০০০ বছর চলবে। বর্তমানের দ্বিগুণ পরিমাণ ব্যয়িত হলেও ১০০০ বছর চলে যাবে।

কয়লা উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর মধ্যে প্রথম স্থানের অধিকারী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বৎসরে ১৭২৩.৪ বিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা উত্তোলিত হয়ে থাকে। রাশিয়ায় হয় ৫৮৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন, গ্রেট ব্রিটেনে ১৭৭.৪ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং ভারতে ৭০.১ মিলিয়ন মেট্রিক টন।

পৃথিবীতে মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ৪৬ ভাগ এশিয়ায়, ৩৮.২ ভাগ উত্তর আমেরিকায়, ১৩.১ ভাগ ইউরোপে, ১.৪ ভাগ আফ্রিকায়, অস্ট্রেলিয়ায় ১.১ ভাগ ও দক্ষিণ আমেরিকায় ০.২ ভাগ।

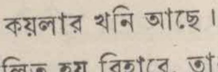
ভারতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে খনি থেকে রানীগঞ্জে প্রথম কয়লা উৎপাদন শুরু হয়।

প্রতি বৎসরই পৃথিবীর নানা নূতন নূতন স্থানে কয়লার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে। ভারতে রামগড়, রানীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে নূতন কয়লা খনি আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভারতে সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ ৮৩,০০০ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এর বেশির ভাগই আছে ঝরিয়া গিরিডি, বোকারো ও রানীগঞ্জ অঞ্চলে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, মেঘালয় অরুণাচল প্রদেশ ও নাগাল্যাণ্ডে কয়লার খনি আছে। সব চেয়ে বেশী কয়লা উত্তোলিত হয় বিহারে, তার পরে পশ্চিমবঙ্গে, তারপর মধ্যপ্রদেশে।

১৯৭৩ সালে সমগ্র কয়লাশিল্প জাতীয়করণের আওতায় আনা হয়েছে। ১৯৭৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর কোল ইণ্ডিয়া লিঃ গঠিত হয়েছে।

॥ লিগনাইট ॥



লিগনাইট এক ধরনের নরম বাদামী কয়লা। এ থেকে পেট্রোলিয়াম, ডিজেল অয়েল ও হাইড্রো-কারবন গ্যাস উৎপন্ন হয়। তামিলনাড়ুর দক্ষিণ আর্কট জেলার নেভেলিতে লিগনাইটের খনি আছে। রাজস্থান, গুজরাট ও কাশ্মীরেও লিগনাইট পাওয়া যায়।

॥ গভীরতম কয়লার খনি ॥

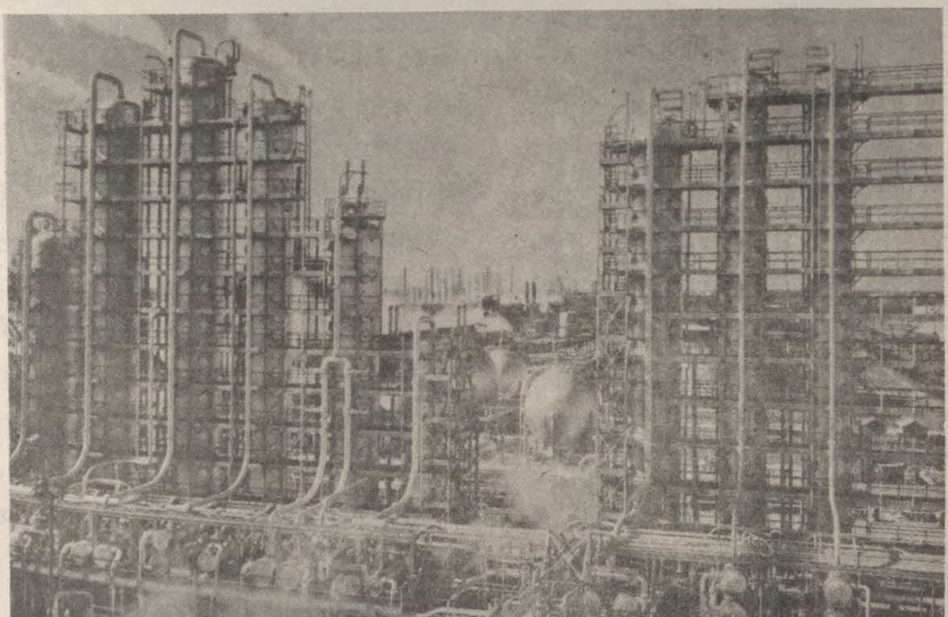
সব চেয়ে গভীর কয়লার খনি গ্রেটার ম্যাঞ্চে-

স্টারের অন্তর্গত লে (Leigh)-র আর্লে সীম, পারসনেজ কলিয়ারি ১২৫৯ মিটার গভীর। তার পরে গ্রেটার ম্যাঞ্চেস্টারের অন্তর্গত বিকারশ' (Bickershaw)-এ অবস্থিত বিকারশ' কলিয়ারি —:০৯৭ মিটার গভীর।



॥ খনিজ তৈল ॥

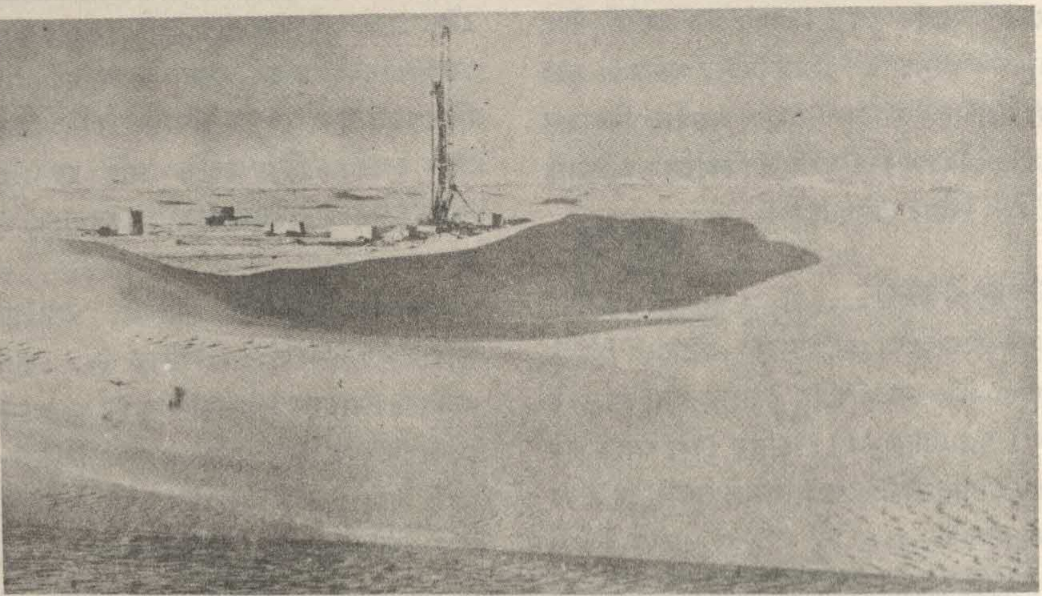
কয়লাকে বলা হয় কালো হীরে (black diamond), আর খনিজ তৈলকে বলা হয় তরল সোনা (liquid gold)। খনিজ তৈল বলতে খনি থেকে যে তৈল অর্থাৎ পেট্রোলিয়াম তোলা হয় তাকে বোঝানো হচ্ছে।



তৈলশোধনাগার

পেট্রোলিয়াম যখন উত্তোলিত হয় তখন তার সঙ্গে অনেক কিছু মিশানো থাকে। সেই পেট্রোলিয়ামকে নানা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিশোধিত করা হয়। তা থেকেই পেট্রল (গ্যাসোলিন) পাওয়া যায়। এই পেট্রলের সাহায্যে মোটর, বাস, লরী, টেমপো চলে, উড়োজাহাজ চলে, নানারকম এঞ্জিন চলে—এমনই কত রকমের কাজ হয়। পেট্রল নিষ্কাশনের সময় যে-সব জিনিস পাওয়া যায় তা থেকে রবার, প্লাস্টিক প্রভৃতি তৈরি হয়। পেট্রল আবিষ্কৃত হওয়ায় মনুষ্যসমাজ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বার্ষিক পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের পরিমাণ ৪৮৫ মিলিয়ন টন। সোভিয়েট রাশিয়ার উৎপাদন ৬০৩ মিলিয়ন টন। ভেনেজুয়েলা ১১৩ মিলিয়ন টন, মেক্সিকো ১১০ মিলিয়ন টন, সৌদি আরব ৪৯৫ মিলিয়ন টন, ইরাক ১৩৮ মিলিয়ন টন, নাইজিরিয়া ১০১ মিলিয়ন টন, চীন ১০৬ মিলিয়ন টন, যুক্তরাজ্য ৮০ মিলিয়ন টন, ইরান ৭৭ মিলিয়ন টন, কুওয়াইট ৮৬ মিলিয়ন টন, আবু ধাবি ৬৫ মিলিয়ন টন, কানাডা ৮২ মিলিয়ন টন, ঈজিপ্ট ৩০ হাজার টন, লিবিয়া ৮৫ মিলিয়ন টন, পশ্চিম জার্মানি ২৪ মিলিয়ন টন, সিরিয়া ৩০ মিলিয়ন টন,



লিবিয়া মরুভূমি থেকে তৈল উত্তোলন

আলজিরিয়া ৪৫ মিলিয়ন টন। এ ছাড়া ত্রিনিদাদ, কলম্বিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইকোয়েডর, পেরু, বলিভিয়া, চিলি, কাতার, ওমান, দুবাই, তুরস্ক, বাহ্‌রায়েন, গ্যাবঁ, অ্যাঙ্গোলা, টিউনিসিয়া, কঙ্গো, জাইরে, অস্ট্রিয়া, স্পেন, নেদারল্যাণ্ডস, ফ্রান্স, ইটালী, ডেনমার্ক, অস্ট্রেলিয়া, ব্রুনেই, মালয়েশিয়া, বার্মা, জাপান, পাকিস্তান, রুমানিয়া, যুগোস্লাভিয়া, আলবেনিয়া, হাঙ্গেরী, পোল্যাণ্ড, পূর্ব জার্মানি, বুলগেরিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় অল্পবিস্তর পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হয়। আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, কিউবা, গোয়াতেমালা, ইজরায়েল, মঙ্গোলিয়া, মরক্কো, নিউ জীল্যাণ্ড, তাইওয়ান ও থাইল্যাণ্ডে নগণ্য পরিমাণ পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়।

ভারতে মাত্র ১০ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম উৎপন্ন হয়। সারা পৃথিবীতে মোট ৩০৬৫ মিলিয়ন টন পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হয়। সবই অপরিশোধিত খনিজ তৈল।

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ভারতে খনিজ তৈল উত্তোলনের জন্য কুপ খনন করা হয়। ১৮৮৯ সালে ডিগবয়ে তৈল উত্তোলিত হয়। পরের ৬০ বৎসর শুধু ডিগবয় থেকেই তৈল পাওয়া যায়। বর্তমানে আসামের ডিগবয়, নাহারকাটিয়া, মোরান প্রভৃতি স্থানে খনিজ তৈল উত্তোলিত হয়। বোম্বাইয়ের কাছে সমুদ্রতলের নীচে Bombay Hich-নামক স্থান থেকে সম্প্রতি পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হচ্ছে। ভারতের নানা জায়গা থেকে খনিজ তৈল পাওয়ার আশা দেখা দিয়েছে।

বারাউনি (বিহারে), কোচিন, কয়ালি (বরোদার কাছে), নুনমাটি (গৌহাটির কাছে) প্রভৃতি স্থানে তৈলশোধনাগার স্থাপিত হয়েছে।

বহু জায়গায় পাইপে করে দূরবর্তী স্থানে পেট্রোলিয়াম পাঠানো হয়। ট্রানস-সাইবীরিয়ান পাইপ লাইন Tuimazy থেকে (Omosk ও Novosibirsk হয়ে) Irkutsk পর্যন্ত বিস্তৃত। দৈর্ঘ্য ৩,৭৩২ কিলোমিটার। পৃথিবীর মধ্যে দীর্ঘতম।

কানাডার অন্তর্গত আলবার্টার এডমনটন থেকে

নিউইয়র্ক স্টেটের বাফেলো পর্যন্ত বিস্তৃত ইন্টার প্রভিন্সিয়াল পাইপ লাইন কোম্পানির পাইপলাইন ২৮৫৬ কিলোমিটার দীর্ঘ।

সবচেয়ে বেশী খরচ পড়েছে আলাস্কা পাইপ লাইন বসাতে। পাইপের ব্যাস ১·২১ মিটার। এতে করে দিনে ২ মিলিয়ন ব্যারেল অপরিশোধিত তৈল পাঠানো হয়।

পেট্রোলিয়াম অতি দাহ্য পদার্থ। সহজেই এতে আগুন ধরে যায়। অনেক সময় তৈল উত্তোলনের সময়ে ঘর্ষণে বা অন্য কারণে তৈলকূপের মধ্যেই আগুন লাগে। কখনও কখনও সেই আগুন নেভাতে ২।১ বৎসর লেগে যায়। সেই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ফলে ধোঁয়ায় সারা আকাশ ঢেকে যায়।

বর্তমানে কয়লা থেকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পেট্রল উৎপাদিত হচ্ছে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে যে-সব বৃহদাকার প্রাণী পৃথিবীতে বিচরণ করত তারা কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে মাটি চাপা পড়ে যায়। সেই অবস্থায় প্রচণ্ড চাপে ও তাপে সেই-সব প্রাণীর দেহজাত পদার্থই পেট্রোলিয়াম।

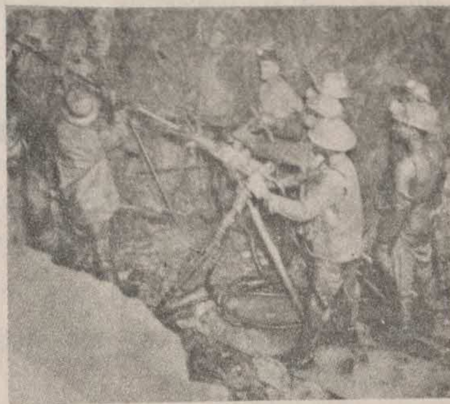
॥ সোনা ॥



সোনা (gold) খুব দামী ধাতু। সোনা দিয়ে অলংকারাদি তৈরী হয়। তাছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ঘাটতি হলে সোনা দিয়ে তা পূরণ করতে হয়।

প্রধানতঃ খনি থেকে অপরিশোধিত অবস্থায় সোনা পাওয়া যায়। নদীর বালির মধ্যে স্বর্ণরেণু পাওয়া যায়। বিশুদ্ধ স্বর্ণ কোমল। তামা, রুপা, নিকেল বা প্যাল্যাডিয়াম মিশিয়ে তাকে কঠিন করে নেওয়া হয়।

স্বর্ণ উৎপাদনে পৃথিবীতে দক্ষিণ আফ্রিকার স্থান প্রথম (শতকরা ৪৭ ভাগ)। কানাডার স্থান দ্বিতীয়।



খনি থেকে সোনা আহরণকারী

ভারতে স্বর্ণের উৎপাদন নগণ্য বলা চলে। ভারতে যে স্বর্ণ উত্তোলিত হয় তার শতকরা ৬৫ ভাগ আসে কর্ণাটক রাজ্যের কোলার স্বর্ণখনি থেকে। অন্ধ্র-প্রদেশের অনন্তপুর জেলায়, তামিলনাড়ুর Wynaad-এ, বিহারের মানভূম অঞ্চলে কিছু খনিজ সোনা পাওয়া যায়। আসাম, বিহার, কাশ্মীর, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে পলিজ সোনা কিছু পাওয়া যায়।



॥ অভ্র ॥

আয়ুর্বেদে অভ্রের উল্লেখ আছে। অভ্র ভারতে অতি প্রাচীন কাল থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বিহারে ৩,৩৮০ বর্গ কিলোমিটার, রাজস্থানে ২,১১০ বর্গকিলোমিটার এবং অন্ধ্রপ্রদেশে ১,৫৫০ বর্গ কিলোমিটার স্থানে প্রচুর অভ্র পাওয়া যায়। ভারত পৃথিবীর নানাদেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় অভ্রের পাতের ৮০ শতাংশ রপ্তানি করে।

বিমান, মোটরগাড়ি, বার্নিশ ও নানা ঔষধ তৈরিতে অভ্রের প্রয়োজন হয়।

কানাডা, মাদাগাস্কার, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশে কিছু কিছু অভ্র পাওয়া যায়।

অভ্র নানাপ্রকার। তন্মধ্যে পটাসিয়াম মাইকা,

ম্যাগনেসিয়াম মাইকা, বাইওটাইট ও আয়রন মাইকা প্রধান।

॥ তামা ॥



তামা প্রাগৈতিহাসিক যুগে আবিষ্কৃত ধাতু। তামার মধ্য দিয়ে বৈদ্যুতিক শক্তি উত্তমরূপে যাতায়াত করে এবং এতে কোন মরিচা পড়ে না। তামা নমনীয়। উৎপাদিত তামার প্রায় অর্ধেক বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তৈরিতে লাগে।

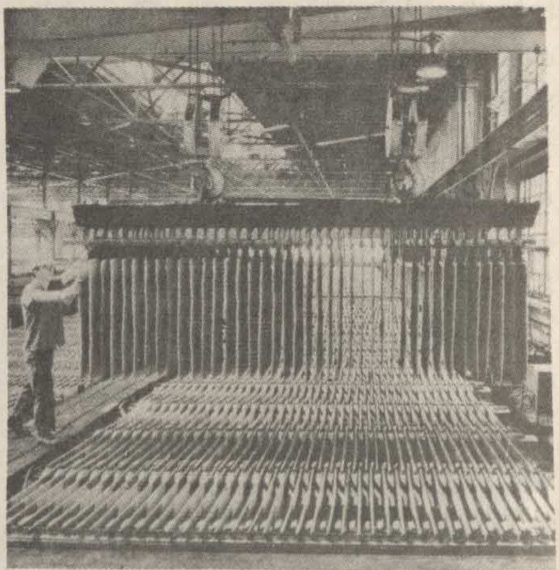


উটার তামার খনি

তামা ও দস্তার মিশ্রণে পিতল তৈরী হয়। তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চিলি, কানাডা, জাম্বিয়া ও কঙ্গোতে প্রচুর তামা পাওয়া যায়।

ভারতে বিহারের অন্তর্গত সিংভূম, রাজস্থানের খেতরি ও দারিবোয় যথেষ্ট তামা উৎপন্ন হয়। বিদেশ থেকে ভারতে তামা আমদানি করতে হয়।

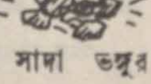


বিজ্ঞানসম্মত তামার পাত শোধনাগার



অ্যাপেলেশিয়ার তামার খনি

॥ ম্যাঙ্গানীজ ॥

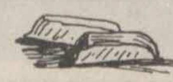


ম্যাঙ্গানীজ একধরনের রূপালী সাদা ভঙ্গুর ধাতু। বাতাসের সংস্পর্শে মলিন হয়ে যায়। কার্বন মেশালে ম্যাঙ্গানীজ কঠিন পদার্থে পরিণত

হয়। সুইডিশ রসায়নবিদ্ কার্ল উইলহেল্ম্ শীলি (Carl Wilhelm Scheele, ১৭৪২-৮৬ খ্রী) ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাঙ্গানীজ আবিষ্কার করেন। প্রতি টন ইস্পাত তৈরিতে ১৪ পাউণ্ড ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন। ড্রাই ব্যাটারি, এনামেল, প্লাস্টিক, বার্নিশ, কাচ ও নানা রাসায়নিক শিল্পে ম্যাঙ্গানীজের প্রয়োজন।

পৃথিবীতে ১৮·৫ মিলিয়ন মেট্রিক টন ম্যাঙ্গানীজ উৎপন্ন হয়। ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান পৃথিবীতে প্রথম। ভারতের স্থান তৃতীয়। প্রধানতঃ মধ্যপ্রদেশ, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদিত হয়। বিহারের সিংভূম, গুজরাটের পাঁচ-মহল, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর, বালাঘাট, ভাণ্ডারা, ছিন্দোয়ারা, ইন্দোর, ওড়িশার বোনাই, কেওনঝড়, কোরাপুট ও রাজস্থানের বাঁশওয়াড়ায় ম্যাঙ্গানীজের খনি আছে। মধ্যপ্রদেশে ভারতের মোট উৎপাদনের দুই-তৃতীয়াংশ ম্যাঙ্গানীজ পাওয়া যায়।

॥ দস্তা ॥



তামার সঙ্গে দস্তা (zinc) মেশালে পিতল তৈরী হয়। রং, রবার, প্রসাধন দ্রব্য ইত্যাদি



দস্তা ও সীসার খনি

তৈয়ারিতে ও মৃৎশিল্পে দস্তা লাগে কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো পোলাণ্ড অস্ট্রেলিয়া সোভিয়েট রাশিয়া, ইটালী, স্পেন ও পৃথিবীর নানা স্থানে দস্তার খনি আছে। ভারতে রাজস্থান ও তামিল-নাড়ুতে দস্তা পাওয়া যায়। ভারতে খুব বেশী পরিমাণ দস্তা উৎপাদিত হয়।

॥ সীসা ॥



সীসা (lead) নরম ঘাতসহ ধাতু। পিতল, ব্রোঞ্জ, ছাপার টাইপের ধাতু, জলের নল, কাচ ও রংশিল্প ইত্যাদিতে সীসার প্রয়োজন। ছাপার টাইপ তৈরি করতে এর সঙ্গে অ্যান্টিমনি মেশাতে হয়। সকল প্রকার সীসাই বিষাক্ত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (মিসৌরী), অস্ট্রেলিয়া (Broken Hill) ও সোভিয়েট রাশিয়ায় প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়।

ভারতে সীসার উৎপাদন নগণ্য। পৃথিবীর মোট উৎপাদনের মাত্র ০·২ শতাংশ ভারতে পাওয়া যায়। বিহারের পালামৌ, উদয়পুরের জওহর ও জয়পুরে সীসার খনি আছে।

॥ ইউরেনিয়াম ॥

বিজ্ঞানী ক্ল্যাপরথ (Klaproth) ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পিচব্লেণ্ড থেকে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়াম শ্বেতবর্ণ ধাতু, কিন্তু বাতাসের



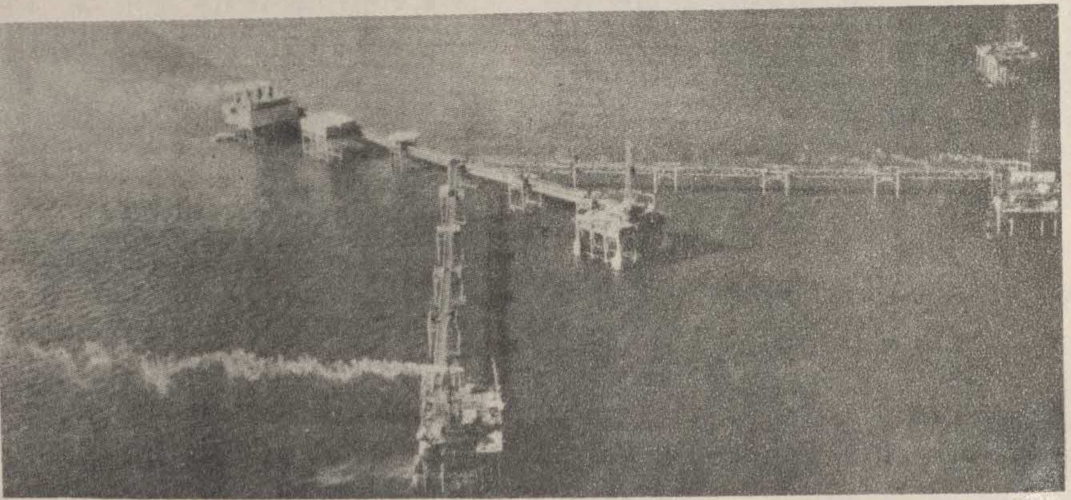
এক পাউণ্ড ইউরেনিয়াম-২৩৫ (প্রস্থে ২·৫৪ সেন্টিমিটার, দৈর্ঘ্যে ২·৫৪ সেন্টিমিটার, উচ্চতায় ২·৫৪ সেন্টিমিটার), ১৫০০ টন কয়লার তেজ এতে নিহিত।

সংস্পর্শে মলিন হয়ে যায়। ইউরেনিয়াম নানা-প্রকার। ইউরেনিয়াম আইসোটোপ U^{235} আবিষ্কৃত হওয়ার পর পারমাণবিক কার্যের বিশেষ সুবিধা হয়েছে এবং পারমাণবিক বোমা তৈরি করা গেছে।

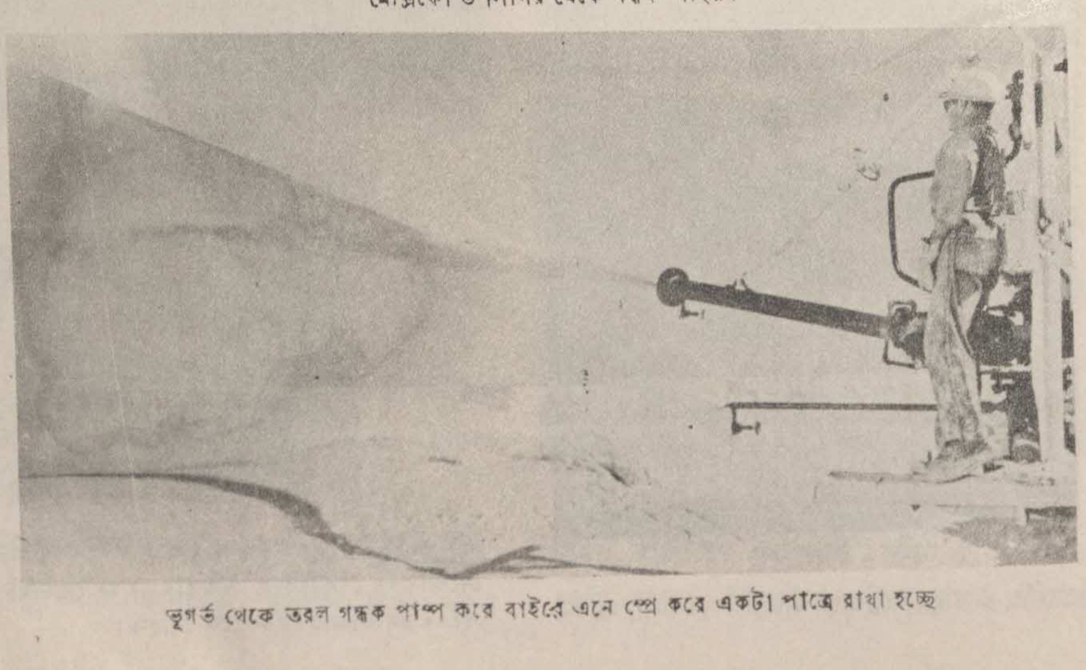
ভারতে বিহারে, কুলু অঞ্চলে ও গাড়োয়ালে ইউরেনিয়াম পাওয়া গেছে।

॥ গন্ধক ॥

গন্ধক (sulphur বা brimstone) সালফিউরিক আসিড, কাগজ, কীটনাশক দ্রব্য, দিয়াশলাই, বারুদ প্রভৃতি তৈরিতে লাগে। সাধারণতঃ আগ্নেয়গিরির নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়। এর রং হলদে। এটি ভঙ্গুর ধাতব পদার্থ। ভারতে গন্ধক উৎপাদন নগণ্য। বেশির ভাগ গন্ধক বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয়।



মেক্সিকো উপসাগর থেকে গন্ধক আহরণ



ভূগর্ভ থেকে তরল গন্ধক পাম্প করে বাইরে এনে স্প্রে করে একটা পাত্রে রাখা হচ্ছে

॥ পারদ ॥

পারদ বা পারা (mercury বা quicksilver) একমাত্র তরল ধাতু। ব্যারোমিটার ও থার্মোমিটার তৈরি করতে পারদ লাগে। mercury-vapour ল্যাম্পে পারদের প্রয়োজন হয়। ঔষধ রং ছাপার কালি, বিস্ফোরক পদার্থ ও অন্যান্য অনেক রাসায়নিক পদার্থ তৈরি করতে পারদ লাগে। স্পেন, চীন, জাপান, মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকায় প্রচুর পারদ পাওয়া যায়।



॥ অ্যাজবেস্টজ ॥

অ্যাজবেস্টজকে কখনও কখনও 'rock cotton' বলা হয়। অ্যাজবেস্টজ (asbestos) দীর্ঘ আঁশযুক্ত একধরনের খনিজ পদার্থ। এ থেকে অগ্নি-নিরোধক ও তাপনিরোধক বস্তু তৈরি করা যায়। সিমেন্ট মিশিয়ে যে বোর্ড তৈরি করা হয় তা দিয়ে ঘরের পার্টিশন, সীলিং, ছাদ ইত্যাদি তৈরি হয়। কানাডা, দক্ষিণ আফ্রিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোয়াজিল্যাণ্ড, রাশিয়া, সাইপ্রাস, ফ্রান্স ও ইটালীর খনি থেকে অ্যাজবেস্টজ পাওয়া যায়।

অ্যাজবেস্টজ অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, কর্ণাটক ও রাজস্থানে পাওয়া যায়। ক্রিসোলাইট অ্যাজবেস্টজ ইচ্ছামতো বাঁকানো নোয়ানো যায়। তা পাওয়া যায় অন্ধ্রপ্রদেশের কুডাপ্পায়, ট্রমলাইট অ্যাজবেস্টজ সহজে বাঁকানো নোয়ানো যায় না।

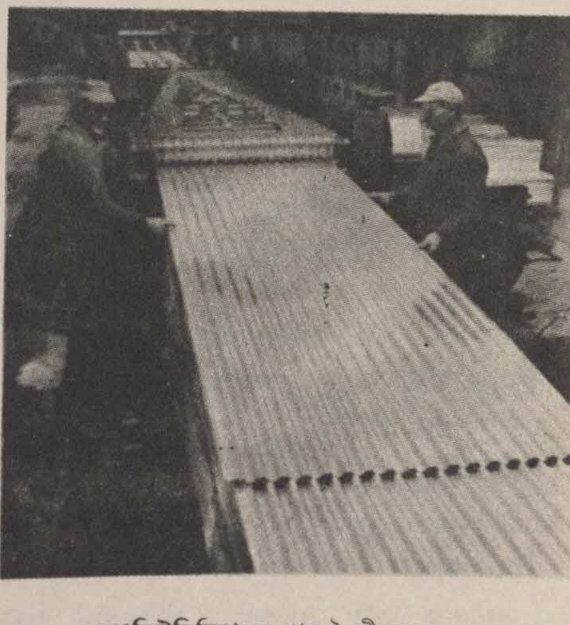


॥ অ্যালিউমিনিয়াম ॥

অ্যালিউমিনিয়াম একপ্রকার নীলাভ শ্বেতবর্ণ, লঘু ও নমনীয় ধাতু। এর গলনাঙ্ক ৬৬০·২° সেন্টিগ্রেড। বক্সাইট থেকে উৎপন্ন হয়। অ্যালিউ-মিনিয়াম ভূত্বকের ৮·১ শতাংশ। বিমান, রেলের কামরা, বাসনকোসন, ঘরের নানা আসবাব প্রভৃতি তৈরিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতের বহু স্থানে বক্সাইটের খনি আছে। সেইজন্যে প্রভূত পরিমাণ অ্যালিউমিনিয়াম উৎপন্ন হয়।



৫ টন ওজনের অ্যালিউমিনিয়ামের পিণ্ড (ngot)



অ্যালিউমিনিয়ামের পাত তৈরী হচ্ছে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালিউমিনিয়াম কোম্পানি

অব আমেরিকা ১৯৭৯ খ্রী. ১৭,১০,৯৩৮ টন অ্যালিউমিনিয়াম উৎপাদন করে। পৃথিবীতে এই উৎপাদনেরপরিমাণ সব চেয়ে বেশী। অ্যালিউমিনিয়াম গলানোর দিক্ দিয়ে কানাডার অ্যালিউমিনিয়াম কোম্পানি অব কানাডা লিঃ পাশ্চাত্ত্যে শ্রেষ্ঠ। বৎসরে ওই কোম্পানি ৪,৩১,০০০ টন অ্যালিউমিনিয়াম গলায়।

॥ হীরা ॥

হীরা বা হীরক (diamond) বিশুদ্ধ অঙ্গারক। প্রচণ্ড চাপে ও তাপে হীরার সৃষ্টি। হীরা সব চেয়ে দামী ও কঠিন পদার্থ। ভারতে প্রথম হীরা পাওয়া যায়। হায়দ্রাবাদের নিকটে গোলকুণ্ডার খনি থেকে 'কোহিনুর'-নামক হীরা পাওয়া যায়। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকার খনি খুব প্রসিদ্ধ। অ্যাঙ্গোলা, সিয়েরা লিওন, কঙ্গো, তানজানিয়া, রাশিয়া প্রভৃতি স্থানে হীরা পাওয়া যায়। কৃত্রিম উপায়ে অতি উচ্চ তাপে ও চাপে হীরা প্রস্তুত করা গেছে। এক্সেলসর (exselsior) ১৭১ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা), গ্রেট মোগল— ২৮০ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান ভারত), জোঙ্কার (jonker) ৭২৬ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা), রিজেন্ট (regent) ৪১০ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান ভারত), অর্লভ (orlov) ৯০০ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান ভারত), কোহিনুর ১০৬$\frac{1}{16}$ ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান ভারত), কুলিনান ৩১০৬



নানা রকমের হীরা

ক্যারাট (প্রাপ্তিস্থান দক্ষিণ আফ্রিকা) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ হীরক।

খনিজ দ্রব্যের সংখ্যা প্রায় ২ হাজার। সে-সবের বিবরণ দিতে গেলে একটা সম্পূর্ণ বইয়ের প্রয়োজন। কাজেই প্রধান প্রধান খনিজ দ্রব্যের কথা জানানো হল।

খনিজ সম্পদ্ বলতে বহু রকমের বিভিন্ন রত্নকেও বোঝায় যেমন, চন্দ্রকান্ত মণি, রুবি, নীলা (জামীরা), পান্না, বৈদূর্যমণি, তামড়ি, পুষ্পরাগমণি (পোখরাজ), পীলু (Jade), প্রবাল প্রভৃতি।



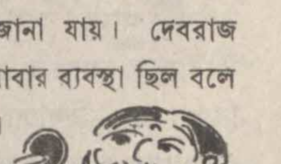
ম্যাজিকের কথা

ম্যাজিক (magic) এই ইংরেজী শব্দটির মানে ইন্দ্রজাল, ভোজবাজি, ভেলকি বা জাদুবিদ্যা। কথাটি গ্রীক শব্দ magike (=কৌশল) থেকে এসেছে। কেউ কেউ বলেন, Magus শব্দের বহুবচন Magi (মেজাই) শব্দ থেকে কথাটার উৎপত্তি।

প্রাচীন মিশর, পারস্য, গ্রীস ও রোমের পুরোহিতেরা ও চিকিৎসকেরা নানা ধরনের জাদুবিদ্যা দেখাতেন। পারস্যের একশ্রেণীর পুরোহিতকে বলা হত Magus, বহুবচনে মেজাই (Magi)। তাঁরা যে-সব জাদুবিদ্যার কৌশল দেখাতেন সেগুলি তাঁরা দেবদেবীর কাছ থেকে শিখেছেন, বলা হত। যেভাবেই হোক, সেই জাদুবিদ্যা বর্তমানকালের মতো নানা কৌশলপূর্ণ ছিল না। তাঁরা ভবিষ্যদ্বাণী করার মাধ্যমে জনসাধারণের চিত্তজয় করতেন। মেজাই-ই যীশুখ্রীষ্টের জন্মের কথা আগে থেকে বলেন।

॥ ভারতে জাদুবিদ্যাঃ ইন্দ্রজাল ॥

কবে কোন্ দেশে ম্যাজিক বা জাদুবিদ্যার প্রথম প্রচলন হয়, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে ভারতে যে জাদুবিদ্যার প্রচলন বহুকাল আগে থেকে ছিল তা সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায়। দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় এই বিদ্যা দেখাবার ব্যবস্থা ছিল বলে এর আর এক নাম ইন্দ্রজাল।



॥ ভোজবাজি ॥

ভোজরাজ রাজকার্যের অবসরে জাদুবিদ্যা দেখাতেন। একজন ভিক্ষুক সন্ন্যাসী তাঁকে এই বিদ্যা শিখিয়েছিল। সেকালে তাঁর জাদুবিদ্যা দেখবার জন্যে রাজপ্রাসাদের সম্মুখের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ প্রজাদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে যেত। কখনও কখনও



রাজপ্রাসাদের সামনের প্রাঙ্গণে ভোজরাজ বহু লোকের সামনে জাদুবিদ্যা দেখাচ্ছেন।

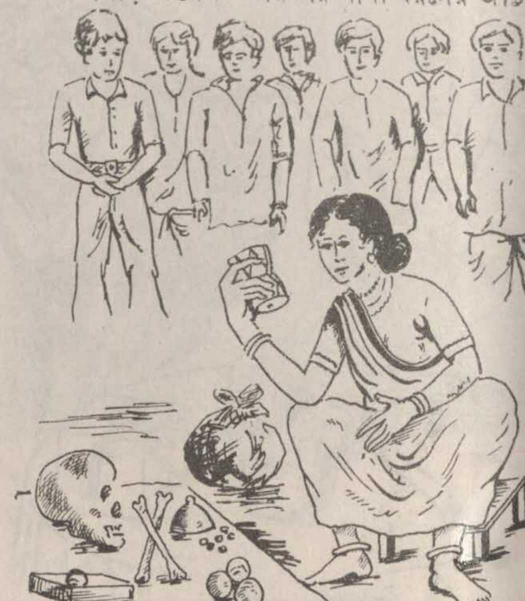
ভিন্ন রাজ্যের অধিবাসীরাও এসে ভিড় জমাত। সেই থেকে তাঁর জাদুবিদ্যা ভোজবাজি নামে প্রসিদ্ধ।



॥ **ভানুমতীর খেলা** ॥

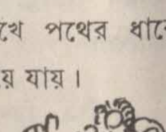
বিক্রমাদিত্যের কন্যা ভানুমতী ছিলেন ভোজরাজের পত্নী। তিনি জাদুবিদ্যার কৌশল ভালোভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। প্রথমদিকে রাজপ্রাসাদের ছাদে বা অঙ্গনে সমবেত লোকদের বিশেষ করে মহিলাদের এই বিদ্যা দেখাতেন। পরে রাজপথের ধারেও জাদুবিদ্যার কৌশল দেখিয়ে জনসাধারণকে বিমোহিত করতেন। তাঁর নাম থেকেই জাদুবিদ্যার আর এক নাম ভানুমতীর খেলা বা খেল।

আজকাল পথে ঘাটে অনেকে, বিশেষ করে পশ্চিমা মেয়েরা ডুগডুগি বাজিয়ে জাদুবিদ্যা দেখায়। বেদে-বেদেনীরাও দেখায়। তাদের জাদুবিদ্যাকে ভানুমতীর খেলা বা খেল বলা হয়। তারা মড়ার খুলি, মানুষের হাড় সামনে রেখে ডুগডুগি বাজিয়ে দর্শক যোগাড় করে। তার পর নানা ধরনের জাদুর



পথের ধারে ভানুমতীর খেলা

কৌশল দেখায়। এই ভানুমতীর খেলা দেখে সাধারণ লোক অবাক্ হয়। স্টেজ বাঁধা নেই, তাঁবু খাটানো নেই, বিশেষ কিছু সাজসরঞ্জাম নেই। তারা তাদের সামান্য উপকরণ দিয়ে যে-সব জাদুবিদ্যার কৌশল দেখায়, তা দেখে পথের ধারে সমবেত লোকজনেরা বিমোহিত হয়ে যায়।



॥ **কামাখ্যার জাদুবিদ্যা** ॥

আসামের কামাখ্যাকে জাদুবিদ্যার জন্যে প্রসিদ্ধ বলা হয়। এখানকার জাদুকরেরা নাকি তাদের দৈবশক্তিলব্ধ জাদুবিদ্যার বলে মানুষকে ভেড়া বানাতে পারত। অবশ্য, এর কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

॥ **রাজসভায় জাদুকর** ॥

আগেকার দিনে দেশবিদেশের রাজসভায়

অনেক জাদুকর থাকত বা বহু জাদুকরকে জাদুবিদ্যা দেখানোর জন্যে আহ্বান জানানো হত। জাদুকরেরা হাজার হাজার দর্শককে তাদের জাদুর কৌশল দেখিয়ে বিমোহিত করত।

জাদুকরেরা গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, দেশ থেকে দেশান্তরে ম্যাজিক দেখিয়ে বেড়াত। যাদের সঙ্গে সামান্য উপকরণ থাকত, তারা হেঁটেই যেত। যাদের থাকত বহু উপকরণ, সাজসরঞ্জাম তারা গাড়িতে করে যাতায়াত করত।

॥ বর্তমান কালের জাদুবিদ্যার জনক ॥

ফরাসী জাদুকর রবার্ট হুডিনকে বলা হয় বর্তমান কালের জাদুবিদ্যার জনক। তিনি শুধু হাতের কৌশল দেখাতেন না, নানা ধরনের যন্ত্রপাতির সাহায্যে উন্নত ধরনের জাদুবিদ্যা দেখাতেন।



॥ গণপতি সরকার ॥

গণপতি সরকার ছিলেন একজন বিখ্যাত জাদুকর। তাঁর বহুবিধ জাদুবিদ্যার কৌশলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাওয়া সুপ্রসিদ্ধ। তিনি এমন সব কৌশল দেখাতেন, যে-সব তাঁর আগেকার জাদুকররা দেখান নি।



॥ হুডিনি ॥

হ্যারি হুডিনি (Harry Houdini, ১৮৭৪-১৯২৬ খ্রী.) ছিলেন সেকালের সবচেয়ে নাম-করা জাদুকর। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল Erich Weiss। তিনি হাঙ্গেরীর লোক ছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, লণ্ডন প্রভৃতি স্থানে তাঁর জাদুবিদ্যার কৌশল দেখিয়ে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর



হাতকড়াবদ্ধ হুডিনি নিজেকে মুক্ত করছেন।

অন্যান্য জাদুর কৌশলের মধ্যে হাতকড়াবদ্ধ অবস্থায় বন্ধনমুক্ত হওয়া ছিল সবচেয়ে বড় আকর্ষণ।

কার্ডিনি (Cardini) বলে একজন জাদুকর নানা ধরনের জাদুবিদ্যা দেখিয়ে খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।



॥ জাদুসম্রাট পি. সি. সরকার ॥

পি. সি. সরকার অর্থাৎ প্রতুলচন্দ্র সরকার (১৯১৩-১৯৭১ খ্রী.) ছিলেন বর্তমান কালের একজন অতি বিখ্যাত জাদুকর। তিনি স্বদেশে জাদুবিদ্যা দেখিয়ে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেন। ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইরান, জাপান, জার্মানি, আফ্রিকার নানা দেশ প্রভৃতি স্থানে বার বার দলবল সহ গিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

ময়মনসিংহের টাঙ্গাইলে তাঁর জন্ম হয়। তিনি নিউইয়র্ক শহর থেকে জাত্বিদ্যার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'sphinx' পান। জাপান, জার্মানি থেকেও তিনি অনেক পুরস্কার লাভ করেন। তিনি প্যারিসের



পি. সি. সরকার চোখ-বাঁধা অবস্থায় প্যারিসের রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছেন।

জনাকীর্ণ রাস্তায় চোখবাঁধা অবস্থায় সাইকেল চালনা করেন। তাঁর পুত্র জুনিয়ার পি. সি. সরকার পিতার মতোই, কোন কোন ক্ষেত্রে পিতার চেয়েও খ্যাতিমান্ জাত্বকর।

॥ ভারতের বহু জাদুকর ॥



ভারতে বহু প্রখ্যাত জাত্বকর তাঁদের জাত্বিদ্যা দেখিয়ে হাজার হাজার দর্শককে বিমোহিত করে থাকেন। জাত্বকর এ. সি. সরকার, যোগী জাত্বকর মৃণাল রায়, কে. লাল প্রভৃতি বহু জাত্বকর প্রভূত খ্যাতিলাভ করেছেন।

আজকাল বহু মহিলা জাত্বকরও বেশ নাম করেছেন।

॥ নানা রকমের জাদুবিদ্যার কৌশল ॥

হরেক রকম তাসের খেলা, শূন্য থেকে আম পাড়ার জালতির মতো জালতি দিয়ে অদৃশ্য পায়রা ধরা, টুপি-চাপা দেওয়া ডিম, পায়রা প্রভৃতি অদৃশ্য করে দেওয়া, স্টেজ থেকে আরোহীসমেত মোটর-গাড়িকে উধাও করা, একটা ছোট পাত্র থেকে বালতি বালতি জল বার করা, বীজ পোতার সঙ্গে সঙ্গে গাছ গজিয়ে তোলা বা গাছকে বড় করে তোলা, লোকের মাথায় জ্বলন্ত উন্নুন চাপিয়ে তাতে রান্না করা, চোখবাঁধা অবস্থায় ব্লাকবোর্ডের লেখা পড়তে পারা বা তিন চার লাইন অঙ্কের সমষ্টি



জাত্বকর একটা লম্বা মোটা নলের মতো পাত্র থেকে কয়েকটা টাইমপীস বার করেছেন।

করা, একটা সরু পাত্রের মধ্য থেকে কয়েকটা টাইমপীস বার করা, কারো শরীরে তরবারি প্রবেশ

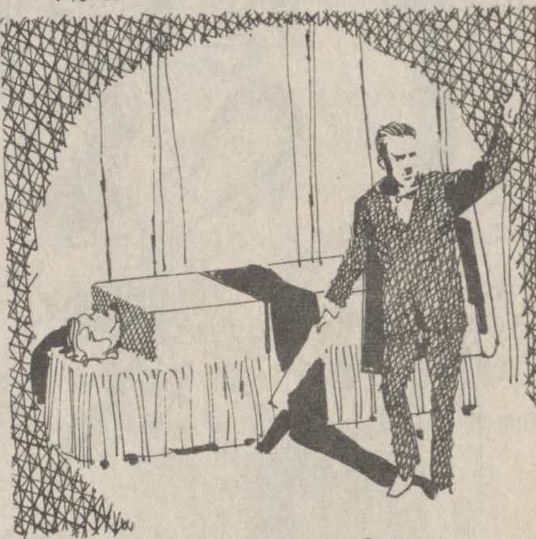


জাদুকর কারো শরীরে তরবারি প্রবেশ করানোর ম্যাজিক দেখাচ্ছেন।

করিয়ে দেওয়া, পাত্রের এক ধরনের ফলকে অন্য ধরনের ফলে পরিণত করা—এমনই কত রকমের জাদুবিদ্যা বর্তমানে দেখানো হয়, তা বলে শেষ করা যায় না।

॥ মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করা ॥

সবচেয়ে লোমহর্ষক জাদুবিদ্যা একটা জীবন্ত



জাদুকর শায়িত মানুষকে দ্বিখণ্ডিত করার ম্যাজিক দেখাচ্ছেন।

মানুষকে একটা বাক্সের মধ্যে পুরে তাকে লম্বা করে শুইয়ে তাকে করাতের সাহায্যে দ্বিখণ্ডিত করা।

এই সব জাদুবিদ্যায় দেখানো ব্যাপারগুলো যে সত্য সত্যই ঘটে না, তা জেনেও লোকে জাদুবিদ্যার আসরে দর্শকের আসনে আসীন হয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ মঞ্চে জাদুকর কী কৌশলে অত সব কাণ্ড ঘটাচ্ছে, তা বুঝতে পারে না।

জাদুবিদ্যা অতি নির্দোষ আমোদজনক ব্যাপার। সব দেশেই জাদুবিদ্যার উত্তরোত্তর প্রসার লাভ ঘটছে। তবে ভারতে এর দ্রুত উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে।



নৃত্যকলা

নৃত্যকলার অর্থ নানারকম অঙ্গভঙ্গী করে নাচা। এই নাচা নিজের মনে আনন্দ হলেও হয়, লোককে আনন্দ দেবার জন্যে জনসমক্ষেও হয়। কবে যে পৃথিবীতে লোকে নাচতে শুরু করে, তা জানা যায় না। কিন্তু আদিম যুগে গুহামানবেরাও যে নাচত, তা গুহার দেওয়ালের চিত্র দেখে জানতে পারা যায়। তবে সেই নাচ বর্তমান যুগের মতো নানারকম সুদৃশ্য ও সুশৃঙ্খল অঙ্গভঙ্গীসহকারে হত না।

॥ মন্দিরে মন্দিরে নৃত্য ॥

দেবতাকে খুশী করবার জন্যে লোকে, বিশেষ করে মেয়েরা মন্দিরে মন্দিরে নৃত্য করে এসেছে, এখনও করে। সেই সব নৃত্য কখনও ধুনুচি হাতে করে, কখনও প্রদীপ নিয়ে, কখনও পূজার পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে হয়ে থাকে। গ্রীস, মিশর (ঈজিপ্ট), ভারত, বলিদ্বীপ, শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), কাম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া) প্রভৃতি দেশের নানা উপাসনালয়ে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। নৃত্য দ্বারা নর্তক বা নর্তকী নিজে খুশী হয়, অপরকে খুশী করে।

॥ নূপুরের তালে তালে নৃত্য ॥

আগে নৃত্য ছিল মানুষের কেবল আনন্দের প্রকাশ। তারা নাচত আপনমনে অনাড়ম্বরভাবে। আজকাল লোকে নানা রকম মুখোশ, সাজসজ্জা নিয়ে নাচে। সেই নাচের সঙ্গে থাকে বাজনা, তাল, মান। সে-নাচে সে খুব বেশী সুর করে গান গায় না, কিন্তু অপরে গান গায়। সেই গানের ভাষাকে নর্তক বা নর্তকী নাচের মধ্য দিয়ে রূপ দেয়। তাদের পায়ে বাঁধা থাকে নূপুর। নাচের সঙ্গে সেই নূপুর তালে তালে বাজতে থাকে। কখনও হাতে থাকে খঞ্জনী বা করতাল।

॥ নানা কৌশলের নৃত্য ॥

যত দিন যাচ্ছে, ততই বিভিন্ন দেশের লোক

বিভিন্ন রকমের নাচের কৌশল প্রদর্শন করছে। সেই সব নাচের নানা দেশে নানা নাম। সভ্য শিক্ষিত মানুষেরা থিয়েটারে, জনসভায়, হোটেলে নানা কৌশলে নানা সাজসজ্জাসমন্বিত হয়ে নাচে।



॥ ভারতে নৃত্যের প্রচলন ॥

সুমের দেশে, গ্রীসে, পেরুতে, মেক্সিকোয়, ভারতে বহু প্রাচীন কাল থেকেই নৃত্য শুরু হয়েছে। ভারতে তো চৌষট্টিকলার মধ্যে নৃত্য একটি উঁচু ধরনের কলা। নানা গ্রন্থে ভারতীয় নৃত্যের কথা লেখা আছে। নানা মন্দিরগাত্রে খোদিত বহু নৃত্য-মূর্তি দেখা যায়। ভারতে কয়েক হাজার বছর আগেও নৃত্যের প্রচলন ছিল।

॥ নানা দেশের নৃত্য ॥

মিশরে ৪ হাজার বছর আগেও নৃত্যের প্রচলন ছিল। সেখানে প্রধানতঃ ভোজসভায় নাচের ব্যবস্থা ছিল।

গ্রীসে বহু প্রাচীন কালে নৃত্য প্রচলিত ছিল। সক্রেটিস, প্লেটো প্রভৃতি মনীষীরা নৃত্যকে উঁচু দরের শিল্প বলে গেছেন।

রোমান বাগ্মী সিসেরো (Marcus Tullius Cicero, ১০৬-৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁর বক্তৃতায় ও লেখায় নৃত্যের গুণগান করে গেছেন।

স্পেনের নৃত্যকলাও বহু কাল পূর্বের। অবশ্য, স্পেনের নৃত্যশিল্পে আরবীয় ধারার সন্ধান মেলে।

প্রাচীনকালেও ফ্রান্সে নৃত্যশিল্পের বহুল প্রচলন ছিল। পরে দ্বিতীয় হেনরীর পত্নী ক্যাথারিন ডি মেডিসি (Catherine de' Medici, ১৫১৯-৮৯ খ্রী.) ফ্রান্সে সামাজিক নৃত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেন ও প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

॥ মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পায় নৃত্য ॥

সিন্ধু উপত্যকায় মোহেন-জো-দরোতে ও পাঞ্জাবে হরপ্পায় যে-সব ভগ্নাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, সে সবের মধ্যে বহু নর্তকীর ভাঙ্গা মূর্তি পাওয়া গেছে। মন্দিরে দেবতাকে সন্তুষ্ট করবার জন্যে যে নারীরা নৃত্য করত, যারা নৃত্যে সারা জীবন উৎসর্গ করত, যাদের বলা হত দেবদাসী তাদের কথা তাই থেকে জানা যায়। ভগ্নাবশেষের মধ্যে নর্তকীদের সঙ্গে নানারকমের বাদ্যযন্ত্রও পাওয়া গেছে।

॥ দেবদাসী প্রথা ॥

কেউ কেউ বলেন, দেবদাসী প্রথার প্রচলন হয় মিশরে, কেউ কেউ বলেন, ভারতেই প্রথম দেবদাসী



ব্যাঙ্ককের দেবদাসীদের নৃত্য

প্রথা শুরু হয়। এখান থেকেই বলিদ্বীপ, মিশর, গ্রীস, রোম, শ্যামদেশ প্রভৃতি স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

॥ ইন্দোনেশিয়ায় ভারতীয় প্রথায় নৃত্য ॥

ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্গত বলিদ্বীপের অধিবাসীদের অধিকাংশ আজও হিন্দু। তারা রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীকে রূপ দেবার সময় নৃত্যের অবতারণা করে থাকে। আগেও করত। ইন্দোনেশিয়া বর্তমানে ইসলামধর্মাবলম্বীদের দেশ হলেও সেখানে আজও লোকে রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য ভারতীয় পুরাণের কাহিনীর অভিনয় করে গীতবাদ্যের

সঙ্গে নৃত্য করে। শ্যামদেশে (থাইল্যাণ্ডে), ব্রহ্ম-দেশে, কাম্বোডিয়ায় (কাম্পুচিয়ায়) নানাভাবে ভারতীয় প্রথায় নৃত্যের অবতারণা হয়ে থাকে।

॥ আদিম অধিবাসীদের নৃত্য ॥

শুধু মন্দিরে মন্দিরে নৃত্যপ্রথা প্রচলিত ছিল না। শব-শোভাযাত্রায়, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সময়, পশু



আদিবাসীদের নৃত্যের মুখোশ

শিকারে যাবার সময়, যুদ্ধযাত্রার প্রাক্কালে, যুদ্ধে জয়লাভ হলে, যুদ্ধক্ষেত্রে, নিবিড় অরণ্যে, আনন্দোৎ-



কেনিয়ার আদিবাসীদের নৃত্য

সবের সময় বহু দেশের আদিম অধিবাসীরা নৃত্য করে এসেছে এবং কোথাও কোথাও আজও করে থাকে।

॥ বিজয়নৃত্য ॥

প্রাগৈতিহাসিক কালে প্রস্তরযুগেরও আগে ফিলিপিন্‌জ্‌ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর-পশ্চিম লুজনের ইগরট (Igorot) জাতির মধ্যে একধরনের 'বিজয়নৃত্য' প্রচলিত ছিল।

সে নৃত্য ছিল রীতিমতো উদ্দাম ও প্রচণ্ড। তারা সামনে হিংস্র জীবজন্তুদের দেখে এই ধরনের নৃত্য শুরু করত। তাদের ধারণা ছিল, ওই রকম তাণ্ডব নৃত্য দেখে বনের পশুরা বশীভূত হয়ে পড়বে। তারা ভিন্ন দলের শত্রু প্রকৃতির মানুষদের সামনে ওই



আমেরিকান ইণ্ডিয়ানদের যুদ্ধনৃত্য

ধরনের দুর্ধর্ষ নৃত্য শুরু করত। সেই নৃত্যের প্রচণ্ডতা লক্ষ্য করে শত্রুরা অনেক সময়েই ভীত হয়ে পশ্চাদ-পসরণ করত। যুদ্ধে জয়লাভ করেও তারা ওই ধরনের উদ্দাম নৃত্য করত। বর্তমানে অবশ্য ফিলি-পিন্‌জের কোথাও সেই ধরনের অতি বিশৃঙ্খল নৃত্য দেখা যায় না।

॥ মহর্ষি ভরত ॥

আমাদের দেশে প্রাচীন কালে ভরত নামে এক মহর্ষি ছিলেন। তিনি নৃত্য সম্বন্ধে একটি বই লিখে গেছেন। তাতে তিনি মহাদেবকে বলেছেন, স্বয়ং নটরাজ। মহাদেবই নৃত্যের তালে তালে ত্রিভুবনকে মোহিত করেন। মহর্ষি ভরত নৃত্যকলা সম্বন্ধে বহু কথা তাঁর বইতে লিখে গেছেন।

॥ দক্ষিণ ভারতের নৃত্য ॥



শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করে কালিয়নাগকে দমন করেন,

শত শত গোপিনীর মনে আনন্দ দেবার জন্যে রাসনৃত্যে মেতে ওঠেন। শ্রীকৃষ্ণের সেই সব নৃত্যের ধারা আজও ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে চালু আছে।

॥ উচ্চাঙ্গ নৃত্য ॥

ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্যের চারটি প্রধান ধারা—ভরতনাট্যম্, কথাকলি, মণিপুরী ও কথক। এই সব নৃত্য নারীপুরুষ উভয়েই করে থাকে। নারীর নৃত্যের ভঙ্গীকে বলে লাস্য এবং পুরুষের নৃত্য-ভঙ্গীকে বলা হয় তাণ্ডব। অবশ্য উচ্চাঙ্গ নৃত্যে লাস্য বর্তমান থাকলেও তাণ্ডবেরই প্রাধান্য বেশী।

॥ ভরতনাট্যম্ ॥



ভরতনাট্যম্ নৃত্যরতা শান্তা রাও

ভাব, রস ও তালের আদ্যক্ষর (ভ=ভাব, র=রস, ত=তাল) নিয়ে ভরতনাট্যম্ কথাটির সৃষ্টি। নৃত্যকলা ও অভিনয়কলার সংমিশ্রণ ভরতনাট্যম্। এই নৃত্যের মাধ্যমে ভগবদারাধনা করা হয়। শুধু মনোহর নৃত্য নয়, মধুর সংগীত ভরতনাট্যমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নানাপ্রকারে ঘাড় ও কাঁধ কাঁপিয়ে, হাত নেড়ে, চোখের ইশারা করে ভরতনাট্যম্ নৃত্য প্রদর্শিত হয়। দক্ষিণ ভারতের তাঞ্জোর জেলায় এর উৎপত্তি এবং প্রধানতঃ দক্ষিণ ভারতেরই নৃত্য হলেও ভারতের নানা রাজ্যে ভরত-নাট্যম্ নৃত্য ছড়িয়ে পড়েছে।

॥ কথাকলি নৃত্য ॥

দক্ষিণ ভারতের কেরলে কথাকলি নৃত্য খুব বেশী চলে। প্রাক্তন ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য এর উৎপত্তিস্থল। রূপসজ্জা এই নৃত্যের প্রধান অঙ্গ। নানারকমের মুখোশ পরে, নানা ধরনের রঙ্ দ্বারা সজ্জিত হয়ে ও অলংকার পরে এই নাচ দেখানো হয়। এতে ৬৪টি মুদ্রা এবং মাথার ৯টি, চোখের ৮টি, ভ্রূর ৬টি ও গলার ৪টি ভঙ্গী প্রদর্শিত হয়। প্রধানতঃ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কথাকলি নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। এই নৃত্যে বীররসেরই প্রাধান্য। আবহসংগীত এই নৃত্যের অপরিহার্য অঙ্গ। কথাকলি নৃত্য যখন চলে তখন দুজন গায়ক মধুর স্বরে গান গায়, তিন চারজন বাদক নানা যন্ত্র বাজায়। নৃত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অভিনয় করাও হয়।

॥ মণিপুরী নৃত্য ॥



মণিপুর ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য। এই রাজ্যে মণিপুরী নৃত্যের উদ্ভব। প্রধানতঃ মণিপুরের নৃত্য হলেও আসাম, মেঘালয়, অরুণাচল, পশ্চিমবঙ্গ



কথাকলি নৃত্যের শিল্পীর বিচিত্র রূপসজ্জা

প্রভৃতি স্থানে এর প্রচলন কম নয়। শিব ও পার্বতীর মিলন নিয়ে মণিপুরী নৃত্য রচিত। সাধারণতঃ সাতদিন ধরে মণিপুরী নৃত্য চলে। নৃত্যের সঙ্গে সংগীত ও বাদ্য চলে, আর চলে অভিনয়। মন্দিরা ও খোল বাদ্যসহযোগে এই নৃত্য হয়।

॥ কত্থক নৃত্য ॥

কত্থক নৃত্যে মুখচোখের ভাব প্রকাশ ও অঙ্গ-ভঙ্গী অপরিহার্য। পায়ে ঘুঙুর বেঁধে তবলার বোলের সঙ্গে তাল রেখে উদ্দাম ভঙ্গীতে নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। কত্থক নৃত্যে অত্যধিক দৈহিক পরিশ্রম হয়। কত্থক নৃত্যেও রূপসজ্জার বিশেষ প্রয়োজন। নারীপুরুষ উভয়েই কত্থক নৃত্য করে থাকে। উত্তর ভারতে এই নৃত্যের উৎপত্তি। পশ্চিমবঙ্গে এর বহুল প্রচলন লক্ষ্য করা যায়।

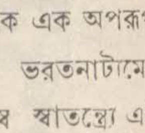
॥ ওড়িশি নৃত্য ॥

ওড়িশি নৃত্যের সঙ্গে কর্ণাটক সংগীত যুক্ত হয়ে এক বিচিত্র পরিবেশের সৃষ্টি করে। এই নৃত্যের সময়ে নর্তকের কোমর, পিঠ ও ঘাড় সোজা থাকে। উপযুক্ত বাদ্যসহযোগে এই নৃত্য মনোহর হয়ে ওঠে।

॥ কুচিপুড়ি ॥

কুচিপুড়ি ভরতনাট্যমেরই রূপান্তর। অন্ধ্র-প্রদেশেই এর প্রচলন বেশী। এই উচ্চাঙ্গ নৃত্যের সঙ্গে কর্ণাটক সংগীত যুক্ত হয়ে নৃত্যকে এক অপরূপ মাধুর্যে মণ্ডিত করে তোলে। ভরতনাট্যমের রূপান্তর হলেও অনেকাংশে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যে এই নৃত্য মনোহর।

তাল মান লয়ের সঙ্গে এই নৃত্য এক অপূর্ব পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকে।



॥ সাঁওতালী নৃত্য ॥

ভারতের আদিবাসী সাঁওতালরা অন্যান্য আদি-বাসীর তুলনায় অনেক দিক্ দিয়ে উন্নত প্রকৃতির। এদের সাহিত্য অপূর্ব সুষমামণ্ডিত। নৃত্যও দর্শক-দের প্রভূত আনন্দ দান করে। পূর্ণিমা রাত্রে আরণ্য পরিবেশে মাদল-সহযোগে সাঁওতালী মেয়েদের নৃত্য রীতিমতো উপভোগ্য। প্রতিটি মেয়েই মাথায় ফুল গুঁজে নৃত্য করে। পুরুষদের বাদনভঙ্গীও অপূর্ব। প্রধানতঃ ছোটনাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে সাঁওতাল নারীপুরুষের নৃত্য তাদের যতটা আনন্দ দেয়, ততটা আনন্দ দেয় সমবেত দর্শকদের।



চীনের প্রাচীর

[পূর্বপৃষ্ঠায় প্রদত্ত ছবি]

চীনের প্রাচীর (**The Great Wall of China**) পৃথিবীর অন্যতম অত্যাশ্চর্য। ২০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে চীন শি হুয়াং (**Chin Shih Huang**) উত্তরের দুর্ধর্ষ হূনেদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্যে এই প্রাচীর নির্মাণ করতে শুরু করেন। এটির দৈর্ঘ্য ২,৪১৪ কিলোমিটার (১,৫০০ মাইল)। এই প্রাচীর নির্মাণ করতে দুর্গম অরণ্য, পর্বত প্রভৃতি অতিক্রম করতে হয়েছে।

প্রাচীরের মাঝে মাঝে উঁচু টাওয়ার আছে। টাওয়ারের উচ্চতা ৯ মিটার (৩০ ফুট), প্রস্থে ৬ মিটার (২০ ফুট । সেখান থেকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করার ব্যবস্থা হয়। প্রাচীরের উপরে ৪'৫ থেকে ৭'৬ মিটার (১৫-২৫ ফুট) চওড়া রাস্তা আছে। প্রাচীর নানা জায়গায় ৬ থেকে ১৫ মিটার (২০-৫০ ফুট) পর্যন্ত উঁচু।

নানা শাখা ও ঘুরপথ ধরলে চীনের প্রাচীরের দৈর্ঘ্য ৮,২১৯ কিলোমিটার (২,০০০ মাইল)।

॥ রায়বেঁশে নৃত্য ॥

রায়বেঁশে একপ্রকার পল্লী নৃত্য। রায়বাঁশ নামে এক ধরনের বাঁশের লাঠি নিয়ে পল্লীর যোদ্ধারা যুদ্ধ করত। সেই ধরনের লম্বা লাঠি এক হাতে নিয়ে, অন্য হাতে ঢাল নিয়ে পথিকরা নাচত। খালি গায়ে, খালি পায়ে মালকোঁচা বেঁধে তারা নৃত্য করত। এখন আর রায়বেঁশে লাঠি নিয়ে পথিকরা কোথাও নাচে না। ব্রতচারী আন্দোলনের প্রবর্তক গুরুসদয় দত্ত রায়বেঁশে লোকনৃত্যের পুনঃপ্রবর্তন করেন। যারা নাচে তাদের নাচে যুদ্ধের ভঙ্গী নেই। তবে হাঁকডাক আছে। প্রধানতঃ তারা গুরুসদয় দত্ত-রচিত ছড়া-কবিতা আবৃত্তি করে নেচে থাকে।

॥ থালি নৃত্য ॥

নাগা মেয়েরা ও অন্যান্য আদিবাসীরা থালি নিয়ে যে নৃত্য করে তা দেখতে খুবই সুন্দর। সাঁওতালী মেয়েরাও এই নৃত্যে খুব পটু।



নাগা মেয়েদের থালি নিয়ে নৃত্য

॥ কাঠি-নৃত্য ॥

যাকে বলা হচ্ছে কাঠি-নৃত্য, তা বাংলার প্রাচীন লাঠি-নৃত্য থেকে উদ্ভূত। পূর্বে রাজা, জমিদার প্রভৃতির লাঠিয়ালরা অন্য রাজা বা জমিদারের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপারে লাঠি হাতে করে ছুটে যেত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সেই সব লাঠিয়ালদের বিক্রম লোপ পেতে থাকে। তারা যে লাঠি খেলা দেখাত, লাঠি নিয়ে লড়াই করতে যাওয়া বন্ধ হয়ে গেলে সেই লাঠি খেলা পল্লী অঞ্চলে থেকে যায়। পরে বড় বড় লাঠি নিয়ে সেই খেলার স্থানে ছোট ছোট লাঠি বা কাঠি নিয়ে নাচের প্রচলন হয়। বর্তমানে স্কুলের ছেলেমেয়েরা কাঠি নৃত্য করে থাকে। নানা আদিবাসীদের মধ্যে লাঠি নিয়ে নৃত্য আজও প্রচলিত, কাঠি নিয়েও তারা নৃত্য করে থাকে।



॥ ছৌ-নাচ ॥

সাধারণতঃ রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে ছৌ-নাচ বা ছো-নাচ দেখানো হয়। এতে বীররসের প্রাধান্য। পুরুষেরা নানা ধরনের মুখোশ পরে ও বিভিন্ন সাজসজ্জায় সজ্জিত হয়ে ছৌ-নৃত্য দেখিয়ে থাকে। চৈত্রসংক্রান্তিতে শিবের গাজনের সময় পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় ছৌ-নৃত্য

হতে দেখা যায়। বর্তমানে ছৌ-নৃত্য প্রধানতঃ পুরুলিয়ায় অনুষ্ঠিত হয়।

॥ ঢালী নৃত্য ॥

আগেকার দিনে রাজা ও জমিদারের পাইকরা ঢাল নিয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে লড়াই করতে যেত। তারা বৎসরে ২/১ বার ঢাল নিয়ে নৃত্যের অনুষ্ঠান করত। তাকে বলা হত ঢালী নৃত্য। এখন রাজাও নেই, জমিদারও নেই। তাদের পাইকরাও নেই। কিন্তু পল্লী অঞ্চলে ঢালী নৃত্যের প্রচলন এখনও আছে। এই নৃত্যে বীররসের প্রাধান্য। তবে যারা নাচ দেখায় তারা ঢাল নিয়ে নাচে না, ঢালের বদলে চাঁচাড়ির চেঙারি নিয়ে নাচ দেখায়। সেই চেঙারি যেন তাদের ঢাল।

॥ জারী নৃত্য ॥

প্রধানতঃ পল্লী অঞ্চলের মুসলমানদের মধ্যে এই নাচ প্রচলিত। জারী গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নাচ দেখানো হয়ে থাকে। কোথাও দলবদ্ধ ভাবে, কোথাও একা একা এই নাচের অনুষ্ঠান হয়। আগেকার দিনে এ নাচ ছিল বীররসপ্রধান। বর্তমানে এ নাচে করুণ রসের প্রাধান্য। প্রধানতঃ কারবালা যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে এই নৃত্যের উদ্ভব।

॥ নাটুয়া নৃত্য ॥

পুরুলিয়ায় বিবাহাদি সামাজিক উৎসবে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ধামসা-নামক এক ধরনের চামড়ার বাদ্যযন্ত্রের বাদনসহযোগে এই নৃত্য হয়ে থাকে। এর প্রধান বিষয়বস্তু যুদ্ধ। যুদ্ধের নানা কৌশল, ব্যূহরচনার অনুকরণে নাটুয়া নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। এতে অনেক লোক একসঙ্গে নৃত্যে যোগ দিয়ে থাকে। তাদের হাতে থাকে খেলনা তরোয়াল বা ছোরা। তাদের অঙ্গে থাকে যাত্রার যোদ্ধার মতো সাজ। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় এর তেমন প্রচলন নেই।

॥ লোকনৃত্য ॥

পৃথিবীর সকল দেশেই লোকনৃত্য (folk dance) প্রচলিত। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম লোকনৃত্যের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। বাংলায় লোকনৃত্য আগে ছিল বীররসপ্রধান। বর্তমানে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে লোকনৃত্য লাস্যপ্রধান হয়ে উঠেছে। ভারতের সর্বত্র লোকনৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বেশী হয়। লোকনৃত্যের সঙ্গে লোকসংগীত গাওয়া হয়।

॥ বেদুইনদের নাচ ॥

মরুভূমির বেদুইনদের উদ্দাম নৃত্য খুবই উপভোগ্য। মরুভূমি থেকে বালির ঝড় ও উত্তাপ থেকে শরীরকে রক্ষা করবার জন্যে বেদুইনরা সারা শরীর ঢেকে রাখে। সেই রকম পোশাকে আপাদমস্তক-পরিবৃত হয়ে তারা বালির উপরেই নাচ শুরু করে দেয়।



॥ বর্মী নাচ ॥

বর্মা বা ব্রহ্মদেশ ভারতের পাশেই অবস্থিত। অনেক সাংস্কৃতিক ব্যাপারে বর্মীরা ভারতের অনুকরণ করে থাকে। তারা যেভাবে অঙ্গভঙ্গী করে নাচে তা অনেকটা ভারতীয় নৃত্যের মতোই। বর্মার ওজি (ozi) নৃত্য ও পোয়ে নৃত্য শুধু বর্মার নয়, বর্মার বাইরে নানা দেশের লোকেদের খুব প্রিয়।

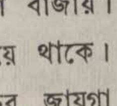
॥ জাপানী নৃত্য ॥

জাপানের নর্তকীদের নাচ খুব মনোরম। তারা যখন বহুবর্ণ পোশাক পরে নাচে তখন তা দেখে দর্শকেরা খুব আনন্দ পায়। জাপানের নর্তকীদের বলে গেইশা (geisha)। বাড়িতে অতিথি এলে গেইশারা নৃত্য করে তাকে আনন্দ দেয়। সেই



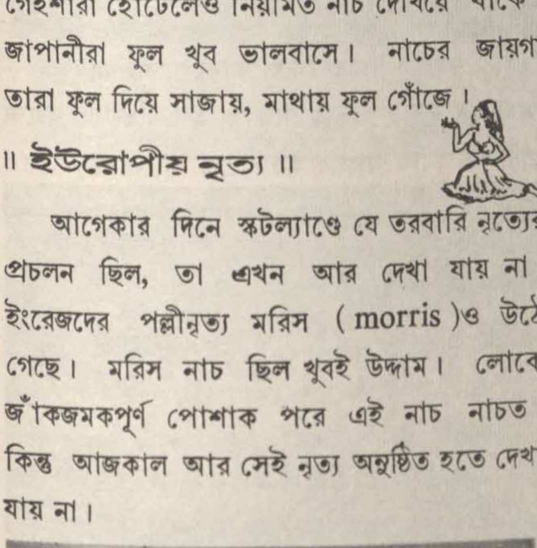
জাপানের গেইশা নর্তকীর দল

সঙ্গে পুরুষ বাদকেরা প্রধানতঃ বাঁশি বাজায়। গেইশারা হোটেলেও নিয়মিত নাচ দেখিয়ে থাকে। জাপানীরা ফুল খুব ভালবাসে। নাচের জায়গা তারা ফুল দিয়ে সাজায়, মাথায় ফুল গোঁজে।



॥ ইউরোপীয় নৃত্য ॥

আগেকার দিনে স্কটল্যাণ্ডে যে তরবারি নৃত্যের প্রচলন ছিল, তা এখন আর দেখা যায় না। ইংরেজদের পল্লীনৃত্য মরিস (morris)ও উঠে গেছে। মরিস নাচ ছিল খুবই উদ্দাম। লোকে জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরে এই নাচ নাচত। কিন্তু আজকাল আর সেই নৃত্য অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায় না।



আমেরিকার চতুষ্কোণ (স্কোয়ার) নৃত্য

পল্লীর চতুষ্কোণ (square) নৃত্য খুব প্রাচীন। চার জোড়া নারীপুরুষের দ্বারা এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। মাজুরকা (mazurka) প্রধানতঃ পোলিশ-দের নৃত্য। তাহলেও ইংল্যাণ্ডে এ নৃত্যের প্রচলন দেখা যায়।

কোয়াড্রিল (qudrille)ও একধরনের চতুষ্কোণ (square) নৃত্য। স্কটিশ-হাইল্যাণ্ড নৃত্য রীল (reel)। রীল গীতবাদ্যের সহযোগে এই নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়।

জিগ (jig) নৃত্য আগের মতো বহুলপ্রচলিত না হলেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় নি। এখনও কিছু চলে। স্টেপ (step) নৃত্যও চলে।

১৭শ-১৮শ শতাব্দীতে মিনিউয়েট (minuet), ফরাসী কৃষকদের গ্যাভট (gavotte) নৃত্য, বল নাচের মতো দুজনের কোটিলিয়ন (cotillion) নৃত্য বহুলপ্রচলিত ছিল। আজকাল এ-সব নাচের তেমন চলন নেই।

বর্তমান কালে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র বল নাচ (ball dance) ব্যাপকভাবে প্রচলিত। একই হলে এক সঙ্গে অনেকে দুজন স্ত্রীপুরুষে মিলে এই নৃত্য করে থাকে। বল নাচ সামাজিক নৃত্য।

স্পেনিশ-আমেরিকান নৃত্য ট্যাংগো (tango) একধরনের সামাজিক বল নাচ। বর্তমানে ট্যাংগো

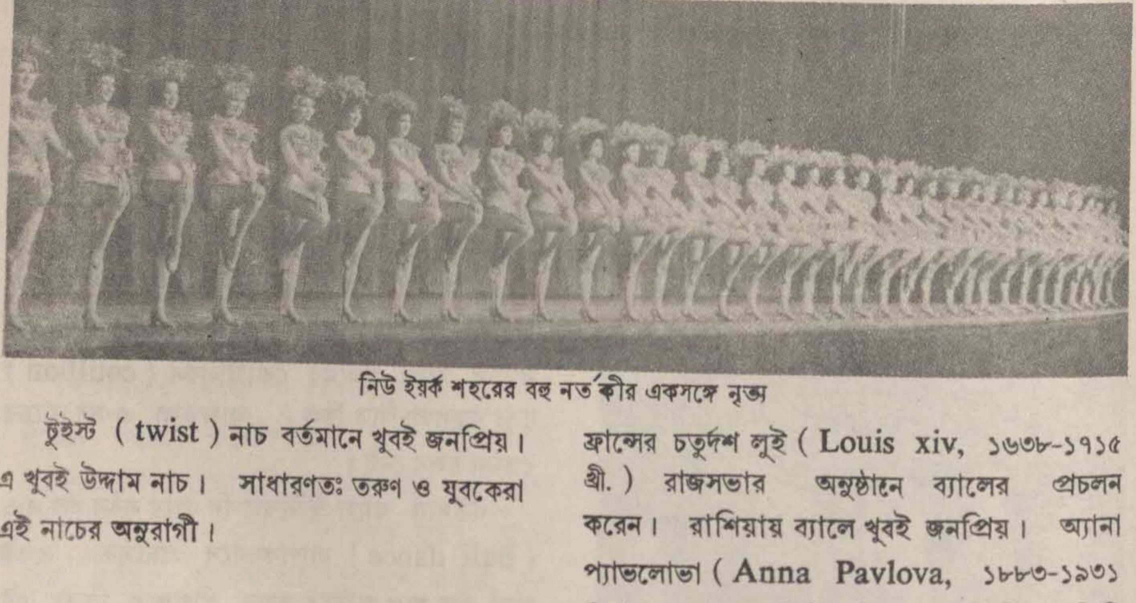


অষ্ট্রিয়ানদের উদ্দাম নৃত্য



নৃত্যরত উদয়শংকর ও অ্যানা প্যাভলোভা

খুব জনপ্রিয়। দক্ষিণ আমেরিকার আর্জেন্টিনায় এই নাচের প্রচলন খুব বেশী।



নিউ ইয়র্ক শহরের বহু নর্তকীর একসঙ্গে নৃত্য

টুইস্ট (twist) নাচ বর্তমানে খুবই জনপ্রিয়। এ খুবই উদ্দাম নাচ। সাধারণতঃ তরুণ ও যুবকেরা এই নাচের অনুরাগী।

॥ ব্যালে ॥

ইউরোপ, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি স্থানে ব্যালে (ballet) নৃত্যের খুবই প্রচলন। গ্রীসে ও রোমে মুক অভিনয়ে ব্যালের চলন ছিল। ফ্রান্সে প্রচলিত হবার আগেই ইটালীতে ব্যালে চালু ছিল।

ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই (Louis xiv, ১৬৩৮-১৭১৫ খ্রী.) রাজসভার অনুষ্ঠানে ব্যালের প্রচলন করেন। রাশিয়ায় ব্যালে খুবই জনপ্রিয়। অ্যানা প্যাভলোভা (Anna Pavlova, ১৮৮৩-১৯৩১ খ্রী.) একজন পৃথিবীপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী। তিনি ভারতে এসে বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শংকরের (১৯০০-১৯৭৭ খ্রী.) সঙ্গে কয়েকটি ব্যালে নৃত্যে যোগ দিয়েছিলেন।



নিউ ইয়র্ক শহরের ব্যালে নৃত্য

॥ ক্যাবারে ॥

ক্যাবারে (cabaret) এক ধরনের উদ্দাম নৃত্য। বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীসহকারে এই নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমানে প্রধানতঃ হোটেলে ও রেস্তোরাঁয় এই নাচ দেখানো হয়।



॥ উদয়শংকর ॥

নৃত্যজগতে উদয়শংকর এক অবিস্মরণীয় নাম। তিনি নৃত্যে অসামান্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তাঁর দলে ফরাসী নর্তকী সিমকি, তাঁর বোন কনকলতা, স্ত্রী অমলাশংকর ও ভাই দেবেন্দ্রশংকর ছিলেন। সকলেই নৃত্য-নাট্যের (dance-drama) মাধ্যমে বহু কাহিনীতে রূপদান করেছেন। উদয়শংকর হরপার্বতী নৃত্য, গজাসুর বধ প্রভৃতি নৃত্য দ্বারা সকলকে বিস্ময়বিমুগ্ধ করে গেছেন।



হরপার্বতী নৃত্যে উদয়শংকর ও ফরাসী নর্তকী সিমকি

॥ নানাধরনের নাচ ॥

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে হুলা, আমেরিকান নিগ্রোদের



নিউ জীল্যাণ্ডের মাওরীদের নৃত্য

জাজ, ট্যাপ ডান্স, কিউবান ডান্স কোঙ্গা (conga) খুবই প্রসিদ্ধ।



টরন্টোর জাতীয় ব্যালে নৃত্য

পাঞ্জাবী পুরুষদের ভাংরা নাচ, গুজরাটী মেয়েদের গরবা নাচ, বিহারের পল্লীনৃত্য হো-হো ও ছক্করবাজি, গাড়োয়ালী নাচ প্রভৃতি বহু নাচ ভারতের নানা অঞ্চলে প্রচলিত।

চীন, মালয়েশিয়া, মঙ্গোলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, বলিভিয়া, পেরু, ব্রাজিল, মেক্সিকো, ইরান, ইরাক, ইউরোপের নানা দেশ, সাগরের বিভিন্ন দ্বীপ প্রভৃতিতে কত ধরনের নাচ যে প্রচলিত তা বলে শেষ করা যায় না।



বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হয়ে দক্ষিণ সাগরের দ্বীপবাসীদের উদ্দাম নৃত্য

নৃত্য সম্বন্ধে নানা কথা

॥ বহু লোকের কোঙ্গা নৃত্য ॥

ডেভনের অন্তর্গত সিড মাউথ নামক স্থানে ১৯৭৮ সালের ২৫শে আগস্ট ৮১২৮ জন লোক একসঙ্গে সাপের আকারে কোঙ্গা নৃত্য প্রদর্শন করে।

॥ নৃত্যপ্রদর্শনীতে অধিকসংখ্যক নর্তক-নর্তকী ॥

১৯৬৯ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাসের হাউসটনে অ্যাস্ট্রো হলে এক নৃত্য-প্রদর্শনী হয়। তাতে একসঙ্গে ১৬,৫০০ জন লোক অংশগ্রহণ করে। স্থানাভাবে ৪ হাজার নর্তক-নর্তকী ফিরে যায়।

॥ একনাগাড়ে বেশী সময় নৃত্যের রেকর্ড ॥

পিট্স্বার্গের মোটর স্কোয়ার গার্ডেনে টনি আলটেরিরি (Tony Alteriri) ও ভেরা মিকাস (Vera Mikus) ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুন থেকে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত টানা ২৪ সপ্তাহ ৫ দিন (৪১৫২ই ঘণ্টা) ধরে নৃত্য করেন। প্রথম দিকে তাঁদের ঘণ্টায় ১৫ মিনিট বিশ্রাম দেওয়া হত। পরে সেই সময়

কমিয়ে কমিয়ে ১০, ৭, ৬, ৫ মিনিট করা হয়। শেষ সপ্তাহে ঘণ্টায় ৩ মিনিট বিশ্রামের ব্যবস্থা হয়। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের নির্দেশে নাচ বন্ধ করে দেওয়া হয়।

॥ ব্যালেতে সবচেয়ে বেশী লোকের অংশগ্রহণ ॥

১৯৬২ সালে রয়াল আলবার্ট হলে লিলিয়ান রাউলে (Lillian Rowley) কর্তৃক আয়োজিত লণ্ডন কস্টার ব্যালেতে ২০০০ লোক অংশগ্রহণ করে।

॥ ট্যাপ ডান্সে রেকর্ড ॥

১৯৭৩ সালের ১৪ই জানুয়ারি রয় ক্যাস্‌ল্‌ মিনিটে ১৪৪০ বার (সেকেণ্ডে ২৪ বার) কাঠের পাটাতনের উপরে জুতো ঠুকে ট্যাপ ডান্স করেন। এইটি পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা দ্রুত ট্যাপ ডান্সে ট্যাপ করার রেকর্ড।

॥ সর্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক ট্যাপ-ডান্সার ॥

১৯৭৯ সালের ১৫ই অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মিনিয়াপলিসে Beth Obermeyer-আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে ১৮০১ জন ট্যাপ-ডান্সার সমবেত হন।

॥ ড্রাম বাজানো ॥

১৯৭৭ সালের ২৬শে ডিসেম্বর থেকে ১৯৭৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি পর্যন্ত (৭২০ ঘণ্টা) এক নাগাড়ে ড্রাম বাজান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত রিজফিল্ডের ক্লিফোর্ড মার্শাল ভ্যান বুরেন (Clifford Marshall Van Buren)। ড্রাম বাজানোতে এইটিই বিশ্ব রেকর্ড।





বায়োস্কোপ (bioscope) বা সিনেমা (cinema)-র কথা শোনে নি, এমন কেউ আছে বলে মনে হয় না। বায়োস্কোপ মানে ছায়াছবি বা চলচ্চিত্র। ছায়াছবি বা চলচ্চিত্রের ঘরকেও বায়োস্কোপ বলে। সিনেমার একই অর্থ—ছায়াছবি বা চলচ্চিত্র এবং ছায়াছবি বা চলচ্চিত্রের ঘর।

সব দেশের শহরে, এমন কি পাড়াগাঁয়ে আজকাল বায়োস্কোপ বা সিনেমা দেখা যায়। বেশী দিন আগে কোথাও বায়োস্কোপ বা সিনেমার চলন ছিল না। ফটোগ্রাফ তোলা শুরু হয় অনেক আগে। প্রায় দেড়শ বছর আগে। ফটোগ্রাফি যেমন অনেক দিনের অনেক চেষ্টায় আবিষ্কৃত হয়েছে, বায়োস্কোপ বা সিনেমাও তেমনই আবিষ্কার করতে অনেক দিন ধরে নানা দেশে বহু মনীষীকে চেষ্টা করতে হয়েছে।

ফটোগ্রাফির সাহায্যে ছায়াকে ধরে রাখা যায়। কিন্তু সেই ছায়া বা ছবি স্থির থাকে, নড়ে না চড়ে না। ঘরের দেওয়ালের গায়ে গাছপালার ছায়া পড়ে। তাতে গাছপালার ছবি ফুটে ওঠে। ঝড় বইলে গাছপালা দুলতে থাকে। দেওয়ালে যে ছায়া পড়ে, তাও দুলতে থাকে। তাই দেখে দেখে মনীষীরা ভাবতে থাকলেন, ছবিকে তো নড়তে চড়তে দেখা যায়। এমন উপায় বার করা দরকার যাতে ছবির নড়াচড়া বা চলন্ত ছবিকে নিজের ইচ্ছামতো যখন তখন দেখা যাবে। এই ভাবতে ভাবতে মানুষের অনেক দিন কেটে গেল।

॥ রাস্তার বায়োস্কোপ ॥

পথের ধারে একজন লোক একটা কাঠের চকচকে পালিশ-করা বাক্সের উপর চোঙওয়ালা গ্রামোফোন বসিয়ে হাঁক দিত, কে বায়োস্কোপ দেখবে, এস। বাক্সের গায়ে থাকত তিন চারটে গোল গোল মুখ। সেই মুখের মধ্য দিয়ে তাকালে বাক্সের ভিতরে নানা ছবি দেখা যেত। বাইরে থেকে হাতল ঘোরালে সেই সব ছবি একটার পর একটা দেখা যেত। সাধারণতঃ ছেলেমেয়েরা তাই দেখে খুব আনন্দ পেত। একে বলা হত রাস্তার



রাস্তার বায়োস্কোপ

বায়োস্কোপ। ভারতের সুদূর পল্লী অঞ্চলে এখনও কেউ কেউ এই ধরনের বায়োস্কোপ দেখিয়ে অর্থোপার্জন করে।

॥ জোয়িট্রোপ ও জোয়িক্রোম ॥

ইংরেজ গণিতজ্ঞ ডবলিউ. জি. হর্নার জোয়িট্রোপ (zoetrope) বা জীবনচক্র (the wheel of life) নামে একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার উপরের ছিদ্র দিয়ে ভিতরে তাকালে চোঙের উপরের ছবিগুলিকে ছুটন্ত বা চলন্ত বলে মনে হত। ভিতরে থাকত নানাভঙ্গির ছবি। দ্রুত চোঙ ঘোরালে মনে হত, ভিতরের কোন ছবি ছুটে যাচ্ছে। রঙিন ছবি দেখবার যন্ত্রকে বলা হত zoechrome। এই জোয়িট্রোপ বা জোয়িক্রোমকে বলা যেতে পারে বর্তমান যুগের চলচ্চিত্র বা ছায়াছবির আদি। জোয়িট্রোপ বা জোয়িক্রোম অনেকটা রাস্তার বায়োস্কোপেরই মতো।

॥ প্র্যাক্সিনোস্কোপ ॥

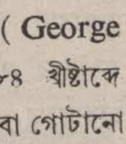
এই ধরনের আর একটা যন্ত্রের নাম প্র্যাক্সিনোস্কোপ (praxinoscope)। সেটাও একটা বাক্স, যার মধ্যে ছুটন্ত বা চলন্ত ছবি দেখা যেত। হাতল ঘোরালে ভিতরের রোলার ঘুরতে থাকত। তাতে যে-সব আঁকা ছবি থাকত, সেগুলি দ্রুত হাতল ঘোরাবার ফলে ছুটছে বা চলছে মনে হত।

॥ ফটোগ্রাফের সাহায্যে চলন্ত ছবি দেখানো ॥

এডওয়ার্ড ময়ব্রিজ (Edward Muybridge) নামে এক ব্যক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত সানফ্রান্সিস্কোতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে আঁকা ছবি নিয়ে চলন্ত ছবি দেখানোর বদলে ফটোগ্রাফ তুলে তাই দিয়ে ছুটন্ত বা চলন্ত ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু এভাবেও বর্তমান যুগের মতো চলচ্চিত্র তৈরী হল না।

॥ রোল ফিল্ম আবিষ্কার ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ইস্টম্যান (George Eastman, ১৮৫৪-১৯৩২ খ্রী.) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সেলুলয়েডের ফটো তোলার রোল ফিল্ম বা গোটানো ফিল্ম আবিষ্কার করলেন। কোডাক ক্যামেরাও তাঁরই আবিষ্কার। তাঁর আবিষ্কারের ফলে ফটো তোলার ব্যাপারে খুবই সুবিধা হল।



॥ মুভি ক্যামেরা ॥

উইলিয়াম ফ্রিজ গ্রীন (William Friese Green) নামে একজন ইংরেজ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে চলন্ত ছবি তোলার ক্যামেরা (movie camera) আবিষ্কার করলেন।

॥ এডিসনের কিনেম্যাটগ্রাফ ॥

প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva Edison, ১৮৪১-১৯৩১ খ্রী.) সিনেম্যাটগ্রাফ (cinematograph) বা কিনে-

ম্যাটগ্রাফ (kinematograph) নামে এক যন্ত্র আবিষ্কার করলেন। সে যন্ত্রের হাতল ঘোরাতে চলন্ত ছবি দেখা গেল। তাঁর আবিষ্কৃত যন্ত্রের সাহায্যে যে চলন্ত ছবি দেখা গেল, তাই-ই প্রথম চলচ্চিত্র। এডিসন ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর কিনেম্যাট-গ্রাফ যন্ত্রের পেটেণ্ট নেন।

তবে ফ্রান্সের Etienne Jules Marey (১৮৩০-১৯০৩ খ্রী.) ১৮৭০ সালে সিনেম্যাটগ্র্যাফি উদ্ভাবনের প্রেরণা যোগান।

॥ চুনকাম-করা দেওয়ালে চলচ্চিত্র প্রদর্শন ॥

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে লে প্রিন্স (Le Prince, ১৮৪২-১৮৯০ খ্রী.) নিউ ইয়র্কে বধিরদের প্রতিষ্ঠানে (at the Institute for the Deaf) এক চুন-কাম-করা দেওয়ালে চলচ্চিত্রের রৈখিক আদরা দেখাবার ব্যবস্থা-করেন। তিনি ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লীডস সেতুর উপরের যানবাহন চলাচলের এক চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

॥ সেলুলয়েড ফিল্মের চলচ্চিত্র ॥

১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসে Auguste Marie Louis Nicolas Lumiere (১৮৬২-১৯৫৪ খ্রী.) ও Louis Jean Lumiere (১৮৬৪-১৯৪৮ খ্রী.) সেলুলয়েড ফিল্মের চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ছবিটি তোলা হয় সম্ভবতঃ ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে Lyons-এর কারখানার ফটকে।

॥ প্রোজেক্টর ॥

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে টমাস আর্শাট তাঁর ভাইটা-স্কোপ ও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট ডাবলিউ. পল থিয়েটারগ্রাফ যন্ত্র আবিষ্কার করেন। এই যন্ত্র একধরনের প্রোজেক্টর (projector)। তার সাহায্যে পর্দার উপরের ছবি স্পষ্ট হয়। তাঁদের যন্ত্র দুটি আধুনিক কালের অত্যাবশ্যক প্রোজেক্টর বা উৎক্ষেপণ যন্ত্রের আদি রূপ।

॥ স্থায়ী সিনেমাগৃহ ॥

যে-সব চলচ্চিত্র দেখানো হত, সেগুলি দেখা-বার জন্যে প্রথম স্থায়ী গৃহ অর্থাৎ সিনেমা হল (চলচ্চিত্র-গৃহ) নির্মিত হয় পিটস্‌বার্গে হ্যারী ডেভিস নামে এক ব্যক্তির উদ্যোগে। এই হলে প্রদর্শিত প্রথম ছবির নাম দ্য গ্রেট ট্রেন-রবারি (The Great Train-robbery)। হলের প্রবেশ-



কায়রোর কাছে খোলা জায়গায় চলচ্চিত্র প্রদর্শন

মূল্য ধার্য হয়েছিল নিকেল ধাতুর তৈরী পাঁচ সেণ্ট। সেই থেকে হলটির নাম দেওয়া হয়েছিল নিকেলো-ডিয়ন (Nickelodion)। নূতন হল, নূতন প্রদর্শিত চলচ্চিত্র। প্রতিটি প্রদর্শনীতে তিলধারণের জায়গা থাকত না। দেশের সবাই, গণ্যমান্য ব্যক্তিও উৎসাহের সঙ্গে চলচ্চিত্র দেখতেন।

এর পর থেকে জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, ইটালি, স্পেন, পোর্তুগাল, রাশিয়া, মেক্সিকো, কানাডা, জাপান, চীন, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি সব দেশেই চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয়। ভারতেও হয়, তবে এই সব দেশের তুলনায় অনেক পরে।



॥ সবাক্ ছবি ॥

নির্বাক্ ছবি দেখে দেশের লোক সন্তুষ্ট রইল না। যে-সব ছবি দেখা হয়, তারা তো কথা বলে না, গান গায় না, আকাশের মেঘ থেকে শব্দ হয় না, গাড়ি চলবার সময় কোন ধরনের আওয়াজ হয় না। যাতে সেই সব কথা বা শব্দ শোনা যায়, তার জন্যে সকল দেশেই বিশেষভাবে চেষ্টা চলতে থাকল। বিজ্ঞানী এডিসন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফনোগ্রাফ (phonograph) যন্ত্র আবিষ্কার করে শব্দতরঙ্গকে ধরে রাখতে ও তাকে বাজিয়ে শোনাতে সমর্থ হন। তিনি কাইনেটোস্কোপ (kinetoscope) ও ফনোগ্রাফ জুড়ে মানুষের কথা বা গান অথবা কোন কিছুর শব্দকে ধরে তা শোনাবার ব্যবস্থা করলেন।

যে চলচ্চিত্রে মানুষের কথা, পাখির গান, ঝরনার জল পড়ার শব্দ, মেঘের ডাক ইত্যাদি শোনা যায় তা হ'ল সবাক্ চিত্র বা টকি (talkie)। প্যারিসের ইউজিন -অগাস্টিন লস্টি (Eugene Augustin Lauste) ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট যে মেসিনের পেটেণ্ট নেন ১৯১০ সালে লণ্ডনে তার সাহায্যে ছবি ও শব্দ দুইই একসঙ্গে ফিল্মের উপর ধরা পড়ে।

॥ প্রথম সম্পূর্ণ সবাক্ চলচ্চিত্র ॥

ডঃ লী ফরেস্ট (Dr Lee Forest, ১৮৭৩-১৯৬১ খ্রী.) ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল নিউ ইয়র্ক শহরের রিয়ালটো থিয়েটারে সবাক্ চলচ্চিত্র প্রদর্শন করার ব্যবস্থা করেন। ওয়ার্নার ব্রাদার্সের 'Lights of New york'—যেটি ১৯২৮ সালের ৬ই জুলাই নিউ ইয়র্ক শহরের দ্য স্ট্র্যাণ্ডে প্রদর্শিত হয় সেটি প্রথম পুরো সবাক্ চলচ্চিত্র। প্রথম বাংলা সবাক্ ছবি 'জামাই ষষ্ঠী'। সেটি ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে প্রদর্শিত হয়।

॥ রঙিন ছবি ॥

বেশির ভাগ চলচ্চিত্র একরঙা। বর্তমানে বহু ছায়াছবিকে রঙিন করে তোলা হয়েছে। বিদেশে বর্তমানে রঙিন ছবিই বেশী প্রদর্শিত হয়। এই রঙিন ছবিকে বলে টেক্‌নি-কলার (techni-colour ছবি।

॥ ছবি তোলার কৌশল ॥



আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার দেখাবার জন্যে নির্মিত ৪৫ ফুট উঁচু মাটির কৃত্রিম আগ্নেয়গিরি

ছবি তোলার ব্যাপারে নানা কৌশল অবলম্বন করা হয়। দুস্তর মরুভূমি, গহন অরণ্য, দুর্গম তুষার-রাজ্য, গগনস্পর্শী পর্বত, সীমাহীন সমুদ্র—সব জায়গায় না গিয়েও অনেক সময়ে স্টুডিওতেই কৃত্রিম উপায়ে ছবি তোলা হয়ে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে হলেও সেই সব দৃশ্য দেখে দর্শকেরা ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যায়, যেন তারা সত্যিকারের দৃশ্যই দেখছে। এমনি কৌশলে কৃত্রিম উপায়ে ভূমিকম্প, বন্যা, ঝড় প্রভৃতির ছবি তোলা হয়। এ ব্যাপারে পরিচালক ও ক্যামেরাম্যানের বাহাদুরি খুবই প্রশংসনীয়।

॥ সবচেয়ে বেশী অর্থব্যয়ে নির্মিত ছবি ॥

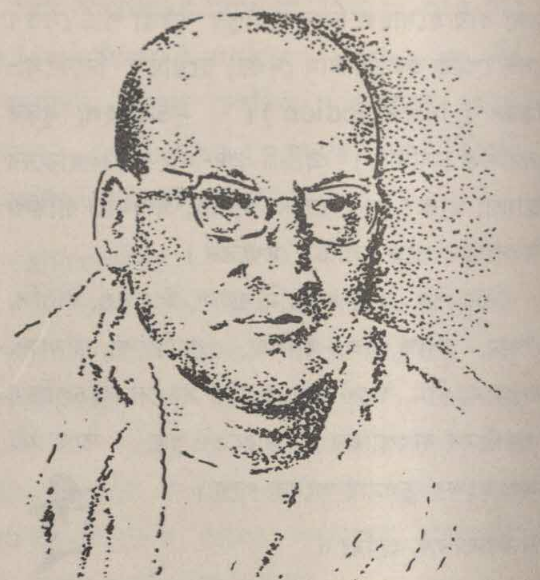
১৯৭৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর স্টার ট্রেক (Star Trek) বলে যে ছবিটির ওয়াশিংটনে প্রদর্শন শুরু হয় তা তুলতে ৪৬০ লক্ষ ডলার লেগেছিল। পরিচালক ছিলেন রবার্ট ওয়াইজ ও প্রযোজক ছিলেন জি. রডেনবেরি। এটিই সবচেয়ে দামী ছবি।

॥ সব চেয়ে কম খরচে তোলা ছবি ॥

সব চেয়ে কম খরচ লেগেছিল সিসিল হেপ-ওয়ার্থের 'Rescued by Rover' নামক ছবিটি তুলতে। খরচ পড়েছিল মাত্র ৩৭.৪০ পাউণ্ড।

॥ ভারতের খ্যাতিমান্ অভিনেতা ও অভিনেত্রী ॥

ভারতের চলচ্চিত্রের খ্যাতিমান্ অভিনেতা-অভিনেত্রীর নাম—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রমথেশ বড়ুয়া, ছবি বিশ্বাস, জহর গাঙ্গুলী, তুলসী চক্রবর্তী, অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, জহর রায়, কানন দেবী, চন্দ্রাবতী, বিকাশ রায়, উমাশশী, পেসেন্স কুপার, সীতা দেবী, যমুনা দেবী, অশোককুমার, কিশোরকুমার, সৌমিত্র



অহীন্দ্র চৌধুরী

চাটার্জী, সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া চৌধুরী, অপর্ণা সেন, সন্ধ্যা রায়, মলিনা দেবী, প্রভা, রাজলক্ষ্মী, রেণুকা দেবী, তরুণকুমার, নবদ্বীপ হালদার, হেমা মালিনী,



চলচ্চিত্রে সেকস্‌পীয়রের Henry V নাটকের একটি দৃশ্য

ধর্মেন্দ্র, বৈজয়ন্তীমালা, রেখা, মালা সিংহা, নার্গিস, রাজকাপুর, দিলীপকুমার, সায়রা বানু প্রভৃতি।

॥ বিদেশের অভিনেতা ও অভিনেত্রী ॥

বিদেশের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে চার্লি



চার্লি চ্যাপলিন



শিশু চলচ্চিত্রাভিনেত্রী শার্লি টেম্পল



War and Peace নামক চলচ্চিত্রে নেপোলিয়ানের ভূমিকায় এক অভিনেতা



দ্য বাইসিকল থীফ চিত্রের একটি দৃশ্য

চ্যাপলিন, গ্রেটা গার্বো, ফ্রেডারিক মার্চ, লন চেনী, স্টান লরেল, অলিভার হার্ডি, ক্লারা বো, শার্লি টেম্পল, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, রুডলফ ভ্যালেন্টিনো, হ্যারল্ড লয়েড, মরিস শেভ্যালিয়ার, বারবারা স্ট্যানউইক, এলিজাবেথ টেলার, জ্যানেট গেনর, ক্যাথারিন হেপবার্ন, স্পেন্সার ট্রেসি, মার্লন ব্র্যাণ্ডো,

পোলা নেগ্রী, ক্লার্ক গেব্‌ল্‌, লাওনেল ব্যারিমোর, সারা বার্নহাডট, রিচার্ড বার্টন, জ্যাকি কুপার, রবার্ট টেলার প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ ভারতের খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক ॥

ভারতের খ্যাতনামা চিত্রপরিচালক—মধু বোস, সত্যজিৎ রায়, তপন সিংহ, দেবকীকুমার বসু, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, প্রমথেশ বড়ুয়া, ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি.জি.), নীতিন বোস, তরুণ মজুমদার, উত্তমকুমার, অরুন্ধতী দেবী, হৃষীকেশ মুখার্জী, উৎপলেন্দু চক্রবর্তী প্রভৃতি।

॥ ওয়াল্ট ডিজনি ॥

চলচ্চিত্র জগতে ওয়াল্টার (ওয়াল্ট) ডিজনি (Walter Elias Disney, ১৯০১-১৯৬৬ খ্রী.) এক বিস্ময়কর নাম। তিনি আঁকা ছবির সাহায্যে জীবজন্তু ও মানুষের অভিনয় করিয়ে চলচ্চিত্র সৃষ্টি করেছেন। তাঁর 'মিকি মাউস' জগদ্বিখ্যাত। তিনি



ডিজনি

শত শত শিল্পীর সাহায্যে লক্ষ লক্ষ ছবি আঁকিয়ে সেগুলির জীবন্ত রূপ চলচ্চিত্রে দেখিয়েছেন। মিকি মাউস, ডোনাল্ড ডাক প্রভৃতি কথার স্রষ্টা তিনি।

অসংখ্য মূল্যবান্ তথ্যচিত্র তৈরি করে ডিজনি জগৎজোড়া নাম কিনেছেন। সেই সব তথ্যচিত্রে মরুভূমি, অরণ্য, সমুদ্র, নানা গাছপালা, জীবজন্তু প্রভৃতি দেখা গেছে।



॥ ডিজনি ল্যাণ্ড ॥

ডিজনির অতি বিস্ময়কর সৃষ্টি ডিজনি ল্যাণ্ড (Disney Land)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত লস অ্যাঞ্জেলস শহর থেকে কিছু দূরে ১০৫ একর জমির উপর বহু কোটি টাকা ব্যয়ে তিনি এক রূপকথার দেশ সৃষ্টি করেছেন। এখানে নদনদী, অরণ্য, প্রান্তর, হ্রদ প্রভৃতি তৈরি করা হয়েছে। এখানে নানা জীবজন্তুও রাখা হয়েছে। এতে আছে ছোট রেল লাইন, ছোট জাহাজ। তাতে করে ঘোরা চলে। মূলতঃ ডিজনি ল্যাণ্ড ছোট ছেলেমেয়েদের জন্যে তৈরী হলেও বড়দের পক্ষেও এটি খুব আকর্ষক সুন্দর স্থান।

॥ ডিজনির পরিচালিত চলচ্চিত্র ॥

ওয়াল্ট ডিজনি অনেক চলচ্চিত্র তৈরি করে গেছেন—স্নো হোয়াইট অ্যাণ্ড দ্য সেভ্‌ন্‌ ডোয়াফ্‌র্স্‌ (Snow White and the Seven Dwarfs), ফ্যাণ্টাসিয়া (Fantasia), সিলি সিমফনিজ (Silly Symphonies), দ্য ভ্যানিশিং প্রেইরী (The Vanishing Prairy,) দ্য লিভিং ডেজার্ট (The Living Desert) প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ।

॥ সুদীর্ঘ-সময়ের চলচ্চিত্র ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত ওহিওর Andy Warhol ২৪ ঘণ্টা চলে এমন একটি চলচ্চিত্র তৈরি করেন। এটি ব্যবসায়গত দিক্ থেকে ব্যর্থ হয়। Jacques Rivette যে চলচ্চিত্রটি নির্মাণ করেন

সেটি ছিল ১২ ঘণ্টা ৪০ মিনিটের চলচ্চিত্র। কিন্তু ১৯৭১ সালে Le Havre-তে মাত্র একবার প্রদর্শিত হয়েছিল। পশ্চিম জার্মানির অন্তর্গত হানোভারের একটি চলচ্চিত্র একটানা ৩২ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট ১০ সেকেণ্ড চলে।

॥ অভিনয়ে বেশী অর্থ-উপার্জন ॥

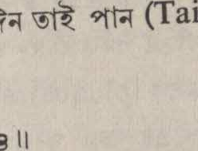
চলচ্চিত্রে একবার অভিনয়ের জন্যে সব চেয়ে বেশী অর্থ উপার্জন করেন মার্লন ব্র্যাণ্ডো (Marlon Brando, জন্ম ১৯২৪ খ্রী.) ও স্টীভ ম্যাককুঈন (Steve Mc Queen, ১৯৩০-৮০ খ্রী.)। দুজনেই পান ২৫,০০,০০০ ডলার (১২,৫০,০০০ পাউণ্ড) করে—মার্লন ব্র্যাণ্ডো সুপারম্যান (Superman) বইয়ে ও স্টিভ ম্যাককুঈন তাই পান (Tai Pan) বইয়ে অভিনয়ের জন্যে।

॥ সর্ববৃহৎ ফিল্ম স্টুডিও ॥

কালিফোর্নিয়ার ইউনিভার্সাল সিটিতে অবস্থিত The Black Lot স্টুডিও পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ ফিল্ম স্টুডিও। এখানে ৫৬১টি বাড়ি ও ৩৪টি স্টেজ আছে।

॥ সব চেয়ে পুরাতন সিনেমা-গৃহ ॥

পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে পুরাতন সিনেমা-গৃহ ১৮৯৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়ার অ্যাটলাণ্ট শো-তে নির্মিত হয়।



॥ সর্ববৃহৎ সিনেমা ॥

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ সিনেমা নিউ ইয়র্ক শহরের রেডিও সিটি মিউজিক হল। এটি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর নির্মিত হয়। এতে ৫,৯৪৫টি আসন ছিল, বর্তমানে ৫,৮৮৮টি আসন আছে। নিউ ইয়র্ক শহরের রক্সি সিনেমা (১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চ নির্মিত হয়) এক সময়ে সর্ববৃহৎ ছিল। এর আসনসংখ্যা ছিল প্রথমে ৬,২১৪ (পরে হয় ৫,৮৬৯)। এটি ১৯৬০ সালে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

॥ সিনেমা-প্রাঙ্গণে গাড়ি রাখবার প্রশস্ততম স্থান ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লীন (Lynn)-এর Loew's Open Air সিনেমা-প্রাঙ্গণে ৫,০০০ গাড়ি রাখবার জায়গা আছে।

॥ জনসংখ্যার বিচারে সব চেয়ে বেশী সিনেমা ॥

সান মেরিনোয় জনসংখ্যার বিচারে সব চেয়ে বেশী সিনেমা আছে। প্রতি ১,৫১২ জনের জন্যে ১টি সিনেমা। সৌদি আরবের লোকসংখ্যা ৯৫ লক্ষ ২০ হাজার। কিন্তু সে দেশে কোন সিনেমা নেই।

॥ যে দেশে সবচেয়ে বেশী লোক সিনেমায় যায় ॥

ফিলিপিন্‌জের (লোকসংখ্যা ৪ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৪ হাজার ১৭) লোকেরা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী সিনেমায় যায়।

॥ সব চেয়ে বেশীসংখ্যক সিনেমা ॥

১৯৭৪ সালের হিসাবে দেখা যায়, পৃথিবীর মধ্যে সিনেমার সংখ্যা সোভিয়েট রাশিয়ায় সব চেয়ে বেশী—১,৬৩,৪০০।

॥ সব চেয়ে বড় সিনেমার পর্দা ॥

সিনেমার পর্দা সব চেয়ে বড় কালিফোর্নিয়ার অন্তর্গত সান্টা ক্লারার ম্যারিয়ট'স গ্রেট আমেরিকা এণ্টারটেনমেণ্ট সেণ্টার-এর পিক্টোরিয়াম থিয়েটারের পর্দা—২১·৩৩ মিটার লম্বা, ২৯·২৬ মিটার চওড়া। এটি স্থায়ী পর্দা।

অস্থায়ী পর্দা ১৯৩২ সালের প্যারিস প্রদর্শনীতে নির্মিত সিনেমাগৃহের পর্দা ৯০'৫×১০ মিটার।

॥ অস্কার পুরস্কার ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত টেক্সাসের অস্কার পিয়ার্স (Oscar Pierce)-এর নামে চলচ্চিত্র, সিনেমায় অভিনয় বা পরিচালনার জন্যে যে পুরস্কার দেওয়া হয়, তার নাম অস্কার পুরস্কার। ইউনাইটেড স্টেটস অ্যাকাডেমি অব মোসন পিকচার আর্টস অ্যাণ্ড সায়েন্সেস কর্তৃক অস্কার পুরস্কার দেওয়া হয়। ওয়াল্টার (ওয়াল্ট) ডিজনি সব চেয়ে বেশী অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন। ক্যাথারিন হেপবার্ন তিনটি অস্কার পুরস্কার লাভ করেন। ফ্রেডারিক মার্চ, স্পেন্সার ট্রেসি ও মার্লন ব্র্যাণ্ডো দুটি করে অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন।

চলচ্চিত্র হিসাবে বেন হুর (Ben Hur) ১১টি, গান উইথ দ্য উইণ্ড (Gone with the Wind) ১০টি, ওয়েস্ট সাইড স্টোরি (West Side Story) ১০টি পুরস্কার লাভ করে। অ্যাটেনবরোর 'গান্ধী' ছবি ৭টি অস্কার পুরস্কার লাভ করেছে।

সর্বকনিষ্ঠা অভিনেত্রী শার্লি টেম্পল (Shirley Temple) ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ বৎসর বয়সে অস্কার পুরস্কার লাভ করেন।

সব চেয়ে বেশীবয়স্ক অভিনেতা জর্জ বার্নস্ ৮০ বৎসর বয়সে ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে The Sunshine Boys-নামক ছবিতে অভিনয়ের জন্যে অস্কার পুরস্কার লাভ করেন।

ভারতের পরিচালক সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন প্রভৃতি কয়েকটি অস্কার পুরস্কার পেয়েছেন।

॥ নানা কথা ॥

বাংলা চলচ্চিত্র ভারতের অন্যান্য স্থানের চলচ্চিত্র অপেক্ষা উন্নত মানের বলে বিবেচিত হয়েছে। সব চেয়ে বেশী ছবি বোম্বাইয়ে তৈরী হলেও সব ছবি বাংলার ছবির মতো উন্নত ধরনের নয়।

ক্যানে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (Cannes Film Festival), ভেনিস ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল (Venice Film Festival) প্রভৃতিতে বাংলা ছবি অনেক পুরস্কার পেয়েছে।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে চলচ্চিত্র, অভিনেতা ও পরিচালককে পুরস্কার দেওয়া হয়ে থাকে।

ভারতের চলচ্চিত্র ছাড়া বিদেশী চলচ্চিত্রও এই পুরস্কার লাভ করে—এর নাম স্বর্ণময়ূর, রৌপ্য ময়ূর ও ব্রোঞ্জ ময়ূর।

উচ্চশ্রেণীর জাতীয় ছবির জন্য প্রযোজক রাষ্ট্রপতির পদক ও ৪০ হাজার টাকা, পরিচালক একটি ফলক (plaque) ও ১০ হাজার টাকা পান। তথ্যচিত্রের জন্য পুরস্কারের অর্থ একটি পদক ও ১৫ হাজার টাকা—পান প্রযোজক, একটি প্লেক ও ৫ হাজার টাকা পান পরিচালক। এছাড়া আরো কয়েকটি পুরস্কার (অর্থ ও পদক) বরাদ্দ আছে।

১৮৯৬ সালের ৭ই জুলাই বোম্বাইয়ের ওয়াটসন হোটেলে ফ্রান্সের লুমিয়ের ব্রাদার্স প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন। রেলগাড়ি, সমুদ্রস্নান, কারখানা থেকে শ্রমিকদের প্রস্থান প্রভৃতি দেখানো হয়। ১৮৯৭ সালে ইংল্যাণ্ডের জুবিলী শোভাযাত্রা দেখানো হয়। কয়েকজন বিদেশী ফটোগ্রাফারও কয়েকটি চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

১৮৯৯ সালে হরিশ্চন্দ্র নামে এক ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রদর্শন করেন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের সাধু পুণ্ডলিকের জীবনকথা নিয়ে চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে দাদাসাহেব ফালকে রাজা হরিশ্চন্দ্র নামে এক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন।

এটি বোম্বাইয়ে প্রদর্শিত হয়। চলচ্চিত্র বিষয়ে বহুমুখী কর্মধারার জন্যে দাদাসাহেব ফালকেকে ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক বলা হয়।

১৯০১ সালে হীরালাল সেন (রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি) প্রথম কয়েকটি বাংলা থিয়েটারে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন।

১৯০৭ সালে জে. এফ. ম্যাডান কলকাতায় এলফিনস্টোন পিকচার প্যালেস নামে প্রথম সিনেমা গৃহ নির্মাণ করান।

জে. এফ. ম্যাডান নলদময়ন্তী নামে যে চলচ্চিত্র নির্মাণ করান, সেইটি প্রথম বাংলা চলচ্চিত্র।

স্টার অব দি ইস্ট ফিল্ম কোং দক্ষিণ ভারতে ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা নামে প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণ করে।

বোম্বাইয়ের ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানি Alam Ara নামে প্রথম ভারতীয় সবাক্ চলচ্চিত্র তৈরি করে। কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারের শিরিন ফরহাদ দ্বিতীয় ভারতীয় সবাক্ চলচ্চিত্র।

জামাই ষষ্ঠী প্রথম বাংলা সবাক্ চলচ্চিত্র ১৯৩১ সালে নির্মিত হয়।

ইম্পিরিয়ালের কৃষাণ কন্যা ভারতে তোলা প্রথম রঙিন ছবি।

চণ্ডীদাস চলচ্চিত্রে দেবকীকুমার বসু প্রথম নেপথ্য সংগীত প্রবর্তন করেন (১৯৩২ খ্রী.)। নীতিন বোস ভাগ্যচক্রে প্রথম প্লেব্যাক প্রথার প্রবর্তন করেন (১৯৩৪ খ্রী.)।

১৯৫৬ সালে ভারতীয় চলচ্চিত্রের রৌপ্য জুবিলী উৎসব প্রতিপালিত হয়।

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম, ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয়, ১৯৬৬ খ্রী. তৃতীয়, ১৯৬৯ খ্রী. ৪র্থ, ১৯৭৫ খ্রী. পঞ্চম, ১৯৭৬ খ্রী. ষষ্ঠ, ১৯৭৯ খ্রী. ৭ম, ১৯৮১ খ্রী. অষ্টম, ১৯৮৩ খ্রী. নবম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। এই উৎসবে ভারত, রাশিয়া, ইজিপ্ট, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, ব্রাজিল, ইরান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফিনল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশ যোগদান করে।

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় চলচ্চিত্রের হীরক জুবিলী অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭১ সালে পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে বেশী চলচ্চিত্র ভারতে নির্মিত হয় (৪৩৩টি ফিল্ম)। জাপান ছিল দ্বিতীয় (৪০০ ফিল্ম)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় (২০০ ফিল্ম)। বর্তমানে ভারতের স্থান পৃথিবীতে দ্বিতীয়।

ভারতের প্রত্যেক রাজ্যেই চলচ্চিত্র নির্মিত হয়ে থাকে। ১৯৮২ সালের হিসাবেদেখা যায়, সব চেয়ে বেশী নির্মিত হয়েছে অন্ধ্রপ্রদেশে (১৯৬১), তার পরে তামিলনাডুতে (১৭৭৭), তার পরে মহারাষ্ট্রে (১১৯৫), এর পরে কেরলে (১১৯৪)। পশ্চিমবঙ্গে ৬৬৮টি চলচ্চিত্র নির্মিত হয়েছে (১৯৮২ খ্রী.)।



ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

প্রধানতঃ যে বিদ্যার সাহায্যে ঘরবাড়ি তৈরি করা হয় তাকে বলে স্থাপত্য (architecture)। ঘরবাড়ি তৈরি করার বিদ্যা যার জানা আছে তাকে বলে স্থপতি (architect)। আর কেটে বা খোদাই করে মূর্তি, মন্দিরাদি তৈরি করার বিদ্যাকে বলা হয় ভাস্কর্য (sculpture) এবং এ বিদ্যা যার জানা আছে তাকে বলে ভাস্কর (sculptor)। স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারত বহু প্রাচীনকাল থেকে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। সুমের, মিশর, চীন, গ্রীস, রোম প্রভৃতি স্থানের মতো স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে ভারতের স্থান খুব উচ্চে। ভারতায় স্থপতি ও ভাস্করদের সহায়তায় কাম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া), শ্যামদেশ (থাইল্যাণ্ড), বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, শ্রীলঙ্কা প্রভৃতি স্থানে বহু স্তূপ, মন্দির প্রভৃতি গড়ে উঠেছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, জাপান, কানাডা, দক্ষিণ আমেরিকার বহু দেশ প্রভৃতিতে ভাস্কর্য তেমন উৎকর্ষলাভ না করলেও সে-সব দেশে স্থাপত্যের বহু অত্যুন্নত নিদর্শন বর্তমান। মেক্সিকো, পেরু প্রভৃতি দেশে স্থাপত্য ও ভাস্কর্য—দুইয়েরই বহু উন্নত ধরনের নিদর্শন দেখা যায়।

॥ সিন্ধুসভ্যতা ॥



মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার ঘরবাড়ির বহু ধ্বংসাবশেষ দেখা গেছে। সে-সব দেখে মনে হয়, সেই অতি প্রাচীন যুগেও ভারতের স্থাপত্য কত উন্নত ছিল। তখনকার দিনের স্থপতিদের ঘরবাড়ি তৈরি করার কাজে বিস্ময়কর নৈপুণ্য ছিল। মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পার সভ্যতাকে সিন্ধুসভ্যতা বলা হয়।

॥ মৌর্যযুগের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ॥

তারপর প্রায় আড়াই হাজার বছর ধরে ভারতের স্থপতি ও ভাস্করেরা কী সব ঘরবাড়ি মন্দিরাদি তৈরি করেছিলেন, তার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মৌর্য-যুগের বহু স্তম্ভ, স্তূপ প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়।

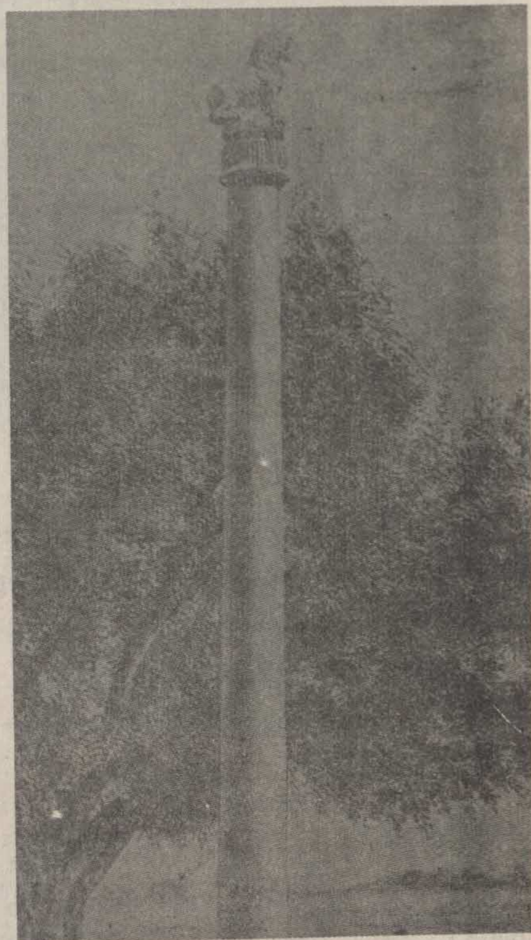
॥ অশোকের নির্মিত স্তূপ, স্তম্ভ ও চৈত্য ॥

মৌর্যযুগের সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (জীবৎকাল খ্রী. পূ. ৩২১ অব্দ) মগধের প্রাচীন হিন্দু সম্রাট্ ও মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রাজপ্রাসাদ ছিল বিরাট ও অপূর্ব কারুকার্যখচিত। সেই রাজপ্রাসাদ এখন আর নেই। কিন্তু বিদেশী ভ্রমণকারীদের লিখিত বিবরণ থেকে রাজপ্রাসাদের কথা জানা যায়।



॥ অশোকস্তম্ভ ॥

মগধের বিখ্যাত সম্রাট্ অশোক ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পৌত্র। তাঁর পিতা বিন্দুসার। অশোকের প্রাসাদও ছিল বিরাট ও সুন্দর। বিদেশী পর্যটকদের লেখা থেকে সে কথা জানা যায়। রাজপ্রাসাদটি বর্তমানে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত। কিন্তু অশোকের তৈরী বহু স্তূপ, স্তম্ভ, চৈত্য প্রভৃতি এখনও ভারতের নানাস্থানে বর্তমান। প্রধানতঃ অশোকস্তম্ভ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের অতি উন্নত নিদর্শন। অশোকের সময়ে তৈরী বারাণসীর কাছের সারনাথ স্তম্ভের উপরকার সিংহমূর্তি ও অশোকচক্র খুবই প্রসিদ্ধ। সারনাথ স্তম্ভের উপরে দাঁড়িয়ে আছে চারটি সিংহমূর্তি—প্রত্যেকে প্রত্যেকের দিকে পিছন করে। তাদের পায়ের কাছে আরও কয়েকটি ছোট প্রাণীর মাঝখানে একটি চক্র। সিংহমূর্তি ও অশোকচক্র বর্তমানে ভারতের জাতীয় প্রতীক। যে-সব অশোকস্তম্ভ এখনও বিদ্যমান, তা স্থাপত্যের অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন।



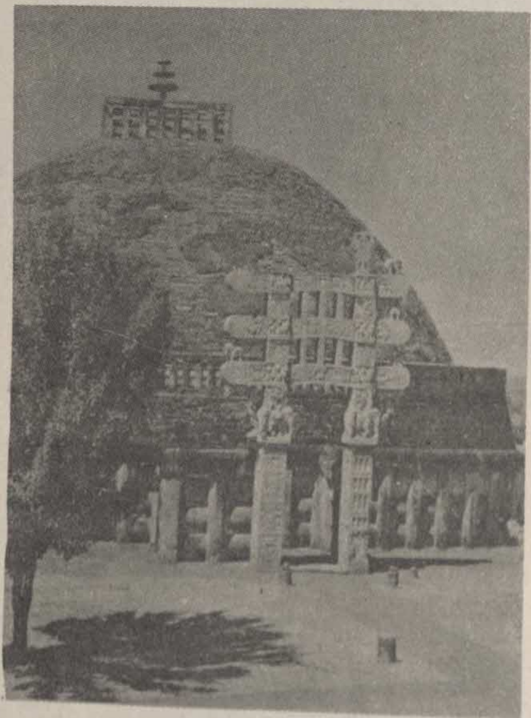
লৌড়িয়া নন্দনগড়ের অশোকস্তম্ভ

সম্রাট্ অশোক প্রায় ৮৪ হাজার স্তূপ নির্মাণ করিয়েছিলেন। ইট পাথর দিয়ে তৈরী হয়েছে গম্বুজের মতো স্তূপ। স্তম্ভ, স্তূপ ও চৈত্য সারা ভারতের নানা স্থানে ছিল। বহু স্তম্ভ, স্তূপ ও

চৈত্য ধ্বংস হয়ে গেছে। যা আছে সৌন্দর্যে, কারুকার্যে, স্থাপত্যে ও ভাস্কর্যে সে-সব অতুলনীয়।

॥ সাঁচী স্তূপ ॥

চৈত্য বৌদ্ধ মঠ। অশোকের তৈরী বহু চৈত্য তাঁর বিশাল সাম্রাজ্যের নানা স্থানে নির্মিত হয়েছিল। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী ভূপালের



সাঁচী স্তূপ

নিকটবর্তী সাঁচী স্তূপ সুপ্রসিদ্ধ। এটির চারদিকের বেষ্টনীর মাপ ৩৭ মিটার। এটি উচ্চতায় ১৩ মিটার। ইট ও পাথর দিয়ে তৈরী এই স্তূপটির কারুকার্য ও গঠনশৈলী প্রতিটি দর্শককে বিমোহিত করে।

॥ শুঙ্গ রাজাদের আমলের স্তূপ ॥

খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৪ অব্দে মৌর্য বংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত রাজবংশের নাম শুঙ্গবংশ। শুঙ্গবংশের রাজারা ১১২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁদের আমলেও বহু স্তূপ নির্মিত হয়। এই সব স্তূপের মধ্যে ভারহুত স্তূপ অতি প্রসিদ্ধ। এটি আকারে যেমন বৃহৎ, এর গঠনৈপুণ্যও তেমন অপূর্ব। কিন্তু এটির ধ্বংসাবশেষ মাত্র বর্তমান।

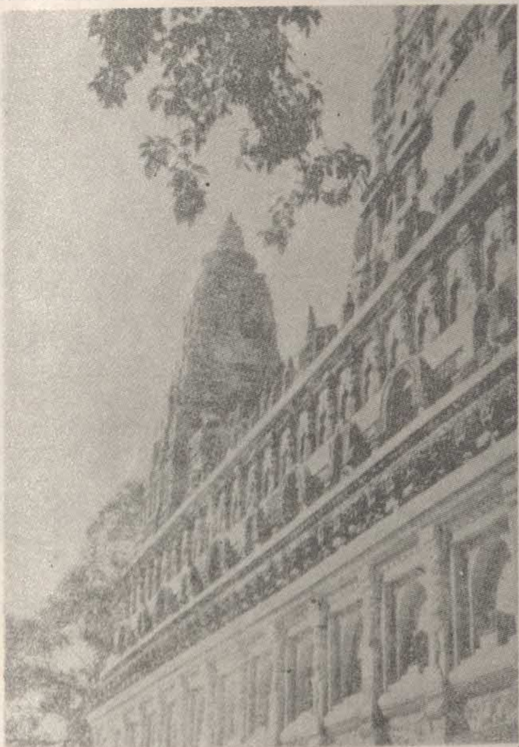
॥ বুদ্ধগয়ার মন্দির ॥

শুঙ্গ রাজাদের রাজত্বকালেই বিহারের বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্মিত হয়। এই মন্দির আজও পূর্ণ



বুদ্ধগয়ার মন্দির

মহিমায় বিদ্যমান। এর ভিতরের ও বাইরের কারুকার্য অপূর্ব। এটি বেশ উচ্চ। সারা পৃথিবীর নানা দেশের পর্যটক, বিশেষ করে চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, কাম্পুচিয়া প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ



বুদ্ধগয়ার মন্দিরে বাইরের প্রাচীর গাত্রের কারুকার্য

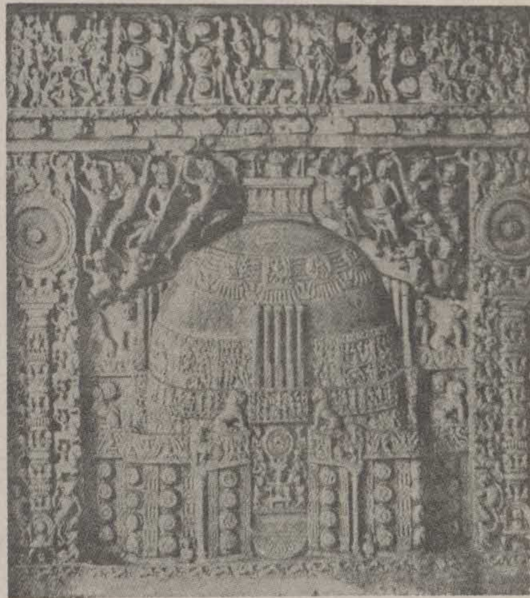
সন্ন্যাসীরা প্রতি বৎসর এটি দর্শন করতে সমবেত হন।

॥ নাগার্জুনকোণ্ডা ॥

শুঙ্গ রাজাদের আমলে নির্মিত নাগার্জুনকোণ্ডা স্তূপ, চৈত্য ও মঠের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে বুদ্ধদেব ও তাঁর শিষ্যদের নানা ভঙ্গীর অপূর্ব সুষমামণ্ডিত প্রস্তরমূর্তি বিদ্যমান। সেগুলির মধ্য দিয়ে ভারতের প্রাচীনকালের স্থপতিদের অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রায় দু হাজার বছর কেটে গেছে: কিন্তু সে-সবের সৌন্দর্য ম্লান হয় নি। বর্তমানকালের মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে সে যুগের স্থাপত্যের নৈপুণ্য লক্ষ্য করে।

॥ অমরাবতী স্তূপ ॥

দক্ষিণ ভারতের অমরাবতী স্তূপ অতি বিখ্যাত। এই স্তূপের গায়ে পাথর কেটে নানা গাছ, লতাপাতা, পদ্মফুল তৈরি করা হয়েছে। সে সবের



অমরাবতী স্তূপ

সৌন্দর্য প্রতিটি দর্শকের চিত্ত জয় করে। সূক্ষ্ম কারুকার্যের জন্য স্তূপটি সুপ্রসিদ্ধ। নানা স্থান থেকে সহস্র সহস্র লোক এই স্তূপ দেখতে যায়।

॥ পাহাড়ের গুহার শিল্পকর্ম ॥

প্রাচীনকালের ভাস্কর ও স্থপতিরা বিভিন্ন স্থানে পাহাড়ের গুহায় তাঁদের অপরূপ শিল্পকর্ম সৃষ্টি করে গেছেন। বোম্বাই থেকে উত্তর ভারত পর্যন্ত নানা স্থানে, পূর্ব ভারতের ওড়িশা, মধ্যপ্রদেশের নানা স্থানের নানা গুহায় সেই সব যুগের ভাস্কর ও স্থপতিদের নিপুণ হস্তের সৃষ্টি বিদ্যমান। কার্লে, নাসিক, বেদসা, ভাজা গুহার স্তূপ ও চৈত্যের অপূর্ব শিল্পকর্ম অতি বিখ্যাত। বোম্বাইয়ের কাছে কার্লে গুহার সম্মুখের প্রাচীরগাত্রের ভাস্কর্য, বড় বড় ঘরের ভিতরকার নানা স্তম্ভ ইত্যাদি ভারতের প্রাচীন

যুগের স্থপতি ও ভাস্করদের অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচয় দেয়। সারা পৃথিবী থেকে সমাগত শত শত পর্যটক সেই সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্য দেখে বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে যান।



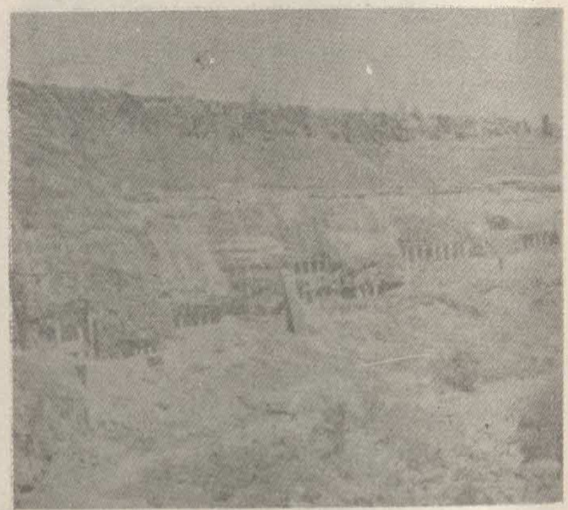
॥ অজন্তা ॥

অজন্তা বা অজণ্টা মহারাষ্ট্রের ঔরঙ্গাবাদ জেলার একটি ছোট গ্রাম। জলগাঁ স্টেশন থেকে ৬১ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এখানকার অজণ্টা বা অজন্তা পর্বত পশ্চিমঘাটের একটি শাখা পর্বত। সেই পর্বতের গুহামন্দির বিশ্ববিখ্যাত। পর্বতগাত্র ক্ষোদিত করে এখানে ২৫টি বিহার ও ৫টি চৈত্য নির্মিত হয়েছিল। গুহার সংখ্যা ৩৯টি।



অজন্তার ১৯নং গুহার ভিতরের দৃশ্য

ছাদে ও প্রাচীরগাত্রে অসংখ্য চিত্র আঁকা আছে। প্রধানতঃ বুদ্ধদেবের জীবনের ঘটনাবলী নিয়ে চিত্রগুলি অঙ্কিত। এখানকার বিহার, চৈত্য, মূর্তি



অজন্তা গুহার বহির্দৃশ্য

প্রভৃতির সৌন্দর্য অপরূপ, এ-সবের গঠননৈপুণ্য অতি বিখ্যাত।

॥ ওড়িশার মন্দির ॥

উড়িষ্যা (ওড়িশা) রাজ্যে অগণিত কারুকার্যমণ্ডিত বিখ্যাত মন্দির অবস্থিত। পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির, ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির, কোনারকের (কোনার্কের) সূর্যমন্দির অতি প্রসিদ্ধ। ওড়িশার উদয়গিরি পর্বতের বাঘগুহা, উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির গুহামন্দির স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিস্ময়কর নৈপুণ্যের নিদর্শন। ওড়িশায় সম্রাট্‌ অশোকের শিলালিপিও আবিষ্কৃত হয়েছে।



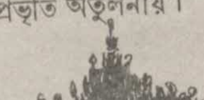
॥ ইলোরা ॥

ইলোরা মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি স্থান, দৌলতাবাদ ও ঔরঙ্গাবাদের নিকটবর্তী। এখান থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে কয়েকটি বিখ্যাত গুহামন্দির অবস্থিত। বৌদ্ধ, হিন্দু ও জৈন পর্যায়ে বিভক্ত ওই সব মন্দিরে অপূর্ব স্তম্ভ, মূর্তি প্রভৃতি বিরাজিত। এগুলি প্রাচীন কালের ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এখানকার



ইলোরার কৈলাস মন্দির।

কৈলাসনাথের মন্দির, ইন্দ্রসভা প্রভৃতি অতুলনীয়।

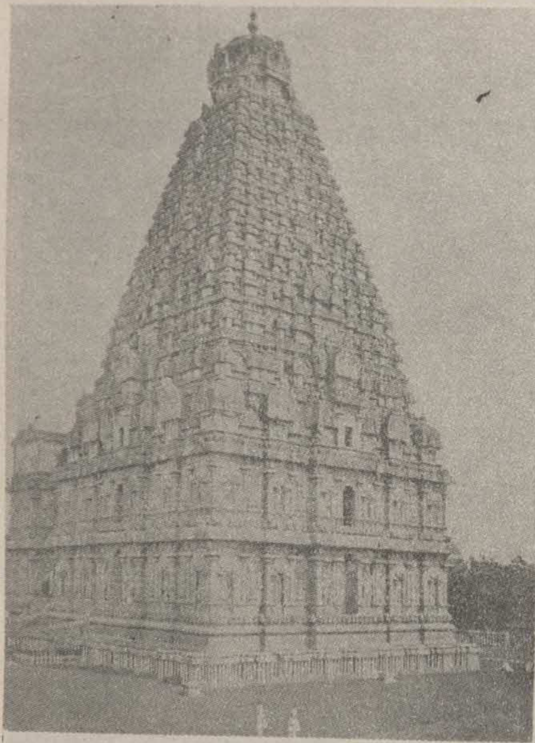


॥ দাক্ষিণাত্যের মন্দির ॥

দাক্ষিণাত্যে কত যে প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত, তা বলে শেষ করা যায় না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেগুলি স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মহিমায় অত্যুজ্জ্বল। মহাবলীপুরমের রথ বা প্যাগোডা মন্দির, তাঞ্জোরের মন্দির, মীনাক্ষী দেবীর মন্দির, রামেশ্বরের মন্দির, তিরুপতির মন্দির প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। সবগুলিরই স্থাপত্য ও ভাস্কর্য অতুলনীয়।



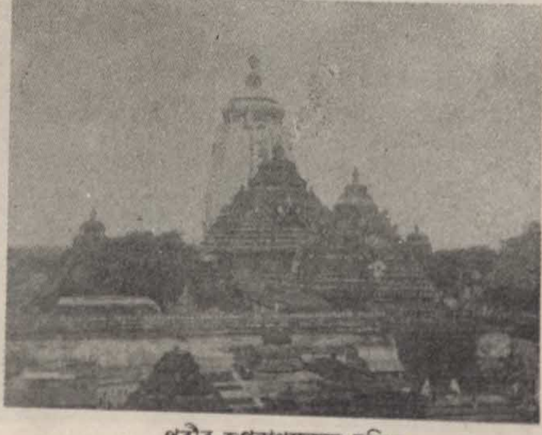
দাক্ষিণাত্যের মহাবলীপুরমের প্যাগোডা মন্দির



তাঞ্জোরের মন্দির

॥ পুরীর মন্দির ॥

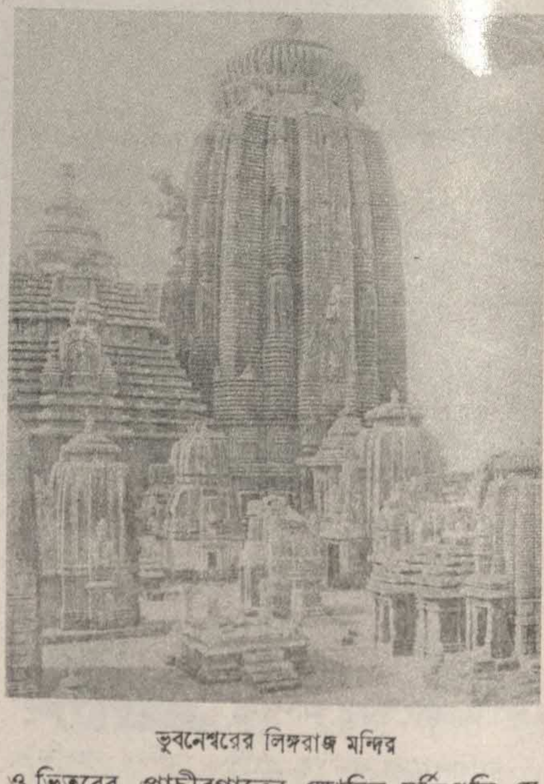
পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির ভারতের অত্যুচ্চ স্থাপত্যের নিদর্শন। উৎকলরাজ যযাতি কেশরীর রাজত্বকালে এটি নির্মিত হয়। পুরীর মন্দিরের ভিতর ও বাহিরের স্থাপত্য অতিশয় প্রশংসনীয়।



পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দির

॥ ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির ॥

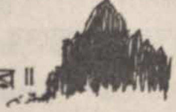
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির পুরীর মন্দির প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বে নির্মিত হয়। এই মন্দিরের সু-উচ্চ গম্বুজের চূড়া থেকে পাদদেশ পর্যন্ত প্রস্তরশিল্পের অতি প্রশংসনীয় নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। বাহিরের



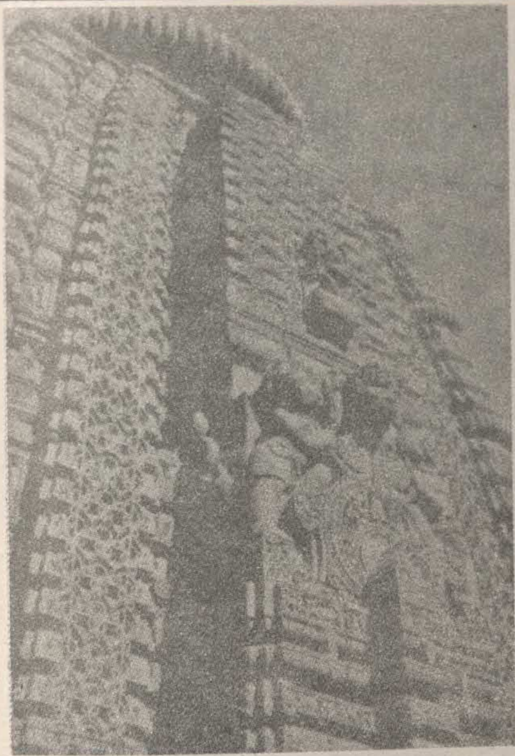
ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির

ও ভিতরের প্রাচীরগাত্রের ক্ষোদিত মূর্তিগুলি সে-যুগের স্থপতি ও ভাস্করদের অপূর্ব নৈপুণ্যের পরিচায়ক।

॥ ভুবনেশ্বরের নানা মন্দির ॥



ভুবনেশ্বরে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অপূর্ব নিদর্শন



ভুবনেশ্বরের মুক্তকেশীর মন্দির

অনেকগুলি মন্দির দেখা যায়। রাজারানীর মন্দির, মুক্তকেশীর মন্দির প্রভৃতির বিস্ময়কর কারুকার্য দর্শকচিত্তকে বিস্ময়ে বিমোহিত করে।

॥ কোনারকের মন্দির ॥



কোনারকের (কোনার্কের) সূর্যমন্দির (black pagoda) কাল পাথরের তৈরী এক বিস্ময়কর স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শন। ওড়িশার রাজা নরসিংহদেব বা নৃসিংহদেব ১২৫০-৬০ খ্রীষ্টাব্দে এটি নির্মাণ করান। প্রাচীন মন্দিরের কিছুটা ভেঙে পড়েছে। যতটুকু আছে, তা দেখে পৃথিবীর সব পর্যটক বিস্ময়াভিভূত হয়। মন্দিরটি একটি রথের আকারে নির্মিত। মন্দিরের চাকাগুলি পাথরে ক্ষোদিত এক অপূর্ব ভাস্কর্য। সে-যুগের স্থপতি



কোনারকের মন্দির

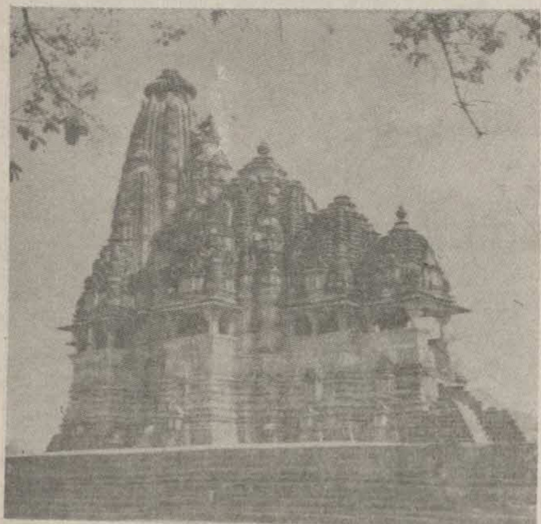


কোনারকের মন্দিরের চাকা

ও ভাস্করেরা যেন তাঁদের প্রতিভা উজাড় করে এই মন্দিরটিকে অপূর্ব কারুকার্যময় করে তুলেছেন। এতে অশ্ব, নানা জীবজন্তু, নর্তকী, নৃত্যরত দেবতা, সৈনিক, গুরুশিষ্য, শোভাযাত্রাসহকারে গমনশীল জনতা প্রভৃতির পাথরে-গড়া মূর্তি বিদ্যমান। সব কিছু মিলিয়ে যেন এটি একটা স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের বিচিত্র সৃষ্টির অপূর্ব সমারোহ।

॥ খাজুরাহোর মন্দির ॥

মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহো-নামক নগরের মন্দির-সমষ্টি খ্রীষ্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতকে নির্মিত হয়। এখানকার বহু মন্দির কালের নিষ্ঠুর আঘাতে ধ্বংস হয়ে গেছে। এখনও ২৫টি মন্দির বিদ্যমান। চিত্র-গুপ্ত, পার্শ্বনাথ, আদিনাথ, লক্ষ্মণ, বামন, বিশ্বনাথ,



খাজুরাহোর বিশ্বনাথের মন্দির

চতুর্ভুজ প্রভৃতির বহু মন্দির এখানে আছে। পাথরে খোদাই-করা দেবদেবী, গন্ধর্ব, নাগ, পৃথিবীর নরনারী, জীবজন্তু প্রভৃতির অগণিত প্রতিমূর্তি মন্দিরকে সুশোভিত করেছে। খাজুরাহোর মন্দির-গুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এরূপ অপূর্ব যে তা দেখে সারা পৃথিবীর দর্শকেরা অতি মাত্রায় বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে যায়। সমগ্র পৃথিবীতে এরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত শিল্পকর্ম আর কোথাও নেই।

॥ ভারতের অগণিত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ॥

যে-সব স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনের কথা



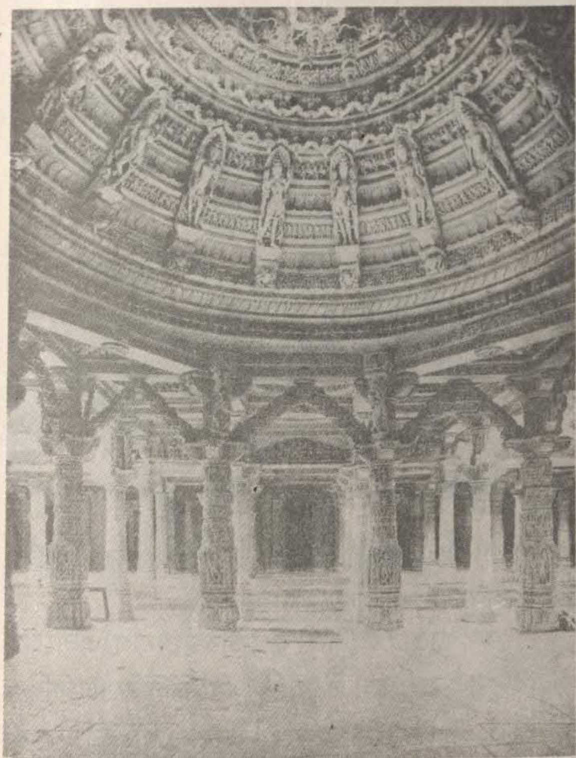
মাদুরার একটি মন্দির

জানানো হল, সে-সব ছাড়া আরো বহু স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভারতের নানা স্থানে অবস্থিত। পুনের পার্বতী মন্দির, হায়দ্রাবাদের হস্তিগুহা মন্দির, কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির, আবু পাহাড়ের



বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির

জৈন মন্দির, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরীর মন্দির, আগ্রার তাজমহল, সাসারামের শেরশাহের সমাধি,

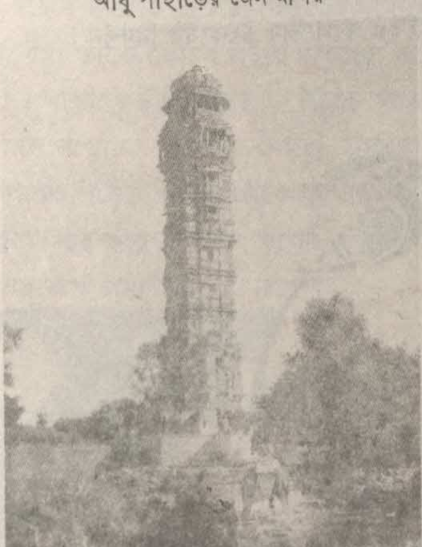


আবু পাহাড়ের জৈন মন্দির

বিজাপুরের গোল গম্বুজ, দিল্লীর কুতবমিনার, ফতেপুরসিক্রির বুলন্দ দরজা, ভাখরা নাঙ্গাল বাঁধ, হীরাকুদ বাঁধ, অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির, দেওঘরের নওলক্ষ মন্দির, তারাপীঠের মন্দির, রায়পুরের শিবের



আইহোলের দুর্গ-মন্দির



চিতোরের বিজয়স্তম্ভ



দেওঘরের নওলক্ষ মন্দির

চিতোরের বিজয়স্তম্ভ, পরেশনাথ পাহাড়ের জৈন মন্দির, শ্রবণবেলগোলার গোমতেশ্বর মূর্তি,



রায়পুরের শিবের মন্দির

মন্দির, আইহোলের দুর্গমন্দির, মোতি মসজিদ,



তারাপীঠের মন্দির

বিড়লা প্ল্যানেটেরিয়াম প্রভৃতি ভারতের স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মাত্র কয়েকটি নিদর্শন।

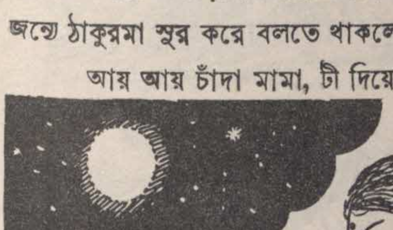
কলকাতার চ্যাটার্জী'স ইণ্টারন্যাশনাল, এভারেস্ট বিল্ডিং, ইনস্যুরেন্স ভবন, নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং, টাটা সেণ্টার, টেলিফোন ভবন, আয়কর ভবন, প্রভৃতি বহু বড় বড় বাড়ি তৈরী হয়েছে। এগুলি ভারতের স্থাপত্যের উৎকর্ষের নিদর্শন।

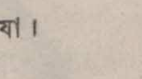


ছেলে ভুলোনো ছড়া

রাত হয়েছে। ছোট ছেলেটা কিছুতেই ঘুমোচ্ছে না। ঠাকুরমা তাকে কোলে শুইয়ে দাওয়ায় এসে বসলেন। আকাশে চাঁদ উঠেছে। চাঁদের আলো উঠোনে এসে পড়েছে, দাওয়ার উপরে, ঠাকুরমার গায়ের উপরেও পড়েছে। ছেলেটাকে ঘুমপাড়ানোর জন্যে ঠাকুরমা সুর করে বলতে থাকলেন—

আয় আয় চাঁদা মামা, টী দিয়ে যা,


আয় আয় চাঁদা মামা টী দিয়ে যা

চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।
মাছ কুটলে মুড়ো দেব,
ধান ভানলে কুঁড়ো দেব,
কালো গরুর দুধ দেব,

সোনার থালে ভাত দেব,
রাজার মেয়ে বিয়ে দেব।
চাঁদের কপালে চাঁদ টী দিয়ে যা।

ঠাকুরমার সুরেলা গলার ছড়া শুনতে শুনতে ছেলেটা ঘুমিয়ে পড়ল।

এইভাবে ছোট ছেলেমেয়েকে ঘুম পাড়াতে বা তাদের কান্না থামাতে পৃথিবীর সব দেশের মা-দিদিমা-ঠাকুরমারা সুর করে ছড়া বলে এসেছেন আজো বলেন।

সেইসব ছড়ার ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এলোমেলো ও অর্থহীন। কিন্তু ছেলেমেয়েদের উপর সে-সবের প্রচণ্ড প্রভাব। তারা ছড়া শুনতে

বা বলতে খুবই ভালবাসে। বাংলার পল্লী অঞ্চল থেকে শুরু করে শহরের অট্টালিকায় পর্যন্ত নানা ধরনের ছড়া চালু আছে। আবার নূতন করে বিভিন্ন কবিরা ছড়া তৈরি করে চলেছেন।

অনেক ছড়া কার যে রচনা তা জানা যায় না। কিন্তু বহুকাল থেকেই সেগুলি বাংলার সর্বত্র প্রচলিত। এই ছড়া শুনেই ছেলেমেয়েরা কান্না ভুলে যায়, ঘুমিয়ে পড়ে, অসংগত আবদার করা থেকে বিরত হয়।



॥ কয়েকটি বাংলা ছড়া ॥

(এক)

খোকা ঘুমল, পাড়া জুড়ল,
বর্গী এল দেশে।



খোকা ঘুমল, পাড়া জুড়ল

বুলবুলিতে ধান খেয়েছে,
খাজনা দেব কিসে ?
ধান ফুরল, পান ফুরল—
খাজনার উপায় কি ?
আর কটা দিন সবুর কর,
রসুন বুনেছি।

(দুই)

আঁটুল বাঁটুল শামলা সাঁটুল
শামলা গেছে হাটে,
শামলাদের মেয়েগুলো



শামলাদের মেয়েগুলো পথে বসে কাঁদে

পথে বসে কাঁদে।
আর কেঁদো না, আর কেঁদো না
ছোলা ভাজা দেব,
এবার যদি কাঁদ, তবে
তুলে আছাড় দেব।

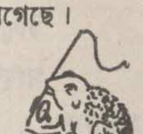
(তিন)

নোটন নোটন পায়রাগুলি
ঝোটন বেঁধেছে,



নোটন নোটন পায়রাগুলি ঝোটন বেঁধেছে

ওপারেতে দুটি মেয়ে
নাইতে নেমেছে।
দুই পারে দুই রুই কাতলা
ভেসে উঠেছে।
কে দেখেছে—কে দেখেছে?
দাদা দেখেছে।
দাদার হাতে কলম ছিল,
ছুড়ে মেরেছে—
উঃ! দাদা! বড্ড লেগেছে।



(চার)

খোকা গেল মাছ ধরতে
ক্ষীর নদীর কূলে,
ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে



ছিপ নিয়ে গেল কোলা ব্যাঙে
মাছ নিয়ে গেল চিলে।
খোকন বলে, পাখিটি
কোন্ বিলেতে চরে?
খোকা বলে ডাক দিলে
উড়ে এসে পড়ে।

(পাঁচ)

দোল্ দোল্ দোল্
কিসের এত গোল?
খোকা আসছে বিয়ে করে
সঙ্গে ছ'শ ঢোল।
থামলো ঢোলের রব,
খোকামণি ঘুমিয়ে প'ল,
শান্ত হল সব।

(ছয়)

তাই তাই তাই,
মামার বাড়ি যাই।
মামার বাড়ি ভারী মজা,
কিল চড় নাই।
মামা দিল দৈ সন্দেশ,
গোয়ালে বসে খাই।
মামী এল ঠেঙা নিয়ে,
প্রাণ নিয়ে পালাই।

(সাত)

খোকন খোকন করে মায়,
খোকন গেল কাদের নায়?
সাতটা কাকে দাঁড় বায়,
খোকন রে, তুই ঘরে আয়।
খোকন গেছে কোন্‌খানে?
শতদলের মাঝখানে।
সেখানে খোকন কি করে?
ডুব দিয়ে দিয়ে মাছ ধরে।

(আট)

ঘুমোও খোকন, যাবে যদি
তেপান্তরের মাঠে,
মাঠ পেরিয়ে যাবে তুমি
তিরপুর্নির ঘাটে,
ঘাট পেরিয়ে যাবে তুমি
অচিন রাজার দেশে,

পৌঁছে যাবে রাজপুরীতে
রাজার ছেলের বেশে।
রাজকন্যা নিয়ে সাথে
ফিরবে আপন বাড়ি।
দেব তারে মোতির মালা,
ময়ূরকণ্ঠী শাড়ি।



ঘুমোও খোকন
ঘুমোও এখন চুপটি করে
ঘুমিয়ে পড় তবে,
ডেকে দেব কালকে তোমায়
যখন সকাল হবে।

(নয়)



মাছের লেজে ঝাপটা লাগে,
শালুক ওঠে দুলে,
রোদ পড়েছে নাচনমণির
ভিজে চিকন চুলে।
কোথায় ঘাটের কাটল থেকে
ডাকল কোলা ব্যাং;
খড়গপুরের ঢাকে ঢোলে
বাজল ড্যাডাঙ ড্যাঙ।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(দশ)

বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর,
বাজছে মাদল গামুর গুমুর।
ডাল চাল আর মক্কা মসূর
ফোঁটায় ফোঁটায় নামে,
আকাশ থেকে নামে,
জলের সাথে নামে,
ঘরে ঘরে নামে,
টাপুর টুপুর গামুর গুমুর,
গামুর গুমুর টাপুর টুপুর।

—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(এগার)



নীল আকাশে সূয্যি মামা
ঝলক দিয়েছে।
সবুজ মাঠে নতুন পাতা
গজিয়ে উঠেছে।
পালিয়েছিল সোনার টিয়ে,
ফিরে এসেছে।
ক্ষীর নদীটির পারে খোকন
হাসতে লেগেছে।

—দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

(বার)

কমলাফুলি, কমলাফুলি, কমলালেবুর ফুল !
কমলাফুলির বিয়ে হবে, কানে মোতির দুল !
কমলাফুলির বিয়ে,
দেখতে যাবে, ফলার খাবে চন্দনা আর টিয়ে।
কোথায় থাক কমলাফুলি ? "সিলেট আমার ঘর"।
টিয়ে বলে "দেখতে যাব, পাখায় দিয়ে ভর"।

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

(তের)

একের পিঠে দুই,
চৌকি চেপে শুই।
গোলাপ চাঁপা জুঁই,
ইলিশ মাগুর রুই,
পোঁটলা বেঁধে থুই,
হিনচে পালং পুঁই।
শান-বাঁধানো ভুঁই।
গোবর জলে ধুই।
কাঁদিস কেন তুই ?

—সুকুমার রায়

(চৌদ্দ)

"কী খেয়েছ ? কী খেয়েছ ?
বল আমায় সত্য।"
"আর তো কিছুই যায় না পাওয়া,
তাই খেয়েছি আজব খাওয়া—
কাঁঠালের আমসত্ত্ব !"

"খেলে কিসে ? খেলে কিসে ?
বল আমায় খাঁটি।"
"বাসন যত ছিল ঘরে
বিকিয়ে গেছে ওজন দরে,
বাকি ছিল খাবার তরে
সোনার পাথর বাটি।"

—অন্নদাশংকর রায়

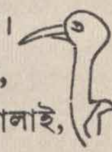
(পনের)

হরেক ব্যামো এ দুনিয়ার
কোন্ ওষুধে সারবে ?
জলদি হদিস না মিললে
জরুর নাড়ি ছাড়বে।

পিঁপড়েরা সব ক্ষুদে ক্ষুদে,
হাতিরা সব মস্ত।



কাক কি কোকিল কালো এবং
বকেরা ধোপদস্ত।



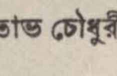
চালিয়ে রোলার করব সমান,
এক সাথে সব ঢালাই,
সবাই হ'লে একই মাপের
ঘুচবে সকল বালাই।

—প্রেমেন্দ্র মিত্র

(ষোল)

তাইরে নাইরে তাইরে,
তেল আভিবে তেল মেলে না,
বেলফাস্টে বেল নাইরে।
তাইরে নাইরে নাইরে।

তাইরে নাইরে তাইরে,
জাম্বিয়াতে জাম মেলে না,
আম্বালায় আম নাইরে।
তাইরে নাইরে তাইরে।



তাইরে নাইরে তাইরে,
কলকাতাতে কল চলে না,
ব্যাংককে ব্যাং নাইরে
তাইরে নাইরে নাইরে।



—অমিতাভ চৌধুরী

(সতের)

গোয়াড়ির গদাধর
করে গেঁয়ো-যাত্রা,
গদাঘাতে ধরাশায়ী

শশধর সাঁতরা।
অভিনেতা অতি ওঁচা
চুলগুলি খোঁচা খোঁচা,
ছুয়েরি গায়ের রঙ্
যেন আলকাতরা।
গড়েছে সখের দল
নেই তাল-মাত্রা !!

—হরেন ঘটক

॥ হিন্দী ছড়া ॥

চন্দা মামা দূরকে
পুএ পাকায়েঁ পুরকে।
আপ খায়েঁ থালী মেঁ,
বচ্চো কো দেঁ প্যালীমে।
প্যালী গয়ী টুট,
চন্দা গয়া রুঠ।

(বাংলা অনুবাদ)

চাঁদা মামা অনেক দূর,
বানান পিঠে দিয়ে পুর।
নিজে খান থালাতে,
ছেলেকে দেন পেয়ালাতে।
পেয়ালাটা ভাঙ্গল,
চাঁদা মামা রাগল।





চাঁদা মামা অনেক দূর

॥ গুজরাটী ছড়া ॥

মামান্থ ঘর কেটলে ?
দীবো জুড়ে এটলে।
দীবো তো মেঁ দীঠো,
মামো লাগে মীঠো।

(বাংলা অনুবাদ)

মামার ঘর কোথায় ?
জ্বলছে আলো যেথায়।
আলোয় দৃষ্টি পড়ল,
মামাকে মিষ্টি লাগল।

॥ মারাঠী ছড়া ॥

য়ে রে য়ে রে পাউসা,
তুলা দেতো প্যায়সা।
প্যায়সা ঝালা খোটা,
পাউস আলা মোটা।
পাউস পড়লা ঝিম ঝিম ঝিম,
অঙ্গন ঝালে ওলো চিম্ব,
পাউস পড়লা মুষল ধার,
রাস ঝালে হির বেগার।

(বাংলা অনুবাদ)

আয়রে আয়রে বর্ষা,



আয়রে আয়রে বর্ষা
তাকে দে তো পয়সা।
মেকী সব পয়সা,
জোরে এল বর্ষা।
ঝিম ঝিম বিষ্টি ঝরে,
উঠানটা জলে ভরে।
মুষল ধারে বৃষ্টি ঝরে,
সবুজ ক্ষেত জলে ভরে।

॥ তামিল ছড়া ॥

তামিল দক্ষিণ ভারতের একটি ভাষা। প্রধানতঃ তামিলনাড়ু রাজ্যের লোক এই ভাষায় কথা বলে। তামিল ছড়ার একটি বাংলা অনুবাদ ঃ—

থপথপিয়ে খোকনমণি চলে,
চলতে চলতে সারা শরীর টলে।
হাত দুখানা দোলে,
গলায় হার ঝোলে,
দোকানী গো, দোকান খোল,



থপথপিয়ে খোকনমণি চলে

দোকানের ঝাঁপটা তোল।
খাবার খাবে খোকন—
মিঠাই মনের মতন।
খোকন পথে চলছে,
হাত দুখানা দুলছে।



॥ জাপানী ছড়া ॥

এখানে যে জাপানী ছড়ার অনুবাদ দেওয়া হল, সেই ছড়াটি অনেক বড়। তার মাত্র কয়েক ছত্রের বাংলা অনুবাদ ঃ—

ঘুমো আমার সোনার খোকা,
ঘুমো মায়ের বুকে,
আকাশ জুড়ে উঠল তারা,
ঘুমোরে তুই সুখে।



হাত পা নেড়ে কান্না কেন ?
কান্না কেন এত ?
চাঁদ উঠেছে, ঘুমোরে তুই
সোনার চাঁদের মতো।
ইত্যাদি

॥ মাওরি জাতির ছড়া ॥

অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণে নিউ জীল্যাণ্ড দ্বীপপুঞ্জ, অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহর থেকে ১৯৩২ কিলোমিটার দূরে। নিউ জীল্যাণ্ডের আদিবাসীদের নাম মাওরি। তাদের একটি ছড়ার বাংলা অনুবাদ দেওয়া হল। (জাপানী ছড়া ও মাওরি ছড়া দুটিরই বাংলা অনুবাদ কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের!।

খোকা আমার, খোকা আমার,
'তুল' তুলসীর পাতা।
বেনামূলের গুচ্ছ আমার,
রাখ্ রে বুকে মাথা।
মৃগনাভির কৌটো আমার,
খোকা ঘুম যায়।
গুগগুলো ধুনোর আবেশ
খোকার চোখে আয়।



॥ নানা দেশের ছড়া ॥

ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি সব দেশেই ছেলে-ভুলানো ছড়া প্রচলিত। সব দেশের ছেলেমেয়েই ছড়া শুনতে বা বলতে ভালবাসে। বইয়ের পাতায় ছবি আর ছড়া। প্রায় সব স্কুলেই ছড়ার বই-এর মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা ছড়া পড়ে, মুখস্থ করে। এই সব ছড়া কবে কে যে রচনা করেছিল, তা জানা যায় না। বেশির ভাগ ছড়াই অর্থহীন, এলোমেলো ভাষায় রচিত।.

ইংরেজী ছড়াগুলোকে প্রধানতঃ বলে নার্সারী রাইমস্ (nursery rhymes) ও Mother Goose's rhymes (গুজ্ ঠাকরুনের ছড়া)।

এই Mother Goose-এর আসল পরিচয় সঠিকভাবে জানা যায় না। কেউ বলে তাঁর প্রকৃত নাম Queen Goosefoot। কিন্তু তা অনুমান মাত্র। ফ্রান্সে গুজ্ ঠাকরুনের ছড়ায় দেশ ভরে গেছে।

ইংল্যাণ্ডে মাদার গুজেস মেলডিজ (Mother Goose's melodies) নামে একটা ছড়ার বই প্রকাশিত হলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে খুব সাড়া পড়ে গেল। তারপর থেকে গুজ্ ঠাকরুনের ছড়া বলে অনেক ছড়ার বই বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের স্কুলগুলিতে পড়া হতে থাকল। তারপর সেই সব ছড়া বা সেই ধরনের নানা ছেলে-ভুলানো ছড়া কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে চালু হল।

মেক্সিকো, ব্রাজিল, চিলি, আর্জেন্টিনা, পেরু, বলিভিয়া, অস্ট্রেলিয়া, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, চীন, ফিলিপিন্‌স্, মঙ্গোলিয়া, ইরান, ইরাক প্রভৃতি পৃথিবীর সব দেশেই ছড়া চলে।

আমেরিকার রেডইণ্ডিয়ান, ভারতের সাঁওতাল, নাগা, কুকী, আফ্রিকার বুশম্যান, নিগ্রো প্রভৃতি অনগ্রসর জাতির মধ্যেও বহু ছড়ার প্রচলন আছে। সাঁওতালদের ছড়ার ভাব ও ভাষা বেশ উন্নত ধরনের ও মধুর। মঙ্গোলিয়ার পার্বত্যজাতির মধ্যে বহুকাল আগে থেকেই ছড়া প্রচলিত।

এক সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান ইংরেজদের দখলে ছিল। ইংরেজরা সেই সব জায়গা থেকে সরে গেছে। কিন্তু ইংরেজী ভাষা রয়ে গেছে। তাই ইংরেজী ছড়াও এই সব দেশে ব্যাপকভাবে প্রচলিত।

Jack and Jill
Went up the hill
To fetch a pail of water ;
Jack fell down,
And broke his crown,
And Jill came tumbling after.

(বাংলা অনুবাদ)

জ্যাক জিল দুজনে
উঠল গিয়ে পাহাড়ে
বালতি খানেক জল আনবে বলে,



জ্যাক গেল পড়ে।
ভাঙল তার চাঁদি
জিল গড়াতে গড়াতে পিছনে এল চলে।

কয়েকটি প্রসিদ্ধ ইংরেজী ছড়ার প্রথম ছত্র—

(1) Humpty Dumpty sat on a wall ;
(2) Baa ! Baa ! black sheep ;
(3) Higgeldy, Piggeldy, my black hen ;
(4) Hickery Dickery, Dock ;
(5) Marry had a little lamb ;
(6) Ding, dong, bell ;
(7) Handy, Spandy, Jack-a-dandy ;
(8) Pussy Cat, Pussy Cat ;

ইত্যাদি।

॥ রাশিয়ান ছড়া ॥

একটি রাশিয়ান ছড়ার বাংলা অনুবাদ—

খুকুরানী গেল কোথায় ?
সবুজ ঘন ঘাস যেথায়।
সেথায় দুলছে কত ফুল,
যেন খুকুর ঝাঁকড়া চুল।
আপন মনে রাঙা সাঁঝে
বোনে জামা বনের মাঝে।



॥ জার্মান ছড়া ॥

(বাংলা অনুবাদ)

সবাই জানে ভালো করে, আছে আমারো জানা,
চাঁদা মামার কাছে আছে একটি ভেড়ার ছানা।
চাঁদা মামা উঁকি মারে ছাদের কিনারায়,
উঁচুতে থাকে, পারবে নাক' ছুঁতে তায়।
তাকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ তারার হাসি ফোটে,
কেউতো সেথায় ঝগড়াবিবাদ করে নাকো মোটে।

॥ ফরাসী ছড়া ॥

লক্ষ্মী ভাই,
কাঁদতে নাই।
মায়ের পিঠে
বড় মিঠে।
বাবার মিঠাই
খাবে ভাই।
কান্না থামাও
খেতে যাও।



রঙ্গালয়

নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী করে, কথা বলে কোন কাহিনীর রূপায়ণকে বলে অভিনয়। উঁচু মঞ্চ বা স্টেজের উপর অভিনয় হয়। তার সামনে থাকে প্রেক্ষাগৃহ বা অডিটোরিয়াম (auditorium)। সেখানে বসে দর্শক বা শ্রোতারা অভিনয় দেখে বা শোনে। যেস্থানে এই অভিনয় হয় তার নাম থিয়েটার (Theatre)। থিয়েটার শব্দের অর্থ রঙ্গালয়।

॥ যবনিকা ও দৃশ্যপট ॥

মঞ্চের ঠিক সামনে থাকে একটা ঝোলানো পর্দা বা যবনিকা। অভিনয় শুরু হলে সেই যবনিকা উপরে তুলে নেওয়া হয় বা পাশে সরিয়ে দেওয়া হয়। আর থাকে নানা দৃশ্য-আঁকা পট যাকে বলা হয় দৃশ্যপট বা সীন (scene)।

॥ কলকাতার রঙ্গালয় ॥

কোন লম্বা বড় ঘরেও অভিনয় হয়, উন্মুক্ত স্থানেও অভিনয় হয়। অভিনয়গৃহ অর্থাৎ থিয়েটার বা রঙ্গালয় বর্তমানে পৃথিবীর সব উন্নত দেশেই আছে। কলকাতায় 'স্টার থিয়েটার', 'রঙমহল', 'বিশ্বরূপা', 'রঙ্গনা', 'কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ', 'প্রতাপ মঞ্চ', 'তপন থিয়েটার', 'সারকারিনা', 'মিনার্ভা থিয়েটার', 'নেতাজী মঞ্চ' প্রভৃতি বহু রঙ্গালয় আছে।

॥ ভারতীয় নাটকের উপর গ্রীক প্রভাব ॥

ভারতে অতি প্রাচীনকালেও অভিনয় হত। যে-সব সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হত, সে-সবের মধ্যে অনেক নাটক বর্তমানে পাওয়া যায় না। যে নাটকগুলির নাম আমরা জানি সেগুলির উপর গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার (Alexander the Great, ৩৫৬-৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে উত্তর ভারতে আসেন। সেই সময়ে ও তার কিছু পরে উত্তর

ভারতের নানা স্থানে গ্রীক নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়।

৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আলেকজাণ্ডার উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় ঈজিপ্টে যে নগরীটির প্রতিষ্ঠা করেন, তার নাম আলেকজাণ্ড্রিয়া (Alexandria)। এই নগরীর সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল। আলেকজাণ্ড্রিয়া ছিল সেকালে গ্রীক শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র। সেখানে নাটক অভিনয়ের সুব্যবস্থা ছিল। সেখান থেকে গ্রীক নাট্যাভিনয়ের প্রভাব ভারতীয় সংস্কৃত নাটক অভিনয়ের উপর এসে পড়ে। উত্তর ভারতের নাট্যাভিনয়ের ধারা ক্রমশঃ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে গ্রীক নাট্যাভিনয়ের প্রভাব ভারতীয় নাটকের অভিনয়ের উপর পড়বার বহু আগেই ভারতের নিজস্ব নাটক-রচনা ও অভিনয়ের ধারা বর্তমান ছিল।

॥ প্রথম নাটক রচনা ও অভিনয় ॥

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের অভিমত, গ্রীসে প্রথম নাটক-রচনা ও অভিনয় শুরু হয়। প্রায় তিন হাজার বছর আগে গ্রীক পৌরাণিক দেবতা ডাইওনিসাস (**Dionisus**) দেবতার সম্মানে নানা উৎসবের অনুষ্ঠান হত। নাচ গান হই-হল্লার মধ্য দিয়ে সেই সব অনুষ্ঠান হত। তখন থেকেই অভিনয়ের আরম্ভ। সেই সব অভিনয় ছিল মিলনান্তক। মিলনান্ত নাটক অর্থাৎ কমেডি (comedy) রই ব্যবস্থা হত। বিয়োগান্ত নাটক বা ট্র্যাজেডি (tragedy)-র প্রচলন শুরু হয় অনেক পরে। অবশ্য বর্তমান কালের বিয়োগান্ত নাটকের অভিনয়ের মতো অভিনয় তখন হত না। সেগুলি ছিল করুণ মর্মস্পর্শী স্তবোচ্চারণ। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বর্তমান কালের ট্র্যাজেডির সৃষ্টি হয়।

॥ গ্রীসের রঙ্গমঞ্চ ॥

যতদূর জানা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীতে মধ্য গ্রীসের মেগালোপলিস (Megalopolis)-এ প্রথম রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয়। তার উচ্চতা ছিল ২৩ মিটার। ১৭ হাজার লোকের সেই রঙ্গমঞ্চে অভিনয়



অ্যাথেন্সের অ্যাক্রপলিস

দেখার ব্যবস্থা ছিল। অ্যাথেন্সের অ্যাক্রপলিস (Acropolis) দুর্গের পাশে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে যে রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হয় সেটি সুপ্রসিদ্ধ। তাকে বলা হত ডাইওনিসাসের রঙ্গালয়। সেই রঙ্গালয় বর্তমান কালের মতো ছিল না। উন্মুক্ত স্থানে অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। দর্শকেরা পাহাড়ের গায়ে কাটা পাথরের আসনে বসত। তাতে ৪০ হাজার দর্শক বসতে পারত।



॥ মুখোশ পরে অভিনয় ॥

সাধারণতঃ প্রথম দিকে পুরুষ অভিনেতা মুখোশ পরে নানা ধরনের বেশ পরে অভিনয় করত। কোন অভিনেত্রী অভিনয় করত না। পুরুষ অভিনেতাই অভিনেত্রীর বেশে অভিনয় করত।



মুখোশ পরে অভিনয় করতে নামবার আগে ছাত্রদের সাজসজ্জা



যে ধরনের মুখোশ পরে অভিনয় করা হত

॥ সব চেয়ে বড় অ্যাম্পিথিয়েটার ॥

সব চেয়ে বড় অ্যাম্পিথিয়েটার (ampi-theatre) বা উন্মুক্ত অভিনয়স্থান ক্লেভিয়ান অ্যাম্পিথিয়েটার বা রোমের কলোসিয়াম। এটির দৈর্ঘ্য ১৮৭ মিটার ও সর্বাপেক্ষা অধিক প্রস্থ ১৭৫ মিটার। ৮৭ হাজার লোকের আসন-সমন্বিত এই বিরাট অ্যাম্পিথিয়েটার ৫ একর বা ২ হেক্টার জায়গায় অবস্থিত।



॥ গৃহমধ্যের রঙ্গালয় ॥

ইটালীতে প্রথম ঘরের মধ্যে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। Andrea di Pietro, ওরফে Palladio (১৫০৮-৮০ খ্রী.) পরলোকগমনের তিন মাস আগে যে রঙ্গালয়ের নির্মাণ-কার্য আরম্ভ করেন, যেটি তাঁর ছাত্র Vicenzo Scamozzi (১৫৫২-১৬১৬ খ্রী.)

১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ করেন, সেটি পৃথিবীর প্রথম গৃহমধ্যের রঙ্গালয় (indoor theatre)। তার নাম Teatro Olimpico। সেটি ইটালীর Vicenza-য় অবস্থিত।

॥ ইংল্যাণ্ডের রঙ্গালয় ॥

লণ্ডনের ফিনসবেরি ফীল্ডস (Finsbury Fields)-এর নিকটে ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত James Burbage's 'দ্য থিয়েটার' লণ্ডনের প্রথম রঙ্গালয়। লীড্‌সের দ্য সিটি ভ্যারাইটিজ মিউজিক হল ১৭৬২ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়। ব্রিস্টলের 'দ্য রয়াল' থিয়েটার-এর ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। থিয়েটারটি ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ মে জনসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত হয়।

আগেকার দিনে ইংল্যাণ্ডে ধর্মীয় বিষয় নিয়ে অভিনয় হত। যীশু খ্রীষ্টের জীবনের নানা কাহিনী নিয়ে রচিত নাটক অভিনীত হত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে অভিনয় বর্তমানকালের মতো হত না। কোথাও গির্জার সিঁড়িতে, কখনও ভ্রাম্যমাণ ঘোড়ার গাড়ির উপরে নির্মিত মঞ্চে, কোথাও খোলা মাঠে অভিনয় হত। ভূতপ্রেত, স্বর্গনরক, দৈত্যদানব প্রভৃতির নানা দৃশ্য, কাণ্ডকারখানা, লম্ফঝম্প ইত্যাদি দেখানো হত।

ক্রমশঃ শুধু ধর্মীয় ব্যাপারে অভিনয় করা ছেড়ে দিয়ে নানা সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে রচিত নাটকের অভিনয় হতে থাকে। বহু নাট্যকারের উদ্ভব হতে থাকে। তাঁদের নাটকের স্ত্রী-চরিত্রে অভিনেত্রীরা অভিনয় করতে থাকে। নানাস্থানে স্থায়ী ও সুদৃশ্য রঙ্গালয় গড়ে ওঠে।

স্পেন, জার্মানি, রাশিয়া, ইটালী প্রভৃতি দেশের বহু নাট্যকার বিভিন্ন সময়ে বহু নাটক রচনা করলেন। সেই সব নাটকের বেশ সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় দর্শকদের মোহিত করে রাখতে লাগল।

॥ স্পেনের রঙ্গালয় ॥



স্পেনে প্রথম দিকে উন্মুক্ত স্থানে, ঘেরা বাড়ির উঠানে অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। পরে স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। ইংল্যাণ্ডেও সেইরকম খোলা জায়গায় অভিনয় হতে হতে ছোট বড় রঙ্গালয় নির্মিত হয়। বর্তমানে বহু সুদৃশ্য সুগঠিত রঙ্গালয় অগণিত দর্শক ও শ্রোতার মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করেছে।

॥ ইটালীর নাট্যাভিনয় ॥

ইটালীতে আগেকার দিনে নাট্যকারগণ যে-সব নাটক রচনা করতেন সেগুলির তিনভাবে অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। রঙবেরঙের ও নানা আকৃতির মুখোশ পরে অভিনয়, খুব বেশী গান-বাজনার মধ্য দিয়ে অভিনয় ও সার্কাসের ভাঁড়েদের মতো হাস্যকর ব্যাপারের অবতারণা করে অভিনয়—এই তিন প্রকার অভিনয়ের ব্যবস্থা হত। ক্রমশঃ নাটক-রচনা ও নাট্যাভিনয়ের উন্নতি ঘটতে লাগল। অন্যান্য দেশের উন্নত নাট্যাভিনয় সারা ইটালীকে মাতিয়ে তুলল।

॥ জার্মান নাট্যকার ॥

জার্মানিতে বর্তমানে বহু উচ্চশ্রেণীর নাট্যকারের উদ্ভব হয়েছে। তাঁদের নাটক বহু অত্যুৎকৃষ্ট রঙ্গমঞ্চে প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দ্বারা অভিনীত হয়ে থাকে। এই সব অভিনেতা-অভিনেত্রী নাট্যাভিনয় করতে করতে বহু পৃথিবী-প্রসিদ্ধ চলচ্চিত্রে অভিনয় করে থাকেন। চতুর্দশ শতাব্দী থেকে বহু জার্মান নাট্যকার বহু নাটক রচনা করে আসছেন। হ্যান্‌স্ স্যাক্‌স, গ্যেটে, শিলার, সুতারমান প্রভৃতি নাট্যকারের রচিত নাটকে জার্মানির নাট্য সাহিত্য সুসমৃদ্ধ।

॥ রাশিয়ান নাট্যকার ॥

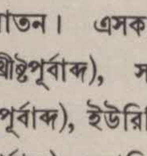
পুশকিন, গোগোল প্রভৃতি রাশিয়ান নাট্যকারের নাটকসমূহ অভিনয়কালে মঞ্চশিল্প, সাজপোশাক, পাদপীঠের আলো, ফোকাসিং প্রভৃতি ব্যবস্থার প্রবর্তন হলে রঙ্গালয়গুলি অধিকসংখ্যক দর্শককে আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। এইরূপ ব্যবস্থার প্রবর্তন শুধু রাশিয়া কেন, জার্মানি, ইটালি, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশেও হয়েছে।

। ফ্রান্সের নাটক রচয়িতা ॥

ফ্রান্সে পিয়েরে কর্নেইল (Pierre Corneille, ১৬০৬-১৬৮৪ খ্রী.), জঁা রাসিন (Jean Racine, ১৬৩৯-১৬৯৯ খ্রী.), মলিয়ের (Jean Moliere, ১৬২২-৭৩ খ্রী.) প্রভৃতি নাট্যকারের আবির্ভাবে বহু সুদৃশ্য রঙ্গালয়ে বহু নাটকের অভিনয় হতে থাকে।

॥ গ্রীক নাট্যকার ॥

গ্রীক নাট্যসাহিত্য বহু পুরাতন। এসকাইলাস (Aeschylus, ৫২৫-৪৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), সফক্লিজ (Sophocles, ৪৯৫-৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), ইউরিপিডিজ (Euripides, ৪৮০-৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), অ্যারিস্টফ্যানিজ (Aristophanes, ৪৫৪-৩৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রভৃতি বিশ্ববিশ্রুত নাট্যকারগণ অজস্র কমেডি ও ট্র্যাজেডি রচনা করে দর্শক ও শ্রোতাদের বিমোহিত করেছেন। অবশ্য, অন্যান্য বহু দেশ বর্তমান গ্রীক নাট্যসাহিত্যকে পিছনে ফেলে রেখে উৎকর্ষের চরম শিখরে উন্নীত হয়েছে।



॥ শেকস্‌পীয়ার ॥

শেক্‌স্‌পীয়ারকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নাট্যকার বলা হয়। তাঁর নাটক সারা পৃথিবীর নানা ভাষায় অনূদিত হয়ে অভিনীত হয়ে থাকে। যে-সব দেশে ইংরেজী ভাষা চলে সে-সব দেশে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকসমূহ তাঁর লেখা ইংরেজী ভাষাতেই অভিনীত হয়ে থাকে। কিন্তু শেক্‌স্‌পীয়ারের আমলে রঙ্গমঞ্চের অবস্থা বর্তমানকালের মতো তেমন উন্নত ছিল না। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ইংল্যাণ্ডের রঙ্গমঞ্চ বর্তমানকালের মতো সুদৃশ্য, সুশৃঙ্খল ও সুরুচিসম্মত হয়ে দাঁড়ায়।

॥ ইংল্যাণ্ডের নানা থিয়েটার ও নটনটী ॥

দ্য রয়্যাল শেক্‌স্‌পীরিয়্যান কোম্পানি, দ্য ন্যাশনাল থিয়েটার, দি ইংলিশ স্টেজ কোম্পানি, দ্য মারমেড থিয়েটার, দ্য ন্যাশনাল ইউথ থিয়েটার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বেকেট, লিভিংস, পিথার, সণ্ডারস্‌, হুয়ীটিং, ব্রেখ্‌ট্‌, পিটার ব্রুক, বেন জনসন, ওয়েকস্টার, স্ট্রিণ্ডবার্গ, ও' নীল, চার্লস উড, অসবোর্ন, ডি. এইচ. লরেন্স, মাইকেল হেস্টিংস প্রভৃতি নাট্যকারদের নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। সিবার (Colley Ciber, ১৬৭১-১৭৫৭ খ্রী.), গ্যারিক (David Garrick, ১৭১৭-৭৯ খ্রী.), সিডন্‌স্‌ (Mrs. Sara Siddons, ১৭৫৫-১৮৩১ খ্রী.) প্রভৃতি অভিনেতা-অভিনেত্রী অভিনয়ে বিপুল যশ অর্জন করেন।

॥ নানাদেশের নাট্যকার ॥

বেলজিয়ামের মেটারলিঙ্ক (Count Maurice Maeterlinck, ১৮৬২-১৯৪৯ খ্রী.), ইংল্যাণ্ডের পিনেরো (Arthur Wing Pinero, ১৮৫৫-১৯৩৪ খ্রী.), নরওয়ের ইবসেন (Henrik Johan Ibsen, ১৮২৮-১৯০৬ খ্রী.), আয়ার্ল্যাণ্ডের ইয়েট্‌স্‌ (William Butler Yeats, ১৮৬৫-১৯৩৯ খ্রী.), বিখ্যাত আইরিশ নাট্যকার বার্নাড শ' (George



রঙ্গমঞ্চে জর্জ বার্নাড শ'র নাটক পিগম্যালিয়নের অভিনয়ের একটি দৃশ্য

Bernard Shaw, ১৮৬৫-১৯৫০ খ্রী.) প্রভৃতি নাট্যকারের কালজয়ী নাটক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে অভিনীত হয়ে নাট্যশিল্পের অভূতপূর্ব উৎকর্ষ সাধন করেছে।

।। হলিডে অন আইস ।।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে Morris Chalfen বরফের উপর নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম হলিডে অন আইস প্রোডাকসন ইঙ্ক। এই প্রতিষ্ঠান পৃথিবীর ৭৫টি দেশে বরফের উপর নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। বৎসরে ২ কোটি দর্শক ৪ কোটি ডলার ব্যয়ে অভিনয় দেখে।

।। সব চেয়ে বড় রঙ্গমঞ্চ ।।

সব চেয়ে বড় রঙ্গমঞ্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত নেভাদার Ziegfeld Room Reno। এতে ৮০০টি স্পট লাইট আছে। ২টি ১৯.১ মিটার পরিধির ঘূর্ণায়মান টেবিল আছে। তিনটি প্রধান লিফট দিয়ে ১২০০ শো গার্ল (Show girl) উপরে যেতে পারে।

॥ বাংলায় নাট্যাভিনয়ের সূচনা ॥

১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুরের উদ্যানে প্রথম বাঙালীরা নাট্যাভিনয়ের সূচনা করে। কিন্তু ইংরেজী নাটকের অভিনয় নয়, বাংলা নাটকের অভিনয় হয় বাগবাজারের নবীন বসুর বাড়িতে। বই-এর নাম 'বিদ্যাসুন্দর'। কিন্তু অভিনয়ের কোন মঞ্চ বা সীন ছিল না। সাধারণ গাছতলাতেই অভিনয় হয়।

তার পরে কলকাতার আশেপাশে অনেক জায়গায় নাট্যাভিনয় হয়। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইংরেজী ও সংস্কৃত নাটকের অভিনয় হত। এ সব ক্ষেত্রেও বাঁধা রঙ্গালয় ছিল না।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের (নাটুকে রামনারায়ণের) 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটক চড়ক-

ডাঙ্গার জয়রাম বসাকের বাড়িতে অভিনীত হয়। অভিনয় দেখতে এত দর্শক উপস্থিত হয়েছিল যে অভিনয়স্থল পূর্ণ হয়ে গিয়েও বহু লোককে ফিরে যেতে হয়।

॥ হেরাসিম লেবেডফ ॥

হেরাসিম লেবেডফ একজন রুশীয় বণিক। তিনি তাঁর প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গলী থিয়েটারে ১৭৯৫ সালে সর্বপ্রথম বাংলা নাটকের অভিনয় করান। নাটকটির নাম ছিল 'ছদ্মবেশ'। নাটকটি ইংরেজী থেকে অনুবাদ করা। তাঁর বেঙ্গলী থিয়েটার ছিল বিদেশীয় ধরনের রঙ্গালয়।

॥ প্রথম জাতীয় নাট্যশালা ॥

কলকাতার নাট্যপ্রিয় বহু মনীষী মিলে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বেলগাছিয়ায় একটা রঙ্গালয় স্থাপন করেন। তার নাম ছিল 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'। এইটিই বাংলার প্রথম জাতীয় নাট্যশালা। এতে যে নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় তার নাম 'রত্নাবলী'। নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন।

॥ প্রথম পেশাদারী রঙ্গালয় ॥

জোড়াসাঁকোর মধুসূদন দত্তের বাড়িতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় হয়। অস্থায়ী মঞ্চে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়। এইটিকে কলকাতার প্রথম পেশাদারী রঙ্গালয় বলা হয়। যে সংস্থার উদ্যোগে অভিনয়ের ব্যবস্থা হয়, তার নাম ন্যাশনাল থিয়েটার।

এই থিয়েটার স্থাপনে অংশ গ্রহণ করেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী (১২৫৮-১৩১৫ বঙ্গাব্দ), নাট্যাচার্য অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রী.), নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, অবিনাশচন্দ্র



অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী

কর, মহেন্দ্র বসু, মতিলাল শূর প্রভৃতি। সংস্থার সভাপতি ছিলেন বেণীমাধব মিত্র। অমৃতলাল বসু, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী ও আরো অনেকে অভিনয় করেন।

নীলদর্পণের অভিনয় জনসাধারণের প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেছিল। কিন্তু দলাদলির জন্যে ন্যাশনাল থিয়েটার বন্ধ হয়ে যাবার উপক্রম হলে মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ (১৮৪০-১৯১১ খ্রী.) ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২ খ্রী.) ১৮৭৩ সালে এর পরিচালন-ভার গ্রহণ করেন।

শিশিরকুমারের প্রেরণায় এই থিয়েটারে 'ভারত-মাতা' নামে একটি রূপকনাট্যের অভিনয় হয়। শিশিরকুমার অবশ্য নানা কারণে থিয়েটারটির সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট থাকতে পারেন নি।



অমৃতলাল বসু

॥ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥

গিরিশচন্দ্র ঘোষ ছিলেন বাংলার প্রখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা। ('সাহিত্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

॥ ইংরেজীতে নাট্যাভিনয় ॥

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে সাহেবরা ভারতে যে থিয়েটার স্থাপন করেন, তার নাম 'প্লে হাউস'। ১৮৮৭ সালে 'মিসেস ব্রিস্টোর থিয়েটার' নামে রঙ্গালয়ে যে নাট্যাভিনয় হত, তা সবই ইংরেজীতে।

॥ সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ॥

গিরিশচন্দ্রের পর তাঁর পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০ খ্রী.) অতি উচ্চদরের অভিনেতা ছিলেন। কিশোর বয়সে তিনি এমারেল্ড থিয়েটারে অভিনয় করেন। তিনি পিতার মৃত্যুর পর মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার হন। পরে তিনি মনোমোহন থিয়েটারের অধ্যক্ষ হন। তিনি 'দানীবাবু' নামে খ্যাত।

॥ অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ॥

অমরেন্দ্রনাথ দত্ত (১৮৭৬-১৯১৬ খ্রী.) ছিলেন একজন নিপুণ নাট্যকার ও অভিনেতা। তিনি রঙ্গালয় নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রবর্তন করেন। রঙ্গমঞ্চ সম্বন্ধে এটিই প্রথম সাময়িক পত্র। ক্লাসিক থিয়েটারের তিনিই প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর রচিত 'নির্মলা', 'জীবনে-মরণে' প্রভৃতি নাটক সুপ্রসিদ্ধ।

কয়েকজন মনীষী আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেডের পত্তন করেন। সেই প্রতিষ্ঠানের উপর স্টার থিয়েটারের পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়। তখনকার দিনে প্রতিভাবান্ অভিনেতা ছিলেন অহীন্দ্র চৌধুরী ১৮৯৫-১৯৭৪ খ্রী.), দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৯২-১৯৪৩ খ্রী.), শিশিরকুমার ভাদুড়ী (১৮৮৭-১৯৫৯ খ্রী.), তিনকড়ি চক্রবর্তী প্রভৃতি।

॥ অহীন্দ্র চৌধুরী ॥

অহীন্দ্রভূষণ চৌধুরী (১৮৯৫-১৯৭৪ খ্রী.) ছিলেন প্রখ্যাত অভিনেতা। তিনি আর্ট থিয়েটার্স লিঃ, মিনার্ভা থিয়েটার, রঙমহল, নাট্যভারতী রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি রঙ্গালয়ে অভিনয় করেন। তিনি যে কত নাটকের বিভিন্ন ভূমিকায় সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন, তা বলে শেষ করা যায় না। তিনি পশ্চিমবঙ্গের সংগীত, নৃত্য, নাটক আকাদমীর নাট্য বিভাগের অধিকর্তা হয়েছিলেন।



অহীন্দ্র চৌধুরী

॥ অহীন্দ্রনাথ দে ॥

একজন কুশলী নট। ১৮৯৯ সালে প্রথম ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনয় করেন। হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সে যুগে জনচিত্ত জয় করেছিল। গম্ভীর ভূমিকায়ও তাঁর অভিনয় অনবদ্য ছিল।

॥ শিশিরকুমার ভাদুড়ী ॥

অনন্য নাট্যপ্রতিভার জন্যে তাঁকে নাট্যাচার্য বলা হয়। শিশিরকুমার (১৮৮৭-১৯৫৯ খ্রী.) বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তিনি অধ্যাপনা ত্যাগ করে ম্যাডান থিয়েটারে পেশাদার অভিনেতৃরূপে যোগদান করেন। তাঁর দেখাদেখি নির্মলেন্দু লাহিড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, যোগেশ চৌধুরী, তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধিকারঞ্জন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি নাট্যজগতে প্রবেশ করেন।



শিশিরকুমার ভাদুড়ী

শিশিরকুমার ষোড়শীতে 'জীবানন্দ', আলমগীরে 'আলমগীর', দিগ্বিজয়ীতে 'নাদির শাহে'র ভূমিকায় অপূর্ব অভিনয় করেন। যোগেশ চৌধুরী-রচিত সীতা নাটকে 'রামের' অভিনয় করে তিনি বিপুল খ্যাতি লাভ করেন।

আর্ট থিয়েটার্স লিমিটেড 'কর্ণার্জুন' নাটকের অভিনয়ের সময় ফুট লাইটের পিছনে কাটাকাটা দৃশ্যপট, তার সঙ্গে উইংস (wings) ও স্পট লাইটের আমদানি করে বাংলার নাট্যমঞ্চের উৎকর্ষ সাধন করেছিল।

॥ অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

প্রসিদ্ধ নাট্যকার। তিনি মিনার্ভা ও স্টার থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন। 'কর্ণার্জুন',

'ছিন্নহার', 'ইরানের রানী' প্রভৃতি বহু নাটক তিনি রচনা করেন।

॥ দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রখ্যাত নট (১৮৯২-১৯৪৩ খ্রী.)। স্টার থিয়েটারে যোগদান করে বহু ভূমিকায় অভিনয় করেন। চলচ্চিত্রেও তিনি অবতীর্ণ হন।

রামনারায়ণ তর্করত্ন, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, দীনবন্ধু মিত্র, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি মনীষীরা বহু নাটক রচনা করেন ('সাহিত্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

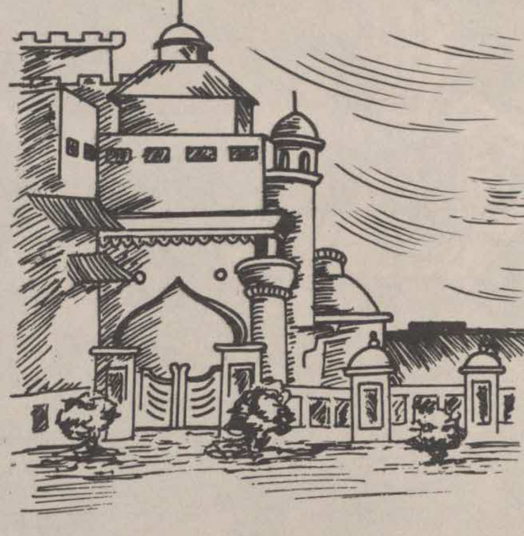
ব্রজেন্দ্রনাথ দে যাত্রার উপযোগী বহু নাটক রচনা করেন। তাঁকে পালা সম্রাট্ বলা হয়।

॥ ঘূর্ণায়মান মঞ্চ ॥

পূর্বে রঙ্গালয়ে বিদেশের ঘূর্ণায়মান মঞ্চের ব্যবস্থা ছিল না। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে 'মহানিশা'র অভিনয়-কালে ঘূর্ণায়মান মঞ্চের প্রবর্তন হয়। সতু সেন বঙ্গদেশে এই ঘূর্ণায়মান মঞ্চ (Revolving Stage) এর প্রবর্তক।

॥ অবন মহল ॥

ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের মনোরঞ্জনের জন্যে যে শিশু রঙমহলের প্রতিষ্ঠা হয়, তারই বর্তমান নাম 'অবন মহল'। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামে এই অবন মহল। এখানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা



অবন মহল

দর্শক হিসাবে উপস্থিত থেকে প্রভূত আনন্দ লাভ করে থাকে।

॥ সব চেয়ে বড় থিয়েটার ভবন ॥

পিকিং-এর তিয়ান অ্যান মেন স্কোয়ারের পশ্চিমে অবস্থিত ন্যাশনাল পিপ্‌ল্স কংগ্রেস ভবন (Ren min da hui tang) পৃথিবীর সব চেয়ে বড় থিয়েটার ভবন। এটির নির্মাণকার্য ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ভবনটি ১২·৯ একর (৫·২ হেক্টার) স্থানের উপর অবস্থিত। এতে ১০ হাজার লোকের বসবার আসন আছে।

॥ সব চেয়ে বেশী অভিনয় ॥

থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও টেলিভিশনে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Jan Leighton ১৮০৪ বার বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেন।



ডাকঘর ও ডাকটিকিট

পৃথিবীতে কত দেশ। কোন দেশ কাছে, কোন দেশ দূরে, আবার কোন দেশ বহু দূরে। মাঝখানে সাগর, নদী, পাহাড়-পর্বত, অরণ্য, মরুভূমি থেকে নানা দেশকে পৃথক্ করে রেখেছে।

লোকে নানা কাজে নানা দেশে যায়। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব বিদেশে যায়। কেউ কেউ সেখানে বাস করে, কেউ কেউ কম দিনের জন্যে যায়। তাদের কাছে সংবাদ পাঠানোর দরকার হয়, তারাও সংবাদ পাঠায়। শুধু সংবাদ নয়, জিনিসপত্র দেওয়া-নেওয়া চলে।

কিন্তু এ সব কাজ তো লোক মারফত করা সহজ নয়। কাজেই মানুষ চিঠি দিয়ে সংবাদ ও পার্শেল যোগে জিনিসপত্র দেওয়া নেওয়া করে।

॥ ডাকঘরের কাজ ॥

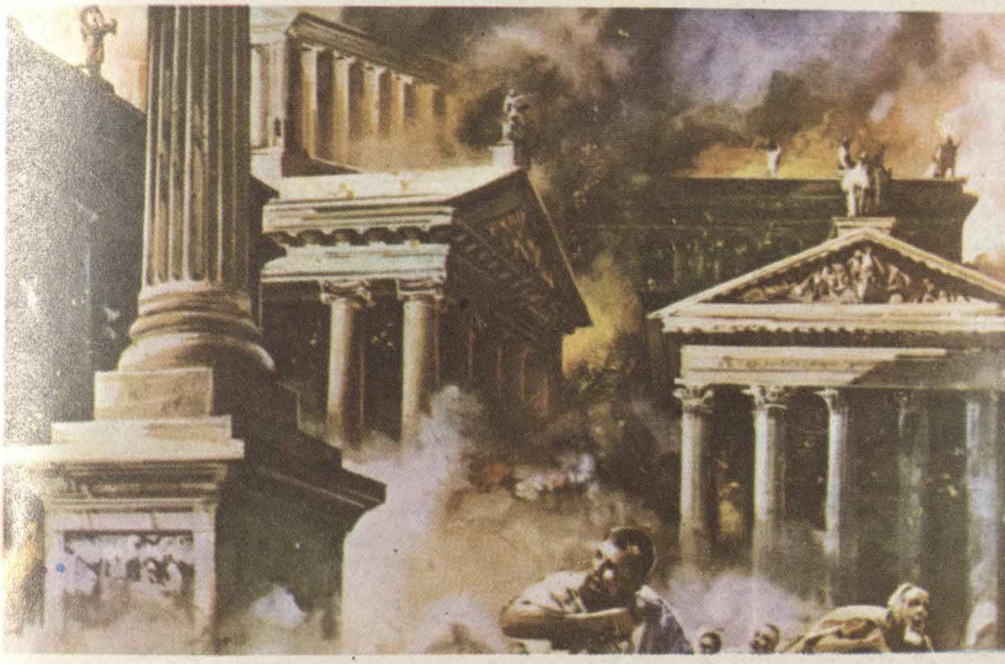
এই চিঠি ডাকঘর মারফত পাঠানো হয়। সামান্য খরচে কাছে বা দূরে চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা ডাকঘরই



ডাকঘর

করে। সব দেশেই ডাকঘর (post office) আছে। প্রত্যেক দেশের সরকারই ডাকঘর চালিয়ে থাকে।

এই ডাকঘর মারফত চিঠি, জিনিসপত্রের





প্রাচীন কালের রোমে অগ্নিকাণ্ড

নীরো (Nero, Claudius Caesar, ৩৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) ছিলেন প্রাচীন রোমের সম্রাট্। তাঁর সময়ে রোমে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। অনেকে বলেন নীরোর নির্দেশে রোমে অগ্নিকাণ্ড ঘটানো হয়। অগ্নি-কাণ্ডের ধ্বংসলীলা দেখে নীরো উল্লাসে বীণা বাজাতে থাকেন।

ঐতিহাসিক ট্যাসিটাস (Caius Cornelius Tacitus, ৫৫-১২০ খ্রী.) বলেন, সে যুগে বীণা (fiddle) আবিষ্কৃতই হয় নি। আর অগ্নিকাণ্ডের সময়ে নীরো রোম থেকে বহু দূরে অ্যান্টিয়াম-নামক স্থানে তাঁর নিজের বাড়িতে ছিলেন।

[পূর্বপৃষ্ঠার উপরের ছবি]

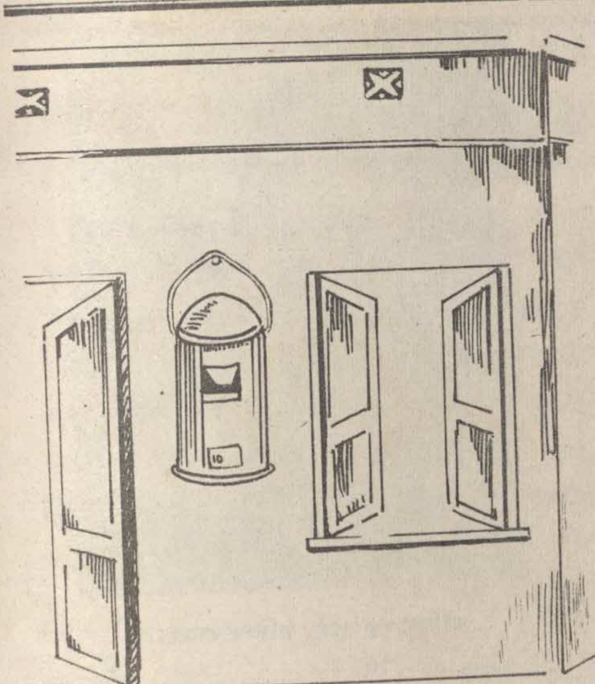
ট্রয়ের যুদ্ধ

প্রাচীন কালে ট্রয়-নামক স্থানে ট্রোজানদের সঙ্গে গ্রীক-দের এক ভয়াবহ যুদ্ধ হয়। ১০ বৎসর ধরে যুদ্ধ চলে।

অ্যাগামেমনের ভ্রাতা স্পার্টার রাজা মেনেলেয়াসের সুন্দরী পত্নী হেলেন স্বামী ও কন্যা পরিত্যাগ করে ট্রয়ের রাজা প্যারিসের সঙ্গে চলে গেলে তাঁকে উদ্ধার করে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবার জন্যে ট্রোজানদের বিরুদ্ধে গ্রীকেরা সংঘবদ্ধভাবে যুদ্ধযাত্রা করে। একটা কাঠের ঘোড়ার মধ্যে গ্রীক সৈন্যরা লুকিয়ে থেকে ট্রয়ে প্রবেশ করে এবং তুমুল যুদ্ধের পর ট্রয়কে ধ্বংস করে হেলেনকে উদ্ধার করে নিয়ে আসে।

প্যারিস ট্রয়ের যুদ্ধের নবম বৎসরে নিহত হন।

[পূর্বপৃষ্ঠার নীচের ছবি]



চিঠি ফেলবার ডাকবাক্স

পার্শেল, টেলিগ্রাম, সংবাদপত্র ইত্যাদি সুশৃঙ্খলভাবে পাঠানো হয়।



॥ ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা ॥

আগে বর্তমান কালের মতো ডাকের ব্যবস্থা ছিল না। দিল্লীর পাঠান সম্রাট্ শেরশাহ (রাজত্বকাল ১৫৪৩-১৫৪৮ খ্রী.) ঘোড়ার পিঠে করে ডাক পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এখনও অনেক দেশে ঘোড়ায় চড়ে, উটে চড়ে, সাইকেলে, গরুর গাড়িতে, নৌকোয়



স্পেনে সাইকেলে করে চিঠি বিলি

বল্গা হরিণে টানা বা কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে ডাক যায়। দূর দূর পল্লী অঞ্চলে লোকে পায়ে হেঁটে ডাক নিয়ে যায়। তাদের হাতে থাকে একটা লাঠি বা



মরিটানিয়ায় উটের পিঠে ডাক



ডাক পিওন



ফরাসী ডাকহরকরা

বর্শা. লাঠির বা বর্শার মাথায় ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা



রানার

থাকে। যখন তারা জোর পায়ে চলে তখন ঘণ্টা থেকে ঠুন ঠুন করে আওয়াজ হয়। এদের বলে রানার (runner)।

আজকাল অবশ্য রানারের সংখ্যা অনেক কমে গেছে। মোটরগাড়ি, রেল, জাহাজ, উড়োজাহাজ প্রভৃতিতে করে ডাক পাঠানো হয়।



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহিলা ডাকহরকরা



॥ পায়রার সাহায্যে সংবাদ প্রেরণ ॥

আগে পোষা পায়রাদের পায়ে একটা ছোট কৌটোয় চিঠি পুরে ছেড়ে দেওয়া হত। সেই পায়রা গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যেত। যুদ্ধের সময় পায়রার সাহায্যে সংবাদ আদান-প্রদান চলত। এখন এ প্রথা কোথাও কোথাও খুব সামান্যই আছে।

॥ জনসাধারণের জন্যে ডাকের ব্যবস্থা ॥

প্রথম দিকে সরকার নিজেদের সংবাদাদি আদানপ্রদানের জন্যে ডাকের ব্যবস্থা আরম্ভ করে। পরে জনসাধারণের প্রয়োজনে ডাকের ব্যবস্থা সকলের জন্যে হয়। ইংল্যাণ্ডে ১৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন ডাকবিভাগের কর্তা উইদারিংস জন-সাধারণের জন্যে ডাকের ব্যবস্থা করেন। ভারতে ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ডাকের ব্যবস্থা শুরু হয়। লর্ড ক্লাইভ সেই ব্যবস্থা করেন। কিন্তু তখন শুধু সরকারী কাজে ডাকের ব্যবস্থা হয়।

এর অনেক পরে ভারতে জনসাধারণের জন্যে ডাকের ব্যবস্থা শুরু হয়।



॥ ডাকটিকিট ॥

পোস্টকার্ড, খাম ইত্যাদি পাঠাতে গেলে সরকারকে কিছু শুল্ক দেবার প্রয়োজন হয়। তখন ঠিক হয়, চিঠিপত্রাদির উপর স্ট্যাম্প বা ডাকটিকিট মেরে দিতে হবে বা স্ট্যাম্প-লাগানো পোস্টকার্ড, খাম ইত্যাদি কিনতে হবে। জনসাধারণ সামান্য অর্থ দিয়ে ডাকটিকিট কেনে বা পোস্টকার্ড, খাম ইত্যাদি কেনে। তার ফলে সরকারের যে অর্থাগম হয়, তাতে ডাকবিভাগের খরচ চলে যায়।

॥ সর্বত্র একই হারের মাসুল ॥

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। সেই ডাকটিকিট শুধু চলত সিন্ধু প্রদেশে। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশের সব জায়গায় একই রকম মাসুলের হার প্রবর্তিত হয়। আগে মাত্র তিনরকমের ডাকটিকিট চালু হয়েছিল (১) সাদা কাগজে শুধু একটা ডিজাইন, (২) লাল কাগজে ডিজাইন, (৩) সাদা কাগজে নীল কালিতে ডিজাইন।

॥ আগেকার দিনে ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা।

ডাকপ্রেরণের ব্যবস্থা নানা দেশে অনেক আগে হয়েছিল। রোমে ঘোড়সওয়ার ঘোড়ায় করে বাড়িতে বাড়িতে চিঠি বিলি করত। পথের মাঝে মাঝে সে যুগেও ডাকঘর ছিল।

প্রাচীন মিশরে যীশু খ্রীষ্ট জন্মাবার ছ'শ বছর আগেও চিঠি পাঠানোর ভালো বাবস্থা ছিল।

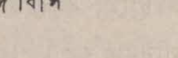
বিখ্যাত মিশরীয় পর্যটক ইবন বতুতা মহম্মদ তুঘলকের সময়ে (১৩২৫-১৩৫১ খ্রী.) ভারতে ঘোড়ায় করে ও পায়ে হেঁটে চিঠিপত্রাদি বিলির ব্যবস্থা ছিল বলে জানিয়েছেন। তাঁর লেখা বই 'সফরনামা'



ঘোড়ায় করে চিঠিপত্রাদি বিলি

পড়ে এ কথা জানা যায়।

মার্কো পোলো (Marco Polo, ১২৫৬-১৩২৩ খ্রী.) ১২৮০ খ্রীষ্টাব্দে চীন দেশে যান। তিনি লিখে গেছেন, সেই সময়ে চীনে দশ হাজারেরও বেশী ডাকঘর (post office) ছিল।



॥ মানি-অর্ডার ॥

পোস্টকার্ড, ইনল্যাণ্ড লেটার কার্ড, খাম প্রভৃতির সাহায্যে চিঠি পাঠানো হয়। কোন জিনিস পার্শেল করে প্রেরণ করা চলে। টাকা পয়সা পাঠাতে গেলে মানি-অর্ডার করতে হয়। ডাকঘরে গিয়ে একটা ফর্মে যাকে টাকা পাঠানো হবে তার ঠিকানা, কত টাকা পাঠানো হচ্ছে তা এবং ২।৪ লাইনে একটা চিঠি লিখে সেই ফর্ম ও টাকা ডাকঘরে জমা দিলেই হল। সেই সঙ্গে মানি-অর্ডার খরচও দিতে হবে। তাহলেই যার নামে টাকা পাঠানো হল তা নির্দিষ্ট সময়ে তার কাছে পৌঁছে যাবে। মানি-অর্ডার যোগে টাকা-পাঠানোর ব্যবস্থা হয় ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে।

॥ টেলিগ্রাফ ॥

যত দিন যাচ্ছে, ডাকঘরের কাজ ততই

বাড়ছে। ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা হয়েছে। যার কাছে যে কথা জানানো হবে তা লিখে ডাকঘরে জমা দিলে ডাকঘরের কর্মচারী টেলিগ্রাফ-যন্ত্রের সাহায্যে তা পাঠিয়ে দেন। একটা যন্ত্রে সাংকেতিক ভাষায় সংবাদ প্রেরণ করা হয়। একটি বৈদ্যুতিক তারের দুদিকে দুটি যন্ত্র সংলগ্ন থাকে। তাতে আঙুলের ডগা দিয়ে সামান্য আঘাত করলে একরকম শব্দ হয় এবং তা মুহূর্তের মধ্যে যন্ত্রের অপর প্রান্তে সেইরকম স্থানে শব্দ উত্থিত হয়। টেলিগ্রামে 'টরে' ও 'টক্কা'-নামক দুটি শব্দের সাহায্যে বর্ণগুলি লিখিত হয়ে শেষে একটা বাক্যে পরিণত হয়। এ সম্বন্ধে যে সাংকেতিক বর্ণমালার ব্যবহার হয় তাকে বলে মর্স কোড (Morse Code)। টেলিগ্রাফ—যন্ত্র। টেলিগ্রাম—টেলিগ্রাফে বাহিত সংবাদ।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে ডায়মণ্ড-হারবারে প্রথম টেলিগ্রাফে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। এই টেলিগ্রাফ লাইনের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র প্রায় ৩৪ কিলোমিটার। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত টেলিগ্রাম পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। পরে একদিকে বোম্বাই ও অন্যদিকে পেশোয়ার পর্যন্ত এই লাইন বাড়ানো হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি ইংল্যাণ্ড ও ভারতের মধ্যে প্রথম টেলিগ্রাফে খবর পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

১৮৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে সর্বপ্রথম টেলিগ্রাফের তার বসানো হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে R. S. Newell জলের তলার তার (cable) তৈরি করেন। ১৮৭১ সালে আটলান্টিক মহাসাগরের তলা দিয়ে আমেরিকার সঙ্গে টেলিগ্রাফের তার বসিয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

॥ টেলিপ্রিন্টার ॥

টেলিগ্রাফ প্রেরকযন্ত্রে টাইপরাইটারের চাবির বোর্ড এমনভাবে লাগানো থাকে যাতে দূরে অবস্থিত অপর একটি টাইপরাইটার চলতে পারে। এর ফলে দূরের সংবাদ সঙ্গে সঙ্গে টাইপে লেখা হয়ে যায়। এই যন্ত্রের নাম টেলিপ্রিন্টার যন্ত্র। অবশ্য, বর্তমানে সংবাদপত্রের অফিসে ও অন্যান্য বড় বড় অফিসে টেলিপ্রিন্টার যন্ত্র আছে। এর জন্যে ডাকঘরে যেতে হয় না। টেলিপ্রিন্টার এক্সচেঞ্জের সংক্ষিপ্ত নাম টেলেক্স (tellex)। ১৯৬৯ সালের ৮ই জুলাই দেবনাগরী অক্ষরে টেলেক্স সার্ভিস প্রথা চালু হয়। ১৯৭৮ সালে ভারতে ১০১টি শহরে টেলেক্স সার্ভিসের ব্যবস্থা ছিল।

॥ ভি. পি ॥

১৮৭৭ সালে ভি. পি. বা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল্য দিয়ে দেবার ব্যবস্থায় মালপত্র পাঠানোর ব্যবস্থা হয়। বর্তমানে এই ভি. পি. করার ব্যাপার খুবই বেড়ে গেছে।



॥ বিমান ডাক ॥

চিঠিপত্র জাহাজে করে পাঠাতে গেলে দেরি হয়ে যায়। সেইজন্যে এরোপ্লেনে করে চিঠি পাঠানো হয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সর্বপ্রথম ভারতে এরোপ্লেনযোগে চিঠিপত্র প্রেরণ করা হয়। এলাহাবাদের ইউ. পি. ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড এগ্রিকালচারাল প্রদর্শনী থেকে নৈনী জংশনে ৬,৫০০ চিঠি ও পোস্টকার্ড এরোপ্লেনযোগে পাঠানো হয়।

॥ ইনসিওর করার ব্যবস্থা ॥

পার্শেল, চিঠিপত্রাদি যাতে না হারিয়ে যায় তার জন্যে বেশী মাসুল দিয়ে সে-সব ইনসিওর করার ব্যবস্থা আছে। হারিয়ে গেলে ডাক বিভাগকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

॥ এক্সপ্রেস ডেলিভারি ॥

তাড়াতাড়ি চিঠিপত্রাদি পাঠানোর জন্যে

এক্সপ্রেস ডেলিভারির ব্যবস্থা আছে। এজন্যে বেশী মাসুল দিতে হয়। সাধারণ চিঠিপত্রাদির চেয়ে এই ব্যবস্থায় প্রেরিত চিঠিপত্রাদি অনেক দ্রুত নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে যায়।

॥ দেবনাগরী অক্ষরে টেলিগ্রামের ব্যবস্থা ॥

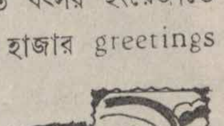
আগে শুধু ইংরেজীতেই টেলিগ্রাম করবার ব্যবস্থা ছিল। আজকাল ভারতের প্রায় তিন হাজার টেলিগ্রাফ আফিসে দেবনাগরী অক্ষরে প্রধান প্রধান ভাষায় টেলিগ্রাম পাঠানো যায়। ২,৯০৫টি ডাকঘরে এইভাবে টেলিগ্রাম প্রেরণের সুবিধা আছে।



॥ প্রীতি ও শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক তারবার্তা ॥

নম্বর-দেওয়া কয়েকটা বাঁধা গৎ আছে। কেউ তার পছন্দমতো সেই সব নম্বরের দু'একটা টেলিগ্রাম করলে টেলিগ্রাফ অফিস নির্দিষ্ট স্থানে তা পৌঁছবার ব্যবস্থা করে। এইভাবে প্রীতি ও শুভেচ্ছা (greetings) জানানো হয়।

দেবনাগরী বা ইংরেজী ভাষায় লেখা সুন্দর ছবি-সমন্বিত কার্ড বা খামে করে এই greetings পাঠানো হয়। ভারতে প্রতি বৎসর ইংরেজীতে ২১ লক্ষ ও দেবনাগরীতে ৪৩ হাজার greetings পাঠানো হয়।



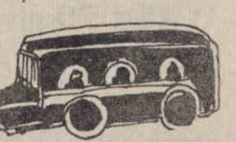
॥ ডেড লেটার অফিস ॥

ঠিকানা লেখার ভুলে অনেক চিঠিপত্রাদি নির্দিষ্ট স্থানে পাঠানো যায় না। সেই সব চিঠিপত্রাদি ডেড লেটার অফিসে যায়। সেখানকার কর্মচারীরা চিঠি খুলে ঠিকানার খোঁজ করেন। যদি ঠিক ঠিকানা পাওয়া যায় তাহলে আবার সেই চিঠিপত্রাদি নির্দিষ্ট স্থানে পাঠাবার চেষ্টা করা হয়।

॥ পিন কোড ॥

১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট থেকে ডাক বিভাগ সহজে ও ভালোভাবে চিঠি বিলি করবার উদ্দেশ্যে একধরনের ব্যবস্থা করেছে। এর নাম Postal Index Number Code (সংক্ষেপে PIN Code)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের ব্যবস্থাকে বলে Zip Code। এই ব্যবস্থায় সারা ভারতকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। ৬টি সংখ্যা দিয়ে Pin Code লেখা হয়। প্রথম সংখ্যায় অঞ্চল বুঝায়, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংখ্যায় উপ-অঞ্চল বুঝায়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংখ্যায় নির্দিষ্ট ডাকঘরকে বুঝায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম পড়েছে ৭ নম্বরে। কলকাতার বড় ডাকঘরের সংখ্যা ৭০০০০১। কলকাতার বড় ডাকঘর বোঝাবে ৭০০০০১ দিয়ে। নয়াদিল্লীর বড় ডাকঘর হয়েছে ১১০০০১। এইভাবে সারা ভারতের সব জায়গার বড় ডাকঘরের এক একটা নম্বর হয়েছে।



॥ ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর ॥

ভ্রাম্যমাণ ডাকঘরেরও ব্যবস্থা হয়েছে। নাগপুর, মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, কলকাতা, আমেদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, কানপুর ও ভিলাই-এ ডাকঘরের সুবিধা-সংবলিত ডাকবিভাগের গাড়ি বিভিন্ন স্থানে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে প্রতিদিন ঘুরে থাকে। ১৯৭৯ সালের হিসাবে দেখা যায়, সারা ভারতে ৩২,৫৭৩টি ভ্রাম্যমাণ ডাকঘর ছিল।

॥ রাত্রিকালীন বিমান ডাক ॥

বোম্বাই, কলকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী ও নাগপুরে

রাত্রে অন্তর্দেশীয় রাত্রিকালীন বিমান ডাকের ব্যবস্থা আছে। ইনল্যাণ্ড লেটার কার্ড, পোস্টকার্ড, মানি-অর্ডার প্রভৃতি অতিরিক্ত মাসুল ব্যতিরেকেই পাঠানো হয়ে থাকে।

ভারতে দেড় শতাধিক ডাকঘর রাত্রে খোলা থাকে (১৯৭৯তে ছিল ১৪৩টি)।

॥ অন্ধদের বিশেষ সুবিধা ॥

ভারতে অন্ধ ব্যক্তিদের ১৯৬৬ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে দেশে বা বিদেশে চিঠিপত্রাদিতে ডাকটিকিট লাগাতে হয় না বা কোন রকম মাসুল লাগে না।

॥ চিঠি, টেলিগ্রাম ও পার্শেলের সংখ্যা ॥

ভারতে প্রতি বৎসর ২ কোটি চিঠি, ৪ লাখ টেলিগ্রাম ও ২ লাখ পার্শেল পাঠানো হয়ে থাকে।

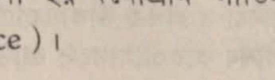
॥ ডাকবাক্স ও ডাকঘরের সংখ্যা ॥

ভারতের গ্রামাঞ্চলে ৪,২৬,৫৫৩টি ডাকবাক্স আছে। ডাকঘরের সংখ্যা ভারতে দেড় লক্ষের বেশী (১৯৭৯ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,৩০,৯৮৮)।

ভারতীয় টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা পৃথিবীতে সর্বপ্রাচীন। বর্তমানে ২০,৮৭০টি টেলিগ্রাফ অফিস আছে।

॥ ফনোগ্রাম সার্ভিস ॥

ডাকবিভাগে টেলিফোনে বা টেলিগ্রামে কোন সংবাদ দিলে নির্দিষ্ট স্থানে টেলিফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়। একে বলা হয় ফনোগ্রাম সার্ভিস (phonogram service)।



॥ টেলিফোন ॥

গ্রাহাম বেল দ্বারা ১৮৭৬ সালে টেলিফোন উদ্ভাবিত হয়। এর ৫ বছর পরে ভারতে টেলিফোন চালু হয়। তখন সারা ভারতে ৫০টি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে কলকাতায় প্রথম টেলিফোন চালু হয়। ১৯৭৮ সালের হিসাবে দেখা যায়, ভারতে টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সংখ্যা ৬,২ ৮।

১৯১৩ সালে সিমলায় ৭০০টি অটোমেটিক টেলিফোন চালু হয়। বর্তমানে ভারতের প্রত্যেক বড় শহরে অটোমেটিক টেলিফোনের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৭৮ সালে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ২২,৪৭,১৮৭।

১৯৭৮ সালে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ১,২৫,২৮৩। গ্রামাঞ্চলের ডাকঘরের সংখ্যা ছিল ১৩,২০৬।

॥ ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক ॥

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা জমা নেবার জন্যে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হয়। ১,২৪,৮৪৯টি ডাকঘরে সেভিংস ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে। ১৯৭৯ সালে ৪ কোটি ২৬ লক্ষ সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খোলা হয়। সেভিংস ব্যাঙ্কে জমা টাকার পরিমাণ ৫,৭৪৭ কোটি টাকা।



॥ বেয়ারিং চিঠি ॥

চিঠি লিখে খামে পুরে বা পোস্টকার্ডে নাম ঠিকানা লিখে ডাকবাক্সে ফেলতে হয়। পোস্টম্যান আৎ ডাকবিভাগের লোক ডাকবাক্স খুলে চিঠি নিয়ে যায়। খামে বা কার্ডে কম মাসুলের ডাকটিকিট লোগানো হলে তা 'বেয়ারিং চিঠি' হয়ে যায়। যাকে সেই কমমাসুল-দেওয়া চিঠি পাঠানো হয়, তার কাছ থেকে দ্বিগুণ মাসুল আদায় করা হয়।

সব দেশের ডাকটিকিট আলাদা। আবার একই দেশে বিভিন্ন সময়ে নূতন নূতন ডাকটিকিট বার হয়। মাসুল অনুযায়ী ডাকটিকিটের ধরন নানা রকমের হয়।

॥ ভারতের প্রথম ডাকটিকিট ॥

সিন্ধুপ্রদেশে ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই প্রথম

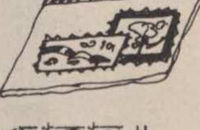
ডাকটিকিটের প্রচলন শুরু হলেও সারা ভারতে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর ডাকটিকিট চালু হয়। সেইজন্যে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে ডাকটিকিট প্রচলনের শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে প্রদর্শনী হয়। তাতে ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সারা ভারতে যত রকম ডাকটিকিট ছাপা হয়েছিল সে-সব প্রদর্শিত হয় ও সব ডাকটিকিটের এক রঙিন অ্যালবাম প্রকাশিত হয়।



রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিভিন্ন ডাকটিকিট

॥ পুরনো ডাকটিকিটের মূল্য ॥

চিঠিপত্রাদি পাঠানোর মাসুল বাবদ ডাকবিভাগ থেকে ডাকটিকিট (postage stamp) প্রকাশিত হয়। সেই মাসুল অধিকাংশ ক্ষেত্রে সামান্য। কিন্তু ডাকটিকিট পুরনো হলে বা ডাকটিকিট প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে সে-সব যখন দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে তখন তাদের মূল্য হয়ে ওঠে অনেক বেশী। কোন কোন ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্য রকম মূল্যে সেগুলি বিক্রি হয়। যাঁদের ডাকটিকিট সংগ্রহ করার শখ তাঁরা দাম বেশী হলেও সেগুলি কিনে নেন।



॥ ডাকটিকিট বিক্রয়ের দোকান ॥

পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ডাকটিকিট সংগ্রহ করার জন্যে বহু লোক সময় ও অর্থ ব্যয় করেন সে-সব টিকিট বিক্রির বড় বড় দোকানও আছে।

এই টিকিট সংগ্রহ করাকে ইংরেজীতে বলা হয় ফিলাটেলি (philately), যে সংগ্রহ করে তাকে বলা হয় ফিলাটেলিস্ট (philatelist)।

লণ্ডনের স্ট্যানলি গিবন্‌স্ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ডাকটিকিট বিক্রির দোকান। ভারতেও ফিলাটেলি ওরিয়েন্ট, বোম্বে ফিলাটেলিং কোং প্রভৃতি অনেক ডাকটিকিট বিক্রির দোকান আছে।



বিভিন্ন দেশের ডাকটিকিট



ডাকটিকিটে খেলার বিষয়



ডাকটিকিটে নানা জীবজন্তু

॥ দু পয়সা ডাকটিকিটের দাম কয়েক হাজার টাকা ॥

সিন্ধুপ্রদেশে ডাকটিকিট প্রচলনেরও আগে ভারতে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে দু'রকম ডাকটিকিট প্রচলিত হয়েছিল। তাতে সিংহ ও তালগাছের নকশা ছিল। ঐ টিকিট কলকাতার টাঁকশালে ছাপা হয়েছিল। কর্নেল ফর্বস এই ডাকটিকিটের প্রবর্তক। কিন্তু সেই টিকিটগুলি শেষ পর্যন্ত চালু হয় নি। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই যে টিকিট চালু হয় তা ছিল লাল, সাদা ও নীল রঙের। একটা গোল বেল্টের মধ্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির তীর-আঁকা একটা নকশা এম্বস করে দেওয়া হত। তাতে লেখা থাকত Sinde District Dawk। প্রতিটি টিকিটের দাম ছিল মাত্র দু' পয়সা। বর্তমানে সেই সব অপ্রচলিত পুরাতন টিকিটের প্রতিটির দাম কয়েক শ' টাকা। লাল রঙের টিকিটের দাম আবার কয়েক হাজার টাকা। এত দাম দিয়েও এই সব টিকিট সংগ্রহ করা খুবই কঠিন ব্যাপার।

॥ আঠাযুক্ত ডাকটিকিট ॥

১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে স্কটল্যাণ্ডের জেমস চামান আঠাযুক্ত ডাকটিকিটের প্রচলন করেন। জেকব পার্কিন্স টিকিটের পিছনে আঠা লাগাবার মেসিন আবিষ্কার করেন।



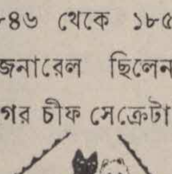
॥ রোলাণ্ড হিল ॥

আগে ইংল্যাণ্ডে দূরত্ব হিসাবে চিঠিপত্রাদি পাঠাবার মাসুল ছিল বিভিন্ন রকমের। স্যার রোলাণ্ড হিল (Sir Roland Hill, ১৭৯৫-১৮৭৯ খ্রী)-এর চেষ্টায় একই হারে সর্বত্র চিঠিপত্রাদি পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে মাত্র ১ পেনি



রোলাণ্ড হিল

মূল্যের ডাকটিকিটে ইংল্যাণ্ডের সর্বত্র চিঠি পাঠাবার ব্যবস্থা হয়। রোলাণ্ড হিল ১৮৪৬ থেকে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোস্টমাস্টার জেনারেল ছিলেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডাকবিভাগের চীফ সেক্রেটারি ছিলেন।



॥ ফটোগ্রেভিওর পদ্ধতিতে টিকিট ছাপা ॥

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে ডিলা রু অ্যাণ্ড কোম্পানির ছাপাখানায় চার আনা দামের ডাকটিকিট ছাপা হয়। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের নাসিক শহরে সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেসে ডাকটিকিট ছাপাবার ব্যবস্থা হয়। ফটোগ্রেভিওর (photogravure) পদ্ধতিতে ডাকটিকিট ছাপিয়ে আনা হত আগে সুইটজারল্যাণ্ড থেকে। এখন ভারতেই ফটো-গ্রেভিওর পদ্ধতিতে ডাকটিকিট ছাপা হয়।

॥ স্মারক ডাকটিকিট ॥

নিত্য নূতন ডাকটিকিট বিশেষ করে বিভিন্ন মনীষীর স্মরণে স্মারক ডাকটিকিট ছাপানো হচ্ছে। তাছাড়া, নানা জীবজন্তু, স্থাপত্য, প্রাকৃতিক দৃশ্য, নদী, পর্বত প্রভৃতির ছবিও ডাকটিকিটে থাকে।

॥ দেশীয় রাজ্যের ডাকটিকিট ॥

ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে ব্যবস্থা করে বিভিন্ন দেশীয় রাজ্য ডাকটিকিট ছাপানোর ব্যবস্থা করে। ভুপাল, পাতিয়ালা, গোয়ালিয়র, ঝিন্দ প্রভৃতি দেশীয় রাজ্য নিজ নিজ টিকিট ছাপাতে থাকে। এখন আর কোন দেশীয় রাজ্য নেই। সেই সব রাজ্যের টিকিটও চালু নেই। দেশীয় রাজ্যসমূহের ছাপানো টিকিট দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। তাই সে-সব কিনতে অনেক টাকা লাগে। টিকিট-সংগ্রাহকরা বেশী দাম দিয়েই সেই সব টিকিট কেনে ও সযত্নে তাদের অ্যালবামে সাজিয়ে রাখে।

॥ ডাকটিকিটের জাদুঘর ॥

নয়া দিল্লীতে জাতীয় ডাকটিকিটের জাদুঘর (National Philatelic Museum) স্থাপিত হয়েছে। তাতে সব রকম ডাকটিকিট রাখা হয়েছে এবং যত নূতন ডাকটিকিট ছাপা হয় তা সাজিয়ে রাখা হয়। এই জাদুঘরে শুধু ভারতীয় ডাকটিকিটই নেই, অসংখ্য বিদেশী ডাকটিকিটও আছে।

দশ টাকা মূল্যের গান্ধী-স্মারক ডাকটিকিটও এখানে আছে। অনেক দুষ্প্রাপ্য বিদেশী টিকিট এই জাদুঘরে রক্ষিত আছে। Penny Black of 1840 (১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের কালো রঙের এক পেনি মূল্যের) ইংল্যাণ্ডের ডাকটিকিটও এই জাদুঘরে আছে।

॥ ডাকটিকিট জমানোর নানা সরঞ্জাম ॥

যাঁরা ডাকটিকিট সংগ্রহ করে জমান, তাঁদের বেশ কিছু সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়। ডাকটিকিট রাখার অ্যালবাম, জল রাখার ট্রে (tray) বা পাত্র, যাতে খামে-আঁটা ডাকটিকিট ভিজিয়ে তুলে



অ্যালবামে লাগানোর জন্যে চিমটে দিয়ে ডাকটিকিট তোলা হচ্ছে

নিতে হয়, ভিজা টিকিট তোলবার চিমটে (tweezers), ডাকটিকিটের কাগজের জলছাপ দেখবার কালো রঙের ওয়াটার-মার্ক ডিটেকটার (water-mark detector), যার উপরে ডাকটিকিট উলটে রাখলে জলছাপ স্পষ্ট দেখা যায় প্রভৃতি সরঞ্জাম ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর পক্ষে প্রয়োজন। ডাক-টিকিট রাখার অ্যালবাম ছোট, মাঝারি, বড়—সব রকমের হয়। নূতন করে পাতা লাগাবার জন্যে আলাদা আলগা পাতাওয়ালা (loose-leaf) অ্যালবামও ব্যবহার করা চলে। অনেক অ্যালবামে ডাকটিকিট আটকাবার জন্যে দেশ-হিসাবে পাতা নির্দিষ্ট করা থাকে।

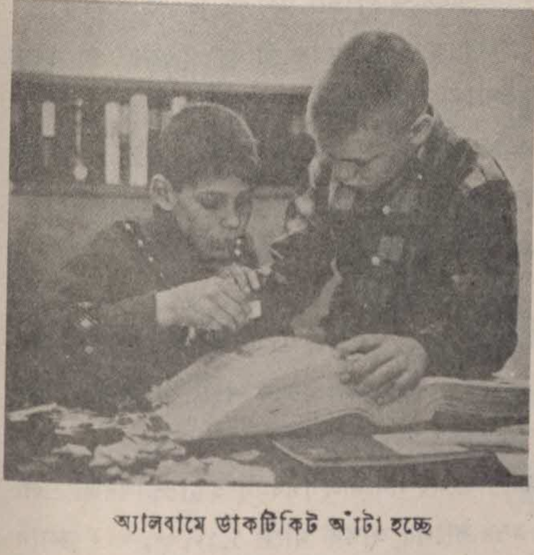


॥ পারফোরেশন ডাকটিকিট ॥

ডাকটিকিট অনেকগুলি একসঙ্গে ছাপা হয়। সেই সব ডাকটিকিট আলাদা করার সময়ে যাতে ডাকটিকিট ছিঁড়ে না যায় বা কোন অসুবিধা না হয় তার জন্যে ডাকটিকিটের চার ধারে ফুটো থাকে। এই ফুটোকে বলে পারফোরেশন (perforation)। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে আর্চার সাহেব পারফোরেশন-করা ডাকটিকিট চালু করেন।

॥ ডাকবিভাগ কর্তৃক অতিরিক্ত ডাকটিকিট ছাপানো ॥

ডাকটিকিট সংগ্রহকারীর সংখ্যা দিন দিন দেশে বেড়েই চলেছে। তাদের কথা ভেবে ডাকবিভাগ বহু বাড়তি ডাকটিকিট ছাপেন। সেগুলি অব্যবহৃত টিকিট। প্রধানতঃ ব্যবসায়ীরা সেগুলি কিনে নেন। ডাকটিকিট সংগ্রহকারীরা তাদের কাছ থেকে সেই সব অব্যবহৃত টিকিট (mint) কিনে নেয়। কিন্তু অব্যবহৃত টিকিটের চেয়ে ব্যবহার-করা টিকিটের মূল্য বেশী। তাই ডাকবিভাগ কিছু খামে ডাক-টিকিট মেরে তাতে ডাকঘরের ছাপ মারে। তাকে বলে first day cover। সেই ছাপ-মারা ডাকটিকিট ব্যবসায়ীরা কিনে নিয়ে সময়মতো ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের কাছে বিক্রি করে।



অ্যালবামে ডাকটিকিট আঁটা হচ্ছে

॥ ফেরারির অমূল্য ডাকটিকিটের সংগ্রহ ॥

সারা পৃথিবীতে বহু অত্যুৎসাহী নাম-করা ডাকটিকিট সংগ্রাহক ছিলেন ও আছেন। জার্মানির কাউন্ট ফিলিপ ফন ফেরারি এই রকম একজন উৎসাহী ডাকটিকিট সংগ্রাহক। তাঁকে উপাধি দেওয়া হয়েছে 'স্ট্যাম্প কালেক্টার নাম্বার ওয়ান'। তিনি ছিলেন বিরাট ধনী। তাঁর মা তাঁকে আড়াই কোটি টাকার ধনসম্পত্তি দিয়ে যান। ফেরারির বেশভূষা বা অন্য কোন ব্যাপারের দিকে মন ছিল না। প্রতি সোমবার তিনি পঞ্চাশ হাজার ফ্র্যাঙ্ক (Franc) মূল্যের ডাকটিকিট কিনতেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে জার্মান সরকার ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফেরারির অমূল্য সংগ্রহ-ভাণ্ডার ফরাসী সরকারকে দিয়ে দেন। সেই সংগ্রহ তখনকার দিনে ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যে নিলামে বিক্রি হয়।

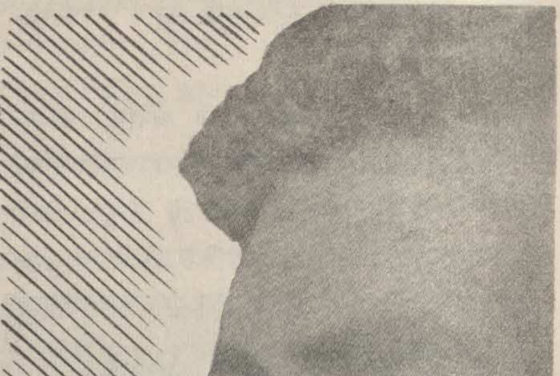


॥ ডাকটিকিট সংগ্রাহক বিশিষ্ট ব্যক্তি ॥

ইংল্যাণ্ডের রাজা পঞ্চম জর্জ ও ষষ্ঠ জর্জ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, রুমানিয়ার রাজা ক্যারল, মিশরের রাজা ফারুক, স্পেনের রাজা আলফান্সো, নাৎসী জার্মান নায়ক হিটলার ডাকটিকিট সংগ্রাহক ছিলেন। রানী এলিজাবেথ ডাকটিকিট সংগ্রহ করে থাকেন।

রাজা ক্যারলের সংগৃহীত ডাকটিকিট ছিল আড়াই লক্ষ, রুজভেল্টের ডাকটিকিট ছিল ত্রিশ হাজার।

ভারতের জাল কুপার, যিনি India's Stamp Journal-এর সম্পাদক, তিনি একজন অদ্বিতীয় অভিজ্ঞ ডাকটিকিট সংগ্রাহক। তিনি জাতিতে পার্শী।



জাল কুপার

॥ সবচেয়ে দামী ডাক টিকিট ॥

সব চেয়ে দামী ডাক টিকিট ব্রিটিশ গায়েনার (বর্তমানে স্বাধীন রাষ্ট্র গিয়ানার—Guyana-র)। ১৮৫৬ সালের ৪ঠা এপ্রিলের ছাপ-সংবলিত ১ সেণ্ট মূল্যের ম্যাজেন্টা রঙের ডাকটিকিট। এটি নিলামে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার ডলারে (৩,৮০,০০০ পাউণ্ডে) বিক্রী হয়। এটি ১৯৮০ সালের ৫ই এপ্রিল Irwin R. Weinberg Syndicate কর্তৃক নিউইয়র্ক শহরে এক অজ্ঞাতনামা ডাকটিকিট সংগ্রাহককে বিক্রীত হয়।

লণ্ডনের স্ট্যানলি গিবনস্ ইন্টারন্যাশনাল লিঃ ১৯৭৯ সালের আগস্ট মাসে ১,১০,০০,০০০ ডলার

(৪৫,৪৫,০০০ পাউণ্ড) দামের টিকিট বিক্রি করেন।

॥ নানা আয়তনের ডাকটিকিট ॥

বিশেষ উদ্দেশ্যে ২৪৭৫×৬৯৮ মিলিমিটার আয়তনের ডাকটিকিট ১৯১৩ সালে চীনে ছাপা হয়।

১৯৭৯ সালের ৩০শে অক্টোবর মার্শাল দ্বীপপুঞ্জে যে ৭৫ সেন্ট মূল্যের ডাকটিকিট ছাপা হয়, তার আয়তন ১৬০×১১০ মিলিমিটার।

॥ সব চেয়ে ছোট ডাকটিকিট ॥

সব চেয়ে ছোট ডাকটিকিটের আয়তন ৮×৯.৫ মিলিমিটার। এর মূল্য ১০ সেন্ট ও ১ পেসো। ১৯৬৩-৬৬ সালে বলিভারে ছাপা হয়।

॥ সব চেয়ে পুরনো ডাকটিকিট ॥

গ্রেটব্রিটেনের রানী ভিক্টোরিয়ার মূর্তি-সংবলিত পেনি দামের ডাকটিকিট সব চেয়ে পুরাতন



রানী ভিক্টোরিয়ার প্রতিমূর্তি-সংবলিত এক পেনি মূল্যের ডাকটিকিট

(Penny Black of 1840)। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে জেনারেল পোস্ট অফিস থেকে বিক্রি শুরু হয়।

ভারতের ডাকবিভাগ সুশৃঙ্খলভাবে নানা কাজ করে চলেছে। সব কথা এই অধ্যায়ের স্বল্প পরিসরে বিবৃত হল না। ডাকবিভাগ দ্বারা ভারতের জনসাধারণের পরম উপকার সাধিত হচ্ছে।



দিয়াশলাই

আদিম যুগের লোক আগুনের ব্যবহার জানত না। আকাশ থেকে বাজ পড়ে যখন বনের শুকনো পাতায় আগুন ধরে গেল, তখন তা দেখে তারা ভাবতে লাগল, এ আবার কী! গাছে গাছে প্রচণ্ড ঘর্ষণে আগুন জ্বলে উঠে সারা বন পুড়ে ছাই হয়ে গেল, তখন বনের আদিম অধিবাসীরা পালিয়ে গেল ও ভাবতে লাগল, কী থেকে কী হল? সারা বনটা ছাই হয়ে গেল! মেঘের কোলে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখে তারা ভাবতে থাকল, ঈশ্বরের অভিশাপে ওই রকম হচ্ছে।

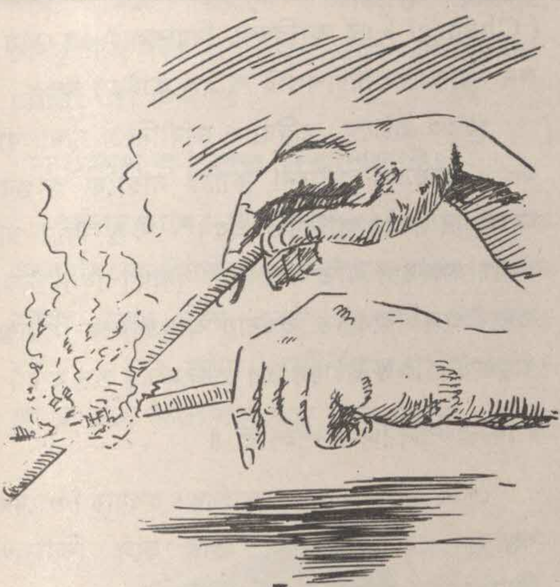
তখনও পর্যন্ত তারা কাঁচা মাংস, কাঁচা সবজি, ফলমূল খেত, ক্রমে তারা আগুনের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারল। কিন্তু আগুন জ্বালবার উপায় বার করতেই তাদের বহু কাল কেটে গেল।

॥ আদিম যুগে প্রথম আগুনের সৃষ্টি ॥

আদিম যুগের মানুষেরা প্রথম প্রথম শুকনো কাঠ বার বার জোরে জোরে ঘষে আগুন জ্বালাতে শিখল। কিন্তু সে এক ভীষণ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তার পর পাথরের উপর পাথর ঠুকে আগুন সৃষ্টি করতে থাকল। ওই ঠোকাঠুকিতে যে স্ফুলিঙ্গ বার হল, তা পাশে রাখা শুকনো পাতা বা শেওলায় লেগে আগুন জ্বলে উঠত।

সে-যুগের লোকেরা কাঁচা মাংস বা সবজি পুড়িয়ে খেতে বা তৈজসপত্র তৈরি করতে শিখল। যত দিন যেতে লাগল ততই তারা আগুনকে নানা কাজে লাগাতে থাকল। আগুনে ধাতু গলাতেও তারা শিখল।

লোকে বুঝল, মানুষের জীবনে আগুনের খুবই



শুকনো কাঠ ঘষে আগুন জ্বালানো

প্রয়োজন। কিন্তু আগুন জ্বালবার সহজ উপায় বার করতে তাদের বহুকাল কেটে গেল।

গুহামানবেরা পাথরে পাথরে ঠোকাঠুকি করে আগুন জ্বালাত। রোমানরা তার চেয়ে বেশী দূর



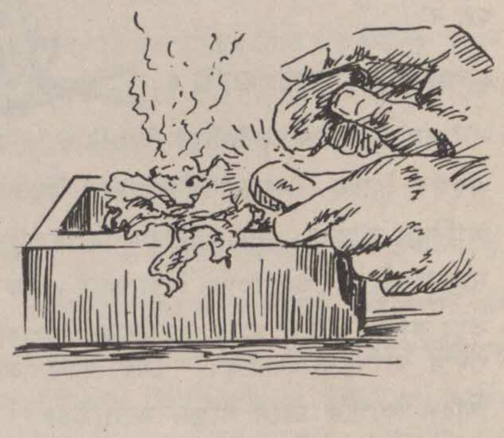
পাথর ও লোহার সংঘর্ষে আগুন জ্বালানো

অগ্রসর হয় নি। তারাও ওইভাবে পাথরের উপর পাথর ঠুকে, বড় জোর লোহা ঠুকে আগুন জ্বালাত। পাশে থাকত গন্ধক-মাখানো কাঠের টুকরো, তাতে আগুনের ফুলকি পড়ে আগুন জ্বলে উঠত।



॥ টিণ্ডার বক্স ॥

মধ্যযুগে পাথর ও লোহার সংঘর্ষে আগুন জ্বালানো হত। সেই আগুনের ফুলকি ছেঁড়া কাপড়, শুকনো শেওলা বা পাতায় পড়ে আগুন জ্বলে উঠত। এই সব জিনিসকে বলা হত টিণ্ডার (tinder)। যে



টিণ্ডার বক্স

বাক্সে এ সব রাখা হত, তাকে বলা হত টিণ্ডার বক্স (tinder box)।

পরে টিণ্ডার বক্সে ছেঁড়া কাপড় বা শেওলা রাখার পরিবর্তে গন্ধকে-ডোবানো সরু সরু সহজদাহ্য কাঠের ফালি রাখা হত। পাথরে লোহায় ঠোকাঠুকিতে আগুনের ফুলকি বার হলে সেই ফুলকি সেই কাঠের ফালিতে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আগুন জ্বলে উঠত।

॥ গন্ধক ও ফসফরাসের সাহায্যে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা ॥

এইভাবে চলল বহু কাল। নানা লোকে

নানাভাবে আগুন জ্বালাবার সহজ উপায় বার করার চেষ্টা করতে থাকল। শেষে ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে রবার্ট বয়েল (Robert Boyle, ১৬২৭-৯১ খ্রী.) নামে একজন ইংরেজ বিজ্ঞানী যিনি রবার্ট হুক (Robert Hooke)-এর সঙ্গে আধুনিক রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার পত্তন করেন, তিনি এক টুকরো পাতলা কাঠের ফালিতে গন্ধক মাখিয়ে তা গন্ধক ও ফসফরাসের মিশ্রণের মধ্যে ডুবিয়ে আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থা করলেন। কিন্তু তাঁর এই ব্যবস্থা তেমন কার্যকরী হল না।



॥ কংগ্রীভ দিয়াশলাই ॥

জন ওয়াকার (John Walker) নামে একজন ইংরেজ ঔষধব্যবসায়ী প্রথম দিয়াশলাই আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কৃত দিয়াশলাই-এর নাম কংগ্রীভ (Congreve) দিয়াশলাই। সরু সরু করে কাটা কাঠির ডগায় সহজদাহ্য রাসায়নিক পদার্থ লাগানো থাকত। সেই কাঠি একটা সিরিশ কাগজে ঘষলে আগুন জ্বলে উঠত। জন ওয়াকারের দিয়াশলাই থেকে বর্তমান কালের দিয়াশলাই-এর উদ্ভব বলা চলে।

॥ রসায়নবিদ চ্যানসেলের আবিষ্কৃত দিয়াশলাই ॥

১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রসায়নবিদ্ চ্যানসেল



চ্যানসেলের দিয়াশলাই

(Chancel)-এর আবিষ্কৃত দিয়াশলাই-এর চেয়ে জন ওয়াকারের দিয়াশলাই অধিক কার্যকর হয়।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অষ্ট্রিয়া ও জার্মানিতে সাদা বা হলদে ফসফরাস-মাখানো কাঠির সাহায্যে আগুন জ্বালাবার উপায় আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু সাদা বা হলদে ফসফরাস অতি সহজদাহ্য পদার্থ। বিপজ্জনক পদার্থ বলে বিবেচিত হওয়ায় আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে এর প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়।

॥ নিরাপদ দিয়াশলাই ॥

শেষে লাল ফসফরাস আবিষ্কৃত হওয়ায় বিপদের সম্ভাবনা কেটে গেল। তার ফলে নিরাপদ দিয়াশলাই (সেফটি ম্যাচ)-এর উদ্ভব হল। প্রথম নিরাপদ দিয়াশলাই আবিষ্কৃত হয় ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনে। দিয়াশলাইয়ের কাঠির মাথায় সব রাসায়নিক পদার্থ লাগানোর পরিবর্তে দিয়াশলাই-এর বাক্সের গায়ে কিছুটা রাসায়নিক পদার্থ লাগানো হলো। সেই রাসায়নিক পদার্থ-লাগানো জায়গায় রাসায়নিক পদার্থ-লাগানো কাঠি ঘষে আগুন জ্বালানো সম্ভব হল। জন ওয়াকারের কংগ্রীভ ম্যাচ (Congreve match) ও স্যামুয়েল জোনসের লুসিফার ম্যাচ (Lucifer match)-এর চেয়ে এই নিরাপদ দিয়াশলাই বেশী কার্যকর হল।

॥ লোকোফোকো ॥

ফসফরাস-লাগানো কাঠি খসখসে জায়গায় ঘষলে জ্বলে ওঠে। এই ধরনের কাঠিভরা দিয়াশলাই বাক্সকে বলা হত লোকোফোকো (locofoco)। লোকোফোকোর প্রচলন বেশী দিন ছিল না। ফসফরাস সাধারণতঃ বিষাক্ত। যাতে কারখানার কর্মীদের এই বিষাক্ত ফসফরাস ব্যবহার করতে না হয় বা গৃহস্থের বাড়িতে এই ধরনের বিষাক্ত ফসফরাস-লাগানো দিয়াশলাই ব্যবহার করতে না হয়, সে

জন্যে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে অবিষাক্ত ফসফরাস সেসকুইসালফাইড (Phosphorus sesquisulphide)-এর চলন হয়।

॥ বর্তমান কালের দিয়াশলাই ॥

বর্তমান কালের দিয়াশলাই-এর কাঠির মাথায় ফসফরাস সেসকুইসালফাইড লাগানো থাকে। কাঠির মাথার তলার দিকে একটু প্যারাফিন লাগানো থাকে। তার জন্যে কাঠি তাড়াতাড়ি জ্বলে ও আগুন জ্বলে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে নিভে যায় না।



বর্তমান কালের নিরাপদ দিয়াশলাই

পৃথিবীর সব দেশেই নিরাপদ দিয়াশলাই (সেফটি ম্যাচ) চলে। রান্নাঘরে এই সেফটি ম্যাচের নিত্যকার প্রয়োজন। অধিকাংশ মানুষের পকেটে দিয়াশলাই থাকে। এ জন্যে প্রতিদিন কোটি কোটি দিয়াশলাই-এর বাক্স তৈরী হয়। এত দিয়াশলাই তৈরি করতে সব দেশেই কারখানা গড়ে উঠেছে।

॥ দিয়াশলাই-এর কাঠি ও বাক্স তৈরি ॥

সাধারণতঃ পাইন (pine) ও ফার (fir) গাছের কাঠ থেকে দিয়াশলাই-এর কাঠি ও বাক্স তৈরী হয়ে থাকে। এই সব বাক্স ও কাঠি তৈরি করতে আধুনিক উন্নত ধরনের যন্ত্রপাতি প্রতিটি দিয়াশলাই-এর কারখানায় আছে। সেই সব কারখানায় হাজার হাজার লোক কাজ করে। কলে কাঠ চেরাই হয়, দিয়াশলাই-এর বাক্স তৈরী হয়। কাঠির মাথায় ও দিয়াশলাই-এর বাক্সের গায়ে রাসায়নিক পদার্থ লাগানো হয়।

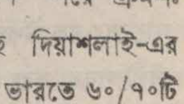


॥ দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরে রঙিন ছবি ॥

দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপর কত ধরনের রঙিন ছবি থাকে। তাতে কোম্পানির নাম লেখা থাকে। অধিকাংশ কারখানায় নিজস্ব ছাপার মেসিন থাকে। তাতে ছবি ছাপা হয়।

॥ ভারতে দিয়াশলাই-এর কারখানা ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ভারতে দিয়াশলাই-এর কারখানা খুব বেশী ছিল না। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে আমদানি-করা দিয়াশলাই-এর উপর শুল্ক বসে। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের নিজস্ব দিয়াশলাই শিল্পকে বাঁচাতে সংরক্ষণ শুল্ক ধার্য হয়। তার ফলে বিদেশ থেকে দিয়াশলাই আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। ওয়েস্টার্ন ম্যাচ কোম্পানি লিমিটেড নামে একটি প্রতিষ্ঠান একটি বড় সুইডিশ কোম্পানির তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠে। কলকাতা, বেরিলি, অম্বরনাথ ও মাদ্রাজে কারখানা তৈরী হয়। পরে ক্রমশঃ সারা ভারতের নানা স্থানে বহু দিয়াশলাই-এর কারখানা স্থাপিত হয়। বর্তমানে ভারতে ৬০/৭০টি দিয়াশলাই-এর কারখানায় কোটি কোটি দিয়াশলাই তৈরী হচ্ছে।



॥ সিগারেট লাইটার ॥

সিগারেট-লাইটার (cigarette-lighter) বলে



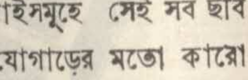
জাপানের **Teiichi Yoshizawa** র সংগৃহীত দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরকার ছবি

আগুন জ্বালাবার একরকম ছোট জিনিসের চলন হয়েছে। সেটি সাধারণতঃ লোকের পকেটে থাকে। আগুন জ্বালবার দরকার হলে আঙুল দিয়ে সিগারেট-লাইটারের মধ্যকার ছোট ইস্পাতের চাকা ঘুরোতে হয়। সেই চাকার সঙ্গে ছোট চকমকি পাথরের ঘষা লেগে আগুনের ফুলকি বার হয়। ভিতরে যে পেট্রলে-ভেজা পলতে থাকে, তাতে আগুনের ফুলকি লেগে দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে। আগুনের প্রয়োজন শেষ হলে সিগারেট-লাইটারের মাথার ঢাকনাটা বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে যায়।

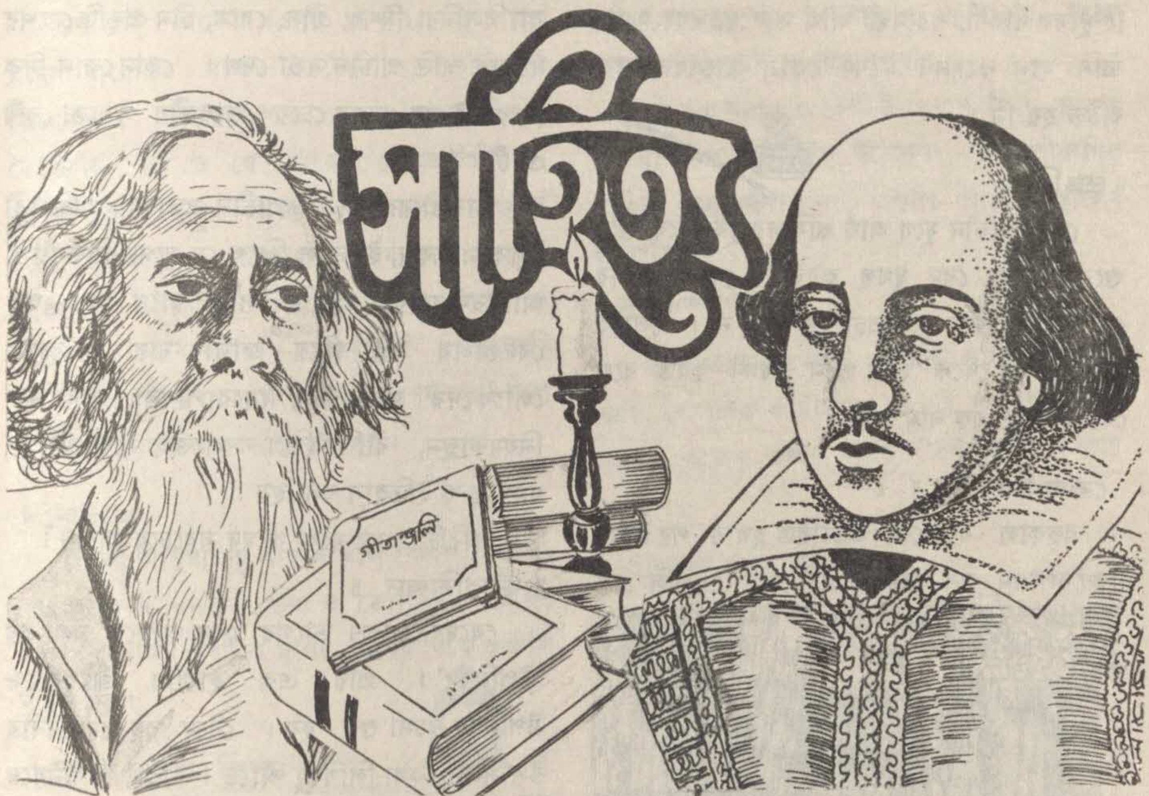
নিরাপদ দিয়াশলাই বা সিগারেট-লাইটার মানুষের বহু উপকার সাধন করে থাকে। এর জন্যে বেশী পয়সা খরচ করতে হয় না। এতেও মানুষ পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়। আরো সহজ ও অল্পব্যয়সাধ্য দিয়াশলাই উদ্ভাবন করার জন্যে লোকে চেষ্টা করে যাচ্ছে।

প্রতিটি দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরে নানা ধরনের রঙিন ছবি থাকে। সারা পৃথিবীর অগণিত কারখানায় তৈরী দিয়াশলাইসমূহে সেই সব ছবি লাগানো থাকে। স্ট্যাম্প যোগাড়ের মতো কারো কারো ওই সব দিয়াশলাই-এর বাক্স যোগাড় করে জমিয়ে রাখবার শখ থাকে। **Teiichi Yoshizawa** (জন্ম ১৯০৪ খ্রী.)-নামে এক জাপানী ভদ্রলোক ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরকার ছবি সংগ্রহ করে যাচ্ছেন। এ পর্যন্ত তিনি ১০০-র অধিক দেশের ৫,৫৯,৭৪৪টি দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরকার ছবি সংগ্রহ করেছেন।

॥ সবচেয়ে পুরানো দিয়াশলাই বাক্সের উপরকার ছবি ॥



জন ওয়াকারের দিয়াশলাই-এর বাক্সের উপরকার ছবি সব চেয়ে পুরাতন (১৮২৭ খ্রী.)। সেই ছবিও জাপানী ভদ্রলোকের সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত আছে।



মানুষ ভাবে। কথা বলে সে তার মনের ভাব প্রকাশ করে। সেই যে কথা তাকে বলে ভাষা। প্রাগৈতিহাসিক যুগে মানুষ তার মনের কথা ভাষার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করত। সেকালে লিপি আবিষ্কৃত হয় নি। অনেক পরে লিপির আবিষ্কার হয়েছে। যে দিন জনসাধারণের মধ্যে সেই সব লিপির প্রচার হল সেই সময় থেকে মুদ্রণ-প্রথা আবিষ্কৃত হল। লিপি ও মুদ্রণ প্রথার আবিষ্কার হতে বহু যুগ কেটে গেছে।

মানুষের চিন্তার লিখিত রূপ—কবিতা, উপন্যাস, নাটক, সন্দর্ভ প্রভৃতি যা অলংকার, ব্যাকরণ, ছন্দ ইত্যাদির সঙ্গে রচিত হয়, তাকে বলা হয় সাহিত্য। এক শ্রেণীর রচনার সমষ্টি সাহিত্য, যেমন—অনুবাদ সাহিত্য, ধর্ম সাহিত্য, বৈজ্ঞানিক সাহিত্য, দার্শনিক সাহিত্য ইত্যাদি।

॥ পূর্বের সব কিছুরই প্রকাশ কবিতায় ॥

আগেকার দিনে মানুষ যা কিছু ভাষায় প্রকাশ করত ও যা লিখত তা সবই কবিতার মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হত। বর্তমান যুগের মতো গদ্যের প্রচলন ছিল না। মানুষ যে-সব বই লিখত, তা কবিতার মাধ্যমে। এমন কি লোকে কবিতায় চিঠি লিখত। গদ্যের প্রচলন অনেক পরে হয়েছে, এখন চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, রচনা, পুস্তক সবই গদ্যে লেখা হয়। কবিতা রচনার রেওয়াজ অনেক কমে গেছে। পৃথিবীর সর্বত্রই গদ্যে পুস্তকাদি রচিত হয় ও ছাপা হয়। নানা ধরনের পুস্তক, সংবাদপত্র, সাময়িক পত্রাদি সবই গদ্যে লেখা হয়।

॥ পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ ॥

পৃথিবীর প্রথম গ্রন্থ ভারতের আর্যদের বেদ। অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছর আগে বেদ রচিত হয়।

হিন্দুদের ধারণা, পরমেশ্বর আর্য ঋষিদের বেদ অর্থাৎ জ্ঞান দান করেন। বেদ কোন মানুষের দ্বারা রচিত হয় নি।



॥ শ্রুতি ॥

সেই প্রাচীন যুগে আর্য ঋষিদের মুখ থেকে শুনে শুনে লোকে বেদ মুখস্থ করত। কোন প্রকার লেখার মধ্য দিয়ে বেদ প্রচারিত হত না। লোকে ঋষিদের মুখ থেকে শুনে শুনে শিক্ষা করত বলে বেদের আর এক নাম শ্রুতি।

॥ বেদ বিভাগ ॥

বহুকাল ধরে বেদ প্রচারিত হবার পর মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন সব বেদ সংগ্রহ করে সেগুলি চার



ব্যাসদেব বেদ বিভাগ করছেন

ভাগে সাজান। বেদ বিভাগ করার জন্যে কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নাম হয় বেদব্যাস। চার ভাগ বেদ—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব।

বেদ শুধু ভারতীয় ঋষিদের রচিত প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র নয়। বেদকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস বলা যেতে পারে। ভারত অ্যাসিরিয়া, সুমের, ব্যাবিলনিয়া, মিশর, গ্রীস, রোম, চীন প্রভৃতি দেশের মতোই অতি প্রাচীন সভ্য দেশ। কোন কোন দিক্ দিয়ে ওই সব দেশের চেয়েও ভারতীয় সভ্যতা বেশী প্রাচীন।

ভারতীয়েরা যতই সুপ্রাচীন সভ্যতার অধিকারী হোক না কেন, ইতিহাস লিখে সে যুগের রীতিনীতি, আচারব্যবহার প্রভৃতি লিখে রাখে নি। শুধু বেদগুলির মধ্য দিয়ে জানা যায় সে-যুগের লোকেদের জীবনযাত্রা, দেবোপাসনা, সামাজিক নিয়মকানুন, রীতিনীতি। কাজেই বেদগুলিকে ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস বলা হয়।

চারিটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ সবচেয়ে প্রাচীন।

॥ উপনিষদ্ ॥

বেদের ব্রাহ্মণ ভাগের শেষ অংশকে বলা হয় 'উপনিষদ্'। প্রায় এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উপনিষদ্ রচনা শুরু হয়। বেদে বহু দেবদেবীর উপাসনার কথা লিখিত আছে। কিন্তু উপনিষদে একমাত্র ব্রহ্মের কথা বলা হয়েছে। ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়, সকল উপনিষদে তাই বলা হয়েছে।



শঙ্করাচার্য উপনিষদের ভাষ্য রচনা করছেন

উপনিষদ্ অনেক (প্রায় ১৫০)। সে সবের মধ্যে বারোটির নাম—ঐতরেয় ও কৌশীতকী (ঋগ্বেদীয়); ছান্দোগ্য ও কেন (সামবেদীয়); তৈত্তিরীয়, কঠ ও শ্বেতাশ্বতর (কৃষ্ণযজুর্বেদীয়); বৃহদারণ্যক, ঈশ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য (শুক্লযজুর্বেদীয়)। জাবাল, পরমহংস, সন্ন্যাস, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, পিণ্ড, আত্ম, চুলিক ও নীলরুদ্র (অথর্ববেদীয়)। শঙ্করাচার্য বারোখানি উপনিষদের ভাষ্য লেখেন। বেদের শেষ ভাগ বলে মূলতঃ উপনিষদ্‌কে বেদান্ত বলা হয়।

॥ বেদাঙ্গ ॥

বেদের আনুষঙ্গিক শাস্ত্রকে বলে বেদাঙ্গ। শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ—এই ছয় প্রকার বেদাঙ্গ। বৈদিক যুগের শেষের দিকে এগুলি রচিত হয়।



॥ স্মৃতি বা সংহিতা ॥

স্মৃতি বা সংহিতা সংস্কৃত ধর্মশাস্ত্র। এগুলি মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক, উশনঃ, অঙ্গিরঃ, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ ও বশিষ্ঠ কর্তৃক লিখিত হয়।

॥ পুরাণ ও উপপুরাণ॥

খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০ অব্দ থেকে আরম্ভ করে ৪০০ অব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৮ খানি মহাপুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণ রচিত হয়। অবশ্য, আরও অনেক পুরাণ ও উপপুরাণের নাম পাওয়া যায়। পুরাণে সৃষ্টি-রহস্য, ধর্মের কথা, ব্রতের নিয়ম সম্বন্ধীয় কথা, দেব-দেবতাদের কথা প্রভৃতি লিখিত আছে। মহাপুরাণ—ব্রহ্মপুরাণ, পদ্মপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ুপুরাণ, ভাগবত, নারদীয় পুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণ, অগ্নিপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, বরাহ-পুরাণ, স্কন্দপুরাণ, বামনপুরাণ, কূর্মপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, গরুড়পুরাণ ও ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

এই সব পুরাণ ও ১৮টি উপপুরাণ নিয়ে বিরাট পৌরাণিক সাহিত্য গড়ে উঠেছে। এই পৌরাণিক সাহিত্য শুধু ধর্মশাস্ত্র নয়, এগুলি প্রাচীন কালের ইতিহাস।

॥ দর্শনশাস্ত্র ॥

দর্শন প্রধানতঃ ছয়টি—বেদান্ত, সাংখ্য, পাতঞ্জল ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসা। এই ষড়্‌দর্শন ছাড়া আরও অনেক দর্শন আছে ('দর্শনশাস্ত্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

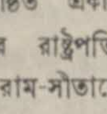
॥ প্রাচীন মহাকাব্য ॥

ভারতের দুখানি অমূল্য মহাকাব্য—রামায়ণ ও মহাভারত। প্রাচীন যুগের ঋষিদের দ্বারা



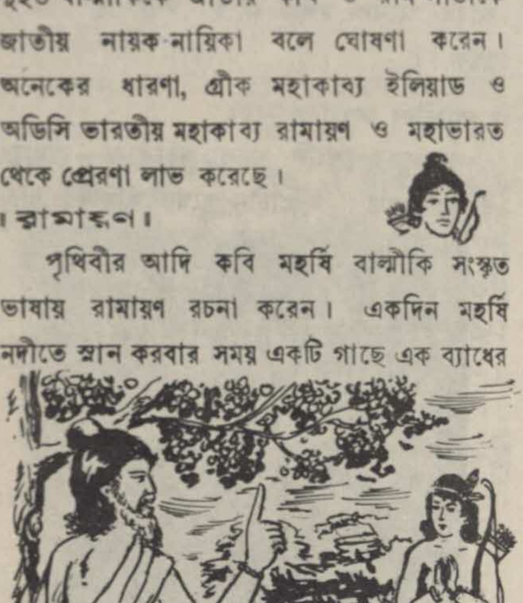
ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহর্ত

রচিত মহাকাব্য দুইটি একাধারে ধর্মশাস্ত্র, পৌরাণিক সাহিত্য ও ইতিহাস। চার হাজার বৎসরেরও আগে রচিত মহাকাব্য দুটি আজও ভারতের সর্বত্র অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করে আসছে ; শুধু ভারতে নয়, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া (কাম্পুচিয়া), শ্রীলঙ্কা, নেপাল, আফগানিস্তান প্রভৃতি দেশে মহাকাব্য দুটির প্রভাব বিদ্যমান। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ সম্বন্ধে অনুষ্ঠিত একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি সুহর্ত বাল্মীকিকে জাতীয় কবি ও রাম-সীতাকে জাতীয় নায়ক-নায়িকা বলে ঘোষণা করেন। অনেকের ধারণা, গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াড ও অডিসি ভারতীয় মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত থেকে প্রেরণা লাভ করেছে।



। রামায়ণ।

পৃথিবীর আদি কবি মহর্ষি বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় রামায়ণ রচনা করেন। একদিন মহর্ষি নদীতে স্নান করবার সময় একটি গাছে এক ব্যাধের



এক ব্যাধ নদীর ধারের গাছের একটি বককে তীর দিয়ে বিঁধেছে। বাল্মীকি তাকে অভিশাপ দিচ্ছেন।

দ্বারা দুই ক্রৌঞ্চের একটিকে (কোঁচ বককে) বাণ-বিদ্ধ হতে দেখে খুবই ব্যথিত হন। তাঁর মুখ দিয়ে একটি শ্লোক নির্গত হয়—

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীসমাঃ
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্॥

বাল্মীকির মুখনিঃসৃত এই দুই পঙ্‌ক্তিই সংস্কৃত ভাষায় প্রথম শ্লোক—পৃথিবীর প্রথম কবিতা।



মহর্ষি বাল্মীকি কর্তৃক রামায়ণ রচনা

মহর্ষি বাল্মীকি ব্রহ্মাকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে রাম-সীতার কাহিনী নিয়ে রামায়ণ রচনা করেন। এই রামায়ণের সাতটি কাণ্ড - আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড। সত্যপালনার্থ দশরথ কর্তৃক রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে প্রেরণ, সীতা ও লক্ষ্মণ সহ রামের বনে গমন, লঙ্কার রাজা রাবণ কর্তৃক পঞ্চবটী বন থেকে সীতা হরণ, সুগ্রীব হনুমানাদির সাহায্যে সবংশে রাবণকে নিধন, অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তনের পর সীতার পাতাল-প্রবেশ, রাম-লক্ষ্মণের সরযূতে আত্মবিসর্জন, দশরথপত্নী কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা, অপর দুই

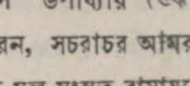


পঞ্চবটী বন থেকে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণ

পুত্র ভরত ও শত্রুঘ্ন প্রভৃতির কথা সুললিত সংস্কৃত কবিতায় লিখিত আছে।

বাঙালী কবি কৃত্তিবাস উপাধ্যায় (ওঝা) বাংলায় যে রামায়ণ রচনা করেন, সচরাচর আমরা তাই পাঠ করে থাকি। এতে মূল সংস্কৃত রামায়ণে নেই, এমন অনেক কাহিনীও আছে। যেমন— রত্নাকর দস্যু, হনুমানের সূর্যকে বগলে পোরা, অহীরাবণ ও মহীরাবণের কথা প্রভৃতি।

সম্ভবতঃ দেড় হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দ আগে ভারতের জাতীয় মহাকাব্য রামায়ণ রচিত হয়।



॥ মহাভারত ॥

মহাভারত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস-রচিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ কাব্যগ্রন্থ। ভারতের এই জাতীয় মহাকাব্য আনুমানিক প্রায় এক হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত হয়। এতে মোট ২,২০,০০০ পঙ্‌ক্তি আছে।

মহাভারতের পর্ব আঠারোটি— আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য,



মহর্ষি ব্যাসদেব কর্তৃক মহাভারত রচনা

সৌপ্তিক, স্ত্রী, শান্তি, অনুশাসন, অশ্বমেধ, আশ্রম-বাসিক, মৌষল, মহাপ্রস্থানিক ও স্বর্গারোহণ।

কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধই মহাভারতের মূল বিষয়বস্তু। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধন, ধৃতরাষ্ট্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর পুত্র যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেবকে তাঁদের ন্যায্য রাজ্যাধিকার থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত করার জন্যে নানা কৌশল অবলম্বন করেন। পাণ্ডুপত্নী কুন্তী ও পাণ্ডবদের পত্নী দ্রৌপদী বহু নির্যাতন ভোগ করেন। কুরুক্ষেত্র-নামক স্থানে আঠারো দিনব্যাপী এক বিরাট যুদ্ধ হয়। এতে সারা ভারতের রাজা ও বীরেরা যোগদান করেন। কর্ণ, ভীষ্ম, দ্রোণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি বীরগণ কৌরব-পক্ষে যোগদান করেন। শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবদের সহায় হন এবং অর্জুনের রথের সারথি হন। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত দুর্যোধন ও তাঁর পক্ষের অধিকাংশ বীরই মারা যান। পাণ্ডবরা অর্জুনপুত্র অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিতের উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করে মহাপ্রস্থানে গমন করেন।



রথে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন

॥ হরিবংশ ॥

হরিবংশ গ্রন্থটির নাম খিল হরিবংশ। শ্রীকৃষ্ণের জীবনকথা নিয়ে গ্রন্থটি রচিত। একে মহাভারতের পরিশিষ্ট বলা চলে।

॥ গীতা ॥

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-নামক গ্রন্থকে সংক্ষেপে গীতা বলা হয়। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গ্রন্থটি এক অপূর্ব পৌরাণিক সাহিত্য ও ধর্মশাস্ত্র। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রারম্ভে যুদ্ধক্ষেত্রে সমবেত আত্মীয়স্বজনদের দেখে অর্জুন বিমর্ষ হয়ে রথের উপর চুপ করে বসে থাকলে শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে বুঝিয়ে দেন আত্মীয়স্বজনদের বধে অর্জুনের কোন অন্যায় হবে না। তিনি আরও অনেক উপদেশ দান করেন। সেই সব কথা গীতায় সুন্দরভাবে লিখিত আছে। মহর্ষি বেদব্যাস কর্তৃক গ্রন্থটি রচিত হয়। এটি হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ও দর্শনশাস্ত্র। পৃথিবীর বহু ভাষায় গীতা অনূদিত হয়েছে।

॥ অশ্বঘোষ ॥

অশ্বঘোষ বিখ্যাত কবি, দার্শনিক ও সংগীতজ্ঞ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমদিকে তিনি মহারাজ কনিষ্কের সভাকবি হন। তিনি প্রথম জীবনে হিন্দু ব্রাহ্মণ ছিলেন, পরে বৌদ্ধ হন। তাঁর রচিত বারোটি গ্রন্থের মধ্যে 'মহাযানশ্রদ্ধোৎপাদনশাস্ত্রম্', 'বুদ্ধচরিত' প্রসিদ্ধ। সেকালে তাঁর রচিত সাহিত্য গ্রন্থের বিশেষরূপ সমাদর ছিল।

॥ ভাস ॥

ভাস সম্ভবতঃ চতুর্থ শতকে দাক্ষিণাত্যে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর সংস্কৃত ভাষায় নাটক-রচয়িতা, তিনি বৎসরাজ উদয়ন ও তাঁর পত্নী বাসবদত্তার কথা নিয়ে যে অতি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন, তার নাম 'স্বপ্নবাসবদত্তা'। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে এইটিই শ্রেষ্ঠ।

॥ কালিদাস ॥

মহাকবি কালিদাস মহারাজ বিক্রমাদিত্যের (২য় চন্দ্রগুপ্তের) নবরত্নসভার শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন। কেউ কেউ তাঁকে প্রথম কুমারগুপ্তের সমসাময়িক বলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি ছিলেন পশ্চিম মালবের অধিবাসী এবং খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

কিংবদন্তী আছে যে, তিনি প্রথম জীবনে অতিশয় মূর্খ ছিলেন, পরে সরস্বতীর কৃপায় ও অপরিসীম চেষ্টা দ্বারা ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবি ও নাট্যকার হন। তাঁর রচিত রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও ঋতুসংহার অতি উৎকৃষ্ট কাব্য। অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ও বিক্রমোর্বশীয়ম্ বিখ্যাত নাটক।

রামায়ণ-বর্ণিত সূর্যবংশের ত্রিশ জন রাজার



মহাকবি কালিদাস কর্তৃক কাব্যরচনা

কাহিনী নিয়ে রচিত 'রঘুবংশ'। 'কুমারসম্ভবে' দেবসেনাপতি কার্তিকের জন্মকাহিনীর বর্ণনা আছে। এক নির্বাসিত বিরহবেদনাতুর যক্ষের মেঘকে দূত করে তাঁর পত্নীর নিকট বার্তা প্রেরণের ব্যাপার নিয়ে মন্দাক্রান্তা ছন্দে রচিত খণ্ডকাব্য 'মেঘদূত'। এ এক অপূর্ব সাহিত্য। 'ঋতুসংহার' প্রকৃতি প্রেম-মূলক কাব্য।

কণ্বমুনির আশ্রমে পালিতা শকুন্তলার সঙ্গে রাজা দুষ্মন্তের বিবাহ, স্মৃতিভ্রংশের ফলে সাময়িক বিচ্ছেদ, পরে পুনরায় মিলনের কাহিনী নিয়ে অপূর্ব ভাষায় রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' নাটক। এই নাটক পৃথিবীর বহু ভাষায় অনূদিত হয়ে সমাদৃত হয়েছে।

কুবেরভবন থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী কেশী-দানব কর্তৃক আক্রান্ত হন। পুরূরবা তাঁকে উদ্ধার করেন। উর্বশী এক অসতর্ক মুহূর্তে দেবসভায় পুরূরবার নাম উচ্চারণ করলে নাট্যাচার্য ভরতের শাপে স্বর্গ থেকে নির্বাসিত হন ও পুরূরবার সঙ্গে থাকতে বাধ্য হন। সেই কাহিনী



কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা

নিয়ে 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' নাটকটি রচিত।

বিদিশাপতি অগ্নিমিত্রের সাহায্যে বিদর্ভের মাধব সেন বিদর্ভে আপনার প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে নিজ সহোদরা মালবিকাকে নিয়ে বিদিশার পথে যাত্রা করেন। পথে নানা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। ঐতিহাসিক পটভূমিকায় মালবিকা ও অগ্নিমিত্রের কাহিনী নিয়ে রচিত হয় কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্' নাটক। ঐতিহাসিকেরা বলেন, 'বিক্রমোর্বশীয়ম্' রচনার পর কালিদাস এই নাটক রচনা করেন। এটি সম্ভবতঃ কালিদাসের দ্বিতীয় রচনা।



॥ শূদ্রক ॥

'মৃচ্ছকটিকম্' একটি সংস্কৃত নাটক। সেটির রচয়িতার নাম শূদ্রক। তিনি ছিলেন বিদিশার রাজা। ঐতিহাসিকদের ধারণা, কোন পণ্ডিত রাজা শূদ্রকের নামে এই নাটকটি রচনা করেন।

নাটকটিতে সে যুগের রাষ্ট্রবিপ্লব এবং ত্যাগ, দান প্রভৃতির নিখুঁত চিত্র আছে। বিদিশার রাজা বিবিধ শাস্ত্রে পারদর্শী শতবর্ষজীবী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

॥ শ্রীহর্ষ ॥

শ্রীহর্ষ নামে কান্যকুব্জে প্রাচীনকালে এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর পিতার নাম শ্রীহরি। শ্রীহর্ষ 'নৈষধচরিতম্' নামে একটি সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন।

কনৌজরাজ হর্ষবর্ধন শ্রীহর্ষ নামে পরিচিত। তিনি 'রত্নাবলী' ও 'নাগানন্দ' নামে দুইটি সংস্কৃত নাটক রচনা করেন। 'প্রিয়দর্শিকা' নামে আর একটি নাটকও তিনি লেখেন।



॥ ভবভূতি শ্রীকণ্ঠ ॥

অষ্টম শতাব্দীর একজন বিখ্যাত নাট্যকার। পিতা নীলকণ্ঠ, পিতামহ গোপাল ভট্ট ও মাতা জাতুকর্ণী। ভবভূতি শ্রীকণ্ঠের জন্মস্থান দক্ষিণাপথের অন্তর্গত বিদর্ভ প্রদেশের পদ্মপুর নগর। শ্রীকণ্ঠ তাঁর উপাধি, তিনি কনৌজরাজ যশোবর্মন ও কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্যের সভাকবি ছিলেন। তিনি মালতীমাধব', 'বীরচরিত' ও 'উত্তরচরিত' নামে তিনটি নাটক রচনা করেন।

॥ বাক্‌পতিরাজ ॥

ভবভূতি শ্রীকণ্ঠের শিষ্য সংস্কৃত কবি। তাঁর রচিত কাব্যের নাম 'গৌড়বহ'। তিনি কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্মনের সভাকবি ছিলেন।

ভট্টনারায়ন ॥

কৃষ্ণনগরের রাজবংশের পূর্বপুরুষ। আদিশূর কান্যকুব্জ থেকে যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, ভট্টনারায়ণ তাঁদের মধ্যে একজন। ভট্টনারায়ণ 'বেণীসংহার' নামে একটি উৎকৃষ্ট নাটক রচনা করেন।

॥ বিশাখদত্ত ॥

রাজা পৃথুর পুত্র ও প্রসিদ্ধ নাট্যকার। 'মুদ্রারাক্ষস' তাঁর রচিত নাটক।

॥ যশোবর্মন ॥

কান্যকুব্জের রাজা। তিনি 'রামাভ্যুদয়' নামে একটি নাটক রচনা করেন।

॥ মহেন্দ্রবর্মন ॥

প্রাচীনকালের খ্যাতিমান্ লেখক। তাঁর রচিত একটি নাটকের নাম 'মত্তবিলাস'।

॥ রাজশেখর ॥

প্রাচীন কালের একজন বিখ্যাত সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা ও কবি। তিনি ছয়খানি নাটক রচনা করে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তন্মধ্যে চারিটি নাটকের নাম—'কর্পূরমঞ্জরী', 'বালরামায়ণ', 'বালমহাভারত' ও 'বিদ্ধশালভঞ্জিকা'। তিনি বহু কবিতা রচনা করে গেছেন।

॥ শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ॥

বিখ্যাত রূপকধর্মী নাটক 'প্রবোধচন্দ্রোদয়ে'র রচয়িতা। কেউ কেউ বলেন, তাঁর প্রকৃত নাম কেশব মিশ্র।

॥ শ্রীকৃষ্ণ তর্কালংকার ॥

'চন্দ্রদূত'-নামক খণ্ডকাব্যের রচয়িতা। তিনি দায়ভাগের টীকা, কাব্যপ্রকাশের টীকা ও শ্রাদ্ধ-বিবেকের টীকাও রচনা করেন।

॥ শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম ॥

অপর নাম শ্রীকৃষ্ণ শর্মা। প্রাচীন কালের বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পিতামহ নবদ্বীপরাজ রামজীবনের সভাপণ্ডিত

ছিলেন। খণ্ডকাব্য 'পদাঙ্কদূত' তাঁর রচনা।

॥ আর্যশূর ॥

প্রাচীন কালের বিখ্যাত কবি। তাঁর কাব্য-গ্রন্থের নাম 'জাতকমালা'।

॥ নাগার্জুন ॥

'সুহৃল্লেখ' ও 'মধ্যমকারিকা' নামে দুটি সাহিত্য-রসোচ্ছল কাব্য প্রণয়ন করে বিখ্যাত হয়ে আছেন।

॥ আর্যদেব ॥

আর্যদেব কয়েকটি কাব্য রচনা করেন বলে জানা যায়। সে-সবের মধ্যে 'চতুঃশতিকা' কাব্য সুপ্রসিদ্ধ।

॥ অসঙ্গ ॥

প্রাচীন কালের একজন শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ দার্শনিক। তিনি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীতে পুরুষপুরে (পেশোয়ারে) আবির্ভূত হন। তাঁর রচিত বহু গ্রন্থের মধ্যে 'মহাযান সূত্রালংকার' ও 'মহাযান সম্পরিগ্রহশাস্ত্র' সুপ্রসিদ্ধ।

॥ ভারবি ॥

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। তাঁর রচিত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'কিরাতার্জুনীয়ম্'।

॥ মাঘ ॥

ধারা নগরীর রাজা ভোজদেবের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। পিতার নাম শ্রীদত্তক সর্বাশ্রয়। তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ 'শিশুপালবধ'।

॥ ভট্টি ॥

বিখ্যাত 'ভট্টিকাব্যে'র (রাবণবধ মহাকাব্যের) রচয়িতা। বলভীর রাজা ধরসেনের দ্বারা পালিত হন। 'ভট্টিকাব্য' পাণিনিসূত্রের উদাহরণমূলক হলেও কাব্যগুণে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে। ভট্টি নামধারী একাধিক পণ্ডিত ছিলেন। ভরত মল্লিকের মতে রাজা ভর্তৃহরি ও ভট্টি একই ব্যক্তি।

॥ ভর্তৃহরি ॥

উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন। তিনি 'বৈরাগ্যশতক', 'নীতিশতক' ও 'শৃঙ্গারশতক' গ্রন্থের রচয়িতা। পতঞ্জলি পাণিনি মহাকাব্যের 'বাক্যপ্রদীপ'-নামক টীকা রচনা করেন।

॥ কহ্লণ ॥

কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। কাশ্মীরের রাজাদের ইতিহাস কবিতায় রচনা করে বিখ্যাত হন। সেই রচনা-গ্রন্থের নাম 'রাজতরঙ্গিণী'। গ্রন্থখানি ১১৪৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। কহ্লন কাশ্মীরের এক রাজার মন্ত্রিপুত্র ছিলেন।

॥ সোমদেব ভট্ট ॥

প্রসিদ্ধ 'কথাসরিৎসাগর'-নামক সংস্কৃত আখ্যায়িকার রচয়িতা। গ্রন্থটি কাশ্মীরাধিপতি রাজা অনন্তদেবের রানী সূর্যবতীর সন্তোষবিধানের জন্য রচিত হয়।

॥ জয়দেব ॥

১২শ শতকের প্রসিদ্ধ সংস্কৃত কবি। প্রথমে রাজা লক্ষ্মণসেনের, পরে উৎকলরাজের সভাকবি হন। বীরভূম জেলার কেন্দুবিল্ব গ্রামে জন্ম হয়। পিতা ভোজদেব। পত্নী পদ্মাবতী। প্রসিদ্ধ গীতিকাব্য 'গীতগোবিন্দ' রচনা করেন। গীত-গোবিন্দের 'দেহি পদপল্লবমুদারম্' ছত্রটি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের রচনা বলে কিংবদন্তী আছে।

প্রাকৃত ও পালি সাহিত্য

কত যে সংস্কৃত ভাষার কবি, নাট্যকার, আখ্যায়িকাকার বিভিন্ন সময়ে কত যে গ্রন্থ রচনা করে গেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। সংস্কৃত



গীতগোবিন্দ রচনারত জয়দেব

ভাষার পরে দেশে প্রাকৃত ভাষার প্রচলন হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রাকৃত ভাষা প্রচলিত হয় (বঙ্গদেশে মাগধী প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত প্রভৃতি)। 'গাথাসপ্তশতী', 'বৃহৎকথা' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় রচিত হয়। প্রাকৃত ভাষা বলে গণ্য পালি ভাষাতেও বহু গ্রন্থ রচিত হয়। বেশির ভাগ বৌদ্ধ গ্রন্থ পালি ভাষায় রচিত হয়। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ 'ত্রিপিটক' পালি ভাষায় রচিত। গ্রন্থটির তিনটি বিভাগ– সুত্ত (সূত্র) বিনয় ও অভিধম্ম (অভিধর্ম)।

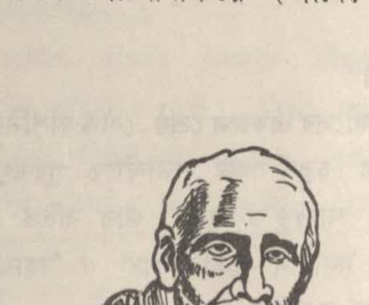
বহু সংস্কৃত নাটকে সাধারণ লোকের কথাবার্তায় ও মেয়েদের কথাবার্তায় প্রাকৃত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে। মহাকবি কালিদাসের সংস্কৃত নাটক অভিজ্ঞানশকুন্তলমে এই রকম করা হয়েছে।

প্রাকৃত ভাষা ও পালি ভাষার প্রচলন বন্ধ হয়ে গেলে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে প্রাদেশিক ভাষার চলন হয়। বঙ্গদেশে বঙ্গভাষার প্রচলন হয়। বঙ্গভাষা বা বাংলা ভাষার প্রচলন হতে থাকলেও বহু লেখক বহু গ্রন্থ সংস্কৃতে রচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্য

॥ আদি যুগ ॥

বাংলা ভাষা ভারতের, এমন কি পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা। কিন্তু মাত্র হাজার খানেক বছর আগে এই ভাষার প্রচলন হয়। আদিযুগে অর্থাৎ প্রথমদিক্‌কার যুগে এই ভাষা ছিল কিম্ভূতকিমাকার। সব চেয়ে পুরাতন বাংলা ভাষায় লেখা বই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' (সংক্ষেপে চর্যাপদ),



হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

যেটি মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩২ খ্রী.) নেপাল রাজদরবারের পুঁথিপত্তর ঘাঁটতে ঘাঁটতে ১৩২৩ বঙ্গাব্দে আবিষ্কার করেন, তার ভাষা দেখলেই বুঝতে পারা যায়, বর্তমান কালের ভাষা থেকে আদি যুগের বাংলা ভাষার

কতখানি পার্থক্য ছিল। চর্যাপদে সাড়ে ছেচল্লিশটি গান আছে। এই গানগুলিকে চর্যা বা চর্যাপদ বলে। তেইশ চব্বিশ জন বৌদ্ধ সহজিয়া পণ্ডিত এগুলি রচনা করেন। দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ।

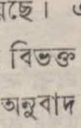
॥ মধ্যযুগ ॥

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ বলতে বোঝায়, ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত কালকে। মধ্যযুগের প্রথম দিক্‌কার বই বিশেষ সংগ্রহ করা যায় নি। বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্তবড়ু চণ্ডীদাসের লেখা যে বইটি পাওয়া গেছে, সেই বইটির নাম জানা যায় নি। কারণ, বইটি ছেঁড়াকাটা অবস্থায় পাওয়া যায়। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক রচনা বলে বইটির নাম দেওয়া হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। এই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার সঙ্গেও বর্তমান কালের বাংলা ভাষার অনেক পার্থক্য।

মধ্যযুগে অসংখ্য বই রচিত হয়েছে। এই যুগের সাহিত্যকে প্রধানতঃ পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করা হয় —(১) মঙ্গলকাব্য সাহিত্য, (২) অনুবাদ সাহিত্য, (৩) বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, (৪) চৈতন্যজীবনী সাহিত্য ও শাক্তপদ সাহিত্য।

॥ মঙ্গলকাব্য সাহিত্য ॥

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাখ্যানমূলক কাব্যগুলিকে বলা হয় মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যও ছিল নানা প্রকার। সে সবের মধ্যে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, শিবমঙ্গল, কালিকামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি বিভিন্ন রকম মঙ্গলকাব্য ছিল।



॥ মনসামঙ্গল ॥

দেবী মনসাকে নিয়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচিত। চম্পাই নগরের বণিক শিবভক্ত চাঁদ সদাগর মনসার পূজা করতে অসম্মত হলে মনসা দেবী চাঁদের সব ছেলেকে মেরে ফেলেন। মনসা দেবীর পাঠানো সাপের কামড়ে চাঁদের ছোট ছেলে লখীন্দর মারা যান। লখীন্দরের নববিবাহিতা পত্নী



ভেলায় বেহুলা ও লখীন্দর

বেহুলা ভেলায় করে মৃত স্বামীকে নিয়ে স্বর্গে উপস্থিত হন। বেহুলার অনুরোধে দেবতারা চাঁদকে মনসার পূজা করতে সম্মত করান। তখন লখীন্দর মনসাদেবীর কৃপায় পুনর্জীবন লাভ করেন। মনসামঙ্গলের বিষয়বস্তু এই চাঁদ-মনসার বিবাদ। দ্বিজ বংশীদাস, হরিদত্ত, নারায়ণদত্ত প্রভৃতি বহু কবি বিভিন্ন সময়ে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। সেগুলির মধ্যে পঞ্চদশ শতকের বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গল সুবিখ্যাত।

॥ চণ্ডীমঙ্গল ॥

দুর্গার অপর নাম চণ্ডী। তাঁকে নিয়ে যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয় তার নাম চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।



কালকেতু ও স্বর্ণগোধিকা

অনেক কবি বিভিন্ন সময়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। সে সবের মধ্যে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (১৬শ-১৭শ শতক)-রচিত চণ্ডীমঙ্গল কাব্য সর্বশ্রেষ্ঠ। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য কবিকঙ্কণ চণ্ডী নামে প্রসিদ্ধ। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে আছে, চণ্ডীদেবী কৈলাস ত্যাগ করে নিজ পূজার প্রচারের জন্যে কালকেতুর গৃহে গোধিকারূপে গমন করেন। দেবীর পূজা করলে কালকেতু অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। ধনপতি নামে এক বণিকের স্ত্রী খুল্লনা তাঁর সতীন লহনার দ্বারা বহুভাবে নিগৃহীত হন। চণ্ডীদেবীর পূজা করলে খুল্লনার ভাগ্য ফিরে যায়। ধনপতি চণ্ডীদেবীকে পূজা না করায় বহু কষ্ট ভোগ করেন ও সিংহলে বন্দী হন। পুত্র শ্রীমন্ত চণ্ডীদেবীর কৃপায় পিতাকে মুক্ত করেন।



॥ ধর্মমঙ্গল ॥

রাঢ় অঞ্চলের দেবতা ধর্মঠাকুরের কথা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মাণিকরাম গাঙ্গুলী, ঘনরাম চক্রবর্তী, রূপরাম চক্রবর্তী প্রভৃতি বহু কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত ঢেকুর-গড়ের ইছাই ঘোষের সঙ্গে যুদ্ধে ধর্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র মারা যায়। কর্ণসেনের সঙ্গে গৌড়ের রাজার শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়। কর্ণসেন-রঞ্জাবতীর লাউসেন নামে পুত্র হয়। লাউসেনের সঙ্গে ইছাই ঘোষের যুদ্ধ ও মৃত্যু এবং লাউসেনের বীরত্বের নানা আশ্চর্যজনক কাহিনী নিয়ে ধর্মমঙ্গল রচিত।

॥ নরসিংহ দেব ॥

অষ্টাদশ শতকের কবি। তিনি ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। বর্ধমান জেলার রাখাবি গ্রাম তাঁর জন্মস্থান।

॥ অনুবাদ সাহিত্য ॥

চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি বাংলায় অনুবাদ করা হয়।

॥ মালাধর বসু ॥

গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের মন্ত্রী ও রূপ-সনাতনের নিয়োগকর্তা মালাধর বসু শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের অনুবাদ করেন। সেই অনুবাদগ্রন্থের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'। এতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে দেহত্যাগ পর্যন্ত বর্ণনা আছে। হুসেন শাহ্ তাঁকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দেন।

॥ কৃত্তিবাস ওঝা ॥

কৃত্তিবাস ওঝা (উপাধ্যায়) খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর শেষভাগে নদীয়া জেলার ফুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। গৌড়েশ্বরের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃত্তিবাস বাল্মীকির সংস্কৃত রামায়ণের কাহিনী বাংলা পদ্যে রচনা করেন। সচরাচর আমরা তাঁর

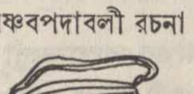
অনুবাদগ্রন্থ রামায়ণই পাঠ করে থাকি। অবশ্য বাল্মীকি রামায়ণে নেই এমন বহু কথা তিনি লিখে গেছেন। তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন।

॥ কাশীরাম দাস ॥

ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধ ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের কবি কাশীরাম দাস ব্যাসদেবের সংস্কৃত মহাভারতের আদিপর্ব, সভাপর্ব, বনপর্ব ও বিরাটপর্বের কিছু অংশ লিখে মারা যান। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরাম বাকী অংশ লেখেন। কাশীরাম জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় বর্ধমান জেলার সিঙ্গি গ্রামে। তাঁর পিতা কমলাকান্ত সপরিবারে উড়িষ্যায় (ওড়িশায়) বাস করতেন।

॥ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য ॥

বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস প্রভৃতি অনেক কবি বিভিন্ন সময়ে রাধাকৃষ্ণের লীলা নিয়ে বৈষ্ণবপদাবলী রচনা করে গেছেন।



॥ বিদ্যাপতি ॥

মিথিলাপ্রবাসী বাঙালী কবি বিদ্যাপতি (আনুমানিক ১৪০০—১৫০৬ খ্রী.) মিথিলার রাজা শিবসিংহের সভাকবি ছিলেন। তিনি মৈথিলী বাংলায় রাধা-কৃষ্ণবিষয়ক বহু পদাবলী রচনা করে গেছেন। 'পুরুষপরীক্ষা', 'দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী', 'বিবাদসার' প্রভৃতি পুস্তক তাঁর লেখা। অনেকের মতে বিদ্যাপতি নামে একাধিক কবি ছিলেন।

॥ বিদ্যাপতি কবিরঞ্জন ॥

এঁকে বলা হয় ছোট বিদ্যাপতি। তিনি বর্ধমান জেলার শ্রীখণ্ডবাসী বৈষ্ণবকবি। রঘুনন্দন ঠাকুর তাঁর গুরু। তিনি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক বহু বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করে গেছেন।

॥ চণ্ডীদাস ॥

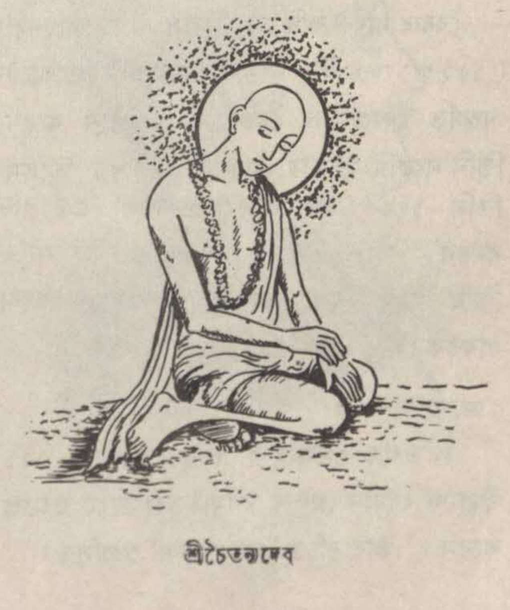
চণ্ডীদাস নামে বাংলা সাহিত্যে একাধিক কবির নাম পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচয়িতা অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসের কথা আগেই বলা হয়েছে। দীন চণ্ডীদাস ও দ্বিজ চণ্ডীদাস নামে দুজন কবির নাম পাওয়া যায়। চৈতন্যোত্তর যুগের কবি চণ্ডীদাসই প্রসিদ্ধ। তিনি বীরভূম জেলার নান্নুর বা বাঁকুড়া জেলার ছাতনা গ্রামের বাশুলী দেবীর পূজারী ছিলেন। দুই স্থানের দুই জন চণ্ডীদাসও হতে পারেন। চণ্ডীদাসের বৈষ্ণবপদাবলী পুরোপুরি বাংলায় রচিত ও অপূর্ব রসনিষিক্ত।

॥ জ্ঞানদাস ॥

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদাবলী-রচয়িতা জ্ঞানদাস বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত বহু সুমধুর পদ আছে।

॥ চৈতন্যজীবনী সাহিত্য ॥

আধুনিক প্রেমভক্তিমূলক বৈষ্ণবমতের প্রবর্তক চৈতন্যদেব (১৪৮৫-১৫৩৩ খ্রী.) স্ত্রী বিষ্ণুপ্রিয়া ও



শ্রীচৈতন্যদেব

মাতা শচীদেবীর মায়া ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। তিনি দণ্ডী কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং বাংলায়, উড়িষ্যায় (ওড়িশায়) ও দক্ষিণ ভারতের নানাস্থানে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন ও সকলকে কীর্তনের মাধ্যমে হরিভক্তিতে মাতিয়ে তোলেন। তাঁর অপূর্ব জীবনকাহিনী নিয়ে রূপ গোস্বামীর শিষ্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ বৃন্দাবনদাস ॥

বৃন্দাবনদাস ঠাকুর (১৫০৭-১৬০৯ খ্রী.) হালিশহরের নতিগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। আনুমানিক ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'চৈতন্যমঙ্গল' নামে চৈতন্যজীবনীমূলক গ্রন্থ রচনা করেন, পরবর্তী কালে তার নাম হয় চৈতন্যভাগবত। 'পদকল্পতরু'তে তাঁর রচিত ৩০টি পদ আছে। 'নিত্যানন্দবংশ বিস্তার', 'চৈতন্যলীলামৃত', 'ভক্তিচিন্তামণি', 'ভজন-নির্ণয়' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি প্রনয়ন করেন।



॥ লোচনদাস ॥

বৈষ্ণব সাধক কবি লোচনদাস বা ত্রিলোচনদাস (১৫২৩-১৫৮৯ খ্রী.) বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটের অন্তর্গত কোগ্রামের বৈদ্যবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নরহরি সরকার ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। তিনি ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর রচিত বহু পদাবলী প্রচলিত আছে। তিনি বাংলা কথ্য ভাষার ও মাত্রাবৃত্ত ছন্দের প্রবর্তক।

॥ জয়ানন্দ ॥

অভিরাম গোস্বামীর শিষ্য জয়ানন্দ ১৫১২ খ্রীষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার আমাইপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত 'চৈতন্যমঙ্গল' সুপ্রসিদ্ধ।

॥ গোবিন্দদাস ॥

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবপদরচয়িতা কবি গোবিন্দদাস (১৫৩৫-১৬১৩ খ্রী.) শ্রীখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বহু বৈষ্ণবপদাবলী রচনা ছাড়া সংস্কৃতে 'সংগীত মাধব' (নাটক) ও 'কর্ণামৃত' নামে দুখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। বিদ্যাপতির 'প্রেম কি অঙ্কুর' পদটি সম্পূর্ণ করে 'কবিরাজ' উপাধি পান।

॥ গোবিন্দদাস চক্রবর্তী ॥

গোবিন্দদাসের সমকালীন বৈষ্ণব কবি। তিনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন। তিনি পুরোপুরি বাংলায় পদাবলী রচনা করেন। তাঁর অনেক পদাবলী গোবিন্দদাসের পদাবলীর সঙ্গে মিশে গেছে।

॥ শ্রীনিবাস আচার্য ॥

বিখ্যাত গৌরাঙ্গভক্ত। নদীয়া জেলার চাকন্দী গ্রামে জন্ম। তাঁর কয়েকটি মধুর পদাবলী আছে।

॥ শাক্ত পদাবলী সাহিত্য ॥

দেবী দুর্গা ও কালিকা শক্তির দেবী। তাঁদের নিয়ে যে-সব গান বিভিন্ন সময়ে রচিত হয়েছে, সেই সব গানকে শাক্ত পদাবলী বলে।

॥ রামপ্রসাদ সেন ॥

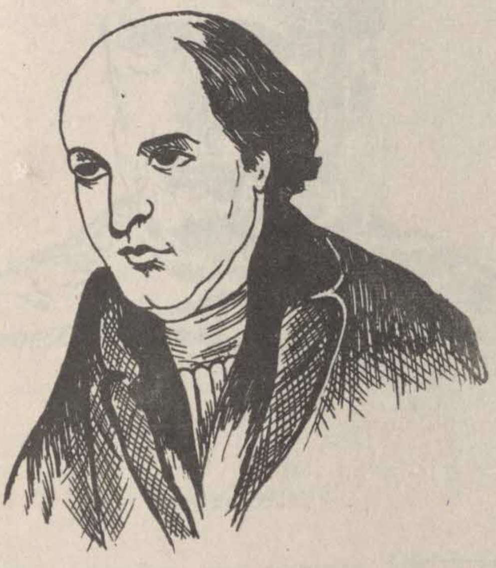
রামপ্রসাদ সেন কবিরঞ্জন (১৭২৩-১৭৭৫ খ্রী.) প্রসিদ্ধ শাক্ত পদাবলীরচয়িতা সাধক কবি। তিনি হালিশহরের পাশে কুমারহট্ট গ্রামের অধিবাসী। তিনি প্রসিদ্ধ শ্যামাসংগীত-রচয়িতা। তাঁর রচিত 'কালীকীর্তন' সুবিখ্যাত।

॥ কমলাকান্ত ভট্টাচার্য ॥

বর্ধমানের মহারাজার সভাপণ্ডিত সাধক কমলাকান্ত ১২১৬ বঙ্গাব্দে বর্তমান ছিলেন। তাঁর রচিত বহু শ্যামাসংগীত বাংলার সর্বত্র আজও প্রচলিত।

॥ শ্রীরামপুরে কেরী সাহেবের ছাপাখানা ॥

প্রসিদ্ধ ইংরেজ মিশনারী উইলিয়াম ডি. ডি. কেরী (William D. D. Carey, ১৭৬১-১৮৩৪



উইলিয়াম কেরী

খ্রী.) শ্রীরামপুরে একটি ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পঞ্চানন কর্মকারের তৈরী টাইপ দিয়ে একটি বাংলা ব্যাকরণ, বাংলা-ইংরেজী অভিধান (১৮২৫ খ্রী.), রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুশর্মার হিতোপদেশ প্রভৃতি ছেপে প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন সময়ে বঙ্গদেশে কত যে কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, প্রবন্ধকার, গীতিরচয়িতা প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেছেন তা বলে শেষ করা যায় না। ভারতচন্দ্র রায়, ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আরম্ভ করে বর্তমান কালের নানা কবি ও সাহিত্যিকের রচনায় বাংলা সাহিত্য দিন দিন উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে।

॥ ভারতচন্দ্র রায় ॥

ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর (১৭১২-১৭৬০ খ্রী.) পেঁড়োবসন্তপুর গ্রামের জমিদারবংশীয় মুখোপাধ্যায়-বংশীয় ব্রাহ্মণ। তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভার সভাকবি ছিলেন। তিনি 'অন্নদামঙ্গল' 'বিদ্যাসাগর' ও 'রসমঞ্জরী'-নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

॥ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ॥

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১২১৮-১২৬৫ বঙ্গাব্দ) বঙ্কিমচন্দ্র ও দীনবন্ধুর গুরু ছিলেন। তিনি 'সংবাদ প্রভাকর'-নামক পত্রিকা প্রকাশ করেন। 'প্রবোধ প্রভাকর', 'হিতপ্রভাকর', 'বোধেন্দুবিকাশ' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ। তিনি খাঁটি বাঙালী কবি ছিলেন।

॥ রাজা রামমোহন রায় ॥

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রী.)



রামমোহন রায়

ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা। হুগলী জেলার অন্তর্গত রাধানগরের খানাকুল গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। তিনি 'বেদান্তসার', 'বেদান্তগ্রন্থ', 'ভট্টাচার্যের সহিত বিচার', 'গোস্বামীর সহিত বিচার' প্রভৃতি ৭০ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বাংলা গদ্যকে সাহিত্যের উপযোগী করে গড়ে তোলেন। তিনি দিল্লীর বাদশাহের প্রতিনিধি হিসাবে বিলাতে যান। ব্রিস্টলে তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭-১৯০৫ খ্রী.) শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠাতা।



দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর

তাঁর লেখা বাংলা রচনা খুব মধুর ছিল। তিনি 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশ করেন।



॥ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ॥

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রী) মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আধুনিক বাংলা গদ্য-সাহিত্যের জনক বলা হয়। তিনি সীতার বনবাস', 'কথামালা', বোধোদয়', 'চরিতাবলী', 'আখ্যান মঞ্জরী', 'উপক্রমণিকা', 'ব্যাকরণ কৌমুদী', 'ঋজুপাঠ', 'শকুন্তলা', 'উত্তররামচরিত', 'বর্ণপরিচয়', ভ্রান্তিবিলাস', 'বেতাল পঞ্চবিংশতি' প্রভৃতি বহুগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সর্বজনপূজ্য



ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

মহামনীষীই বাক্যমধ্যে কমা, সেমিকোলন, দাঁড়ি ইত্যাদির ব্যবহারপ্রথা চালু করেন।

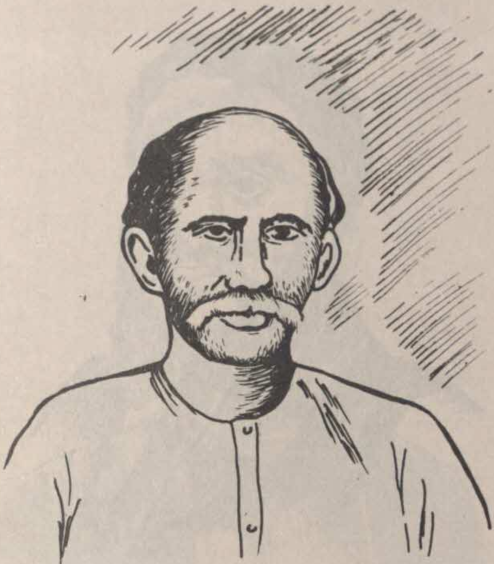
॥ টেকচাঁদ ঠাকুর ॥

প্যারীচাঁদ মিত্র টেকচাঁদ নামে পরিচিত (১৮১৪-১৮৮৩ খ্রী.)। তিনি কথ্য ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' নামে বাংলা ভাষায় প্রথম উপন্যাস রচনা করেন। তিনি 'জাত থাকার কি উপায়', 'আধ্যাত্মিকা' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রণেতা।

॥ অক্ষয়কুমার দত্ত ॥

অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬ খ্রী.) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক হন। বাংলা সাহিত্যে বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধে সার্থক রচনা তিনিই প্রথম প্রকাশ করেন। তাঁর 'চারুপাঠ' (তিন ভাগ), 'ভূগোল', 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব-প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার',

'ধর্মনীতি', 'পদার্থবিদ্যা', 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা গদ্য সাহিত্যকে উন্নত করেন।



অক্ষয়কুমার দত্ত

॥ ভূদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

বিখ্যাত শিক্ষাব্রতী ও বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্য রচনাকার। ভূদেবচন্দ্র (১৮২৭-১৮৯৪ খ্রী.) 'পারিবারিক প্রবন্ধ', 'সামাজিক প্রবন্ধ', 'আচার প্রবন্ধ', 'সফল স্বপ্ন', 'স্বপ্নলব্ধ ভারতের ইতিহাস', 'পুষ্পাঞ্জলি', 'ক্ষেত্রতত্ত্ব', 'পুরাবৃত্তসার' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করে বাংলা গদ্যসাহিত্যের উন্নতিসাধন করেন।

॥ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮–১৮৯৫ খ্রী) ২৪ পরগনা জেলার কাঁঠালপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে বাংলার শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক ও 'বন্দেমাতরম্' মন্ত্রের ঋষি বলা হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'বিষবৃক্ষ',



বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্কিমচন্দ্র একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক হিসাবেও বিখ্যাত। তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র', 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

॥ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র (১৮৩৪-১৮৮৯ খ্রী.) একজন প্রথম শ্রেণীর প্রবন্ধলেখক ছিলেন। তাঁর লেখা 'পালামৌ', 'জাল প্রতাপচাঁদ' প্রভৃতি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। তিনি 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদক ছিলেন।

॥ রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ॥



বিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক লেখক ও প্রবন্ধকার। রামেন্দ্রসুন্দর (১৮৬৪-১৯১৯ খ্রী.) 'প্রকৃতি', 'জিজ্ঞাসা', 'কর্মকথা', 'চরিত-কথা', 'নানাকথা', 'বিচিত্র প্রসঙ্গ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে বাংলা



রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

সাহিত্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম ছিলেন।

॥ রামনারায়ণ তর্করত্ন ॥



রামনারায়ণ তর্করত্ন (১৮২২-১৮৮৬ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার। ২৪ পরগনা জেলার হরিনাভি গ্রামে তাঁর জন্ম। তাঁর 'কুলীনকুলসর্বস্ব' প্রথম বাংলা সামাজিক নাটক(১৮৫৪ খ্রী.)। 'বেণী-সংহার নাটক', 'রত্নাবলী নাটক', 'অভিজ্ঞান শকুন্তল নাটক', 'নব-নাটক', 'মালতীমাধব নাটক', 'যেমন কর্ম তেমন ফল', 'চক্ষুদান' প্রভৃতি বহু নাটক তিনি রচনা করেন। লোকে তাঁকে বলত নাটুকে রামনারায়ণ। 'দক্ষযজ্ঞম্', 'আর্যশতকম্' প্রভৃতি তাঁর সংস্কৃত রচনা।

॥ মাইকেল মধুসূদন দত্ত ॥

বাংলা ভাষায় প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক প্রসিদ্ধ কবি ও সাহিত্যিক মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩ খ্রী.) বর্তমান বাংলাদেশের যশোহরের সাগরদাঁড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করে মাইকেল উপাধি লাভ করেন।



মাইকেল মধুসূদন দত্ত

'মেঘনাদবধ' কাব্য তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। তিনি 'শর্মিষ্ঠা', 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ', 'পদ্মাবতী নাটক', 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য', 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য', 'কৃষ্ণকুমারীনাটক', 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী,' 'হেক্টর বধ', 'মায়াকানন' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ইংরেজী রচনায়ও তাঁর বিশেষ কৃতিত্ব ছিল।

॥ রাজকৃষ্ণ রায় ॥

প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক রাজকৃষ্ণ রায় (১৮৪৯-১৮৯৪ খ্রী.) ভঙ্গ-অমিত্রাক্ষরের অন্যতম স্রষ্টা। 'পতিব্রতা', 'লয়লা-মজনু', 'দ্বাদশ গোপাল' (১৮৭৮ খ্রী), 'বামনভিক্ষা' (১৮৮৫ খ্রী.), 'হিরণ্ময়ী', 'কিরণ্ময়ী', গিরিসন্দর্শন', 'আগমনী', 'নিভৃত নিবাস' প্রভৃতি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

॥ দীনবন্ধু মিত্র ॥

বিখ্যাত নাটক 'নীলদর্পণে'র রচয়িতা দীনবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ



দীনবন্ধু মিত্র

নাট্যকার। 'নবীন তপস্বিনী', 'সধবার একাদশী' (সামাজিক নাটক), 'কমলে কামিনী', 'লীলাবতী', 'বিয়ে পাগলা বুড়ো', 'জামাই বারিক' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।

॥ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ॥

বিখ্যাত নট, নাট্যকার ও রঙ্গমঞ্চপরিচালক গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১ খ্রী.) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। 'সীতার বনবাস', 'বিল্বমঙ্গল ঠাকুর', 'সিরাজুদ্দৌলা', 'মীরকাশিম', 'প্রফুল্ল', 'বলিদান', 'শাস্তি কি শান্তি', 'তপোবন', 'লক্ষ্মণ বর্জন', 'পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস', 'পাণ্ডব কৌরব', 'ছত্রপতি', 'হারানিধি' প্রভাসযজ্ঞ', 'চৈতন্যলীলা', 'আশাতরু' প্রভৃতি ৭০ খানি নাটক, প্রহসন ও গীতিনাট্য রচনা করেন।



গিরিশচন্দ্র ঘোষ

॥ অমৃতলাল বসু ॥

অমৃতলাল বসু (১৮৫৩-১৯২৯ খ্রী) ছিলেন একজন যশস্বী নট ও নাট্যকার। তাঁর নাটক ও



অমৃতলাল বসু

প্রহসনের মধ্যে 'হরিশ্চন্দ্র', 'তরুবালা', 'খাসদখল',

'বিবাহবিভ্রাট', 'বিজয়বসন্ত', 'অবতার', 'ব্যাপিকা বিদায়' প্রভৃতি বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাঁর রচিত অনেক গান আছে।

॥ ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ ॥

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ (১৮৬৩-১৯২৭ খ্রী) 'আলিবাবা', নন্দকুমার', 'আলমগীর', 'নিবেদিতা', 'সাবিত্রী'. 'বঙ্গেশ্বর প্রতাপাদিত্য', 'পদ্মিনী', 'চাঁদবিবি', মিশরকুমারী' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ॥

বিখ্যাত গীতিকার ও নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রী.) নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে



দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

জন্মগ্রহণ করেন। 'চন্দ্রগুপ্ত', 'সাজাহান', 'মেবার পতন', 'পুনর্জন্ম', 'পরপারে', 'আষাঢ়ে' 'ত্র্যহস্পর্শ', প্রায়শ্চিত্ত', 'কল্কি অবতার', 'পাষাণী', 'সীতা', 'ভীষ্ম', 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' প্রভৃতি নাটক ও প্রহসন তিনি রচনা করেন। তিনি বহু উৎকৃষ্ট সংগীত রচনা করেন। ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকার তিনি প্রতিষ্ঠাতা। দিলীপ কুমার রায় তাঁর পুত্র।

॥ রমেশচন্দ্র দত্ত ॥

রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯ খ্রী.) ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তাঁর 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা', 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত', 'মাধবীকঙ্কণ', 'বঙ্গবিজেতা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক উপন্যাস সুপ্রসিদ্ধ। 'সমাজ', 'সংসার' প্রভৃতি কয়েকটি সামাজিক উপন্যাসও তিনি রচনা করেন। তিনি বরোদা রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী হয়েছিলেন।

॥ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

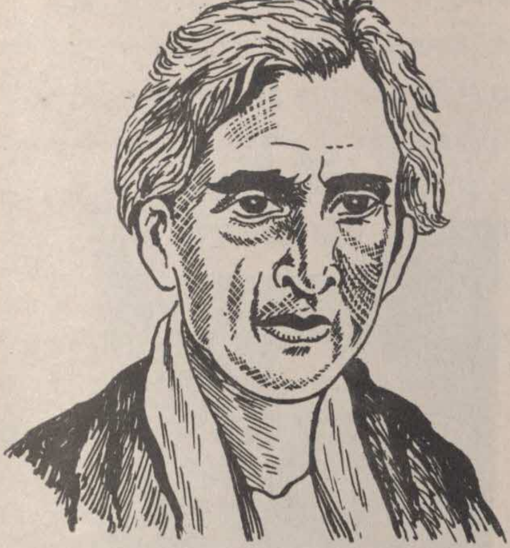
বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৯২-১৩৩৭ বঙ্গাব্দ) মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পা গ্রাম খনন করিয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর রচিত 'শশাঙ্ক', 'ময়ূখ', 'ধর্মপাল', 'পাষাণের কথা' প্রভৃতি ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

॥ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ॥

প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় (১৮৭৩-১৯৩২ খ্রী.) বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর লেখা 'সিন্দুর কৌটা', 'নবীন সন্ন্যাসী', 'সত্যবালা', 'রত্নদীপ', 'রমা সুন্দরী' প্রভৃতি উপন্যাস ও বহু গল্প প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেছিল।

॥ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥

আধুনিক যুগের প্রথিতযশা কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র হুগলী জেলার দেবানন্দপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'চন্দ্রনাথ', 'দেবদাস', 'বড়দিদি', 'রামের সুমতি', 'বিন্দুর ছেলে' 'গৃহদাহ', 'দত্তা', 'পল্লী সমাজ', 'নববিধান', 'শেষপ্রশ্ন', 'পথের দাবী', 'অরক্ষণীয়া', 'পরিণীতা', 'বামুনের মেয়ে' 'পণ্ডিত



শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মশাই' প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর রচিত বহু ছোট গল্প সাহিত্য জগতে সুপ্রসিদ্ধ।

॥ চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রখ্যাত সাহিত্যিক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৩৮ খ্রী.) হাইফেন', 'স্রোতের ফুল', 'যমুনাপুলিনে ভিখারিনী', চোরকাঁটা', 'দোটানা', মুক্তিস্নান', 'নষ্টচন্দ্র' প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর 'রবিরশ্মি' রবীন্দ্রকাব্যের সমালোচনা-মূলক অপূর্ব গ্রন্থ।

॥ রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

প্রসিদ্ধ কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭ খ্রী.) বর্ধমানের বাকুলিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'রসসাগর'-নামক এক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যান', 'কর্মদেবী', 'কাঞ্চী কাবেরী', 'শূরসুন্দরী' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থের মধ্য দিয়ে তিনি পরাধীন জাতির লোকেদের মনে স্বাধীনতার কামনা জাগিয়ে তোলেন।

॥ হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, রূপক, গীতিকবিতা প্রভৃতি রচনা করে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১২৪৫-

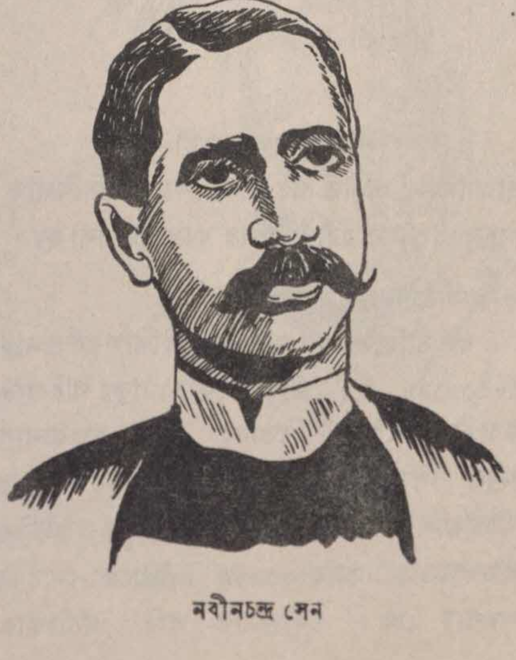


হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৩১০ বঙ্গাব্দ) অশেষ যশ অর্জন করেছেন। তাঁর 'বৃত্রসংহার কাব্য', 'দশমহাবিদ্যা', 'আশা-কানন' 'বীরবাহু কাব্য', 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'ছায়াময়ী' প্রভৃতি অসংখ্য রচনা সুবিখ্যাত।

॥ নবীনচন্দ্র সেন ॥

বাংলার স্বনামধন্য কবি নবীনচন্দ্র সেন



নবীনচন্দ্র সেন

(১৮৪০-১৯০৯ খ্রী) 'অবকাশরঞ্জিনী', 'পলাশীর যুদ্ধ', 'রৈবতব', 'কুরুক্ষেত্র', 'প্রভাস', 'অমিতাভ', 'রঙ্গমতী', 'আমার জীবন', 'প্রবাসের পত্র' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ বিহারীলাল চক্রবর্তী ॥

আধুনিক গীতিকাব্যের জনক বিহারীলাল চক্রবর্তী (১৮৩৫-১৮৯৪ খ্রী.) পূর্ণিমা', 'সাহিত্য সংক্রান্তি', 'অবোধ বন্ধু', 'সংগীতশতক', 'বঙ্গসুন্দরী',

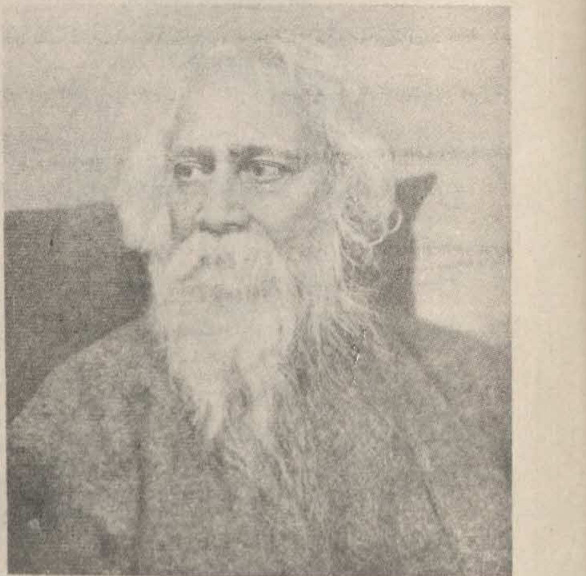


বিহারীলাল চক্রবর্তী

'সারদামঙ্গল' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগুরু বলা হয়।

॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

বঙ্গ সাহিত্যে এক স্মরণীয় সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ১৮৬১-১৯৪১ খ্রী) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ 'প্রিন্স' দ্বারকানাথ ঠাকুর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর 'গীতাঞ্জলির' ইংরেজী অনুবাদ পড়ে সুইডিশ অ্যাকাডেমি তাঁকে ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার দেয়। রবীন্দ্রনাথ কবি, গীতিকার,



রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গল্পলেখক, উপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রবন্ধলেখক, অভিনেতা, চিত্রকর ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর 'ভানুসিংহের পদাবলী', 'কড়ি ও কোমল', 'সোনার তরী', 'খেয়া', 'চৈতালি', 'বৌঠাকুরানীর হাট', 'রাজর্ষি', গোরা', 'ঘরে বাইরে', 'নৌকাডুবি', 'শেষের কবিতা', বাল্মীকি প্রতিভা', 'বিসর্জন', 'রাজা ও রানী'. 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'গৃহপ্রবেশ', শেষরক্ষা', চিরকুমার সভা'. শ্যামা', 'চণ্ডালিকা', তাসের দেশ', 'চার অধ্যায়' 'জীবনস্মৃতি' প্রভৃতি অসংখ্য গ্রন্থ বিপুল যশ অর্জন করেছে। 'ছুটি', কাবুলিওয়ালা', 'পোস্টমাস্টার' প্রভৃতি অসংখ্য ছোট গল্প লিখে তিনি বাংলা সাহিত্যের পরিপুষ্টি করেছেন। তিনি প্রায় তিন হাজার গান লিখে তাতে নিজে সুর দিয়েছেন। বহু শিশুপাঠ্য গ্রন্থও তিনি রচনা করে গেছেন। এত বড় সাহিত্যিক ভারতে কেন সারা বিশ্বেও কেউ জন্মগ্রহণ করেন নি।

বহু কবি, গীতিকার, ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক, নাট্যকার. শিশুসাহিত্যিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে

সমৃদ্ধ করেছেন ও করে যাচ্ছেন। গোবিন্দচন্দ্র দাস, যতীন্দ্রমোহন বাগচী যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত প্রমথ চৌধুরী (বীরবল). রাজশেখর বসু (পরশুরাম), মোহিতলাল মজুমদার, রবীন্দ্রনাথ মৈত্রেয়, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কালী-প্রসন্ন সিংহ, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ



বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র মজুমদার, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), অন্নদাশংকর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ দাশ, সুকান্ত ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মনিশংকর মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল মিত্র, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, চারুচন্দ্র চক্রবর্তী জরাসন্ধ, শক্তিপদ রাজগুরু, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, বিনয় মুখোপাধ্যায়, বিমল ঘোষ, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, গৌরকিশোর ঘোষ, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী, অখিল নিয়োগী, সুকুমার সেন, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রিয়ংবদা দেবী, শিবরাম চক্রবর্তী, কালিদাস রায়, কুমুদরঞ্জন মল্লিক, সত্যজিৎ রায়, রমাপদ চৌধুরী, ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়,



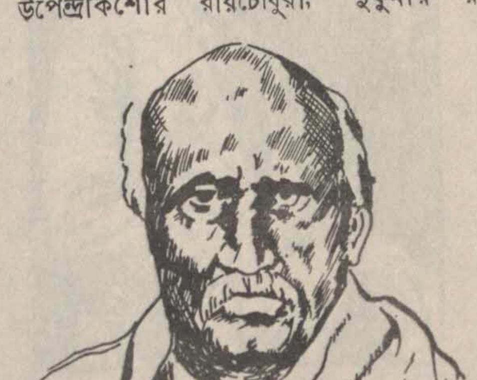
সুকান্ত ভট্টাচার্য

নারায়ণ সান্যাল, সুনীল গাঙ্গুলী, ক্ষিতীন্দ্র নারায়ণ ভট্টাচার্য এবং আরো অনেকে বাংলা সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন ও করে যাচ্ছেন।



॥ শিশু সাহিত্য ॥

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, সুকুমার রায়



কালিদাস রায়

(চৌধুরী), যোগীন্দ্র সরকার, সুখলতা রাও, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, লীলা মজুমদার, হেমেন্দ্র



কুমুদরঞ্জন মল্লিক

কুমার রায় প্রভৃতি বহু শিশুসাহিত্যিকের রচনায় বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে।



সুকুমার রায়

আরবীয় সাহিত্য

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের অন্ততঃ হাজার বছর আগে আরবীয় সভ্যতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সে সময়কার কোন সাহিত্যের কথা জানা যায় না। ৭ম –৮ম খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে রচিত সাহিত্যের কিছু কিছু সন্ধান মেলে। আরবীয় সাহিত্যিকেরা তাঁদের কবিতা সুর সহযোগে গাইতেন। এই সব কবি সাহিত্যিক-দের বলা হত রাউই। তাঁদের কবিতাকে বলা হত কাশিদা।

ইরানীয় সাহিত্য

ইরানীয় সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা পুরাতন গ্রন্থের নাম জরথুস্ট্র রচিত 'জেন্দ আবেস্তা।' গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডারের আক্রমণে প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্যের বহু নিদর্শন নষ্ট হয়ে যায়। পারস্যের (ইরানের) চার জন বিখ্যাত কবির নাম ওমর খৈয়াম, হাফিজ, সাদি ও ফিরদৌসী। বহুপঠিত আরব্যোপন্যাস পারসিক ভাষায় রচিত। গ্রন্থ-খানির নাম আলেফ লয়লা বা একাধিক সহস্র রজনী।



জরথুস্ট্র

॥ ওমর খৈয়াম ॥

পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি (মৃতু ১১২৩ খ্রী)। তাঁর প্রণীত কাব্যগ্রন্থ 'রুবাইয়াৎ'। এই 'রুবাইয়াৎ' কবিতাগুচ্ছ পৃথিবীর প্রায় সব শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

॥ হাফিজ ॥

প্রসিদ্ধ পারসিক কবি হাফিজ চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম শামসুদ্দীন মহম্মদ। তাঁর রচিত গ্রন্থের নাম 'দিওয়ান হাফিজ'।

॥ শেখ সাদী ॥

শেখ সাদী (১১৭৪-১২৯২ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পারসিক কবি। তাঁর রচিত 'গুলিস্তান' ও 'বুস্তান' প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ।

॥ ফিরদৌসী ॥

গজনীর মামুদের সভাকবি ফিরদৌসী (৯৩৭-১০২০ খ্রী.) বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'শাহনামা' রচনা করেন। ফিরদৌসীর প্রকৃত নাম মুহম্মদ আবুল কাসিম।



ফিরদৌসী

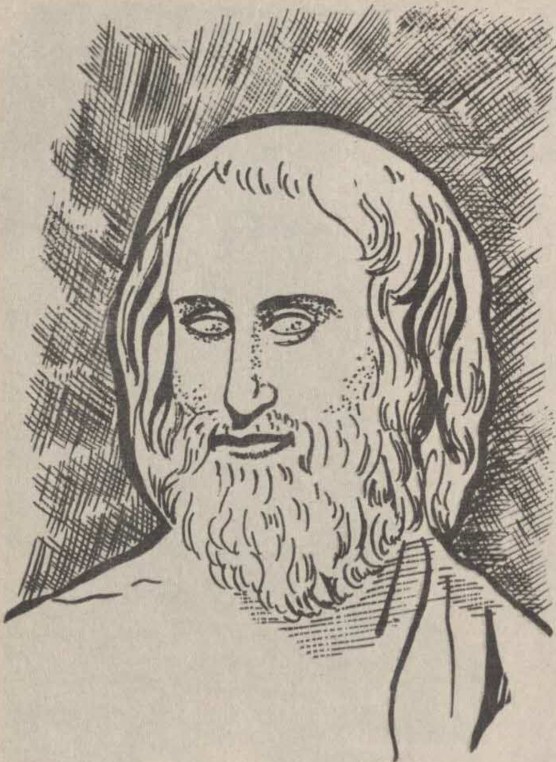


॥ গ্রীক সাহিত্য ॥

প্রাচীন যুগে গ্রীস বহু দিক্ দিয়ে উন্নত ছিল। তার সাহিত্যও অপূর্ব ছিল। হোমার, ঈসপ, থেলিজ (Thales of Miletus, আনুমানিক ৬২৪-৫৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), অ্যানাক্সিম্যাণ্ডার (Anaximander, ৬১১-৫৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), হেরাক্লিটাস (Heraclitus of Ephesus, আনুমানিক ৫৪০-৪৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), এসকাইলাস (Aeschylus, ৫২৫-৪৫৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। গ্রীক নাট্যসাহিত্যের জনক), সফক্লিজ (Sophocles, ৪৯৫-৪০৬, খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। শতাধিক নাটকের রচয়িতা), ইউরিপিডিজ (Euripides, ৪৮০-৪০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, ৯২টি নাটকের রচয়িতা। বিয়োগান্ত নাটক-রচয়িতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ), অ্যারিস্টফেনিজ (Aristophanes, আনুমানিক ৪৪৪-৩৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ, ৪৪ খানি মিলনান্তক নাটকের রচয়িতা), সক্রেটিস ('দর্শনশাস্ত্র' অধ্যায় দ্রষ্টব্য), অ্যারিস্টটল ('দর্শনশাস্ত্র অধ্যায় দ্র.)



থেলিজ



ইউরিপিডিজ

প্রভৃতি বহু মনীষী তাঁদের বহুমুখী প্রতিভার দ্বারা গ্রীক সাহিত্যকে বিভিন্ন কালে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

॥ হোমার ॥

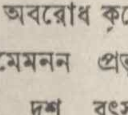
গ্রীক মহাকবি হোমার (Homer) খ্রীষ্টজন্মের প্রায় সাতশ বছর আগে বর্তমান ছিলেন। তিনি 'দ্য ইলিয়াড' (The Iliad) ও 'অডিসি' (Odyssey)-নামক দু'খানি মহাকাব্য রচনা করেন। ইলিয়াডে আছে, ট্রয় শহরের রাজকুমার প্যারিস স্পার্টার রাজা মেনেলাউসের পত্নী হেলেনকে নিয়ে গেলে মেনে-লাউস ও তাঁর ভাই অ্যাগামেমনন অন্যান্য গ্রীক



হোমার

রাজাদের সাহায্যে ট্রয় অবরোধ করেন। ইউলিসিস, অ্যাকিলিজ, অ্যাগামেমনন প্রভৃতি বীরদের সাহায্যে মেনেলাউস দশ বৎসর যুদ্ধের পর হেলেনকে উদ্ধার করেন।

অডিসি ইলিয়াডের উপসংহার। ট্রয়যুদ্ধের পর গ্রীকবীর ইথাকার রাজা অডিসিউসের নানা দুঃসাহসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে স্বদেশে ফেরার কথা নিয়ে অডিসি রচিত।



॥ ঈসপ ॥

বিখ্যাত গ্রীক নীতিগল্প-লেখক ঈসপ (Aesop, আনুমানিক ৬২০-৫৬০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন একজন ক্রীতদাস। জীবজন্তুদের নিয়ে রচিত নীতিগল্পের লেখক হিসাবে ঈসপ বিখ্যাত। অনেকে অবশ্য বলেন, ঈসপের নামে যে নীতিগল্প প্রচলিত (Aesop's Fables) তা ঈসপের রচনা নয়। তাঁর

মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে ব্যাব্রিয়াস বলে এক ব্যক্তি গল্পগুলি লেখেন।

প্রাচীন মিশরীয় সাহিত্য

মিশরীয় সভ্যতা অতি প্রাচীন ('ধর্মের কথা' অধ্যায় দ্র.)। প্রায় তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে মিশরের সম্রাট্ (ফেরো) রাজত্ব শুরু করেন। দ্বাদশ রাজবংশের সময়ে মিশরীয় সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সম্রাট্ চতুর্থ আমেন-হোটেপের রচিত সূর্যদেবতা আটনের স্তুতি সাহিত্যরসোচ্ছল। সেগুলি মিশরের এক জাদুঘরে রক্ষিত আছে।

রোমান সাহিত্য

বর্তমানে রোম ইটালীর একটি রাজধানী মাত্র। পূর্বে রোম সাম্রাজ্য বলতে সারা ইটালী ও অন্যান্য স্থানকে বোঝাত। প্রাচীন রোমে যেমন অনেক প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছিল, ইটালীতেও তেমনই বহু সাহিত্যিকের দ্বারা উৎকৃষ্ট সাহিত্য সৃষ্ট হয়েছে। নাটক, অনুবাদ, ইতিহাস, প্রবন্ধ, কাব্য, উপন্যাস প্রভৃতির ভিতর দিয়ে সেই সাহিত্য পৃথিবীতে বিপুল সমাদর লাভ করেছে।

॥ প্লটাস ও টেরেন্স ॥

প্লটাস (Titas Maccius Plautus, আনুমানিক ২৫৪-১৮৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও টেরেন্স (Terence, আনুমানিক ১৯০-১৫৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রোমান যুগের প্রসিদ্ধ কমেডি বা মিলনান্তক নাট্যকার। প্লটাস প্রায় ১৩০ খানি নাটক রচনা করেন বলে জানা যায়।

॥ কেটো ॥

কেটো (Marcus Porcius Cato, ২৩৪-১৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) সাত খণ্ডে রোমের ইতিহাস লেখেন। তাঁকে রোমক যুগের আদি গদ্যলেখক বলা হয়।

॥ সিসেরো ॥

প্রখ্যাত বাগ্মী ও দার্শনিক সিসেরো (Marcus Tullius Cicero, ১০৬-৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গদ্য-সাহিত্য রচনায় উচ্চস্থান অধিকার করেন। তিনি জুলিয়াস সীজারের বন্ধু ছিলেন। জুলিয়াস সীজারের মৃত্যুর পর তিনি নিহত হন।



॥ ভার্জিল ॥

লাটিন ভাষার বিখ্যাত সাহিত্যিক ভার্জিল



ভার্জিল.

(Publius Vergilius Maro, ৭০-১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বিখ্যাত 'ইনিড' (Aeneid) কাব্যের রচয়িতা। ট্রয় যুদ্ধের পরে ইনিয়াসের ভ্রমণকাহিনী অবলম্বনে গ্রন্থখানি রচিত।

॥ টাইটাস লিভিয়াস ॥

টাইটাস লিভিয়াস (Titus Livius, খ্রীষ্টপূর্ব ৫৯-১৭ অব্দ) ১৪২ খণ্ডে সমগ্র রোমের ইতিহাস লেখেন। তিনি Livy নামে পরিচিত।

॥ প্লিনি ॥

প্লিনি (Pliny the Elder, ২৩-৭৯ খ্রী.) Natural History রচনা করেন। গ্রন্থটি ৩৭ খণ্ডে বিভক্ত।

॥ ওভিড ॥

ওভিড (Ovid, ৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-১৮ খ্রীষ্টাব্দ) Art of Love ও Metamorphoses-নামক দুইটি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনা করেন।



॥ দান্তে ॥

দান্তে (Dante Alighiery, ১২৬৫-১৩২১ খ্রী) ইটালীর সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি 'Divine Comedy'-নামক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা।



দান্তে

॥ পেত্রার্ক ॥

পেত্রার্ক (Francesco Petrarch, ১৩০৪-৭৪ খ্রী.) বহু উৎকৃষ্ট সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচনা করেন।



পেত্রার্ক

॥ বোকাচিও ॥

বোকাচিও (Giovanni Boccaccio, ১৩১২-১৩৭৫ খ্রী.) 'ডেকামিরন' (Decameron)-নামক গল্পগ্রন্থের রচয়িতা।

হিব্রু সাহিত্য

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আটশত বৎসর আগে হিব্রু সাহিত্যের সৃষ্টি। ইহুদী জাতির প্রাচীন সাহিত্যকে হিব্রু সাহিত্য বলা হয়। বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেণ্ট অংশের মোট ৩৯ খণ্ড হিব্রু ভাষায় লেখা।

ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'তালমুদ'। কেউ কেউ মনে করেন তালমুদ মোজেসের লেখা। কেউ

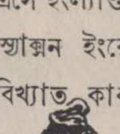


মোজেস

কেউ বলেন এজরার লেখা। তালমুদ দুরকমের —জেরুজালেমের ও ব্যাবিলনের। ইহুদীরা ব্যাবিলনের তালমুদ মেনে চলেন।

ইংরেজী সাহিত্য

খ্রীষ্টের জন্মের পাঁচশ বছর আগে জার্মানি থেকে অ্যাঙ্গলস (Angles), স্যাক্সন (Saxon) ও জুট (Jute) জাতির লোক এসে ইংল্যাণ্ড জয় করে। তাদের দ্বারাই অ্যাংলো-স্যাক্সন ইংরেজী সাহিত্য গড়ে ওঠে। সে যুগের বিখ্যাত কাব্য বেওউলফ (Beowulf)।



॥ বীড ॥

বীড (Bede, the Venerable, ৬৭৩-৭৩৫ খ্রী) নামে একজন সন্ন্যাসী ল্যাটিন ভাষায় ইতিহাস সম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ রাজা আলফ্রেড ॥

রাজা আলফ্রেড (Alfred the Great,



আলফ্রেড দ্য গ্রেট

৮৪৯-৮৯৯ খ্রী.) ইংরেজী গদ্যসাহিত্যের জনক বলে প্রসিদ্ধ।

নর্মানরা একাদশ শতকে ইংল্যাণ্ড জয় করে। ক্রমে ক্রমে ইংল্যাণ্ডে অ্যাংলো-নরম্যান ইংরেজী সাহিত্য গড়ে ওঠে।

॥ চসার ॥

বিখ্যাত 'ক্যানটারবেরি টেল্ স্' (Canterbury Tales রচনা করে চসার (Geoffrey Chaucer,



চসার

১৩৪৩-১৪০০ খ্রী) প্রভূত যশ অর্জন করেন। তাঁকে বিশুদ্ধ ইংরেজীর জনক বলা হয়।

॥ জন ওয়াইক্লিফ ॥

জন ওয়াইক্লিফ (John Wyclif, ১৩২৪-৮৪ খ্রী) ইংরেজী ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন।

॥ ল্যাংল্যাণ্ড ॥

ল্যাংল্যাণ্ড (William Langland ১৩৩০-১৪০০ খ্রী.) 'The Vision of Piers the Plowman' নামে একটি করুণ কাব্য রচনা করেন।

॥ জন গাওয়ার ॥

জন গাওয়ার (John Gower, ১৩২৫-১৪০৮ খ্রী) Confessio Amantis নামে একটি কাব্য রচনা করেন।



॥ এলিজাবেথীয় সাহিত্য ॥

রানী এলিজাবেথের সময়ে ইংল্যাণ্ডে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় এলিজাবেথীয় সাহিত্য। তখন রেনেসাঁসের যুগ চলছে।

॥ এডমণ্ড স্পেন্সার ॥

এডমণ্ড স্পেন্সার (Edmund Spenser,



এডমণ্ড স্পেন্সার

১৫৫২-১৫৯৯ খ্রী.) "দ্য ফেয়ারী ক্যুইন,' 'শেফার্ড স ক্যালেণ্ডার' প্রভৃতি কাব্য রচনা করেন।

॥ ফিলিপ সিডনী ।

ফিলিপ সিডনী (Sir Philip Sidney, ১৫৫৪-৮৬ খ্রী) রানী এলিজাবেথের প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি 'আর্কেডিয়া', 'অ্যাপলজি ফর পোয়েট্রি', 'ডিফেন্স অব পোয়েট্রি' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি যুদ্ধকালে জুটফেনে মারা যান।





নেলসনের মৃত্যু

১ম ভাইকাউন্ট হোরেসিও নেলসন (1st Viscount Horatio Nelson, ১৭৫৮-১৮০৫ খ্রী.) ছিলেন একজন অতিপ্রসিদ্ধ ইংরেজ সমরনায়ক। ঐতিহাসিকেরা তাঁকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৌসেনাপতি বলেন। তিনি প্রায় সারা জীবন ধরে যুদ্ধ করে গেছেন। ১২ বছর বয়সে তিনি জাহাজে কার্যরত হন। ১৭৯৩ খ্রী. তিনি ক্যাপ্টেন হন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর একটি চক্ষু বিনষ্ট হয়। ১৭৯৭ খ্রী তিনি রিয়্যার-অ্যাডমিরাল হন। যুদ্ধে তাঁর ডান হাত কাটা যায়। ১৭৯৮ খ্রী. আবুকির উপসাগরে তিনি ফরাসীদের পরাজিত করেন। ১৮০৫ খ্রী. ট্রাফালগারে তাঁর বাহিনী ফরাসী নৌবাহিনীকে ধ্বংস করে। কিন্তু এই যুদ্ধে ফরাসীদের জাহাজ থেকে একটি গুলি এসে তাঁর দেহে বিদ্ধ হয়। তিনি জাহাজের পাটাতনে লুটিয়ে পড়েন।

নেলসন মৃত্যুর পূর্বক্ষণে শুনতে পেলেন, তাঁর বাহিনীর জয় হয়েছে। তিনি অবশ হাত ঊর্ধ্বে তুলে তাঁর জয়লাভের জন্যে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

[পূর্বপৃষ্ঠার উপরের ছবি]

রানী ইজাবেলার দরবারে কলাম্বাস

রানী ইজাবেলা (Isabella I, ১৪৫১-১৫০৪ খ্রী.) ছিলেন স্পেনের অন্তর্গত ক্যাস্টিলের বিখ্যাত রানী। আরাগনের পঞ্চম ফার্ডিন্যান্ড (Ferdinand V, ১৪৫২-১৫১৬ খ্রী.) ১৪৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইজাবেলাকে বিবাহ করেন। প্রধানতঃ ইজাবেলার উৎসাহে ও প্রেরণায় কলাম্বাস (Christopher Columbus, ১৪৫১-১৫০৬ খ্রী) সমুদ্রযাত্রা করেন। কলাম্বাস ছিলেন মূলতঃ ইতালীয় নাবিক। কিন্তু ইতালীয় সরকার থেকে সহায়তা না পেয়ে স্পেনে যান। রানী ইজাবেলা তাঁর দুরন্ত অভিলাষের কথা শুনে তাঁকে জাহাজ, লোকজন ও প্রয়োজনীয় অর্থাদি দিয়ে সাহায্য করেন।

কলাম্বাস অবশ্য ভারত ও চীনে যাবার জন্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি ১৪৯২ খ্রী. পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে পৌঁছান। তিনি আরো কয়েকবার পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে যান। উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মূল ভূখণ্ডেও তিনি পৌঁছেছিলেন। কলাম্বাস সোনা, রত্ন ও মসলার সন্ধানে যাত্রা করেছিলেন কিন্তু তা পান নি।

কলাম্বাসের সমুদ্র-অভিযানের কাহিনী ইউরোপে প্রচারিত হলে সেখানকার বিভিন্ন দেশে সমুদ্রপথে যাত্রার জন্যে উৎসাহের সঞ্চার হয়।

[পূর্বপৃষ্ঠার নীচের ছবি]

॥ ক্রিস্টোফার মার্লো ॥

প্রসিদ্ধ নাট্যকার ক্রিস্টোফার মার্লো (Christopher Marlowe, ১৫১৪-১৫৯৩ খ্রী) 'ডক্টর ফস্টাস' (Dr. Faustus), 'দ্য জ্যু অব মালটা' (The Jew of Malta), 'ট্যাম্বারলেন দ্য গ্রেট' (Tamburlaine the Great) ও 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড' (Edward II) নামক নাটক রচনা করেন।

॥ উইলিয়াম শেকসপীয়ার ॥

সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেকসপীয়ার (William Shakespeare, ১৫৬৪-১৬১৬ খ্রী) মোট ৩৭ খানি নাটক রচনা করেন। তাঁর কমেডি



শেকসপীয়ার

বা মিলনান্তক নাটকসমূহের মধ্যে 'দ্য মার্চেন্ট অব ভেনিস', 'এ মিডসামার নাইট'স ড্রীম', 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট', 'দ্য কমেডি অব এররস্' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। ট্র্যাজেডি বা বিয়োগান্ত নাটকসমূহের মধ্যে 'ম্যাকবেথ', 'জুলিয়াস সীজার', 'ওথেলো', 'হ্যামলেট', 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট', 'কীং লীয়ার' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শেকসপীয়ার সনেট রচনায়ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তিনি অভিনয়ও করতেন।

॥ বেন জনসন ॥

শেকসপীয়ারের বন্ধু ও খ্যাতিমান্ নাট্যকার বেন জনসন (Ben Jonson, ১৫৭৩-১৬৩৭ খ্রী) 'এভ্রি ম্যান ইন হিজ হিউমার', 'এভ্রি ম্যান আউট অব হিজ হিউমার', 'দি অ্যালকেমিস্ট' প্রভৃতি নাটক রচনা করেন।



॥ প্রসিদ্ধ নাট্যকার ॥

বোমণ্ট (Francis Beaumont, ১৫৮৪-১৬১৬ খ্রী). ফ্লেচার (John Fletcher, ১৫৭৯-১৬২৫ খ্রী) জর্জ চ্যাপমান (George Chapman. ১৫৫৯-১৬৩৪ খ্রী.) প্রভৃতি নাট্যকার বহু নাটক রচনা করে ইংরেজী নাট্যসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন্।

॥ ফ্র্যান্সিস বেকন ॥

এলিজাবেথীয় যুগের বিশিষ্ট প্রবন্ধ লেখক ও



ফ্রান্সিস বেকন

দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন (Francis Bacon ১৫৬১-১৬২৬ খ্রী) 'এসেজ', 'নোভাস অর্গানাম', 'অ্যাটলান্টিস প্রভৃতি প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেন।

॥ বাইবেলের অনুবাদ ॥

রাজা প্রথম জেমসের নির্দেশে ৪৭ জন পণ্ডিত ইংরেজীতে বাইবেলের অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ সহজ ও স্বচ্ছন্দ হয়। সাহিত্যরসোত্তীর্ণ এই অনুবাদের নাম Authorised Version of the Holy Bible।

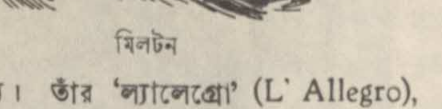
॥ মিলটন ॥

মিলটন (John Milton, ১৬০৮-১৬৭৪ খ্রী.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি। ১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ অন্ধ হয়ে যান। তাঁর রচিত 'প্যারাডাইজ লস্ট' (Paradise Lost) ও 'প্যারাডাইজ রিগেণ্ড' (Paradise Regained) দুখানি



মিলটন

শ্রেষ্ঠ কাব্য। তাঁর 'ল্যালেগ্রো' (L' Allegro), 'ইল পেনসেরোসো' (Il Penseroso), 'লিসিডিয়াস' (Lycidius) প্রভৃতি কাব্য সুবিখ্যাত।



॥ ড্রাইডেন ॥

ব্যঙ্গ নাটক রচনা করে যে-সব ইংরেজ কবি বিখ্যাত হয়েছেন তাঁদের মধ্যে জন ড্রাইডেন



জন ড্রাইডেন

(John Dryden, ১৬৩১-১৭০০ খ্রী) অন্যতম শ্রেষ্ঠ। 'অল ফর লাভ', 'রিহার্স্যাল' প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

॥ বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার ॥

উইলিয়াম উইচার্লি (William Wycherley, ১৬৪০-১৭১৫ খ্রী.), উইলিয়াম কনগ্রীভ (William Congreve, ১৬৭০-১৭২৯ খ্রী), স্যার উইলিয়াম ড্যাভারন্যান্ট (Sir William Davernan', ১৬০৬-১৬৬৮ খ্রী)। স্যার জন ভ্যানব্রু (Sir John Vanbrugh, ১৬৬৪-১৭২৬ খ্রী) প্রভৃতি নাট্যকার বহু নাটক রচনা করে ইংরেজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

॥ আলেকজাণ্ডার পোপ ॥

আলেকজাণ্ডার পোপ (Alexander Pope, ১৬৮৮-১৭৪৪ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ কবি ও অনুবাদক। তাঁর রচিত 'এসে অন ম্যান' (Essay on Man), 'এসে অন ক্রিটিসিজ্‌ম' (Essay on



আলেকজাণ্ডার পোপ

Criticism), ইলিয়াড ও অডিসির অনুবাদ বিখ্যাত।



॥ সুইফ্‌ট্‌ ॥

জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ (Jonathan Swift, ১৬৬৭-১৭৪৫ খ্রী) সুপ্রসিদ্ধ গালিভার'স ট্রাভেলস (Gulliver's Travels) রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন (১৭২৬ খ্রী)।



জোনাথান সুইফ্‌ট্‌

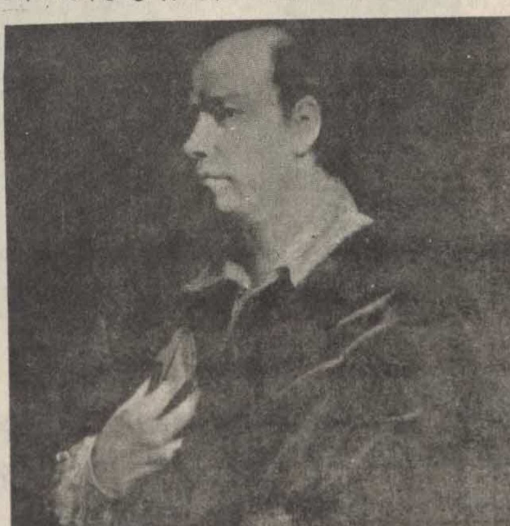
॥ ডাক্তার জনসন ॥

ডাক্তার জনসন (Dr. Samuel Johnson, ১৭০৯-১৭৮৪ খ্রী.) একজন বিখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক ও অভিধানকার। 'রাসেলাস', 'ভ্যানিটি অব হিউম্যান উইশেস', 'দি আইড্‌লার', 'দ্য স্পেক্টেটর', 'লাইভ্‌স্‌ অব পোয়েট্‌স্‌' প্রভৃতি বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন।



স্যামুয়েল জনসন

॥ অলিভার গোল্ডস্মিথ ॥



অলিভার গোল্ডস্মিথ

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক। তাঁর রচনা—'দ্য ভাইকার অব ওয়েকফিল্ড', 'দ্য ডেজার্টেড ভিলেজ', 'দ্য ট্রাভ্‌লার্, শী স্টুপ্‌স্ টু কংকার'।



॥ এডওয়ার্ড গিবন ॥

প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon, ১৭৩৭-১৭৯৪ খ্রী.) 'দ্য ডিক্লাইন অ্যান্ড্ ফল অব দ্য রোমান এম্পায়ার' (The Decline and Fall of the Roman Empire')-নামক ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন।

উপন্যাস রচনা

॥ জন বানিয়ান ॥

জন বানিয়ান (John Bunyan, ১৬২৮-১৬৮৮ খ্রী) কারাগারে বন্দী থাকার সময়ে 'পিলগ্রিম্‌স্'



জন বানিয়ান

প্রগ্রেস' (Pilgrim's Progress) নামে অত্যুৎকৃষ্ট রূপক উপন্যাস রচনা করেন। তাঁর অন্যান্য শ্রেষ্ঠ রচনা—'দ্য হোলি ওয়্যার' (the Holy war), 'গ্রেস অ্যাবাউনডিং' (Grace abounding), 'মি ব্যাডম্যান' (Mr. Badman)।

॥ স্যামুয়েল রিচার্ডসন ॥

স্যামুয়েল রিচার্ডসন (Samuel Richardson, ১৬৮৯-১৭৬১ খ্রী.) বিখ্যাত 'পামেলা' (Pamela)-নামক উপন্যাসের রচয়িতা।

॥ হেনরী ফিলডিং ॥

হেনরী ফিলডিং (Henry Fielding, ১৭০১-১৭৫৪ খ্রী) 'টম জোনস্' (Tom Jones), 'জোসেফ



হেনরী ফিলডিং

অ্যাণ্ড্রুজ' (Joseph Andrews), 'অ্যামেলিয়া' (Amelia) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন।

॥ টোবিয়াস স্মলেট ॥

টোবিয়াস স্মলেট (Tobias George Smollet, ১৭২১-৭১ খ্রী) 'পেরিগ্রিন পিক্‌ল্' (Peregrine Pickle), 'কাউন্ট ফ্যাদম' (Count Fathom), 'হামফ্রি ক্লিংকার' (Humphry Clinker) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে অশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

॥ লরেন্স স্টার্ন ॥

লরেন্স স্টার্ন (Laurence Sterne, ১৭১৩-১৭৬৮খ্রী.) 'ট্রিস্ট্যাম শ্যাণ্ডি' (Tristam Shandy), 'দ্য সেন্টিমেন্ট্যাল জার্নি' ('The Sentimental Journey') প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ব্যঙ্গ-



লরেন্স স্টার্ন

রসাত্মক রচনা লিখে তিনি খুব প্রসিদ্ধি অর্জন করেন।



॥ শেরিড্যান ॥

শেরিড্যান (Richard Brinsley Butler Sheridan, ১৭৫১-১৮১৬ খ্রী.) ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার। 'দ্য রাইভ্যালস্' (The Rivals), 'পিজারো' (Pizzaro), 'দ্য স্কুল ফর স্ক্যাণ্ডাল্‌স্' (The School for Scandals) প্রভৃতি বহু সফল নাটক রচনা করেন।

॥ জেমস্ টমসন্ ॥

জেমস্ টমসন্ (James Thomson, ১৮৩৪-১৮৮২ খ্রী.) ছিলেন একজন স্কটিশ কবি। তিনি 'দ্য সিটি অব ড্রেডফুল নাইট' (The City of Dreadful Night)-নামক রচনার জন্য প্রসিদ্ধ।

॥ টমাস গ্রে ॥

টমাস গ্রে (Thomas Gray, ১৭১৬-১৭৭১ খ্রী.) একজন বিখ্যাত ইংরেজ কবি। তাঁর 'এলিজি



টমাস গ্রে

রিটন্ ইন এ কান্ট্রি চার্চইয়ার্ড' (Elegy Written in a Country Churchyard) অতি বিখ্যাত সুমধুর রচনা। তাঁর অন্যান্য কবিতা 'ওড্ অন এ ডিস্ট্যাণ্ট প্রসপেক্ট অব ইটন কলেজ' (Ode on a Distant Prospect of Eton College) ও 'ওড্ টু অ্যাডভারসিটি' (Ode to Adversity) বিখ্যাত কবিতা।

॥ উইলিয়াম কলিন্স ॥

উইলিয়াম কলিন্স (William Wilkie Collins, ১৮২৪-১৮৮৯ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক। তাঁর উপন্যাস 'দ্য ডেড্ সিক্রেট' (The Dead Secret), 'দি উম্যান ইন হোয়াইট' (The Woman in white) ও 'নো নেম' (No name)।

॥ উইলিয়াম কুপার ॥

উইলিয়াম কুপার (William Cowper,

১৭৩১-১৮০০ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি।



উইলিয়াম কুপার

তাঁর 'টাস্ক' (Task) অষ্টাদশ শতাব্দীর এক অতি প্রসিদ্ধ কবিতা।

॥ টমাস চ্যাটারটন ॥

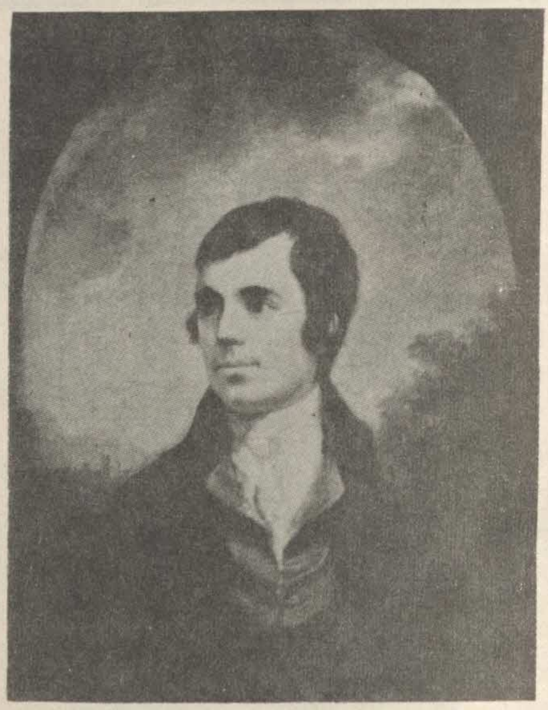
টমাস চ্যাটারটন (Thomas Chatterton, ১৭৫২-১৭৭০ খ্রী.) মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে আত্মহত্যা করেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যুৎকৃষ্ট কবিমনীষার অধিকারী।

॥ উইলিয়াম ব্লেক ॥

উইলিয়াম ব্লেক (William Blake, ১৭৫৭-১৮২৭ খ্রী.) ছিলেন একজন রোমান্টিক কবি ও চিত্রকর। তাঁর 'সংস্ অব ইনোসেন্স' (Songs of Innocence) বিখ্যাত রচনা।

॥ রবার্ট বার্ন্স্ ॥

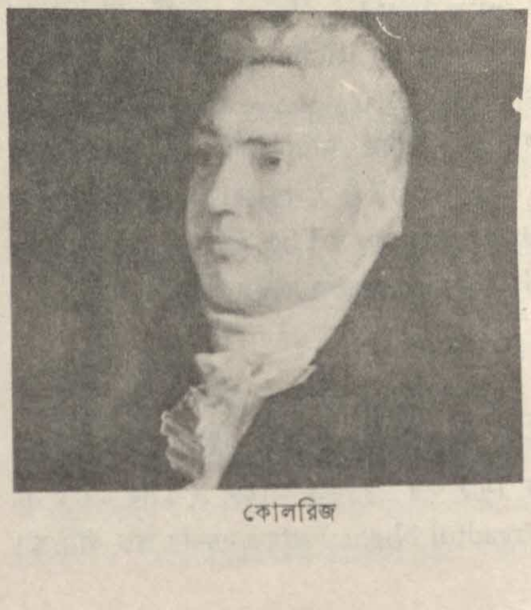
রবার্ট বার্ন্স্ (Robert Burns, ১৭৫৯-১৭৯৬ খ্রী.) সব চেয়ে বিখ্যাত স্কটিশ কবি। তিনি অসংখ্য



রবার্ট বার্ন্স্

গ্রাম্য গীত রচনা করেন। গ্রাম্য সরলতার সুরে ভরা বহু কবিতাও তিনি রচনা করেন।

॥ কোলরিজ ॥

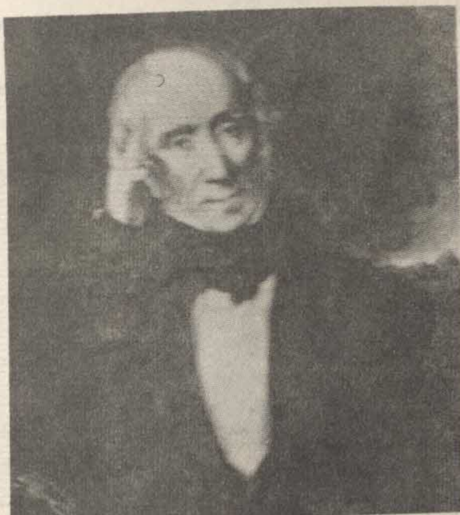


কোলরিজ

কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge, ১৭৭২-১৮৩৪ খ্রী.)-রচিত 'অ্যানসেণ্ট ম্যারিনার' (Ancient Mariner) অতি প্রসিদ্ধ রচনা। তিনি সে যুগের একজন বিখ্যাত রোমান্টিক কবিতা-রচয়িতা ছিলেন। তিনি ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ার্ডস-ওয়ার্থের সঙ্গে যুগ্মভাবে 'লিরিক্যাল ব্যালাড্‌স্‌' রচনা করেন।

॥ ওয়ার্ডসওয়ার্থ ॥

উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ (William Words-



উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ

worth, ১৭৭০-১৮৫০ খ্রী.) অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি। 'লুসী গ্রে', 'ড্যাফোডিল্‌স্‌', 'দ্য সলিটারী রীপার', 'এক্সকারসন্‌' প্রভৃতি বহু কবিতা তিনি রচনা করেন। সরল অনাড়ম্বর ভাষায় সাধারণ বিষয়কে মধুর করে কবিতা রচনার ব্যাপারে তিনি খুব বিখ্যাত ছিলেন।

॥ স্যার ওয়াল্টার স্কট ॥

'দ্য লে অব দ্য লাস্ট মিন্‌স্ট্রেল্‌' (The Lay of the Last Minstrel), 'দ্য মারমিয়ন' (The Marmion), 'দ্য লেডী অব দ্য লেক' (The Lady of the Lake), 'রব রায়' (Rob Roy), 'ওল্ড মর্ট্যালিটি' (Old Mortality) 'আইভ্যানহো' (Ivanhoe), 'দ্য ট্যালিসম্যান' (The Talisman), 'কেনিলওয়ার্থ' (Kenilworth) প্রভৃতি



স্যার ওয়াল্টার স্কট

বহু গ্রন্থের রচয়িতা। স্যার ওয়াল্টার স্কট (Sir Walter Scott, ১৭৭১-১৮৩২ খ্রী.) ছিলেন একজন বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও কবি।

॥ রবার্ট সাউদি ॥

রবার্ট সাউদি (Robert Southey, ১৭৭৪-১৮৪৩ খ্রী.) প্রসিদ্ধ ইংরেজ লেখক ও কবি। তিনি গদ্যে ও পদ্যে অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'ব্রাজিল ও পেনিনসুলার যুদ্ধের ইতিহাস' (Histories of Brazil and of the Peninsular War), 'নেলসনের জীবনী' (Life of Nelson), 'অল ফর লাভ' (All for Love), 'ওয়াট টাইলার' (Wat Tyler) প্রভৃতি তাঁর রচনা।

॥ টমাস মুর ॥

টমাস মূর (Thomas Moore, ১৭৭৯-১৮৫২ খ্রী.) সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আইরিশ কবি ও লেখক। তিনি বায়রনের বন্ধু ও জীবনীকার ছিলেন। তাঁর 'আইরিশ মেলডিজ' (Irish Melodies), 'দি 'এপিকিউরিয়্যান' (The Epicurean) প্রভৃতি বিখ্যাত রচনা।



॥ জর্জ মুর ॥

জর্জ মূর (George Moore, ১৮৫২-১৯৩৩ খ্রী.) ছিলেন একজন বিখ্যাত আইরিশ ঔপন্যাসিক। 'কনফেশন্‌স্ অব এ ইয়ংম্যান' (Confessions of a Young man), 'ইভ্‌লিন্ ইন্‌স্' (Evelyn Innes) প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর দ্বারা রচিত হয়।

॥ টমাস ক্যাম্পবেল ॥

স্কটিশ কবি ও লেখক টমাস ক্যাম্পবেল (Thomas Campbell, ১৭৭৭-১৮৪৪ খ্রী.) 'দ্য



ক্যাম্পবেল

প্লেজার্‌স্ অব হোপ' (The Pleasures of Hope), 'ই মেরিনার্স্ অব ইংল্যাণ্ড' (Ye Mariners of England), 'দ্য ব্যাটল অব দ্য বাল্টিক (The Battle of the Baltic) প্রভৃতি রচনা করেন।

॥ ল্যাণ্ডর ॥

ল্যাণ্ডর (Walter Savage Landor, ১৭৭৫-১৮৬৪ খ্রী.) একজন ইংরেজ কবি ও লেখক। তাঁর লেখা 'ইম্যাজিনারি কনভারশেসন্‌স্' (Imaginary Conversations) অত্যুৎকৃষ্ট রচনা।

॥ শেলি ॥

শেলি (Percy Bysshe Shelley, ১৭৯২-১৮২২ খ্রী.) মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে মারা যান।



শেলি

কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে তাঁর স্থান খুব উচ্চে। তিনি গীতি-কবিতা, কাব্যনাট্য ও কাহিনী-কাব্য লিখে প্রসিদ্ধ হন। তাঁর 'কুইন ম্যাব' (Queen Mab), 'অ্যাল্যাস্টর' (Alastor), 'দ্য রিভোল্ট অব ইসলাম' (The Revolt of Islam), 'অ্যাডোনিস'

(Adonis), 'প্রমিথিউস আনবাউণ্ড' (Prometheus Unbound), 'দি উইচ অব অ্যাটলাস' (The Witch of Atlas) প্রসিদ্ধ রচনা।

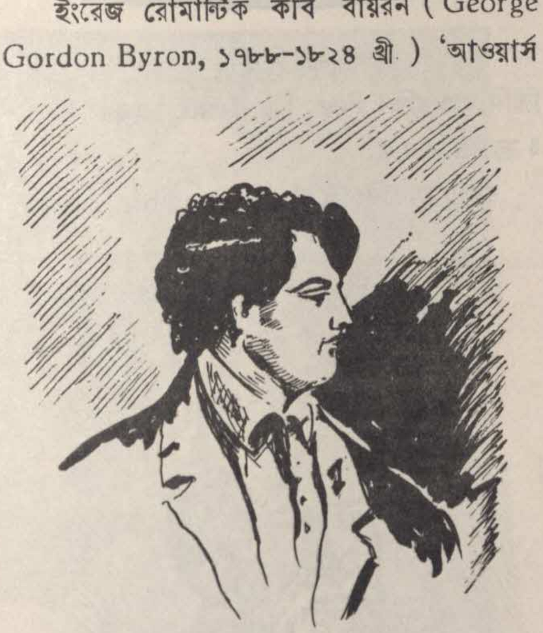
॥ কীটস ॥

ইংরেজ কবি কীটস (John Keats, ১৭৯৫-১৮২১ খ্রী.) অতি তরুণ বয়সে মারা গেলেও অপূর্ব সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন। তাঁর 'ওড্‌স্' (Ode), 'ইসাবেলা' (Isabela), 'দি ইভ অব সেণ্ট অ্যাগ্‌নিস' (The Eve of St Agnes) অপরূপ কাব্যসৌন্দর্যে পরিপূর্ণ।



॥ বায়রন ॥

ইংরেজ রোমান্টিক কবি বায়রন (George Gordon Byron, ১৭৮৮-১৮২৪ খ্রী.) 'আওয়ার্স



বায়রন

অব আইড্‌লনেস' (Hours of Idleness), চাইল্ড হ্যারল্ড'স পিল্‌গ্রিমেজ্' (Childe Harold's Pilgrimage), 'ডন জুয়ান' (Don Juan) প্রভৃতি বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন।

॥ ডি ক্যুইনসি ॥

বিখ্যাত প্রবন্ধকার ও সমালোচক ডি ক্যুইনসি (Thomas De Quincy, ১৭৮৫-১৮৫৯ খ্রী.)



ডি ক্যুইনসি

ছিলেন কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও সাউদির বন্ধু। তাঁর বিখ্যাত রচনা 'কনফেসন্‌স্ অব অ্যান ওপিয়াম-ইটার' (Confessions of an Opium-eater)।

॥ উইলিয়াম হ্যাজলিট ॥

ইংরেজ প্রবন্ধকার ও সমালোচক উইলিয়াম হ্যাজলিট (William Hazlitt, ১৭৭৮-১৮৩০ খ্রী) 'ক্যারেক্টার্‌স্ অব শেক্‌সপীয়ার'স প্লেজ্' (Characters of Shakespeare's Plays), 'টেব্‌ল্ টক্‌স্' (Table Talks) প্রভৃতি রচনা করে বিখ্যাত হন।

॥ চার্লস ল্যাম্ব ॥

চার্লস ল্যাম্ব (Charles Lamb, ১৭৭৫-১৮৩৪ খ্রী.) 'এসেস অব এলিয়া' (Essays of



চার্লস ল্যাম্ব

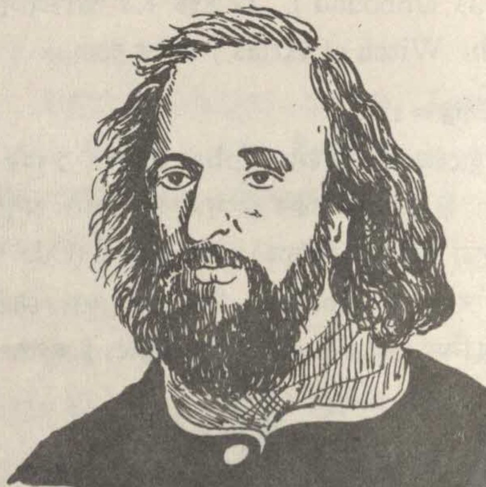
Elia)-নামক গ্রন্থ রচনা করে বিপুল খ্যাতি অর্জন করেন।

॥ জেন অস্টেন ॥

জেন অস্টেন (Jane Austen, ১৭৭৫-১৮১৭ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ মহিলা ঔপন্যাসিক। 'প্রাইড অ্যাণ্ড প্রেজুডিস' (Pride and Prejudice), 'এমা' (Emma), 'ম্যানসফীল্ড পার্ক' (Mansfield Park), 'সেন্স অ্যাণ্ড সেনসিবিলিটি' (Sense and Sensibility), 'পারস্যুয়েসন্' (Persuasion) প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ তিনি রচনা করে গেছেন।

॥ আলফ্রেড টেনিসন ॥

আলফ্রেড টেনিসন (Lord Alfred Tennyson, ১৮০৯-১৮৯২ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক। 'দ্য প্রিন্সেস' (The Princess), 'দি আইডিলস অব দ্য কিংস' (The Idylls of the Kings), 'বেকেট' (Becket), 'হ্যারল্ড' (Harold)। 'কুইন মেরী' (Queen Mary) 'ইন মেমোরিয়াম' (In Memorium), 'ম্যাড্' (Maud) প্রভৃতি তাঁর রচনা। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে



আলফ্রেড টেনিসন

তিনি রাজকবি (Poet Laureate) হন।

॥ ব্রাউনিং ॥

রবার্ট ব্রাউনিং (Robert Brownin , ১৮১২-



রবার্ট ব্রাউনিং

১৮৮৯ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি। 'ক্রিসমাস ইভ' (Christmas Eve), 'ম্যান অ্যাণ্ড উম্যান' (Man and Woman) 'পলিন' (Pauline), 'ড্রামাটিস পারসনী' (Dramatis Personae), 'পিপা পাসেস' (Pippa Passes). 'দ্য রিং অ্যাণ্ড দ্য বুক' (The Ring and the Book) প্রভৃতি তাঁর রচনা। তাঁর সঙ্গে কবি এলিজাবেথ ব ারেট ব্রাউনিং-এর বিয়ে হয়।

এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং (Elizabeth Barrett Browning. ১৮০৬ ১৮৬১ খ্রী.) সনেটস ফ্রম দ্য পোর্তুগিজ' (Sonnets from the



এলিজাবেথ ব্যারেট ব্রাউনিং

Portuguese), 'দ্য ক্রাই অব দ্য চিলড্রেন' (The Cry of the Children), 'অরোরা লাইট' (Aurora Light) প্রভৃতি কাব্য ও কবিতা রচনা করেন।

॥ ম্যাথু আরনল্ড ॥



প্রসিদ্ধ কবি ও সমালোচক ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold, ১৮২২-১৮৮৮ খ্রী.)-এর কাব্যগ্রন্থ 'সোরাব অ্যাণ্ড রুস্তম' (Sorab and



ম্যাথু আরনল্ড

Rustam) এবং 'এসেজ ইন ক্রিটিসিজ্‌ম্‌' (Essays in Criticism)-নামক সমালোচনা গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ।

॥ জর্জ মেরিডিথ ॥

প্রখ্যাত কবি ও ঔপন্যাসিক জর্জ মেরিডিথ (George Meredith, ১৮২৮-১৯০৯ খ্রী.)



জর্জ মেরিডিথ

'অরডিয়্যাল অব রিচার্ড ফেভারেল' (Ordeal of Richard Feverel), ইভ্যান হ্যারিংটন' Evan Harrington), 'ডায়না অব দ্য ক্রসওয়েজ' Diana of the Crossways), 'দি অ্যামেজিং ম্যারেজ' (The Amaging Marriage) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন।

॥ টমাস হার্ডি ॥

প্রতিভাবান্ ঔপন্যাসিক ও কবি টমাস হার্ডি (Thomas Hardy, ১৮৪০-১৯২৮ খ্রী.) ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড' (Far from the



টমাস হার্ডি

Madding Crowd), 'দ্য ট্রাম্পেট মেজর' (The Trumpet Major), 'জুড দি অবস্কিওর' (Jude the Obscure), 'এ পেয়ার অব ব্লু আইজ' (A Pair of Blue Eyes), 'ডেসপ্যারেট রেমেডিজ' (Desperate Remedies) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ রাডিয়ার্ড কিপলিং ॥

কবি, ঔপন্যাসিক ও বিভিন্ন বিষয়ের লেখক রাডিয়ার্ড কিপলিং (Rudyard Kipling, ১৮৬৫-১৯৩৬ খ্রী. ভারতের বোম্বাই-এ জন্মগ্রহণ করেন। 'জাংগল বুক' (Jungle Book) 'কিম' (Kim) প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান।

॥ রসেটি

দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি (Dante Gabriel Rossetti, ১৮২৮ ৮২ খ্রী.) ও তাঁর বোন জর্জিনা রসেটি (Christina Georgina Rossetti, ১৮৩০-৯৪ খ্রী.) দুজনেই ভালো কবি ছিলেন। 'বিয়াট্রিক্স' (Beatrix), 'লিলিথ' (Lillith), 'দান্তে'স ড্রীম' (Dante's Dream), 'ব্যাল্যাড্‌স্ অ্যাণ্ড সনেট্‌স্' (Ballads and Sonnets) প্রভৃতি গ্রন্থ দান্তের রচনা। ক্রিশ্চিনা রসেটির গ্রন্থ – 'দ্য প্রিন্সেস প্রগ্রেস' (The Prince's Progress), 'সিং-সং' (Sing-song), 'গবলিন মারকেট অ্যাণ্ড আদার পোয়েম্‌স' (Goblin Market and Other Poems) প্রভৃতি।

॥ সুইনবার্ন ॥

খ্যাতনামা ইংরেজ কবি সুইনবার্ন (Algernon



সুইনবার্ন

Charles Swinburne, ১৮৩৭-১৯০৯ খ্রী.) 'অ্যাটাল্যান্টা ইন ক্যালিডন (Atalanta in Calydon), 'সংগস্ বিফোর সানরাইজ' (Songs Before Sunrise), 'মেরী স্টুয়ার্ট (Mary Stuart) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

॥ মরিস ॥

ইংরেজ কবি মরিস (William Morris, ১৮৩৪-৯৬ খ্রী.) 'আর্থলি প্যারাডাইস' (Earthly Paradise)-নামক কাব্য লিখে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।



॥ টমাস কার্লাইল ॥

টমাস কার্লাইল (Thomas Carlyle, ১৭৯০-১৮৮১ খ্রী.) বিখ্যাত গদ্য সাহিত্যিক। তিনি 'ফ্রেঞ্চ রেভল্যুশন' (French Revolution), 'পাস্ট অ্যাণ্ড প্রেজেন্ট' (Past and Present), 'লাইফ অ্যাণ্ড লেটার্স অব অলিভার ক্রমওয়েল' (Life and Letters of Oliver Cromwell), 'ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট' (Frederick the Great), 'চ্যারিটিজম্' (Charitism), 'সার্টর রিসার্টাস' (Sartor Resartus) প্রভৃতি অনেক বই লেখেন।

॥ কার্ডিন্যাল নিউম্যান ॥

কার্ডিন্যাল নিউম্যান (John Henry Cardinal Newman, ১৮০১-৯০ খ্রী.) বিখ্যাত ইংরেজ মনীষী, ধর্মযাজক ও সাহিত্যিক। 'লীড' (Lead), 'কাইণ্ডলি লাইট' (Kindly Light) প্রভৃতি তাঁর রচনা।

॥ ফিটজেরাল্ড ॥

ফিটজেরাল্ড (Edward Fitzerald, ১৮০৯-১৮৮৩ খ্রী.) একজন খ্যাতনামা ঔপন্যাসিক'। 'দিস সাইড অব প্যারাডাইস' (This Side of Paradise), 'দ্য লাস্ট টাইফুন' (The Last Tyfoon) প্রভৃতি তাঁর লিখিত উপন্যাস। তিনি ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ওমর খৈয়ামের 'রুবাইয়াতে'র ইংরেজী অনুবাদ করেন।

॥ চার্লস ডিকেন্স ॥

ভিক্টোরিয়ান যুগের অমর ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্স (Charles Dickens, ১৮১২-১৮৭০ খ্রী.)

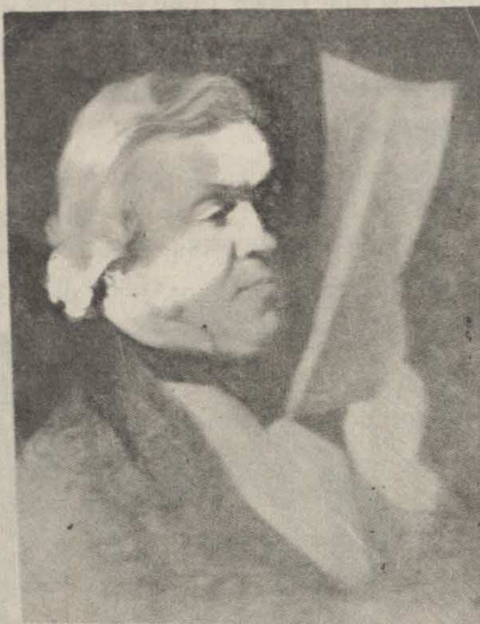


চার্লস ডিকেন্স

'পিকউইক পেপার্স্' (Pickwick Papers), অলিভার ট্যুইস্ট' (Oliver Twist), 'ডেভিড কপারফিল্ড' (David Copperfield), 'এ টেল অব টু সিটিজ' (A Tale of Two Cities), 'ওল্ড কিউরিঅসিটি শপ' (Old Curiosity Shop) প্রভৃতি অসংখ্য উপন্যাস তেত্রিশ বৎসর ধরে রচনা করেন।

॥ থ্যাকারে ॥

থ্যাকারে (William Makepeace Thackeray, ১৮১১-৬৩ খ্রী.) 'ভ্যানিটি ফেয়ার'



থ্যাকারে

(Vanity Fair), 'দ্য বুক অব স্নবস্' (The Book of Snobs), 'ইয়েলোপ্লাশ পেপারস্' (Yellow-plush Papers), 'পেন্ডেনিস' (Pendennis) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। থ্যাকারের কলকাতায় জন্ম হয়।

॥ লিউয়িস ক্যারল ॥

'অ্যালিসেস অ্যাডভেঞ্চারস্ ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড' (Alice's Adventures in Wonderland) একখানি শিশুপাঠ্য সুমধুর গ্রন্থ। এই বইখানি লেখেন চার্লস্ ডজসন (Charles Lutwidge Dodgson, ১৮৩২-১৮৯৮ খ্রী.)। কিন্তু তিনি লিউস ক্যারল (Lewis Carroll) নামে গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর আর একখানি চমৎকার বই

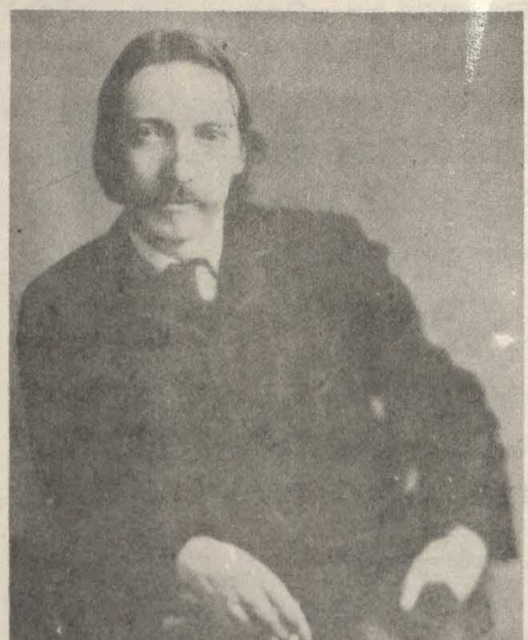


ক্যারল

'থ্রু দ্য লুকিং গ্লাস' (Through the Looking Glass)।

॥ আর এল স্টিভেনসন ॥

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ও কবি আর. এল.



স্টিভেনসন

স্টিভেনসন (Robert Louis Stevenson, ১৮৫০-১৮৯৪ খ্রী.) 'ট্রেজার আইল্যাণ্ড' (Treasure Island), 'কিডন্যাপ্‌ড্' (Kidnapped', 'ডঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিস্টার হাইড' (Dr. Jekyll and Mr. Hyde), 'ট্রাভেল্‌স্ উইথ এ ডনকি' (Travels with a Donkey) প্রভৃতি বিখ্যাত বই। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের সামোয়া দ্বীপে থাকতেন।



॥ জর্জ বার্নাড শ' ॥

পৃথিবীপ্রসিদ্ধ আইরিশ নাট্যকার 'জর্জ বার্নার্ড শ' (George Bernard Shaw, ১৮৫৬-১৯৫০



জর্জ বার্নার্ড শ'

খ্রী.) 'ম্যান অ্যাণ্ড সুপারম্যান' (Man and Superman), 'ব্যাক টু মেথুসেলা' (Back to Methuselah), 'দ্য অ্যাপ্‌ল্ কার্ট্' (The Apple Cart), 'সেণ্ট জন' (Saint John.), 'হার্টব্রেক হাউস' Heartbreak House), 'আর্মস অ্যাণ্ড দ্য ম্যান' (Arms and the Man) প্রভৃতি বহু নাটক রচনা করেন।

॥ টি. এস. এলিয়ট ।

প্রসিদ্ধ কবি ও নাট্যকার টি এস এলিয়ট (Thomas Stearns Eliot, ১৮৮৮-১৯৬৫ খ্রী.) 'দি ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' (The Waste Land) 'দ্য



টি. এস. এলিয়ট

হলো মেন' The Hollow Men), 'মার্ডার ইন্ দ্য ক্যাথিড্রাল' (Murder in the Cathedral). 'দ্য ফ্যামিলি রিইউনিয়ন' (The Family Reunion) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি ॥

খ্যাতনামা ইংরেজ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জন গল্‌স্‌ওয়ার্দি (John Galsworthy, ১৮৬৭-১৯৩৩ খ্রী.) ফোরসাইট সাগা' (Foresite Saga), 'জাস্টিস' (Justice), 'স্ট্রাইফ' (Strife), 'দ্য ম্যান অব দ্য প্রপার্টি' (The Man of the Property)



গলসওয়ার্দি

প্রভৃতি বহু গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ এইচ. জি. ওয়েল্স্ ॥

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক ও ঔপন্যাসিক এইচ. জি ওয়েলস (Hervert George Wells,



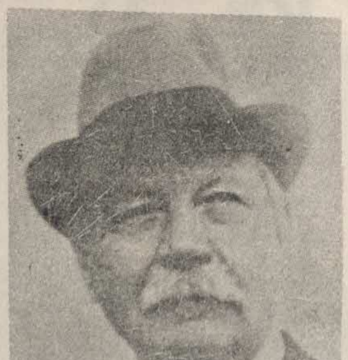
এইচ. জি. ওয়েলস

১৮৬৬-১৯৪৬ খ্রী.) বহু বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি 'দ্য টাইম মেসিন' (The Time Machine, 'দি ইনভিজিব্‌ল্ ম্যান' (The Invisible Man), 'দ্য শেপ অব থিংস টু কাম' (The Shape of Things to Come), 'দ্য সায়েন্স অব লাইফ' (The Science of Life), 'কিপস' (Kipps), 'দি ওয়ার্ক, ওয়েল্‌থ্ অ্যাণ্ড হ্যাপিনেস অব ম্যানকাইণ্ড' (The Work, Wealth and Happiness of Mankind), 'দি আউটলাইন অব হিস্ট্রি' (The Outline of History) প্রভৃতি বহু গ্রন্থ রচনা করে সাহিত্যজগতে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করে গেছেন। তিনি ছিলেন বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বক্তা। তাঁর অনেক ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে।



॥ কোনান ডয়েল ॥

রহস্যোপন্যাস লিখে স্যার আর্থার কোনান ডয়েল (Sir Arthur Conan Doyle, ১৮৫৯-১৯৩০ খ্রী) বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর উপন্যাসের গোয়েন্দা শার্লক হোমস (Sherlock Holmes) জগৎপ্রসিদ্ধ। তিনি 'দ্য হাউণ্ড অব দ্য



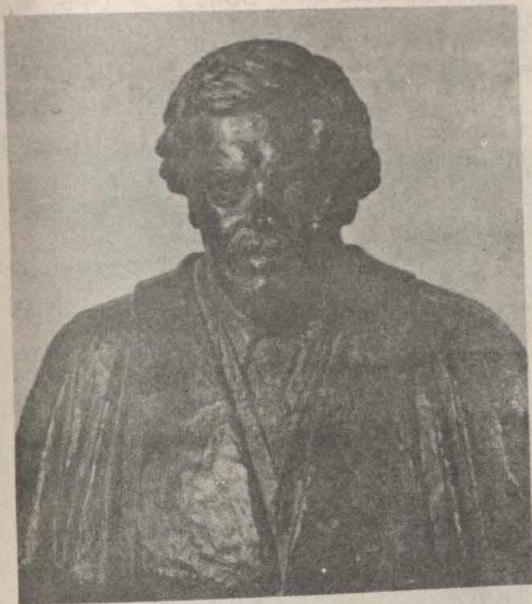
কোনান ডয়েল

বাস্কারভিলস' (The Hound of the Buskervilles), 'স্পেক্‌ল্‌ড্ ব্যান্ড্' (Speckled Band) প্রভৃতি অমর গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ জি. কে. চেস্টারটন ॥

প্রসিদ্ধ কবি ও ঔপন্যাসিক জি কে. চেস্টারটন (Gilbert Keith Chesterton, ১৮৭৪-

১৯৩৬ খ্রী) বহু গ্রন্থ রচনা করে গেছেন। 'দ্য নেপোলিয়ন অব নটিং হিল' (The Napoleon



জি. কে. চেস্টারটন

of Notting Hill), 'দ্য ফ্লাইং ইন' (The Flying Inn'), 'ফাদার ব্রাউন স্টোরিজ' (Father Brown Stories), 'দ্য ব্যালাড অব দ্য হোয়াইট-হর্স' (The Ballad of the White Horse), 'হোয়াট্'স্ রং উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড্' (What's Wrong with the World) প্রভৃতি তাঁর রচনা।

রাশিয়ান সাহিত্য

অন্যান্য দেশের মতো রাশিয়ায় প্রাচীনকালে সাহিত্য-সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে রাশিয়ান সাহিত্য সমৃদ্ধ হতে থাকে। একাদশ শতাব্দী থেকে সাহিত্য-সৃষ্টি শুরু হলেও তা তেমন প্রসিদ্ধি লাভ করে নি।

রাশিয়ান কবি, দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক লোমোনোসফকে রাশিয়ান সাহিত্যের জনক বলা হয়। লোমোনোসফ (Mikhail Vasilyevich Lomonosov, ১৭১১-৬৫ খ্রী.) মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।



॥ আলেকজাণ্ডার পুশকিন ॥

আলেকজাণ্ডার পুশকিন (Alexander Pushkin, ১৭৯৯-১৮৩৭ খ্রী.) ছিলেন রাশিয়ার জনপ্রিয় জাতীয় কবি। তিনি বার বার দেশ



আলেকজাণ্ডার পুশকিন

থেকে নির্বাসিত হন। তিনি ছিলেন কবি, নাট্যকার ও গল্পলেখক। তাঁর রচনা পরবর্তী রাশিয়ান সাহিত্যকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে। তাঁর দুখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ Eugene Onegin ও Boris Godunov।

॥ নিকোলাই গোগোল ॥

সমাজ-জীবনের অসংখ্য ত্রুটিবিচ্যুতির কথা নিয়ে বিদ্রূপাত্মক নাটক রচনা করে গোগোল (Nikolai Vasilievich Gogol, ১৮০৯-৫২ খ্রী.) বিখ্যাত হয়ে আছেন। তাঁর রচিত নাটক 'ডেড

সোল্‌স্' (Dead Souls—১৮৪২ খ্রী.) ও 'দ্য

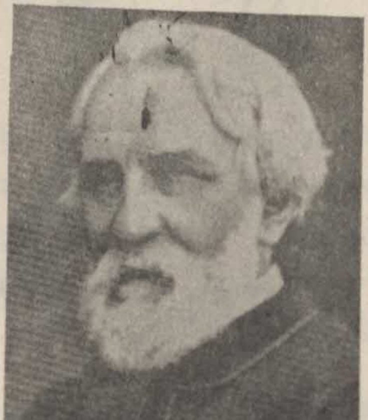


নিকোলাই গোগোল

গভর্নমেন্ট ইন্‌স্পেক্টার' (The Government Inspector—১৮৩৬ খ্রী.) অতি অপূর্ব নাটক।

॥ আইভ্যান টুর্গেনেফ ॥

বিখ্যাত রাশিয়ান ছোট গল্প ও উপন্যাস রচয়িতা আইভ্যান টুর্গেনেফ (Ivan Serveyvich



টুর্গেনেফ

Turgenev, ১৮১৮-৮৩ খ্রী.) গোগোল ও টলস্টয়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। কৃষকদের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী তাঁর লেখার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'ফাদার্স অ্যাণ্ড সন্‌স্' (Fathers and Sons) 'এ নেস্ট অব জেন্টলফোক' (A Nest of Gentlefolk), 'ভার্জিন সয়েল' (Vergin Soil), 'স্মোক (Smoke) প্রভৃতি। নিহিলিস্ট (Nihilist) কথাটির তিনিই উদ্ভাবক।

॥ ডস্টয়েভস্কি ॥

নির্যাতিত শ্রমিকদের দুঃখের কাহিনী লিখে ডস্টয়েভস্কি (Feodor Mikhailovitch Dostoyevsky, ১৮২১-১৮৮১ খ্রী.) সে যুগে বিখ্যাত হন। তাঁর রচিত উপন্যাস 'ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিশ-



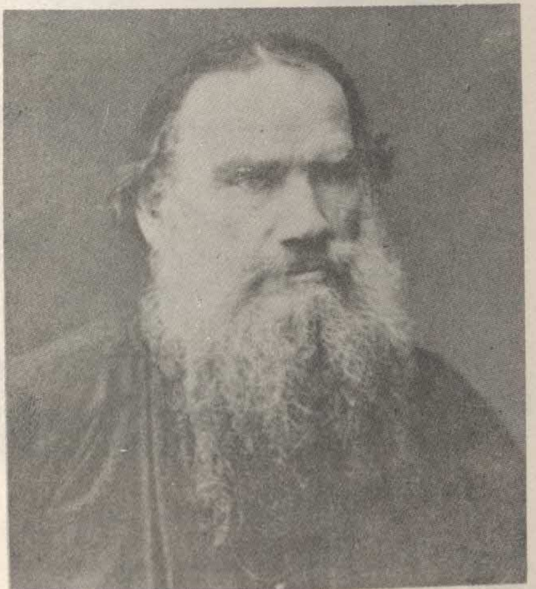
ডস্টয়েভস্কি

মেন্ট' (Crime and Punishment), 'দি ইডিয়ট' (The Idiot), 'দ্য পজেস্‌ড্' (The Possessed), 'ব্রাদার্স কারামাজোভ' (Brothers Karamazov) প্রভৃতি।

॥ কাউন্ট লিও টলস্টয় ॥

কাউন্ট লিও টলস্টয় (Count Leo Niko-

layevitch Tolstoy, ১৮২৮-১৯১০ খ্রী.) দার্শনিক মনোভাব, সরল জীবনধারা ও সৌম্য আকৃতির জন্য ঋষি টলস্টয় নামে খ্যাত। তাঁর রচিত বিখ্যাত বই 'ওয়ার অ্যাণ্ড পীস' (War



টলস্টয়

and Peace), 'অ্যান্না কারেনিনা' (Anna Karenina), 'রেজারেক্‌শন' (Resurrection), 'দ্য কসাক্‌স্‌' (The Cossacs), 'দি এণ্ড অব দি এজ' (The End of the Age), 'দ্য পাওয়ার অব ডার্কনেস' (The Power of Darkness) প্রভৃতি।

॥ ম্যাক্সিম গর্কি ॥

ম্যাক্সিম গর্কি (Maxim Gorky, ১৮৬৮-১৯৩৬ খ্রী) অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাশিয়ান সাহিত্যিক। তাঁর প্রকৃত নাম অ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ পেসকভ (Alexey Maximovich Peshkov)। তাঁর রচিত উপন্যাস 'মাদার' (Mother) পৃথিবীর সকল শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ



ম্যাক্সিম গর্কি

'মাই চাইল্ডহুড' (My Childhood), 'বাই-স্ট্যাণ্ডার' (Bystander), 'টোয়েন্টি-সিক্স মেন অ্যাণ্ড ওয়ান উম্যান' (Twenty-six Men and One Woman), 'স্যাটার্ডে নাইট' (Saturday Night) প্রভৃতি।

॥ প্যাস্টারন্যাক ॥

প্যাস্টারন্যাক (Boris Leonidovich Pasternak, ১৮৯০-১৯৬০ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ রাশিয়ান সাহিত্যিক। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর রচিত ডঃ ঝিভাগো (Dr. Zhivago) রাশিয়ায় নিষিদ্ধ হয়। তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন কিন্তু ওই পুরস্কার নিতে অস্বীকার করেন।

॥ শোলোখভ ॥

মিখাইল শোলোখভ (Mikhail Aleksandrovich Sholokhov) 'অ্যাণ্ড কোয়ায়েট ফ্লোজ দ্য ডন' (And Quiet Flows the Don), 'ভার্জিন সয়েল আপটার্নড্‌' (Virgin Soil Upturned) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন।

তিনি ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সলঝেনিৎসিন, গ্লাডকভ, প্যানফেরড প্রভৃতি সাহিত্যিক বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। এ ছাড়া আরও বহু রাশিয়ান লেখক রাশিয়ান সাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন।

জার্মান সাহিত্য

জার্মান সাহিত্য বর্তমানে সুসমৃদ্ধ। কিন্তু এই সাহিত্য খুব পুরাতন নয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে জার্মান সাহিত্য বিশেষভাবে প্রচলিত। তার আগেকার সাহিত্য তেমন উন্নত ছিল না।

॥ হ্যানস স্যাক্স্ ॥

হ্যানস স্যাক্স (Hans Sachs, ১৪৯৪-১৫৭৬ খ্রী.) গদ্যে ও পদ্যে ৫০০০ বিভিন্ন রচনা দ্বারা সে যুগের জার্মান সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তিনি ছিলেন ধর্মসংস্কার আন্দোলনের যুগের একজন মুচি।

॥ লেসিং ॥

লেসিং (Gothold Epraim Lessing, ১৭২৯-৮১ খ্রী.) ছিলেন একজন বিশিষ্ট নাট্যকার, সমালোচক ও কবি। তাঁর প্রসিদ্ধ রচনা 'লাওকুন' (Laocoon)।

॥ গ্যয়টে বা গ্যেটে ॥

গ্যয়টে বা গ্যেটে (Johann Wolfgang von Goethe, ১৭৪৯-১৮৩২ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জার্মান ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার। তাঁর রচিত 'ফাউস্ট' (Faust) এক



গ্যেটে

অপূর্ব রচনা। তিনি কালিদাসের রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলমে'র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

॥ শিলার ॥

বিখ্যাত জার্মান নাট্যকার ও কবি শিলার (Johan Christóph Friedrich Schiller, ১৭৫৯-১৮০৫ খ্রী.) 'দ্য রবারস্' (The Robbers), 'ডন কার্লস' (Don Carlos), 'ওয়ালেনস্টাইন' (Wallenstein), 'উইলিয়াম টেল' (William Tell), 'দ্য মেড অব অরলীনস্' (The Maid of Crlean.), 'মেরী স্টুয়ার্ট' (Mary Stuart), 'হিস্ট্রী অব দ্য থারটি ইয়ার্স ওয়ার্' (History



শিলার

of the Thirty Years' War) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ হাইনরিখ হাইনে ॥

হাইনরিখ হাইনে (Heinrich Heine, আনুমানিক ১৭৯৭-১৮৫৬ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ জার্মান সাহিত্যিক। জার্মান হলেও বেশির ভাগ



হাইনরিখ হাইনে

সময়ে প্যারিসে থাকতেন। তিনি জাতিতে ইহুদী ছিলেন। তাঁর লেখা গান ও কবিতা মধুর হলেও দুঃখভারাক্রান্ত ছিল।



॥ রিল্‌কে ॥

রিল্‌কে (Rainer Maria Rilke, ১৮৭২-১৯২৬ খ্রী.) একজন উল্লেখযোগ্য জার্মান সাহিত্যিক। তাঁর কবিতা অতি মধুর ও মর্মস্পর্শী।

॥ রাঙ্কে ॥

প্রসিদ্ধ লেখক রাঙ্কে (Leopold Von Ranke, ১৭৯৫-১৮৮৬ খ্রী.) ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করে জার্মান সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করেছেন।

॥ মম্‌সেন্ ॥

মম্‌সেন্ (Theodore Momsen, ১৮১৭-১৯০৩ খ্রী.) 'রোমান হিস্টরী' (Roman History), 'হিস্টরী অব দ্য রোমান কয়নেজ' (History of the Roman Coinage), 'রোমান



মমসেন

প্রভিন্সেস' (Roman Provinces) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।



॥ হেরমান সুডারমান ॥

হেরমান সুডারমান (Hermann Sudermann, ১৮৫৭-১৯২৮ খ্রী.) বহু উপন্যাস, নাটক ও কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর রচিত 'ডেম কেয়ার' (Dame Care)-এর ১২৫ তম সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

॥ হাউপ্টমান ॥

হাউপ্টমান (Gerhart Hauptmann, ১৮৬২-১৯৪৬ খ্রী.) ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। তিনি সাইলেসিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন এবং রোম, বার্লিন, সুইটজারল্যাণ্ড ও যুক্তরাষ্ট্রে কাটান। 'দি উয়িভার্স' (The Weavers) তাঁর বিখ্যাত



হাউপ্টমান

রচনা। 'রিকনসিলিয়েসন' (Reconciliation), 'দ্য সাংকেন বেল' (The Sunken Bell), 'লোনলী লাইভ্‌জ্‌' (Lonely Lives) প্রভৃতি তাঁর উৎকৃষ্ট রচনা। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ রেমার্ক ॥

রেমার্ক (Erich Maria Remarque) একজন খ্যাতনামা জার্মান ঔপন্যাসিক। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' (All Quiet on the Western Front)। এ ছাড়া তিনি আরও কয়েকটি উপন্যাস রচনা করেন।



॥ টমাস মান ॥

টমাস মান (Thomas Mann, ১৮৭৫-১৯৫৫ খ্রী.) একজন খ্যাতনামা জার্মান ঔপন্যাসিক, গল্পলেখক ও প্রবন্ধকার। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার পান। 'বাডেনব্রুক্‌স্‌'



টমাস মান

(Buddenbrooks), 'দ্য ম্যাজিক মাউনটেন' (The Magic Mountain) প্রভৃতি তাঁর রচনা।

॥ গ্রিম ॥

জার্মান শিশু সাহিত্যের রচয়িতা হিসাবে দুজনের নাম খুব প্রসিদ্ধ—জ্যাকব লাডউইগ কার্ল

গ্রিম (Jacob Ludwig Karl Grimm, ১৭৮৫-১৮৬৩ খ্রী.) ও তাঁর ভাই উইলহেল্‌ম্ কার্ল গ্রিম (Wilhelm Karl Grimm, ১৭৮৬-১৮৫৯ খ্রী.)। তাঁরা রূপকথা রচনা করে প্রসিদ্ধ হয়ে আছেন।

ফরাসী সাহিত্য

আগেকার দিনের ফরাসী সাহিত্য ছিল রূপকথা ও লোককথা নিয়ে রচিত নানা ধরনের রচনা। দ্বাদশ শতাব্দীর আগে উল্লেখযোগ্য ফরাসী সাহিত্যের সন্ধান মেলে না।

॥ জঁা ফ্রয়সার্ট ॥

জঁা ফ্রয়সার্ট (Jean Froissart, ১৩৩৭-১৪১০ খ্রী.) বিখ্যাত 'ক্রনিক্‌ল্‌স' (Chronicles) রচনা করে ফ্রান্সে কেবল রূপকথার প্রচলনের মোড় ঘুরিয়ে দেন।

॥ কমিন্স ॥

কমিন্স (Philippe de Comines বা Commines বা Comynes বা Commynes, আনুমানিক ১৪৪৭-১৫১১ খ্রী.) একজন ফরাসী লেখক। তিনি মূলতঃ কাহিনীকার হলেও বহু গান রচনা করে গেছেন।

॥ র‍্যাবেলে ॥

র‍্যাবেলে (Francois Rabelais, আনুমানিক ১৪৯৫-১৫৫৩ খ্রী.) ছিলেন একজন খ্রীষ্টীয় যাজক। তিনি দেশে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম ধরেন। তাঁর 'গারগান্টুয়া অ্যাণ্ড প্যান্ট্যাগ্রুয়েল' (Gargantua and Pantagruel) রচনার ভাষা রুক্ষ হলেও হাস্যরসাত্মক।

॥ রঁসার ॥

ফরাসী কবি রঁসার (Pierre Ronsard. ১৫২৪-১৫৮৫ খ্রী.) তাঁর বহু রচনার মধ্য দিয়ে ফরাসী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তোলেন।

॥ মঁতেন ॥

ফরাসী প্রবন্ধকার মাইকেল ডি মঁতেন (Michel de Montaigne, ১৫৩৩-৯২ খ্রী.) অনেক পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেন। তাঁর রচনা সে যুগের ইংরেজ লেখকদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

॥ মলিয়ের ॥

মলিয়ের (Moliere—Jean Baptiste Poquelin, ১৬২২-৭৩ খ্রী.) একজন খ্যাতনামা হাস্যরসাত্মক নাটকের রচয়িতা।

॥ ভলতেয়ার ॥

ভলতেয়ার (Francois Marie Arouet de Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রী) ছিলেন সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরাসী লেখক ও দার্শনিক। তাঁর রচিত 'ডিসকোর্সেস অন ম্যান' (Discourses



ভলতেয়ার

on Man, 'এসে অন দ্য মর‍্যালস অ্যাণ্ড স্পিরিট অব নেশনস্ (Essay on the Morals and Spirit of Nations), 'ফিলজফিক্যাল লেটার্স্' (Philosophical Letters) প্রভৃতি সুবিখ্যাত। তিনি ১৭৫০ থেকে ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের আহ্বানে বার্লিনে থাকেন।



॥ রুশো ॥

রুশো (Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ খ্রী.) একজন উচ্চদরের ফরাসী দার্শনিক ও রাজনৈতিক লেখক ছিলেন। তিনি 'লে কনট্রাক্ট সোশাল' (Le Contract Social), 'কনফেশনস্' (Confessions) প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর মতবাদকে ফরাসী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ বলা হয়।

॥ বো-মারশে ॥

বো-মারশে (Beau-Marchais, de Pierre Augastin Caron, ১৭৩২-১৭৯৯ খ্রী.) একজন ফরাসী নাট্যকার। তাঁর নাটক ফ্রান্সের বিভিন্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে এক নবযুগের সূচনা করে।

॥ রুঝে ডি লিল ॥

ফ্রান্সের জাতীয় সংগীত La Marseillaise ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই অপূর্ব জাতীয় প্রেরণাদায়ক সংগীত যিনি রচনা করেন তাঁর নাম রুঝে ডি লিল (Rouget de Lisle, Claude Joseph, ১৭৬০-১৮৩৬ খ্রী.)। তিনি ছিলেন খ্যাতমানা কবি ও গীতিকার।

॥ কোঁত ॥

কোঁত (Auguste Comte, ১৭৯৮-১৮৫৭ খ্রী) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ দার্শনিক। তিনি ছয়টি বৃহৎ খণ্ডে তাঁর 'পজিটিভ ফিলজফি' (Positive Philosophy)-নামক অমর গ্রন্থ রচনা করেন।

॥ ভিক্টর হিউগো ॥

ভিক্টর হিউগো (Victor Marie Hugo, ১৮০২-১৮৮৫ খ্রী.) একজন বিখ্যাত ফরাসী



ভিক্টর হিউগো

ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার। 'লে মিজারেব্‌ল্‌স্' (Le Miserables), 'দ্য টয়লার্স অব দ্য সী' (The Toilers of the Sea), 'নোৎরদাম' (Notre Dame) প্রভৃতি অত্যুৎকৃষ্ট পুস্তক তিনি রচনা করেন।

॥ বালজাক ॥

বালজাক (Balzac, Honore de, ১৭৯৯-১৮৫০ খ্রী.) ছিলেন একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তিনি আশি খানার বেশী উপন্যাস



বালজাক

রচনা করেন। তাঁর রচনার নাম 'লা কমেডী হিউমেন' (La Comedia Humaine)।

॥ দুমা ॥

দুমা (Alexandre Dumas, ১৮০২-৭০ খ্রী.)



দুমা

প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। 'দ্য থ্রী মাস্কেটীয়ার্স' (The Three Musketeers), 'দ্য কাউন্ট অব মন্টিক্রিস্টো' (The Count of Monte Cristo), 'দ্য ব্ল্যাক টিউলিপ' (The Black Tulip) প্রভৃতি বহু উপন্যাস তিনি রচনা করেন।

॥ সাঁদ ॥

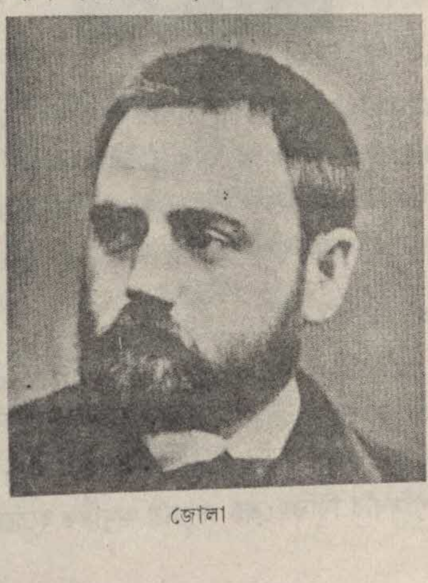
সাঁদ (George Sand, ১৮০৪-৭৬ খ্রী.) ছিলেন একজন ফরাসী লেখিকা। তাঁর প্রকৃত নাম Armandine Lucie Dupin. উপন্যাস-রচনায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল।

॥ ফ্লোবার ॥

ফ্লোবার (Gustave Flaubert, ১৮২১-৮০ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ ফরাসী ঔপন্যাসিক। 'ম্যাডেম বোভারি' (Madame Bovary), 'সালামবো' (Salammbo) প্রভৃতি বহু রচনার জন্য তিনি বিখ্যাত।

॥ জোলা ॥

জোলা (**Emil E**douard Zola, ১৮৪০-১৯০২ খ্রী.) ইতালীয় হলেও প্যারিসে জন্মগ্রহণ



জোলা

করেন। 'নানা' (Nana), 'জ্যারমিন্যাল' (Germinal) প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

॥ দোদে ॥

দোদে (Alphonse Daudet, ১৮৪০-৯৭ খ্রী.) 'রবার্ট হেলমন্ট' (Robert Helmont), 'টার্টারিন ডি টারাসকন' (Tartarin de Tarascon) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

॥ ফ্রাঁস ॥

ফ্রাঁস Anatole France, ১৮৪৪-১৯২৪ খ্রী.) ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রকৃত নাম Jacques Anatole Francois



ফ্রাঁস

Thibault। ছোট গল্প লেখায় তাঁর খুব সুনাম ছিল। তাঁর প্রসিদ্ধ বই 'থেই' (Thaise), 'রেড লিলি' (Red Lily) প্রভৃতি। তিনি ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ মোপাসাঁ ॥

মোপাসাঁ (Gue de Maupassant, ১৮৫০-৯৩ খ্রী.) পৃথিবী-বিখ্যাত শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক। তিনি ফ্লোবার, জোলা ও দোদের বন্ধু ছিলেন। তাঁর বহু গল্প পৃথিবীর বিভিন্ন শ্রেষ্ঠ ভাষায় অনূদিত হয়েছে।

॥ রোমা রোঁলা ॥

রোমা রোঁলা (Romain Rolland, ১৮৬৬-১৯৪৪ খ্রী.) সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক ও মনীষী। তাঁর লেখা দশ খণ্ডে সম্পূর্ণ 'জাঁ-ক্রিস্‌তফ' (Jean-Chris ophe) বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তিনি ভারতীয় মনীষীদের প্রতি খুব শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাঁর লেখা ঠাকুর রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর জীবনী সুপ্রসিদ্ধ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি একজন ভালো নাট্যকারও ছিলেন।

সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কের সাহিত্য

ইংল্যাণ্ডে রাজা উইলিয়ামের আমলে পশুর চামড়ার উপরে নানা কাহিনী লেখা হত। সেই কাহিনীগুলির নাম সাগা (Saga)। আইসল্যাণ্ড, সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কে আগে বর্তমান কালের মতো উন্নত সাহিত্য ছিল না। ওই চারটি দেশে সাগা সাহিত্য প্রচলিত ছিল। বর্তমানে সে স্থলে উন্নত সাহিত্যের সৃষ্টি হয়েছে। আগেকার ভাষা এখন আর সুইডেন, নরওয়ে ও ডেনমার্কে ব্যবহৃত হয় না। আইসল্যাণ্ডে পুরনো দিনের ভাষাই চলে।

॥ সুইডেনবর্গ ॥

সুইডেনবর্গ (Emanuel Swedenborg, ১৬৮৯-১৭৭২ খ্রী.) একজন সুইডিশ লেখক। তাঁর 'দ্য ট্রু ক্রিস্টান রিলিজন' (The True Christian Religion), 'ফোর প্রিলিমিনারি ডকট্রিন্‌স্‌' (Four Preliminary Doctrines), 'দি অ্যাপক্যালিপ্‌স্‌ রিভীল্‌ড্‌' (The Apocalypse Revealed) প্রভৃতি বিখ্যাত রচনা।

॥ সেলমা লাগেরলফ ॥

সেলমা লাগেরলফ (Selma Lagerlof, ১৮৫৮-১৯৪০ খ্রী.) বিখ্যাত মহিলা সুইডিশ ঔপন্যাসিক। 'গোস্টা বারলিং'স সাগা' (Gosta Berling's Saga), 'টেল্ অব এ ম্যানর' (Tale of a Manor) প্রভৃতি গ্রন্থ লিখে তিনি প্রভূত যশ অর্জন করেন। তিনিই প্রথম মহিলা ঔপন্যাসিক যিনি নোবেল পুরস্কার পান (১৯০৯ খ্রী.)।

॥ ইবসেন ॥

ইবসেন (Henrik Johan Ibsen, ১৮২৮-১৯০৬ খ্রী.) নরওয়ের একজন প্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক, কবি ও নাট্যকার। নাটক রচনায় তাঁর স্থান খুব

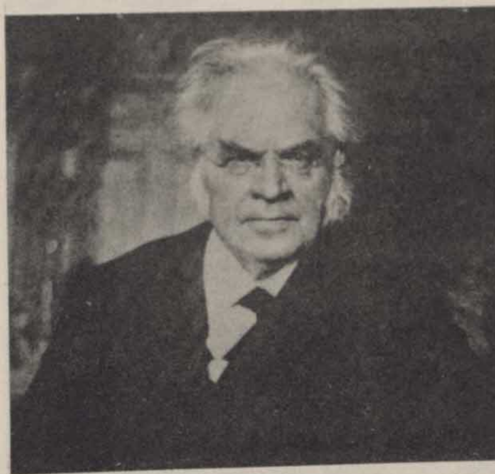


ইবসেন

উচ্চে। 'ঘোস্ট্স্' (Ghosts), 'দি ওয়াইল্ড ডাক' (The Wild Duck), 'দ্য মাস্টার বিল্ডার' (The Master Builder), 'এ ডল'স হাউস' (A Doll's House) প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা।

॥ বিয়ার্ন্সন বিয়ার্ন্স্টার্ন্ ॥

বিয়ার্ন্সন বিয়ার্ন্স্টার্ন্ (Bjornson



বিয়ার্নস্টার্ন

Bjornstjerne, ১৮৩২-১৯১০ খ্রী.) নরওয়ের প্রসিদ্ধ নাট্যকার, ঔপন্যাসিক ও কবি। নরওয়ের জাতীয় সংগীত তাঁর রচনা।

॥ হ্যামসুন ॥

হ্যামসুন (Knut Hamsun, ১৮৫৯-১৯৫২ খ্রী.) দ্য গ্রোথ অব দ্য সয়েল' (The Growth of the Soil), 'হাংগার' (Hunger), 'মিস্ট-রিজ' (Mysteries) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ সিগ্রিড উণ্ডসেট ॥

সিগ্রিড উণ্ডসেট (Sigrid Undset, ১৮৮২-১৯৪৯ খ্রী.) নরওয়ের একজন বিখ্যাত মহিলা ঔপন্যাসিক। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

। অ্যানডারসেন ॥

অ্যানডারসেন (Hans Christian Andersen, ১৮০৫-৭৫ খ্রী.) ডেনমার্কের বিখ্যাত



অ্যানডারসেন

কবি, নাট্যকার ও ঔপন্যাসিক। শিশুদের জন্য রূপকথা রচনায় তাঁর নৈপুণ্য ছিল অসীম। তাঁর লেখা 'দ্য লিট্‌ল্ মারমেড' (The Little Mermaid), 'দি আগলি ডাকলিং' (The Ugly Duckling), 'দ্য লিট্‌ল্ ম্যাচ-সেলার' (The Little Matchseller) প্রভৃতি বই সুপ্রসিদ্ধ।

॥ ব্র্যাণ্ডেস ॥

ব্র্যাণ্ডেস (Georg Morris Cohen Brandes, ১৮৪২-১৯২৭ খ্রী.) ডেনমার্কের একজন খ্যাতিমান্ সাহিত্যিক। তাঁর সমালোচনা সাহিত্য অতি উচ্চদরের।

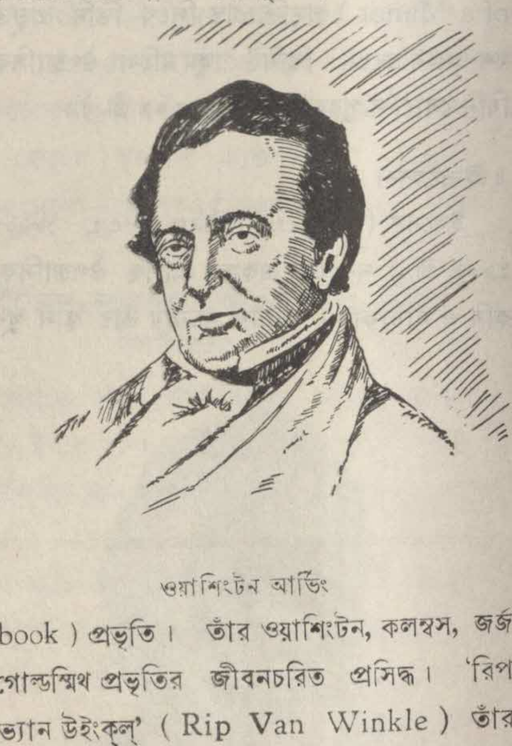
আমেরিকান সাহিত্য

॥ বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন ॥

বেনজামিন ফ্র্যাঙ্কলিন (Benjamine Franklin, ১৭০৬-৯০ খ্রী.) মূলতঃ রাজনীতিক ও বিজ্ঞানী হলেও তাঁর 'আত্মজীবনী' সাহিত্য-রসোচ্ছল। তাঁর আর একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'ওয়ে টু ওয়েলথ' (Way to Wealth)।

॥ ওয়াশিংটন আর্ভিং ॥

ওয়াশিংটন আর্ভিং (Washington Irving ১৭৮৩-১৮৫৯ খ্রী.) আমেরিকান লেখক। তাঁর রচিত গ্রন্থ : 'টেল্‌স অব এ ট্রাভলার' (Tales of a Traveller), দ্য স্কেচবুক' (The Sketch-



ওয়াশিংটন আর্ভিং

book) প্রভৃতি। তাঁর ওয়াশিংটন, কলম্বস, জর্জ গোল্ডস্মিথ প্রভৃতির জীবনচরিত প্রসিদ্ধ। 'রিপ ভ্যান উইংক্‌ল্' (Rip Van Winkle) তাঁর একটি বহুপঠিত রচনা।

॥ জেম্‌স্ ফেনিমোর কুপার ॥

জেম্‌স্ ফেনিমোর কুপার (James Fenimore Cooper, ১৭৮৯-১৮৫১ খ্রী.) একজন আমেরিকান ঔপন্যাসিক। 'দ্য স্পাই' (The Spy), 'দ্য লাস্ট অব দ্য মোহিক্যান্‌স্' (The Last of the Mohicans), 'দ্য পাথফাইণ্ডার' (The Pathfinder), 'দ্য ডীয়ার স্লেয়ার' The Deer Slayer), হোমওয়ার্ড বাউণ্ড' (Homeward Bound), 'দ্য প্রেইরী' (The Prairie), 'দ্য



জেম্স্ ফেনিমোর কুপার

পাইওনীয়ার্স' (The Pioneers), 'দ্য পাইলট' (The Pilot) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রসিদ্ধ।

॥ এডগার অ্যালান পো ॥

এডগার অ্যালান পো (Edgar Allan Poe, ১৮০৯-৪৯ খ্রী.) আমেরিকান কবি ও গল্প লেখক। তাঁর 'দ্য র‍্যাভেন' (The Raven), 'টু হেলেন'



এডগার অ্যালান পো

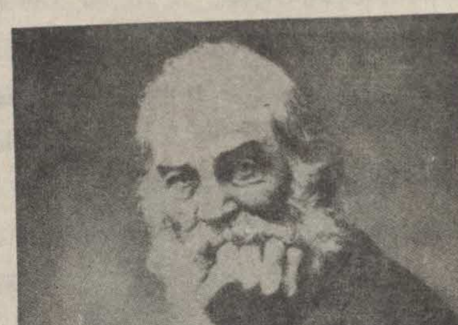
(To Helen), 'অ্যান্যাবেল লী' (Annabel Lee) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ এবং 'টেল্‌স্ অব দ্য গ্রোটেস্ক অ্যাণ্ড অ্যারাবেস্ক' (Tales of the Grotesque and Arabesque) ছোট গল্পের সংকলন এবং 'দ্য গোল্ড বাগ' (The Gold Bug), 'দ্য ব্ল্যাক ক্যাট' (The Black Cat) প্রভৃতি ছোট গল্প।

হারম্যান মেলভিল

হারম্যান মেলভিল (Herman Melville, ১৮১৯-১৮৯১ খ্রী.) বিখ্যাত আমেরিকান লেখক। মোবি ডিক' Moby Dick), 'হোয়াইট জ্যাকেট' (White Jacket) প্রভৃতি তাঁর রচিত গ্রন্থ।

॥ ওয়াল্ট হুয়িটম্যান ॥

ওয়াল্ট হুয়িটম্যান (Walt Whitman, ১৮১৯-৯২ খ্রী.) আমেরিকার জাতীয় কবি। তাঁর গদ্যছন্দে লিখিত কবিতা বাংলার কবিদের গদ্যছন্দে কবিতা লিখতে প্রেরণা যুগিয়েছে বলে মনে হয়।



ওয়াল্ট হুয়িটম্যান

'লীভ্‌স্ অব গ্রাস' (Leaves of Grass), 'ড্রাম টেপ' (Drum Tape), 'ডেমোক্র্যাটিক ভিস্টাজ'

(Democratic istas) প্রভৃতি তাঁর রচনা।

॥ র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়ালডো এমারসন ॥

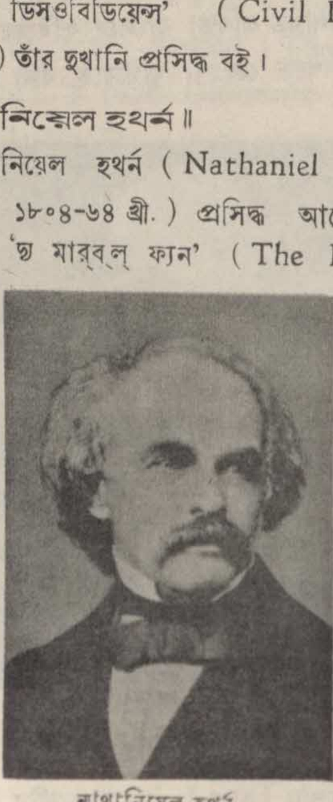
র‍্যাল্‌ফ্‌ ওয়ালডো এমারসন (Ralph Waldo Emerson, ১৮০৩-৮২ খ্রী.) আমেরিকান কবি ও প্রবন্ধকার। তাঁর 'দ্য প্রব্‌লেম্‌' (The Problem), 'উড্‌নোট্‌স্‌' (Woodnotes), 'টার্মিনাস' (Terminus), 'কনডাক্ট অব লাইফ', 'রিপ্রেজেণ্টেটিভ মেন' (Representative Men) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ রচনা।

॥ হেনরী ডেভিড থোরো ॥

হেনরী ডেভিড থোরো (Henry David Throeau, ১৮১৭-৬২ খ্রী) ইমারসনের বন্ধু জনপ্রিয় আমেরিকান লেখক। 'ওয়ালডেন' (Walden), 'সিভিল ডিসওবিডিয়েন্স' (Civil Disobedience) তাঁর দুখানি প্রসিদ্ধ বই।

॥ ন্যাথানিয়েল হথর্ন ॥

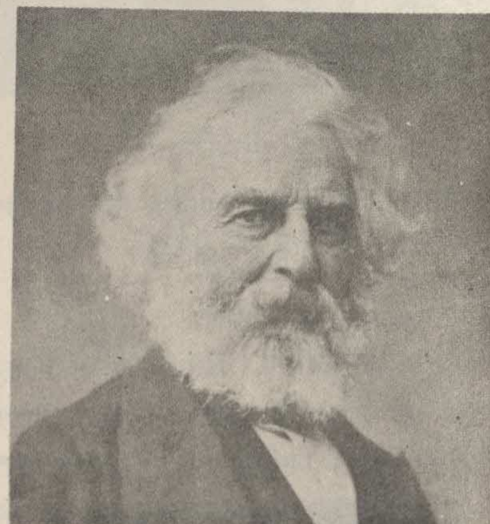
ন্যাথানিয়েল হথর্ন (Nathaniel Hawthorne, ১৮০৪-৬৪ খ্রী.) প্রসিদ্ধ আমেরিকান লেখক। 'দ্য মার্‌বল্‌ ফ্যন' (The Marble Fawn), 'দ্য স্কার্লেট লেটার' (The Scarlet Letter), 'দ্য হাউস অব দ্য সেভেন গেব্‌ল্‌স্‌' (The House of the Seven Gables), 'দ্য স্নো ইমেজ' (The Snow Image) প্রভৃতি তাঁর রচিত উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থ।



ন্যাথানিয়েল হথর্ন

॥ হেনরী ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ লংফেলো ॥

হেনরী ওয়াড্‌স্‌ওয়ার্থ লংফেলো (Henry Wadsworth Longfellow, ১৮০৭-৮২ খ্রী.) প্রসিদ্ধ আমেরিকান কবি। তাঁর রচিত 'দ্য গোল্ডেন লিজেণ্ড' (The Golden Legend), 'ভয়েসেস অব দ্য নাইট' (Voices of the Night), 'দ্য স্প্যানিশ স্টুডেন্ট' (The Spanish Student), 'হাইয়াওয়াথা' (Hiawatha) প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।



লংফেলো

॥ জেম্‌স্‌ রাসেল লোয়েল ॥

জেম্‌স্‌ রাসেল লোয়েল (James Russel Lowell, ১৮১৯-৯১ খ্রী.) আমেরিকান লেখক। 'এ ফেব্‌ল্‌ ফর ক্রিটিক্‌স্‌' (A Fable for Critics) তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

॥ হোম্‌স্ ॥

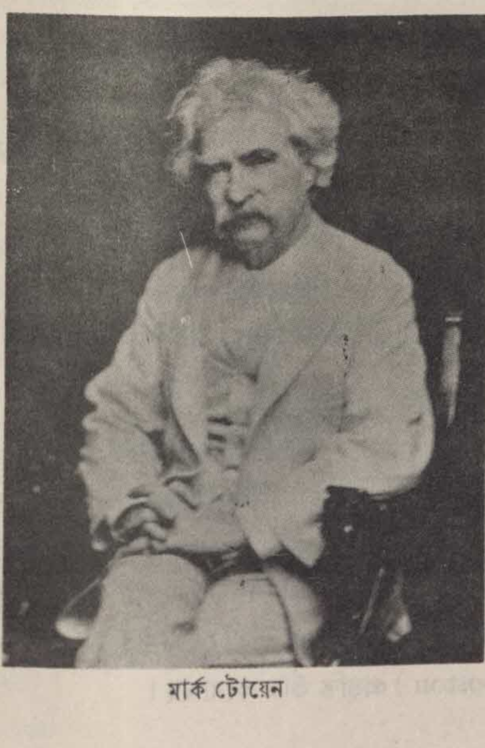
হোম্‌স্ (Oliver Wendell Holmes, ১৮০৯-৯৪ খ্রী.) আমেরিকান লেখক। 'দ্য প্রফেসার অ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেব্‌ল্' (The Professor at the Breakfast Table), 'দ্য পোয়েট অ্যাট দ্য ব্রেকফাস্ট টেব্‌ল্' (The Poet at the Breakfast Table), 'অটোক্র্যাট অব দ্য-ব্রেকফাস্ট টেব্‌ল্ (Autocrat of the Breakfast Table) প্রভৃতি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ।

॥ উইলিয়াম প্রেসকট ॥

উইলিয়াম প্রেসকট (William Hickling Prescot, ১৭৯৬-১৮৫৯ খ্রী.) আমেরিকার ঐতিহাসিক গ্রন্থকার। তাঁর রচিত ফার্ডিন্যাণ্ড ও ইজাবেলার ইতিহাস, পেরুবিজয়, মেক্সিকোজয়ের ইতিহাস সাহিত্যরসোত্তীর্ণ বহুপঠিত গ্রন্থ।

॥ মার্ক টোয়েন ॥

মার্ক টোয়েন (Mark Twain, ১৮৩৫-১৯১০ খ্রী.) একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী আমেরিকান লেখক। তাঁর প্রকৃত নাম স্যামুয়েল ল্যাংহর্ন ক্লিমেন্স (Samuel Langhorn Clemens)। 'টম সইয়ার' (Tom Sawyer), 'এ ট্র্যাম্প অ্যাব্রড' (A Tramp Abroad), 'ইনোসেণ্ট্‌স্ অ্যাব্রড' (Innocents Abroad), 'হাক্‌ল্‌বেরী ফিন' (Huckleberry Finn), 'দ্য প্রিন্স অ্যাণ্ড দ্য পপার' (The Prince and the Pauper) প্রভৃতি তাঁর লিখিত পুস্তক প্রসিদ্ধ।



মার্ক টোয়েন

॥ ওয়াশিংটন কেব্‌ল্ ॥

ওয়াশিংটন কেব্‌ল্ (George Washington Cable, ১৮৪৪-১৯২৫ খ্রী.) আমেরিকান লেখক ও সমালোচক। দাসপ্রথার বিলোপ নিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরাংশ ও দক্ষিণাংশের মধ্যে যে গৃহযুদ্ধ বাধে সে সম্বন্ধে যে-সব সাহিত্যিক লেখনী ধারণ করেন, ওয়াশিংটন কেব্‌ল্ তন্মধ্যে একজন। তিনি 'দ্য সাইলেণ্ট সাউথ' (The Silent South), 'স্ট্রেঞ্জ স্টোরিজ অব লুইসিয়ানা (Strange Stories of Louisiana), 'দ্য নিগ্রো কোয়েশ্চেন্' (The Negro Question) প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

॥ হ্যারিয়েট স্টো ॥

হ্যারিয়েট স্টো (Harriet Elizabeth Beecher Stowe, ১৮১১-৯৬ খ্রী.) বিখ্যাত 'আঙ্কল্ টম'স্ কেবিন' (Uncle Tom's Cabin)-নামক উপন্যাসের লেখিকা। উপন্যাসটিতে



হ্যারিয়েট স্টো

দাস-ব্যবসায়ের জঘন্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট বর্ণনা আছে।

॥ ও' হেনরী ॥

ও' হেনরী (O' Henry, ১৮৬২-১৯১০ খ্রী.) ছোট গল্প লিখে সে যুগে খুব নাম করেন। তাঁর 'কাবেজেস অ্যাণ্ড কিংস' (Cabbages and Kings) সুপ্রসিদ্ধ রচনা। তাঁর আসল নাম ছিল উইলিয়াম সিডনি পোর্টার (William Sydney Porter)।

॥ এমিলি ডিকিন্‌সন্ ॥

এমিলি ডিকিন্‌সন্ (Emily Elizabeth Dickinson, ১৮৩০-৮৬ খ্রী.) বিখ্যাত আমেরিকান মহিলা কবি। তিনি দু'হাজারেরও বেশী কবিতা রচনা করেছেন।

॥ উইলিয়াম হাওয়েল্‌স্ ॥

উইলিয়াম হাওয়েল্‌স্ (William Dean Howells, ১৮৩৭-১৯২০ খ্রী.) আমেরিকান ঔপন্যাসিক ও লেখক।

॥ হ্যামলিন গারল্যাণ্ড ॥

হ্যামলিন গারল্যাণ্ড (Hamlin Garland, ১৮৬০-১৯৪০ খ্রী.) প্রসিদ্ধ আমেরিকান ঔপন্যাসিক।

॥ স্টিফেন ক্রেন ॥



স্টিফেন ক্রেন (Stephen Crane, ১৮৭১-১৯০০ খ্রী.) আমেরিকান লেখক।

॥ ফ্র্যাঙ্ক নরিস ॥

ফ্র্যাঙ্ক নরিস (Frank Norris, ১৮৭০-১৯০২ খ্রী.) আমেরিকান ঔপন্যাসিক। তাঁর ভাই চার্লস্ গিলম্যান নরিস (Charles Gilman Norris, ১৮৮১-১৯৪৫ খ্রী.)-ও একজন আমেরিকান ঔপন্যাসিক ছিলেন।

॥ জ্যাক লণ্ডন ॥

জ্যাক লণ্ডন (Jack London, ১৮৭৬-১৯১৬ খ্রী.) একজন আমেরিকান লেখক।

॥ কার্ল স্যাণ্ডবার্গ ॥

কার্ল স্যাণ্ডবার্গ (Carl Sandburg, ১৮৭৮-১৯৬৭ খ্রী.) একজন আমেরিকান কবি ও সাহিত্যিক। 'স্মোক অ্যাণ্ড স্টীল' (Smoke and Steel), 'শিকাগো পোয়েম্‌স্' (Chicago Poems) প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁর রচনা।

॥ রবার্ট ফ্রস্ট ॥

রবার্ট ফ্রস্ট (Robert Lee Frost, ১৮৭৪-১৯৬৩ খ্রী.) একজন আধুনিক নামকরা আমেরিকান কবি। অনেকের মতে তিনি বর্তমান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ আমেরিকান কবি। 'এ বয়ে'জ উইল' (A Boy's Will), 'নর্থ অব বোস্টন' (North of Boston) প্রভৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ।

॥ এজরা পাউণ্ড ॥

এজরা পাউণ্ড (Ezra Loomis Pound, ১৮৮৫-১৯৭২ খ্রী.) প্রসিদ্ধ আমেরিকান সাহিত্যিক। অনুবাদ সাহিত্যে তাঁর স্থান খুব উচ্চে। ইংরেজী সাহিত্যে তাঁকে শ্রেষ্ঠ তিনজন কবির মধ্যে একজন বলা হয়।

॥ ওয়ালেস স্টীভেন্স ॥

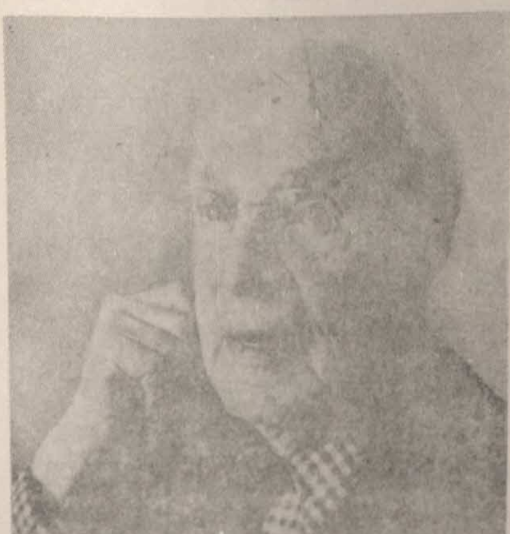
ওয়ালেস স্টীভেন্স (Wallace Stevens, ১৮৭৯ ১৯৫৫ খ্রী.) একজন প্রথিতযশা আমেরিকান কবি ও সাহিত্যিক।

॥ শেরউড অ্যাণ্ডারসন ॥

শেরউড অ্যাণ্ডারসন (Sherwood Anderson, ১৮৭৬-১৯৪১ খ্রী.) আমেরিকান কবি, ঔপন্যাসিক ও গল্পলেখক। 'মেন স্ট্রীট' (Main Street) 'ওয়াইনবার্গ' (Wineburg) প্রভৃতি তাঁর রচনা।

॥ লিউয়িস সিনক্লেয়ার ॥

লিউয়িস সিনক্লেয়ার (Lewis Sinclair,



লিউয়িস সিনক্লেয়ার

১৮৮৫-১৯৫১ খ্রী) আমেরিকান ঔপন্যাসিক।

॥ আর্নেস্ট হেমিংওয়ে ॥

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে (Earnest Hemingway, ১৮৯৮-১৯৬১ খ্রী) বিখ্যাত আমেরিকান ঔপন্যাসিক। তাঁর রচিত 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্' (A Farewell to Arms), 'ডেথ ইন দি আফটারনূন' (Death in the Afternoon), 'ফর হুম দ্য বেল টোল্স্' (For Whom the



আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

Bell Tolls), 'দি ওল্ড ম্যান অ্যাণ্ড দ্য সী' (The Old Man and the Sea), 'দ্য স্নোজ অব কিলিম্যান্জারো' (The Snows of Kilimangaro), 'গ্রীন হিল্স্ অব আফ্রিকা' (Green Hills of Africa), 'ইন আওয়ার টাইম' (In Our Time) ইত্যাদি গ্রন্থ সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ উইলিয়াম ফক্নার ॥

উইলিয়াম ফক্নার (William Faulkner, ১৮৯৭-১৯৬২ খ্রী.) প্রসিদ্ধ আমেরিকান

ঔপন্যাসিক। তিনি 'দ্য সাউণ্ড অ্যাণ্ড দ্য ফিউরি' (The Sound and the Fury), 'অ্যাজ আই লে ডাইং' (As I Lay Dying), 'লাইট ইন অগস্ট' (Light in August), 'স্যাংকচুয়্যারি' (Sanctuary) প্রভৃতি অনেক উপন্যাসের রচয়িতা। তিনি ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।



॥ পার্ল বাক ॥

পার্ল বাক (Pearl Sydenstricker Buck, ১৮৯২-১৯৭৩ খ্রী.) উল্লেখযোগ্য আমেরিকান উপন্যাস লেখিকা। তিনি বহুকাল চীনে অতিবাহিত করেন। 'দ্য গুড আর্থ' (The Good Earth)



পার্ল বাক

তাঁর একটি পৃথিবী-প্রসিদ্ধ উপন্যাস। তিনি ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

যে সব কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার ও গল্প-লেখকের নাম করা হল তাঁরা ছাড়া সারা পৃথিবীতে বহু প্রসিদ্ধ মনীষী ছিলেন ও আছেন। মেক্সিকো, পেরু ব্রাজিল আর্জেন্‌টিনা, বলিভিয়া, যুগোস্লাভিয়া. পোল্যাণ্ড ফিনল্যাণ্ড, রুমানিয়া, বেলজিয়াম, স্পেন, পোর্তুগাল, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর অসংখ্য দেশে অসংখ্য সাহিত্যিক জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের প্রতিভা ও মনীষায় পৃথিবীর সাহিত্যভাণ্ডার কানায় কানায় পূর্ণ।

জাপানী সাহিত্য

জাপান পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশ। অনেক দিক্ দিয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশ রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্সের চেয়ে কম উন্নত নয়। কিন্তু জাপানের সাহিত্য ভারতের মতো তো নয়ই, অনেক দেশের মতো সুপ্রাচীন নয়।

জাপানের সাহিত্যে চীনা প্রভাব খুব বেশী করেই পড়েছিল। জাপানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর থেকে সাহিত্য উন্নতি লাভ করতে থাকে।

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'কোজিকি' গ্রন্থ প্রাচীন কালের সাহিত্যের নিদর্শন। 'নিহোঙ্গী' ও 'যুদোকি' আরও দুখানি প্রাচীন গ্রন্থ।

জাপানী নাট্যসাহিত্যের সৃষ্টি কিভাবে হয় তা 'কোজিকি' গ্রন্থে লেখা আছে। আমতেরসু-ও-মিকমি-নো মিকোতো সে যুগের আলোর দেবী। কোন কারণে তিনি পৃথিবীর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে এক পর্বতগুহার মধ্যে আত্মগোপন করেন। ফলে সারা পৃথিবী গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেল। অনেকে অনেক ভাবে তাঁর সাধ্যসাধনা করল, অনেক স্তবস্তুতি করল কিন্তু দেবীর অসন্তোষ দূর হল না, তিনি গুহার বাইরে এলেন না। তখন অমৎসু-উজুমে-নো-মিকিতো বলে এক দেবতা এক ফন্দী আঁটলেন। তিনি গুহার ঠিক বাইরে এক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করলেন। তখন দেবীর সেই অভিনয় দেখবার কৌতূহল হল। তিনি গুহার



গুহা থেকে আলোর দেবী বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

বাইরে এসে দাঁড়ালেন। তার ফলে দিগ্‌দিগন্ত আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেল।

৭২০ খ্রীষ্টাব্দে 'নিহোঙ্গী' রচিত হয়। কবে যে 'যুদোকি' রচিত হয়, তা জানা যায় না।

৭৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ৪৫০০টি কবিতার একখানি সুবৃহৎ সংকলন রচিত হয়। ৪৫০ জন কবি কবিতাগুলির রচয়িতা। গ্রন্থটির নাম 'মান্যোসু'।

প্রাচীন যুগের কয়েকজন প্রখ্যাত কবির নাম কাকিনোমোতো-নো-হিতোমারো (৬৫৫-৬৭১ খ্রী.), ইয়ানবে-নো-আকাহিতো (৭৩০ খ্রী.) ভামানোই-নো-ওকুরা (৬৫৯-৭৩১ খ্রী)। এই সব কবি যে ছন্দে কবিতা রচনা করেন তার নাম 'ওয়াকা'।

৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে-বেশ কয়েকজন কবির অনেকগুলি কবিতার এক সংকলন প্রকাশিত হয়। এই সংকলনের নাম 'কাইফুসু'।

৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে একখানি উন্নত ধরনের কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়। তাতে বহু উৎকৃষ্ট কবিতা থাকে। সংকলনের নাম 'কোকিলসু' যে সব কবির কবিতা নিয়ে এই গ্রন্থ রচিত হয় তাঁদের কয়েকজনের নাম—কি নো-মিৎসুনে (৮৫৯-৯২৬ খ্রী.), মিলুলো তদামিনে (৮৬৭-৯৬৫ খ্রী.), কি-নো-ৎসুরাই (৯৪৬ খ্রী.)।

১২০৫ খ্রীষ্টাব্দে যে অপূর্ব কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়, তার নাম 'শিংকেকিনসু'। এই ভাবে বিভিন্ন সময়ে বহু কবিতা-সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

শুধু কবিতা রচনা নয়, গদ্য রচনাতেও সে যুগে জাপানী লেখকেরা খুব নৈপুণ্যের পরিচয় দেন। ধর্মীয় প্রার্থনাবলী, ভ্রমণকাহিনী, দিনপঞ্জী, উপন্যাস, গল্প প্রভৃতি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক-লেখিকার দ্বারা গদ্যে রচিত হয়।

'নরিটো' শিন্টো ধর্মের প্রার্থনাবলী নিয়ে রচিত হয়। ৮০০ থেকে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত 'আইসে মনোগাতারি' ও 'তাকে তোরি মনোগা-তারি' দুখানি গদ্যগ্রন্থ। ৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'তোরানিক্কি' গদ্যে লেখা ভ্রমণকাহিনী। ৯৭৪-৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'কগেরোনিক্কি' গদ্যে লেখা দিনপঞ্জী।

মহিলা ঔপন্যাসিক মারাসাকি সিকিলু সে যুগে উপন্যাস লিখে প্রভূত যশ অর্জন করেন। ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে জনপ্রিয় উপন্যাসটি রচনা করেন, তার নাম 'গেন্‌জি মনোগাতারি।'

'হেইকি মনোগাতারি', 'ৎসু-রেজুরেগুসা', 'হোজোকি' প্রভৃতি গদ্যগ্রন্থ দ্বাদশ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত জাপানে বহু সাহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়েছে। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াসুনারি কাওয়াবাতা (Yasunari

Kawabata) সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

নাটক রচনায় জাপান বৌদ্ধ যুগেই নৈপুণ্য প্রদর্শন করে। সে যুগে 'নো' নামে একশ্রেণীর নাটক রচিত হয়। এই 'নো' নাটককে প্রধানতঃ চারিটি ভাগে ভাগ করা যায়—কামি নো (দেব-দেবীদের কাহিনী নিয়ে রচিত), সুগেম-নো (সৎ ও অসতের দ্বন্দ্ব নিয়ে রচিত). ইউরেই-নো (নানা অলৌকিক অবাস্তব কাহিনী নিয়ে রচিত) ও গেনজাই-নো (সামাজিক, অর্থনৈতিক প্রভৃতি সমস্যা নিয়ে রচিত)।

ওতা নবুনাগা নামে এক মনীষী ও ন'-নো-ও-ৎসু-নামক একজন মহিলা সাহিত্যিককে দিয়ে কয়েকটি উপাখ্যান লেখান। সেই উপাখ্যানের নাট্যরূপ মহা সমাদরে মঞ্চস্থ হয়।

১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ইজুমো-নো-ওকুনি নামে এক মহিলা জাঁকজমকপূর্ণ নৃত্যগীতবাদ্য-সমন্বিত নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। এই নাট্যাভিনয় জাপানীদের খুব প্রিয় হয়ে ওঠে। নাটকের নাম প্রথমে ছিল 'শিবাই', পরে হয় 'কাবুকি'।

কাবুকি নাটকের অভিনয় বর্তমানেও জাপানে খুব জনপ্রিয়। ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'সোগো-নো-যুবান-কিরি' একটি প্রখ্যাত কাবুকি নাটক। কাওয়ারা জেনোসুকে যে অতি জনপ্রিয় কাবুকি নাটক রচনা করেন, তার নাম 'সোগা-নো-কিয়োজেন।'

কাবুকি নাটকের অভিনয় বিদেশীরাও আগ্রহের সঙ্গে দেখে থাকে, কিন্তু ভাবার্থ গ্রহণ করতে পারে না। শুধু আড়ম্বরপূর্ণ সাজসজ্জা, প্রসাধন-করা অভিনেতা-অভিনেত্রীর ধীরগতি অভিনয় (অনেক ক্ষেত্রে মূকাভিনয়) বাঁশী, ঢাক ও তিন তারের গিটারের বাজনা প্রভৃতিই তাদের আনন্দ দেয়।

জাপানের সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের দরবারে পূর্বে তেমন সমাদর লাভ করত না। বর্তমানে বহু উদীয়মান সাহিত্যিকের উদ্ভব হওয়ায় জাপানী সাহিত্য বিশেষভাবে সমাদৃত হয়ে থাকে।

চীনা সাহিত্য

চীন অতি প্রাচীন কালের সভ্য দেশ। চীনা সাহিত্যও খুব প্রাচীন। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে রচিত 'ইং কিং' একখানি সুপ্রাচীন গ্রন্থ। 'সু-কিং' 'সি-কিং', 'লি-কিং', 'চুন বিউ' প্রভৃতি গ্রন্থ বহু প্রাচীন। মহাত্মা কনফুসিয়াস বা কংফুৎসি 'চুন বিউ' গ্রন্থখানি রচনা করেন। 'চুন বিউ' মূলতঃ ইতিহাসগ্রন্থ।

কনফুসিয়াসের শিষ্যরা 'মেন-সি', 'তা-শুচ', 'কুংচি' ও লুন-ইউ' নামে চারটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। যে সাহিত্যরসসমৃদ্ধ পুস্তক কনফুসিয়াসের বাণীর সংকলন তার নাম 'লুন-ইয়াই'।

মহাজ্ঞানী মহাপুরুষ লাওয়েৎসে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'তাও তে-কিং' নামে একখানি গ্রন্থে তাঁর মতবাদ লিপিবদ্ধ করেন। লাওয়েৎসের প্রধান শিষ্য কোয়াং-সে এবং তাঁর শিষ্যবর্গ লিউ-আন, হান-ফেই-সে, ৎসমা-খিন লাওয়েৎসের প্রচারিত 'তাও' ধর্ম সম্বন্ধে বহু সাহিত্যধর্মী গ্রন্থ রচনা করেন।

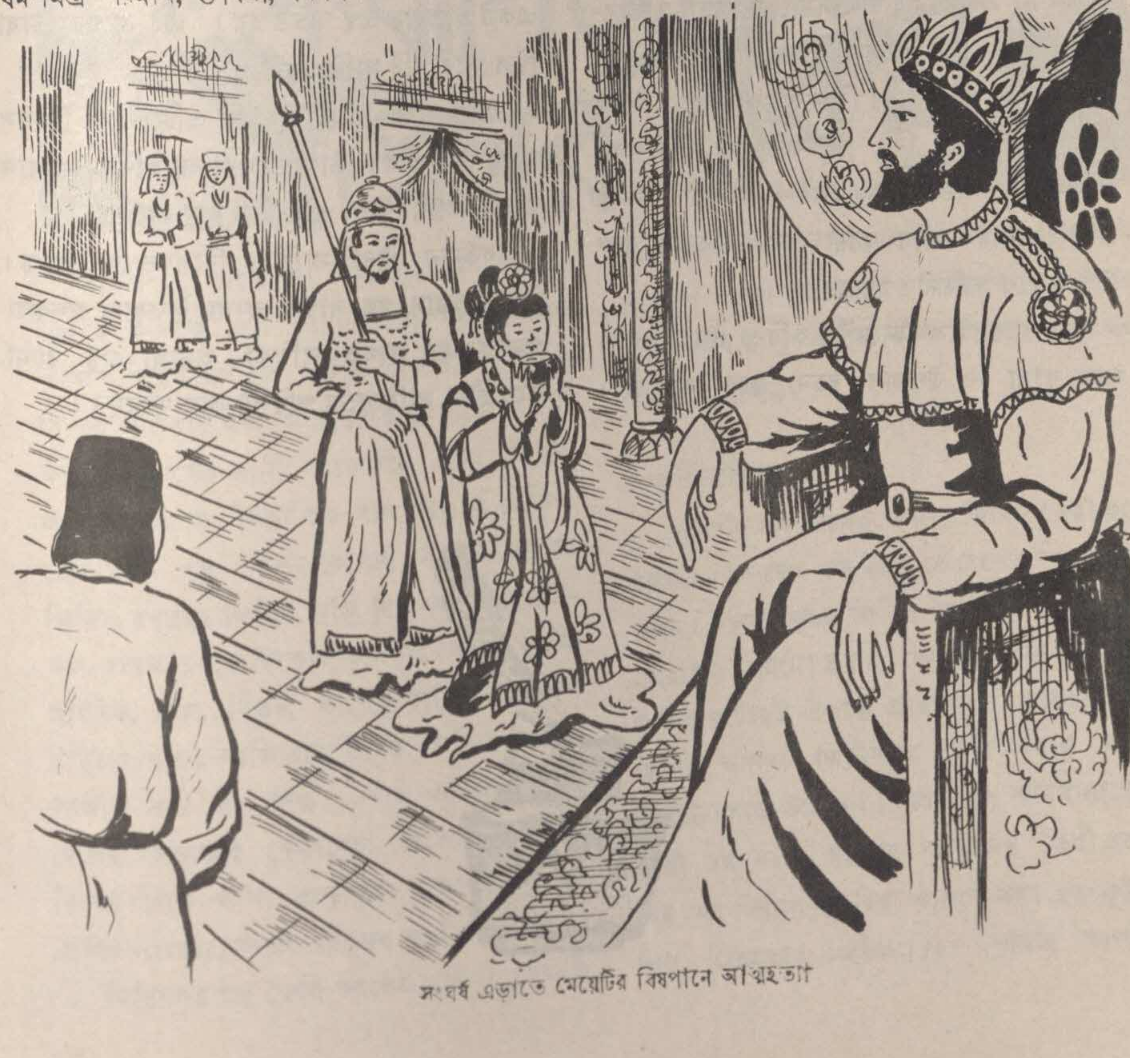
চীনে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের পর বহু গ্রন্থ রচিত হয়। প্রায় ৫,৪০০ গ্রন্থের কথা জানা যায়। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়ান ভারতবর্ষ সম্বন্ধে চীনা ভাষায় যে সাহিত্যরসোজ্জ্বল গ্রন্থ রচনা করেন, তার নাম 'কো-ব কি'।

পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ভারতবর্ষ সম্পর্কে যে যে গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'সি-ইউ-কি'। তিনি ৭৪ খানি বৌদ্ধ গ্রন্থ চীনা ভাষায় অনুবাদ করে চৈনিক সাহিত্যকে ঐশ্বর্যশালী করেন।

ভারতবর্ষ থেকে বহু পণ্ডিত চীনে গিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে চৈনিক সাহিত্যের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের নাম বিমলাক্ষ বুদ্ধজীব বজ্রবোধি কুমারজীব সংঘভূতি, ধর্মগুপ্ত, পুণ্যত্রাত প্রভাকর মিত্র গৌতম সংঘদেব, জিনগুপ্ত. ধর্ম-মিত্র পরমার্থ, গুণবর্মা, ধর্মযশ।

বহু শত বৎসর পূর্ব থেকে চীনে অনেক ভালো ভালো নাটক রচিত হয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে নবম শতাব্দী পর্যন্ত চীনা নাট্যকাররা একের পর এক নাটক রচনা করেছেন। চীনা সম্রাট্দের সাহায্যপুষ্ট নাট্যশিল্প ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করতে থাকে।

১১২৭-১১৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৮৫ জন নাট্যকারের নাম জানা যায়। তাঁরা সামাজিক, ঐতিহাসিক পৌরাণিক প্রভৃতি বিষয়ে অসংখ্য নাটক রচনা করেন। তন্মধ্যে একটি নাটক পি-পা-কি' অর্থাৎ বাঁশির কাহিনী।



সংঘর্ষ এড়াতে মেয়েটির বিষপানে আত্মহত্যা

আর একটি করুণরসাশ্রিত নাটক হানের দুঃখ। নাটকটির কাহিনী এইরূপ—সেযুগে অতি দুর্ধর্ষ তাতারদের রাজা চীন সম্রাট্‌কে একটি সুন্দরী মেয়ে পাঠাতে বলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর যে চীনা মেয়েকে সম্রাটের সামনে হাজির করা হল তাকে দেখে চীনসম্রাট্‌ বিমোহিত হলেন। তাকে তাতারদের রাজার কাছে পাঠাতে সম্রাটের মন চাইল না। সে কথা জানতে পেরে তাতার-রাজ ক্রুদ্ধ হয়ে চীনদেশ ধ্বংস করবার হুমকি দিলেন। মেয়েটি সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেন। এই ঘটনায় চীন-সম্রাটের মতো তাতার-রাজও গভীর দুঃখ পেলেন। এর পর তাতার-রাজ চীন সম্রাট্‌ বা চীনাদের বিরুদ্ধে কোনপ্রকার বিরুদ্ধ মনোভাব দেখান নি। নাটকটি সে যুগে বহু অভিনীত। বর্তমানেও সেই কাহিনী নিয়ে একাধিক নাটক রচিত হয়েছে ও সাফল্যের সঙ্গে বিভিন্ন মঞ্চে অভিনীত হয়েছে।

বহুকাল থেকে চীনদেশীয় কবি ও ঔপন্যাসিকগণ নানা কাব্য ও উপন্যাস রচনা করে আসছেন। ওয়াই-উই, ওন-ইয়াং-সি তু-ফু. ওয়াং-আন-সি, পো-চিন-ই. সু-মা-কুয়াং প্রভৃতি বহু কবি বিভিন্ন সময়ে বহু কাব্য রচনা করেন।

ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনায়ও চীন কোন দিন পিছিয়ে ছিল না, আজও নেই। সু মা-চিউ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তিনি যে ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করেন তার নাম 'সে-চি'। এই গ্রন্থে চীন দেশের ইতিহাস বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

একাদশ শতাব্দীতে 'ৎসু-চি-তুংচিয়েন' নামে একটি ইতিহাস-গ্রন্থ রচিত হয়। এই গ্রন্থের ভাষা ছিল পুরোপুরি সাহিত্যধর্মী।

মাঞ্চু বংশীয় সম্রাট্‌ কাংশি ও চিয়েন লুং ছিলেন খ্যাতনামা কবি। তাঁদের লেখা বহু কবিতা বর্তমান কালেও গভীরভাবে প্রশংসিত হয়ে থাকে।

বর্তমান চীনা সাহিত্য বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। চীনা উপন্যাস, গল্প, নাটক, কাব্য, ইতিহাস, রূপকথা প্রভৃতির বহু লেখক-লেখিকা অসংখ্য গ্রন্থ রচনা করে চীনা সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করে তুলছেন।





সাধারণতঃ হাতে বা কলে কোন জিনিস তৈরির কাজকে শিল্প (industry) বলা হলেও আসলে শিল্পের অর্থ হল কোন প্রাকৃতিক সম্পদকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মানুষের ব্যবহারোপযোগী করা। সমাজের নানা প্রয়োজনে নানা জিনিস লাগে। কাপড়, বৈদ্যুতিক সাজ-সরঞ্জাম, রেডিও, টেলিভিশন যন্ত্র, বাসন-কোসন, সাবান, কাচের জিনিস, রবারের জিনিস, দড়ি, দিয়াশলাই, সেলাই-কল, কাগজ, ব্লক, সাইকেল, চামড়ার জিনিস, চিনি, প্লাইউড, থলে, বিস্কুট, কার্পেট, হারিকেন, টাইপ রাইটার, কলম, কালি প্রভৃতি বহু জিনিস তৈরির কাজকে বলা হয় শিল্প। আর এই সব জিনিস দেশের অভ্যন্তরে কেনাবেচা, বিদেশে পাঠানো, বিদেশ থেকে আনা প্রভৃতির কাজকে বলা হয় বাণিজ্য (trade) অর্থাৎ বণিকের কাজ বা ব্যবসায়।

জিনিসপত্র শুধু তৈরি করলেই চলে না, সেগুলি কেনাবেচার জন্যে বিজ্ঞাপনাদি নানা উপায়ে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হয়। শিল্পদ্রব্যকে বাজারে ভালোভাবে চালু করতে হলে উপযুক্ত প্রচারের বিশেষ প্রয়োজন।

॥ কুটীরশিল্প ॥

পৃথিবীর সব দেশেই অসংখ্য জিনিস তৈরী হয়ে থাকে। যে দেশ যত উন্নত সে দেশের শিল্পও তত উন্নত। নিত্য নূতন জিনিস তৈরি করে মানুষের প্রয়োজন মিটানো হয়। দেশকে গড়তে হলে কৃষি- ও শিল্প দুটোরই একান্ত প্রয়োজন। কাজেই সব দেশেই অসংখ্য জিনিসপত্র তৈরি করার জন্যে কারখানা গড়ে উঠেছে। শিল্পদ্রব্য শুধু কারখানাতেই তৈরী হয় না। গৃহস্থের বাড়িতেও তৈরী হয়। সেই সব জিনিস তৈরির কাজকে বলা হয় কুটীর শিল্প (cottage industry)। ভারত, জাপান

প্রভৃতি দেশে অগণিত দ্রব্য কুটীরশিল্পের মাধ্যমে লোকে পেয়ে থাকে। অনেক ক্ষেত্রে কুটীরশিল্প-জাত দ্রব্য পরিমাণে বড় বড় কারখানায় তৈরী শিল্পদ্রব্যের মতো বেশী না হলেও উৎকর্ষের দিক্ দিয়ে যথেষ্ট ভালো বলে বিবেচিত হয়।

পৃথিবীতে কত দেশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জার্মানি, ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, স্পেন, পোর্তুগাল, যুগোশ্লাভিয়া, চীন, জাপান, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি। সেই সব দেশের শিল্প-বাণিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া এই অধ্যায়ের স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। কাজেই এই অধ্যায়ে শুধু ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও প্রচার-ব্যবস্থার কথা বলা হবে। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও মহাদেশতুল্য বিরাট ভারতের শিল্প-বাণিজ্য ও প্রচার-ব্যবস্থার বর্ণনা সীমিতভাবে দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

॥ স্বাধীনতা লাভের পর ভারতে শিল্পোন্নতি ॥

পরাধীন ভারতকে বিদেশাগত দ্রব্যের উপর বেশি করে নির্ভর করতে হত। বৃটিশ শাসকের দুরভিসন্ধিতে ভারতের শিল্প অনেক পিছিয়ে ছিল। বাণিজ্য বলতে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দ্রব্য আমদানিই বোঝাত। বিদেশে ভারতীয় দ্রব্যের রপ্তানি বিদেশের একান্ত প্রয়োজন ছাড়া তেমন ব্যাপক ছিল না। ভারত স্বাধীন হবার পর থেকে ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি সাধিত হয়েছে। অগণিত কলকারখানা সারা ভারতে গড়ে উঠেছে। কুটীরশিল্পেরও প্রভূত উৎকর্ষ সাধিত হয়েছে। আমদানি-রপ্তানির মাধ্যমে বাণিজ্যের যথেষ্ট বৃদ্ধি হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরেও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উল্লেখযোগ্য সম্প্রসারণ ঘটেছে।

॥ ভারতের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ॥

ভারত সরকার ও বিভিন্ন রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে বহু বড় বড় কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। সে-সবের কতকগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন, কতকগুলি প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত, কতকগুলি সম্পূর্ণ বেসরকারী। এখানে মাত্র কয়েকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল।

আর্টিফিসিয়াল লিম্ব্স্ ম্যানুফ্যাকচারিং কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া, কানপুর—১৯৭২ সালে কৃত্রিম অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তৈরির জন্যে স্থাপিত হয়।

ভারত ইলেকট্রনিক্স্ লিঃ, বাঙ্গালোর—১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারিতে কারখানা চালু হয়। এখানে বেতার ও ইলেকট্রনিক্স্-এর দ্রব্য তৈরির ব্যবস্থা হয়। প্রাথমিক মূলধন ছিল ১০ কোটি টাকা।

ভারত হেভি ইলেকট্রিক্যাল্স্ লিঃ—এই প্রতিষ্ঠান (১) চেকোশ্লোভাকিয়ার সহায়তায় স্থাপিত তিরুচিরপল্লীর হাই প্রেসার বয়লার প্ল্যান্ট, (২) চেক-সহায়তায় স্থাপিত অন্ধ্রের অন্তর্গত রামচন্দ্রপুরমে হেভী পাওয়ার ইক্যুইপমেণ্ট প্ল্যান্ট, (৩) সোভিয়েট-সহায়তায় স্থাপিত হরিদ্বারের কাছে রাণীপুরের হেভি ইলেট্রিক্যাল ইক্যুইপমেণ্ট প্ল্যান্ট, (৪) সুইডিশ সহযোগিতায় স্থাপিত হায়দ্রাবাদের স্থ সুইচ্‌গিয়ার ইউনিট ও (৫) হরিদ্বারের সেণ্ট্রাল ফাউণ্ড্রি ফোর্জ প্রোজেক্ট পরিচালনা করে থাকে।

ভারত অফথ্যালমিক গ্লাস লিঃ, দুর্গাপুর—১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েটের অর্থানুকূল্যে ও কারিগরী সহায়তায় চশমার কাচ ইত্যাদি তৈরির জন্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বোকারো স্টীল লিঃ, বিহার—প্রধানতঃ সোভিয়েট সহযোগিতায় চালিত ইস্পাত তৈরির কারখানা।

ব্রেথওয়েট অ্যাণ্ড কোম্পানি লিঃ—বর্তমানে কেন্দ্রীয় পরিচালনাধীন ক্রেন, রেলওয়ে ওয়াগন, পাটকলের যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরির কারখানা।

বার্ন স্ট্যাণ্ডার্ড কোং লিঃ—ভারতের অন্যতম বৃহত্তম রেলওয়ে ওয়াগন নির্মাতা।

সিমেন্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ—১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত কেন্দ্রচালিত সিমেন্ট তৈরির প্রতিষ্ঠান। এর উদ্যোগে মধ্যপ্রদেশ, কর্ণাটক, আসাম ও হিমাচলপ্রদেশে ছটি বৃহৎ সিমেন্ট তৈরির কারখানা পরিচালিত হয়।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস—পশ্চিমবঙ্গের চিত্তরঞ্জনে কেন্দ্রচালিত রেলওয়ে ওয়াগন তৈরির কারখানা। ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে চালু হয়।

সাইকেল কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ—১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় চালু হয়।

ফার্টিলাইজার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ—১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত সার তৈরির কারখানা। সিন্দ্রি (বিহার), নাঙ্গাল (পাঞ্জাব), ট্রম্বে (মহারাষ্ট্র), গোরক্ষপুর (ইউ. পি.) ও নামরূপ (আসাম) —এই পাঁচ জায়গায় সার কারখানা চালু আছে। দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ), বারাউনি (বিহার), নামরূপ এক্সপ্যানসন (আসাম) ও ট্রম্বে এক্সপ্যানসন (মহারাষ্ট্র),—চারটি স্থানে কারখানা স্থাপনের কাজ চলছে। ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশে কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

গার্ডেনরীচ ওয়ার্কশপস্ লিঃ, কলকাতা—এখানে জাহাজ তৈরি ও মেরামতের ব্যবস্থা আছে। ১৯৬০ সাল থেকে কেন্দ্রের পরিচালনাধীন।

হেভী এঞ্জিনীয়ারিং কর্পোরেশন লিঃ, রাঁচি—সোভিয়েট ও চেক-সহযোগিতায় তিনটি কারখানা চলছে। এখানে ভারী ধরনের যন্ত্রপাতি তৈরি করার ব্যবস্থা আছে।

হিন্দুস্থান এয়ারোনটিক্স্ লিঃ—বাঙ্গালোরের এয়ারক্র্যাফট ফ্যাক্টরি, কানপুরের এয়ারক্র্যাফট ডিপো, নাসিকের এয়ারক্র্যাফট ফ্যাক্টরি, কোরাপুটের এয়ারো-এঞ্জিন ফ্যাক্টরি ও হায়দ্রাবাদের ইলেকট্রনিক ইকুইপমেণ্ট ফ্যাক্টরি পরিচালনা করে। বিমান তৈরি, বিমানের এঞ্জিন তৈরি, ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি, ক্ষেপণাস্ত্র প্রভৃতি কারখানাসমূহে তৈরী হয়।

হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্ট লিঃ, বাঙ্গালোর—ভ্যাম্পায়ার জেট বিমান, ন্যাট্স্ বিমান, সুপারসনিক জেট ফাইটার, হেলিকপটার, চারজনের উপযোগী হালকা বিমান 'কৃষক', খুব হালকা বহুমুখী কার্যের জন্য 'পুষ্পক' বিমান তৈরি করে। কেন্দ্র ও কর্ণাটক রাজ্য-নিয়ন্ত্রিত।

হিন্দুস্থান অ্যান্টিবায়োটিক্স্ লিঃ—কেন্দ্রের পরিচালনায় মহারাষ্ট্রের পিম্প্রিতে স্থাপিত পেনিসিলিন ও স্ট্রেপটোমাইসিন তৈরি করার কারখানা।

হিন্দুস্থান কেবল্স্ লিঃ, রূপনারায়ণপুর (পশ্চিমবঙ্গ)—ডাক ও তার বিভাগের নানা যন্ত্রপাতি, টেলিকম্যুনিকেশন কেবল প্রভৃতি তৈরির কারখানা।

হিন্দুস্থান মেশিন টুল্স্ লিঃ, বাঙ্গালোর—লেদ, গ্রাইণ্ডিং মেশিন, মিলিং মেশিন প্রভৃতি তৈরির জন্যে স্থাপিত হয়। বর্তমানে এক জাপানী কোম্পানির সহযোগিতায় বাঙ্গালোরের এক কারখানায় ঘড়ি তৈরী হয়। তৃতীয় কারখানা স্থাপিত হয় হরিয়ানার চণ্ডীগড়ের কাছে। চতুর্থ কারখানা কেরলের এরনাকুলমের কাছে স্থাপিত হয়। পঞ্চম কারখানা হায়দ্রাবাদের কাছে স্থাপিত হয়।

হিন্দুস্থান ফটো ফিল্ম ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ, মাদ্রাজ—ফরাসী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায়

উতকামণ্ডে চলচ্চিত্রের ফিল্ম, ফটো তোলার ফিল্ম, একস্-রে ফিল্ম, ফটোগ্রাফির কাগজ প্রভৃতি তৈরি করার জন্য দু'টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে।

হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিঃ, বিশাখাপত্তনম্—এখানে জাহাজ তৈরী হয়। এই কোম্পানির অধীনে জাপানের সহযোগিতায় কোচিনে স্থাপিত অপর একটি কারখানায় জাহাজ তৈরি ও মেরামতের ব্যবস্থা হচ্ছে।

হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ—৬০০ কোটি টাকা মূলধনে স্থাপিত বৃহত্তম ইস্পাত তৈরির কারখানা। এই কোম্পানিতে ১০৬৬ কোটি টাকা নিয়োজিত আছে।

ইণ্ডিয়ান ড্রাগ্স্ অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল্স্ লিঃ, নিউ দিল্লী—এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালনায় হৃষীকেশে অ্যান্টিবায়োটিক্স্, হায়দ্রাবাদে সিন্থেটিক ড্রাগ্স্, মাদ্রাজে সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি ও কেরলে ফটো কেমিক্যাল্স্ তৈরী হয়। রাশিয়ার সহযোগিতায় যে কারখানায় সালফা ওষধ, অ্যান্টি-টি. বি. ওষুধ, অ্যান্টি-লেপ্রসি ওষুধ, অ্যান্টি-পাইরেটিক্স্ ও ভিটামিন্স্ তৈরী হয় সেটি এশিয়ার মধ্যে বৃহত্তম।

ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন লিঃ—পাইপ লাইন, রিফাইনারি ও বাজারে তৈল বিক্রয়ের জন্য গঠিত প্রতিষ্ঠান। নিউ দিল্লী ও বোম্বাইয়ে এর কেন্দ্রীয় অফিস অর্থাৎ সদর দপ্তর (হেডকোয়ার্টার)।

ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাস্ট্রিজ লিঃ—এই প্রতিষ্ঠানে টেলিফোনের নানা যন্ত্রপাতি তৈরী হয়। বাঙ্গালোর, নৈনী, শ্রীনগর, রায়বেরিলী ও পালঘাটে এই প্রতিষ্ঠানের কারখানা আছে।

ইনস্ট্রুমেন্ট্স্ লিঃ—রাশিয়ান সহযোগিতায় ও অর্থানুকূল্যে রাজস্থানের কোটা ও কেরলের পালঘাট জেলায় ইলেকট্রনিক অটোমেটিক ইণ্ডিকেটর, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক যন্ত্রপাতি, রেকর্ডিং ও কনট্রোলিং যন্ত্রপাতি, মেকানিক্যাল হাইড্রলিক ও নিউম্যাটিক যন্ত্রপাতি প্রভৃতি তৈরী হয়।

জেসপ অ্যাণ্ড কোং লিঃ, দমদম—ক্রেন, ব্যারেজ গেট, রোপওয়ে, মাটি অপসারণের যন্ত্রপাতি, রাস্তার রোলার, কাগজ তৈরির যন্ত্রপাতি, নানা ধরনের স্টীল প্ল্যান্ট প্রভৃতি তৈরির কারখানা। দুর্গাপুরে এই প্রতিষ্ঠানের অধীন একটি গ্রে-আয়রন ফ্রাউণ্ড্রি আছে।

মারুতি উদ্যোগ লিঃ—যাত্রী গাড়ী, লরী প্রভৃতি তৈরির জন্যে স্থাপিত ও ১৯৮১ সালে কেন্দ্র-পরিচালিত প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশন্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস লিঃ, কলিকাতা—সায়েন্টিফিক ও প্রিসিসন ইনস্ট্রুমেন্ট, যথা হাইড্রোমিটার, মেজারিং সিলিণ্ডার, ব্যারোমিটার, ব্লাড-প্রেশার ইনস্ট্রুমেন্ট প্রভৃতি তৈরির জন্যে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান।

ন্যাশন্যাল নিউজপ্রিন্ট অ্যাণ্ড পেপার মিল্স্ লিঃ, নেপানগর (মধ্যপ্রদেশ)—এখানে বৎসরে প্রায় ৭৫ হাজার টন কাগজ তৈরী হয়। সাধারণতঃ এই প্রতিষ্ঠানকে নেপা মিল্স্ বলা হয়।

অয়েল ইণ্ডিয়া লিঃ—কেন্দ্রীয় সরকার ও বর্মা অয়েল কোম্পানির মালিকানায় আসামে ১৯৫৯ সালে স্থাপিত পেট্রোলিয়াম ও ক্রুড অয়েল (এবং ন্যাচারাল গ্যাস) উৎপাদনের প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬২ সালে নাহারকাটিয়া থেকে নুনমাটি পর্যন্ত ৭২০ মাইল দীর্ঘ পাইপ লাইন নির্মাণ করে।

ত্রিবেণী স্ট্রাকচার্যাল্স্ লিঃ, নৈনী—বাড়ি, সেতু প্রভৃতির জন্যে প্রয়োজনীয় ভারী ইস্পাতের জিনিস তৈরির প্রতিষ্ঠান। কেন্দ্রীয় সরকার ও অস্ট্রিয়ার এক প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় এই প্রতিষ্ঠান

স্থাপিত হয়।

॥ বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠান ॥

এ ছাড়া ভারত ব্রেক্‌স্ অ্যাণ্ড ভ্যালভ্‌স্ লিঃ, ভারত আর্থমুভারস্ লিঃ, ভারত হেভি প্লেট অ্যাণ্ড ভেস্‌ল্‌স্ লিঃ, ভারত লেদার কর্পোরেশন লিঃ (আগ্রা), ভারত পাম্প্‌স্ অ্যাণ্ড কমপ্রেসারস্ লিঃ, ভারত ওয়াগন এঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ, বোম্বে ইউরেনিয়াম অ্যাণ্ড থোরিয়াম ফ্যাক্টরি, ডিজেল লোকোমোটিভ ওয়ার্ক্‌স্ (বারাণসী), হ্যাণ্ডিক্রাফট্‌স্ অ্যাণ্ড হ্যাণ্ডলুমস্ এক্সপোর্ট কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, হিন্দুস্থান ইনসেকটি-সাইড্‌স্ লিঃ, হিন্দুস্থান ল্যাটেক্স লিঃ, হিন্দুস্থান অরগ্যানিক কেমিক্যাল্‌স্ লিঃ, হিন্দুস্থান পেপার কর্পোরেশন লিঃ, হিন্দুস্থান সল্ট্‌স্ লিঃ, হিন্দুস্থান স্টীল ওয়ার্ক্‌স্ কনস্ট্রাকসন লিঃ, হিন্দুস্থান টেলিপ্রিন্টার্স লিঃ (মাদ্রাজ), ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভ ফ্যাক্টরি (গোমিয়া, হাজারিবাগ), ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থ্‌স্ লিঃ, ইনটিগ্র্যাল কোচ ফ্যাক্টরি (পেরাম্বুর) মাজগাঁও ডক লিঃ, নাশন্যাল মিনার‍্যাল ডেভেলপ-মেণ্ট কর্পোরেশন লিঃ, সালেম স্টীল লিঃ, স্কুটারস্ ইণ্ডিয়া লিঃ, ট্যানারি অ্যাণ্ড ফুটওয়্যার কর্পোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, ট্রাভানকোর মিনার‍্যালস লিঃ, তুঙ্গভদ্রা স্টীল প্রডাক্ট্‌স্ লিঃ (মহীশূর) প্রভৃতি অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান ভারতের নানা স্থানে গড়ে উঠেছে।

॥ নানাবিধ শিল্পদ্রব্য ॥

সারা ভারতের নানা রাজ্যে নানাবিধ বস্ত্র, ইলেকট্রিক মোটর, ব্যাটারি, সেলাই কল, পাখা, ধাতব বাসনপত্র, ডিজেল এঞ্জিন, পাটের থলে, দড়ি, ত্রিপল, কার্পেট, ঝাড়ন, অ্যালুমিনিয়ামের পাত্র, বল-বেয়ারিং, টাইপরাইটার, বেল্টিং, জিপ-ফাসনার, চিনি, গুড়, প্লাইউড, ব্ল্যাকবোর্ড, চায়ের বাক্স, সাইকেল, কাগজ, পিচবোর্ড, জুতো, চামড়ার ব্যাগ, ব্যারোমিটার, এক্স-রে মেসিন, রেশমী ফিতা, দিয়াশলাই, কাচের গেলাস ও অন্যান্য বাসনকোসন, সাবান, মোটর গাড়ি, বিমান, হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক, বন্দুক, কামান, রেল এঞ্জিন, রেলের ওয়াগন, প্লাস্টিকের নানা জিনিস, সিগারেট, খেলাধুলার সরঞ্জাম, আইসক্রীম, গুঁড়ো দুধ, বিস্কুট, পাঁউরুটি, চকোলেট, গালার জিনিস, গ্রামোফোন রেকর্ড, বৈদ্যুতিক সাজসরঞ্জাম, বার্নিশ, রং, মোমবাতি, মাদুর, সতরঞ্চি, সিমেণ্ট, বনস্পতি, রবারের নানা জিনিস, পুতুল, নানারকমের খেলনা, চামচ, মাছধরা জাল, নাইলনের মশারি, নানা বই, কালি, কলম, চুড়ি, ছাপাখানার টাইপ, চিমনি, আয়না, চশমা, চশমার খাপ, দূরবীন, বাইনোকুলার, ধূপ, সেফটিপিন, আলপিন, টর্চ, থার্মসফ্লাস্ক, কেরোসিন তৈল, টালি, ইট, ঘর ছাইবার টিন, হারিকেন, ঘড়ি, ওষুধ, আঠা, ইনফ্রা-রে মেসিন, মোটর সাইকেল, রিকশা, ট্রামগাড়ি, বাস, লরী, টেম্পো, লজেন্স, নানারকমের আচার, ঘি, মাখন, খোল, ভুষি, খই, মুড়ি, চিঁড়ে, চর্বি, কম্বল প্রভৃতি অগণিত দ্রব্য তৈরী হয়। যত দিন যাচ্ছে ততই ভারতীয় শিল্পের প্রসার বাড়ছে।

॥ আমদানি-রপ্তানি ॥

এই সব শিল্পদ্রব্যের কিছু উদ্বৃত্ত হলে বিদেশে রপ্তানী হয় এবং ভারতের প্রয়োজনে নানা শিল্পদ্রব্য আমদানী হয়। ভারতের রপ্তানি-করা জিনিসের মধ্যে চা, চিনি প্রভৃতি প্রধান। পাশের রাষ্ট্রসমূহে ভারত কয়লাও পাঠিয়ে থাকে। রপ্তানি-আমদানির মাধ্যমে ভারতে দ্রুত বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটছে। ভারতের অভ্যন্তরেও কোটি কোটি দোকানাদি

মারফত এই সব শিল্পদ্রব্য বিক্রী হচ্ছে। তাতে মানুষ বিশেষভাবে উপকৃত হচ্ছে।

॥ প্রচার-ব্যবস্থা ॥

ভারতের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিল্পদ্রব্য বিক্রয়ের জন্যে অধিকসংখ্যক ক্রেতাকে আহ্বান জানানোর জন্যে নানাবিধ উপায়ে প্রচার চালানো হয়ে থাকে। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে, বড় বড় হের্ডিং-এ বিজ্ঞাপন এঁকে ও লিখে, হ্যাণ্ডবিল বিলি করে, মুদ্রিত পুস্তিকা ক্রেতাদের দিয়ে জানানো হয়, কোন্ জিনিসের কত দর, কী ধরনের উপাদান দিয়ে তৈরী কী রকম টেকসই, কী পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞাপন দিলে শিল্পদ্রব্যাদির বিক্রয় বাড়ে।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদনের সময় যে খরচ পড়ে, তার সঙ্গে বিজ্ঞাপনাদির জন্যে যে খরচ হয় তা হিসেব করেই শিল্পদ্রব্যের মূল্য ধার্য করা হয়। প্রস্তুতকারকদের সব সময়েই লক্ষ্য থাকে যাতে উৎপন্ন দ্রব্য ক্রেতার ক্রয়সামর্থ্যের মধ্যেই থাকে।

॥ বিনিময় বাণিজ্যের পরিবর্তন ॥

পূর্বে জিনিসপত্র পেতে হলে জিনিসের বিনিময় করতে হত। চাষী তার ধান-চাল-গম দিয়ে তাঁতীর কাছ থেকে কাপড় নিত। গোয়ালা তার দুধের পরিবর্তে বাজার থেকে সবজি সংগ্রহ করত। কামার দা কুড়ুল তৈরি করে তার মজুরি স্বরূপ কারো কাছ থেকে তার গাছের আম কাঁঠাল বা নারিকেল পেত। এমনিভাবে দ্রব্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে সমাজে দ্রব্যাদির লেনদেন হত। পরে কড়ি দিয়ে জিনিসপত্র কেনবার প্রথা চালু হল। সব কিছুতেই লোকে নানা অসুবিধা বোধ করতে করতে শেষ পর্যন্ত টাকাপয়সার প্রবর্তন হল। টাকাপয়সা দিয়ে জিনিস কেনা সহজ হল।

আবার ব্যাঙ্কের চেক দিয়ে জিনিসপত্র কেনা চলে। সেই চেক ব্যাঙ্কে দিয়ে সহজেই টাকা পাওয়া যায়।

॥ কলকারখানা ॥

চরকায় বা তকলিতে সুতো কেটে তা দিয়ে কাপড় বোনানো চলে। কিন্তু অনেক সময় লাগে, পরিশ্রম বেশী হয়। কম উৎপাদন হয়। তাই মানুষে কাপড় তৈরির কল তৈরি করল। তাতে হাজার হাজার কাপড় সহজে তৈরী হচ্ছে। এই ভাবে আজকাল যন্ত্রপাতির সাহায্যে বড় বড় কারখানায় নানা জিনিস তৈরি করছে।

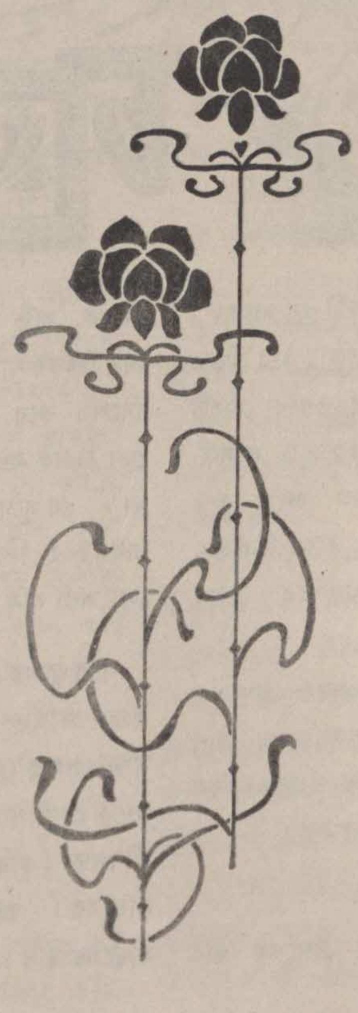
॥ কুটীরশিল্পের মাধ্যমে নানা জিনিস তৈরি ॥

আবার বাড়িতে বাড়িতে জিনিস তৈরি করার রেওয়াজ শুধু ভারতে কেন, সারা পৃথিবীতে বিদ্যমান। ভারতে মিলে যেমন বস্ত্রাদি তৈরী হয়, তাঁতীর ঘরে তেমনই বস্ত্র তৈরী হয়। তাঁতের কাপড় টেকসই ও সুন্দর হয়। ভারতের সব রাজ্যেই অগণিত তাঁতী বস্ত্রাদি তৈরি করে থাকে। সরকার তাদের নানাভাবে সাহায্য করে থাকেন। সুতী কাপড় ছাড়া রেশমী বস্ত্রাদিও তৈরী হয়। জুতো, নানা ধরনের খেলনা, ছুরি, কাঁচি, চিরুনি, আয়না, কাচের জিনিস, সাবান, কাঠের আসবাবপত্র, ঝুড়ি, কুলো, শাবল, কোদাল, কাটারি প্রভৃতি অসংখ্য জিনিস কুটীরশিল্পের মাধ্যমে তৈরী হয়ে থাকে। অলংকার তৈরি পুরোপুরি কুটীরশিল্পের অন্তর্গত। কুটীরশিল্পের মাধ্যমে তৈরী জিনিস সাধারণতঃ উৎকৃষ্ট হয়। এতে দেশের বহু লোকের কারখানায় কাজ না করে ঘরে বসেই অর্থোপার্জন করার সুবিধা হয়।

॥ বিজ্ঞাপনের যুগ ॥

বর্তমানে প্রচারের উদ্দেশ্যে নানা পন্থা গ্রহণ করা হয়। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া, রাস্তার ধারে হোর্ডিং লাগানো, রেলওয়ে, ট্রাম, বাস ইত্যাদিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া, রাস্তায় রাস্তায় হ্যাণ্ডবিল বিলি করা, রেডিওর মারফত প্রচারকার্য চালানো, দোকানের সামনে সাইনবোর্ড টাঙ্গানো, বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেওয়া, সিনেমায় স্লাইড দেওয়া প্রভৃতির দ্বারা শিল্পদ্রব্যের প্রচারের জন্যে নানা উপায় অবলম্বন করা হয়। বর্তমানের যুগ যেমন যন্ত্রযুগ, একে বিজ্ঞাপনের যুগও বলা চলে। ভালভাবে প্রচারকার্য চালাতে গেলে যে বিপুল অর্থব্যয় হয় তা শিল্পদ্রব্যাদির বহুল প্রচারের ফলে পুষিয়ে যায়।

ভারত উত্তরোত্তর শিল্পবাণিজ্যের ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতিলাভ করছে। এইভাবে চললে, ভারত শিল্পবাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশে পরিণত হবে।





চারুকলা

কলা শব্দের ইংরেজী art। শব্দটি খুব ব্যাপক। সংস্কৃত সাহিত্যে কলা বলতে কি বোঝায় তার বিস্তৃত বর্ণনা আছে। বাৎস্যায়ন ও ভাগবতকার চৌষট্টি রকম কলার কথা বলেছেন। শব্দকল্পদ্রুমে, ললিত-বিস্তর গ্রন্থে লিখিত যে চৌষট্টি রকম কলার কথা বলা হয়েছে, তাতে নৃত্য, গীত, বাদ্য, চিত্রাঙ্কন, অভিনয়, প্রসাধন, সাহিত্য প্রভৃতির উল্লেখ আছে।

চারুকলা অর্থাৎ fine arts বলতে প্রধানতঃ চিত্রাঙ্কন ও ভাস্কর্য বোঝায়। সাহিত্য, নৃত্য, গীত, বাদ্যও চারুকলার অন্তর্গত। কিন্তু এখানে কেবল ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়ার কথাই বল হল।

॥ প্রাচীনকালের গুহাচিত্র ॥

বর্তমানে পৃথিবীর সব দেশের লোকেই ছবি আঁকে, মূর্তি গড়ে। এই সব ছবি ও মূর্তির দিন দিন উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে। কিন্তু আগেকার দিনে, বিশেষ করে সুদূর প্রাগৈতিহাসিক যুগে মূর্তি গড়া তো ছিলই না, ছবি আঁকার রেওয়াজও তেমন ছিল না। সে যুগের লোকের না ছিল ঘরবাড়ি, না ছিল এখনকার দিনের মতো আঁকবার সাজসরঞ্জাম। লোকেরা বাস করত পাহাড়ের গুহায়।

সে যুগের লোকেদের মনেও যে ছবি আঁকার ইচ্ছা জাগত তার নিদর্শন পৃথিবীর নানা দেশের নানা গুহার দেওয়ালে আঁকা অতি সাধারণ ছবি থেকে দেখা যায়। প্রধানতঃ এই সব ছবি ছিল জীবজন্তু (হরিণ, বাইসন, হাতি প্রভৃতি) ও মানুষের। তাও সে সব অপটু হাতের আঁকা মানুষের ছবি।

॥ সবচেয়ে পুরনো ক্ষোদিত জন্তু ও মানুষের মূর্তি ॥

সব চেয়ে পুরনো ক্ষোদিত জন্তু ও মানুষের মূর্তি পাওয়া গেছে ফ্রান্সের পেরিগোর্ডে Les Ezzies-এর কাছে লা ফেরাসি থেকে। পাথরের চাঁই-এর উপরে খোদাই করা জন্তু ও মানুষের চেহারা। এ-গুলি ২৫ হাজার খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্ষোদিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

ফ্রান্স, রাশিয়া, মেক্সিকো, স্পেন, অস্ট্রিয়া, ইতালী, সুইটজারল্যাণ্ড, পোল্যাণ্ড, ইরান, মরক্কো, যুগোশ্লাভিয়া, গ্রেট ব্রিটেন, আয়ারল্যাণ্ড, ভারতবর্ষ, চীন প্রভৃতি দেশের বহু গুহার দেওয়ালে গুহা মানবের আঁকা ছবি দেখা গেছে। বহু গুহার দেওয়ালের ছবি রঙিন। গুহামানবেরা সাধারণতঃ নানা জীবজন্তু ও মানুষের ছবি এঁকে রেখে গেছে।

॥ চারুকলায় মিশরীয় নৈপুণ্য ॥

প্রাচীন মিশরে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দেও ছবি আঁকা ও মূর্তি গড়া হত বলে জানা গেছে। সেখানকার ফেরো (pharaoh) অর্থাৎ সম্রাট্‌দের সমাধিকক্ষের দেওয়াল, ছাদ, মেঝে প্রভৃতিতে নানা ছবি আঁকা থাকত। মৃত মানুষের মৃতদেহকে 'মামি' করে যে কাঠের আধারে রাখা হত, সেই আধারে নানা ছবি, নানা কারুকার্য থাকত। অষ্টাদশ রাজবংশের বিখ্যাত সম্রাট্ তুতেনখামেনের সমাধিকক্ষে রঙিন ছবি দেখা গেছে। ছবি আঁকা ছাড়া মূর্তি গড়াতেও সে-যুগের মিশরীয়রা বিশেষরূপ পারদর্শী ছিল। সারা মিশরে সে-যুগের অসংখ্য প্রস্তরমূর্তি পাওয়া গেছে। ছোট বড় বহু স্ফিংক্স্ মিশরীয়দের মূর্তি-গড়ার নৈপুণ্যের নিদর্শন।

॥ সুমেরীয় চারুকলা ॥

সুমেরীয়রা ছবি আঁকতে ও মূর্তি গড়তে খুব পারদর্শী ছিল। অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, ক্রীট দ্বীপ প্রভৃতি স্থানের প্রাচীরচিত্র, কারুকার্য-করা বাসনপত্র, ছোট বড় প্রস্তরমূর্তি প্রভৃতি খুবই সুন্দর ছিল।

॥ মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পার চারুকলা ॥

মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পায় বহু পুতুল, কারুকার্য-করা বাসনপত্র, রং-করা মাটির পাত্র, ছোট বড় মূর্তি, নৃত্যরতা নারীমূর্তি, হাতি, ছাগল, বাঁকানো শিঙের মহিষ প্রভৃতির মূর্তি, নানা ধরনের সীলমোহর পাওয়া গেছে। পাঁচ হাজার বছরেরও আগের মানুষের চারুকলা সৃষ্টিতে কিরূপ নৈপুণ্য ছিল তা সেই সব নিদর্শন দেখে বুঝতে পারা যায়।

॥ প্রাচীন গ্রীস ও রোমের চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য ॥

প্রাচীন গ্রীস ও রোম প্রস্তরমূর্তি নির্মাণে অপূর্ব পারদর্শিতা লাভ করে। এক সময়ে সারা গ্রীসে ও রোমে বিভিন্ন ধরনের বহু সুন্দর সুন্দর প্রস্তরমূর্তি নির্মিত হয়। শুধু পাথরের খোদাই-করা মূর্তি নয়, চিত্রাঙ্কনেও গ্রীসে ও রোমে বিস্ময়কর নৈপুণ্য দেখা গেছে। অনেক ক্ষেত্রে সে-সব চিত্র পাথরের উপরে সূক্ষ্ম কাজের ভিতর দিয়ে বিকাশ লাভ করেছে।

গ্রীসের মূর্তি গড়ার বিদ্যা অর্থাৎ ভাস্কর্য কিরূপ নিপুণ ছিল তা মিলস দ্বীপে প্রাপ্ত ভেনাস দেবীর হাতভাঙা মূর্তি (Venus de Milo) দেখে বুঝতে পারা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর ভাস্কর মাইরন (Myron)-এর দ্বারা গঠিত ডিস্ক অর্থাৎ গোল চাকতি-নিক্ষেপকারী একজনের মূর্তিটিও নিপুণ শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন। অবশ্য আসল মূর্তিটি এখন আর নেই। তারই অনুকরণে নির্মিত মূর্তিকেই আমরা দেখে থাকি। আর একটি বিখ্যাত ভাস্কর্য সাপের সঙ্গে লাওকূনের লড়াইয়ের

মূর্তি। লাওকূন (Laocoon) ছিলেন গ্রীকদের পৌরাণিক দেবতা অ্যাপলোর পুরোহিত ও প্রায়ামের পুত্র। লাওকূন চিরকুমার থাকার প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ ছিলেন। কিন্তু তিনি বিবাহ করেন। তার জন্যে অ্যাপলো ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্যে দুটি বিরাট সাপ পাঠিয়ে দেন। সেই সাপ দুটির সঙ্গে লাওকূনের তুমুল লড়াই শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত সাপ দুটি লাওকূন ও তাঁর দুই পুত্রকে পিষে মেরে ফেলে। লাওকূনের সঙ্গে সাপের লড়াইয়ের প্রস্তরমূর্তিটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর। এটি ভ্যাটিকান প্রাসাদে রক্ষিত আছে।

॥ সুড়ঙ্গের দেওয়ালে যীশুর চিত্র ॥

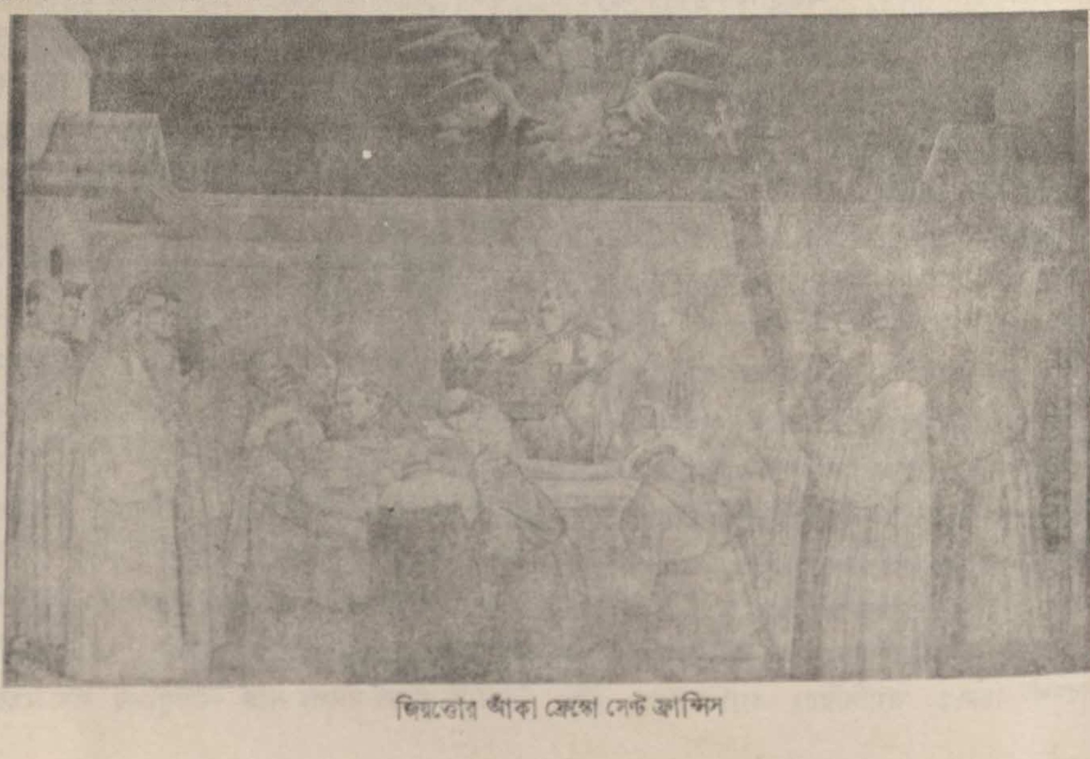
প্রাচীন রোমে খ্রীষ্টধর্মবিরোধীরা খ্রীষ্টানদের উপরে নিদারুণ অত্যাচার শুরু করে। তারা সুযোগ পেলেই খ্রীষ্টানদের ধরে আগুনে পুড়িয়ে মারতে থাকে। সে-সময়ে খ্রীষ্টানরা এখনকার দিনের মতো সংখ্যায় বেশী ছিল না, তাদের শক্তিসামর্থ্যও বিরোধীদের সঙ্গে লড়াই করবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। খ্রীষ্টানরা খ্রীষ্টধর্মবিরোধীদের ভয়ে ভূগর্ভস্থ সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে থাকত। সেই সুড়ঙ্গের দেওয়ালে তাদের আঁকা যীশু খ্রীষ্টের মেষপালক মূর্তি দেখা যায়।

॥ ফ্লোরেন্সের চিত্রশিল্পী ॥

ফ্লোরেন্স (Florence) ইটালীর এক বিখ্যাত শহর। এখানে কবি দান্তে ও মাইকেল্যাঞ্জেলোর জন্ম হয়। এই শহরেই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী জিওভ্যানি চিম্যাবুয়ে (Giovanne Cimabue, ১২৪০-১৩০২ খ্রী.) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল চেনি ডি পেপো (Cenni di Pepo)। তার আঁকা সেন্ট ফ্রান্সিসের ছবি সুবিখ্যাত। তিনি ফ্লোরেন্টাইন চিত্রাঙ্কন ধারার প্রবর্তক।

॥ জিয়ত্তো ॥

ফ্লোরেন্সের আর একজন চিত্রশিল্পী জিয়ত্তো



জিয়ত্তোর আঁকা ফ্রেস্কো সেন্ট ফ্রান্সিস



কুঞ্জবনে গোপগোপী-পরিবৃত শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা

কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণ ও রাধিকা

শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণের অষ্টম অবতার (ভাগবতমতে বিংশ অবতার)। তাঁর পিতা বসুদেব। মাতা কংস-ভগিনী দেবকী। তাঁর বাল্য ও কৈশোর বৃন্দাবনে কাটে। সেই সময়ে অগণিত গোপকন্যা তাঁর লীলার সহচরী হন। শ্রীরাধিকা ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রধানা।

যমুনার তীরে তমালবনে নীপনিকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীরাধিকা ও গোপীদের নিয়ে নানা খেলায় মেতে থাকতেন। সেই সময়কার একটি চিত্র পূর্বপৃষ্ঠায় সন্নিবেশিত হয়েছে।

কুঞ্জবনে গোপগোপী, ময়ূর, হংস, গাভী, বলাকা— সকলেই শ্রীকৃষ্ণ-রাধিকার উপস্থিতিতে উৎফুল্ল। সেই সঙ্গে কিছুটা বিমর্ষও। তাঁদের চিত্ত এই চিন্তায় উদ্বেল যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের ফেলে হয়তো অন্যত্র চলে যাবেন।

শ্রীকৃষ্ণ কংস ও কংসের অনুচরদের হত্যা করেন। শিশুপাল তাঁর দ্বারা নিহত হন। শ্রীকৃষ্ণ কালিয়নাগকে দমন করেন। তিনি কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধে অর্জুনের রথের সারথি ছিলেন। তাঁরই সহায়তায় পাণ্ডবেরা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে জয়ী হন।

তিনি বৃন্দাবন (ব্রজধাম) ত্যাগ করে মথুরায় গিয়ে রাজা হয়েছিলেন। ব্যাসদেব তাঁর ও অর্জুনের কথা নিয়ে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (সংক্ষেপে গীতা) রচনা করেন।

(Giotto di Bondone, আনুমানিক ১২৬৬— আনুমানিক ১৩৩৭ খ্রী.)। তিনি শুধু বিখ্যাত চিত্রকরই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ভাস্কর। জিয়ত্তো আসিসি, পাদুয়া ও ফ্লোরেন্সের চার্চের প্রাচীরগাত্রে যে-সব রঙিন ছবি আঁকেন, তা আজও বিদ্যমান। তাঁর অধিকাংশ চিত্র নষ্ট হয়ে গেছে।

॥ ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো ॥

ইটালীর আর একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো (Fra Angelico, ১৩৮৭-১৪৫৫ খ্রী.)। তিনি ফ্রেস্কো (fresco) অর্থাৎ প্রাচীরচিত্র অঙ্কনের জন্য প্রসিদ্ধ! তিনি ফ্লোরেন্সের গির্জায় বহু ফ্রেস্কো আঁকেন। তাঁর অধিকাংশ



ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকোর আঁকা ম্যাডোনা

ছবিই ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আঁকা। তাঁর আঁকা যীশুকে কোলে নিয়ে ম্যাডোনা (Madonna) বা মাতা মেরীর ছবি অতিশয় সুন্দর।

॥ বতিচেলি ॥

ফ্লোরেন্সের ধর্মপ্রচারক জিরল্যামো স্যাভন্যা-রোলা (Girolamo Savonarola, ১৪৫২-৯৮ খ্রীঃ)-র শিষ্য স্যাণ্ড্রো বতিচেলি (Sandro Botticelli, আনুমানিক ১৪৪৪-১৫১০ খ্রী.)



বতিচেলির আঁকা সেণ্ট সেবাস্টীআন

ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ চিত্রকর। তিনি অসংখ্য ছবি এঁকেছিলেন কিন্তু সে-সবের বেশির ভাগ নিজেই পুড়িয়ে ফেলেন। তিনি সিস্টিন চ্যাপেল (Sistine Chapel)-কে চিত্রভূষিত করার কাজে সহায়তা করেন। তাঁর দান্তের ডিভাইন কমেডি (Devine Comedy)-র চিত্রভূষণ জগদ্বিখ্যাত।

॥ র‍্যাফেল ॥

এর পরের তিনজন পৃথিবীপ্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী—লিওনার্দো দা ভিনচি, মাইকেল্যাঞ্জেলো ও র‍্যাফেল। তিনজনেই ইতালীয়। তাঁদের মধ্যে র‍্যাফেল সর্বকনিষ্ঠ। লিওনার্দো ও মাইকেল্যাঞ্জেলোর প্রভাব তাঁর চিত্রশিল্পে পরিস্ফুট। র‍্যাফেল (Raphael, ১৪৮৩-১৫২০ খ্রী.)-এর আঁকা the Madonna of the Grand Duke, the Sistine Madonna, the Madonna with the Goldfinch ও the Ansidei Madonna বিখ্যাত ছবি। ভ্যাটিকান



র‍্যাফেলের ২১ বৎসর বয়সের আঁকা একটি ছবি

প্রাসাদের বহু প্রাচীর-চিত্র (ফ্রেস্কো) তাঁর চিত্রাঙ্কনের পটুতার নিদর্শন। তিনি সহস্রাধিক ছবি আঁকেন। র‍্যাফেলের আঁকা (Panshanger Madonna ১৯১৩ সালে ১,১৬,৫০০ পাউণ্ডে বিক্রী হয়। এটির ১৯৮১ সালের মূল্য ২৮,৫০,০০০ পাউণ্ড।

॥ লিওনার্দো দা ভিনচি ॥

লিওনার্দো দা ভিনচি (Leonardo da Vinci, ১৪৫২-১৫১৯ খ্রী.) ইটালীর একজন বিখ্যাত



লিওনার্দোর আঁকা তাঁর প্রতিকৃতি

চিত্রকর, ভাস্কর, দার্শনিক, কবি, আবিষ্কারক, স্থপতি, সুরকার, মল্ল ও শারীরস্থানবিৎ (anatomist) ছিলেন। এরূপ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মনীষী সে-যুগে বিরল ছিল। তাঁর আঁকা প্রাচীর-চিত্র Last Supper খুবই প্রসিদ্ধ। মোনা লিসা (Mona Lisa)-র চিত্রকর হিসাবে লিওনার্দোর নাম সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত। ছবিটি বর্তমানে



লিওনার্দোর আঁকা Last Supper



মোনা লিসা

প্যারিসের ল্যুভ্র্ (Louvre) জাদুঘরে রক্ষিত আছে। আনুমানিক ১৫০৩ থেকে ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এটি অঙ্কিত হয়। এটির আয়তন ৭৭ × ৫৩ সেন্টিমিটার। এটি ফ্লোরেন্সের Francesco del Giocondo-র পত্নী ম্যাডোনা (সংক্ষেপে মোনা) লিসা (Lisa Gherardini)-র প্রতিকৃতি। পছন্দ-মতো না হওয়ায় ফ্র্যান্সেস্কো এটি আঁকার পারিশ্রমিক দিতে অসম্মত হন। ফ্রান্সের রাজা প্রথম ফ্র্যান্সিস ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর স্নানের ঘরে রাখার জন্যে ৪০০০ স্বর্ণ ফ্লোরিন অথবা ১৫·৩০ কেজি সোনার দামে এটি ক্রয় করেন (১৯৮১ সালে এটির মূল্য ২,৩৫,০০০ পাউণ্ড ধার্য হয়)। ১৯৬৭ সালে লিওনার্দোর আঁকা Ginerva de Benci (প্রতি-কৃতি) ছবি ১৭,৮৫,৭১৪ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়। এটির ১৯৮১ সালের মূল্য ৭৯,৫০,০০০ পাউণ্ড। এটি ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল গ্যালারি অব আর্ট-এ রক্ষিত আছে।

॥ ভ্যান আইক ॥

বেলজিয়ামের অন্তর্গত ফ্ল্যাণ্ডার্সের দুজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হিউবার্ট ভ্যান আইক (Hubert van Eyck, আনুমানিক ১৩৭০-১৪২৬ খ্রী.) ও তাঁর ভাই জ্যান ভ্যান (Jan van, আনুমানিক ১৩৮৯-



ভ্যান আইকের আঁকা একখানি ছবি

১৪৪১ খ্রী.)। এঁরা দুজন সম্ভবতঃ তেলরঙা ছবি আঁকার প্রথার উদ্ভাবক। ভ্যান আইকের আঁকা Adoration of the Lamb-এর ১৯৮১ সালের মূল্য ২,৬৫,০০০ পাউণ্ড।

॥ রুবেঙ্গ ॥

স্যার পিটার পল রুবেন্স (Sir Peter Paul Rubens, ১৫৭৭-১৬৪০ খ্রী.) ফ্লোরেন্সের আর একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। তাঁর আঁকা ছবি Adoration of the Magi ১৯৫৯ সালে ২,৭৫,০০০ পাউণ্ডে বিক্রী হয়।

॥ ভ্যান ডাইক ॥

ভ্যান ডাইক (Sir Anthony Van Dyck or Vandyke, ১৫৯৯-১৬৪১ খ্রী.) বেলজিয়ামের অ্যান্টোয়ার্পে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রুবেন্সের অধীনে চিত্রাঙ্কনবিদ্যা শিক্ষা করেন। রুবেন্সের মতোই তিনি জমকালো রঙের ছবি আঁকতেন। মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে তিনি খুব পারদর্শী ছিলেন। তাঁর আঁকা Elena Grimaldi-Cattaneo-র প্রতিকৃতি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ১,০২,৮৮০ পাউণ্ড মূল্যে (১৯৮১ সালের মূল্য ৩০,০০,০০০ পাউণ্ড) বিক্রীত হয়।

॥ হলবীন ॥

জার্মান চিত্রশিল্পী হলবীন দি এলডার (Holbein the Elder, আনুমানিক ১৪৬৫-১৫২৪ খ্রী.)-এর আঁকা ছবির সুনাম জার্মানি ছাড়িয়ে ইউরোপের নানা দেশে পরিব্যাপ্ত হয়।

॥ ড্যুরার ॥

আলব্রেখ্‌ট্‌ ড্যুরার (Albrecht Durer,



ড্যুরারের আঁকা তাঁর মায়ের প্রতিকৃতি

১৪৭১-১৫২৮ খ্রী.) একজন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী জার্মান মনীষী। তিনি ছিলেন একজন খ্যাতনামা চিত্রকর ও খোদাইকর (engraver)। তামার উপর খোদাই-করা The Knight, Melancholia ও St. Jerome in His Study খুবই প্রসিদ্ধ। এই তিনটি ব্রিটিশ মিউজিয়ামে আছে। তিনি খোদাই বিদ্যার (etching) অর্থাৎ ধাতুর উপরে নকশাদি খোদাই করার প্রথার উদ্ভাবক।

॥ রেমব্র্যান্‌ট্‌ ॥

ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী রেমব্র্যান্‌ট্‌ (Harmens van Rijn Rembrandt, ১৬০৬-৬৯ খ্রী.) মানুষের প্রতিকৃতি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, ধর্মীয় কাহিনী প্রভৃতির



রেমব্র্যান্‌ট্‌

নিখুঁত চিত্র অঙ্কন করে পৃথিবীতে বিখ্যাত হয়ে আছেন। রেমব্র্যানটের আঁকা Aristotle Contemplating the Bust of Homer ১৯৬১ সালে ৮,২১,৪২৯ পাউণ্ডে বিক্রী হয়। এর বর্তমান মূল্য ৪৯,০০,০০০ পাউণ্ড। এটি নিউ ইয়র্ক মেট্রোপলিটান মিউজিয়াম অব আর্টে রক্ষিত আছে।

॥ ভারমিয়ার ॥

চিত্রশিল্পী ভারমিয়ার (Jan Vermeer, ১৬৩২-৭৫ খ্রী.) উত্তর-পশ্চিম নেদারল্যাণ্ডসের ডেলফটে জন্মগ্রহণ করেন। জীবিতকালে তিনি চিত্রাঙ্কনের জন্যে প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। মৃত্যুর পরে লোকে তাঁকে ভুলে যায়। উলটে তাঁর চিত্রসমূহকে অপর শিল্পীর আঁকা বলে প্রচার করে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আবার তাঁর নাম খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী হিসাবে ঘোষিত হতে থাকে।

॥ স্পেনীয় চিত্রশিল্পী ॥

এল গ্রেকো (El Greco, ১৫৪৮ ?-১৬১৪ বা



এল গ্রেকোর আঁকা একটি চিত্র

১৬২৫ খ্রী.), ভেলাসকেস (Velasquez, ১৫৯৯-১৬৬০ খ্রী.), মিউরিলো (Bartolme Esteban, Murillo, ১৬১৭-১৬৮২ খ্রী.) প্রভৃতি স্পেনীয় চিত্রশিল্পীদের নাম খুব প্রসিদ্ধ। মিউরিলো ধর্মীয় চিত্র অঙ্কন করে সে যুগে খুব নাম করেছিলেন।

ভেলাসকেসের আঁকা জুয়ান ডি প্যারেজার প্রতিকৃতি ২৩,১০,০০০ পাউণ্ডে বিক্রী হয়। এর ১৯৮১ সালের মূল্য ৮৫,৩৫,০০০ পাউণ্ড। এটি নিউ ইয়র্কের Wildenstein Gallery-তে রক্ষিত আছে।

॥ নামজাদা ফরাসী চিত্রকর ॥

ফ্রান্সের ওয়াত্তো (Jean Antoine Watteau, ১৬৮৪-১৭২১ খ্রী.) একজন খ্যাতনামা ফরাসী চিত্রকর। প্রধানতঃ তাঁর আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি অপূর্ব। তাঁর আঁকা বহু ছবি প্যারিসের ল্যুভ্‌র্ জাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে। দেলাক্রোয়ে (Ferdinand Victor Eugene Delacroix, ১৭৯৮-১৮৬৩ খ্রী.), কোরো (Jean Baptiste Camille Corot, ১৭৯৬-১৮৭৫ খ্রী.), মিলে (Jean Francois Millet, ১৮১৪-১৮৭৫ খ্রী.), মানে (Edouard Manet, ১৮৩২-১৮৮৩ খ্রী.), মোনে (Claude Monet, ১৮৪০-১৯২৬ খ্রী.), দেগাস (Edgar Degas, ১৮৩৪-১৯১৭ খ্রী.), রেনোয়ার (Pierre Auguste Renoir, ১৮৪১-১৯১৯ খ্রী.) প্রমুখ বহু খ্যাতিমান্ ফরাসী চিত্রশিল্পীর আঁকা ছবি বিভিন্ন জাদুঘরে বা চিত্রশালায় অতি যত্নের সঙ্গে রক্ষিত আছে।

॥ হোগার্থ ॥

ইংল্যাণ্ডের উইলিয়াম হোগার্থ (William Hogarth, ১৬৯৭-১৭৬৪ খ্রী.) একজন প্রসিদ্ধ কার্টুন চিত্রের শিল্পী। তা ছাড়া ইনি রুপোর উপরে খোদাই-এর কাজে বিশেষ নৈপুণ্য প্রদর্শন করেন।

॥ জেসুয়া রেনল্ডস ॥

স্যার জেসুয়া রেনল্ডস (Sir Jeshua Reynolds, ১৭২৩-১৭৯২ খ্রী.) মানুষের প্রতিকৃতি (portrait) অঙ্কনে খুব দক্ষ ছিলেন।

॥ গেইনজ্‌বরো ॥

টমাস গেইনজ্‌বরো (Thomas Gains-



গেইনজ্‌বরোর আঁকা একটি প্রতিমূর্তি

borough, ১৭২৭-১৭৮৮ খ্রী.) প্রাকৃতিক দৃশ্য ও মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন।

॥ ব্লেক ॥

উইলিয়াম ব্লেক (William Blake, ১৭৫৭-১৮২৭ খ্রী.) একজন খ্যাতনামা চিত্রকর ও কবি ছিলেন।

॥ কন্‌স্‌ট্যাব্‌ল্‌ ॥

জন কন্‌স্‌ট্যাব্‌ল্ (John Constable, ১৭৭৬-১৮৩৭ খ্রী.) প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কনের দিক্ থেকে সে-যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পী।

॥ টার্নার ॥

টার্নার (Joseph Mallord William Turner, ১৭৭৫-১৮৫১ খ্রী.) তাঁর সময়কার একজন অতি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। তাঁর বহু চিত্র ন্যাশনাল গ্যালারীতে রক্ষিত আছে। তাঁর ১৮৩৬ সালে, উইলিয়াম টার্নারের আঁকা 'Juliet and Her Nurse' ছবি

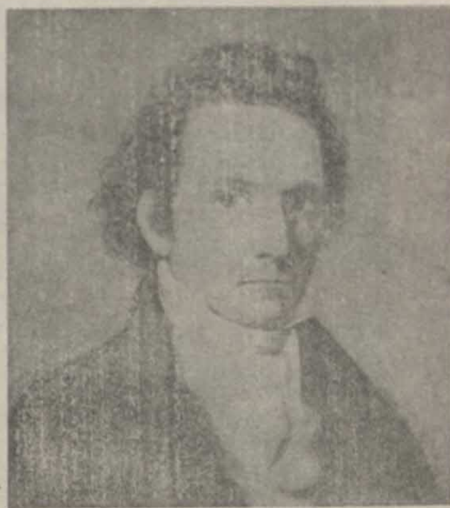
আঁকা Juliet and Her Nurse ১৯৮০ সালে নীলামে ২৭,২৯,০০০ পাউণ্ড মূল্যে বিক্রীত হয়।

॥ আমেরিকান চিত্রশিল্পী ॥

ওয়াশিংটন অ্যালসটন (Washington Alston, ১৭৭৯-১৮৪৩ খ্রী.) এফ. বি. মর্স (F. B. Morse, ১৭৯১-১৮৭২ খ্রী.), মেরী ক্যাস্যাট (Mary Cassat, ১৮৪৪-১৯২৬ খ্রী.) হুইষলার (James Abott Whistler, ১৮৩৪-১৯০৩ খ্রী.) প্রভৃতি আমেরিকান চিত্রকর চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ অড্যাবন ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী অড্যাবন (John James Audubon, ১৭৮৫-১৮৫১ খ্রী.) পাখিদের অসংখ্য রঙিন ছবি আঁকেন।



অড্যাবন

॥ ফরাসী চিত্রশিল্পী ॥

ফ্রান্সের সেজান (Paul Cezanne, ১৮৩৯-১৯০৬ খ্রী.) ও গোগাঁ (Paul Gauguin, ১৮৪৮-১৯০৩ খ্রী.) প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী। ভ্যান গগ্‌ (van Vincent Gogh, ১৮৫৩-১৮৯০ খ্রী.) ছিলেন একজন অতি প্রসিদ্ধ ওলন্দাজ চিত্রশিল্পী। তিনি প্রাকৃতিক দৃশ্য, মানুষের প্রতিকৃতি প্রভৃতি অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে আঁকেন। তিনি জীবনে অতিশয় অসুখী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা করেন।

॥ পিকাসো ॥

স্পেনীয় চিত্রকর ও ভাস্কর পাবলো পিকাসোর (Pablo Picasso, ১৮৮১-১৯৭২ খ্রী.) নাম জগৎজোড়া। তাঁর বহু ছবি বহু লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়েছে। তিনি ৭৮ বৎসর ধরে লক্ষাধিক ছবি আঁকেন এবং মূর্তি গড়েন ও খোদাই-এর কাজ করেন। পিকাসোর জীবনকালে তাঁর ছবি ও ভাস্কর্যের মূল্য ছিল ৫০ লক্ষ পাউণ্ড। কিন্তু তাঁর ছবি, বিশেষ করে শেষ জীবনের ছবি সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য। সে-সবের কি যে অর্থ, তা বুঝিয়ে বলা যায় না, বোঝাও যায় না।











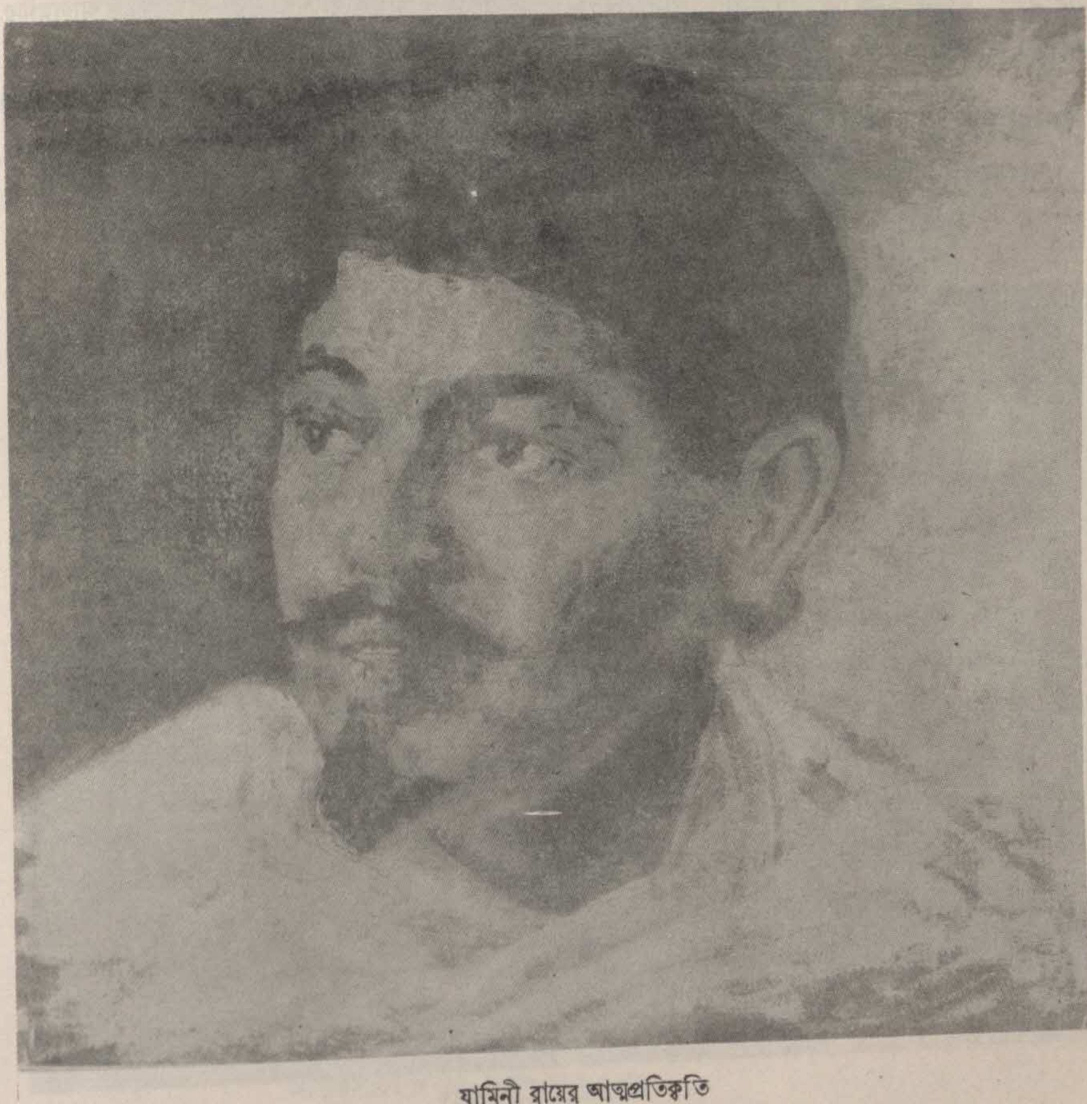


অড্যাবনের আঁকা পাখির ছবি

॥ ভারতীয় চিত্রশিল্প ॥

ভারতের চিত্রশিল্প সর্বযুগে সর্বরাজ্যে খুবই উন্নত। গুহাচিত্র, ভাস্কর্য, তৈলচিত্র, ব্যঙ্গচিত্র, বহু রঙ-সমন্বিত চিত্র অনেক ক্ষেত্রে অপূর্ব। গান্ধার চিত্রশিল্প ও ভাস্কর্য, রাজপুত চিত্রশিল্প, মোগল চিত্রশিল্প, কাঙড়া চিত্রকলা প্রভৃতি দেশে বিদেশে উচ্চ প্রশংসা অর্জন করেছে।

শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধদেব, মহাদেব এবং রামায়ণ-মহাভারতের বিভিন্ন চরিত্র ও কাহিনী প্রভৃতি সম্পর্কে সারা ভারতে অজস্র চিত্র ও ভাস্কর্যের সৃষ্টি হয়েছে। অজন্তা গুহার প্রাচীরচিত্র, এলোরা গুহার ভাস্কর্য সারা পৃথিবীর দর্শকদের বিমোহিত করেছে। গোয়ালিয়রের কাছে বাঘগুহার ছবিও খুব প্রসিদ্ধ।



যামিনী রায়ের আত্মপ্রতিকৃতি

রাজা গোবর্ধন সিং কাঙড়া চিত্রশিল্পের প্রবর্তক। তিনি এই চিত্রশিল্পে মোগল চিত্রশিল্প ও হিন্দু চিত্রশিল্পের মিলন সাধন করিয়েছিলেন।

॥ রবি বর্মা ॥

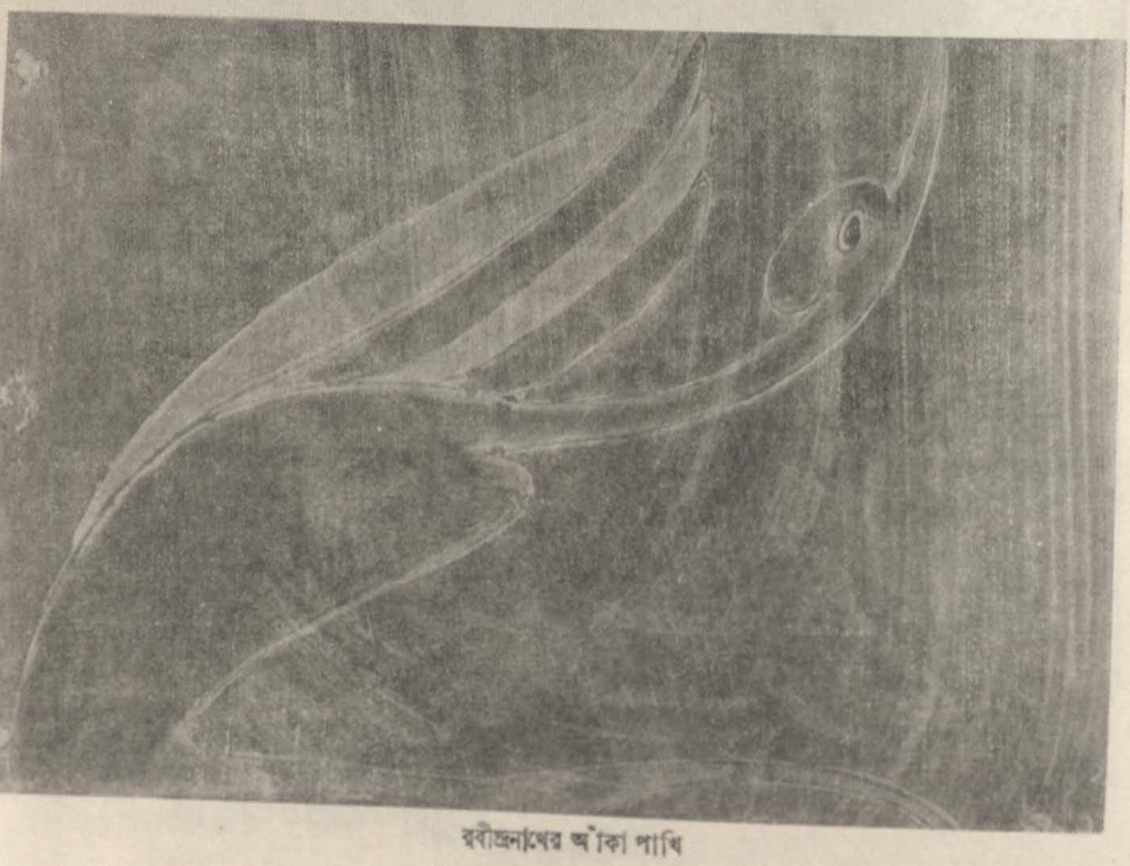
চিত্রকর রবি বর্মা (১৮৪৮-১৯০৭ খ্রী.) রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী নিয়ে বহু চিত্র অঙ্কন করেছেন। সেগুলি সারা ভারতে প্রচলিত। তিনি প্রধানতঃ রঙিন চিত্র ও তেলরঙা ছবি এঁকে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

॥ কালীঘাটের পটশিল্প ॥

প্রধানতঃ মাটির সরায় কালীঘাটের পটুয়ারা যে-সব ছবি আঁকেন, সেগুলি পটশিল্পের বিশেষ নিদর্শন। প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় কালীঘাটের পটশিল্পের অনুকরণে বহু ছবি এঁকেছেন।

॥ অবনীন্দ্রনাথ ॥

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতীয় চিত্রকলার গুরুস্থানীয়। তাঁকে বলা হয় ফাদার অব ইণ্ডিয়ান আর্ট। তাঁর শ্বেতময়ূর, বিরহী যক্ষ, কচ ও দেবযানী, শাহজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষা, আলমগীর, শাহজাহানের স্বপ্ন, ওমর খৈয়াম, ভারতমাতা, বুদ্ধ ও সুজাতা, জেব উন্নিসা প্রভৃতি বহু ছবি সুপ্রসিদ্ধ। নানারকম কাঠকুটো, ছেঁড়া কাপড়, ভাঙাচোরা নানা ধরনের মালমসলা জোড়াতাড়া



রবীন্দ্রনাথের আঁকা পাখি



অবনীন্দ্রনাথের আঁকা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিয়ে তিনি যে শিল্পের সৃষ্টি করেন, তার নাম দিয়েছিলেন কাটুম-কুটুম।

॥ চিত্রশিল্পে রবীন্দ্রনাথ ॥

রবীন্দ্রনাথ প্রবীণ বয়সে তুলি ধরেন। কিন্তু সেই তুলি দিয়ে যে-সব অজস্র চিত্র এঁকে গেছেন, তা সারা পৃথিবীতে উচ্চ প্রশংসা লাভ করেছে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মুকুল দে, নন্দলাল বসু, অসিত হালদার, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী, সুনয়নী দেবী, আবদুর রহমান চাঘতাই, ইন্দ্র দুগড়, হীরাচাঁদ দুগড়, গোপাল ঘোষ, চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রভৃতি ভারতের বিশেষ করে বাংলার অতি প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পী।

চিত্রশিল্পে ইম্‌প্রেসনিজ্‌ম্‌, পোস্ট-ইমপ্রেসনিজ্‌ম্‌, ফিউচারিজ্‌ম্‌, কিউবিজ্‌ম্‌, সার্‌-রিয়ালিজ্‌ম্‌ প্রভৃতি বহু ধারা প্রচলিত।

॥ অণুচিত্র ॥

অণুচিত্র (miniature painting) বলে এক ধরনের চিত্র বহু কাল থেকে সারা পৃথিবীতে প্রচলিত। তালপাতা, চামড়া, রেশমবস্ত্র, গজদন্ত, ধাতুর পাত, কাঠের পাটা প্রভৃতির উপরে স্বচ্ছ বা অস্বচ্ছ জলরঙে আঁকা এই সব ক্ষুদ্রাকার ছবিকে অণুচিত্র বলা হয়। ভারত, চীন, জাপান, পারস্য, ইউরোপের নানা দেশ প্রভৃতি স্থানে বহু শতাব্দী পূর্ব হতেই অণুচিত্র প্রচলিত।

॥ দেবদেবীর মূর্তি গড়ার নৈপুণ্য ॥

ভারতে, বিশেষ করে বঙ্গদেশে দেবদেবীর মূর্তি গড়ার ব্যাপারে ভারতীয় কারিগররা অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। প্রধানতঃ কুমারটুলীতে অজস্র দেবদেবীর মৃন্ময় মূর্তি নির্মিত হয়। সে-সবের সৌন্দর্য প্রশংসনীয়।



গোপাল ঘোষের আঁকা নৌকো

॥ মহিলা শিল্পীর ছবি ॥

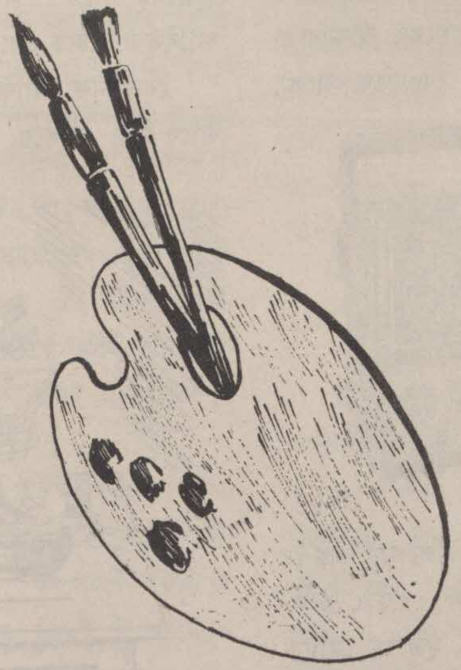
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরী ক্যাস্সাট (Mary Cassatt, ১৮৪৪-১৯২৬ খ্রী.) Summertime বলে যে ছবিটি আঁকেন তা নিউ ইয়র্কে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ১,৫০,০০০ ডলার দামে বিক্রী হয়।

॥ সবচেয়ে বেশী মূল্যের অণুচিত্র ॥

নিকোলাস হিলিয়ার্ড (Nicholas Hilliard, ১৫৪৭-১৬১৯ খ্রী.) পশুচর্মের উপর যে অণুচিত্রটি আঁকেন সেটি লণ্ডনে নীলামে ৭৫,০০০ পাউণ্ডে বিক্রী হয়। ছবিটির ব্যাস মাত্র ৪২ মিলিমিটার।



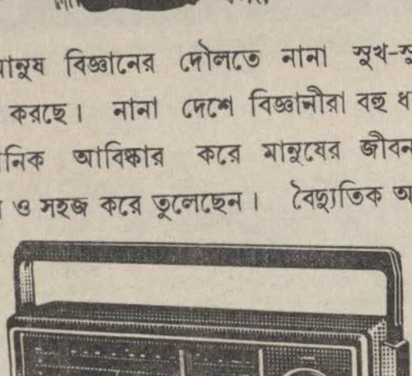
নিকোলাস হিলিয়ার্ডের আঁকা অণুচিত্র





বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার

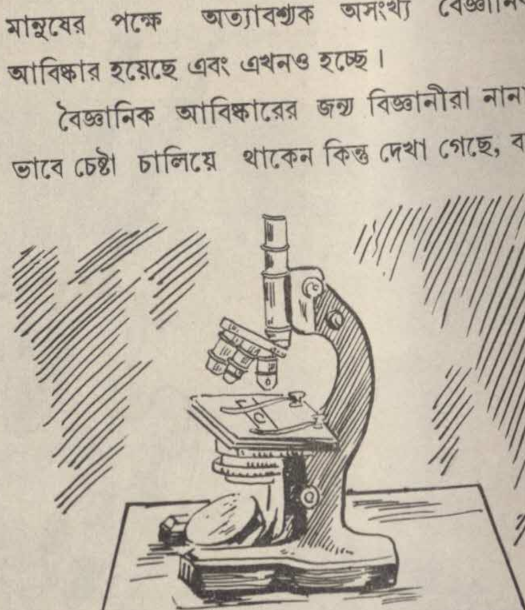
মানুষ বিজ্ঞানের দৌলতে নানা সুখ-সুবিধা ভোগ করছে। নানা দেশে বিজ্ঞানীরা বহু ধরনের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করে মানুষের জীবনযাত্রা সুন্দর ও সহজ করে তুলেছেন। বৈদ্যুতিক আলো,



রেডিও

রেলগাড়ি, রকেট, মাধ্যকর্ষণতত্ত্ব, টেলিফোন, এক্স-রে রেডিয়াম, গ্রামোফোন, টেলিগ্রাফ, রেডিও, টেলিভিশন, উড়োজাহাজ, ক্লোরোফর্ম, মুদ্রাযন্ত্র, মোটরগাড়ি, দূরবীন, অণুবীক্ষণযন্ত্র, মাইক্রোফোন, ব্যারোমিটার, প্ল্যাসটিকস্, বাইসিকল, ফাউন্টেন পেন, ক্যামেরা, টাইপরাইটার, পেনিসিলিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, টর্পেডো, রেডার, সাবমেরিন, চলচ্চিত্র প্রভৃতি মানুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক অসংখ্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে।

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীরা নানাভাবে চেষ্টা চালিয়ে থাকেন কিন্তু দেখা গেছে, বহু



অণুবীক্ষণ যন্ত্র

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আকস্মিকভাবে সংঘটিত হয়েছে।

কোন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার প্রায় ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব বলে ঘোষিত হয়েছে, কিন্তু নানা দেশে নানা বিজ্ঞানী একই আবিষ্কার সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়েছেন, কিছুটা কৃতকার্যও হয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞানীকে কৃতিত্বের অধিকারী বলে মেনে নেওয়া হয়েছে।

সকল বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কথা অতি সংক্ষেপে বলতে গেলেও বিরাট গ্রন্থেও স্থান হবে না। এখানে কিছু কিছু বিষয় সম্বন্ধে বলা হল।

॥ মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব ॥

উপর দিকে কিছু ছুড়ে দিলে তা তখনই মাটিতে এসে পড়ে। কেন পড়ে তা বিশ্ববিখ্যাত নিউটন (Sir Isaac Newton, ১৬৪২-১৭২৭ খ্রী.)-এর আগে কেউ তেমন করে ভেবে দেখেন নি, যেমনটি নিউটন গভীর আগ্রহের সঙ্গে চিন্তা করেছিলেন।

একদিনের কথা। নিউটন তাঁর বাগানে বেঞ্চের উপর বসে ছিলেন। এমন সময় গাছ থেকে একটা আপেল মাটিতে এসে পড়ল। এই ঘটনাটি অতি সাধারণ হলেও নিউটনকে ভাবিয়ে তুলল, আপেলটি মাটিতে এসে পড়ল কেন? কেনই বা সব জিনিস উপর থেকে নীচে এসে পড়ে?

ভাবতে ভাবতে তিনি যে তত্ত্ব আবিষ্কার করলেন তার নাম মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব। তিনি জানালেন, মাধ্যাকর্ষণ (gravitation)-এ আপেলটি মাটিতে পড়েছে। এমনই করে সব কিছুই উপর থেকে নীচে এসে পড়ে। এই মাধ্যাকর্ষণশক্তির বলে সূর্য পৃথিবীকে টানছে, পৃথিবী চন্দ্রকে টানছে, চন্দ্র পৃথিবীকে টানছে। বিশ্বের সব জ্যোতিষ্ক



বাগানে বেঞ্চের উপর বসে নিউটন আপেল পড়া দেখছেন।

পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এই আকর্ষণকে বলা হয় অভিকর্ষ (ভূকেন্দ্রের দিকে জড়পদার্থের আকর্ষণ ; gravitation)। জড়বস্তুর পরস্পর আকর্ষণকে বলা হয় মহাকর্ষ (gravitation)। পূর্বে gravitation বলতে মাধ্যাকর্ষণ শব্দটির প্রচলন ছিল।

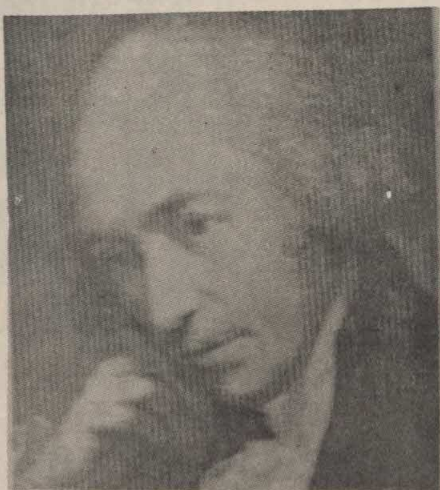
॥ নিউটনের অন্যান্য আবিষ্কার ॥

বিজ্ঞানী নিউটন জলঘড়ি, সূর্যঘড়ি প্রভৃতি তৈয়ারি করেন। তিনি জানান, সূর্যের আলোর রং সাদা হলেও তাতে বেগুনি (Violet), ঘন নীল (Indigo), নীল (Blue), সবুজ (Green), হলদে (Yellow), কমলা (Orange) ও লাল রং (Red) আছে। ইংরেজীতে সংক্ষেপে বলা হয় **VIBGYOR,** বাংলায় বলে বেঘনীসহকলা। তিনি নিজের হাতে একটি দূরবীন (Newtonian Reflecting Telescope) তৈয়ারি করেন। দূরবীনটি

(২৪৯·৪ সেন্টিমিটার) রয়্যাল গ্রীনউইচ অবজারভেট-রিতে বসানো হয়।

॥ বাষ্পীয় এঞ্জিন ॥

জেমস ওয়াট (James Watt, ১৭৩৬-১৮১৯



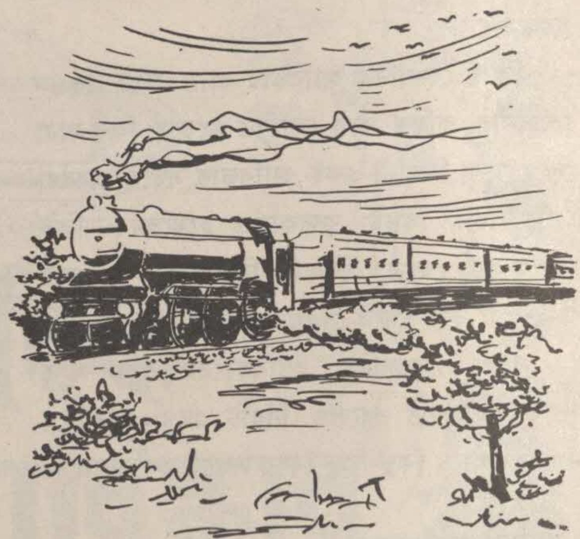
জেমস ওয়াট

খ্রী.) স্কটল্যাণ্ডের গ্রীনকে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একদিন লক্ষ্য করেন, কেটলীতে জল ফুটছে, আর মাঝে মাঝে ঢাকনাটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। এ থেকে তিনি বুঝতে পারলেন, জল ফুটলে যে বাষ্প হচ্ছে তা উপরে উঠে যাবার সময় ধাক্কা দিচ্ছে। তিনি ফুটন্ত জলের বাষ্পের শক্তির কথা বুঝতে পারলেন।

ওয়াট তখন বাষ্পীয় শক্তিতে এঞ্জিন তৈরি করার পরিকল্পনা করেন। ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি বাষ্পীয় শক্তি-চালিত এঞ্জিন তৈরি করলেন ও তার পেটেন্ট নিলেন।

সেই বাষ্পীয় এঞ্জিনের সাহায্যে খনি থেকে কয়লা তোলা হতে লাগল। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বাষ্প-শক্তির সাহায্যে কয়লা তোলা হয়েছিল।

জর্জ স্টিফেনসন (George Stephenson,



বাষ্পীয় এঞ্জিন

১৭৮১-১৮৪৮ খ্রী.) নামে একজন ইংরেজ কয়লার খনিতে কাজ করবার সময় জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় শক্তি-চালিত এঞ্জিন দেখে ধারণা করেন, বাষ্প-শক্তিতে রেলগাড়ি চালানো যায়। তিনি প্রধানতঃ কয়লা বয়ে নিয়ে যাবার জন্যে বাষ্পীয় যান তৈরি করলেন। দুটি রেলের উপর দিয়ে সেই যান চালা-বার ব্যবস্থা হল। প্রথমদিকে সেই যান চলত ঘণ্টায় চার মাইল করে। তারপর কয়লা ও যাত্রী নিয়ে বাষ্পীয় রেলগাড়ি ঘণ্টায় ১২ মাইল করে যেতে লাগল।

তাঁর ছেলে রবার্ট তাঁকে লিভারপুল ও ম্যাঞ্চে-স্টারের মধ্যে স্থাপিত রেলপথে গাড়ি চলাচলে প্রভৃত সাহায্য করেন। তখন থেকে রেলগাড়ির যুগের সূচনা বলা চলে।

॥ বেতার ॥

মধ্যপথে কোন তার নেই কিন্তু একস্থান থেকে আর একস্থানে সংবাদাদি প্রেরণের ব্যবস্থাকে বেতার বা রেডিও বলে। সবাই জানেন, ইতালির মার্কোনি



মার্কোনি



জগদীশচন্দ্র

(Guglielmo Marchese Marconi, ১৮৭৮-১৯৩৭ খ্রী.) বেতারের উদ্ভাবক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উদ্ভাবক আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু (৩০শে নভেম্বর, ১৮৫৮-২৩শে নভেম্বর, ১৯৩৭ খ্রী.)। তিনি কলকাতার টাউন হলে বেতারযন্ত্র প্রদর্শন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তাঁর বাড়িতে বেতারে সংকেত প্রেরণ করেন। সে কথা জানতে পেরে ভারত সরকার তাঁকে তাঁর যন্ত্রসহ বিলাতে প্রেরণ করেন।

মার্কোনি ইতালীয় হলেও বিলাতে থাকতেন। ম্যাক্সওয়েল ও হের্ৎজের বৈজ্ঞানিক তথ্যের উপর নির্ভর করে জগদীশচন্দ্র, লজ, ব্র্যানলে, মার্কোনি প্রভৃতি বিজ্ঞানী রেডিও আবিষ্কারের চেষ্টা চালাতে থাকেন। জগদীশচন্দ্র প্রথমেই সফল হন। মার্কোনি একটা যন্ত্র তৈরি করেছিলেন কিন্তু যন্ত্রের বৈজ্ঞানিক ত্রুটির জন্য সে যন্ত্র কার্যকর হয় নি।

জগদীশচন্দ্র বহু বিজ্ঞানীর সম্মুখে তাঁর উদ্ভাবিত যন্ত্রের কার্যকারিতা দেখান। সেই সভায় মার্কোনিও ছিলেন। সভা থেকে বেরিয়ে আসতেই জগদীশচন্দ্রকে বিলাতের লোকে সঙ্গে সঙ্গে পেটেন্ট নিতে বলেন। কিন্তু জগদীশচন্দ্র পেটেন্ট নিতে অসম্মত হন, বলেন, তাঁর যন্ত্রে পৃথিবীর সকলে উপকৃত হোক, এই-ই তিনি চান। পেটেন্ট নেবার প্রয়োজন নেই।

জগদীশচন্দ্রের যন্ত্র দেখে মার্কোনি তাঁর যন্ত্রের ত্রুটি সংশোধন করে পেটেন্ট নেন। তার ফলে তাঁকেই লোকে বেতারের উদ্ভাবক বলে জানে। এমন অদ্ভুত ব্যাপার, পাশ্চাত্ত্যের লেখকেরা তাঁদের পুস্তকে জগদীশচন্দ্রকে বেতারের উদ্ভাবক তো বলেনই না, এমন কি অনেক পুস্তকে তাঁর জীবনকথা পর্যন্ত নেই। অথচ জগদীশচন্দ্র ধাতুর যে এক ধরনের প্রাণ আছে, তা আবিষ্কার করেন। গাছের প্রাণ আছে তা বিভিন্নভাবে ক্রেসকোগ্রাফ ও অন্যান্য যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখান। তিনি যে পৃথিবীর অন্যতম উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞানী তা-ও পর্যন্ত পাশ্চাত্ত্য জগতের

একদেশদর্শী লেখকেরা বলেন না।

জগদীশচন্দ্র বেতারযন্ত্র নিয়ে আর কোন গবেষণা করেন নি। কিন্তু মার্কোনি তাঁর গবেষণা চালিয়ে যেতে থাকেন। তার ফলে বেতারযন্ত্রের বহু উন্নতি সাধিত হয়। ইতালীর রাজা হামবার্ট ও রানী মার্গেরিটা তাঁকে পুরস্কৃত করেন।



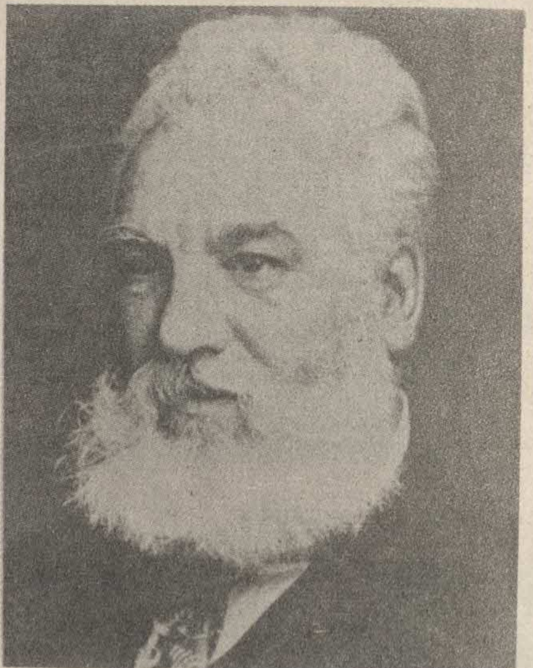
বেনিটো মুসোলিনী

বেনিটো মুসোলিনী (Benito Mussolini, ১৮৮৩-১৯৪৫ খ্রী.) মার্কোনির সুখস্বাচ্ছন্দ্যের সকল ব্যবস্থা করেন। মুসোলিনীর চেষ্টায় ইতালীর শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকেরা মার্কোনিকে দেখাশোনা করতেন।

॥ টেলিফোন ॥

আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেল (Alexander Graham Bell, ১৮৪৭-১৯২২ খ্রী.) এডিনবরায় জন্মগ্রহণ করেন কিন্তু ১৮৭০ সালে কানাডায় চলে যান। পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হন।

বেলের স্ত্রী মাবেল হাবার্ড কানে শুনতে পেতেন না। কী করে তিনি শুনতে পাবেন, তার কোন ব্যবস্থা করা যায় কিনা তা ভাবতে ভাবতে তিনি এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন, যার পরিণতি



গ্রাহাম বেল

বর্তমান যুগের টেলিফোন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যন্ত্রটির কার্যকারিতা প্রমাণ করেন।



টেলিফোন

টেলিফোন এক বৈদ্যুতিক যন্ত্র। এর সাহায্যে দূরবর্তী স্থান থেকে পরস্পর কথা বলা যায়। প্রত্যেক

টেলিফোন যন্ত্রে একটি গ্রাহক-যন্ত্র ও একটি প্রেরক-যন্ত্র থাকে। গলার স্বর বিদ্যুতে পরিণত হয়ে তারের মধ্য দিয়ে অপর প্রান্তে পৌঁছে যায়। সেখানে যে গ্রাহক-যন্ত্র থাকে তার সাহায্যে বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আবার শব্দে পরিণত হয়। Exchange বা বিনিময়-কেন্দ্রের মারফত যখন দুই স্থানের মধ্যে সংযোগ সাধিত হয় তখন তাকে বলে manual exchange। আর যখন এই সংযোগ আপনা-আপনি সাধিত হয় তখন তাকে বলে automatic exchange।

বেল যখন তাঁর যন্ত্রের পেটেন্ট নেন তার দু' ঘণ্টা বাদে শিকাগোর এলিসা গ্রে-ও পেটেন্টের জন্য দরখাস্ত করেন। অনেক বিজ্ঞানীই টেলিফোন যন্ত্র সৃষ্টির চেষ্টা চালান। শেষ পর্যন্ত বেলকেই টেলিফোনের উদ্ভাবক বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়।

বেল মূক-বধিরদের শিক্ষাদান কার্যে বহু সময় ব্যয় করেন।

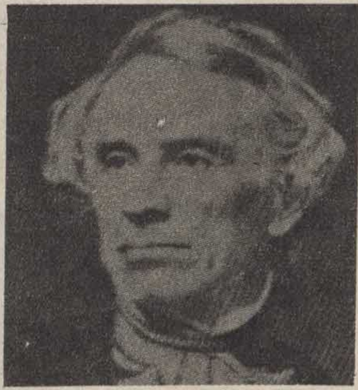
টমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva Edison, ১৮৪৭-১৯৩১ খ্রী.) টেলিফোন যন্ত্রের প্রভূত উন্নতি সাধন করেন।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় প্রথম টেলিফোন স্থাপিত হয়। এখন পৃথিবীর সব দেশেই টেলিফোন ব্যবহৃত হয়। ১৯৭৯ সালের হিসাব অনুযায়ী দেখা যায়, পৃথিবীতে টেলিফোনের সংখ্যা ৪৪,৮২,৫০,০০০। তন্মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেলিফোনের সংখ্যা ১৬,৮৯,৯৪,০০০। টেলিফোন ব্যবহারে প্রথম—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দ্বিতীয়—জাপান, তৃতীয়—গ্রেট ব্রিটেন।

টেলিফোনের তার সব চেয়ে লম্বা অস্ট্রেলিয়া থেকে কানাডা। এই তার অকল্যাণ্ড, নিউ জীল্যাণ্ড, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরের তলা দিয়ে কানাডায় পৌঁছেছে। এর দৈর্ঘ্য ১৪,৪৮০ কিলোমিটার।

॥ টেলিগ্রাফ ॥

মর্স (Samuel Finley Breese Morse



মর্স

১৭৯১-১৮৭২ খ্রী.) সাংকেতিক সংবাদপ্রেরণের যে যন্ত্র আবিষ্কার করেন তার নাম টেলিগ্রাফ (telegraph)। একটা বৈদ্যুতিক তারের দুদিকে দুটি যন্ত্র থাকে। তাতে আঙ্গুলের ডগা দিয়ে সামান্য টোকা মারলে এক ধরনের শব্দের সৃষ্টি হয়। তা সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রের অন্য প্রান্তের যন্ত্রে গিয়ে ধ্বনিত হয়। টেলিগ্রাফে 'টরে' ও 'টক্কা' নামক দুটি ধ্বনির মাধ্যমে বর্ণগুলি সাংকেতিক ভাবে শব্দগ্রাহক কর্মচারী কর্তৃক লিখিত হয়। এভাবে সাংকেতিক বর্ণমালার সাহায্যে শব্দ ব্যবহার হওয়াকে বলে মর্স কোড (Morse Code)।

টেলিগ্রাফে প্রেরিত সংবাদকে বলা হয় টেলিগ্রাম (telegram)।

অ্যাম্পিয়ার, গস, ওয়েবার, মর্স প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় টেলিগ্রাফে বার্তা প্রেরণ কার্যকর হয়। ১৮৩৮-৩৯-এ ইংলণ্ডে প্রথম টেলিগ্রাফের তার বসানো হয়। ১৮৭৩ সালে অ্যাটলান্টিক

মহাসাগরের তলদেশে টেলিগ্রাফের তার স্থাপিত হয়।

ভারতে প্রথম ডায়মণ্ডহারবার থেকে কলকাতার মধ্যে টেলিগ্রাফ লাইন বসানো হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সব চেয়ে বেশী টেলিগ্রাম ব্যবহৃত হয়। ১৯৭৮ সালের হিসাবে দেখা যায় সেখানে ৪৯,২৬,৩১,০০০টি টেলিগ্রাম করা হয়েছে।

॥ টেলিপ্রিণ্টার ॥

টেলিপ্রিণ্টার (teleprinter) যন্ত্রের সাহায্যে একস্থান থেকে অন্য দূরবর্তী স্থানে টাইপ-করা সংবাদ পাঠানো হয়। টেলিগ্রাফ প্রেরকযন্ত্রে টাইপ রাইটারের চাবির বোর্ড এমন ভাবে লাগানো থাকে যে তাতে দূরের অপর একটি টাইপরাইটারও চলতে পারে। তার ফলে সঙ্গে সঙ্গে সেই টাইপ-রাইটারে দূরের সংবাদ টাইপ হয়ে যায়। সাধারণতঃ বর্তমানে সংবাদপত্রের অফিসে এটির ব্যবহার অপরিহার্য।

॥ টেলিফটোগ্রাফি ॥

টেলিগ্রাফের সাহায্যে দূরবর্তী স্থানে ফটোগ্রাফ পাঠানোর পদ্ধতিকে বলা হয় টেলিফটোগ্রাফি (telephotography)। সাধারণতঃ চিকিৎসকেরা বিশেষজ্ঞের মতামত গ্রহণের জন্য X-Ray-করা আলোকচিত্রকে দূরবর্তী স্থানে পাঠান। সংবাদ-পত্রের অফিসে টেলিফটোগ্রাফির ব্যবহার হয়।

॥ গ্রামোফোন ॥

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টমাস আলভা এডিসন ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ফনোগ্রাফ বলে যে যন্ত্র উদ্ভাবন করেন, বর্তমানের গ্রামোফোন তারই উন্নত রূপ। একটি সিলিণ্ডার, সঙ্গে একটি হাতল। সিলিণ্ডারের



এডিসন

দিকে মুখ-করা একটা ছুঁচলো কাঠি ও আর একটা চোঙা। তারই সাহায্যে কোন কিছুর স্বরকে পুনরায় প্রকাশ করা চলত।

এই ধরনের স্বরধর যন্ত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র-প্রবাসী জার্মান এমিল বার্লিনের (Emile Berliner, ১৮৫১-১৯২৯ খ্রী.) প্রথম বর্তমানের ডিস্ক ব্যবহার



তরুণ বয়সে এডিসন



গ্রামোফোন

করেন। তাঁকেই প্রকৃত গ্রামোফোনের উদ্ভাবক বলা হয়।

ফনোগ্রাফের কল্পনা প্রথম মাথায় আসে ফরাসী কবি ও বিজ্ঞানী চার্লস ক্রসের মাথায়। ক্রস (Charles Cros, ১৮৪২-১৮৮৮ খ্রী.) তাঁর পরিকল্পনা সীল-করা খামে পুরে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে এপ্রিল ফ্রেঞ্চ অ্যাকেডেমি অব সায়েন্সে জমা দেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Chichester Bell ও Charles Sumner Tainter ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মোম-মাখানো সিলিণ্ডার ফনোগ্রাফ তৈরি করেন।

সব চেয়ে বেশী গ্রামোফোন বিক্রী হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

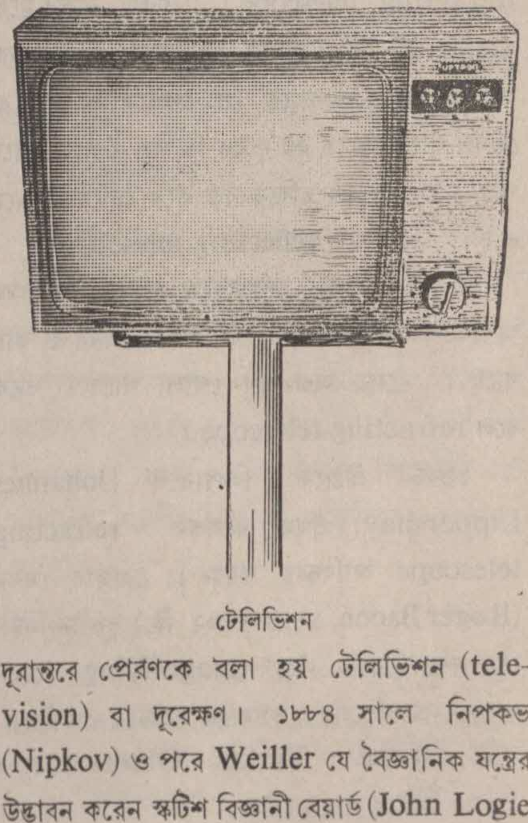
॥ বিজলী বাতি ॥

টমাস এডিসন অসংখ্য আবিষ্কৃত জিনিসের পেটেন্ট গ্রহণ করেন। তিনি ১৩০০ যন্ত্রের অধিক পেটেন্ট নিয়েছিলেন। সে-সবের মধ্যে বিজলী বাতির স্থান খুব উচ্চে।

এখন যে ঘরে ঘরে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে, তাতে যে বাল্ব ব্যবহৃত হয় তা এডিসনই উদ্ভাবন করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে অক্টোবর প্রথম বৈদ্যুতিক আলো জ্বলতে শুরু করে।

॥ টেলিভিশন ॥

রেডিওর সাহায্যে এক স্থান থেকে দূরের অন্য স্থানে সংবাদাদি প্রেরণ করা হয়ে থাকে। রেডিওর সাহায্যে কোন কিছুর চলমান বাস্তব দৃশ্যকে দূর-



টেলিভিশন

দূরান্তরে প্রেরণকে বলা হয় টেলিভিশন (television) বা দূরেক্ষণ। ১৮৮৪ সালে নিপকভ (Nipkov) ও পরে Weiller যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন স্কটিশ বিজ্ঞানী বেয়ার্ড (John Logie Baird, ১৮৮৮-১৯৪৬ খ্রী.) ও আমেরিকার জেনকিনস (Jenkins) সেই যন্ত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে যে যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন তাই-ই টেলিভিশনের প্রাথমিক রূপ। ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বেয়ার্ড টেলিভিশনে সফলভাবে

চলমান মানুষের প্রতিকৃতি প্রদর্শন করেন।

টেলস্টার উপগ্রহ মারফত ১৯৬২ সালে আটলান্টিক মহাসাগরের অপর পারে টেলিভিশনের দৃশ্য প্রেরণ সম্ভব হয়।

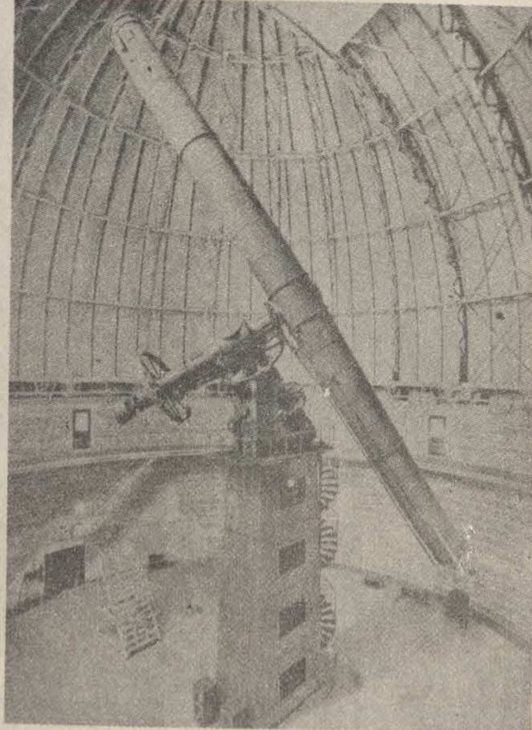
॥ টেলিস্কোপ ॥

টেলিস্কোপ অর্থাৎ দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা বহু দূরের জিনিস বড় আকারে ও সুস্পষ্ট দেখা যায়। টেলিস্কোপ দুরকমের, reflecting telescope ও refracting telescope। একটি নলের মধ্যে সাধারণ দুটি লেনস বসিয়ে টেলিস্কোপ তৈরি করা যায়। নলের একপ্রান্তে যে পেটমোটা কাচ বা লেনস থাকে তাতে বহু দূরের জিনিস উলটো ভাবে পড়ে। লেনস এই ছবিকে বড় করে চোখের সামনে ধরে। একে বলে reflecting telescope।

একটা নলের শেষপ্রান্তে একটা concave অর্থাৎ অবতল (ভিতর দিকে বাঁকা) লেনস বা কাচ থাকে। নলের অন্য মুখ খোলা থাকে। একে বলে refracting telescope।

১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে লিপারশে (Johannes Lippershay) প্রথম কার্যকর refracting telescope আবিষ্কার করেন। রোজার বেকন (Roger Bacon, ১২১৪-১২৯২ খ্রী.) দূরবীন নির্মাণের জন্য বিবর্ধক কাঁচ (magnifying lens) ব্যবহার করেছিলেন। বর্তমানে সবচেয়ে বড় রিফ্র্যাকটিং টেলিস্কোপ Yerkes Observatory-র ১৮·৯০ মিটার লম্বা দূরবীন।

নিউটন প্রথম রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ নির্মাণ করেন। এখন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ রিফ্লেকটিং টেলিস্কোপ রাশিয়ার ককেশাশ পর্বতের সেমিরোডরিকি পর্বত (Mount Semirodriki)-এ ২০৮০ মিটার উর্ধ্বে স্থাপিত দূরবীন। এর শক্তি কেমন তা এতে



Yerkes Observatory-র টেলিস্কোপ

বুঝতে পারা যায় যে ২৪,০০০ কিলোমিটার দূরের একটা জ্বলন্ত মোমবাতিকে এই দূরবীনের সাহায্যে দেখা যাবে।

কালিফোর্নিয়ার পালোমার মানমন্দিরের দূরবীন (৫০৮ সেন্টিমিটার) খুবই শক্তিশালী। এর নাম হেল (Hale)। এর দ্বারা দুশো কোটি আলোকবর্ষ দূরের ছায়াপথকে দেখা ও তার আলোকচিত্র গ্রহণ সম্ভব হয়েছে। কালিফোর্নিয়ার মাউন্ট উইলসন মানমন্দিরের দূরবীনও (২৫৪ সেন্টিমিটার) খুব শক্তিশালী।

॥ অণুবীক্ষণযন্ত্র ॥

যে যন্ত্রের সাহায্যে খুব ছোট জিনিসকে বড় করে দেখায় তাকে বলে অণুবীক্ষণযন্ত্র (micro-

scope)। জ্যানসেন (Jansen) ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে অণুবীক্ষণযন্ত্র আবিষ্কার করেন। গ্যালিলিও, ফন্টানা ও অনেকে অণুবীক্ষণযন্ত্রের উন্নতি সাধন করেন।

সাধারণ অণুবীক্ষণযন্ত্রে কোন কিছুকে ১০ হাজার গুণ বড় করে দেখা যায়। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপে কোন জিনিসকে ১৫ লক্ষ গুণ বড় দেখায়। মিশিগ্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ লরেন্স বার্টেল (Dr. Lawrence Bartell) ও চার্লস রিৎজ (Charles Ritz) ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে জানান, পৃথিবীর সব চেয়ে শক্তিশালী অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়ে কোন কিছুকে ২৬ কোটি গুণ বড় করে দেখা গেছে।

॥ ইনফ্রা-রেড রেজ ॥

ইনফ্রা-রেড রেজ অবলোহিত রশ্মি লাল আলো থেকে দীর্ঘতর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আলোকরশ্মি। এর সাহায্যে বহু দূরের অস্পষ্ট পর্বত বা মেঘাবৃত স্থানের আলোকচিত্র গ্রহণ করা যায়। কোন জিনিসের উপর পড়ে এই রশ্মি উত্তাপ সৃষ্টি করতে পারে। বহুবিধ পেশীর ব্যথায় এর প্রয়োগ উপকারী।

॥ অ্যান্টিবায়োটিকস ॥

ছত্রাকজাতীয় জিনিসের জীবাণুর দেহ-নিঃসৃত যে জৈবপদার্থ অন্য কোন ক্ষতিকর জীবাণুকে ধ্বংস করে বা তার বৃদ্ধি রোধ করে তাকে বলা হয় অ্যান্টিবায়োটিকস (anti-biotics)। পেনিসিলিন, ক্লোরোমাইসেটিন, স্ট্রেপ্টোমাইসিন, অরিওমাইসিন এইজাতীয় জিনিস।

আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং (Sir Alexander Fleming, ১৮৮১-১৯৫৫ খ্রী.) এক ধরনের ছত্রাক থেকে রোগজীবাণু ধ্বংসকর পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। তিনি যে ছত্রাক থেকে পেনিসিলিন (penicillin) আবিষ্কার করেন তার নাম পেনিসিলিয়াম নোটেটাম (penicillium notatum)।

ফ্লেমিং বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী রাইট (Sir Almroth Wright, ১৮৬১-১৯৪৭ খ্রী.)-এর গবেষণাগারে গবেষণা করেন।

রাইট রক্তে রোগজীবাণু ধ্বংসকারক আর এক ধরনের রোগজীবাণু প্রবেশ করিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। তিনি টাইফয়েড-প্রতিরোধক টিকা আবিষ্কার করেন।

ফ্লেমিং বিজ্ঞানী ফ্লোরে ও চেনের সহযোগিতায় পেনিসিলিনকে সুষ্ঠুভাবে মানুষের রোগ নিরাময়ের কাজে লাগান। ফ্লেমিং, ফ্লোরে ও চেন একযোগে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ ইউরেনিয়াম ॥

ইউরেনিয়াম (uranium) এক ধরনের মৌলিক ধাতু। এর বর্ণ শ্বেত। কিন্তু বাতাসে সহজেই মলিন বর্ণ ধারণ করে। বিজ্ঞানী ক্ল্যাপরথ (Klaproth) ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পিচব্লেণ্ড থেকে এটি আবিষ্কার করেন। ইউরেনিয়াম (U-235) বিভাজনের ফলে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটে। প্রধানতঃ বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতিতে এর ব্যবহার হয়।

॥ এক্স-রে ॥

এক্স-রে (X-Ray) জার্মান পদার্থতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক রোন্টগেন (Wilhelm Konrad Rontgen, ১৮৪৫-১৯২৩ খ্রী.) কর্তৃক ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়।

ইংরেজ বিজ্ঞানী স্যার উইলিয়াম ক্রুকস (Sir William Crookes, ১৮৩২-১৯১৯ খ্রী.) যে বায়ুশূন্য কাচের নলের মধ্য দিয়ে তড়িৎ-প্রবাহের পরীক্ষা করেন রোন্টগেন সেই নল নিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে অন্ধকার ঘরে এমন একটা রশ্মির সন্ধান পান,

যা কঠিন জিনিস ভেদ করে যেতে পারে। এই বিস্ময়কর রশ্মিটা আসলে কি তা প্রথমে রোণ্টগেন বুঝতে না পেরে সেই রশ্মির নামকরণ করলেন এক্স-রে (X-Ray)। আজও তাঁর দেওয়া সেই নামই চলে আসছে।

এক্স-রে (বাংলায় বলে রঞ্জনরশ্মি) দ্বারা দেহাভ্যন্তরের ভাঙা হাড়, ফুসফুস, বুলেট প্রভৃতির আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। এই যুগান্তকারী আবিষ্কারের জন্য রোণ্টগেন ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থ-বিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ রেডিয়াম ॥

রেডিয়াম (radium) এক ধরনের অতি মূল্যবান্ মৌলিক ধাতু। ফ্রান্সের পদার্থতত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক বেকারেল (Antoine Henri Becquerel, ১৮৫২-১৯০৮ খ্রী.) ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইউরেনিয়ামের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পান। তিনিই প্রথম জানতে পারেন, পিচব্লেণ্ড-নামক পদার্থ অন্ধকারে জ্বলজ্বল করে।

মেরী ক্যুরি (Madame Marie Curie, ১৮৬৭-১৯৩৪ খ্রী.) ও তাঁর স্বামী পিয়েরে ক্যুরি (Pierre Curie, ১৮৫৯-১৯০৬ খ্রী.) পিচব্লেণ্ড থেকে বিসমাথ নামে এক ধাতু আবিষ্কার করেন যার শক্তি ইউরেনিয়ামের চেয়ে তিনশ' গুণ বেশী।

বিসমাথ নিয়ে গবেষণা করতে করতে ক্যুরি দম্পতি আর একটি ধাতু আবিষ্কার করলেন, যার নাম দেওয়া হল পোলোনিয়াম (polonium)। ওই পোলোনিয়াম নিয়ে দীর্ঘকাল গবেষণা করে তাঁরা রেডিয়াম আবিষ্কার করলেন।

রেডিয়াম হাইড্রোজেন অপেক্ষা ২৬৮ গুণ অধিক ভারী। রেডিয়াম অতি দুষ্প্রাপ্য ধাতু।

রেডিয়াম আবিষ্কারের জন্য ক্যুরি দম্পতি ও বেকারেল ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

পিয়েরে ক্যুরি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিসের রাজপথে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যান। মেরী ক্যুরি ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে রসায়নবিদ্যায় পুনরায় নোবেল পুরস্কার পান।

ক্যুরির কন্যা আইরিন জোলিও-ক্যুরি ও তাঁর স্বামী একযোগে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ রোগ-জীবাণু ॥

রোগ-জীবাণু এত ছোট যে তা খালি চোখে দেখা যায় না। অণুবীক্ষণযন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়। কোন রোগ-জীবাণু (ভাইরাস) দেখতে পাওয়া যায় অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপের সাহায্যে।

আগে লোকের রোগ-জীবাণুর কথা জানা ছিল না।

ফরাসী বিজ্ঞান লুই পাস্তুর (Louis Pasteur, ১৮২২-১৮৯৫ খ্রী.) রোগ-জীবাণুর আক্রমণের ফলে যে নানা রোগ হয় তা প্রচার করেন। সেই থেকে রোগ-জীবাণু ধ্বংসকারী নানা ঔষধ আবিষ্কৃত হয়ে আসছে। পাস্তুর জলাতঙ্ক রোগের প্রতিষেধক বার করেন। গো-মহিষাদি পশুর অ্যানথ্রাক্স (anthrax) রোগের প্রতিষেধক তিনিই আবিষ্কার করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় রোগ-জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে রেশম শিল্পকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা হয়।

॥ রকেট ॥

কালীপূজোর সময় যে হাওয়াই বাজি ছোড়া হয়, রকেট তারই এক সুবৃহৎ সংস্করণ। কবে

যে রকেট তৈরি শুরু হয়, তা নিশ্চিত করে বলা যায় না।

চীনের ৎসেং কুং লিয়াং ১০৪২ খ্রীষ্টাব্দে কাঠকয়লা-শোরা-গন্ধক বারুদ দিয়ে যে রকেট তৈরি করেন, তা যুদ্ধে ব্যবহৃত হয়েছিল।

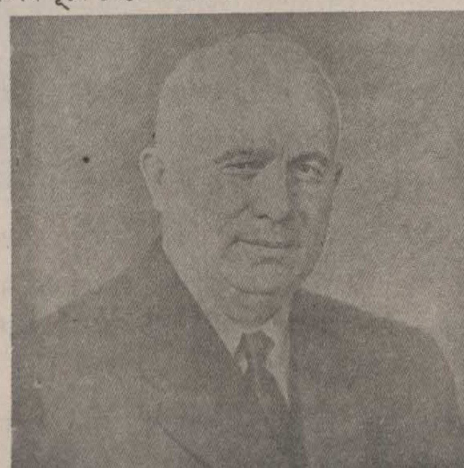
১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপে রকেটের প্রচলন হয়। ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ব্রিটেনের স্যার উইলিয়াম কনগ্রীভ (Sir William Congreve, ১৭৭২-১৮২৮ খ্রী.) ২.৭২ কেজি ওজনের একটা রকেট তৈরি করেন। সেটি ১৮২৫ মিটার দূরে যেতে সমর্থ হয়। এই রকেট ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর ফ্রান্সের বুলোনে ব্রিটিশ নৌবাহিনী কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়।



রবার্ট গডার্ড

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডঃ রবার্ট হাচিংস্ গডার্ড (Dr. Robert Hutchings Goddard, ১৮৮২-১৮৪৫ খ্রী.) ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ প্রথম তরল-জ্বালানিপূর্ণ রকেট উৎক্ষেপ করেন। এই রকেট ৫৬ মিটার দূরে গিয়ে পড়তে সমর্থ হয়।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ রাশিয়ার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী নিকিতা ক্রুশ্চেভ ঘোষনা করেন, তাঁদের এমন রকেট আছে, যা ৩০,০০০ কিলোমিটার দূরে যেতে সমর্থ।



ক্রুশ্চেভ

জার্মানরা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে শব্দের চেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন ১ টন ওজনের V-2 রকেট ফ্রান্সের উপকূল থেকে লণ্ডনে নিক্ষেপ করেছিল।

নানা দেশে বিভিন্ন সময়ে যুদ্ধের কাজে রকেট তৈরী হয়ে আসছে। বর্তমানে বিভিন্ন শক্তির ও ওজনের রকেট মহাশূন্যে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে। তাতে করে মানুষ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করছে, চাঁদে গিয়েছে, সৌরজগতের বিভিন্ন গ্রহের দিকে বহু রকেট উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। এ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া অগ্রনী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিনার-১০ রকেট সৌরজগৎ ছাড়িয়ে নক্ষত্রলোকের দিকে যাত্রা করেছে।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এড়িয়ে যেতে গেলে কোন রকেটকে প্রায় ২৫ হাজার মাইল বেগে ছুটতে হয়। এরূপ গতিসম্পন্ন রকেট অনেক তৈরী হয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রকেট অ্যাপলো-১০-এ করে ইউজিন, সারনান, জন ইয়ং ও স্ট্যাফোর্ড চন্দ্র প্রদক্ষিণ করেন। রকেটটির গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৩৯,৮৯৭ কিলোমিটার। রাশিয়ান মহাকাশযাত্রী য়ুরি গ্যাগারিন ভোস্টক-১ নামক রকেটে করে পৃথিবীকে পরিক্রমা করেন। এই রকেটের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ২৮,২৬০ কিলোমিটার।

১৯৬৪ সালের ২০শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক SERT I রকেট ব্যবহৃত হয়। এটি ছিল আইয়ন (ion) রকেট। আইয়ন-চালিত রকেটের গতিবেগ দাঁড়ায় ১, ৬০,০০০ কিলোমিটার। এরূপ গতিসম্পন্ন না হলে সূর্যকে ছাড়িয়ে যাওয়া যায় না। এর চেয়ে কম গতিসম্পন্ন হলে সেই রকেট সূর্যের একটি গ্রহে পরিণত হয়।

স্যার আইজ্যাক নিউটনের লেখা Philosophiae Naturalis Principia Mathematica (Mathematical Principles of Natural Philosophy)-নামক পুস্তকে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপের তত্ত্ব বর্ণিত আছে।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার K.E. Tsiolkovsky প্রথম মহাশূন্যে রকেট উৎক্ষেপের পরিকল্পনা করেন।

॥ উড়োজাহাজ, হেলিকপটার ও জেপেলিন ॥

উড়োজাহাজ, হেলিকপটার ও জেপেলিন আবিষ্কৃত হবার ফলে মনুষ্যসমাজের বহু উপকার সাধিত হয়েছে। বহুদিনের চেষ্টায় এগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। বর্তমানে যাত্রিবহন, মালবহন ছাড়াও যুদ্ধের বিভিন্ন কাজে এগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে ['যানবাহন' অধ্যায় দ্রষ্টব্য]।

॥ পারমাণবিক বোমা ॥

ইতালির বিজ্ঞানী এনরিকো ফার্মি (Enrico

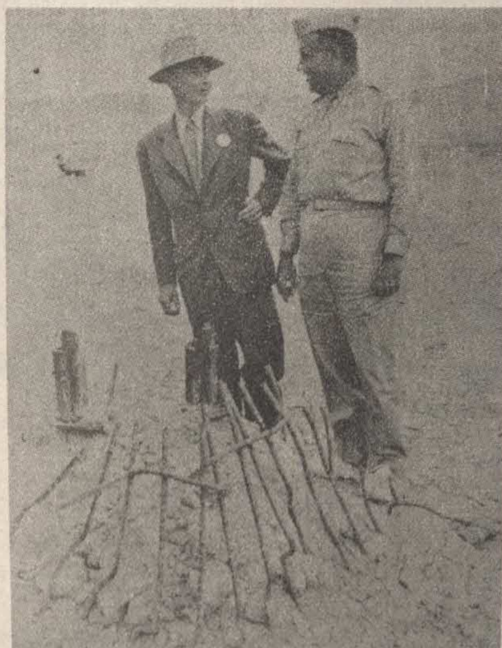


এনরিকো ফার্মি

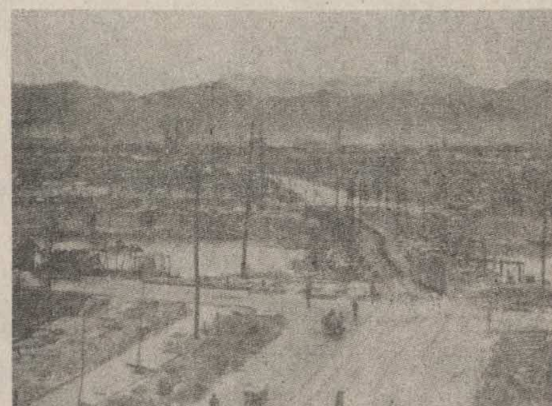
Fermi, ১৯০১—৫৪ খ্রী.) আবিষ্কার করেন, নিউট্রন ক্ষেপণে পরমাণুকেন্দ্রে বিভাজন ঘটবে। তার ফলে প্রচণ্ড পারমাণবিক শক্তির উদ্ভব হবে।

ফার্মির উদ্ভাবিত তত্ত্বের অনুসরণ করে নিউ ইয়র্কের জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার (Julius Robert Openheimer) গবেষণা শুরু করলেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুলাই পারমাণবিক শক্তি নির্গত হল। এইভাবে পারমাণবিক যুগের সূচনা হল।

পারমাণবিক শক্তিদ্বারা মনুষ্যসমাজের বহু কল্যাণ সাধিত হতে পারে। পর্বতবিদারণ, নদীর গতিপথ পরিবর্তন, বিদ্যুতের সাহায্য ব্যতিরেকেই আলো জ্বালানো, জাহাজ চালানো, রেলগাড়ি চালানো প্রভৃতি বহু মঙ্গলজনক কার্য করার ব্যাপারে পারমাণবিক শক্তির প্রয়োজন। কিন্তু মানুষ দুর্বুদ্ধিবশতঃ পারমাণবিক বোমা সৃষ্টি করে মানুষ মারার ব্যবস্থা করেছে। রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র,



রবার্ট ওপেনহাইমার পারমাণবিক বিস্ফোরণের জায়গা পর্যবেক্ষণ করছেন।

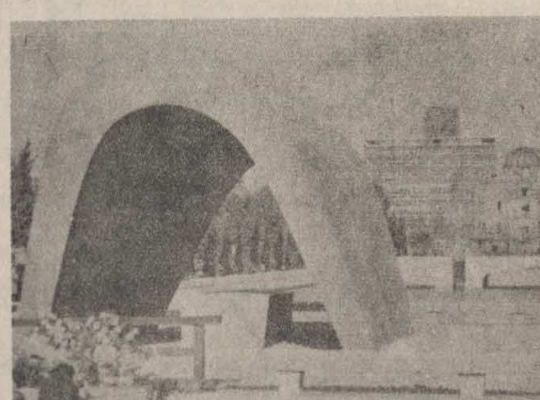


পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণের পর হিরোশিমার দৃশ্য

চীন প্রভৃতি দেশে বহু পারমাণবিক বোমা মজুত আছে। ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্মানি প্রভৃতি দেশ পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটাচ্ছে।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুটি পারমাণবিক বোমা. ফেলে। তাতে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যায়, আহত হয় ও চিরদিনের মতো বিকলাঙ্গ হয়ে যায়। এই অমানুষিক মনুষ্যধ্বংসকর ব্যাপার দেখেও শক্তিশালী দেশের লোকেরা পারমাণবিক বোমা ব্যবহার না করার সংকল্প নেয় নি।

হিরোশিমায় যে বোমাটি ফেলা হয়, তার ওজন ছিল ৪,০৮০ কেজি। হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে নিক্ষিপ্ত ২টি বোমার শক্তিই ছিল ২০ কিলোটন TNT।



হিরোশিমায় পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণে নিহতদের স্মৃতিরক্ষার্থ স্তম্ভ

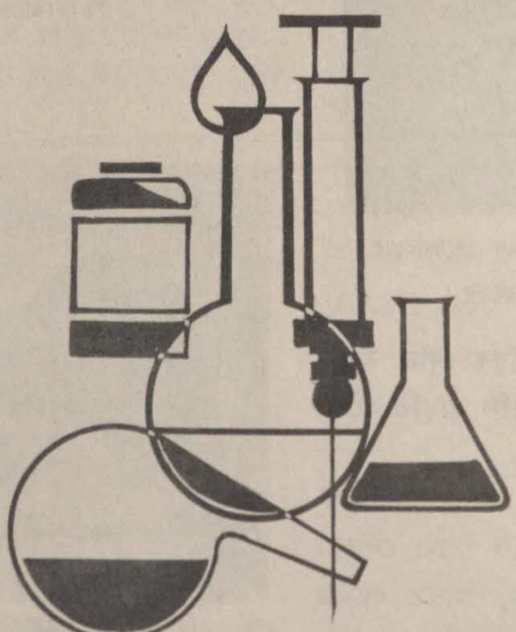
১৯৬১ সালে ক্রুশ্চেভ জানিয়েছিলেন তাঁরা ১০০ মেগাটনের পারমাণবিক বোমা প্রস্তুত করতে সমর্থ।

রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি পারমাণবিক বোমা তৈরির ব্যাপারে রীতিমতো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রত।

১টি মাত্র ৫০ হাজার মেগাটন cobalt-salted পারমাণবিক বোমার নিক্ষেপে সারা পৃথিবীর সব মানুষ মারা যেতে পারে।

॥ প্ল্যাস্টিক্স্ ॥

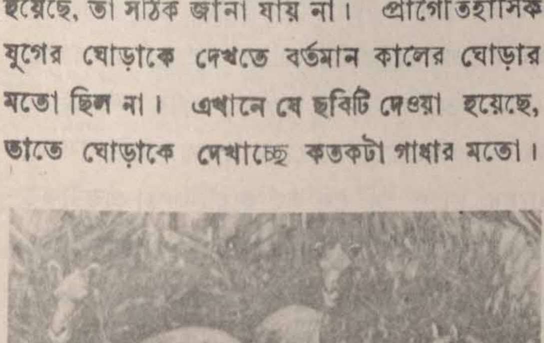
প্ল্যাস্টিক্স্ (plastics) দুরকমের—থার্মোপ্ল্যাস্টিক্স্ ও থার্মোসেটিং। প্ল্যাস্টিক্স্ অত্যন্ত তাপে গলে গেলে তাকে যে-কোন আকার দেওয়া যায়। থার্মোপ্ল্যাস্টিক্স্ যখনই গরমে ফেলে নরম হয়ে যায়, তখন তাকে যে কোন আকার দেওয়া যায়। যতবারই গরম করা যায় তা নরম হয়ে যায় এবং তাকে যে কোন আকারে গড়া চলে। যেমন—সেলুলয়েড। থার্মোসেটিং প্ল্যাস্টিক্স্ একবার গরমে ফেলে নরম করে কোন কিছু গড়লে আর তাকে গলিয়ে অন্য কোন আকার দেওয়া যায় না। যেমন—বেকেলাইট।





ছয় কোটি বছর আগেকার ঘোড়া

কত কাল আগে পৃথিবীতে ঘোড়ার আবির্ভাব হয়েছে, তা সঠিক জানা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘোড়াকে দেখতে বর্তমান কালের ঘোড়ার মতো ছিল না। এখানে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তাতে ঘোড়াকে দেখাচ্ছে কতকটা গাধার মতো।



প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘোড়া

এই ঘোড়া ছয় কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বর্তমান ছিল।

এই ঘোড়া বনে জঙ্গলে বাস করত। এরা গাছের পাতা, নরম ডালপালা প্রভৃতি খেয়ে জীবন-ধারণ করত। এই ঘোড়াই এ পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রথম যুগের ঘোড়ার নিদর্শন। উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থানে এদের বাস ছিল। এই প্রাগৈতিহাসিক ঘোড়ার নামকরণ হয়েছে Hyracotherium বা 'Eohippus'। এই ঘোড়া Eocene যুগের।

সাড়ে তিন কোটি বছর আগেকার ঘোড়া

সাড়ে তিন কোটি বছর আগে Oligocene যুগের ঘোড়াদের নামকরণ হয়েছে Mesohippus ও Miohippus। এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, দুটি Mesohippus ঘোড়া ছুটে যাচ্ছে। এই ঘোড়াদের বাস ছিল কেবল উত্তর আমেরিকায়। অন্য কোথাও এই ঘোড়ার বাস ছিল না।



Mesohippus ঘোড়া

গাছের চওড়া চওড়া পাতা Mesohippus ঘোড়ার প্রধান খাদ্য ছিল। বনে জঙ্গলে ও লম্বা লম্বা ঘাসে ভরা মাঠে এদের বাস ছিল। আকারে এরা Hyracotherium ঘোড়ার চেয়ে একটু বড় ছিল।

আড়াই কোটি বছর আগের ঘোড়াদের সঙ্গে Oligocene যুগের ঘোড়াদের পার্থক্য খুব কমই ছিল। দেড় কোটি বছর আগে ঘোড়াদের আকার ধীরে ধীরে বর্তমান যুগের ঘোড়ার মতো হতে আরম্ভ করে।

ডাইনোসরের পায়ের ছাপ

কয়েক কোটি বছর আগে পৃথিবীতে অনেক বৃহদাকার প্রাণী বাস করত। ডাইনোসর তাদের মধ্যে একটি। বর্তমানে ডাইনোসর পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে অবলুপ্ত। তারা লোপ পেয়ে গেলেও তাদের অশ্মীভূত কঙ্কাল, হাড়, ডিম ইত্যাদি পৃথিবীর নানা স্থানে পাওয়া গেছে। তাই দেখে বিজ্ঞানীরা তাদের সম্বন্ধে নানা বিবরণ বর্তমান কালের লোকেদের জানিয়েছেন।

ডাইনোসরেরা এক জায়গা দিয়ে গিয়েছিল। তাদের পায়ের চাপে বড় বড় গর্ত হয়ে গিয়েছিল। সেই সব গর্ত যে ডাইনোসরের পায়ের চাপে সৃষ্ট হয়েছে, তা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জেনেছেন। এখানে প্রদত্ত ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে, ডাইনোসরের পায়ের ছাপে যে সব গর্ত হয়েছিল তা প্রস্তরীভূত বা অশ্মীভূত হয়ে রয়েছে। ডাইনোসর সাড়ে তের কোটি বছর আগে পৃথিবীতে বিচরণ করত।

ডাইনোসরের ডিম

সাড়ে তের কোটি বছর আগে যে বৃহদাকার অধুনালুপ্ত ডাইনোসর পৃথিবীপৃষ্ঠে বিচরণ করত তাদের কয়েকটি ডিম আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে প্রদত্ত ছবিতে সেই সব ডিমের কয়েকটি দেখা যাচ্ছে।

এইসব ডিম বর্তমানে অশ্মীভূত বা প্রস্তরীভূত। বিজ্ঞানীরা মঙ্গোলিয়ায় এই সব ডিম পেয়েছেন।



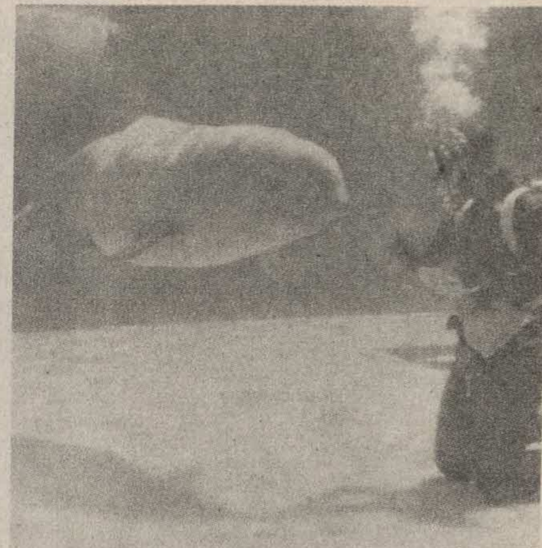
ডাইনোসরের পায়ের ছাপ

এ সবের মধ্যে সব চেয়ে বড় ডিম প্রায় ২০·৩২ সেন্টিমিটার (৮ ইঞ্চি) লম্বা।

প্রস্তরীভূত হলেও সেই সব দেখে বিজ্ঞানীরা অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছেন।

বিলুগা তিমি

বিলুগা তিমি বা শ্বেত তিমিকে উত্তরমেরু সমুদ্র ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সমুদ্রে বা নদীতে দেখা যায়। এই তিমি শুশুকজাতীয়। তিমি সাধারণতঃ পিছনদিকে সাঁতার কাটে না। কিন্তু এই বিলুগা



বিলুগা তিমি

তিমি পিছন দিকে সাঁতার দিতে পারে। ছবিতে যে দু'টি বিলুগা তিমিকে দেখা যাচ্ছে সে দুটি নিউ ইয়র্ক অ্যাকোয়েরিয়ামের মধ্যে অবস্থিত। একজন ডুবুরী সেই অ্যাকোয়েরিয়ামের মধ্যে নেমে বিলুগা তিমিকে খাদ্য দিচ্ছে।

বিলুগা তিমি সমুদ্রে ঝাঁক বেঁধে ঘোরে। এরা ঘণ্টায় ২৪ কিলোমিটার যেতে পারে। পুরুষ বিলুগা দৈর্ঘ্যে ৪.৫ মিটার ও মেয়ে বিলুগা দৈর্ঘ্যে ২.৫ মিটার হয়। এদের ওজন হয় ২২৫ থেকে ৬৭৫ কেজি।

বিলুগা তিমির ৩২ থেকে ৪০টা দাঁত থাকে।

গরিলা (Gorilla)

এখানে যে কিম্ভূতকিমাকার প্রাণীটি দেখা যাচ্ছে, তা গরিলার ছবি। দেখতে ভয়ংকর হলেও গরিলারা শান্ত ও নিরীহ। তাদের আক্রমণ না করলে তারা মানুষের কোন ক্ষতি করে না।

গরিলারা খাড়া হয়ে কদাচিৎ হাঁটে। পার্বত্য গরিলার গায়ে বড় বড় ও ঘন লোম হয়। তাদের



ডাইনোসরের ডিম

৪০০০ মিটার পর্যন্ত উঁচুতে থাকতে দেখা যায়।

আফ্রিকায় ক্যামেরুন, গ্যাবঁ, নাইজারিয়া, রোয়াণ্ডা ও উগাণ্ডায় এদের বাস। বয়স্ক পুরুষ



গরিলা

গরিলার ওজন হয় প্রায় ২০৪ কেজি এবং মেয়ে গরিলার ওজন হয় ৯১ থেকে ১১৩ কেজি। পুরুষ গরিলা উচ্চতায় প্রায় ২ মিটার হয়।

চিড়িয়াখানাতে আটক গরিলার ওজন ২৭২ থেকে ৩১৮ কেজি পর্যন্ত হতে দেখা গেছে।

গরিলারা দল বেঁধে থাকে। এদের গায়ে ভীষণ জোর। গরিলারা সাধারণতঃ ৩৫ বৎসর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

Molock (মোলক্)

এই অদ্ভুত আকৃতির জীবটির নাম মোলক্। অস্ট্রেলিয়া এদের বাসস্থান। এদের সারা গায়ে বড় বড় তীক্ষ্নাগ্র কাঁটা থাকে। এরা এক ধরনের নিরীহ সরীসৃপ।

মোলক্ সমতল স্থানেও বাস করে, উঁচু পর্বতেও এদের দেখা যায়। এদের আক্রমণ না করলে এরা কাউকে কামড়ায় না। নিতান্ত ত্যক্তবিরক্ত



মোলক্



অনেক উড়াল পুল

হলে মানুষ বা অন্য জন্তুকে কামড়ায়। কামড়ের ফলে আক্রান্ত জীবের দেহে তীব্র জ্বালার সৃষ্টি হয়।

মোলক্ সাধারণতঃ নিশাচর। তবে এদের দিনের বেলাতেও দেখা যায়। এরা কীটপতঙ্গাদি খেয়ে ক্ষুধানিবৃত্তি করে।

উড়াল পুল

কলকাতা শহরে দু'একটা উড়াল পুল দেখতে লোকে অভ্যস্ত। কিন্তু বিদেশের অতিশয় কর্মব্যস্ত শহরে অনেক উড়াল পুল দেখা যায়। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশের যে-সব শহরে লোকসংখ্যা খুব বেশী সেখানকার রাস্তায় যানবাহন চলাচলের জন্যে অনেক উড়াল পুল করতে হয়েছে। একটা রাস্তার উপর দিয়ে অনেক রাস্তা চলে গেছে। এখানে কালিফোর্নিয়ার লস অ্যাঞ্জেলসের এই রকম রাস্তার ছবি দেওয়া হল। ছবিতে সেই সব রাস্তা কিভাবে একটার উপর দিয়ে অন্যটা গিয়েছে তা দেখানো হয়েছে।

অন্ধের স্পর্শ করে কিছু বুঝতে পারা

অন্ধ লোকে চোখে দেখতে পায় না। কিন্তু তাদের স্পর্শেন্দ্রিয় খুব শক্তিশালী। তারা কোন কিছুকে স্পর্শ করে সহজেই বুঝতে পারে, সেটা কি জিনিস। এখানে যে ছবিটি দেওয়া হল, তাতে দেখা যাচ্ছে, কয়েকজন অন্ধ বালক একটি ভেড়ার গায়ে হাত রেখে বুঝতে পারছে যে সেটা ভেড়া। এইভাবে স্পর্শ করে তারা নানা জিনিস সহজেই বুঝতে ও বলতে পারে।



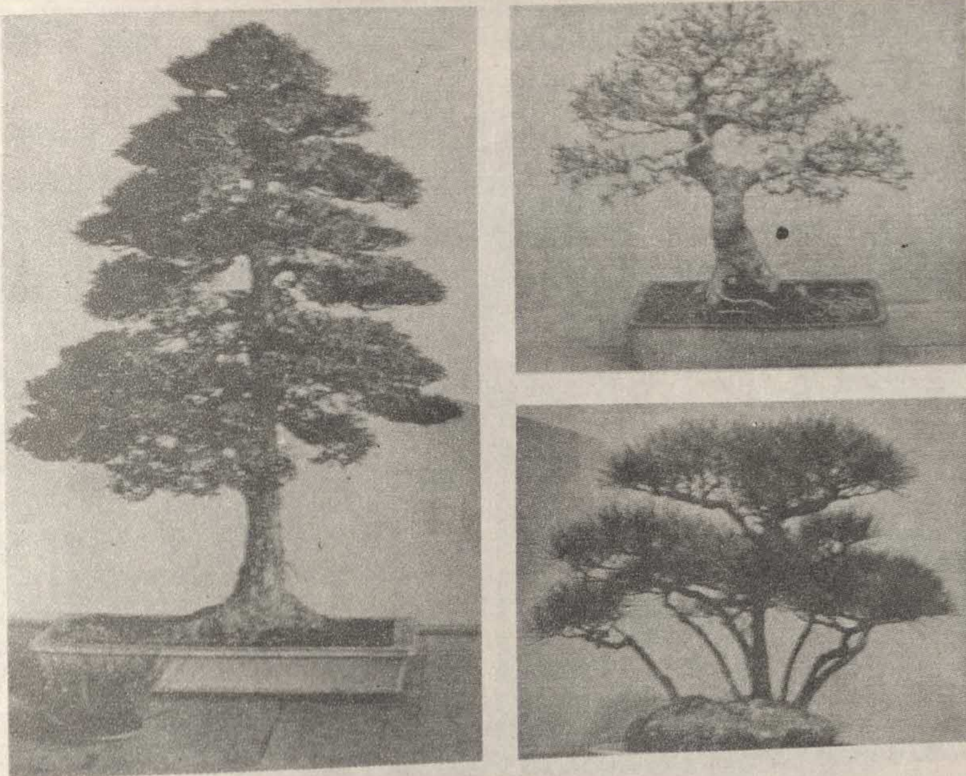
অন্ধের স্পর্শ করে বুঝতে পারা

বামন গাছ

জাপানীরা কৃত্রিম পদ্ধতিতে বড় বড় গাছকে একটা পাত্রে ছোট করে জন্মাতে পারে। যে-সব গাছ সাধারণতঃ বৃহদাকার হয় সেইসব গাছকে একটা টবে বা কোন ছোট পাত্রে খুব ছোট করে জন্মানোর ব্যবস্থা করে। এখানে যে তিনটি ছবি দেওয়া হল তা সাইপ্রেস, ম্যাপ্‌ল্ ও পাইন গাছের। এই সব গাছ সাধারণতঃ খুব বড় হয়ে থাকে। কিন্তু জাপানীরা বিচিত্র উপায়ে এই গাছ তিনটিকে —সাইপ্রেস মাত্র ১০৯ সেন্টিমিটার, ম্যাপ্‌ল্ ৪৩ সেন্টিমিটার ও পাইন ৫৩ সেন্টিমিটার উঁচু গাছে পরিণত করেছে। এই ধরনের বহু গাছকে তারা বিচিত্র উপায়ে খুব ছোট আকারের করে থাকে। একে বলে 'বন্‌সাই' (Bonsai) পদ্ধতি। জাপানীদের দেখাদেখি অন্যান্য দেশেও এই রকম ছোট গাছ তৈরি করা হয়ে থাকে।

মালয়ী জলদস্যু

আগেকার দিনে বিভিন্ন দেশের নানা জলদস্যু সংঘবদ্ধভাবে নৌকায় ও জাহাজে করে কোন দেশের বাণিজ্যতরীকে আক্রমণ করত। তারা ছিল অসমসাহসিক। প্রাণের মায়া তাদের ছিল



জাপানীদের তৈরী বামন গাছ



মালয়ী জলদস্যুর ফরাসী জাহাজ আক্রমণ

না। কোন জাহাজকে আক্রমণ করতে গিয়ে জলদস্যু মারা যেত বা গুরুতরভাবে আহত হত, কিন্তু তাতেও তারা দস্যুবৃত্তি থেকে বিরত হত না।

এখানে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, মালয়ী জলদস্যুরা অস্ট্রেলিয়ার টরেস প্রণালীতে একটা ফরাসী জাহাজকে আক্রমণ করছে। এটা হল ঊনবিংশ শতাব্দীর ঘটনা।

বর্তমানে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্যতরী আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র-সমন্বিত হওয়ায় সমুদ্রে জলদস্যুদের উপদ্রব দেখা যায় না।

দাবানল

বনের মধ্যে সাধারণতঃ ঝড়ের সময় গাছে গাছে ঘষটানি লেগে আগুন জ্বলে ওঠে। কখনও কখনও অসাবধানী মানুষ শুকনো পাতার উপর



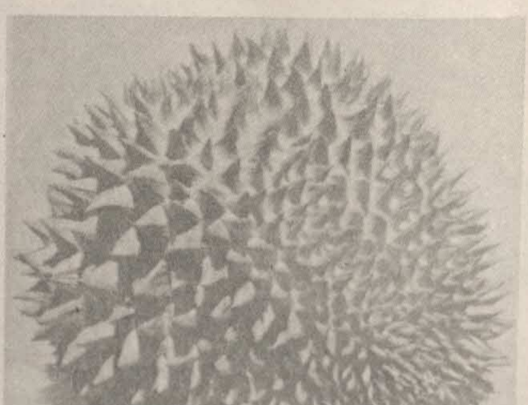
দাবানলে বন পুড়ে যাচ্ছে

জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরা ফেলে বা রান্না করবার সময় নানাভাবে বনের মধ্যে প্রলয়ংকর আগুনের সৃষ্টি করে। বনের এই আগুনকে বলে দাবানল।

যে কারণেই দাবানলের সৃষ্টি হোক না কেন, তাতে বিরাট বনের মূল্যবান গাছগুলি পুড়ে ছাই হয়ে যায়। এখানে যে ছবি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, বনে আগুন লেগে গাছপালা পুড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

ডুরিয়ান গাছের ফল

মালয়েশিয়ার Durio zi bethinus নামে একধরনের গাছকে বলা হয় ডুরিয়ান গাছ। এ গাছ সাধারণতঃ ৪৫ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। মালয়েশিয়ার গাছ হলেও কাম্পুচিয়া, থাইল্যাণ্ড,



বিচিত্র ডুরিয়ান গাছের ফল

বর্মা শ্রীলঙ্কা ও দক্ষিণ ভারতেও এই গাছ দেখা যায়।

এই ডুরিয়ান গাছের ফলের ব্যাস হয় ২০ সে.মি.। এই ফলের গায়ে তীক্ষ্ণাগ্র কাঁটা থাকে। সেই কাঁটা গায়ে লাগলে জ্বালা করে। পাকা ফল উঁচু গাছ থেকে নীচে পড়লেও ফেটে যায় না। এই ফলের গন্ধ উৎকট। কিন্তু লোকে এই ফলের শাঁস খেতে ভালবাসে। ডুরিয়ান ফলের বীচি ভেজে বা সিদ্ধ করে খাওয়া হয়।

শিম্পাঞ্জীর বুদ্ধি

পৃথিবীর নানা জন্তুর মধ্যে শিম্পাঞ্জীকে খুব বুদ্ধিমান্ বলে মনে হয়। পোষা শিম্পাঞ্জী পালকের আদেশমতো নানা কাজ করে থাকে। সে আলমারিতে বই তুলে রাখে, ঘর ঝাঁট দেয়, পাতকুয়া থেকে জল তুলে আনে, রোদে কাপড় শুকোতে দেয়। এই রকম নানা কাজ সে করে।

এখানে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, একটা শিম্পাঞ্জী চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলছে। অবশ্য এ সব কাজ করার জন্যে তাকে ভালো খাদ্য দেবার লোভ দেখাতে হয়।



শিম্পাঞ্জী চাবি দিয়ে সিন্দুক খুলছে

এক গোছা চাবির মধ্যে যে চাবিটি দিয়ে সিন্দুকটি খোলা যাবে, তা সে অভ্যাসমতো বেছে নিতে পারে। কোন ভুল তার হয় না।

অদ্ভুত বর্ষাতি

বৃষ্টির জল থেকে শরীরকে বাঁচাতে সব দেশের লোকেই নানা ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকে।



কোরিয়ার চাষীদের অদ্ভুত বর্ষাতি

প্রধানতঃ ছাতাই লোকে ব্যবহার করে। তার পরেই ওয়াটারপ্রুফ জামার স্থান। কিন্তু সে সব নিয়ে তো চাষীরা মাঠে কাজ করতে পারে না। আমাদের দেশে তালপাতার আবরণ দিয়ে বৃষ্টি থেকে মাথা ও দেহ রক্ষা করে। সে-সবের নাম চৌকা, মাথাল ইত্যাদি।

এখানে ছবিতে দেখা যাচ্ছে, কোরিয়ার চাষী এক অদ্ভুত বর্ষাতিতে শরীর ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় বড় টুপির মতো আবরণ। তার নীচে গোছা গোছা খড় ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই টুপি ও খড় চাষীকে বৃষ্টি থেকে রক্ষা করে।

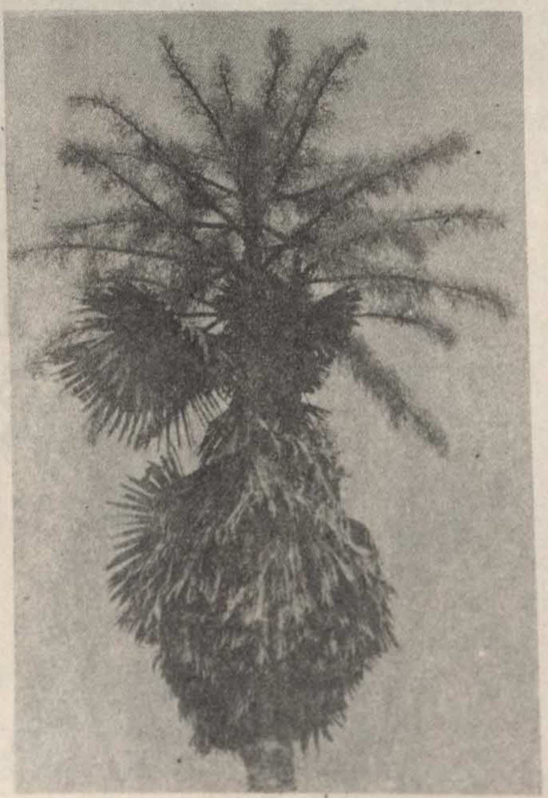
ট্যালিপট গাছ

শ্রীলঙ্কা, ফিলিপিন্‌জ্‌ ও ভারতের মালাবার উপকূলে এই গাছ দেখা যায়। কখনও কখনও ফ্লোরিডা ও দক্ষিণ কালিফোর্নিয়ায়ও এই গাছ দেখা যায়।

ট্যালিপট (Talipot) একধরনের তাল গাছ। এই গাছ ২৪ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। এর পাতা ২·৪ থেকে ৪·৮ মিটার পর্যন্ত চওড়া হয়। ৫০ থেকে ৭০ বছর পরে এই গাছে ফুল ফোটে। বিচিত্র সেই ফুল। এই ফুল ৪/৫ থেকে ৬ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাশের দিকে এই ফুল ডাটা সমেত ৯ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকে।

ফুল থেকে ফল হয়; সেই ফল পাকতে ১৩ মাস সময় লাগে।

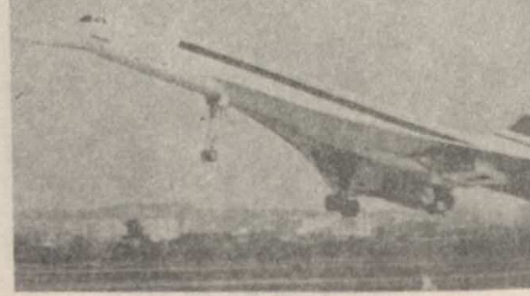
ছবিতে গাছের মাথায় অনেক ফুল দেখা যাচ্ছে।



ট্যালিপট তালগাছের ফুল

শব্দের চেয়ে বেশী গতিসম্পন্ন বিমান

সাধারণতঃ বিমান ডাঙ্গার মোটর, রেল প্রভৃতির চেয়ে অনেক জোরে যায়। কিন্তু তাতেও



শব্দের চেয়ে গতিসম্পন্ন বিমান

মানুষ খুশী নয়। ক্রমশঃই তারা এমন বিমান তৈরি করছে, যে-সব বিমান শব্দের চেয়ে বেশী দ্রুত যেতে পারে (শব্দের গতি সেকেণ্ডে ৩৪১ মিটার ১,১২০ ফুট)।

এখানে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের এঞ্জিনীয়াররা এই বিমান তৈরি করেছেন। বিমানটি সুদৃশ্য ও শব্দের চেয়ে বেশী দ্রুত গতিসম্পন্ন।

শুধু ব্রিটেন ও ফ্রান্সই নয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া প্রভৃতি পৃথিবীর নানা দেশেও এই ধরনের বিমান তৈরী হয়েছে।

এতে করে যাত্রিবহন ও মালপত্র বহন চলে।

পরিযায়ী পাখির ঝাঁক

এখানে ছবিতে অসংখ্য পাখিকে দেখা যাচ্ছে। এই সব পাখিকে বলা হয় পরিযায়ী পাখি (migratory bird)। এরা শীতপ্রধান দেশ থেকে শীতকালে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উড়ে আসে। সেই সময়ে তাদের থাকবার জায়গা বরফে ঢেকে যায়। তারা না পায় খাদ্য, না থাকে তাদের থাকবার জায়গা। তারা গ্রীষ্মপ্রধান দেশের এমন জায়গায় উড়ে যায়, যেখানে তারা নিশ্চিন্তভাবে খাদ্য ও থাকবার জায়গা পায়। তারপর শীত ফুরোলে বসন্তকালের শুরুতে আবার তাদের পুরনো জায়গায় উড়ে যায়।

ছোট ছোট পাখি। কিন্তু তাদের বিচিত্র ক্ষমতা। তারা শীতকালে অনেক সময়ে হাজার হাজার মাইল দূর থেকে উড়ে আসে এবং বসন্তের



পরিযায়ী পাখির ঝাঁক

শুরুতে যে পথে তারা এসেছিল সেই পথেই তাদের অত দূরের বাসস্থানে ফিরে যায়। অত্যাশ্চর্য এদের ক্ষমতা। তাদের দিক্ ভুল হয় না।

অদ্ভুত বেশে নৃত্য

নানা দেশের লোকে নানাভাবে নৃত্য করে থাকে। সাধারণতঃ আদিবাসীদের অদ্ভুত বেশে নৃত্য করতে দেখা যায়। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীরা এই ধরনের নৃত্যের জন্য প্রসিদ্ধ।

এখানে যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে দুজন আদিম অধিবাসী অতি অদ্ভুত বেশে নৃত্য করছে। তাদের সারা গা খড় ইত্যাদি দ্বারা আবৃত। তারা সেই সব খড়ের ফাঁক দিয়ে যেটুকু দেখতে পায়, তাই তাদের পক্ষে যথেষ্ট। তারা অদ্ভুত বেশে তাণ্ডব নৃত্য করে। লোক দুটি ব্রাজিলের কারাজা ইণ্ডিয়ানের।



ব্রাজিলের কারাজা ইণ্ডিয়ানদের নৃত্য



ভৌগোলিক আবিষ্কার



নানা দেশ, মহাদেশ, দ্বীপ নিয়ে পৃথিবী। সে-সব স্থান বর্তমানে সকলেরই জানা। অরণ্য, পর্বত, মরুভূমি, সাগর, তুষাররাজ্যে ভরা পৃথিবীর সর্বত্র মানুষ গিয়ে থাকে। এই মানুষ বলতে উন্নত দেশ-সমূহের মানুষকেই বোঝাচ্ছে। উন্নত ধরনের জল-জাহাজ ও উড়োজাহাজে করে সেই সব স্থানে লোকে গিয়েছে এবং সহজে যায়। কিন্তু এমন দিন ছিল, ওই সব স্থান ছিল দুর্গম, দুর্ভেদ্য ও বিপদ-সংকুল। তখনকার দিনে না ছিল উন্নত ধরনের জলযান, না ছিল বিমান। লোকে যেদিন থেকে জানতে পারল, পৃথিবী ছোট নয়, তাতে কত দেশ-মহাদেশ, অরণ্য, পর্বত, সমুদ্র, মরুভূমি আছে, সেই দিন থেকে সেই সব জায়গায় যাবার জন্যে নানা দেশের, বিশেষ করে ইউরোপের লোকেরা চেষ্টা করতে থাকল। এই অসম সাহসিক চেষ্টার জন্যে তাদের অনেককেই মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে, অনেকে অপরিসীম ক্লেশভোগ করেছে।

প্রধানতঃ ইউরোপের নানা দেশের লোকের আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা ও প্রচেষ্টার ফলে পৃথিবীর নানা স্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। একেই বলা হয়েছে ভৌগোলিক আবিষ্কার। লোকে দেশ আবিষ্কার করতে গিয়ে দেখেছে, সব জাগয়াতেই নানা ধরনের মানুষের বাস রয়েছে। তাদের বলা হয় আদিম অধিবাসী। তারা সভ্য জগতের কোন খোঁজই রাখে না। তাদের বাসের জায়গা ছেড়ে কোনদিন অন্য কোথাও যায় না।

॥ আমেরিকা আবিষ্কার ॥

বর্তমানে বিজ্ঞানের কল্যাণে সব দেশ, মহাদেশ ও সেখানকার সব মানুষ যেন এক হয়ে গেছে। সবাই সবাইকে জানে। আমেরিকা মহাদেশের সব দেশের কথা ইউরোপ এশিয়ার লোকেরা বর্তমানে সবাই জানে। সে সব দেশে যাতায়াত খুবই সহজ ও সুগম হয়েছে। কিন্তু আগে আমেরিকা মহাদেশের কথা ইউরোপ-এশিয়ার লোকদের জানা ছিল না। বলা হয়, কলাম্বাস (Christopher Columbus) ও আমেরিগো ভেসপুচি (Amerigo Vespucci, ১৪৫১-১৫১২ খ্রী.) আমেরিকা আবিষ্কার করেন।

কিন্তু খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে চীনারা পালতোলা বড় নৌকো করে আমেরিকায় পৌঁছেছিল বলে জানা গেছে। চীনা নাবিকগণ যে স্থানে যায় তাই হচ্ছে বর্তমান কালিফোর্নিয়া। পেরুর অধিবাসীদের জীবনযাত্রায় চীনাদের প্রভাব নানাভাবে লক্ষ্য করা যায়।

তাছাড়া কলাম্বাস ও আমেরিগো ভেসপুচির অন্ততঃ পঁচিশ বছর আগে ইউরোপের লোকেরা আমেরিকায় যেতে থাকে।

॥ ভাইকিংস ॥

স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ায় অর্থাৎ ডেনমার্ক, সুইডেন ও নরওয়েতে অষ্টম শতাব্দীতে এক শ্রেণীর দুর্ধর্ষ জলদস্যুর আবির্ভাব হয়। তাদের বলা হয় ভাইকিংস (Vikings)-। এই ভাইকিংসরা ছিল অসমসাহসী নাবিক। তারা তাদের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড নৌকোয় করে প্রথমে আইসল্যাণ্ডে, পরে গ্রীনল্যাণ্ডে, তার পরে আমেরিকায় যায়।

৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিয়ার্ন হারজুলফ্‌সন (Bjarne Herjulfsson) নামে এক দুঃসাহসী ভাইকিং জলদস্যু আইসল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করে। সে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারে না। এক জায়গায় গিয়ে সে তার নৌকো বা জাহাজ নোঙ্গর



ভাইকিংস

করে। সে প্রথমে ভেবেছিল, সে গ্রীনল্যাণ্ডে পৌঁছেছে। গ্রীনল্যাণ্ডে সে এর আগে কয়েকবার গিয়েছিল। গ্রীনল্যাণ্ড তার জানা জায়গা। সে পরে বুঝতে পারল, সে যে জায়গায় পৌঁছেছে, সেটা নূতন জায়গা, গ্রীনল্যাণ্ড নয়।

॥ ভিনল্যাণ্ড ॥

নরওয়ের নাবিক এরিক দ্য রেড (Eric the Red)-এর পুত্র লীফ এরিকসন (Leif Ericson



লীফ এরিকসন

বা Ericsson) ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে তার পিতার প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণ গ্রীনল্যাণ্ডের উপনিবেশ থেকে গ্রীনল্যাণ্ডের বাকী অংশ আবিষ্কারের জন্যে সমুদ্র-পথে যাত্রা করে। সে ও তার লোকজন ঝড়ের জন্যে কয়েক সপ্তাহ ধরে সমুদ্রে ঘুরতে বাধ্য হয়। পরে যে জায়গায় অবতরণ করে, তা-ই হচ্ছে বর্তমান কানাডার অন্তর্গত লাব্রাডর। এখানে বহু আঙুর গাছ দেখে এরিকসন এই জায়গার নাম দিয়েছিল Vinland অর্থাৎ আঙুরের দেশ। এরিকসন ও তার লোকেরা কিন্তু বুঝতে পারে নি, তারা নূতন মহাদেশ আবিষ্কার করেছে। ভিনল্যাণ্ডে কয়েক মাস থেকে তারা স্থান ত্যাগ করে।

॥ মেক্সিকোয় ভাইকিংস ॥

এর বছর ছয়েক বাদে ভাইকিং থরফিন কার্ল-সেফ্‌নে (Thorfinn Karlsefne) যেখানে গিয়ে পৌঁছল বর্তমানে তারই নাম মেক্সিকো। তার ইচ্ছা ছিল সেখানে চিরকালের জন্যে বাস করবে। সেই উদ্দেশ্যে কয়েকটি ছাগল ও গরু এবং ১৬০ জন স্ত্রী-পুরুষকে সে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে যে-সব লোক বাস করত, তারা অনবরত প্রচণ্ডভাবে বাধা দিতে থাকে। তার ফলে বহু চেষ্টা করেও তারা টিকে থাকতে পারে নি। বছর তিনেক বাদে তাদের স্থান ত্যাগ করতে হয়।

॥ আমেরিকান ইণ্ডিয়ান ॥

এ থেকেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, আমেরিকা বহু প্রাচীন কালেও জনশূন্য ছিল না। উত্তর আমেরিকান ইণ্ডিয়ান নামে জাতির লোকেরা, চেরোকী (Cherokee), অ্যাপাচি (Apachi) প্রভৃতি বহু জাতি আমেরিকার নানা স্থানে বাস করত।

এই ইণ্ডিয়ানরা সম্ভবতঃ এশিয়া থেকে বিভিন্ন পথ ধরে আমেরিকায় স্থায় ও স্থায়িভাবে বাস করতে থাকে। এ হচ্ছে কলাম্বাস ও আমেরিগো ভেসপুচির আমেরিকায় যাবার বহু শত বৎসর আগের কথা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, ইউরোপের আধুনিক কালের আবিষ্কারকদের বহু আগেই বিভিন্ন জাতির দ্বারা আমেরিকা আবিষ্কৃত হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, পৃথিবীর নানা দেশে, নানা দ্বীপে বহু শত বা সহস্র বৎসর পূর্বে মানুষের বাস ছিল। ইউরোপের বা এশিয়ার ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের লোকদের জানবার বহু আগে থেকে তারা ওই সব স্থানে বাস করে আসছে। মাত্র কয়েক শতাব্দী আগে তাদের দেশ বা তাদের কথা আমরা জানতে পেরেছি।

॥ কলাম্বাস ॥

কলাম্বাসের জন্ম হয় আনুমানিক ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইটালীর অন্তর্গত জেনোয়ায়। তিনি ছিলেন একজন সুদক্ষ নাবিক। বহুবার তিনি সমুদ্রপথে বহু স্থানে গমন করেন। ইউরোপের লোকদের ভারত, ফিলিপিনস্ প্রভৃতি স্থানের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে খুব চড়া দামে বিভিন্ন মসলা কিনতে হত। কলাম্বাস প্রথমে পোর্তুগালের রাজার কাছে ভারতে যাবার সহজ পথ আবিষ্কারের জন্যে যাত্রা করতে জাহাজ ও অর্থসাহায্য চান। তিনি অসম্মত হলে কলাম্বাস স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ (Ferdinand V of Aragon ১৪৫২-১৫১৬ খ্রী.)ও রানী ইজাবেলা



রানী ইজাবেলার দরবারে কলাম্বাস

(Isabella of Castile, ১৪৫১-১৫০৪ খ্রী.)-র কাছে অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। প্রধানতঃ রানী ইজাবেলার আগ্রহে রাজা ফার্দিনান্দ কলাম্বাসকে পিন্টা, নিনা ও সান্টা মারিয়া নামে তিনটি জাহাজ ও প্রায় এক হাজার পাউণ্ড দিয়ে সাহায্য করেন।

কলাম্বাস ১২০ জন লোক ও উপযুক্ত রসদ নিয়ে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। কলাম্বাসের জাহাজ পশ্চিম দিকে যাত্রা করে। পথে একধরনের ভাসমান জলজ উদ্ভিদের মধ্য দিয়ে যেতে তাঁর জাহাজগুলিকে খুবই বেগ পেতে হয়। তিনি এই জলজ উদ্ভিদের নাম দেন সারগাসো (sargasso)। যে জায়গায় ঠেসাঠেসি করে গাছগুলি ছিল তার নাম সারগাসো সাগর।

অকূল সমুদ্রের উপর দিয়ে যেতে যেতে জাহাজের লোকজন হতাশায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা প্রায় তিন মাস কেটে গেলেও ডাঙ্গার দেখা না পেয়ে ঠিক করল, কলাম্বাসের মতো একটা উন্মাদ লোককে খুন করবে। শেষ পর্যন্ত পাখির ঝাঁক, ভাসমান ফুলের গোছা, কাঠ, লাঠি ইত্যাদি দেখে সকলেই বুঝল, কাছেই কোথাও ডাঙা আছে। শেষ পর্যন্ত তারা শান্ত হল।

১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট কলাম্বাস ও তাঁর লোকজনের আকুল প্রতীক্ষা সফল হল। ডাঙার কাছে গিয়ে জাহাজ ভিড়ল। যে জায়গায় কলাম্বাস অবতরণ করলেন, তার নাম ওয়াটলিং (Watling)। এটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (ওয়েস্ট ইণ্ডিজের) বাহামার অন্তর্গত। এখান থেকে তিনি কিউবা, হাইতি ও অন্যান্য দ্বীপে গমন করেন।

হাইতিতে একটা দুর্গ তৈরি করে তাতে কিছু লোকজন রেখে কলাম্বাস স্পেনে ফিরলে বিপুল সংবর্ধনা লাভ করেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, তিনি আমেরিকা আবিষ্কার করেছেন। তিনি তৃতীয়

অভিযানে ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ আমেরিকায় অবতরণ করেন।

কিছু ঈর্ষাপরায়ণ লোকের অভিযোগে কলাম্বাস কিছুকাল কারাগারে বন্দী-জীবন কাটাতে বাধ্য হন। ১৫০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চতুর্থ বার অভিযানে বহির্গত হন কিন্তু রোগগ্রস্ত হয়ে ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৫০৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের ভ্যাল্যাডলিড (Valladolid)-এ একান্ত অবহেলিত ও দীন অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

॥ আমেরিগো ভেসপুচি ॥

আমেরিগো ভেসপুচি ছিলেন একজন ইতালীয় ব্যবসায়ী ও বণিক। তিনি স্পেনের অধিবাসী হন।



আমেরিগো ভেসপুচি

তিনি কয়েকবার আটলান্টিক মহাসমুদ্র অতিক্রম করেন। তাঁর নিজের বর্ণনানুযায়ী তিনি ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই জুন দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিত হন। তাঁর দক্ষিণ আমেরিকায় উপস্থিতি অনেকের দ্বারা সত্য বলে সমর্থিত হয় নি। ১৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে একজন জার্মান ভূবৃত্তকার (Geographer) তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তাঁর মানচিত্রে আমেরিকা নামের উল্লেখ করেন।

॥ জন ক্যাবট ॥

জন ক্যাবট (John Cabot, আনুমানিক ১৪৫৭-১৪৯৮ খ্রী.) ছিলেন ইতালীর অন্তর্গত জেনোয়ার লোক। তিনি ব্রিস্টলের অধিবাসী হন। ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরী (Henry VII, ১৪৫৭-১৫০৯ খ্রী.) জন ক্যাবটকে পশ্চিম দিকে অভিযানে প্রেরণ করেন। ক্যাবট নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড ও নোভা স্কোশিয়া (Nova Scotia) আবিষ্কার করেন। তাঁর ধারণা হয়, স্থান দুটি এশিয়ার অংশ। তিনি সম্ভবতঃ কলাম্বাসের যাওয়ার পূর্বেই আমেরিকায় পৌঁছেন।

॥ সেবাস্টিয়্যান ক্যাবট ॥

সেবাষ্টিয়্যান ক্যাবট (Sebastian Cabot, ১৪৮৩-১৫৫৭ খ্রী.) জন ক্যাবটের পুত্র। তিনি এশিয়ায় যাবার উত্তর-পশ্চিম দিকের সমুদ্রপথ খুঁজতে বার হন। তিনি হাডসন বে পর্যন্ত পৌঁছান। ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক গড়ে তুলতে উত্তর-পূর্ব সমুদ্রপথ খুঁজতে বহির্গত হন। রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক তিনিই গড়ে তোলেন। উত্তর আমেরিকার উপর ইংরেজদের দাবি তাঁর দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ অভিযানকারীদের ভুল ॥

কলাম্বাস যেমন ভারতে পৌঁছতে গিয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পৌছেন এবং ভাবেন, তিনি ভারতেই পৌঁছেছেন তেমন ভুল অনেকেই করেছেন। কৃষ্ণ সাগরের উত্তর ও উত্তর-পূর্বে এবং আরল সাগরের পূর্বে ইউরোপ ও এশিয়ার প্রাচীন অঞ্চল সাইথিয়া নামে পরিচিত। সেখানে পিক্‌টস্ (Picts) নামে



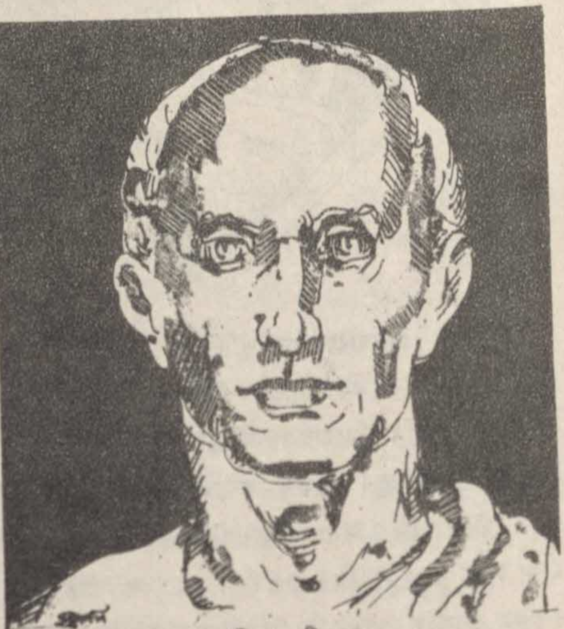
স্কটল্যাণ্ডে পিক্‌টস্ জাতি

এক জাতের লোক ছিল। তারা ইংল্যাণ্ড ভেবে ভুল করে স্কটল্যাণ্ডে উপস্থিত হয়। তারা উত্তর-পূর্ব স্কটল্যাণ্ডে বসতি স্থাপন করে। নবম শতাব্দীতে আরগিল (Argyill)-এ স্কট্‌রা পরাজিত হয়। পরে পিক্‌ট্‌স্ ও স্কটেরা সম্মিলিত ভাবে রাজত্ব গড়ে তোলে।

ফরাসী অভিযাত্রী লা-সাল (La Salle, ১৬৪৩-১৬৮৭ খ্রী.) এমনই ভুল করে বসেন। তিনি কানাডার সেন্ট লরেন্স নদী দিয়ে যাবার সময় একটা জলপ্রপাত দেখে ভাবেন, তার ওপারেই চীন দেশ। সেই কথা ভেবেই জলপ্রপাতটির নাম দেন লাশিন র‍্যাপিড্‌স (Lachine Rapids) অর্থাৎ চীন জলপ্রপাত। দেশে ফিরে গিয়ে সেই কথা সবিস্তারে দেশবাসীদের জানান।

॥ এস্কিমো ॥

রোমক সেনাপতি জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar, ১০০-৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ৫৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করেন। তার হাজার বছর আগে এস্কিমোরা সুমেরু অঞ্চলের তুষাররাজ্যে গিয়ে বসতি স্থাপন করে। চিরকাল তারা তুষাররাজ্যের অধিবাসী ছিল না। আগে তারা শ্যামল গাছপালা ভরা কতকটা উষ্ণ দেশে বাস করত। স্বাধীনভাবে



জুলিয়াস সীজার

বাস করার জন্যে তারা উত্তরমেরু প্রদেশের তুষারাবৃত ভূ-ভাগে বাস করতে থাকে।

॥ ফিনিশিয়দের অভিযান ॥

ফিনিশিয়রা সেমিতিক জাতির লোক। তারা খুব সাহসী ও বাণিজ্য সম্বন্ধে অভিজ্ঞ নাবিক ছিল। তারা ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বর্তমান ইজরায়েল ও লেবাননের পশ্চিম উপকূলে বাস করতে থাকে। তারা আফ্রিকার উত্তরাংশে, স্পেন, সিসিলি ও ইতালীর দক্ষিণ উপকূলে বাণিজ্য করতে যেত। ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তারা উত্তর আফ্রিকায় কার্থেজ নামে এক উপনিবেশ গড়ে তোলে। তারা ইংল্যাণ্ডে গিয়েছিল। লোহিত সাগর হয়ে ও উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে তারা আফ্রিকা মহাদেশের পূর্ব উপকূল পর্যন্ত গিয়েছিল।



॥ মিশরীয়দের অভিযান ॥

মিশরীয়গণ ভূমধ্যসাগরের অপর পারে বাণিজ্য করতে গিয়েছিল। ক্রীট দ্বীপ গ্রীস থেকে ৪৮ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত ভূমধ্যসাগরের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপে বাণিজ্য করতে গিয়ে মিশরীয়গণ সেখানে এক সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

॥ মার্কো পোলো ॥

বিখ্যাত ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo, ১২৫৬-১৩২৩ খ্রী.) মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে ১২৭১ খ্রীষ্টাব্দে তার বাবা ও কাকার সঙ্গে চীনদেশে যাবার জন্যে বেরিয়ে পড়েন। তাঁরা হাঁটা পথে মরুভূমি, অরণ্য, পর্বত অতিক্রম করে পারস্য, পশ্চিম এশিয়া ও ভারতের মধ্য দিয়ে চীনে গিয়ে পৌছান। তখন চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র কুবলাই খাঁ চীনের সম্রাট্। মার্কো পোলো সম্রাট্ কর্তৃক সাদরে সংবর্ধিত হন ও বহু কাজের ভার প্রাপ্ত হন। তিনি চীনা ভাষা শিক্ষা করেন। সম্রাট্ তাঁকে ভারত, কোচিন চায়না প্রভৃতি দেশে দূত হিসাবে প্রেরণ করেন। মার্কো পোলো ১২৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালীতে ফিরে যান। তাঁর ভ্রমণকাহিনী বিস্ময়কর কাহিনীতে পূর্ণ এবং সে সবের অধিকাংশই সত্য।

॥ ইবন বাতুতা ॥

ইবন বাতুতা প্রাচীন কালের একজন প্রসিদ্ধ পর্যটক (১৩০৪-১৩৭৮ খ্রী.)। আফ্রিকার মরক্কোতে তাঁর জন্ম হয়। তিনি আরব, মেসোপটেমিয়া, আফ্রিকার নানা স্থান, এশিয়া মাইনর, বোখারা, সুমাত্রা, ভারত ও চীনদেশে পর্যটন করেন। মহম্মদ তোগলকের আমলে (রাজত্বকাল ১৩২৫-১৩৫১ খ্রী.) ভারতে আসেন ও প্রায় আট বৎসর কাজীর কাজ করেন। 'সফরনামা' নামক ভ্রমণবৃত্তান্তে তিনি তাঁর ভ্রমণকাহিনী সম্বন্ধে নানা গুরুত্বপূর্ণ ও বিস্ময়কর বর্ণনা দিয়েছেন।



॥ হেনরী দ্য নেভিগেটর ॥

পোর্তুগালের ১ম জনের পুত্র প্রিন্স হেনরী "দ্য নেভিগেটর" ম্যাডিরা (Madeira) ও দি আজোর্স (the Azores) আবিষ্কার করেন। তাঁর কাছ থেকে প্রেরণা পেয়ে পোর্তুগিজ নাবিকেরা নানা দিকে অভিযান চালায়।

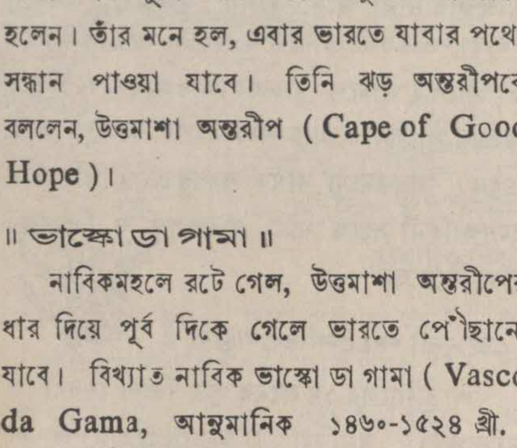
॥ বারথলোমিউ ॥

সেকালের সুদক্ষ পোর্তুগিজ নাবিক ডিয়াস বারথলোমিউ (Dias Bartholomeu, আনুমানিক ১৪৫০-১৫০০ খ্রী.) ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসার জন্য বহির্গত হন। তখনকার দিনে আরব দেশের ব্যবসায়ীরা ইউরোপের নানা দেশে ভারত ও অন্যান্য প্রাচ্য দেশ থেকে জিনিস আমদানি করত। স্বভাবতঃই তারা বেশী দাম নিত। কাজেই পোর্তুগাল, স্পেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, ইতালী, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোক জলপথে গিয়ে প্রাচ্যের দেশগুলিতে পৌছে সরাসরি নিজেরাই মালপত্র

বিশেষ করে মসলা কিনতে আগ্রহান্বিত হল। সেইজন্যে প্রাচ্য দেশসমূহে যাবার জলপথ আবিষ্কারের জন্য সচেষ্ট হল। বারথলোমিউ সেই উদ্দেশ্যে জলপথে বেরিয়ে পড়লেন। কিন্তু আফ্রিকার সর্বদক্ষিণ প্রান্তে পেঁাছে প্রচণ্ড ঝড়ের মুখে পড়লেন। তিনি সেই জায়গাকে ঝড় অন্তরীপ নাম দিলেন ও দেশে ফিরে গেলেন। পোর্তুগালের রাজা তাঁর মুখে সব শুনে খুবই আশান্বিত হলেন। তাঁর মনে হল, এবার ভারতে যাবার পথের সন্ধান পাওয়া যাবে। তিনি ঝড় অন্তরীপকে বললেন, উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope)।

॥ ভাস্কো ডা গামা ॥

নাবিকমহলে রটে গেল, উত্তমাশা অন্তরীপের ধার দিয়ে পূর্ব দিকে গেলে ভারতে পেঁাছানো যাবে। বিখ্যাত নাবিক ভাস্কো ডা গামা (Vasco da Gama, আনুমানিক ১৪৬০-১৫২৪ খ্রী.) ১৪৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে ভারতে যাবার জন্য বহির্গত হন। তাঁর



ভাস্কো ডা গামা

জাহাজে বারথলোমিউ ডিয়াসও ছিলেন। তবে তিনি ছিলেন দলপতি। তাঁর জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপের ধার দিয়ে পূর্বদিকে যাত্রা করে ৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কালিকটে (বর্তমান কোঝিকোড়ে) পৌঁছেন ও বহু দামী দামী উপহার দিয়ে কালিকটের জামোরিন উপাধিধারী রাজার কাছ থেকে ভারতে ব্যবসায় করার জন্যে সনন্দপত্র আদায় করেন ও দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পরে ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে কালিকটে উপনিবেশ স্থাপন করেন।

॥ ম্যাজেলান ॥

ফার্ডিন্যাণ্ড ম্যাজেলান বা ম্যাগেলান (Ferdinand Magellan, ১৪৮০-১৫৫১ খ্রী.) ছিলেন একজন বিখ্যাত নাবিক। তিনি পোর্তুগিজ হলেও স্পেনের বাসিন্দা ছিলেন। স্পেনের রাজা পঞ্চম চার্লসের সাহায্যে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দে ১০শে সেপ্টেম্বর নূতন দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সমুদ্রযাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে ছিল পাঁচটি জাহাজ ও ২৭০ জন খালাসী। তিন বছর বারো দিন ধরে তিনি পৃথিবী পরিক্রমা করলেন। ম্যাজেলান ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে সেখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হলেন। তাঁর পাঁচটি জাহাজের মধ্যে মাত্র ১টি জাহাজ ও ২৭০ জন খালাসীর মধ্যে ১৮ জন খালাসী দেশে ফিরে এল। আর সব জাহাজ ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, লোকজন মারা গিয়েছিল।

॥ ফ্রান্সিস ড্রেক ॥

ফ্রান্সিস ড্রেক (Francis Drake, আনুমানিক ১৫৪০-১৫৯৬ খ্রী.) রানী এলিজাবেথের সময়কার ইংরেজ নাবিক ও অভিযাত্রী। তিনি ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেশ আবিষ্কার ও লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে পৃথিবী পরিক্রমায় বহির্গত হন। তিন বৎসর তিনি সমুদ্রে ঘোরাফেরা করেন। তিনি ম্যাজেলান প্রণালী দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার সর্ব দক্ষিণ প্রান্ত কেপ হর্ন (Cape Horn) পার হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়েন। দক্ষিণ আমেরিকা যে



শিশুসন্তানসহ এস্কিমো

পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে প্রচণ্ড শীত। নদী, সাগর প্রভৃতির জল সেই দারুণ শীতে জমে বরফ হয়ে যায়। শীতকালে বরফ গলে না। গ্রীষ্মকালে বরফ গলে। কিন্তু বহু স্থানে গরমের সময়েও বরফ গলে জল হয়ে যায় না। উত্তর মেরুপ্রদেশের কাছাকাছি জায়গায় কিছু কিছু মানুষ বাস করে। গ্রীনল্যাণ্ড বিরাট দ্বীপ। কিন্তু সেখানে ও অন্যান্য স্থানে মুষ্টিমেয় লোকের বাস। সাধারণতঃ এস্কিমোরা সেই দুঃসহ শীতের দেশে বাস করে।

পূর্বপৃষ্ঠায় যে ছবিটি দেওয়া হয়েছে, তাতে দেখা যাচ্ছে, এস্কিমো জননী সুবেশে হাসিমাখা মুখে তার শিশুকন্যাকে পিঠে নিয়ে রয়েছে। এরা সাইবীরিয়া থেকে প্রায় ৬৫ কিলোমিটার দূরে সেণ্ট লরেন্স দ্বীপের অন্তর্গত গ্যামবেলের বাসিন্দা। আলাস্কা থেকে বছরে একবার আলাস্কা নেটিভ সার্ভিসের জাহাজ সেখানে যায়।

দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত নয়, তা তিনিই প্রমাণ করেন। তিনি প্রাচ্য দেশে যাবার নর্থ ওয়েস্ট প্যাসেজ (North West Passage) বার করতে চেয়েছিলেন। তা আর হয়ে ওঠে নি। অশান্ত নাবিকদের জেদাজেদিতে ইংল্যাণ্ডে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

॥ হামফ্রে গিলবার্ট ॥

স্যার হামফ্রে গিলবার্ট (Sir Humphrey Gilbert, ১৫৩৯-১৫৮৩ খ্রী.) রানী এলিজাবেথের সময়কার একজন ইংরেজ নাবিক। তিনি নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন ও সেটিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। দেশে ফেরার পথে তাঁর স্কুইরল (Squirrel) নামক জাহাজ জলমগ্ন হয়।

॥ ওয়াল্টার র‍্যালে ॥

স্যার ওয়াল্টার র‍্যালে (Sir Walter Raleigh, ১৫৫২-১৬১৮ খ্রী.) ছিলেন রানী এলিজাবেথের সময়কার একজন বিখ্যাত লেখক ও আবিষ্কারক। তিনি ১৫৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ভার্জিনিয়ায় ব্রিটিশ উপনিবেশ স্থাপন করেন। তিনি ১ম জেমসের আমলে স্বর্ণ আবিষ্কারের জন্যে অভিযান করেন; কিন্তু ব্যর্থ হন। দেশে প্রত্যাবর্তন করলে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

॥ স্পেনের উদ্যম ॥

স্পেন, পোর্তুগাল, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশসমূহ অনাবিষ্কৃত দেশ ও দ্বীপসমূহ আবিষ্কার করে সেই সব স্থান নিজ নিজ অধিকারে রাখবার চেষ্টা করতে লাগল। স্পেন প্রথম দিকে সব চেয়ে বেশী উদ্যমী হয়। ১৫১৩ খ্রীষ্টাব্দে জুয়ান পন্‌স্ দ্য লিওঁ (Juan Ponce de Leon) ফ্লোরিডা আবিষ্কার করলেন। ভাস্কো নুনেজ দ্য বালবোয়া (Vasco Nunez de Balboa, ১৪৭৫-১৫১৭ খ্রী.) পানামার অন্তর্গত ড্যারিয়েন যোজক আবিষ্কার করলেন।

হারন্যাণ্ডো কর্টেজ (Hernand› Cortes বা, Cortez ১৪৯৮-১৫৪৭ খ্রী.) মেক্সিকো আবিষ্কার করে, সেখানকার উন্নত সভ্যতার অধিকারী অ্যাজটেকদের পরাভূত করে সেখানে স্পেনের অধিকার কায়েম করেন। দশ বৎসর মেক্সিকো স্পেনের শাসনাধীন থাকে।

॥ দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের আধিপত্য বিস্তার ॥

ফ্রান্সিস্কো পিজারো (Francisco Pizarro,



পিজারো

আনুমানিক ১৪৭৮-১৫৪১ খ্রী.) দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে গিয়ে হাজির হলেন। তখন পেরু ইন্‌কাদের রাজ্য। ইন্‌কা ছিল সে যুগে সভ্য ও শিক্ষিত। বিশ্বাসঘাতকতা করে পিজারো পেরুর সম্রাট্ আতাহু আলপাকে বন্দী করে বধ করলেন। তারপর ইন্‌কা সভ্যতা বিনষ্ট করে সেখানে স্পেনীয় অধিকার স্থাপন করলেন। এইভাবে স্পেন দক্ষিণ আমেরিকার নানা দেশে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে থাকল।

॥ ফরাসী অভিযাত্রী কার্টিয়ে ॥

স্পেনের দেশ অধিকার ও উপনিবেশ স্থাপনের কথা শুনে ইউরোপের নানা দেশে সাড়া পড়ে গেল। ফ্রান্স চুপ করে বসে রইল না। দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অভিযানকারীকে পাঠাতে থাকল। ফরাসী নাবিক ও অভিযাত্রী জ্যাক কার্টিয়ে (Jacques Cartier, ১৪৯১-১৫৫৭ খ্রী.) তিনবার সমুদ্রযাত্রা করেন। তিনি সেণ্ট লরেন্স উপসাগর ও নদী আবিষ্কার করেন।

॥ হেনরী হাডসন ॥

হেনরী হাডসন (Henry Hudson, আনুমানিক ১৫৫০-১৬২১ খ্রী.) একজন অসমসাহসী ইংরেজ নাবিক। তিনি সমুদ্রযাত্রা করে যেসব নদী,



হেনরী হাডসনের সমুদ্রযাত্রা

উপসাগর ও প্রণালী আবিষ্কার করেন সে-সবের নাম হাডসন নদী, হাডসন উপসাগর ও হাডসন প্রণালী। তিনি যে জাহাজে করে অভিযান করেন, তার নাম হারপুন। হাডসন উপসাগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার ॥

অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে ইংরেজদের অধীন। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দ্বীপ প্রায় মহাদেশতুল্য দেশ অস্ট্রেলিয়ায় প্রথম কোন্ ইউরোপীয় জাতির নাবিক উপস্থিত হয়, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। পোর্তুগিজ নাবিকেরা ১৫২৪ খ্রী. থেকে ১৫৪২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ায় উপস্থিত হয়। কারো কারো মতে ফরাসী নাবিক বিনোৎস্থ গোনেভিল (Binot del Gonnaville) বলেন, তিনি অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছেছিলেন। কেউ কেউ বলেন, তিনি মাদাগাস্কার (মালাগাসি) অতিক্রম করে আর অগ্রসর হন নি।

পেরু থেকে অ্যালভারো মেণ্ডানা দ্য নেয়রা (Alvaro Mendana de Neyra) সমুদ্রপথে নূতন নূতন দ্বীপের সন্ধানে বহির্গত হন। তিনি সলোমন দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছেন।

স্পেনীয় নাবিক সলোমন দ্বীপপুঞ্জে যাবার জন্যে বহির্গত হয়ে মার্কুয়েসাস (Marquesas) দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

পেড্রো ফার্নাণ্ডেজ কুইরোস (Pedro Fernandeg Quiros) নামে স্পেনীয় অভিযাত্রী নিউ হেব্রাইডিস দ্বীপ আবিষ্কার করেন। কুইরোসের এক সহকারী অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন। তাঁর নাম লুই ভেইজ দ্য টরেস (Louis Vaez de Torres)।

এরপ্রায় দশ বছর বাদে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন ওলন্দাজ জলদস্যু অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূলে পৌঁছেন। ১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্যাপ্টেন ভ্লামিং নামে একজন ওলন্দাজ সেখানে পৌঁছেন। তারপর প্রায় একশ বছর ধরে নানা দেশের জলদস্যু ও নাবিকরা

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পদার্পণ করে। তাদের মধ্যে অনেকেই আদিম অধিবাসীদের আক্রমণে নিহত হয়।

॥ আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক ॥

এর পর শুরু হল ইংরেজদের অভিযান। ইংরেজ জলদস্যু ও নাবিক উইলিয়াম ড্যাম্পিয়ের (Willam Dampier, ১৬৫২-১৭১৫ খ্রী.) অস্ট্রেলিয়ায় এসে পৌঁছলেন। এর প্রায় এগার বছর বাদে তিনি সমুদ্রপথে অভিযানে বেরোলেন। তাঁর জাহাজে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক (Alexander Selkirk, ১৬৭৬-১৭২১ খ্রী.) নামে এক নাবিক ছিলেন। ড্যাম্পিয়ের অশিষ্ট আচরণের জন্য বিরক্ত হয়ে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে সেলকার্ককে জুয়ান ফার্ণাণ্ডেজ (Juan Fernandes) নামে জনহীন অরণ্যপর্বতময় দ্বীপে নামিয়ে দিয়ে যান। সেখানে সম্পূর্ণ একা সেলকার্ককে চার বৎসর থাকতে হয়। তাঁর কথা নিয়েই ড্যানিয়েল ডিফো (Daniel Defoe, ১৬৬০-১৭৩১ খ্রী.) প্রায় ষাট বৎসর বয়সে রবিনসন ক্রুশো (Robison Crusoe) নামে গল্পের বই লেখেন।

॥ জেম্স্ কুক্ ॥

দুঃসাহসী ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন জেম্স্ কুক্ (Captain James Cook, ১৭২৮-১৭৭৯ খ্রী.) Endeavour, Resolution ও Adventure নামে তিনটি জাহাজ নিয়ে সমুদ্র অভিযানে বহির্গত হন। তিনি অস্ট্রেলিয়ার বহু অংশ আবিষ্কার করেন ও অস্ট্রেলিয়া যে ফলফুলে ভরা এক রমণীয় স্থান তা জানান। তিনি যে অঞ্চলে অবতরণ করেন তার নাম দেন নিউ সাউথ ওয়েলস (New South Wales)। কুক্ লেবুর জল ও টাটকা সবজি খাইয়ে নাবিকদের স্কার্ভি রোগ থেকে বাঁচান। তিনি প্রশান্ত মহাসাগর ও অ্যাণ্টার্কাটিকা সম্বন্ধে বহু



জেম্স্ কুক্

তথ্য সংগ্রহ করেন। হাওয়াই দ্বীপে তিনি সেখানকার আদিম আধিবাসীদের দ্বারা নিহত হন।

॥ অন্ধকার মহাদেশ আফ্রিকা ॥

এতদিন ধরে উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউ জীল্যাণ্ড, প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলাণ্টিক মহাসাগরের বহু দ্বীপ ইত্যাদিতে ইউরোপের স্পেন, পোর্তুগাল, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোকেরা উপস্থিত হয় ও সেই সব স্থানে নিজ নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু আফ্রিকা মহাদেশ সম্বন্ধে কোন তথ্য সংগ্রহ করে নি। আফ্রিকার উত্তর উপকূল ছাড়া ভিতরের দেশসমূহের কোন তথ্য ইউরোপের লোকেদের জানা ছিল না। সেইজন্যে আফ্রিকা মহাদেশকে বলা হত অন্ধকার মহাদেশ, অজানা মহাদেশ (Dark Continent)। স্পেন, পোর্তুগাল, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশের লোক আফ্রিকা মহাদেশে যেতে শুরু করল। তারা প্রধানতঃ ক্রীতদাস সংগ্রহের জন্যে আফ্রিকায় যেত। কিছু কিছু খ্রীষ্টান ধর্মযাজক ধর্মপ্রচারের

উদ্দেশ্যে আফ্রিকায় যেতে থাকেন। ক্রীতদাস ব্যবসায়ীরা শুধু ক্রীতদাস সংগ্রহ করার মতো জঘন্য কার্যে লিপ্ত ছিল না, তারা আয়না, নানারকমের খেলনা, পুঁতির মালা, চিনি, নুন, রঙ্গিন কাপড় প্রভৃতি দিয়ে আফ্রিকাবাসীদের কাছ থেকে সোনা, হীরে, জহরত প্রভৃতি আদায় করত।

॥ জেম্স্ ব্রুস ॥

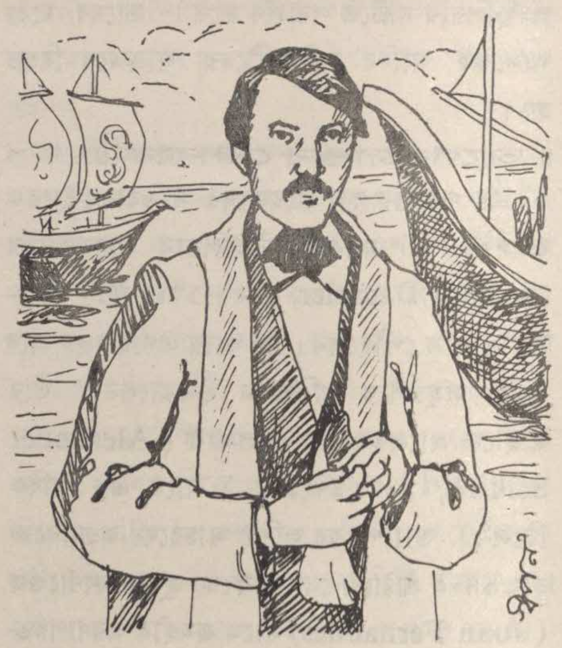
জেম্স্ ব্রুস (**James Bruce,** ১৭৩০-১৭৯৪ খ্রী.) স্কটল্যাণ্ডের নামে একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী আবিসিনিয়ায় গেলেন। তিনি নীল নদের একটি শাখা **The Blue Nile**-এর উৎপত্তি-স্থান আবিষ্কার করেন। চার বৎসর ধরে অভিযান চালিয়ে ব্রুস বহু অজানা তথ্য আবিষ্কার করেন।

॥ মাঙ্গো পার্ক ॥

মাঙ্গো পার্ক (**Mungo Park,** ১৭৭১-১৮০৬ খ্রী.) ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের একজন দুঃসাহসী অভিযাত্রী। তিনি নাইজার নদীর উৎসস্থল আবিষ্কার করেন। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে একজন ইউরোপীয় দাস-ব্যবসায়ী তাঁকে জাহাজে করে নিয়ে যায়। তিনি বাড়িতে ফিরে কিছু কাল পরে আবার আফ্রিকায় যান ও নাইজার নদীর ধারে প্রাণত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর কারণ জানা যায় নি। তাঁর লেখা প্রসিদ্ধ বই **Travels in the Interior of Africa** বহু অজানা তথ্যে পূর্ণ।

॥ ডেভিড লিভিংস্টোন ॥

ডেভিড লিভিংস্টোন (**David Livingstone,** ১৮১৩-১৮৭৩ খ্রী.) ছিলেন একজন স্কটিশ ধর্ম-প্রচারক ও আবিষ্কারক। তিনি জাম্বেজী নদীর গতিপথ, ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত ও নায়াগ্রা হ্রদ আবিষ্কার করেন। তিনি আফ্রিকাবাসীদের মধ্যে



লিভিংস্টোন

খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন। তিনি বহু কষ্ট করে কঙ্গো নদীর অববাহিকা আবিষ্কার করেন। তিনি বার বার আফ্রিকায় অভিযানে যান। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের কাছে উজিজি (**Ujiji**)-তে হেনরী মর্টন স্ট্যানলী তাঁকে জ্বরে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করেন। লিভিংস্টোন ক্রীতদাস-প্রথার নৃশংসতা সম্বন্ধে সভ্য জগৎকে অবহিত করেন। আফ্রিকাতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ হেনরী মর্টন স্ট্যানলি ॥

হেনরী মর্টন স্ট্যানলি (**Henry Morton Stanley,** ১৮৪১-১৯০৪ খ্রী. ছিলেন একজন ইংরেজ আবিষ্কারক। তিনি উজিজিতে লিভিংস্টোনকে উদ্ধার করেন। লিভিংস্টোন সুস্থ হলে দুজনে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের উত্তরাংশ আবিষ্কার করেন। স্ট্যানলি তাঁর দ্বিতীয় অভিযানে এমিন পাশাকে উদ্ধার করেন। তিনি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন কঙ্গো রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর লেখা বই **'I Found**

Livingstone', 'Through the Dark Continent', 'In Darkest Africa' ও 'An Autobiography' সুপ্রসিদ্ধ।

॥ এমিল পাশা ॥

এমিল পাশার প্রকৃত নাম এডওয়ার্ড শ্নিৎসার (Edward Schnitser)। তিনি সাইলিসিয়ার অধিবাসী ও জাতিতে ইহুদি ছিলেন। কিন্তু তিনি তুর্কীদের ধর্ম গ্রহণ করেন ও এমিল পাশা নাম গ্রহণ করেন। দাসব্যবসায়ীরা তাঁর ঘোরতর শত্রু ছিল। স্ট্যানলি তাঁকে তাদের কবল থেকে উদ্ধার করার পর তিন বৎসর বাদে ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে দাস ব্যবসায়ীদের দ্বারাই এমিল পাশা নিহত হন।

॥ ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদ আবিষ্কার ॥

স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস বার্টন (Sir Richard Francis Burton, ১৮২১-১৮৯০ খ্রী.) ও ক্যাপ্টেন জন হ্যানিং স্পেক (Captain John Hanning Speke, ১৮১৭-১৮৬৪ খ্রী.) ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদ আবিষ্কার করেন। স্পেক ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া নিয়ান্জা হ্রদ আবিষ্কার করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ও জেম্স্ অগাস্টাস গ্র্যান্ট (James Augustus Grant) ভিক্টোরিয়া নিয়ান্জা যে নীলনদের উৎস তা আবিষ্কার করেন।

॥ মার্টিন ফ্রবিশার ॥

ইংরেজ নাবিক মার্টিন ফ্রবিশার (Martin Frobisher, ১৫৩৫-১৫৯৪ খ্রী.) প্রাচ্য দেশে, বিশেষ করে ভারতে আসবার উত্তর-পশ্চিমের পথ (North-West Passage) আবিষ্কারের চেষ্টা করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তিনি চীন দেশে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উত্তর কানাডার বেফিন দ্বীপের নিকটে পৌছেন। তিনি যে উপসাগর আবিষ্কার করেন তার নাম ফ্রবিশার বে (Frobisher Bay)।



মার্টিন ফ্রবিশার

॥ জন ডেভিস ॥

জন ডেভিস (John Davis, আনুমানিক ১৫৫০-১৬০৫ খ্রী.) রানী এলিজাবেথের সময়কার একজন অসমসাহসী নাবিক। তিনবার সমুদ্র-অভিযান করেন। গ্রীনল্যাণ্ডের কাছের যে প্রণালী তাঁর দ্বারা আবিষ্কৃত হয়, তার নাম ডেভিস প্রণালী (Davis Strait)। তিনি আদিম অধিবাসীদের দ্বারা নিহত হন।

॥ উইলিয়াম ব্যারেন্ট্স্ ॥

ওলন্দাজ নাবিক ও আবিষ্কারক উইলিয়াম ব্যারেন্ট্স্ (William Barents, মৃত্যু ১৫৯৭ খ্রী.) সমুদ্রপথে উত্তর-পশ্চিমের পথ (North-West Passage) আবিষ্কারের জন্যে তিনবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সফল হতে পারেন নি। তাঁর নামানুযায়ী নোভায়া জেম্লিয়ার উত্তরাংশকে 'ব্যারেন্ট্স্ ল্যাণ্ড' এবং উত্তর মেরু সাগরের একাংশকে 'ব্যারেন্ট্স্ সী' বলা হয়। তিনি প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় মারা যান, বাড়ি ফিরতে পারেন নি।

॥ উইলিয়াম বেফিন ॥

উইলিয়াম বেফিন (William Baffin, ১৫৮৪-১৬২২ খ্রী.) নামে একজন ইংরেজ নাবিক সমুদ্র অভিযানে বেরিয়ে ১৬১৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূল ও গ্রীনল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী যে উপসাগর আবিষ্কার করেন, তারই নাম বেফিন উপসাগর (Baffin Bay)। বেফিন ল্যাণ্ড (Baffin Land)-ও তাঁরই দ্বারা আবিষ্কৃত। তিনি চীনে যাবার জন্যে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। কিন্তু পারস্য উপসাগরে মারা যান।

॥ ভাইটাস বেরিং ॥

ডেনমার্কের প্রসিদ্ধ নাবিক ও আবিষ্কারক ভাইটাস বেরিং (Vitus Bering, ১৬৮০-১৭৪১ খ্রী.) রাশিয়ার নৌবিভাগে চাকরি করতেন। রুশ সরকার তাঁকে এশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে কোন প্রণালী আছে কিনা তার সন্ধানে প্রেরণ করেন। বেরিং বহু লোকজন, ঘোড়া, রসদ নিয়ে অভিযানে বহির্গত হন। প্রথম অভিযানে তাঁর উদ্দেশ্য সফল হয় না। তিনি ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় অভিযানে বহির্গত হন। তিনি আমেরিকার উপকূলে পৌঁছতে সমর্থ হন। কিন্তু অসুস্থ হয়ে এক নির্জন দ্বীপে তাঁবু খাটিয়ে থাকলেন। সেখানেই তিনি মারা যান। এই দ্বীপের নাম রাখা হয়েছে বেরিং দ্বীপ। তাঁর আবিষ্কৃত প্রণালীর নাম বেরিং প্রণালী। এই প্রণালী এশিয়ার সোভিয়েট রাষ্ট্র ও আমেরিকার আলাস্কার মধ্যে অবস্থিত।

॥ উত্তর-পশ্চিমের পথের সন্ধানে অভিযান ॥

স্যার জন রস (Sir John Ross, ১৭৭৭-১৮৫৬ খ্রী.), তাঁর ভাইপো স্যার জেমস ক্লার্ক রস (Sir James Clark Ross, ১৮০০-১৮৬২ খ্রী.) এবং স্যার উইলিয়াম এডওয়ার্ড প্যারি (Sir



প্যারি

William Edward Parry, ১৭৯০-১৮৫৫ খ্রী.) তিনজন অসমসাহসী নাবিক ও আবিষ্কারক। তাঁরা ব্রিটিশ সরকারের ঘোষিত ২৫ হাজার পাউণ্ড পুরস্কার পাবার জন্যে উত্তর মেরুর পথে ৮৯ ডিগ্রী অক্ষাংশ অতিক্রম করার উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। বহু চেষ্টা ও অপরিসীম কষ্ট করেও তাঁরা কৃতকার্য হতে পারলেন না। স্যার জন রস উত্তর মেরুর পথে কয়েকবার অভিযান চালান, উত্তর-পশ্চিমের পথের সন্ধান করেন। তিনি বোথনিয়া উপদ্বীপ আবিষ্কার করেন।

॥ ম্যাগ্‌নেটিক পোলে জেম্‌স্‌ ক্লার্ক ॥

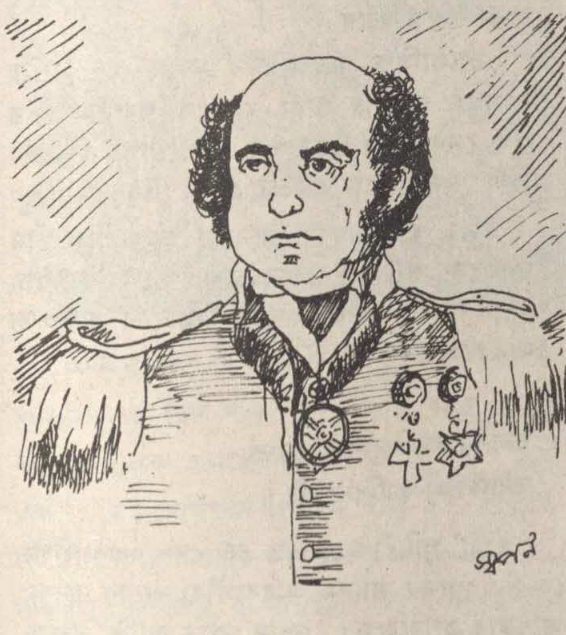
স্যার জেম্‌স্‌ ক্লার্ক ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ম্যাগ্‌নেটিক পোলে পৌঁছেন। তিনি ১৮৩৯-৪৩ সালে এরেবাস ও টেরর জাহাজে করে দক্ষিণ মেরু অভিযানে বহির্গত হন। তিনি ভিক্টোরিয়া ল্যাণ্ড, মাউন্ট এরেবাস ও টেরর এবং রস আইস ব্যারিয়ার আবিষ্কার করেন।

উইলিয়াম এডওয়ার্ড প্যারি মেরুপ্রদেশে

অভিযান চালান এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করেন।

॥ জন ফ্রাঙ্কলিন ॥

স্যার জন ফ্রাঙ্কলিন (Sir John Franklin, ১৭৮৬-১৮৪৭ খ্রী.) একজন ইংরেজ আবিষ্কারক।



জন ফ্রাঙ্কলিন

তিনি কয়েকবার সমুদ্রে অভিযান করেন। তিনি ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এরেবাস ও টেরর জাহাজে ১৩৪ জন লোক নিয়ে উত্তর মেরু প্রদেশের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু বেরিং প্রণালীর দিকে যেতে পথেই তাঁর ও তাঁর দলের সকলেই মারা যান।

॥ উত্তর-পুবের পথ আবিষ্কার ॥

অ্যাডল্‌ফ্ এরিক নর্ডেনশিল্ড (Adolf Erik Nordenskjold, ১৮৩২-১৯০১ খ্রী.) একজন অত্যুৎসাহী মেরু অভিযাত্রী। তিনি ১৮৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বেরিং প্রণালীর মধ্য দিয়ে জাহাজ চালিয়ে উত্তর-পুবের পথ আবিষ্কার করেন। তিনি জাপানের ইয়োকোহামাতে পৌঁছতে সমর্থ হন।

রোয়াল্ড আমানসেন একজন রীতিমতো কষ্ট-সহিষ্ণু অসমসাহসিক মেরু অভিযাত্রী (তাঁর কথা 'মেরু অভিযান' অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য)। তিনি ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর-পশ্চিমের পথ আবিষ্কার করেন।

॥ অস্ট্রেলিয়া ॥

অস্ট্রেলিয়া (Australia) পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ দ্বীপ। এর আয়তন ৭৬,৮২,৩০০ বর্গ কিলোমিটার। কেউ কেউ বিষুবরেখার দক্ষিণে অবস্থিত এই বিরাট দ্বীপকে মহাদেশ বলে থাকেন। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যাণ্ডের অধীন উপনিবেশ। পৃথিবীর সব দ্বীপ ও দেশ যেমন আদিম অধিবাসীতে ভরা ছিল, অস্ট্রেলিয়াতেও তেমনি আদিম অধিবাসীরা বাস করত। বহু কাল ইউরোপের কোন দেশের লোক এই দেশের সন্ধান জানত না। পোর্তুগিজ, স্পেনীয়, ওলন্দাজ, ইংরেজ প্রভৃতি নাবিকরা বিভিন্ন সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় যায়। তবে প্রকৃত পক্ষে অস্ট্রেলিয়ার আবিষ্কর্তা ক্যাপ্টেন জেম্‌স্ কুক। তিনি ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে এনডেভার নামক জাহাজে করে সিড্‌নি শহরের কাছে অবতরণ করেন।

গ্রেগরী ব্ল্যাক্সল্যাণ্ড (Gregory Blaxland), জন অক্সলি (John Oxley), অ্যালান কানিংহাম (Allan Cunningham), ক্যাপ্টেন চার্লস স্টার্ট, এডওয়ার্ড জন আয়ার (Edward John Eyre, ১৮১৫-১৯০১ খ্রী.), লাড্‌উইগ লিক্‌হার্ড Ludwig Leichhardt), জন ম্যাকড্যুয়াল, স্ট্য়ার্ট, জ্যাকি জ্যাকি, রবার্ট ও' হারা বার্ক (Robert O' Hara Burke, ১৮২০-১৮৬০ খ্রী.), উইলিয়াম জন উইলস, গ্রে, কিং প্রভৃতি অসংখ্য নাবিক অভিযাত্রী, আবিষ্কারক ও ধর্মযাজকদের বহু বৎসরব্যাপী অক্লান্ত প্রয়াসে অস্ট্রেলিয়ার সকল স্থান আবিষ্কৃত হয়।

॥ অস্ট্রেলিয়ায় ইংরেজের উপনিবেশ স্থাপন ॥

ইংরেজরা অস্ট্রেলিয়া অধিকার করে ১৭৮৮

খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জানুয়ারি প্রথম উপনিবেশ গড়ে তোলে। প্রথমে ইংরেজরা অস্ট্রেলিয়ায় শুধু অপরাধীদের পাঠাতো, তারাই অস্ট্রেলিয়াকে শ্বেতাঙ্গ মানুষদের বাসোপযোগী করে তোলে বলা চলে। ক্রমে ক্রমে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ অস্ট্রেলিয়ার শ্বেত উপনিবেশীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১১ লক্ষ ৪৬ হাজার।

বিস্তীর্ণ প্রান্তর, অরণ্যসমন্বিত অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত। কিন্তু সহজে এ-সব স্থান ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত হয় নি। সর্বত্র আধিপত্য বিস্তারের জন্যে ইংরেজদের অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে বহু যুদ্ধ করতে হয়। আদিম অধিবাসীরা দুঃসাহসী ও দুর্ধর্ষ হলেও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ইংরেজদের সঙ্গে পেরে ওঠে না।

ইংরেজরা বহু ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত এই মহাদেশতুল্য বিরাট দ্বীপরাজ্যের অধিপতি হয়ে বসে।

এমনি করে ইংরেজরা সারা পৃথিবীতে অভিযান চালিয়ে অতি বিশাল এলাকার উপর আধিপত্য কায়েম করে। আফ্রিকা, ভারত, ব্রহ্মদেশ, মহাসাগরের অসংখ্য দ্বীপ, উত্তর আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তার করে।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, কানাডা ও কয়েকটি দ্বীপ ছাড়া কোথাও ইংরেজদের কোনপ্রকার কর্তৃত্ব বজায় নেই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ভারতবর্ষ, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, পাকিস্তান, বাংলাদেশ প্রভৃতি স্থান ইংরেজের অধীনতামুক্ত।

॥ আফ্রিকায় বিদেশীদের উপনিবেশ স্থাপনের কথা ॥

আফ্রিকা মহাদেশে পোর্তুগাল, ফ্রান্স, ইতালী, বেলজিয়াম, ইংল্যাণ্ড, জার্মানি, হল্যাণ্ড, স্পেন, প্রভৃতি ইউরোপীয় দেশগুলি উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আর সব দেশ আফ্রিকাবাসীদের আয়ত্তে এসে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকা জাতিবিদ্বেষ জীইয়ে রেখে আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ অধিবাসীদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে।

ভৌগোলিক আবিষ্কারের নামে ইউরোপীয় দেশসমূহ পৃথিবীর নানা দেশকে পরাধীন করে রেখে সেখানকার ধনসম্পদ্ উপভোগ করেছে। দক্ষিণ আমেরিকার প্রতিটি দেশই এখন স্বাধীন।

উত্তর আমেরিকার কানাডা বাদে সব স্থান বিদেশীদের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। কানাডা স্বাধীন হলেও এখনও কিছুটা ব্রিটেনের আনুগত্য মেনে চলে।

॥ ন্যায্য অধিকারচ্যুত আদিম অধিবাসী ॥

সারা পৃথিবী জুড়ে এত যে দেশ, এত দ্বীপ, সে-সব স্থানের আদিম অধিবাসীরা তাদের ন্যায্য অধিকার হারিয়েছে। কোন কোন জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, কেউ কেউ তাদের দেশে থাকলেও সংখ্যায় কমে গেছে, সংগত অধিকারও হারিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এখন শ্বেতাঙ্গদের রাজত্ব। এখানে ইংরেজ, ফরাসী, জার্মান, অস্ট্রিয়ান, ইটালিয়ান, ওলন্দাজ, স্পেনীয়, পোর্তুগিজ প্রভৃতি জাতি এক হয়ে গেছে। কিন্তু এখানকার আদিম অধিবাসীদের অনেকেরই এখন আর অস্তিত্ব নেই। যা আছে তা শ্বেতাঙ্গদের আধিপত্য মেনে নিয়ে বাস করছে।



এমন একদিন ছিল যেদিন যে পৃথিবীতে আমরা বাস করি, তা ছিল না। ৫০০ কোটি বছর আগে মহাশূন্য থেকে গ্যাসের গোলক ঘুরতে ঘুরতে ছুটে এল। সেই গোলকের পরিধি প্রায় ৪০ হাজার কিলোমিটার। সৃষ্টির আদিতে পৃথিবীতে ছিল না গাছপালা, জীবজন্তু, বা মানুষ। প্রথমে গাছপালা, পরে জীবজন্তু, সব চেয়ে শেষে সৃষ্টি হল মানুষের। বিজ্ঞানীরা বলেন, বানর থেকে ক্রমবিবর্তনের ফলে মানুষের উদ্ভব। কয়েক লক্ষ বছর আগে আদি মানুষের উৎপত্তি। বর্তমান মনুষ্যজাতির মতো মনুষ্য-সৃষ্টি মাত্র চল্লিশ হাজার বছর আগে। ('বিশ্বের কথা' ও 'পৃথিবী' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

॥ প্রকৃত ইতিহাসের প্রারম্ভ ॥

যে-যুগের কথা বলা হল, সে-যুগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। আগেকার সেই সব দিনে কী ছিল, কী ঘটত ইত্যাদির বৃত্তান্ত বা বিবরণকে বলা হয় ইতিহাস (history)। অবশ্য সেই সব দিনের বহু পরের দিনের বিবরণকেই ইতিহাস বলা হয়। যে যুগের কথা আগে বলা হয়েছে, তাকে বলে প্রাগৈতিহাসিক যুগ অর্থাৎ ইতিহাস সৃষ্টির আগের যুগ। আমরা সব কিছুর বিবরণ যে সময় থেকে জানতে পেরেছি সেই সময় থেকেই প্রকৃত ইতিহাসের শুরু। পৃথিবীর সব দেশ সম্বন্ধে ওই একই কথা।

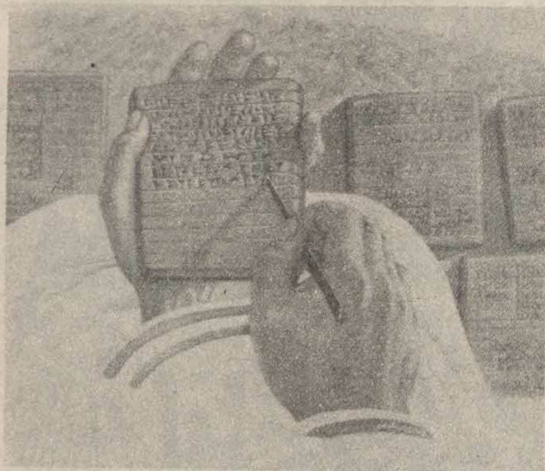
[পৃথিবীর দেশের সংখ্যা অনেক। সেই সব দেশের ইতিহাসের বর্ণনা প্রসঙ্গে এই অধ্যায়ে কিছু কিছু অত্যাবশ্যক ভৌগোলিক তথ্য সন্নিবেশিত করা হয়েছে।]



॥ সুমেরীয় সভ্যতা ॥

প্রাচীন সভ্যতার আরম্ভ নিয়ে ইতিহাসের শুরু। যতদূর জানা যায় সুমেরীয় সভ্যতা সব চেয়ে প্রাচীন। ৫০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বা তার চেয়েও আগে এই সভ্যতার বিকাশ হয়। নিকট প্রাচ্যে ইউফ্রেতিস ও তাইগ্রিস নদীর মধ্যবর্তী উর্বর ভূভাগে সুমেরীয়দের বাস ছিল। এই সুমেরীয়দের অর্থাৎ সুমেরের অধিবাসীদের সভ্যতার কিছু পরে মিশরে সভ্যতার বিকাশ হয়। তার পরে হয় ভারতে। ভারতের সভ্যতার পরে চীনে।

সুমেরীয়রাই প্রথম উন্নত ধরনের ভাষার ব্যবহার করে। তারাই কীলকাকার বর্ণমালায়



সুমেরীয়দের কীলকাকার বর্ণমালা

লিপি (Cuneiform script) আবিষ্কার করে। নলখাগড়া দিয়ে কাদার উপরে এই লিপি লেখা হত। তার পর সেই ক্ষোদিত কাদার টালি রোদে শুকিয়ে বা পুড়িয়ে শক্ত করে নেওয়া হত। প্রথম প্রথম সেই লিপি এরূপ দুর্বোধ্য ছিল যে সুমেরীয়দেরই তা বুঝতে অসুবিধা হত। পরে তারা প্রায় ছয় শত সহজবোধ্য শব্দের সৃষ্টি করে ও সে সবের চিত্ররূপ দেয়।

সাংকেতিক অঙ্ক চিহ্ন, সাল গণনা করার পদ্ধতি বা মাস নির্ধারণের উপায়ও তাদের জানা ছিল।

॥ উর শহরের উন্নত সভ্যতা ॥

উর (Ur) ছিল একটি অত্যুন্নত সুমেরীয় শহর। এই শতাব্দীর প্রথম দিকে ভূগর্ভে খনন-কার্য চালিয়ে উরে বিস্ময়কর সুমেরীয় সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। তা থেকে সুমেরীয়দের জীবনযাত্রার নানা দিক্ জানতে পারা সম্ভব হয়েছে। এখানকার সভ্যতা লাগাশ (Lagash), ইরিডু (Eridu) ও কিশ (Kish) শহরের সভ্যতার অনুরূপ ছিল বলে জানা গেছে।

ইউফ্রেতিস নদীর পূর্বতীরে উর শহর ছিল। এই শহরে সুন্দর বড় বড় বাড়ি ছিল। এই সব বড় বাড়ির মধ্যে জিগুরাট (Giggurat) ছিল একটি বড় মন্দির। তার ছাদে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের গবেষণাগার ছিল। জিগুরাটের পাশে ছিল রাজপ্রাসাদ। জিগুরাট ও রাজপ্রাসাদ প্রাচীরবেষ্টিত ছিল।

সুমেরীয়রা এক রাজার অধীনে ঐক্যবদ্ধ ছিল না। ২৭০০ থেকে ২৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উর ছিল সর্বপ্রধান শহররাজ্য।

সুমেরীয়রাই প্রথমে ইটের তৈরী বাড়ি, মন্দির, প্রাসাদ, দোকান তৈরি করে। তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর তীর থেকে কাদা নিয়ে তারা ইট তৈরি করে রোদে শুকিয়ে শক্ত করে নিত। পরবর্তী কালে কাঠের আগুনের চুল্লীতে সেই সব ইটকে পুড়িয়ে নেওয়া হত।

॥ সেমাইটদের মধ্যে সভ্যতার বিকাশ ॥

মিশর থেকে সুমের দেশ কয়েক শত কিলোমিটার দূরে ছিল। মাঝখানে ছিল মরুভূমি ও উর্বর জমি। সুমের দেশের অনেক কাছে এলামাইট (Elamite), সেমাইট (Semite) ও অ্যামরাইট (Amorite) জাতির লোকদের বাস ছিল। তারা তখনও সুমেরীয় বা মিশরীয়দের মতো তত সভ্যতার অধিকারী হয়ে ওঠে নি। সেমাইটদের মধ্যে দ্রুত সভ্যতার বিকাশ ঘটতে থাকে।

॥ অক্কদীয় বংশের প্রতিষ্ঠা ॥

২৩৭০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে সারগন নামে সেমাইট জাতির এক নেতা সব নগররাজ্যগুলিকে এক করে আক্কাদীয় বা অক্কদীয় বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই আক্কাদীয়দের আমলেই ভারত ও মিশরের সঙ্গে সুমের দেশের ব্যবসাবাণিজ্যগত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়।

সেমাইটরা ইহুদী ও আরবদের পূর্বপুরুষ।

॥ হামুরাবি ॥

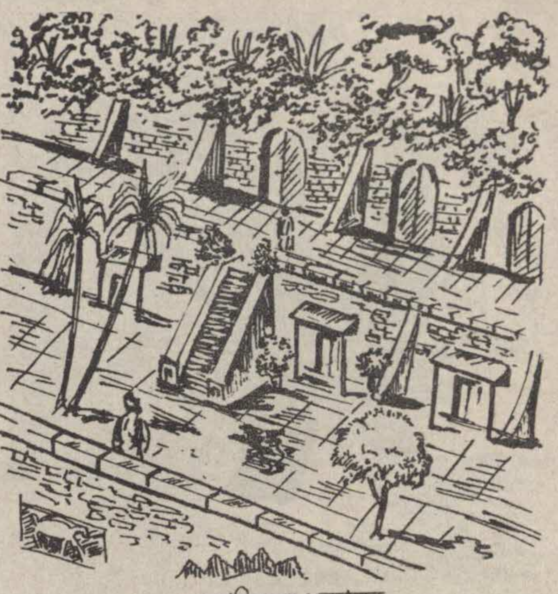
অক্কদীয় রাজবংশ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত অক্কদ-সুমের অঞ্চলে আধিপত্য বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিল। ইউফ্রেতিস-তাইগ্রিস নদীর সংগমস্থলের দক্ষিণে ছিল ক্যালডিয়া (Chaldea)। অক্কদ সুমের-ক্যালডিয়া সহযোগে গঠিত হয়েছিল সুপ্রাচীন ব্যাবিলনিয়া। সেমিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত এক বিদেশাগত রাজবংশের ষষ্ঠ নরপতি হামুরাবি (Hammurabi, ১৯৫৫-১৯১৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ব্যাবিলনিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

অ্যাসিরিয়া

এর মধ্যে অ্যাসিরিয়া নামে এক রাজ্যের উদ্ভব হয়। অ্যাসিরিয়ার লোকেরা সেমিতীয় জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের বাসস্থান ছিল অসুর ও নিনেভে (Nineveh)। অ্যাসিরিয় রাজাদের মধ্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন ৩য় টিগ্‌লাথ-পিলেসার (Tiglath-Pileser III, ৭৪৫-৭২৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), সেনাকেরিব (Sennacherib, ৭০৫-৬৮১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), অসুরবানিপাল (Ashurbanipal or Asurbanipal, ৬৬৯-৬২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রভৃতি।

॥ নেবুক্যাড্‌নেজার ॥

নেবুক্যাড্‌নেজার (Nebuchadnezzar, ৬০৫-৫৬২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন ক্যালডিয়ান (Chaldean) সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ব্যাবিলনের অধিপতি। তিনি স্বীয় রানীর মনস্তুটির জন্যে যে শূন্যোদ্যান নির্মাণ করেন তার নাম ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান (Hanging Gardens of Semiramis, at Babylon, Iraq)।



ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান

॥ ক্যালডীয় রাজবংশের পতন ॥

৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রতাপশালী ক্যালডীয় রাজবংশের পতন ঘটে। পারস্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা সাইরাস (৫৫৯-৫২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ক্যালডীয় রাজাকে পরাভূত করে তাঁর রাজ্য দখল করে নেন। সাইরাস লিডিয়াও অধিকার করেন।

মিশর



॥ মিশরীয় সভ্যতা ॥

আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে মিশর (ঈজিপ্ট) দেশ অবস্থিত। নীলনদ মিশরের প্রাণ। এই নদের অববাহিকায় খ্রীষ্টজন্মের তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে মিশরীয় সভ্যতা গড়ে ওঠে। ফেরো (pharaoh) নামে মিশরীয় রাজাদের অধীনে মিশরে সে যুগে এক সুপ্রাচীন ও অপূর্ব সভ্যতার সৃষ্টি হয়। খুফু বা গ্রীক কীয়প্‌স্ (Khufu or Greek Cheops, ২৯০০-২৮৭৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), মেনকাউরে, ৩য় আমেনহোটেপ



প্রথম সেটি

(Amenhotep III, রাজত্বকাল ১৪১১-১৩৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), প্রথম সেটি, ইখনাটন (Ikhnaton, Amenhot p IV, ১৩৭৫-১৩৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), ২য় রামেসিস (Rameses II, রাজত্বকাল ১২৯২-১২২৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), ৩য় রামেসিস (Rameses III,



দ্বিতীয় রামেসিস

রাজত্বকাল ১১৯৮-১১৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রভৃতি ফেরো সুপ্রসিদ্ধ।

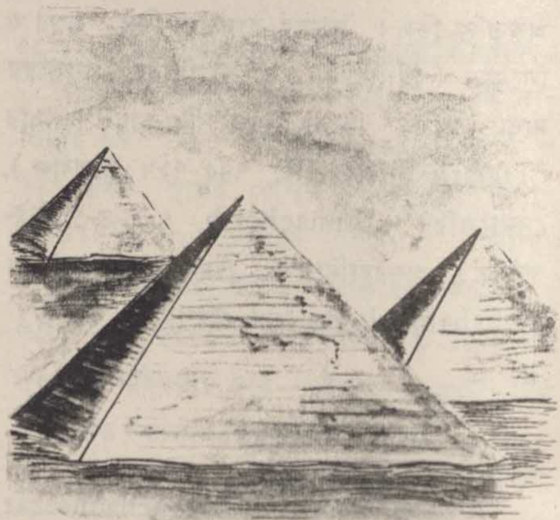
॥ মামী ॥

প্রাচীনকালে মিশরীয়দের ধারণা ছিল, আত্মা অবিনশ্বর এবং মৃত ব্যক্তির আত্মা দ্বারা একদিন মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার হবে। সেইজন্যে তারা মৃতদেহকে অদ্ভুত কৌশলে সংরক্ষিত করত। মৃতদেহে মসলা মাখিয়ে বা অন্য উপায়ে এমনভাবে সংরক্ষিত করা হত, যাতে সেই দেহ পচে গিয়ে নষ্ট হত না। এইভাবে সংরক্ষিত মৃতদেহকে বলা হয় মামী (mummy)।



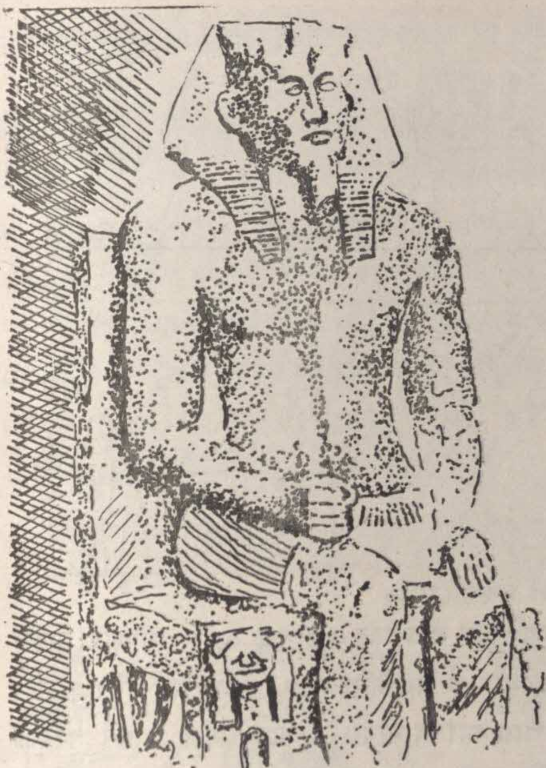
॥ পিরামিড ॥

মিশরীয়রা ফেরোদের দেবতাদের মতো জ্ঞান করত। কোন ফেরোর মৃত্যু হলে তার দেহ বিরাট বিরাট পিরামিডের মধ্যে রেখে দিত বা পরবর্তী কালে সুরক্ষিত ও সুগঠিত সমাধিগর্ভে রেখে দিত। সে যুগে যে-সব পিরামিড নির্মিত হয়েছিল, সেগুলির



পিরামিড

মধ্যে বৃহত্তম প্রথম খুফুর পিরামিড। গিজা বা গিজে নামক স্থানে এটি অবস্থিত। এর উচ্চতা প্রায় ১৫২ মিটার। এটির ভিত্তিরেখা প্রায় ২৩০ মিটার। ২৫৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই পিরামিড নির্মিত হয়।



প্রথম খুফুর প্রস্তরমূর্তি

এরই কাছে সেফ্রেন (Chephren)-এর পিরামিড ও তার কাছে মাইসেরিনাস (Mycerinus)-এর পিরামিড অবস্থিত। Meidum-এ স্নেফ্রু (Snefru)-র পিরামিড খুব বিখ্যাত।

॥ আলেকজাণ্ডার ॥

মিশরের রাজশক্তি দুর্বল হয়ে পড়লে পারস্য-সম্রাট্ সাইরাসের পুত্র ক্যাম্বাইসিজ (Cambyses, মৃত্যু ৫২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) মিশর জয় করেন। পরে গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার মিশর ও পারস্য জয় করে নেন এবং উত্তর মিশরে আলেকজান্দ্রিয়া শহর স্থাপন করেন। তাঁর পরলোকগমনের পর তাঁর সেনাপতি টলেমি (Ptolemy) মিশরের শাসনভার গ্রহণ করেন।

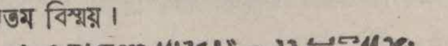
॥ স্ফিংক্স্ ॥

ফেরো খাপ্‌রে একটা আস্ত পাহাড় কেটে যে স্ফিংক্স্ নামে একটা বিরাট মূর্তি তৈরি করান, যার



স্ফিংক্স্

শরীরটা সিংহের কিন্তু মাথাটা মানুষের, তা পৃথিবীর অন্যতম বিস্ময়।

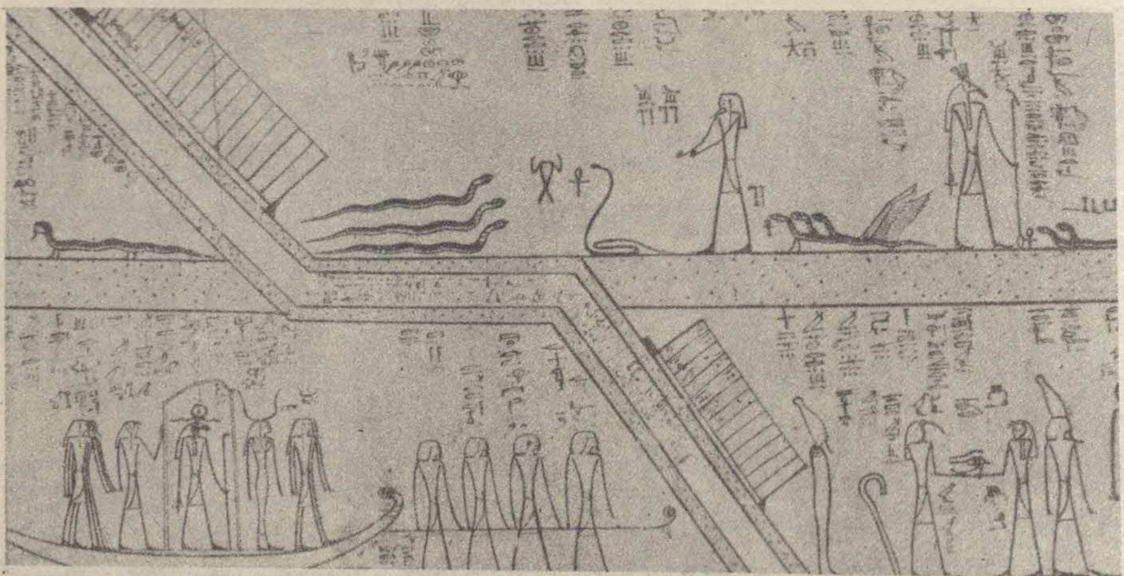


॥ মিশরীয় সাংকেতিক লিপি ॥

মিশরীয়রা যে সাংকেতিক লিপি আবিষ্কার করে তাকে বলে হাইয়্যারোগ্লিফ (Hieroglyph)। তারা লেখবার কালি, প্যাপাইরাস গাছের মজ্জা থেকে কাগজ, জল তোলার শাদূক যন্ত্র, বড় বড় নৌকো প্রভৃতি তৈরি করে।



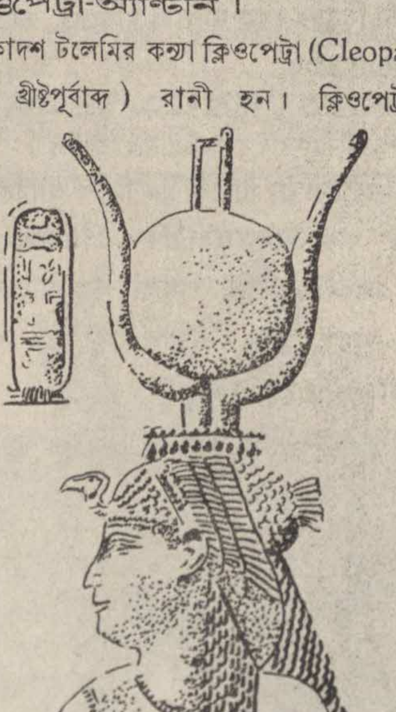
শাদূক যন্ত্রের সাহায্যে জল তোলা



ফেরোর সমাধির গাত্রের হাইয়্যারোগ্লিফ

॥ ক্লিওপেট্রা-অ্যান্টনি ।

একাদশ টলেমির কন্যা ক্লিওপেট্রা (Cleopatra, ৬৯-৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রানী হন। ক্লিওপেট্রা ও জুলিয়াস সীজারের এক পুত্র হয়। সীজার নিহত হলে মার্ক অ্যান্টনির সঙ্গে ক্লিওপেট্রার বিবাহ হয়। পরে অ্যাস্প নামক সাপকে দিয়ে দংশন করিয়ে ক্লিওপেট্রা মৃত্যু বরণ করেন। পরে রোমের প্রথম সম্রাট্ কেয়াস অক্টেভিয়ানাস অগস্টাস (Caius Octavianus Augustus, ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-১৪ খ্রীষ্টাব্দ) মিশর জয় করে নেন।



রানী ক্লিওপেট্রা

॥ মিশরে খলিফাদের শাসন ॥

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর সপ্তম শতাব্দীতে মিশরে বাগদাদের খলিফাদের শাসন শুরু হয়। নবম শতাব্দীতে খলিফারা মিশরে শক্তিহীন হয়ে পড়েন। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধে যোগদান করে যিনি বিশেষভাবে খ্যাত হন, সেই সেলজুক তুর্কী সুলতান সালাদিন (১১৩৭-১১৯৩ খ্রী.) মিশরের সুলতান হন। তাঁর পরলোক গমনের পর (১২৫০ খ্রী.) সালাদিনের এক বংশধর ককেশাশ পাহাড় অঞ্চল থেকে অনেক শ্বেতকায় তুর্কী ক্রীতদাসকে মিশরে আনেন। এই ক্রীতদাসদের বলা হত মামলুক। একজন মামলুক পরে মিশরের শাসনকর্তৃত্ব দখল করে নেন।

॥ মিশরে মামলুকদের শাসন ॥

প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে মিশরে মামলুকদের শাসন চলে। তার পরেও আরও প্রায় তিন শ' বছর মামলুকরা অর্ধ-স্বাধীনরূপে মিশরে শাসনকার্য চালান। ষোড়শ শতাব্দীতে মিশর কনস্টাটিনোপলের তুর্কী অটোমান সুলতানদের অধিকারে যায়। এর পরেও মিশরে মামলুকদের প্রভূত ক্ষমতা থাকে। শেষে মামলুকদের পরাজিত করে ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন মিশর দখল করে নেন। কিন্তু বেশী দিন মিশরকে তিনি দখলে রাখতে পারেন নি।

॥ মহম্মদ আলি ॥

তুর্কী সুলতান ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আলি

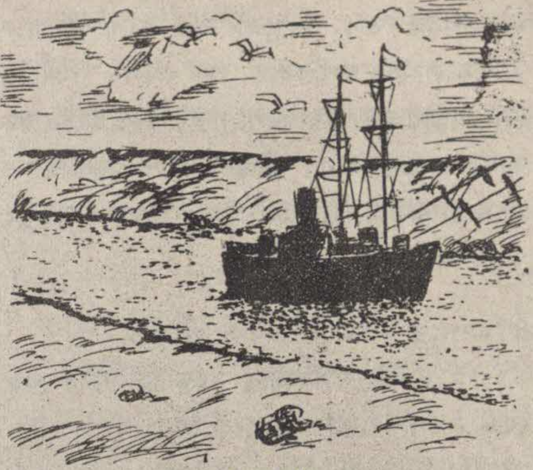


মহম্মদ আলি

নামে এক আলবেনীয় তুর্কীকে মিশরের শাসনকর্তা বা 'খেদিভ' নিযুক্ত করেন। মহম্মদ আলি ক্রীট দ্বীপ অধিকার করেন ও সুদান জয় করেন।

॥ ইসমাইল পাশা ॥

মহম্মদ আলির পর 'খেদিভ' হন ইসমাইল পাশা (১৮৩০-১৮৯৫ খ্রী.)। তাঁর আমলে ফরাসী এঞ্জিনীয়ার ফার্ডিন্যাণ্ড দ্য লেসেপস (Ferdinand de



সুয়েজ খাল

Lesseps, ১৮০৫-১৮৯৪ খ্রী.)-এর তত্ত্বাবধানে সুয়েজ খাল কাটা শেষ হয়। সুয়েজ খালের অধিকাংশ শেয়ার ছিল মিশরীয় ও ফরাসীদের হাতে। ইসমাইল পাশা অর্থাভাবে পড়ে মিশরীয়দের শেয়ার ইংরেজদের সাড়ে পাঁচ কোটি টাকায় বেচে দেন (১৮৭৫, ২৪শে নভেম্বর)। পরে ইংরেজ সরকার আরও শেয়ার কিনে নেন। তাঁদের শেয়ারসংখ্যা দাঁড়ায় ২,৯৫,০২৬টি (মোট শেয়ারসংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় লক্ষ)।

॥ মিশরে ইংরেজদের আধিপত্য ॥

ইংরেজরা দলে দলে মিশরের খেদিভের অধীনে চাকরি নিয়ে মিশরে দল ভারী করে তুলতে লাগল।



আরাবী পাশা

শেষ পর্যন্ত তারা মিশরের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রীতিমতো হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। মিশরের এক জাতীয় দল আরাবী পাশার নেতৃত্বে ইংরেজদের তাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু ইংরেজরা উন্নত অস্ত্র ও যুদ্ধজাহাজের সাহায্যে জয়ী হয়ে মিশরে পুরোপুরি আধিপত্য বজায় রাখে।

॥ মিশরে সামরিক বিদ্রোহ ॥

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির সঙ্গে যোগ দিলে ইংরেজরা মিশরের রক্ষণাবেক্ষণের ভার সরাসরি নিজেদের হাতে তুলে নেয়। সেই থেকে মিশর ইংরেজদের আশ্রিত রাজ্য বলে গণ্য হতে থাকে। মিশরীয়রা সম্পূর্ণ স্বাধীন হবার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু মিশরের রাজা ১ম ফারুক (রাজত্বকাল ১৯৩৬-১৯৫২ খ্রী.) গোপনে গোপনে ইংরেজদেরই সাহায্য করতে থাকেন। তার ফলে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্য



নাগিব বা নেগুইব

বাহিনীর জেনারেল মহম্মদ নাগিব বা নেগুইব (General Mohamed Neguib) ফারুকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। ফারুক দেশ ছেড়ে পলায়ন করেন।

॥ নাসের ॥

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গামাল আবদেল নাসের (Gamal Abdel Nasser, ১৯১৮-১৯৭০ খ্রী.)



নাসের

প্রজাতন্ত্রী মিশরের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন। তিনি সুয়েজ খালকে জাতীয়করণ করেন, রাশিয়ার সাহায্যে আসোয়ান ড্যাম সম্পূর্ণ করেন ও সিরিয়া ও ইয়েমেনকে নিয়ে সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র গঠন করেন অবশ্য বর্তমানে সিরিয়া ও ইয়েমেন সংযুক্ত আরব যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেছে।

॥ সাদাত ॥

মহম্মদ আনোয়ার এল সাদাত ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ঈজিপ্টের প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হন।

মিশর অর্থাৎ ঈজিপ্টের আয়তন ৩,৮৬.১৯৮ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা৪,০৯,৮০,০০০ (১৯৭৯): রাজধানী কায়রো।

ভারতবর্ষ

॥ ভারতীয় সভ্যতা ॥

বহু ঐতিহাসিকের অভিমত, ভারতবর্ষের

সভ্যতাই সব চেয়ে প্রাচীন। সর্বাপেক্ষা প্রাচীন না হলেও সুমেরীয় ও মিশরীয় সভ্যতার সমকালীন তো বটেই যাকে বলে সিন্ধু-উপত্যকার সভ্যতা (Indus Valley Civilization) বা সিন্ধুসভ্যতা। তদানীন্তন ভারতের সিন্ধু-প্রদেশের অন্তর্গত মোহেন-জো-দরো ও পশ্চিম পাঞ্জাবের অন্তর্গত হরপ্পার ভূগর্ভ খনন করে যে দু'টি শহরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে সেই শহর দুটির সভ্যতাকে পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন সভ্যতা বলা যেতে পারে। সিন্ধুসভ্যতা আর্যসভ্যতারও পূর্বেকার। ভূগর্ভ খনন করে সাতটি স্তরে সাতটি শহরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। সর্বনিম্নের শহরের সভ্যতা খ্রীষ্টজন্মের অন্ততঃ তিন হাজার বছর আগেকার।



॥ অনার্য বা দ্রাবিড় সভ্যতা ॥

মোহেন-জো-দরো থেকে হরপ্পার দূরত্ব ৪৮৩০ কিলোমিটার। সম্ভবতঃ হরপ্পা মোহেন-জো-দরো অপেক্ষা বৃহত্তর ও শক্তিশালী ছিল। শহর দুটির সভ্যতা ছিল অনার্য বা দ্রাবিড় সভ্যতা। আর্যসভ্যতার আরম্ভ খ্রীষ্টজন্মের প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, আর্যরা কাসপিয়ান সাগরের ধারের তাদের বাসভূমি ত্যাগ করে উত্তর ভারতে আসে। যখন আসে তখন ভারতে দ্রাবিড়দের আধিপত্য। দ্রাবিড়দের সভ্যতাই অনার্য সভ্যতা।

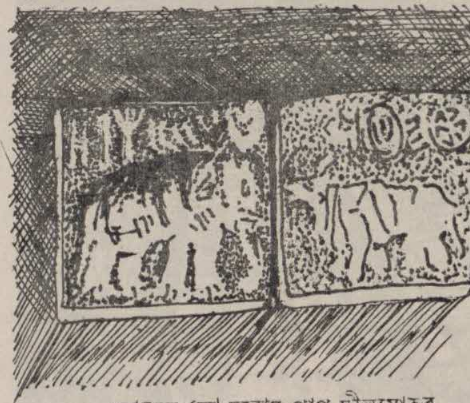
॥ ভারতে আর্যদের আধিপত্যের প্রসার ॥

দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের প্রবল বিরোধ বাধল। দ্রাবিড়রা পরাভূত হলে আর্যরা ধীরে ধীরে ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগল।

অনেক ঐতিহাসিক বলেন, আর্যদের ভারতের বাইরের লোক বলা ঠিক নয়। কারণ, সে-যুগে ভারতবর্ষ কাসপিয়ান সাগর (কশ্যপ সাগর) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কাজেই আর্যরা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে এসেছিল বলাই সংগত।

॥ সুমেরীয় ও মিশরীয়দের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ॥

সুমেরীয়দের ও মিশরীয়দের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। মেসোপটেমিয়ার ভূগর্ভ খনন করে ভারতবর্ষের বহু দ্রব্য পাওয়া গেছে;



মোহেন-জো-দরোয় প্রাপ্ত সীলমোহর



মোহেন-জো-দরোর একটি কূপ

মিশরেও পাওয়া গেছে। আবার মোহেন-জো দরোতে সুমেরীয় ও মিশরীয় বহু দ্রব্য পাওয়া গেছে।

সুমেরীয় ও মিশরীয় স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত ইষ্টকাদি, মোহেন জো-দরো ও হরপ্পার ইষ্টকাদি একই রূপ ছিল। কূপ খনন, মৃৎপাত্র তৈরি, গাড়ি তৈরি, রাস্তা তৈরি, নর্দমা নির্মাণ প্রভৃতি ভারত বর্ষেও যেরূপ ছিল, সুমেরু, ব্যাবিলনিয়া ও মিশরে



মোহেন-জো-দরোর রাস্তা

সেইরূপ ছিল। এ ছাড়া বহু ব্যাপারে সুমের, ব্যাবিলন, মিশর প্রভৃতির সঙ্গে ভারতবর্ষের বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া গেছে।

॥ সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বেদ ॥

আর্যরা যে বেদ রচনা করে তা পৃথিবীর সর্ব প্রাচীন গ্রন্থ। বিখ্যাত উপনিষদ্ এই বেদ থেকেই উদ্ভূত। আর্যরা সূর্য, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করত।

॥ হিন্দুধর্ম ॥

বৈদিক যুগের শেষ দিকে আর্যদের মধ্যে যাগযজ্ঞ, বলিদান প্রভৃতি বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানের বাড়াবাড়ি ঘটে। ব্রাহ্মণরা সমাজের অন্য শ্রেণীর লোকদের উপর আধিপত্য করতে থাকে। পুরোহিতেরা আচার-অনুষ্ঠান পালনের জন্যে সমাজের লোকদের উপর নানাভাবে পীড়ন শুরু করে দেয়। এরই আগে ভারতে হিন্দু ধর্মের উদ্ভব হয়। অবশ্য, কার দ্বারা এই হিন্দু ধর্ম প্রচারিত হয় এবং কবে এই ধর্মের প্রচার হয়, তা জানা যায় না।

॥ গৌতম বুদ্ধ ॥

উত্তর-পূর্ব ভারতে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নগরে শুদ্ধোদন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্রের নাম শাক্যসিংহ, সিদ্ধার্থ বা গৌতম। তাঁর পত্নীর নাম যশোধরা, পুত্র রাহুল।



বুদ্ধদেব

তিনি উনত্রিশ বৎসর বয়সে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যান। গয়ায় বোধি বৃক্ষের তলায় সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে 'বুদ্ধ' নামে পরিচিত হন। তাঁর প্রচারিত ধর্মের নাম বৌদ্ধ ধর্ম।

॥ বৌদ্ধধর্মের প্রসার ॥

বুদ্ধদেবের মহাপ্রয়াণের পর ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভ ঘটে এবং তা ক্রমশঃ হিন্দু-প্রভাবিত সকল স্থান থেকে হিন্দুধর্মের অবলুপ্তি ঘটায়। পার্শ্বনাথ ও মহাবীর কর্তৃক জৈন ধর্মেরও বিকাশ লাভ ঘটে।

॥ শংকরাচার্য ॥

পরে দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত শংকরাচার্য (৭৮৮ বা ৬৮৬-৮২০ খ্রী.) কর্তৃক ভারতে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। সারা ভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ক্ষীণ হয়ে যায়। বেদ উপনিষদ প্রভৃতি স্বমহিমায় পুনরায় ভারতের সর্বত্র সমাদৃত হতে থাকে।

॥ আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ॥

ভারতবর্ষ যুগে যুগে নানা বৈদেশিক শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয়। পারস্য-সম্রাট্ প্রথম দরায়ুস (Darius I, আনুমানিক ৫৫৮-৪৮৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ উত্তর-পশ্চিম ভারতের কিছু কিছু অংশ জয় করেন। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট (Alexander, the Great, ৩৫৬-৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) দিগ্বিজয়ে বেরিয়ে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া ও মিশর জয় করেন। শেষে খ্রীষ্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে উত্তর ভারতে এসে উপস্থিত হন। কোন কোন রাজা তাঁর অধীনতা স্বীকার করলেও রাজা পুরু তাঁর সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন। তাঁর বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে আলেকজাণ্ডার তাঁকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন। অবশ্য কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, আলেকজাণ্ডার পুরুর নিকট পরাজিত হয়ে ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যান। এই ঘটনার দু'বৎসর পরে ব্যাবিলন শহরে তাঁর মৃত্যু হয়।



আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট



॥ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ॥

মৌর্যবংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য নন্দবংশীয় রাজাদের বিতাড়িত করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন (রাজত্বকাল ৩২১-২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। গ্রীকদের পরাজিত করে তিনি পাঞ্জাব অধিকার করেন। আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি সেলুকাসকে পরাজিত করে তিনি কাবুল, কান্দাহার ও হিরাট দখল করেন। তাঁর সাম্রাজ্য পারস্যের সীমান্ত থেকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তাঁর কুটনীতিবিদ্ মন্ত্রীর নাম চাণক্য। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পুত্র বিন্দুসার অমিত্রঘাতের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্য দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্রাট্ অশোক তাঁর পুত্র।

॥ সম্রাট্ অশোক ॥

মগধের সুপ্রসিদ্ধ সম্রাট্ অশোক বা অশোকবর্ধন (রাজত্বকাল খ্রী. পূ. ২৭৩-২৩২ অব্দ) প্রথম দিকে অতিশয় নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। তিনি তাঁর অন্যান্য ভাইদের হত্যা করে সিংহাসনে আরোহণ

করেন। সেই সময়ে তাঁর নাম হয় চণ্ডাশোক। তিনি কলিঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে নিদারুণ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হতে দেখে তাঁর মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। তিনি উপগুপ্ত নামে এক সন্ন্যাসীর নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তার পর থেকে তিনি আর যুদ্ধ করেন নি। তিনি অসংখ্য কূপ খনন করান ও পান্থশালা, মন্দির, স্তূপ, স্তম্ভ প্রভৃতি নির্মাণ করান। তাঁর সময়ে ভারতের শিল্প-কলার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর দ্বারা নির্মিত সারনাথ স্তম্ভের উপরকার সিংহমূর্তি ও অশোকচক্র সুপ্রসিদ্ধ। অশোকচক্র বর্তমানে ভারতের জাতীয় প্রতীক।

॥ মৌর্যবংশের পতন ॥

অশোকের পরলোকগমনের পর মৌর্যবংশের পতন শুরু হয় এবং মগধে শুঙ্গ, কাণ্ব প্রভৃতি বংশীয় রাজগণ রাজত্ব করেন। খ্রীষ্টপূর্ব ১৮৪ অব্দে মৌর্যবংশের শেষ রাজা বৃহদ্রথের সেনাপতি পুষ্যমিত্র স্বীয় প্রভুকে হত্যা করে মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশের নাম শুঙ্গ। শুঙ্গদের ১১২ বৎসর রাজত্বের পর এই বংশের শেষ রাজা দেবভূতি তাঁর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বাসুদেব কর্তৃক গুপ্তভাবে নিহত হন।

॥ কাণ্ববংশ ॥

বাসুদেব যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন তার নাম কাণ্ববংশ। এই বংশের রাজারা খ্রীষ্টপূর্ব ২৭ বা ২৮ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অন্ধ্র বা শাত-বাহন বংশের জনৈক রাজা কাণ্ববংশের শেষ রাজাকে হত্যা করেন।

॥ শাতবাহন বংশ ॥

দাক্ষিণাত্যের অন্ধ্র রাজবংশ শাতবাহন বংশ নামে প্রসিদ্ধ। শাতকর্ণী এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। এই বংশের ত্রিশ জন রাজা এদেশে রাজত্ব করেন।

॥ শকজাতির আক্রমণ ॥

উত্তর-পশ্চিম ভারতে বাহ্লীক, শক, পহ্লব, প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করেন। ইউ-চি জাতির আক্রমণে শকগণ অক্সাস নদীর তীরবর্তী রাশিয়া ও আফগানিস্তানের মধ্যবর্তী অঞ্চল ত্যাগ করে ভারতবর্ষে উপস্থিত হয়। তারা উত্তরে তক্ষশীলা ও মথুরায় এবং দক্ষিণে মালব ও সৌরাষ্ট্রে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্থাপন করে। শকজাতির এক শাখা প্রথম শতাব্দীর শেষভাগ থেকে চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত এদেশে রাজত্ব করে।

॥ পল্লবদের আধিপত্য ॥

চালুক্য রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্বেই দাক্ষিণাত্যে পল্লবদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের রাজধানী ছিল কাঞ্চী। এই বংশের শেষ রাজা মহেন্দ্র বর্মন ও নরসিংহ বর্মন বিশেষ ক্ষমতাশালী ছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চোলগণের হস্তে পল্লববংশ নির্মূল হয়।

॥ কুশান বংশ ॥

কুশান বংশ ইউ-চি জাতির একটি শাখা। ইউ চি জাতির পাঁচটি শাখার একটি কুশান। কুশানবংশীয় রাজারা গ্রীক ও পারসিকদের কাছ থেকে আফগানিস্তান কেড়ে নেয়। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কনিষ্ক।

॥ কনিষ্ক ॥

কনিষ্কের রাজধানী ছিল পুরুষপুর (বর্তমান পেশোয়ার)। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম ভাগে তিনি রাজত্ব করতেন। অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, চরক প্রভৃতি পণ্ডিতগণ তাঁর সভায় বিদ্যমান ছিলেন।

॥ হুনদের আক্রমণ ॥

হুন জাতি মধ্য এশিয়ার এক দুর্ধর্ষ জাতি।

খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে এরা দলে দলে ভারত, পারস্য ও ইউরোপ আক্রমণ করে। ভারতবর্ষ আক্রমণ করে শ্বেতকায় হুন জাতি। রাজপুত ও জাঠ জাতি এই শ্বেতকায় হুণ জাতি থেকে উদ্ভূত।

॥ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ॥

গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময়ে হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুদয় হয়। তিনি লিচ্ছবি বংশের এক রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিয়ে করে বিশেষ শক্তিশালী হন ও নিজরাজ্যের সীমা বর্ধন করেন। তাঁর পুত্রের নাম সমুদ্রগুপ্ত।



॥ সমুদ্রগুপ্ত ॥

সমুদ্রগুপ্ত (রাজত্বকাল ৩৩০-৩৭৫ খ্রী.)। গুপ্তবংশের দ্বিতীয় সম্রাট্। সামরিক কৃতিত্বের জন্যে তাঁকে ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়। তিনি দাক্ষিণাত্য ব্যতীত সারা ভারতের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি সুকবি, সংগীতজ্ঞ ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কবি হরিষেণ তাঁর সভাসদ্ ছিলেন।

॥ ২য় চন্দ্রগুপ্ত ॥

সমুদ্রগুপ্তের পুত্র ২য় চন্দ্রগুপ্ত (রাজত্বকাল ৩৮০-৪১৪ খ্রী.) বিক্রমাদিত্য ও শকারি নামে পরিচিত। তাঁর সময়ে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারত পর্যটন করেন (৩৯৯ থেকে ৪১৫ খ্রী.)। তাঁর নবরত্নসভায় কালিদাস, বরাহমিহির, বররুচি, ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর ও শঙ্কু ছিলেন।

॥ রাজ্যবর্ধন ॥

সপ্তম শতকে থানেশ্বরের রাজা ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্ধন। প্রভাকরবর্ধন পুষ্যভূতি বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা। তিনি কনৌজের মৌখরিরাজ গ্রহবর্মনের সঙ্গে তাঁর মেয়ে রাজ্যশ্রীর বিয়ে দেন। হুণদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধলে রাজ্যবর্ধন হুণদের পরাজিত করেন। প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পর গৌড়রাজ শশাঙ্ক ও মালবরাজ দেবগুপ্ত একসঙ্গে কনৌজ আক্রমণ করলেন। কনৌজরাজ গ্রহবর্মনের মৃত্যু হল। রাজ্যশ্রী মালবরাজের হাতে বন্দিনী হলেন। ভগ্নীকে উদ্ধার করতে গেলে মালবরাজ পরাজিত হলেও শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু হল। রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পলায়ন করলেন।

॥ রাজ্যশ্রী ॥

রাজ্যবর্ধনের ভাই হর্ষবর্ধন রাজ্যশ্রীর খোঁজে বেরিয়েপড়লেন। বিন্ধ্যারণ্যে গিয়ে দেখলেন, রাজ্যশ্রী



বিন্ধ্যারণ্যে রাজ্যশ্রী আগুনে ঝাঁপ দিতে উদ্যত

অগ্নিতে আত্মাহুতি দেবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছেন। হর্ষবর্ধন ভগ্নীকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলেন।



॥ হর্ষবর্ধন ॥

হর্ষবর্ধন (রাজত্বকাল ৬০৬-৬৪৭ খ্রী.) ভারতের শেষ হিন্দু রাজা। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ তাঁর সময়ে ভারত পর্যটন করেন (৬২৯-৬৪৫ খ্রী.)। হর্ষবর্ধন এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী ছিলেন।

তাঁর সময়ে প্রসিদ্ধ বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন। হর্ষবর্ধনের উপাধি ছিল শিলাদিত্য। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যিক ছিলেন। 'রত্নাবলী' নাটক তাঁর রচনা।

॥ দ্বিতীয় পুলকেশী ॥

গুপ্তযুগের দক্ষিণ ভারতে বাতাপির চালুক্য ও কাঞ্চীর পল্লবরাজ্যের উদ্ভব হয়। রাজা হর্ষকে দ্বিতীয় পুলকেশী পরাজিত করেন। দ্বিতীয় পুলকেশী দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন। তিনি ৬০৮-৬৪২ খ্রী. পর্যন্ত রাজত্ব করেন। হিউয়েন সাং তাঁর রাজধানী পরিদর্শন করেন।

॥ রাজেন্দ্র চোল ॥

চোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ালয়ের পুত্র আদিত্য (আনুমানিক ৮৭১-৯০৭ খ্রী.) কাঞ্চীর পল্লবরাজগণের ক্ষমতা বিনষ্ট করেন। চোলবংশের রাজেন্দ্র চোল (১ম) বিখ্যাত রাজা ছিলেন।

॥ রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণ ॥

রাষ্ট্রকূট জাতি রাজপুত জাতির একটি শাখা। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটরা এক প্রবল রাজ্য স্থাপন করেন। রাষ্ট্রকূটরাজ প্রথম কৃষ্ণের আমলে ইলোরার প্রসিদ্ধ কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হয়।

॥ সিন্ধুদেশে আরবদের আধিপত্য ॥

বহিরাগত মুসলমানেরা সিন্ধুদেশের হিন্দু রাজা দাহিরের রাজ্য আক্রমণ করে। তৃতীয় বারের আক্রমণে আরব সেনাপতি মহম্মদ বিন কাসিমের হাতে রাজা দাহির নিহত হন। সিন্ধুদেশে আরবদের আধিপত্য কায়েম হয় (৭১১ খ্রী.)।

॥ সবুক্তগীন ॥

গজনীর রাজা সবুক্তগীন (শাসনকাল ৯৭৭-৯৯৮ খ্রী.) ভারতের হিন্দু রাজা জয়পালকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। তাঁর পুত্রের নাম সুলতান মামুদ।

॥ সুলতান মামুদ

সুলতান মামুদ (৯৭১-১০৩০ খ্রী.) সতেরবার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি সোমনাথের মন্দির, মথুরা, নগরকোট ও থানেশ্বরের মন্দির লুণ্ঠন করে প্রভূত ধনরত্ন নিয়ে যান।

॥ মহম্মদ ঘোরী ॥

নৃশংস ভারত আক্রমণকারী শিহাবুদ্দীন মহম্মদ ঘোরী ৬ বার ভারত আক্রমণ করেন। ষষ্ঠ বারের



মহম্মদ ঘোরী

যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ ও সমর সিংহকে পরাজিত ও নিহত করেন। তিনি ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে কুতবউদ্দীন আইবেককে দিল্লীর শাসনকর্তা করেন।

॥ কুতবউদ্দীন ॥

কুতবউদ্দীন আইবেক (রাজত্বকাল ১২০৬-১২১১ খ্রী.) ছিলেন মহম্মদ ঘোরীর ক্রীতদাস। ঘোরীর মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর স্বাধীন সুলতান হন। তাঁর বংশকে বলে দাস রাজবংশ।



কুতবউদ্দীন

॥ ইলতুৎমিস ॥

ইলতুৎমিস (আলতামাস) শামসুদ্দীন (রাজত্বকাল ১২১১-১২৩৬ খ্রী.) মহাকালের মন্দির বিধ্বস্ত করেন। তিনি কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পর দিল্লীর সুলতান হন।

॥ সুলতানা রিজিয়া বা রাজিয়া ॥

ইলতুৎমিসের পরে তাঁর কন্যা সুলতানা রিজিয়া



সুলতানা রিজিয়া বা রাজিয়া

বা রাজিয়া (রাজত্বকাল ১২৩৬-১২৪০ খ্রী.) দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। তিনি নিহত হন।

॥ আলাউদ্দীন খিলজী ॥

রিজিয়ার মৃত্যুর পর খিলজী বংশের সম্রাট্ আলাউদ্দীন (রাজত্বকাল ১২৯৬-১৩১৬ খ্রী.) দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। আলাউদ্দীন ছিলেন এক নৃশংস অত্যাচারী সম্রাট্। ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ করেন। পদ্মিনী ও বারো হাজার রাজপুতনারী সম্মানরক্ষার জন্যে জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন দেন।

॥ মহম্মদ বিন তুঘলক ॥

তারপর শুরু হয় তুঘলক বংশ। মহম্মদ বিন তুঘলক (রাজত্বকাল ১৩২৫-১৩৫১ খ্রী.) দিল্লীর সম্রাট্ হন। তিনি তামার নোটের প্রবর্তন করেন। তাঁর রাজত্বকালে সমরখন্দের নৃশংস রক্তলোলুপ তৈমুরলঙ্গ (১৩৩৫-১৪০৫ খ্রী.) দিল্লী আক্রমণ করে রাজপথে রক্তের স্রোত বইয়ে দেন। তিনি চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর।



॥ ইব্রাহিম লোদি ও বাবর ॥

তারপর সৈয়দ ও লোদী বংশ দিল্লীতে রাজত্ব করে। লোদী বংশের শেষ সুলতান ইব্রাহিম লোদিকে ১৫২৬ খ্রী. পানিপথের যুদ্ধে হারিয়ে



বাবর

তৈমুরলঙ্গের বংশের বাবর (১৪৮২-১৫৩০ খ্রী.) দিল্লীর সম্রাট্ হন।

॥ হুমায়ুন ॥

মোগল সম্রাট্ বাবরের পর তাঁর পুত্র হুমায়ুন



হুমায়ুন

(রাজত্বকাল ১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬ খ্রী.) দিল্লীর সম্রাট্ হন। তিনি শেরশাহের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন।

॥ শেরশাহ্ ॥

পাঠান সম্রাট্ শেরশাহ্ (রাজত্বকাল ১৫৪৩-১৫৪৮ খ্রী.) ঘোড়ার ডাক প্রবর্তন করেন, রূপোর টাকা চালাবার ব্যবস্থা করেন, গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড



শেরশাহ্

তাঁর চেষ্টায় তৈরী হয়। শেরশাহের মৃত্যুর পর হুমায়ুন পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১৫১৫ খ্রী.) জয়ী হয়ে পুনরায় দিল্লীর সিংহাসনে বসেন।



॥ আকবর ॥

হুমায়ুন শের শাহের পর মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর পুত্র আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খ্রী.)



আকবর

দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজা মানসিংহ তাঁর প্রধান সেনাপতি ছিলেন। রাজা তোডরমল রাজস্বসচিব ও আবুল ফজল সভাসদ্ ছিলেন। গায়ক তানসেন তাঁর সভাতে ছিলেন। আকবর সারা জীবন হিন্দু রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। বাংলার বারভূইঞারা আকবরের প্রবল বিরোধিতা করেন। আকবর প্রাতঃস্মরণীয় ভারতগৌরব রানা প্রতাপসিংহকে দমন করতে পারেন নি। আকবরের সেনাপতি রাজপুতকুলকলঙ্ক মানসিংহের পরিচালনায় এক বিরাট সৈন্যদল হলদিঘাট বা গোগুণ্ডা গিরি-সংকটে প্রতাপের সৈন্যদলকে পরাজিত করে (১৫৭৬ খ্রী.)। প্রতাপ চিতোর ছাড়া তাঁর সাম্রাজ্যের সকল স্থান মুসলমানের কবল থেকে উদ্ধার করেন। রানা প্রতাপের কাহিনী ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল ও গৌরবময় অধ্যায়।



রানা প্রতাপ

॥ জাহাঙ্গীর ॥

আকবরের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর (১৫৬৮-১৬২৭ খ্রী.) বর্ধমানের জায়গিরদার শের



জাহাঙ্গীর

আফগানকে হত্যা করে তাঁর পরমা সুন্দরী পত্নীকে বলপূর্বক বিবাহ করেন। তাঁর নাম ছিল মেহের-উন্নিসা। পরে তাঁর নাম হয় নূরজাহান। জাহাঙ্গীরের সাথে শিখদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

॥ শাহ্‌জাহান ॥

জাহাঙ্গীরের পুত্রের নাম শাহ্‌জাহান (রাজত্বকাল ১৬২৭-১৬৫৮ খ্রী)। তিনি তাঁর



শাহ জাহান

পত্নী মমতাজের সমাধির উপর যে সমাধি মন্দির নির্মাণ করান তারই নাম তাজমহল। ময়ূরসিংহাসন মোতি মসজিদ প্রভৃতি তাঁরই দ্বারা নির্মিত হয়। ১৬৫৮ থেকে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ তিনি পুত্র আওরঙ্গজেব কর্তৃক বন্দী হয়ে থাকেন।



॥ আওরঙ্গজেব ॥

আওরঙ্গজেব বা ঔরঙ্গজেব (১৬১৮-১৭০৭ খ্রী) তাঁর ভ্রাতা দারা ও মুরাদকে হত্যা করেন। ভ্রাতা শুজা আরাকানে পলায়ন করেন। আওরঙ্গজেব প্রবল হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন। শত শত হিন্দু মন্দির ভেঙ্গে সে-সবের উপর মসজিদ নির্মাণ করান। কাশীর বিশ্বনাথের মন্দির, মথুরার কেশবদেবের মন্দির ধ্বংস করেন। হিন্দুদের উপর সংকীর্ণচিত্ত আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর বসান। তিনি বহু চেষ্টা করেও প্রাতঃস্মরণীয় ভারতগৌরব বীরপুরুষ শিবাজীকে



আওরঙ্গজেব

দমন করতে পারেন নি।



॥ শিবাজী ॥

মহাবীর শিবাজী (১৬২৭-১৬৮০ খ্রী) আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে দমন করবার জন্যে আফজল খাঁকে প্রেরণ করেন। শিবাজী তাঁর বুকে বাঘনখ বসিয়ে তাঁকে হত্যা করলেন। আওরঙ্গজেব তাঁকে দমন করবার জন্যে মাতুল শায়েস্তা খাঁকে প্রেরণ করলেন। শায়েস্তা খাঁর পুত্র ও চল্লিশজন দেহরক্ষী মারা গেল। শায়েস্তা খাঁ পলায়ন করলেন। শিবাজীর তরবারির আঘাতে তাঁর হাতের একটি আঙুল কাটা গেল। পরে আওরঙ্গজেব বিশ্বাসঘাতকতা করে জয়সিংহ ও দিলির খাঁকে পাঠিয়ে শিবাজীকে রাজধানীতে আনিয়ে বন্দী করলেন। শিবাজী অপূর্ব কৌশলে কারাগার থেকে পলায়ন করলেন। প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ শিবাজী অখণ্ড স্বাধীন হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্যে আজীবন চেষ্টা করে গেছেন। তাঁর মাতৃভক্তি, হিন্দুধর্মে ঐকান্তিক শ্রদ্ধা, বীরত্ব, সাহস, উপস্থিত বুদ্ধি, নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি অসাধারণ ছিল।



শিবাজী



॥ নাদির শাহ্ ॥

পারস্যের নৃশংস অধিপতি নাদির শাহ্ দিল্লী আক্রমণ করে রক্তের বন্যা বইয়ে দেন। তাঁর সেনাপতি আহম্মদ শাহ্ দুরানীর সঙ্গে ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধে (পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে) মারাঠাদের পরাজয় হল। মারাঠাদের অখণ্ড হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনের সকল আশা নির্মূল হয়ে গেল।

॥ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ॥

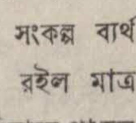
পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো ডা গামা (Vasco da Gama, ১৪৬০-১৫২৪ খ্রী.) ভারতের কালিকট বন্দরে এলেন। পোর্তুগিজ বণিকরা গোয়া, দমন, দিউ, বোম্বাই, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করল। ইংরেজ বণিকদল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে ভারতে বাণিজ্য করবার উদ্দেশ্যে সুরাট, আগ্রা ও আমেদাবাদে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করল। জাহাঙ্গীরের আমলে তারা বাণিজ্য করবার

অনুমতি পেলেও আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তাদের বিরোধ বাধল। তার ফলে ইংরেজরা কলকাতায় এসে কুঠি করল। ফরাসী বণিকেরা ভারতে এলে তাদের সঙ্গে ইংরেজদের বিরোধ বাধল। ফরাসী নায়ক ডুপ্লে (Joseph Francois Duplex, ১৬৯৭-১৭৬৭ খ্রী.) ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য স্থাপনের সংকল্প



ক্লাইভ

করেছিলেন। ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ (Lord Clive, ১৭২৫-১৭৭৪ খ্রী.) তাঁর সেই সংকল্প ব্যর্থ করলেন। পোর্তুগিজদের অধিকারে রইল মাত্র গোয়া, দমন ও দিউ। ফরাসীদের অধিকারে থাকল চন্দননগর ও পণ্ডিচেরী।



॥ সিরাজউদ্দৌলা ॥

বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা (১৭৩০-১৭৫৮ খ্রী.) পলাশির যুদ্ধে (১৭৫৭ খ্রী.) ইংরেজদের দ্বারা পরাজিত হলেন ও বন্দী অবস্থায় নৃশংসভাবে নিহত হলেন। ভারতে ইংরেজ শাসনের সূত্রপাত হল।



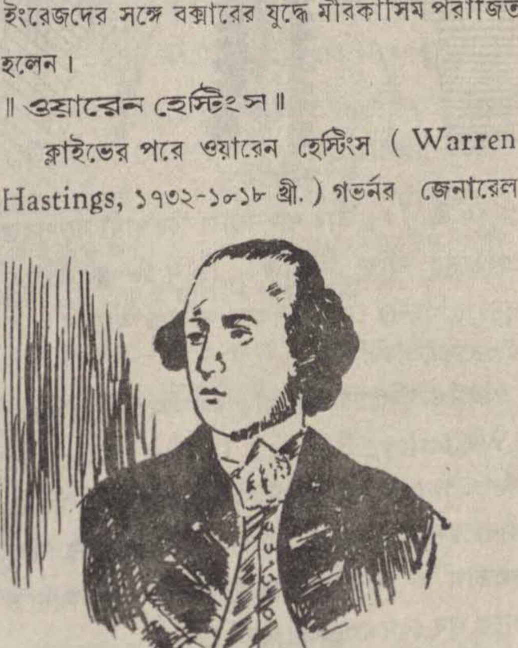
সিরাজউদ্দৌলা

॥ মীরজাফর ও মীরকাসিম ॥

বাংলার নূতন নবাব মীরজাফর (শাসনকাল ১৭৫৭-১৭৬০ খ্রী.) ইংরেজদের বিনা শুল্কে বাণিজ্য করবার অধিকার দিলেন। মীরজাফরের পর নূতন নবাব মীরকাসিম (শাসনকাল ১৭৬০-১৭৬৪ খ্রী.) ইংরেজদের বিরোধী ছিলেন। ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজদের সঙ্গে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাসিম পরাজিত হলেন।

॥ ওয়ারেন হেস্টিংস ॥

ক্লাইভের পরে ওয়ারেন হেস্টিংস (Warren Hastings, ১৭৩২-১৮১৮ খ্রী.) গভর্নর জেনারেল

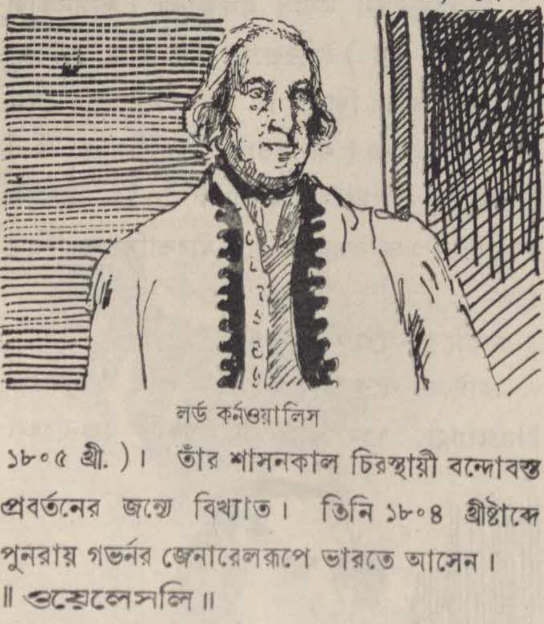


ওয়ারেন হেস্টিংস

হন ও বাংলার শাসনকর্তা হয়ে দেশ শাসন করতে থাকেন। তাঁরই কুচেষ্টায় মহারাজ নন্দকুমার মিথ্যা অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বিচারপতি ইলাইজা ইম্পে কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। একজন সম্পূর্ণ নিরপরাধ ব্যক্তিকে ফাঁসি দেওয়ায় বিলাতে বিখ্যাত বাগ্মী বার্ক (Edmund Burke, ১৭২৯-৯৭ খ্রী.)-এর নেতৃত্বে প্রবল আন্দোলন হয়। তার ফলে হেস্টিংস পদত্যাগ করে বিলাতে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

॥ লর্ড কর্নওয়ালিস ॥

ওয়ারেন হেস্টিংসের পরে গভর্নর জেনারেল হন লর্ড কর্নওয়ালিস (Lord Cornwallis, ১৭৩৮-



লর্ড কর্নওয়ালিস

১৮০৫ খ্রী.)। তাঁর শাসনকাল চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের জন্যে বিখ্যাত। তিনি ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে আসেন।

॥ ওয়েলেসলি ॥

কর্নওয়ালিসের পরে মার্কুইস অব ওয়েলেসলি (Wellesley, Richard Colley, Marquis of, ১৭৬০-১৮৪২ খ্রী.) ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে আসেন। মহীশূরের টিপু সুলতান ও মারাঠা রাজ্যগুলিকে বশে আনতে তাঁকে খুব বেগ পেতে হয়েছিল।

॥ লর্ড হেস্টিংস ॥

১৮১৩ খ্রী. গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে আসেন লর্ড হেস্টিংস (Lord Hastings, Earl of Moira, ১৭৫৪-১৮২৬ খ্রী.)। নেপালযুদ্ধ, মারাঠাযুদ্ধ ও পিণ্ডারী-দমন তাঁর সময়কার প্রসিদ্ধ ঘটনা।

॥ লর্ড বেণ্টিঙ্ক ॥

হেস্টিংস-এর পরে গভর্নর জেনারেলরূপে আসেন লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক (Lord William Bentinck, ১৭৭৪-১৮৩৯ খ্রী)। ঠগীদমন, সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ প্রভৃতি তাঁর সময়ের প্রসিদ্ধ ঘটনা।



রাজা রামমোহন রায়

রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রী.) বেণ্টিঙ্কের সময়কার খ্যাতনামা মনীষী। ['সাহিত্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।]

॥ লর্ড হার্ডিঞ্জ ॥

লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge, ১৭৮৫-১৮৬৭ খ্রী.) ১৮৪৪ থেকে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন। তাঁর সময় প্রথম শিখযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়।

॥ রণজিৎ সিংহ ॥

পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহ (১৭৮০-১৮৩৯ খ্রী.)

পেশোয়ার থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি হন। ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধিতে স্থির হয়, তাঁর আধিপত্য কেবল শতদ্রুর পশ্চিমপারে থাকবে।



॥ লর্ড ডালহাউসি ॥

লর্ড ডালহাউসি (Lord Dalhousie, ১৮২২-১৮৬০ খ্রী.) গভর্নর জেনারেলরূপে ভারতে এসে স্থির করেন, দেশীয় রাজাদের গৃহীত পোষ্যপুত্র রাজ্যের অধিকার পাবে না। তার ফলে দেশীয় রাজাদের মধ্যে প্রবল অসন্তোষের সৃষ্টি হয়।

॥ সিপাহী বিদ্রোহ ॥

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। সিপাহী বিদ্রোহের পর মহারানী ভিক্টোরিয়া (Victoria, ১৮১৯-১৯০১ খ্রী.) ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন। লর্ড কার্জন ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলাকে দু'ভাগে ভাগ করেন। তার ফলে দেশে প্রবল রাজনৈতিক আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়। দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন চলতেই থাকে। শেষ পর্যন্ত বহু লোকের আত্মত্যাগের পর ভারত স্বাধীন হয়। ('ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম' অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

॥ ভারত বিভাগ ॥

ইংরেজরা ভারতকে স্বাধীন করে এ দেশ ত্যাগ করে যায়। তারা অখণ্ড ভারতকে দু টুকরো করে দিয়ে যায়। ভারত ও প্যাকিস্তান দুই পৃথক্ রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

পাকিস্তান

কোয়ায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্নার নেতৃত্বে বৃটিশশাসিত ভারতের সিন্ধুপ্রদেশ, বালুচিস্তান, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাবের পশ্চিমাংশ এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের শ্রীহট্ট জেলা নিয়ে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তান গঠিত হয়। বাহাওয়ালপুর, খয়েরপুর, চিত্রল প্রমুখ তেরটি দেশীয় রাজ্য পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। পাকিস্তান জোর করে জম্মু ও কাশ্মীরের একাংশ অধিকার করে। ঐ এলাকার নাম হয় আজাদ কাশ্মীর।

শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ববঙ্গ স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে বাংলাদেশ নাম গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মির্জার পর ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ আয়ুব খান পাকিস্তানে ক্ষমতায় আসীন হন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে আয়ুব খাঁ ক্ষমতা ত্যাগ করলে আগা মহম্মদ ইয়াহিয়া খান শাসনভার গ্রহণ করেন।

স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের পর ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দে ইয়াহিয়া খান পদত্যাগ করেন। জে. এ ভুট্টো প্রেসিডেন্ট হন। পরে ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি প্রেসিডেন্ট পদ ত্যাগ করলে ফজল ইলাহি প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল এম. জিয়া-উল-হক সামরিক শাসন জারি করেন। ভুট্টো হত্যার ষড়যন্ত্রের জন্যে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। জিয়া-উল-হক ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন।

বিভিন্ন সময়ে কোয়ায়েদ-ই-আজম মহম্মদ আলি জিন্না, খোজা নাজিমুদ্দীন, গোলাম মহম্মদ, মেজর জেনারেল ইস্কান্দর মির্জা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হন। প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

পাকিস্তান বিভিন্ন সময়ে ভারত আক্রমণ করলে ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাকিস্তানী সৈন্যদের পরাস্ত করে।

সাধারণ নির্বাচন না হওয়ায় পাকিস্তানবাসীরা ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রচণ্ডভাবে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। বহু লোক হতাহত হয়।

পাকিস্তান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে বিপুল আধুনিক রণসম্ভার পায়।

পাকিস্তানের আয়তন ৮,০১,৪০৮ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা প্রায় আট কোটি (১৯৮০) ; রাজধানী ইসলামাবাদ।

॥ বঙ্গদেশ ॥

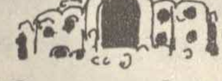
বঙ্গদেশও পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গ এই দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। প্রথম দিকে পূর্ববঙ্গ পূর্ব পাকিস্তান রূপে পাকিস্তানের অংশ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হয়। পরে শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে। ভারতকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করে বহু ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করতে হয়। অগণিত প্রাণহানি ও অপরিমিত অর্থ-ব্যয়ের পর পশ্চিম পাকিস্তান পরাজিত হয়।



মুজিবর রহমান

॥ বাংলাদেশ ॥

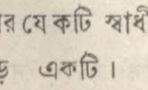
পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট আয়ুব খাঁ কঠোর হস্তে পূর্ববঙ্গের আন্দোলন দমন করতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হলে শাসনভার ত্যাগ করেন। ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব-বঙ্গের মানুষদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালান। শেষ পর্যন্ত নিজেদের চেষ্টায় ও ভারতের সক্রিয় সহায়তায় পূর্ববঙ্গ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়ে 'বাংলাদেশ' নাম গ্রহণ করে। পরে মুজিবর রহমান সপরিবারে নিহত হন এবং বাংলাদেশে বহু রাজনৈতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৪ ০২০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৮,৮৭,০০,০০০ (১৯৮০) ; রাজধানী ঢাকা।



॥ সম্রাট্ শশাঙ্ক ॥

গুপ্তযুগের পূর্বে বঙ্গদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। গুপ্তযুগের পর যে কটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়, তন্মধ্যে গৌড় একটি। ঐ সময়কার রাজাদের মধ্যে ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচার দেবের নাম জানা যায়। ষষ্ঠ শতকে কনৌজরাজ ঈশান বর্মন বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন।

ষষ্ঠ শতকের শেষে বা সপ্তম শতকের প্রথম দিকে মহাবীর শশাঙ্ক গৌড়ে প্রবল হয়ে ওঠেন। কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদের 'রাঙামাটি') ছিল তাঁর রাজধানী। আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কামরূপের রাজা ভাস্কর বর্মন তাঁর রাজ্য দখল করে নেন। শশাঙ্ক প্রথম বাঙালী সম্রাট্।



॥ রাজা গোপাল ॥

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বহু দিন বঙ্গদেশে 'মাৎস্যন্যায়' অর্থাৎ প্রবল কর্তৃক দুর্বলকে গ্রাস করার নীতি চলতে থাকে। শেষে খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে দেশবাসী গোপাল দেব নামে এক

ব্যক্তিকে রাজা নির্বাচিত করে। তিনি পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ওদন্তপুরের বিখ্যাত বিহার তিনিই নির্মাণ করান। তাঁর পুত্রের নাম ধর্মপাল।

॥ ধর্মপাল ॥

ধর্মপাল (রাজত্বকাল ৭৭০-৮১০ খ্রী.) পালবংশীয় দ্বিতীয় ও শ্রেষ্ঠ রাজা। কামরূপ পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত হয়। তাঁর উপাধি ছিল 'বিক্রমশীল'। মগধের বিখ্যাত বৌদ্ধবিহার বিক্রমশীলা তাঁরই কীর্তি। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন। দেবপাল তাঁর পুত্র।

॥ দেবপাল ॥

দেবপাল (৮১৫-৮৫৪ খ্রী.) পালবংশের তৃতীয় রাজা। তাঁর সময়ে বঙ্গদেশের সীমা আসাম ও উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

॥ মহীপাল ॥

প্রথম মহীপাল (রাজত্বকাল ৯৮৮-১০৩৮ খ্রী.) পালবংশীয় দশম রাজা। তাঁর সময়ে দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ (৯৮০-আনুমানিক ১০৫৩ খ্রী.) বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন।

দ্বিতীয় মহীপাল (রাজত্বকাল ১০৭০-১০৭৫ খ্রী) পালবংশীয় ত্রয়োদশ রাজা। উত্তরবঙ্গের প্রজাগণের অধিনায়ক দিব্য বা দিব্বোক তাঁকে নিহত করেন।

॥ বল্লালসেন ॥

বঙ্গদেশের সেনবংশীয় হিন্দু রাজা সামন্ত সেন ছিলেন দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটকের লোক। তিনি সেন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গের সেনবংশীয় রাজা বিজয় সেনের পিতামহ ছিলেন সামন্ত সেন। বিজয় সেন বিখ্যাত বল্লালসেনের পিতা। বল্লাল সেন বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার প্রবর্তন করেন। তিনি রাঢ় (বর্ধমান বিভাগ), বরেন্দ্র (রাজসাহী বিভাগ), বাগড়ি (প্রেসিডেন্সি বিভাগ), বঙ্গ (ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ) এবং মিথিলা—এই পাঁচ ভাগে নিজ রাজ্যকে বিভক্ত করে নবদ্বীপ, রামপাল ও গৌড় —এই তিন স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি আনুমানিক ১১১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁর লেখা 'দানসাগর'ও 'অদ্ভুত সাগর' নামে দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে।



॥ লক্ষ্মণ সেন ॥

লক্ষ্মণ সেন (১১১৯-১২০৩ খ্রী) নবদ্বীপে রাজত্ব করতেন। তাঁর সভায় জয়দেব, শূলপাণি, হলায়ুধ, উমাপতি ধর, শরণ, গোবর্ধন, ধোয়ী কবি প্রভৃতি পণ্ডিতরা ছিলেন। কথিত আছে, মহম্মদ ঘোরীর সেনাপতি মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজী এক বিরাট সৈন্যবাহিনী নিয়ে নদীয়া আক্রমণ করেন। তাঁর সতের জন অশ্বারোহী সৈন্য অতর্কিতে রাজপুরীতে প্রবেশ করে। ৮০ বৎসরের বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেন রাজপুরী ত্যাগ করে চলে যান।

ঐতিহাসিকেরা বলেন, লক্ষ্মণ সেনের পরেও কয়েকজন হিন্দু রাজা বঙ্গদেশে ছিলেন।

॥ বঙ্গদেশে মুসলিম রাজত্ব ॥

খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ্ বঙ্গদেশে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন (১৩৪২ খ্রী.)। তাঁর নাম থেকে তাঁর বংশকে বলা হয় ইলিয়াস শাহী রাজবংশ। ১৩৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর পুত্র সিকন্দর শাহ্ পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করেন। তাঁর পুত্র গিয়াসুদ্দীন আজম। ১৩৪২ থেকে ১৪১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইলিয়াসশাহী বংশ গৌড়ে রাজত্ব করে।

॥ রাজা গণেশ ॥

রাজা গণেশ গিয়াসউদ্দীন আজমের রাজত্বকালে রাজস্ব ও শাসনবিভাগের কর্তা ছিলেন। তাঁর চক্রান্তে আজম শাহ্ নিহত হন। রাজা গণেশ ইলিয়াসশাহী সুলতানের হাত থেকে গৌড় রাজ্য কেড়ে নেন। তিনি নিষ্ঠাবান্ হিন্দু ছিলেন। কিন্তু

তাঁর পুত্র যত্থ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন মহম্মদ শাহ্ নাম গ্রহণ করেন।

জালালুদ্দীন হিন্দুদের উপর বহু অত্যাচার করেন। তাঁর অযোগ্য পুত্র শামসুদ্দীন আহ্মদ পিতার চেয়ে বেশী অত্যাচারী ছিলেন।

॥ হুসেন শাহ্ ॥

বিদ্রোহীদের দ্বারা হাবসী সুলতান শামসুদ্দীন মুজফ্ফর শাহ নিহত হলে হুসেন শাহ্ সুলতান হন (রাজত্বকাল ১৪৯৩-১৫১৮ খ্রী.)। তাঁর সময়ে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিরসাশ্রিত বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেন।

হুসেন শাহ্ ও তাঁর পুত্র নসরৎ শাহের আমলে (রাজত্বকাল ১৫১৯-১৫৩৩ খ্রী) ছোট সোনা মসজিদ ও বড় সোনা মসজিদ নির্মিত হয়। নসরৎ শাহ্ বঙ্গ সাহিত্যের একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

॥ গৌড়ে দিল্লীর আধিপত্য ॥

শের শাহের আমলে গৌড় পুনরায় দিল্লীর অধীন হয়। শাহ্জাহানের সময় তাঁর পুত্র সুজা বঙ্গদেশের শাসনকর্তা হন। সুজার মৃত্যুর পর আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খাঁকে বঙ্গদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এর পর বঙ্গদেশে ইংরেজ আমল শুরু হয়।

ভারতের আয়তন ৩১,৫৯,৫৩০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৬৮,৩০,০০,০০০ (১৯৮১); রাজধানী নিউ দিল্লী। (আয়তন ও লোকসংখ্যা পাকিস্তান-অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীরের অংশ বাদে।)

ভুটান

ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত স্বাধীন পার্বত্য রাজ্য। ভুটানে রাজতন্ত্র বিদ্যমান। এর উত্তরে ও পূর্বে তিব্বত ও ভারতবর্ষ, পশ্চিমে সিকিম এবং দক্ষিণে ভারতবর্ষ। এর আয়তন ৪৬,৬০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১১ লক্ষ (১৯৭৯); রাজধানী থিম্পু (Thimpu)। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জিগমি দোরজি ওয়াংচুক পরলোকগমন করলে তাঁর পুত্র জিগমি সিংগি ওয়াংচুক সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

চীন

সুমের, মিশর, ভারতের মতো চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন। প্রায় পাঁচ হাজার বৎসর পূর্বের চীনা ইতিহাস জানা যায়।

চীনদেশ ভারতের ন্যায় প্রাকৃতিক দিক্ দিয়ে সুরক্ষিত। চীনের পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণ-পশ্চিমে হিমালয় গিরিশ্রেণী, আর পশ্চিমে ও উত্তরে নানা পাহাড়-পর্বত এবং দুস্তর মরুভূমি। পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশী লোকের বাসভূমি চীন।

চীনদেশে ইয়াংসিকিয়াং ও পীত নদী (হোয়াং-হো) নামে দুটি নদীর মধ্যের উর্বর সমতলভূমিতে ছিল চীনাদের আদি বাস। এখান থেকেই কালক্রমে তারা সারা চীনদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

॥ চী'ন শি হুয়াং-তি ॥

প্রাচীন কাল থেকে চীনে অনেক রাজবংশ রাজত্ব করে। এর মধ্যে শিয়া (Hsia) বংশ চারশ', চী'ন (Tsin) বংশ প্রায় সাড়ে ছশ' ও চৌ-বংশ নশ' বছর রাজত্ব করে। চৌ-বংশের রাজাদের পরে পুনরায় চী'ন বংশের রাজার হাতে শাসন-ক্ষমতা চলে যায়। চী'ন বংশের শ্রেষ্ঠ রাজার নাম চী'ন শি হুয়াং-তি (রাজত্বকাল খ্রীষ্টপূর্ব ২৪৬-২১০ অব্দ)। তাঁরই সময়ে দুর্ধর্ষ হুন প্রভৃতি জাতির আক্রমণ থেকে রাজ্যকে রক্ষা করবার জন্যে ৩,৪৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ (শাখা প্রাচীর আরো ২,৮৬০ কিলোমিটার দীর্ঘ) ৪·৫ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত

উঁচু ও ৯৮ মিটার পুরু প্রাচীর নির্মিত হয়। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই প্রাচীরের মেরামত কার্য চলে। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রাচীরের ৫১.৫ কিলোমিটার অংশ ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে কিছু অংশ বাঁধ (dam) তৈরির জন্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়।

চৌ-বংশের রাজত্বকালে কনফুসিয়াস ও লাওৎ সের আবির্ভাব হয়।

॥ হান বংশ ॥

চী'ন বংশের পতনের পর হান বংশের রাজত্বের আরম্ভ। এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা উ-তি। তাঁর সময়ে চীনে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার হয়। হান রাজাদের আমলে চীনে চা-এর প্রচলন হয়।

॥ তাং বংশ ॥

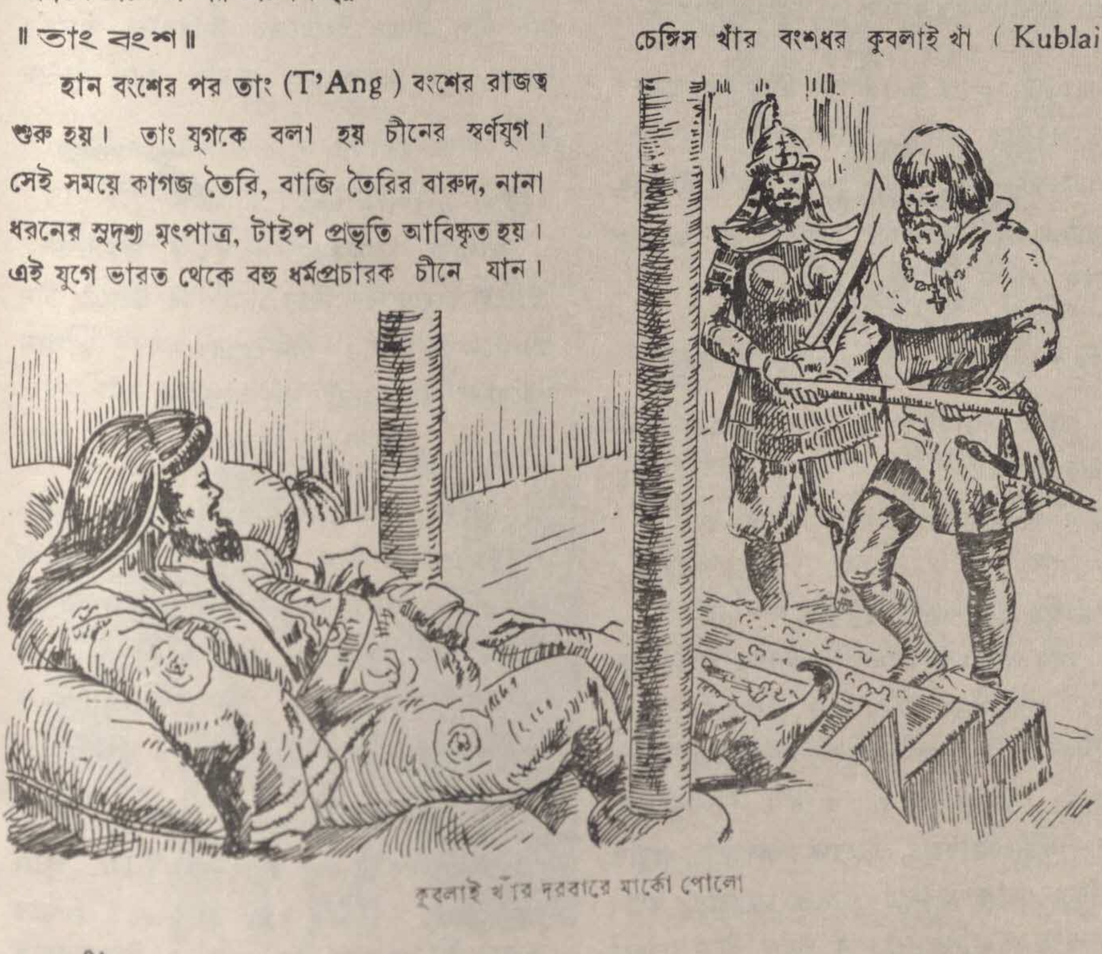
হান বংশের পর তাং (T'Ang) বংশের রাজত্ব শুরু হয়। তাং যুগকে বলা হয় চীনের স্বর্ণযুগ। সেই সময়ে কাগজ তৈরি, বাজি তৈরির বারুদ, নানা ধরনের সুদৃশ্য মৃৎপাত্র, টাইপ প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়। এই যুগে ভারত থেকে বহু ধর্মপ্রচারক চীনে যান। হিউয়েন সাং এই সময়ে ভারতে আসেন। তাং রাজারা দুর্বল হয়ে পড়লে তাতাররা চীনের রাজধানী পিকিং দখল করে।

॥ চেঙ্গিস খাঁ ॥

চীনের উত্তরে মধ্য এশিয়ায়, ভারত, চীন ও সাইবীরিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুর্ধর্ষ মঙ্গোল জাতির বাস ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীতে চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে তারা চীন আক্রমণ করে। চেঙ্গিস খাঁ Genghiz Khan (১১৬২-১২২৭ খ্রী.) চীনের রাজাকে তাড়িয়ে পিকিং দখল করেন। তাঁর সাম্রাজ্য পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

॥ কুবলাই খাঁ ॥

চেঙ্গিস খাঁর বংশধর কুবলাই খাঁ (Kublai



কুবলাই খাঁর দরবারে মার্কো পোলো



তাং যুগে রাজসভায় কবি লি-পো কর্তৃক কবিতা পাঠ

Khan, ১২১৬-৯৪ খ্রী.) সম্পূর্ণ চীন জয় করেন। তাঁর দরবারে প্রসিদ্ধ পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo, ১২৫৬-১৩২৩ খ্রী.) উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ১৭ বৎসর চীনে অবস্থান করেন।

॥ মিং বংশের রাজত্ব ॥

চতুর্দশ শতাব্দীতে চীনে মিং (Ming) বংশের রাজত্ব শুরু হয়। ১৩৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিং বংশের রাজারা রাজত্ব করে।

॥ মাঞ্চু বংশের রাজত্ব ॥

তার পরে মাঞ্চু বংশের রাজাদের রাজত্ব শুরু হয়। মাঞ্চু বংশই চীনের শেষ রাজবংশ। মাঞ্চু বংশের রাজার আমলে ইউরোপীয়ানরা চীনে বাণিজ্য করতে যেতে থাকে। পোর্তুগিজ, ওলন্দাজ, রাশিয়ান, ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি জাতির লোক ব্যবসায় করতে সে দেশে যায়। ওলন্দাজ ও রাশিয়ানরা শেষ পর্যন্ত চীনে ব্যবসায় করতে যাওয়া বন্ধ করে। ইংরেজ ও পোর্তুগিজ ব্যবসায়ীরা থেকে যায়।

॥ আফিম-যুদ্ধ ॥

ইংরেজরা চীনে আফিমের ব্যবসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করতে থাকে। মাঞ্চুরাজা দেখলেন, আফিম খেয়ে চীনারা দুর্বল হয়ে পড়ছে। তিনি চীনে আফিমের ব্যবসায় বন্ধ করে দিলেন। ইংরেজরা এতে চটে গিয়ে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে চীনাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। এই যুদ্ধকে বলে আফিম-যুদ্ধ। দু বৎসর ধরে যুদ্ধ চলল। চীন হেরে গিয়ে পাঁচটি বন্দরে ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিল। তন্মধ্যে হংকং দ্বীপ একটি। সেই দ্বীপ আজও ইংরেজের অধিকারে আছে। অবশ্য এই অধিকারের মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে।

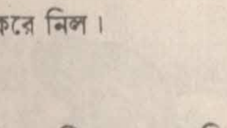


॥ চীন-জাপান যুদ্ধ ॥

জাপানও চীনে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করল। কোরিয়া ও মাঞ্চুরিয়া নিয়ে ১৮৯০-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন জাপানে যুদ্ধ চলল। চীন হেরে গেল। জাপান ফরমোজা (তাইওয়ান) দখল করে নিল।

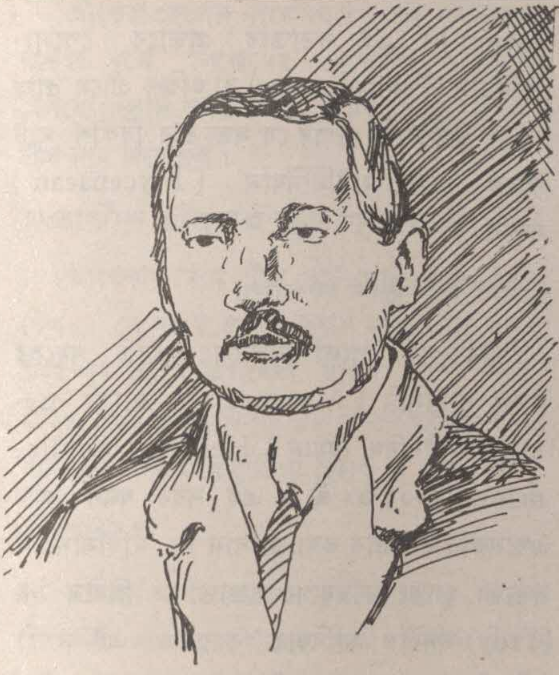
॥ বক্সার বিদ্রোহ ॥

এর পর ইংরেজ, ফরাসী, রাশিয়ান; প্রভৃতি জাতির লোকেরা চীন দেশটাকে ভাগ করে নিতে শুরু করল। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে চীনারা বিদ্রোহী হয়ে বিদেশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। একে বলা হয় বক্সার বিদ্রোহ। চীনারা ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে পরাজিত হল।



॥ সান ইয়াৎ-সেন ॥

তখন দেশে ডঃ সান ইয়াৎ-সেন (Dr. Sun Yat-Sen, ১৮৬৬-১৯২৫ খ্রী.)-এর নেতৃত্বে কুয়োমিন্টাং দল দুর্বল মাঞ্চু রাজাকে সিংহাসনচ্যুত



সান ইয়াৎ-সেন

করে ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে চীনে প্রজাতন্ত্র স্থাপন করল। সান ইয়াৎ-সেন রাষ্ট্রপতি হলেন।

॥ চিয়াং কাই-শেক ॥

সান ইয়াৎ-সেনের মৃত্যুর পর চিয়াং কাই-শেক (Chiang Kai-Shek, ১৮৮৭-১৯৭৫ খ্রী.) কুওমিণ্টাং দলের নেতা হলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির



চিয়াং কাই-শেক

সঙ্গে চিয়াং কাই-শেকের প্রবল বিরোধ বাধল।

॥ চীনের কাছে জাপানের আত্ম সমর্পণ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চীন মিত্রশক্তির পক্ষে যোগদান করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান বিনা শর্তে মিত্রশক্তির নিকট আত্মসমর্পণ করে। জাপান চীনের কাছেও আত্মসমর্পণ করে।



॥ চীনে গৃহযুদ্ধ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়।



মাও সে-তুং

মাও সে-তুং-এর নেতৃত্বে কম্যুনিস্ট বাহিনী চিয়াং কাই-শেকের বাহিনীকে ক্রমাগত পরাজিত করে।

॥ তাইওয়ানে চিয়াং কাই শেক ॥

চিয়াং কাই-শেক মূল চীনা ভূখণ্ড ত্যাগ করে ফরমোজা দ্বীপে (তাইওয়ানে) চলে গেলেন ও সেখানে থেকে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। মার্কিন সাহায্যপুষ্ট তাইওয়ানে চীনা আক্রমণের আশঙ্কা দূরীভূত হয়।



॥ তাইওয়ান ॥

তাইওয়ানের নাম হয়েছে রিপাবলিক অব চায়না। এর আয়তন ৩৫,৯৮৯ বর্গ কিলোমিটার ;

লোকসংখ্যা ১,৭৪,৮০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী তাইপে।

॥ চীনের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব ॥

চীন কম্যুনিস্ট-প্রভাবিত রাজ্য হলেও প্রথম দিকে রাশিয়ার সঙ্গে তার যে বন্ধুত্ব-সম্পর্ক ছিল তার হানি ঘটেছে। বর্তমানে তার মনোভাব কতকটা সাম্রাজ্যবাদী হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীন ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত অধিকার করে বসল। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের উত্তরাংশের এক বিরাট এলাকা দখল করে নিল। সেই অংশ আজও চীনাদের দখলে আছে।



॥ চীন সাধারণতন্ত্র ॥

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটাতে শুরু করে। নানাভাবে উন্নততর অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত হয়ে চীন সাধারণতন্ত্র পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে।

চীনের আয়তন ৯৫,৯৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৯৭,১০,০০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী বেইজিং (পিকিং)।

গ্রীস

॥ গ্রীসের সভ্যতা ॥

গ্রীসের সভ্যতাও খুব প্রাচীন। বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার দর্শন, সাহিত্য, জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদির প্রায় সব কিছুই প্রাচীন গ্রীসের দান।

॥ মিনোয়ান সভ্যতা ॥

সুমের, মিশর, ভারত ও চীনে যখন সভ্যতার বিকাশ ঘটে সেই সময়ে গ্রীসের পার্শ্বে ইজিয়ান সাগর (Aegian Sea) অঞ্চলে অবস্থিত ক্রীট দ্বীপে যে সুপ্রাচীন সভ্যতার প্রসার হয়, তাকে বলে মিনোয়ান সভ্যতা (Minoan Civilization)। এই সভ্যতার প্রভাবে পেলোপনিসাস (Peloponnesus) বা দক্ষিণ গ্রীসে প্রায় ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ যে সভ্যতার বিকাশ ঘটে তাকে বলে মাইসিনিয়ান (Mycenaean) সভ্যতা।

॥ মাইসিনিয়ান সভ্যতা ॥

উত্তর-পূর্ব পেলোপনিসাসের একটি শহরের নাম মাইসিনি (Mycenae)। জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক হাইনরিখ্ শ্লিমান (Heinrich Schliemann, ১৮২২-৯০ খ্রী) এই শহর খনন করে এখানকার সভ্যতার কথা জানান। মাইসিনিয়ান সভ্যতা মূলতঃ তাম্রযুগের সভ্যতা। শ্লিমান ট্রয় (Troy) নগরীও আবিষ্কার করেন। এই নগরী এশিয়া মাইনরে অবস্থিত ছিল।



॥ ইলিয়াড ও অডিসি ॥

ট্রয়-যুদ্ধের প্রাচীন উপকথা ও কাহিনীকে অবলম্বন করে হোমার (৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ইলিয়াড (Iliad) ও অডিসি (Odyssey) মহাকাব্য রচনা করেন।



হোমার

হোমারের ইলিয়াড-বর্ণিত ট্রোজান যুদ্ধের নেতা ছিলেন আগামেমনন (Agamemnon)। তিনি ছিলেন মাইসিনীয় রাজা।

গ্রীকেরা হেলেন নামে তাদের এক পূর্বপুরুষের বংশধর বলে নিজেদের হেলেনীজ ও তাদের দেশকে হেলাস বলত। রোমানরা পরে গ্রীক ও গ্রীস নাম দিয়েছিল।

॥ প্রাচীন গ্রীসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র ॥

আগেকার দিনে গ্রীস ছোট ছোট রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। সে সময়ে প্রধান প্রধান নগররাষ্ট্রের মধ্যে উত্তর-পূর্ব গ্রীসে অ্যাথেন্স, দক্ষিণ গ্রীসে স্পার্ট, করিন্থ, উত্তর গ্রীসে থিব্‌স্‌ এবং তারও অনেক উত্তরে ম্যাসিডন নগর উল্লেখযোগ্য ছিল।

॥ স্পার্টা ॥

প্রসিদ্ধ আইন-প্রণেতা লাইকারগাস কর্তৃক নিয়মনিষ্ঠ সংস্কার প্রবর্তনের ফলে স্পার্টা বিশেষ শক্তিশালী হয়। স্পার্টানগণ ক্রমে পেলোপনিসাস বা দক্ষিণ গ্রীসে প্রধানতম শক্তি হয়ে ওঠে।

॥ অ্যাথেন্সে গণতন্ত্র ॥

মধ্য গ্রীসে অ্যাটিকাতে অ্যাথেন্স নগরী রাজনীতিজ্ঞ সোলন (Solon, ৬৩৮-৫৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর চেষ্টায় সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। কাইস্থিনিস-প্রবর্তিত গণতন্ত্রের চরম বিকাশ হয় পেরিক্লিজ (Pericles, আনুমানিক ৪৯০-৪২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর বিজ্ঞ শাসনসংস্কারের ফলে।



॥ গ্রীক সভ্যতার প্রসার ॥

গ্রীস থেকে আইয়োনিয়ান জাতির লোকেরা এশিয়ার উপকূলে গিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করার ফলে সেই অঞ্চলের নাম আইয়োনিয়া (Ionia)। সেখান থেকে স্পেন, ইটালী, আফ্রিকা প্রভৃতি স্থানে গ্রীকেদের বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে গ্রীক সভ্যতা ছড়িয়ে পড়ে।

॥ ম্যারাথন, থার্মোপীলি ও সালামিসের যুদ্ধ।

পরে শক্তিশালী পারস্য-সম্রাট্‌ প্রথম দরায়ুস (Darius, I, ৫৪৮-৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) গ্রীস আক্রমণ



রাজা দরায়ুস



থার্মোপিলীর যুদ্ধ



ম্যারাথনের যুদ্ধ

করলে ম্যারাথন-নামক স্থানে যুদ্ধ বাধে। অ্যাথেন্সের গ্রীকবাহিনী দরায়ুসের পারসিক বাহিনীকে



জেরক্সেজ

পরাজিত করে (৪৯০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। পরে প্রথম দরায়ুসের পুত্র জেরক্সেজ (Xerxes, আনুমানিক



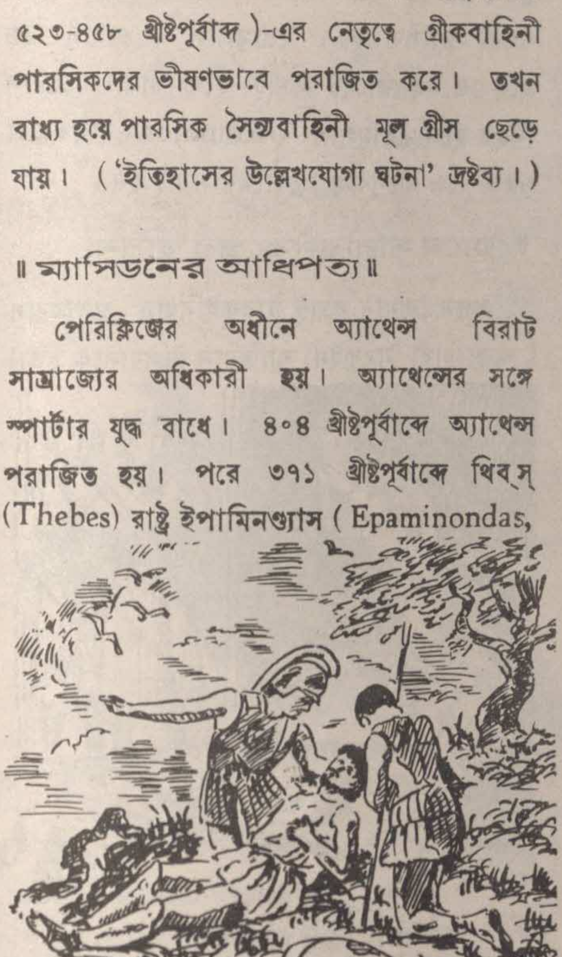
সালামিসের নৌযুদ্ধ

৫১৯-৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রেরিত এক বিরাট সৈন্যবাহিনী থার্মোপীলি (Thermopylae)-নামক গিরিসংকটে (৪৮০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) স্পার্টান সৈন্যদের পরাজিত করে। পরে সালামিসের নৌযুদ্ধে

থিমিস্টোক্লিজ (Themistocles, আনুমানিক ৫২৩-৪৫৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর নেতৃত্বে গ্রীকবাহিনী পারসিকদের ভীষণভাবে পরাজিত করে। তখন বাধ্য হয়ে পারসিক সৈন্যবাহিনী মূল গ্রীস ছেড়ে যায়। ('ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা' দ্রষ্টব্য।)

॥ ম্যাসিডনের আধিপত্য ॥

পেরিক্লিজের অধীনে অ্যাথেন্স বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়। অ্যাথেন্সের সঙ্গে স্পার্টার যুদ্ধ বাধে। ৪০৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অ্যাথেন্স পরাজিত হয়। পরে ৩৭১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে থিব্‌স্ (Thebes) রাষ্ট্র ইপামিনণ্ড্যাস (Epaminondas,



ইপামিনণ্ড্যাসের মৃত্যু

আনুমানিক ৪১৮-৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)-এর নেতৃত্বে স্পার্টাকে হারিয়ে দেয়। তার প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে ম্যাসিডন (Macedon) রাষ্ট্র প্রভূত ক্ষমতা লাভ করে। রাজা ফিলিপ (Philip, ৩৮২-৩৩৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। আলেকজাণ্ডার দ্য গ্রেট (Alexander the Great, ৩৫৬-৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) তাঁর পুত্র।

॥ আলেকজাণ্ডারের দিগ্বিজয় ॥

আলেকজাণ্ডার প্রায় সমস্ত গ্রীস জয় করে পারস্য জয় করেন। পারসিকরা আগে অ্যাথেন্সের সুন্দর মন্দিরটি পুড়িয়ে ধ্বংস করেছিল। তারই প্রতিশোধ হিসাবে তিনি পার্সেপোলিস নগরীর পারস্য সম্রাটের প্রাসাদকে অগ্নিদগ্ধ করেন।

তিনি জেরুজালেম, মিশর, ব্যাবিলন প্রভৃতি দখল করে উত্তর ভারতে এলেন। পুরু নামে এক রাজা তাঁকে প্রবল ভাবে বাধা দিলেন। যুদ্ধে পুরুর পরাজয় হল। অবশ্য, অনেক ঐতিহাসিক বলেন, পুরুর পরাজয় হয় নি। তাঁর দ্বারা পরাজিত হয়েই আলেকজাণ্ডার ভারত ত্যাগ করেন।

সৈন্যবাহিনীসহ দেশে ফিরে যাবার সময় আলেকজাণ্ডার ব্যাবিলনে ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। ৩৪ বৎসর বয়সে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। (এই অধ্যায়ের 'ভারতবর্ষ' অংশ দ্রষ্টব্য।)

আলেকজাণ্ডারের মৃত্যুর পর রোমানরা গ্রীসদেশ দখল করে।



॥ গ্রীসে নানা মনীষীর জন্ম ॥

রোমানদের গ্রীস অধিকারের পূর্বে সক্রেটিস



সক্রেটিস

(Socrates, ৪৬৯-৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), প্লেটো (Plato, ৪২৭-৩৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), অ্যারিস্টটল Aristotle, ৩৮৪-৩২২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) প্রভৃতি বহু মনীষীর উদ্ভব হয়।

॥ গ্রীসের স্বাধীনতা লাভ ॥

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে অটোমান তুর্কীরা রোমান

সাম্রাজ্য জয় করলে গ্রীস তাদের অধিকারভুক্ত হয়

গ্রীকরা মুক্তি আন্দোলন চালিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভ করে। ইংল্যাণ্ডের মহারানী ভিক্টোরিয়ার পরামর্শে ডেনমার্কের রাজকুমারকে গ্রীকরা গ্রীসের সিংহাসনে বসায়। রাজার নাম হয় প্রথম জর্জ। প্রায় একশ' বছরের কিছু বেশী সময় ধরে গ্রীসে রাজতন্ত্র চলবার পর ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় গ্রীসে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গ্রীস নাৎসী জার্মানির অধিনায়ক হিটলারের অধীন হয়। যুদ্ধে নাৎসী জার্মানির পতন হলে গ্রীস পুনরায় স্বাধীন হয়।

॥ গ্রীসে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ॥

নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গ্রীসে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কনস্ট্যানটিনস কারামানলিস ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীসের প্রেসিডেন্ট হন। প্রধানমন্ত্রী হন জর্জ র‍্যালিস।

গ্রীসের উত্তরে আলবেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া ও বুলগেরিয়া, পূর্বে তুরস্ক ও ইজিয়ান সাগর, দক্ষিণে ভূমধ্য সাগর এবং পশ্চিমে আইওনিয়ান সাগর। এর আয়তন ১,৩১,৯৮৬ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৯৫ লক্ষ (১৯৮০) ; রাজধানী অ্যাথেন্স।

রোমান সাম্রাজ্য

বর্তমানে রোম ইতালীর রাজধানী, একটি নগরী মাত্র। প্রাচীন কালে রোম সমগ্র ইতালি, ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশের বিস্তৃত অঞ্চলের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। এক শক্তিশালী রোমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়।

॥ রোমের প্রতিষ্ঠা ॥

প্রবাদ এই যে, ইতালির ল্যাটিয়ামের পাহাড়ে রোমুলাস ও রেমাস নামে দুই ভাই নেকড়ে বাঘের দুধ খেয়ে বড় হয়ে ওঠে। তাদের দ্বারাই রোম নগরী স্থাপিত হয়। রোমুলাস ও রেমাস বড় হয়ে দুজনেই রোমের সম্রাট্ হতে চান। রেমাস নিহত হলে রোমুলাস (Romulus, রাজত্বকাল ৭৫৩-৭১৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রোমের সম্রাট্ হন।

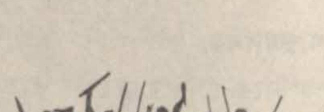
॥ রোমে সাধারণতন্ত্রের স্থাপনা ॥

সপ্তম রোমান সম্রাট্ টারকুইনিয়াস সুপারবাস (অত্যাচারী টারকুইন) সার্ভিয়াস টুলিয়াসকে হত্যা



প্যাট্রিসিয়ান ও প্লিবিয়ান

করে সিংহাসন দখল করেন। ৫১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে টারকুইনের মৃত্যু হয়। তার পর রোমে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।



॥ প্যাট্রিসিয়ান-প্লিবিয়ান সংঘর্ষ ॥

তখনকার দিনে রোমের উচ্চশ্রেণীর লোকদের বলা হত প্যাট্রিসিয়ান এবং জনসাধারণকে বলা হত প্লিবিয়ান। ক্রমাগত দু'শ বছরের সংঘর্ষের পর প্লিবিয়ানদের অভাব-অভিযোগ দূরীভূত হয়। প্লিবিয়ানরা সকল সুযোগ-সুবিধার অধিকারী হয়।



রোমুলাস ও রেমাস

॥ হানিবলের পরাজয় ॥

ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে উত্তর আফ্রিকায় অবস্থিত কার্থেজ নগরী ছিল ফিনিসিয়দের শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ। কার্থেজ দখলের জন্যে রোমকে প্রচণ্ড যুদ্ধ চালাতে হয়। এই যুদ্ধকে বলে পিউনিক যুদ্ধ। কার্থেজের বীর হামিলকারের পুত্র হানিবল (Hannibal, ২৪৭-১৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) কার্থেজের নূতন ঘাঁটি স্পেন থেকে বেরিয়ে আল্পস পর্বত পার হন ও উত্তর ইতালি আক্রমণ করেন এবং ইতালির অধিকাংশ স্থান দখল করেন। পরে হানিবল কার্থেজ নগরী রক্ষার জন্যে সসৈন্য যাত্রা করেন। কিন্তু বীর রোমক সেনাপতি সিপিও (Scipio) জামা'র যুদ্ধে হানিবলকে পরাজিত করেন। হানিবল তারপর আত্মহত্যা করেন।

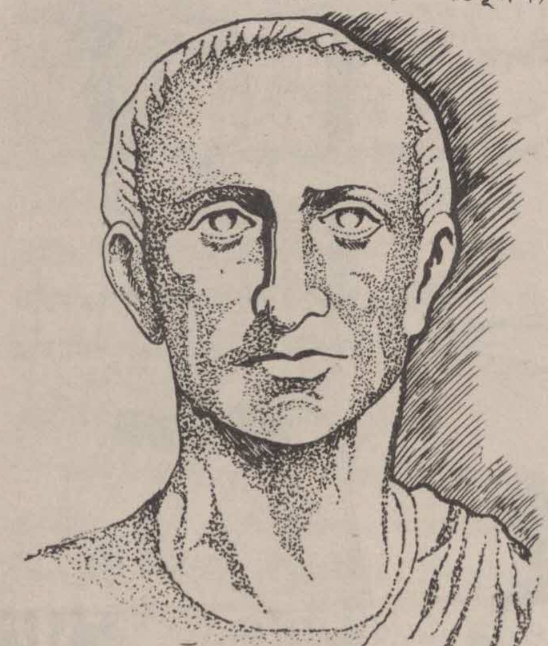
ক্রমে ম্যাসিডোনিয়া, গ্রীস, সিরিয়া স্পেন, মিশর, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।



জামা'র যুদ্ধ

॥ জুলিয়াস সীজার ॥

রোমে প্রচণ্ড রাজনৈতিক দলাদলি দেখা দিলে সুল্লা সব ক্ষমতা দখল করলেন (৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। তার পরে পম্পী (Pompey, ১০৬-৪৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)



জুলিয়াস সীজার

ও জুলিয়াস সীজার (Julius Caesar, ১০০-৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) রোমের রাজনীতিক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করেন। সেপ্টিমাস নামে জুলিয়াস সীজারের এক সৈনিকের দ্বারা পম্পী নিহত হলে সীজার রোমের সর্বেসর্বা হন। তিনি ছিলেন একজন বীর সেনাপতি। ফ্রান্স ও জার্মানির কতকাংশ তাঁর দ্বারা অধিকৃত হয়। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫ ও ৫৪ অব্দে দু'বার ব্রিটেন অভিযান করে ব্রিটেনকে রোমান সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। তিনি পশ্চিম এশিয়ার অনেক স্থানও জয় করেন।

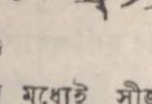
॥ সীজার বধ ॥

সীজারের নেতৃত্বে রোমে সাধারণতন্ত্রের অবসান হয়ে একনায়ক-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর মতো বাগ্মী, প্রতিভাবান্, উদার, শিক্ষিত বীর পুরুষ পৃথিবীতে বিরল। তিনি ক্যালেণ্ডারের সংস্কার করে সমগ্র মানব জাতির অশেষ উপকার করে গেছেন। কিন্তু সেনেটের অনেক স্বার্থপর সদস্য তাঁর শাসন পছন্দ করতেন না। শেষ পর্যন্ত মার্কাস ব্রুটাস (Marcus Brutus, ৮৫-৪২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও কেয়াস কেসিয়াস (Caius Cassius)



সীজারের হত্যাকাণ্ড

-এর উদ্যোগে রোমান সেনেটের মধ্যেই সীজার ছুরিকাঘাতে নিহত হলেন (৪৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ)।



॥ অগস্টাস ॥

সীজারের মৃত্যুর পর রোমে সাধারণতন্ত্রের অস্তিত্ব রইল না। সীজারের ভাগিনেয় অক্টেভিয়ানাস অগস্টাস (Caius Octavianus Augustus ৬৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-১৪ খ্রীষ্টাব্দ) রোমের

সম্রাট্ হলেন। রোমে রাজতন্ত্র স্থাপিত হল। ১২ বৎসর মার্ক অ্যান্টনি ও লেপিডাসের সঙ্গে একযোগে তিনি রাজকার্য পরিচালনা করেন। পরে একা রাজকার্য চালান। তাঁর সময়ে কবি ভার্জিল (Virgil, ৭০-১৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), লিভি, হোরেস (Horace, ৬৫-৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), ওভিড (Ovid, ৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ -১৮ খ্রীষ্টাব্দ প্রভৃতি মনীষী বর্তমান ছিলেন। তাঁর সময়েই যীশুখ্রীষ্ট অবতীর্ণ হন।



॥ নীরো ॥

অগস্টাসের পর অত্যাচারী ও নৃশংস সম্রাট্ নীরো (Nero, ৩৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দ) সম্রাট্ হন।



নীরো

নীরোর নির্দেশে বহু লোককে হত্যা করা হয়। তাঁর সময়েই রোমের প্রায় অর্ধেক আগুনে পুড়ে ধ্বংস হয়।

॥ হাড্রিয়ান ॥

হাড্রিয়ান (Hadrian, ৭৬-১৩৮ খ্রী) ছিলেন শান্তিপ্রিয় রাজা। তাঁর আমলে প্রজারা সুখে-শান্তিতে বাস করতে পেরেছিল।

॥ অ্যাণ্টোনিয়াস ॥

সম্রাট্ অ্যাণ্টোনিয়াস (Antonius, ৮৬-১৬১ খ্রী.) ছিলেন প্রজাপালক, দয়ালু ও ধার্মিক সম্রাট্। তাঁর আমলে রোমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের



হাড্রিয়ান

প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর সঙ্গে ভারত-সম্রাট্ মহাপ্রাণ অশোকের তুলনা করা হয়।

॥ মার্কাস অরেলিয়াস ॥

ধর্মভীরু জ্ঞানী সম্রাট্ মার্কাস অরেলিয়াস (Marcus Aurelius, ১২০-১৮০ খ্রী.) শান্তিতে রাজত্ব করতে পারেন নি। তাঁর সময়ে প্রচণ্ড



মার্কাস অরেলিয়াস

ভূমিকম্পে, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে বহু লোক মারা যায়। প্রজারা মনে করল, দেবতাদের কোপে ওই বিপর্যয় ঘটেছে। তারা দেবতাকে তুষ্ট করতে খ্রীষ্টানদের উপর অত্যাচার শুরু করে।

॥ ডাইঅক্লিশান ॥

সম্রাট্ ডাইঅক্লিশান (Diocletian, ২৪৫-৩১৩ খ্রী.)-এর আমলে খ্রীষ্টানদের সঙ্গে বিরোধ চরমে ওঠে। ডাইঅক্লিশান সকলের প্রতি আদেশ

করলেন, তাঁর পূজা করতে হবে। খ্রীষ্টানরা রাজী হল না। ফলে হাজার হাজার খ্রীষ্টান নিহত হল।



॥ কনস্টানটাইন ॥

কনস্টানটাইন (Constantine, ২৭২-৩৩৭ খ্রী.) সম্রাট্ হয়ে খ্রীষ্টানদের অভয় দিয়ে জানালেন, কাউকে হত্যা করা হবে না। তিনি নিজেও পরে খ্রীষ্টান হন। তিনি কৃষ্ণ সাগরের তীরস্থ বাই-জ্যানটিয়াম(Byzantium)শহরে রোম-সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। তাঁর নামানুযায়ী বাইজানটিয়ামের নাম হল কনস্টানটিনোপল (Constantinople)। তিনি শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে বিরাট রোমান সাম্রাজ্যকে দু-ভাগে ভাগ করলেন। রোম হল পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী, কনস্টানটিনোপল হল পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের রাজধানী। এর ফলে রোমান সাম্রাজ্যের পতন শুরু হল।



॥ রোমান সাম্রাজ্যের পতন ॥

ফ্রাঙ্ক, ভ্যাণ্ডাল, গথ, ভিসিগথ, লম্বার্ড, অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন প্রভৃতি উপজাতির লোকেরা দিকে দিকে আক্রমণ শুরু করে আধিপত্য বিস্তার করতে থাকল। ফ্রাঙ্করা ফ্রান্স জয় করল, ভ্যাণ্ডালরা স্পেন ও উত্তর আফ্রিকা জয় করে নিল এবং অ্যাঙ্গল ও স্যাক্সনরা হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ড অধিকার করল। এর ফলে ফ্রান্স, স্পেন, হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ইংল্যাণ্ড রোমান সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে গেল। ভিসিগথদের রাজা অ্যালারিক ৪১০ খ্রীষ্টাব্দে রোম নগরী ধ্বংস করলেন। শেষ পর্যন্ত রোমানদের অধিকারে থাকল শুধু ইতালি।

ইতালি

'রেনেসাঁস' (Renaissance বা 'জ্ঞানের নবোন্মেষ') ইতালিতেই প্রথম আরম্ভ হয়। এই যুগে কবি আলিঘিয়েরি দান্তে (Alighieri Dante, ১২৬৫-১৩২১ খ্রী.), পেত্রার্ক(Francesco

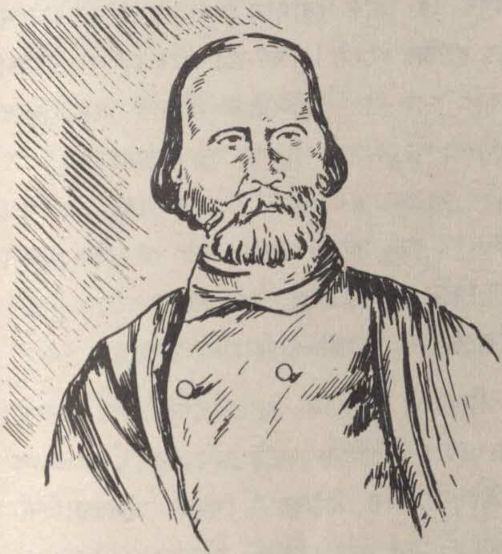


লিওনার্দো দা ভিঞ্চি

Petrarch, ১৩০৪-৭৪ খ্রী.), বোকাচিও (Giovanni Boccaccio, ১৩১৩-৭৫ খ্রী.), লিওনার্দো দা ভিঞ্চি (Leonardo da Vinci, ১৪৫২-১৫১৯ খ্রী.), মাইকেল অ্যাঞ্জেলো (Michelangelo Buonarroti, ১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রী.), র‍্যাফেল (Raphael, ১৪৮৩-১৫২০ খ্রী.) প্রভৃতি মনীষীর আবির্ভাব হয়। সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে ইতালির নগরগুলির পূর্ণ বিকাশ ঘটলেও দেশে রাজনৈতিক একতার অভাব ছিল।

॥ বিভিন্ন মনীষীর চেষ্টায় ঐক্যবদ্ধ ইতালির সৃষ্টি ॥

সম্রাট্ নেপোলিয়ন ইতালি জয় করে সারা দেশকে রাজনৈতিক দিক্ দিয়ে একতাবদ্ধ করবার



গ্যারিবল্ডি

চেষ্টা করেন। কিন্তু তাঁর প্রয়াস ফলপ্রসূ হল না। শেষে মাৎসিনি (Guiseppe Mazzini, ১৮০৫-



মাৎসিনি

১৮৭২ খ্রী.), গ্যারিবল্ডি (Guiseppe Garibaldi, ১৮০৭-১৮৮২ খ্রী.) ও কাভুর (Camillo Benso di Cavour, ১৮১০-১৮৬১ খ্রী.)—এই তিনজন মনীষীর প্রয়াসে ইতালী ঐক্যবদ্ধ হয়।



কাভুর

॥ বেনিটো মুসোলিনী ॥



প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইতালিতে বেনিটো মুসোলিনী (Benito Mussolini, ১৮৮৩-১৯৪৫ খ্রী.) ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-ফেরত সৈনিকদের



মুসোলিনী

নিয়ে ফ্যাসিস্ট দল নামে এক শক্তিশালী দল গঠন করলেন। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী প্রধান মন্ত্রী এবং পরে ইতালির সর্বাধিনায়ক হলেন। তাঁর উপাধি হল 'ইল দুচে' (Il Duce)।

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে ইতালির যোগদান ॥

ইতালি আবিসিনিয়া (ইথিওপিয়া) দখল করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইতালি জার্মানির পক্ষে যোগ দিলে ইংরেজরা ইতালির শত্রু হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজেরা আবিসিনিয়া থেকে ইতালীয়দের বিতাড়িত করে। ইতালি গ্রীস আক্রমণ করেছিল কিন্তু গ্রীসের হাতে ভীষণ ভাবে পর্যুদস্ত হয়। জার্মান সৈন্যেরা ইতালীয়দের রক্ষা করে।



॥ মুসোলিনী নিহত ॥

ইতালি আক্রান্ত হলে জনসাধারণের চাপে পড়ে মুসোলিনী পদত্যাগ করেন। মার্শাল বদোলিও (Marshal Pietro Badoglio, ১৮৭১ ১৯৫৬ খ্রী.) মুসোলিনীকে বন্দী করেন, নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন ও জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসোলিনী সুইটজারল্যাণ্ডে পলায়ন করতে গেলে ইতালীয় পার্টিজান দলের লোক তাঁকে গুলি করে ও পুড়িয়ে মারে।

ইতালির রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল সিংহাসন ত্যাগ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে ইতালিতে প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হয়। ফ্যাসিস্ট দল পুনর্গঠন নিষিদ্ধ হয়েছে। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েলের বংশধরগণ সর্বপ্রকার অধিকার থেকে চ্যুত হয়েছেন।

ইতালির আয়তন ৩,০১,২৪৫ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৫,৭০,০০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী রোম।

॥ ইংল্যাণ্ড ॥

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ইংল্যাণ্ডের নাম ছিল ব্রিটেন। অধিবাসীদের বলা হত ব্রিটন। জুলিয়াস সীজার গল বা ফ্রান্স থেকে যাত্রা করে খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫ অব্দে রোমান সৈন্যদের নিয়ে ব্রিটেনে গিয়ে হাজির হলেন। ব্রিটনরা হেরে গেলেও বশ্যতা স্বীকার করল না। জুলিয়াস সীজার গলে ফিরে গেলেন। পর বৎসরে সীজার বহু সৈন্যসামন্ত নিয়ে ব্রিটেন আক্রমণ করলেন। ব্রিটেন হেরে গেল। ব্রিটনদের কাছ থেকে অনেক কর ও উপঢৌকন নিয়ে তিনি পুনরায় গলে ফিরে এলেন।

॥ ব্রিটেনে রোমান আধিপত্য ॥

সীজারের ব্রিটেন আক্রমণের প্রায় একশ' বছর পরে ৪৩ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ ক্লডিয়াস (Claudius ১০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ) বিপুল সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে ব্রিটেন দখল করে নিলেন। এর পর রোমানরা প্রায় চারশ' বছর ব্রিটেনে রাজত্ব করে।

॥ ইংল্যাণ্ড ও ইংরেজ নামের সৃষ্টি ॥

স্কটল্যাণ্ড থেকে পিক্ট, স্কট ও জার্মানি থেকে



আলফ্রেড দ্য গ্রেট

অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন, জুট প্রভৃতি বর্বর জাতির লোকেরা ব্রিটেনে এসে ব্রিটনদের উপর ভীষণ অত্যাচার শুরু করল। অ্যাঙ্গল ও স্যাক্সনরাই ব্রিটেনের বেশির ভাগ স্থানে আধিপত্য বিস্তার করল। তাদের নাম থেকে দেশের নাম হল ইংল্যাণ্ড ও অধিবাসী-দের নাম হল ইংরেজ।

॥ আলফ্রেড ও ক্যানিউট

প্রাচীন কালের রাজা আলফ্রেড (Alfred the Great, ৮৪৯-৯৯ খ্রী.) ডেনমার্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে শেষ পর্যন্ত জয়ী হন। কিন্তু তাঁর পরে ডেনমার্কের রাজাই ইংল্যাণ্ড জয় করেন। ইংল্যাণ্ডের ডেন রাজাদের মধ্যে ক্যানিউট (Canute, ৯৯৫-১০৩৫ খ্রী.) প্রসিদ্ধ।

॥ বিজয়ী উইলিয়াম ও দ্বিতীয় হেনরী ॥

ফ্রান্সের উত্তর উপকূলের নরম্যাণ্ডির রাজা প্রথম উইলিয়াম বা বিজয়ী উইলিয়াম (William, I, the Conqueror, ১০২৭-৮৭ খ্রী.) ইংল্যাণ্ডের অ্যাংলো স্যাক্সন রাজা হ্যারল্ড (Harold, ১০২২-১০৬৬ খ্রী)-কে পরাজিত করে ইংল্যাণ্ড ও নরম্যাণ্ডি দুটো দেশেই রাজত্ব করতে থাকেন। তাঁর পরে দ্বিতীয় হেনরী (Henry II, ১১৩৩-১১৮৯ খ্রী) রাজা হন। তাঁর সময়ে ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ টমাস বেকেট (Thomas Becket,' ১১১৮-৭০ খ্রী.) ধর্মীয় ব্যাপারে বিরোধিতা করে নিহত হন।



প্রথম রিচার্ড

॥ প্রথম রিচার্ড ॥

দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র প্রথম রিচার্ড (Richard I, The Lion-hearted, ১১৫৭-৯৯ খ্রী) ক্রুসেডে অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধে মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড শক্তিতে যুদ্ধ করেন।



॥ ম্যাগনা কার্টা ॥

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ছোট ভাই জন (John, ১১৬৭-১২১৬ খ্রী.) সিংহাসনে বসেন। জনের অত্যাচারে বিব্রত হয়ে ইংল্যাণ্ডের অভিজাত সম্প্রদায় এক হয়ে রাজাকে ১২১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই জুন ম্যাগনা কার্টা বা মহাসনদে ছাপ মেরে (রাজা



সাইমন ডি মন্টফোর্ট

জন নিরক্ষর ছিলেন) রাজী করিয়ে নিলেন যে প্রজাদের উপর সুবিচার করা হবে। পরে জন সেই ঘোষণাপত্র অনুযায়ী কাজ করতে অসম্মত হলে

অভিজাত সম্প্রদায় তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এক বৎসর যুদ্ধ চলার পর জন একদিন মারা গেলেন।

॥ তৃতীয় হেনরী ॥

জনের মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে তৃতীয় হেনরী (Henry III, ১২০৭-১২৭২ খ্রী.)-র আমলে হাউস অব কমন্স বা গণপ্রতিনিধি সভার (পার্লামেন্টের) প্রবর্তন হয়। তাঁর রাজত্বকাল সাইমন ডি মন্টফোর্ট (Simon de Montfort, ১২০৮-১২৬৫ খ্রী.) নামে এক বিশিষ্ট রাজনীতিকের জন্যে স্মরণীয় হয়ে আছে। হাউস অব কমনসের প্রতিষ্ঠা তাঁর চেষ্টাতেই হয়।

॥ প্রথম এডওয়ার্ড ॥

তৃতীয় হেনরীর পরে তাঁর পুত্র প্রথম এডওয়ার্ড (Edward I, ১২৩৯-১৩০৭ খ্রী.) পার্লামেন্টের উন্নতি সাধন করেন। তিনি ওয়েলস রাজ্যকে ইংল্যাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করেন।



॥ দ্বিতীয় এডওয়ার্ড ॥

প্রথম এডওয়ার্ডের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় এডওয়ার্ড (Edward II, ১২৮৪-১৩২৭ খ্রী.) ছিলেন অপদার্থ রাজা। তিনি নিহত হন।

॥ তৃতীয় এডওয়ার্ড ॥

দ্বিতীয় এডওয়ার্ডের পুত্র তৃতীয় এডওয়ার্ড (Edward III, ১৩১২-৭৭ খ্রী.) ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। তাঁর সময়ে ফ্রান্সের সঙ্গে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধ চলে ষষ্ঠ হেনরীর রাজত্বকাল পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত ফ্রান্স ইংরেজের হাতছাড়া হয়ে যায়।



তৃতীয় এডওয়ার্ড

॥ ব্ল্যাক প্রিন্স ॥

তৃতীয় এডওয়ার্ডের বড় ছেলে কালো রঙের বর্ম পরতেন বলে ব্ল্যাক প্রিন্স (১৩৪০-১৩৭৬ খ্রী.) নামে খ্যাত ছিলেন। শতবর্ষের যুদ্ধে তিনি খুব



দ্বিতীয় রিচার্ড



কাম্বোডিয়ায় (বর্তমানের কামপুচিয়ার) অবস্থিত প্রাচীন অতি বিস্ময়কর
বিষ্ণুমন্দির আঙ্কোরভাটের বুদ্ধমূর্তি

আঙ্কোরভাটের বুদ্ধমূর্তি

পূর্বপৃষ্ঠায় যে বিরাট বুদ্ধমূর্তি দেখা যাচ্ছে, তা আঙ্কোরভাটের একাংশে বিদ্যমান। ৮০০ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে খ্মের সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিল। লাওস, ব্রহ্মদেশ ও ভিয়েত্‌নামের খ্মের শাসকেরা এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তার মধ্যস্থলে ছিল কাম্বোডিয়া। কাম্বোডিয়ায় হিন্দু সভ্যতা বিদ্যমান ছিল। রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মন্‌ বা সূর্যবর্মা (১১১২—১১৫২ খ্রী.) যে বিশাল মন্দিরের নির্মাণকার্য শুরু করেন ও তাঁর ভাগিনেয় ও উত্তরাধিকারী ধরণীন্দ্র বর্মন (১১৫২-১১৮১ খ্রী.)-এর আমলে সেই কার্য শেষ হয়। তারই নাম আঙ্কোরভাট বা অঙ্কোরভাট (ওঙ্কারধাম)। এত বড় মন্দির পৃথিবীতে আর নেই। ৯১৪'৪ মিটার দীর্ঘ স্থানের চারিদিকে প্রাচীর অবস্থিত। এই স্থানে বহু ছোট বড় মন্দির বিদ্যমান। আঙ্কোরভাট নির্মাণের ৩০০ বৎসর পরে মন্দিরসমেত স্থানটি অজ্ঞাত কারণে পরিত্যক্ত হয়। ফরাসী প্রত্নতাত্ত্বিক **Henry Mouhout** এই জঙ্গলে ঢাকা স্থান ও মন্দির আবিষ্কার করেন। ৪৮'২৮ বর্গ কিলোমিটার স্থানের দুর্ভেদ্য জঙ্গল পরিষ্কার করা হলে আঙ্কোরভাট বর্তমান জগতের দর্শকদের দেখার সুযোগ হয়।

আঙ্কোরভাট প্রধানতঃ বিষ্ণুমন্দির হলেও পরবর্তী কালে তাতে বৌদ্ধ প্রভাব পড়ে। এখানে বহু বুদ্ধমূর্তি বর্তমান।

বীরত্বের পরিচয় দেন। ব্ল্যাক প্রিন্সের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় রিচার্ড (Richard II, ১৩৬৭-১৪০০ খ্রী.) রাজা হন।



॥ যোয়ান অব আর্ক ॥

রাজা পঞ্চম হেনরী (Henry V, ১৩৮৭-১৪২২ খ্রী.) এজিনকোর্টের যুদ্ধে জয়লাভ করেন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র ষষ্ঠ হেনরী (Henry VI, ১৪২১-৭১ খ্রী.) রাজা হন।

ফরাসীরা একটার পর একটা যুদ্ধে যখন ইংরেজদের দ্বারা পরাজিত হচ্ছিল তখন যোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc—Jeanne d' Arc, ১৪১২-৩১ খ্রী.) নামে এক গ্রাম্য বালিকা ফরাসী



শ্বেতবর্ণ অশ্বে আরূঢ়া যোয়ান অব আর্ক

সৈন্যদের নিয়ে যুদ্ধ করে ইংরেজদের পরাজিত করে। শেষে নিষ্ঠুর ইংরেজরা তাঁকে ডাইনী বলে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে পুড়িয়ে মারে।

॥ সপ্তম হেনরী ॥

ষষ্ঠ হেনরীর পর চতুর্থ এডওয়ার্ড (Edward IV, ১৪৪২-৮৩ খ্রী.) রাজা হন। তাঁর পরে রাজা হন টিউডর বংশের প্রবর্তক সপ্তম হেনরী (Henry VII, ১৪৫৭-১৫০৯ খ্রী.)।

তিনি তৃতীয় রিচার্ড (Richard III, ১৪৫২-৮৫ খ্রী.)-কে বসওয়ার্থের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। গোলাপের যুদ্ধ (Wars of the Roses, ১৪৫৫-১৪৮৫ খ্রী.) তাঁর সময়ে শেষ হয়।

॥ অষ্টম হেনরী ॥

সপ্তম হেনরীর পর অষ্টম হেনরী (Henry VIII, ১৪৯১-১৫৪৭ খ্রী.) রাজা হন। তাঁর সময়ে



অষ্টম হেনরী

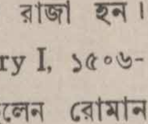
মার্টিন লুথার (Martin Luther, ১৪৮৩-১৫৪৬ খ্রী.) দ্বারা প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মমতের প্রতিষ্ঠা হয়। পোপের অনুরক্ত ব্যক্তিরা রোমান ক্যাথলিক নামে অভিহিত হল। কার্ডিনাল উলসে (Cardinal Wolsey, ১৪৭৫-১৫৩০ খ্রী.) তাঁর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।



কার্ডিনাল উলসে

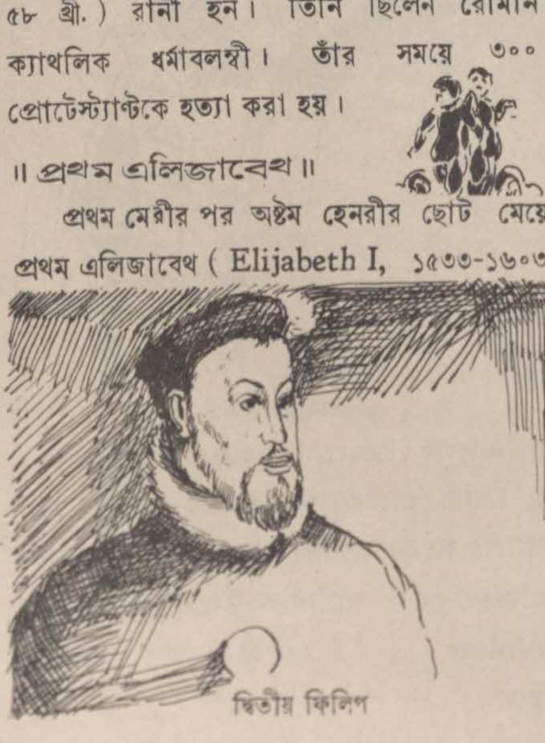
॥ প্রথম মেরী ॥

অষ্টম হেনরীর পর তাঁর পুত্র ষষ্ঠ এডওয়ার্ড (Edward VI, ১৫৩৭-১৫৫৩ খ্রী.) রাজা হন। তারপর বড় মেয়ে প্রথম মেরী (Mary I, ১৫০৬-৫৮ খ্রী.) রানী হন। তিনি ছিলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী। তাঁর সময়ে ৩০০ প্রোটেস্ট্যান্টকে হত্যা করা হয়।



॥ প্রথম এলিজাবেথ ॥

প্রথম মেরীর পর অষ্টম হেনরীর ছোট মেয়ে প্রথম এলিজাবেথ (Elijabeth I, ১৫৩৩-১৬০৩



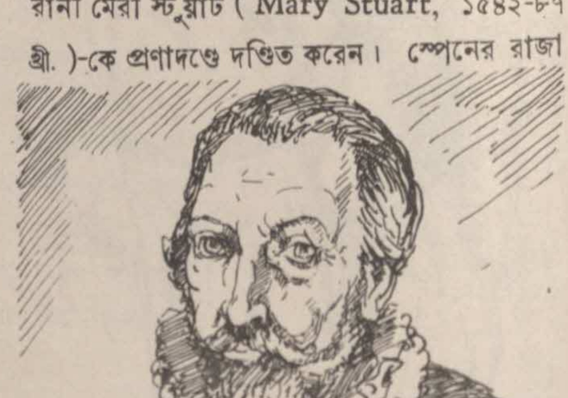
দ্বিতীয় ফিলিপ

খ্রী) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি স্কটল্যাণ্ডের



রানী প্রথম এলিজাবেথ

রানী মেরী স্টুয়ার্ট (Mary Stuart, ১৫৪২-৮৭ খ্রী.)-কে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। স্পেনের রাজা



ফ্রান্সিস ড্রেক

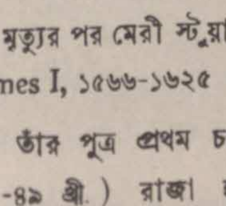
দ্বিতীয় ফিলিপ (Philip II, ১৫২৭-৯৮ খ্রী.) এক বিশাল নৌবহর স্পেনিশ আর্মাডা (Spanish

Armada) নিয়ে ইংল্যাণ্ড আক্রমণ করতে যাত্রা করল। প্রধানতঃ ভীষণ ঝড় ওঠায় স্পেনিশ্ আর্মাডা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, বহু জাহাজ ধ্বংস হল। ফ্রান্সিস ড্রেক (Francis Drake, ১৫৪০-৯৬ খ্রী.) ছিলেন ইংরেজ পক্ষে সুযোগ্য সেনাপতি। রানী এলিজাবেথের আমলে ইংল্যাণ্ডের সাহিত্যের প্রভূত শ্রীবৃদ্ধি হয়। শেক্সপীয়ার (William



শেক্সপীয়ার

Shakespeare, ১৫৬৪-১৬১৬ খ্রী) তাঁর আমলের লোক।





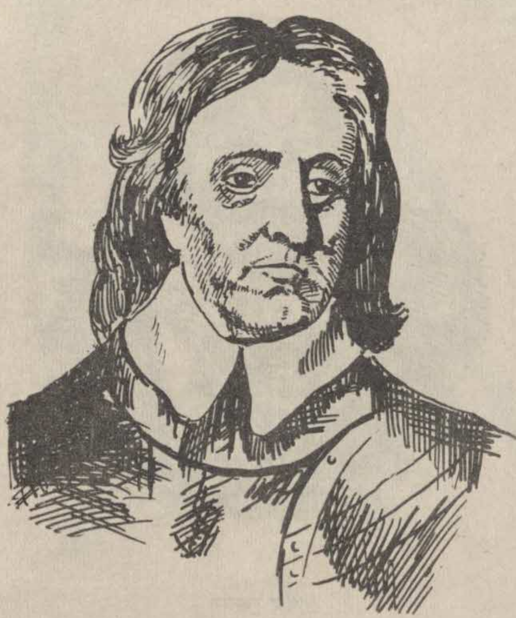
প্রথম জেমস



প্রথম চার্লস

॥ প্রথম চার্লস ॥

রানী এলিজাবেথের মৃত্যুর পর মেরী স্টুয়ার্টের ছেলে প্রথম জেমস (James I, ১৫৬৬-১৬২৫ খ্রী.) রাজা হন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র প্রথম চার্লস (Charles I, ১৬০০-৪৯ খ্রী.) রাজা হন। অলিভার ক্রমওয়েল (Oliver Cromwell, ১৫৯৯-১৬৫৮ খ্রী.)-এর নেতৃত্বে রাজার বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। ছ বছর যুদ্ধ চলার পর প্রথম চার্লস পরাজিত হন। রাজা চার্লসের শিরশ্ছেদ হয়।

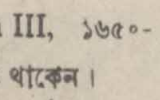


অলিভার ক্রমওয়েল

॥ রক্তপাতহীন গৌরবময় বিপ্লব ॥

ক্রমওয়েলের মৃত্যুর পর প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লস (Charles II, ১৬৩০-৮৫ খ্রী.) রাজা হন। দ্বিতীয় চার্লসের পর দ্বিতীয় জেমস (James II, ১৬৩৩-১৭০১ খ্রী.) রাজা হন। এক 'রক্তপাতহীন গৌরবময় বিপ্লবে'র ফলে তিনি দেশ ত্যাগ করেন। হল্যাণ্ডের অরেঞ্জ-বংশীয় রাজা উইলিয়ামকে ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসানো হল। তিনি তৃতীয় উইলিয়াম (William III, ১৬৫০-১৭০২ খ্রী.) নাম নিয়ে রাজত্ব করতে থাকেন।

॥ রানী অ্যান ॥



তৃতীয় উইলিয়ামের পর দ্বিতীয় জেমসের কন্যা রানী অ্যান (Queen Anne, ১৬৬৫-১৭১৪ খ্রী.) সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকালে সুইফট, পোপ, অ্যাডিসন, স্টীল, ডিফো, নিউটন, রেন, ভ্যানক্র, ডিউক অব মার্লবরো প্রভৃতি মনীষীর উদ্ভব হয়।

॥ ইংল্যাণ্ডে হ্যানোভার বংশের রাজত্ব ॥

রানী অ্যানের পর ইংল্যাণ্ডে জার্মানির হ্যানোভার রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। প্রথম জর্জ (George I, ১৬৬০-১৭২৭ খ্রী.) ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনে বসেন। দ্বিতীয় জর্জ (George II, ১৬৮৩-১৭৬০ খ্রী.) তাঁর পরে রাজা হন। সেই সময়কার ওয়ালপোল (Robert Walpole, ১৬৭৬-১৭৪৫ খ্রী.) ইংল্যাণ্ডের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ উইলিয়াম পিট (William



উইলিয়াম পিট (বড় পিট)

Pitt, The Elder Pitt. ১৭০৮-১৭৭৮ খ্রী.) সেই সময়কার লোক।

দ্বিতীয় জর্জের মৃত্যুর পর রাজা হন তৃতীয় জর্জ (George III, ১৭৩৮-১৮২০ খ্রী.) তিনি ছিলেন স্বেচ্ছাচারী রাজা। তাঁর সময়ে পলাশীর যুদ্ধে ভারত ইংরেজের অধীন হয় ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীন হয়।

॥ নেলসন ও ডিউক অব ওয়েলিংটন ॥

ফ্রান্সে ফরাসী বিপ্লব হওয়ার কিছু পরে নেপো-

লিয়নের অভ্যুত্থান ঘটে। ভাইকাউন্ট হোরেসিও নেলসন (Viscount Horatio Nelson, ১৭৫৮-১৮০৫ খ্রী.) ট্রাফালগারের নৌ-যুদ্ধে ফরাসী সম্রাট নেপোলিয়নকে পরাজিত করেন। ডিউক অব



নেলসন

ওয়েলিংটন (Duke of Wellington, ১৭৬৯-



ডিউক অব ওয়েলিংটন

১৮৫২ খ্রী.) ওয়াটার্লু র যুদ্ধে নেপোলিয়নকে পরাস্ত করেন।

॥ মহারানী ভিক্টোরিয়া ॥

মহারানী ভিক্টোরিয়া (Queen Victoria, ১৮৩৭-১৯০১ খ্রী.) চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁর সময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে



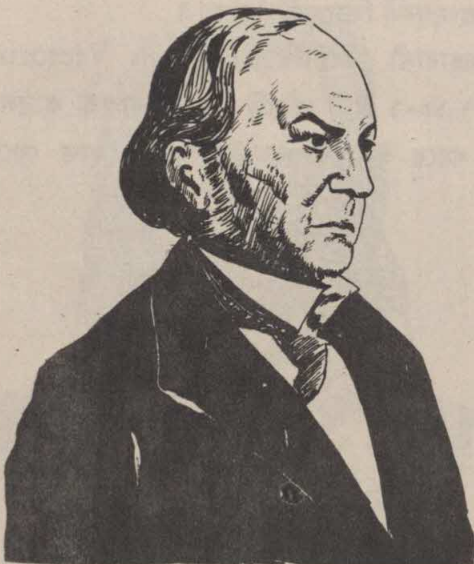
মহারানী ভিক্টোরিয়া

ইংল্যাণ্ড সরাসরি ভারত শাসনের ভার গ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি (Benjamine Disraeli



ডিজরেলি

Beaconsfield, ১৮০৪-১৮৮১ খ্রী.) ও গ্ল্যাডস্টোন



গ্ল্যাডস্টোন

(Gladstone, ১৮০৯-১৮৯৮ খ্রী.) এই সময়ের লোক।



॥ সপ্তম এডওয়ার্ড ও পঞ্চম জর্জ ॥

মহারানী ভিক্টোরিয়ার পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সপ্তম এডওয়ার্ড (Edward VII, ১৮৪১-১৯১০ খ্রী.) রাজা হন। তাঁর পরে ভিক্টোরিয়ার মধ্যম পুত্র পঞ্চম জর্জ (George V, ১৮৬৫-১৯৩৬ খ্রী.) রাজা হন। তাঁর সময়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হয়।



অষ্টম এডওয়ার্ড



চার্চিল

॥ ষষ্ঠ জর্জ ॥

পঞ্চম জর্জের পর অষ্টম এডওয়ার্ড (Edward VIII, ১৮৯৪-১৯৭২ খ্রী.) ইংল্যাণ্ডের রাজা হন। কিন্তু বিবাহ সম্পর্কিত ব্যাপারে পদত্যাগ করেন।



রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথ

তারপরে ষষ্ঠ জর্জ (George VI, ১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রী.) রাজা হন। তাঁর সময়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়। তাঁর সময়কার বিখ্যাত প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বলডুইন (Stanely Baldwin, ১৮৬৭-১৯৪৭ খ্রী.) ও



অ্যাটলী



হ্যারল্ড ম্যাকমিলান

চার্চিল (Winston Churchill, ১৮৭৫-১৯৬৫ খ্রী.)।

॥ দ্বিতীয় এলিজাবেথ ॥

রাজা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা এলিজাবেথ (Elizabeth II, জন্ম ১৯২৬ খ্রী.) সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি (Attlee, ১৮৮৩-১৯৬৭ খ্রী.)-র উদ্যোগে ভারত



পঞ্চম জর্জ ও রানী মেরী

স্বাধীন হয়। তাঁর পরে হ্যারল্ড ম্যাকমিলান প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর পরে মার্গারেট থ্যাচার Margaret Thatcher, জন্ম ১৯২৫ খ্রী.) প্রধানমন্ত্রী হন।

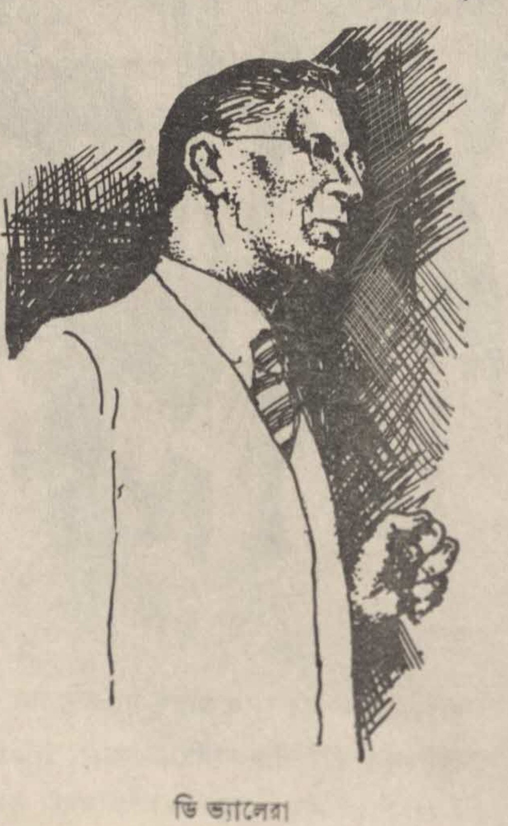
আয়ারল্যাণ্ড

আয়ারল্যাণ্ড পূর্বে ইংল্যাণ্ডের অধীন ছিল। আয়ারল্যাণ্ডবাসীরা স্বাধীন হবার জন্যে বহু দিন ধরে আন্দোলন চালায়। ইংরেজরা নানাভাবে নানা সময়ে সেই আন্দোলনকে ব্যর্থ করে। ইংরেজরা আয়ারল্যাণ্ডকে নানা সুযোগ সুবিধা দিয়ে শান্ত করতে চায়। কিন্তু আইরিশরা তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে শেষ পর্যন্ত সিন ফিন (Sinn Fein) দল গড়ে তীব্র আন্দোলন চালাতে থাকেন। সিন ফিন একটা আইরিশ কথা। এর অর্থ, আমরা আলাদা থাকব।



॥ ডি ভ্যালেরা ॥

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে সিন ফিন দল প্রচণ্ড ভাবে বিদ্রোহ করে। ডি ভ্যালেরা (Emmon De Valera, ১৮৮২-১৯৭৫ খ্রী.) বিদ্রোহের নেতৃত্ব করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন হয়। তবে আয়ারল্যাণ্ড দ্বিধাবিভক্ত হয়। শুধু দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড স্বাধীন হয়। দু'বার রাষ্ট্রপতি হন ডি ভ্যালেরা। উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও আলস্টারের অধিকাংশ এখনও গ্রেট ব্রিটেনের অন্তর্ভুক্ত। স্বাধীন আয়ারল্যাণ্ড আইরিশ রিপাবলিক নামে খ্যাত। দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড বা আইরিশ রিপাবলিকের আয়তন ৬৮,৮৯৩ বর্গ কিলোমিটার ; জনসংখ্যা ৩০,৩০,০০০ (১৯৭৩) ; রাজধানী ডাবলিন।



ডি ভ্যালেরা

স্কটল্যাণ্ড

বর্তমানে ইংল্যাণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের সম্মিলিত নাম গ্রেট ব্রিটেন। স্কটল্যাণ্ড বহু কাল ধরে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ করে স্বাধীনতা বজায় রাখতে চেষ্টা করেছে। ইংল্যাণ্ডের অধীন হওয়ার আগে স্কটল্যাণ্ডে অনেক রাজা বিভিন্ন সময়ে রাজত্ব করেছেন।

॥ উইলিয়াম ওয়ালেস ॥

স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে বহু বীর যোদ্ধার নাম পাওয়া যায়, উইলিয়ম ওয়ালেস (William Wallace, ১২৭০-১৩০৫ খ্রী.) ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে স্টার্লিং ব্রিজের যুদ্ধে ইংরেজদের হারিয়ে দেন। অবশ্য, এক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতায় ধরা পড়ে ইংরেজদের দ্বারা নিষ্ঠুরভাবে নিহত হন।

॥ রবার্ট ব্রুস ॥

স্কটদের স্বাধীনতা সংগ্রামে যে নাম স্মরণীয় হয়ে আছে তা স্কটবীর রবার্ট ব্রুস (Robert Bruce, ১২৭৪-১৩২৯ খ্রী.)। তিনি প্রায় সারা জীবন ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। ইংরেজরা ব্যানকবার্নের যুদ্ধে পরাজিত হয়। ব্রুস স্কটল্যাণ্ডের প্রথম স্বাধীন রাজা হন। তারপর প্রায় তিনশ বছর ধরে স্কটরা নানাভাবে ইংরেজদের বিরোধিতা



রবার্ট ব্রুস

করে এসেছে।

রানী অ্যানের সময়ে ঠিক হয়, স্কটল্যাণ্ড ও ইংল্যাণ্ড একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে। সেই থেকে স্কটল্যাণ্ড গ্রেট ব্রিটেনের একটি অংশ। ইংল্যাণ্ড, উত্তর আয়ারল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ড নিয়ে গ্রেটব্রিটেন যুক্তরাজ্য (United Kingdom)। এর আয়তন ২,৪৪,০৩০ বর্গ-কিলোমিটার; জনসংখ্যা ৫,৫৯,৩০,০০০ (১৯৭৬); রাজধানী লণ্ডন।

॥ ফ্রান্স ॥

পূর্বে ফ্রান্স রোমানদের অধীনে ছিল, সেই সময়ে ফ্রান্সের নাম ছিল গল (Gaul)। রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটলে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ফ্রাঙ্ক জাতির মেরোভিঞ্জিয়ান রাজা ক্লোভিস (Clovis, ৪৬৫-৫১১ খ্রী.) গলের অধিকাংশ ও অন্যান্য স্থানে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। ফ্রাঙ্ক নাম থেকে ফ্রান্স (France) নামের উৎপত্তি।

॥ শার্লামেন ॥

কার্লোভিঞ্জি বংশের চার্লস মার্টেল (Charles Martel, ৬৮৯-৭৪১ খ্রী.) ৭৩২ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ



শার্লামেন

ফ্রান্সে টুরস যুদ্ধক্ষেত্রে স্পেনের আরবদের পরাজিত করেন। তাঁর পরে শার্লামেন বা চার্লস দ্য গ্রেট (Charlemagne or Charles the Great) গল, ইতালি, স্পেন ও জার্মানির অধিকাংশ জয় করে এক বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হন।

১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সে ভ্যালয় (Valois) রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময়ে ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধ শুরু হয়। কৃষক বালিকা যোয়ান অব আর্ক (Joan of Arc, ১৪১২-১৪৩১ খ্রী.) ফরাসী সৈন্যগণকে সম্মিলিত করে যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজিত করেন। বর্বর ইংরেজরা তাঁকে পুড়িয়ে মারে।

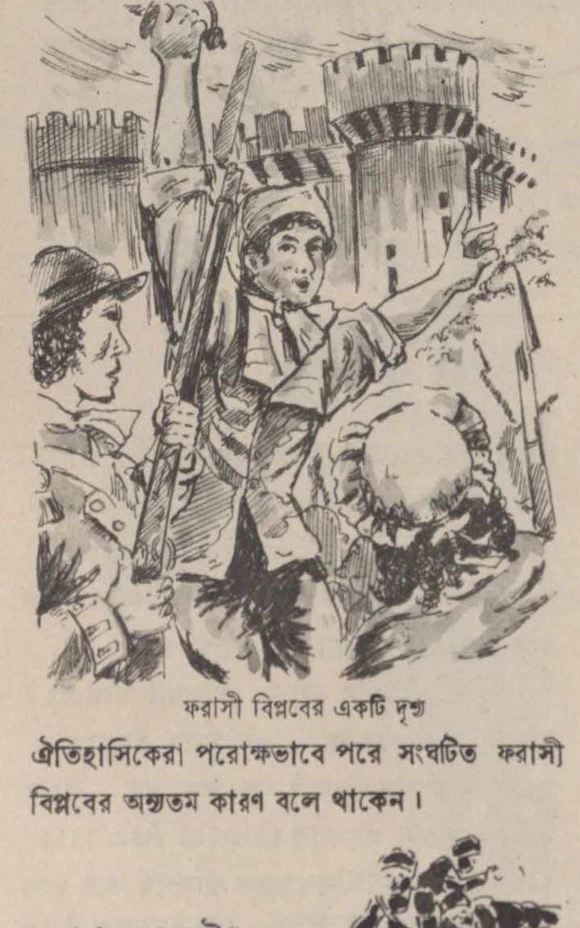
॥ ত্রয়োদশ লুই ॥

ভ্যালয় রাজবংশের পর বুরবন বা বুর্বোঁ

(Bourbon) রাজবংশের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। ত্রয়োদশ লুই (Louis XIII, ১৬০১-১৬৪৩ খ্রী.) এই বংশীয় রাজা। তাঁর মন্ত্রী রিসলু (Cardinal Richelieu, ১৫৮৫-১৬৪২ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিদ্।

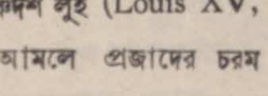
॥ চতুর্দশ লুই ॥

তাঁর পরের রাজা চতুর্দশ লুই (Louis XIV, ১৬৩৮-১৭১৫ খ্রী.) তাঁর সময়ে ইউরোপে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট্ ছিলেন। তাঁর নিরঙ্কুশ রাজতান্ত্রিকতাকে



ফরাসী বিপ্লবের একটি দৃশ্য

ঐতিহাসিকেরা পরোক্ষভাবে পরে সংঘটিত ফরাসী বিপ্লবের অন্যতম কারণ বলে থাকেন।



॥ পঞ্চদশ লুই ॥

চতুর্দশ লুইয়ের পর পঞ্চদশ লুই (Louis XV, ১৭১০-১৭৭৪ খ্রী.)-এর আমলে প্রজাদের চরম দুর্গতি হয়।



পঞ্চদশ লুই

॥ ষোড়শ লুই ॥

ষোড়শ লুই (Louis XVI, ১৭৫৪-৯৩ খ্রী.)-এর আমলে প্রজাদের দুর্গতি চরমে ওঠে। তাঁর সময়ে বিদ্রোহী প্রজারা ব্যাস্টিল কারাদুর্গ উন্মুক্ত



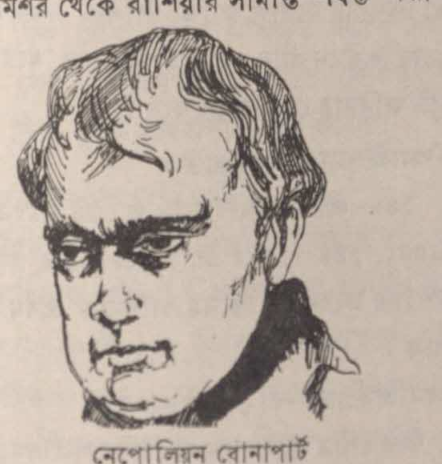
ষোড়শ লুই

করে আটক রাজবন্দীদের মুক্ত করে। ফরাসী বিপ্লব (the French Revolution, ১৭৮৯-১৭৯৫ খ্রী.) শুরু হয়ে যায়। মিরাবো (Gabriel Mirabeau, ১৭৪৯-১৭৯১ খ্রী.), দাঁতো (Danton, ১৭৫৯-১৭৯৪ খ্রী.), রোবসপিয়ের (Robespierre, ১৭৫৮-১৭৯৪ খ্রী.), ম্যারাট (Jean Paul Marat, ১৭৪৩-৯৩ খ্রী) প্রভৃতি বিপ্লবী নেতারা রাজবংশের উচ্ছেদ করতে চেষ্টিত হন। চতুর্দশ লুই ও রানী আন্তোয়নেতে (Marie Antoinette) প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। দাঁতো, রোবসপিয়েরেরও শিরশ্ছেদ হল। অসংখ্য লোকের মাথা কাটা গেল। রুশো Jean-Jacques Rousseau, ১৭১২-৭৮ খ্রী.), ভলটেয়ার (Voltaire, ১৬৯৪-১৭৭৮ খ্রী.) প্রভৃতি মনীষীরা সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী প্রচার করেন।



॥ নেপোলিয়ান বোনাপার্ট ॥

ফরাসী বিপ্লবের দশ বৎসর পরে ফরাসীরা নেপোলিয়ান বোনাপার্ট (Napoleon Bonaparte, ১৭৬৯-১৮২১ খ্রী.)-কে সম্রাট্ করল। নেপোলিয়ন সারা জীবন যুদ্ধ করেই কাটান। তিনি মিশর থেকে রাশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত ফরাসী



নেপোলিয়ন বোনাপার্ট

সাম্রাজ্যের বিস্তার সাধন করেন। শেষ পর্যন্ত নৌযুদ্ধে নেলসন ও স্থলযুদ্ধে ডিউক অব ওয়েলিংটন তাঁকে পরাজিত করেন। নেপোলিয়নের রাশিয়া অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হল। তিনি প্রচণ্ড শীতের কবলে পড়ে দেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হলেন। ইংরেজরা তাঁকে বন্দী করে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নিয়ে গেল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ অষ্টাদশ লুই, দশম চার্লস ও লুই ফিলিপ ॥

নেপোলিয়নের পর বুরবন বা বুরবোঁ বংশের অষ্টাদশ লুই (Louis XVIII, ১৭৫৫-১৮২৪ খ্রী.)



অষ্টাদশ লুই

রাজা হলেন। তাঁর পরে রাজা হলেন দশম চার্লস (Charles X)। তাঁকে সরিয়ে অর্লিয়ন্স বংশের লুই ফিলিপকে প্রজারা সিংহাসনে বসাল। ,ফিলিপ দেশের অভ্যন্তরীণ অশান্তিতে বিব্রত হয়ে সিংহাসন ত্যাগ করলেন।

॥ তৃতীয় নেপোলিয়ন ॥

তারপর সম্রাট নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন তৃতীয় নেপোলিয়ন (১৮০৮-১৮৭৩ খ্রী.) নাম নিয়ে সিংহাসনে বসলেন। তিনি ফ্রাঙ্কো-প্রাসিয়ান যুদ্ধে হেরে গিয়ে জার্মানদের হাতে বন্দী হলেন। পরে জার্মানরা তাঁকে ছেড়ে দিলে তিনি ইংল্যাণ্ডে চলে যান। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

॥ দ্য গোল ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ফ্রান্স জার্মানিকে হারিয়ে দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের বাহিনী প্যারিস দখল করে নিলে ভিচীতে মার্শাল পেঁতা (Marshal Petain, ১৮৫৬-১৯৫১ খ্রী.) হিটলারের অধীনে এক তাঁবেদার সরকার স্থাপন করেন। কিন্তু



দ্য গোল

দ্য গোল (General De Gaulle, ১৮৯০-৭০ খ্রী) ইংল্যাণ্ডে থেকে জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাতে থাকেন। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানি পরাজিত হলে ফ্রান্স তার স্বাধীনতা ফিরে পায়।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্য গোল ফরাসী সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হন। তারপর বহুবার বিভিন্ন সময়ে বহু ব্যক্তি ফ্রান্স সাধারণতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন।

ফ্রান্সের উত্তরে ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর-পূর্বে বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ, পূর্বে পশ্চিম জার্মানি, সুইটজারল্যাণ্ড ও ইতালি, দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ-পূর্বে স্পেন ও অ্যাঙ্গোরা এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। এর আয়তন ৫,৪৩,৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ৫,৩৫,৯০,০০০ (১৯৮০). রাজধানী প্যারিস।

সোভিয়েট রাশিয়া

ইউরোপ ও এশিয়া মহাদেশের বিরাট জায়গা নিয়ে সোভিয়েট রাশিয়া। বর্তমানে এ দেশ অত্যুন্নত হলেও পূর্বে ছিল পশ্চাৎপদ ও অনুন্নত। ৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে ভ্লাদিমির (ladimir ৯৫৬-১০১৫ খ্রী.) নামে বীর যোদ্ধা রাশিয়ার শাসনকর্তা হন। তিনি ছিলেন রুরিক নামীয় এক সুইডিসের বংশধর। রুরিক ৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কাছে রাশিয়া রাজ্যের প্রথম পত্তন করেন। এর পর মধ্য এশিয়ার মঙ্গোল জাতি রাশিয়া দখল করে। তাদের অধীনে প্রায় আড়াই শ' বছর ধরে ছোট ছোট জমিদার দেশ শাসন করে।

॥ আইভ্যান দ্য গ্রেট ॥

১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে আইভ্যান দ্য গ্রেট (Ivan the Great, ১৪৪০-১৫০৫ খ্রী.) মঙ্গোলদের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করেন। তিনিই রাশিয়ার প্রথম স্বাধীন নৃপতি।

॥ আইভ্যান দ্য টেরিব্‌ল্ ॥

তাঁর পৌত্র আইভ্যান দ্য টেরিব্‌ল্ (Ivan the Terrible, ১৫৩০-১৫৮৪ খ্রী.) রাশিয়ার প্রথম

জার (Czar বা Tsar) অর্থাৎ সম্রাট্।

॥ পিটার দ্য গ্রেট ॥

১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দে পিটার দ্য গ্রেট (Peter the Great, ১৬৭২-১৭২৫ খ্রী.) রাশিয়ার জার হন।



পিটার দ্য গ্রেট

তিনি ছিলেন রোমানক্ বংশীয়। তাঁর আমলে নানা দিক্ দিয়ে রাশিয়ার প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। সেন্ট পিটার্সবুর্গ (বর্তমানে লেনিনগ্রাড) শহরে তিনি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন।

॥ ক্যাথারিন দ্য গ্রেট ॥

পিটারের পর রাশিয়ার সিংহাসনে বসেন ক্যাথারিন দ্য গ্রেট (Catherine the Great, ১৭২৯-১৭৯৬ খ্রী.)। তিনি পোল্যাণ্ডকে বার বার বিভাগ করে ও তুরস্কের বিরুদ্ধে ক্রমাগত যুদ্ধ করে রাশিয়ার সাম্রাজ্যকে বিস্তৃত করেন। তাঁর



ক্যাথারিন দ্য গ্রেট

আমলে কৃষকদের কোনও উন্নতি হয় নি।

ক্যাথারিনের পর রাশিয়ার জার হন প্রথম আলেকজাণ্ডার। তাঁর সময়ে মস্কোয় অভিযান করে নেপোলিয়ানের ভীষণ বিপর্যয় ঘটে।

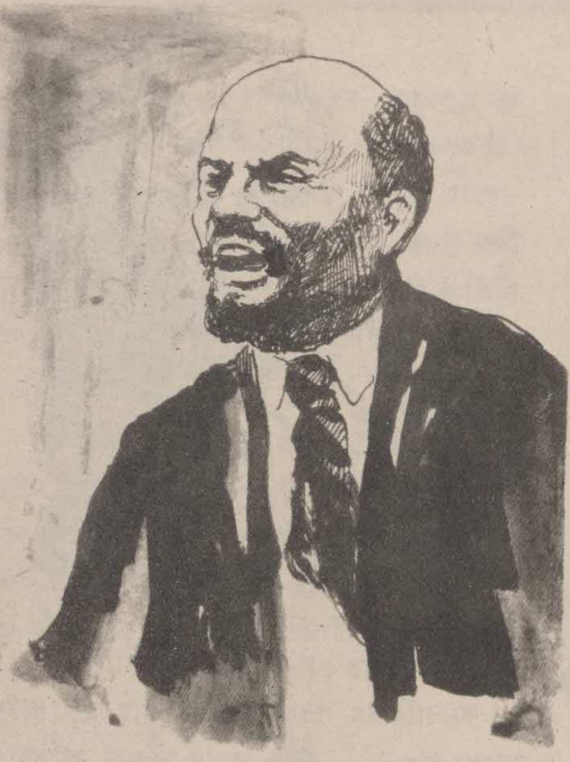
রাশিয়া ক্রিমিয়ার যুদ্ধে (১৮৫৩-১৮৫৬ খ্রী.) ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের কাছে হেরে যায়।

দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার (Alexander II, ১৮১৮-৮১ খ্রী.) জার হয়ে দু'কোটি ত্রিশ লক্ষ দাসকে মুক্তি দান করেন। তাঁর সময়ে কৃষকদের কিছুটা উন্নতি হয়। নিহিলিস্টদের দ্বারা তিনি নিহত হন।

॥ রুশ-জাপান যুদ্ধ ॥

মাঞ্চুরিয়া ও কোরিয়ার অধিকার নিয়ে জাপানের সঙ্গে ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়ার যুদ্ধ বাধে, জাপান পরাজিত হয়।

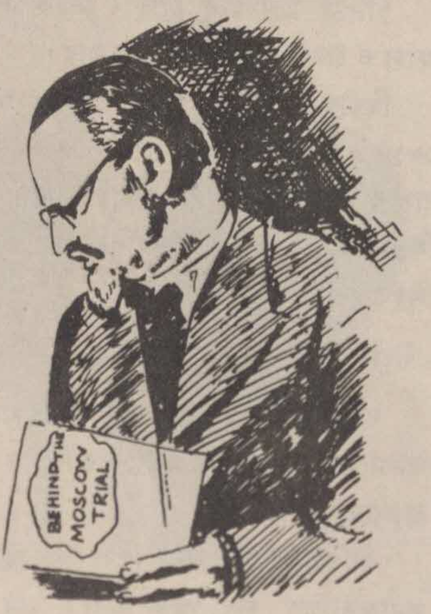
রাশিয়ায় বিপ্লবী নিহিলিস্ট দল ছিল। এখন সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে উঠল। এই দলের সব চেয়ে বড় নেতা ছিলেন লেনিন (Vladimir



লেনিন



স্ট্যালিন



ট্রট্স্কী

Ilyich Ulyanov Lenin, ১৮৭০-১৯২৪ খ্রী.)। এই দলের আর দু জন বড় নেতার নাম ট্রট্স্কী (Leon Trotsky—Lev Davidovich Bronstein ১৮৭৯-১৯৪০ খ্রী.) ও স্ট্যালিন (Joseph Stalin, ১৮৭৯-১৯৫৩ খ্রী.)। সমাজ-তান্ত্রিক দল বলশেভিক ও মেনশেভিক এই দুই দলে ভাগ হয়ে যায়। লেনিন ছিলেন বলশেভিক দলের নেতা।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-শেষে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে বলশেভিকরা জারের উচ্ছেদের জন্যে বদ্ধপরিকর হয়। প্রচণ্ড বিপ্লবের পর রাশিয়ার শাসনক্ষমতা বলশেভিকদের হাতে চলে যায়। জার নিকোলাস (Nicholus II, ১৮৬৮-১৯১৮ খ্রী.) বিপ্লবীর গুলিতে সপরিবারে

নিহত হলেন। এক নূতন কম্যুনিস্ট শাসন স্থাপিত হল। লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে একজন আততায়ীর গুলিতে লেনিন আহত হলেন। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত হল। কথা বলার শক্তি লুপ্ত হয়ে গেল। পর বৎসর তিনি পরলোক গমন করলেন।

ছলে বলে কৌশলে ট্রট্‌স্কী হলেন সোভিয়েট রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বহু ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করে রাশিয়া জার্মানির বিরুদ্ধে জয়ী হল।

স্ট্যালিন ও তাঁর লোকদের ভয়ে ট্রট্‌স্কী মেক্সিকোতে চলে গেলেন। কিন্তু তাতেও তিনি রেহাই পেলেন না। ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে এক যুবকের হাতুড়ির আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্ট্যালিনের মৃত্যু হল।

স্টালিনের মৃত্যুর পর ১৯৫ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেনকভ হন সোভিয়েট রাশিয়ার মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি।



ক্রুশেভ



ম্যালেনকভ



বুলগানিন

হন। তিনি সে পদে বেশী দিন থাকতে পারেন নি। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ক্রুশেভ (Nikita Sergeyevich Khruschev, ১৮৯৫-১৯৭১ খ্রী.) প্রধান মন্ত্রী হন। মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি হন বুলগানিন (Robert Wilhelm Bulganin, ১৮৯৫-১৯৭৫ খ্রী.)। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রেঝনেভ (Leonid



ব্রেঝনেভ

Ilyich Brezhnev)সভাপতি হন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে সোভিয়েট রাশিয়া বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ক্রমশঃ উন্নতিলাভ করেছে। রাশিয়াই প্রথম মহাকাশে স্পুট্‌নিক্ (শিশু চাঁদ) প্রেরণ করে। পারমাণবিক বোমা, দূর পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র, শক্তিশালী বিমান ও যুদ্ধজাহাজ, অতি শক্তিশালী রকেট প্রভৃতি তৈরি করে রাশিয়া এখন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিশালী দেশে পরিণত হয়েছে। অবশ্য, রাশিয়ার কোন মহাকাশচারী চাঁদে অবতরণ করেন নি।

সোভিয়েট রাশিয়ার আয়তন ২,২৪,০২,২০০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ২৬,৪৫,০০,০০০ (১৯৮০) ; রাজধানী মস্কো।

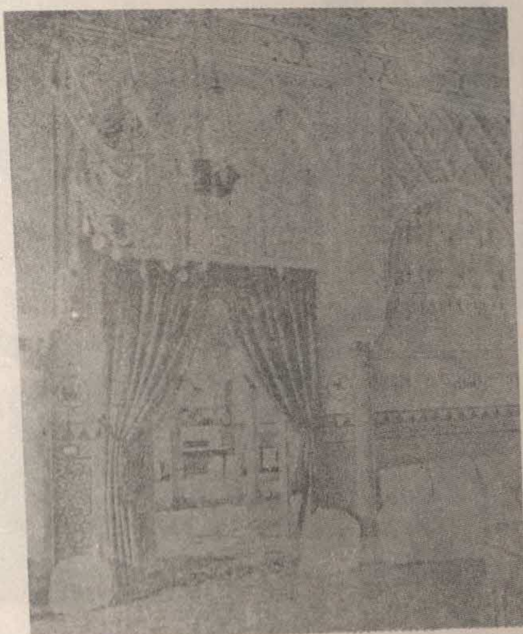
॥ স্পেন ॥

স্পেন (Spain) ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি উন্নত দেশ। কার্থেজের সেনাপতি হামিলকার বার্কা ও তাঁর পুত্র বিশ্ববিশ্রুত যোদ্ধা হানিবল (Hannibal, ২৪৭-১৮২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) দক্ষিণ স্পেন জয় করেন। রোমানগণ কার্থেজশক্তিকে পরাজিত করে স্পেনের অধীশ্বর হয়। রোমানদের পতনের পর ভ্যাণ্ডাল, ভিসিগথ প্রভৃতি বর্বর জাতি স্পেন দখল করে। ৭১১ খ্রীষ্টাব্দে আরবের মূর বা সারাসেনরা স্পেন অধিকার করে।

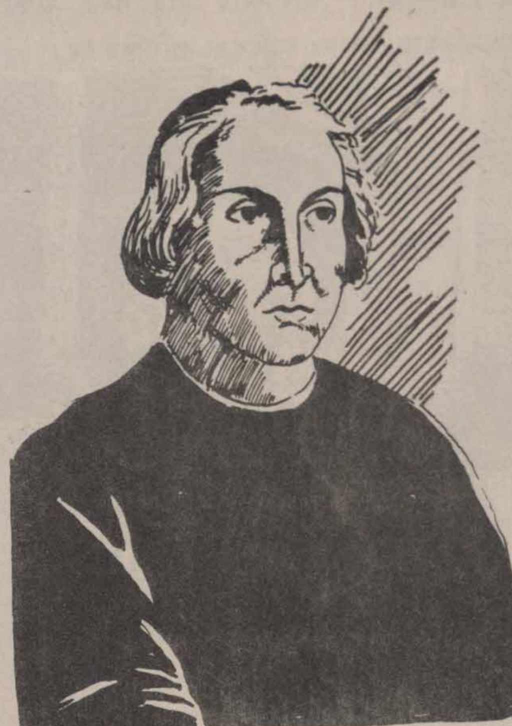
মূরেরা কর্ডোভায় রাজধানী স্থাপন করে। তারা স্পেনে প্রায় পাঁচশ' বছর রাজত্ব করে। তাদের রাজত্বকালে স্পেন দর্শন, জ্যোতির্বিদ্যা, সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতিতে অভূতপূর্ব উন্নতি লাভ করে। পরে ক্যাস্টিলের রাজা কর্ডোভা জয় করেন। তখন মূরেরা দক্ষিণ স্পেনের গ্রানাডা রাজ্যের পত্তন করে সেখানে আরও দু'শ' বছর স্পেনে রাজত্ব করে। গ্রানাডার আলহামব্রা প্রাসাদ উন্নত আরব স্থাপত্যের পরিচায়ক।

আরবদের পতনের পর ফার্দিনান্দ (Ferdinand V, ১৪৫২-১৫১৬ খ্রী.) ও তাঁর রানী ইজাবেলা (Isabella of Castille, ১৪৫১-১৫৫৪ খ্রী.) স্পেনে রাজত্ব করেন। তাঁরা খ্রীষ্টান ছিলেন। তাঁদের সময়ে কলম্বাস আমেরিকা আবিষ্কার করেন ও ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামা (Vasco da Gama, আনুমানিক ১৪৬০-১৫২৪ খ্রী.) ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন।

ফার্দিনান্দ ও ইজাবেলার পর তাঁদের মেয়ের ছেলে পঞ্চম চার্লস (Charles V, ১৫০০-১৫৫৮



আলহামব্রা প্রাসাদ



কলম্বাস



ফার্দিনান্দ



কলম্বাসের জাহাজ সান্টামেরিয়া

খ্রী.) রাজা হন। তাঁর সময়ে প্রায় সমগ্র দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।



পঞ্চম চার্লস



দ্বাদশ আলফন্সো

পঞ্চম চার্লসের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফিলিপ (Philip II. ১৫২৭-১৫৯৮ খ্রী.) রাজা হন। তিনি ইংল্যাণ্ড জয় করার জন্যে 'ইনভিন্‌সিবল আর্মাডা' অর্থাৎ অজেয় বিরাট নৌবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি পরাজিত হন।

॥ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ আল্‌ফন্সো ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে স্পেনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় কিন্তু পরে পুনরায় রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ওদিকে দক্ষিণ আমেরিকার সব উপনিবেশ স্পেনের হাতছাড়া হয়ে যায়। রাজা দ্বাদশ আলফন্সো (Alfonso XII, ১৮৫৭-১৮৮৫ খ্রী.) মারা গেলে তাঁর পুত্র ত্রয়োদশ আলফন্সো (Alfonso XIII. ১৮৮৪-১৯৪১ খ্রী.) রাজা হন।



ত্রয়োদশ আল্‌ফন্সো

॥ রিভেরা ॥

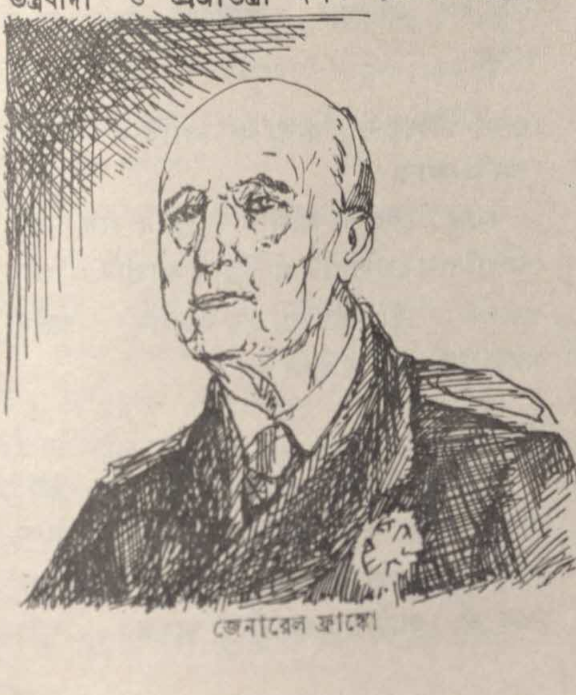
তাঁর সময়ে প্রাইমো ডি রিভেরা (Miguel Primo de Rivera, ১৮৭০-১৯৩০ খ্রী.) নামে এক সেনাধ্যক্ষ ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে সব ক্ষমতা দখল করে স্পেনের ডিক্টেটার হন (১৯২৫-১৯৩০ খ্রী.)। তাঁর স্বেচ্ছাচরিতায় তাঁর বিপক্ষে সারা স্পেনে তুমুল আন্দোলন দেখা দেয়। তখন রাজা আল্‌ফন্সো তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন।

॥ স্পেনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ॥

ত্রয়োদশ আল্‌ফন্সো রাজ্যশাসনের ভার নিজের হাতে নিয়ে ঠিকমতো দেশকে চালাতে পারলেন না। রাজ্য জুড়ে দিকে দিকে বিদ্রোহ দেখা দিল। রাজা দেশ ছেড়ে চলে গেলেন, ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল।

॥ জেনারেল ফ্রাঙ্কো ॥

তারপর দেশে দুটো দল গড়ে উঠল—সমাজতন্ত্রবাদী ও প্রজাতন্ত্রী দল। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে


জেনারেল ফ্রাঙ্কো

জেনারেল ফ্রাঙ্কো (General Francisco Franco, ১৮৯২-১৯৭৫ খ্রী.) সমাজতন্ত্রবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। হিটলার ও মুসোলিনীর সাহায্য তিনি পেলেন। রাশিয়া, ফ্রান্স ও মেক্সিকো সমাজতন্ত্রবাদীদের সাহায্য করল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলল। ফ্রাঙ্কো জয়ী হলেন। ইংল্যাণ্ড শেষ পর্যন্ত ফ্রাঙ্কো সরকারকে মেনে নিল। স্পেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকে।

ফ্রাঙ্কো অসুস্থ হয়ে পড়লে প্রথম জুয়ান কার্লস (Juan Carlos I, জন্ম ১৯৩৮ খ্রী.) ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের শাসনভার গ্রহণ করেন। ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর প্রথম জুয়ান কার্লস রাজা হিসাবে সিংহাসনে বসবার পর ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে নূতন সংবিধান চালু হয়েছে।

স্পেনের উত্তরে বিস্কে উপসাগর ও পিরেনীজ পর্বতমালা পূর্বে ও দক্ষিণে ভূমধ্যসাগর ও জিব্রাল্টার প্রণালী, দক্ষিণ পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে পোর্তুগাল ও আটলান্টিক মহাসাগর। এর আয়তন ৪,৯২,৫৯২ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩,৭৭,০০,০০০ (১৯৭৭); রাজধানী মাদ্রিদ।

জার্মানি

জার্মানি বর্তমানে ইউরোপের একটি অতি উন্নত রাষ্ট্র। জ্ঞানবিজ্ঞানের দিক্ দিয়ে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেশ। কিন্তু এ দেশের সভ্যতা-সংস্কৃতি সুপ্রাচীন নয়। প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের আমলে এখানে ফ্রাঙ্ক, স্যাক্সন, গথ, ভিসিগথ প্রভৃতি অর্ধ-সভ্য বীর জাতির বাস ছিল। সে সময়ে জার্মানি বলে কোন একটা দেশই ছিল না। সমগ্র অঞ্চলে ছোট ছোট পৃথক্ রাজ্য ছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষের দিকে ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ সম্রাট্ শার্লেমেন (Charlemagne, ৭৪২-৮১৪ খ্রী.) সব পৃথক্

রাজ্য এক করে একটি অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত করেন। তিনি ছিলেন ফ্রাঙ্কদের রাজা। তিনি ইতালী, গল (ফ্রান্স), স্পেন ও বর্তমান জার্মানির বিরাট অংশের অধীশ্বর হন। তাঁর পরলোকগমনের পর প্রকৃত পৃথক্ জার্মানির সৃষ্টি হয়।

পরে জার্মানিতে পুনরায় পৃথক্ পৃথক্ রাজ্যের সৃষ্টি হয়। অনেক শতাব্দী ধরে জার্মানিকে ঐক্য-হীন, বহুধা-বিভক্ত দেশরূপে কাটাতে হয়। মাত্র ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানি ঐক্যবদ্ধ বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়।

॥ মার্টিন লুথার ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানির মার্টিন লুথার (Martin Luther. ১৪৮৪-১৫৪৬ খ্রী.) প্রোটে-স্ট্যান্ট ধর্ম প্রচার করেন। জার্মান রাজ্যগুলির প্রায় অর্ধেক লোক প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম গ্রহণ করে। বাকী সবাই রোমান ক্যাথলিকই থেকে যায়। প্রোটেস্ট্যান্ট ও রোমান ক্যাথলিকদের মধ্যে বিরোধ ও যুদ্ধ লেগেই থাকে। এর ফলে ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধের সৃষ্টি হয় (১৬১৮-১৬৪৮ খ্রী.)। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ওয়েস্টফেলিয়ার সন্ধির দ্বারা যুদ্ধের অবসান ঘটে। কিন্তু জার্মানি তিনশ'র বেশী ছোট ছোট খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। এই সব রাজ্যের মধ্যে ব্রাণ্ডেনবুর্গ ছিল প্রধান রাজ্য। এখানে হোহেনজোলার্ন (Hohenzolern) রাজ-বংশ রাজত্ব করত। এই রাজ্যই সম্প্রসারিত হতে হতে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। তখন তার নাম হয় প্রাসিয়া (Prussia)।

॥ ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট ॥

প্রাসিয়ার রাজাদের মধ্যে ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট (Frederick the Great, ১৭১২-১৭৮৬ খ্রী.)



ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট

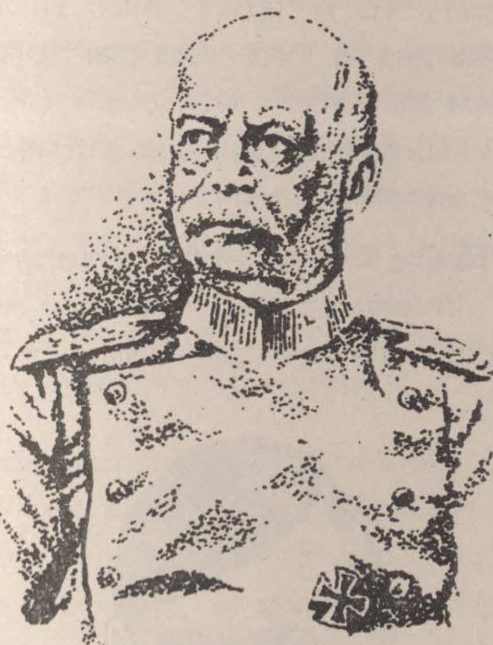
ছিলেন উল্লেখযোগ্য। ৪৬ বৎসর রাজত্ব করে ফ্রেডারিক প্রাসিয়ার সর্বতোমুখী উন্নতি সাধন করেন।

॥ নেপোলিয়ন কর্তৃক বার্লিন নগরী অধিকার ॥

ফ্রেডারিকের পর জার্মানি শক্তিহীন হয়ে পড়ে। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রাসিয়া ও জার্মানি আক্রমণ করলেন। তিনি প্রাসিয়া জয় করলেন। বার্লিন নগরী তাঁর দ্বারা অধিকৃত হল।

॥ বিসমার্ক ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত রাজ-নীতিজ্ঞ অটো ফন বিসমার্ক (Prince Otto Edward Leopold von Bismarck, ১৮১৫-১৮৯৮ খ্রী.) প্রাসিয়ার প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৮৭০



বিসমার্ক



দ্বিতীয় উইলিয়াম

খ্রীষ্টাব্দে সিডানের যুদ্ধে তিনি ফ্রান্সকে হারিয়ে আলসাস-লোরেন কেড়ে নিলেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত জার্মানির সৃষ্টি হল। প্রাসিয়ার রাজা প্রথম উইলিয়াম (William I, ১৭৯৭-১৮৮৮ খ্রী.) সম্মিলিত জার্মানির প্রথম সম্রাট্ হয়ে 'কাইজার' উপাধি গ্রহণ করলেন।

॥ বিসমার্ককে পদত্যাগে বাধ্যকরন ॥

রাজা প্রথম উইলিয়ামের মৃত্যুর পর প্রথম উইলিয়ামের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফ্রেডারিক রাজা হন। তিনি কয়েক মাস পরেই মারা যান। তাঁর পরে দ্বিতীয় উইলিয়াম (William II, ১৮৫৯-১৯৪১ খ্রী.) জার্মানির কাইজার হলেন। তাঁর সঙ্গে বিসমার্কের মতের মিল না হওয়ায় তিনি বিসমার্ককে চ্যান্সেলর পদ ত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। বিসমার্কের বিদায় নেওয়ার ঘটনাটি ইতিহাসে 'ড্রপিং দ্য পাইলট' (Dropping the Pilot) নামে খ্যাত।



ড্রপিং দ্য পাইলট অর্থাৎ কর্ণধার বিতাড়ন। বিসমার্ককে পদচ্যুত করণ।

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ॥

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে সার্বিয়ায় অস্ট্রিয়ার যুবরাজ নিহত হন। সেই উপলক্ষ্য করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। জার্মানির সঙ্গে ছিল অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া। বিপক্ষে ছিল ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, ইতালি, রুমানিয়া, পোর্তুগাল প্রভৃতি তেইশটি দেশ। জার্মানি পরাজিত হয়। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন ভার্সাই (Versailles) শহরে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়।

॥ হিটলারের অভ্যুদয় ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কাইজার সিংহাসন ত্যাগ করেন। জার্মানিতে রাষ্ট্রপতির অধীনে চ্যান্সেলার অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী রাজ্যশাসন করতে থাকেন। বহু ব্যাপারে বিক্ষুব্ধ জার্মানিতে ন্যাশনাল সোশ্যালিস্ট দল গড়ে ওঠে। সেই দলকে সংক্ষেপে বলা হয়



হিণ্ডেনবার্গ

নাৎসী (Nazi)। হিটলার (Adolf Hitler ১৮৮৯-১৯৪৫ খ্রী.) সেই দলের নেতা ছিলেন। ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রপতি ফন হিণ্ডেনবার্গ (Von Pal Hindenburg, ১৮৪৭-১৯৩৪ খ্রী.) হিটলারকে চ্যান্সেলার নিযুক্ত করলেন।

॥ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ॥

চ্যান্সেলার হয়ে হিটলার ভার্সাই সন্ধির শর্তগুলিকে অমান্য করতে থাকেন নির্বিচারে লক্ষ লক্ষ



হিটলার

ইহুদীকে হত্যা করান ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা করেন। তখন তিনি জার্মানির রাষ্ট্রপতি ও চ্যান্সেলার। তাঁর উপাধি হল ফুরার। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে ইতালি ও জাপান যোগদান করে। বিপক্ষে থাকে ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, পোল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু দেশ। জার্মানি প্রথম দিকে বহু যুদ্ধে জয়লাভ করে। তার

সুশিক্ষিত সৈন্যদল আধুনিক শক্তিশালী অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে বহু দেশ দখল করে নেয়। কিন্তু শেষ রক্ষা হয় না। জার্মানির ভাগ্যবিপর্যয় শুরু হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই মে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। হিটলার ভূগর্ভস্থ আশ্রয়কক্ষে আত্মহত্যা করেন। বহু উচ্চপদস্থ জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ ও হিটলারের সহকর্মী সামরিক আদালতে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া জার্মানিকে চার ভাগে ভাগ করে নিজ নিজ দখলে রাখে।

॥ পশ্চিম জার্মানি ও পূর্ব জার্মানি ॥

পশ্চিম জার্মানি (Federal Republic of Germany) ও পূর্ব জার্মানি (German Democratic Republic) এই দুইভাগে জার্মানি বিভক্ত হয়। বন হয় পশ্চিম জার্মানির রাজধানী বার্লিনের একাংশ পূর্ব জার্মানির রাজধানী হয়।

পূর্ব জার্মানি থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ লোক পশ্চিম জার্মানিতে চলে আসে। তখন বাধ্য হয়ে রাশিয়ার নির্দেশে পূর্ব জার্মানি এক দুর্ভেদ্য প্রাচীর তুলে পূর্ব জার্মানির বিশেষ করে বার্লিনের লোকদের পশ্চিম জার্মানিতে আসা বন্ধ করে। কার্যতঃ পশ্চিম জার্মানি ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তিলাভ করেছে। কিন্তু পূর্ব জার্মানি এখনও সম্পূর্ণ রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন।

পশ্চিম জার্মানির ফেডারেল চ্যান্সেলার ডাঃ অ্যাডেন্যুর।

ডঃ অ্যাডেন্যুর, ডঃ হাইনরিক লিউবকে প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিভিন্ন সময়ে পশ্চিম জার্মানির কর্ণধার হন।

যোহান গুটেনবার্গ, কেপলার, ভলটেয়ার, ইমান্যুয়েল কান্ট, গ্যেটে, শীলার, বেঠোভেন, হেগেল, সোপেনহাউয়ার, হাইনরিক হাইনে, লিবিগ, ভাগনার, কার্ল জাইস, মমসেন, কার্ল মার্ক্স, রোণ্টগেন, রবার্ট কক, কার্ল বেন্জ্, ডেমলার, নীটশে, বেরিং, হের্ৎজ, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, টমাস মান আইনস্টাইন প্রভৃতি বহু মনীষী জার্মানিতে জন্মগ্রহণ করেছেন।



পশ্চিম জার্মানির প্রেসিডেন্ট ডাঃ হাইনরিক লিউবকে

পশ্চিম জার্মানি অর্থাৎ ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানির আয়তন ২,৪৮,৬৬৭ বর্গ কিলোমিটার লোকসংখ্যা ৬,১৪,০০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী; বন।

পূর্ব জার্মানি অর্থাৎ জার্মান ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিকের আয়তন ১,০৮,১৭৭ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৬৭,০০,০০০ (১৯৭৯), রাজধানী পূর্ব বার্লিন।

অস্ট্রিয়া

অস্ট্রিয়া (Austria) ইউরোপের মধ্যস্থলে অবস্থিত হলেও যেন পূর্ব সীমানার দ্বারপ্রান্তে অবস্থিত। অস্ট্রিয়া শব্দের অর্থ পূর্বদিকের রাজ্য। এ দেশের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়। নবম শতাব্দীতে অস্ট্রিয়া নামের সৃষ্টি। এখানে ব্যাবেনবুর্গ ও হ্যাপসবুর্গ বংশ রাজত্ব করে।

॥ শার্লেমেন ॥

সম্রাট্ শার্লেমেন (Charlemagne, ৭৪২-৮১৪ খ্রী.) স্লাভদের হাত থেকে তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য রক্ষাকল্পে অস্ট্রিয়াকে ঘাঁটিস্বরূপ ব্যবহার করেন। পবিত্র রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হলেও অস্ট্রিয়া প্রভূত স্বাধীনতা ভোগ করতে থাকে।

॥ ম্যাক্সিমিলিয়্যান ॥

অস্ট্রিয়ার হ্যাপসবুর্গ বংশীয় সম্রাট্ চতুর্থ ফ্রেডারিকের পুত্র ম্যাক্সিমিলিয়ান (Maximilian, রাজত্বকাল ১৪৯৯-১৫১৯ খ্রী.) অস্ট্রিয়াকে অতিশয় শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। বারগ্যাণ্ডির কন্যা মেরীকে বিবাহ করার ফলে ম্যাক্সিমিলিয়ান বেলজিয়াম হল্যাণ্ড প্রভৃতি প্রভূত দেশ লাভ করেন।

ম্যাক্সিমিলিয়ানের পুত্র ফিলিপ স্পেনের রাজকুমারীকে বিবাহ করার ফলে স্পেনিশ সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করার অধিকার লাভ করেন। ফিলিপের পুত্র পঞ্চম চার্লস নামে অস্ট্রিয়ার সিংহাসনে বসেন। কনিষ্ঠ পুত্র ফার্দিনান্দ পঞ্চম চার্লসের পর রাজা হন।

॥ মেরিয়া থেরেসা ॥

পরে প্রথম লিওপোল্ড অনেক দিন রাজত্ব করেন। হ্যাপসবুর্গ বংশের পুরুষ বংশধরদের মধ্যে ষষ্ঠ চার্লস শেষ সম্রাট্। ষষ্ঠ চার্লসের পর তাঁর কন্যা মেরিয়া থেরেসা সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে প্রাসিয়ার দ্বিতীয় ফ্রেডারিক অস্ট্রিয়ার কাছ থেকে সাইলেসিয়া ছিনিয়ে নেবার জন্যে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অস্ট্রিয়া পরাজিত হয়। ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আই-লা-শ্যাপেলের সন্ধিতে অস্ট্রিয়া প্রাসিয়াকে সাইলেসিয়া দিতে বাধ্য হয়।



মেরিয়া থেরেসা

১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে মেরিয়া থেরেসার পুত্র দ্বিতীয় জোসেফ অস্ট্রিয়ার সম্রাট্ হন। তাঁর পরে সম্রাট্ হন দ্বিতীয় লিওপোল্ড। দ্বিতীয় লিওপোল্ডের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফ্রান্সিস সম্রাট্ হন।

॥ মেটারনিক ॥

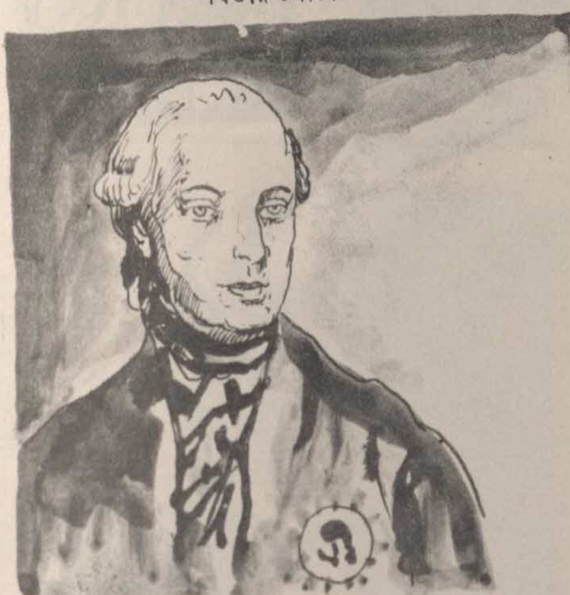
১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর কয়েক বছর অস্ট্রিয়া নেপোলিয়ানের অধীনে রইল। নেপোলিয়ানের পতনের পর অস্ট্রিয়া তার হৃত রাজ্যগুলি ফিরে পেল। বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ মেটারনিকের কূট কৌশলে অস্ট্রিয়া প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হল।



দ্বিতীয় জোসেফ



দ্বিতীয় ফ্রান্সিস



দ্বিতীয় লিওপোল্ড

॥ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ॥

বহু ভাঙ্গাগড়ার মধ্য দিয়ে অস্ট্রিয়ার দিন কেটে গেল। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে জুন অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফ্রান্সিস ফার্দিনান্দ বোসনিয়ার রাজধানী সারাজেভোয় বেড়াতে গেলে সস্ত্রীক নিহত হন। এজন্যে অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। তা থেকেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সতের বৎসর পরে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়া পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বর্তমানে অস্ট্রিয়া আয়তনে অনেক



অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ড

ছোট হয়ে গেছে। অস্ট্রিয়ার আয়তন ৮৩,৮৫৩ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৭৪,৬০,০০০ (১৯৭১); রাজধানী ভিয়েনা।

সুইডেন

সুইডেন ইউরোপের উত্তরে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের পূর্ব ও বৃহত্তর অংশ নিয়ে গঠিত দেশ। এর পশ্চিমে নরওয়ে ও পূর্বে ফিনল্যাণ্ড। সুইডেনের ইতিহাস প্রাচীন নয়।

॥ রাজা ওলফ ॥

রাজা ওলফ্ সুইডেনের প্রথম খ্রীষ্টান নরপতি। তখনকার দিনে সুইডেনে বহু জমিদার ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তেমন ঐক্য ছিল না। বিদেশীদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করবার জন্যে সুইডেনের বর্তমান রাজধানী স্টকহোমকে সুরক্ষিত দুর্গরূপে পরিণত করা হয়

॥ রাণী মার্গারেট ॥

রানী মার্গারেট সুইডেন নরওয়ে ও ডেনমার্কের অধিশ্বরী হয়ে দেশে ঐক্য ও শান্তি আনয়ন করেন (১৩৯৭ খ্রী.)। তাঁর পরে দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় থাকে না।

॥ গাস্টেভাস ভাসা ॥

ডেনমার্কের রাজা দ্বিতীয় ক্রিশ্চিয়ান সুইডেন দখল করে নিলেন। তাঁর অত্যাচারে বিব্রত হয়ে সুইডেনবাসীরা গাস্টেভাস ভাসা (Gustavus Vasa, ১৪৯৮-১৫৬০ খ্রী.)-কে ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা করে। তিনি সুইডেনকে পূর্ণ স্বাধীন রাজ্যে পরিণত করেন।

॥ গাস্টেভাস অ্যাডল্‌ফাস ॥

পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সুইডেনের শাসনকার্য এগিয়ে চলতে থাকে। গাস্টেভাস অ্যাডল্‌ফাস (Gustavus Adolphus, ১৫৯৪-



গাস্টেভাস ভাসা



গাস্টেভাস অ্যাডল্‌ফাস

১৬৩২ খ্রী.) ভাসা-বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নৃপতি। জার্মানিতে যে 'ত্রিশ বৎসরব্যাপী যুদ্ধ' চলছিল তাতে প্রোটেস্ট্যান্টদেব পক্ষাবলম্বন করে তিনি অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু যুদ্ধজয়ের প্রাক্কালে এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন।

॥ রানী ক্রিস্টিনা ॥

আাডল্‌ফাসের পরে তাঁর কন্যা ক্রিস্টিনা দেশের



রানী ক্রিষ্টিনা

রানী হন। রাজকার্যে তাঁর বিশেষ মন ছিল না। তার ফলে দেশে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়. তিনি ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করে রোমে চলে যান

॥ সুইডেন সাম্রাজ্যের পতন ॥

ক্রিস্টিনার সিংহাসন ত্যাগের পর দশম চার্লস রাজা হন। তিনি খুব ভাল যোদ্ধা ছিলেন। তাঁকে বলা হয় সুইডেনের নেপোলিয়ন। তিনি মারা গেলে একাদশ চার্লস রাজা হন। তাঁর পরে দ্বাদশ চার্লস (Charles XII, ১৬৮২-১৭১৮ খ্রী.) রাজা হন। তিনি খুব বীর যোদ্ধা ছিলেন।



দ্বাদশ চার্ল্‌স

কিন্তু তাঁর সময়েই সুইডেন সাম্রাজ্যের দ্রুতগতি পতন শুরু হয়।

'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে' যোগদান করে সুইডেন ভীষণভাবে অপদস্থ হল। তৃতীয় গাস্টেভাস (Gustavus III, ১৭৪৬-১৭৯২ খ্রী.) সুইডেনের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন। তাঁর পরে চতুর্থ গাস্টেভাস (Gustavus IV, ১৭৭৮-১৮৩৭ খ্রী.) ও ত্রয়োদশ চার্ল্‌স পর পর রাজত্ব করেন।

॥ সুইডেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ॥

পরে নেপোলিয়নের ফরাসী সেনানায়ক বার্নাদোত চতুর্দশ চার্লস উপাধি নিয়ে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ



চতুর্দশ চার্লস

পর্যন্ত সুইডেনে রাজত্ব করেন। এর পর থেকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজা সুইডেনের সিংহাসনে আরোহণ করেন। দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সুইডেন নিরপেক্ষ থাকে। বর্তমানে সুইডেনে ইংল্যাণ্ডের ন্যায় নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। দেশের রিক্স্ট্যাগ (Rikstag) বা পার্লামেন্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট। কার্ল ষোড়শ গুস্তভ ১৯৭৩ সালে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুইডেন বর্তমানে শক্তিশালী দেশ।

সুইডেনের আয়তন ৪,১১,৬১৫ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ৮৩,০০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী স্টকহোম।

ডেনমার্ক

ডেনমার্ক উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের একটি সুসমৃদ্ধ শক্তিশালী দেশ। অতি প্রাচীন কাল থেকে এখানে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে এটি একটি স্বতন্ত্র রাজ্য। পূর্বে নরওয়ে গ্রীনল্যাণ্ড, আইসল্যাণ্ড প্রভৃতি স্থান নিয়ে ডেনমার্ক এক বিশাল রাজ্য ছিল। বর্তমানে নরওয়ে ও আইসল্যাণ্ড ডেনমার্কের অধীনতা থেকে মুক্ত। শুধু জনবিরল বিরাট দ্বীপ গ্রীনল্যাণ্ড ও ফারো দ্বীপপুঞ্জ ডেনমার্কের অধীন।

॥ শ্রীরামপুরে দিনেমারদের কুঠি স্থাপন ॥

ডেনমার্কের অধিবাসীদের দিনেমার বলা হয়। ভারতে দিনেমাররা একসময়ে কোন কোন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৭৫৫ খ্রীষ্টাব্দে তারা শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন করেছিল। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীরামপুর ডেনমার্কের অধীন ছিল।

ডেনমার্কে রাজা রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী মুখ্য প্রশাসক। রাজা দশম ফ্রেডারিকের মৃত্যুর পর তাঁর কন্যা Margrethe II ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ডেনমার্কের আয়তন ৪৩,০৮০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৫১,২০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী কোপেনহাগেন।

নরওয়ে

নরওয়ে ইউরোপের উত্তর-পশ্চিমস্থ স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া উপদ্বীপের পশ্চিমাংশ নিয়ে গঠিত দেশ। এ দেশ পর্বত ও অরণ্যময় অনুর্বর ও হিমশীতল। নরওয়েকে নিশীথ সূর্যের দেশ বলা হয়। কারণ, এখানকার উত্তরাঞ্চলে মে মাসের মাঝ থেকে জুলাই-এর শেষ পর্যন্ত সূর্য অস্ত যায় না। ১৮ই নভেম্বর থেকে ২৩শে জানুয়ারি পর্যন্ত উত্তর নরওয়ের আকাশে সূর্যের দেখা মেলে না। ওই দীর্ঘকাল রাত্রে অরোরা বোরিয়েলিস বা সুমেরুজ্যোতি নামে এক আলোকচ্ছটা দেখা যায়।

॥ ভাইকিং ॥

নরওয়েবাসীরা টিউটনিক জাতিগোষ্ঠীভুক্ত।

উত্তরে মঙ্গোলীয় জাতিগোষ্ঠীর কিছুসংখ্যক ফিন ও ল্যাপ বাস করে। হাজার বৎসরের আগে এদেশের ভাইকিং নামে দুর্দান্ত সমুদ্র-অভিযাত্রীরা ইউরোপ থেকে আমেরিকায় যায়।

॥ স্বাধীন রাষ্ট্র নরওয়ে ॥

বহু শতাব্দীকাল সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকার পর নরওয়ে ১৩৯৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেনমার্কের সঙ্গে যুক্ত হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই অবস্থা চলে। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুইডেনের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ডেনমার্কের প্রিন্স কার্ল সপ্তম হাকন নামে নরওয়ের সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে নরওয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ কুইসলিং ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নরওয়ে নাৎসী জার্মানির দ্বারা অধিকৃত হয়। যুদ্ধশেষে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। কুইস্‌লিং-এর নেতৃত্বে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে নরওয়েতে নাৎসী জার্মানির তাঁবেদার সরকার গঠিত হয়। যুদ্ধ শেষে বিশ্বাস-ঘাতকতার অপরাধে কুইসলিং-এর প্রাণদণ্ড হয়।

সপ্তম হাকনের মৃত্যুর পর পঞ্চম ওলাভ (Olav V) ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ের রাজা হন। জন্ম (১৯০৩ খ্রী.)। প্রধান মন্ত্রী মুখ্য প্রশাসক হিসাবে দেশের শাসনকার্য চালান। নরওয়ের আয়তন ৩,২৩,৮৯৪ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৪০,৭৮,৯০০ (১৯৮০); রাজধানী অসলো।

পোর্তুগাল

পোর্তুগাল ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র পর্বতময় দেশ। ক্ষুদ্র হলেও একদা এ দেশ বৃহৎ শক্তি বলে পরিগণিত হত।

॥ পোর্তুগালে প্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা ॥

দ্বাদশ শতাব্দীতে এই দেশ একটি স্বাধীন রাজতন্ত্রী দেশ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৫৮০ থেকে ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোর্তুগাল স্পেনের দখলে ছিল। ১৭৯২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এ দেশ নেপোলিয়ান-শাসিত ফ্রান্সের অধিকারে থাকে। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে দেশে এক বিদ্রোহ দেখা দেয়। দেশের লোক তখন রাজা দ্বিতীয় ইম্যানুয়েলকে অপসারিত করে দেশকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত করে।

॥ দেশে সামরিক শাসন ॥

১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে দেশে সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে অ্যান্টোনিও সালাজার ডিক্টেটার হন। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থান হয়।

॥ পোর্তুগালের সব উপনিবেশ হাত-ছাড়া ॥

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে পোর্তুগাল দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিল, অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক ও পৃথিবীর নানা স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ উপনিবেশ গড়ে তোলে। তখন পোর্তুগালের চেয়ে প্রায় তিনশ গুণ বড় ছিল তার ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভাস্কো ডা গামা ভারতের কালিকট বন্দরে উপস্থিত হন। ভারতে গোয়া, দমন, দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলিতে পোর্তুগিজরা উপনিবেশ স্থাপন করে। এক সময়ে হার্মাদ নামে পোর্তুগিজ জল-দস্যুরা ভারতবাসীদের উপরে রীতিমতো অত্যাচার চালাত। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সকল উপনিবেশ পোর্তুগালের হাত-ছাড়া হয়ে গেছে। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে দাদরা, নগর হাভেলি, গোয়া, দমন ও দিউ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। চীনের অন্তর্গত ম্যাকাওকে পোর্তুগিজ কবলমুক্ত করার কথা চলছে। পোর্তুগালের আয়তন ৯১,৬৩১ বর্গ-কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৯৮,৬২,৭০০ (১৯৭৯); রাজধানী লিসবন।

পোল্যাণ্ড

পূর্ব ইউরোপের দেশ পোল্যাণ্ডের ইতিহাস সুপ্রাচীন নয়। এ দেশে বিভিন্ন সময়ে বহু রাষ্ট্রীয় বিপর্যয় সংঘটিত হয়েছে। বার বার এ দেশ বিভক্ত হয়েছে, যুদ্ধবিগ্রহ, হত্যাকাণ্ড প্রভৃতির দ্বারা সারা দেশে চরম দুর্দশা দেখা দিয়েছে।

॥ বিভিন্ন সময়ে পোল্যাণ্ড বিভাগ ॥

৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পোল্যাণ্ডের ইতিহাস জানা যায়। চতুর্দশ থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পোল্যাণ্ড শক্তিশালী দেশ ছিল। রাশিয়া, প্রাসিয়া ও অস্ট্রিয়া ১৭৭২, ১৭৯৩ ও ১৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনবার পোল্যাণ্ডকে বিভক্ত করে। ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ন পোল্যাণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ করেন। কিন্তু ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত-অনুযায়ী এ দেশ খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে অস্ট্রিয়া প্রাসিয়া ও রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয়।

॥ কম্যুনিস্টদের অধীনে পোল্যাণ্ড ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর পোল্যাণ্ড স্বাধীনতা ফিরে পায় ও অখণ্ড রাষ্ট্রে পরিণত হয়। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এ দেশকে সোভিয়েট রাশিয়া ও জার্মানি দ্বিখণ্ডিত করে অধিকার করে। জার্মানির অধিকারে থাকার সময়ে হিটলারের নির্দেশে পোল্যাণ্ডের ৩০/৩৫ লক্ষ ইহুদী নিহত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কম্যুনিস্ট রাশিয়ার প্রভাবাধীনে পোল্যাণ্ডকে কয়েক বৎসর কাটাতে হয়। স্ট্যালিনপন্থীরা তাদের বারো বৎসরের শাসনকালে দেশের সকল জমিদারকে ক্ষমতাচ্যুত করে, স্কুলে ধর্মশিক্ষা বন্ধ করে, রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজকদের কারারুদ্ধ করে।

॥ গোমুলকা ॥

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গোমুলকাকে জেল থেকে মুক্ত করে নেতার পদ দেওয়া হয়। তাঁর চেষ্টায় স্কুলে ধর্মশিক্ষার ও গির্জায় উপাসনা করার অনুমতি দেওয়া হয়

॥ ওয়ালেসা ॥

পোল্যাণ্ড কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র হলেও সকল ব্যাপারে কম্যুনিস্ট মতবাদ পূর্ণভাবে সমর্থন করে না। দেশে নানা অশান্তি লেগেই আছে। বিশিষ্ট শ্রমিক নেতা ওয়ালেসা ধর্মঘট করার ও ট্রেড ইউনিয়ন গঠন করার স্বাধীনতার জন্যে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনি ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি বিষয়ে নোবেল পুরস্কারজয়ী হিসাবে মনোনীত হন। তিনি নোবেল পুরস্কার নিতে যান নি। তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর স্ত্রী পুরস্কার গ্রহণ করেন।

প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ নিকোলাস কোপার্নিকাস (Nicolas Copernicus, ১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রী.) ও মহিলা বিজ্ঞানী মেরী কুরি জাতিতে পোল। পোল্যাণ্ডের আয়তন ৩,১২,৮৬৩ বর্গ কিলোমিটার : লোকসংখ্যা ৩,৫৩,৮২,০০০ (১৯৮০) : রাজধানী ওয়ারস।

হল্যাণ্ড

হল্যাণ্ড বর্তমানে নেদারল্যাণ্ডস (Netherlands) বলে পরিচিত। হল্যাণ্ডের অধিবাসীদের বলে ডাচ বা ওলন্দাজ। নেদারল্যাণ্ডসের অর্থ নিম্নভূমি। হল্যাণ্ডের অধিকাংশ স্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে নিচে অবস্থিত। হল্যাণ্ডের উত্তর ও পশ্চিম এলাকাকে বাঁধ বেঁধে সমুদ্রের জলকে ঠেকিয়ে রাখতে হয়েছে।

॥ উইলিয়াম দ্য সাইলেন্ট ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে হ্যাপসবুর্গ রাজবংশের সম্রাট পঞ্চম চার্লস তাঁর পিতা-পিতামহের বৈবাহিক সূত্রে অস্ট্রিয়া, স্পেন প্রভৃতি বিরাট সাম্রাজ্যের রাজা



দ্বিতীয় ফিলিপ



উইলিয়াম দ্য সাইলেন্ট

হন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপের ভাগে পড়ে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়াম।

দ্বিতীয় ফিলিপ অতিশয় উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি ছিলেন গোঁড়া ক্যাথলিক। হল্যাণ্ডের লোকরা বেশির ভাগ ছিল প্রোটেস্ট্যান্ট। তিনি তাদের শায়েস্তা করতে ডিউক আলভা নামে এক নিষ্ঠুর দুর্দান্ত শাসনকর্তাকে পাঠালেন। আলভার অমানুষিক অতি নৃশংস অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হয়ে হল্যাণ্ডবাসীরা অরেঞ্জ বংশের প্রিন্স উইলিয়াম দ্য সাইলেন্ট (William the Silent, ১৫৩৩-১৫৮৪ খ্রী.) নামে এক স্বার্থত্যাগী বীরপুরুষের নেতৃত্বে প্রতিরোধ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হল। ১৫ ৭খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-সংগ্রাম চলে। উইলিয়াম দ্য সাইলেন্টকে কিছুতেই পরাজিত করতে না পেরে দ্বিতীয় ফিলিপ তাঁকে গুপ্তঘাতক দ্বারা হত্যা করান।

॥ হল্যাণ্ডে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ॥

ইংল্যাণ্ড ও জার্মানি সাহায্য করায় হল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করল। সেখানে সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হল।

॥ হল্যাণ্ডের সব উপনিবেশ হস্তচ্যুত ॥

হল্যাণ্ড পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অর্থাৎ ইন্দোনেশিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করল। তারপর সিংহল (শ্রীলঙ্কা) অধিকার করল। উত্তর আমেরিকার নিউ আমস্টার্ডাম (পরবর্তী নিউ ইয়র্ক) প্রদেশ ও দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করল। এ ছাড়া ভারতে ও পৃথিবীর অন্যান্য বহু স্থানে হল্যাণ্ড উপনিবেশ স্থাপন করে। বর্তমানে তাদের দখলে আর কোন উপনিবেশ নেই। সবই হাতছাড়া হয়ে গেছে।

স্বতন্ত্র রাজ্যরূপে হল্যাণ্ডের প্রতিষ্ঠা ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে। ভিয়েনা কংগ্রেসে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ামকে এক রাজ্যে পরিণত করা হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড বেলজিয়াম থেকে পৃথক্ হয়ে যায়।

দক্ষিণ আফ্রিকায় যে বুয়রদের সঙ্গে হু'বার ইংরেজদের যুদ্ধ হয়। সেই বুয়রদের পূর্বপুরুষ হল্যাণ্ডের অধিবাসী।

॥ রানী উইলহেলমিনা ॥

হল্যাণ্ডের রানী উইলহেলমিনা (Queen



উইলহেলমিনা

Wilhelmina, ১৮৮০-১৯৬২ খ্রী.) ও বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নিজেদের দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে মিলিতভাবে চেষ্টা করেন। হল্যাণ্ড আটচল্লিশ ঘণ্টার বেশী জার্মান বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি।

উইলহেলমিনার পর তাঁর কন্যা জুলিয়ানা উইলহেলমিনা সিংহাসনে বসেন। তিনি ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করলে তাঁর কন্যা বিয়াট্রিক্স উইলহেলমিনা আর্মগার্ড (Beatrix Wilhelmina Armgard, জন্ম ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে) ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আন্তর্জাতিক আইনের জনক গ্রোসিয়াস (Grotius, ১৫৮৩-১৬৪৫ খ্রী.) হল্যাণ্ডের অধি-



রেমব্রাণ্ট

বাসী। বিখ্যাত চিত্রকর রেমব্রাণ্ট (Rembrandt, ১৬০৬-৬৯ খ্রী.) হল্যাণ্ডের লোক।

হল্যাণ্ডের আয়তন ৩৩,৯২৮ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৪০,৯১,০১৪ (১৯৮০); রাজধানী আমস্টার্ডাম।

ফিনল্যাণ্ড

ফিনল্যাণ্ড ইউরোপের উত্তরে স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার অন্তর্গত দেশ। তুষারাবৃত বিস্তীর্ণ প্রান্তর, নিবিড় অরণ্য ও অগণিত হ্রদে ভরা ফিনল্যাণ্ড। ১১৫৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশ

সুইডেনের অধীন থাকে। তার পরে ফিনল্যাণ্ড রাশিয়ার অধীন হয়। রাশিয়ার বিপ্লবের পর ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর ফিনল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে ফিনল্যাণ্ড স্বাধীন সাধারণ-তন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

॥ রাশিয়া কর্তৃক ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ ॥

১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে নভেম্বর সোভিয়েট রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড আক্রমণ করে। প্রবল যুদ্ধের পর ফিনল্যাণ্ড ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই মার্চ ৩২,৮০৬ বর্গ কিলোমিটার স্থান রাশিয়াকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে নাৎসী জার্মানি রাশিয়াকে আক্রমণ করলে হৃত স্থানসমূহের পুনরুদ্ধারের আশায় ফিনল্যাণ্ড যুদ্ধে নামে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে এক যুদ্ধবিরতি পত্র স্বাক্ষরিত হয়। ফিন-ল্যাণ্ড এবার ৪২৯৩৪ বর্গ কিলোমিটার স্থান ছেড়ে দিতে স্বীকৃত হয়। তা ছাড়া রাশিয়া পোর্ককালায় ৫০ বৎসরের জন্যে ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার লাভ করে। রাশিয়া ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ককালা ফিন-ল্যাণ্ডকে ফেরত দেয়।

ফিনল্যাণ্ড ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের সংবিধান অনুযায়ী এক স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ডঃ উরো কেকোনেন (Dr. Urho Kekkonen) ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ৬ বৎসরের জন্যে রাষ্ট্রপতি হন।

ফিনল্যাণ্ডের আয়তন ৩,০৫,৪৭৫ বর্গ কিলো-মিটার; লোকসংখ্যা ৪৭,৯০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী হেলসিঙ্কি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা (সংক্ষেপে ইউ. এস. এ.) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নামে খ্যাত।

॥ সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ ॥

কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর থেকে ইউরোপের বিভিন্ন জাতির লোক বিভিন্ন সময়ে আমেরিকায় বসতি স্থাপন করে। আমেরিকার তেরটি উপনিবেশ ইংরেজদের অধীন ছিল। কানাডা ছিল ফরাসীদের অধীন। ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ হয়, তাতে ফ্রান্স পরাজিত হয়। কানাডা ইংরেজদের দ্বারা অধিকৃত হয়।

॥ জর্জ ওয়াশিংটন ॥

এর পর আমেরিকার লোকেদের সঙ্গে জর্জ ওয়াশিংটন (George Washington, ১৭৩২-১৭৯৯ খ্রী.)-এর নেতৃত্বে ইংরেজদের প্রচণ্ড যুদ্ধ বাধে। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৩টি ইংরেজ উপনিবেশ পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই স্বাধীন উপনিবেশ-গুলির সম্মিলিত নাম হয় ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকা। এর প্রেসিডেন্ট হন জর্জ ওয়াশিংটন।

॥ আব্রাহাম লিঙ্কন ॥

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham



আব্রাহাম লিঙ্কন

Lincoln, ১৮০৯-৬৫ খ্রী.) প্রেসিডেন্ট হন। তিনি দাসপ্রথার উচ্ছেদ করেন। কিন্তু যে সব

উপনিবেশ দাসপ্রথা উচ্ছেদের বিরোধী ছিল, তাদেরই একজন এক থিয়েটারগৃহে গুলি চালিয়ে লিঙ্কনকে হত্যা করে। আততায়ীর নাম জন উইলকিস বুথ।

॥ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ॥

৫০টি রাষ্ট্র নিয়ে বর্তমান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র



রুজভেল্ট

গঠিত। বিভিন্ন সময়ে উড্রো উইলসন (Woodrow Wilson, ১৮৫৬-১৯২৪ খ্রী.), ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট (Franklin Roosevelt, ১৮৮২-১৯৪৫ খ্রী.)।



উড্রো উইলসন

জেমস মনরো (James Monroe, ১৭৫৯-১৮৩১ খ্রী.), হার্বার্ট সি হুভার (Herbert C. Hoover, ১৮৭৪-১৯৬৪ খ্রী.), জন. এফ. কেনেডি (John F. Kennedy, ১৯১৭-১৯৬৩ খ্রী.),



জন এফ. কেনেডি

লিণ্ডন বি. জনসন (Lyndon B. Johnson, ১৯০৮-১৯৭৩ খ্রী.), রিচার্ড এম. নিক্সন



নিক্সন

(Richard M. Nixon, জন্ম ১৯১৩ খ্রী.), জি. আর. ফোর্ড (Gerald R. Ford, জন্ম ১৯১৩ খ্রী.), জেমস আর্ল কার্টার (Jemes Earl Carter, জন্ম ১৯২৪ খ্রী.), রোনাল্ড রেগন (Ronald Reagan, জন্ম ১৯১১ খ্রী.) প্রভৃতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। কেনেডি নিহত হন।

দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটালে জাপান আত্মসমর্পণ করে। দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই জার্মানি পরাজিত হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী দেশ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আয়তন ৯৩,৬৩,৩৮৯ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২২,৬৫,০০,০০০ (১৯৮০), রাজধানী ওয়াশিংটন ডি. সি.।

কানাডা

কানাডা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র (প্রথম সোভিয়েট রাশিয়া)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তর সীমান্ত থেকে আর্কটিক সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত বিরাট ভূভাগ।

॥ কানাডা রাষ্ট্রের উদ্ভব ॥

ইংল্যাণ্ডবাসী ইতালীয় নাবিক জন ক্যাবট (John Cabot, ১৪২৫-১৫০০ খ্রী.) কানাডার উপকূলে অবতরণ করেন। তিনি ওই এলাকাকে ইংল্যাণ্ডের অধিকারভুক্ত বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু ইংরেজরা সেই সুযোগ নিতে বিলম্ব করে। ষোড়শ শতাব্দীতে ফরাসীরা কানাডায় উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ শেষ হয়। ফরাসীরা কানাডার অধিকার ত্যাগ করে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ডোমিনিয়ন অব কানাডা রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়।

কানাডা বর্তমানে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অধীনে স্বাধীন রাষ্ট্র। ক্রমশঃ ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে কানাডার সাংবিধানিক সম্পর্কের ব্যবধান বেড়েই চলেছে।

কানাডার আয়তন ৯৯,৭৬,১৪০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২,৩৯,০০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী ওটাওয়া।

বেলজিয়াম

বেলজিয়াম বার বার বিদেশী শক্তির অধীন হয়েছে। জুলিয়াস সীজার এক সময়ে বেলজিয়ামে আধিপত্য করেন। স্পেন, ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া প্রভৃতি

দেশ বহু বার বেলজিয়াম অধিকার করেছে। এই কারণে বেলজিয়ামকে বলা হয় ইউরোপের রণক্ষেত্র (The Cockpit of Europe)।

॥ বেলজিয়ামে স্বাধীন রাজতন্ত্র ॥

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েনা কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেলজিয়ামকে হল্যাণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করা



বেলজিয়ামের দৃশ্য

হয়। পরে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বেলজিয়ামে স্বাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথম লিওপোল্ড রাজা হন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় লিওপোল্ড ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন ও ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তার পর রাজা হন প্রথম আলবার্ট। আলবার্টের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তৃতীয় লিওপোল্ড রাজা হন।

॥ বিশ্বযুদ্ধ ও বেলজিয়াম ॥

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে জার্মান সৈন্য বেলজিয়ামে প্রবেশ করে ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাজা তৃতীয় লিওপোল্ড জার্মানির নিকট আত্মসমর্পণ করেন। তা সত্ত্বেও দেশের ক্ষতি কম হয় নি।

১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জুলাই তৃতীয় লিওপোল্ড রাজা হন। তাঁর পরে তাঁর পুত্র বদৌইন ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই সেপ্টেম্বর সিংহাসনে আরোহণ করেন।

বেলজিয়ান বলে কোন জাতি নেই। বেলজিয়ামের উত্তরাংশে প্রধানতঃ টিউটনিক জাতি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ফ্লেমিশদের বাস, দক্ষিণাংশে লাতিন জাতিগোষ্ঠীর ওয়ালুনদের বাস। বেলজিয়াম ইউরোপের সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ দেশ।

বেলজিয়ামের আয়তন ৩০,৫১,৮৭১ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৯৮,৫৫,১১০ (১৯৭৯) ; রাজধানী ব্রাসেল্‌স্।

সুইটজারল্যাণ্ড

সুইটজারল্যাণ্ড মধ্য ইউরোপের পর্বত, হ্রদ ও অরণ্যময় সুন্দর দেশ।



সুইটজারল্যাণ্ডের তুষারাবৃত পর্বতমালা

সুইটজারল্যাণ্ডের প্রায় ৬০ শতাংশ জুড়ে আল্‌প্‌স্ পর্বতমালা বিরাজিত।

॥ নিরপেক্ষ রাষ্ট্র সুইটজারল্যাণ্ড ॥

সুইটজারল্যাণ্ড এক সময়ে রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। সুইটজারল্যাণ্ড নানা পরিবর্তনের

মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হতে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। অস্ট্রিয়া, ফ্রান্স, গ্রেট ব্রিটেন, পোর্তুগাল, প্রাসিয়া, রাশিয়া, স্পেন ও সুইডেন এই দেশের নিরপেক্ষতাকে সমর্থন করে। ভিয়েনা কংগ্রেসের প্রস্তাবানুসারে সুইটজারল্যাণ্ড হয় স্থায়ী নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। সুইটজারল্যাণ্ড রাষ্ট্রসংঘের সদস্য নয়।

সুইটজারল্যাণ্ডের আয়তন ৪১,২৮৮ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৬৩,০০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী বার্ন।

আইসল্যাণ্ড

গ্রীনল্যাণ্ড যেমন সবুজ গাছপালাময় নয়, তেমনই আইসল্যাণ্ড বরফের দেশ নয়। আইসল্যাণ্ডের আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ।

॥ স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্র আইসল্যাণ্ড ॥

৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর আটলান্টিকের এই দ্বীপ-রাজ্যে নরওয়ের কিছু অভিযাত্রী গিয়ে বসতি স্থাপন করে। ৯৭০ থেকে ১২৬২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আইসল্যাণ্ড স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল।

১২৬৩ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ড নরওয়ের শাসনাধীন হয়। ১৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে আইসল্যাণ্ড ও নরওয়ে ডেনমার্কের অধীন হয়। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নরওয়ে ডেনমার্ক থেকে পৃথক্ হলে আইসল্যাণ্ড ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ডেনমার্কের অধীন থাকে। তার পরে আইসল্যাণ্ড স্বাধীনতা লাভ করলেও ডেনমার্কের রাজার প্রতি আনুগত্য বজায় থাকে। পরে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ সবচেয়ে প্রাচীন পার্লামেণ্ট ॥

আইসল্যাণ্ডের পার্লামেণ্ট পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন। এই পার্লামেণ্ট এক হাজার বছরেরও আগে গঠিত হয়। আইসল্যাণ্ডের প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক সাক্ষর।

আইসল্যাণ্ডের আয়তন ১,০২,৮১৯ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা.২,২৬,২৭৪ (১৯৭৯); রাজধানী রেকইয়্যাভিক।

হাঙ্গেরি

হাঙ্গেরি মধ্য ইউরোপের একটি দেশ। ১০০১ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশে প্রথম স্বাধীন রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। তার পর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এই দেশ ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। পরে হাঙ্গেরি ও অস্ট্রিয়ার দ্বারা তুর্কীরা পরাজিত হয়।

॥ হাঙ্গেরিতে রাজতন্ত্র ॥

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অস্ট্রিয়ার সম্রাট হাঙ্গেরির রাজা হন। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরিতে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ হাঙ্গেরিতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হাঙ্গেরি জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। যুদ্ধশেষের দিকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া হাঙ্গেরির বেশির ভাগ জায়গা দখল করে। হাঙ্গেরিতে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরিতে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

॥ ইমরে নাগি ও জেনস্ কাদার ॥

১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই আগস্ট হাঙ্গেরিতে সোভিয়েটসদৃশ শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়। ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে হাঙ্গেরি রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হয়। ইমরে নাগি ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত হাঙ্গেরির প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইমরে নাগি পুনরায় প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি রাষ্ট্রসংঘের সাহায্য প্রার্থনা করেন। জেনস কাদার পালটা

সরকার গঠন করে সোভিয়েট রাশিয়ার সমর্থন চান।

॥ হাঙ্গেরিতে ব্যাপক হত্যাকাণ্ড ॥

মার্শাল জুখভের নেতৃত্বে বিপুলসংখ্যক রাশিয়ান সৈন্য হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করে। নাগি ও তাঁর মন্ত্রীদের বলপূর্বক অপহরণ করে হত্যা করা হয়। স্বাধীনতাকামী হাঙ্গেরিবাসীদের প্রায় ত্রিশ হাজার লোক রাশিয়ান সৈন্যদের হাতে মারা যায়। হাঙ্গেরির লোকে জুখভকে 'বুদাপেস্তের জল্লাদ' বলতে থাকে।

১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট-হাঙ্গেরি চুক্তি সম্পাদিত হয়। বর্তমানে হাঙ্গেরি সোভিয়েট রাশিয়ার নিয়ন্ত্রণাধীন রাষ্ট্র।

হাঙ্গেরির আয়তন ৯৩,০৩২ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,০৭,১০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী বুদাপেস্ত।

যুগোশ্লাভিয়া

যুগোশ্লাভিয়া দক্ষিণ ইউরোপে আড্রিয়াটিক সাগরের উত্তর উপকূলে অবস্থিত দেশ। সার্বিয়া, বোস্‌নিয়া, ক্রোশিয়া, শ্লোভেনিয়া, হারজেগোভিনা, ম্যাসিডোনিয়া ও মন্টেনেগরো এবং স্বয়ংশাসিত অঞ্চল কোসোভো ও ভজভোদিনো নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া গঠিত। পূর্বে যুগোশ্লাভিয়া ছিল রাজতন্ত্রী দেশ।

॥ মার্শাল টিটো ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে যুগোশ্লাভিয়া জার্মানির অন্তর্ভুক্ত হয়। তখন মার্শাল টিটো (Josip Broz Tito, ১৮৯২-১৯৮০ খ্রী.) দেশের এক বিশাল গণবাহিনী নিয়ে জার্মানদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন। তাঁর নেতৃত্বে মুক্তিফৌজ ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করলে তৎকালীন



মার্শাল টিটো

রাজা দ্বিতীয় পিটার সপরিবারে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সকল প্রকার অধিকার থেকে বঞ্চিত হন। মার্শাল টিটো রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হন। যুগোশ্লাভিয়া কম্যুনিষ্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র হলেও নির্বিচারে রাশিয়ার অনুশাসন মেনে চলে না।

যুগোশ্লাভিয়ার আয়তন ২,৫৫,৮০৪ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২,২৩,০০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী বেলগ্রেড।

চেকোশ্লোভাকিয়া

চেকোশ্লোভাকিয়া মধ্য ইউরোপের একটি ভূমিবদ্ধ দেশ হলেও এল্‌ব্‌ ও দানিয়ুব নদীর দ্বারা কৃষ্ণসাগর ও উত্তর সাগরের সঙ্গে সংযুক্ত। চেকোশ্লোভাকিয়া নবগঠিত রাষ্ট্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে সৃষ্ট হয়। অস্ট্রিয়ার বোহেমিয়া, মোরাভিয়া ও সাইলেসিয়ার কিছু অংশ এবং হাঙ্গেরির শ্লোভাকিয়া ও রুথেনিয়া প্রদেশ নিয়ে এই দেশটি গঠিত হয়। দেশটিতে থাকে ৭৫ লক্ষ চেক, ২৩ লক্ষ শ্লোভাক, ৩২ লক্ষ জার্মান ও ৭ লক্ষ ম্যাগিয়ার।

১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে হিটলার চেকোশ্লোভাকিয়ার জার্মান-অধ্যুষিত সুদেতন অঞ্চল জার্মানির সঙ্গে সংযুক্তির দাবি জানান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে সুদেতন অঞ্চল চেকোশ্লোভাকিয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়। তবে, রুথেনিয়াকে রাশিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়।

॥ কম্যুনিস্ট সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র চেকোশ্লোভাকিয়া ॥

১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চেকোশ্লোভাকিয়া সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন হয়। তখন থেকে চেকোশ্লোভাকিয়া কম্যুনিস্ট সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র।



চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রথম রাষ্ট্রপতি টমাস মাসারিক চেকোশ্লোভাকিয়াকে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণা করছেন।

টমাস মাসারিক (Thomas Garrigue Masaryk, ১৮৫০-১৯৩৭ খ্রী.) ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চেকোশ্লোভাকিয়ার রাষ্ট্রপতি ছিলেন। পরে বেনেস (Edward Benes, ১৮৮৪-১৯৪৮ খ্রী.) রাষ্ট্রপতি হন।

॥ চেকোশ্লোভাকিয়ায় রাশিয়ান সৈন্য ॥

১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ডুবচেকের নেতৃত্বে চেকোশ্লোভাকিয়ার কম্যুনিস্ট শাসনকে রাশিয়ান প্রভাবমুক্ত করবার জন্যে সারা দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। ঐ বছর রুশ, জার্মান, হাঙ্গেরিয়ান ও বুলগেরিয়ান সৈন্য সম্মিলিতভাবে চেকোশ্লোভাকিয়ায় প্রবেশ করে। ডুবচেকের দল পরাজিত হয়। তখন থেকে চেকোশ্লোভাকিয়ায় বিরাট রুশ সৈন্যদল স্থায়িভাবে থাকার ব্যবস্থা হয়।

১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে অ্যান্টোনিন নভোটনি রাষ্ট্রপতি হন। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে গুস্তাভ হুসাক (Gustav Húsak) রাষ্ট্রপতি হন।

চেকোশ্লোভাকিয়ার আয়তন ১,২৭,৮৭৭ বর্গ-কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৫১,৮০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী প্রাগ।

রুমানিয়া

রুমানিয়া বা রোমানিয়া (Romania) দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে বল্কান উপদ্বীপের উত্তরে অবস্থিত কম্যুনিস্ট প্রভাবান্বিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র।

॥ রুমানিয়া রাষ্ট্রের উদ্ভব ॥

যে অঞ্চলের বর্তমান নাম রুমানিয়া ১০১ খ্রীষ্টাব্দে তা রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে মোলদাভিয়া (Moldavia) ও ওয়ালেকিয়া (Walachia)-কে সংযুক্ত করে রুমানিয়া রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। রুমানিয়ার একাংশে তুর্কীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে এই অঞ্চলের নাম হয় রুমানিয়া।

॥ কম্যুনিস্ট-শাসিত সাধারণতন্ত্র রুমানিয়া ॥

১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে রুমানিয়া তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ক্যারল (Caroll I) রাজা হন। রাজা দ্বিতীয় ক্যারল (১৮৯৩-১৯৫৩ খ্রী.) ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রুমানিয়া শাসন করেন। প্রথম মাইকেল ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে রাজা হন। তিনি কম্যুনিস্ট চাপে ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তখন থেকে রুমানিয়া কম্যুনিস্ট-শাসিত সাধারণতন্ত্র।

রুমানিয়ার আয়তন ২,৩৭,৫০০ বর্গকিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ২,২০,৫০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী বুখারেস্ট।

আলবেনিয়া

আলবেনিয়া (Albania) ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের একটি ক্ষুদ্র দেশ। ১৪৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আলবেনিয়ায় তুর্কীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুর্কীদের অধীনে থাকে। ঐ বৎসর ২৮শে নভেম্বর স্বাধীনতা ঘোষণা করে। প্রিন্স উইলিয়াম ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই মার্চ রাজা হন কিন্তু ৩রা সেপ্টেম্বর সিংহাসন ছেড়ে দেশত্যাগ করেন। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে আলবেনিয়া সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ বেগ জোগু (Ahmed Beg Zogu, ১৮৯৫-১৯৬১ খ্রী.) রাজা প্রথম জোগ নামে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজা থাকেন।

॥ সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র আলবেনিয়া ॥

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশ ইতালীয় ও জার্মান অধিকারে থাকে। সেই সময়ে রাজা জোগ দেশের বাইরে থাকেন। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশ তাদের কবল থেকে মুক্তিলাভ করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে এনভার হোজা (Enver Hoxha)-র অধীনে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণতন্ত্রী দেশ হিসাবে ঘোষিত হয়। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী দেশের মুখ্য প্রশাসক। আলবেনিয়া পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র নিরীশ্বরবাদী রাষ্ট্র।

আলবেনিয়ার আয়তন ২৮,৭৪৮ বর্গ-কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ২৫,৯০,০০০ (১৮৭৯)। রাজধানী টিরানা।

বুল্‌গেরিয়া

বুলগেরিয়া (Bulgaria) কৃষ্ণসাগরের পশ্চিমে, রুমানিয়ার দক্ষিণে এবং গ্রীস ও তুরস্কের উত্তরে অবস্থিত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে বুলগেরিয়া রাজ্য গঠিত হয়। ১৩৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের শাসনাধীন হয়। বুলগেরিয়া ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করে।

১৮৭৯ থেকে ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রিন্স প্রথম আলেকজাণ্ডার রাজা হন। প্রিন্স (১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের পর জার) ফার্দিনান্দ ১৮৮৭ থেকে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে বসেন। জার তৃতীয় বোরিস ১৯১৮ থেকে ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সিংহাসনে আরূঢ় থাকেন।

॥ কম্যুনিস্ট প্রভাবান্বিত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র বুল্‌গেরিয়া ॥

বুলগেরিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির পক্ষে যোগদান করে খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মানি এই দেশকে কবলিত করে। জার্মানির পরাজয়ের পর বুলগেরিয়ায় কম্যুনিস্ট প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বুলগেরিয়া বর্তমানে কম্যুনিস্ট

প্রভাবান্বিত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। প্রেসিডিয়ামের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেন।

বুলগেরিয়ার আয়তন ১,১০,৯১১ বর্গ-কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৮৮,৮০,০০০ (১৯৮০) ; রাজধানী সোফিয়া।

তুরস্ক

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ও দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত একটি মুসলমান-অধ্যুষিত দেশ তুরস্ক। দার্দানেলিস প্রণালী মাঝখানে থেকে তুরস্ককে দ্বিখণ্ডিত করেছে। ইউরোপের অংশ সামান্যই, এশিয়ার অংশই বেশী।

॥ সেলজুক তুর্কী ও অটোমান তুর্কী ॥

গোবি মরুভূমির পশ্চিমে তুর্কী নামে এক যাযাবর জাতির বাস ছিল। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দুর্দান্ত তাতাররা তাদের বিতাড়িত করলে তারা ভূমধ্যসাগরের উপকূলে আনাতোলিয়ায় বাস করতে থাকে। তারা সেলজুক তুর্কী নামে খ্যাত। এর দু'শতাব্দী বাদে পশ্চিম দিক্ থেকে আসে অটোমান তুর্কী। তাদের নেতা ওসমান (ওৎমান, তাই থেকে অটোমান) প্রথমে তুরস্কের শাসনকর্তা হন। পরে অটোমান তুর্কীরা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে থাকে।

॥ খলিফা ॥

আরবের মুসলমানদের সংস্পর্শে এসে তুর্কীরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে। তুরস্কের সম্রাট্‌কে বলা হত সুলতান। তিনি মুসলমানদের ধর্মগুরু হিসাবে সম্মানিত হতে থাকেন। তখন তাঁকে খলিফা বলা হত।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহম্মদ কনস্ট্যান্টিনোপল অধিকার করেন। ষোড়শ শতাব্দীতে



দ্বিতীয় মহম্মদ



তুর্কী সম্রাট্ সোলেমান

তুর্কী সম্রাট সোলেমানের সময়ে তুর্কীরা বাগদাদ, হাঙ্গেরি, মিশর ও উত্তর আফ্রিকার নানা স্থান অধিকার করে। শেষে ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে লেপান্তোর নৌযুদ্ধে হেরে গিয়ে অটোমান তুর্কীদের সাম্রাজ্য-বিস্তার বাধাপ্রাপ্ত হয়।

॥ তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক্ থেকে তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হয়। রাশিয়ার সঙ্গে তুরস্কের বার বার যুদ্ধ বাধে। শেষে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্কের একাংশের উপর রাশিয়ার কর্তৃত্ব নিয়ে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্স

তুরস্কের পক্ষে যোগদান করে। রাশিয়া বিশেষ সুবিধা করতে পারে না। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ শেষ হয়। কিন্তু তুরস্কের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, বোসনিয়া, হারজেগোভিনা তুরস্কের অধীনতাপাশ ছিন্ন করে স্বাধীন হয়ে যায়।

॥ তরুণ তুর্কী ॥

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে গ্রীস তুর্কীদের কবল থেকে মুক্ত হয়। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স আলজিরিয়া ছিনিয়ে নেয়। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়া আরমেনিয়া ও ইউরোপের আর কিছু অংশ তুরস্কের হাত থেকে দখল করে। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স টিউনিসিয়া কেড়ে নেয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ড তুর্কীদের বিতাড়িত করে মিশরের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯০৮-৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশের তরুণ সম্প্রদায় অকর্মণ্য সুলতানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। তারা তরুণ তুর্কী (Young Turks) নামে খ্যাত। এর পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দিলে জর্ডন, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি স্থান তুরস্কের হাতছাড়া হয়ে যায়।

॥ কামাল আতাতুর্ক ॥

এই দারুণ দুর্দিনে মুস্তাফা কামাল (১৮৮১-১৯৩৮ খ্রী.) নামে এক অসম সাহসী বীর তুরস্কের গগনে উদিত হন। তিনি দেশ থেকে খলিফা পদ তুলে দেন, ফেজ পরা ও বোরখা প্রথার উচ্ছেদ ঘটান, ইউরোপীয় কায়দায় হ্যাট পরা প্রচলন করেন, কাজীর বিচার তুলে দিয়ে বিচারের ভার দেন শিক্ষিত বিচারকদের হাতে, তুর্কী ভাষা ল্যাটিন হরফে (ইংরেজী ভাষা যে হরফে লেখা হয় তাকে বলে ল্যাটিন হরফ) লেখবার ব্যবস্থা করেন। তাঁর নেতৃত্বে ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে তুরস্ক প্রজাতন্ত্রী দেশ



কামাল আতাতুর্ক

বলে ঘোষিত হয়। কামাল প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। সুলতান দেশ ত্যাগ করলেন। কামালকে দেশবাসী বলা শুরু করল 'আতাতুর্ক' অর্থাৎ তুর্কী জাতির পিতা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তুরস্ক কোন পক্ষে যোগ দেয় নি। তবে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

তুরস্ক বর্তমানে ধর্মনিরপেক্ষ অকম্যুনিস্ট আধুনিক রাষ্ট্র। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান।

তুরস্কের আয়তন ৭,৭৯,৬১৯ বর্গ কিলোমিটার, (ইউরোপে ২৩,৭৬৪ বর্গ কিলোমিটার, এশিয়ায় ৭,৫৫,৮৫৫ বর্গ কিলোমিটার)।

লোকসংখ্যা ৪,৫৪,৪২,০০০ (১৯৮০); রাজধানী আঙ্কারা।

ইজরায়েল

ইজরায়েল (Israel) ইহুদীদের একমাত্র দেশ। আব্রাহামের পৌত্র জেকব ইজরেল নামেও খ্যাত

ছিলেন। তাই থেকেই ইজরায়েল নামের উৎপত্তি। প্যালেস্টাইন আগে ছিল ইহুদীদের বাসস্থান। রোমানদের অভিযানে তারা প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ে। তারা চলে গেলে আরবের মুসলমানরা প্যালেস্টাইনে দলে দলে এসে বাস করতে থাকে।

॥ ব্যালফুর ঘোষণা ॥

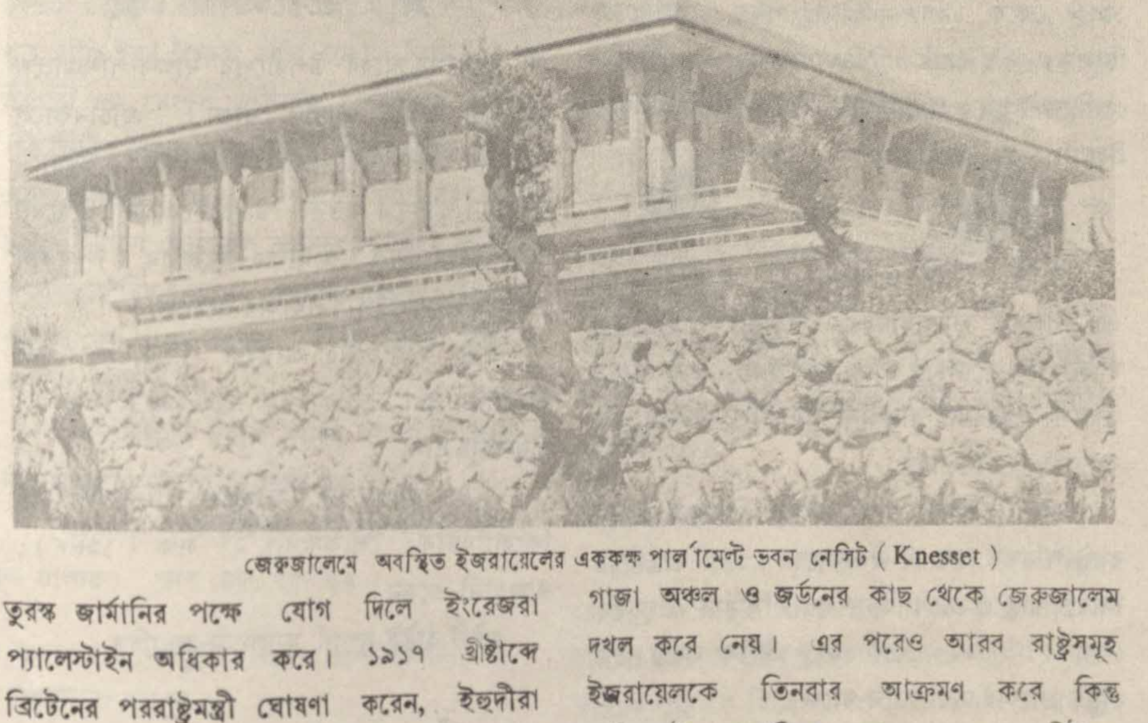
বিদেশে থাকলেও ইহুদীদের নিজেদের দেশের উপরে মমতা এতটুকু কমে নি। তারা প্যালেস্টাইন ফিরে পাবার জন্যে প্রচণ্ড আন্দোলন (Zionist Movement) শুরু করে। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন থিওডোর হার্জ্‌ল্ (Theodor Herzl, ১৮৬০-১৯০৪ খ্রী.)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় প্যালেস্টাইন ছিল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন। তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দিলে ইংরেজরা প্যালেস্টাইন অধিকার করে। ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা করেন, ইহুদীরা যাতে প্যালেস্টাইনে তাদের বাসভূমি ফিরে পায়, তার জন্যে চেষ্টা করা হবে। এর নাম ব্যালফুর ঘোষণা।

॥ ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের নির্দেশে নাৎসীদের দ্বারা বহু লক্ষ ইহুদী নিহত হলে ইহুদীদের মাতৃভূমি ফিরে পাবার আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্রসংঘের অনুমোদনক্রমে প্যালেস্টাইনকে দু'ভাগে ভাগ করে এক ভাগে ইজরায়েল রাষ্ট্র গঠন করা হয়। ঐ বৎসর ইংরেজ প্যালেস্টাইন ত্যাগ করে চলে যায়। মুসলমানেরা রীতিমতো ক্ষুব্ধ হয়। সিরিয়া, ইজিপ্ট, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব ও জর্ডন একযোগে ইজরায়েল রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে কিন্তু ইজরায়েলের নিকট পরাজিত হয়।

॥ আরব রাষ্ট্রসমূহের পরাজয় ॥

ইজরায়েল ইজিপ্টের কাছ থেকে সিনাই ও গাজা অঞ্চল ও জর্ডনের কাছ থেকে জেরুজালেম দখল করে নেয়। এর পরেও আরব রাষ্ট্রসমূহ ইজরায়েলকে তিনবার আক্রমণ করে কিন্তু প্রতিবারই পরাজিত হয়। ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ইজরায়েলের সঙ্গে ইজিপ্টের একটা চুক্তি হয়। তার ফলে ইজরায়েল সিনাই থেকে সরে আসে।



জেরুজালেমে অবস্থিত ইজরায়েলের এককক্ষ পার্লামেন্ট ভবন নেসিট (Knesset)

ইজরায়েলে এখনও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় নি। লেবানন ও আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই আছে। প্যালেস্টাইন দখলের জন্যে প্যালেস্টাইন মুক্তিসংঘ অবিরাম আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে।

ইজরায়েলের আয়তন ৮৯,৩৫৯ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৩৮,৩০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী জেরুজালেম।

॥ **ইজরায়েলের প্রেসিডেন্ট** ॥

সি. ওয়াইজম্যান (**Chaim Weizmann,** ১৮৭৪-১৯৫২ খ্রী.) ১৯৪৯ থেকে ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট থাকেন। তাঁর পরে বেন-জ্‌ভি (**Izhak Ben-Zvi**) ১৯৫২ থেকে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত, শাজার (**Zalman Shazar**) ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এবং **Ephraim Katzir** ১৯৬৮ থেকে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। **Yitzik Navon** ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হন। প্রধানমন্ত্রী বেগিন (**Menachem Begin**—১৯৮০ খ্রী.)।

সিরিয়া

সিরিয়া পশ্চিম এশিয়ার এক প্রাচীন দেশ। এর পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও লেবানীজ সাধারণতন্ত্র, দক্ষিণে ইজরায়েল ও জর্ডন, পূর্বে ইরাক এবং উত্তরে তুরস্ক। সিরিয়ার রাজধানী দামাস্কাস বারো হাজার বৎসরের প্রাচীন শহর।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই আগস্ট সিরিয়া স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ঐ বৎসরের ১লা সেপ্টেম্বর সিরিয়া রাষ্ট্র দু'ভাগে বিভক্ত হয়—সিরিয়া ও বৃহত্তর লেবানন। ১৯২০ থেকে ১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দুইটি রাষ্ট্রই ফ্রান্সের তত্ত্বাবধানে থাকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে মিত্রবাহিনী সিরিয়া দখল করে ও সিরিয়াকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ায় অবস্থিত সব ফরাসী সৈন্য সিরিয়া ত্যাগ করে।

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি সিরিয়া ইজিপ্টের সঙ্গে মিলিতভাবে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র বলে খ্যাত হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর ইজিপ্টের প্রেসিডেন্ট নাসের সিরিয়াকে সংযুক্ত আরব সাধারণতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে গণ্য হবার পক্ষে মত দেন। ১৩ই অক্টোবর সিরিয়া পুনরায় মিলিত হয় এবং আরব লীগের সদস্য হয়।

সিরিয়া কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন রাষ্ট্র। এর আয়তন ১,৮৫,৬৮০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৮৩,৫০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী দামাস্কাস।

★ ইয়েমেন ★

ইয়েমেন আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে অবস্থিত একটি প্রাচীন রাজ্য। প্রাচীনকালে ইয়েমেন 'সেবা'র রাজত্বের অংশ ছিল। বর্তমানে ইয়েমেন দু'ভাগে বিভক্ত—উত্তর ইয়েমেন (ইয়েমেন আরব রিপাবলিক) ও দক্ষিণ ইয়েমেন (পিপ্‌ল্‌স্ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ইয়েমেন)।

উত্তর ইয়েমেনের আয়তন ১,৯৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ৬৫ লক্ষ (১৯৭৫) ; রাজধানী সানা।

দক্ষিণ ইয়েমেনের আয়তন ১,৬০,৩০০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ (১৯৮০) ; রাজধানী এডেন।

দুইটি রাষ্ট্রই সম্পূর্ণ মুসলমান-অধ্যুষিত।

ইরাক

ইরাক সুপ্রাচীন সভ্য দেশ। এর পূর্ব নাম মেসোপটেমিয়া। প্রাচীন শহর উর, ইরিদু, নিনেভে

ও ব্যাবিলন এখানে অবস্থিত ছিল। এখানকার সভ্যতা ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ক্রীট, মিশর, গ্রীস প্রভৃতিকে প্রভাবিত করেছিল। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিজ নদীর মধ্যে অবস্থিত এই দেশ।

ইতিহাসে দেখা যায়, বিভিন্ন সময়ে এই দেশ ব্যাবিলন, অ্যাসিরিয়া, পারস্য, ম্যাসিডন, আরব ও তুরস্ক কর্তৃক শাসিত হয়।

॥ ইরাকে রাজতন্ত্র ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে তুরস্কের কাছ থেকে এই দেশ ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত হয়। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইরাক ব্রিটেনের আশ্রিত রাজ্যরূপে থাকে। এরই মধ্যে ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। হেজাজের রাজা ফৈজল ইরাকের রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গাজি ইবন ফৈজল রাজা হন। তিনি ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে এক মোটর দুর্ঘটনায় মারা যান। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ফৈজল রাজা হন। তিনি, তাঁর কাকা এমির আবদুল ইলা ও প্রধানমন্ত্রী নুরি অল সৈদ ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল কাসিমের নেতৃত্বে সামরিক তৎপরতায় নিহত হন। পরে চার বৎসর জেনারেল কাসিম দেশ শাসন করেন। তিনি ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক 'আরব ইসলামিক স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র' হিসাবে ঘোষিত হয়।

তৈলসমৃদ্ধ কুওয়েতকে অধিকার করতে ইরাক যুদ্ধ চালায়। তার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

॥ কুর্দদের কিছুটা স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ ॥

ইরাকের উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দিকের চারটি পার্বত্য প্রদেশের উপজাতি কুর্দদের সঙ্গে ইরাকীদের সংঘর্ষ বাধে। তারা কুর্দিস্তান নামে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়তে চায়। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে ইরাক সরকার কুর্দদের কিছুটা স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেয়।

ইরাকে সামরিক শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। বিপ্লবী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান।

॥ ইরাকে ইরানে যুদ্ধ ॥

ইরাকের সঙ্গে ইরানের এক প্রবল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছে। ১৯৮৩ খ্রীষ্টাব্দেও যুদ্ধবিরতি ঘটে নি।

ইরাকের আয়তন ৪,৩৮,৪৪৬ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,২২,০০,০০০; রাজধানী বাগদাদ। ইরাকের উত্তরে তুরস্ক, পূর্বে ইরান, দক্ষিণে সৌদি আরব, পশ্চিমে জর্ডন ও সিরিয়া।

লেবানন

লেবানন পশ্চিম এশিয়ায় ভূমধ্যসাগরের পূর্ব তীরস্থ স্বাধীন রাষ্ট্র। এর উত্তরে ও পূর্বে সিরিয়া, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর এবং দক্ষিণে ইজরায়েল।

লেবানন বহুদিন তুর্কীদের অধীন থাকবার পর ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে সিরিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত হয় ও ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সের রক্ষণাধীন থাকে। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স সিরিয়া ও লেবাননের উপরকার কর্তৃত্ব তুলে নিলে লেবানন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়।

॥ লেবাননে বিদ্রোহ ॥

১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে লেবাননে বিদ্রোহ দেখা দিলে প্রেসিডেন্ট চামুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সাহায্য চান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশাল সৈন্যবাহিনী ও যুদ্ধজাহাজ পাঠালে বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। পরবর্তী নির্বাচনে জেনারেল ফউদ চেহাব প্রেসিডেন্ট হন। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট হেলু (Helou) ৬ বৎসরের জন্যে নির্বাচিত হন।

॥ লেবাননে ইজরায়েলী আক্রমণ ॥

লেবাননে বহু প্যালেস্টাইনী এসে আশ্রয় নেয়। অন্তর্বিদ্রোহে লেবানন রীতিমতো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অসংখ্য লোক হতাহত হয়। সিরিয়ার সহায়তায় প্রেসিডেন্ট এলিয়াস সারকিস (১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাচিত) দেশে বিদ্রোহ প্রশমিত করেন। দক্ষিণ লেবাননে অশান্তি চলতেই থাকে। প্যালেস্টাইনীদের নৌ-আক্রমণের জন্যে ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইজরায়েল লেবাননে আক্রমণ চালায়। পরে রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতায় ইজরায়েল সৈন্য অপসারণ করে নেয়। তার পরে কয়েকবার ইজরায়েলের পালটা আক্রমণ চলে।

লেবাননের আয়তন ১০,৪০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ (১৯৭৮); রাজধানী বেরুট।

ইরান

ইরানের পূর্ব নাম পারস্য। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সরকারী আদেশের বলে পারস্য নামের পরিবর্তে নাম হয় ইরান। খ্রীষ্টজন্মের কয়েক শতাব্দী আগে পারস্য সাম্রাজ্য পূর্বে সিন্ধু নদ থেকে পশ্চিমে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

॥ কাইরাস ॥

৫৪৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কাইরাস (**Cyrus**, ৫৫৯-৫২৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) পারস্যের সম্রাট্ হন। তিনি একিমিনিড বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর সাম্রাজ্য পূর্বে ভারত ও পশ্চিমে ইজিয়ান সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। রাজা প্রথম দরায়ুস (**Darius I**, ৫৪৮-৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ছিলেন বিখ্যাত পারস্য-সম্রাট্। তিনি পারসেপলিসের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিশাল বাহিনী ম্যারাথনের যুদ্ধে গ্রীকদের নিকট পরাজিত হয়।

॥ জারক্সেজ ॥

প্রথম দরায়ুসের পুত্র জারক্সেজ (**Xerxes**, ৫১৯-৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) থার্মপিলীতে স্পার্টানদের পরাজিত করেন। তিনি ৪৮৫ থেকে ৪৬৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং নিহত হন।

দ্বিতীয় দরায়ুস (মৃত্যু ৪০৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে)-এর পর তৃতীয় দরায়ুস (মৃত্যু ৩৩১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে) সম্রাট্ হন। গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পারস্য আক্রমণ করে তৃতীয় দরায়ুসকে পরাজিত ও নিহত করেন।

আলেকজাণ্ডার পারস্য জয় করে পারসেপলিস নগর অগ্নিদগ্ধ করেন। একিমিনিড বংশ ২২০ বৎসর এক বিরাট সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য করে। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে সাসানিড রাজবংশ স্থাপিত হয়।

॥ ইরানের প্রসিদ্ধ কবিগণ ॥

ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হবার ফলে ইরান তুর্কীদের অধিকারভুক্ত হয়। সেই সময়ে ওমর খৈয়াম, হাফেজ, ফিরদৌসি, জালালুদ্দিন রুমি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবির আবির্ভাব হয়।

॥ তৈমুর ॥

সমরখন্দের নৃশংস তুর্কী বীর তৈমুর (১৩৩৬-১৪০৫ খ্রী.) ইরান অধিকার করেন। তাঁর বংশধরেরা একশত বৎসর ইরানে রাজত্ব করেন। সেই সময়কে বলা হয় তিমুরিড যুগ। ষোড়শ শতাব্দীতে তিমুরিডরা বিতাড়িত হয়। সাফাভি রাজবংশ ইরানের সিংহাসনে আসীন হয় এবং ১৫০২ থেকে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করে।

॥ নাদির শাহ ॥

সাফাভি বংশের পতনের পর নৃশংস লুণ্ঠক

নাদির শাহ্ (১৬৬৮-১৭৪৭ খ্রী.) ইরানের সিংহাসনে বসেন। তিনি বেশী দিন রাজত্ব করতে পারেন নি। নিজের অনুচরেরা তাঁকে হত্যা করে।

॥ রেজা শাহ্ পাহ্লবী ॥



১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ইরানের দক্ষিণ দিক্ ও রাশিয়ানরা উত্তর দিক্ দখল করে নেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরান নিরপেক্ষ থাকলেও দুর্দশার হাত থেকে রেহাই পায় নি। রাশিয়া ইরানের সব চেয়ে উর্বর জায়গা মাজান্দেরান আক্রমণ করলে রেজা খাঁ ইরানের প্রধানমন্ত্রী হলেন। ইরানের শাহ্ ইউরোপে বেড়াতে গিয়ে ফিরে না এলে তিনি রেজা শাহ্ পাহ্লবী নামে সম্রাট্ হলেন। তাঁর শক্তিশালী শাসনে ইরান ঐক্যবদ্ধ হয়।

॥ মহম্মদ রেজা পাহ্লবী ॥

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংল্যাণ্ড ও রাশিয়া ইরানে সৈন্যবাহিনী পাঠিয়ে দিল। রেজা শাহ্ নিষ্ফল বাধা দেবার পর সিংহাসন ত্যাগ করলেন। তাঁর পুত্র মহম্মদ রেজা পাহ্লবী সিংহাসনে বসলেন। তিনি দেশে নানা সংস্কার প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। তাঁর বিরুদ্ধে দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। আয়াতুল্লা রুহোল্লা খোমেইনি ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্বাসিত হন।

প্রিন্স রেজা পাহ্লবী

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৭ই জানুয়ারি শাহ্ সপরিবারে দেশ ত্যাগ করেন এবং ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জুলাই ইজিপ্টে মারা যান। তাঁর পুত্র প্রিন্স রেজা পাহ্লবী নিজেকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করেন।

॥ আয়াতুল্লা খোমেইনি ॥

আয়াতুল্লা ইরানে ফিরে এসে বিক্ষুব্ধ ইরানের শাসনব্যবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করতে থাকেন। প্রধানতঃ তাঁর নির্দেশে বহু শত লোককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ বানি-সদর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। কিন্তু তিনি খোমেইনির নির্বিচারে ইরানবাসীদের হত্যা করার প্রতিবাদে প্রেসিডেন্টের পদ ত্যাগ করে বিদেশে চলে যান। ইরানে এখনও শান্তি সংস্থাপিত হয় নি। খোমেইনি-বিরোধীদের সঙ্গে খোমেইনির সমর্থকদের সংঘর্ষ লেগেই আছে। ফলে বহু লোক হতাহত হচ্ছে। বিশিষ্ট নাগরিকরাও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হচ্ছেন (১৯৮৩ খ্রী.)।

॥ ইরাকের সঙ্গে ইরানের সংঘর্ষ ॥

ইরাকের সঙ্গে ইরানের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলছে (১৯৮৩ খ্রী.)। তাতে ইরানের বহু ক্ষয়ক্ষতি হচ্ছে, বহু লোকের প্রাণহানিও সংঘটিত হচ্ছে।

ইরান ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে তার সমস্ত তৈলখনি জাতীয়করণ করে। তখন থেকেই নানা গোলযোগের সৃষ্টি হয়। কম্যুনিস্টভাবাপন্ন ও কম্যুনিস্ট-বিরোধীদের মধ্যে ক্ষমতা অধিকারের দ্বন্দ্ব প্রবল।

ইরানের আয়তন ১৬,৪৮,০০০ বর্গ কিলো-মিটার; লোকসংখ্যা ৩,৪০,০০,০০০ (১৯৭৭): রাজধানী তেহরান।

আরব

আয়তনে আরব দেশ ইউরোপ মহাদেশের প্রায় চারভাগের একভাগ হলেও, এর বেশির ভাগই মরুভূমি। মরুভূমির আরবদের বেদুইন বলে।

॥ হজরত মহম্মদ ॥

ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২ খ্রী.) আরবের মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন ও

মদিনায় পরলোকগমন করেন। তাঁর পরলোক-গমনের পর সব ধর্মীয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা খলিফাদের হাতে চলে যায়। মিশর, সিরিয়া, জেরুজালেম প্রভৃতি বহু দেশের লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। আরবের মুসলমানেরা স্পেন, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশ জয় করে। বিরাট অঞ্চল জুড়ে আরব বা সারাসেন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। খলিফাদের মধ্যে বিখ্যাত ছিলেন হারুন অল-রসিদ (৭৬৬-৮০৯ খ্রী.)। তাঁর জীবনের নানা ঘটনা অবলম্বন করে আরব্য উপন্যাসের সৃষ্টি হয়। তাঁর রাজধানী ছিল ইরাকের বাগদাদ।

॥ সালাদিন ॥

হারুন-অল-রসিদের পর সেলজুক তুর্কীরা আরব দখল করে। তুর্কী সুলতান সালাদিন (১১৩৭-১১৯৩ খ্রী.) খ্রীষ্টানদের ধর্মযুদ্ধের অভিযানকে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে বাধা দেন।

॥ চেঙ্গিস খাঁ ॥

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নৃশংস চেঙ্গিস খাঁ (১১৬২-১২২৭ খ্রী.) বাগদাদ ধ্বংস করেন। তার পরে আরব রাজ্যগুলি অটোমান তুর্কীদের হাতে চলে যায়।

সৌদি আরব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন, ট্রান্সজর্ডন, হেজাজ, ইরাক, সিরিয়া, ইয়েমেন ও সৌদি আরব রাজ্য গড়ে ওঠে। ইংরেজদের সাহায্যে ইবন সৌদ (১৮৮০-১৯৫৩ খ্রী.) হেজাজের রাজা হুসেন (১৮৫৬-১৯৩১ খ্রী.)-কে পরাজিত করে আরবের ছোট ছোট রাজ্যগুলি একটির পর একটি দখল করেন এবং একটি বড় রাজ্য গড়ে তুলে তার নাম দেন সৌদি আরব (১৯৩২ খ্রী.)। ইবন সৌদ তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্রের দ্বারা ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে মার্চ নিহত হন। খালিদ ইবন আবদুল-আজিজ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি প্রধান মন্ত্রীর কার্যও পরিচালনা করেন। তৈলসম্পদে পৃথিবীতে সৌদি আরবের স্থান তৃতীয়।

সৌদি আরবের আয়তন ২৪ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৯৫,২০,০০০ (১৯৭৭); রাজধানী রিয়াধ।

ওমান

আরব উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্র। এর উত্তরে সৌদি আরব, পশ্চিমে দক্ষিণ ইয়েমেন।

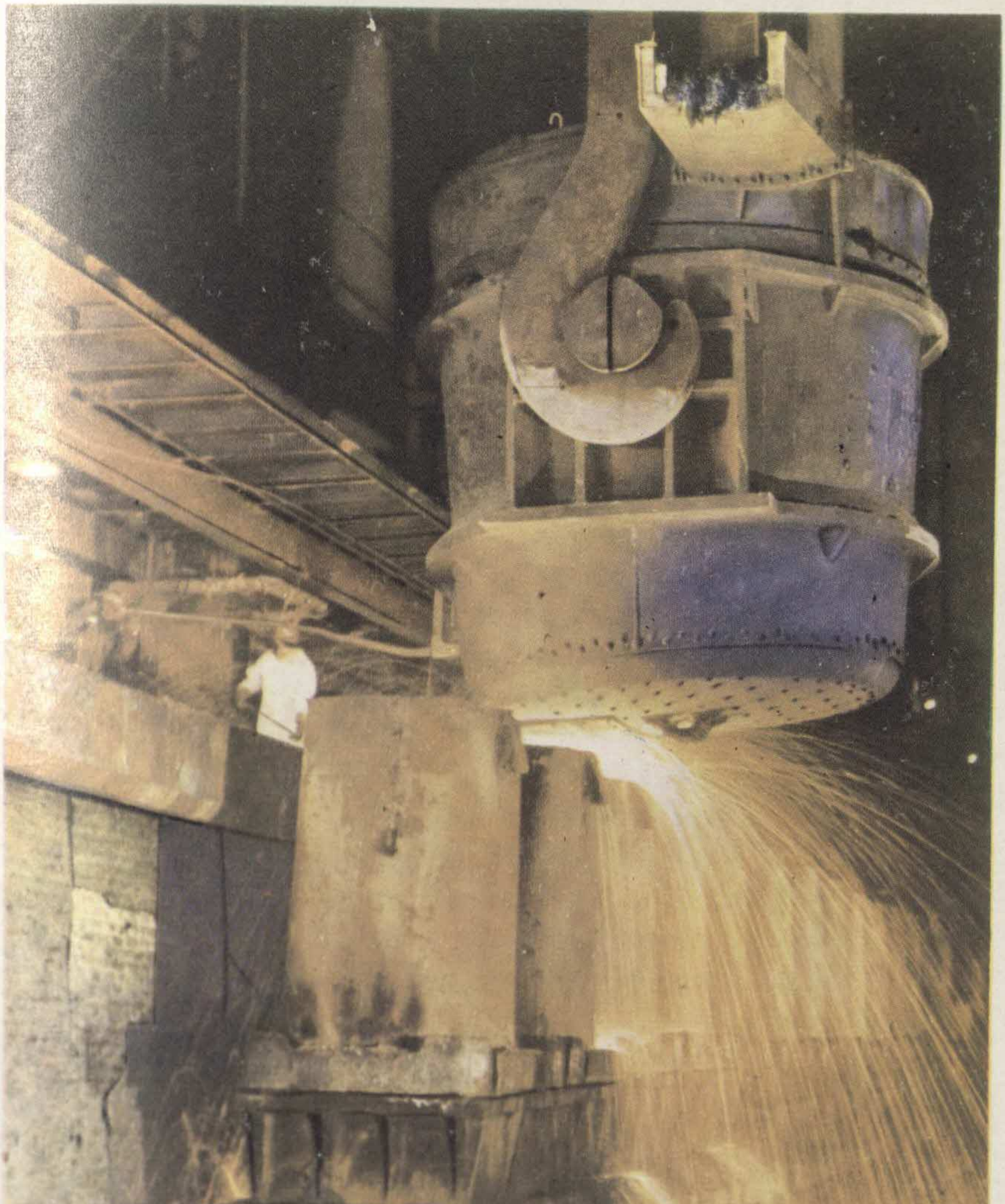
১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ওমানের সুলতান মস্কট ও ওমানের সুলতান নামে খ্যাত ছিলেন। ওমান তৈল সম্পদে পৃথিবীর যোড়শ স্থানাধিকারী দেশ। সিন্ধু ও কচ্ছের বহু খোজা সম্প্রদায়ের মুসলমান ও পশ্চিম ভারতের বহু হিন্দু বণি ওমানের স্থায়ী বাসিন্দা। ওমানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টন খেজুর উৎপন্ন হয়। তার বেশির ভাগ ভারতে আসে।

ওমানের আয়তন ৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৮,২০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী মস্কট।

কুওয়েত

পারস্য উপসাগরের উত্তর-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ক্ষুদ্র স্বাধীন রাষ্ট্র। বর্তমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা শেখ সুবা অল-ওয়েল (রাজত্বকাল ১৭৫৬-৭২ খ্রী.)। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত কুওয়েত (Kuwait) ব্রিটিশের রক্ষণাধীন থাকে। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

কুওয়েত তৈলসমৃদ্ধ দেশ। এদেশে অধিবাসীদের কোন প্রকার কর দিতে হয় না। তেল বিক্রয়ের দ্বারা যে বিপুল অর্থ উপার্জিত হয়, তাতেই দেশের সব কাজ চলে যায়।



ব্লাস্ট ফারনেস বা ধাতু গলানোর চুল্লী

লোহার নানা জিনিস আমাদের প্রতিদিনের প্রয়োজন। কড়ি, বরগা, ট্রামের লাইন, রেল লাইন, শাবল, কোদাল, কাস্তে, হাতুড়ি, পাইপ প্রভৃতি অসংখ্য রকম লোহার জিনিস লোকে ব্যবহার করে থাকে। নানারকম প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে প্রথমে লোহা পরিশোধিত করে লৌহখণ্ড তৈরি করা হয়। পরে সেই লৌহখণ্ডকে প্রচণ্ড উত্তাপে গলিয়ে নানা আকারের জিনিস গঠন করা হয়।

লৌহকে দ্রবীভূত করার যন্ত্রকে বলা হয় ব্লাস্ট ফারনেস (blast furnace)। ভারতবর্ষ, জার্মানি, সোভিয়েট রাশিয়া, জাপান ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন প্রভৃতি পৃথিবীর সব উন্নত দেশে অসংখ্য লোহার কারখানা আছে। সেইসব লোহার কারখানায় ছোট বড় বহু ব্লাস্ট ফারনেস বা ধাতু গলানোর চুল্লী আছে।

পূর্বপৃষ্ঠার ছবির ব্লাস্ট ফারনেসটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি লৌহকারখানার অভ্যন্তরে অবস্থিত।

সেখ জবির অল-আহম্মদ অল-জবির অল-সাবা কুওয়েতের ত্রয়োদশ আমীর। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শাসনভার গ্রহণ করেন।

কুওয়েতের আয়তন ২৪,২৮০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১২,৭০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী কুওয়েত।

॥ কাতার ॥

কাতার (Qater) আরব উপদ্বীপের পূর্ব উপকূল থেকে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত প্রসারিত একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এই আমীর শাসিত রাজ্য ১৮৭২ থেকে ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তুরস্কের অধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটেন তুরস্কের হাত থেকে কাতার অধিকার করে। সেই থেকে ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটেনের রক্ষণাধীন থাকে। ঐ বৎসর ১লা সেপ্টেম্বর স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

কাতার তৈলসমৃদ্ধ দেশ। তৈলসম্পদে পৃথিবীতে তার স্থান চতুর্দশ। তৈল দ্বারা উপার্জিত অর্থের জন্যে দেশে নানা উন্নতি সাধিত হচ্ছে।

কাতারের আমীর শেখ খলিফা বিন হামাদ অল-যানি ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে শাসন ক্ষমতা লাভ করেন।

কাতারের আয়তন ১১,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২ লক্ষ (১৯৭৮ খ্রী.); রাজধানী দোহা।

বাহরেন

বাহ্‌রেন (Bahrein) আরব উপদ্বীপ থেকে প্রায় ৩২ কিলোমিটার দূরে পারস্য উপসাগরে অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জ। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের রক্ষণাধীন হয়। ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

বাহ্‌রেন তৈলসমৃদ্ধ রাষ্ট্র। তৈলশোধন সামর্থ্যে পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানাধিকারী।

১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অল-খলিফা বংশ শাসন-কার্য চালায়। বর্তমান আমীর শেখ ইসা বিন সুলেমান অল-খলিফা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা নভেম্বর রাষ্ট্রের শাসনভার গ্রহণ করেন।

বাহ্‌রেনের আয়তন ৩৭০ বর্গ কিলোমিটার: লোকসংখ্যা ৩,৫০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী মানামা।

জর্ডন

জর্ডন দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একটি স্বাধীন আরব রাষ্ট্র। এর চারিদিকে ইরাক, সৌদি আরব, সিরিয়া, ইজরায়েল অবস্থিত।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জর্ডন ছিল অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলার সময়ে জর্ডন ব্রিটেনের রক্ষণাধীন হয়। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে আবদুল্লা ইবন অল হুসেন রাজা হন।

১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জর্ডন পূর্ণ স্বাধীন হয়। দেশের বিশৃঙ্খলার জন্যে রাজা হুসেন ব্রিটেনের সাহায্য চাইলে জর্ডনে ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন থাকে।

জর্ডন নদীর পশ্চিম পারে জেরুজালেম অবস্থিত। বর্তমানে জেরুজালেম ইজরায়েলের অধিকারভুক্ত এলাকা ও রাজধানী।

বর্তমান রাজা হুসেন নিয়মতান্ত্রিক রাজা হলেও দেশের বহু ব্যাপারে আত্মনিয়োগ করেন।

জর্ডন নদীর পশ্চিম তীরের জর্ডন রাষ্ট্রের আয়তন ৯১,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১৯,৫১,৯৬৮; রাজধানী আম্মান। [জর্ডন নদীর পূর্ব তীরের জর্ডন রাষ্ট্রের অংশ ইজরায়েলের অধিকারভুক্ত থাকায় সে হিসাব ধরা হয় নি।]

প্যালেস্টাইন

প্যালেস্টাইনের সভ্যতা সুপ্রাচীন।

প্যালেস্টাইন দেশ ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানদের পক্ষে অতি পবিত্র স্থান।

॥ মোজেস বা মুসা ॥

খ্রীষ্টপূর্ব ষোড়শ শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে মোজেস বা মুসার নেতৃত্বে ইহুদী জাতি দক্ষিণ প্যালেস্টাইনের অন্তর্গত কানান অধিকার করে। খ্রীষ্টপূর্ব দশম শতাব্দীতে রাজা সল প্যালেস্টাইনে শাসনকার্য চালান। তাঁর উত্তরাধিকারী ডেভিড অতিশয় দক্ষ রাজা ছিলেন। তাঁর পুত্র সলোমনের রাজত্বকালে জেরুজালেমে খুবই উন্নতি সাধিত হয়।

৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোমানগণ জেরুজালেম দখল করে ইহুদীদের বিতাড়িত করে।

॥ যীশু খ্রীষ্ট ॥

যীশু খ্রীষ্ট (৪ খ্রী. পূর্বাব্দ—৩০ বা ৩৩ খ্রী.) প্যালেস্টাইনের নাজারেথে থাকতেন। তাঁর উপদেশবাণী নাজারেথের লোকদের ভাল লাগে না। তারা যীশুকে নাজারেথ ছেড়ে যেতে বলে। যীশু প্যালেস্টাইনের নানা জায়গায় ঘুরে জেরুজালেমে যান। সেখানে রাজা হেরডের মন্দিরে অসংখ্য পশুবলি হতে দেখে খুব ব্যথিত হন। তিনি বলতে থাকেন, ওইভাবে পশুবলি করা মহা অপরাধ। এ কথা শুনে মন্দিরের পুরোহিতরা ক্রুদ্ধ হন। জুডাস ইসকেরিয়ট নামে যীশুর এক বিশ্বাসঘাতক শিষ্য যীশুকে ধরিয়ে দিল। জেরুজালেমের রোমান গভর্নর পন্টিয়াস পাইলেটের বিচারে যীশুকে ক্রুশে বিদ্ধ করে হত্যা করার আদেশ দেওয়া হল।

॥ ধর্মযুদ্ধ ॥

রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্যালেস্টাইন সেলজুক তুর্কীদের হস্তগত হয়। তাদের সময়েই প্যালেস্টাইনের তীর্থস্থানগুলি অধিকারের জন্যে খ্রীষ্টানদের ক্রুসেডের অর্থাৎ ধর্মযুদ্ধের শুরু হয়।

প্যালেস্টাইন কিছুকাল সেলজুক তুর্কী ও মিশরের মামলুকদের অধীনে থাকবার পর অটোমান তুর্কীদের দ্বারা অধিকৃত হয়।

॥ দ্বিধাবিভক্ত প্যালেস্টাইন ॥

প্যালেস্টাইন বর্তমানে দ্বিধা-বিভক্ত। বেশী অংশ নিয়ে ইজরায়েল গঠিত। প্যালেস্টাইনের জেরুজালেম ইজরায়েলের রাজধানী।

নেপাল

ভারতের বাইরে নেপাল একমাত্র হিন্দু রাজ্য। এর উত্তরে তিব্বত, পূর্বে সিকিম ও পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণে ও পশ্চিমে বিহার ও উত্তরপ্রদেশ। এভারেস্ট গিরিশৃঙ্গ নেপালে অবস্থিত।

॥ নেপালে রানা বংশের শাসন ॥

১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত নেপাল রানা বংশের লোকদের দ্বারা শাসিত হয়। শেষ রানা প্রধানমন্ত্রী ছিলেন মহারাজা মোহন শামশের জং বাহাদুর। তিনি ১৯৫১ খ্রীষ্টাব্দে পদত্যাগ করেন। মহারাজাধিরাজ ত্রিভুবন বীর বিক্রম (১৯০৬-১৯৫৫ খ্রী.) রানাবংশীয় প্রধান-মন্ত্রীর শাসনব্যবস্থা বাতিল করেন। তিনি সংসদীয় শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ দেব সিংহাসনে আরোহণ করেন।

॥ বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ দেব ॥

মহেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ দেবের পর তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র বীর বিক্রম শাহ্ দেব ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি রাজা হন।

॥ গোর্খা ॥

নেপালের অধিবাসীরা গোর্খা নামে খ্যাত। গোর্খারা বীর, সাহসী ও কষ্টসহিষ্ণু।

নেপালের আয়তন ১,৪১,০০০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ১,৩৪,২০,০০০ (১৯৭৮) ; রাজধানী কাঠমাণ্ডু।

ব্রহ্মদেশ

ব্রহ্মদেশ বা বর্মা (Burma) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি দেশ। এর পূর্বে চীন, লাওস ও থাইল্যাণ্ড, পশ্চিমে ভারত মহাসাগর, বাংলাদেশ ও ভারত।

॥ ইংরেজদের ব্রহ্মদেশ অধিকার ॥

প্রাচীনকালে ব্রহ্মদেশ দুটি ভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এক শক্তিশালী রাজবংশ ব্রহ্মের সিংহাসনে বসে। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে ব্রহ্মদেশ ইংরেজের প্রভাবাধীন থাকে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের বিরোধ বাধে। তিনবার যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মদেশ পরাজিত হয়। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ব্রহ্মের রাজা থিবোকে সিংহাসনচ্যুত ক'রে ব্রহ্মদেশকে ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে।

॥ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্রহ্মদেশ ॥

১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা ব্রহ্মকে পৃথক্ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ব্রহ্মদেশ জাপানের কবলিত হয়। যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জানুয়ারি ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ-কবলমুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র।

১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের নির্বাচনে উ নু জয়ী হন। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল নে উইন উ নু-র সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করে। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে দেশে সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। ব্রহ্মদেশ একদলীয় সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। উ নে উইন প্রেসিডেন্ট হন।

ব্রহ্মদেশের আয়তন ৬,৭৮,০০০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৩,৩০,০০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী রেঙ্গুন।

থাইল্যাণ্ড

থাইল্যাণ্ডের পূর্ব নাম শ্যাম দেশ। এর পশ্চিমে ব্রহ্মদেশ ও ভারত মহাসাগর, পূর্বে থাইল্যাণ্ড উপসাগর, কাম্পুচিয়া এবং পূর্বে ও উত্তরে লাওস। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন শ্যামদেশ সরকারী ভাবে থাইল্যাণ্ড বা তাইল্যাণ্ড নামে আখ্যাত হয়।

॥ চিরস্বাধীন থাইল্যাণ্ড ॥

থাইল্যাণ্ড কখনও পরাধীন হয় নি। ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা প্রজাধীপক শাসনতন্ত্রের সংশোধন-পত্রে স্বাক্ষর করেন। কিন্তু তাঁকে শেষ পর্যন্ত সিংহাসন ত্যাগ করতে হয়। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আনন্দ মহীদল সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে ভূমিবল আতুলইয়াদেজ (Bhumibol Adulyadej) রাজা হন।

॥ সামরিক শাসনের অবসান ॥

দেশে যে সামরিক শাসন চলছিল, ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তার অবসান ঘটে। ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় সামরিক শাসন প্রবর্তিত হয়। ১৯৭৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশে সেই সামরিক শাসনের অবসান ঘটে। রাজা রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী মুখ্য প্রশাসক।

থাইল্যাণ্ডের আয়তন ৫,১৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৪,৫০,০০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী ব্যাংকক।

ভিয়েতনাম

ভিয়েতনাম দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনাম ফ্রান্সের উপনিবেশ হয়। ১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাপানের অধিকারে থাকে। দেশে প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে ১৭ অক্ষরেখা বরাবর দেশকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়। একভাগ হয় উত্তর ভিয়েতনাম বা ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম, অপর ভাগ হয় দক্ষিণ ভিয়েতনাম বা রিপাবলিক অব ভিয়েতনাম।

॥ উত্তর ভিয়েতনাম ॥

উত্তর ভিয়েতনামে ডঃ হো চি-মিন (Dr. Ho



হো চি-মিন

Chi-minh, ১৮৯২-১৯৬৯ খ্রী.) কম্যুনিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণ ভিয়েতনামে ছিল রাজতন্ত্র। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে এক গণভোটের সিদ্ধান্তানুযায়ী রাজা বাও দাই অপসারিত হন। দক্ষিণ ভিয়েতনাম সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। নো দিন দিয়েম হন প্রেসিডেন্ট।

॥ উত্তর ভিয়েতনামের সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধ ॥

কম্যুনিস্ট গেরিলাদের প্রতিরোধ করার জন্যে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য চায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য পাঠায়। প্রবল যুদ্ধ বাধে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামের সংগ্রামীদের দমন করতে পারে না। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ বন্ধ করে সৈন্য সরিয়ে নিয়ে যায়। তারপর উত্তর ভিয়েতনাম দক্ষিণ ভিয়েতনামকে যুদ্ধে পরাজিত করে সারা ভিয়েতনামকে এক করে ও কম্যুনিস্ট শাসন প্রবর্তন করে।

সংযুক্ত ভিয়েতনামের আয়তন ৩,২৯,৫৬৬ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৫,৪০,০০,০০০ (১৯৮১); রাজধানী হানয়।

কাম্পুচিয়া

পূর্বে যে দেশের নাম ছিল কাম্বোডিয়া, তারই বর্তমান নাম কাম্পুচিয়া। এর উত্তরে লাওস ও থাইল্যাণ্ড, পশ্চিমে থাইল্যাণ্ড, পূর্বে ভিয়েতনাম এবং দক্ষিণে থাইল্যাণ্ড উপসাগর।

॥ আঙ্করভাট ॥

কাম্বোডিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভারতীয় সভ্যতা-পরিপুষ্ট প্রাচীন সুসভ্য দেশ। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ফউ-নান (Fou-Nan) এখানে যে রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন, থাইল্যাণ্ড, মালয়, কোচিন চীন ও লাওসের কিছু কিছু অংশ তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবম থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে বিস্ময়কর বিষ্ণুমন্দির আঙ্করভাট নির্মিত হয়।

॥ খ্মেরু সাধারণতন্ত্র ॥

১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বোডিয়া ফ্রান্সের রক্ষণাধীন রাজ্য হয়। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে রাষ্ট্রপ্রধান প্রিন্স নরোদম সিহানুক গদিচ্যুত

হন। ঐ বৎসর কাম্বোডিয়ার নাম হয় খ্মের সাধারণতন্ত্র।

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভিয়েতনামীদের দ্বারা নম পেন অধিকৃত হয়। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে কাম্বোডিয়ার নাম হয় কাম্পুচিয়া।

কাম্পুচিয়ার আয়তন ১,৮০,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৭,৭৫,০০,০০০ (১৯৭৬); রাজধানী নম পেন (Phnom Penh)।

লাওস

লাওস (Laos) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি ভূমিবদ্ধ দেশ। এর উত্তরে চীন, পূর্বে ভিয়েতনাম, দক্ষিণে কাম্পুচিয়া এবং পশ্চিমে থাইল্যাণ্ড ও ব্রহ্মদেশ।

লাওস ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের আশ্রিত রাজ্য হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে কিছু দিনের জন্যে লাওস জাপানের অধিকারভুক্ত হয়। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই লাওস স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজকীয় বাহিনীর সঙ্গে প্যাথেট লাও-এর যুদ্ধ চলে। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের যুদ্ধে কম্যুনিস্টরা বিরাট সাফল্য লাভ করলে প্যাথেট লাও বাহিনী সমগ্র লাওস দখল করে নেয়। রাজা সাভাং বাথানা সিংহাসন ত্যাগ করেন। পিপ্‌ল্‌স্ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব লাওস প্রতিষ্ঠিত হয়।

লাওসের আয়তন ২,৩৬,৮০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩৫ লক্ষ (১৯৭৯), রাজধানী ভিয়েঁতিয়েঁ (Vientiane)।

ইন্দোচীন এবং চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ফরাসী অধিকৃত সম্মিলিত ভিয়েতনাম, কাম্বোডিয়া ও লাওসের নাম ছিল ইন্দোচীন (Indo-China)।

ইন্দোচীনের অস্তিত্ব এখন আর নেই। তিনটি দেশই পৃথক্ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে।

॥ চম্পা রাজ্য ॥

যে স্থানে ইন্দোচীন প্রতিষ্ঠিত ছিল সেইস্থানে শক্তিশালী চম্পা ও কম্বোজ রাজ্য অবস্থিত ছিল। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৪৭১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চম্পা রাজ্য হিন্দু ঔপনিবেশিকদের দ্বারা শাসিত হয়। জয়পরমেশ্বর বর্মদেব ঈশ্বরমূর্তি, রুদ্রবর্মন, মহারাজাধিরাজ শ্রীজয়ইন্দ্রবর্মন ও জয়সিংহবর্মন চম্পার বিভিন্ন সময়ের উল্লেখযোগ্য নরপতি।

চম্পার নিকটবর্তী কৌঠা সম্ভবতঃ প্রথম হিন্দু উপনিবেশ। প্রাচীন কৌঠার রাজধানী পো-



পো-নগরের মন্দির

নগরে অনেক প্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গেছে। এখানকার মন্দির অপূর্ব কারুকার্যময়।

॥ কম্বোজ রাজ্য ॥

কম্বোজ রাজ্য বর্তমান কাম্বোডিয়া বা কাম্পুচিয়ার দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। কম্বোজ রাজ্য চম্পা রাজ্যের চেয়ে বেশী শক্তিশালী ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিভিন্ন বিদেশী শক্তির আক্রমণে কম্বোজ রাজ্যের পতন ঘটে। এই কম্বোজেই পৃথিবী-প্রসিদ্ধ আঙ্করভাটের মন্দির, আঙ্করথোমের মন্দির-সমূহ নির্মিত হয়। রাজা দ্বিতীয় সূর্যবর্মনের রাজত্বকালে সম্ভবতঃ ১১১২ থেকে ১১৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আঙ্করভাট নির্মিত হয়।

মালয়েশিয়া

১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর মালয় যুক্তরাষ্ট্র, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্নিও (পরে নাম হয় সাবা) ও সারাওয়াক একত্রে মালয়েশিয়া নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সিঙ্গাপুর মালয়েশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

এর আয়তন ৩,৩৩,২১৫ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৩৩,০০,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী কুয়ালা লামপুর।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া পূর্বে নেদারল্যাণ্ডস ঈস্ট ইণ্ডিজ বা ডাচ ঈস্ট ইণ্ডিজ নামে খ্যাত ছিল। পোর্তুগিজ, ইংরেজ ও ওলন্দাজরা বিভিন্ন সময়ে এখানকার দ্বীপ-সমূহে উপনিবেশ স্থাপন করে। শেষ পর্যন্ত হল্যাণ্ড ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপগুলিতে আধিপত্য লাভ করে। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড (নেদারল্যাণ্ডস) সরাসরি দ্বীপগুলির শাসনভার গ্রহণ করে।

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান ইন্দোনেশিয়া অধিকার করে। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ডঃ সুকর্ণ ও ডঃ হাতার নেতৃত্বে গঠিত সরকার ওলন্দাজ আধিপত্য অস্বীকার করে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। তখন



ডঃ সুকর্ণ

থেকে নাম হয় ইন্দোনেশিয়া। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হল্যাণ্ড ইন্দোনেশিয়াকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে



ডঃ সুহার্তো

নেয়। ইন্দোনেশিয়া জাভা বা যবদ্বীপ (রাজধানী যোগ্যাকর্তা বা জাকার্তা এখানে অবস্থিত), সেলিবিস, পশ্চিম ইরিয়ান (পশ্চিম নিউ গিনি), মাত্বরা, মলাক্কাস, বালি বা বলী দ্বীপ এবং আরও কয়েক হাজার দ্বীপের সমষ্টি।

কম্যুনিস্টদের দ্বারা ইন্দোনেশিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হলে ডঃ সুকর্ণকে অপসারিত করে কর্নেল ডঃ সুহার্তো শাসনকর্তৃত্ব হাতে নেন। প্রায় আশি হাজার কম্যুনিস্ট নিহত হয়। ইন্দোনেশিয়ায় কম্যুনিস্ট বাহিনী বেআইনী ঘোষিত হয়।

॥ ইন্দোনেশিয়ার হিন্দু অধিবাসী ॥

ইন্দোনেশিয়ায় প্রায় ৬০ লক্ষ হিন্দুর বাস। ইন্দোনেশিয়ায় রামায়ণ খুবই জনপ্রিয়।

ইন্দোনেশিয়ার আয়তন ১৯,০৩,৬৫০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১৪,৮৫,০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী জাকার্তা বা যোগ্যাকর্তা।

কোরিয়া

সিলা (Silla) রাজবংশের অধীনে ৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া অখণ্ড রাজ্য ছিল। চীনারা কোরিয়ার উপর বহু শতাব্দী ধরে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়াকে চীন স্বাধীন রাষ্ট্র বলে মেনে নেয়।

॥ দ্বিধাবিভক্ত কোরিয়া ॥

রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে কোরিয়ার উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যুদ্ধ শুরু হয় (রুশ-জাপান যুদ্ধ)। রাশিয়া পরাজিত হয়। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া জাপানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হলে উত্তর দিক্ থেকে সোভিয়েট সৈন্য কোরিয়ার উত্তরাংশ দখল করে। দক্ষিণ দিক্ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণাংশ অধিকার করে। ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর কোরিয়া দ্বিখণ্ডিত হয়। দু'টি রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়—উত্তর কোরিয়া অর্থাৎ পিপ্‌ল্‌স্ ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া অর্থাৎ রিপাবলিক অব কোরিয়া।

॥ উত্তর কোরিয়া ॥

উত্তর কোরিয়ার কিম ইল সুং (Kim Il Sung) রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট, সৈন্যবাহিনীর সর্বাধিনায়ক, কোরিয়া ওয়ার্কার্স পার্টির জেনারেল সেক্রেটারি। উত্তর কোরিয়া কম্যুনিস্ট-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র।

এর আয়তন ১,২২,৩৭০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৬০,০০,০০০ (১৯৭৫); রাজধানী পিয়ংইয়াং (Pyongyang)।

॥ দক্ষিণ কোরিয়া ॥

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন ডঃ সিংমান রী (Dr. Syngman Rhee)। ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে জেনারেল চুন দূ-হোয়ান (Chun Doo-Hwan) প্রেসিডেন্ট হন।

এর আয়তন ৯৮,৪৪৭ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩,৭০,১৯,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী সিউল (Seoul)।

জাপান

জাপান এশিয়া মহাদেশের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত শক্তিশালী অত্যুন্নত রাজতন্ত্রী দেশ। খ্রীষ্টজন্মের বহু শত বৎসর আগে জাপানে বিভিন্ন সময়ে বহু রাজবংশ রাজত্ব করে। ২০০ খ্রীষ্টাব্দে জাপান সম্মিলিত রাজ্য হিসাবে পরিগণিত হয়। ১১৮৬ থেকে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শোগুন রাজবংশ



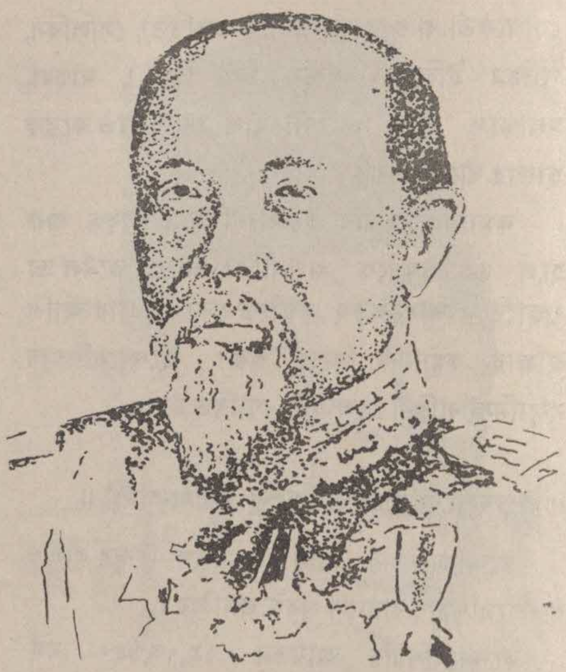
নবীন জাপানের প্রথম সম্রাট্ মুৎসিহিতো

রাজত্ব করে। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট্ মুৎসিহিতো (১৮৬৭-১৯১২ খ্রী.) রাজা হন। সঙ্গে সঙ্গে মেইজি অর্থাৎ নবযুগের সূচনা হয়। তিনি যে শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করেন, তা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

॥ কমোডোর পেরি ॥

১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কমোডোর ম্যাথু সি. পেরি জাপানের উপকূলে অবতরণ করেন। সেই থেকে বিভিন্ন ইউরোপীয় জাতি জাপানে ব্যবসায়ের জন্যে উপস্থিত হয়।

এই সময়ে প্রিন্স হিরোবুমি ইতো, ওকুমা ও ওকাকুরা প্রভৃতি প্রতিভাবান্ নেতারা জাপানের উন্নতি সাধন করেন। প্রিন্স ইতো দেশের শাসন-সংস্কারের প্রথম খসড়া তৈরি করেন।



প্রিন্স হিরোবুমি ইতো

॥ চীন-জাপানের যুদ্ধ ॥

কোরিয়ার উপর আধিপত্য নিয়ে জাপানের সঙ্গে চীনের ১৮৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধ হয়। চীন পরাজিত হয়। জাপান ফরমোজা (তাইওয়ান) দ্বীপে আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯০৪-৫ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চুরিয়ার উপর অধিকারের প্রশ্ন নিয়ে জাপানের সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ হয়। রাশিয়া পরাজিত হয়। এর ফলে পোর্ট আর্থার দ্বীপ জাপানের অধিকারভুক্ত হয়।

॥ মাঞ্চুরিয়া ॥

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে জাপান মাঞ্চুরিয়া দখল করে। তখন থেকে মাঞ্চুরিয়ার নাম হয় মাঞ্চুকুয়ো।

॥ পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান অতর্কিতে পার্ল হারবারে মোতায়েন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বহু যুদ্ধ-জাহাজের উপর বোমা ফেলে সেগুলি ধ্বংস করে। জাপান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগদান করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানের হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে দুটি পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে বহু সহস্র নিরীহ নাগরিকের প্রাণনাশ করে। তখন ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর জাপান বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে।

যুদ্ধসমাপ্তির পর প্রধানমন্ত্রী তোজো ও তাঁর সহকর্মীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।



জাপানের যুদ্ধকালীন প্রধানমন্ত্রী তোজো

১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে জাপান পুনরায় সর্বপ্রকার নিয়ন্ত্রণহীন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। জাপান দ্রুত বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী দেশ হয়ে উঠেছে।

॥ হিরোহিতো ॥

জাপানের রাজা হিরোহিতো তাঁর পিতা যোশিহিতোর পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

জাপানের আয়তন ৩,৬৯,৬৬২ বর্গ কিলো-মিটার; লোকসংখ্যা ১১,৬০,১০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী টোকিও।

ফিলিপিন্‌জ্‌

ফিলিপিন্‌জ্‌ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র। প্রায় ৭,১০০ দ্বীপ নিয়ে রাষ্ট্রটি গঠিত। ম্যাজেলান বা ম্যাগেলান ১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বীপটি আবিষ্কার করেন। স্পেনের যুবরাজ ফিলিপের নামে ফিলিপিন্‌জ্‌ নাম হয়।

১৫৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই দেশ স্পেনের অধিকারে থাকে।

১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এদেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিকারে যায়। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ফিলিপিন্‌জ্‌কে স্বাধীনতা দেয়।

॥ ম্যাগসাইসাই পুরস্কার ॥

ফিলিপিনজের প্রেসিডেণ্ট র‍্যামন (Ramon Magsaysay) যে পুরস্কার প্রবর্তন করেন তার নাম ম্যাগসাইসাই পুরস্কার। মার্কস (Marcos) ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রেসিডেণ্ট হন।

ফিলিপিন্‌জের আয়তন প্রায় ৩ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৪,৭৯,১০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী ম্যানিলা।

অস্ট্রেলিয়া

পৃথিবীর সব চেয়ে বড় দ্বীপ। এই মহাদেশ-তুল্য দ্বীপ ইংরেজ নাবিক ক্যাপ্টেন জেম্‌স্‌ কুক (Captain James Cook, ১৭২৮–৭৯ খ্রী.) ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করেন। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে

এখানে ইংরেজদের উপনিবেশ গড়ে ওঠে। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে কমনওয়েল্থ্ অব অস্ট্রেলিয়া গঠিত হয়।

অস্ট্রেলিয়ায় ব্রিটেনের রাজা বা রানীর দ্বারা প্রেরিত প্রতিনিধি গভর্নর জেনারেল নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। ব্রিটেনের রাজা বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান।

অস্ট্রেলিয়ার আয়তন ৭৬,৮২,৩০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৪২,০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী ক্যানবেরা।

নিউ জীল্যাণ্ড

অস্ট্রেলিয়া থেকে ১২০০ মাইল দূরে নিউ জীল্যাণ্ড প্রশান্ত মহাসাগরের এক দ্বীপরাষ্ট্র। ওলন্দাজ নাবিক টাসমান (Abel Janszoon Tasman, ১৬০৩-১৬৫৯ খ্রী.) ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জীল্যাণ্ড আবিষ্কার করেন।

॥ নিউ জীল্যাণ্ডে ব্রিটেনের উপনিবেশ স্থাপন ॥

ক্যাপ্টেন কুক ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জীল্যাণ্ডে অবতরণ করেন। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিউ জীল্যাণ্ড ব্রিটেনের উপনিবেশ হয়।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশ ব্রিটিশ কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে ডোমিনিয়ন মর্যাদাসম্পন্ন দেশ হয়।

নিউ জীল্যাণ্ডের মাওর জাতি বীর, সাহসী ও অপেক্ষাকৃত সভ্য।

নিউ জীল্যাণ্ডে ব্রিটেনের রাজা বা রানীর প্রতিনিধিরূপে গভর্নর জেনারেল দেশ শাসন করেন। ব্রিটেনের রাজা বা রানী রাষ্ট্রপ্রধান।

নিউ জীল্যাণ্ডের আয়তন ২,৬৮,৬৭৬ বর্গ-কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩১ লক্ষ (১৯৮০); রাজধানী ওয়েলিংটন।

আফগানিস্তান

ইরান, পাকিস্তান ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যস্থলে অবস্থিত আফগানিস্তান একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। প্রাচীন আফগানিস্তান ভারতেরই অংশ ছিল। এখানে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করতেন। এখনও আফগানিস্তানে বহু শিবের মন্দির দেখা যায়। হিন্দু রাজাদের পরে বৌদ্ধ রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বহু বৌদ্ধ মূর্তি আফগানিস্তানে দৃষ্ট হয়।

আফগানিস্তানের গজনী রাজ্যের সুলতান মামুদ ১৭ বার উত্তর ও পশ্চিম ভারত আক্রমণ করেন। ঘুর রাজ্যের মুহম্মদ ঘুরী বা ঘোরী ১১৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ভারত জয় করেন।

॥ আফগানিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ॥

১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদ শা দুরানি আফগানিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ করে রাজা হন। আমানুল্লা খাঁ আফগানিস্তানকে উন্নত করবার জন্যে বহু সংস্কার করার প্রয়াস করেন। তার ফলে দেশে তীব্র অসন্তোষ দেখা দেয়। তিনি সিংহাসন ত্যাগ করে বিদেশে চলে যান। পরে বাচ্চা-ই-সাকো কিছু দিন রাজত্ব করেন। তিনিও বিতাড়িত হন। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে রাজা জাহির শাহ্ রাজা হন। ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে জাহির শাহ্ সিংহাসনচ্যুত হন। মহম্মদ দাউদ রাজা হন। ১৯৭৮ সালের সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি গদিচ্যুত ও নিহত হন।

॥ আফগানিস্তানে সোভিয়েট বাহিনী ॥

১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েট সৈন্যবাহিনী আফগানিস্তানে প্রবেশ করে। প্রেসিডেণ্ট নূর মহম্মদ তারাকি গদিচ্যুত হন। সিংহাসনে বসেন হাফিজুল্লা আমিন। সোভিয়েট সৈন্য দ্বারা তিনি গদিচ্যুত হন।

১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানে ৯৫,০০০ সোভিয়েট সৈন্য মোতায়েন থাকে বলে জানা যায়। এখনও সোভিয়েট সৈন্য আফগানিস্তান ত্যাগ করে যায় নি (১৯৮৪)।

বারবাক কারমাল আফগানিস্তানের প্রেসিডেন্ট (১৯৮৩)।

আফগানিস্তানের আয়তন ৬,৩৬,২৬৬ বর্গ-কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ১,৭০,৫০,০০০ (১৯৭৬) ; রাজধানী কাবুল।

মঙ্গোলিয়া

চীনের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত স্বাধীন (কম্যুনিস্ট প্রভাবাধীন) রাষ্ট্র। এর উত্তরে রাশিয়া, পূর্বে, দক্ষিণে ও পশ্চিমে চীন।

মঙ্গোলিয়ার দুর্ধর্ষ সম্রাট্ চেঙ্গিজ খাঁ সমগ্র চীন ও মধ্য এশিয়া জয় করেন। কুবলাই খাঁ সমগ্র চীনব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।

মঙ্গোলিয়া ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে নভেম্বর মঙ্গোলিয়ান পিপ্‌ল্‌স্ রিপাবলিক নামে খ্যাত হয়।

মঙ্গোলিয়ার আয়তন ১৫,৬৫,০০০ বর্গ কিলো-মিটার ; লোকসংখ্যা ১৬,৪০,০০০ (১৯৮০) ; রাজধানী উলান বাতোর (Ulan Bator)।

শ্রীলঙ্কা

ভারতের দক্ষিণে ভারত মহাসাগরে অবস্থিত দ্বীপরাষ্ট্র। পূর্বে নাম ছিল সিংহল বা সিলোন (Ceylon)। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হলে শ্রীলঙ্কা নামে অভিহিত হয়।

রামায়ণের যুগে রাবণের এখানেই বাস ছিল। বৈদিক যুগ থেকে সিংহল ভারতেরই অংশ। ৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত থেকে বহু লোক সিংহলে গিয়ে বাস করতে থাকে, তারাই সিংহলীদের পূর্বপুরুষ।

॥ রাজকুমার বিজয়ের লঙ্কাজয় ॥

খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ভারত থেকে বিজয় নামে এক ভারতীয় রাজকুমার সিংহলে গিয়ে রাজত্ব করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্যন্ত সিংহলে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত থাকে।

শ্রীলঙ্কার দুই-তৃতীয়াংশ লোক সিংহলী, তারা বৌদ্ধ। উত্তরাংশে বাস করে তামিলরা, তারা হিন্দু। তারা শ্রীলঙ্কার অধিবাসীদের এক-তৃতীয়াংশ।

১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা সিংহলকে অধিকার করে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির শাসনের অন্তর্ভুক্ত করে। মূলতঃ ভারতের অংশ হলেও ইংরেজরা সিংহলকে স্বাধীনতা দেবার ১০ বছর আগে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করে।

॥ সিংহলী ও তামিলদের মধ্যে বিরোধ ॥

সিংহলী ও তামিলদের মধ্যে শ্রীলঙ্কায় বিরোধ ঘনীভূত হয়ে ওঠে। সিংহলী সৈন্য, পুলিশ ও জনসাধারণের দ্বারা বহু তামিল নিহত হয়।

১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সলোমন ডব্লিউ. আর. ডি বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি নিহত হলে বিজয়ানন্দ দহনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। পরে প্রধান-মন্ত্রী হন ডি. সেনানায়েক। পরে বন্দরনায়েকের বিধবা পত্নী সিরিমাভো বন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে আর. প্রেমদাস প্রধানমন্ত্রী হন ও প্রেসিডেন্ট হন জে. আর. জয়বর্ধন।

তামিলনাডুর দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের পর ভারত মহাসাগর। আদাম'স ব্রিজ বা সেতুবন্ধ শ্রীলঙ্কা ও ভারতের মধ্যে অবস্থিত। শ্রীলঙ্কার আয়তন ৬৫,৬১০ বর্গ-কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ১,৪৪,৭০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী কলম্বো।

মেক্সিকো

মেক্সিকো উত্তর আমেরিকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণে অবস্থিত এক সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রী স্বাধীন রাষ্ট্র। এর উত্তরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর, দক্ষিণে গোয়াটেমালা ও বেলিজ এবং পূর্বে মেক্সিকো উপসাগর। এখানকার উন্নত মায়াসভ্যতা সুপ্রাচীন। অ্যাজটেকরা এখানে এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। স্পেনীয় জেনারেল হার্মাণ্ডো কোর্টিস ১৫১৯-১৫২১ খ্রীষ্টাব্দে বলপূর্বক অ্যাজটেক সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন। অ্যাজটেকরা ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে যে শহর গড়ে তোলে তারই নাম মেক্সিকো।

॥ স্পেনীয় শাসন থেকে মেক্সিকোর মুক্তিলাভ ॥

মিগুয়েল কস্টিলা, প্যাভন, ইতুরবাইড প্রভৃতি জননেতার চেষ্টায় অত্যাচারী স্পেনীয় শাসন থেকে ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকো মুক্তিলাভ করে। ইতুরবাইড নিজেকে সম্রাট বলে ঘোষণা করেন। কিন্তু তিনি অপসারিত ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

ফ্রান্সের সহায়তায় অস্ট্রিয়ান আর্চডিউক প্রথম ম্যাক্সমিলিয়ান ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোর সিংহাসনে বসেন। মেক্সিকোর বিদ্রোহী দেশপ্রেমিকরা ম্যাক্সমিলিয়ানকে পরাজিত করে ও তাঁকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে মেক্সিকোয় নূতন শাসনতন্ত্রের প্রবর্তন হয়।

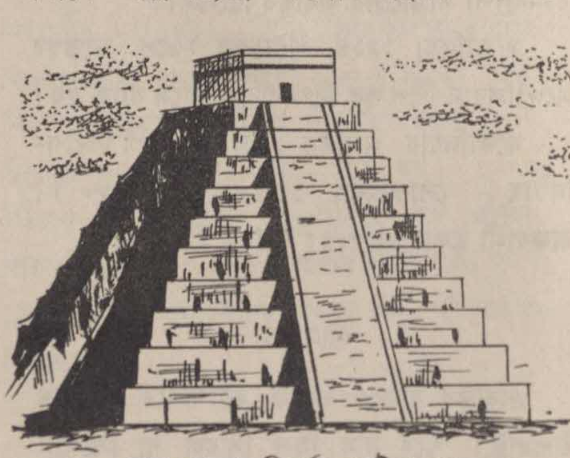
১৯২০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে মেক্সিকোয় বহু প্রেসিডেন্ট হন। জোসে লোপেজ পোর্টিলো ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে ৬ বৎসরের জন্য প্রেসিডেন্ট হন।

পূর্বে মেক্সিকো অনেক বড় ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টেক্সাস, আরিজোনা, উটা, নেভাডা, কলোরাডো, ওয়াইওমিং ও নিউ মেক্সিকো রাষ্ট্র মেক্সিকোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেক্সিকোর বর্তমান আয়তন ১৯,৬৭,১৮৩ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৬,৯৪,০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী মেক্সিকো সিটি।

মধ্য আমেরিকা

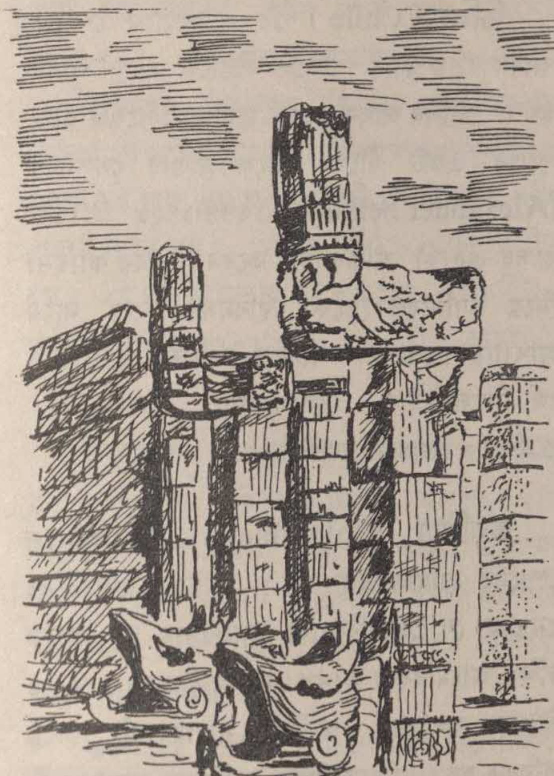
গোয়াটেমালা, হণ্ডুরাস, নিকারাগুয়া, পানামা, এল সালভেডর ও কোস্টা রিকা রাষ্ট্র মধ্য আমেরিকায় অবস্থিত।

গোয়াটেমালা (Guatemala) প্রাচীন মায়া-সভ্যতার কেন্দ্রস্থল। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এখানে মায়া-সভ্যতা বর্তমান ছিল। ১৮২১



মায়া-সভ্যতার নিদর্শন একটি প্রাসাদ

খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গোয়াটেমালা স্পেনের অধীনে থাকে। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ১,০৮,৮৮৯ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৭০,৫০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী গোয়াটেমালা সিটি।



মায়া-সভ্যতার অন্য একটি নিদর্শন

হণ্ডুরাস (Honduras) ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ১,১২,০০৮ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩৬,৯০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী টেগুসিগাল্পা।

নিকারাগুয়া (Nicaragua) ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয়দের দ্বারা আধিকৃত হয়। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। এর আয়তন ১,৩৯,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ (১৯৮০); রাজধানী ম্যানাগুয়া।

পানামা (Panama) পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে প্রায় তিনশ' বৎসর স্পেনের অধীন থাকে। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ৭৭,০৮২ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১৮,৯০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী পানামা সিটি। পানামা খাল অঞ্চল ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে পানামার অধিকারভুক্ত হয়েছে।

এল সালভেডর (El Salvador) ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ২১,৩৯৩ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৪৩,৬০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী সান সালভেডর।

কোস্টা রিকা (Costa Rica) ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধীন হয়। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে কোস্টা রিকা স্বাধীন হয়। এর আয়তন ৫০,৮৯৮ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২১,৯০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী সান জোসে।

দক্ষিণ আমেরিকা

দক্ষিণ আমেরিকায় অনেক দেশ। আর্জেন্টিনা, বলিভিয়া, ব্রাজিল, চিলি, কলম্বিয়া, প্যারাগুয়ে, পেরু, উরুগুয়ে, ভেনেজুয়েলা, ইকোয়েডর দক্ষিণ আমেরিকায় অবস্থিত।

আর্জেন্টিনা (Argentina) ১৫১৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রসিদ্ধ অভিযাত্রী সেবাস্টিয়ান ক্যাবট (Sebastian Cabot, ১৪৭৪-১৫৫৭ খ্রী.) আর্জেন্টিনা নামকরণ করেন। আর্জেন্টিনার আয়তন ২৭,৭৭,৮১৫ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২,৭৮,৬০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী বুয়েনস আইরেস। আর্জেন্টিনা দক্ষিণ আমেরিকার দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।

বলিভিয়া (Bolivia) বহুকাল ইনকা সাম্রাজ্যের অধীন থাকে। ১৫৩৮ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের অধিকারভুক্ত থাকে।



সাইমন বলিভার

সাইমন বলিভার (Simon Boliver, ১৭৮৩-১৮৩০ খ্রী.)-এর নেতৃত্বে সংগ্রাম চালিয়ে দেশটি স্বাধীন হয়। তাঁর নামানুসারে দেশের নাম হয় বলিভিয়া। বলিভিয়ার আয়তন ১০,৯৮,৫৮০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৫১,৫০,০০০(১৯৮০); রাজধানী লা পাজ।

ব্রাজিল বা ব্রেজিল (Brazil) দক্ষিণ আমেরিকার বৃহত্তম দেশ ও স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। পৃথিবীর বৃহত্তম নদী আমাজন ব্রাজিলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগিজ নাবিক পেড্রো আলভারেস ক্যাব্রাল (Pedro Alvares Cavral, ১৪৬০-১৫২৬ খ্রী.) ব্রাজিলে অবতরণ করার পর ব্রাজিল পোর্তুগিজ অধিকারে যায়। পরে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। দুইটি বিশ্বযুদ্ধেই ব্রাজিল মিত্রপক্ষে যোগদান করে। এর আয়তন ৮৫,১১,৯৬৫ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,২৩,০০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী ব্রাসিলিয়া।

চিলি (Chile) ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ স্বাধীন হয়। চিলির অধিকারভুক্ত জুয়ান ফার্নাণ্ডেজ দ্বীপপুঞ্জের একটি দ্বীপে আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক (Alexander Selkerk, ১৬৭৬-১৭২১ খ্রী.) চার বৎসর একাকী অতিবাহিত করেন। তাঁর কাহিনী নিয়ে ড্যানিয়েল ডিফো 'রবিনসন ক্রুসো' নামে আখ্যায়িকা লেখেন। চিলির আয়তন ৭,৪৯,৭৬৭ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,১১,০০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী স্যান্টিয়াগো।

কলম্বিয়া (Columbia) ১৫৩৬ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে যে স্পেনবিরোধী আন্দোলন হয় তাতে দক্ষিণ আমেরিকার অনেক দেশ স্বাধীন হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বিয়া স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নামানুযায়ী দেশটির নাম কলম্বিয়া হয়েছে। এর আয়তন ১১,৩৮,৯১৪ বর্গ .. কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২৬,৪০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী বোগটা। কলম্বিয়ায় লক্ষাধিক হিন্দুর বাস।

প্যারাগুয়ে (Paraguay) ১৫৩৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধিকারভুক্ত হয়। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারাগুয়ে স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা ও উরুগুয়ের সঙ্গে যুদ্ধে (১৮৬৫-৭০ খ্রী.) প্যারাগুয়ের জনসংখ্যা ৬ লক্ষ থেকে হ্রাস পেয়ে ২,৩২,০০০-এ দাঁড়ায়। প্যারাগুয়ের আয়তন ১,৫৭,৮২৭ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩০ লক্ষ (১৯৮০); রাজধানী আসুনসিয়ন।

পেরু (Peru) ফ্রান্সিসকো পিজারো (Franciso Pizaro, ১৪৭৮-১৫৪১ খ্রী.) ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে

পেরু জয় করেন। তখন থেকে পেরু স্পেনের অধীন হয়। স্পেন ইনকা সাম্রাজ্য ধ্বংস করে।

ইনকাদের বিস্ময়কর সভ্যতার বহু নিদর্শন এখনও পেরুতে দেখা যায়। পিজারো ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইনকাদের সঙ্গে যুদ্ধে ও প্রতিদ্বন্দ্বী স্পেনীয়দের সঙ্গে সংঘর্ষে নিহত হন। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে পেরু স্বাধীন হয়। পেরুর আয়তন ১২,৮৫,২১৫ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা ১,৭৩,০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী লিমা।

উরুগুয়ে (Uruguay) সপ্তদশ শতাব্দীতে পোর্তুগিজদের অধিকারে ছিল। তারপর ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের অধিকারভুক্ত থাকে। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে উরুগুয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

উরুগুয়ের আয়তন ১,৮৬,৯২৬ বর্গ কিলোমিটার লোকসংখ্যা প্রায় ২৯ লক্ষ (১৯৭৮); রাজধানী মন্টিভিডিও।

ভেনেজুয়েলা (Venezuela) ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ১৫৪৫ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের অধীন হয়। সাইমন বলিভারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে ১২৮১ খ্রীষ্টাব্দে ভেনেজুয়েলা স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ভেনেজুয়েলা তৈল উৎপাদনে পৃথিবীতে পঞ্চম স্থানাধিকারী। ভেনেজুয়েলার আয়তন ৯,১২,০৫০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৪৫,৪০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী কারাকাস।

ইকোয়েডর (Ecuador) ১৫৩২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনের উপনিবেশ হয়। তখন কলম্বিয়া ইকোয়েডরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। কলম্বিয়ার কিটো প্রেসিডেন্সি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ইকোয়েডর নামে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ইকোয়েডরের আয়তন ২,৭০,৬৭০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৭৮,১০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী কিটো (Quito)।

কিউবা

কিউবা (Cuba) পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের (West Indies-এর) বৃহত্তম দ্বীপ। ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে কলম্বাস কিউবা আবিষ্কার করেন। ১৭৬২-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ অধিকারে থাকে। তার পরে ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্পেনের শাসনাধীন থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। বাতিস্তার ডিক্টেটরী শাসনের বিরুদ্ধে দেশে ডঃ ফিডেল কাস্ত্রোর নেতৃত্বে



ফিডেল কাস্ত্রো

তুমুল আন্দোলন চলে। বাতিস্তা ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি পদত্যাগ করে লিসবনে পলায়ন করেন। ডঃ ফিডেল কাস্ত্রো (Dr. Fidel Castro, জন্ম ১৯২৭ খ্রী.) প্রধানমন্ত্রী হন। বর্তমানে তিনি রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ও ভাগ্যনিয়ন্তা।

কিউবা কম্যুনিস্ট-প্রভাবান্বিত রাষ্ট্র। এর আয়তন ১,১০,৯২২ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৯৭,৩০,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী হাভানা।

আফ্রিকা মহাদেশ

পূর্বে আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত প্রায় সব দেশ ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। বর্তমানে প্রায় সব দেশই বিদেশীদের কবলমুক্ত। কঙ্গো সাধারণতন্ত্র, ঘানা, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, সুদান, লিবিয়া, লাইবিরিয়া, আলজিরিয়া, গিনি, ইথিওপিয়া, মরক্কো, সেনিগাল, টিউনিসিয়া, সোমালি, মাদাগাস্কার, গ্যাবোঁ, মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র, চাদ সাধারণতন্ত্র, নাইজার সাধারণতন্ত্র, বেনিন, আইভরি কোস্ট মরিটানিয়া, মালি, ক্যামেরুন, টোগো, অ্যাঙ্গোলা, বৎসোয়ানা, বুরুণ্ডি, দ্য গাম্বিয়া, কেনিয়া, লেসোথো, মোজাম্বিক, নাইজিরিয়া, সোয়াজিল্যাণ্ড, তানজানিয়া, উগাণ্ডা, জাইরে, জাম্বিয়া, জিম্বাবোয়ে, আপার ভোল্টা, ইকোয়েটরিয়াল গিনি, গিনি-বিসাউ, মালাউ য়, রোয়াণ্ডা, সিয়েরা লিওন, সাউথ ওয়েস্ট আফ্রিকা প্রভৃতি অসংখ্য দেশ নিয়ে আফ্রিকা মহাদেশ।

পূর্বে আফ্রিকাকে বলা হত অন্ধকার মহাদেশ (Dark Continent)। কারণ, বহু শতাব্দী ধরে আফ্রিকার দেশসমূহ সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য জাতির লোকেরা অজ্ঞ ছিল। স্পেক, স্ট্যানলী, লিভিংস্টোন প্রভৃতি পর্যটক ও ভৌগোলিক আবিষ্কারকদের চেষ্টায় ইউ-রোপীয় দেশসমূহ আফ্রিকার বহু তথ্য জানতে সমর্থ হয়। তখন থেকে ইংল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, স্পেন, পোর্তুগাল প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতি বিভিন্ন সময়ে আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপনি-বেশ স্থাপন করে। বহু বৎসর পরে আফ্রিকার প্রতিটি দেশ তাদের স্বাধীনতা ফিরে পেয়েছে।

ইথিওপিয়া (Ethiopia) উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। এর পূর্ব নাম আবিসিনিয়া। এ দেশের অধিবাসীরা হাবসী নামে আখ্যাত। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়া অধিকৃত হয়। সম্রাট্ হাইলে সেলাসী দেশান্তরে গমন করেন। ব্রিটিশ সৈন্য ইথিওপিয়াকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে ইতালির কবলমুক্ত করলে হাইলে সেলাসী ফিরে এসে সিংহা-সনে বসেন। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে ইরিত্রিয়া ইথিওপিয়ার



হাইলে সেলাসি

সঙ্গে সংযুক্ত হয়। হাইলে সেলাসী (Haile Selassi, ১৮৯২-১৯৭২ খ্রী.) ইথিওপিয়ার ২২৫তম শাসক। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থানে হাইলে সেলাসী গদিচ্যুত হন। ইথিওপিয়া বর্তমানে সামরিক শাসনাধীন। এর আয়তন ১০, ০,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩,০৪.০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী আদ্দিস আবাবা।

আলজিরিয়া (Algeria) ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ উপকূলস্থ উত্তর আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। আলজিরিয়ার ইতিহাস সুপ্রাচীন। খ্রীষ্টযুগের পূর্বে এ দেশ রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৮৪৭

খ্রীষ্টাব্দে আলজিরিয়া ফরাসী উপনিবেশে পরিণত হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। এর আয়তন ২৩,৮১,৭৪৫ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৮২,৫০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী আলজিয়ার্স।

অ্যাঙ্গোলা (Angola) ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগালের উপনিবেশ হয়। ১৬৪১ থেকে ১৬৪৮ পর্যন্ত ওলন্দাজদের অধিকারে থাকে। এর উত্তরে কঙ্গো, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে জাইরে, পূর্বে জাম্বিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, দক্ষিণে নামিবিয়া এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। অ্যাঙ্গোলা ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান। প্রধানমন্ত্রীর পদ নেই। এর আয়তন ১২,৪৬,৭০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ (১৯৭৯); রাজধানী লুয়াণ্ডা।

বেনিন (Benin) অঞ্চল ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের দ্বারা অধিকৃত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। এর পূর্বনাম ছিল ডাহোমে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক শাসনের অধীন হয়। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মার্ক্সিস্ট-লেনিনিস্ট রাষ্ট্র হিসাবে পরিগণিত হয়ে ডাহোমে নামের পরিবর্তে বেনিন হয়। এর পূর্বে নাইজিরিয়া, উত্তরে নাইজার ও আপার ভোল্টা, পশ্চিমে টাগো। এর আয়তন ১,১২,৬২২ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩৪,৭০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী পোর্টো নোভো

বৎসোয়ানা (Botswana) পূর্বে বেচুয়ানাল্যাণ্ড নামে পরিচিত ছিল। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দ ব্রিটিশের অধীনে থাকবার পর স্বাধীন হয় ও নূতন নাম হয় বৎসোয়ানা। এর আয়তন ৫,৭৫,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৮,৩১,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী গ্যাবোরোন।

বুরুণ্ডি (Burundi) পূর্ব-মধ্য আফ্রিকার একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির উপনিবেশ হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে বেলজিয়ামের রক্ষণাধীন হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। স্বাধীনতা লাভের পর নাম হয় বুরুণ্ডি। সেই সময়ে বুরুণ্ডি ছিল নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর রাজতন্ত্রের অবসান হয়। বুরুণ্ডির আয়তন ২৭,৮৩৪ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৪২,৮০,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী বুজুমবুরা।

ক্যামেরুন (Cameroon) পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ক্যামেরুন ছিল জার্মানির উপনিবেশ। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সৈন্যবাহিনী দেশটা দখল করে। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন সংযুক্ত ক্যামেরুন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হয়। ক্যামেরুনের পশ্চিমে গিনি উপসাগর, উত্তর-পশ্চিমে নাইজিরিয়া, পূর্বে চাদ ও সেন্ট্রাল-আফ্রিকান রিপাবলিক এবং দক্ষিণে কঙ্গো, গ্যাবোঁ ও ইকোয়েটরিয়াল গিনি। এর আয়তন ৪,৬৫,০৫৪ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৮২,৮০,০০০ (১৯৮০); রাজধানী ইয়াউণ্ডে (Yaounde)

সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক (Central African Republic) অর্থাৎ মধ্য আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র মধ্য আফ্রিকায় অবস্থিত একটি ভূমিবদ্ধ দেশ। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই আগস্ট স্বাধীন হয়। রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়। সম্রাট প্রথম বোকাসা প্রেসিডেন্ট বোকাসা হন। এর উত্তরে চাদ, পূর্বে সুদান, দক্ষিণে জাইরে ও পশ্চিমে ক্যামেরুন। এর আয়তন ৬,২৪,৯৭৭ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২০,৮৮,০০০ (১৯৮০); রাজধানী বাংগুই (Bangui)।

চাদ (Chad) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ দেশ ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই আগস্ট স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর পশ্চিমে ক্যামেরুন, নাইজিরিয়া ও নাইজার, উত্তরে লিবিয়া, পূর্বে সুদান এবং দক্ষিণে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক। এর আয়তন ১২,৮৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৪৪,০৫,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী এন' জামেনা (N' djamena)।

কঙ্গো (Congo) মধ্য আফ্রিকার একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসীদের অধিকারভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় দ্য গোলের নির্দেশে ফরাসী সরকার কঙ্গোর ব্রাজাভিলে স্থানান্তরিত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগস্ট কঙ্গো স্বাধীন হয়। এর উত্তরে ক্যামেরুন ও দ্য সেন্ট্রাল আফ্রিকান এম্পায়ার, পূর্বে ও পশ্চিমে জাইরে, দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে গ্যাবোঁ। এর আয়তন ৩,৪২,০০০ বর্গ কিলোমিটার, লোকসংখ্যা ১৪,৩৪,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী ব্রাজাভিল। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক।

ইকোয়েটরিয়াল গিনি (Equatoriel Guinea) মধ্য-পশ্চিম আফ্রিকায় অবস্থিত একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। একদা স্পেনের এই উপনিবেশটি ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই অক্টোবর পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করেছে। এর আয়তন ২৮,০৫১ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩,২৫,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী মালাবো (Malabo)।

গ্যাবোঁ (Gabon) পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। এই প্রাক্তন ফরাসী উপনিবেশ ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগস্ট স্বাধীন হয়। এর পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে ইকোয়েটরিয়াল গিনি ও ক্যামেরুন এবং পূর্বে ও দক্ষিণে কঙ্গো। এর আয়তন ২,৬৭,৬৬৭ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১৩ লক্ষ (১৯৭৮); রাজধানী লিবরেভিল (Libreville)।

দ্য গ্যাম্বিয়া (The Gambia) পশ্চিম আফ্রিকায় আটলান্টিক মহাসাগরের তীরে অবস্থিত। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজরা এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে এপ্রিল গাম্বিয়া সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর এবং আর সব দিকে সেনিগাল। এর আয়তন ১১,২৯৫ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ৫,৯২,০০০ (১৯৮০); রাজধানী বানজুল (Banjul)। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক।

ঘানা (Ghana) পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। এর পূর্ব নাম গোল্ড কোস্ট। এই দেশ ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের অধিকারভুক্ত হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মার্চ স্বাধীন হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দে ঘানা সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ডঃ এনক্রুমা (Dr. N krumah) ঘানার প্রথম প্রেসিডেন্ট। এর আয়তন ২,৩৮,৩০৫ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ১,১৭,০০,০০০ (১৯৮০) রাজধানী আক্রা (Accra)।

গিনি (Guinea) আটলান্টিক মহাসাগরের তীরস্থ পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে গিনি ফ্রান্সের উপনিবেশ হয়। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর গিনি স্বাধীন হয়। এর উত্তরে ও পূর্বে গিনি-বিসাউ, সেনিগাল ও মালি, দক্ষিণে লাইবিরিয়া ও সিয়েরা লিওন এবং পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। এর আয়তন ২,৪৫,৮৫৭ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ৫১,৩০,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী কোনাক্রি (Conakry)।

গিনি-বিসাউ (Guinea Bissau) আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব-তীরস্থ পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৪৪৬ খ্রীষ্টাব্দে পোর্তুগিজ নাবিক নুনো ত্রিস্তাও (Nuno Tristao) কর্তৃক এই দেশ আবিষ্কৃত হওয়ার পর এটি পোর্তুগালের উপনিবেশ হয়। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গিনি-বিসাউ স্বাধীনতা লাভ করে। এর উত্তরে সেনিগাল, পূর্বে ও দক্ষিণে গিনি। এর আয়তন ৩৬,১২৫ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ৭.৭৭,২১৪ (১৯০৯); রাজধানী বিসাউ।

আইভরি কোস্ট (Ivory Coast) পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ফ্রান্স ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এখানে উপনিবেশ স্থাপন করে। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট স্বাধীন হয়। আইভরি কোস্ট লাইবিরিয়া ও ঘানার মধ্যে অবস্থিত। গিনি, মালি ও আপার ভোল্টার সীমানা আইভরি কোস্টের সীমানার সহিত লাগোয়া। এর আয়তন ৩,২২,৪৬৩ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৭৯,২০.০০০ (১৯৭৯); রাজধানী আবিদজান (Abidjan)।

কেনিয়া (Kenya) আরব সাগরের তীরে অবস্থিত পূর্ব আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। উনিশ শতকের শেষে দেশটি ইংরেজদের অধীন হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ডিসেম্বর স্বাধীন হয়। জোমো কেনিয়াট্টা (Jomo Kenyatta) ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে কেনিয়ার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন। এর উত্তরে ইথিওপিয়া, পশ্চিমে উগাণ্ডা, দক্ষিণে তানজানিয়া এবং পূর্বে সোমালি সাধারণতন্ত্র ও ভারত মহাসাগর। এর আয়তন ৫,৮২,৬০০ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ১,৫৩,২০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী নাইরবি (Nairobi)।

লেসোথো (Lasotho) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ দেশ। পূর্বে নাম ছিল বাসুতোল্যাণ্ড। ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনের রক্ষণাধীন হয়। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর স্বাধীন হয়। তখন থেকে নাম হয় লেসোথো। এর পশ্চিমে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট, উত্তরে অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট ও নাটাল, পূর্বে নাটাল এবং দক্ষিণে কেপ প্রভিন্স। আয়তন ৩০,৩৪০ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ১২,৭৯,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী ম্যাজেরু (Maseru)। লেসোথোর অধিবাসীরা পুরোপুরি আফ্রিকান।

লাইবিরিয়া (Liberia) পশ্চিম আফ্রিকার তীর বরাবর মার্কিন ক্রীতদাসদের জন্যে স্থাপিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুলাই লাইবিরিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়। এর পশ্চিমে সিয়েরা লিওন, পূর্বে আইভরি কোস্ট। এর আয়তন ১.১২.৬০০ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা প্রায় ১৮ লক্ষ (১৯৭৯); রাজধানী মনরোভিয়া। প্রেসিডেন্ট দেশের প্রধান শাসক।

লিবিয়া (Libya) উত্তর আফ্রিকার বিরাট মরুকল্প স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ট্রিপলিতানিয়া, সাইরেনাইকা ও ফেজান এর সমবায়ে লিবিয়ার সৃষ্টি। প্রাচীনকালে এই অঞ্চল কার্থেজ ও রোমের অধীন ছিল। ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারি লিবিয়া স্বাধীন হয়। ইদ্রিস রাজা হন। ১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক অভ্যুত্থানের পর লিবিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান ঘটে। সেই থেকে দেশটি সামরিক শাসনাধীন। এর আয়তন ১৭,৫৯,৫৪০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২৯,৪০,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী ত্রিপলি।

মাদাগাস্কার (Madgascar) আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের নিকটে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। পোর্তুগিজ নাবিক দিয়েগো দিয়াজ (Diego Diaz) কর্তৃক ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে মাদাগাস্কার আবিষ্কৃত হয়। কিছুকাল ফরাসীদের অধিকারে থাকবার

পর ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর মাদাগাস্কার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ৫,৯৪,১৮০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা প্রায় ৮৮ লক্ষ (১৯৭৮); রাজধানী আন্টানানারিভো (Antananarivo)।

মালাউয়ি (Malawi) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। পূর্বে নাম ছিল নিয়াসাল্যাণ্ড। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের উপনিবেশ ছিল। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই স্বাধীন হলে নাম হয় মালাউয়ি। ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই জুলাই সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। মালাউয়ির আয়তন ৯৬,২০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা প্রায় ৫৮ লক্ষ (১৯৭৯); রাজধানী লিলনগোয়ে (Lilongwe)। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক।

মালি (Mali) উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী উপনিবেশ হয়। ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে নভেম্বর স্বাধীন হয়। স্বাধীনতার পূর্বে মালি ফ্রেঞ্চ সুদান নামে খ্যাত ছিল। এর উত্তর-পশ্চিমে মরিটানিয়া, উত্তর-পূর্বে আলজিরিয়া এবং পূর্বে নাইজার। এর আয়তন ১২,০৪,০২১ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৬৪,৭০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী বামাকো।

মরিটানিয়া (Mauritania) উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই দেশ ফরাসী উপনিবেশ হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৮শে নভেম্বর স্বাধীন হয়। এর পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, উত্তরে পশ্চিম সাহারা, উত্তর-পূর্বে আলজিরিয়া, পূর্বে ও দক্ষিণ-পূর্বে মালি এবং দক্ষিণে সেনিগাল। এর আয়তন ১০,৩০,৭০০ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ১৫,৪০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী নুআকশট (Nouakchott)।

মরক্কো (Morocco) উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাজ্য। ১৯১২ থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যটি দ্বিখণ্ডিতভাবে ফ্রান্স ও স্পেনের রক্ষণাধীন ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ ফ্রান্স মরক্কোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। স্পেন ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ই এপ্রিল মরক্কোর রক্ষণভার ত্যাগ করে। স্বাধীন মরক্কোর আয়তন ৬,৫৯,৯৭০ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ১,৯৫,০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী রাবাত (Rabat)। মরক্কোর অন্তর্গত কাসাব্লাঙ্কা একটি সুন্দর শহর। এখানে ১৫ লক্ষাধিক লোকের বাস। রাজা দ্বিতীয় হাসান (জন্ম ১৯২৯ খ্রী) রাষ্ট্রপ্রধান।

মোজাম্বিক (Mojambique) দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে দেশটি ভাস্কো ডা গামা কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়। ১৫০৫ খ্রীষ্টাব্দে মোজাম্বিক পোর্তুগিজ উপনিবেশ হয়। ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুন মোজাম্বিক পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। এর পূর্বে ভারত মহাসাগর, দক্ষিণে দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ-পশ্চিমে সোয়াজিল্যাণ্ড ও রোডেশিয়া এবং উত্তরে জাম্বিয়া, মালাউয়ি ও তানজানিয়া। এর আয়তন ৭,৮৪,৯৬১ বর্গ কিলোমিটার; জনসংখ্যা ১,১৭,৫০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী মাপুতো (Maputo)। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান।

নাইজার (Niger) পশ্চিম আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা আগস্ট স্বাধীন হয়। এর উত্তরে আলজিরিয়া ও লিবিয়া, পূর্বে চাদ, দক্ষিণে নাইজিরিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে আপার ভোল্টা এবং পশ্চিমে মালি। এর আয়তন ১১,৮৬,৪০৮ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা

৫৩ লক্ষ (১৯৭৯) ; রাজধানী নিয়ামে (Niamey)। ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে সামরিক শাসনাধীন হয়।

নাইজিরিয়া (Nigeria) পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্র। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর স্বাধীন হয়। ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। বার বার সামরিক অভ্যুত্থান ও অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত হয়। এর আয়তন ৯,২৩,৭৭৩ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৮,১০,০০,০০০ (১৯৭৮) ; রাজধানী লাগোস (Lagos)।

রোয়াণ্ডা (Rwanda) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র। কিছুকাল জার্মানির অধীন থাকবার পর প্রথম মহাযুদ্ধের সময় বেলজিয়ামের রক্ষণাধীন হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে গণভোটের মাধ্যমে রাজতন্ত্রের অবসান হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর দক্ষিণে বুরুণ্ডি, পশ্চিমে কিভু হ্রদ ও কঙ্গো নদী, উত্তরে উগাণ্ডা এবং পূর্বে তানজানিয়া। এর আয়তন ২৬,৩৩০ বর্গ কিলোমিটার ; লোকসংখ্যা ৪৬,৫০,০০০ (১৯৭৯) ; রাজধানী কিগালি (Kigali)। সামরিক শাসনাধীনে প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক।

সেনিগল (Senegal) আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব-উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। একদা এই দেশ ছিল ফরাসী উপনিবেশ। নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে আগস্ট স্বাধীন হয়। এর আয়তন ১,৯৬,৭২২ বর্গ কিলোমিটার ; জনসংখ্যা ৫৬,৬০,০০০ (১৯৮০) ; রাজধানী ডাকার (Dakar)। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান।

সিয়েরা লিওন (Sierra Leone) আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বিপন্ন কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসদের পুনর্বাসনকল্পে এখানকার একাংশে ব্রিটেনের উদ্যোগে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে বিভিন্ন ক্রীতদাস ব্যবসায়ীদের জাহাজ থেকে উদ্ধার করে এনে বহু ক্রীতদাসের এখানে বসবাসের ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে আগস্ট সিয়েরা লিওন ব্রিটেনের রক্ষণাধীন হয়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল স্বাধীন হয় এবং ১৯৭১ খ্রীষ্টাব্দের ১৯শে এপ্রিল সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর উত্তর-পশ্চিম, উত্তর ও উত্তর-পূর্বে গিনি সাধারণতন্ত্র, দক্ষিণ-পূর্বে লাইবিরিয়া এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর। এর আয়তন ৭৩,৩২৬ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৩৪,৭০,০০০ (১৯৭৮) ; রাজধানী ফ্রীটাউন (Freetown)। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান।

সোমালি (Somali) পূর্ব আফ্রিকার একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। পূর্বতন ব্রিটিশ সোমালিল্যাণ্ড প্রোটেকটরেট ও ইতালির রক্ষণাধীন সোমালিল্যাণ্ড সংযুক্ত হয়ে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই সোমালি ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক (Somali Democratic Republic) নামে স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর আয়তন ৬,৩০,০০০ বর্গ কিলোমিটার ; জনসংখ্যা ৩৬,৪০,০০০ (১৯৮০) ; রাজধানী মোগাডিসিও (Mogadiscio)। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান।

দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র (Republic of South Africa) আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্তে অবস্থিত শ্বেতাঙ্গশাসিত রাষ্ট্র। উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope), নাটাল, দ্য ট্রান্সভাল ও দি অরেঞ্জ ফ্রী স্টেট সম্মিলিতভাবে ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে যে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন হিসাবে গঠিত হয় তা-ই ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই অক্টোবর দক্ষিণ

আফ্রিকা সাধারণতন্ত্রে পরিণত হয়। এর উত্তরে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, বৎসোয়ানা ও রোডেসিয়া, উত্তর-পূর্বে মোজাম্বিক ও সোয়াজিল্যাণ্ড, পূর্বে ভারত মহাসাগর এবং দক্ষিণে ও পশ্চিমে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর। এর আয়তন ১১,৪০,৫১৯ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২,৪০,০০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী প্রিটোরিয়া। লোকসংখ্যার মাত্র হাজার চল্লিশেক শ্বেতাঙ্গ, বাকী প্রায় পৌনে দু'কোটি কৃষ্ণাঙ্গ। অথচ শ্বেতাঙ্গরা জোর করে কৃষ্ণাঙ্গদের অধীন করে রেখেছে। সারা পৃথিবীর সকল স্থান থেকে উত্থিত প্রতিবাদ সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গ শাসক সম্প্রদায় তাদের বর্ণ বৈষম্য নীতির পরিবর্তন ঘটায় নি। এই জঘন্য বর্ণবিদ্বেষ (apartheid) পৃথিবীর সর্বস্তরের মানুষ কর্তৃক নিন্দিত।

সাউথ-ওয়েস্ট আফ্রিকা (**South-West Africa**) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে জার্মানির রক্ষণাধীন অঞ্চল ছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই জুলাই সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়নের অধিকারে আসে। এই অঞ্চল বর্তমানে নামিবিয়া নামে আখ্যাত। এর উত্তরে অ্যাঙ্গোলা ও জাম্বিয়া, পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে কেপ প্রভিন্স, পূর্বে বৎসোয়ানা ও জাম্বিয়া। এর আয়তন ৮,২৩,১৪৫ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৯,০৮,৮০০ (১৯৭৭)। নয় লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মাত্র প্রায় এক লক্ষ শ্বেতাঙ্গ। দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্রের বর্ণবিদ্বেষী অনমনীয় মনোভাবের জন্যে নামিবিয়ার ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় নি।

সুদান (**Sudan**) উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৯৯ থেকে ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুদান ছিল ব্রিটেন ও ইজিপ্টের যৌথ শাসনাধীন। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর উত্তরে ইজিপ্ট, উত্তর-পূর্বে লোহিত সাগর, পূর্বে ইথিওপিয়া, দক্ষিণে কেনিয়া, উগাণ্ডা ও জাইরে, পশ্চিমে সেণ্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক ও চাদ এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে লিবিয়া। এর আয়তন ২৫ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৮৪,০০,০০০ (১৯৮০) ও রাজধানী খার্তুম। দেশে বার বার সামরিক অভ্যুত্থান হয়। প্রেসিডেণ্ট রাষ্ট্রপ্রধান ও মুখ্য প্রশাসক।

সোয়াজিল্যাণ্ড (**Swaziland**) আফ্রিকার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত ভূমিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্র। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের রক্ষণাধীন হয় এবং ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই সেপ্টেম্বর স্বাধীন হয়। এর উত্তরে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে ট্রান্সভাল প্রভিন্স এবং পূর্বে মোজাম্বিক ও জুলুল্যাণ্ড। এর আয়তন ১৭,৪০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৫,৬৩,৭৩৩ (১৯৭৯) এবং রাজধানী এম্‌ব্যাবেন (Mbabane)। রাজা দ্বিতীয় সোভুজা (Sobhuza II)।

তানজানিয়া (**Tanzania**) পূর্ব আফ্রিকার একটি স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে টাঙ্গানাইকা জার্মানির উপনিবেশ ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় টাঙ্গানাইকা ইংরেজের অধিকারে যায়। ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে টাঙ্গানাইকা স্বাধীন হয় ও পরবৎসর সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। সুলতান-শাসিত জাঞ্জিবার ব্রিটিশের কবলমুক্ত হয়ে ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে এপ্রিল টাঙ্গানাইকা, জাঞ্জিবার ও পেমবা দ্বীপ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে ইউনাইটেড রিপাবলিক অব টাঙ্গানাইকা অ্যাণ্ড জাঞ্জিবার নামে এক রাষ্ট্র গঠন করে, তা ঐ বৎসরেই তানজানিয়া নাম গ্রহণ করে। তানজানিয়ার উত্তর-পূর্বে কেনিয়া, উত্তরে ভিক্টোরিয়া হ্রদ ও উগাণ্ডা, উত্তর-পশ্চিমে রোয়াণ্ডা ও বুরুণ্ডি, পশ্চিমে টাঙ্গানাইকা হ্রদ, দক্ষিণ-পশ্চিমে জাম্বিয়া ও মালাউয়ি এবং দক্ষিণে মোজাম্বিক। এর আয়তন ৯,৩৯,৭০৪ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৭৬,০০,০০০ (১৯৭৯); রাজ-

ধানী দোদোমা (Dodoma)। ডঃ জুলিয়াস কে. নাইয়েরের (Dr. Julius K. Nyerere) ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে পাঁচ বৎসরের জন্য পুনরায় প্রেসিডেন্ট হন।

টোগো (Togo) গিনি উপসাগরের উপকূলস্থ পশ্চিম আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জার্মান অধিকারে থাকার পর নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে এপ্রিল স্বাধীন হয়। এর উত্তরে আপার ভোল্টা, পশ্চিমে ঘানা। এর আয়তন ৫৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২৪,৭০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী লোমে (Lome)।

টিউনিসিয়া (Tunisia) ভূমধ্যসাগরের দক্ষিণ-কূলবর্তী উত্তর আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। টিউনিসিয়া ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ফরাসীদের রক্ষণাধীন ছিল। ১৯৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে মার্চ স্বাধীন হয়। ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে জুলাই সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর উত্তরে ও পূর্বে ভূমধ্যসাগর, পশ্চিমে আলজিরিয়া এবং দক্ষিণে লিবিয়া। এর আয়তন ১,৬৪,১৫০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৬০,৩০,০০০ (১৯৭৮); রাজধানী টিউনিস। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান।

উগাণ্ডা (Uganda) পূর্ব আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে উগাণ্ডা ব্রিটিশের উপনিবেশ হয়। ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীন হয়। এর উত্তরে সুদান, পূর্বে কেনিয়া, দক্ষিণে তানজানিয়া ও পশ্চিমে জাইরে। এর আয়তন ২,৩৬,৮৬০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ১,৩২,২০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী কাম্পালা (Campala)। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্রপ্রধান।

জাইরে (Zaire) মধ্য আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। নৃপতি-শাসিত কঙ্গো ফ্রী স্টেট বেলজিয়ামের অধীন বেলজিয়ান কঙ্গো নামে পরিচিত হয়। ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জুন স্বাধীন হয়। বর্তমান নাম জাইরে। এর উত্তরে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, উত্তর-পূর্বে সুদান, পূর্বে উগাণ্ডা, রোয়াণ্ডা, বুরুণ্ডি ও টাঙ্গানাইকা হ্রদ, দক্ষিণে জাম্বিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিমে অ্যাঙ্গোলা এবং উত্তর-পশ্চিমে কঙ্গো। এর আয়তন ২৩,৪৫,৪০৯ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ২,৯২ ৭০,০০০ (১৯৭৯); রাজধানী কিনশাসা (Kinshasa)। তীব্র জাতীয়তাবাদী মবুতু সেসো সেকো (Mobuto Seso Seko) ১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তৃতীয় বার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

জাম্বিয়া (Zambia) মধ্য আফ্রিকার ভূমিবদ্ধ স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। এর পূর্ব নাম উত্তর রোডেসিয়া। এটি ছিল প্রাক্তন ব্রিটিশ উপনিবেশ। ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে অক্টোবর স্বাধীন হয়। এর নাম হয় জাম্বিয়া। এর উত্তরে তানজানিয়া, পূর্বে মালাউয়ি, দক্ষিণ-পূর্বে মোজাম্বিক এবং দক্ষিণে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা। এর আয়তন ৭,৫২,৬২০ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৫৬ লক্ষ; রাজধানী লুসাকা (Lusaka)। ডঃ কেনেথ ডেভিড কুয়াণ্ডা প্রেসিডেন্ট (১৯৮১)।

জিম্বাবোয়ে (Zimbabwe) আফ্রিকার স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র। দক্ষিণ রোডেসিয়ার নাম হয়েছে জিম্বাবোয়ে। ১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল জিম্বাবোয়ে স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর পূর্বে মোজাম্বিক, পশ্চিমে বৎসোয়ানা। ট্রান্সভাল ও জাম্বেজী নদীর মধ্যস্থলে অবস্থিত। এর আয়তন ৩,৯০,৩০৮ বর্গ কিলোমিটার; লোকসংখ্যা ৭৪ লক্ষ (১৯৮০); রাজধানী স্যালিসবেরি (Salisbury)।

যে-সব দেশের কথা বলা হল, তাছাড়া আরো অনেক ছোট বড় দেশ বা দেশবৎ দ্বীপ পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যমান।

সেনিগালের ৫৬৩ কিলোমিটার দূরে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত **কেপ ভার্ড** (Cape Verde) স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র, পূর্ব ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত **সাইপ্রাস** (Cyprus) স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র **কমনওয়েল্‌থ্‌ অব ডমিনিকা** (Comonwealth of Dominica , পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র **ডমিনিকান রিপাবলিক** (Domin can Republic), দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র **ফিজি** (Fiji), দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলে আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র **গায়েনা** (Guyana), পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র **হাই**তি (Haiti), সোমালি সাধারণতন্ত্র ও ইথিওপিয়ার মধ্যস্থলে এডেন উপসাগরে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র **জিবুতি** (Jibuti), মধ্য প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী দ্বীপরাষ্ট্র **কিরিবাতি** (Kiribati), পশ্চিম ইউরোপের রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র **লাক্সেমবুর্গ** (Luxemburg), ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী দ্বীপরাষ্ট্র **মাল্টা** (Malta), ভারত মহাসাগরে অবস্থিত স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র **মরিশাস** (Mauritius), প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত স্বাধীন দ্বীপরাষ্ট্র **পাপুয়া নিউগিনি** (Papua New Guinea), গিনি উপসাগরে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী দ্বীপরাষ্ট্র **সাও তোমে** (Sao Tome), ভারত মহাসাগরে অবস্থিত স্বাধীন সাধারতণন্ত্রী দ্বীপরাষ্ট্র সেচেল্‌জ্‌ (Seychelles), মালয় উপদ্বীপের দক্ষিণাংশে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র সিঙ্গাপুর (Singapore), দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপরাষ্ট্র সলোমন দ্বীপপুঞ্জ (Solomon Islands), দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূলে অবস্থিত স্বাধীন রাষ্ট্র **সুরিনেম** (Suriname), মধ্য প্রাচ্যের আমীর-শাসিত স্বাধীন রাষ্ট্র **ইউনাটেড আরব এমিরেট্‌স্‌** (United Arab Emirates), ফিজির ৮০৫ কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রী রাষ্ট্র **ভানুয়েতু** (Vanuatu), পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীন রাষ্ট্র **ত্রিনিদাদ ও টোবাগো** (Trinidad and Tobago), ফিজির নিকটবর্তী স্বাধীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র **টোঙ্গা** (Tonga), দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের স্বাধীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র **পশ্চিম সামোয়া** (Western Samoa) প্রভৃতি।



॥ বালকের সাহস ও বুদ্ধি ॥

ছেলেবয়সের খেয়াল। তালগাছের পাখির বাসা থেকে ছানা চুরি করতে হবে। একটি ছেলে তর তর করে তালগাছে উঠে গেল। গাছের মাথায় পৌঁছে দেখল, তার আগেই একটা সাপ সেখানে এসেছে। হয়তো তার মতলব পাখির ছানাকে ধরে খাবে। বালককে দেখেই সাপটা ফোঁস করে উঠল। বালক খুব মুশকিলে পড়ে গেল। হয়তো বিষধর সাপ হবে। হাতে কোন অস্ত্র নেই যা দিয়ে সাপটাকে মেরে ফেলা যায়। অথচ না মারতে পারলে সাপের কামড়ে বালকের মৃত্যু হতে পারে। সে হতভম্ব না হয়ে ফস করে সাপটার মাথা ধরে তালগাছের পাতার ডাঁটার ধারালো কিনারায় ঘষে দিল। সাপের মাথাটা তাইতে কেটে দু'ফাঁক হয়ে গেল।

নীচে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা বালকের বুদ্ধি আর সাহস দেখে অবাক্ হয়ে গেল। একজন পণ্ডিত বললেন, ছেলেটি বড় হয়ে খুব নাম কিনবে।

এই বালকই বড় হয়ে এক বিখ্যাত নৈয়ায়িক পণ্ডিত হয়েছিলেন। তিনিই নবদ্বীপের বিখ্যাত পণ্ডিত জগদীশ তর্কালংকার।

॥ বালক শিল্পী ॥



স্কুলের ক্লাসে সবাই মন দিয়ে অঙ্ক কষছে। শিক্ষক মশাই ঘুরে ঘুরে দেখছেন। হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল, একটি ছেলে অঙ্ক না কষে খাতার পাতায় ছবি আঁকছে। তিনি ছেলেটিকে তার জন্যে খুব ধমক দিলেন ও তার খাতাটা নিয়ে গিয়ে



বালক মাইকেল অ্যাঞ্জেলো খাতার পাতায় ছবি আঁকছে।

টেবিলে বসলেন। তিনি ঠিক করেছিলেন, অবাধ্যতা ও অমনোযোগিতার জন্যে ছেলেটিকে শাস্তিস্বরূপ সেদিনকার মতো ক্লাস থেকে বার করে দেবেন।

কিন্তু খাতায় আঁকা ছবিটা দেখে তিনি থমকে উঠলেন। এ কী! এমন সুন্দর ছবি যেন বেশী বয়সের নাম-করা কোন শিল্পীর আঁকা। তিনি বালককে ক্লাস থেকে বার তো করে দিলেনই না, উলটে তাকে কাছে ডেকে তার খুব প্রশংসা করলেন।

এই বালক বড় হয়ে, হয়েছিলেন একজন বিশ্ব-বিখ্যাত শিল্পী ও ভাস্কর। তাঁর নাম মাইকেল-অ্যাঞ্জেলো (Michelangelo, ১৪৭৫-১৫৬৪ খ্রী.)। ইতালিতে তাঁর জন্ম হয়।

॥ আকাশের তারা দেখে তন্ময় ॥

বাড়ির সকলে ঘরের মধ্যে বসে গল্প-গুজব করছে। শুধু একটি বালক বাইরের ফাঁকা উঠানে বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্মেঘ কালো আকাশে কত তারা জ্বল-জ্বল করছে। ও সব কী? কত দূরে আছে? পৃথিবীর মাটিতে এসে পড়ছে না কেন? এমনই সব আবোলতাবোল নানা চিন্তায় বালকের মন আচ্ছন্ন। খাবার সময় উতরে যায় যায়। তখনও তার তারা দেখা ও নানা কথা ভাবার বিরাম নেই।

এই বালক বড় হয়ে একজন বড় বৈজ্ঞানিক হয়েছিলেন। নাম তাঁর গ্যালিলিও (Galilei Galileo, ১৫৬৪-১৬৪২ খ্রী.)। ইতালীর পিসা নগরে তাঁর জন্ম হয়। তিনি বৃহস্পতির চারটি উপগ্রহ এবং শনির বলয় আবিষ্কার করেন। পেণ্ডুলামের গতি-নির্ণয় ও দূরবীণ যন্ত্র উদ্ভাবন করে তিনি বিখ্যাত হন।

॥ ঈশ্বরভক্ত বালক ॥

বামুনের ঘরের ছেলে। ভালো করে পড়াশুনা না করলে বড় হয়ে টোলে (চতুষ্পাঠীতে) পণ্ডিতি করা যাবে না। তখনকার দিনে টোলে শিক্ষাদান খুব সম্মানজনক ছিল। ছেলেটি মন দিয়ে পড়াশুনা করা তো দূরের কথা, বইপত্তর রেখে উধাও হয়ে যেত। এক রাত্রে তো বাড়িতে ফিরলই না। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, কাছের মন্দিরের বারান্দায় চোখ বুজিয়ে বসে কাটিয়েছে। ঘুমোয় নি। ঈশ্বরের ধ্যান করেছে। বয়স তো মোটে বারো কি তেরো, এরই মধ্যে ঈশ্বরচিন্তা তার এত প্রবল যে সে না ঘুমিয়ে না খেয়ে সারারাত মন্দিরে বসে ঈশ্বরের ধ্যানে তন্ময় হয়ে কাটিয়েছে।

পাড়ার সবাই বালকের ভাবগতিক দেখে বলাবলি করতে লাগল, বড় হয়ে এ ছেলে একজন



শিবের ধ্যানে তন্ময় বালক তৈলঙ্গ

উঁচুদরের তপস্বী হবে। হয়েছিলও তাই। তিনিই কাশীধামের বিখ্যাত সন্ন্যাসী যোগী তৈলঙ্গ স্বামী (১৬০৭-১৮৮৭ খ্রী.)। যোগবলে তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক সর্বজনপূজ্য মহাপুরুষ। তাঁকে সবাই বলত 'সচল শিব'।

॥ শিশু লেখক ॥

যে বয়সে ছেলেরা খেলাধুলায় মেতে থাকে, পড়ার ফাঁকে গল্পগুজব করে সময় কাটায়, পথে প্রান্তরে বেড়াতে ভালবাসে, সেই বয়সের একটি ছেলে ছিল অদ্ভুত ধরনের। সে খেলাধুলা, গল্প-গুজব ছেড়ে টেবিলে বসে পাতার পর সাদা পাতা আবোলতাবোল লেখায় ভরিয়ে তুলত। সে-সব লেখার বেশির ভাগই ছিল কাঁচা হাতের, অপরিণত মনের মিলহীন ছন্দোহীন কবিতা। সেই সব লেখা পড়ে সবাই হাসত, বিদ্রূপ করত। শুধু একজন বিদ্রূপ করেন নি বা হাসেন নি। তিনি বালকের গৃহশিক্ষক। তিনি বুঝেছিলেন, এই কাঁচা অপরিণত লেখার মধ্য দিয়েই উন্নত পরিণত রচনা উঁকি দিচ্ছে।

এই বালক বড় হয়ে একজন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও কবি হয়েছিলেন। নাম তাঁর শিলার (Johanns Christoph Friedrich von Schiller, ১৭৫৯-১৮০৫ খ্রী.)। তিনি ছিলেন জার্মান। গ্যেটে তাঁর বন্ধু ছিলেন। তিনি বহু বিখ্যাত বই লিখে গেছেন।

॥ মৌলভীর বিস্ময় ॥

প্রতিদিনের মতো নির্ধারিত সময়ে মৌলভী এলেন। বালকের সেদিকে খেয়াল ছিল না। নিজের মনে পড়ে যাচ্ছিল। মৌলভী দেখলেন, বালক আরবী বা ফারসী পড়ছে না, সংস্কৃত বই তন্ময় হয়ে পড়ছে। তিনি বলে উঠলেন, ও কী বই পড়া হচ্ছে? আরবী ফারসী বই পড়ার কথা তো



মৌলভী প্রশ্ন করে জানলেন, বালক রামমোহন সব পাঠ শেষ করে ফেলেছে।

ছিল। বালক একটু থতমত খেয়ে উঠে দাঁড়াল, বলল, আরবী ফারসী বই পড়া হয়ে গেছে। তাই সংস্কৃত বইটায় একটু চোখ বুলিয়ে নিচ্ছিলাম।

মৌলভী আরবী ফারসী বই-এর যে যে অংশ পড়তে বলে গিয়েছিলেন, প্রশ্ন করে দেখলেন, সত্যিই তো বালক সব পাঠ শেষ করে ফেলেছে। তিনি রীতিমতো বিস্মিত হয়ে বালকের পিতাকে বললেন, এ ছেলের মতো প্রতিভা তিনি আর কোন বালকের দেখেন নি। বালক বড় হয়ে দেশের মুখ রক্ষা করবে।

এই বালক রামমোহন রায়। তাঁর পিতা রামকান্ত রায়। রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩ খ্রী.) ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ইংরেজী, উর্দু, হিব্রু, ফারসী, আরবী, ফরাসী, গ্রীক ও লাটিন ভাষা শিখেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় দেশ থেকে সতীদাহ প্রথা উঠে যায়। তিনি প্রায় ৭০ খানি বই লিখে গেছেন।

॥ অপূর্ব মেধাবী বালক ॥

ছোট ছেলে। বয়স মোটে আট বছর। তার মধ্যেই গ্রীক ভাষা আয়ত্ত করে সে গ্রীক ভাষায় লেখা ভালো ভালো বই পড়া শেষ করল। ছেলেটি ইংরেজ। গ্রীক তার ভাষা নয়। সেই বিদেশী ভাষা শিখে ফেলতে তার এতটুকু অসুবিধা হয় নি। শুধু তাই নয়, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে মোটা মোটা ইংরেজী ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র পড়ে ফেলল। তখন তার বয়স বড় জোর পনের। ওই বয়সে দেশবিদেশের ইতিহাস পড়াই কঠিন ব্যাপার কিন্তু সেই কঠিন ব্যাপার তার কাছে কঠিন মনে হয় নি। শুধু তাই নয়, দর্শনশাস্ত্রের মতো দুরূহ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেও তার অসুবিধা হত না।

এই অপূর্ব মেধাবী ছাত্রের নাম জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill, ১৮০৬-১৮৭৩ খ্রী.)। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ ইংরেজ দার্শনিক ও লেখক।

॥ ক্রীতদাসদের দুর্দশায় বেদনা অনুভব ॥

ছেলেটির বয়স বেশী নয়, আট কি নয় বছর। সে পাশের বাড়িতে তার যে সঙ্গী ছিল তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছে। ঘরের বারান্দায় গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। ও কী? তার বন্ধুর বাবা একটা কালো মানুষকে বেত মারছেন। কেন? কী করেছে ও? গায়ের রং কালো হলেও সেও তো মানুষ। সে মনমরা হয়ে বাড়ি ফিরে এল। সেই বয়সেই ভাবতে লাগল, কেন অমন হয়? তাদের বাড়ির বৃদ্ধা পরিচারিকার কাছে শুনল, ওরা



বাড়ির বৃদ্ধা পরিচারিকা বালক লিঙ্কনকে বলল, ওরা ক্রীতদাস।

ক্রীতদাস। ওদের মনিবরা ওদের নির্মমভাবে খাটায়, ওদের উপরে কারণে অকারণে নির্যাতন করে।

বালকের বয়স বেড়ে চলল। একদিন তিনি

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হলেন। নাম তাঁর আব্রাহাম লিঙ্কন (Abraham Lincoln, ১৮০৯-১৮৬৫ খ্রী.)। তিনি সারা জীবন ধরে ক্রীতদাসদের কথা ভাবেন। তাঁর সময়েই ক্রীতদাসপ্রথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উঠে যায়। তাঁর বিখ্যাত কথা 'Government of the people, by the people, for the people'। এক নৃশংস আততায়ী তাঁকে হত্যা করে।

॥ সর্বজনপূজ্য মহামনীষীর শৈশবের কথা ॥

গরীবের ছেলে। দুবেলা খাওয়াই জোটে না। বই কেনা হবে কী করে। বালক তাতে দমল না। সে ভোর হবার আগেই হাঁটতে শুরু করত।



বালক ঈশ্বরচন্দ্র এক ভদ্রলোকের আলমারি থেকে বই নিয়ে পড়ছে।

প্রায় তিন মাইল হেঁটে এক ভদ্রলোকের বাড়ীতে গিয়ে পৌছত। তাঁর ছিল বইয়ে ঠাসা কয়েকটা আলমারি। তাতে নানা ধরনের বই—ব্যাকরণ, সাহিত্য, বেদান্ত, স্মৃতি, পুরাণ—এমনই কত বিষয়ের বই। বালক সেই সব বই আগ্রহের সঙ্গে পড়ত। পড়তে পড়তে বেলা হয়ে যেত। ক্ষিদে পেলেও সে দিকে তার ভ্রূক্ষেপ ছিল না।

অন্ধকার গ্রামের পথ। চারদিকে ডোবা আর পানা পুকুর। তার পাশ দিয়ে সরু পথ। একদিন যেতে যেতে বালক একটা পুকুরে পড়ে গেল। সে কোনক্রমে ডাঙ্গায় উঠে আবার চলতে থাকল। ভিজে জামা কাপড় নিয়ে সে ভদ্রলোকের বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হল। ভদ্রলোক তার অবস্থা দেখে বললেন, এ কী! জামা কাপড় ভিজে কেন? পুকুরে পড়ে গিয়েছিলে? আজ আর পড়তে হবে না। বাড়ী চলে যাও। ভিজে কাপড় না বদলালে অসুখ করবে।

বালক তাঁর কথায় কান না দিয়ে ভিজে জামা কাপড়ে বসেই আগের দিনের পড়া অসমাপ্ত এক ন্যায়ের বই পড়তে থাকল। ভিজে জামা কাপড় গায়েই শুকিয়ে গেল।

এই বালক স্বনামধন্য স্মরণীয় মনীষী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১ খ্রী.)। তাঁকে বলা হয় বাংলা গদ্য সাহিত্যের জনক। তাঁর লেখা বর্ণপরিচয়, উপক্রমণিকা, ব্যাকরণ কৌমুদী, কথামালা প্রভৃতি অসংখ্য বই পড়ে বাংলার লোক মানুষ হয়েছে। তিনি মেট্রোপলিটান ইনিস্টিটিউ-সনকে কলেজে পরিণত করেন। তাই-ই বর্তমান কালের বিদ্যাসাগর কলেজ। তিনি শুধু বিদ্যার সাগর ছিলেন না, দয়ারও সাগর ছিলেন। 'বিদ্যাসাগর' তাঁর উপাধি। তাঁর পুরো নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। মেদিনীপুরের (তখন

হুগলীর) বীরসিংহ গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা ভগবতী দেবী।

॥ মায়ের প্রার্থনা বৃথা যায় নি ॥

বর্তমানে রাসায়নিক উপায়ে নীল তৈরী হয়। আগে নীল গাছ থেকে নীল তৈরী হত। বিশেষ করে বঙ্গদেশে ও বিহারে নীল গাছের ব্যাপক চাষ হত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলের কথা। ইংরেজ ব্যবসায়ীরা বাংলার চাষীদের দিয়ে নীল চাষ করাত। চাষীরা যা পারিশ্রমিক পেত, তাতে তাদের অন্নসংস্থান হত না। তারা বেশী পয়সা মজুরী চাইলে বা নীল চাষ করতে রাজী না হলে অত্যাচারী ইংরেজরা তাদের উপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালাত। চাষীদের দুর্গতির সীমা ছিল না। নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে ১৮৫৯-১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ আন্দোলন দেখা দেয়। এই আন্দোলন নীলকর আন্দোলন নামে খ্যাত। দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নামে একটা নাটকে সাহেবদের অত্যাচারের কথা লেখেন। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' নামে একটি পত্রিকার সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের তীব্র প্রতিবাদে নীলকরদের অত্যাচার খুব কমে যায়।

এই হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বয়স যখন নয় কি দশ তখন তাঁর ইংরেজীতে বেশ জ্ঞান হয়। ছেলেটির পিতা শৈশবে মারা যান। খুবই অর্থকষ্টে তার শৈশব কাটে। স্কুলে পড়তে যাবার মতো পয়সা যোগাড় হত না। তিনি বাড়িতেই পড়ে অনেক লেখাপড়া শিখেছিলেন।

সেকালে ইংরেজ বণিক ও ব্যবসায়ীদের কাছে চিঠি দিতে গেলে ইংরেজীতেই লিখতে হত। সাধারণ লোকে ইংরেজী জানত না। বালক ওই বয়সেই তাদের জন্যে ইংরেজীতে চিঠিপত্র লিখে পয়সা উপায় করত। একদিন বাড়িতে কোন রকম খাদ্যের সংস্থান নেই। বিধবা মা খুবই চিন্তার মধ্যে পড়লেন। ছেলে বলল, ভাবছ কেন মা, এখনই পয়সা এনে তোমায় দেব। এই বলে



বালক হরিশ্চন্দ্র বারান্দায় বসে অপরের চিঠি লিখে দিচ্ছে।

সে ঘরের বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে গেল। সে বালককে দিয়ে একটা চিঠি লেখাল। লোকটি ওইটুকু ছেলের ইংরেজীতে জ্ঞান দেখে অবাক্ হয়ে গেল। সে ছেলেটিকে বেশ কিছু পয়সা দিয়ে গেল। ছেলেটি হাসতে হাসতে ভিতরে গিয়ে মায়ের হাতে সেই পয়সা দিল। আনন্দে মায়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। তিনি ছেলেকে বুকে চেপে ধরে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, তাঁর ছেলে যেন বড় হয়ে দেশের মুখ রক্ষা করে। মায়ের প্রার্থনা বৃথা যায় নি। হরিশ্চন্দ্র (১৮২৪-১৯৬১ খ্রী.) পরিণত বয়সে একজন প্রসিদ্ধ দেশসেবক হয়েছিলেন।

॥ কম বয়সেই কারিগরি ॥

পাশের ঘর থেকে মা শুনতে পেলেন, তাঁর

ছেলের ঘরে ঠুকঠাক আওয়াজ হচ্ছে। তিনি তাকে তার টেবিলে বসিয়ে দিয়ে এসেছিলেন লেখাপড়া করার জন্যে। কই, পড়ার কোন শব্দ তো শোনা যাচ্ছে না। শুধু মাঝে মাঝে নানা ধরনের ঠুকঠাক আওয়াজ ভেসে আসছে। মা রান্নাঘর থেকে তাঁদের বৈঠকখানায় গিয়ে দেখলেন, ছেলের পড়ার টেবিলে ভাঙ্গা লোহার পাত, তার,



যন্ত্রপাতি নিয়ে পরীক্ষারত এডিসন

কাঠের টুকরো, স্ক্রু, পেরেক, দড়ি, হাতুড়ি, ছেনি এমনই নানা আজেবাজে জিনিস। ছেলে তন্ময় হয়ে সেই সব জিনিস নিয়ে ঠোকাঠুকি করছে। মা তাকে বকতে গিয়ে হেসে ফেললেন, বললেন, লেখাপড়া তুমি ছেড়ে এসব ছেলেমানুষি কেন করছ? ছেলে বলল, দেখ মা, এইসব জিনিস দিয়ে কিছু তৈরি করার চেষ্টা করছি যা মানুষের কাজে লাগে। হয়তো সেদিন বালক কোন জিনিস তৈরি করতে পারে নি। কিন্তু বড় হয়ে মানুষের প্রয়োজনে লাগে এমন শত শত জিনিস তৈরি করেছিল।

তার নাম টমাস আলভা এডিসন (Thomas Alva Edison, ১৮৪৭-১৯৩১ খ্রী.)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন প্রসিদ্ধ আবিষ্কারক। তিনি ফনোগ্রাফ, বৈদ্যুতিক বাতি, সিনেম্যাটগ্রাফ প্রভৃতি প্রায় ১৩০০ রকম জিনিস আবিষ্কার করে গেছেন। শৈশব থেকে তাঁর নূতন কিছু তৈরি করার ঝোঁক ছিল। তাঁর আবিষ্কৃত নূতন নূতন জিনিস মানুষের নানা কাজে লাগে।

॥ রোগা ছেলের স্বাস্থ্য লাভ ॥

পথ দিয়ে কত ছেলে সামনের মাঠে যায়। বালক জানালার ধারে বসে তাদের হাসিমাখা মুখ দেখে, তাদের আনন্দ-কলরব শোনে। কিন্তু কী করবে, তার শরীর এত খারাপ যে সে মাঠে ছুটোছুটি করে খেলতে যেতে পারে না। মনমরা হয়ে ভাবতে ভাবতে একদিন তার মনে হল, সে যদি ভোরে উঠে বেড়াতে যায় ও জোরে জোরে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশঃ একটু ছোটাছুটি করে তাহলে হয়তো সে শরীরে জোর পাবে, তার মনে স্ফূর্তি আসবে। সেই ভেবে তার পর দিন থেকে তাই-ই করতে লাগল। আশ্চর্য! বালক প্রধানতঃ তার মনের জোরে শরীরে বল পেল, ধীরে ধীরে তার অসুস্থতা দূর হল। সে তারপর থেকে নিয়মিত মাঠে খেলতে শুরু করল।

এই বালকের নাম থিওডোর রুজভেল্ট (Theodore Roosevelt, ১৮৫৮-১৯১৯ খ্রী.)। তিনি দু'বার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন। তিনি রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্যে ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি বিষয়ে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ বিস্ময়কর প্রতিভা ॥

বেদ, উপনিষদ্ প্রভৃতি দুরূহ দর্শনশাস্ত্র।

সে-সব আয়ত্ত করতে বেশী বয়সের লোকেরই রীতিমতো অসুবিধা হয়। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের মালাবার প্রদেশে কালাদি নামক স্থানে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে (কারো কারো মতে ৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে) এমন একটি বালকের জন্ম হয়েছিল, যার প্রতিভা ছিল অনন্যসাধারণ। তিন বছর বয়সে সে সংস্কৃত ভাষায় অপরিসীম জ্ঞান অর্জন করেছিল।

টোলের পণ্ডিত মশাই পাঁচ বছর বয়সে তার শাস্ত্রজ্ঞান দেখে খুবই বিস্মিত হয়েছিলেন। যখন তার মাত্র সাত বছর বয়স তখন সে বেদ, উপনিষদ্, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞান লাভ করে।



বালক শংকরাচার্য পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছে।

একদিনের কথা। পণ্ডিত মশাই টোলের বাইরে কোন কাজে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে টোলের ঘরের বাইরে থেকে শুনতে পেলেন, ছেলেটি একজন বড় পণ্ডিতের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছে। তিনি ঘরের মধ্যে না গিয়ে বাইরে থেকে চুপ করে শুনতে থাকলেন তার কথা। আশ্চর্য! যে সব কথা বড়রাই ভালো করে ব্যাখ্যা করতে পারে না, বালক অবলীলাক্রমে সে-সব দুরূহ বিষয়ের ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। পণ্ডিত মশাই বুঝলেন, যে বড় পণ্ডিতের সঙ্গে কথা হচ্ছিল, তিনিও বুঝলেন, এ বালক অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছে। এই বালকের নাম শংকরাচার্য। বেদান্তশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর উপনিষদের ভাষ্য অপূর্ব। তিনি বহু গ্রন্থ রচনা করেন। বড় হয়ে জগন্নাথক্ষেত্র, দ্বারকা, যোশীমঠ ও শৃঙ্গেরীতে চারটি মঠ স্থাপনা করেন। তিনি মাত্র ৩২ বছর বেঁচেছিলেন। তার মধ্যেই তাঁর চেষ্টায় ভারত থেকে বৌদ্ধধর্ম প্রায় অবলুপ্ত হয়, হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান ঘটে।

॥ দীপংকর শ্রীজ্ঞান অতীশ ॥

পূর্ববঙ্গের বিক্রমপুরে প্রায় এক হাজার বছর আগে কমলশ্রী বা কল্যাণশ্রী বলে এক রাজা ছিলেন। রানীর নাম ছিল প্রভাবতী। পিতা-মাতা ছেলের নাম রেখেছিলেন চন্দ্রগর্ভ। ছেলেকে বড় পণ্ডিত করে তোলবার জন্যে পিতা অনেক বড় বড় বড় পণ্ডিত নিয়োগ করলেন। তাঁরা বালকের প্রতিভা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন। একদিন তাঁরা তার পিতাকে বললেন, এ ছেলে বড় হয়ে অসাধারণ পণ্ডিত হবে।

বাঙালীর ছেলে। বাংলার সকল পণ্ডিতের কাছে তার পড়া শেষ হয়ে গেল। সে শুনেছিল, বোম্বাই-এর কাছে কৃষ্ণগিরি বিহারে রাহুলগর্ভ বলে একজন বড় পণ্ডিত আছেন। তাঁর কাছে জ্ঞানলাভ করতে বাংলা দেশ থেকে ছেলেটি সেখানে যাবার জন্যে যাত্রা করল। তখনকার দিনে না ছিল রেলপথ, না ছিল বাস-লরী।

পায়ে হেঁটে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে, বনজঙ্গল ভেদ করে, নদ-নদী পার হয়ে বালক সেখানে পৌঁছল। প্রথম দৃষ্টিতেই রাহুলগর্ভ বুঝেছিলেন, ছেলেটি সাধারণ ছেলের মতো নয়। তার শাস্ত্রাধ্যয়নে একনিষ্ঠতা, জ্ঞানলাভের অদম্য স্পৃহা - সবই অসাধারণ। মহাজ্ঞানী রাহুলগর্ভের সকল বিদ্যা বালকের অল্পদিনের মধ্যে আয়ত্ত হয়ে গেল। তখন বালক দেশে যেতে চাইলে রাহুলগর্ভ কেমন যেন মনমরা হয়ে গেলেন। এমন একজন তীক্ষ্ণধী ছাত্রকে ছাড়তে তাঁর মন চাইছিল না। তিনি তাকে বললেন, "আমি একটা শ্লোক তোমাকে দিচ্ছি। এর অর্থ বার না করা পর্যন্ত তোমার দেশে ফিরে যাওয়া চলবে না।" রাহুলগর্ভ ভেবেছিলেন, বালক এই অতি দুরূহ শ্লোকের অর্থ বার করতে পারবে না। তার আর দেশে ফিরে যাওয়াও হবে না। কিন্তু রাহুলগর্ভ অবাক্ হয়ে দেখলেন, বালক সঙ্গে সঙ্গেই শ্লোকটির সুমধুর অর্থ করে দিল। তিনি বালকের মাথায় হাত দিয়ে বললেন, "তুমি দিগ্বিজয়ী হবে।" বালক দেশে ফিরে এসে বাড়িতে চুপ করে বসে না থেকে মগধের ওদন্তপুরী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শীল রক্ষিতের কাছে গেল।

শীল রক্ষিত এমন মেধাবী ছাত্র এর আগে কখনও দেখেন নি। তিনি মনপ্রাণ দিয়ে তাঁর সকল বিদ্যা উজাড় করে দিলেন, আর বালকটির নাম দিলেন দীপংকর শ্রীজ্ঞান। চন্দ্রগর্ভ দীপংকর শ্রীজ্ঞান নামে আখ্যাত হলেন। দিগ্বিদিক্ থেকে বহু শিক্ষার্থী এসে তাঁর কাছে ভিড় জমিয়ে তুলল।

বর্তমান ভাগলপুর জেলায় বিক্রমশীলা নামে এক নগরী ছিল। সেখানকার প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম ছিল বিক্রমশীলা মহাবিহার। দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড় হয়ে সেখানকার অধ্যক্ষের পদ লাভ করেন। পরে তিনি তিব্বতে যান। সেখানকার লোকে তাঁকে 'অতীশ' উপাধিতে ভূষিত করে।

॥ বালক কবি ॥



দারুণ শীতের রাত। জোরে জোরে কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। শহরের কেউ বাইরে নেই। ঘরের মধ্যে জেগে বা ঘুমিয়ে। জনশূন্য পথের একধারে দাঁড়িয়ে একটি বালক। দেখছিল ঝড়ো হাওয়ায় গাছের ডাল দুলে দুলে উঠছে। শুনছিল ঝড়ের ক্রুদ্ধ গর্জন। বালকের মনে জেগে উঠল অপূর্ব ভাবের বন্যা। তার মুখ দিয়ে বেরোল এক ছত্র কবিতা।

বালক তখনই ঘরে ফিরে টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। কাগজ কলম নিয়ে সেই ছত্র দিয়ে শুরু করে একটা বড় কবিতা লিখে ফেলল। তখন রাত গভীর। নিজের লেখা কবিতা নিজেই সুর করে আবৃত্তি করতে থাকল। তার পর চেয়ারে বসে ভাবতে লাগল, কই, তার আগে তো সে কোনদিন কবিতা লেখে নি!

সকাল হলে সকলেই সেই কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে গেল। বলল, বড় হয়ে সেই বালক একজন বিখ্যাত কবি হবে। হয়েছিলও তাই। ন' বছর বয়সের লেখা কবিতাটি ছাপার অক্ষরে বেরিয়ে অগণিত পাঠক-পাঠিকাকে বিমোহিত করেছে। এর নাম দান্তে (Alighicri Dante, ১২৬৫—১৩২১ খ্রী.)। তিনি ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর অনেক রচনার মধ্যে 'Divina Commedia' সুপ্রসিদ্ধ।

॥ প্রকৃত বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবক ॥

রাত দুপুরে বাড়ির লোক দেখল, ছেলেটি কী সব তার, যন্ত্রপাতি, ব্যাটারি নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। সারা বিছানায় সেগুলি এলোমেলোভাবে



নানা জিনিসপত্র নিয়ে পরীক্ষারত বালক জগদীশচন্দ্র

ছড়ানো রয়েছে। কত রাত হয়েছে, সেদিকে তার খেয়াল নেই। সে তন্ময় হয়ে সেই সব জিনিসপত্র নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

সকাল হলে তার ঘরে গিয়ে বাড়ির লোকে দেখল, বালকটি মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বিছানার জিনিসপত্র তেমনই রয়েছে। পিতা তাঁকে বকলেন। কিন্তু বালক সেই বকুনিতে দমল না। সে নানা আজেবাজে জিনিস নিয়ে নাড়াচড়া করতেই থাকল। যেন সে মূল্যবান্ গবেষণা করে চলেছে।

এই বালকই আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। (১৮৫৮-১৯৩৭ খ্রী.)। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু। জগদীশচন্দ্রই প্রকৃত বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবক। কিন্তু তিনি পেটেন্ট নেন নি। তাঁর আবিষ্কৃত তথ্যের উপর নির্ভর করে মার্কোনি বেতারযন্ত্র তৈরি করেন এবং পেটেন্ট নিয়ে বেতারযন্ত্রের উদ্ভাবক বলে খ্যাত হন। জগদীশচন্দ্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদার্থতত্ত্ববিদ্। উদ্ভিদবিদ্যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী। তিনি ক্রেস্কোগ্রাফ, কুঞ্চনমান যন্ত্র, শোষণগ্রাফ প্রভৃতি আবিষ্কার করেন।

॥ শৈশবে পিতার কাছ থেকে পুরস্কার লাভ ॥

ওইটুকু ছেলে। এত কম বয়সে গান লেখে ও সেই গান সুর করে গায়। পিতা সে কথা শুনতে পেলেন। তাঁর বিশ্বাস হল না। একদিন



পিতা দেবেন্দ্রনাথ বালক রবীন্দ্রনাথকে পুরস্কৃত করছেন।

তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে একটা গান শুনতে চাইলেন। বালক সঙ্গে সঙ্গে একটি গান রচনা করে সুর করে সেই গান পিতাকে শোনালেন। পিতা অবাক্ হয়ে ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। কী আশ্চর্য! এইটুকু বয়সে এত ভালো গান লেখা ও সঙ্গে সঙ্গে সুর করে গান গাওয়া তিনি নিজে না দেখলে বা শুনলে বিশ্বাসই করতে পারতেন না। তিনি অভিভূত হয়ে তখনই পুত্রকে পাঁচশত টাকা পুরস্কার দিলেন। যত না মোটা টাকার পুরস্কার পেয়ে, তার চেয়ে বেশী আনন্দ পেল বালক পিতার হর্ষে অভিভূত প্রশংসাবাণী শুনে।

এই বালকই আমাদের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১ খ্রী.)। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী ও অসাধারণ। ভারতকে বিশেষ করে বাংলাকে তিনি সারা পৃথিবীতে এক উচ্চ আসনে বসিয়ে গেছেন। গীতিকার, সুরকার, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধলেখক, নাট্যকার, অভিনেতা, চিত্রকর, দেশপ্রেমিক, বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠাতা রবীন্দ্রনাথ ১৯১৩ খ্রীষ্টাব্দে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

॥ বাঙালীকে ব্যবসায়ে ব্রতী করবার আগ্রহ ॥

সকাল থেকে বালকটির নজরে যে ক'জন ফেরিওয়ালা পড়ল, তারা প্রায় সবাই অবাঙালী। অত কম বয়সে তার মনে হল, বাঙালী পাড়া। সবাই বাঙালী। অথচ ফেরিওয়ালাদের বেশির ভাগই অবাঙালী। কেন এমন হয়? বাঙালীরা কি মালপত্র ফেরি করতে জানে না? শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে একই ধরনের চিন্তায় তার মন ভারাক্রান্ত হয়ে রইল।

বড় হয়ে তিনি হয়ে উঠলেন একজন নামজাদা রাসায়নিক, অধ্যাপক ও দেশপ্রেমিক। তিনি মনীষী ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪ খ্রী.)। সংক্ষেপে তাঁকে লোকে বলে স্যার পি. সি. রায়। তিনি বিজ্ঞান কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁর লেখা 'হিন্দু রসায়নের ইতিহাস' এক অতি মূল্যবান্ গ্রন্থ। বাঙালীরা যাতে শিল্পে ও বাণিজ্যে যথেষ্ট আগ্রহী হয়, উন্নতি লাভ করে, তার জন্যে তিনি বই লিখে, সভাসমিতিতে বক্তৃতা করে, পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে আজীবন নানাভাবে চেষ্টা করে গেছেন।

॥ গরীব দুঃখীর সেবা করাই প্রকৃত ধর্ম ॥

সঙ্গীসাথীরা যখন হই হই করে খেলার মাঠের



বালক বিবেকানন্দ পুঁটলি করে চিঁড়ে মুড়ি নিয়ে যাচ্ছে।

দিকে চলেছে তখন একজন বালক একটা পুঁটলি নিয়ে শহরের গরীব পাড়ার দিকে চলেছে। তা দেখে তার বন্ধুরা বলল, কী রে, কোথায় যাচ্ছিস? খেলতে যাবি না? বালক বলল খেলা নিয়ে মাতবার চেয়ে তাকে অন্য দরকারী কাজ করতে হবে। কী সেই দরকারী কাজ? পাড়ার দুঃস্থ লোকের অনেকেরই পর্যাপ্ত খাদ্য জোটে না। মার কাছ থেকে কিছু চিঁড়ে ও পাটালি গুড় নিয়ে সে তাদের দিতে চলেছে। গরীব লোকদের শীর্ণ চেহারা দেখে তার মন ওই বয়স থেকেই কেঁদে উঠত।

এই বালক বড় হয়ে খুব নাম করেছিলেন। ইনি স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬২-১৯০২ খ্রী.)। তিনি বলতেন, গরীব দুঃখীদের সেবা করাই মানুষের আসল ধর্ম। তিনি সকলকেই গরীব দুঃখীদের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করতে বলতেন। তিনি পরমহংস রামকৃষ্ণদেবের শিষ্য ছিলেন। অনেক বই তিনি লিখে গেছেন। তাঁর শৈশবের নাম ছিল বীরেশ্বর বা বিলে। পরে নাম হয় নরেন্দ্রনাথ। সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণের পর তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ।

॥ বিখ্যাত নাট্যকারের ছেলেবেলা ॥

মা খেতে ডাকলেন। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেল না। টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে লিখে যেতে থাকল। ছেলে খেতে না আসায় মা উঠে তার কাছে গিয়ে বললেন, কী করছিস? খেতে যাবি না? ছেলেটি কাগজ থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'যাচ্ছি মা, এটা লেখা শেষ করেই যাব'। মা বললেন, 'কী লিখছিস অত মন দিয়ে?' ছেলে আগের মতই মুখ না তুলে বলল, 'নাটক লিখছি। আমরা সবাই প্লে করব।' মা হেসে বললেন,



বালক দ্বিজেন্দ্রলাল মাকে তার লেখা নাটক দেখাচ্ছে।

'নাটক? দেখি, কী লিখছিস।' তিনি কাছে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তাঁর বিস্ময়ের অবধি রইল না। সত্যই সে বেশ কয়েক লাইন যা লিখেছে, তাকে নাটক বলা চলে।

এত কম বয়সে তার মাথায় নাটক লেখার খেয়াল কেন চাপল? সে আগের দিন একটা নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়েছিল। ভারী সুন্দর লেগেছিল তার। এইরকম একটা কিছু লেখবার ইচ্ছা তার হয়েছে।

মা মুখে কিছু বললেন না। কিন্তু বুঝতে পারলেন, এ ছেলে বড় হয়ে ভালো নাটক লিখতে পারবে।

এই ছেলেই প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও গীতিকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (১৮৬৩-১৯১৩ খ্রী.)। কৃষ্ণনগরে তাঁর জন্ম হয়। পিতা কার্তিকেয়চন্দ্র রায় খুব ভালো গান গাইতে পারতেন। দ্বিজেন্দ্রলাল (ডি. এল. রায়) অনেক নাটক লিখে গেছেন, বহু ভালো ভালো গান রচনা করেছেন। তিনি ছিলেন

'ভারতবর্ষ'-নামক মাসিক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর ছেলে বিখ্যাত গায়ক দিলীপকুমার রায়।



॥শৈশবেই লেখাপড়ায় অসীম আগ্রহ॥

ভবানীপুরে বাড়ি। সামনের রাস্তা দিয়ে দুর্গাঠাকুর বিসর্জনের শোভাযাত্রা চলেছে। শোভাযাত্রায় কত জাঁকজমক। কত আলো, কত বাজনা। বাড়ির সকলে দোতলার জানালার ধারে দাঁড়িয়ে তাই দেখছে। সকলেই জানালা দিয়ে বাইরের শোভাযাত্রার দৃশ্য দেখছে। শুধু একজন জানালার ধারে এসে দাঁড়ায় নি। সে একটি ছেলে।

কোথায় গেল সে ? খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সে তন্ময় হয়ে একটা স্লেটের উপর কী সব দাগ কাটছে আর মুছছে। পিতা ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ। তিনি হই হই করে উঠলেন। ছেলের শরীর খুব খারাপ। কিছুদিন অন্ততঃ পড়াশুনা লেখালেখি বন্ধ। কিন্তু সে কোনরকম বারণ না শুনে অঙ্ক কষছে, জ্যামিতির রেখা আঁকছে। দুর্গাঠাকুরের বিসর্জনের শোভাযাত্রা পর্যন্ত দেখবার জন্যে যায় নি। পিতা তাকে ভর্ৎসনা করে স্লেট পেনসিল কেড়ে নিয়ে গেলেন।

এই ছেলেই 'বাংলার বাঘ' আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪ খ্রী.)। তিনি পর পর চারবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সলার হয়েছিলেন। হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি, কিছুদিনের জন্যে প্রধান বিচারপতি হন। গণিত বিদ্যায় তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ।

॥ শৈশবেই দেশসেবার সংকল্প ॥

সকালে খবরের কাগজ এলে ছেলেটি সকলের আগে সেই কাগজে চোখ বুলিয়ে নিতে চায়। কতই বা বয়স। এরই মধ্যে সে ভালোভাবে পড়তে শিখেছে। খবরের কাগজের সব খবর ঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও তার কাগজ পড়া চাই-ই। কাগজ পড়তে পড়তে সে দেখল, ব্রিটিশ-সরকার নানাভাবে ভারতবাসীদের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। সেই বয়সেই তার মনে ইংরেজদের উপর দারুণ বিতৃষ্ণা জেগে উঠল। সে ঠিক করল, বড় হয়ে দেশের কাজে লাগবে। যেমন করেই হোক ইংরেজদের এদেশ থেকে তাড়াতে হবে।

এই বালকের নাম গোপাল কৃষ্ণ গোখলে (১৮৬৬-১৯১৫ খ্রী.)। বড় হয়ে তিনি মনপ্রাণ দিয়ে দেশের কাজে নেমে পড়েন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেসের বারাণসীর অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বাঙালীদের তিনি খুব প্রশংসা করতেন।

॥ বই পড়ার দারুণ ঝোঁক ॥

সংসারে দারুণ অর্থকষ্ট। বয়স কম হলেও ছেলেটি বুঝল, কিছু উপায় করতে না পারলে চলবে না। সে অর্থ উপার্জন করার জন্যে নানা চেষ্টা করতে থাকল। অবশ্য, তারই মাঝে নিজের লেখাপড়া ঠিক ঠিক চালিয়ে যেতে থাকল। তার পিতার এক বন্ধু তাদের বাড়িতে এসেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন, বাড়ির বারান্দায় তাঁর বন্ধুর ছেলে একটা ছোট টেবিল নিয়ে বসে আছে। গ্রামের লোকে তাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, কেউ বা টাকা পাঠাবার ফরম লিখিয়ে নিচ্ছে। তাতে তার যা রোজগার হচ্ছে, সবই সে বাবা-মাকে দিচ্ছে।

ভদ্রলোকের ভারী ভালো লাগল ছেলেটিকে। তিনি তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী



বালক ম্যাকডোনাল্ডকে এক ভদ্রলোক বললেন, 'তুমি কি চাও?'

চাও আমার কাছে?' বালক ইচ্ছা করলে তাঁর কাছ থেকে কিছু অর্থ চাইতে পারত। চাইলে সে নিশ্চয়ই পেত। কারণ তিনি খুব বড় লোক, আর তার পিতার একজন হিতৈষী বন্ধু।

বালক অর্থ না চেয়ে বলল, সে তাঁর বাড়ির লাইব্রেরিতে গিয়ে নানা বই পড়তে চায়। ভদ্রলোকটির বাড়ি বেশী দূরে ছিল না। তিনি একটু হেসে বললেন, 'বেশ, যে-বই তোমার পড়তে ইচ্ছে হবে, সেই বই আলমারি থেকে নিয়ে প'ড়। ইচ্ছে করলে কোন বই বাড়িতেও নিয়ে আসতে পার।'

এই বালকের নাম র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড্ (Ramsay Macdonald, ১৮৬৬—১৯৩৭ খ্রী.)। তিনি স্কটল্যাণ্ডের লোক। তিনি ইংল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়েও অবসর সময়ে নানা বই বিশেষ করে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও রাজনীতির বই পড়তেন।

॥ নিস্পৃহ বালক ॥

পথে একটা ছোট ব্যাগ পড়ে ছিল। বালকটি সেটি কুড়িয়ে নিয়ে দেখল, তাতে অনেক নোট। কার টাকা কে জানে? হয়তো সে টাকাটা হারিয়ে ফেলে খুব ভাবছে। বালক ব্যাগটা নিয়ে পথের ধারের এক বাড়ির বারান্দায় বসে রইল। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। কেউ ব্যাগটির খোঁজ নিতে এল না। বালক কী আর করবে? ব্যাগটা নিয়ে বাড়ি চলে এল।

পরের দিন আবার সে সেইখানে গিয়ে বসল। সেদিনও কেউ ব্যাগটার খোঁজে এল না। বালক মহা ভাবনায় পড়ে গেল। তার পরের দিনও সে তেমনইভাবে ব্যাগটা হাতে নিয়ে সেখানে বসে



বালক গান্ধী প্রকৃত মালিককে তাঁর মানিব্যাগ ফেরত দিচ্ছে।

রইল। সেদিন দুপুরের কিছু আগে এক ভদ্রলোক হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনিই ব্যাগটি হারিয়ে ফেলেছিলেন। বালক তাঁর হাতে ব্যাগটি দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। ভদ্রলোক

তাড়াতাড়ি ব্যাগটি খুলে তাকে একটি নোট দিতে গেলেন। বালক নিল না। সে বলল, আপনার ব্যাগ আপনাকে ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। এতেই আমি আনন্দিত। এই আনন্দই আমার পুরস্কার। পুরস্কারস্বরূপ অর্থ চাই না।'

এই বালক জাতির জনক মহাত্মা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী (১৮৬৯-১৯৪৮ খ্রী.)। প্রধানতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় ভারত স্বাধীন হয়। তিনি ছিলেন সত্যবাদী আদর্শ কর্মপুরুষ, জাতীয় আন্দোলনের সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা।

॥ শিশুকালেই ধনীদরিদ্রের বিভেদ-মোচনের সংকল্প ॥

সম্ভ্রান্ত পরিবারের বালক হলেও সে গরীব-দুঃখীর সঙ্গে প্রাণ খুলে আলাপ করত, তাদের দুঃখদুর্দশার কথা শুনে মনে কষ্ট পেত। যখন সে দেখত, পথ দিয়ে কত জাঁকজমকের সঙ্গে বড়লোকেরা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ পথের ধারে গরীব লোকেরা শীতে কষ্ট পাচ্ছে, সেদিকে ধনী লোকদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, তখন তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠত। সে মনে মনে সংকল্প করত, বড় হয়ে এই ধরনের ধনীদরিদ্রের বিভেদ দূর করবে।

এই বালকের নাম ভ্লাডিমির ইলিইক উলইয়ানোভ (Vladimir Ilyich Ulyanov, ১৮৭০-১৯২৪ খ্রী.)। লেনিন নামেই পরিচিত। তাঁকে সোভিয়েট রাষ্ট্রের জনক বলা হয়। তিনি লাল সৈন্যের সাহায্যে অত্যাচারী জারের শাসন থেকে রাশিয়াকে মুক্ত করেন।

॥ দুর্জয় মেরু-অভিযাত্রীর ছেলেবেলার কথা ॥

সবাই যখন গল্পগুজবে মেতে আছে, তখন বালক নানা ছবিওয়ালা সাময়িক পত্রিকার উপর ঝুঁকে পড়ে তন্ময় হয়ে সময় কাটায়। খেতে ডাকলেও সহজে পত্রিকা ছেড়ে উঠতে চায় না।



বালক আমানসেন মন দিয়ে ছবি দেখছে।

একদিন বাড়ির লোকে ভাবল, দেখি তো, ওই সব পত্রিকায় ছেলেটি কি অত মন দিয়ে দেখে। তারা দেখল, ছেলেটি পাহাড়পর্বত, তুষাররাজ্য, বরফে ঢাকা সমুদ্র, বনজঙ্গল প্রভৃতির ছবিই বেশি করে দেখে। সে বলল, আমাদের দেশের উত্তর দিকে তো বরফ আর বরফ। বড় হয়ে আমি সেখানে যাব। শুধু তাই নয়, তার চেয়েও দূরে অনেক দূরে, চলে যাব।

বালকটির নাম আমানসেন (Captain Roald Amundsen ১৮৭২-১৯২৮ খ্রী.)। তিনি ছিলেন উত্তর ইউরোপের নরওয়ের লোক। তিনি হয়ে উঠেছিলেন দুর্জয় অভিযাত্রী। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের

১৬ই ডিসেম্বর তিনি দক্ষিণ মেরুকেন্দ্রে পৌছান। তিনি ১৯২৬ খ্রীষ্টাব্দে বিমানে করে উত্তর মেরুর উপর দিয়ে উড়ে যান। পরে তিনি মোবাইল অভিযাত্রীদের খুঁজতে গিয়ে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান।

॥ শৈশবে পৌরাণিক কাহিনী শোনার আগ্রহ ॥

যে বয়সে সাধারণতঃ ছেলেরা ভূতপেত্নী রাজপুত্তুর তেপান্তরের মাঠ প্রভৃতির গল্প শুনতে ভালবাসে সেই বয়সের ছেলে হলেও সে শুনতে চাইত পুরাণের গল্প, ইতিহাসের গল্প। ভারতীয় পুরাণের নানা কাহিনী তার এত ভালো লেগেছিল যে একবার শুনেই সে-সব তার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তার কেবলই মনে হত, বড় হয়ে সে পৌরাণিক কাহিনী নানাভাবে দেশের ছেলে-মেয়েদের শোনাবে।

বড় হয়ে তিনি যখন জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন তখন তাঁর সব চেয়ে বড় কাজ ছিল ছেলে-মেয়েদের পুরাণের নানা গল্প শোনানো। ছেলে-মেয়েরা তন্ময় হয়ে সেই সব কাহিনী শুনত।

তিনি ঋষি শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ (১৮৭২-১৯৫০ খ্রী.)। তিনি ছিলেন বরোদা কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় ঐ কাজ ছেড়ে দেন ও জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্লবী সন্দেহে তাঁর বিচার হয়। তিনি মুক্তি পান। পরে পণ্ডিচেরীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে আজীবন ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। তিনি অনেক ভালো ভালো বই লিখে গেছেন।

॥ ছেলেবয়স থেকেই ইংরেজকে তাড়াবার সংকল্প ॥

এত বড় দেশ ভারত। ভারত শাসন করছে সাত সমুদ্দুর তের নদীর পার থেকে এসে বিদেশী ইংরেজ। তারা দেশ শাসন করে, দেশের ধনরত্ন নানাভাবে লুঠ করে, দেশবাসীর উপর অত্যাচার করে। বালক হলেও সেই বয়সে তার মন ইংরেজ-বিদ্বেষী হয়ে উঠেছিল। সে ঠিক করেছিল বড় হয়ে দেশের কাজে লাগবে। তার প্রধান কাজ হবে যেমন করে হোক ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়ানো।

বালক বড় হয়ে দেশের কাজে লেগে গেলেন। ইংরেজদের তাড়াতে হলে অস্ত্র চাই। তাই তিনি দলবল নিয়ে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন করেন। তাঁর নাম সূর্য সেন (মৃত্যু ১৯৩৪ খ্রী.)। 'মাস্টার-দা নামেই তিনি অধিক পরিচিত। ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দে নির্মম অত্যাচারী ব্রিটিশ তাঁকে ফাঁসি দেয়।

॥ বীর রমণীর শৈশবের কথা ॥



স্কুলের কমবয়সী মেয়ে। অত্যাচারী বিদেশী ইংরেজদের কথা সে অনেকের কাছ থেকে শুনেছে। বার বার তার মনে হয়েছে, যাদের দেশ তারা অনাহারে দারিদ্র্যে দিন কাটায়, আর হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে বিদেশী ইংরেজ এসে এই দেশের উপর প্রভুত্ব করে, দেশের ধনরত্ন ছলে বলে কৌশলে লুঠ করে নিয়ে যায়। সে ক্লাসের ভালো মেয়ে ছিল। পড়ায় তার অমনোযোগ ছিল না। কিন্তু লেখাপড়া করার ফাঁকে সে ইংরেজদের এদেশ থেকে দূর করে দেবার কথা ভাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সেই সম্বন্ধে আলোচনা করে।

বড় হয়ে তিনি সূর্য সেনের দলে যোগ দেন। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের তিনি অন্যতম নায়িকা

ছিলেন। সূর্যসেনের শিষ্যা প্রীতিলতা ওয়াদেদ্দার নাম্নী এই বীর রমণী চট্টগ্রামের ইউরোপীয়ান ক্লাবের উপরে বোমা ফেলেন। সেই সময়ে পুলিসের গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। যেদিন তাঁর মৃত্যু হয়, সেদিন জানা যায়, তিনি বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন।

॥ শিশুর অসাধারণ প্রতিভা ॥

মায়ের নাম কাত্যায়নী। ছেলের পড়ার আগ্রহ দেখে বই পড়াতে বসলেন। প্রথমভাগ



মা কাত্যায়নী ছেলেকে পড়াচ্ছেন।

বইয়ের কিছুটা পড়িয়ে উঠে গেলেন। বালক উঠলো না। বইয়ের বাকী অংশ পড়া শেষ করে তবে উঠল। পিতার নাম ভূতনাথ। তাঁর কাছে বালক নূতন কোন বই চাইল। পিতা বললেন, 'প্রথমভাগ শেষ হলে অন্য বই দেব।' ছেলে বলল, ও বই তার পড়া হয়ে গেছে। পিতা বললেন, 'দেখি, কেমন পড়া হয়ে গেছে।' ছেলে গড়গড় করে আগাগোড়া বইটা মুখস্থ বলে গেল।

আশ্চর্য! এইটুকু ছেলে। কী করে সে সমগ্র বইটা পড়ে ফেলেছে। শুধু তাই নয়, সবটা তার মুখস্থ হয়ে গেছে। ছেলে তার পর শ্লেট এনে অ আ ক খ ইত্যাদি সব অক্ষর লিখে দেখাল। মা কাত্যায়নী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনলেন, দেখলেন। পিতামাতার আনন্দ আর ধরে না।

এই ছেলের নাম হরিনাথ দে (১৮৭৭-১৯১১ খ্রী.) তিনি সর্বসমেত ৩৪টি ভাষা জানতেন। প্রায় একলক্ষ টাকার পুরস্কার তিনি পেয়েছিলেন। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরীতে প্রায় ষাট হাজার বই ছিল।

॥ শৈশবে কবিতা রচনা ॥

ছোট্ট মেয়ে। কী রকম লেখাপড়া করছে, তা দেখবার জন্যে পিতা অঘোরনাথ তার লেখার খাতাটা দেখলেন। এ কী! কোথায় অঙ্ক কষা বা ইংরেজী অনুবাদ (translation) করা? এতো দেখছি, ছোট ছোট কবিতা। পিতা মন দিয়ে কবিতাগুলো পড়লেন। ভারী সুন্দর। ভাবলেন, বড় কারও লেখা। পিতা বললেন, 'কোন্ বই থেকে কোন্ কবির লেখা কবিতা কটি লিখেছ?' মেয়ে বলল, আর কারো লেখা কবিতা নয়। কবিতা কটি সে নিজেই লিখেছে। পিতা অবাক্ হয়ে গেলেন, বললেন, 'বড় হয়ে তুমি একজন উঁচু দরের কবি হবে।'

এই মেয়ে সরোজিনী নাইডু (১৮৭৯-১৯৪৯খ্রী.) বাঙালীর মেয়ে, চট্টোপাধ্যায়। নাইডু-নামে এক মাদ্রাজীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন



সরোজিনী শৈশবে কবিতা রচনা করছে।

একজন নাম-করা কবি, রাজনীতিক ও দেশকর্মী! ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেসের কানপুরের অধিবেশনে সভানেত্রী হন। 'The Bird of Time', 'The Golden Threshold', 'The Broken Wings' প্রভৃতি অনেক বই তিনি লিখে গেছেন।

॥ ক্লাসের মান রক্ষা ॥

আগেকার দিনে ভারতে অস্পৃশ্যতা ছিল খুবই প্রবল। যাদের উঁচু জাতের লোক বলা হত, তারা নীচু জাতের লোকদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশত না। তাদের ছোঁয়া জল বা অন্য খাদ্য উঁচু জাতের লোকেরা খেত না। আরো নানাভাবে তারা সমাজে অস্পৃশ্য ছিল। এখন আর অস্পৃশ্যতার তেমন বাড়াবাড়ি ভারতে নেই।

যে-সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সেই সময়ে একজন মেধাবী ছাত্র নীচু জাতের ছেলে বলে উঁচু জাতের ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে অনেক অবহেলা পেয়েছিল। স্কুলের ক্লাসে তাকে আলাদা বসতে বাধ্য করা হত। খাবার জলের ঘরে তাকে ঢুকতে দেওয়া হত না। একসঙ্গে বসে সে টিফিন পর্যন্ত খেতে পারত না।

সে-ই একদিন তার ক্লাসের মান রক্ষা করেছিল। একবার স্কুল-ইন্‌স্‌পেক্টর স্কুল পরিদর্শনে এলেন। সে যে-ক্লাসে পড়ত, সেই ক্লাসের ছেলেদের তিনি পরীক্ষা করতে এলেন। স্কুলের ছাত্ররা যারা সামনের বেঞ্চে বসেছিল তারা কেউই একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে পারল না। সবার শেষের বেঞ্চের একধারে বসেছিল সেই ছেলেটি। সে উঠে দাঁড়িয়ে ইন্সপেক্টরের প্রতিটি প্রশ্নের ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে দিল। শিক্ষক মহাশয়ের মুখ প্রসন্ন হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। উঁচু জাতের ছেলেরা বিষণ্ণ হয়ে চুপ করে বসে রইল।

এই ছেলের নাম ডঃ ভীমরাজ রামজী আম্বেদকর। তিনি বড় হয়ে আইন ব্যবসায়ে যোগ দেন। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বাধীন ভারতের আইনমন্ত্রী হন ও ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া রচনা করেন।

॥ বাল্যকালেই প্রবল ইংরেজ-বিদ্বেষ ॥

ছেলে বয়স থেকেই ইংরেজদের উপর প্রবল বিদ্বেষ। তার কেবলই মনে হয়েছে, কী অধিকারে হাজার হাজার কিলোমিটার দূর থেকে এসে এই বিদেশীরা ভারতের বুকের উপর চেপে বসেছে? একদিন সে দেখল, কয়েকজন গোরা সৈন্য একজন কুলীকে ধরে প্রহার করল। তার অপরাধ, সে ন্যায্য মজুরি চেয়েছিল। গোরা সৈন্যরা তত

মজুরি দিতে আপত্তি জানালে কুলীটি ন্যায্য মজুরি চাইতে থাকে। তাতে গোরা সৈন্যরা চটে গিয়ে তাকে মজুরি তো দিলই না, উলটে প্রহার করল। এ কী অত্যাচার! বালক সংকল্প করল, সে বড় হয়ে এই ধরনের অত্যাচারী ইংরাজদের এদেশ থেকে তাড়াবে।

এই বালকই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু (জন্ম ১৮৯৭ খ্রী.)। তিনি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হন, ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে ও ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি হন, ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করেন, বিদেশে গিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের পরিচালন ভার গ্রহণ করেন।

॥ বাষ্পচালিত এঞ্জিনের আবিষ্কারক ॥

কেটলিতে জল গরম হচ্ছে। একটি বালক লক্ষ্য করল, কেটলির উপরের ঢাকনাটা মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। কেন এইভাবে কেঁপে কেঁপে উঠছে, সে সম্বন্ধে ভাবতে ভাবতে বালক বুঝতে পারল, জল গরম হলে বাষ্পের সৃষ্টি হয়। সেই বাষ্প উপরে উঠে যাবার সময় তার ধাক্কায় ঢাকনাটি কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এই বালকের নাম জেম্স্ ওয়াট (James Watt, ১৭৩৬-১৮১৯ খ্রী.) তিনি বড় হয়ে বাষ্পচালিত এঞ্জিন আবিষ্কার করেন। গরম জল থেকে যে বাষ্প বেরোয়, তার ধাক্কা যে কিরূপ প্রচণ্ড তা বুঝতে পারা যায় বাষ্পচালিত রেলগাড়িকে লক্ষ্য করলে। রেলগাড়ির এঞ্জিন-সংলগ্ন জলাধারে জল কয়লার আগুনে উত্তপ্ত হলে যে বাষ্পের সৃষ্টি হয়, তারই জোরে রেলগাড়ি চলে। শুধু তাই নয়। বাষ্পচালিত এঞ্জিনের দ্বারা আরো অনেক উপকার সাধিত হয়ে থাকে।



আদিম যুগের মানুষ মনের আনন্দে বা ভাবের আবেগে সুর করে কথা বলত। গান বলতে বর্তমানে যা বোঝায়, তারা তা জানত না, সুর করে কথা বলত, গান গাইত না। তারা পাখির বা অন্য কোন জীবজন্তুর স্বরের অনুকরণ করত। তা-ই অনেকটা গানের মতো শোনাত।

ফিনিশিয়া, অ্যাসিরিয়া, ব্যাবিলনিয়া, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের সভ্যতা অতি প্রাচীন। কিন্তু সেই সব দেশের লোকেরা গান গাইত কিনা, তা জানা যায় না। ভারতের সভ্যতা ওই সব দেশের চেয়ে কম প্রাচীন নয়। মোহেন-জো-দরো ও হরপ্পায় প্রাপ্ত শিলালিপিতে সে-যুগের লোকেদের রচিত কোন গান পাওয়া যায় নি। তারা যে গান গাইত, তার প্রমাণস্বরূপ অনেক বাদ্যযন্ত্র পাওয়া গেছে। নৃত্যরতা রমণীর প্রতিমূর্তিও পাওয়া গেছে। তাই থেকে মনে হয়, নৃত্যের সঙ্গে গীতবাদ্যের ব্যবস্থাও ছিল।

॥ আদি গান ॥



বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম গ্রন্থ। চারি বেদের, বিশেষ করে সামবেদের স্তোত্র ঋষিদের নির্দেশে শিষ্যরা সুর করে উচ্চারণ করত। তাকে গান বলা চলে। যতদূর জানা যায়, পৃথিবীতে সেই হচ্ছে আদি গান।

অবশ্য কেবল সুর করে কথা বললেই প্রকৃত গান হয় না। লোকের গলার কম-বেশী চড়া ও খাদবিশিষ্ট আওয়াজকে তাল ও লয়ের সঙ্গে প্রকাশ করলে প্রকৃত গানের সৃষ্টি হয়।



শিষ্যরা বেদগান গাইছে

॥ স্বর ॥

মানুষের কণ্ঠস্বরকে মৃদু ও চড়া হিসাবে সাজিয়ে উচ্চারণ করলে মধুর শোনায়। এই সাজানোর সংখ্যা সাতটি। এগুলিকে বলা হয় 'স্বর'। ভারতে সাতটি স্বরের নাম হচ্ছে ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত ও নিষাদ। চলতি ভাষায় কেউ কেউ ষ-কে খ-এর মতো উচ্চারণ করেন বলে খরজ, রেখাব, নিখাদ নাম শোনা যায়। এই স্বর সাতটিকে বলা হয় স্বরসপ্তক। স্বরগুলির প্রথম অক্ষর ধরে বলা হয় সা রে গা মা পা ধা নি অথবা স র গ ম প ধ ন অথবা স র গ ম প ধ নি।

॥ শুদ্ধ ও বিকৃত স্বর ॥

৭টি শুদ্ধ ও ৫টি বিকৃত স্বর নিয়ে স্বরের সংখ্যা মোট ১২টি। ৭টি শুদ্ধ স্বরের নাম—সা রে গা মা পা ধা নি এবং ৫টি বিকৃত স্বরের নাম—রে গা মা ধা নি।

কোন স্বর একটু উঁচু বা নীচু হলেই তাকে বলে বিকৃত (বিকারগ্রস্ত) স্বর। বিকৃত স্বরের দুটি রূপ—কোমল ও তীব্র। শুদ্ধ স্বর থেকে অন্য স্বর নীচু হলে তাকে বলা হয় কোমল স্বর এবং উঁচু হলে বলা হয় তীব্র বা কড়ি স্বর। রে গা ধা নি কোমল স্বর এবং মা তীব্র বা কড়ি মধ্যম স্বর। ভাতখণ্ডে পদ্ধতিতে কোমল স্বরগুলির নীচে (—) চিহ্ন এবং তীব্র মধ্যমের উপরে (।) চিহ্ন বসানো হয়। যথা কোমল স্বর রে গা ধা নি (নীচে — চিহ্ন)

এবং তীব্র স্বর মা (উপরে । চিহ্ন)। আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে কোমল স্বরগুলির রূপ ঋ জ্ঞ দ ও ণ এবং তীব্র মধ্যম হ্ম।

॥ সংগীত ॥



সংগীত রত্নাকরে আছে —

"গীতং, বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে।"

অর্থাৎ গীত, বাদ্য ও নৃত্য তিনটির সমন্বয়কে সংগীত বলা হয়। সংগীত রত্নাকর মতে গীতের অধীন বাদ্য, বাদ্যের অধীন নৃত্য। উত্তমরূপে গান করাকেই সংগীত বলে।

॥ ভারতের দুটি প্রধান সংগীত পদ্ধতি ॥

দক্ষিণ ভারতীয় বা কর্ণাটকী সংগীত পদ্ধতি ও উত্তর ভারতীয় বা হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি—ভারতের এই দুটি প্রধান সংগীত পদ্ধতি। দুই পদ্ধতির মধ্যে মিলও আছে, আবার অমিলও আছে।

॥ শ্রুতি ॥

গীতের উপযোগী আওয়াজ যা পরস্পরের পার্থক্য-সহ স্পষ্টভাবে শ্রুতিগোচর হয়, তার নাম শ্রুতি। ভারতীয় সংগীতে শ্রুতি ২২টি—তীব্রা, কুমুদ্বতী, মন্দা, ছন্দোবতী, দয়াবতী, রঞ্জনী, রক্তিকা, রৌদ্রী, ক্রোধী, বজ্রিকা, প্রসারিণী, প্রীতি, মার্জনী, ক্ষিতি, রক্তা, সন্দীপনী, আলাপিনী, মদন্তী, রোহিণী, রম্যা, উগ্রা

ও ক্ষোভিনী। উপরে যে নামগুলি দেওয়া হল তা সংগীত রত্নাকরোক্ত। 'সংগীত দামোদর', 'সংগীত ভাষ্য' প্রভৃতি গ্রন্থে শ্রুতির অন্য নাম দেখা যায়।

॥ নাদ বা ধ্বনি ॥

লোচন-বিরচিত 'রাগতরঙ্গিণী' গ্রন্থে বলা হয়েছে, নাদ ব্যতীত স্বরের উৎপত্তি হতে পারে না। সংগীতোপযোগী মধুর স্বর যা স্থির ও নিয়মিত আন্দোলন দ্বারা সৃষ্ট হয়, তারই নাম নাদ বা ধ্বনি। নাদ দু' প্রকার—আহত নাদ ও অনাহত নাদ।

॥ আরোহ ॥



স্বরগুলি ক্রমশ উপরের দিকে উঠতে থাকলে তাকে 'আরোহ' বলে। আরোহকালে স্বরসমূহের গতি হয় মন্দ্র থেকে মধ্য অথবা মধ্য থেকে তার সপ্তকের দিকে। ভিন্ন ভিন্ন রাগের আরোহে ৫টি, ৬টি বা ৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়।

॥ অবরোহ ॥

উপর থেকে নিম্নাভিমুখে স্বরের নামার নাম অবরোহ। অবরোহে স্বরের গতি হয় তার সপ্তক থেকে মধ্য সপ্তক অথবা মধ্য সপ্তক থেকে মন্দ্র সপ্তকের দিকে।

॥ ঠাট ॥

এক সপ্তকের ১২টি স্বরের মধ্যে ৭টি স্বরের ক্রমিক রচনার নাম ঠাট বা থাট। ঠাটে ৭টি স্বর থাকবেই। ঠাট ১০ প্রকার—কল্যাণ, বিলাবল, খাম্বাজ, ভৈরব, পূর্বী, মারোয়া, কাফী, আশাবরী, ভৈরবী ও তোড়ী। দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যাঙ্কটমখীর মতে ঠাট ৭২টি। হিন্দুস্থানী সংগীতে ঠাট ৩২টি হলেও সুবিধার জন্যে ১০টি ঠাট ধরা হয়।

॥ বাদী ॥

যে স্বরটির প্রাধান্য রাগে সব চেয়ে বেশী, যার ঠিক ঠিক প্রয়োগ না হলে রাগের যথার্থ রূপের প্রকাশ ঘটে না, সেই স্বরটিকে বলা হয় 'বাদী' স্বর।

॥ সম্বাদী ॥

বাদীর চেয়ে যে স্বরের কিছু কম প্রয়োগ হয় তার নাম 'সম্বাদী' স্বর।

॥ অনুবাদী ॥

বাদী ও সম্বাদী স্বরের চেয়ে যে স্বরের প্রয়োগ কম হয় তার নাম 'অনুবাদী' স্বর।

॥ বিবাদী ॥

যে স্বর ব্যবহার করলে রাগের রূপের বিকৃতি ঘটে তার নাম 'বিবাদী' বা 'বর্জিত' স্বর। অনেক সময়ে কুশলতার সঙ্গে বিবাদী স্বরের প্রয়োগে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি হয়ে থাকে।

॥ ন্যাস ॥

যে স্বর দিয়ে রাগ সমাপ্ত হয় তার নাম 'ন্যাস'।

॥ অংশ ॥

বাদী স্বরের মতো যে স্বরটি আজকাল বেশী ব্যবহৃত হয় তার নাম 'অংশ' স্বর।

॥ গ্রহ ॥

গান বাজনা শুরু হওয়ার সময়ের স্বরকে বলা হয় 'গ্রহ' স্বর।

॥ পকড় ॥

কম বেশী স্বরসমষ্টি যা রাগ নির্ণয়ের সহায়ক বা যার দ্বারা রাগরূপ সুস্পষ্ট হয় তার নাম 'পকড়'।

॥ স্পর্শস্বর ॥

কোন একটি স্বর উচ্চারণ করবার সময় আগে বা পরে অপর কোন স্বরকে স্পর্শ করলে যে স্বর স্পর্শ করে তাকে বলে 'স্পর্শস্বর'।

যেমন—পা
সাঁ সাঁ নি সাঁ রেঁ

॥ বক্রস্বর ॥

যে স্বর বা স্বরগুলিকে কোন রাগে সরলভাবে ব্যবহার না করে ঘুরিয়ে ব্যবহার করা হয় তার বা তাদের নাম 'বক্রস্বর'।

॥ জনক ঠাট ॥

যে-সব ঠাট থেকে রাগ উৎপন্ন হয় তাদের নাম 'জনক' ঠাট। সব ঠাট রাগ উৎপাদক নয়।

॥ জন্য রাগ ॥

প্রতিটি রাগ কোন না কোন ঠাট থেকে উৎপন্ন। এরূপ রাগ 'জন্য' রাগ।



॥ রাগ ॥

যে স্বর রচনা মানুষের মনোরঞ্জন করে, তার নাম 'রাগ'।

॥ রাগের জাতি ॥

রাগের মুখ্য তিনটি জাতি—ঔড়ব, ষাড়ব ও সম্পূর্ণ। ঔড়বে ৫টি, ষাড়বে ৬টি ও সম্পূর্ণ জাতিতে ৭টি স্বর ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

॥ গীতের বিভাগ ॥

গীতের বা গতের চারিটি বিভাগ—স্থায়ী বা অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

চারিটি বিভাগের মধ্যে স্থায়ী অংশের প্রাধান্য সব চেয়ে বেশী। সঞ্চারী বাদে অন্তরা ও আভোগ অংশ সমাপনের শেষে আবার স্থায়ী অংশে প্রত্যাবর্তন করা হয়। স্থায়ী অংশের চলন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উদারা (মন্দ্র সপ্তক) ও মুদারার (মধ্য সপ্তকের) মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

গীত বা গতের দ্বিতীয়াংশের নাম অন্তরা। মুদারা (মধ্য সপ্তক) ও তারার (তার সপ্তকের) মধ্যেই সাধারণতঃ অন্তরা সীমাবদ্ধ থাকে।

গীত বা গতের তৃতীয় ভাগের নাম সঞ্চারী। মন্দ্র ও মধ্য সপ্তকে সঞ্চারীর গতিবিধি।

গীত বা গতের চতুর্থ বিভাগের নাম আভোগ। অন্তরার মতোই আভোগের গতিবিধি।

স্থায়ী বা অস্থায়ী

বর্ষা এল হর্ষভরে,
ধরার বুকে বৃষ্টি ঝরে।

অন্তরা

লতায় ঝরে, পাতায় ঝরে,
ঝরে দূরের মাঠের 'পরে,
আকাশ-ভাঙ্গা বন্যা-ধারায়
মরা নদীর বুকটি ভরে।

সঞ্চারী

জুঁই কেতকী গন্ধ বিলায়,
নাচে শিখী কদম-শাখায়।

আভোগ

বর্ষা তার স্পর্শ দিয়া
স্নিগ্ধ করে ধরার হিয়া,
ঝর ঝর বর্ষা-ধারায়
ভাবুক মন আকুল করে।

॥ আলাপ ॥

রাগ গাইবার ভূমিকাকে বলে আলাপ।

॥ তান ॥

তান কথাটির অর্থ স্বরবিস্তারকরণ। প্রধানতঃ

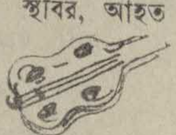
খেয়াল গানেই তানের ব্যবহার হয়ে থাকে। মতঙ্গ বলেন, স্বরের আরোহণ-ক্রমের নাম মূর্ছনা ও অবরোহণ-ক্রমের নাম তান।

॥ মিড় ॥

এক স্বর থেকে ক্রমে এক বা একাধিক স্বরে উচ্চ বা নিম্নস্বরে কোমল ভাবে আরোহণ বা অবরোহণের নাম মিড় বা মীড়। তানপুরার তারে ঘা দিয়ে কানে পাক দিলে যে ধ্বনি ক্রমশঃ উচ্চ বা নীচু হয়, তাই-ই মিড়ের আওয়াজ। রবীন্দ্রসংগীতে মিড় খুব বেশী দেওয়া হয়েছে।

॥ গমক ॥

স্বরের কম্পনকে বলে গমক ('স্বরস্য কম্পো গমকঃ'—সংগীত রত্নাকর)। গমক সাত প্রকার—কম্পিত, স্ফুরিত, লীন, ভিন্ন, স্থবির, আহত ও আন্দোলিত।



॥ মূর্ছনা ॥

সংগীতে স্বরগ্রামের আরোহণ বা অবরোহণের ক্রমকে বলে মূর্ছনা। আধুনিক সংগীতজ্ঞগণ কোন সুর থেকে অবিচ্ছেদগতিতে সুরান্তরে প্রবেশ করাকে মূর্ছনা বলেন। মৃদঙ্গবাদ্যে পরণ শেষ করার বোলকে বলা হয় মূর্ছন বা মূর্ছনা।

॥ আশ ॥

গানের একটি বর্ণে পর পর দুই তিন সুরের যোগের নাম আশ। কোন সারিকায় তার চেপে আঘাত করবার পর আঘাতের অনুরণন থাকতে থাকতে বাঁ হাতের আঙুলের ঘর্ষণযোগে এক বা একাধিক সুরে ক্রমান্বয়ে যাওয়ার নাম 'আশ' বা ঘর্ষণ।

॥ আশ্রয় রাগ ॥

যে রাগের নামানুযায়ী ঠাটের নামকরণ হয়েছে সেই বিশেষ রাগটিকে বলা হয় সেই ঠাটের আশ্রয় রাগ।

॥ গীতের প্রাচীন প্রকার ॥

প্রাচীন কালে তালবদ্ধ গানকে বলা হত নিবদ্ধ গান, তালছাড়া ভাবে যে-সব গান গাওয়া হত সেগুলিকে বলা হত অনিবদ্ধ গান।

॥ রাগের প্রকার ॥

রাগের সংখ্যা অনেক। সব রাগ তেমন প্রচলিত নয়।

রাগ প্রথমে ছিল ৬টি। মহাদেবের পাঁচটি মুখ থেকে বেরিয়েছিল পাঁচটি রাগ—শ্রী, বসন্ত, ভৈরব, পঞ্চম ও মেঘ। পরে পার্বতীর মুখ থেকে বেরোয় নট-নারায়ণ। এই ছয় রাগের আবার ছত্রিশটা রাগিণীর সৃষ্টি হয়। কিন্তু ভাতখণ্ডে বলেন, প্রাচীন রাগরাগিণী পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক। সব কিছুই রাগ। রাগিণী নাম বর্তমানে অচল।

রাগসমূহের নাম:—আড়ানা, আলাইয়া বিলাবল, আশাবরী, ইমন, কলিঙ্গ বা কালিংড়া, কর্ণাট, কল্যাণ, কাফী, কানাড়া, কামোদ, খাম্বাজ, খম্বাবতী, গুর্জরী, গৌরী, গৌড়সারঙ্গ, গৌড় মল্লার, ছায়ানট, জয়জয়ন্তী, জৌনপুরী, ঝিঁঝিট বা ঝিঁঝোটি, তিলককামোদ, তিলঙ্গ, তোড়ী, দরবারী কানাড়া, দুর্গা, দেশ, দেশকার, দেশী, ধনাশ্রী, পরজ, পূরবী বা পূর্বী, পিলু, বাহার, বসন্ত, বিলাবল, বেহাগ, বাগেশ্বরী, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, ভীমপলাশী বা ভীমপলশ্রী, ভূপালী, ভৈরব, ভৈরবী, মল্লার, মারবা বা মারোয়া, মালকোশ, মালগুঞ্জী, মুলতানী, রাগেশ্বরী, রামকেলী, ললিত, শংকরা, শ্যাম, শ্রী, সারঙ্গ, সুঘরাই, সুরমল্লার, সৈন্ধবী, সোহনী, হাম্বির, হিন্দোল, হেম কল্যাণ, কেদার, ককুভা, পাহাড়ী,



শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত চিত্র—শ্বেত ময়ূর

শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথের আঁকা চিত্র 'শ্বেতময়ূর

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুজ গিরীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র গুণেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ পুত্র আচার্য অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১ খ্রী.) ভারতের শিল্পগুরু। তিনি ছিলেন একজন প্রথিতযশা সাহিত্যিক। অগণিত ভাবসমৃদ্ধ ও সুমধুর গ্রন্থ রচনা করে তিনি অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর প্রকৃত পরিচয় তিনি একজন অপরিসীম নৈপুণ্যের অধিকারী চিত্রশিল্পী। বহু খ্যাতনামা শিল্পী তাঁর শিষ্য। সারা জীবন ধরে তিনি যে কত ছবি এঁকেছেন তা বলে শেষ করা যায় না।

তাঁর আঁকা 'জেবউন্নিসা', 'নির্বাসিত যক্ষ', 'সাজাহানের মৃত্যু,' 'বুদ্ধ ও সুজাতা,' 'কচ ও দেবযানী', 'ওমর খৈয়াম', 'ভারতমাতা' প্রভৃতি চিত্র সুপ্রসিদ্ধ।

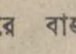
'শ্বেতময়ূর' চিত্রটি দেশে বিদেশে অপূর্ব প্রশংসা অর্জন করেছে। লেখক চিত্রকর, অভিনেতা, কথক, ভাবুক অবনীন্দ্রনাথের চিত্র-ঐশ্বর্য পৃথিবীর সকল গুণী-মহলে বিপুলভাবে সমাদৃত।

গুণকেলী, পটমঞ্জরী, মেঘ, বিলাসখানি তোড়ী প্রভৃতি। আবার কানাড়া, মল্লার ও সারঙ্গ বহু প্রকার।

॥ পূর্বরাগ ও উত্তররাগ ॥

দুপুর ১২টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত সময়কে বলা হয় পূর্বাঙ্গ এবং রাত ১২টা থেকে দিন ১২টা পর্যন্ত সময় উত্তরাঙ্গ। পূর্বাঙ্গে গেয় রাগগুলি পূর্ব-রাগ ও উত্তরাঙ্গে গেয় রাগগুলি উত্তররাগ।

॥ তাল ॥



গীত, বাদ্য বা নৃত্যের গতি তথা লয়ের স্থিতি নির্ধারণ করাকে বলে 'তাল'।

॥ মাত্রা ॥

একটি সম্পূর্ণ তালকে সমান ভাগে ভাগ করলে প্রত্যেকটি ভাগকে বলা হয় মাত্রা।

॥ লয় ॥

সংগীতের গতিকে বলা হয় লয়। লয় তিন রকম —বিলম্বিত, মধ্য ও দ্রুত। অবশ্য লয়কে একের বেশী ভাগে বিভক্ত করা যায়—অতি বিলম্বিত, দুই গুণ, তিনগুণ, চারগুণ, আটগুণ ইত্যাদি।

॥ সম্ ॥

যেখান থেকে তালের যাত্রা শুরু সেই স্থানটিকে বলা হয় 'সম্'। সাধারণতঃ তালের প্রথম মাত্রাকে সম্ বলে। বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন দ্বারা সমকে বোঝানো হয়। যেমন '×' '+' '১' '২' ইত্যাদি।

॥ তালি ॥

তালের যেখানে যেখানে ঝোঁক পড়ে, সেই স্থানগুলি হাতে তালি দিয়ে দেখানো হয়ে থাকে। সমসহ সেই স্থানকে বলা হয় তালি।

॥ ফাঁক বা খালি ॥

তালের যে স্থানে তালের আঘাত (beat) দেওয়া হয় না, তবলার 'তা', 'তি', 'তিন্', বোল বাজানো হয়, সেই স্থানকে বলা হয় ফাঁক বা খালি। শূন্য (০) চিহ্ন দ্বারা খালির স্থান নির্দেশ করা হয়। রবীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত তালসমূহে কোন ফাঁক বা খালি থাকে না।

॥ ঠেকা ॥

প্রয়োজনবোধে তবলার কিছু বর্ণকে ছন্দোবদ্ধ-ভাবে নির্দিষ্ট মাত্রাবিভাগ সহকারে বাজানোকে ঠেকা দেওয়া বলে।

॥ তালের প্রকার ॥

তাল নানা প্রকার—দাদরা, রূপক, তীব্রা বা তেওড়া, কাহারবা, ঝাঁপতাল, সুরফাঁকতাল, একতাল, চৌতাল, আড়াচৌতাল, ধামার, ত্রিতাল।

॥ রাবীন্দ্রিক তাল ॥

ঝম্পক, অর্ধঝাঁপ, ষষ্ঠী, রূপকড়া, নবতাল, একাদশী, নবপঞ্চতাল।

॥ জোড় ॥

বাদ্যযন্ত্রাদিতে আলাপ অংশে যে তান ব্যবহার করা হয় তাকে বলা হয় জোড়।

॥ ঝালা ॥

নায়কী বা নায়কীর পাশের তারে সুরসৃজনের সঙ্গে সঙ্গে চিকারী বা তার পাশের তারে নানা লয়ে বা ছন্দে আঘাত করলে যে সুরমণ্ডলের সৃষ্টি হয় তার নাম ঝালা বা ঝংকার।

॥ কম্পন ॥

তন্ত্রবাদ্যের তারে আঘাত দিলে যে অনুরণন হয় তার নাম কম্পন বা আন্দোলন। আন্দোলনের চারটি প্রকার—স্থির, অস্থির, নিয়মিত ও অনিয়মিত।

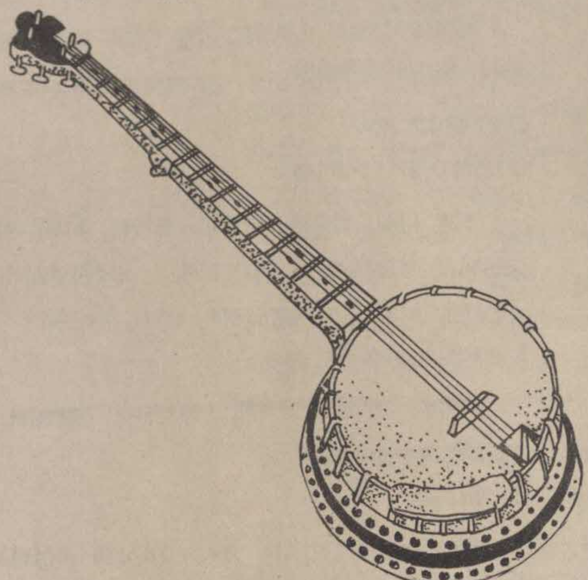
॥ বর্ণ ॥

গান গাইবার রীতির নাম বর্ণ। বর্ণ চারপ্রকার—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী ও সঞ্চারী।



॥ বাদ্যযন্ত্র ॥

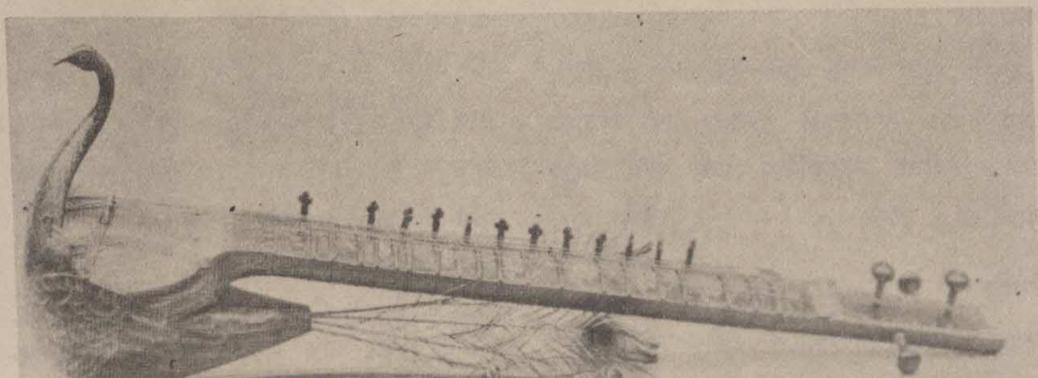
তানপুরা, এস্‌রাজ, দিলরুবা, পাখোয়াজ, তবলা, বাঁয়া, একতারা, আনন্দলহরী, খোল, গীটার, বীণা, সেতার, ময়ূরী, ঢোলক, মাদল, করতাল, ঝাঁজর, মন্দিরা, নাকাড়া, খঞ্জনী, বাঁশি, সানাই, রণশিঙা, তূরী, ভেরী, বিউগল, দোতারা, ডুগডুগি, সুরবাহার, জাইলোফোন, সরোদ, রবাব, সারেঙ্গী, সারিঙ্গা, অর্গ্যান, পিয়ানো, হারমোনিয়াম, গেকিন, স্যামিসেন, হার্প, সিথারা, লায়ার, বেহালা, চেলো, ম্যাণ্ডোলিন, ব্যান্‌জো, হার্পসিকর্ড, ইউকুলেলে, পিকলো বা, পিকলু ওবো, কর্নেট, ব্যাসুন, ক্ল্যারিওনেট, ট্রাম্পেট, টিউবা, স্যাক্সোফোন, টমটম, বঙ্গো, কেটলড্রাম, রামশিঙা প্রভৃতি বহু রকম বাদ্যযন্ত্র সারা পৃথিবীতে প্রচলিত।



ব্যান্‌জো



বাঁ দিকের জাপানী মহিলা গেকিন (Gekkin) এবং ডান দিকের মহিলা স্যামিসেন (Samisen) বাজাচ্ছেন



ময়ূরী



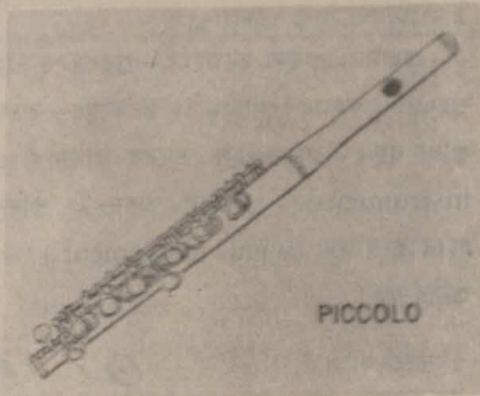
বর্মীদের জাইলোফোন



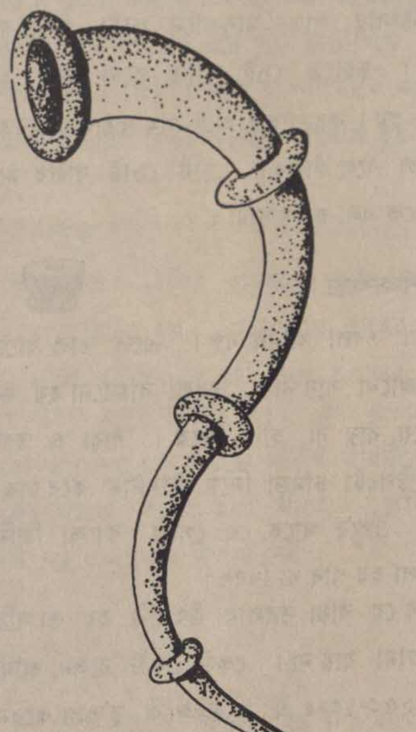
সুমেরীয় হার্প



হার্পসিকর্ড



পিকলো বা পিকলু



রামশিঙা

॥ বাদ্যযন্ত্রের প্রকার ॥

প্রধানতঃ বাজনা দুরকমের—সুরযন্ত্র ও তালযন্ত্র। সুরযন্ত্রও আবার মোটামুটি দুরকমের—ততযন্ত্র ও শুষির যন্ত্র। ততযন্ত্র হল তারের বাজনা (string instruments)। সেতার ততযন্ত্র। শুষির যন্ত্র হাওয়ার বাজনা (wind instruments)। বাঁশি শুষির যন্ত্র।

॥ তালযন্ত্র ॥



তালযন্ত্র দুরকম—অবনদ্ধ বা আনদ্ধ যন্ত্র ও ঘনযন্ত্র। ঢোল অবনদ্ধ বা আনদ্ধ যন্ত্র। এই যন্ত্র চামড়া দিয়ে ছাওয়া হয়। করতাল ঘনযন্ত্র। এই যন্ত্র দুটো ধাতুর জিনিস—ঠুকে বাজানো হয়। দুটো গোল কাঁসার পাত, মাঝখানে ফুটো করে দড়ি পরানো। দুহাতে সেই পাত দুটো ঠুকে ঠুকে বাজাতে হয়। করতালের অন্য নাম খর্তাল। করতাল বড় হলে বলে ঝাঁজর। ছোট ছোট বাটির মতো হলে তাকে বলা হয় মন্দিরা।

॥ আনদ্ধযন্ত্র ॥



বাঁয়া তবলা আনদ্ধ যন্ত্র। এতে তাল বাজে। সুর বাজানো যায় না। তবলা বাজানো হয় ডান হাত দিয়ে, বাঁয় বাঁ হাত দিয়ে। বাঁয়া ও তবলা দুইয়ের উপরটা চামড়া দিয়ে টানটান করে ঢাকা। চামড়ার উপরে থাকে যে গোল কালো জিনিস তাকে বলা হয় গাব বা খিরণ।

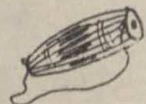
কবে যে বাঁয়া তবলার উৎপত্তি হয় তা সঠিক ভাবে জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, আমীর খসরু (১২৫৩-১৩২৫ খ্রী.) মৃদঙ্গকে দু'ভাগ করেন। তিনি ডান হাতে বাজানোর উপযোগী করে তবলা বা দাহিনার সৃষ্টি করেন এবং বাঁ হাতে বাজানোর উপযোগী করে বাঁয়া বা ডুগীর সৃষ্টি করেন। বাঁয়া তবলা সংগীতে তালরক্ষা অর্থাৎ সংগতে একান্ত অপরিহার্য।

তবলার খোল হয় কাঠের। উপরিভাগ টানটান করে চামড়ায় ছাওয়া। বাঁয়ার খোল হয় তামা, পিতল বা মাটির। মাটির বাঁয়ারই চলন বেশী।

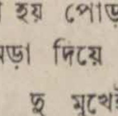
॥ পাখোয়াজ ॥

পাখোয়াজ অতি পুরাতন বাদ্যযন্ত্র। প্রাচীন কালে এর নাম ছিল পুষ্কর। ঋগ্বেদে এর উল্লেখ আছে। শাস্ত্রীয় সংগীতে ধ্রুপদ, ধামার প্রভৃতি গানের সঙ্গে পাখোয়াজের সাহায্যে সংগত করা হয়। বাঁয়া ও তবলার সংযুক্ত রূপের ন্যায়ই পাখোয়াজের আকৃতি। এর খোল হয় কাঠের, দুই মুখই চামড়ায় ঢাকা। বাঁয়ার ন্যায় অংশে চামড়ার উপর পুরু করে ময়দা লাগিয়ে বাজানো হয়। খোলকে মৃদঙ্গ বলে। পাখোয়াজও এক ধরনের মৃদঙ্গ। পাখোয়াজের বাঁ মুখটা ডান মুখের দেড়গুণ বড় হয়।

॥ শ্রীখোল ॥



খোলের বা শ্রীখোলের আর এক নাম মৃদঙ্গ। খোলের সম্পূর্ণ কাঠামোটাই তৈরী হয় পোড়া মাটি দিয়ে। বাঁ ও ডান দুই মুখই চামড়া দিয়ে ঢাকা। বাঁ মুখ ডান মুখের চেয়ে বড়। দু মুখেই গাব লাগানো থাকে। তবলার মতো খোলে বাঁধাবাঁধির ব্যাপার নেই। প্রধানতঃ কীর্তন ও ভক্তিমূলক সংগীতে খোল বাজানো হয়।



॥ ঢাক ॥

ঢাক মাটির উপরে রেখে বা কাঁধে ঝুলিয়ে রেখে দুটো কাঠি দিয়ে একমুখ পিটিয়ে বাজানো হয়। শুদ্ধ কথায় ঢাককে বলা হয় ঢক্কা।

॥ ঢোল ॥

ঢোল গলায় ঝুলিয়ে বাজানো হয়। ঢোলের দু মুখ প্রায়ই সমান। ছোট ঢোলের নাম ঢোলক। সাঁওতালেরা যে মাদল বাজায় তা-ও একধরনের ঢোল। দু'মুখওয়ালা বড় ঢাককে বলা হয় নাকাড়া বা নাগরা।

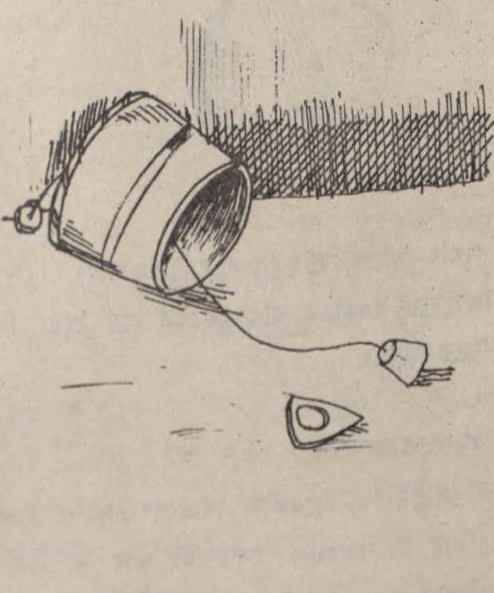


॥ ডমরু ॥

ডমরু এক ধরনের আনদ্ধ যন্ত্র। ডমরু মহাদেবের বাদ্যযন্ত্র। সাধারণতঃ আজকাল যারা পথে বাঁদর বা ভালুক খেলা দেখায় তারা ডমরু বাজায়। সেই ডমরুকে বলা হয় ডুগডুগি। এর পেটটা সরু। সেটা ধরে নাড়লে দুপাশের দুটো দড়ির গাঁট দু'মুখের চামড়ায় লেগে ডুগডুগ আওয়াজ হয়।

॥ আনন্দলহরী ॥

যার নাম খমক তাকেই বলা হয় আনন্দলহরী বা গুবগুবি। একটা কাঠের খোলের নীচের দিক্ চামড়ায় ঢাকা থাকে। উপর দিক্ খোলা থাকে। চামড়ার ঢাকা অংশের ঠিক মাঝখানের ছিদ্রে একটি তন্তু বা জন্তুর শুকনো নাড়ী প্রবেশ করানো থাকে। তন্তুর অন্য দিকে থাকে একটি কাঠের চোঙ বা ভাঁড়। আনন্দলহরী যন্ত্রটি বাঁ বগলে চেপে ধরে ডান হাত দিয়ে একটা কাঠের টুকরো দিয়ে তন্তুটিতে আঘাত করতে হয়। তন্তুটির মাথায় বাঁধা ভাঁড় বা চোঙ বাঁ হাতের মুঠো দিয়ে চেপে ধরে রাখতে হয় যাতে তন্তুটি সোজা টানটান অবস্থায় থাকে।



আনন্দলহরী



॥ খঞ্জনি ॥

খঞ্জনি একটা কাঠের রিং-এর একপিঠ চামড়া দিয়ে ছাওয়া। যন্ত্রটি বাঁ হাতে ধরে ডান হাত দিয়ে চাপড়ে বাজাতে হয়। রিংটার সঙ্গে আলগাভাবে লাগানো টিনের চাকতিগুলি থেকে ঝনঝন আওয়াজ হয়।

॥ তানপুরা ॥

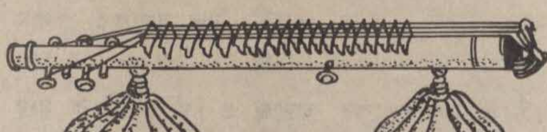
কণ্ঠসংগীত বা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তানপুরা বা তম্বুরা বাজানো হয়। তানপুরায় তারের সংখ্যা মাত্র চারটি ১ম তারটি মন্দ্র সপ্তকের পঞ্চম (রাগবিশেষে মধ্যম বা নিষাদ)। ২য় ও ৩য় তার দুটিকে মধ্য সপ্তকের ষড়জে ও ৪র্থ তারটিকে মন্দ্র সপ্তকের ষড়জে বাঁধা হয়ে থাকে। তানপুরায় সাতটি স্বর বাজানোর উপায় নেই।

॥ বীণা বা বীন ॥

সব চেয়ে পুরনো তারের যন্ত্র বীণা বা বীণ। মা সরস্বতী বীণা বাজান বলে তাঁর এক নাম বীণাপাণি। নারদমুনি বীণা বাজিয়ে হরিনাম প্রচার করতেন। বীণায় আজকাল সাতটি তার থাকে। বীণা দেখতে বড় সেতারের মতো।



তানপুরা

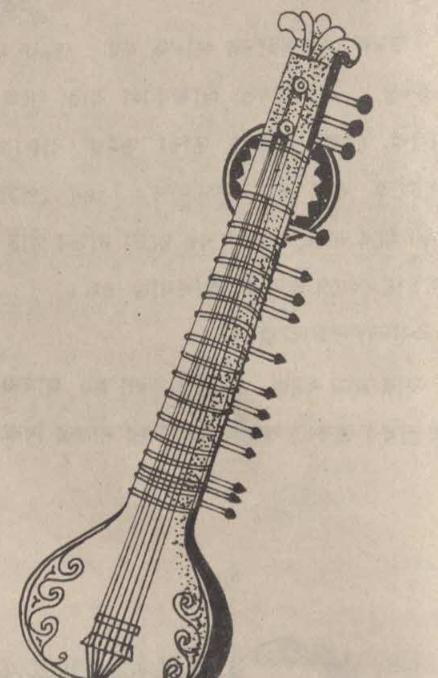


বীণা



॥ সেতার ॥

সেতারে বর্তমানে সাতটি তার থাকে। আগে আমীর খসরু তিনটি তার লাগাবার ব্যবস্থা করেন। ফারসী ভাষায় 'সেহ্' মানে তিন। তাই থেকে সেতার নাম হয়। শাহ্ সদারঙ্গ্ সেতারে আরও তিনটি তার যোগ করেন। তারের সংখ্যা বাড়লেও 'সেতার' নামটি রয়ে গেছে। মিজরাব বা তারের টুপি ডান হাতের আঙুলে লাগিয়ে তারে আঘাত করে আওয়াজ তুলতে হয়। বাঁ হাতের আঙুল তারের উপর চালিয়ে সুর তোলা হয়। কোন কোন ধরনের সেতারে ৭টা তার ছাড়া ৯টা বা ১১টা বা ১৫টা তার পাশের দিকে লাগানো হয়। সেই ধরনের সেতারের নাম তরফদার

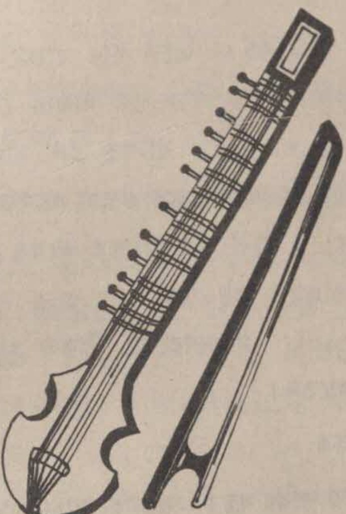


সেতার

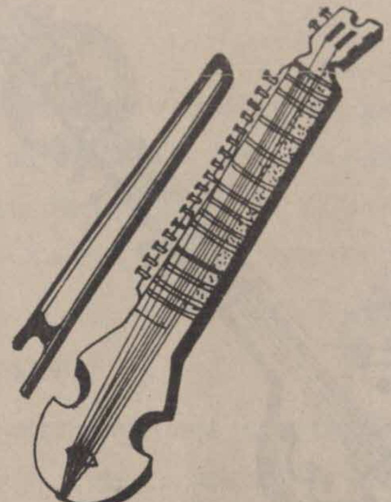
(অর্থাৎ পাশে তার-লাগানো) সেতার। সেতার বাজানোয় বর্তমানে রবিশংকরের নাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে।

॥ এস্‌রাজ ॥

সেতার ও সারেঙ্গীর মিশ্রণে এস্রাজ তৈরী। এর ঘাট বা পর্দাগুলি সেতারের ন্যায় ও নিম্নাংশ সারেঙ্গীর মতো চামড়ায় ছাওয়া। এস্রাজ সারেঙ্গীর



এস্রাজ



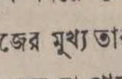
দিলরুবা

ন্যায় ডান হাতে ছড়ি (bow) টেনে ও বাঁ হাতের আঙুলের সাহায্যে বাজানো হয়। এই ছড়ি বা ছড় হয় ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে তৈরী। এর আকার লম্বা আকারের। এস্রাজের মুখ্য তার চারটি। এই চারটি তার ছাড়া ১৫টি তরফ বা পাশের তার থাকে।

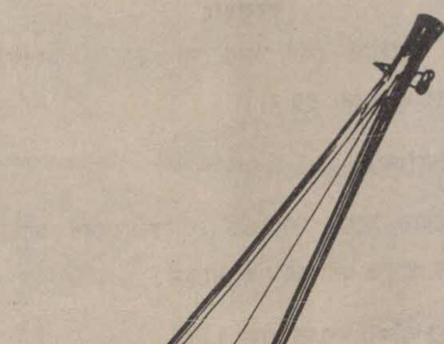
॥ দিলরুবা ॥

বড় আকারের ও উন্নত সংস্করণের এস্রাজের নাম দিলরুবা। দিলরুবার তরফের তার সংখ্যা এস্রাজ থেকে বেশী। দিলরুবার ফিঙ্গারবোর্ডের অংশটি এস্রাজের ফিঙ্গারবোর্ডের চেয়ে বেশী চওড়া। দিলরুবার স্বর এসরাজের চেয়ে বেশী গম্ভীর।

॥ একতারা ॥



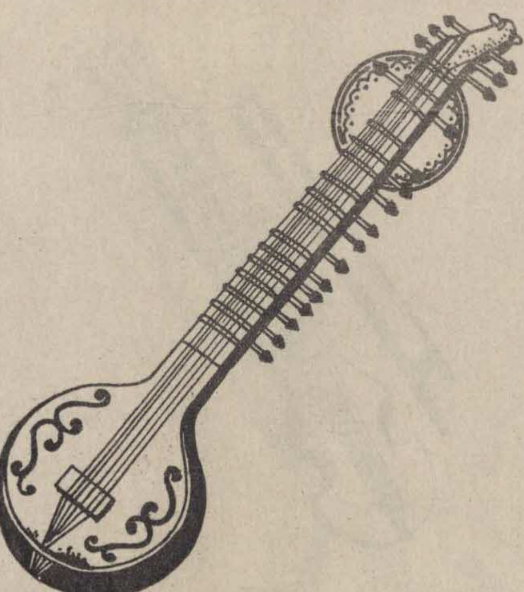
একটি চামড়ায় ঢাকা লাউয়ের খোলের দুদিকে একটি লম্বা কাঠ বা বাঁশের দণ্ড লাগানো থাকে। সাধারণতঃ লোকগীতির শিল্পীরা একতারা বাজিয়ে গান করে থাকেন।



একতারা

॥ সুরবাহার ॥

সুরবাহার একধরনের বড় সেতার। এতে



সুরবাহার

রাগের আলাপ বেশী বাজানো হয়। সাধারণতঃ এতে গৎ বাজানো হয় না।

॥ স্বরোদ ॥

স্বরোদ যন্ত্রের তার ৬টি। তিমিরবরণ স্বরোদ বাজিয়ে প্রভূত যশ অর্জন করেছেন।

॥ রুদ্রবীণা বা রবাব ॥

রুদ্রবীণা বা রবাবে তার ৬টি। গড়ন দেখে কোন্‌টি স্বরোদ, কোন্‌টি রবাব তা চেনা যায়।

॥ সারেঙ্গী ও সারিঙ্গা ॥

সারেঙ্গী ও সারিঙ্গা ছড় দিয়ে বাজাতে হয়। এ সবের তলাকার খোলটার ধার কাটা—সমান গোল নয়, এস্রাজের মতো। সারেঙ্গী ও সারিঙ্গার সব তার তাঁতের অর্থাৎ জন্তুর শুকনো নাড়ী দিয়ে তৈরী। সারেঙ্গীতে চারটে আসল তার থাকে। ১৫টি থাকে পাশের তার। সারিঙ্গায় থাকে মাত্র তিনটি আসল তার।

॥ বাঁশি ॥

বাঁশি শুষির যন্ত্র। এতে গান বাজানো যায়। ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় বলে যে বাজায় সে আর গাইতে পারে না। যে বাঁশির এক মাথায় ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় তাকে বলে সোজা বা সরল বাঁশি (flageolet)। যে বাঁশির পাশের দিকের ফুটোতে ফুঁ দিয়ে বাজাতে হয় তার নাম আড় বাঁশি বা মুরলী (flute)। মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ মুরলী বা বাঁশরী বাজাতেন।

॥ সানাই ॥

সানাইও শুষির যন্ত্র। সানাই সাধারণতঃ বিয়ে বাড়িতে বাজানো হয়। একটা শুধু পোঁ ধরেই থাকে, আর একটাতে গানের সুর বাজে।

॥ হারমোনিয়াম ॥



হারমোনিয়াম বিদেশী বাজনা। কিন্তু এদেশের সর্বত্রই প্রচলিত। হারমোনিয়ামে যেগুলি টিপে টিপে বাজাতে হয়, সেগুলিকে বলা হয় পর্দা। পর্দার কতক সাদা, কতক কালো। সাদাগুলি পর পর হল সা রে গা মা পা ধা ও নি। সা থেকে তার আগের বা পরের সপ্তকের সা পর্যন্ত আটটি স্বর বা পর্দার নাম অষ্টক অথবা অক্টেভ। এক এক অষ্টক বা অক্টেভের মধ্যে অতিরিক্ত পাঁচটা করে কালো পর্দা আছে। এর ফলে প্রতিটি অষ্টকে বা অক্টেভে মোটের উপর ১২টা স্বর।

প্রথমে নীচু বা খাদ (মন্দ্র) এক সপ্তক, তারপর মাঝারি (মধ্য) এক সপ্তক, তারপর চড়া (তার) এক সপ্তক শব্দ বাজে।

সা রে গা মা পা ধা নি—এই সাতটিকে শুদ্ধ স্বর বলা হয়। অন্য পাঁচটিকে বলা হয় বিকৃত স্বর। সা ও রে স্বরের মধ্যকারটা হচ্ছে একটু নীচু রে,

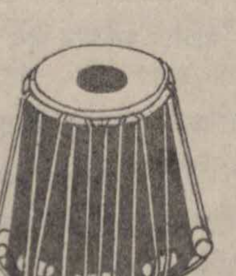
তাই তার নাম 'কোমল রে'। তার পরেরটা কোমল গা'। 'মা' ও 'পা'র মধ্যকার স্বরের নাম তীব্র বা কড়ি মা—কড়ি মধ্যম। তার পরের দুটো 'কোমল ধা' ও 'কোমল নি'।

॥ পাশ্চাত্য সংগীতের শুদ্ধ স্বর ॥

গুইডো অ্যারেটিনো বা গুইডো দ্য অ্যারেৎসো (Guido Aretino or Guido d' Arezzo, আনুমানিক ৯৯৫-১০৫০ খ্রী.) ছিলেন একজন ইতালিয়ান মনীষী। তিনি ইউরোপের সাতটা শুদ্ধ স্বরের নাম দেন ডো, রে, মি, ফা, সল্, লা, টি (do, re, mi, fa, sol, la, ti)। 'ডো'-কে পুনরায় ধরে যে আটটা স্বর হল তার নাম অক্টেভ। সাধারণতঃ ইউরোপীয় সংগীতের অক্টেভ হয় সি, ডি, ই, এফ, জি, এ, বি, সি। সংক্ষেপে অক্টেভের স্বরগুলির নাম হচ্ছে এ, বি, সি, ডি, ই, এফ, জি, এ। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে 'ডো' হয় 'সি'।

হারমোনিয়ামে হাপর (bellow) দিয়ে হাওয়া করে ডান হাতে পর্দা টিপে ধরলে সেই হাওয়া পর্দার পথ ধরে বেরোয়। বিভিন্ন সুরে বাঁধা পাতলা ধাতুর পাত (রীড) হাওয়া লেগে কাঁপে। তাই থেকে সুরের সৃষ্টি হয়।


বাঁয়া


তবলা

হারমোনিয়াম, বাঁয়া ও তবলা ছাড়া এদেশে গান তেমন হয় না। কিন্তু এদেশ ও বিদেশের ওস্তাদরা হারমোনিয়াম পছন্দ করেন না।

॥ অর্গ্যান ॥

সাধারণতঃ লোকে যাকে অর্গ্যান (organ) বলে, সেটা প্রকৃত অর্গ্যান নয়। তাকে টেবল হারমোনিয়াম (table harmonium) বলা ভালো। প্রকৃত অর্গ্যান সাধারণতঃ খ্রীষ্টানদের গির্জায় দেখতে পাওয়া যায়।



॥ পিয়ানো ॥

পিয়ানোর পুরো নাম পিয়ানোফোর্ট (piano-forte)। পিয়ানোর মধ্যে সুর বাঁধা তার থাকে।


পিয়ানো

পর্দা টিপলে সেই তারে হাতুড়ি পড়ে সেটা বেজে ওঠে।

॥ বেহালা ॥

বেহালার ইংরেজী নাম ভায়োলিন (violin)। ছড় দিয়ে বেহালা বাজাতে হয়। খুব বড় বেহালাকে বলে চেলো (violincello)।

॥ গীটার ॥

আজকাল গীটারের বহুল প্রচলন। অনেকে বলেন, ভারতের কচ্ছপী বীণা থেকে এর উদ্ভব। কেউ কেউ বলেন, এর উদ্ভব স্পেনে।

সাধারণতঃ দুরকম গীটার দেখা যায়—স্প্যানিশ গীটার (Spanish guitar) ও হাওয়াইয়ান গীটার



গীটার

(Hawaiian guitar)। অবশ্য স্প্যানিশ গীটার থেকে হাওয়াইয়ান গীটারের উদ্ভব। গীটারে রবীন্দ্র সংগীত, দ্বিজেন্দ্রগীতি, রজনীকান্তগীতি, অতুলপ্রসাদ সংগীত, নজরুলগীতি বা আধুনিক সংগীত ভালো ভাবেই বাজানো চলে। আবার শাস্ত্রীয় সংগীতও বাজানো চলে।

॥ অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র ॥

হার্প (harp), সিথারা (cithara), লায়ার (lyre), ম্যাণ্ডোলিন (mandoline), ব্যানজো, (banjo), জিথার (zither) প্রভৃতি বিদেশী তারের বাজনা। এদেশে সংগীতপ্রিয়রা ম্যাণ্ডোলিন ও ব্যানজো বাজিয়ে থাকেন।

পিকলো বা পিকলু (piccolo), ওবো (oboe), কর্নেট (cornet বা cornett), ক্ল্যারিনেট (clarinet) বা ক্ল্যারিওনেট (clarionet), ব্যাসুন (bassoon) প্রভৃতি যন্ত্র ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়। হর্ন (horn), ট্রম্বোন (trombone), টিউবা (tuba), ট্রাম্পেট (trumpet) প্রভৃতি মুখ দিয়ে বাজানো হয়। এসব যন্ত্র সাধারণতঃ পিতলের তৈরী।

স্যাক্সোফোন (saxophone), হার্পসিকর্ড, কেটল-ড্রাম (kettle drum), বঙ্গো (bongo), টমটম (tomtom), জাইলোফোন, ময়ূরী প্রভৃতি নানা ধরনের বাদ্যযন্ত্র নানা দেশে চলে। গেকিন (gekkin) ও স্যামিসেন (samisen) বা শ্যামিসেন (shamisen) বাদ্যযন্ত্র সাধারণতঃ জাপানে প্রচলিত। দুটিই তারের যন্ত্র। গীটারজাতীয় বাদ্যযন্ত্র স্যামিসেনের প্রচলন জাপানে খুব বেশী।

॥ লোকসংগীত ॥



গ্রাম্যজীবন, প্রাকৃতিক পরিবেশ প্রভৃতির অনাড়ম্বর পটভূমিতে লোকসংগীত রচিত ও গীত হয়ে থাকে। জেলে, মাঝি, তাঁতী, কুমোর, চাষী, শ্রমিকদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রচলিত হলেও বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে লোকসংগীত বেশ কিছু স্থান অধিকার করেছে।

লোকসংগীত (folk song) খুব ব্যাপক।

গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, ঘেঁটু, বাউল, টুসু, ভাটিয়ালী, সারি, জারি, ভাদু, চটকা, গাজন, ঝুমুর প্রভৃতি গান সবই লোকসংগীতের আওতায় পড়ে। লোক-মুখে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রচারিত বলে এর নাম হয়েছে লোকসংগীত। গ্রাম্য জীবন, সমাজজীবনের মনের কথা এর মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

॥ কাব্যসংগীত ॥

কাব্যসংগীতে কাব্যটাই মুখ্য। কাব্যাংশ ও সুর সমান সমান হতে পারে কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রে সুর থেকে কাব্যের প্রাধান্য বেশী দেখা যায়। উপযুক্ত সুর প্রয়োগে কাব্যের রূপ ভালভাবে ফুটিয়ে তোলাই কাব্যসংগীতের বৈশিষ্ট্য।

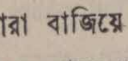
॥ ভাবসংগীত ॥

ভাবসংগীতে ভাবেরই প্রাধান্য। যার বাণী ও সুর গায়ক ও শ্রোতার মনে পবিত্র ভাবের সৃষ্টি করে, তাই-ই হচ্ছে ভাবসংগীত। কোনপ্রকার চটুল ভাবের স্থান এতে নেই, এতে থাকে ভাবগম্ভীর বাণী ও সুর।



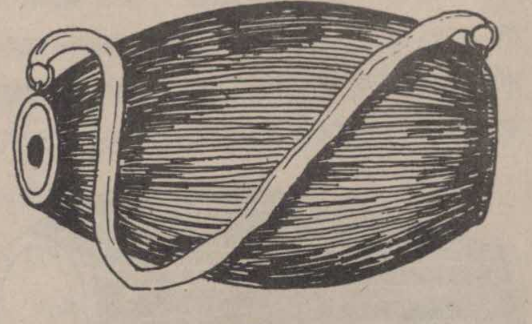
॥ বাউল ॥

একশ্রেণীর ভক্ত গায়কদের বলা হয় বাউল। ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে একতারা বাজিয়ে নৃত্য করতে করতে এরা গান করে, এদের পরম দেবতা রাধাকৃষ্ণ। এরা তিলক পরে। দাড়ি গোঁফ রাখে, মাথার চুল উঁচু করে চূড়াকারে বাঁধে। গুরুবাদ, সহজিয়াবাদ, শূন্যবাদ এদের প্রধান উপজীব্য। বাউলদের রচিত বা গীত গানই বাউল গান। ক্ষ্যাপাচাঁদ দীন বাউল, লালন ফকীর, সিরাজ সাঁই, হরুচাঁদ, দীন ভূষণ, রামচাঁদ প্রভৃতি বিখ্যাত বাউল।



॥ কীর্তন ॥

কীর্তন একশ্রেণীর বিশেষ গান। কীর্তন প্রধানতঃ দুরকমের—নামকীর্তন ও লীলাকীর্তন।



খোল

ঈশ্বরের গুণগানকে বলা হয় নামকীর্তন, আর রাধা-কৃষ্ণের লীলাবর্ণনা দ্বারা লীলাকীর্তন হয়। গৌরাঙ্গ লীলাও লীলাকীর্তনের মধ্যে পড়ে। খোল ও করতাল বাজিয়ে কীর্তন হয়।

॥ খেয়াল ॥

নানা রকম তাল বিস্তার ইত্যাদির দ্বারা বিভিন্ন তালে খেয়াল গান হয়। খেয়াল গান দু'রকমের—বড় খেয়াল (বিলম্বিত খেয়াল) ও ছোট খেয়াল (দ্রুত খেয়াল)। পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ শর্কী বড় খেয়াল এবং আমীর খসরু ছোট খেয়ালের আবিষ্কর্তা।

তবলা সহযোগে খেয়াল গান হয়। একতাল, ত্রিতাল, ঝুমরা, আড়া চৌতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি তালে খেয়াল গান হয়।

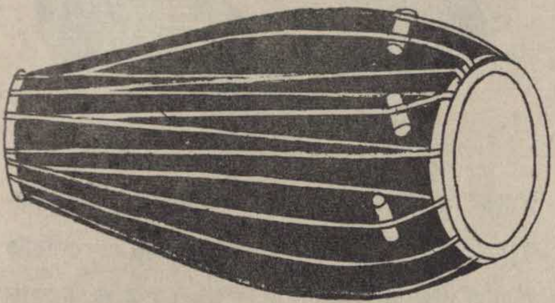
॥ ধামার বা হোরী ॥

হোরীর বর্ণনাসমেত যে সব গান ধামার তালে গাওয়া হয়, তাকে বলে ধামার বা হোরী গান। ধামার গান ধ্রুপদ অপেক্ষা চঞ্চল ও এতে হিন্দী ও ব্রজভাষাই বেশী ব্যবহৃত হয়। রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণনাই ধামার বা হোরী গানের মুখ্য বিষয়বস্তু।

॥ ধ্রুপদ ॥

ধ্রুপদ ভারতের অতি প্রাচীন ও অতি প্রসিদ্ধ শাস্ত্রীয় সংগীত। ধ্রুপদ গানে মীড় বা গমক প্রয়োগ

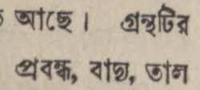
করে রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। দীর্ঘ আলাপের পর ধ্রুপদ গান আরম্ভ হয় ও সুষ্ঠু লয়ে গান চলে। সাধারণতঃ ঈশ্বরের ভজনা ধ্রুপদ গানের প্রধান উপজীব্য। ভারতে ও বঙ্গদেশে যত উচ্চশ্রেণীর গান



পাখোয়াজ

প্রায় তার অধিকাংশই ধ্রুপদ। পাখোয়াজ সহযোগে ধ্রুপদ গান হয়। বড় বড় খেয়াল-গায়কেরাও ধ্রুপদ গান শ্রদ্ধার সঙ্গে গেয়ে থাকেন। বহু বাংলা গান, বিশেষ করে প্রথম দিকের রবীন্দ্র সংগীত বা ব্রহ্মসংগীতে ধ্রুপদেরই প্রাধান্য। গোয়ালিয়রের রাজা মানসিংহ তোমর ধ্রুপদ গানের স্রষ্টা।

॥ সংগীতরত্নাকরম্ ॥



সারঙ্গদেব (বা শার্ঙ্গী বা শার্ঙ্গদেব)-রচিত বিরাট সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্র। এই পুস্তকে মার্গী বা দেশী সংগীতের প্রকারভেদ, রাগ-রাগিণীর রূপ-লক্ষণ, তাললক্ষণ ও প্রস্তাব প্রভৃতি আছে। গ্রন্থটির অধ্যায় সাতটি—স্বর, রাগ, প্রকীর্ণ, প্রবন্ধ, বাদ্য, তাল ও নর্তন। এ এক বিরাট সংগীতগ্রন্থ। ব্রজেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী এই গ্রন্থের একটি বাংলা অনুবাদ করেছেন।

॥ সংগীত-পারিজাতম্ ॥

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে পণ্ডিত অহোবল 'সংগীত-পারিজাতম্' গ্রন্থ রচনা করেন। এতে প্রধানতঃ উত্তর ভারতীয় সংগীতের আলোচনা আছে। দক্ষিণ ভারতের কোন কোন রাগের বিবরণও এতে আছে।

॥ সংগীত-দামোদরম্ ॥

শুভংকর-রচিত দুর্লভ সংস্কৃত সংগীতশাস্ত্র। এতে বিভিন্ন রাগ-রাগিণীর রূপ, লক্ষণ ও তালসমূহের তালাঘাত ও মাত্রা নির্ণয় প্রভৃতি দেওয়া হয়েছে।

॥ রাগতরঙ্গিণী ॥

মিথিলার পণ্ডিত লোচন-রচিত সংগীতশাস্ত্র। সম্ভবতঃ বল্লালসেনের রাজত্বকালের প্রথমে এইটি লেখা হয়েছিল। এতে রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তবে সে-সব আলোচনার মধ্যে বর্তমানকালের রাগরূপাদির বহু অংশে মিল নেই।

॥ হৃদয়কৌতুক, হৃদয়প্রকাশ ॥

পণ্ডিত হৃদয় নারায়ণ দেব গ্রন্থ দুটির রচয়িতা। সম্ভবতঃ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে গ্রন্থ দুখানি রচিত হয়। 'হৃদয়কৌতুক' গ্রন্থে শুদ্ধ ও বিকৃত স্বরের বর্ণনা আছে। 'হৃদয়প্রকাশ' গ্রন্থে তারের মাপে স্বরস্থানের নির্দেশ আছে।

॥ রাগতত্ত্ববিবোধ ॥

খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে শ্রীনিবাস এই গ্রন্থ রচনা করেন বলে মনে হয়। এই গ্রন্থে মূর্ছনা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।

॥ অনুপসংগীতবিলাস, অনুপসংগীত-রত্নাকর, অনুপ সংগীতাঙ্কুশ ॥

প্রায় দু'শ বছর আগে ভাবভট্ট অনুপসিংহ গ্রন্থ তিনখানি রচনা করেন। এতে রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।

॥ রাগমালা, রাগমঞ্জরী ॥

কর্ণাটকী পণ্ডিত পুণ্ডরীক বিট্টল গ্রন্থ দু'খানি রচনা করেন। গ্রন্থ দুটিতে উত্তর ভারতীয় সংগীতের

বিস্তৃত আলোচনা আছে ও মেলের বহু নাম সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে।

॥ সংগীততরঙ্গ ॥

রাধামোহন সেন বিরচিত সংগীতশাস্ত্র। বাংলা পদ্যে রাগ-রাগিণী, তাল, মাত্রা প্রভৃতির সরল বিবরণ এতে আছে।



॥ সংগীতসার ॥

ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী-রচিত সংগীতগ্রন্থ। হিন্দুস্থানী সংগীতের বিবরণ, বিভিন্ন গানের পার্থক্য, স্বরলিপির সাহায্যে রাগ-রাগিণীর আলাপ প্রভৃতি এতে আছে।

॥ ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র ॥

যতদূর জানা যায়, এই গ্রন্থখানি ভারতীয় সংগীত সম্বন্ধে রচিত সব চেয়ে পুরনো বই। ভরতমুনি এতে রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে বহু কথা বলেছেন।

সারা ভারত জুড়ে বিভিন্ন সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রাগ-রাগিণী সম্বন্ধে নানা আলোচনা করে গেছেন। কিন্তু বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন স্থানে বার বার রাগ-রাগিণীর নাম, রূপ ইত্যাদির পরিবর্তন হয়েছে। আজও উত্তর ভারতের সংগীত-পদ্ধতির সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের পদ্ধতির অনেক অমিল। নানা মুনির নানা মত। এমন কোন সর্বভারতীয় প্রচেষ্টা আজও হল না, যাতে সর্বত্র একই পদ্ধতির অনুসরণ করা হয়।

॥ আমীর খসরু ॥

সম্রাট্ আলাউদ্দিন খিলজির প্রধানমন্ত্রী ও গুরু আমীর খসরু (খুসরৌ) ছোট খেয়াল সৃষ্টি করেন বলে শোনা যায়। তিনি কাওয়ালী গানেরও স্রষ্টা। তিনি বহু নূতন নূতন রাগ-রাগিণীর সৃষ্টি করেছেন।

॥ সারঙ্গদেব বা শার্ঙ্গদেব ॥

সম্ভবতঃ যাদব বংশীয় এক রাজার আমলে ১২০৮ থেকে ১২৪৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। সংগীতশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। বিখ্যাত 'সংগীতরত্নাকরম্' গ্রন্থ তাঁরই রচনা। কল্লিনাথ গ্রন্থটির সহজবোধ্য টীকা রচনা করেন।

॥ গোপাল নায়ক ॥

দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের রাজা দেবরায়ের সভার গাইয়ে ছিলেন। কেউ বলেন, তিনি ছিলেন দেবগিরি-নিবাসী। আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর তাঁকে দিল্লীতে নিয়ে যান। আমীর খসরু আড়াল থেকে তাঁর গান শুনে সংগীত সম্বন্ধীয় বহু তত্ত্ব আহরণ করেন।

॥ তানসেন ॥

তানসেন ছিলেন এক অসাধারণ সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ গায়ক। তিনি হিন্দু ছিলেন। তাঁর নাম ছিল রামতনু বা তন্না। কিন্তু পরে মুসলমান হন। তিনি



তানসেন

বান্ধোগড়ের রাজা রামচন্দ্রের সভাগায়ক ছিলেন। পরে আকবরের সভাগায়ক হন। তিনি 'রবাব' যন্ত্রের উদ্ভাবক। ধ্রুপদকে স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগে তিনি বিভক্ত করেন। তিনি ছিলেন হরিদাস স্বামীর স্নেহভাজন শিষ্য।

॥ বৈজু বাওরা ॥



বৈজু বাওরা ছিলেন একজন বিখ্যাত ধ্রুপদ-গায়ক। গুজরাটের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম



বৈজু বাওরা

হয়। বাওরা শব্দের অর্থ পাগল। বৈজু গান নিয়ে পাগলের মতো এমন মেতে থাকতেন যে লোকে তাঁকে বলত 'বৈজু বাওরা'।

॥ হরিদাস স্বামী ॥

ষোড়শ শতাব্দীর বিখ্যাত গায়ক ও নিম্বার্ক-সম্প্রদায়ভুক্ত সন্ন্যাসী হরিদাস বৃন্দাবনবাসী ছিলেন। তাঁর সংগীতগুরু ছিলেন কৃষ্ণদত্ত বা কৃষ্ণানন্দ বা কৃষ্ণদাস গোস্বামী। তানসেন তাঁর শিষ্য ছিলেন। 'সাধারণ সিদ্ধান্ত' ও 'রসকে পদ' তাঁর লেখা দু'খানি হিন্দী বই।



হরিদাস স্বামী

॥ মীরাবাঈ ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে, সম্ভবতঃ ১৫০৪ খ্রীষ্টাব্দে যোধপুর রাজ্যে রাঠোর বংশে মীরাবাঈয়ের জন্ম হয়। মেবারের রানা কুম্ভের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিনি তীর্থ পর্যটনে বার হয়ে মন্দিরে মন্দিরে গান করে বেড়ান। তাঁর রচিত শত শত গান বর্তমান। কিংবদন্তী, ১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দেবমূর্তির সঙ্গে মিশে যান।

॥ সুরদাস ॥



আজন্ম অন্ধ সুরদাস ছিলেন সুকণ্ঠ গায়ক ও ভজন-রচয়িতা। তিনি এক হাজারেরও বেশী ভজন রচনা করেন। ১৫৯১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী-মথুরা রোডের নিকটবর্তী কোন গ্রামে তাঁর জন্ম হয়।

॥ দাদূ ॥

দাদূ (১৫৪৪-১৬০৩ বা ১৬০৪ খ্রী.) ছিলেন একজন বিখ্যাত ভজন-গায়ক। সম্ভবতঃ তাঁর পূর্বাশ্রমের নাম ছিল মহাবলী।

॥ সদারঙ্ ॥

বাদশাহ্ মহম্মদ শাহের আমলে শাহ্ সদারঙ্গ্ বা নিয়ামত খাঁ বর্তমান ছিলেন। তাঁর লেখা গানের শেষে 'সদারঙ্গিলে মহম্মদ শাহ্' থাকত। তাই থেকেই তাঁর নাম হয় সদারঙ্গ্। তাঁর দুই ছেলে অদারঙ্গ্ ও মহারঙ্গ্ (ফিরোজ খাঁ ও ভূপৎ খাঁ)।

॥ ভাতখণ্ডে ॥



বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে (১৮৬০-১৯৩৬ খ্রী.) বোম্বাইয়ের নিকটবর্তী বালকেশ্বর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি উকীল ছিলেন। তিনি একজন প্রখ্যাত সংগীতশাস্ত্রজ্ঞ গ্রন্থকার ছিলেন। তিনি অষ্টোত্তর শততাললক্ষণম্, অভিনব তালমঞ্জরী, হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (চার খণ্ড), ক্রমিক পুস্তক-মালিকা (ছ' খণ্ড) রচনা করেন। লক্ষ্ণৌ-এর মরিস কলেজ (বর্তমানে ভাতখণ্ডে বিদ্যাপীঠ) তাঁর বিশেষ কীর্তি।



ভাতখণ্ডে

॥ বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর ॥

বিখ্যাত গান 'রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিত পাবন সীতারাম'-এর রচয়িতা বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর (১৮৭২-১৯৩১ খ্রী.) এক নূতন স্বরলিপি পদ্ধতির প্রবর্তক। পণ্ডিত ওংকারনাথ ঠাকুর ও পুত্র ডি. ভি. পালুস্কর তাঁর শিষ্য।



বিষ্ণুদিগম্বর পালুস্কর

॥ আবদুল করিম খাঁ ॥

বরোদা রাজদরবারের গায়ক ও পুনায় ও বোম্বাইয়ে আর্যসংগীত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা আবদুল করিম খাঁর (১৮৭২-১৯৩৭ খ্রী.) গানের ঢংকে কিরানা ঘরানা বলে। তাঁর বাবা কালে খাঁ ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজন গুণী গায়ক-বাদক ছিলেন। হীরাবাঈ বরোদেকার ও রোশনারা বেগম তাঁর শিষ্যা।

॥ উজীর খাঁ ॥

রামপুর রাজদরবারের বীণাবাদক আমীর খাঁর ছেলে উজীর খাঁ (১৮৬০-১৯২৭ খ্রী.) বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। আলাউদ্দীন খাঁ তাঁর ছাত্র।

॥ ফৈয়াজ খাঁ ॥

আগ্রার ফৈয়াজ খাঁ ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বরোদা রাজদরবারের গায়ক ছিলেন। তিনি বিখ্যাত খেয়াল গায়ক ছিলেন।

নাসীর উদ্দীন খাঁ, আলাবন্দ খাঁ, বড়ে গোলাম আলি, কেরামত উল্লা খাঁ (স্বরোদ), বাদল খাঁ,

এনায়েৎ খাঁ (সেতার), কণ্ঠে মহারাজ (তবলা), আহমদ জান খেরাকুয়া (তবলা), খলিফা আবেদ হোসেন খাঁ (তবলা) প্রভৃতির নাম সংগীত জগতে স্মরণীয়।

॥ আলাউদ্দীন খাঁ ॥

বিখ্যাত স্বরোদ-বাজিয়ে। তাঁর এক শিষ্য তিমিরবরণ ভট্টাচার্য স্বরোদ-বাদক। তাঁর শিষ্য ও



আলাউদ্দীন খাঁ

জামাতা রবিশংকর বিখ্যাত সেতার-বাদক। তাঁর পুত্র আলি আকবরও প্রসিদ্ধ স্বরোদ-বাজিয়ে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন খাঁর মৃত্যু হয়।

॥ টপ্পা গান ॥

শোরী মিঞা টপ্পা গান প্রচলন করেন। হুগলী জেলার চাঁপতা গ্রামের নিধুবাবু (নিধিরাম গুপ্ত বা রামনিধি গুপ্ত—১৭৪১-১৮২৮ খ্রী.) বিখ্যাত টপ্পা গায়ক।

॥ ঠুংরী ও গজল ॥

ধ্রুপদ, খেয়াল প্রভৃতি গান ছাড়া যে সব নূতন ধারার গানের প্রচলন হয়, তন্মধ্যে ঠুংরী ও গজল প্রসিদ্ধ। ঠুংরী ক্ষুদ্র রাগে ও ক্ষুদ্র তালে রচিত গান। গজল সাধারণতঃ এক ধরনের ফারসী গানের ঢঙে গাওয়া গান।

রবীন্দ্রনাথ, রামপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন. দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, নজরুল ইসলাম প্রভৃতি গীতিকার ও গায়ক প্রসিদ্ধ ('সাহিত্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

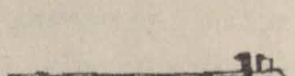
॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ (১৮৪৯-১৯২৫ খ্রী.) বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদুভট্ট ও শ্রীকণ্ঠ সিংহের নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। তিনি একাধারে গীতিকার, গায়ক, বাদক, সুরকার ও নাট্যকার ছিলেন।

॥ বিষ্ণু চক্রবর্তী ॥

বিষ্ণু চক্রবর্তী (১৮০৪-১৯০০ খ্রী.) ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতশিল্পী। তিনি মূলতঃ ধ্রুপদী গানের গায়ক ছিলেন। খেয়ালও গাইতেন। তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে সংগীতশিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্রাহ্মসমাজের গায়ক হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছিল অপরিসীম। রবীন্দ্রনাথ বিষ্ণুর গান শুনে শাস্ত্রীয় সংগীতে যথেষ্ট জ্ঞান আহরণ করেন।

॥ যদুভট্ট ॥



বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত গায়ক যদুভট্ট (১৮৪৩-১৮৮৩ খ্রী.) জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ির সংগীত-শিক্ষক ছিলেন। তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী গায়ক ছিলেন। তিনি শুধু গায়ক ছিলেন না। সুরকার ও গীতিকারও ছিলেন। ধ্রুপদ গানে তাঁর অশেষ দক্ষতা ছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্র-সংগীতের স্রষ্টা। ('সাহিত্য' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

॥ দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥



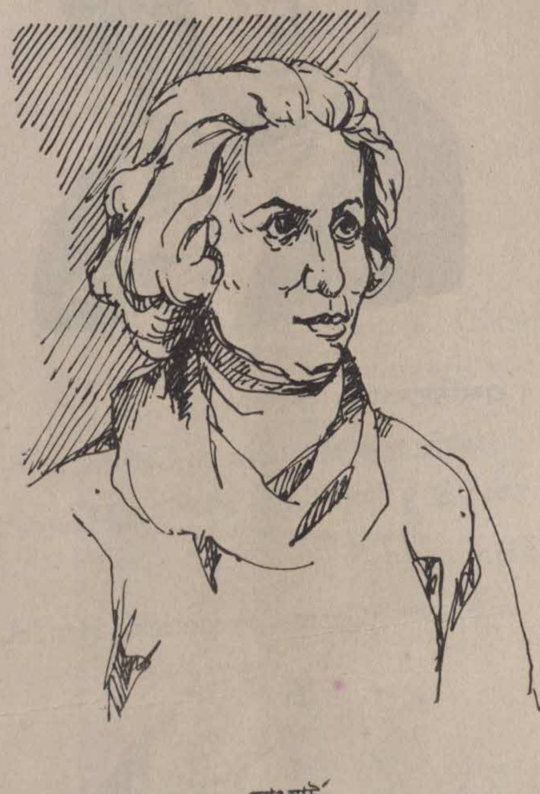
দিনেন্দ্রনাথ (১২৮৯-১৩৪২ বঙ্গাব্দ) ছিলেন গীতিকার, স্বরলিপিকার, সুরকার, গায়ক ও সমালোচক। তিনি রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের স্বরলিপি করেন।

ভারতে, বিশেষ করে বাংলায় কত যে গীতিকার, গায়ক ও বাদক জন্মেছেন, তা বলে শেষ করা যায় না। তাঁদের কয়েকজনের নাম—শুভলক্ষ্মী, লতা মুঙ্গেশকর, আশা ভোঁসলে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, দিলীপকুমার রায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অমর ভট্টাচার্য, মোহিনীমোহন মিশ্র, যামিনী গাঙ্গুলী, সুখেন্দু গোস্বামী, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, পঙ্কজ মল্লিক, তারাপদ চক্রবর্তী, অনিল বাগচী, স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, অনুপম ঘটক, সায়গল, জগন্ময় মিত্র, পান্নালাল ভট্টাচার্য, মান্না দে, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, কালীকিঙ্কর ভট্টাচার্য, মহম্মদ রফি, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, রাধাকান্ত নন্দী, শিশিরকণা ধরচৌধুরী, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শান্তা প্রসাদ, অজয় ভট্টাচার্য, গোপাল দাশগুপ্ত, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, নির্মলচন্দ্র বড়াল, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশকালী ঘোষাল, প্রণব রায় বাণীকুমার, মোহিনী চৌধুরী, শৈলেন রায়, সজনীকান্ত মতিলাল, সলিল চৌধুরী, হীরেন বসু, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি।

পাশ্চাত্ত্যে অসংখ্য সুরকার (composer), গায়ক ও গীতিকার জন্মেছেন। ইউরোপ-আমেরিকার সকল দেশে, চীন, জাপান, থাইল্যাণ্ড, কোরিয়া, ভিয়েটনাম, ইন্দোনেশিয়া, আরব, ইরান, ইরাক, ইজিপ্ট প্রভৃতি সব দেশেই অসংখ্য সংগীতশিল্পী জন্মেছেন।

॥ মোৎসার্ট ॥

মোৎসার্ট (Wolfgang Amadeus Mozart. ১৭৫৬-৯১ খ্রী.) বিখ্যাত অস্ট্রিয়ান সুরকার



মোৎসার্ট

(composer)। তাঁর রচিত গীতিনাট্যও সুপ্রসিদ্ধ।

॥ বেটোভেন ॥

বেটোভেন (Ludwig von Beethoven, ১৭৭০-১৮২৭ খ্রী.) বিখ্যাত জার্মান সুরকার (composer)। তিনি মোৎসার্টের নিকট শিক্ষা-লাভ করেন। তাঁর Ninth Symphony একটি সুপ্রসিদ্ধ সুর-সৃষ্টি। ৩০ বৎসর বয়সে তিনি বধির হয়ে গেলেও অজস্র সুর সৃষ্টি করে গেছেন।



বেটোভেন

১৬৮৫-১৭৫৯ খ্রী.) ছিলেন বিখ্যাত জার্মান সুরকার (composer)। তিনি ৪০ খানার অধিক গীতিনাট্য রচনা করেন। মৃত্যুর ৮ বৎসর আগে তিনি অন্ধ হয়ে যান। কিন্তু বন্ধু জন ক্রিস্টোফার স্মিথকে দিয়ে সুর লিখিয়ে রেখে গেছেন।

॥ বাখ ॥

বাখ (Johann Sebastian Bach, ১৬৮৫-১৭৫০ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জার্মান সুরকার



বাখ

(composer)। তিনিও শেষ বয়সে অন্ধ হয়ে যান। তিনি উৎকৃষ্ট বেহালা-বাদক ও অর্গান-বাদক ছিলেন।

॥ এনরিকো কারুসো ॥

এনরিকো কারুসো (Enrico Caruso, ১৮৭৩-১৯২১ খ্রী.) ছিলেন বিখ্যাত ইতালীয় গায়ক।

॥ হ্যাণ্ডেল ॥

হ্যাণ্ডেল (George Frederick Handel,

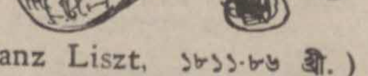


হ্যাণ্ডেল

॥ ভাগনার ॥

ভাগনার (Richard Wagner, ১৮১৩-৮৩ খ্রী.) ছিলেন জার্মান কবি, নাট্যকার ও সুরকার (composer)। তিনি বেশ কয়েকটি গীতিনাট্য রচনা করেন।

॥ লিস্‌ৎট্‌ ॥



লিস্‌ৎট্‌ (Franz Liszt, ১৮১১-৮৬ খ্রী.) ছিলেন একজন হাঙ্গেরিয়ান সুরকার (composer)। তাঁর বোন কোসিমা (Cosima)-কে ভাগনার বিবাহ করেন। তিনি ভাগনারের বন্ধু ছিলেন।



ভাগনার



লিস্‌ট্‌

॥ মেণ্ডেলসন বারথল্‌ডি ॥

মেণ্ডেলসন-বারথল্‌ডি (Felix Mendelssohn-Bartholdy, ১৮০৯-৪৭ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ জার্মান সুরকার (composer)।

॥ ব্রাম্‌জ্‌ ॥

ব্রাম্‌স্‌ (Jonannes Brahms, ১৮৩৩-৯৭ খ্রী.) একজন নাম-করা জার্মান সুরকার (composer)। তিনি শুম্যানের বন্ধু ছিলেন। সংসারধর্ম না করে সারা জীবন সংগীত-চর্চা নিয়ে থাকেন।

॥ হেড্‌ন্‌ ॥



হেড্‌ন্‌ (Franz Joseph Haydn, ১৭৩২-১৮০৫ খ্রী.) অস্ট্রিয়ান সুরকার। তাঁকে 'Father of the symphony' বলা হয়।

॥ স্কার্লাটি ॥

স্কার্লাটি (Allessandro Scarlatti, ১৬৫৯-১৭২৫ খ্রী.) ইতালীয় সংগীতশিল্পী।

॥ শোপাঁ ॥

শোপাঁ (Frederic Francois Chopin, ১৮১০-৪৯ খ্রী.) পোলিশ পিয়ানো-বাদক ও সুরকার (composer)। তাঁর পিতা ছিলেন ফরাসী, মাতা পোলিশ। তাঁকে 'the poet of the piano' বলা হয়।



শোপাঁ

॥ সাইবেলিয়াস ॥

সাইবেলিয়াস (Jean Sibelius, ১৮৬৫-১৯৫৭ খ্রী.) ফিনল্যাণ্ডের বিখ্যাত সুরকার (composer)।

॥ প্যাডেরেভ্স্কি ॥

প্যাডেরেভ্স্কি (Ignace Jan Paderewski, ১৮৬০-১৯৪১ খ্রী.) ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ পোলিশ পিয়ানো-বাদক। তিনি পোলাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নির্বাসিত অবস্থায় মারা যান।

॥ চাইকভ্স্কি ॥

চাইকভ্স্কি (Peter Ilich Tchaikovsky, (১৮৪০-৯৩ খ্রী.) একজন রাশিয়ান সুরকার (composer) ও গীতিনাট্য রচয়িতা।

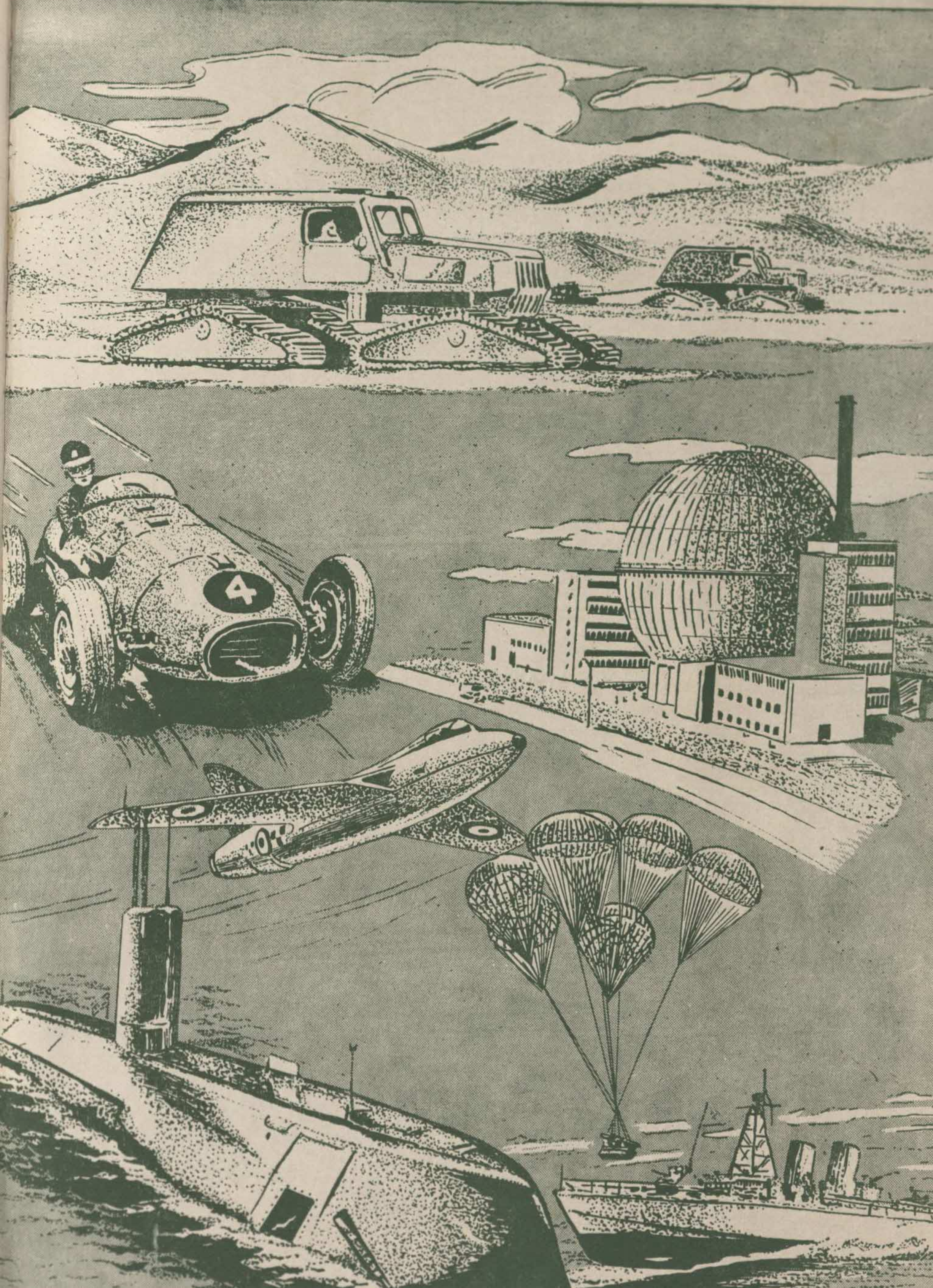


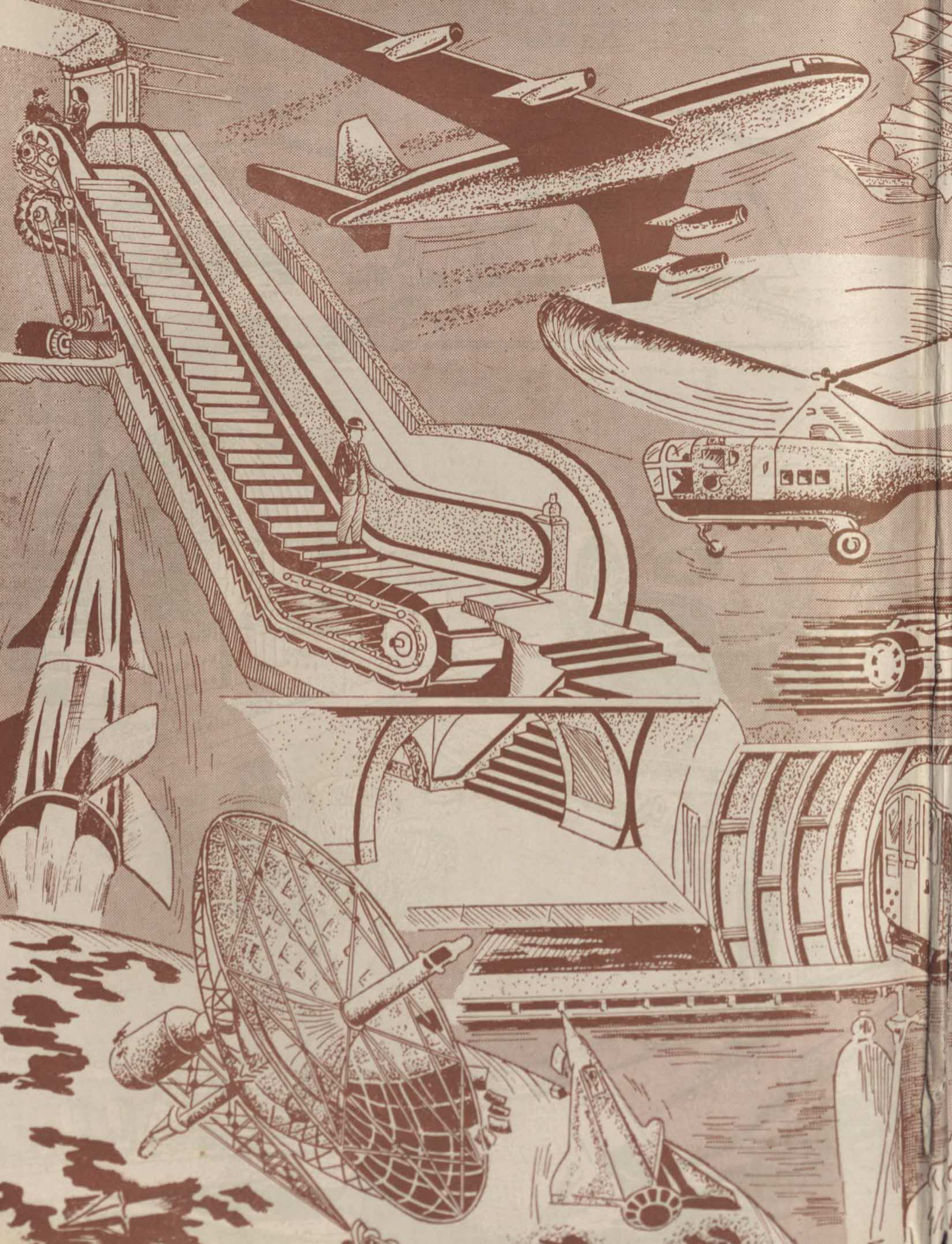
॥ স্মেটানা ॥

স্মেটানা Bedrich Smetana, ১৮২৪-৮৪ খ্রী.) ছিলেন একজন উৎকৃষ্ট চেক সুরকার ও গীতিনাট্য-রচয়িতা। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সম্পূর্ণ বধির হয়ে যান। উন্মাদাশ্রমে তাঁর মৃত্যু হয়।

যাদের নাম করা হল, তাঁরা অসংখ্য সুরকার, গীতিনাট্যকার ও গীতিকারদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন।








WMN
train

